تفسير انوار القرآن

তাফসীরে
আনওয়ারুল কুরআন

৬

[২৬তম পারা থেকে ৩০তম পারা পর্যন্ত]

রচনা ও সংকলনে

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
তাফসীরে জালালাইন শরীফের অনুবাদক
লেখক, গবেষক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন (৬ষ্ঠ খণ্ড)

রচনা ও সংকলনে ◈ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

প্রকাশক ◈ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

শব্দবিন্যাস ◈ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণে ◈ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
২৮/ এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

হাদিয়া ◈ ৬০০.০০ টাকা মাত্র

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد! : فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم "وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون" وقال رسول الله ﷺ : تركت فيكم امرين ماتمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا : كتاب الله وسنتى.

প্রথমে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি রহমান ও রহীম। যার দয়া অফুরন্ত ও অসীম। যিনি আমাদের উপর আপন অনুগ্রহে বেহিসাব নায-নিয়ামত দান করেছেন। বিশেষ করে অধম কে স্বীয় কালামে পাকের ব্যখ্যাগ্রন্থ 'তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন' রচনার তৌফিক দিয়েছেন।

আম্মা বাদ :

দুনিয়াবি ও উখরবি জিন্দেগিতে মানবতার শাশ্বত মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যুগে যুগে বহু নিদর্শনাবলি পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। কখনো বা পৃথিবীবাসীকে অপার দয়া-রহমত আবার কখনো বেদনাদায়ক আজাব-শাস্তির স্বাদ চাখিয়েছেন। কখনো বা নিজ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলির অবলোকন করিয়েছেন। সময়ে সময়ে আদেশ-নিষেধ সম্বলিত সহীফা ও কিতাব অবতারণ করেছেন। এতসব কিছুর লক্ষ্য একটাই, মানুষের বিকার মস্তিষ্কে যেন বোধের উদয় ঘটে। দুনিয়া, নফস ও শয়তানের ফাঁদ এড়িয়ে এক ইলাহে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। মহিয়ান গরিয়ান রাব্বুল আ'লামীনের মানশা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখেরাতে সিদ্ধকাম হতে পারে। কিন্তু কোনটি যে তামাম জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ– তা তো এই নগণ্য জিন ও ইনসান সম্প্রদায়ের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়! তাহলে এখন উপায় কী হবে? এরই ধারাবাহিকতায় আখেরি উম্মতের জন্য রাব্বানার পক্ষ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ অবতীর্ণ করা হয় খোলাচিঠি 'আল-কুরআন'।

এই আল-কুরআনকে বলা হয় আদর্শ জীবন বিধান। এর মাঝে রয়েছে বৈচিত্র্যময় ও শতবাকধারী জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা। বিশ্বাসগত, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক– সকল বিষয়ে রয়েছে সর্বযুগের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য মৌলিক নীতিমালা। এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি যুগের সমসাময়িক সমস্যার সমাধানও তো কুরআনের মূলনীতি থেকেই উদ্ভাবিত হয়। তাছাড়া নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া শুদ্ধ হয় না। শুধু তাই না কুরআনের অনুকরণ ছাড়া জিন্দেগির সফলতাও সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন– 'তোমাদের মাঝে আমি এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা ধরে থাকলে আমার পরে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত।' (মুসনাদে আহমাদ : ৪/৫০)

✦ বলা বাহুল্য, আমল, আখলাক, কথাবার্তা, চাল-চলন তথা বৈষয়িক জীবনে অনুপম আদর্শে সাহাবায়ে কেরামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের মূল হেতু কিন্তু এই আল কুরআনের অনুধাবন ও অনুকরণ। এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন–

كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشَرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ وَالْعَمَلَ بِهِنَّ

"আমাদের মাঝে কেউ যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি সেগুলোর অর্থ অনুধাবন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ব্যতীত সেগুলোকে অতিক্রম করতেন না। (তাফসীরে তাবারী : ১/ ২৭; বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৬ হিজরি)। সাহাবায়ে কেরাম তো আখেরি নবীর সোহবত পেয়ে ধন্য হয়েছেন। সময়ে সময়ে কুরআনের আয়াত অবতারণের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট আলোকন করেছেন। তার উপর আবার অবোধগম্য বিষয়াবলি নিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে আলোচনা করে সমাধান করে নিতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা কীভাবে কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করব? সংকীর্ণ মেধাতে ইলাহী কালাম অনুধাবন করার সাধ্য কার? এর প্রেক্ষিতেই তাফসীর শাস্ত্রের বিকাশ। এর সূচনাটাও হয়েছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে। প্রথমত হযরত মুহাম্মদ ﷺ তো ছিলেন কুরআনেরই জীবন্ত ব্যাখ্যাপুরুষ। তাঁর পবিত্র জীবনে এই কুরআনই তো নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত হয়েছিল। তাই তো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন– 'তিনি তো সাক্ষাৎ কুরআন।' দ্বিতীয়ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআনকে মানুষের সামনে তুলে ধরা তো ছিল রাসূল ﷺ-এর গুরুদায়িত্বসমূহের অন্যতম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ –

"আমি তোমার প্রতি এক স্মরণিকা (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, যেন তা তুমি মানুষের জন্য বয়ান তথা ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা : নাহল; আয়াত : ৪৪; পারা : ১৪)

সারকথা, তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমেই সূচিত হয়েছে এবং এটাও উপলব্ধ যে, তাফসীর হলো আল-কুরআনেরই বিশ্লেষিত রূপ। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআনের মর্ম মর্মে অনুধাবন করা অতঃপর তদনুযায়ী অনুকরণ, অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই তো আল্লামা যারকাশী (র.) আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন (১/৩৩) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন-

هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ عَلٰى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَبَيَانُ مَعَانِيْهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ –

অর্থাৎ এটা এমন এক বিজ্ঞানের নাম, যার দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব অনুধাবন, তার অর্থের ব্যাখ্যা ও আয়াতের বিধি-বিধান এবং এর রহস্য জানা যাবে।

আর ড. মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী (র.) আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসিসরুন (১/১৫-১৬; কায়রো : মাকতাবা ওয়াহাবা; ১৪১৬ হি.) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন– بَيَانُ كَلَامِ اللّٰهِ أَوْ أَنَّهُ الْمُبَيِّنُ لِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَمَفْهُوْمَاتِهَا অর্থাৎ, (এটা) আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা অথবা এটা কুরআনের শব্দমালা ও ভাবসমূহের সুস্পষ্টকারী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানব জীবনে দু'জাহানের শান্তি-সুখ ও সফলতা লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আল-কুরআনের, ঠিক তেমনি কুরআন অনুধাবনের জন্য তাফসীর শাস্ত্রে প্রয়োজন।

✦ ইসলামিয়া কুতুবখানা -এর উদ্যোগে ইতঃপূর্বে আনওয়ারুল কুরআন নামক পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সূরা বাকারা, নিসা, মায়িদা, আন'আম, আ'রাফ, আনফাল ও তাওবা -এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু সূরার সরল অনুবাদ, শাব্দিক অনুবাদ, ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং শানে নুযূলসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এর আঙ্গিকে গ্রন্থটি সাজানো হয়েছিল। সহজ ও সরল পাঠে প্রয়োজনীয় তবে নির্ভুল তত্ত্বে উপস্থাপিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আনওয়ারুল কুরআন পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাদের আকুলিত হৃদয়ের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কুরআনের একটি যুগোপযোগী তাফসীর গ্রন্থ রচনার বিষয়টি সামনে আসে। এরই প্রেক্ষিতে ইসলামিয়া কুতুবখানার সত্ত্বাধিকারী আলহাজ্ব মাওলানা মোস্তফা সাহেব (দা. বা.) কুরআনের খেদমত করার মনস্থ করত আমাকে

আনওয়ারুল কুরআনের আদলে একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানান। কিন্তু কুরআনের এত বড় খেদমত করতে গিয়ে না জানি কলঙ্কের ছোঁয়া লাগে– এই ভয়ে আমি অনুরোধে সাড়া দিচ্ছিলাম না। কিন্তু মাওলানা সাহেবও খেদমত করার সুযোগ হাতছাড়া করার ব্যক্তি নন। অবশেষে তাঁর অনুরোধকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানালাম। মূলত তাঁর দিলের তড়পেই আমি এ খেদমতে হাত লাগালাম। তাফসীর গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আনওয়ারুল কুরআনের রচনা কাঠামোর আলোকে রচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আশরাফ আলী থানবী (র.) -এর তরজমার অনুকরণ করা হয়েছে। এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) এর মা'আরিফুল কুরআন কে অনুসরণ করা হয়েছে। আর তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) -এর মা'আরিফুল কুরআনকে সামনে রাখা হয়েছে। এছাড়াও তাফসীরে নূরুল কুরআন, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী, ইবনে কাছীর ও তাফসীরে মাজহারীর গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনাও সমভাবে উপাত্ত হয়েছে। দীর্ঘদিনের মেহনতের বদৌলতে তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন আজ প্রকাশের পথে, তাই এ আনন্দঘন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি পাবলিকেশনের জগতে অনুকরণীয় আদর্শ আলেমে দীন আলহাজ মাওলানা মোস্তাফা সাহেব (দা. বা.) -এর জন্য দোয়া করি– 'আল্লাহ! হযরতকে সিহহাত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর সমস্ত দীনি খেদমত ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন।' এবং যারা আমাকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা, মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্যও দোয়া করি– 'হে আল্লাহ! তাদেরকে উত্তম জাযা ও খায়ের দান করুন এবং এই তাফসীর গ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে সর্বস্তরের পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে কবুল করে নিন।' পরিশেষে কবিতার চরণে ইতি টানছি–

ওফাতের পরে আমি, জাহানের একক স্বামী,
তোমারি আদালতে, হাজির হব যবে।
হিসেবের খাতায় লিখে, রেখো গো যতন করে,
অধমের গ্রন্থখানি, হে দয়াময়! তবে।

মোহাম্মাদ আবুল কালাম মাসূম
সেভভিউ– ১
হাসনাবাদ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
০৭/০৭/২০১৪ ইং
৮ রমাজানুল মুবারক

যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এ আনওয়ারুল কুরআনটি আলোর মুখ দেখেছে

- **মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম**
  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ আনওয়ারুল হক**
  সিনিয়র সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- **মাওলানা আব্দুল আলীম**
  উস্তাদ, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইদারাতুল উলূম, আফতাব নগর, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ আকবর হোসাইন**
  ফাযেল দারুল উলূম হাটহাজারী চট্টগ্রাম।
- **মাওলানা রফিকুল ইসলাম সিরাজী**
  ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।
  সাবেক উস্তাদ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
  ৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মাহমূদ হাসান**
  উস্তাদ, মাদরাসা উলূমে শরী'আহ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ এনামুল হাসান**
  উস্তাদ, মাদরাসা নূরুল কুরআন, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন**
  মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া মোহাম্মাদিয়া মোহাম্মদনগর, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান**
  ফাযেলে দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান**
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- **মাওলানা হাফেজ ইমাম উদ্দীন**
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মোবারক হোসাইন**
  সাবেক শিক্ষক, আল ফারুক ইসলামিয়া একাডেমি চাটখিল, নোয়াখালী।

সূচিপত্র

পারা : ২৮, ৩০১–৪৫২

পারা : ২৬

سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ

সূরা আহকাফ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩৫, রুকূ'– ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. হা-মীম,	حٰمٓ ﴿١﴾
২. এ কিতাব মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত হয়েছে।	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾
৩. আমি সৃষ্টি করেছি আসমানসমূহ ও জমিনকে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে হেকমতের সাথে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য; আর যারা কাফের তাদেরকে যে বিষয়ের ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তারা তা হতে বিমুখ হয়ে থাকে।	مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾
৪. আপনি বলুন, বল তো, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা করছ, আমাকে এটা দেখাও যে, তারা কোন জমিন সৃষ্টি করেছে, নাকি আসমানসমূহে (সৃষ্টির ব্যাপারে) তাদের কোনো অংশ আছে?	قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۭ

শাব্দিক অনুবাদ :

১. حٰمٓ হা-মীম।

২. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ এ কিতাব অবতারিত হয়েছে مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।

৩. مَا خَلَقْنَا আমি সৃষ্টি করেছি السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিনকে وَمَا بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে اِلَّا بِالْحَقِّ হেকমতের সাথে وَاَجَلٍ مُّسَمًّى এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কাফের عَمَّا اُنْذِرُوْا তাদেরকে যে বিষয়ের ভীতি প্রদর্শন করা হয় مُعْرِضُوْنَ তারা তা হতে বিমুখ হয়ে থাকে।

৪. قُلْ আপনি বলুন اَرَءَيْتُمْ বল তো مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা করছ اَرُوْنِيْ আমাকে এটা দেখাও যে مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ তারা কোন জমিন সৃষ্টি করেছে اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ না কি আসমানসমূহে তাদের কোনো অংশ আছে?

اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾	** (এতে প্রমাণিত হলো যে, কোনো যৌক্তিক প্রমাণই নেই। আর যদি কোনো কিতাবী প্রমাণ থাকে, তবে) আমার সম্মুখে উপস্থিত কর এই কুরআনের পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থ অথবা অপর কোনো নির্ভরযোগ্য মৌখিক বর্ণিত বাণী (যা গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয়নি) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٥﴾	৫. আর (এটা স্পষ্ট যে, এরূপ প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি। অতএব,) সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক পথভ্রষ্ট, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন মা'বূদকে ডাকে- যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? অধিকন্তু তারা তাদের ডাকের খবরও রাখে না।
وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿٦﴾	৬. আর যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে, তখন তারা (ঐ উপাস্যগণ) তাদের (উপাসকদের) শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের উপাসনা করার বিষয়টি অস্বীকার করে বসবে।
وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾	৭. আর যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো তাদের সম্মুখে পঠিত হয়, তখন এ অবিশ্বাসীরা এ সত্য বাণী সম্বন্ধে যখন তা তাদের নিকট পৌঁছে এরূপ বলে যে, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

শাব্দিক অনুবাদ :

** اِيْتُوْنِيْ আমার সম্মুখে উপস্থিত কর بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ এই কুরআনের পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ অথবা অপর কোনো নির্ভরযোগ্য মৌখিক বর্ণিত বাণী اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৫. وَمَنْ اَضَلُّ আর কে অধিক পথভ্রষ্ট مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন মা'বূদকে ডাকে مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ অধিকন্তু তারা তাদের ডাকের খবরও রাখে না।

৬. وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ আর যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً তখন তারা তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ এবং তাদের উপাসনা করার বিষয়টি অস্বীকার করবে।

৭. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ আর যখন তাদের সম্মুখে পঠিত হয় اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তখন এ অবিশ্বাসীরা এরূপ বলে যে لِلْحَقِّ এই সত্য বাণী সম্বন্ধে لَمَّا جَآءَهُمْ যখন তা তাদের নিকট পৌঁছে هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾

৮. নাকি তারা এরূপ বলে যে, এ ব্যক্তি নিজেই এটা রচনা করে নিয়েছে; আপনি বলে দিন, যদি আমি এটা নিজেই রচনা করে থাকি, তবে তো তোমরা আমাকে আল্লাহ (-এর আজাব) হতে মোটেও রক্ষা করতে পারবে না; কুরআন সম্বন্ধে তোমরা যে যে উক্তি করছ, তিনি তা খুব অবগত আছেন; আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনিই যথেষ্ট সাক্ষী; আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. أَمْ يَقُولُونَ নাকি তারা এরূপ বলে যে افْتَرَاهُ এ ব্যক্তি নিজেই এটা রচনা করে নিয়েছে قُلْ আপনি বলে দিন إِنِ افْتَرَيْتُهُ যদি আমি এটা নিজেই রচনা করে থাকি فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا তবে তো তোমরা আমাকে আল্লাহ (-এর আজাব) হতে মোটেও রক্ষা করতে পারবে না هُوَ أَعْلَمُ তিনি তা খুব অবগত আছেন بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ কুরআন সম্বন্ধে তোমরা যে উক্তি করছ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনিই যথেষ্ট সাক্ষী وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আহকাফ -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। ইবনে মারদূবিয়্যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা আহকাফ মক্কা মোওয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মারদূবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সূরায় ৪ রু'কূ, ৩৫ আয়াত, ৬৪৪ টি বাক্য এবং ২,৬০০ অক্ষর রয়েছে।

নামকরণ : 'আহকাফ' ইয়েমেনের অন্তর্গত একটি স্থানের নাম, যেখানে আদ জাতির বসবাস ছিল। 'আহকাফ' শব্দটি 'হকফ' -এর বহুবচন, এর আভিধানিক অর্থ হলো বালুর স্তূপ। আলোচ্য সূরায় আদ জাতির নাফরমানির শাস্তি স্বরূপ তাদের ধ্বংসের বিবরণ স্থান পেয়েছে, যেন পৃথিবীর অন্যত্র অবস্থানকারী নাফরমানদের জন্যে তা শিক্ষণীয় হয়। এজন্য এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আহকাফ'।

সূরার মূল আলোচ্য বিষয় :

১. প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়ত প্রমাণিত করা, কেননা যতক্ষণ তাঁকে আল্লাহ পাকের নবী হিসেবে কেউ মেনে নেবে না, ততক্ষণ পবিত্র কুরআনের সত্যতায় বিশ্বাস করবে না। এজন্য সর্বপ্রথম এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে, তাই ইরশাদ হয়েছে– تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ অর্থাৎ সর্বশক্তিমান, বিজ্ঞানময় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে [হে রাসূল!] আপনার প্রতি মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের নিকট থেকে প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি কিতাব নাজিল হওয়াই তাঁর রিসালাতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

২. স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রমাণ। ইরশাদ হচ্ছে– مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ পাকই আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনিই স্রষ্টা। তিনিই পালনকর্তা। তিনি এক, অদ্বিতীয়; আর তিনিই উপাস্য। কেননা পৃথিবীর কোনো কিছুই আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, আল্লাহ পাকই তাঁর "কুন" আদেশ দ্বারা সবকিছুকে যথাযথভাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। অতএব, এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করাই হলো বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য। –[তানভীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস পৃ. ৪২৩]

এ সূরার আমল : সূরা আহকাফ লিপিবদ্ধ করে সঙ্গে রাখলে জিন ও মানুষের ক্ষতিসাধন থেকে হেফাজত করা হয়।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে, তার মৃত্যুর সময় মালাকুল মওত হযরত আজরাঈল (আ.) অতি উত্তম আকৃতি ধারণ করে তার নিকট আসবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তিতে কিয়ামতের দিনের সত্যতার ঘোষণা রয়েছে। আর এ সূরার সূচনাতেই পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং কিয়ামতের আলোচনা রয়েছে। কুরআনে কারীমে এ দুটি বিষয়ের আলোচনা প্রায়শ কাছাকাছিই থাকে, আর এটিই উভয় সূরার যোগসূত্র। –[বয়ানুল কুরআন পৃ. ৯৬৭]

قُلْ أَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ –এসব আয়াতে মুশরিকদের দাবি বাতিল করার জন্যে তাদের দাবির স্বপক্ষে দলিল চাওয়া হয়েছে। কেননা, সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত কোনো দাবি গ্রহণীয় হয় না। দলিলের যত প্রকার রয়েছে, সবগুলো আয়াতে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুশরিকদের দাবির পক্ষে কোনো প্রকার দলিল নেই। তাই এহেন দলিলবিহীন দাবিতে অটল থাকা নিরেট পথভ্রষ্টতা। আয়াতে দলিলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (এক) যুক্তিভিত্তিক দলিল। এর খণ্ডনে বলা হয়েছে أَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ দ্বিতীয় প্রকার ইতিহাস ভিত্তিক দলিল। বলা বাহুল্য, আল্লাহর ব্যাপারে কেবল সেই ইতিহাসভিত্তিক দলিলই গ্রহণীয় হতে পারে, যা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জীল, কুরআন ইত্যাদি ঐশী কিতাব অথবা আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূলগণের উক্তি। এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের খণ্ডনে বলা হয়েছে اِئْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا অর্থাৎ, তোমাদের মূর্তি পূজার কোনো দলিল থাকলে কোনো ঐশী কিতাব পেশ কর, যাতে মূর্তি পূজার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, রাসূলগণের উক্তি খণ্ডন করতে বলা হয়েছে, أَوْ أَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ অর্থাৎ, কিতাব আনতে না পারলে কমপক্ষে রাসূলগণের পরম্পরাগত কোনো উক্তি পেশ কর। তাও পেশ করতে না পারলে তোমাদের কথা ও কাজ পথভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

اَثَارَةٌ শব্দটি شَجَاعَةٌ - سَمَاحَةٌ-এর ওজনে একটি ধাতু। অর্থ নকল, রেওয়ায়েত। এ কারণে ইকরিমা ও মুকাতিল-এর তাফসীরে 'পয়গম্বরগণ থেকে রেওয়ায়েত' বলেছেন। (কুরতুবী) সারকথা এই যে, দু'রকম ইতিহাসভিত্তিক দলিল গ্রহণযোগ্য– কোনো পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং লোক পরম্পরায় প্রমাণিত পয়গম্বরের উক্তি। আয়াতে أَوْ أَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ অন্যান্য আরো কিছু তাফসীর করেছেন, যা কুরআনের ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

خَلَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْقُ মূলবর্ণ (خ - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ– আমি সৃষ্টি করেছি।

كَفَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ– কাফের। সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে।

اُنْذِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে।

اِئْتُوْنِيْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– আমার নিকট নিয়ে এসো।

تُتْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পঠিত হয়।

يَقُوْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বাব مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বলে।

تَدْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা উপাসন করছ। আহ্বান করছ।

صٰدِقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلصِّدْقُ মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ– সত্যবাদি।

اَضَلُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّلَالَةُ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– অধিক পথভ্রষ্ট।

اَعْدَاءً : শব্দটি বহুবচন; একবচন عَدُوٌّ অর্থ– শত্রু।

بَيِّنٰتٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন بَيِّنَةٌ অর্থ– স্পষ্ট। দলিল। প্রমান,

اِفْتَرَيْتُهٗ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি এটা নিজেই রচনা করে থাকি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ : এখানে واو টি استئنافية আর مَنْ হলো মুবতাদা, আর اَضَلُّ বাক্যটি হলো খবর। আর مِمَّنْ টা اَضَلُّ -এর সাথে متعلق হয়েছে আর يَدْعُوْا বাক্যটি সেলাহ। আর مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ হলো حال আর مَنْ হলো يَدْعُوْ ফে'লের মাফউল। আর لَا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ বাক্যটি - مَنْ এর সেলাহ হয়েছে। আর اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ বাক্যটি حال হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ.১৬১]

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٩﴾

৯. আপনি বলে দিন, আমি তো কোনো অভিনব নবী নই, আর না আমি (এটা) অবগত আছি যে, আমার সাথে কী আচরণ করা হবে, আর না (এটা অবগত আছি যে,) তোমাদের সাথে (কী আচরণ করা হবে); আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি– যা ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট পৌঁছে এবং আমি তো শুধু স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠﴾

১০. আপনি বলুন, তোমরা বল তো, যদি এ কুরআন আল্লাহর নিকট হতেই [অবতীর্ণ] হয়ে থাকে, আর তোমরা তাকে অবিশ্বাস কর এবং বনী ইসরাঈল হতে কোনো সাক্ষী তদনুরূপ কিতাব হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং ঈমান আনে, আর তোমরা অহংকারই করতে থাক; নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদেরকে হেদায়েত করেন না।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ؕ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ﴿١١﴾

১১. আর এ কাফেররা মু'মিনদের সম্বন্ধে এরূপ বলে যে, যদি এ কুরআন উত্তম হতো তবে এ সমস্ত (নিম্ন শ্রেণির) লোক তার প্রতি (ঈমান আনয়নে) আমাদের অগ্রবর্তী হতে পারত না; আর যখন তারা কুরআন দ্বারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়নি, তখন এটাই বলবে যে, এটাও একটা পুরাকালীন মিথ্যা।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. قُلْ আপনি বলে দিন مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ আমি তো কোনো অভিনব নবী নই وَمَآ اَدْرِيْ আর না আমি অবগত আছি যে مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ আমার সাথে কি আচরণ করা হবে আর না তোমাদের সাথে اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট পৌঁছে وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ এবং আমি তো শুধু স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

১০. قُلْ আপনি বলুন اَرَءَيْتُمْ তোমরা বল তো اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ যদি এ কুরআন আল্লাহর নিকট হতে হয়ে থাকে وَكَفَرْتُمْ بِهٖ আর তোমরা তাকে অবিশ্বাস কর وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ এবং বনী ইসরাঈল হতে কোনো সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় عَلٰى مِثْلِهٖ তদনুরূপ কিতাব হওয়ার পক্ষে فَاٰمَنَ এবং ঈমান আনে وَاسْتَكْبَرْتُمْ আর তোমরা অহংকারই করতে থাক اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদেরকে হেদায়েত করেন না।

১১. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর এ কাফেরারা মুমিনদের সম্বন্ধে এরূপ বলে যে। لَوْ كَانَ خَيْرًا যদি এ কুরআন উত্তম হতো مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ তবে এ সমস্ত লোক তার প্রতি আমাদের অগ্রবর্তী হতে পারত না وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ আর যখন তারা কুরআন দ্বারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়নি فَسَيَقُوْلُوْنَ তখন এটাই বলবে هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ এটাও একটা পুরাকালীন মিথ্যা।

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖۗ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲﴾

১২. আর এর (কুরআনের) পূর্বে মূসার কিতাব, যা পথপ্রদর্শক ও রহমত ছিল; আর এটা (এমন) একটি গ্রন্থ, যা তার (তাওরাতের) সত্যতা প্রমাণ করে (এবং) আরবি ভাষায় (অবতারিত,) যেন তা অনাচারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, আর নেককার লোকদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. যারা বলেছে, আমাদের রব আল্লাহ, অতঃপর (তাতে) অটল রয়েছে, সুতরাং (পরলোকে) তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না।

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. এরাই বেহেশতের অধিবাসী– তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে, সেই কার্যসমূহের বিনিময়ে যা তারা করত।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ

১৫. আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি; তার মাতা তাকে বড় কষ্টসহ গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। আর তাকে গর্ভে ধারণ করা ও দুধ ছাড়ানো ত্রিশ মাস; এমনকি যখন সে স্বীয় যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বৎসরে পৌঁছে,

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰى আর এর পূর্বে মূসার কিতাব اِمَامًا وَّرَحْمَةً যা পথপ্রদর্শক ও রহমত ছিল وَهٰذَا كِتٰبٌ আর এটা একটা গ্রন্থ مُصَدِّقٌ যা তার সত্যতা প্রমাণ করে لِسَانًا عَرَبِيًّا আরবি ভাষায় لِيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا যেন তা অনাচারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ আর নেককার লোকদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে।

১৩. اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا যারা বলেছে رَبُّنَا اللّٰهُ আমাদের রব আল্লাহ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا অতঃপর (তাতে) অটল রয়েছে فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ সুতরাং তাদের কোনো ভয় নেই وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না।

১৪. اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ এরাই জান্নাতের অধিবাসী خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ সেই কার্যসমূহের বিনিময়ে যা তারা করত।

১৫. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا তার মাতা তাকে বড় কষ্টসহ গর্ভে ধারণ করেছে وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا এবং অতি কষ্টে প্রসব করেছে وَحَمْلُهٗ আর তাকে গর্ভ ধারণ করা وَفِصٰلُهٗ ও দুধ ছাড়ানো ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ত্রিশ মাস حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ এমনকি যখন সে স্বীয় যৌবনে উপনীত হয় وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً এবং চল্লিশ বৎসরে পৌঁছে

** তখন সে বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এর উপর স্থায়িত্ব দান করুন, যেন আমি আপনার সেই নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় করি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন, আর যেন আমি নেক কাজ করি, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন এবং আমার (কল্যাণের) জন্য আমার সন্তান-সন্ততির মধ্যেও যোগ্যতা দান করুন; আমি আপনার দরবারে তওবা করছি এবং নিশ্চয় আমি (আপনার) অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।	قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** قَالَ তখন সে বলতে থাকে رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এর উপর স্থায়িত্ব দান করুন اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ যেন আমি আপনার সেই নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় করি যা আপনি আমাকে দান করেছেন وَعَلٰى وَالِدَيَّ ও আমার পিতামাতাকে وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا আর যেন আমি নেক কাজ করি تَرْضٰىهُ যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ এবং আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততির মধ্যেও যোগ্যতা দান করুন اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ আমি আপনার দরবারে তওবা করছি وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ এবং নিশ্চয় আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالَ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ.

শানে নুযূল–১ : আলোচ্য আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন মুশরিক, ইহুদি ও মুনাফিকেরা আনন্দিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমরা এমন একজন নবীকে কিরূপভাবে অনুসরণ করতে পারি, যিনি তার সাথে এবং আমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না, আমাদের উপর তার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তাদের এমন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতহের ২নং আয়াত لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ নাজিল করেন। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের হুকুম রহিত করে কাফের সম্প্রদায়কে অপমানিত ও তিরস্কার করেন। সে মুহূর্তে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম যারা ছিলেন, তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনার সম্পর্কে কি আচারণ করা হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। অনন্তর আমাদের সাথে আল্লাহ কি আচরণ করবেন সে সম্পর্কে আমাদের অনুমান হলে আমাদের জন্যে কতইনা মঙ্গল হতো? তখন সূরায়ে ফাতহের ৫নং আয়াত لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ নাজিল হয়। এরই সাথে সূরায়ে আহযাবের ৪৭ নং আয়াত وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا নাজিল হয়। –[কুরতুবী ১৬০/১৬]

শানে নুযূল–২ : আবূ সালেহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণের উপর যখন বিপদাপদ প্রচণ্ডাকার ধারণ করল, তখন রাসূল ﷺ স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি এমন এক অঞ্চলে হিজরত করে যাচ্ছেন, যেখানে খেজুর বৃক্ষরাজী ও পানির সমাহার রয়েছে। তখন রাসূল ﷺ সে ঘটনা বর্ণনা করেন। ফলে তারাও এর দ্বারা সুসংবাদ গ্রহণ করল। পক্ষান্তরে তারা তাতে মুশরিকদের নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পন্থা পেল। অতঃপর তারা কিছু কাল সেখানে অবস্থান করে সে সুসংবাদের বাস্তবতা কিছুই দেখতে পেলনা। সুতরাং তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে, ভূমি স্বপ্নে দেখেছিলেন সে দিকে কখন আমরা হিজরত করব? এতে রাসূল ﷺ নীরবতা অবলম্বন করেন, সে সময় আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের مَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ অংশটুকু নাজিল করেন। –[কুরতুবী]

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ [١٠]

শানে নুযূল : ১. আবূ ইয়ালা, তাবারানী ও হাতেম বিশুদ্ধতম সনদ দ্বারা হযরত আউফ বিন মালেক আশজায়ী (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ হাঁটতে হাঁটতে ইহুদিদের উৎসবের দিনে তাদের উপাসনালয়ে গিয়ে প্রবেশ করেন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। আমরা তাদের নিকট যে গমন করলাম তা তাদের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মনে হলো। রাসূল ﷺ তখন তাদেরকে বললেন যে, তোমাদের মধ্য হতে এমন বার জন মানুষ দেখাও তো যারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর অন্য কোনো মা'বুদ নেই, এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার রাসূল। তাহলে আল্লাহ তা'আলা সকল ইহুদিদের উপর থেকে তার ক্রোধ উঠিয়ে নিবেন। তখন তাদের সকলেই নীরব হয়ে পড়ল। কেউ কোনো প্রকারের জবাব দেয়নি। তিনি তাদেরকে এরূপভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। তাদের কেউই তাঁর জবাব দেয়নি। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা অস্বীকার করলে! আল্লাহ তা'আলার কসম আমি হচ্ছি اَلْعَاقِبُ اَلْحَاشِرُ ও اَلْمُقَفّٰى তোমরা বিশ্বাস কর আর বিশ্বাস না কর। অতঃপর রাসূল ﷺ ও আমি বের হয়ে পড়লাম। আমরা যখন বের হয়ে পড়ছিলাম তখন তাঁর পিছু হতে একজন মানুষ সামনে এগিয়ে এসে বলল, হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে কে আমার সম্পর্কে জান? তারা বলল, আল্লাহর শপথ আমাদের মধ্যে আপনি এবং আপনার পিতা ও দাদা অপেক্ষা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান অন্য কেউ আছে বলে আমাদের জানা নেই। তখন সে লোকটি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক এবং তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জিল গ্রন্থে যা পেয়েছ, সে অনুপাতে তিনি হচ্ছেন নবী। এ প্রসঙ্গে তারা বলল যে, তুমি মিথ্যুক মিথ্যা বলছ। তারা আরো মন্দ মন্তব্য করল। তখন রাসূল ﷺ আমি ও ইবনে সালাম আমরা দাঁড়ালাম। রাসূল ﷺ-এর দেওয়া দাওয়াতকে একজন গ্রহণ করল ও বাকি যারা ছিল তারা প্রত্যাখ্যান করল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল–২ : আব্দ বিন হুমাইদ হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত রাসূল ﷺ-এর খেদমতে মদীনার ইহুদি দলপতি মাইমূন বিন ইয়ামীন এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আপনি ইহুদি এবং আপনার মধ্যে সমঝোতা করার জন্যে এক জন লোক নির্ধারণ করুন। তারা তাদের পক্ষ হতে অবশ্যই আমাকে সমর্থন দেবে। সুতরাং রাসূল ﷺ কাউকে প্রেরণ করলেন। অতঃপর তারা এসে বিরক্তি ভরে রাসূল ﷺ-এর সাথে আলোচনা করে। রাসূল ﷺ তাদেরকে বললেন যে, সমঝোতা করার জন্যে একজন লোক নিযুক্ত কর। তারা বলল যে, মাইমুন বিন ইয়ামিনকে আমরা সমর্থন করি। রাসূল ﷺ তখন তাকে তাদের সামনে বের করে দিলেন। মাইমুন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল এবং তিনি হলেন সত্যবাদী। তারা সমর্থন করতে অস্বীকার করল। তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৩/২৬/১৩, ফতহুল কাদীর ১০/৫]

শানে নুযূল–৩ : হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান, ইকরিমা, কাতাদা ও মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতের وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ (الاية) অংশটুকু নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.) তিনি তাওরাতের বড় আলেম ছিলেন। তিনি ইহুদিদের সামনে একথার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তাওরাতে আল্লাহর যে রাসূলের কথা উল্লিখিত রয়েছে, তিনিই হচ্ছেন আল্লাহর মনোনীত সেই রাসূল। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য অংশটুকু নাজিল করা হয়েছে। তিরমিযির বর্ণনা মতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.) কতৃক বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন যে, আমার সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ১৬২/১৬, ফতহুল কাদীর ১৯/৫]

ইবনে জারীর ইবনে আবী হাতেম আমের বিন সাঈদ এর উদ্ধিৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, আমি আব্দুল্লাহ বিন সালাম ছাড়া আর কারো বেলায় আল্লাহ তা'আলা এ সুসংবাদ প্রদান করেননি যে, ভূপৃষ্টে অমুক লোকটি বেহেশতী এবং তার সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতের وَشَهِدَ شَاهِدٌ (الاية) অংশটুকু অবতীর্ণ হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ১৫৬/৪]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ إِفْكٌ قَدِيْمٌ [١١]

শানে নুযূল : ইবনে মুনযির হযরত আউন বিন আবি শাদাদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর যিন্নীরা নামী এক বাদী ছিল। সে বাদী হযরত ওমর (রা.)-এর পূর্বেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার

কারণে তিনি তাকে প্রহার করতেন। সে সময় কাফের কুরাইশরা বলত যে, ইসলাম যদি কল্যাণকরই হতো, তাহলে যিন্নিরা আমাদের আগে তা গ্রহণ করত না। আল্লাহ তা'আলা সে বাদীর শানে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রূহুল মা'আনী ১৪/২৬/১৩, বাহরে মুহীত ৫৭/৮, দুররে মানছুর ৪০/৬, ফতহুল কাদীর ১৯/৫]

আল্লামা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ কুরতুবী (র.) আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। শিক্ষার্থী ও পাঠক সমাজের উপকারার্থে সেই রেওয়াত গুলোও উল্লেখ করে দেওয়া হলো।

১. হযরত নবী করীম ﷺ মক্কায় অবস্থান কালে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) কে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। আবূ যর দাওয়াত গ্রহণ করেন। নিজ কওমের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তখন তাদের পক্ষ থেকে একজন উকিল তার নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সংবাদ কুরাইশের নিকট পৌছলে তারা মন্তব্য করল যে, ইসলাম বরকতময় হলে তারা আমাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করত না। তাদের এহেন মন্তব্য এবং তাদের ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

২. হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের বলেন যে, যিন্নীরা নামী এক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করার পর তার দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন মক্কার কাফেররা বলতে লাগল যে, লাত ঔজ্জা তাকে বিমার দ্বারা আক্রান্ত করেছে। অতঃপর আল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিলেন। অপর দিকে কুরাইশ নেতৃবর্গরা বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন তা যদি কল্যাণ কর হতো, তাহলে যিন্নীরা বাদি আমাদের আগে ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হতো না। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

৩. আল্লামা কুশাইরী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মক্কার প্রসিদ্ধ গোত্র গুলো যথা বনূ আমের, গাতফান, তামীম, আসাদ, হান্যালা ও আশজা এর কাফেররা গিফার, আসলাম, জুহাইনা, মুযাইনা, ও খুযাআ গোত্র সমূহ হতে যারাই ইসলাম গ্রহণ করত, তাদেরকে বলত, মুহাম্মদ ﷺ-এর আনীত ধর্ম যদি মঙ্গলজনক হতো, তাহলে আমাদের ন্যায় সম্মানিত ব্যক্তিদের আগে রাখালেরা তা গ্রহণ করত না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

৪. হযরত কাতাদা (রা.) বলেন যে, কুরাইশের মুশরিকরা বলত যে, মুহাম্মদ ﷺ যে ধর্মের প্রতি আমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন, তা যদি মুক্তিকামী হতো, তাহলে বেলাল, সুহাইব, আম্মার এবং অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তি আমাদের আগে তা গ্রহণ করত না। সে প্ররিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

৫. ইহুদি কাফেররা ঈমানদার তথা হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও তার সঙ্গি সাথিদেরকে বলত যে, মুহাম্মদের আনীত ধর্ম যদি সত্য হতো, তাহলে তারা আমাদের আগে তা গ্রহণ করতে পারত না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

৬. মাসরূক বলেন যে, কাফেররা বলতে ছিল যে, এ ধর্মমত যদি মুক্তিকামী হতো,তাহলে ইহুদিরা আমাদের পূর্বে তা গ্রহণ করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১২৫-২৬/১৬]

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا حَتّٰى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْٓ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

শানে নুযূল : ইবনে মাজাহ ছাড়া মুসলিম শরীফ সহ অন্যান্য সিহাহের ইমামগণ হযরত সা'দ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সা'দ (রা.)-এর মাতা সা'দ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর বলেছিল, আল্লাহ কি মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করার আদেশ করেন নি! তুমি আল্লাহর সাথে কুফরি না করা পর্যন্ত আমি খাদ্য ও পানীয় কিছুই গ্রহণ করব না। সুতরাং সে মহিলা খাদ্য ও পানীয় থেকে সম্পূর্ণ বিরত হয়ে যায়। ফলে মানুষেরা লাঠি দ্বারা তার মুখ খুলে আহার করাত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের এ অংশটুকু নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ১৫/৭/৪]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক এ রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য অংশটুকু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[দুররে মানছুর ৪০/৬]

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَأَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىٓ إِنِّىْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

শানে নুযূল : হযরত আলী (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশ হযরত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা.) মাতা-পিতা সহ ইসলাম গ্রহণ করেননি। সে জন্যে আল্লাহ তা'আলা তার মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ করার নির্দেশ করেন এবং তাঁর মাতা হলেন উম্মে খায়ের, নাম হলো সালমা বিনতে সাখার বিন আমের বিন কা'আব বিন সা'াদ। –[কুরতুবী ১৬৮/১৬, রূহুল মা'আনী ১৭/২৬/১৩]

وَمَآ أَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰىٓ إِلَىَّ -এ আয়াতে إِنْ أَتَّبِعُ বাক্যটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। অর্থ এই যে, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, তা ব্যতীত আমি জানি না। এর ভিত্তিতে তাফসীরবিদ যাহ্হাক এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, আমি একমাত্র ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান লাভ করতে পারি। ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয় জানানো হয় না, তা আমার ব্যক্তিগত বিষয় হোক অথবা উম্মতের মু'মিন ও কাফেরের বিষয় হোক অথবা ইহকালের বিষয় হোক কিংবা পরকালের বিষয় হোক তা আমি জানি না। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলি, তা সবই ওহীর আলোকে বলে থাকি। কুরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। এক আয়াতে আছে تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ إِلَيْكَ জাহান্নাম, জান্নাত, হিসাব, নিকাশ, শাস্তি, প্রতিদান ইত্যাদি পারলৌকিক বিষয়ের বিবরণ তো স্বয়ং কুরআন পাকে অনেক রয়েছে। ইহকালের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির অনেক বিবরণও পরম্পরাগত সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত আয়াতের সারমর্ম এতটুকু যে, আমি অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানে আল্লাহ তা'আলার মতো নই এবং জ্ঞানে স্বেচ্ছাধীনও নই; বরং ওহীর মাধ্যমে আমাকে যতটুকু বলে দেওয়া হয়, আমি ততটকুই বর্ণনা করি।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, আমার বিশ্বাস, রাসূলুল্লাহ ﷺ ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেননি, যতদিন আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি এবং পরকালের ও ইহকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি। তবে যায়েদ আগামীকাল কি করবে, তার পরিণাম কি হবে ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষের খুঁটিনাটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকা কোনো উৎকর্ষের বিষয় নয় এবং এগুলো না জানলেও নবুয়তের উৎকর্ষ হ্রাস পায় না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত আদব : এ ব্যাপারে আদব এই যে, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না, এরূপ বলা সঙ্গত নয়। বরং এভাবে বলা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদির অনেক জ্ঞান দান করেছিলেন যা অন্য কোনো পয়গম্বরকে দেননি। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে পার্থিব অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে 'আমি জানি না' বলা হয়েছে– পারলৌকিক অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে নয়। কেননা পারলৌকিক বিষয়ে তিনি খোলাখুলি বলে দিয়েছেন যে, মু'মিন জান্নাতে যাবে এবং কাফের জাহান্নামে যাবে।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىٓ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً أَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِىٓ إِسْرَآئِيْلَ -এ আয়াতের এবং সূরা শু'আরার আয়াতের অর্থ একই রকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালাত ও কুরআন অমান্য করে, তারা স্বয়ং তাদের কিতাব সম্পর্কেও অজ্ঞ। কেননা বনী ইসরাঈলের অনেক আলেম তাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলেমগণের সাক্ষ্যও কি এই মূর্খদের জন্যে যথেষ্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার নবুয়ত দাবিকে ভ্রান্ত এবং কুরআনকে আমার রচনা বল। এর এক জবাবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে নবী বলে মিথ্যা দাবি করলে তার দুনিয়াতেই নিপাত হয়ে যাওয়া জরুরি, যাতে জনসাধারণ প্রতারিত না হয়। এ জবাবই যথেষ্ট, কিন্তু তোমরা যদি না মান তবে এ সম্ভাবনার প্রতিও লক্ষ্য কর যে, আমার দাবি যদি সত্য হয় এবং কুরআন আল্লাহর কিতাব হয় আর তোমরা একে অমান্য করেই যাও, তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে, বিশেষতঃ যখন তোমাদের বনী-ইসরাঈলেরই কোনো মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আল্লাহর কিতাব, অতঃপর সে নিজেও মুসলমান হয়ে যায়? এ জ্ঞান লাভের পরও যদি তোমরা জেদ ও অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুতর শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

আয়াতে বনী ইসরাঈলের কোনো বিশেষ আলেমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরণের পূর্বেই জনসমক্ষে এসে গেছে, না ভবিষ্যতে আসবে। তাই বনী ইসরাঈলের কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার উপর আয়াতের অর্থ নির্ভরশীল নয়। খ্যাতনামা ইহুদি আলেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) সহ যত ইহুদি ও

খ্রিস্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা সবাই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যদিও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ আয়াতটি মক্কায় নাজিল হয়েছিল।

হযরত সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্হাক প্রমুখ তাফসীরবিদগণ তাই বলেছেন। এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিপন্থি নয়। এমতাবস্থায় আয়াতটি ভবিষ্যতবাণী হিসেবে গণ্য হবে। -[ইবনে কাছীর]

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ অহংকার ও গর্ব মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকেও বিকৃত করে দেয়। অহংকারী ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালোমন্দের মাপকাঠি বলে মনে করতে থাকে। সে যা পছন্দ করে না, অন্যেরা তা পছন্দ করলে সে সবাইকে বোকা মনে করে, অথচ বাস্তবে নিজেই বোকা। কাফেরদের এ ধরনের অহংকার ও গর্বই আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে। ইসলাম ও ঈমান তাদের পছন্দীয় ছিল না। তাই অন্যান্য ঈমান-প্রেমিকদের সম্পর্কে তারা বলত, ঈমান যদি ভালোই হতো, তবে সর্বাগ্রে তা আমাদের পছন্দনীয় হতো। এই হতচ্ছাড়াদের পছন্দের কি মূল্য।

ইবনে মুনযির প্রমুখ এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) যখন মুসলমান ছিলেন না, তখন তাঁর রানীন নামী এক বাঁদি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই অপরাধে তিনি বাঁদিকে প্রচুর মারধর করতেন, যাতে সে ইসলাম ত্যাগ করে। তখন কুরাইশ কাফেররা বলত, ইসলাম ভালো হলে রানীনের মতো নীচ বাঁদি আমাদেরকে পিছনে ফেলে যেতে পারত না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[মাযহারী]

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰى اِمَامًا وَّرَحْمَةً –এ আয়াত থেকে প্রথমতঃ প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো অভিনব রাসূল এবং কুরআন কোনো অভিনব কিতাব নয় যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনে আপত্তি হবে। বরং এর আগে হযরত মূসা (আ.) রাসূলরূপে আগমন করেছেন এবং তাঁর প্রতি তাওরাত নাজিল হয়েছিল। ইহুদি ও খ্রিস্টান কাফেররাও তা স্বীকার করে। দ্বিতীয়তঃ এতে وَشَهِدَ شَاهِدٌ বাক্যেরও সমর্থন আছে। কেননা হযরত মূসা (আ.) ও তাওরাত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনের সত্যতার সাক্ষ্যদাতা।

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে জালেমদের জন্যে শাস্তিবাণী এবং মুমিনদের জন্যে সাফল্যের সুসংবাদ ছিল। আলোচ্য ১৩ ও ১৪ নং আয়াত তারই পরিশিষ্ট। প্রথম অর্থাৎ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا আয়াতে অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভঙ্গিতে সমগ্র ইসলাম, ঈমান ও সৎকর্মসমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। رَبُّنَا اللّٰه বাক্যে সমগ্র ঈমান এবং اِسْتِقَامَةٌ শব্দের মধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অবিচল থাকা ও তদনুযায়ী পূর্ণমাত্রায় আমল করা দাখিল রয়েছে। اِسْتِقَامَةٌ -এর গুরুত্বের ব্যাখ্যা সূরা হা-মীম সেজদায় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও ঈমানে অবিচল থাকার কারণে ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের ভবিষ্যতে কোনো দুঃখ কষ্টের ভয় নেই এবং অতীত কষ্টের কারণেও তারা পরিতাপ করবে না। পরের আয়াতে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের এই সুখ চিরন্তন ও স্থায়ী হবে। পরবর্তী ১৫-১৮ নং আয়াতে মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মানুষের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ সন্তানের জন্যে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার এবং পরিণত বয়সে পৌঁছার পর মানুষকে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাছীরের ভাষায় পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র এই যে, কুরআন পাক সাধারণভাবে যেখানে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়, সেখানে সাথে সাথে পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করে। বিভিন্ন সূরার অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী এখানেও আল্লাহর তাওহীদের প্রতি দাওয়াতের সাথে সাথে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরতুবীতে বর্ণিত যোগসূত্র এই যে, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক প্রকার সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখুন। কেউ কবুল করবে এবং কেউ করবে না। এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা মানুষ তাদের পিতা-মাতার ক্ষেত্রেও সবাই সমান নয়। কেউ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং কেউ সদ্ব্যবহার করে না।

মোটকথা, এ আয়াত চতুষ্টয়ের আসল বিষয়বস্তু হলো পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। অবশ্য এতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শিক্ষাও এসে গেছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এসব আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এর ভিত্তিতেই তাফসীরে মাযহারীতে وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ বাক্যে اِنْسَانٌ -এর অর্থ নেওয়া হয়েছে, হযরত আবূ বকর (রা.)। বলাবাহুল্য কুরআনের কোনো আয়াত অবতরণের কারণ কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা ঘটনা হলেও আয়াতের নির্দেশ সবার জন্যেই ব্যাপক হয়ে থাকে। এখানেও যদি আয়াতটির অবতরণের কারণ

হযরত আবূ বকর (রা.) হয়ে থাকেন এবং আয়াতে উল্লিখিত বিশেষ গুণাবলি তাঁরই গুণাবলি হয়ে থাকে, তবুও আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে সবাইকে শিক্ষা দান করা। আসল আয়াতকে ব্যাপক রাখা হলে হযরত আবূ বকর (রা.) আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার প্রথম প্রতীক হবেন এবং যৌবনে পদার্পণ ও চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত বিশেষ গুণাবলি হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا - وَصَّيْنَا শব্দের অর্থ তাকীদপূর্ণ নির্দেশ এবং إِحْسَانٌ -এর অর্থ সদ্ব্যবহার। এতে সেবা-যত্ন, আনুগত্য, সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত।

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا - كُرْهٌ শব্দের অর্থ সে কষ্ট, যা মানুষ কোনো কারণবশতঃ সহ্য করে থাকে এবং كَرْهٌ -এর অর্থ সে কষ্ট, যা সহ্য করতে অন্য কেউ বাধ্য করে। এ থেকেই إِكْرَاهٌ শব্দের উৎপত্তি। এ বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই তাকীদ। অর্থাৎ, পিতা-মাতার সেবা-যত্ন ও আনুগত্য জরুরি হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্যে অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষতঃ মাতার কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাই এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এ ছাড়াও এসময়ে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও।

মাতার হক পিতা অপেক্ষা বেশি : আয়াতের শুরুতে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরি। গর্ভধারণের সময়ে কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার জন্যে লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্ববস্থায় জরুরি হয় না। পিতা ধনাঢ্য হলে এবং তার চাকর-বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তানের দেখাশুনা করতে পারে, কিংবা বিদেশে অবস্থান করে ভরণ-পোষণের অর্থ প্রেরণ করতে পারে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্তানের উপর মাতার হক বেশি রেখেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন– صِلْ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ অর্থাৎ, মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর পিতার সাথে, অতঃপর নিকট আত্মীয়ের সাথে।

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا –এ বাক্যেও মাতার কষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কষ্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। এর পরে সন্তানের খাদ্যও আল্লাহ তা'আলা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন। মাতা তাকে স্তন্যদান করেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। হযরত আলী (রা.) এই আয়াতদৃষ্টে বলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। কেননা وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ আয়াতে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দুই বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এখানে গর্ভধারণ ও স্তন্যদান উভয়ের সমকাল বর্ণিত হয়েছে ত্রিশ মাস। এতএব, স্তন্যদানের দু'বছর অর্থাৎ, চব্বিশ মাস বাদ দিলে গর্ভধারণের জন্যে ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এটাই হবে গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর খেলাফতকালে জনৈক মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে গেলে তিনি একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারি করেন। কেননা সাধারণ নিয়ম ছিল নয় এবং সর্বনিম্ন সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া। হযরত আলী (রা.) এই সংবাদ অবগত হয়ে খলীফাকে শাস্তি কার্যকর করতে বারণ করলেন এবং আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। খলীফা তার যুক্তিপ্রমাণ কবুল করে শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করে নেন। –[কুরতুবী]

এ কারণেই সমস্ত আলেমগণ একমত যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস হওয়া সম্ভবপর। এখন সর্বোচ্চ সময়কাল কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আর কুরআন এ সম্পর্কে কোনো ফয়সালা দেয়নি।

আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস নির্ধারিত। এর কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্নরূপ। এমনিভাবে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর নির্ধারিত। বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে আরো ছয়মাস সময় বাড়ানো যেতে পরে। কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোনো কোনো নারীর দুধই হয় না এবং কারো কারো দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না অথবা মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। ফলে অন্য দুধ পান করাতে হয়।

গর্ভ ধারণের ও স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের ব্যাপারে ফিকহবিদদের মতভেদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গর্ভ ধারণের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর। ইমাম মালেক থেকে চার বছর, পাঁচ বছর, সাত বছর ইত্যাদি বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। ইমাম শাফেয়ীর ও ইমাম আহমদের মতে চার বছর। (মাযহারী) স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের সাথে

স্তন্যদান হারাম হওয়ার বিধানও সম্পৃক্ত। অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে এই সময়কাল দু'বছর। একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আড়াই বছর পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যদান করা যায়। এর অর্থ এই যে, শিশু দুর্বল হলে, স্তনের দুধ ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণ না করলে অতিরিক্ত ছ'মাস স্তন্যদানের অনুমতি রয়েছে। কারণ, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, স্তনদানের দু'বছরের সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গেলে মায়ের দুধ শিশুকে পান করানো হারাম।

حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً - اَشُدَّ -এর শাব্দিক অর্থ শক্তি সামর্থ্য। সূরা আনআমে এর তাফসীর করা হয়েছে' প্রাপ্তবয়স' বলে। এ আয়াতেও কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন। অতঃপর وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً -কে বয়সের অপর একটি স্তর সাব্যস্ত করেছেন। হাসান বসরী (র.)-এর মতে بَلَغَ اَشُدَّهٗ ও وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً উভয়টি সমার্থবোধক। আয়াতে প্রথমে সন্তানের গর্ভধারণ, অতঃপর স্তন্যপানের সময়কাল বর্ণনা করার পর حَتّٰى اِذَا بَلَغَ বলার অর্থ এই যে, এরপর সে প্রাপ্তবয়স্ক ও শক্তিশালী হলো এবং জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করল। এ সময় সে স্রষ্টা ও পালনকর্তার অভিমুখী হওয়ার তাওফীক লাভ করল। ফলে এই বলে দোয়া করতে লাগল رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে শক্তি দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শোকর আদায় করি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করি, আমার পিতা-মাতাকেও সৎকর্ম পরায়ণ করুন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আমি আপনার একজন আজ্ঞাবহ। এখানে সবগুলো ক্রিয়ার অতীত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এটা কোনো বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা, যা আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকবে। একারণেই তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এগুলো সব হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অবস্থা। এগুলোই ব্যাপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অন্য মুসলমানগণও এতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এরূপ করে। কুরতুবীতে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতের দলিল। এ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রা.)-এর অর্থকড়ি নিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফরে যান, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) সে সফরে তাঁর সঙ্গি ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর। এ বয়সকেই بَلَغَ اَشُدَّهٗ বলা হয়েছে। এ সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসাধারণ অবস্থা অবলোকন করে তার একান্ত ভক্ত হয়ে যান। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্যে অতিবাহিত করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করলেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়ে গেল তখন তিনি উল্লেখিত দোয়া করলেন। আয়াতে وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً বলে তাই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ দোয়াও কবুল করেন এবং নয় জন মুসলমান ও কাফেরদের হাতে নির্যাতিত গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করার তাওফীক দান করেন। এমনিভাবে তাঁর দোয়া وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ কবুল হয়। বস্তুত : তাঁর সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে ইসলাম গ্রহণ করেনি। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.) কেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেন যে, তিনি নিজেও মুসলমান হন এবং পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তাঁরা সবাই রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র সংসর্গও লাভ করেন। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতেও একথা বর্ণিত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হয় যে, তাঁর পিতা আবূ কোহাফা মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছিলেন, আর এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই তখন পিতা-মতার প্রতি নিয়ামত দেওয়ার কথা কেমন করে উল্লেখ করা হলো? জবাব এই যে, কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। এরূপ হলে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় না। আর যদি মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তবে অর্থ হবে ইসলামের নিয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত হওয়ার দোয়া। (রুহুল মা'আনী) এই তাফসীর দৃষ্টে যদিও সবগুলো অবস্থা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর জন্য বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু আয়াতের বিধান সবার জন্যেই প্রযোজ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য সমস্ত মুসলমানকে নির্দেশ দেওয়া যে, মানুষের বয়স চল্লিশ বছরের নিকটবর্তী হয়ে গেলে তার মধ্যে পরকাল চিন্তা প্রবল হওয়া উচিত। অতীত গোনাহ থেকে তওবা করে ভবিষ্যতে সেগুলো থেকে আত্মরক্ষার পুরোপুরি যত্নবান হওয়া দরকার। কেননা অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, চল্লিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস ও চরিত্র গড়ে উঠে, তা পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে থাকে।

হযরত ওসমান (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুমিন বান্দা যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা হিসাব সহজ করে দেন, ষাট বছর বয়সে পৌঁছালে সে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার তাওফীক লাভ করে, সত্তর বছর বয়সে পৌঁছালে আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে, আশি বছর বয়সে পৌঁছালে আল্লাহ

তা'আলা তার সৎকর্মসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং মন্দ কর্মগুলোকে মিটিয়ে দেন এবং যখন সে নব্বই বছর বয়সে পৌছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত অতীত গোনাহ মাফ করে দেন, তাকে তার পরিবারের লোকজনের জন্যে সুপারিশ করার অধিকার দেন এবং আকাশে তার নামের সাথে اَسِيْرُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ লিখে দেন। অর্থাৎ, সে পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা কয়েদী। (ইবনে কাছীর) বলাবাহুল্য, হাদীসে সে মু'মিন বান্দাকে বোঝানো হয়েছে, যে শরিয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে আল্লাহভীতি সহকারে জীবন অতিবাহিত করে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

بِدْعًا : নিত্যনতুন। صفت مشبه ; اسم فاعل ও اسم مفعول উভয় অর্থে আসে। তাই কেউ কেউ প্রথম অর্থে مُبْدِعٌ অর্থ নিয়েছেন তথা নতুন কথা বলে যে। কেউ কেউ দ্বিতীয় অর্থে مُبْدَعٌ অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ নতুন প্রেরিত, যার পূর্বে কোনো বার্তাবাহক (পয়গম্বর) আসেনি।

اَدْرِىْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার دِرَايَةٌ মূলবর্ণ (د ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি অবগত আছি।

اَوْزِعْنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْزَاعٌ মূলবর্ণ (و ـ ز ـ ع) জিনস مثال واوى অর্থ– কোনো বস্তুর উপর দৃঢ় করা। ইলহাম করা।

اَصْلِحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصْلَاحٌ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তুমি সৎ বানিয়ে দাও। তুমি সংশোধন করে দাও।

اَتَّبِعُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি অনুসরণ করি।

شَاهِدٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلشَّهَادَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ه ـ د) জিনস صحيح অর্থ– সাক্ষী।

اَلظّٰلِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلظُّلْمُ মূলবর্ণ (ظ ـ ل ـ م) জিনস صحيح অর্থ– জালিম।

مَا سَبَقُوْنَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّبْقُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা আমাদের অগ্রবর্তী হতে পারত না।

اَلْمُحْسِنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْسَانُ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– নেককার লোক।

اِسْتَقَامُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– অটল রয়েছে।

حَمَلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحَمْلُ মূলবর্ণ (ح ـ م ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– গর্ভেধারণ করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ : এখানে فَاء টি আতেফা, আর اٰمَنَ ফে'ল তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ হলো ফায়েল অর্থাৎ الشَّاهِدُ আর اِسْتَكْبَرْتُمْ টা اٰمَنَ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اللّٰهُ শব্দটি اِسْمِ اِنَّ এবং لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ হলো خَبَرِ اِنَّ –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ১৬৫]

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১৬. তারা সেই সমস্ত লোক– যাদের নেক কাজসমূহ আমি কবুল করব এবং তাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দেব, এভাবে যে, তারা বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে; সেই সত্য প্রতিশ্রুতির কারণে যা তাদেরকে দেওয়া হতো।	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾
১৭. আর যে ব্যক্তি নিজ পিতামাতাকে বলে যে, তোমাদের প্রতি ধিক্কার, তোমরা কি আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ যে, আমি কবর হতে বের হবো? অথচ আমার পূর্বে বহু সম্প্রদায় অতীত হয়েছে (কেউ পুনর্জীবিত হয়নি।) আর তারা (পিতামাতা) উভয়ে আল্লাহর সমীপে ফরিয়াদ করছে, (এবং বলছে যে,) আরে তোর সর্বনাশ হোক! ঈমান আন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তখন সে বলে, এটা ভিত্তিহীন কথা মাত্র, যা প্রাচীনদের হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।	وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾
১৮. এরা ঐ সমস্ত লোক যে, তাদের সম্বন্ধেও আল্লাহর (আজাবের) বাণী সাব্যস্ত হয়ে আছে ঐ লোকদের সাথে যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে– জিন ও মানুষের মধ্য হতে; নিশ্চয় এরা ক্ষতিতে রইল।	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾
১৯. আর প্রত্যেকে তাদের কর্মের দরুন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি পাবে, আর যেন আল্লাহ প্রত্যেককে তাদের আমল (-এর প্রতিদান) পূর্ণ করে দেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।	وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. أُولَٰئِكَ তারা সেই সমস্ত লোক الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا যাদের নেক কাজসমূহ আমি কবুল করব وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ এবং তাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দেব فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ এভাবে যে, তারা বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে وَعْدَ الصِّدْقِ সেই সত্য প্রতিশ্রুতির কারণে الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ যা তাদেরকে দেওয়া হতো।

১৭. وَالَّذِي قَالَ আর যে ব্যক্তি বলে যে لِوَالِدَيْهِ নিজ পিতামাতাকে أُفٍّ لَّكُمَا তোমাদের প্রতি ধিক্কার أَتَعِدَانِنِي তোমরা কি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ যে أَنْ أُخْرَجَ আমি কবর হতে বের হবো وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي অথচ আমার পূর্বে বহু সম্প্রদায় অতীত হয়েছে وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ আর তারা উভয়ে আল্লাহর সমীপে ফরিয়াদ করছে وَيْلَكَ آمِنْ আরে তোর সর্বনাশ হোক! ঈমান আন إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য فَيَقُولُ তখন সে বলে مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ এটা ভিত্তিহীন কথামাত্র যা প্রাচীনদের হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।

১৮. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ এরা ঐ সমস্ত লোক যে حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ তাদের সম্বন্ধেও আল্লাহর (আজাবের) বাণী সাব্যস্ত হয়ে আছে فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم ঐ লোকদের সাথে যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ জিন ও মানুষের মধ্য হতে إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ নিশ্চয় এরা ক্ষতিতে রইল।

১৯. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا আর প্রত্যেকে তাদের কর্মের দরুন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি পাবে وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ আর যেন আল্লাহ প্রত্যেককে তাদের আমল (-এর প্রতিদান) পূর্ণ করে দেন وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ط أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ج فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

২০. আর যেদিন কাফেদেরকে অগ্নির সম্মুখে আনা হবে; (বলা হবে যে,) তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের উপভোগের সামগ্রী ভোগ করেছ এবং তা খুব উপভোগ করেছ, সুতরাং আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ তোমরা ভূপৃষ্ঠে অযথা অহংকার করতে, আর এ কারণে যে, তোমরা অবাধ্যতা করতে।

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ط إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ط إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾

২১. আর আপনি 'আদ গোত্রের ভ্রাতা (হূদ) -কে স্মরণ করুন; যখন তিনি আঁকাবাঁকা দীর্ঘ বালুকা স্তূপবিশিষ্ট স্থলে বসবাসকারী নিজ সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করলেন, আর তাঁর পূর্বে ও তাঁর পরে বহু ভয় প্রদর্শনকারী অতীত হয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করো না; আমি তোমাদের উপর এক ভীষণ দিবসের আজাবের আশঙ্কা করছি।

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا ج فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾

২২. তারা বলতে লাগল, তুমি কি এ উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট এসেছ যে, আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণ হতে ফিরিয়ে দেবে? সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে তুমি আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ তা আমাদের উপর পতিত কর।

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ আর যেদিন কাফেরদেরকে অগ্নির সম্মুখে আনা হবে أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ তোমরা তোমাদের উপভোগের সামগ্রী ভোগ করেছ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا তোমাদের পার্থিব জীবনেই وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا এবং তা খুব উপভোগ করেছ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ সুতরাং তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ কারণ তোমরা ভূপৃষ্ঠে অযথা অহংকার করতে وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ আর এ কারণে যে, তোমরা অবাধ্যতা করতে।

২১. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ আর আপনি 'আদ গোত্রের ভ্রাতা (হূদ)-কে স্মরণ করুন إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ যখন তিনি আঁকাবাঁকা দীর্ঘ বালুকা স্তূপবিশিষ্ট স্থলে বসবাসকারী নিজ সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করলেন وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ আর তাঁর পূর্বে ও তাঁর পরে বহু ভয় প্রদর্শনকারী অতীত হয়েছেন যে أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করো না إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ আমি তোমাদের উপর এক ভীষণ দিবসের আজাবের আশঙ্কা করছি।

২২. قَالُوا তারা বলতে লাগল أَجِئْتَنَا তুমি কি এ উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট এসেছ যে لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণ হতে ফিরিয়ে দেবে فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا সুতরাং যদি তুমি আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ তা আমাদের উপর পতিত কর إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ যদি তুমি সত্যবাদী হও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِيْ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللّٰهَ وَيْلَكَ أٰمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ [١٧]

শানে নুযূল–১ : আলোচ্য আয়াত মাতাপিতার অবাধ্য সন্তানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মারওয়ান বিন হিকামের ধারণা ও মন্তব্য হচ্ছে যে, আলোচ্য আয়াত আব্দুর রহমান বিন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), সুদ্দী, আবুল আলিয়া ও মুজাহিদের অভিমত হচ্ছে, আলোচ্য আয়াত আব্দুল্লাহ বিন আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাকে তার মাতাপিতা উভয় জন ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তখন তিনি তাদের দাওয়াত কবুল করেননি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৩ : কাতাদাহ ও সুদ্দীর এক বর্ণনায় বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আব্দুর রহমান বিন আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তার পিতা ও মাতা উম্মে রুমান ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এবং পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছিলেন। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে তা গ্রহণ করছিলেন না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। তবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তা সম্পূর্ণ ভাবেই অস্বীকার করেন এবং মারওয়ানের দাবির জবাবে পর্দার আড়াল হতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন যে, আমাদের সম্পর্কে আমার ওজর ও আমার সাফাই বর্ণনা করা ছাড়া অন্য কোনো আয়াত নাজিল হয়নি। বিশুদ্ধতম মতামত হচ্ছে যে, মাতাপিতার অবাধ্য কাফের সন্তানের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[২০/২৬/১৩, কুরতুবী ১৬৯/১৬, দুররে মানছূর ৪১/৬, ইবনে কাছীর ১৫৯/৪]

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ.

অর্থাৎ, উপরিউক্ত গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এটাও ব্যাপক বিধান। তবে হযরত আবূ বকরের ক্ষেত্রে এটা সর্বপ্রথম প্রযোজ্য। হযরত আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও আয়াতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। মুহাম্মদ ইবনে হাতেম বর্ণনা করেন, একবার আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে আরও কিছু লোক উপস্থিত ছিল। তারা হযরত ওসমান (রা.)-এর চরিত্রে কিছু দোষ আরোপ করলে তিনি বললেন :

كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الَّذِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِمْ : أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْ أَصْحٰبِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ قَالَ وَاللّٰهِ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَهَا ثَلَاثًا.

অর্থাৎ, হযরত ওসমান (রা.) সে লোকদের অন্যতম ছিলেন, যাঁদের কথা আল্লাহ তা'আলা أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহর কসম! ওসমান ও তাঁর সঙ্গিদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। –[ইবনে কাছীর]

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا –পূর্বের আয়াতসমূহে মাতাপিতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য সম্পর্কিত নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সে ব্যক্তির আজাব ও শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে, যে পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ও কটুক্তি করে। বিশেষতঃ পিতামাতা যখন তাকে ইসলাম ও সৎকর্মের দিকে দাওয়াত দেয়, তখন তাদের কথা অমান্য করা দ্বিগুণ পাপ। ইবনে কাছীর বলেন, যে কোনো লোক পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, তার ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে।

মারওয়ান এক ভাষণে বলেছিল, এ আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) মারওয়ানের এই দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। কোনো সহীহ রেওয়ায়েতে আয়াতটি কোনো বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বর্ণিত নেই।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا অর্থাৎ, কাফেরদেরকে বলা হবে, তোমরা কিছু ভালো কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আকারে দেওয়া হয়েছে। এখন পরকালে তোমাদের কোনো প্রাপ্য নেই। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের যেসব সৎকাজ ঈমানের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়; পরকালে সেগুলো মূল্যহীন; কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা

তাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দিয়ে দেন। কাজেই কাফেররা দুনিয়াতে যেসব বিষয়-বৈভব, ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভ করে, সেগুলো তাদের দানশীলতা, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি সৎকর্মের প্রতিফল হয়ে থাকে। মু'মিনদের জন্যে এরূপ নয়। তারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নিয়ামত লাভ করলেও পরকালের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না।

দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা : আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার কারণে কাফেরদের উদ্দেশ্যে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের জীবনালেখ্য এর সাক্ষ্য দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়ামেন প্রেরণ করার সময় এ উপদেশ দেন : দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থেকো। হযরত আলী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে অল্প রিজিক নিতে সম্মত হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলাও তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হয়ে যান।

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَتَقَبَّلُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّقَبُّلُ মূলবর্ণ (ق - ب - ل) জিনস صحيح অর্থ– আমিকবুল করব।

نَتَجَاوَزُ : সীগাহ جمع متكم বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَجَاوُزٌ মূলবর্ণ (ج - و - ز) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা অতিক্রম করব।

اَسَاطِيْرُ : বহুবচন, একবচনে أُسْطُوْرَةٌ অর্থ– মনগড়া কাহিনী, মনগড়া লিখিত কথা। উপাখ্যান, পৌরাণিক কাহিনী। মিথ্যা গল্প কাহিনী, যে ব্যাপারে বিশ্বাস থাকে ইহা মনগড়াভাবে লিখিত।

هُوْنٌ : اسم ও مصدر অর্থ– লাঞ্ছনা, অবমাননা। লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়া। দুর্বল ও দরিদ্র হওয়া।

خَلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসাদার خُلُوٌّ মূলবর্ণ (خ - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– অতীত হয়েছে, খালি হয়েছে।

اَلنُّذُرُ : نَذِيْرٌ-এর বহুবচন। অর্থ– ভীতি প্রদর্শনকারীগণ অর্থাৎ পয়গম্বর।

لِتَأْفِكَنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منصوب بلام বাব ضَرَبَ মাসদার إِفْكٌ ও اَفْكٌ মূলবর্ণ (ا - ف - ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমাদেরকে ফিরিয়ে দিবে।

اِئْتِنَا : সীগাহ واحد مذكر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– আমাদের নিকট নিয়ে আস।

يَسْتَغِيْثَانِ : সীগাহ تثنيه مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِغَاثَةُ মূলবর্ণ (غ - و - ث) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা উভয়ে ফরিয়াদ করছে।

يُعْرَضُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَرْضُ মূলবর্ণ (ع - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ– সম্মুখে আনা হবে।

تَعِدُنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعِدَةُ، اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তুমি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا : এখানে أُولٰئِكَ হলো মুবতাদা। আর الَّذِيْنَ হলো তার খবর। আর نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ বাক্যটি হলো সেলাহ الَّذِيْنَ মওসূলের আর اَحْسَنَ হলো مفعول به এবং مَا হলো মাওসূলাহ মুযাফ ইলাইহি। আর عَمِلُوْا বাক্যটি সেলাহ হয়েছে। আর এটা مَا مصدرية হওয়াও বৈধ। অর্থাৎ اَحْسَنَ عَمَلِهِمْ;
–[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ১৬৯]

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তিনি বললেন, (তার) পূর্ণ অবগতি তো আল্লাহরই আছে, আর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তাই তোমাদেরকে পৌছাচ্ছি; কিন্তু আমি দেখছি যে, তোমরা নিরেট মূর্খতার কথাবার্তা বলছ।

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ؕ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ؕ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾

২৪. অতঃপর যখন তারা সেই মেঘরাশিকে নিজেদের প্রান্তর ভূমির দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তখন বলতে লাগল, এটা তো মেঘ- যা আমাদের উপর বর্ষিত হবে; (আল্লাহ বললেন) না, বরং এটা তা যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে; (এটা) এক প্রচণ্ড বায়ু যাতে যন্ত্রণাময় আজাব রয়েছে,

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. এটা প্রত্যেক বস্তুকে নিজ প্রতিপালকের আদেশে ধ্বংস করে ফেলবে, ফলত তারা এরূপ হয়ে গেল যে, তাদের বাসস্থানগুলো ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না; আমি এরূপেই অপরাধী লোকদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ۖ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর আমি তাদেরকে ঐ সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম যে, যেসব বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করিনি এবং আমি তাদেরকে কর্ণ ও চক্ষু এবং অন্তর (সবকিছুই) দিয়েছিলাম, অনন্তর না কর্ণ তাদের কোনো কাজে আসল, আর না তাদের চক্ষু, আর না অন্তর, কেননা তারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করত, আর তা-ই এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ তিনি বললেন (তার) পূর্ণ অবগতি তো আল্লাহরই আছে وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ আর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাই তোমাদের কে পৌছাচ্ছি وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ কিন্তু আমি দেখছি قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ তোমরা নিরেট মূর্খতার কথাবার্তা বলছ ;

২৪. فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا অতঃপর যখন তারা সেই মেঘরাশিকে অগ্রসর হতে দেখল مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ নিজেদের প্রান্তর ভূমির দিকে। قَالُوْا তখন বলতে লাগল هٰذَا عَارِضٌ এটা তো মেঘ مُّمْطِرُنَا যা আমাদের উপর বর্ষিত হবে بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ না, বরং এটা তা যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে رِيْحٌ এক প্রচণ্ড বায়ু فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ যাতে যন্ত্রণাময় আজাব রয়েছে।

২৫. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ এটা প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করে ফেলবে بِاَمْرِ رَبِّهَا নিজ প্রতিপালকের আদেশে। فَاَصْبَحُوْا ফলত তারা এরূপ হয়ে গেল যে لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ তাদের বাসস্থান গুলো ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ আমি এরূপেই অপরাধী লোকদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

২৬. وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ আর আমি তাদেরকে ঐ সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম যে فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ যে সব বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করিনি وَجَعَلْنَا لَهُمْ এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ অনন্তর না কর্ণ তাদের কোনো কাজে আসল وَلَآ اَبْصَارُهُمْ আর না তাদের চক্ষু وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ আর না অন্তর اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ কেননা তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করত وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ আর তাই এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত।

২৭. আর আমি তোমাদের আশেপাশের অন্যান্য জনপদগুলোকেও ধ্বংস করেছি এবং আমি পুনঃপুন আমার নিদর্শনাবলি বর্ণনা করেছিলাম, যেন তারা ফিরে আসে।	وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. অনন্তর তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে স্বীয় উপাস্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল, তারা কেন এদেরকে সাহায্য করল না? বরং তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গেল, বস্তুত এটা তাদের নিছক রচিত ও মনগড়া উক্তি।	فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ؕ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. আর যখন আমি জিনদের একটি দলকে আপনার নিকট উপনীত করলাম, যারা কুরআন শ্রবণ করছিল মোটকথা, যখন তারা কুরআনের নিকট উপস্থিত হলো, (তখন) পরস্পর বলল, নীরব হও, অনন্তর যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো তখন তারা (ঈমান আনল এবং) স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট (তার) সংবাদ পৌছানোর জন্য প্রত্যাগমন করল।	وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا আর আমি ধ্বংস করেছি مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى তোমাদের আশে পাশের অন্যান্য জনপদগুলোকেও وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ এবং আমি পুনঃপুনঃ আমার নিদর্শনাবলি বর্ণনা করেছিলাম لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ যেন তারা ফিরে আসে।

২৮. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ অনন্তর তারা কেন এদেরকে সাহায্য করল না الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ তারা আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে স্বীয় উপাস্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল قُرْبَانًا اٰلِهَةً আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ বরং তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গেল وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ বস্তুতঃ এটা তাদের নিছক রচিত ও মনগড়া উক্তি।

২৯. وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ আর যখন আমি আপনার নিকট উপনীত করলাম نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ জিনদের একটি দলকে يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ যারা কুরআন শ্রবণ করছিল فَلَمَّا حَضَرُوْهُ মোটকথা যখন তারা কুরআনের নিকট উপস্থিত হলো قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا (তখন) পরস্পর বলল, নীরব হও فَلَمَّا قُضِيَ অনন্তর যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ তখন তারা (ঈমান আনল এবং) স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট (তার) সংবাদ পৌছানোর জন্য প্রত্যাগমন করল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ.

শানে নুযূল : ইবনে আবী শাইবা, ইবনে মারদুভিয়া ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ একদা বতনে নাখলা নামক স্থানে ফজরের নামাজে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন তখন নয় সদস্যের একটি জিন্নাতের দল সেখানে অবতরণ করে এটা শুনতে পেয়ে তারা একে অপরকে বলল,

চুপ থাক ও শ্রবণ কর। সে নয় জনের মধ্যে একজনের নাম ছিল যোবাআ। জিন জাতিদের আকস্মিক এ অবতরণ এবং কুরআন শ্রবণ করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রূহুল মা'আনী ৩১/২৬/১৩, কুরতুবী ১৫৮/১৬, দুররে, মানছূর ৪৪/৬, ফতহুল কাদীর ২৭/৫, ইবনে কাছীর ১৬৩/৪]

আয়াতসমূহের যোগসূত্র : (উপরে 'আদ সম্প্রদায়ের কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন তাদেরই মতো অন্যান্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে কুফর ও পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে বিভিন্ন আজাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাদের জনপদের ধ্বংসাবশেষ মক্কাবাসীদের সফরের পথে অবস্থিত ছিল। এসব ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে সংক্ষেপে তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।)

আমি তোমাদের আশপাশের আরও জনপদ (কুফর ও শিরকের কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি। (যেমন, সামূদ ও লূতের সম্প্রদায়। মক্কাবাসীরা সিরিয়া সফরে এসব জনপদ অতিক্রম করত। মক্কার এক দিকে ইয়ামন ও অপরদিকে সিরিয়া অবিস্থিত ছিল। তাই مَا حَوْلَكُمْ বলা হয়েছে।) এবং আমি (ধ্বংস করার পূর্বে তাদের উপদেশের জন্যে) বার বার নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছি, যাতে তারা (কুফর ও শিরক থেকে) বিরত হয়। (কিন্তু তারা বিরত হলো না এবং ধ্বংস হয়ে গেল।) অতঃপর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে নৈকট্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল (ধ্বংস ও আজাবের সময়) তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা (অর্থাৎ, তাদেরকে উপাস্য ও সুপারিশকারী মনে করা) ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়। (বাস্তবে তারা উপাস্য ছিল না।)

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ

মক্কার কাফেরদেরকে শোনানোর জন্যে পূর্বেকার আয়াতসমূহে কুফর ও অহংকারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, জিনরা অহংকার ও গর্বে তোমাদের চেয়েও বেশি, কিন্তু কুরআন শুনে তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জিনদের চেয়ে বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন; কিন্তু তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছ না! (জিনদের কুরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সহীহ্ হাদীসসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পর থেকে জিন জাতিকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। সেমতে তাদের কেউ সংবাদ শোনার মানসে উপরে গেলে তাকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হতো। জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হলো এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। একদল হেজাযেও পৌছল। সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন সাহাবীসহ 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা 'ওকায' বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আরবরা আমাদের যুগের প্রদর্শনীর মতো বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন করত। এসব মেলায় বহুলোক উপস্থিত থাকত, দোকান খোলা হতো এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো। ওকায নামক স্থানে প্রতি বছর এমনি ধরনের এক মেলা বসত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভবতঃ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করছিলেন। বাতনে নাখলা নামক স্থানে তিনি যখন ফজরের নামাজের কুরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের অনুসন্ধানী দলটি সেখানে গিয়ে পৌছল। তারা কুরআন পাঠ শুনে বলতে লাগল, এই সে নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহে নিবৃত্ত করা হয়েছে। –[বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী]

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, জিনরা সেখানে পৌছে পরস্পর বলতে লাগল, চুপ করে কুরআন শুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ করলে জিনরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তদন্তকার্যের রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা জিন অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই জিনদের গমনাগমন এবং তাদের কুরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণের বিষয় কিছুই জানতেন না। সূরা জিনে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। –[ইবনুল মুনযির]

আরো এক রেওয়ায়েতে আছে, নসীবাঈন নামক স্থানের অধিবাসী এই জিনদের সংখ্যা ছিল নয় অথবা সাত। তাদের প্রচারের ফলে পরবর্তীকালে আরও তিন শত জিন ইসলাম গ্রহণের জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়। -(রূহুল-মা'আনী) অন্যান্য হাদীসে জিনদের আগমনের ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে একাধিক ঘটনা বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোনো বৈপরীত্য নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বার বার আগমন করেছে।

খাফফাযী বলেন, সবগুলো হাদীস একত্রিত করলে দেখা যায় যে, জিনদের আগমনের ঘটনা ছয় বার সংঘটিত হয়েছে। –[বয়ানুল কুরআন] জিনদের আগমনের ঘটনাই উপরিউক্ত আয়াত সমূহে বিধৃত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أُبَلِّغُكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّبْلِيْغُ মূলবর্ণ (ب - ل - غ) জিনস صحيح অর্থ– আমি তোমাদেরকে পৌঁছাচ্ছি।

تَجْهَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْجَهْلُ মূলবর্ণ (ج - ه - ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা নিরেট মুর্খতার কথাবার্তা বলছ।

أَوْدِيَةً : শব্দটি وادي -এর বহুবচন। অর্থ– নালা, উপত্যকা। মূলতঃ وادى বলা হয়, যে স্থানে পানি প্রবাহিত হয়। استعارة হিসাবে প্রত্যেক পদ্ধতি ও প্রত্যেক রাস্তাকেও وادى বলা হয়।

مُمْطِرُنَا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْطَارٌ মূলবর্ণ (م - ط - ر) জিনস صحيح অর্থ– যা আমাদের উপর বর্ষিত হবে।

تُدَمِّرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيل মাসদার تَدْمِيْر মূলবর্ণ (د - م - ر) জিনস صحيح অর্থ– ধ্বংস করে ফেলবে।

لَا يُرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ– দেখা যাচ্ছিল না।

حَاقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার حَيْقًا - حَوْقًا মূলবর্ণ (ح - ى - ق) জিনস اجوف يائى অর্থ– ঘিরে ফেলল।

نَفَرًا : اسم جمع ; মানসূব। অর্থ– জামাত। কায়েকজনের একটি দল। জান্নাতের জামাত, পরিবার/গোষ্ঠী। বংশধর।

وَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيل মাসদার تَوْلِيَةٌ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা প্রত্যাগমন করল।

اَلْمُجْرِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِجْرَامُ মূলবর্ণ (ج - ر - م) জিনস صحيح অর্থ– অপরাধী লোকজন।

صَرَّفْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّصْرِيْفُ মূলবর্ণ (ص - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– আমি বর্ণনা করেছিলাম।

يَسْتَمِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِمَاعُ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা শ্রবণ করছিল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ : এটা كلام مستانف আর لَقَدْ -এর লাম টি উহ্য قسم -এর জন্য আর قَدْ হলো حرف تحقيق আর اَهْلَكْنَا ফে'ল ও ফায়েল, আর مَا হলো مفعول به আর حَوْلَكُمْ হলো উহ্যের সাথে ظرف যার اعراب -এর কোনো স্থান নেই। কেননা এটা মওসূলের সেলাহ হয়েছে। আর مِنَ الْقُرٰى টা উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে। আর صَرَّفْنَا টা اَهْلَكْنَا -এর উপর আতফ হয়েছে الْاٰيٰتِ আর مفعول به হলো لَعَلَّهُمْ -এর لَعَلَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর هُمْ তার ইসম এবং يَرْجِعُوْنَ হলো তার খবর। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ১৮১]

৩০. (এবং) বলল, হে আমাদের ভ্রাতাগণ! আমরা মূসার পরে অবতারিত এমন এক কিতাব শুনে আসছি, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সত্যতা প্রতিপাদন করছে, (এবং) সত্যের দিকে ও সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করছে।	قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۳۰﴾
৩১. হে ভাইগণ! তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর উপর ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ মার্জনা করবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় আজাব হতে রক্ষা করবেন।	يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۱﴾
৩২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা না মানবে, তবে সে ভূপৃষ্ঠে (কোথায়ও পলায়ন করে আল্লাহকে) পরাভূত করতে পারবে না, আর আল্লাহ ভিন্ন অপর কেউ তার সহায়কও হবে না; এরাই স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে।	وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۲﴾
৩৩. তারা কি এটা জানতে পারেনি যে, যে আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় সৃষ্টি করতে একটুও ক্লান্ত হননি, তিনি এতে সক্ষম যে, মৃতকে জীবিত করেন; কেন সক্ষম হবেন না? নিঃসন্দেহে তিনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।	اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۳﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ বলল, হে আমাদের ভ্রাতাগণ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى আমরা মূসার পরে অবতারিত এমন এক কিতাব শুনে আসছি مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ যা তার পূর্ববর্তী কিতাব গুলোর সত্যতা প্রতিপাদন করছে يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ সত্যের দিকে ও সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করছে।

৩১. يٰقَوْمَنَآ হে ভাইগণ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও وَاٰمِنُوْا بِهٖ এবং তাঁর উপর ঈমান আন يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ মার্জনা করবেন وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় আজাব হতে রক্ষা করবেন।

৩২. وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা না মানবে فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ তবে সে ভূপৃষ্ঠে (কোথায়ও পলায়ন করে আল্লাহকে) পরাভূত করতে পারবে না وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ আর আল্লাহ ভিন্ন অপর কেউ তার সহায়কও হবে না اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ এরাই স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে।

৩৩. اَوَلَمْ يَرَوْا তারা কি এটা জানতে পারেনি যে اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ যে আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ এবং এতদুভয় সৃষ্টি করতে তিনি একটুও ক্লান্ত হননি بِقٰدِرٍ তিনি এতে সক্ষম যে عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى মৃতকে জীবিত করেন بَلٰٓى কেন সক্ষম হবেন না اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে তিনি সর্বোবিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

অনুবাদ	আয়াত
৩৪. আর যেদিন কাফেদেরকে দোজখের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে; (তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে) এ দোজখ কি বাস্তব ব্যাপার নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, অবশ্যই এটা বাস্তব ব্যাপার; আল্লাহ বলবেন, তবে নিজেদের কুফরের বিনিময়ে এ আজাব আস্বাদন কর।	وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. সুতরাং আপনি ধৈর্য ধরুন, যেমন অন্যান্য দৃঢ়সঙ্কল্পে রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছিলেন, আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করবেন না; যেদিন তারা তা দেখবে– যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, (তখন মনে করবে) যেন তারা দিবসের এক মুহূর্ত মাত্র অবস্থান করেছে; এটা (আল্লাহর পক্ষ হতে) পৌঁছে দেওয়া, অতএব, তারাই ধ্বংস হবে যারা নাফরমানি করবে।	فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَيَوْمَ আর যেদিন يُعْرَضُ উপস্থিত করা হবে الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেরদেরকে عَلَى النَّارِ দোজখের সম্মুখে اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ এ দোজখ কি বাস্তব ব্যাপার নয়? قَالُوْا তারা বলবে بَلٰى وَرَبِّنَا আমাদের প্রতিপালকের শপথ অবশ্যই قَالَ আল্লাহ বলবেন فَذُوْقُوا الْعَذَابَ তবে এ আজাব আস্বাদন কর بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ নিজেদের কুফরের বিনিময়ে।

৩৫. فَاصْبِرْ সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুণ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ যেমন অন্যান্য দৃঢ়সঙ্কল্পে রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছিলেন وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করবেন না كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ যেদিন তারা দেখবে যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ (তখন মনে করবে) যেন তারা দিবসের এক মুহূর্ত মাত্র অবস্থান করেছে بَلٰغٌ এটা (আল্লাহর পক্ষ হতে) পৌঁছে দেওয়া فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ অতএব, তারাই ধ্বংস হবে যারা নাফরমানি করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى –'মূসার পরে' বলার কারণে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, আগন্তুক জিনরা ইহুদি ধর্মাবলম্বী ছিল। কেননা হযরত মূসা (আ.)-এর পর হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি যে ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের উক্তিতে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ইঞ্জীলের উল্লেখ না করাই তাদের ইহুদি হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। কেননা ইঞ্জীলের উল্লেখ না করার এক কারণ এও হতে পারে যে, ইঞ্জিলের অধিকাংশ বিধি-বিধান তাওরাতেরই অনুসারী। কিন্তু কুরআন তাওরাতের মতো একটি স্বতন্ত্র কিতাব। এর বিধি-বিধান ও শরিয়ত তাওরাত থেকে অনেক ভিন্নতর। তাই একথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কুরআনই তাওরাতের অনুরূপ স্বতন্ত্র কিতাব।

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ - مِنْ অব্যয়টি আসলে 'কোনো কোনো' -এর অর্থ নির্দেশ করে। এখানে এই অর্থ নেওয়া হলে বাক্যের' ফায়দা এই হবে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে কোনো কোনো গোনাহ্ মাফ হবে, অর্থাৎ আল্লাহর হক মাফ হবে- বান্দার হক মাফ হবে না। কেউ কেউ مِنْ অব্যয়টিকে অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এমতাবস্থায় এ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أُنْزِلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْزَالُ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ– অবতারিত। অবতীর্ণ করা হয়েছে।

مُصَدِّقًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْدِيْقُ মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ– সত্যতা প্রতিপাদন করছে। সত্যায়ন করছে।

يَهْدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পথ প্রদর্শন করছে।

مُسْتَقِيْمٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– সরল পথ। সোজা পথ।

اَجِيْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِجَابَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা সাড়া দাও।

دَاعِىَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস– ناقص واوى অর্থ– আহ্বান কারী। আহবায়ক। দায়ী।

يُجِرْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِجَارَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– রক্ষা করতেন, পরিত্রাণ দিবেন।

لَا يُجِبْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِجَابَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– কথা মানবে না, সাড়া দিবে না।

وَلَمْ يَعْىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بلم বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَىُّ মূলবর্ণ (ع - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– ক্লান্ত হন নি। অক্ষম হননি।

يُعْرَضُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার عَرْضٌ মূলবর্ণ (ع - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ– উপস্থিত করা হবে।

فَذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروفا বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা আস্বাদন কর।

اَلرُّسُلُ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে الرسول অর্থ– রাসূলগণ।

لَا تَسْتَعْجِلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعْجَالُ মূলবর্ণ (ع - ج - ل) জিনস صحيح অর্থ– তাড়াহুড়া করবেন না।

يُهْلَكُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهَلَاكَةُ মূলবর্ণ (ه - ل - ك) জিনস صحيح অর্থ– তারাই ধ্বংস হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ এখানে : قَالُوْا হলো ফে'ল ও ফায়েল اِنَّا হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ও তার ইসম, আর سَمِعْنَا বাক্যটি خَبَر اِنَّ আর كِتٰبًا হলো مفعول به আর اُنْزِلَ বাক্যটি كِتٰبًا-এর সিফত; اُنْزِلَ হলো فعل مجهول তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর هو হলো নায়েবে ফায়েল আর مِنْۢ بَعْدِ টা اُنْزِلَ-এর সাথে متعلق হয়েছে আর مُوْسٰى হলো মুযাফ ইলাইহি। আর مُصَدِّقًا টা كِتٰبًا-এর সিফত হয়েছে। আর لِمَا টা مُصَدِّقًا-এর সাথে متعلق হয়েছে; আর بَيْنَ টা উহ্যের সাথে متعلق হয়ে ظرف হয়েছে। আর তা موصول-এর সেলাহ হয়েছে; আর يَدَيْهِ হলো মুযাফ ইলাইহি। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ১৮৩]

سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ مَدَنِيَّةٌ

সূরা মুহাম্মদ

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩৮, রুকূ'– ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যারা কাফের হয়েছে এবং (অন্যকেও) আল্লাহর পথ হতে বিরত রেখেছে, আল্লাহ তাদের আমল ব্যর্থ করে দিয়েছেন।	اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾
২. আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে এবং তার উপর ঈমান এনেছে, যা মুহাম্মদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে, অথচ তা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে বাস্তব বিষয়, আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং তাদের অবস্থা ঠিক রাখবেন।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾
৩. এটা এজন্য যে, কাফেররা তো ভুল পথের অনুসরণ করেছে, আর যারা মু'মিন তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে (আগত) ঠিক পথে চলেছে; এভাবেই আল্লাহ মানবগণের জন্য তাদের অবস্থা বর্ণনা করে থাকেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ﴿٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কাফের হয়েছে وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং (অন্যকেও) আল্লাহর পথ হতে বিরত রেখেছে اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ আল্লাহ তাদের আমল ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

২. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও নেক কাজ করেছে وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ এবং তার উপর ঈমান এনেছে যা মুহাম্মদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ অথচ তা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে বাস্তব বিষয় كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করবেন وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ এবং তাদের অবস্থা ঠিক রাখবেন।

৩. ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا এটা এ জন্য যে, কাফেররা তো اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ ভুল পথের অনুসরণ করেছে وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا আর যারা মু'মিন اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে (আগত) ঠিক পথে চলেছে كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ এভাবেই আল্লাহ মানবগণের জন্য তাদের অবস্থা বর্ণনা করে থাকেন।

৪. অনন্তর যখন তোমরা কাফেরদের সম্মুখীন হও, তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করতে (তাদেরকে হত্যা করতে) থাক; এমনকি যখন তাদের রক্তস্রোত বইয়ে দেবে, তখন তাদেরকে (বন্দি করে) দৃঢ়রূপে বেঁধে ফেল, অতঃপর হয়তো কোনো মুক্তিপণ ব্যতীতই তাদেরকে ছেড়ে দাও কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও, যে পর্যন্ত না তারা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে। এ হুকুম পালন করো; আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতেন, কিন্তু (এজন্য) যেন তিনি তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা করেন; আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, আল্লাহ তাদের আমল কখনো বিনষ্ট করবেন না।	فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۖ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾
৫. আল্লাহ তাদেরকে মকসূদ পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন এবং তাদের অবস্থা ঠিক রাখবেন,	سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾
৬. এবং তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন; যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়ে ছিলেন।	وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾
৭. হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহর সাহায্য কর, তবে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা অটল রাখবেন।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾
৮. আর কাফেরদের জন্য সর্বনাশ রয়েছে এবং আল্লাহ তাদের আমল ব্যর্থ করবেন।	وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا অনন্তর যখন তোমরা কাফেরদের সম্মুখীন হও فَضَرْبَ الرِّقَابِ তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করতে থাক حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ এমনকি যখন তাদের রক্তস্রোত বইয়ে দিবে فَشُدُّوا الْوَثَاقَ তখন তাদেরকে (বন্দী করে) দৃঢ়রূপে বেধে ফেল فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ অতঃপর হয়তো কোনো মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই তাদেরকে ছেড়ে দাও وَإِمَّا فِدَاءً, কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا যে পর্যন্ত না তারা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে ذَٰلِكَ এ হুকুম পালন করো وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ আর যদি আল্লাহ চাইতেন لَانتَصَرَ مِنْهُمْ তবে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতেন وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ কিন্তু (এজন্য) যেন তিনি তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা করেন; وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ আল্লাহ তাদের আমল কখনো বিনষ্ট করবেন না।

৫. سَيَهْدِيهِمْ আল্লাহ তাদেরকে মাকসূদ পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ এবং তাদের অবস্থা ঠিক রাখবেন।

৬. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ এবং তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন عَرَّفَهَا لَهُمْ যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়ে ছিলেন।

৭. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে মুমিনগণ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ যদি তোমরা আল্লাহর সাহায্য কর يَنصُرْكُمْ তবে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ এবং তোমাদের পা অটল রাখবেন।

৮. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ আর কাফেরদের জন্য সর্বনাশ রয়েছে وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ এবং আল্লাহ তাদের আমল ব্যর্থ করবেন।

৯. এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহর অবতারিত নির্দেশাবলিকে না পছন্দ করেছে, অতএব, তিনি তাদের কৃতকর্ম-বিফল করেছেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝٩
১০. তারা কি ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করে না এবং দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল? আল্লাহ তাদের উপর কেমন ধ্বংস নিপতিত করেছেন, আর এ কাফেরদের জন্যও অনুরূপ ব্যবহারই হবে।	اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۫ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ۝١٠
১১. এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলাই মুসলমানদের কার্যনির্বাহক, আর কাফেরদের জন্য কোনোই কার্যনির্বাহক নেই।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝١١

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. ذٰلِكَ এটা এজন্য যে بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا তারা না পছন্দ করেছে مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ আল্লাহর অবতারিত নির্দেশাবলিকে فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ অতএব, তিনি তাদের কৃতকর্ম বিফল করেছেন।

১০. اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ তারা কি ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করে না فَيَنْظُرُوْا এবং দেখে না যে كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ আল্লাহ তাদের উপর কেমন ধ্বংস নিপতিত করেছেন وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا, আর এ কাফেরদের জন্যও অনুরূপ ব্যবহারই হবে।

১১. ذٰلِكَ এটা এ কারণে যে بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আল্লাহ তা'আলাই মুসলমানদের কার্যনির্বাহক وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ আর কাফেরদের জন্য কোনো কার্যনির্বাহক নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা মুহাম্মদ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এই সূরা মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ, এতে ৪ রুকূ' ও ৩৮ আয়াত রয়েছে।

নামকরণ : এই সূরাকে 'সূরা কিতাল' -ও বলা হয়। কেননা এতে জিহাদের বিবরণ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং কাতাদা (র.) বলেছেন, একটি আয়াত ব্যতীত সম্পূর্ণ সূরাটিই মদীনা মোনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। আর সে আয়াতটি হলো– وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً ..... فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

প্রিয়নবী ﷺ হিজরতের সফরে যখন মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হন, তখন বারংবার মক্কা নগরীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "হে মক্কা! আল্লাহ পাকের দরবারে তুমি প্রিয় শহর, আর আমার নিকটও তুমি অত্যন্ত প্রিয় শহর, যদি মক্কাবাসী আমাকে বাধ্য না করতো তবে আমি কখনো এই শহর থেকে হিজরত করতাম না।" তখন আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়।

যেহেতু আয়াতখানি হিজরতের সফরে মক্কার অদূরে মদীনা মোনাওয়ারায় পৌছার পূর্বে নাজিল হয়, তাই এ আয়াতকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মক্কায় অবতীর্ণ বলেছেন, সূরার অবশিষ্ট সকল আয়াতই মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর নাফরমানি করে, যারা পাপিষ্ঠ, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এ কথার উপর কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, কুফরি ও নাফরমানি সত্ত্বেও যারা গরিব দুঃখীকে সাহায্য করে, দুর্গত মানবতার সেবায় এগিয়ে যায়, তারাও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? এরই জবাবে আল্লাহ পাক সূরার প্রথম আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন– اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ

অর্থাৎ যারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকেও মানে না, তদুপরি মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, তাদের যাবতীয় সৎ কাজ বরবাদ হয়ে যায়; কেননা ঈমান ও ইখলাস ব্যতীত আল্লাহ পাকের দরবারে কোনো নেক আমলই কবুল হয় না।

সূরার মূল বক্তব্য : এ সূরায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারা কাফের, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর দুশমন, তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, প্রিয়নবী ﷺ -এর সত্য-সাধনায় বাধা দেয়, তাদের যাবতীয় সৎকাজ ব্যর্থ। এরপর জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুসলিম জাতি কখন আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়। এরপর মক্কার কাফেরদের ধ্বংসের কথাও বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে মদীনা মোনাওয়ারায় মুনাফিকদের ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সূরার পরিসমাপ্তিতে মুসলিম জাতিকে আল্লাহর রাহে জিহাদের আহ্বান জানানো হয়েছে। কেননা জিহাদের মাধ্যমেই মুসলিম জাতি পৃথিবীতে বিজয় এবং সাফল্য লাভ করতে পারে।

সূরার আমল : যে ব্যক্তি এ সূরা লিপিবদ্ধ করে আবে জমজম দ্বারা ধৌত করে পান করে, সে মানুষের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রিয় হয়। আর যে ঐ পানি দ্বারা গোসল করে, সে অনেক রোগ থেকে বিশেষত চর্ম রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে।

স্বপ্নের তাবীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, তার নিকট হযরত আজরাঈল (আ.) অতি উত্তম আকৃতি ধারণ করে আসবেন এবং তার হাশর হবে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে।

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ সূরার প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছে, মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে– فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُوْنَ অর্থাৎ পাপিষ্ঠরাই ধ্বংস হবে। এ কথার উপর এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে, যারা নিরন্নকে খাবার দেয়, যারা আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেয়, সেলায়ে রেহমী করে তাদের সকল সৎকাজই বিনষ্ট হয়ে যাবে? অথচ কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন– فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ‘যে সামান্যতম সৎকাজও করবে সে তার শুভ পরিণতি অবশ্যই দেখতে পাবে।"

এ প্রশ্নের জবাবই আলোচ্য আয়াতে দেওয়া হয়েছে এবং এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে-

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ যারা অস্বীকার করেছে প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে, শুধু তাই নয়; বরং তারা মানুষকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিরত রেখেছে আল্লাহ পাক তাদের সকল আমলকে বাতিল করে দিয়েছেন। কেননা কোনো সৎকাজ আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হওয়ার জন্যে পূর্বশর্ত হলো ঈমান। যেহেতু তারা কাফের ও বিদ্রোহী এবং জনসাধারণকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিরত রাখার জন্যে তারা সর্বদা অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকতো, তাই তাদের কোনো সৎকর্মই আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়।

যে কর্মের উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা না হয়, তা আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে দুনিয়াতে তাদের এসব কল্যাণকর কাজের জন্যে সুনাম হতে পারে।

তাফসীরকার যাহহাক (র.) আলোচ্য আয়াতে أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ বাক্যটির অর্থ করেছেন এভাবে– আল্লাহ পাক কাফেরদের গোপন চক্রান্তগুলোকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর বিরুদ্ধে, তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে বানচাল করেছেন। মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখার এটিই অনিবার্য শাস্তি।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -এর দুটি অর্থ হতে পারে। ১. তারা নিজেদেরকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। ২. অথবা এর অর্থ হলো তারা অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণে বিরত রাখে।

বস্তুত অমুসলিমরা যেসব কাজকে সৎকাজ এবং মানবতার জন্যে কল্যাণকর কাজ বলে মনে করে, কিয়ামতের দিন সে কাজগুলোর কোনোটিরই গুরুত্ব হবে না, ঈমান ব্যতীত কোনো সৎকাজই যে গ্রহণযোগ্য হয় না, সেদিন তারা এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কারো সৎকাজ ব্যর্থ হওয়ার জন্যে তথা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার জন্য তার কুফরি ও নাফরমানিই যথেষ্ট; অন্যদেরকে ঈমান আনয়নে বাধা দান এর শর্ত নয়, তবে মক্কার কাফেরদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা শুধু কুফরি

ও নাফরমানিতেই যে লিপ্ত ছিল তাই নয়; বরং তারা মানুষকে ঈমান আনয়নেও বাধা দিত এবং কুফরি ও নাফরমানিতে লিপ্ত থাকতে প্ররোচিত করতো।

তাবারানী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো সময় মাগরিবের নামাজে এ সূরার প্রথম আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতেন।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ [١]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মক্কার কাফের যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী। নিজেকে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছে। সে সকল নরাধম সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। সে সকল নেতৃস্থানীয় হতভাগারা হচ্ছে ১২ জন। তারা বদর অভিযানের দিনে কাফের বাহিনীর খানা পিনার ব্যবস্থা করেছিল। যাতে করে কাফের বাহিনীর কোনো সদস্য বিশ্বাস ঘাতকতা না করে। ১২ জন হচ্ছে ১. আবূ জাহেল ২. হারেছ বিন হিশাম, (রাবিয়ার দুই পুত্র) ৩. উতবা বিন রাবিআ ৪. শাইবা বিন রাবিআ, খালাফ এর দুই পুত্র ৫. উবাই বিন খালফ ৬. উমায়্যা বিন খলফ, হাজ্জাজের দুই পুত্র ৭. মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ ৮. নুবাইহ বিন হাজ্জাজ ৯. আবুল বাখতারী বিন হিশাম ১০. যুমাআ বিন আসওয়াদ ১১. হাকিম বিন হাযাম ১২ হারেছ বিন আমের বিন নাওফল।
–[কুরতুবী ১৯১/১৬, রূহুল মা'আনী পৃ. ৩২ পারা ২৬ খণ্ড ১৩]

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ [٢]

শানে নুযূল–১ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, মদীনার আনসারগণ ইসলাম গ্রহণ করার পর, মক্কা হতে আগত মুহাজিরগণকে তাদের স্থাবর অস্থাবর সকল মাল সম্পর্কে সমান অধিকার প্রদান করে সাম্যতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল–২ : মুকাতিল বলেন, মক্কার এক শ্রেণির কুরাইশিরা ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে রাসূল ﷺ সহ তাদেরকে মক্কা হতে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে। বিশেষ করে একমাত্র তাদের শানে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।
–[কুরতুবী ১৯/১৬]

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ (٤)

শানে নুযূল : ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধরত ছিলেন এবং মুসলমানরা আঘাত ও হত্যায় ক্লান্ত ছিলেন এই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ঐ সময় মুশরিকরা উচ্চ ধ্বনিতে বলতে লাগল যে, হুবলই সর্বোচ্চ। আর মুসলমানরা বলতে লাগল আল্লাহই সর্বোচ্চ এবং সম্মানিত। আর মুশরিকরা একথা বলতে লাগল যে, আজকের দিন বদরের দিনের পরিবর্তে আর উভয় দিনের যুদ্ধ সমান সমান। তখন নবী করীম ﷺ মুসলমানদের বলতে লাগলেন তোমরা বল না উভয় দিন সমান না। বরং আমাদের শহীদরা আল্লাহর কাছে থেকে রিজিক প্রাপ্ত হচ্ছে আর তোমাদের মৃতদেরকে অগ্নিতে পুরানো হচ্ছে। এর প্রতি উত্তরে তারা বলতে লাগল আমাদের তো উযযা আছে তোমাদের তো কোনো উযযা নাই। এর উত্তরে মুসলমানরা বলল, আল্লাহ আমাদের মাওলা, তোমাদের কোনো মাওলা নেই।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ [١١]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতও হুদের দিনে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, রাসূল ﷺ পাহাড় শৃঙ্গে ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর মাঝে হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল, তখন মুশরিকরা চিৎকার করে বলতে লাগল اُعْلُ هُبَلُ মুসলমানরা বলতে লাগল, اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ। মুশরিকরা বলতে লাগল, আজকে বদরের প্রতিশোধ গ্রহণ করার দিন। যুদ্ধ সমান সমান। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা বল, সমান নয় আমাদের যারা নিহত হচ্ছে, তারা জীবিত, আল্লাহর নিকট তারা রিজিক প্রাপ্ত। পক্ষান্তরে তোমাদের পক্ষে যারা নিহত হচ্ছে, তারা জাহান্নামে শাস্তি প্রাপ্ত হবে। তখন মুশরিকেরা বলেছিল, আমাদের তো উযযা রয়েছে, তোমাদের কিন্তু উযযা নেই। তখন মুসলমানগণ বলেছিলেন যে, আল্লাহ আমাদের সহায়ক তোমাদের কোনো সহায়ক নেই। কাফেরদের বিপক্ষে মুসলমানদের দাবির সত্যায়নে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১৯৬/১৬]

أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ বলে সَبِيْلِ اللّٰهِ - صَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এখানে (আল্লাহর পথ) বলে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। কাফেরদের ঐ সকল কর্ম বুঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে সৎ কর্ম, যেমন ফকির-মিসকিনকে সাহায্য ও সহায়তা করা, প্রতিবেশীর সমর্থন ও হেফাজত করা, দানশীলতা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এসব কর্ম যদিও প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম, কিন্তু ঈমানসহ হলেই পরকালে এগুলো দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। কাফেরদের এ ধরনের সৎ কর্ম পরকালে তাদের জন্য মোটেই উপকারী হবে না। তবে তাদের সৎকর্মের বিনিময়ে ইহকালেই তাদেরকে আরাম ও সুখ দান করা হয়।

وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ –যদিও পূর্ববর্তী বাক্যেও ঈমান ও সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাত ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীও শামিল রয়েছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় বাক্যে একথা স্পষ্টভাবে পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই সত্য ব্যক্ত করা যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সমস্ত শিক্ষা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার উপরই ঈমানের আসল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ - بَالٌ শব্দটি কখনো অবস্থার অর্থে এবং কখনো অন্তরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থ নেওয়া যায়। প্রথম অর্থে আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থাকে অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কর্মকে ভালো করে দেন। দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে ঠিক করে দেন। এর সারমর্মও সমস্ত কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া। কেননা কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া অন্তর ঠিক করে দেওয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ الخ

আলোচ্য আয়াত থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। (এক) যুদ্ধের মাধ্যমে কাফেরদের শৌর্য-বীর্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দি করতে হবে। (দুই) অতঃপর এই যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে মুসলমানদের দুই রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ কৃপাবশতঃ তাদেরকে কোনো রকম মুক্তিপণ ও বিনিময় ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। মুক্তিপণ এরূপও হতে পরে যে, আমাদের কিছুসংখ্যক মুসলমান তাদের হাতে বন্দি থাকলে তাদের বিনিময়ে কাফের বন্দিদেরকে মুক্ত করা এবং এরূপও হতে পরে যে, কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। এই বিধান পূর্ববর্ণিত সূরা আনফালের বিধানের বাহ্যতঃ খেলাফ। সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বন্দিদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সতর্কবাণী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ তা'আলার আজাব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। যদি এই আজাব আসত, তবে ওমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.) ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পেত না। কেননা তাঁরা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সারকথা এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদরের বন্দিদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত এই উভয় বিষয়কে সিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদ বলেন যে, সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হাসান, আতা (র.), প্রমুখ অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের উক্তি তাই। ছাওরী, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক (র.) প্রমুখ ফিকহবিদ ইমামগণের মাযহাবও তাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তখন কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য ও সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন সূরা মুহাম্মদে কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। তাফসীরে মাযহরীতে কাযী সানাউল্লাহ (র.) একথাটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, এ উক্তিই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। কেননা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ একে কার্যে পরিণত করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও একে কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তাই এই আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। কারণ এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। বদর যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় সালে সংঘটিত হয়েছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ষষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী বন্দিদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মক্কার আশি জন কাফের রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অতর্কিতে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তানয়ীম পাহাড় থেকে নীচে অবতরণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতহের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় : وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর সিদ্ধান্ত এই যে, যুদ্ধবন্দিদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া জায়েজ নয়। এ কারণেই হানাফী আলেমগণ সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াতকে ইমাম আযম (র.) -এর মতে রহিত ও সূরা আনফালের আয়াতকে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তাফসীরে মাযহারী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, সূরা আনফালের আয়াত পূর্বে এবং সূরা মুহাম্মদেরে আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সূরা মুহাম্মদের আয়াতই রহিতকারী এবং সূরা আনফালের আয়াত রহিত। ইমাম আযমের পছন্দনীয় মাযহাবও অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের অনুরূপ অর্থাৎ, মুক্তি করা জায়েজ বলে তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেছে। যদি এতেই মুসলমানদের উপকারিতা নিহিত থাকে। তাফসীরে মাযহারীর মতে এটাই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় মাযহাব। হানাফী আলেমগণের মধ্যে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) ফতহুল কাদীর গ্রন্থে এই অভিমতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি লিখেন : কুদূরী ও হেদায়ার বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আযমের মতে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করা যায় না। এটা ইমাম আযম (র.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েত। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই অপর এক রেওয়ায়েত 'সিয়ারে-কাবীরে' জমহুরের উক্তির অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, মুক্ত করা জায়েজ। উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে শেষোক্ত রেওয়ায়েতই অধিক স্পষ্ট। ইমাম তাহাভী (র.) "মা' আনিউল-আসারে" একেই ইমাম আযম (র.) -এর মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা এই যে, সূরা মুহাম্মদ ও সূরা আনফালের উভয় আয়াত অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের মতে রহিত নয়। মুসলমানদের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলমানদের শাসনকর্তা এতদুভয়ের মধ্যে যে কোনো একটিকে উপযুক্ত মনে করবে, সেটিই প্রয়োগ করতে পারবে। কুরতুবী রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে কখনও হত্যা করা হয়েছে, কখনও গোলাম করা হয়েছে, কখনও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং কখনও মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে মুসলমান বন্দিদেরকে মুক্ত করানো এবং কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া এই উভয় ব্যবস্থাই মুক্তিপণ নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা উভয় ব্যবস্থাই প্রমাণিত আছে। এই বক্তব্য পেশ করার পর ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, এ ব্যাপারে যেসব আয়াতকে রহিতকারী ও রহিত বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তদ্রূপ নয়; বরং সবগুলো অকাট্য আয়াত। কোনো আয়াতই রহিত নয়। কেননা কাফেররা যখন বন্দি হয়ে আমাদের হাতে আসবে, তখন মুসলিম শাসনকর্তা চারটি ধারার মধ্য থেকে যে কোনোটি প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি উপযুক্ত মনে করলে বন্দিদেরকে হত্যা করবেন, উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাদেরকে গোলাম ও বাঁদী করে নেবেন, মুক্তিপণ নেওয়া উপযুক্ত মনে করলে অর্থকড়ি নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দিদের বিনিময়ে ছেড়ে দেবেন। অথবা কোনোরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেবেন। এরপর কুরতুবী লিখেন :

وَهٰذَا الْقَوْلُ يُرْوٰى مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَاَبِىْ عُبَيْدٍ وَحَكَاهُ الطَّحَاوِىُّ مَذْهَبًا عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالْمَشْهُوْرُ مَا قَدَّمْنَاهُ.

মদীনার আলেমগণ তাই বলেন এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী ও আবূ ওবায়েদ (র.)-এর উক্তি। ইমাম তাহাভী, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মত সেটিই যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে মুসলিম শাসনকর্তার চারটি ক্ষমতা : উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা যুদ্ধবন্দিদেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকেও গোলাম বানাতে পারবেন। এই প্রশ্নে উম্মতের সবাই একমত। মুক্তিপণ নিয়ে অথবা মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে যদিও কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশের মতে এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ।

ইসলামে দাসত্বের আলোচনা : এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যুদ্ধবন্দিদের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে তো ফিকহবিদগণের মধ্যে কিছু না কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু হত্যা করা ও গোলাম বানানোর বৈধতার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করা উভয় ব্যবস্থাই জায়েজ। এমতাবস্থায় কুরআন পাকে এই ব্যবস্থাদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়নি কেন? শুধু মুক্ত করে দেওয়ার দুই ব্যবস্থাই কেন উল্লেখ করা হলো? ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এখানে কেবল এমন দুটি ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে যা সর্বত্র ও সর্বদা বৈধ। দাসে পরিণত করার কথা উল্লেখ না করার কারণ এই যে, আরবের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি নেই এবং পঙ্গু ইত্যাদি লোকের হত্যাও জায়েজ নয়। এতদ্ব্যতীত হত্যার কথা পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে। -[তাফসীরে-কাবীর, ৭ম খণ্ড, ৫০৮ পৃ.]

দ্বিতীয় কথা এই যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করার বৈধতা সুবিদিত ও সুপরিজ্ঞাত ছিল। সবাই জানত যে, এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ। এর বিপরীতে মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি বদর যুদ্ধের সময় রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। এখন এস্থলে মুক্ত ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল! তাই এরই দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুক্তিপণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। যেসব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই বৈধ ছিল সেগুলোকে এস্থলে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এসব আয়াতদৃষ্টে একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিতই হয়ে যেত, তবে কুরআন ও হাদীসের এক না এক জায়গায় এর নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত হতো। যদি আলোচ্য আয়াতই নিষেধাজ্ঞার স্থলাভিষিক্ত হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পর কোরআন ও হাদীসের অকৃত্রিম অনুসারী সাহাবায়ে কেরাম অসংখ্য যুদ্ধবন্দীদের কেন দাসে পরিণত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে দাসে পরিণত করার কথা এত অধিক পরিমাণে ও পরম্পরা সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের সর্ববৃহৎ সংরক্ষক হয়ে দাসত্বের অনুমতি কিরূপে দিল? প্রকৃতপক্ষ ইসলামের বৈধকৃত দাসত্বকে জগতে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করে নেওয়ার কারণেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অথচ ইসলাম দাসদেরকে যেসব অধিকার দান করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল নামেই দাস রয়ে গেছে। নতুবা তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে দেখা যায় যে, অনেক অবস্থায় যুদ্ধবন্দিদের সাথে এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ মসিও গোস্তাও লিবান তদীয় "আরবের তমদ্দুন" গ্রন্থে লিখেন :

"বিগত ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে লিখিত আমেরিকার বই-পুস্তক পাঠে অভ্যস্ত কোনো ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে যদি 'দাস' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তবে তার মানসপটে এমন অসহায় একদল মানুষের চিত্র ভেসে উঠে যাদেরকে শিকল দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে, গলায় বেড়ি পরানো হয়েছে এবং বেত মেরে মেরে হাঁকানো হচ্ছে। তাদের খোরাক প্রাণটা কোনোরূপে দেহে আটকে রাখার জন্যেও যথেষ্ট নয়। বসবাসের জন্য অন্ধকারময় কক্ষ ছাড়া তারা আর কিছুই পায় না। আমি এখানে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এই চিত্র কতটুকু সঠিক এবং ইংরেজরা বিগত বছরগুলোতে আমেরিকায় যা কিছু করেছে তা এই চিত্রের অনুরূপ কি না। ..... কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে, মুসলমানদের কাছে দাসের যে, চিত্র তা খ্রিস্টানদের চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। –[ফরীদ ওয়াজদী প্রণীত দায়েরাতুল-মা'আরেফ থেকে উদ্ধৃত। ৪র্থ খণ্ড, ১৭৯ পৃ]

প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক অবস্থায় বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার চাইতে উত্তম কোনো পথ থাকে না। কেননা দাসে পরিণত না করা হলে যৌক্তিক দিক দিয়ে তিন অবস্থাই সম্ভবপর– হয় হত্যা করা হবে, না হয় মুক্ত ছেড়ে দেওয়া হবে, না হয় যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখা হবে। প্রায়ই এই তিন অবস্থা উপযোগিতার পরিপন্থি হয়। কোনো কোনো বন্দী উন্নত প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে, এ কারণে হত্যা করা সমীচীন হয় না। মুক্ত ছেড়ে দিলে অনেক ক্ষেত্রেই এমন আশঙ্কা থাকে যে, স্বদেশে পৌঁছে সে মুসলমানদের জন্য পুনরায় বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। এখন এই দুই অবস্থাই অবশিষ্ট থাকে- হয় তাকে যাবজ্জীবন বন্দী রেখে আজকালকার মতো কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটক রাখা, না হয় তাকে দাসে পরিণত করে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানো এবং তার মানবিক অধিকারগুলোও পুরোপুরি প্রদান করা। চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা কোনটি? বিশেষতঃ দাসদের সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা আরও সহজ। দাসদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি রাসূলে কারীম ﷺ নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مَايَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ.

তোমাদের দাসেরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব, যার ভাই তার অধীনস্থ হয়, সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে এবং তাকে যেন এমন কাজের ভার না দেয় যা তার জন্য অসহনীয় হয়। যদি এমন কাজের ভার দিতেই হয়, তবে যেন সে নিজেও তাকে সাহায্য করে। –[বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ]

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম দাসদেরকে যে মর্যাদা দান করেছে তা স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের মর্যাদার প্রায় কাছাকাছি। সেমতে অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম দাসদেরকে শুধু বিবাহ করার অনুমতিই দেয়নি; বরং মালিকদেরকে وَانْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ আয়াতের মাধ্যমে জোর তাগিদও করেছে। এমনকি তারা স্বাধীন মুক্ত নারীদেরকেও বিবাহ করতে পারে। তারা জেহাদেও অংশগ্রহণ করতে পারে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদের অংশ স্বাধীন মুজাহিদদের সমান। শত্রুকে যে কোনো ধরনের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে তাদের উক্তিও তেমনি ধর্তব্য যেমন স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের উক্তি।

কুরআন ও হাদীস তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশাবলি এত অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে একত্রে সন্নিবেশিত করলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে যেতে পারে। হযরত আলী (রা.) বলেন, দু'জাহানের সরদার হযরত রাসূলে মকবূল ﷺ -এর পবিত্র মুখে যে কথাগুলো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছিল এবং যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল এই: اَلصَّلٰوةَ اَلصَّلٰوةَ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ অর্থাৎ, নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখ, নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তোমাদের অধীনস্থ দাসদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। –[আবূ দাউদ]

ইসলাম দাসদেরকে শিক্ষাদীক্ষা অর্জনেরও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আমলে ইসলামি সম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশের জ্ঞান-গরিমায় যারা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই দাসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ প্রথাটি ক্রমে বিলীন করা অথবা হ্রাস করার জন্যে দাসদেরকে মুক্ত করার ফজিলত কুরআন ও হাদীসে ভূরি ভূরি বর্ণিত হয়েছে, যাতে মনে হয় যেন অন্য কোনো সৎকর্ম এর সমকক্ষ হতে পারে না। ফিকহের বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদেরকে মুক্ত করার জন্যে বাহানা তালাশ করা হয়েছে। রোজার কাফ্ফারা, হত্যার কাফ্ফারা, যেহারের কাফ্ফারা ও কসমের কাফ্ফরার মধ্যে দাস মুক্ত করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি দাসকে অন্যায়ভাবে চপেটাঘাত করে, তবে এর কাফ্ফারা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করে দেওয়া। –(মুসলিম) সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল তাঁরা অকাতরে প্রচুর সংখ্যক দাস মুক্ত করতেন। "আন্নাজমুল ওয়াহ্হাজ" -এর গ্রন্থকার কোনো কোনো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন :

হযরত আয়েশা (রা.) - ৬৯, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা.) ১০০, হযরত ওসমান গণী (রা.) - ২০, হযরত আব্বাস (রা.) - ৭০, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)- ১০০০, হযরত যূল কা'লা হিমাইয়ারী (রা.)- ৮০০০ (মাত্র একদিনে), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (র.)- ৩০, ০০০ (ফতহুল আল্লাম, টীকা বুলুগুল মারাম নবাব সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃ.) এ থেকে জানা যায় যে, মাত্র সাতজন সাহাবী, ৩৯, ২৫৯ জন দাসকে মুক্ত করেছেন। বলাবাহুল্য, অন্য আরও হাজারো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশি হবে। মোটকথা, ইসলাম দাসত্বের ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী সংস্কার সাধন করেছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের দাসত্বকে অন্যান্য জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এসব সংস্কার সাধনের পর যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি তাদের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ, ইসলামি রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত বিবেচনা করে, তবে তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারে। এরূপ করা মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব নয়। বরং কোরআন ও হাদীসের সমষ্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই উত্তম বোঝা যায়। দাসে পরিণত করার এই অনুমতিও ততক্ষণ, যতক্ষণ শত্রুপক্ষের সাথে এর বিপরীত কোনো চুক্তি না থাকে। যদি শত্রুপক্ষের সাথে চুক্তি হয়ে যায় যে, তারা আমাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করব না, তবে এই চুক্তি মেনে চলা অপরিহার্য হবে। বর্তমান যুগে বিশ্বের অনেক দেশ এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। কাজেই যেসব মুসলিম দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাদের জন্যে চুক্তি বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোনো বন্দীকে দাসে পরিণত করা বৈধ হবে না।

জেহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি রহস্য : وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ –এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জেহাদের সিদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে একটি রহমত। কেননা জেহাদকে আসমানি আজাবের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ কুফর, শিরক ও খোদাদ্রোহিতার শাস্তি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে আসমান ও জমিনের

আজাব দ্বারা দেওয়া হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে এরূপ হতে পারত, কিন্তু রাহমাতুল্লিল-আলামীনের কল্যাণে এই উম্মতকে এ ধরনের আজাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর স্থলে জেহাদ সিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক আজাবের তুলনায় অনেক নমনীয়তা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। প্রথমত এই যে, ব্যাপক আজাবে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জেহাদে নারী ও শিশুরা তো নিরাপদ থাকেই, পরন্তু পুরুষও তারাই আক্রান্ত হয়, যারা আল্লাহর দ্বীনের হেফাজতকারীদের মোকাবিলায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে। তাদের মধ্যেও সবাই নিহত হয় না; বরং অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক হয়ে যায়। জেহাদের দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে উভয়পক্ষের অর্থাৎ, মুসলমান ও কাফেরদের পরীক্ষা হয়ে যায় যে, কে আল্লাহর নির্দেশে নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় এবং কে অবাধ্যতা ও কুফরে আটল থাকে কিংবা ইসলামের উজ্জ্বল প্রমাণাদি দেখে ইসলাম কবুল করে।

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ –সূরার প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, যারা কুফরি ও শিরক করে এবং অপরকেও ইসলাম থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিবেন; অর্থাৎ, তারা যেসব সদকা-খয়রাত ও জনহিতকর কাজ করে, শিরক ও কুফরের কারণে সেগুলোর কোনো ছওয়াব তারা পাবে না। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তাদের কর্ম বিনষ্ট হয় না; অর্থাৎ তারা কিছু গোনাহ করলেও সেই গোনাহের কারণে তাদের সৎকর্ম হ্রাস পায় না। বরং অনেক সময় তাদের সৎকর্ম তাদের গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ –এতে শহীদের জন্য দু'টি নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। (এক) আল্লাহ তাকে হেদায়েত করবেন, (দুই) তার সমস্ত অবস্থা ভালো করে দেবেন। অবস্থা বলে দুনিয়া ও আখেরাত-উভয় জাহানের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এই যে, যে ব্যক্তি জেহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের ছওয়াবের অধিকারী হবে। আখেরাতে এই যে, সে কবরের আজাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানি থেকে মুক্তি পাবে। কিছু লোকের হক তার জিম্মায় থেকে গেলে আল্লাহ তা'আলা হকদারদেরকে তার প্রতি রাজি করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। –(মাযহারী) শহীদ হওয়ার পর হেদায়েত করার অর্থ এই যে, তাদেরকে 'মনযিলে-মকসূদ' অর্থাৎ, জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন; যেমন কুরআনে জান্নাতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে পৌঁছে একথা বলবে: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا অর্থাৎ, আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাদিগকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ –এ হচ্ছে একটি তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ, তাদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌঁছানো হবে না; বরং তাদের অন্তরে আপনা-আপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের নিয়ামত তথা হুর ও গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তারা চিরকাল তাদের মধ্যে বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে অসুবিধা ছিল। কারণ জান্নাত ছিল একটি নতুন জগৎ। সেখানে নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেওয়ার মধ্যে ও সেখানকার বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছুকাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সেই আল্লাহর কসম, যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন, তার চাইতেও বেশি জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গ হবে। –(মাযহারী) কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জান্নাতীর জন্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। সে জান্নাতে তার স্থান বলে দেবে এবং সেখানকার সঙ্গিনীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا –এখানে মক্কার কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেমন আজাব এসেছে, তেমনি তোমাদের উপরও আসতে পারে। কাজেই তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না।

وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ - مَوْلٰى শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অভিভাবক। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর আরেক অর্থ মালিক। কুরআনের অন্যত্র কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ - এতে আল্লাহ তা'আলাকে কাফেরদেরও মাওলা বলা হয়েছে। কারণ এখানে মাওলা শব্দের অর্থ মালিক। আল্লাহ তা'আলা সবারই মালিক। মুমিন-কাফের কেউ এই মালিকানার বাইরে নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَثْخَنْتُمُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِثْخَانٌ মূলবর্ণ (ث ـ خ ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– রক্ত স্রোত বইয়ে দিবে।

شُدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার شَدٌّ মূলবর্ণ (ش ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– দৃঢ়রূপে বেধে ফেল।

اَوْزَارَهَا : এটা وِزْرٌ-এর বহুবচন। অর্থ– তাদের অস্ত্র। তাদের বোঝা।

دَمَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَدْمِيْرٌ মূলবর্ণ (د ـ م ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– ধ্বংস নিপতিত করেছেন।

لَقِيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَللِّقَاءُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা সম্মুখীন হও, সাক্ষাৎ কর।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى এবং মহমুজ লাম অর্থ– চাইতেন। ইচ্ছা করতেন।

قُتِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَتْلُ মূলবর্ণ (ق ـ ت ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– নিহত হয়।

يُصْلِحُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِصْلَاحُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– ঠিক রাখবেন।

عَرَّفَهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْرِيْفُ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– জানিয়ে ছিলেন।

اٰمَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ء ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– ঈমান এনেছে।

يُثَبِّتُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَثْبِيْتٌ মূলবর্ণ (ث ـ ب ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– অটল রাখবেন।

اَعْمَالَهُمْ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে عَمَلٌ অর্থ– আমল।

اَحْبَطَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِحْبَاطُ মূলবর্ণ (ح ـ ب ـ ط) জিনস صحيح অর্থ– বিফল করেছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ : এখানে اَلَّذِيْنَ হলো মুবতাদা আর كَفَرُوْا বাক্যটি হলো সেলাহ। আর صَدُّوْا টা كَفَرُوْا-এর উপর আতফ হয়েছে। আর عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ টা صَدُّوْا-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর اَضَلَّ হলো ফে'ল তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ ফায়েল যা اللّٰهِ-এর দিকে ফিরেছে। আর اَعْمَالَهُمْ হলো মাফউলে বিহী। আর পূর্ণ বাক্যটি اَلَّذِيْنَ মুবতাদার খবর হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾

১২. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে; আর যারা কাফের তারা (পৃথিবীতে শুধু) সুখ-সম্পদ উপভোগ করছে এবং এমনভাবে খাচ্ছে যেমন চতুষ্পদ জন্তুগুলো খায়, বস্তুত দোজখই তাদের আবাসস্থল।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

১৩. আর বহু জনপদ এমন ছিল, যা শক্তিতে আপনার এ জনপদ অপেক্ষা অধিকতর ছিল, যার অধিবাসীরা আপনাকে দেশ হতে বহির্গত করে দিয়েছে, আমি তাদেরকেও (ঐ প্রাচীন কাফেরদেরকেও) ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন কেউ তাদের সহায় হয়নি।

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴿١٤﴾

১৪. অনন্তর যে নিজ প্রতিপালকের উজ্জ্বল পথে রয়েছে সে কি তার সমতুল্য হতে পারে, যার নিকট নিজের অপকর্মসমূহ উত্তম বলে মনে হয় এবং যারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে?

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ

১৫. মুত্তাকীগণকে যে বেহেশতের অঙ্গীকার করা হয়েছে তার অবস্থা এই- তাতে এমন পানির নহরসমূহ রয়েছে যা অপরিবর্তনীয় এবং দুগ্ধের নহরসমূহ রয়েছে যার স্বাদ একটুও পরিবর্তিত হবে না, আর শরাবের বহু নহর রয়েছে যা পানকারীদের নিকট বড় সুস্বাদু বোধ হবে

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে جَنَّاتٍ এমন উদ্যানসমূহে تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে; وَالَّذِينَ كَفَرُوا আর যারা কাফের يَتَمَتَّعُونَ তারা (পৃথিবীতে শুধু) সুখ-সম্পদ উপভোগ করছে وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ এবং এমনভাবে খাচ্ছে যেমন চতুষ্পদ জন্তুগুলো খায় وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ বস্তুতঃ দোজখই তাদের আবাস স্থল।

১৩. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ আর বহু জনপদ এমন ছিল هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ যা শক্তিতে আপনার এ জনপদ অপেক্ষা অধিকতর ছিল الَّتِي أَخْرَجَتْكَ যার অধিবাসীরা আপনাকে দেশ হতে বহির্গত করে দিয়েছে أَهْلَكْنَاهُمْ আমি তাদেরকেও ধ্বংস করে দিয়েছি فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ তখন কেউই তাদের সহায় হয়নি।

১৪. أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ অনন্তর যে নিজ প্রতিপালকের উজ্জ্বল পথে রয়েছে সে কি তার সমতুল্য হতে পারে كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ যার নিকট নিজের অপকর্মসমূহ উত্তম বলে মনে হয় وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم এবং যারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে;

১৫. مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ মুত্তাকীগণকে যে বেহেশতের অঙ্গীকার করা হয়েছে তার অবস্থা এই فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ তাতে এমন পানির নহরসমূহ রয়েছে যা অপরিবর্তনীয় وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ এবং দুগ্ধের নহরসমূহ রয়েছে لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ যার স্বাদ একটুও পরিবর্তিত হবে না وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ আর শরাবের বহু নহর রয়েছে لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ যা পানকারীদের নিকট বড় সুস্বাদু বোধ হবে

وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾

** এবং মধুর বহু নহর রয়েছে যা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার; এবং সেখানে তাদের জন্য সকল প্রকারের ফল থাকবে, আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ক্ষমা রয়েছে; এরা কি তাদের ন্যায় হতে পারে যারা সর্বদা দোজখে থাকবে, আর তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, ফলে তা তাদের নাড়িভুঁড়িগুলোকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলবে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰۤى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۟ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٦﴾

১৬. আর কতিপয় লাক এমন আছে যারা আপনার কথার প্রতি কর্ণপাত করে, এমনকি যখন তারা আপনার নিকট হতে বের হয়ে যায়, তখন অন্যান্য জ্ঞানবান সাহাবীদেরকে বলে, তিনি এখন কি কথা বলেছিলেন? এরাই ঐ লোক যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে।

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٧﴾

১৭. আর যারা সৎ পথে রয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে আরও অধিক হেদায়েত দান করেন এবং তাদেরকে তাদের পরহেজগারীর তাওফীক দান করে থাকেন।

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٨﴾

১৮. অতএব, এরা কেবল কিয়ামতের প্রতীক্ষা করছে, যেন তা তাদের উপর অকস্মাৎ এসে পড়ে, সুতরাং তার লক্ষণগুলো তো এসে গেছে, অতএব, যেদিন কিয়ামত তাদের সম্মুখে এসে পড়বে, তখন তাদের বুঝার সুযোগ থাকবে কোথায়?

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى এবং মধুর বহু নহর রয়েছে যা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ এবং সেখানে তাদের জন্য সর্বপ্রকার ফল থাকবে وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা রয়েছে كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ এরা কি তাদের ন্যায় হতে পারে যারা সর্বদা দোজখে থাকবে وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا আর তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ফলে তা তাদের নাড়িভুড়ি গুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবে।

১৬. وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ আর কতিপয় লোক এমন আছে যারা আপনার কথার প্রতি কর্ণপাত করে حَتّٰۤى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ এমন কি যখন তারা আপনার নিকট হতে বের হয়ে যায় قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ তখন অন্যান্য জ্ঞানবান সাহাবীদেরকে বলে مَاذَا قَالَ اٰنِفًا তিনি এখন কি কথা বলে ছিলেন اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ এরাই ঐ লোক যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন وَاتَّبَعُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ আর তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে।

১৭. وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا আর যারা সৎ পথে রয়েছে زَادَهُمْ هُدًى আল্লাহ তাদেরকে আরো অধিক হেদায়েত দান করেন وَاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ এবং তাদেরকে তাদের পরহেজগারীর তৌফিক দান করে থাকেন।

১৮. فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ এতএব, এরা কেবল কিয়ামতের প্রতীক্ষা করছে اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً যেন তা তাদের উপর অকস্মাৎ এসে পড়ে فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا সুতরাং তার লক্ষণগুলো তো এসে গেছে فَاَنّٰى لَهُمْ অতএব, তখন তাদের বুঝার সুযোগ থাকবে কোথায় اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ যেদিন কিয়ামত তাদের সম্মুখে এসে পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ [١٣]

শানে নুযূল : হযরত কাতাদাহ ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, হযরত নবী করীম ﷺ যখন হিজরত করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে সাউর গুহার দিকে বের হয়ে গেলেন, তখন মক্কার দিকে রুখ করে বললেন اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ وَاَنْتَ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَيَّ وَلَوْلَا الْمُشْرِكُوْنَ اَهْلُكَ اَخْرَجُوْنِيْ لَمَا خَرَجْتُ مِنْكَ আল্লাহর কসম মক্কা নগরী, তুমি আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়তম নগরী, তুমি আমার নিকটও অত্যন্ত প্রিয়তম নগরী, তোমার অধিবাসী মুশরিকরা আমাকে যদি বহিষ্কার না করত তাহলে আমি তোমাদের থেকে কখনও বের হতাম না । হযরত রাসূল ﷺ -এর সে আবেগ ভরা হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে সান্ত্বনা দান স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২০০/১৬, রূহুল মা'আনী ৪৭/২৬/১৩, ইবনে কাছীর ১৭৫/৪, ফতহুল কাদীর ৩৬/৫]

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ حَتّٰى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ [١٦]

শানে নুযূল : ইবনে মুনযির হযরত ইবনে জুরাইজ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে বসে ঈমানদার ও মুনাফিক সম্প্রদায়ের লোকজনেরা সমানভাবে ওয়াজ নছিহত শ্রবণ করত। সুতরাং যারা ঈমানদার ছিল তারা মনে প্রাণে ওয়াজ শ্রবণ করত এবং রাসূল ﷺ যে, সম্পর্কে আদেশ করতেন তার উপর তারা সহযোগিতা করত। মুনাফিকরাও ওয়াজ নাসিহত শুনত কিন্তু তারা তা শুনে রাসূল ﷺ -এর প্রতি কোনো প্রকারের সহযোগিতা করত না। বরং যখন তারা বের হতো, তখন ঈমানদারদেরকে তারা উপহাস রূপে বলত তিনি এ মুহূর্তে কি বলেছেন? তাদের এহেন হঠকারিতা মূলক আচরণের বাস্তব প্রতিকৃতির মূখোশ উম্মোচন করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[দুররে মানছূর ৪৯/৬]

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ - فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ الخ -

দুনিয়ার পানির রং গন্ধ ও স্বাদ কোনো কোনো সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। দুনিয়ার দুধও তেমনি বাসি হয়ে যায়। দুনিয়ার শরাব বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে। তবে সাময়িক নেশার কারণে তা পান করা হয়; যেমন তামাক কড়া হওয়া সত্ত্বেও সেবন করা হয় এবং খেতে অভ্যাস হয়ে যায়। জান্নাতের পানি, দুধ ও শরাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সবই পরিবর্তন ও বিস্বাদ থেকে মুক্ত। জান্নাত অন্যান্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু থেকেও মুক্ত, একথা সূরা সাফফাতের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে : لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ এমনিভাবে দুনিয়ার মধুর মধ্যে মোম ও আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের মধু পরিশোধিত হবে। বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, জান্নাতে আক্ষরিক অর্থেই পানি, দুধ, শরাব ও মধুর চারি প্রকার নহর রয়েছে। এখানে রূপক অর্থ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এটা পরিষ্কার যে, জান্নাতের বস্তুসমূহকে দুনিয়ার বস্তুসমূহের অনুরূপ মনে করা যায় না। সেখানকার প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ ও আনন্দ ভিন্নরূপ হবে, যার নজির পৃথিবীতে নেই।

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا -

اَشْرَاطُ শব্দের অর্থ আলামত বা লক্ষণ। খাতামুন্নাবিয়ীন ﷺ -এর আবির্ভাবই কেয়ামতের প্রাথমিক একটি আলামত। কেননা খতমে-নবুয়তও কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। এমনিভাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মু'জিযাকে কুরআনে اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাও কেয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। এসব প্রাথমিক আলামত কুরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যান্য আলামত সহীহ হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছেন- নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কিয়ামতের সুস্পষ্ট আলামত : জ্ঞানচর্চা উঠে যাবে। অজ্ঞানতা বেড়ে যাবে। ব্যভিচারের প্রসার হবে। মদ্যপান বেড়ে যাবে। পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে; এমন কি, পঞ্চাশ জন নারীর ভরণ-পোষণ একজন পুরুষে করবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, ইলম হ্রাস পাবে এবং মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে। –[বোখারী, মুসলিম]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন যুদ্ধলব্ধ মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে এবং আমানতকে যুদ্ধলব্ধ মাল সাব্যস্ত করা হবে (অর্থাৎ, হালাল মনে করে খেয়ে ফেলবে।) জাকাতকে জরিমানা মনে করা

হবে (অর্থাৎ, আদায় করতে কুণ্ঠিত হবে।) ইলমে-দ্বীন পার্থিব স্বার্থের জন্যে অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য ও জননীর অবাধ্যতা করতে শুরু করবে এবং বন্ধুকে নিকটে রাখবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে হট্টগোল শুরু হবে, পাপাচারী ব্যক্তি কওমের নেতা হয়ে যাবে; হীনতম ব্যক্তি জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে, অত্যাচারের ভয়ে দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে, গায়িকা নারীদের গান-বাদ্য ব্যাপক হয়ে যাবে, বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, মদ্যপান করা হবে এবং উম্মতের সর্বশেষ লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে, তখন তোমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অপেক্ষা করো : একটি রক্তিম ঝড়ের, ভূমিকম্পের, মানুষের মাটিতে প্রোথিক হয়ে যাওয়ার, আকার-আকৃতি বিকৃতি হয়ে যাওয়ার, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণের এবং কিয়ামতের অন্যান্য আলামতের, যেগুলো একের পর এক এভাবে প্রকাশ পাবে, যেমন মুতির মালা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একটি একটি করে মাটিতে খসে পড়ে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُدْخِلُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِدْخَالُ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– দাখিল করবেন।

يَتَمَتَّعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّمَتُّعُ মূলবর্ণ (م - ت - ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা সুখ সম্পদ উপভোগ করছে।

اَخْرَجَتْكَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِخْرَاجُ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ– আপনাকে বহির্গত করে দিয়েছে।

اٰسِنٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ ـ سَمِعَ মাসদার أَسَنٌ মূলবর্ণ (ء - س - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– পচনশীল।

مُصَفًّى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْفِيَةٌ মূলবর্ণ (ص - ف - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আলোকিত করা। নির্মল। খাঁটি।

سُقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّقْىُ মূলবর্ণ (س - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাদেরকে পান করানো হবে।

اَمْعَاءَهُمْ : এটা مِعًى -এর বহুবচন। অর্থ– নাড়ী-ভূঁড়ি, পাকস্থলী। তাদের নাড়ী-ভূঁড়ি।

قَالُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বলল।

قُلُوْبُهُمْ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে قَلْبٌ অর্থ– অন্তরসমূহ।

زَادَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزِّيَادَةُ মূলবর্ণ (ز - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ– আরো অধিক।

يَنْظُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّظَرُ মূলবর্ণ (ن - ظ - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রতীক্ষা করছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ : এখানে وَاَنْهٰرٌ টা পূর্ববর্তী اَنْهٰرٌ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর مِّنْ عَسَلٍ হলো সিফত। আর مُّصَفًّى হলো عَسَلٍ -এর সিফত। আর واو হলো হরফে আতফ। আর لَهُمْ হলো خبر مقدم আর فِيْهَا টা مُسْتَقَرٌّ উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে متعلق আর মুবতাদা উহ্য রয়েছে। তথা اَصْنَافٌ আর مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ টা উহ্য মুবতাদার সিফত হয়েছে। আর مَغْفِرَةٌ টা اَصْنَافٌ -এর উপর আতফ হয়েছে। অথবা এটা মুবতাদা এবং তার খবর উহ্য রয়েছে অর্থাৎ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ আর مِنْ رَّبِّهِمْ টা مَغْفِرَةٌ -এর সিফত হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন : ৭ম খণ্ড: পৃ. ১৯৮]

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾

১৯. সুতরাং আপনি বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই, আর আপনি স্বীয় ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন এবং সমস্ত মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্যও; আর আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্বন্ধে খুব অবহিত আছেন।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿٢٠﴾

২০. এবং মু'মিনগণ বলে থাকে যে, কোনো সূরা কেন নাজিল হলো না, অতঃপর যখন কোনো স্পষ্ট (বিষয়ের) সূরা নাজিল হয় এবং তাতে জেহাদেরও উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন যে, তারা আপনার দিকে এমনভাবে তাকায়, যেমন কেউ মৃত্যুকালে অচেতন অবস্থায় তাকায়; সুতরাং তাদের দুর্ভাগ্য শীঘ্রই আগমন করবে,

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۫ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۫ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

২১. তাদের আনুগত্য ও কথাবার্তা জানা আছে। অনন্তর যখন সমুদয় কাজ প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন যদি এরা (ঈমানের দাবিতে) আল্লাহর নিকট সত্যবাদী থাকত, তবে তাদের পক্ষে অতি উত্তম হতো।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْۤا اَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

২২. সুতরাং যদি তোমরা (যুদ্ধ হতে) সরে থাক, তবে কি তোমাদের এ সম্ভাবনা আছে যে, তোমরা ভূপৃষ্ঠে বিসম্বাদ সৃষ্টি কর এবং পরস্পর আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন করে ফেল?

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. فَاعْلَمْ সুতরাং আপনি বিশ্বাস রাখুন যে اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ আর আপনি স্বীয় ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ এবং সমস্ত মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্য وَاللّٰهُ يَعْلَمُ আর আল্লাহ খুব অবহিত আছেন مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্বন্ধে।

২০. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং মুমিনগণ বলে থাকে যে لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ কোনো সূরা কেন নাজিল হলো না فَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ অতঃপর যখন কোনো স্পষ্ট (বিষয়ের) সূরা নাজিল হয় وَذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ এবং তাতে জিহাদেরও উল্লেখ থাকে رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ তখন যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন যে يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ তারা আপনার দিকে এমনভাবে তাকায় نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ যেমন কেউ মৃত্যুকালে অচেতন অবস্থায় তাকায় فَاَوْلٰى لَهُمْ সুতরাং তাদের দুর্ভাগ্য শীঘ্রই আগমন করবে।

২১. طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ তাদের আনুগত্য ও কথাবার্তা জানা আছে فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ অনন্তর যখন সমুদয় কাজ প্রস্তুত হয়ে যায় فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ তখন যদি এরা (ঈমানের দাবিতে) আল্লাহর নিকট সত্যবাদী থাকত لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ তবে তাদের পক্ষে অতি উত্তম হতো।

২২. فَهَلْ عَسَيْتُمْ সুতরাং তবে কি তোমাদের এই সম্ভাবনা আছে যে اِنْ تَوَلَّيْتُمْ যদি তোমরা (যুদ্ধ হতে) সরে থাক اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ তোমরা ভূপৃষ্ঠে বিসম্বাদ সৃষ্টি কর وَتُقَطِّعُوْۤا اَرْحَامَكُمْ এবং পরস্পর আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন করে ফেল।

২৩. এরাই ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে আল্লাহ নিজ রহমত হতে বিদূরিত করেছেন, অনন্তর তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহ অন্ধ করে দিয়েছেন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

২৪. তবে কি এরা কুরআনে গভীর চিন্তা করে না, নাকি অন্তরসমূহর উপর তালা লেগে রয়েছে?

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

২৫. যারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শনপূর্বক সরে পড়েছে, সৎপথকে পরিষ্কারভাবে জেনে নেওয়ার পর, শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করেছে এবং তাদেরকে শিথিল করেছে।

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾

২৬. এটা এ কারণে যে, এরা ঐ লোকদেরকে যারা আল্লাহর অবতারিত নির্দেশাবলিকে অপছন্দ করছে, বলল যে, কোনো কোনো বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুগত থাকব, আর আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন আলোচনা সম্বন্ধে খুব অবহিত আছেন।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৭. তবে তাদের কী অবস্থা হবে, যখন ফেরেশতাগণ তাদের জান কবজ করবেন (আর) মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে থাকবেন?

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ এরাই ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে আল্লাহ নিজ রহমত হতে বিদূরিত করেছেন فَأَصَمَّهُمْ অনন্তর তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ এবং তাদের চক্ষুসমূহ অন্ধ করে দিয়েছেন।

২৪. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ তবে কি এরা কুরআনে গভীর চিন্তা করে না أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا নাকি অন্তরসমূহের উপর তালা লেগে রয়েছে।

২৫. إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ যারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শনপূর্বক সরে পড়েছে مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى সৎ পথকে পরিষ্কারভাবে জেনে নেওয়ার পর الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করেছে وَأَمْلَىٰ لَهُمْ এবং তাদেরকে শিথিল করেছে।

২৬. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا এটা এ কারণে যে, এরা ঐ লোকদেরকে বলল যে لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ যারা আল্লাহর অবতারিত নির্দশনাবলিকে অপছন্দ করছে سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ কোনো কোনো বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুগত থাকব وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ আর আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন আলোচনা সম্বন্ধে খুব অবহিত আছেন।

২৭. فَكَيْفَ তবে তাদের কি অবস্থা হবে إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ যখন ফেরেশতাগণ তাদের জান কবজ করবেন يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (আর) মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে থাকবেন।

২৮. এটা এ কারণে যে, আল্লাহ যে বিষয়ে অসন্তুষ্ট, এরা তারই অনুসরণ করে চলছে এবং তাঁর সন্তুষ্টিতে বীতশ্রদ্ধ রয়েছে, সুতরাং আল্লাহ তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَاۤ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾
২৯. তারা কি ধারণা করে– যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে– আল্লাহ তাদের অন্তরের শত্রুতাকে কখনো প্রকাশ করবেন না?	اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. ذٰلِكَ এটা এ কারণে بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا এরা তারই অনুসরণ করে চলছে مَاۤ اَسْخَطَ اللّٰهَ আল্লাহ যে বিষয়ে অসন্তুষ্ট وَكَرِهُوْا এবং বীতশ্রদ্ধ রয়েছে رِضْوَانَهٗ তাঁর সন্তুষ্টিতে فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ সুতরাং আল্লাহ তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

২৯. اَمْ حَسِبَ তারা কি ধারণা করে الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ আল্লাহ কখনো প্রকাশ করবেন না اَضْغَانَهُمْ তাদের অন্তরের শত্রুতাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ. [١٩]

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত রাসূল আকরাম ﷺ কাফের গোষ্ঠীর কুফরি, মুনাফিক সম্প্রদায়ের গোপন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে মানসিকভাবে সংকীর্ণতায় ভুগছিলেন। তখন সে অশান্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২০৬/১৬]

(وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ) ١. اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ لِيَعْصِمَكَ الذُّنُوْبَ.

٢. اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اَنْ يَقَعَ مِنْكَ ذَنْبٌ.

٣. ثَبَاتٌ عَلَى التَّوْحِيْدِ وَالْاِخْلَاصِ.

٤. خِطَابٌ لَهٗ وَالْمُرَادُ بِهِ الْاُمَّةُ اَيْ اِسْتَغْفِرْ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ.

٥. اُمِرَ بِالْاِسْتِغْفَارِ لِتَقْتَدِيَ الْاُمَّةُ تَعْلِيْمًا لِلْاُمَّةِ.

(قُرْطُبِي ٢٠٢-١٢-١٠)

অনুবাদ :

১. আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার কর, আল্লাহ যেন তোমাকে গুনাহ থেকে মুক্ত রাখেন।
২. আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার কর তোমার থেকে গুনাহ প্রকাশ হওয়া হতে।
৩. একত্ববাদ একনিষ্ঠতার উপর অটল থাকার প্রার্থনা কর।
৪. সকল উম্মতকে উদ্দেশ্য করে রাসূল ﷺ কে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সকল মুসলমানের জন্যে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন।
৫. উম্মতকে তা'লীম ও শিক্ষা দেওয়ার জন্যে রাসূল ﷺ কে ইস্তেগফার নির্দেশ করা হচ্ছে আমরা যেন তার অনুসরণ করি।

শায়খুল মাকুল ওয়াল মানকূল আল্লামা শাহ আহমদ শফী সাহেব (দাঃ বাঃ) اِسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ -এর ব্যাখ্যা দান করে বলেন যে, মূলত غَفْرٌ ক্রিয়ামূল হতে এর উৎপত্তি, যার অর্থ হচ্ছে ঢাকনা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে আদেশ করেন যে, তার সিনা মুবারক সাক বা বক্ষ বিদীর্ণ করে অন্তর রাজ্য নিষ্কলুষ করা হয়েছে, সে অন্তরে যেন শয়তানি ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহ-সংশয় স্থান না পেতে পারে সে জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। নিজ গুনাহের জন্য নয়। নবী করীম ﷺ-এর কোনো গুনাহই ছিল না। অথচ জনৈক নামধারী ইসলামি চিন্তাবিদ মেধাগত ভ্রান্ততার শিকার হয়ে বলেছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নিজ দাওয়াত ও তাবলীগে ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেন।

আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানও একথা জানে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি একথা জানবেন না কেন? এমতাবস্থায় এই জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দানের অর্থ হয় এর উপর দৃঢ় ও অটল থাকা, না হয় তদনুযায়ী আমল করা। কুরতুবী বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন : তুমি কি কুরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি– فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ এতে ইলমের পর আমলের নির্দেশ রয়েছে। অন্যত্র আছে اِعْلَمُوْۤا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ আরও বলা হয়েছে : سَابِقُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে : وَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ -এরপর বলা হয়েছে فَاحْذَرُوْهُمْ এসব জায়গায় প্রথমে ইলম অতঃপর তদনুযায়ী আমল করার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ যদিও পূর্ব থেকে একথা জানতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য তদনুযায়ী আমল করা। এ কারণেই এরপর وَاسْتَغْفِرْ অর্থাৎ, এস্তেগফারের আদেশ দান করা হয়েছে। পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যদিও এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও স্থলাবিশেষে ইজতিহাদী ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। শরিয়তের আইনে ইজতিহাদী ভুল গোনাহ নয়; বরং এই ভুলেরও ছওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গম্বরগণকে এই ভুল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করে দেওয়া হয় এবং তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভুলকে, ذَنْبٌ তথা গোনাহ্ শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়; যেমন সূরা আবাসায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ কঠোর সতর্কবাণী এই ইজতিহাদী ভুলেরই একটি দৃষ্টান্ত। সূরা আবাসায় এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে যে, সেই ইজতিহাদী ভুল যদিও গোনাহ ছিল না; বরং এরও এক ছওয়াব পাওয়ার ওয়াদা ছিল; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভুলকে পছন্দ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াতে এমনি ধরনের গোনাহ বোঝা যেতে পারে।

জ্ঞাতব্য : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা বেশি পরিমাণে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ কর এবং এস্তেগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনা কর। ইবলীস বলে : আমি মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি, প্রত্যুত্তরে তারা আমাকে কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পাঠ করে ধ্বংস করেছে। এই অবস্থা দেখে আমি তাদেরকে এমন অসার কল্পনার অনুসারী করে দিয়েছি, যা তারা সৎকাজ মনে করে সম্পন্ন করে (যেমন সাধারণ বেদআতসমূহের অবস্থা তদ্রূপই।) এতে করে তাদের তওবা করারও তওফীক হয় না।

مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰكُمْ - مُتَقَلَّبٌ -এর শাব্দিক অর্থ ওলট-পলট হওয়া এবং مَثْوٰى শব্দের অর্থ অবস্থানস্থল। তফসীরবিদগণ এই শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবগুলো অর্থই এখানে উদ্দিষ্ট। কেননা প্রত্যেক মানুষের উপর দ্বিবিধ অবস্থা আসে। (এক) যে অবস্থার সাথে সে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে জড়িত হয় এবং (দুই) যে অবস্থাকে সে স্থায়ী বৃত্তি মনে করে। এমনিভাবে কোনো কোনো গৃহে মানুষ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং কোনো কোনো গৃহে স্থায়ীভাবে। আয়াতে অস্থায়ীকে مُتَقَلَّبٌ শব্দ দ্বারা এবং স্থায়ীকে مَثْوٰى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষের যাবতীয় অবস্থার খবর রাখেন।

سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ - مُحْكَمَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ মজবুত ও অনড়। এই আভিধানিক অর্থে কুরআনের প্রত্যেক সূরাই مُّحْكَمَةٌ কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় مُحْكَمٌ শব্দটি مَنْسُوْخٌ তথা রহিতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে সূরার সাথে "মাহকামাহ" সংযুক্ত করার তাৎপর্য এই যে, সূরা মনসূখ ও রহিত না হলেই আমলের সাধ পূর্ণ হতে পারে। কাতাদাহ (র.) বলেন : যেসব সূরায় যুদ্ধ ও জেহাদের বিধানাবলি বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব "মুহকামাহ" তথা অরহিত। এখানে আসল উদ্দেশ্য জেহাদের নির্দেশ ও তা বাস্তবায়ন। তাই সূরার সাথে মুহ্কামাহ্ শব্দ যুক্ত করে জেহাদের আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আসছে। –[কুরতুবী]

فَاَوْلٰى لَهُمْ আসমায়ীর উক্তি অনুযায়ী এর অর্থ قَارَبَهٗ مَا يُهْلِكُهٗ অর্থাৎ, তার ধ্বংসের কারণসমূহ আসন্ন। –[কুরতুবী]

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْۤا اَرْحَامَكُمْ

আভিধানিক দিক দিয়ে تَوَلّٰى শব্দের দুই অর্থ সম্ভবপর। (এক) মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও (দুই) কোনো দলের উপর শাসন ক্ষমতা লাভ করা। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ প্রথম অর্থ নিয়েছেন। আবূ হাইয়ান (র.) বাহরে-মুহীতে এই অর্থকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা শরিয়তের বিধানাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও- (জেহাদের বিধানও এর অন্তর্ভুক্ত), তবে এর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, তোমরা মূর্খতা যুগের প্রাচীন পদ্ধতির

অনুসারী হয়ে যাবে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। মূর্খতা যুগের প্রত্যেকটি কাজে এই পরিণতি প্রত্যক্ষ করা হতো। এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর হানা দিত এবং হত্যা ও লুটতরাজ করত। সন্তানদেরকে স্বহস্তে জীবন্ত কবরস্থ করত। ইসলাম মূর্খতা যুগের এসব কুপ্রথা মেটানোর জন্যে জেহাদের নির্দেশ জারি করেছে। এটা যদিও বাহ্যতঃ রক্তপাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সারমর্ম হচ্ছে পচা, গলিত অঙ্গকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, যাতে অবশিষ্ট দেহ নিরাময় ও সুস্থ থাকে। জেহাদের মাধ্যমে ন্যায়, সুবিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্মানিত ও সুসংহত হয়। রূহুল মা'আনী, কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে تَوَلّٰى শব্দের অর্থ নেওয়া হয়েছে "রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা লাভ করা"। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে অর্থাৎ, দেশ ও জাতির শাসনক্ষমতা লাভ করলে এর পরিণতি এ ছাড়া কিছুই হবে না যে, তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

আত্মীয়তা বজায় রাখার কঠোর তাকিদ : اَرْحَامُ শব্দটি رَحِمٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ জননীর গর্ভাশয়। সাধারণ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তি সেখান থেকেই সূচিত হয়, তাই বাকপদ্ধতিতে رَحِمٌ শব্দটি আত্মীয়তা ও সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এস্থলে তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, اَرْحَام ও ذَوِى الْاَرْحَام শব্দ কোন কোন আত্মীয়তাতে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম আত্মীয়তার হক আদায় করার জন্যে খুবই তাকিদ করেছে। বোখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও অন্য দু'জন সাহাবী থেকে এই বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ছিন্ন করবেন। এ থেকে জানা গেল যে, আত্মীয় ও সম্পর্কশীলদের সাথে কথায়, কর্মে ও অর্থ ব্যয়ে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর নির্দেশ আছে। উপরিউক্ত হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আলোচ্য আয়াতের বরাতও দিয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে কুরআনের এই আয়াতটি দেখে নাও। অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব গোনাহের শাস্তি ইহকালেও দেন এবং পরকালেও দেন, সেগুলোর মধ্যে নিপীড়ন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সমান কোনো গোনাহ্ নেই।-(আবূ দাউদ, তিরমিযী) হযরত সওবান (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আয়ুবৃদ্ধি ও রুজি-রোজগারে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়তার সাথে সহৃদয় ব্যবহার করে। সহীহ হাদীসসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপরপক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে, তবুও তার সাথে তোমার সদ্ব্যবহার করা উচিত। সহীহ্ বোখারীতে আছে–

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِى وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِىْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهٗ وَصَلَهَا অর্থাৎ, সে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী নয়, যে কেবল প্রতিদানের সমান সদ্ব্যবহার করে; বরং সেই সদ্ব্যবহারকারী, যে অপরপক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখে। –[ইবনে কাছীর]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ, যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেন। অর্থাৎ, তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখেন। হযরত ফারূকে আযম (রা.) এই আয়াত দৃষ্টেই উম্মুল ওলাদের বিক্রয় অবৈধ সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ, যে মালিকানাধীন বাঁদির গর্ভ থেকে কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে বিক্রয় করলে সন্তানের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে, যা অভিসম্পাতের কারণ। তাই এরূপ বাঁদি বিক্রয় করা হারাম। –[হাকেম]

কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাতের বিধান এবং এজিদকে অভিসম্পাত করার ব্যাপারে আলোচনা : হযরত ইমাম আহমদ (র.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ পিতাকে এজিদের প্রতি অভিসম্পাত করার অনুমতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : সে ব্যক্তির প্রতি কেন অভিসম্পাত করা হবে না, যার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে অভিসম্পাত করেছেন? তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করে বললেন : এজিদের চাইতে অধিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী আর কে হবে, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্পর্ক ও আত্মীয়তার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেনি? কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করা বৈধ নয়, যে পর্যন্ত তার কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করা নিশ্চিতরূপে জানা না যায়। হ্যাঁ, সাধারণ বিশেষণসহ অভিসম্পাত করা জায়েজ; যেমন মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত, দুষ্কৃতকারীর প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত ইত্যাদি। -(রূহুল মা'আনী, খন্ড ২৬, পৃষ্ঠা ৭২)

اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا –অন্তরে তালা লেগে যাওয়ার অর্থ তাই, যা অন্যান্য আয়াতে طَبْع ও خَتْم অর্থাৎ, মোহর লেগে যাওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অন্তর এমন কঠোর ও চেতনাহীন হয়ে যাওয়া যে, ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে। এর কারণেই মানুষ সাধারণতঃ বিরামহীনভাবে গোনাহে লিপ্ত থাকে। –[নাউযুবিল্লাহি মিনহু]

اَلشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ –এতে শয়তানকে দু'টি কাজের কর্তা বলা হয়েছে। (এক) تَسْوِيْل -এর সুশোভিত করা; অর্থাৎ, মন্দ বিষয় অথবা মন্দ কর্মকে কারও দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেওয়া। (দুই) اِمْلَاءٌ -এর অর্থ অবকাশ দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান প্রথমে তো তাদের মন্দকর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে ভালো ও শোভন করে দেখিয়েছে, এরপর তাদেরকে এমন দীর্ঘ আশায় জড়িত করে দিয়েছে, যা পূর্ণ হওয়ার নয়।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ - اَضْغَانٌ শব্দটি ضِغْنٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন শত্রুতা ও বিদ্বেষ। মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করত এবং বাহ্যতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত, কিন্তু অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে আলেমুল গায়েব জানা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কেন নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের গোপন ভেদ ও বিদ্বেষকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন? ইবনে কাছীর (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা বারাআতে তাদের ক্রিয়াকর্মের পরিচয় বলে দিয়েছেন, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, কারা মুনাফিক। এ কারণেই সূরা বারাআতকে সূরা ফাযিহা অর্থাৎ, অপমানকারী সূরাও বলা হয়। কেননা এই সূরা মুনাফিকদের বিশেষ বিশেষ আলামত প্রকাশ করে দিয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَاعْلَمْ : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– আপনি বিশ্বাস রাখুন।

اَلْمَغْشِىِّ : সীগাহ اسم مفعول বহছ واحد مذكر বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَشْىُ মূলবর্ণ (غ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আবৃত। আচ্ছাদিত।

اَوْلٰى : অর্থ– অধিক উপযুক্ত। অধিক যোগ্য। খুবই দরিদ্র। وَلِىٌّ থেকে উৎপত্তি। اسم تفضيل -এর সীগাহ।

اَصَمَّهُمْ : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصْمَامٌ মূলবর্ণ (ص - م - م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদেরকে বধির করে দেন।

اَعْمٰى : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اِعْمَاءٌ মূলবর্ণ (ع - م - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অন্ধ করে দিয়েছে।

اِرْتَدُّوْا : সীগাহ ماضى معروف বহছ جمع مذكر غائب বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِدَادٌ মূলবর্ণ (ر - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সরে পড়েছে। মুরতাদ হয়েছে।

سَوَّلَ : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْوِيْلٌ মূলবর্ণ (س - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– প্রতারিত করেছে।

تَوَفَّتْهُمْ : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مؤنث غائب বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّىُ মূলবর্ণ (و - ف - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তাদের জান কবজ করবেন।

تُقَطِّعُوْا : সীগাহ مضارع معروف বহছ جمع مذكر حاضر বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْطِيْعُ মূলবর্ণ (ق - ط - ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বিচ্ছিন্ন করে ফেল।

يَتَدَبَّرُوْنَ : সীগাহ مضارع معروف বহছ جمع مذكر غائب বাব تَفَعُّل মাসদার اَلتَّدَبُّرُ মূলবর্ণ (د - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা গভীর চিন্তা করে।

اِسْرَارَهُمْ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে سِرٌّ অর্থ– তাদের গোপন আলোচনা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ : এখানে اُولٰٓئِكَ মুবতাদা, আর اَلَّذِيْنَ হলো তার খবর لَعَنَهُمُ اللّٰهُ বাক্যটি সেলাহ। আর فاء টি হলো আতেফা وَاَصَمَّهُمْ হলো ফে'ল, যমীর উহ্য هُوَ হলো ফায়েল আর هُمْ হলো مفعول به আর اَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ হলো فَاَصَمَّهُمْ -এর উপর আতফ। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২০৯]

৩০. আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে আপনাকে তাদের পূর্ণ পরিচয় বলে দিতাম, তখন আপনি তাদেরকে তাদের আকৃতি দ্বারাই চিনতে পারতেন; আর আপনি তাদেরকে কথার ধরনের মাধ্যমে অবশ্যই চিনে নিতে পারবেন; আর আল্লাহ তোমাদের সকলের কার্যাবলি অবগত আছেন।	وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾
৩১. আর অবশ্যই আমি তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করব, তাদেরকে জেনে নেওয়ার জন্য, যারা তোমাদের মধ্যে জেহাদকারী ও দৃঢ়পদ রয়েছে, আর তোমাদের অবস্থাও যেন যাচাই করে নেই।	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾
৩২. যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রয়েছে এবং রাসূলের বিরোধিতা করেছে এরপর যে, তাদের নিকট সত্য পথ প্রকাশ হয়েছিল, তারা আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না; আর আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টাসমূহকে বিনষ্ট করে দিবেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾
৩৩. হে মু'মিনগণ! আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের অনুসরণ করে চল এবং নিজেদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. وَلَوْ نَشَآءُ আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম لَاَرَيْنٰكَهُمْ তবে আপনাকে তাদের পূর্ণ পরিচয় বলে দিতাম فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ তখন আপনি তাদেরকে তাদের আকৃতি দ্বারাই চিনতে পারতেন وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ আর আপনি তাদেরকে কথার ধরনের মাধ্যমে অবশ্যই চিনে নিতে পারবেন وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ আর আল্লাহ তোমাদের সকলের কার্যাবলি অবগত আছেন।

৩১. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ আর অবশ্যই আমি তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করব حَتّٰى نَعْلَمَ তাদেরকে জেনে নেওয়ার জন্য الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ যারা তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও দৃঢ়পদ রয়েছে وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ আর তোমাদের অবস্থাও যেন যাচাই করে নেই।

৩২. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কাফের হয়েছে وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রয়েছে وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ এবং রাসূলের বিরোধিতা করেছে مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى এরপর যে, তাদের নিকট সত্য পথ প্রকাশ হয়েছিল لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا তারা আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না; وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ আর আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টা সমূহকে বিনষ্ট করে দিবেন।

৩৩. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে মু'মিনগণ! اَطِيْعُوا اللّٰهَ আল্লাহর অনুগত হও وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ এবং রাসূলের অনুসরণ করে চল وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ এবং নিজেদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।

অনুবাদ	আয়াত
৩৪. নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে এবং অপরকেও আল্লাহর পথ হতে বিরত রেখেছে অতঃপর সে কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তবে আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾
৩৫. সুতরাং তোমরা সাহস হারিয়ো না এবং সন্ধির প্রতি আহ্বান করো না এবং তোমরাই জয়ী হবে, আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তোমাদের আমলসমূহ কখনও কম করবেন না।	فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ۖ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ۖ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾
৩৬. এ পার্থিব জীবন তো কেবল খেলা ও তামাশা মাত্র; আর যদি তোমরা ঈমান আন ও পরহেজগারি অবলম্বন করে চল, তবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান প্রদান করবেন, আর তোমাদের নিকট তোমাদের ধনসম্পদ চাইবেন না।	إِنَّمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾
৩৭. যদি তিনি তোমাদের নিকট ধনসম্পদ চান, তারপর তোমাদের নিকট চরম পর্যায়ে চাইতে থাকেন, তখন তোমরা কৃপণতা করতে থাকবে, আর আল্লাহ তোমাদের অনিচ্ছাভাব প্রকাশ করে দিবেন।	إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ এবং অপরকেও আল্লাহর পথ হতে বিরত রেখেছে ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ অতঃপর সে কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ তবে আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

৩৫. فَلَا تَهِنُوا সুতরাং তেমরা সাহস হারিয়ো না وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ এবং সন্ধির প্রতি আহ্বান করো না وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ এবং তোমরাই জয়ী হবে وَاللَّهُ مَعَكُمْ, আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সঙ্গে আছেন وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ এবং তোমাদের আমলসমূহ কখনো কম করবেন না।

৩৬. إِنَّمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ এ পার্থিব জীবন তো কেবল খেলা ও তামাশা মাত্র; وَإِنْ تُؤْمِنُوا আর যদি তোমরা ঈমান আন। وَتَتَّقُوا ও পরহেজগারী অবলম্বন করে চল يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ তবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান প্রদান করবেন وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ আর তোমাদের নিকট তোমাদের ধন সম্পদ চাইবেন না।

৩৭. إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا যদি তিনি তোমাদের নিকট ধন সম্পদ চান فَيُحْفِكُمْ তৎপর তোমাদের নিকট চরম পর্যায়ে চাইতে থাকেন। تَبْخَلُوا তখন তোমরা কৃপণতা করতে থাকবে وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ আর আল্লাহ তোমাদের অনিচ্ছাভাব প্রকাশ করে দিবেন।

৩৮. অবশ্য তোমরা এরূপ যে, তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য আহ্বান করা হলে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃপণতা করে, আর যে কৃপণতা করে বস্তুত সে স্বয়ং নিজ হতে কৃপণতা করে; আর আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং তোমরা সকলে (তাঁর) মুখাপেক্ষী, আর যদি তোমরা বিমুখ হয়ে থাক, তবে আল্লাহ তোমাদের স্থলে অপর এক সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবেন, তৎপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না।

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ অবশ্য তোমরা এরূপ যে, তোমাদেরকে আহ্বান করা হলে لِتُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃপণতা করে وَمَن يَبْخَلْ আর যে কৃপণতা করে فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ বস্তুতঃ সে স্বয়ং নিজ হতে কৃপণতা করে وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ আর আল্লাহ করো মুখাপেক্ষী নন وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ বরং তোমরা সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ আর যদি তোমরা বিমুখ হয়ে থাক يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ তবে আল্লাহ তোমাদের স্থলে অপর এক সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবেন ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم তৎপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَٰلَكُمْ -[٣٣]

শানে নুযূল–১ : বনূ আসাদ গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ-কে বলেছিল যে, আমরা নিজেরা আপনার অনুসরণ করেছি, আমরা নিজেরা আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। পক্ষান্তরে আমাদের পরিবারের লোকজন তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। তাদের এহেন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত এবং يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

শানে নুযূল–২ : আবদ ইবন হুমাইদ ও মুহাম্মদ বিন নসর আল-মারওয়াযী এবং ইবনে হাতেম আবুল আলিয়া এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণের ধারণা ছিল যে, لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ বললে অর্থাৎ তাওহীদের স্বীকৃতি দেওয়া হলে কোনো পাপই ক্ষতিকর নয়। শিরকের সাথে কোনো নেক কাজ যে ভাবে কোনো প্রকারের উপকার জনক হয় না। সাহাবায়ে কেরামের সে ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল–৩ : ইবনে জারীর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের ধারণা ছিল যে, সকল নেক কাজ কবুল হয়ে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ৭৯/২৬/১৩, ইবনে কাছীর ১৮১/৪]

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে নির্দিষ্ট করে মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে পারি এবং তাদের এমন আকার-আকৃতি বলে দিতে পারি, যা দ্বারা আপনি প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারতেন। এখানে لو অব্যয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিহ্নিত করে আপনাকে বলে দিতাম : কিন্তু রহস্য ও উপযোগিতাবশতঃ আমার সহনশীলতা গুণের কারণে তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করা পছন্দ করিনি, যাতে এই বিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে বুঝতে হবে এবং অন্তরগত অবস্থা ও গোপন বিষয়াদিকে আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। তবে আমি আপনাকে এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছি যে, আপনি মুনাফিকদেরকে তাদের কথাবার্তার ভঙ্গি দ্বারা চিনে নিতে পারবেন। –[ইবনে কাছীর]

হযরত ওসমান গনী (রা.) বলেন : যে ব্যক্তি কোনো বিষয় অন্তরে গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা তার চেহারা ও অনিচ্ছাপ্রসূত কথা দ্বারা তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ, কথাবার্তার সময় তার মুখ থেকে এমন বাক্য বের হয়ে যায়, যার ফলে তার মনের ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমনি এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কোনো বিষয় গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা তার সত্তার উপর সেই বিষয়ের চাদর ফেলে দেন। বিষয়টি ভালো হলে তা প্রকাশ না হয়ে পারে না এবং মন্দ হলেও প্রকাশ না হয়ে পারে না। কোনো কোনো হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, একদল মুনাফিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া হয়েছিল। মুসনাদে-আহমদে ওকবা ইবনে আমের (রা.)-এর হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক খোতবায় ছয়ত্রিশ জন মুনাফিকের নাম বলে তাদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ –আল্লাহ তা'আলা তো সৃষ্টির আদিকাল থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সর্বব্যাপী জ্ঞান রাখেন। এখানে জানার অর্থ প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ, যে বিষয়টি আল্লাহর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই ছিল, তার বাস্তবভিত্তিক ও ঘটনাভিত্তিক জ্ঞান হয়ে যাওয়া। –[ইবনে কাছীর]

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –আলোচ্য আয়াতও মুনাফিক এবং ইহুদি বনী-কোরায়যা ও বনী-নুযায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : এই আয়াত সেসব মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় কোরাইশ কাফেরদেরকে সাহায্য করেছে এবং তাদের বার জন লোক সমগ্র কোরাইশ বাহিনীর পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ একজন লোক গোটা কাফের বাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা করত।

وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ –এখানে "কর্ম বিনষ্ট" করার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবেন না; বরং ব্যর্থ করে দেবেন। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কুফর ও নিফাকের কারণে তাদের সৎকর্মসমূহ যেমন সদকা, খয়রাত ইত্যাদি সব নিষ্ফল হয়ে যাবে-গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ –কুরআন পাক এ স্থলে حَبْط -এর পরিবর্তে اِبْطَالٌ উল্লেখ করেছে। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা বাতিল করা এক প্রকার কুফরের কারণে প্রকাশ পায়, যা উপরের আয়াতে حَبْط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আসল কাফেরের কোনো আমল কুফরের কারণে গ্রহণযোগ্যই হয় না। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করে মুরতাদ তথা কাফের হয়ে যায়, তার ইসলামকালীন সৎকর্ম যদিও গ্রহণযোগ্য ছিল; কিন্তু তার কুফর ও ধর্মত্যাগ সেসব কর্মকেও নিষ্ফল করে দেয়।

আমল বাতিল করার দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোনো কোনো সৎকর্মের জন্যে অন্য সৎকর্ম করা শর্ত। যে ব্যক্তি এই শর্ত পূরণ করে না, সে তার সৎকর্মও বিনষ্ট করে দেয়। উদাহরণতঃ প্রত্যেক সৎকর্ম কবুল হওয়ার শর্ত এই যে, তা খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্যে হতে হবে, তাতে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব এবং নাম যশের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। কুরআন পাকে বলা হয়েছে : اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ অন্যত্র বলা হয়েছে : وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ অতএব, যে সৎকর্ম রিয়া ও নাম যশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আল্লাহর কাছে বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে সদকা-খয়রাত সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে :

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى –অর্থাৎ, অনুগ্রহের বড়াই করে অথবা গরিবকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা খয়রাতকে বাতিল করো না। এতে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহের বড়াই করলে অথবা গরিবকে কষ্ট দিলে সদকা বাতিল হয়ে যায়। হযরত হাসান বসরী (র.)-এর উক্তির অর্থ তাই হতে পারে, যা তিনি এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সৎকর্মসমূহকে গোনাহের মাধ্যমে বাতিল করো না। যেমন ইবনে জুরায়েজ বলেন : بِالرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ মুকাতিল প্রমুখ বলেন : بِالْمَنِّ কেননা আহলে সুন্নত দলের ঐকমত্যে, কুফর ও শিরক ছাড়া কোনো কবীরা গোনাহও এমন নেই, যা মুমিনদের সৎকর্ম বাতিল করে দেয়। উদাহরণতঃ কেউ চুরি করল এবং সে নিয়মিত নামাজি ও রোজাদার। এমতাবস্থায় তাকে বলা হবে না যে, তোমার নামাজ-রোজা বাতিল হয়ে গেছে– এগুলোর কাযা কর। অতএব, সেসব গোনাহ দ্বারাই সৎকর্ম বাতিল হয়, যেগুলো না করা সৎকর্ম কবুল হওয়ার জন্যে শর্ত; যেমন রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা। এরূপ উদ্দেশ্যে না করা প্রত্যেক সৎকর্ম কবুল হওয়ার জন্যে শর্ত। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত হাসান বসরী (র)-এর উক্তির অর্থ সৎকর্মের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া হবে এবং স্বয়ং সৎকর্ম বিনষ্ট হওয়া হবে না। এমতাবস্থায় এটা সকল গোনাহর ক্ষেত্রেই শর্ত হবে। যার আমলে গোনাহের প্রাধান্য থাকবে তার অল্প সৎকর্মেও আজাব থেকে রক্ষা করার মতো বরকত থাকবে না; বরং সে নিয়মানুযায়ী গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে; কিন্তু পরিণামে ঈমানের বরকতে শাস্তি ভোগার পর মুক্তি পাবে।

আমল বাতিল করার তৃতীয় প্রকার এই যে, কোনো সৎ কর্ম শুরু করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। উদাহরণত নফল নামাজ অথবা রোজা শুরু করে বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। এটাও আলোচ্য আয়াতের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত এবং নাজায়েজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব তাই। তিনি বলেন : যে সৎ কর্ম প্রথমে ফরজ অথবা ওয়াজিব ছিল না; কিন্তু কেউ তা শুরু করে দিলে সেই সৎকর্ম পূর্ণ করা আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে ফরজ হয়ে যাবে। কেউ এরূপ আমল শুরু করে বিনা ওজরে ছেড়ে দিলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ফাসেদ করে দিলে সে গুনাহগার হবে এবং কাযা করাও ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে গুনাহগারও হবে না এবং কাযাও করতে হবে না। কারণ প্রথমে যখন এই আমল ফরজ অথবা ওয়াজিব ছিল না, তখন পরেও ফরজ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু হানাফীদের মতে আয়াতের ভাষা ব্যাপক। এতে ফরজ, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি সব আমল বিদ্যমান। তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থানে অনেক হাদীস বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ

এমন শব্দের মাধ্যমেই একটি নির্দেশ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পুনরুল্লেখের এক কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে কাফেরদের পার্থিব ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে এবং এই আয়াতে পারলৌকিক ক্ষতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফেরদের বর্ণনা ছিল, যাদের মধ্যে তারাও শামিল ছিল, যারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা কাফের অবস্থায় যেমন সৎকর্ম করেছিল, তা সবই নিষ্ফল হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পরও সেগুলোর ছওয়াব পাবে না। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে এমন কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ও শিরককে আঁকড়ে রেখেছিল। তাদের বিধান এই যে, পরকালে কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ – এ আয়াতে কাফেরদেরকে সন্ধির আহ্বান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا অর্থাৎ, কাফেররা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়। এ থেকে সন্ধি করার অনুমতি বোঝা যায়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন যে, অনুমতির আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব হলে তোমরা সন্ধি করতে পার। পক্ষান্তরে এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু খাঁটি কথা এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করাও জায়েজ, যদি এতে মুসলমানদের উপযোগিতা দেখা যায় এবং কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা এর কারণ না হয়। এ আয়াতের শুরুতে فَلَا تَهِنُوْا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাপুরুষতা ও জেহাদ থেকে পলায়নের মনোভাব নিয়ে যে সন্ধি করা হয়, তাই নিষিদ্ধ। কাজেই এতেও কোনো বিরোধ নেই। করণ وَاِنْ جَنَحُوْا আয়াতের বিধানও তখনই হবে, যখন অলসতা ও কাপুরুষতার কারণে সন্ধি করা না হয়, বরং মুসলমানদের উপযোগির্তার প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়।

وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ –আর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান হ্রাস করবেন না। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে কোনো কষ্ট ভোগ কর, তার বিরাট প্রতিদান পরকালে পাবে। অতএব, কষ্ট করলেও মুমিন অকৃতকার্য নয়।

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا –সংসার আসক্তিই মানুষের জেহাদের বাধাদানকারী হতে পারে। এতে নিজের জীবনের প্রতি অসক্তি; পরিবার- পরিজনের আসক্তি এবং টাকা কড়ির আসক্তি সবই দাখিল। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু সর্বাবস্থায় নিঃশেষ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এগুলোকে আপাততঃ বাঁচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এসব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মহব্বতকে পরকালের স্থায়ী অক্ষয় নিয়ামতের মহব্বতের উপর প্রাধান্য দিও না।

وَلَا يَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ –আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কুরআনেই জাকাত ও সদকার বিধান এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। স্বয়ং এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার তাকিদ বর্ণিত হচ্ছে। তাই বাহ্যতঃ উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলে মনে হয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন : وَلَا يَسْئَلْكُمْ -এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোনো উপকারের জন্য চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য চান। এ আয়াতেও يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ শব্দ দ্বারা এ উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য বলার কারণ এই যে, পরকালে তোমরা ছওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাজে লাগবে এবং

সেখানে তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেওয়া হবে। এর নজির হচ্ছে এই আয়াত : مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ অর্থাৎ, আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমাদের কাছে নিজের জন্যে কোনো জীবনোপকরণ চাই না। আমার এর প্রয়োজনও নেই। কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, وَلَا يَسْئَلْكُمْ বলে সমস্ত ধনসম্পদ চাওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা ইবনে উয়ায়নার উক্তি। –(কুরতুবী) পরবর্তী আয়াত এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাতে বলা হয়েছে– إِن يَسْئَلْكُمُوهَا - يُحْفِ فَيُحْفِكُمْ শব্দটি إِحْفَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাড়াবাড়ি করা এবং কোনো কাজে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। এ আয়াতের মর্ম সবার মতে এই যে, আল্লাহ তোমাদের কাছে তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তোমরা কার্পণ্য করতে এবং এই আদেশ পালন তোমাদের কাছে অপ্রিয় মনে হতো। এমনকি, আদায় করার সময় মনের এই অপ্রিয় ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ত। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে وَلَا يَسْئَلْكُمْ বলে তাই বোঝানো হয়েছে, যা দ্বিতীয় আয়াতে فَيُحْفِكُمْ সংযুক্ত করে বোঝানো হয়েছে। উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি জাকাত, ওশর ইত্যাদি যেসব আর্থিক ফরজ কাজ আরোপ করেছেন, প্রথমতঃ সেগুলো স্বয়ং তোমাদেরই উপকারার্থে করেছেন– আল্লাহ তা'আলার কোনো উপকার নেই। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলা এসব ফরজ কাজের ক্ষেত্রে করুণাবশতঃ অল্প পরিমাণ অংশই ফরজ করেছেন। ফলে একে বোঝা মনে করা উচিত নয়। জাকাতে মওজুদ অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ, উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের এক অথবা ২০ ভাগের এক, ১০০ ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল মাত্র। অতএব, বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত ধন-সম্পদ চাননি। সমস্ত ধন-সম্পদ চাইলে তা স্বভাবতঃই অপ্রিয় ও বোঝা মনে হতে পারত। তাই এই অল্প পরিমাণ অংশ সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ - أَضْغَانٌ শব্দটি ضِغْنٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন বিদ্বেষ ও গোপন অপ্রিয়তা। এস্থলেও গোপন অপ্রিয়তা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে দেওয়া মানুষের কাছে স্বভাবতঃই অপ্রিয় ঠেকে, যা সে প্রকাশ করতে না চাইলেও আদায় করার সময় টালবাহানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ হয়েই পড়ে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধন-সম্পদ চাইতেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কৃপণতার কারণে যে অপ্রিয়ভাবে তোমাদের অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাই তিনি তোমাদের ধন-সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফরজ করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কৃপণতা শুরু করেছ। শেষ আয়াতে একথাই এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ অর্থাৎ, তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদের কিছু অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করার দাওয়াত দেওয়া হলে তোমাদের কেউ কেউ এতে কৃপণতা করে। এরপর বলা হয়েছেঃ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এতেও কৃপণতা করে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করে না; বরং এর মাধ্যমে সে নিজেরই ক্ষতি করে। কারণ এতে করে সে পরকালের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় এবং ফরজ তরক করার শাস্তির যোগ্য হয়। অতঃপর এই কথাটিই আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে : وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আল্লাহর পথে ব্যয় করা মানে স্বয়ং তোমাদের অভাব দূর করা। وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজের অভাবমুক্ততাকে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তোমাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ তা'আলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, তিনি তো স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেরও মুখাপেক্ষী নন। যদি তোমরা সবাই আমার বিধানাবলি পরিত্যাগ করে বস, তবে যতদিন আমি পৃথিবীকে এবং ইসলামকে বাকি রাখতে চাইব, ততদিন সত্যধর্মের হেফাজত এবং বিধানাবলি পালন করার জন্যে অন্য জাতি সৃষ্টি করব। তারা তোমাদের মতো বিধানাবলির প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না; বরং আমার পুরোপুরি আনুগত্য করবে। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : 'অন্য জাতি বলে অনারব জাতি বোঝানো হয়েছে।' হযরত ইকরামা বলেন : এখানে পারসিক ও রোমক জাতি বোঝানো হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামের সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন তাঁরা আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কোন জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা হবে, অতঃপর তারা আমাদের মতো শরিয়তের বিধানাবলির প্রতি বিমুখ হবে না? রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিসে উপস্থিত হযরত সালমান ফারেসী (রা.)-এর উরুতে হাত মেরে বললেন : সে এবং তার জাতি। যদি সত্য ধর্ম সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রেও থাকত, (যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না,) তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌঁছে সত্যধর্ম হাসিল করতো এবং তা মেনে চলত। –[তিরমিযী, হাকেম, মাযহারী]

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) ইমাম আবূ হানীফার প্রশংসায় লিখিত গ্রন্থে বলেন, আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোনো দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন। –[তাফসীরে-মাযহারীর প্রান্ত-টীকা]

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَشَاءُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ– আমি ইচ্ছা করতাম/করব।

لَتَعْرِفَنَّهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة درفعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَعْرِفَةُ মূলবর্ণ (ع - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– আপনি অবশ্যই চিনে নিতে পারবেন।

لَنَبْلُوَنَّكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– অবশ্যই আমি তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করব।

اَرَيْنَاكَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ– আপনাকে দেখাতাম/বলে দিতাম।

لَحْنٌ : اسم مفرد একবচন; বহুবচন لُحُوْنٌ ও اَلْحَانٌ আসে। অর্থ– কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গি, পরিমাণ, আওয়াজে শ্রুতিমধুরতা।

شَاقُّوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُشَاقَّةٌ মূলবর্ণ (ش - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বিরোধিতা করেছে।

لَنْ يَتِرَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف بلن বাব ضَرَبَ মাসদার وَتْرٌ মূলবর্ণ (و - ت - ر) জিনস مثال واوى অর্থ– তিনি তোমাদের কম করবেন না।

يُحْفِكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْفَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ف - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমাদের কাছে চরম পর্যায়ে চাইতে থাকেন।

لَنْ يَضُرُّوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى تاكيد بلن درفعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلضَّرُّ মূলবর্ণ (ض - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না।

اَطِيْعُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– অনুগত হও।

فَلَاتَهِنُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَهْنُ মূলবর্ণ (و - ه - ن) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা সাহস হারিয়ো না।

يَبْخَلُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْبُخْلُ মূলবর্ণ (ب - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– সে কৃপণতা করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ : এখানে اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। আর الذين হলো তার ইসম, আর كَفَرُوْا বাক্যটি হলো সেলাহ। আর كَفَرُوْا -এর উপর আতফ। আর صَدُّوْا টা عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আর صَدُّوْا -এর সাথে متعلق হয়েছে। ثُمَّ হলো হরফে আতফ। আর مَاتُوْا ফে'ল এবং যমীর ফায়েল। আর فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ হলো خبر اِنَّ ; –[ই'রাবুল কুরআন : ৭ম খণ্ড; পৃ. ২১৫]

سُوْرَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ফাতহ

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২৯, রুকূ'– ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. নিঃসন্দেহে (হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে) আমি আপনাকে এক প্রকাশ্য বিজয় প্রদান করেছি,	إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾
২. যেন আল্লাহ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং আপনার প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেন, আর আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন,	لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢﴾
৩. আর আল্লাহ আপনাকে এমন বিজয় দান করবেন যাতে কেবল সম্মানই সম্মান হয়।	وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ﴿٣﴾
৪. সেই আল্লাহ এমন, যিনি মুসলমানদের অন্তরে সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের ঈমান পূর্ববর্তী ঈমানের সাথে আরো বর্ধিত হয়; আর আসমান ও জমিনের সমস্ত সৈন্যদল আল্লাহরই জন্য; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	هُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে প্রদান করেছি فَتْحًا مُّبِيْنًا এক প্রকাশ্য বিজয়।

২. لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ যেন আল্লাহ ক্ষমা করে দেন مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ত্রুটি وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ এবং আপনার প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেন وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا আর আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

৩. وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ আর আল্লাহ আপনাকে এমন বিজয় দান করবেন। نَصْرًا عَزِيْزًا যাতে কেবল সম্মানই সম্মান হয়।

৪. هُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ সেই আল্লাহ এমন যিনি সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করেছেন فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের অন্তরে لِيَزْدَادُوْٓا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ যাতে তাদের ঈমান পূর্ববর্তী ঈমানের সাথে আরো বর্ধিত হয়; وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ আর আসমান ও জমিনের সমস্ত সৈন্যদল আল্লাহরই জন্য; وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

৫. (আর) যেন আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে প্রবেশ করান এমন বেহেশতসমূহে যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে, আর যেন তাদের পাপসমূহ মোচন করে দেন; আর এটা আল্লাহর নিকট বিরাট সফলতা।	لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۙ﴿۵﴾
৬. আর যেন আল্লাহ আজাব প্রদান করেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদরকে, যারা আল্লাহর সম্বন্ধে কুধারণা রাখে; তাদের উপর শোচনীয় সময় আসন্ন, আর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন এবং তাদেরকে রহমত হতে দূরীভূত করে দেবেন এবং তাদের জন্য তিনি দোজখ প্রস্তুত করে রেখেছেন; আর তা বড়ই নিকৃষ্ট আবাসস্থল।	وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۶﴾
৭. এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সমস্ত সৈন্যদল আল্লাহরই জন্য; আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ যেন আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে প্রবেশ করান جَنّٰتٍ এমন জান্নাতে تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ আর যেন তাদের পাপসমূহ মোচন করে দেন وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا আর এটা আল্লাহর নিকট বিরাট সফলতা।

৬. وَّيُعَذِّبَ যেন আল্লাহ আজাব প্রদান করেন الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ যারা আল্লাহর সম্বন্ধে কুধারণা রাখে عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ তাদের উপর শোচনীয় সময় আসন্ন وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ, আর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন وَلَعَنَهُمْ, এবং তাদেরকে রহমত হতে দূরীভূত করে দিবেন وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ এবং তাদের জন্য তিনি দোজখ প্রস্তুত করে রেখেছেন। وَسَآءَتْ مَصِيْرًا আর তা বড়ই নিকৃষ্ট আবাসস্থল।

৭. وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সমস্ত সৈন্যদল আল্লাহরই জন্য; وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

৮. আমি আপনাকে সাক্ষ্য প্রদানকারী ও সুসংবাদদাতা এবং ভয়প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি,	إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾
৯. যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর ও তাঁকে সাহায্য কর এবং তাঁকে সম্মান কর; আর তোমরা প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁরই তাসবীহ পাঠ করতে থাক।	لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি। شَٰهِدًا সাক্ষ্য প্রদানকারী। وَمُبَشِّرًا ও সুসংবাদদাতা। وَنَذِيرًا এবং ভয় প্রদর্শকরূপে।

৯. لِّتُؤْمِنُوا যেন তোমরা ঈমান আনয়ন কর بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ও তাঁকে সাহায্য কর এবং তাকে সম্মান কর وَتُسَبِّحُوهُ, আর তোমরা তারই তাসবীহ পাঠ করতে থাক بُكْرَةً وَأَصِيلًا প্রভাতে ও সন্ধ্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণের কারণ : কুরআন মাজিদের ৪৮ নং সূরার নাম হলো সূরা ফাতহ। فَتْح [ফাত্‌হ] শব্দের অর্থ হলো উন্মুক্ত করা ও বিজয়। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াত "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا" [নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি] এর মধ্যস্থ "فَتْحًا" [ফাতহান] অর্থ– বিজয়। আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্য সুস্পষ্ট বিজয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে নবী করীম ﷺ ও মুসলমানদেরকে এ বিজয় দান করেছেন। উক্ত সূরায় বিরাট অংশ জুড়ে হুদায়বিয়ার সন্ধির উপর আলোকপাত করেছেন। যেহেতু এ আলোচনার মাধ্যে اَلْفَتْحُ [বিজয়] শব্দটি রয়েছে সেহেতু সূরাটির নামকরণ اَلْفَتْحُ দ্বারা করা হয়েছে। যদিও সূরাটির অংশ বিশেষ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে, তথাপি এ সূরায় আলোচিত বিষয়াদির জন্য এটা যথার্থ শিরোনাম হওয়ার দাবিদার।

সূরাটির ফজিলত ও আমল : আলোচ্য সূরাটির বহু ফজিলত রয়েছে, তন্মধ্য হতে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

১. হুদায়বিয়া নামক স্থানে মহানবী ﷺ মক্কার কুরাইশ কর্তৃক বাধার সম্মুখীন হলে হযরত সুহাইল ইবনে আমরের মধ্যস্থতায় সন্ধি করত মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে আলোচ্য সূরা ফাত্‌হ অবতীর্ণ হয়। সূরাটি রজনীতে নাজিল হয়। প্রভাতে মহানবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন–
অদ্যকার রজনীতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে– اَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا [যা দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সকলবস্তু হতে উত্তম ও পছন্দনীয়।] আর তা হলো– "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا" [নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।]

২. তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধের সময় এ সূরাটি লিখে নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখলে নিরাপদে থাকা যায় এবং বিজয় সহজসাধ্য হয়।

৩. নৌকায় আরোহণ করার সময় এ সূরা তেলাওয়াতে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়ে থাকে।

৪. রমজান শরীফের চাঁদ দেখার সময় তিনবার এ সূরাটি তেলাওয়াত করলে গোটা বছর যাবত রুজি-রোজগার সুপ্রশস্ত ও সুপ্রসন্ন হয়ে থাকে।

স্বপ্নের তাবীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে সূরা ফাত্‌হ পাঠ করতে দেখে, আল্লাহ পাক তাকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করবেন। দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্য দান করবেন।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় : বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি সমাপ্তির পর নবী করীম ﷺ হযরত সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, পথিমধ্যে রজনীকালে সূরাটি নাজিল হয়। সূরাটির প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত হুদায়বিয়ার সন্ধির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

হিজরি ষষ্ঠ সনের যিলকাদ মাসে রাসূল ﷺ স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন যে, তিনি ওমরা পালন করছেন। স্বপ্নের বিষয়টি শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরাম ওমরা পালনার্থে অধীর হয়ে উঠলেন। সুতরাং প্রায় দেড় সহস্র সাহাবীদের সঙ্গে করে ওমরা ব্রত পালানার্থে নবী করীম ﷺ মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। মহানবী ﷺ অবগত হলেন যে, মক্কার কুরাইশরা মক্কায় প্রবেশে বাধা দান করবে, কাজেই নবী করীম ﷺ সাহবায়ে কেরামদের সঙ্গে করে 'যুলহুলায়ফা' নামক স্থানে অবস্থান করলেন। মক্কার মুশরিকদেরকে ব্যাপারটি বুঝানো পূর্বক তাদের সাথে সমঝোতা করার জন্য নবী করীম ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে মক্কায় প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনি বিফল হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

এরপর কুরাইশদের পক্ষ হতে একাধিক দূত এসেও ব্যাপারটির সূরাহা করতে পারেনি। সমস্যা জিইয়ে থাকল। পরিশেষে সুহাইল ইবনে আমরের মাধ্যমে সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু সন্ধির অধিকাংশ শর্তাবলিই বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের স্বার্থের বিপরীত ছিল। বাহ্যত মনে হচ্ছিল নবী করীম ﷺ অনেকটা নতি স্বীকার করেই মুশরিকদের সাথে এক অসম চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

সাহাবায়ে কেরাম– যাঁরা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করার জন্য স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুলহুলাইফার বাবলা গাছের নিচে নবী করীম ﷺ-এর হাতে হাত রেখে বায়'আত করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা ক্ষোভে অভিমানে জ্বলছিলেন। এভাবে নতজানু হয়ে সন্ধি করা অপেক্ষা যুলহুলাইফার ময়দানে জীবন বিসর্জন দেওয়া যেন তাদের নিকট শ্রেয় মনে হয়েছিল। হযরত ওমর (রা.)-এর ন্যায় দু একজন তেজস্বী ও প্রতিভাবান সাহাবী নবী করীম ﷺ-এর সাথে এ নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এতে যে, কি হিকমত লুক্কায়িত ছিল, বাহ্যিক পরাজয়ের অভ্যন্তরে যে এক মহাবিজয় নিহিত ছিল, তা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ-এরই ভালো জানা ছিল। কাজেই সাহাবীগণের সকল মান-অভিমানকে উপেক্ষা করে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর ইঙ্গিতে অনুরূপ শর্তাবলি মেনে নিয়েই সন্ধি করতে সম্মত হলেন।

সে বছর আর ওমরা পালন করা সম্ভব হলো না। সন্ধির শর্তানুযায়ী নবী করীম ﷺ যুলহুলায়ফাতেই সাহাবীগণসহ ইহরাম ভেঙ্গে ফেলেন। হাদীর পশুগুলোকে সেখানেই জবাই করেন। ক্ষোভে-অভিমানে হতাশ মর্মাহত সাহাবীদেরেক নিয়ে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'কুরাউল গাইম' নামক এলাকার আসফান নামক স্থানে রজনীকালে আলোচ্য সূরাটি সম্পূর্ণ নাজিল হয়। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন– "অদ্য রজনীতে এমন একটি সূরা আমার উপর নাজিল হয়েছে যেটা সূর্য যাতে উদিত হয়েছে, তা অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। অতঃপর তিনি সূরাটি তেলাওয়াত করে সাহাবীগণকে শুনালেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– "আমার উপর অদ্য রজনীতে এমন একটি সূরা নাজিল হয়েছে, যা আমার নিকট দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সবকিছু হতে প্রিয়।" এরপর তিনি সূরা ফাত্হ -এর শুরু হতে পড়া আরম্ভ করলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি : আলোচ্য সূরাটি যে মহান ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছিল তা ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত। হিজরি ষষ্ঠ সনে মক্কার অদূরে নবী করীম ﷺ ও কাফেরদের মধ্যে এ ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ মহান ঐতিহাসিক সন্ধির শর্তাবলি যদিও অসম ছিল এবং আপাতঃদৃষ্টিতে কুরাইশদেরই পক্ষে তথাপি মূলত এর দ্বারাই মুসলমানদের বিশ্ব বিজয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

মহানবী ﷺ ও মুহাজির সাহাবীগণ (রা.) মক্কা হতে হিজরত করে মদিনায় আসার পর দেখতে না দেখতে প্রায় ছয়টি বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁরা এমনকি আনসারী সাহাবীগণও মক্কায় বায়তুল্লাহর জিয়ারতে গমন করতে পারেননি। ষষ্ঠ হিজরির জুলকা'দাহ মাসে মহানবী ﷺ স্বপ্নযোগে দেখলেন যে, তিনি সাহাবীগণসহ মক্কা মুয়াজ্জামায় গিয়ে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করছেন। নবীর স্বপ্ন ওহী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কাজেই নবী করীম ﷺ -এর এ স্বপ্নও নিছক কোনো স্বপ্ন ছিল না বরং এটা ছিল ওহীর নামান্তর। মূলত আল্লাহ তা'আলারই ইঙ্গিত।

প্রিয়নবী ﷺ-এর পক্ষে এ ইঙ্গিত বাস্তবায়িত করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছিল না। কুরাইশ মুশরিকরা দীর্ঘ ছয়টি বৎসর যাবৎ মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ঘরের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তারা মুসলমানদেরকে হজ বা ওমরাহ পালনের জন্য মক্কায় যেতে দেয়নি। এখানে তারা স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ-কে সাহাবীদের দলবলসহ মক্কা শরীফে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে, তা কি করে আমা করা যেতে পারে? ওমরার নিয়ত করে এবং ইহরাম বেঁধে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সহকারে বের হওয়া তো যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ারই নামান্তর ছিল। আর নিতান্ত নিরস্ত্র অবস্থায় যাওয়া তো নিজের ও সঙ্গি-সাথিদের প্রাণের জন্য কঠিন বিপদ টেনে আনা ছাড়া অন্য কোনো পরিণতি হতে পারে বলে মনে করা যায় না। এহেন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার এ ইঙ্গিত কি করে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হতে পারে তা কারো বোধগম্য হচ্ছিল না।

কিন্তু পয়গম্বরের পদ ছিল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাঁকে যে নির্দেশই দেবেন, কোনো রূপ দ্বিধা-সংকোচ ব্যতীতই তা যথার্থরূপে পালন করাই তাঁর একান্ত কর্তব্য। এ কারণে নবী করীম ﷺ নিঃসঙ্কোচে অকপটে তাঁর স্বপ্নের বিবরণ তাঁর সাহাবীগণকে শুনালেন এবং সফরে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে দিলেন। আশে-পাশের গোত্রসমূহেও সাধারণভাবে ঘোষণা করে দিলেন– "ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাচ্ছি যারাই আমাদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করবে, তারা যেন আমাদের কাফেলায় শামিল হয়ে যায়।" এতে যাদের দৃষ্টি বাহ্যিক উপায়-উপকরণের উপর নিবদ্ধ ছিল তারা স্পষ্ট মনে করে নিল যে, এ লোকগুলো তো অযথাই মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাদের কেউই রাসূলে কারীম ﷺ-এর সঙ্গি হতে প্রস্তুত ছিল না। অপরদিকে আল্লাহর ও তদীয় রাসূলের ﷺ প্রতি যাদের সত্যিকার ঈমান ডানা পেতে ছিল তাদের এ যাত্রার পরিণতি কি হবে? তারা তা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি হলো না। এটা আল্লাহর সংকেত এবং তাঁরই রাসূল ﷺ এ সংকেত কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, এটাই ছিল তাদের সান্ত্বনা লাভের একমাত্র অবলম্বন। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ -এর সঙ্গি হতে তাদেরকে বাধা দিতে পারে এমন কিছু ছিল না।

চৌদ্দশত সাহাবী রাসূলে কারীম ﷺ-এর নেতৃত্বে এ কঠিন শঙ্কাময় বিপদ সংকুল সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। ষষ্ঠ হিজরির জুলকা'দাহ মাসের শুরুতে এ কাফেলা মদীনা হতে যাত্রা করল। যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে সকলেই ওমরার ইহরাম বাঁধলেন। কুরবানি করার উদ্দেশ্যে সত্তরটি উঁট সঙ্গে নিলেন। উটগুলোর গলায় شِعَارُ قُرْبَانِيْ তথা "কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট জন্তু" হওয়ার চিহ্ন স্বরূপ রশি বেঁধে দেওয়া হলো। জিনিসপত্রের মধ্যে এক একখানি তরবারিও সঙ্গে নেওয়া হলো। এটা কোনো বেআইনী কাজ ছিল না; বরং তখনকার সময় আরবের প্রচলিত নিয়মে বায়তুল্লাহ জিয়ারতকারীদের জন্য এটাও এটার পুরোপুরি অনুমতি ছিল। এটা ছাড়া অন্য কোনো সমরাস্ত্র সঙ্গে নেওয়া হয়নি। অতঃপর এ কাফেলা 'লাব্বাইকা' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে বায়তুল্লাহর দিকে যাত্রা শুরু করল।

এ সময় ও মদীনার মধ্যে যে ধরনের ও যে রূপের সম্পর্ক ছিল, তা আরবের প্রতিটি ব্যাক্তিই জানত। বিগত বৎসরই পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে- আরবের সমগ্র গোত্র-সম্প্রদায়গুলো সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মদীনার উপর আক্রমণ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে 'আহযাব' যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে নবী করীম ﷺ যখন জনতার এতবড় একটি কাফেলা নিয়ে তাঁদের সকলেরই রক্ত-পিপাসু দুশমনদের ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন এ আশ্চর্য ধরনের অভিযাত্রার দিকে আরবের সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। অবশ্য লোকেরা এটাও লক্ষ্য করল যে, এ কাফেলা লড়াই করার জন্য নয়; বরং হারাম মাসে ইহরাম বেঁধে কুরবানির উট সঙ্গে নিয়ে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে আল্লাহর ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

নবী করীম ﷺ-এর এ অগ্রযাত্রায় কুরাইশরা ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। জিলকদ মাস ছিল হারাম মাসসমূহের একটি। যুগ যুগ ধরে আরবের লোকেরা এ মাসগুলোকে হজ ও জিয়ারত করার জন্য সংরক্ষিত এবং অত্যন্ত সম্মানিত মাস মনে করে আসছে। এ মাসসমূহে যে কোনো কাফেলাই ইহরাম বেঁধে হজ বা ওমরাহ পালন করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে, এর প্রতিরোধ করার অধিকার কারো ছিল না। এমনকি কোনো গোত্রের সাথে কোনো কাফেলার লোকদের প্রাণের দুশমনি থাকলেও আরবের সর্বসমর্থিত বিধান অনুযায়ী তার এলাকা দিয়ে তাদেরকে অতিক্রম করতে বাধা দান করতে পারে না। এ কারণে কুরাইশ বংশের লোকেরা বিশেষ দুর্ভাবনার শিকার হলো। তারা মনে করল, মদীনার এ কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে না দিলে সমগ্র আরব জুড়ে সে জন্য কঠিন প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। আরবের প্রত্যেকটি লোকই এ ঘরের একচ্ছত্র মালিক হতে চায়। প্রত্যেক গোত্রই চিন্তা করবে- ভবিষ্যতে কোনো গোত্রকে হজ ও ওমরা পালন করতে দেওয়া না দেওয়া বুঝি আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। আমরা যার উপর বিরাগভাজন হবো, তাকে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করতে তেমনি বাধা প্রদান করব, যেমন- আজ এ জিয়ারত ইচ্ছুক লোকদেরকে বাধা দেব। এটা তো একটি বড় ভ্রান্ত পদক্ষেপ হবে। সমস্ত আরব জনতা আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিমুখ হয়ে পড়বে। কিন্তু আমরা যদি মুহাম্মদকে এতবড় একটা কাফেলা সমভিব্যাহারে বিনা বাধায় আমাদের শহরে প্রবেশ করার সুযোগ দেই তা হলে সারা দেশে আমাদের আর কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং আধিপত্য অবশিষ্ট থাকবে না। লোকেরা মনে করবে, আমরা মুহাম্মদের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। মূলত এটা ছিল কুরাইশদের জন্য মস্তবড় সমস্যা। তারা এতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের জাহেলিয়্যাতের আত্মসম্মানবোধ ও বিদ্বেষই বিজয়ী হয়ে পড়ল। তারা নিজেরদের নাক উঁচু রাখার জন্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, কোনোক্রমেই এ কাফেলাকে তারা তাদের শহরে প্রবশে করতে দেবে না।

নবী করীম ﷺ বনূ কা'আবের এক ব্যক্তিকে পূর্বেই সংবাদদাতা হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। কুরাইশদের মনোভাব, ইচ্ছা, তৎপরতা ও গতিবিধি সম্পর্কে জেনে রাসূলে কারীম ﷺ-কে আগাম অবহিত করানোই ছিল তাঁর দায়িত্ব। নবী করীম ﷺ

যখন উসফান, [মক্কা মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান, মদীনা হতে উটের গাড়িতে দু'দিনের পথ] পৌঁছলেন, তখন সেই লোকটি এসে সংবাদ দিল যে, কুরাইশদের লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে [মক্কার বাইরে উসফানের পথে] 'যী তাওয়া' নামক স্থানে এসে পৌঁছে গেছে। আর খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে সৈন্যে সুসজ্জিত দুই শত উটের গাড়িসহ [উসফান হতে মক্কা দিকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত] 'কুরাউল গাইম' নামক স্থানের দিকে পূর্বেই পাঠিয়ে দিয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর অগ্রযাত্রা রোধ করার উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাফেলার সাথে গায়ে পড়ে তর্ক-বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদেরকে উত্তেজিত করে তোলাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আর যুদ্ধ সংঘটিত হলে যেন সারা দেশে রটিয়ে দেওয়া যায় যে, এ লোকেরা আসলেই লড়াই করার উদ্দেশ্যে এসেছিল। যদিও ওমরা করার বাহানা করেছিল। ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মূলত তারা ইহরাম বেঁধে রেখেছিল।

প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে নবী করীম ﷺ সফরের পথ পরিবর্তন করে দিলেন। সাহাবীগণসহ তিনি অত্যন্ত অসমতল উচুঁ নিচু দূরতিক্রম্য পথ পাড়ি দিয়ে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করে হুদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। এ স্থানটি হারামের বিস্তীর্ণ এলাকার সীমান্তে অবস্থিত।

এ স্থানে বনূ খুজাআ গোত্রের সরদার বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকাহ তাঁর গোত্রের কয়েকজন সঙ্গীসহ নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, কি উদ্দেশ্যে আপনি এসেছেন? নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। বায়তুল্লাহর জিয়ারত ও তার তওয়াফ করাই একমাত্র আমাদের উদ্দেশ্য। তারা এ কথাগুলো কুরাইশ সর্দারদের নিকট পৌঁছে দিল এবং হারাম শরীফের জেয়ারত করতে ইচ্ছুক এ কাফেলাকে বাধা না দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিল। কিন্তু কুরাইশ সর্দাররা তাদের একগুঁয়েমী জেদ ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে রাজি হলো না। তারা কুরাইশদের মিত্র গোত্র সমষ্টি আহবীশ সর্দার হুলাইছ ইবনে আলকামাহকে নবী করীম ﷺ -এর নিকট পাঠাল; যাতে সে নবী করীম ﷺ -কে মদীনায় ফিরে যেতে প্রস্তুত করে। কুরাইশ সর্দারদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ তার কথা না মানলে সে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসবে এবং অতঃপর আহবীশের সমস্ত শক্তি আমাদের পথে নিয়োজিত ও ব্যবহৃত হবে। কিন্তু হুলাইস যখন এসে প্রত্যক্ষ করল যে, সমস্ত কাফেলা ও কাফেলার সব লোকই ইহরাম বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, কুরবানির জন্তুগুলোর গলায় চিহ্ন ব্যবহৃত রয়েছে এবং সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এরা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং বায়তুল্লাহর তওয়াফ করার জন্যই এসেছে, তখন সে নবী করীম ﷺ -এর সাথে কোনো প্রকার বাক্য ব্যয় ব্যতীতই মক্কায় ফিরে গেল। কুরাইশ সর্দারদের নিকট স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল- এই লোকেরা বায়তুল্লাহর মাহাত্ম্য মেনেই তার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছে। তোমরা যদি তাদেরকে বাধা দাও তাহলে আহবীশ এ কার্যে তোমাদের কোনোই সহযোগিতা করবে না। তোমরা কা'বার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য পদদলিত করবে, আর সেই কাজে আমরা তোমাদের সাহায্য করব- এই উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের মিত্র হইনি।

তারপর কুরাইশদের পক্ষ হতে দূত হিসেবে ওরওয়াহ ইবনে মাসউদ সাকাফী আসল। সে নিজস্বভাবে বিভিন্ন কথা বুঝিয়ে নবী করীম ﷺ -কে মক্কায় প্রবেশ করার ইচ্ছা হতে বিরত থাকার জন্য প্রস্তুত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু নবী করীম ﷺ বললেন, আমরা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। তিনি বললেন, আমরা তো আল্লাহর ঘরের মাহাত্ম্য মেনে নিয়ে একটি দ্বীনি কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। ওরওয়া ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে বললেন, আমি কায়সার, কেসরা ও নাজ্জাসীর দরবারেও গিয়েছি। কিন্তু খোদার শপথ! আমি মুহাম্মদের ﷺ সাথি-সঙ্গিদেরকে তাঁর জন্য যতখানি উৎসর্গকৃত দেখতে পেয়েছি, এমন দৃশ্য কোনো বড় বড় বাদশাহর দরবারেও দেখতে পাইনি। এ লোকগুলোর অবস্থা এমন যে, মুহাম্মদ ﷺ অজু করেন, আর তার অনুসারীরা পানির একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়তে দেন না, তাঁরা সবাই নিজেদের দেহে ও কাপড়ে মেখে নেন। এরূপ অবস্থায় তোমরা তোমাদের প্রতিপক্ষকে ভালো করে অনুধাবন করে নাও।

দূতদের পরস্পর আসা-যাওয়া এবং মতবিনিময়ের এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকল। এ সময়ে কুরাইশরা চুপে চুপে নবী করীম ﷺ -এর ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালিয়ে সাহাবীগণকে উত্তেজিত করে তুলত। কোনো না কোনোভাবে এমন কোনো কাজ করতে তাদেরকে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকে, যাতে লড়াই বাধানোর পরিস্থিতি ঘটে। তারা এ ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা বহাল রাখে; কিন্তু প্রতিবারই সাহাবীগণের ধৈর্য এবং নবী করীম ﷺ -এর বুদ্ধিমত্তা, কৌশল তাদের সমস্ত কলাকৌশল ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিল। একবার তাদের চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক রাত্রিবেলায় এসে মুসলমানদের তাবুর উপর প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করল। সাহাবীগণ তাদেরকে গ্রেফতার করে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত করলেন। নবী করীম ﷺ তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। অন্য এক সময় 'তানয়ীম' [মক্কার হারাম

সীমার বাইরে অবস্থিত একটি স্থান] দিক হতে আশি জন লোক এসে ঠিক ফজরের সময় মুসলমানদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসল। তারাও সাহাবীগণের হাতে বন্দী হলো। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাদেরকেও মুক্ত করে দিলেন। কুরাইশদের সব কয়টি ষড়যন্ত্রই এভাবে ভেঙ্গে গেল।

অবশেষে নবী করীম ﷺ স্বয়ং হযরত ওসমান (রা.)-কে দূত বানিয়ে মক্কায় পাঠালেন। তাঁর মাধ্যমে কুরাইশ সর্দারদেরকে বলে দিলেন যে, আমি যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। জেয়ারত ও তওয়াফের উদ্দেশ্যে কুরবানির জন্তুসহ এসেছি। আমরা তওয়াফ ও কুরবানি সম্পাদন করে ফিরে যাব। কিন্তু তারা এতে সম্মত হলো না। উপরন্তু তারা হযরত ওসমান (রা.)-কে আটক করে রাখল।

এ সময় মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, হযরত ওসমান (রা.) শহীদ হয়েছেন। তিনি প্রত্যাবর্তন না করায় মুসলমানরা এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেন। বস্তুত এটা ছিল একটি কঠিন সংকটময় মুহূর্ত। অধিক সহ্য করার এবং চুপচাপ বসে থাকার সময় ছিল না। [মক্কায় প্রবেশ করার ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর]। এর জন্য শক্তি প্রয়োগ প্রার্থিত ছিল না। কিন্তু বিষয়টি যখন দূত হত্যা পর্যন্ত গড়িয়েছে তখন মুসলিম জনতার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না। এ জন্য নবী করীম ﷺ তাঁর সমস্ত সাহাবীদের একত্র করে তাঁদের নিকট হতে এ কথার উপর বায়'আত গ্রহণ করলেন যে, "অতঃপর আমরা এ স্থান হতে মৃত্যু পর্যন্তও পশ্চাদপদ হবো না। অবস্থার নাজুকতা লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, এটা কোনো নগণ্য ধরনের বায়'আত ছিল না। মুসলমান ছিল মাত্র চৌদ্দশত জন, সঙ্গে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বা অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই ছিল না। এ সময় তারা নিজেদের আবাসস্থল হতে আড়াইশত মাইল দূরে মক্কার উপকণ্ঠে উপস্থিত ছিলেন। যেখানে শত্রুপক্ষ পূর্ণ শক্তিতে তাঁদের উপর অতি সহজেই আক্রমণ করতে পারে। আর আশ-পাশ হতে নিজেদের মিত্র ও সমর্থক গোত্রসমূহকে সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলতেও কোনো অসুবিধা ছিল না। এতদসত্ত্বেও মাত্র একজন ব্যক্তি ছাড়া সমস্ত কাফেলা-ই নবী করীম ﷺ-এর হাতে মরতে প্রস্তুত থাকার জন্য বায়'আত গ্রহণ করতে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হলো না। তাঁদের ঈমানী নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা এবং আল্লাহর পথে আত্মদান করতে প্রস্তুত থাকার অধিক স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ এটা অপেক্ষা আর কি হতে পারে? বস্তুত এ বায়'আত 'বাইয়াতে রেদওয়ান' তথা আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আত্মদানমূলক শপথ ও অঙ্গীকার নামে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এবং তা চিরদিনই ইতিহাসে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

পরবর্তীতে জানা গেল যে, হযরত ওসমান (রা.)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ ভুল ছিল। তিনি নিজেই স্ব-শরীরে ফিরে আসলেন। এদিকে কুরাইশদের পক্ষ হতে সুহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সন্ধির ব্যাপারে আলোচনার জন্য নবী করীম ﷺ-এর ক্যাম্পে উপস্থিত হলো। নবী করীম ﷺ ও তাঁর সঙ্গি-সাথিদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতেই দেওয়া হবে না-এরূপ জেদ ও একগুঁয়েমী মনোভাব তারা পরিত্যাগ করেছিল। অবশ্য নিজেদের নাক উঁচু রাখার জন্য তারা বারংবার শুধু বলতে লাগল, আপনি এ বৎসর ফিরে যান। আগামী বৎসর আসতে পারেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর নিম্নলিখিত শর্তাবলির ভিত্তিতে সন্ধি চুক্তি স্থাপিত হলো–

১. দশ বৎসর যাবৎ উভয়ের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে। একদল অপর দলের বিরুদ্ধে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনো প্রকার তৎপরতা চালাবে না।
২. এ সময়ের মধ্যে কুরাইশদের কোনো ব্যক্তি নেতার অনুমতি ব্যতীত পালিয়ে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। অপরদিকে নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গি-সাথিদের মধ্য হতে কেউ কুরাইশদের নিকট পালিয়ে চলে গেলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।
৩. আরবের গোত্রসমূহ উপরিউক্ত পক্ষদ্বয়ের যে কোনো একটির সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে।
৪. মুহাম্মদ ﷺ এ বৎসর ফিরে যাবেন এবং আগামী বৎসর ওমরা পালন করার উদ্দেশ্যে আগমন করে তিন দিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন। তবে অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে মাত্র একখানা করে তরবারি নিয়ে আসতে পারবেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো যুদ্ধ-সরঞ্জাম সঙ্গে আনতে পারবেন না। এ তিন দিনের জন্য মক্কাবাসীরা তাদের জন্য শহর খালি করে দেবে। যেন কোনোরূপ সংঘাত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। কিন্তু তারা এখান হতে ফিরে যাওয়ার সময় কোনো এক ব্যক্তিকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবেন না।

যে সময় এ সন্ধি চুক্তির শর্তসমূহ ঠিক করা হচ্ছিল, তখন মুসলমানদের সমগ্র বাহিনী উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। যে সব কল্যাণকর দিকের উপর দৃষ্টি রেখে নবী করীম ﷺ এ শর্তসমূহ মেনে নিয়েছিলেন, অন্য কারো দৃষ্টি সেই সুদূরপ্রসারী

লক্ষ্যের উপর নিবদ্ধ ছিল না। ফলে এই সন্ধির পরিণতিতে যে মহান কল্যাণ সাধিত হতে যাচ্ছিল; তা কেউই অনুধাবন করতে পারছিলেন না। কাফের কুরাইশগণ এ শর্তসমূহকে নিজেদের সাফল্য মনে করে আত্মপ্রশান্তি লাভ করেছিল। কিন্তু মুসলমানদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল- আমরা দুর্বল দেখে এই অপমানকর শর্তসমূহ মেনে নেব কেন? হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর ন্যায় একজন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন জননেতার অবস্থাও সীমাহীন উদ্বেগজনক ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, ইসলাম কবুল করার পর আমার দিলে কখনো কোনোরূপ সংশয় মাথাচাড়া দেয়নি। কিন্তু এ সময় আমিও তা হতে রক্ষা পেলাম না। তিনি অস্থির হয়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, নবী করীম ﷺ কি প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল নন? আমরা কি মুসলমান নই? তারা কি মুশরিক নয়? তা হলে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এ অপমান ও লাঞ্ছনা মাথা পেতে নেব কেন? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, হে ওমর! তিনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ কখনো তাঁকে বিপথগামী করবেন না। এটা শুনে তিনি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে তাঁকে ঠিক এ প্রশ্নগুলো করলেন। তিনিও তাঁকে ঠিক সেই জবাবই দিলেন- যা দিয়েছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.)।

আলোচ্য সন্ধি চুক্তির দুটি বিষয় লোকদের মনে সর্বাধিক ব্যাকুলতার সৃষ্টি করেছিল। এর একটি হলো দুই নম্বর শর্ত। লোকদের মতে এটা সুস্পষ্টরূপে সমতা ভঙ্গকারী শর্ত। মক্কা হতে পালিয়ে আসা লোককে যদি আমরা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হই তা হলে মদীনা হতে পালিয়ে আসা লোককে তারা ফিরিয়ে দেবে না কেন? নবী করীম ﷺ এ বিষয়ে বললেন, আমাদের নিকট হতে যারা পালিয়ে তাদের নিকট চলে যাবে, তারা কি আমাদের কোনো কাজে আসবে? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমাদের হতে দূরে রাখুন, এতেই তো মঙ্গল। আর তাদের নিকট হতে যারা পালিয়ে আমাদের নিকট আসবে, আমরা যদি তাদেরকে ফিরিয়ে দেই তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের মুক্তি ও নিষ্কৃতির বিকল্প কোনো পথ সৃষ্টি করে দেবেন।

তা ছাড়া চতুর্থ শর্তটিও লোকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পারেনি। মুসলমানরা মনে করছিলেন যে, এই শর্তটি মেনে নেওয়ার অর্থ হলো আমরা সমস্ত আরবদের সম্মুখে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। এতদ্ব্যতীত আরো একটি প্রশ্ন তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল। নবী করীম ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, আমরা মক্কায় তওয়াফ করছি। অথচ বাস্তবে আমরা তওয়াফ না করে ফিরে যাওয়ার শর্ত মেনে নিচ্ছি। নবী করীম ﷺ লোকদেরকে বুঝালেন, এ বৎসরই তওয়াফ করা হবে। স্বপ্নে তা তো স্পষ্ট করে দেখানো হয়নি। সন্ধির শর্তানুযায়ী এ বৎসর না হলেও আগামী বৎসর তো ইনশাআল্লাহ তওয়াফ করা হবেই।

এ সময় একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ঘটনাটি বলা যেতে পারে আগুনে ঘৃত ঢালার কাজ করছে। সন্ধির চুক্তি পত্র লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল, এ মুহূর্তেই সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবূ জান্দাল যিনি ইতঃপূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং মক্কার কাফেররা তাকে বন্দী করে রেখেছিল- কোনো না কোনোক্রমে পালিয়ে এসে নবী করীম ﷺ -এর ক্যাম্পে শামিল হয়ে গেছেন। তাঁর পায়ে বেড়ী লাগানো ছিল, তাঁর সমগ্র দেহের উপর অত্যাচার নির্যাতনের স্পষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট ফরিয়াদ করলেন, "আমাকে এ অন্যায়-অকারণ বন্দীদশা হতে মুক্তি দান করুন।" এ মর্মান্তিক অবস্থা সহ্য করে নেওয়া উপস্থিত জনতার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ল। কিন্তু সুহাইল ইবনে আমর বলল, সন্ধিপত্র লেখা সম্পূর্ণ না হলেও এর শর্তাবলি আমাদের পরস্পরে মাঝে চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং শর্তানুযায়ী আমার এ পুত্রকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিতে আপনি বাধ্য। নবী করীম ﷺ তার যুক্তি মেনে নিলেন। আবূ জান্দালকে এ জালেমদের নিকটই সোপর্দ করা হলো।

সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নবী করীম ﷺ সমবেত সাহাবীগণকে বললেন, এখনই কুরবানি করে মাথা মুণ্ডন করে ফেল এবং ইহরাম খুলে ফেল। কিন্তু একজনও নিজ স্থান হতে নড়লেন না। নবী করীম ﷺ পরপর তিনবার এ নির্দেশ প্রদান করলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এ সময় যে দুঃখ-বেদনা, হতাশা ও অন্তর্জ্বালার সুগভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, তাতে একজন লোকের পক্ষেও স্বীয় স্থান হতে এতটুকু নড়াচড়া করাও সম্ভপর হলো না। অথচ নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে কোনো কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন আর তারা তা পালন করার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই সক্রিয় হয়ে উঠেননি, এমনটি রাসূলে কারীম ﷺ-এর সমগ্র রিসালাতের জীবনে এটাই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ঘটনা। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরূপ বিস্ময়কর ঘটনার আর কখনো উদ্রেক হয়নি। এতদ দর্শনে নবী করীম ﷺ খুবই মর্মাহত হলেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) নিবেদন করলেন, আপনি নিজে গিয়ে চুপ চাপ আপনার উটটি জবাই করে ফেলুন এবং ক্ষৌরকার ডেকে আপনার মাথা মুণ্ডন করে ফেলুন। এরপর সাহাবীগণ নিজেরাই অগ্রসর হয়ে আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। তাঁরা বুঝে নেবে যে, যা কিছু ফয়সালা হয়ে গেছে তা আর পরিবর্তিত হওয়ার মতো নয়। কার্যত হলোও তা-ই। রাসূলে কারীম ﷺ-এর আমল দেখে লোকেরা কুরবানি করল এবং মাথা মুণ্ডন করল, চুল কর্তন করাল এবং ইহরাম ভেঙ্গে ফেলল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের হৃদয় যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিল, হতাশা ও দুঃখ-ক্ষোভে তাদের কলিজাটা যেন ফেটে গিয়েছিল।

অতঃপর এ কাফেলা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে নিজেদের ব্যর্থতা ও অপমান-লাঞ্ছনার চূড়ান্ত প্রতীক মনে করে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিল তখন মক্কা হতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত যাজনান নামক স্থানে [মতান্তরে কুরাউল গাইম নামক স্থানে] এ সূরাটি নাজিল হলো। এতে মুসলমান জনতাকে বলা হয়েছে যে, তোমরা এ সন্ধিকে নিজের পরাজয় মনে করলেও আসলে এটাই তোমাদের মহাবিজয়। এ সূরা নাজিল হওয়ার পর নবী করীম ﷺ সমস্ত মুসলিম জনতাকে একত্র করেন এবং বললেন, আজ আমার উপর এমন একটা জিনিস অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থ সবকিছুর তুলনায় অধিক মূল্যবান। এরপর তিনি তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন এবং বিশেষ করে হযরত ওমর (রা.)-কে ডেকে তা শুনালেন। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধির কারণে তিনিই সর্বাধিক দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন।

ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলার এ মহাবাণী শুনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীতে অল্পকালের মধ্যেই যখন এ সন্ধির কল্যাণ এক একটা করে প্রকাশ হতে শুরু করল তখন এ সন্ধি যে বাস্তবিকই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য এক মহাবিজয় ছিল তাতে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকল না। এ সন্ধির কতিপয় কল্যাণকর বিষয়গুলো নিম্নে উদ্ধৃত হলো-

১. এ সন্ধির ফলে আরবদেশে সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের অবস্থিতিকে যথারীতি স্বীকৃতি দেওয়া হলো। এর পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের মর্যাদা এরূপ ছিল যে, আরবদের দৃষ্টিতে তারা ছিলেন কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী একটি দল বা গোষ্ঠী মাত্র। তারা এদেরকে তাদের ভ্রাতৃগোষ্ঠী বহির্ভূত মনে করত। অথচ সেই কুরাইশরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে সন্ধি চুক্তি করে ইসলামি রাষ্ট্র অধিকৃত অঞ্চলের উপর এর স্বাধীন সার্বভৌমত্ব কর্তৃত্ব মেনে নিল। আরবদের অন্যান্য গোত্রসমূহের জন্য এ দুটি রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে যে কোনো একটির সাথে ইচ্ছা, মিত্রতার সন্ধি চুক্তি করার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

২. মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ঘর জিয়ারতের অধিকার মেনে নিয়ে কুরাইশরা যেন আপনা আপনি এটাও স্বীকার করে নিল যে, ইসলাম ধর্ম বহির্ভূত কোনো ব্যবস্থার নাম নয়। তখনও পর্যন্ত যদিও তারা এটাই মনে করে আসছিল; বরং তা আরবে অবস্থিত ও প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে একটি এবং অন্যান্য ধর্মপরায়ণদের ন্যায় হজ ও ওমরা অনুষ্ঠানাদি পালন করার অধিকার মুসলমানদেরও রয়েছে। কুরাইশদের এ যাবতকালীন মিথ্যা প্রচারণার ফলে আরববাসীদের মনে ইসলামের বিরুদ্ধে যেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ জেগে উঠেছিল এ সন্ধি চুক্তির ফলে তা হ্রাসপ্রাপ্ত হলো।

৩. কুরাইশদের পক্ষ হতে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর নবী করীম ﷺ ইসলাম অধিকৃত ও প্রভাবাধীন অঞ্চলে ইসলামি রাষ্ট্রকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং ইসলামি আইন-বিধান চালু করে ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে মুসলিম সমাজকে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্যাদায় উন্নীত করার অবাধ সুযোগ লাভ করেন। বস্তুত এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার দেওয়া একটি বড় নিয়ামত। সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে এ নিয়ামত সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম। আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করে নিলাম।

৪. সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাল যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার চুক্তি হওয়ায় মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা লাভ করলেন। এর ফলে তাঁরা আরবের সর্বাধিক ও সর্বাঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করত অবাধে ইসলাম প্রচার করার সুযোগ পেলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে উনিশ বৎসরে যত সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, এরপর মাত্র দু বৎসরে তার অনেক বেশি সংখ্যক লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গি ছিলেন মাত্র চৌদ্দশত জন মুসলমান। আর এর মাত্র দুই বৎসর পরই কুরাইশদের চুক্তিভঙ্গের ফলে নবী করীম ﷺ যখন মক্কার উপর চড়াও হলেন, তখন দশ হাজার লোক তাঁর অনুগত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলেই এটা সম্ভবপর হয়েছিল।

৫. কুরাইশদের সাথে সন্ধি হয়ে যাওয়ায় মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র দক্ষিণ দিক [মক্কা] হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা লাভ করল। এতে বড় একটি ফায়দা সাধিত হলো যে, মুসলিমগণ উত্তর আরব ও মধ্য আরবের সমস্ত বিরোধী গোত্রগুলোকে অতি সহজেই অধীন করে নিতে সক্ষম হলো। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মাত্র তিনটি মাসই অতিবাহিত হয়েছিল। এর মধ্যেই ইহুদিদের শক্তিকেন্দ্র খায়বর জয় হয়ে গেল। অতৎপর ফাদাক, ওয়াদীউল কুরা, তাইমা ও তাবুকের ইহুদি জনবসতিসমূহ ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে এসে গেল। এ ছাড়া মধ্য আরবের যেসব গোত্র ইহুদি ও কুরাইশদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল তারাও একে একে মুসলমানদের অধীনতার পাশে বন্দী হয়ে গেল মাত্র দুটি বৎসরের মধ্যেই সমগ্র আরবের শক্তির ভারসাম্য এমনভাবে বদলিয়ে দিল যে, কুরাইশ ও মুশরিকদের শক্তি চাপা পড়ে গেল এবং ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় অবধারিত হয়ে পড়ল।

মূলত মুসলমানরা যে সন্ধিকে নিজেদের ব্যর্থতা এবং অপমানজনক মনে করত এবং কুরাইশরা নিজেদের চরম সাফল্য ও সম্মান মনে করত তার বিপুল কল্যাণময় অবদানসমূহ উল্লিখিতভাবে ছিল। উক্ত সন্ধিতে যে বিষয়টি সর্বাধিক দুঃসহ ও বেদনাদায়ক ছিল এবং যেটাকে কুরাইশরা স্বীয় মর্যাদা ও বিজয়ের হেতু বলে ধারণা পোষণ করত তাহলো মক্কা হতে প্রাণে বেঁচে মদীনায় পলায়নকারী লোকদেরকে কুরাইশদের হাতে সোপর্দ করার এবং মক্কায় যাওয়া লোকদেরকে ফিরিয়ে না দেওয়ার শর্ত।

কিন্তু মূলত বিষয়টি ছিল- মানুষ ভাবে একটা, আর হয় তার বিপরীতটার মতো অর্থাৎ স্বল্পকালের মধ্যেই এ অসম শর্তটি কুরাইশদের সম্পূর্ণ স্বার্থবিরোধী প্রমাণিত হলো। সন্ধির অল্প কিছুদিন পরই মক্কা হতে আবূ বসীর নামক একজন মুসলমান কুরাইশদের বন্দীশালা হতে মুক্ত হয়ে পালিয়ে মদিনায় উপস্থিত হন। নবী করীম ﷺ সন্ধির শর্তানুযায়ী তাঁকে কুরাইশদের হাতে তুলে দিলেন। হযরত আবূ বসীর (রা.)-কে মক্কায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য যেসব লোক এসেছিল মক্কায় যাওয়ার পথে তিনি তাদের একজনকে হত্যাপূর্বক পালিয়ে লোহিত সাগরে মরু অঞ্চলে গিয়ে গোপন আস্তানা গাড়লেন। তাঁর অবস্থানস্থলের পাশ দিয়ে কুরাইশদের ব্যবাসয়ী কাফেলা সিরিয়া যাতায়াত করত। পরবর্তীতে যে কোনো মুসলামনই কুরাইশদের ছোবল হতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হতো সে-ই হযরত আবূ বাসীরের আস্তানায় গিয়ে ভিড়ত। ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা সত্তরে গিয়ে পৌঁছল। তাঁরা সুযোগমতো কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে লুটপাট করতে শুরু করল। তাঁরা যেহেতু মদিনার ইসলামি সরকার হতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন সেহেতু নবী করীম ﷺ-এর উপর এর দায়-দায়িত্ব বর্তালো না। এ বিপদের মোকাবিলা করতে না পেরে পরিশেষে কুরাইশরা নিজেরাই নবী করীম ﷺ-এর নিকট শর্তটি বাতিলের অনুরোধ জানাল। অবশেষে হযরত আবূ বাসীর (রা.) এবং তাঁর সহযোগীরা দস্যুবৃত্তি পরিহার করে মদিনায় চলে আসলেন। এরূপেই এ অসম চুক্তির চির অবসান হয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা ছিল, জিহাদের প্রেক্ষিতে মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, প্রসঙ্গক্রমে তারও উল্লেখ করা হয়েছে, অবশেষে তাদের ব্যর্থতার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে। প্রকৃত মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখ রয়েছে। মুমিনদের ইখলাস, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি মহব্বত, অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রভৃতি গুণাবলির কারণে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে যে সুস্পষ্ট এবং মহান বিজয় দান করেছেন, তার উল্লেখ রয়েছে। একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন এ সূরা নিয়ে অবতরণ করেন, তখন তিনি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-কে বিজয়ের জন্য মোবারকবাদ জানান। আর প্রিয়নবী ﷺ -এরপর উপস্থিত মুসলমানগণকে বিজয়ের সুসংবাদের জন্যে মোবারকবাদ দান করেন।

যেহেতু কাফেরদের সঙ্গে মক্কার অদূরে অবস্থিত হুদায়বিয়া নামক স্থানে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়, আল্লাহ তা'আলা এ শান্তি চুক্তিকেই প্রকাশ্য বিজয়' বলে অভিহিত করেছেন। আর এ সূরায় সে ঐতিহাসিক মহান বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে- 'সূরাতুল ফাত্হ'। 'ফাত্হ' শব্দের অর্থই হলো বিজয়।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, যদিও মক্কা বিজয় হয় এ ঘটনার দু'বছর পর, কিন্তু কাফেরদের সঙ্গে যে শান্তি-চুক্তি হয়েছিল, তা-ই মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছে। আর এজন্যেই আলোচ্য সূরায় হুদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি যে মহব্বত এবং আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাহে প্রাণপণ জিহাদের শপথ গ্রহণ করেছেন, তজ্জন্যে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির কথাও ঘোষণা করেছেন এ সূরায়।

উপরোল্লিখিত ৪ টি আয়াতের শানে নুযূল : হযরত কাতাদা (র.) বলেন, হযরত আনাস (রা.) তাঁদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ যখন হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সমাপন করার পর মদিনায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا হতে فَوْزًا عَظِيمًا পর্যন্ত নাজিল হয়েছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসম চুক্তিতে সম্মত হওয়ার কারণে নবী করীম ﷺ-এর সাথে সাহাবীগণ যথেষ্ট মান-অভিমান ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। যদিও নবী করীম ﷺ -এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণও হুদায়বিয়াতেই ইহরাম ভেঙ্গেছিলেন এবং কুরবানি করেছিলেন। তথাপি তাদের অন্তর্জ্বালা এতটুকু প্রশমিত হয়নি। সুতরাং আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার পরে নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে একত্র করে শুনিয়ে দিলেন- যাতে তারা মানসিক শান্তি লাভ করল- তাদের অন্তরের ক্ষোভ ও দুঃখ মুছে গেল।

হযরত মুকাতিল ইবনে সুলায়মান (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহর বাণী– وَمَآ اَدْرِیْ مَا يُفْعَلُ بِیْ وَلَا بِكُمْ নাজিল হলো তখন মুনাফিক ও মুশরিকরা খুব আনন্দিত হলো। তারা কটূক্তি করে বলতে শুরু করল, যে লোক তার নিজের এবং তার সাহাবীদের ব্যাপারে কি আচরণ করা হবে, তার কোনো হদীস দিতে পারে না, আমরা কিভাবে তার অনুসরণ করতে পারি? এ সময় নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনকালে নাজিল হয়- إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا الخ -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

হযরত আতা (রা.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, যখন আয়াতে কারীমা- "وَمَآ اَدْرِیْ مَا يُفْعَلُ بِیْ وَلَا بِكُمْ" [হে হাবীব! আপনি তাদেরকে বলুন! আমি জানি না আমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে। আর তোমাদের সাথেই বা কিরূপ আচরণ করা হবে।] নাজিল হওয়ার পর ইহুদিরা নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণকে ভর্ৎসনা করে বলেছিল, যে নিজের সম্পর্কে পর্যন্ত কিছু জানে না, আমরা কিভাবে তার আনুগত্য করতে পারি? এতে নবী করীম ﷺ যারপর নাই দুঃখিত হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করলেন- إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিতে পারেন।"

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا [٥]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর প্রমুখ হযরত আনাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হুদাইবিয়া হতে ফিরে আসার পথে لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ আয়াত নাজিল হয়। সুতরাং রাসূল ﷺ বললেন যে, আমার প্রতি একটি আয়াত নাজিল হয়েছে, যা আমার নিকট ভূ-পৃষ্ঠে যা রয়েছে তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়তম বস্তু। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের নিকট তা তেলাওয়াত করেন। তখন তারা বললেন يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا আল্লাহ আপনার সাথে কি আচরণ করবেন তার বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি আমাদের সাথে কি ব্যবহার করবেন? সাহাবায়ে কেরামের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন।–[রূহুল মা'আনী ৯৩/২৬/১৩, কুরতুবী ২২৬/১৬, দুররে মানছূর ৭১/৫]

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদের মতে সূরা ফাত্হ ষষ্ঠ হিজরিতে অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মক্কা মোকাররমা তশরিফ নিয়ে যান এবং হেরেমের সন্নিকটে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। মক্কার কাফেররা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে সন্ধি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর তিনি মদীনায় ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর এই ওমরার কাযা করবেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই বিশেষতঃ হযরত ওমর (রা.) এ ধরনের সন্ধি করতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ খোদায়ী ইঙ্গিতে এই সন্ধিকে পরিণামে মুসলমানদের জন্যে সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরার এহরাম খুলে হুদায়বিয়া থেকে ফেরত রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে এই পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বপ্ন সত্য এবং অবশ্যই বাস্তবরূপ লাভ করবে। কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। পরে মক্কা বিজয়ের সময় এই স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করে। এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিল। তাই একে "প্রকাশ্য বিজয়" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেন : তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে থাক; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে করি। হযরত জাবের (রা.) বলেন : আমি হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয় মনে করি। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন : তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয়; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার ঘটনায় 'ব'আয়তে-রিজওয়ান' কেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বৃক্ষের নীচে উপস্থিত চৌদ্দশত সাহাবীর কাছ থেকে জেহাদের শপথ নিয়েছিলেন। এ সূরায় বরাতের আলোচনাও করা হয়েছে। (ইবনে কাছীর)

যখন জানা গেল যে, আলোচ্য সূরাটি হুদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই ঘটনার অনেক অংশ এই সূরায় উল্লিখিতও হয়েছে, তখন প্রথমে সম্পূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়। তাফসীরে ইবনে কাছীরে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে আরো বেশি বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং চৌদ্দ নং পৃষ্ঠায় এই কাহিনী আদ্যোপান্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনীতে অনেক মু'জিযা, উপদেশ, শিক্ষণীয়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয় বিধৃত হয়েছে। এখানে কাহিনীর কেবল সেসব অংশ লিখিত হচ্ছে, যেগুলো সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা যেগুলোর সাথে সূরার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর ফলে এই কাহিনী সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তাফসীর বুঝা খুবই সহজ হয়ে যাবে।

হুদায়বিয়া ঃ হুদায়বিয়া মক্কার বাইরে হেরেমের সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এই স্থানটিকে "শমীসা" বলা হয়। ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটে ।

প্রথম অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বপ্ন : আবদ ইবনে হুমায়দ, ইবনে জারীর, বায়হাকী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় স্বপ্ন দেখলেন তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কায় নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে প্রবেশ করছেন এবং ইহরামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়মানুযায়ী মাথা মুণ্ডন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহর চাবি তাঁর হস্তগত হয়েছে। এটা সূরায় বর্ণিত ঘটনার একটা অংশ। পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই স্বপ্নটি যে বাস্তবরূপ লাভ করবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এই ঘটনার কোনো সন, তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নটি মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনালেন, তখন তাঁরা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরামের প্রস্তুতি দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা স্বপ্নে কোনো বিশেষ সাল অথবা মাস নির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই এই মুহূর্তেই উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। –[বয়ানুল কোরআন]

দ্বিতীয় অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবায়ে কেরাম ও মরুবাসী মুসলমানদের সাথে চলার জন্য ডাকা এবং কারো কারো অস্বীকার করা : ইবনে সা'দ প্রমুখ বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম ওমরা পালনের ইচ্ছা করলেন, তখন আশঙ্কা দেখা দেখা দিল যে, মক্কার কুরাইশরা সম্ভবত বাধা দিতে পারে এবং প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তাই তিনি মদিনার নিকটবর্তী গ্রামবাসীদেরকে সাথে চলার জন্য দাওযাত দিলেন। অনেক গ্রামবাসী সাথে চলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং বলল : মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সহচরগণ আমাদেরকে শক্তিশালী কুরাইশদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করতে চায়। তাদের পরিণাম এটাই হবে যে, তারা এই সফর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। –(মাযহারী)

তৃতীয় অংশ মক্কাভিমুখে যাত্রা : ইমাম আহমদ, বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গোসল করে নতুন পোশাক পরিধান করলেন এবং স্বীয় উষ্ট্রী কাসওয়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হলেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমাকে সঙ্গে নিলেন এবং তাঁর সাথে মুহাজির, আনসার ও গ্রামবাসী মুসলমানদের একটি বিরাট দল রওয়ানা হলো। অধিকাংশ রেওয়ায়েতে তাদের সংখ্যা চৌদ্দশ বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বপ্নের কারণে এই মুহূর্তেই মক্কা বিজিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের কারো মনে কোনোরূপ সন্দেহ ছিল না। অথচ তরবারি ব্যতীত তাদের কাছে অন্য কোনো অস্ত্র ছিল না। তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ জিলক্বদ মাসের শুরুতে সোমবার দিন রওয়ানা হন এবং যুলহুলায়ফায় পৌঁছে ইহরাম বাঁধেন। –(মাযহারী)

চতুর্থ অংশ মক্কাবাসীদের মোকাবেলার প্রস্তুতি : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বড় দল নিয়ে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেছেন এই খবর যখন মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছল, তখন তারা পরামর্শ সভায় একত্রিত হলো এবং বলল, মুহাম্মদ ﷺ সহচরগণসহ ওমরার জন্য আগমন করেছেন। যদি আমরা তাকে নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ করতে দেই, তবে সমগ্র আরবে এ কথা ছড়িয়ে পড়বে যে, সে আমাদেরকে পরাজিত করে মক্কায় পৌঁছে গেছে। অথচ আমাদের ও তার মধ্যে একাধিক যুদ্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর তারা শপথ করে বলল, আমরা কখনো এরূপ হতে দেব না। সেমতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বাধা দেওয়ার জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি দল মক্কার বাইরে 'কুরাউল-গামীর' নামক স্থানে প্রেরণ করা হলো। তারা আশেপাশের গ্রামবাসীদেরকেও দলে ভিড়িয়ে নিল এবং তায়েফের বনী সাকীফ গোত্রও তাদের সহযোগী হয়ে গেল। তারা বালদাহ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। অতঃপর তারা সবাই পরস্পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কা প্রবেশে বাধা দেওয়ার এবং তাঁর মোকাবেলায় যুদ্ধ করার শপথ করল।

সংবাদ পৌঁছানোর একটি অভাবনীয় সরল পদ্ধতি : তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে যে, বালদাহ থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পৌঁছার স্থান পর্যন্ত প্রত্যেকটি পাহাড়ের শৃঙ্গে কিছু লোক মোতায়েন করে দেয় যাতে মুসলমানদের সম্পূর্ণ গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তাদের নিকটবর্তী পাহাড়ওয়ালা উচ্চৈঃস্বরে দ্বিতীয় পাহাড়ওয়ালা পর্যন্ত, সে তৃতীয় পর্যন্ত এবং সে চতুর্থ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গতিবিধি সম্পর্কে বালদাহে অবস্থানকারীরা অবহিত হয়ে যেত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংবাদ প্রেরণ : মক্কাবাসীদের অবস্থা গোপনে পর্যবেক্ষণ করে সংবাদ প্রেরণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশর ইবনে সুফিয়ানকে আগেই মক্কা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে মক্কাবাসীদের উপরিউক্ত সামরিক প্রস্তুতি ও পূর্ণ শক্তিতে বাধা দানের সংকল্পের কথা অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কুরাইশদের জন্য আক্ষেপ,

কয়েকটি যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও তাদের রণোন্মাদনা এতটুকু দমেনি। আমাকে ও আরবের অন্যান্য গোত্রকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেরা সরে বসে থাকলেই পারত। যদি আরব গোত্রসমূহ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যেত তবে তাদের মনোবাঞ্ছা ঘরে বসেই হাসিল হয়ে যেত। পক্ষান্তরে যদি আমি বিজয়ী হতাম, তবে হয় তারাও মুসলমান হয়ে যেত, না হয় যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকলেও তখন সবল ও সতেজ অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারত। জানি না, কুরাইশরা কি মনে করছে। আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে যে নির্দেশসহ প্রেরণ করেছেন, তার জন্য আমি একাকী হলেও চিরকাল ওদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকব।

পঞ্চম অংশ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উষ্ট্রীর পথিমধ্যে বসে যাওয়া : অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে একত্র করে ভাষণ দিলেন এবং পরামর্শ চাইলেন যে, এখন আমাদেরকে এখান থেকেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে দেওয়া উচিত, না আমরা বায়তুল্লাহর দিকে অগ্রসর হব এবং কেউ বাধা দিলে তার সাথে যুদ্ধ করব? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও অন্যান্য সাহাবী বললেন, আপনি বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়েছেন, কারো সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হন নি। কাজেই আপনি উদ্দেশ্যে অটল থাকুন। হ্যাঁ, যদি কেউ আমাদেরকে মক্কা গমনে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সাথে যুদ্ধ করব। এরপর হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা বনী ইসরাঈলের মতো নই যে, আপনাকে বলে দিব : فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ (আপনি ও আপনার পালনকর্তা যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরা তো এখানেই বসলাম)। বরং আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনে বললেন, ব্যস, এখন আল্লাহর নাম নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হও। যখন তিনি মক্কার নিকট পৌঁছলেন এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তিনি সৈন্যদেরকে কেবলামুখী সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওব্বাদ ইবনে বিশরকে একদল সৈন্যের আমীর নিযুক্ত করে সম্মুখে প্রেরণ করলেন। তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের বাহিনীর বিপরীত দিকে সৈন্য সমাবেশ করলেন। এমতাবস্থায় যোহরের নামাজের সময় হয়ে গেল। হযরত বেলাল (রা.) আজান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তার সিপাহীরা এই দৃশ্য দেখতে লাগল। পরে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ বলল, আমরা চমৎকার সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছি। তারা যখন নামাজরত ছিল, তখনই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। যাক, অপেক্ষা কর তাদের আরো নামাজ আসবে। কিন্তু ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আ.) 'সালাতুল-খওফ' তথা আপদকালীন নামাজের বিধান নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শত্রুদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়ে নামাজের সময় সৈন্যদেরকে দুইভাগে ভাগ করার পদ্ধতি বলে দিলেন। ফলে তাঁরা শত্রু পক্ষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে যান।

ষষ্ঠ অংশ : হুদায়বিয়ায় একটি মু'জিযা : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হুদায়বিয়ার নিকটবর্তী হন, তখন তাঁর উষ্ট্রীর সামনের পা পিছলে যায় এবং উষ্ট্রী বসে পড়ে। সাহাবায়ে কেরাম চেষ্টা করেও উষ্ট্রীকে উঠাতে পারলেন না। তখন সবাই বলতে লাগলেন : কাসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কাসওয়ার কোনো কসুর নেই। তাঁর এরূপ অভ্যাস কখনো ছিল না। তাকে তো সেই আল্লাহ বাধা দিচ্ছেন, যিনি 'আসহাবে-ফীল' তথা হস্তী বাহিনীকে বাধা দিয়েছিলেন। [রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভবত তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বপ্নে দেখা ঘটনা বাস্তবায়িত হওয়ার সময় এটা নয়]। তিনি বললেন, যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আজকের দিনে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনমূলক যে কোনো কথা কুরাইশরা আমাকে বলবে, আমি অবশ্যই তা মেনে নিব। এরপর তিনি উষ্ট্রীকে একটি আওয়াজ দিতেই উষ্ট্রী উঠে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ ইবনে ওয়ালীদের দিক থেকে সরে গিয়ে হুদায়বিয়ার অপর প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেখানে পানি খুবই কম ছিল। পানির জায়গা খালিদ ইবনে ওয়ালীদ করায়ত্ত করে নিয়েছিল। মুসলমানদের অংশে একটি মাত্র কূপ ছিল, যাতে অল্প অল্প পানি চুয়ে চুয়ে কূপে পড়ত। সেমতে এই কূপের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি মু'জিযা প্রকাশ পেল, তিনি কূপের মধ্যে কুলি করলেন এবং একটি তীর কূপের ভিতরে গেড়ে দিতে বললেন। ফলে কূপের পানি ফুলে ফেঁপে কূপের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অতঃপর পানির কোনো অভাব রইল না।

সপ্তম অংশ : প্রতিনিধিদলের মধ্যস্থতায় মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা : অতঃপর প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু হলো। প্রথমে বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা সঙ্গীগণসহ আগমন করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে বলল, কুরাইশরা পূর্ণ শক্তি সহকারে মোকাবেলা করার জন্য এসে গেছে এবং পানির জায়গা দখল করে নিয়েছে। তারা কিছুতেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। তবে কেউ যদি আমাদেরকে ওমরা পালন করতে বাধা দেয়, তবে আমরা যুদ্ধ

করব। অতঃপর তিনি ইতঃপূর্বে বিশরকে যা বলেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন, কুরাইশদেরকে কয়েকটি যুদ্ধ দুর্বল করে দিয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আমাদের সাথে সন্ধি করে নিতে পারে, যাতে তারা নির্বিঘ্নে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পায়। এরপর আমাদেরকে অবশিষ্ট আরবদের মোকাবেলায় ছেড়ে দিতে পারে। যদি তারা বিজয়ী হয়, তবে কুরাইশদের মনোবাঞ্ছা ঘরে বসেই পূর্ণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে তারা হয় মুসলমান হয়ে যাবে, না হয় আমাদের বিরুদ্ধে নব বলে যুদ্ধ করবে। কুরাইশরা যদি এতে সম্মত না হয়, তবে আল্লাহর কসম, আমি একাকী হলেও ইসলামের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাব। কুরাইশদেরকে এই পয়গাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বুদায়েল ফিরে গেল। সেখানে পৌঁছার পর কিছু লোক তার কথা শুনতেই চাইল না। তারা যুদ্ধের নেশায় মত্ত হয়ে রইল। অতঃপর গোত্র-সরদার ওরওয়া কুরাইশ সরদারদেরকে বলল, মুহাম্মদ যা প্রস্তাব দিয়েছে, তা সঠিক। এটা মেনে নাও এবং আমাকে তার সাথে কথা বলার অনুমতি দাও। সেমতে দ্বিতীয়বার ওরওয়া ইবনে মাসউদ আলাপ-আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করল : আপনি যদি স্বগোত্র কুরাইশকে নিশ্চিহ্নই করে দেন, তবে এটা কি করে ভালো কথা হবে? দুনিয়াতে আপনি কি কখনো শুনেছেন যে, কোনো ব্যক্তি তার স্বজাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে? অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের সাথে তার নরম গরম কথাবার্তা হতে থাকে। ইতঃমধ্যেই সে সাহাবায়ে কেরামের এই আত্মোসর্গমূলক অবস্থা প্রত্যক্ষ করল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থুথু ফেললে তারা তা হাতে নিয়ে নিজ নিজ মুখ-মণ্ডলে মালিশ করে। তিনি অজু করলে সাহাবায়ে কেরাম অজুর পানির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুখমণ্ডলে মালিশ করে। তিনি কথা বললে সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায় ওরা ফিরে গিয়ে কুরাইশ সরদারদের কাছে বর্ণনা করল : আমি কায়সার ও কিসরার ন্যায় বড় বড় রাজকীয় দরবারে গমন করেছি এবং নাজ্জাশীর কাছে গিয়েছি কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি এমন কোনো রাজা-বাদশাহ দেখিনি, যার জাতি তার প্রতি এতটুকু আত্মোৎসর্গকারী, যতটুকু মুহাম্মদের প্রতি তাঁর সহচরগণ আত্মোৎসর্গকারী। মুহাম্মদের কথা সঠিক। আমার অভিমত এই যে, তোমরা তার প্রস্তাব মেনে নাও। কিন্তু কুরাইশরা বলে দিল, আমরা তার প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না। তাকে এ বছর ফিরে যেতে হবে এবং পরবর্তী বছর এসে ওমরা পালন করতে পারবে। আমরা এছাড়া অন্য কিছু মানি না। যখন ওরওয়ার কথায় কর্ণপাত করা হলো না, তখন সে তার দল নিয়ে চলে গেল। এরপর জনৈক গ্রাম্য সরদার জলীম ইবনে আলকামা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আগমন করল। সাহাবায়ে কেরামকে ইহরাম অবস্থায় কুরবানীর জন্তুসহ দেখে সে-ও ফিরে গিয়ে স্বজাতিকে বুঝাতে চাইল যে, তারা বায়তুল্লায় ওমরা পালন করতে এসেছে। তাদেরকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যখন কেউ তার কথা শুনল না, তখন সে-ও তার দল নিয়ে চলে গেল। অতঃপর একজন চতুর্থ ব্যক্তি আলাপ-আলোচনার জন্য আগমন করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকেও সেই কথাই বললেন, যা ইতঃপূর্বে বুদায়েল ও ওরওয়াকে বলেছিলেন। সে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জবাব কুরাইশদেরকে শুনিয়ে দিল।

অষ্টম অংশ : হযরত ওসমান (রা.)-কে পয়গম্বরসহ প্রেরণ করা : ইমাম বায়হাকী হযরত ওরওয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হুদায়বিয়ায় পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করলেন, তখন কুরাইশরা ঘাবড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে নিজের কোনো লোক পাঠিয়ে এ কথা বলে দিতে চাইলেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে নয়, ওমরাহ পালন করতে এসেছি। অতএব আমাদের বাধা দিও না। এ কাজের জন্য তিনি হযরত ওমর (রা.)-কে ডাকলেন। তিনি বললেন, কুরাইশরা আমার ঘোর শত্রু। কারণ, তারা আমার কঠোরতার বিষয়ে অবগত আছে। এছাড়া আমার গোত্রের এমন কোনো লোক মক্কায় নেই, যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। তাই আমি আপনার কাছে এমন একজন লোকের নাম প্রস্তাব করছি, যিনি মক্কায় গোত্রগত কারণে বিশেষ শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী। তিনি হলেন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে এ কাজের আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে আরো বলে দিলেন যে, যেসব মুসলমান দুর্বল পুরুষ ও নারী মক্কা থেকে হিজরত করতে সক্ষম হয়নি এবং বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন আছে, তাদের কাছে যেয়ে সান্ত্বনা দিবে যে, তোমরা অস্থির হয়ো না। ইনশাআল্লাহ মক্কা বিজিত হয়ে তোমাদের বিপদাপদ দূর হওয়ার সময় নিকটবর্তী। হযরত ওসমান (রা.) প্রথমে বালদাহে অবস্থানকারী কুরাইশ বাহিনীর কাছে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে সেই পয়গাম শুনিয়ে দিলেন, যা ইতঃপূর্বে বুদায়েল ও ওরওয়া ইবনে মাসউদকে শুনানো হয়েছিল। তারা বলল, আমরা পয়গাম শুনলাম। আপনি ফিরে গিয়ে বলে দিন যে, এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তাদের জবাব শুনে হযরত ওসমান (রা.) যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে আবান ইবনে সাঈদের সাথে দেখা হলো আবান তাঁকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলো এবং নিজ আশ্রয়ে নিয়ে বলল, আপনি মক্কায় পয়গাম নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না। অতঃপর নিজের অশ্বে হযরত ওসমান (রা.)-কে আরোহণ করিয়ে মক্কায় প্রবেশ করল। আবানের গোত্র

বনূ সাঈদ মক্কায় অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। হযরত ওসমান (রা.) এক একজন সরদারের কাছে পৌঁছলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পয়গাম পৌঁছালেন। কিন্তু সবাই তা প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) দুর্বল ও অক্ষম মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পয়গাম পৌঁছালেন। তারা খুবই আনন্দিত হলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাম বলল। পয়গাম পৌঁছানোর কাজ সমাপ্ত হলে মক্কাবাসীরা হযরত ওসমান (রা.) -কে বলল, আপনি ইচ্ছা করলে তওয়াফ করতে পারেন। হযরত ওসমান (রা.) বললেন, আমি তওয়াফ করতে পারি না, যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তওয়াফ না করেন। হযরত ওসমান (রা.) মক্কায় তিনদিন অবস্থান করেন এবং কুরাইশদের রাযী করাবার প্রচেষ্টা চালান।

নবম অংশ : মক্কাবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং মক্কাবাসীদের সত্তর জনের গ্রেফতারী : ইতঃমধ্যে কুরাইশরা তাদের পঞ্চাশজন লোককে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে পৌঁছে সুযোগ বুঝে তাঁকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করল। তারা সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হেফাজত ও দেখাশুনায় নিযুক্ত হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে উপস্থিত করলেন। অপরদিকে হযরত ওসমান (রা.) মক্কায় ছিলেন এবং তাঁর সাথে আরো প্রায় দশজন মুসলমান মক্কায় পৌঁছেছিলেন। কুরাইশরা তাদের পঞ্চাশজনের গ্রেফতারীর সংবাদ শুনে হযরত ওসমানসহ সব মুসলমানকে আটক করল। এতদ্ব্যতীত কুরাইশদের একদল সৈন্য মুসলমান সৈন্যবাহিনীর দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের প্রতি তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ করল। এতে একজন সাহাবী ইবনে যনীম (রা.) শহীদ হলেন। মুসলমানরা কুরাইশদের দশজন অশ্বারোহীকে গ্রেফতার করে নিল। অপরপক্ষে হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে বলেও গুজব ছড়িয়ে পড়ল।

দশম অংশ : বায়'আতে রিজওয়ানের ঘটনা : হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে একটি বৃক্ষের নীচে একত্র করলেন, যাতে সবাই জিহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে বায়'আত করেন। সকলেই তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। এই সূরায় বায়'আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ্ হাদীসসমূহে এই বায়'আতে অংশগ্রহণকারীদের অসাধারণ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে মক্কা গমন করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের এক হাতের উপর অপর হাত রেখে বললেন, এটা ওসমানের বায়'আত। তিনি নিজের হাতকেই ওসমানের হাত গণ্য করে বায়'আত করলেন। এই বিশেষ ফজিলত হযরত ওসমানেরই বৈশিষ্ট্য।

একাদশ অংশ : হুদায়বিয়ার ঘটনা : অপরদিকে মক্কাবাসীদের মনে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি ভয়ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা স্বয়ং সন্ধি স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে সোহায়েল ইবনে আমর, হোয়ায়তাব ইবনে আবদুল ওযযা ও মুকরিম ইবনে হিফসকে ওযর পেশ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট প্রেরণ করল। তাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন পরে মুসলমান হয়েছিল। সোহায়েল ইবনে আমর এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত ওসমান ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা সম্পর্কিত যে সংবাদ আপনার কাছে পৌঁছেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনি আমাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিন। আমরাও তাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। মুসনাদে আহমদ ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই সূরার هُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ আয়াতটি এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর সোহায়েল ও তার সঙ্গীরা ফিরে গিয়ে বায়'আতে রিজওয়ানে সাহাবায়ে কেরামের প্রাণচাঞ্চল্য ও আত্মনিবেদনের অভূতপূর্ব অবস্থা কুরাইশদের সামনে বর্ণনা করল। দূতদের মুখে এসব অবস্থা শুনে শীর্ষস্থানীয় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পরস্পরে বলল, এখন মুহাম্মদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করে নেওয়াই আমাদের পক্ষে উত্তম যে, তিনি এ বছর ফিরে যাবেন, যাতে সমগ্র আরবে একথা খ্যাত না হয়ে পড়ে যে, আমাদের বাধাদান সত্ত্বেও তারা জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেছে এবং পরবর্তী বছর ওমরা করার জন্য আগমন করবেন ও তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। সেমতে এই সোহায়েল ইবনে আমরই এই পয়গাম নিয়ে পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলো। তিনি সোহায়েলকে দেখা মাত্রই বললেন, মনে হয় মক্কাবাসীরা সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়েছে। তাই সোহায়েলকে আবার প্রেরণ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে গেলেন এবং ওব্বাদ ইবনে বিশর ও মাসলামা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। সোহায়েল উপস্থিত হয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর সামনে বসে গেল এবং কুরাইশদের পয়গাম পৌঁছে দিল। সাহাবায়ে কেরাম তখন ওমরা না করে ইহরাম খুলে ফেলতে সম্মত ছিলেন না। তাঁরা সোহায়েলের সাথে কঠোর ভাষায় কথাবার্তা বললেন। সোহায়েলের স্বর কখনো উচ্চ এবং কখনো নম্র হলো। ওব্বাদ সোহায়েলকে শাসিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে

উচ্চৈঃস্বরেকথা বলো না। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের শর্ত মেনে সন্ধি করতে সম্মত হলেন। সোহায়েল বলল, আসুন, আমি নিজের ও আপনার মধ্যকার সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে ডাকলেন এবং বললেন, লিখ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সোহায়েল এখান থেকেই বিতর্ক শুরু করে বলল, 'রাহমান' ও 'রাহীম' শব্দ আমাদের বাকপদ্ধতিতে নেই। আপনি এখানে সেই শব্দই লিখেন, যা পূর্বে লিখতেন; অর্থাৎ 'বিইসমিকা আল্লাহুমা'। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাও মেনে নিলেন এবং হযরত আলীকে তদ্রূপই লিখতে বললেন। এরপর তিনি হযরত আলী (রা.)-কে বললেন, লিখ এই অঙ্গীকারণামা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পাদন করছেন। সোহায়েল এতেও আপত্তি জানিয়ে বলল, যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল স্বীকারই করতাম, তবে কখনোও বায়তুল্লাহ থেকে বাধা দান করতাম না। সন্ধিপত্রে কোনো এক পক্ষের বিশ্বাসের বিপরীত কোনো শব্দ থাকা উচিত নয়। আপনি শুধু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিপিবদ্ধ করান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাও মেনে নিয়ে হযরত আলী (রা.)-কে বললেন, যা লিখেছ, তা কেটে ফেল এবং মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখ। হযরত আলী আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও আরজ করলেন, আমি আপনার নাম কেটে দিতে পারব না। উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে উসায়দ ইবনে হুযায়র ও সাদ ইবনে ওবাদা দৌড়ে এসে হযরত আলী (রা.)-এর হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, কাটবে না এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত আর কিছুই লিখবে না। যদি তারা না মানে, তবে আমাদের ও তাদের মধ্যে তরবারিই ফয়সালা করবে। চতুর্দিক থেকে আরো কিছু আওয়াজ উচ্চারিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধিপত্রটি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন এবং নিরক্ষর হওয়া ও লেখার অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও স্বহস্তে এ কথাগুলো লিখে দিলেন :

هٰذَا مَاقَضٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو اَهْلُهَا عَلٰى وَضْعِ الْحَرْبِ عَنِ النَّاسِ عَشَرَ سِنِيْنَ يَأْمَنُ فِيْهِ النَّاسُ وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ

অর্থাৎ এই চুক্তি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ও সোহায়েল ইবনে আমর দশ বছর পর্যন্ত 'যুদ্ধ নয়' সম্পর্কে সম্পাদন করছেন। এই সময়ের মধ্যে সবাই নিরাপদ থাকবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাদের একটি শর্ত এই যে, আপাতত আমাদেরকে তওয়াফ করতে দিতে হবে। সোহায়েল বলল, আল্লাহর কসম, এটা হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাও মেনে নিলেন। এরপর সোহায়েল নিজের একটি শর্ত এই মর্মে লিপিবদ্ধ করল যে, মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে আপনার কাছে আগমন করবে, তাকে আপনি ফেরত দিবেন যদিও সে আপনার ধর্মাবলম্বী হয়। এতে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ধ্বনি উত্থিত হলো। তারা বলল, সোবহানাল্লাহ! আমরা আমাদের মুসলমান ভাইকে মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দিব এটা কিরূপে সম্ভবপর? কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই শর্তও মেনে নিলেন এবং বললেন, আমাদের কোনো ব্যক্তি যদি তাদের কাছে যায়, তবে তাকে আল্লাহ তা'আলাই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। তার জন্য আমরা চিন্তা করব কেন? তাদের কোনো ব্যক্তি আমাদের কাছে আগমন করলে আমরা যদি তাকে ফিরিয়েও দেই, তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সহজ পথ বের করে দিবেন। হযরত বারা (রা.) এই সন্ধির সারমর্মে তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন : এক. তাদের কোনো লোক আমাদের কাছে আসলে আমরা তাকে ফিরিয়ে দেব। দুই.আমাদের কোনো লোক তাদের কাছে চলে গেলে তারা ফেরত দিবে না। এবং তিন. আমরা আগামী বছর ওমরার জন্য আগমন করব, তিনদিন মক্কায় অবস্থান করব এবং অধিক অস্ত্র নিয়ে আসব না। পরিশেষে লেখা হলো এই অঙ্গীকারণামা মক্কাবাসী ও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর মধ্যে একটি সংরক্ষিত দলিল। কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। অবশিষ্ট আরববাসিগণ স্বাধীন। যার মনে চাইবে মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে এবং যার মনে চাইবে কুরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে। একথা শুনে খুজায়া গোত্র লাফিয়ে উঠল এবং বলল, আমরা মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি, আর বনূ বকর সামনে অগ্রসর হয়ে বলল, আমরা কুরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি।

সন্ধির শর্তাবলির কারণে সাহাবায়ে কেরামের অসন্তুষ্টি ও মর্মবেদনা : যখন সন্ধির উপরিউক্ত শর্তাবলি চূড়ান্ত হয়ে গেল, তখন হযরত ওমর (রা.) স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন? তিনি বললেন, অবশ্যই আমি সত্য নবী। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কি মিথ্যায় পতিত নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই। হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন, আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ জান্নাতে এবং তাদের নিহত ব্যক্তিগণ জাহান্নামে নয় কি? তিনি বললেন, অবশ্যই। এরপর হযরত ওমর (রা.) বললেন, তবে আমরা

কেন ওমরা না করে ফিরে যাবার অপমানকে কবুল করে নেব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল হয়ে কখনো তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করব না। আল্লাহ আমাকে বিপথগামী করবেন না। তিনি আমার সাহায্যকারী। হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি একথা বলেন নি যে, আমরা বায়তুল্লাহর কাছে যাব এবং তাওয়াফ করব? তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে একথা বলেছিলাম; কিন্তু আমি কি একথাও বলেছিলাম যে, এ কাজ এ বছরই হবে? হযরত ওমর (রা.) বললেন, না, আপনি এরূপ বলেন নি। তিনি বললেন, মনে রেখ, আমি যা বলেছি, তা অবশ্যই হবে। তুমি বায়তুল্লাহর কাছে যাবে এবং তাওয়াফ করবে।

হযরত ওমর (রা.) চুপ হয়ে গেলেন, কিন্তু মনের ক্ষোভ দমিত হচ্ছিল না। তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আরে ভাই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, তিনি আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করবেন না। আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী। কাজেই তুমি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে আঁকড়ে থাক। আল্লাহর কসম, তিনি সত্যের উপর আছেন। মোটকথা, সন্ধির শর্তাবলীর কারণে হযরত ফারুকে-আজমের দুঃখ ও মর্মবেদনার অন্ত ছিল না। তিনি নিজে বলেন, আল্লাহর কসম, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এই একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া আমার মনে কোনো সময় সন্দেহ দেখা দেয়নি। (বুখারী) হযরত আবূ ওবায়দা (রা.) তাকে বুঝালেন এবং বললেন, শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। ফারুকে আজম (রা.) বললেন, আমি শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলাম, তখন থেকে সর্বদা সদকা-খয়রাত করেছি, রোজা রেখেছি এবং ক্রীতদাস মুক্ত করেছি, যাতে আমার এই ত্রুটি মাফ হয়ে যায়।

আরো একটি দুর্ঘটনা : চুক্তি পালনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অপূর্ব কর্মতৎপরতা : যে সময়ে সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়েছিল এবং সাহাবায়ে কেরামের অসন্তুষ্টি প্রকাশ অব্যাহত ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে কুরাইশ পক্ষের স্বাক্ষরকারী সোহায়েল ইবনে আমরের পুত্র আবূ জান্দাল হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সে ইতঃপূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং পিতা সোহায়েল তাকে মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, তার উপর অকথ্য নির্যাতনও চালানো হতো। সে কোনোরূপে পলায়ন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পৌঁছে গেল এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল। কয়েকজন মুসলমান অগ্রসর হয়ে তাকে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে নিল। কিন্তু সোহায়েল এই বলে চিৎকার করে উঠল যে, এটাই চুক্তির প্রথম বরখেলাফ কাজ হচ্ছে। আবূ জান্দালকে প্রত্যর্পণ করা না হলে আমি চুক্তির কোনো শর্ত মেনে নিতে রাযী নই। রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তিসূত্রে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই আবূ জান্দালকে ডেকে বললেন, আবূ জান্দাল, তুমি আরো কিছুদিন সবর কর। আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য এবং অন্যান্য অক্ষম মুসলমানের জন্য শীঘ্রই মুক্তি ও নিষ্কৃতির কোনো ব্যবস্থা করে দিবেন। আবূ জান্দালের এই ঘটনা মুসলমানদের আহত অন্তরে আরো বেশি নিমক ছিটিয়ে দিল। তারা তো এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল যে, মক্কা এই মুহূর্তেই বিজিত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানকার অবস্থা দেখে তাদের দুঃখ ও মর্মবেদনার সীমা রইল না। তারা ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধিপত্র চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। সন্ধিপত্রে মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত ওমর, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আব্দুল্লাহ ইবনে সোহায়েল ইবনে ওমর, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আলী ইবনে আবী তালেব প্রমুখ স্বাক্ষর করলেন এবং কুরাইশদের পক্ষ থেকে সোহায়েল ও তার সঙ্গীরা স্বাক্ষর করল।

ইহরাম খোলা ও কুরবানি করা : চুক্তি সম্পাদন সমাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সন্ধির শর্ত অনুযায়ী এখন আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। কাজেই সঙ্গে কুরবানীর যেসব জন্তু আছে, সেগুলো কুরবানি করে ফেল এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম খুলে ফেল। উপর্যুপরি দুঃখ ও বেদনার কারণে সাহাবায়ে কেরাম যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই আদেশ সত্ত্বেও তারা স্ব-স্ব স্থান ত্যাগ করলেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুঃখিত হলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমার কাছে পৌঁছে এই দুঃখ প্রকাশ করলেন। উম্মুল মু'মিনীন তাকে অত্যন্ত সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়ে বললেন, আপনি সহচরদেরকে কিছু বলবেন না। সন্ধির এক তরফা শর্তাবলী এবং ওমরা ব্যতীত ফিরে যাওয়ার কারণে এই মুহূর্তে তাঁরা ভীষণ মর্মবেদনা অনুভব করছে। আপনি সবার সামনে নাপিত ডেকে মাথা মুণ্ডান এবং নিজের জন্তু কুরবানি করুন। পরামর্শ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করলেন। এই দৃশ্য দেখে সাহাবায়ে কেরাম সবাই নিজ নিজ স্থান থেকে উঠলেন এবং একে অপরের মাথা মুণ্ডালেন ও কুরবানি করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার জন্য দোয়া করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ায় উনিশ দিন এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে কুড়ি দিন অবস্থান করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি প্রথমে মাররে যাহরান অতঃপর আসকানে পৌঁছেন। এখানে পৌঁছার পর সব মুসলমানের পাথেয় প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। আহার্য বস্তু সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি দস্তরখান বিছালেন এবং সবাইকে আদেশ দিলেন–যার কাছে যা আছে এখানে রেখে দাও। ফলে অবশিষ্ট সমস্ত আহার্য বস্তু দস্তরখানে একত্র হয়ে গেল। চৌদ্দশ লোকের সমাবেশ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন এবং সবাইকে খাওয়া শুরু করার আদেশ দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন চৌদ্দশ লোক এই খাদ্য খুব পেট ভরে আহার করল এবং নিজ নিজ পাত্রে ভরে নিল। এরপরও পূর্বের ন্যায় আহার্য বস্তু অবশিষ্ট ছিল। এই সফরের এটা ছিল দ্বিতীয় মু'জিযা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দৃশ্য দেখে খুবই প্রীত হলেন।

সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ও আনুগত্যের আরও একটি পরীক্ষা : পূর্বেই বলা হয়েছে, সন্ধির শর্তাবলি এবং ওমরা ব্যতিরেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে দুঃসহ ছিল। অনন্য ও অসাধারণ ঈমানের বলেই তাঁরা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আনুগত্যে অটল ও অনড় থাকতে পেরেছিলেন। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কু'রা গামীম' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন আলোচ্য 'সূরা ফাত্হ' অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। তাদের অন্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দেওয়ায় হযরত ওমর (রা.) আবার প্রশ্ন করে বসলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ। এটা কি বিজয়? তিনি বললেন :" যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। এই ভাষ্যের সামনেও সাহাবায়ে কেরাম মাথা নত করে নিলেন এবং গোটা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্য বিজয় মেনে নিলেন।

হুদায়বিয়া সন্ধির ফলাফল ও কল্যাণের বিকাশ : এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া এই প্রকাশ পায় যে, কোরাইশ ও তাদের অনেক অনুসারীদের সামনে তাদের অন্যায় জেদ ও হঠকারিতা ফুটে উঠে এবং তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা এবং ওরওয়া ইবনে মাসউদ আপন আপন দল নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত : সাহাবায়ে কেরামের নজীরবিহীন আত্মনিবেদন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি তাদের অনুপম অনুরাগ, সম্ভ্রম ও আনুগত্য দেখে কোরাইশরা ভীত হয়ে যায় এবং সন্ধি করতে সম্মত হয়। অথচ তাদের জন্য মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এ চাইতে উত্তম সুযোগ আর ছিল না। কেননা তারা নিজেদের বাড়ি-ঘরে ছিল এবং মুসলমানগণ ছিলেন প্রবাসী। পানির জায়গাগুলো তাদের অধিকারে ছিল। মুসলমানগণ ছিলেন ঘাস পানিবিহীন প্রান্তরে। তাদের পূর্ণ রণশক্তি ছিল। মুসলমানদের কাছে তেমন অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। তাদের দলের অনেক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাত ও মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে অনেকের অন্তরে ইসলাম ও ঈমান আসন করে নেয় এবং তারা মুসলমান হয়ে যায়। তৃতীয়ত : সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের কারণে পথঘাট নিরাপদ হয়ে যায় এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সকল বাধা অপসারিত হয়। আরব গোত্রসমূহের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম আরবের কোণে কোণে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেন। বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর নামে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। এসব কার্যক্রমের ফল এই দাঁড়ায় যে, হুদায়বিয়ার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপক দাওয়াত ও ওমরার জন্যে বের হওয়ার তাকীদ সত্ত্বেও যেখানে দেড় হাজারের বেশি মুসলমান সঙ্গে ছিল না, সেখানে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এই সময়েই সপ্তম হিজরিতে খায়বর বিজিত হয়, যার ফলে বিপুল পরিমাণে সমরোপকরণ হস্তগত হয় এবং মুসলমানদের সমরশক্তি সুসংহত হয়। সন্ধির পর দুই বছর অতিক্রান্ত না হতেই মুসলমানদের সংখ্যা এত বেড়ে যায়, যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এরই ফলস্বরূপ কেরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গের দরুন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপনে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন, তখন সন্ধির মাত্র বিশ একুশ মাস পরে তাঁর সাথে মক্কাগমনকারী আত্মনিবেদিত মুসলমান সিপাহীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সংবাদ পেয়ে কেরাইশরা উদ্বিগ্ন হয়ে চুক্তি নবায়নের জন্যে তড়িঘড়ি আবূ সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তি নবায়ন করলেন না এবং অবশেষে আল্লাহর দশ হাজার লশকর সাথে নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কোরাইশরা এত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, মক্কায় তেমন কোনো যুদ্ধের প্রয়োজনই হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দূরদর্শী রাজনীতিও কিছুটা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে সহায়তা করেছিল। তিনি মক্কায় ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে

নিরাপদ। এভাবে সব মানুষ নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধের তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এ কারণেই মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না যুদ্ধের মাধ্যমে - এ বিষয়ে ফিকহ্শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মোটকথা, অতি সহজেই মক্কা বিজিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বপ্ন বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। সাহাবায়ে কেরাম নিশ্চিন্তে বায়তুল্লাহর তওয়াফ, মাথা মুণ্ডানো ও চুল কাটেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে বায়তুল্লায় প্রবেশ করেন। বায়তুল্লাহর চাবি তাঁর হস্তগত হয়। এ সময় তিনি বিশেষভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) কে এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন : এই ঘটনাই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। এরপর বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে বলেন : এই ঘটনাই আমি তোমাকে বলেছিলাম। হযরত ওমর (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে কোনো বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধির চাইতে উত্তম ও মহান নয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তো পূর্ব থেকেই একথা বলতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর মধ্যকার এই মীমাংসিত সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারা স্বপ্নের দ্রুত বাস্তবায়ন কামনা করত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের দ্রুততা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে দ্রুততা অবলম্বন করেন না, বরং তাঁর প্রত্যেক কাজ যথার্থ সময়েই সম্পন্ন হয়। তাই 'সূরা ফাতহে' আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার ঘটনাকে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির এসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ জানার পর পরবর্তী আয়াতসমূহ বোঝা সহজ হবে। এখন আয়াতসমূহের তাফসীরে দেখুন।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ এখানে প্রথমোক্ত لَامْ কে কারণ বর্ণনার জন্যে ধরা হলে এর সারমর্ম এই হবে যে, আয়াতে বর্ণিত তিনটি অবস্থা অর্জিত হওয়ার জন্য আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করা হয়েছে। তিনটি অবস্থা এই : (এক) আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ গোনাহ্ মাফ করা। সূরা মুহাম্মদে প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র। তাঁদের বেলায় কুরআনে যেখানে সেখানে ذَنْبٌ অথবা عِصْيَانٌ (গোনাহ্) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তমের বিপরীত কাজ করার জন্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। নবুয়তের উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে অনুত্তম কাজ করাও একটি ক্রটি যাকে কুরআনে শাসানোর ভঙ্গিতে ذَنْبٌ তথা গোনাহ্ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। مَا تَقَدَّمَ বলে নবুয়তের পূর্ববর্তী ক্রটি এবং مَا تَأَخَّرَ বলে নবুয়ত লাভের পরবর্তী ক্রটি বোঝানো হয়েছে, –(মাযহারী)। প্রকাশ্য বিজয় এই ক্ষমার কারণ এজন্যে যে, এক প্রকাশ্য বিজয়ের ফলে দলে দলে লোক ইসলামে দাখিল হবে। ইসলামি দাওয়াতের ব্যাপক আকার লাভ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের মহান লক্ষ্যকে সমুন্নত করবে এবং তাঁর ছওয়াব ও প্রতিদানকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, ছওয়াব ও প্রতিদান বেড়ে যাওয়া ক্রটি মার্জনার কারণ হয়ে থাকে। –[বয়ানুল কুরআন]

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا –এটা প্রকাশ্য বিজয়ের দ্বিতীয় কল্যাণ। এখানে প্রশ্ন হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো পূর্ব থেকেই 'সিরাতে-মুস্তাকীম' তথা সরল পথে ছিলেন এবং শুধু তিনিই নন বরং বিশ্ববাসীকে এই সরল পথের দাওয়াত দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। অতএব, হিজরতের ষষ্ঠবর্ষে প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে সরল পথ পরিচালনা করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াব সূরা ফাতেহার তাফসীরে হেদায়াত শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, হেদায়েত একটি ব্যাপক শব্দ। এর অসংখ্য স্তর আছে। কারণ হেদায়েতের অর্থ অভীষ্ট মনজিলের পথ দেখানো অথবা সেখানে পৌঁছানো। প্রত্যেক মানুষের আসল মনজিল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টির অসংখ্য ও অগণিত স্তর আছে। এক স্তর অর্জিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অর্জনের আবশ্যকতা বাকি থাকে। কোনো বৃহত্তম ওলী এমনকি নবী-রাসূলও এই আবশ্যকতা থেকে মুক্ত হতে পারেন না। এ কারণেই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ বলে দোয়া করার শিক্ষা যেমন উম্মতকে দেওয়া হয়েছে, তেমনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেও দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েত তথা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির স্তরসমূহে উন্নতি লাভ করা। এই প্রকাশ্য বিজয়ের কারণে আল্লাহ তা'আলা এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টিরই একটি অত্যুচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দান করেছেন, যাকে يَهْدِيَكَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا –এটা প্রকাশ্য বিজয়ের তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার যে সাহায্য ও সমর্থন আপনি চিরকাল লাভ করে এসেছেন, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলস্বরূপ তা একটি মহান স্তর আপনাকে দান করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا الخ

সূরার প্রথম তিন আয়াতে এই প্রকাশ্য বিজয়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। হুদায়বিয়ার সফর সঙ্গি কয়েকজন সাহাবী আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব নিয়ামত তো আপনার জন্যে। এগুলো

আপনার জন্যে মোবারক হক; কিন্তু আমাদের জন্যে কি? এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে সরাসরি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত যেহেতু ঈমান ও রাসূলের ﷺ আনুগত্যের কারণ হয়েছে, তাই এগুলোতে সব মুমিনও শামিল। কারণ যে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের পূর্ণতা লাভ করবে, সে-ই এসব নিয়ামতের যোগ্য পাত্র হবে।

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে বিশেষ করে বায়াতে রিজওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এসব নিয়ামত দানকারী ছিলেন আল্লাহ এবং দানের মাধ্যম ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তাই এর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ ও রাসূলের হক এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনের কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে তাঁর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে– مُبَشِّرٌ. شَاهِدٌ ও نَذِيرٌ

شَاهِدٌ শব্দের অর্থ সাক্ষী। এর উদ্দেশ্য তাই যা সূরা নেসার فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا আয়াতের তাফসীরে দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর কেউ আনুগত্য করেছে এবং কেউ নাফরমানি করেছে। এমনিভাবে নবী করীম ﷺ ও তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। সূরা নিসার আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী (র.) লিখেন : পয়গম্বরগণের এই সাক্ষ্য নিজ নিজ জামানার লোকদের সম্পর্কে হবে যে, তাঁদের দাওয়াত কে কবুল করেছে এবং কে বিরোধিতা করেছে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষ্য তাঁর আমলের লোকদের সম্পর্কে হবে। কেউ কেউ বলেন, এই সাক্ষ্য সমস্ত উম্মতের পুণ্য ও পাপকাজ সম্পর্কে হবে। কেননা কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সকাল-সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পেশ করা হয়। কাজেই তিনি সমস্ত উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন। -[কুরতুবী]

بَشِيرٌ শব্দের অর্থ সুসংবাদদাতা এবং نَذِيرٌ শব্দের অর্থ সতর্ককারী। উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের আনুগত্যশীল মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন এবং কাফের পাপাচারীদেরকে আজাবের ব্যাপারে সতর্ক করবেন। অতঃপর রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ঈমানের সাথে আরো তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঈমানদারদের মধ্যে থাকা বিধেয়– تُوَقِّرُوْهُ - تُعَزِّرُوْهُ এবং تُسَبِّحُوْهُ

تُعَزِّرُوْهُ : শব্দটি تَعْزِيرٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাহায্য করা। দণ্ডকেও এ কারণে تَعْزِيرٌ বলা হয় যে, অপরাধীকে দণ্ড দিলে প্রকৃতপক্ষে তাকে সাহায্য করা হয়। –[মুফরাদাতুল কুরআন]

تُوَقِّرُوْهُ শব্দটি تَوْقِيرٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সম্মান করা। تُسَبِّحُوْهُ শব্দটি تَسْبِيحٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করা। সর্বশেষ শব্দটি নিশ্চিতরূপে আল্লাহর জন্যেই হতে পারে। তাই এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বুঝানোর সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারাও আল্লাহকেই বুঝিয়েছেন। অর্থ এই যে, বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহকে অর্থাৎ, তাঁর দীনকে ও রাসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কেউ কেউ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারা রাসূলকে বুঝিয়ে এরূপ অর্থ করেন যে, রাসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কিন্তু কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, এতে সর্বনামসমূহের বিভিন্নতা জরুরি হয়ে পড়ে, যা অলংকার শাস্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ। এরপর হুদায়বিয়ার ঘটনার দশম অংশে বর্ণিত বায়আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়আত করেছে, তারা যেন স্বয়ং আল্লাহর হাতে বায়আত করেছে। কারণ এই বায়আতের উদ্দেশ্য আল্লাহর আদেশ পালন করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। কাজেই তারা যখন রাসূলের হাতে হাত রেখে বায়আত করল, তখন যেন আল্লাহর হাতেই বায়আত করল। আল্লাহর হাতের স্বরূপ কারও জানা নেই এবং জানার চেষ্টা করাও দুরস্ত নয়।

বায়আতের আসল অর্থ কোনো বিশেষ কাজের জন্যে শপথ গ্রহণ করা। একজন অপরজনের হাতের উপর হাত রেখে শপথবাণী উচ্চারণ করা বায়আতের প্রাচীন ও মাসনূন তরিকা। তবে হাতের উপর হাত রাখা শর্ত বা জরুরি নয়। যে কাজের অঙ্গীকার করা হয়, তা পূর্ণ করা আইনতঃ ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তাই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বায়আতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। এতে আল্লাহ ও রাসূলের কোনো ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَتَحْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْفَتْحُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ح) জিনস صحيح অর্থ আমরা খুললাম। উন্মুক্ত করলাম।

لِيَغْفِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْغُفْرَانُ মূলবর্ণ (غ ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– যেন ক্ষমা করে দেন।

مُسْتَقِيْمًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– সরল পথ। সোজা রাস্তা। হেদায়েতের পথ।

قُلُوْبٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে قَلْبٌ অর্থ– অন্তর।

لِيَزْدَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِزْدِيَادُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ– যাতে আরো বর্ধিত হয়।

ظَانِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার ظَنٌّ মূলবর্ণ (ظ ـ ن ـ ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ ধারণাকারীগণ।

دَائِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّوْرُ মূলবর্ণ (د ـ و ـ ر) জিনস اجوف واوى অর্থ আসন্ন।

تُعَزِّرُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْزِيْر মূলবর্ণ (ع ـ ز ـ ر) জিনস صحيح অর্থ তাকে সাহায্য কর।

تُوَقِّرُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْقِيْرٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ তাকে সম্মান কর।

جُنُوْدٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে, جُنْدٌ – সমস্ত সৈন্যদল।

مُبَشِّرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تفعيل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সুসংবাদ দাতা।

لِتُؤْمِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ء ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– যেন তোমরা ঈমান আনয়ন কর।

تُسَبِّحُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْبِيْحُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাসবীহ পাঠ করতে থাক।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا : এখানে اِنَّا -এর اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, আর نَا হলো ইসমে ইন্না। আর فَتَحْنَا বাক্যটি হলো خبر ان আর لَكَ টা فَتَحْنَا -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর فَتْحًا হলো মাফউলে মুতলাক এবং مُبِيْنًا হলো فَتْحًا -এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ২১৮-২১৯]

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

১০. যারা (হুদায়বিয়াতে) আপনার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে, তারা (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহরই সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে, অতঃপর যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তবে তার অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি তারই উপর বর্তাবে, আর আল্লাহর সাথে তার যে অঙ্গীকার হয়েছে তা যে ব্যক্তি পূর্ণ করবে, বস্তুত আল্লাহ সত্বরই তাকে বিরাট প্রতিদান প্রদান করবেন।

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾

১১. যেসব গ্রামবাসী পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে, তারা অচিরেই আপনাকে বলবে যে, আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবারবর্গ আমাদেরকে অবসর দেয়নি, সুতরাং আমাদের জন্য মার্জনা প্রার্থনা করুন, এরা নিজেদের মুখে সেই সমস্ত কথা বলছে, যা তাদের অন্তরে নেই; আপনি বলে দিন, আচ্ছা, (বল তো) এমন ব্যক্তি কে আছে, যে আল্লাহর সম্মুখে তোমাদের জন্য কোনো বিষয়ের আধিপত্য রাখে? যদি তিনি তোমাদের কোনো অপকার করতে চান অথবা কোনো উপকার করতে চান; বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত কার্যাবলি অবহিত আছেন।

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا

১২. বরং তোমরা মনে করেছ যে, রাসূল ও মু'মিনগণ তাদের পরিবারবর্গের নিকট কখনো ফিরে আসবে না,

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ যারা আপনার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ তারা (প্রকৃত পক্ষে) আল্লাহরই সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে فَمَن نَّكَثَ অতঃপর যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ তবে তার অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি তারই উপর বর্তাবে وَمَنْ أَوْفَىٰ আর যে পূর্ণ করবে بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ আল্লাহর সাথে তার যে অঙ্গীকার হয়েছে তা فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا বস্তুত আল্লাহ সত্বরই তাকে বিরাট প্রতিদান প্রদান করবেন।

১১. سَيَقُولُ لَكَ তারা অচিরেই আপনাকে বলবে الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ যে সব গ্রামবাসী পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবারবর্গ আমাদেরকে অবসর দেয়নি فَاسْتَغْفِرْ لَنَا সুতরাং আমাদের জন্য মার্জনা প্রার্থনা করুন بِأَلْسِنَتِهِمْ يَقُولُونَ এরা নিজেদের মুখে সেই সমস্ত কথা বলছে مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ যা তাদের অন্তরে নেই قُلْ আপনি বলে দিন فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا আচ্ছা; (বল তো) এমন ব্যক্তি কে আছে যে, আল্লাহর সম্মুখে তোমাদের জন্য কোনো বিষয়ের অধিপত্য রাখে? إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا যদি তিনি তোমাদের কোনো অপকার করতে চান أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا অথবা কোনো উপকার করতে চান। بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত কার্যাবলি অবহিত আছেন।

১২. بَلْ ظَنَنتُمْ বরং তোমরা মনে করেছ যে أَن لَّن يَنقَلِبَ কখনো ফিরে আসবে না الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ রাসূল ও মু'মিনগণ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ তাদের পরিবারবর্গের নিকট أَبَدًا কখনো।

وَزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ﴿١٢﴾

** আর এটা তোমাদের অন্তরে ভালোও লাগছিল এবং তোমরা নানা প্রকার কুধারণা করছিলে, আর (এ কারণে) তোমরা ধ্বংসশীল সম্প্রদায় হয়েছ।

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿١٣﴾

১৩. আর যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে না, ফলত আমি কাফেরদের জন্য দোজখ প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٤﴾

১৪. এবং সমগ্র আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করবেন; আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, দয়াময়।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ؕ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥﴾

১৫. যারা পশ্চাতে রয়েছিল, অচিরেই তারা বলবে, যখন তোমরা (খায়বারের) গনিমতের মাল আহরণ করতে রওয়ানা হবে, তখন আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি দিও, তারা (মুনাফিকরা) এটা চায় যে, আল্লাহর নির্দেশকে পরিবর্তন করে ফেলে আপনি বলে দিন, তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না– আল্লাহ পূর্বেই এটা বলে দিয়েছেন, তখন তারা বলবে, বরং তোমরা আমাদেরকে হিংসা করছো; (অথচ মুসলমানদের মনে হিংসার নাম-গন্ধও নেই,) বরং তারা খুব কমই বুঝে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ আর এটা তোমাদের অন্তরে ভালোও লাগছিল وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ এবং তোমরা নানা প্রকার কুধারণা করছিলে وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا আর (এ কারণে) তোমরা ধ্বংসশীল সম্প্রদায় হয়েছ।

১৩. وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আর যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে না فَاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ফলত আমি কাফেরদের জন্য দোজখ প্রস্তুত করে রেখেছি।

১৪. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এবং সমগ্র আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করবেন وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১৫. سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ যারা পশ্চাতে রয়েছিল অচিরেই তারা বলবে اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا যখন তোমরা (খায়বারের) গনিমতের মাল আহরণ করতে রওয়ানা হবে ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ তখন আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি দিও يُرِيْدُوْنَ তারা (মুনাফেকরা) এটা চায় যে اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ আল্লাহর নির্দেশকে পরিবর্তন করে ফেলে قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ আল্লাহ পূর্বেই এটা বলে দিয়েছেন فَسَيَقُوْلُوْنَ তখন তারা বলবে بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا বরং তোমরা আমাদেরকে হিংসা করছ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا বরং তারা খুব কমই বুঝে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত বিষয়বস্তু সেসব মরুবাসীর সাথে সম্পৃক্ত, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার সফরে সঙ্গে চলার আদেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা নানা তাল-বাহানার আশ্রয় নেয়। হুদায়বিয়ার ঘটনার প্রথম অংশে একথা বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে তওবা করে এবং খাঁটি ঈমানদার হয়ে যায়।

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا الخ

আলোচ্য আয়াতসমূহে হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সপ্তম হিজরিতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বর যুদ্ধে গমন করার ইচ্ছা করলেন, তখন শুধু তাদেরকে সঙ্গে নিলেন, যারা হুদায়বিয়ার সফর ও বয়আতে-রিজওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল ﷺ -কে খায়বর বিজয় ও সেখানে প্রভূত গনিমতের মাল লাভের ওয়াদা দিয়েছিলেন। তখন যেসব মরুবাসী ইতঃপূর্বে হুদায়বিয়ার সফরে আহূত হওয়া সত্ত্বেও ওজর পেশ করে অংশগ্রহণে বিরত ছিল, তারাও খয়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল; হয় এ কারণে যে, তারা লক্ষণাদি দৃষ্টে জানতে পেরেছিল যে, খায়বর বিজিত হবে এবং অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে। না হয় এ কারণে যে, মুসলমানদের সাথে আল্লাহর ব্যবহার ও হুদায়বিয়ার সন্ধির বিভিন্ন কল্যাণ দেখে জেহাদের অংশ গ্রহণ না করার কারণে তারা অনুতপ্ত হয়েছিল এবং এখন জেহাদে শরিক হওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। মোটকথা, তাদের জবাবে কুরআন বলেছে يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَمَ اللهِ তারা আল্লাহর কালাম অর্থাৎ, তাঁর আদেশ পরিবর্তন করতে চায়। এই আদেশের অর্থ : খায়বর যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিশেষ করে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্য। এরপর كَذٰلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ বাক্যেও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের এই বিশেষত্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে, কুরআন পাকের কোথাও এই বিশেষত্বের উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় এই বিশেষত্বের ওয়াদাকে 'আল্লাহর কালাম' ও "আল্লাহ বলে দিয়েছেন" বলা কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে?

ওহী শুধু কুরআনে সীমাবদ্ধ নয়, কুরআন ছাড়াও ওহীর মাধ্যমে আদেশ এসেছে এবং রাসূলের হাদীসও আল্লাহর কালামের হুকুম রাখে ঃ আলেমগণ বলেন : হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীর বিশেষত্ব সম্পর্কিত উল্লিখিত ওয়াদা কুরআন পাকের কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং এই বিশেষত্বের ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা "ওহী গায়র-মতলু" অর্থাৎ, অপঠিত ওহীর মাধ্যমে হুদায়বিয়ার সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিয়েছিলেন। এ স্থলে একেই 'আল্লাহর কালাম' ও আল্লাহ্ ইতঃপূর্বে বলে দিয়েছেন' বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, কুরআনের বিধানাবলি ছাড়া যেসব বিধান সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও এই আয়াত অনুযায়ী 'আল্লাহর উক্তির মধ্যে দাখিল। যেসব ধর্মভ্রষ্ট লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসকে দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রমাণ বলেই স্বীকার করে না, এসব আয়াত তাদের ধর্মভ্রষ্টতা ফাঁস করে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট। এখানে আরো একটি আলোচনাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, হুদায়বিয়া সফরের শুরুতে অবতীর্ণ এই সূরার অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا তাফসীর-বিদগণের ঐকমত্যে এখানে "নিকটবর্তী বিজয়" বলে খায়বর বিজয় বোঝানো হয়েছে। এভাবে কুরআনে খায়বর বিজয় ও তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের পাওয়ার কথা এসে গেছে। এটাই "আল্লাহর কালাম" ও "আল্লাহর উক্তির" অর্থ হতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, এই আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা তো আছে; কিন্তু একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হোদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীরাই বিশেষভাবে পাবে, অন্যেরা পাবে না। এই বৈশিষ্ট্যের কথা নিঃসন্দেহে হাদীস দ্বারাই জানা গেছে। অতএব, "আল্লাহর কালাম' ও আল্লাহর উক্তি বলে এখানে হাদীসই বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, "আল্লাহর কালাম" বলে সূরা তওবার এই আয়াতকে বুঝানো হয়েছে–

فَاسْتَاذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ

তাদের এই উক্তি শুদ্ধ নয়। কারণ এই আয়াতগুলো তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যার সময়কাল খায়বর যুদ্ধের পর নবম হিজরি। –(কুরতুবী)

قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا -এতে হুদায়বিয়া থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কে তাকীদ সহকারে বলা হয়েছেঃ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। এই উক্তি বিশেষভাবে খায়বর যুদ্ধের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। ভবিষ্যতে অন্য কোনো জেহাদেও শরিক হতে পারবে না- আয়াত থেকে এটা মনে করা জরুরি নয়। এ কারণেই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে থেকে মুযায়না ও জোহায়না গোত্রদ্বয় পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গি হয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। –[রূহুল-মা'আনী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُبَايِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُبَايَعَةٌ মূলবর্ণ (ب - ى - ع) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে।

نَكَثَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّكْثُ মূলবর্ণ (ن - ك - ث) জিনস صحيح অর্থ– অঙ্গিকার ভঙ্গ করবে।

عَاهَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُعَاهَدَةُ মূলবর্ণ (ع - ه - د) জিনস صحيح অর্থ– অঙ্গীকার করেছে।

اَوْفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْفَاءٌ মূলবর্ণ (و - ف - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– পূর্ণ করেছে।

زُيِّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ز - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– ভালো লাগছিল, সুসজ্জিত করা হয়েছে।

بُوْرًا : এটা بَائِرٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ ধ্বংস হওয়া। ধ্বংসশীল।

مَغَانِمَ : বহুবচন। مَغْنَمٌ একবচন। অর্থ– এমন বস্তু যা ফ্রি অর্জন করা হয়। চাই শত্রু থেকে হোক কিংবা অন্য কারো থেকে।

ذَرُوْنَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و - ذ - ر) জিনস مثال واوى অর্থ– আমাদেরকে অনুমতি দাও, ছেড়ে দাও।

اَلْمُخَلَّفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّخْلِيْفُ মূলবর্ণ (خ - ل - ف) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাৎপদ।

اَلْسِنَتُهُمْ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে لِسَانٌ অর্থ– নিজেদের মুখে।

اَرَادَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি চান।

لَنْ يَّنْقَلِبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى تاكيد بلن در فعل مستقبل معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْقِلَابُ মূলবর্ণ (ق - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ– কখনো ফিরে আসবে না।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتَادُ মূলবর্ণ (ع - ت - د) জিনস صحيح অর্থ– আমি প্রস্তুত করে রেখেছি।

تَحْسُدُوْنَنَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَسَدُ মূলবর্ণ (ح - س - د) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা আমাদেরকে হিংসা করছ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ : এখানে يَدُ اللّٰهِ মুবতাদা فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ টা উহ্য ফে'লের সাথে ظرف متعلق হয়ে খবর। আর فَمَنْ نَّكَثَ الخ বাক্যটি দ্বিতীয় খবর। আবার এটা يُبَايِعُوْنَكَ-এর ফায়েলের যমীর থেকে حال হওয়াও বৈধ। আবার এটা جمله مستانفة ও হতে পারে। فَمَنْ-এর فاء টি استنافيه আর مَنْ হলো ইসমে শর্ত জযম প্রদানকারী মুবতাদা نَكَثَ ফে'লে শর্ত। আর فَاءٌ হলো রাবেতা। اِنَّمَا হলো كافة এবং مكفوفه আর يَنْكُثُ ফে'লে মুযারে' তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُو ফায়েল, আর عَلٰى نَفْسِهٖ টা يَنْكُثُ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর বাক্যটি হলো جواب شرط –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড: পৃ. ২২৩]

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦﴾

১৬. আপনি সেই পশ্চাতে অবস্থানকারী গ্রামবাসীদেরকে বলে দিন, অচিরেই তোমরা এরূপ লোকদের প্রতি আহূত হবে যারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে, তখন যদি তোমরা তা মান্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন, আর যদি (তখনও) তোমরা অবাধ্য হও যেমন ইতঃপূর্বে অবাধ্য হয়েছিলে, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় আজাব প্রদান করবেন।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٧﴾

১৭. (অবশ্য জেহাদে শরিক না হওয়ার দরুন) অন্ধের কোনো গুনাহ হবে না, আর না খঞ্জের কোনো গুনাহ হবে, আর না পীড়িতের কোনো গুনাহ হবে; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করবে, তাকে দাখিল করবেন এমন বেহেশতসমূহে যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, আর যে অবাধ্যাচরণ করবে, তাকে যন্ত্রণাময় আজাবের এ শাস্তি দেবেন।

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾

১৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষতলে আপনার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছিল, আর তাদের অন্তরে যা ছিল, আল্লাহ তাও জানতেন, অনন্তর আল্লাহ তাদের মধ্যে স্বস্তি সৃষ্টি করলেন, আর তাদেরকে একটি আশু বিজয় দান করলেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ আপনি সেই পশ্চাতে আবস্থানকারী গ্রামবাসীদেরকে বলে দিন سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ অচিরেই তোমরা এরূপ লোকদের প্রতি আহূত হবে اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ যারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা تُقَاتِلُوْنَهُمْ হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ করবে اَوْ يُسْلِمُوْنَ অথবা তারা আত্মসমপর্ণ করবে فَاِنْ تُطِيْعُوْا তখন যদি তোমরা তা মান্য কর يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন وَاِنْ تَتَوَلَّوْا আর যদি তোমরা অবাধ্য হও كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ যেমন ইতঃপূর্বে অবাধ্য হয়েছিলে يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন।

১৭. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ (অবশ্য জেহাদে শরিক না হওয়ার দরুন) অন্ধের কোনো গুনাহ হবে না وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ আর না খঞ্জের কোনো গুনাহ হবে وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ আর না পীড়িতের কোনো গুনাহ হবে وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করবে يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ তাকে দাখিল করবেন এমন বেহেশতসমূহে تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে وَمَنْ يَّتَوَلَّ আর যে অবাধ্যাচারণ করবে يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا তাকে যন্ত্রণাময় আজাবের শাস্তি দিবেন।

১৮. لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ যখন তারা বৃক্ষতলে আপনার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছিল فَعَلِمَ আর আল্লাহ তাও জানতেন مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ তাদের অন্তরে যা ছিল فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ অনন্তর আল্লাহ তাদের মধ্যে স্বস্তি সৃষ্টি করলেন وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا আর তাদেরকে একটি আশু বিজয় দান করলেন।

১৯. এবং প্রচুর গনিমতের মালও (দান করেছেন,) যা তারা গ্রহণ করছে; আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾
২০. আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে (আরো) বহু গনিমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা তোমরা গ্রহণ করবে, সুতরাং এক্ষণে তোমাদেরকে এটা প্রদান করলেন এবং (এজন্য বিপক্ষ) লোকদের হস্ত তোমাদের হতে প্রতিরুদ্ধ করে দিলেন, আর যেন এটা ঈমানদারদের জন্য একটা নিদর্শন হয়, আর যেন তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।	وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ج وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾
২১. এবং একটি বিজয় আরো রয়েছে, যা তোমাদের আয়ত্তে আসেনি, আল্লাহ তাকে (নিজ ক্ষমতাধীনে) পরিবেষ্টন করে আছেন; আর আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।	وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾
২২. আর যদি এই কাফেররা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত, তবে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করত, তখন তারা না কোনো বন্ধু পেত, আর না কোনো সাহায্যকারী।	وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾
২৩. আল্লাহ এ নিয়মই করে রেখেছেন, যা পূর্ব হতে চলে আসছে, আর আপনি আল্লাহর নিয়মে কোনোই পরিবর্তন পাবেন না।	سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً এবং প্রচুর গনিমতের মালও (দান করেছেন) يَّاْخُذُوْنَهَا যা তারা গ্রহণ করছে; وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

২০. وَعَدَكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে (আরো) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন مَغَانِمَ كَثِيْرَةً বহু গনিমতের تَاْخُذُوْنَهَا যা তোমরা গ্রহণ করবে فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ সুতরাং এক্ষণে তোমাদেরকে এটা প্রদান করলেন وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ (এ জন্য বিপক্ষ) লোকদের হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিরুদ্ধ করে দিলেন وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ আর যেন এটা ঈমানদারদের জন্য একটা নিদর্শন হয় وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا আর যেন তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

২১. وَاُخْرٰى এবং একটা বিজয় আরো রয়েছে لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا যা তোমাদের আয়ত্তে আসেনি قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا আল্লাহ তাকে পরিবেষ্টন করে আছেন وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا আর আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

২২. وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যদি এই কাফেররা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ তবে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করত। ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا তখন তারা না কোনো বন্ধু পেত, আর না কোনো সাহায্যকারী।

২৩. سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ আল্লাহ এ নিয়মই করে রেখেছেন যা পূর্ব হতে চলে আসছে وَلَنْ تَجِدَ আর আপনি পাবেন না لِسُنَّةِ اللّٰهِ আল্লাহর নিয়মে تَبْدِيْلًا কোনোই পরিবর্তন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيْمًا [١٧]

শানে নুযূল-১ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا আয়াতাংশ যখন নাজিল হয়, তখন তৎকালীন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমাদের অবস্থা কেমন হবে হে আল্লাহর রাসূল ﷺ? সাহাবায়ে কেরামের সে জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[কুরতুবী ২৩২/১৬]

শানে নুযূল-২ : হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ যা বলেন, তা আমি লিখতে ছিলাম। আর আমার কলমকে আমার কানে রেখে বসে ছিলাম। জিহাদের হুকুম নাজিল হবার কারণেই তৎমুহূর্তে একজন অন্ধ লোক উপস্থিত হয়ে বলল, আমার জন্যে বিধান কি হবে? আমি তো একজন অন্ধ লোক। অন্ধ সাহাবীর এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[ফতহুল কাদীর ৫২/৫]

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا [١٨]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুভিয়া, প্রমুখ হযরত সালমা বিন আকওয়া (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা একদা দুপুরের সময় বিশ্রাম করতে ছিলাম, এমন সময়েই রাসূল ﷺ -এর পক্ষ হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করছিল যে, হে লোক সকল! বয়াত গ্রহণ কর। রূহুল কুদুস অবতীর্ণ হয়েছে। তখন আমরা সকলেই রাসূল ﷺ -এর নিকট সমবেত হলাম। সে সময়ে তিনি ঝাউ বৃক্ষের নিচে অবস্থান গ্রহণ করছিলেন। সেখানেই আমরা বয়আত গ্রহণ করেছি। সুতরাং সে বয়আত এবং সেই বয়আতে অংশ গ্রহণকারী ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিতা সুসংবাদ বহন করেই আলোচ্য আয়াতের অবতারণা হয়েছে। -[ইবনে কাছীর ১৯১/৪, ফতহুল কাদীর ৫২/৫, দুররে মানছূর ৭৩/৫]

হুদায়বিয়ার সফর থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ পরে তওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল : হুদায়বিয়ার সফর থেকে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, তাদের সবাইকে খায়বরের জেহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল অথচ তাদের মধ্যে সবাই মুনাফিক ছিল না। কেউ কেউ মুসলমানও ছিল। কেউ কেউ যদিও তখন মুনাফিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তাই এ ধরনের লোকদের সন্তুষ্টির জন্যে পরবর্তী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী খায়বর যুদ্ধ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা খাঁটি মুসলমান এবং মনে-প্রাণে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যেও ভবিষ্যতে আরও সুযোগ-সুবিধা আসবে। এসব সুযোগের কথা কুরআন পাক একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বর্ণনা করেছে, যা রাসূলে কারীম ﷺ-এর ইন্তেকালের পর প্রকাশ পেয়েছে। এরশাদ হয়েছে سَتُدْعَوْنَ إِلٰى قَوْمٍ أُولِيْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ অর্থাৎ, এক সময় আসবে, যখন তোমাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দেওয়া হবে। এই জিহাদ একটি শক্তিশালী যোদ্ধাজাতির সাথে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই জিহাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়নি। কেননা প্রথমতঃ এরপর তিনি কোনো যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন বলে প্রমাণ নেই; দ্বিতীয়তঃ এরপর এমন কোনো বীর যোদ্ধা জাতির সাথে মোকাবিলাও হয়নি, যাদের বীরত্বের উল্লেখ কুরআন পাক করেছে। তাবুক যুদ্ধে যদিও যোদ্ধাজাতির সাথে মোকাবিলা ছিল; কিন্তু এই যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং এতে কোনো যুদ্ধও সংঘটিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা প্রতিপক্ষের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। ফলে তারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণই হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম বিনা যুদ্ধে তাবুক থেকে ফিরে আসেন। হুনায়ন যুদ্ধেও মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং তখন কোনো সশস্ত্র ও বীর যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে মোকাবিলাও ছিল না। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, আয়াতে পারস্য ও রোম অর্থাৎ কেসরা ও কায়সারের জাতিসমূহ বোঝানো হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর আমলে জিহাদ হয়েছে। -[কুরতুবী]

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) বলেন : আমরা কুরআনের এই আয়াত পাঠ করতাম : কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে, এখানে কোন জাতিকে বোঝানো হয়েছে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা.) -এর খেলাফতকালে তিনি আমাদেরকে বনী-হুনায়ফা ও মোসায়লামাতুল কাযযাবের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার দাওয়াত দেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, উক্ত আয়াতে এই জাতিকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ ও বৈপরীত্য নেই। পরবর্তীকালের শক্তিশালী সকল প্রতিপক্ষই এর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী (র.) এই রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করার পর বলেন : হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আজমের (রা.)-এর খেলাফত যে সত্যের অনুকূলে ছিল, এ আয়াত তার প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে স্বয়ং কুরআন তাঁদের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করেছে।

تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ হযরত উবাই –এর কেরাতে حَتّٰى يُسْلِمُوْا বলা হয়েছে। তদনুযায়ী কুরতুবী أو অব্যয়কে حَتّٰى -এর অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ, সেই জাতির সাথে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা আনুগত্যশীল হয়ে যায়, ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামি রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ –হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উপরের আয়াতে যখন জিহাদে অংশগ্রহণে পশ্চাৎপদের জন্যে শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে, তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কতক বিকলাঙ্গ লোক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা জিহাদে অংশগ্রহণ করার যোগ্য নয়। ফলে তারাও নাকি এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ণকে জিহাদের আদেশের আওতাবহির্ভূত করে দেওয়া হয়েছে। –[কুরতুবী]

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ –এখানে হুদায়বিয়ার শপথ বোঝানো হয়েছে। ইতঃপূর্বেও إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ আয়াতে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতও তারই তাকিদ। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই একে "বয়াতে-রিযওয়ান" তথা সন্তুষ্টির শপথও বলা হয়। এর উদ্দেশ্য শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করা এবং তাদেরকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর তাকিদ করা। বোখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার দিনে আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন– أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ অর্থাৎ, তোমরা ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সহীহ মুসলিমে উম্মে বাশার থেকে বর্ণিত আছে لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ। অর্থাৎ, যারা এই বৃক্ষের নীচে শপথ গ্রহণ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। -(মাযহারী) তাই এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অনুরূপ হয়ে গেছে। তাঁদের সম্পর্কে যেমন কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ বর্ণিত রয়েছে, তেমনি হুদায়বিয়ার শপথে অংশগ্রহণকারীদের জন্যেও এরূপ সুসংবাদ উল্লিখিত আছে।

এসব সুসংবাদ সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁদের সবার খাতেমা অর্থাৎ, জীবনাবসান ঈমান ও পছন্দনীয় সৎকর্মের উপরে হবে। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টির এই ঘোষণা এ বিষয়েরই নিশ্চয়তা দেয়।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি দোষারোপ এবং তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করা এই আয়াতের পরিপন্থি :

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছেঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যেসব সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে ক্ষমা ও মাগফেরাতের ঘোষণা দিয়েছেন, যদি তাঁদের তরফ থেকে কোনো ভুল-ত্রুটি অথবা গোনাহ্ হয়েও যায়, তবে এই আয়াত তাঁদের ক্ষমা ঘোষণা করছে। এমতাবস্থায় তাঁদের যেসব কর্মকাণ্ড প্রশংসনীয় ও উত্তম নয়, সেগুলোকে আলোচনা ও বিতর্কের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা দুর্ভাগ্যজনক এবং এই আয়াতের পরিপন্থি। রাফেযী সম্প্রদায় হযরত আবূ বকর, ওমর ও অন্যান্য সাহাবীর প্রতি কুফর-নেফাকের দোষ আরোপ করে। আলোচ্য আয়াত ওদের সেসব ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করে।

রিযওয়ান বৃক্ষ : আয়াতে যে বৃক্ষের উল্লেখ আছে, সেটা ছিল একটা বাবলা বৃক্ষ। কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর কিছু লোক সেখানে গমন করত এবং এই বৃক্ষের নীচে নামাজ আদায় করত। হযরত ফারুকে আযম (রা.) দেখলেন যে, ভবিষ্যতে অজ্ঞ লোকেরা পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় এই বৃক্ষের পূজা শুরু করে দিতে পারে। এই আশঙ্কায় তিনি বৃক্ষটি কেটে ফেলেন। কিন্তু বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত তারেক ইবনে আব্দুর রহমান বলেন : আমি একবার হজে যাওয়ার পথে এক জায়গায় কিছু সংখ্যক লোককে একত্রিত হয়ে নামাজ পড়তে দেখলাম। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কোন মসজিদ? তারা বলল : এটা সেই বৃক্ষ, যার নীচে রাসূলুল্লাহ ﷺ রিযওয়ানের শপথ গ্রহণ

করেছিলেন। আমি অতঃপর সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিবের কাছে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বিবৃত করলাম। তিনি বললেন : আমার পিতা বয়াতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন, আমরা যখন পরবর্তী বছর মক্কায় উপস্থিত হই, তখন অনেক খোঁজাখুজির পরও বৃক্ষটির সন্ধান পাইনি। অতঃপর সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যেসব সাহাবী এই বয়াতে শরিক ছিলেন, তাঁরা তো এই বৃক্ষের সন্ধান পাননি, আর তুমি জেনে ফেলেছ। আশ্চর্যের বিষয় বটে। তুমি কি তাঁদের চাইতে অধিক জ্ঞাত? -[রূহুল-মা'আনী]

এ থেকে জানা গেল যে, পরবর্তীকালে লোকেরা নিছক অনুমানের মাধ্যমে কোনো একটি বৃক্ষ নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল এবং তার নীচে জড়ো হয়ে নামাজ পড়া শুরু করেছিল। হযরত ফারূকে আযম (রা.) এ কথাও জানতেন যে, এটা সেই বৃক্ষ নয়। তাই অবান্তর নয় যে, তিনি শিরকের আশঙ্কাবোধ করে সেই বৃক্ষটিও কর্তন করে ফেলেন।

খায়বর বিজয় : খায়বর প্রকৃতপক্ষে বহু জনপদ, দূর্গ ও বাগ-বাগিচা সমন্বিত একটি বিশেষ এলাকার নাম। –[মাযহারী]

وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا –এই আসন্ন বিজয়ের অর্থ সর্বসম্মতভাবে খায়বর বিজয়। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এই বিজয় বাস্তবরূপ লাভ করে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় দশ দিন এবং অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিশ দিন অবস্থান করেন। এরপর খায়বরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যিলহজ মাসে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সপ্তম হিজরির মহররম মাসে খায়বর গমন করেন। সফর মাসে খায়বর বিজিত হয়। ওয়াকেদীর মাগাযী অধ্যায়ে তাই বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজারের মতে এ অভিমতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। –[মাযহারী]

মোটকথা, প্রমাণিত হলো যে, খায়বর বিজয়ের ঘটনা হুদায়বিয়ার সফরের বেশ কিছুদিন পরে সংঘটিত হয়। সূরা ফাত্হ যে হুদায়বিয়ার সফরকালে অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। হ্যাঁ, এ বিষয়ের মতভেদ রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সূরা তখনই নাজিল হয়েছিল, না কিছুসংখ্যক আয়াত পরে নাজিল হয়েছে। প্রথমোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহে খায়বরের আলোচনা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে হয়েছে এবং ঘটনাটি যে আকাট্য ও নিশ্চিত একথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শেষোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ পরে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا –এতে খায়বরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বোঝানো হয়েছে, যা দ্বারা মুসলমানদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ –এখানে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ইসলামি বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে, সেগুলো বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত সম্পদ আল্লাহর নির্দেশে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যে দেওয়া হয়েছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত সম্পদ সবার জন্যে ব্যাপক। এ থেকেই জানা যায় যে, বিশেষত্বের আদেশ এসব আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি; বরং তা পৃথক ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা কর্মে পরিণত করেন এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছে ব্যক্ত করেন।

وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ –আয়াতে খায়বরবাসী কাফের সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই জেহাদের অধিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দেননি। ইমাম বগভী (র.) বলেন : গাতফান গোত্র খায়বরের ইহুদিদের সাহায্যার্থে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওয়ানা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা চিন্তা করতে লাগল, যদি আমরা খায়বরে চলে যাই, তবে মুসলমানদের কোনো লশকর আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের বাড়ি-ঘরে চড়াও হতে পারে। এই ভেবে তাদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। –[মাযহারী]

وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا –সরল পথের আমল এবং হেদায়েত তো তাঁদের পূর্বে থেকেই অর্জিত ছিল। কিন্তু পূর্বেও বলা হয়েছে যে, হেদায়েতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এখানে সেই স্তর বোঝানো হয়েছে, যা অর্জিত ছিল না। অর্থাৎ, আল্লাহর উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং ঈমানী শক্তির বৃদ্ধি।

وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনো তাদের ক্ষমতাসীন নয়। এসব বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা বিজয় রয়েছে দেখে কোনো কোনো তাফসীরবিদ আয়াতে মক্কা বিজয়কেই বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষা ব্যাপক হেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজয়ই এর অন্তর্ভুক্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُدْعَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءً মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ তোমাদেরকে আহ্বান করা হবে।

تُقَاتِلُوْنَهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُقَاتَلَةُ মূলবর্ণ (ق ـ ت ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা যুদ্ধ করবে।

تُطِيْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা মান্য কর।

يَتَوَلَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّى মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– অবাধ্যাচরণ করবে।

اَثَابَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ث ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ তাদেরকে দান করলেন।

اَحَاطَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحَاطَةٌ মূলবর্ণ (ح ـ و ـ ط) জিনস اجوف واوى অর্থ পরিবেষ্টন কর আছেন।

وَعَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْدٌ ـ عِدَةٌ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

عَجَّلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْجِيْلُ মূলবর্ণ (ع ـ ج ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– এক্ষণে করলেন।

كَفَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَفُّ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রতিরুদ্ধ করে দিলেন।

لَمْ تَقْدِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَدْرُ মূলবর্ণ (ق ـ د ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের আয়ত্তে আসেনি।

قَاتَلَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُقَاتَلَةُ মূলবর্ণ (ق ـ ت ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত।

خَلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার خُلُوٌّ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ অতিবাহিত হয়েছে। পূর্ব হতে চলে আসছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَعَلِمَ مَافِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا : এখানে فاء টি আতেফা আর عَلِمَ ফে'ল, তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর هو ফায়েল (যা আল্লাহর দিকে ফিরেছে) আর বাক্যটি পূর্ব বর্ণিত يُبَايِعُوْنَكَ এর উপর আতফ হয়েছে। আর মওসূল مَا টা হলো مفعول به এবং فِىْ قُلُوْبِهِمْ টা উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে সেলাহ্ হয়েছে। فَاَنْزَلَ টা فَعَلِمَ-এর উপর আতফ হয়েছে। اَلسَّكِيْنَةَ হলো مفعول به আর عَلَيْهِمْ টা اَنْزَلَ-এর সাথে متعلق আর قَرِيْبًا টাও আতফ হয়েছে এবং هُمْ হলো مفعول به আর فَتْحًا হলো দ্বিতীয় مفعول به এবং اَثَابَهُمْ হলো فَتْحًا-এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৩০]

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿۲۴﴾

২৪. আর তিনি এমন যে, তিনি তাদের হস্ত তোমাদের হতে আর তোমাদের হস্ত তাদের হতে প্রতিরুদ্ধ করে দিয়েছেন মক্কার সরেজমিনে তাদেরকে তোমাদের আয়ত্তে এনে দেওয়ার পর; আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি দেখছিলেন।

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۲۵﴾

২৫. এরা ঐ সমস্ত লোক যারা কুফরি করেছে এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারাম হতে প্রতিরোধ করেছে এবং প্রতিরুদ্ধ কুরবানির জন্তুগুলো তাদের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত করা হতে বাধা দান করেছে; আর যদি বহু মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী না থাকত, যাদের সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জানতে না, অর্থাৎ তাদের নিষ্পেষিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, যদ্দরুন তাদের কারণে অজ্ঞাতসারে তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সমস্ত ব্যাপারই চুকিয়ে দেওয়া হতো কিন্তু তা এজন্য করা হয়নি, যেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতে দাখিল করেন, যদি তারা (ঐ মুসলমানগণ মক্কা হতে) সরে পড়ত, তবে আমি তাদের মধ্যকার কাফেরদেরকে যন্ত্রণাময় আজাব প্রদান করতাম।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ আর তিনি এমন যে, যিনি প্রতিরুদ্ধ করে দিয়েছেন اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ তাদের হস্ত তোমাদের থেকে وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ তোমাদের হস্ত তাদের থেকে بِبَطْنِ مَكَّةَ মক্কার সরেজমিনে مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ তাদেরকে তোমাদের আয়ত্তে এনে দেওয়ার পর। وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি দেখছিলেন।

২৫. هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এরা ঐ সমস্ত লোক যারা কুফরি করেছে وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারাম হতে প্রতিরোধ করেছে وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ এবং প্রতিরুদ্ধ কুরবানির জন্তুগুলো তাদের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত করা হতে বাধা দান করেছে وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ আর যদি বহু মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী না থাকত لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ যাদের সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জানতে না اَنْ تَطَئُوْهُمْ অর্থাৎ তাদের নিষ্পেষিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকত فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ যদ্দরুন তাদের কারণে তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে بِغَيْرِ عِلْمٍ অজ্ঞাতসারে তবে সমস্ত ব্যাপারই চুকিয়ে দেওয়া হতো কিন্তু তা এ জন্য করা হয়নি لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ যেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতে দাখিল করেন لَوْ تَزَيَّلُوْا যদি তারা সরে পড়ত لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ তবে আমি তাদের মধ্যকার কাফেরদেরকে প্রদান করতাম عَذَابًا اَلِيْمًا যন্ত্রণাময় আজাব।

২৬. যখন ঐ কাফেররা নিজেদের অন্তরে অভিমানকে স্থান দিয়েছিল, আর অভিমানও ছিল বর্বরতাসুলভ; অনন্তর আল্লাহ আপন রাসূলকে এবং মু'মিনদেরকে নিজের পক্ষ হতে ধৈর্যশক্তি প্রদান করলেন, আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরহেজগারির বাক্যের উপর অটল রাখলেন এবং তারাই এর অধিক উপযোগী ও যোগ্য ছিল; আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।	إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾
২৭. নিঃসন্দেহে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যা বাস্তবানুরূপই (ছিল) যে, তোমরা ইনশাআল্লাহ মসজিদে হারামে (অর্থাৎ, মক্কা নগরীতে) অবশ্যই নিরাপদে প্রবেশ করবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ মাথা মুড়াতে থাকবে, আর কেউ চুল কাটতে থাকবে, তোমাদের কোনো প্রকার ভয় থাকবে না; পরন্তু আল্লাহ ঐ সমস্ত বিষয় অবগত আছেন যা তোমরা জান না, অনন্তর তিনি এর (অর্থাৎ এ স্বপ্ন বিবরণ সত্যে পরিণত হওয়ার) পূর্বে এক আশু বিজয় প্রদান করেছেন।	لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾
২৮. তিনি (আল্লাহ) এমন যে, তিনি আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করেন; আর আল্লাহই যথেষ্ট সাক্ষী।	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

ع ١١

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ যখন ঐ কাফেররা নিজেদের অন্তরে অভিমানকে স্থান দিয়েছিল حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ আর অভিমানও ছিল বর্বরতা সুলভ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ অনন্তর আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে ধৈর্যশক্তি প্রদান করলেন عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ আপন রাসূলকে এবং মু'মিনদেরকে وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরহেজগারীর বাক্যের উপর অটল রাখলেন وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا এবং তারাই এর অধিক উপযোগী ও যোগ্য ছিল وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

২৭. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا নিঃসন্দেহে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন بِالْحَقِّ যা বাস্তবানুরূপই ছিল যে, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ তোমরা মসজিদে হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে إِنْ شَاءَ اللَّهُ ইনশাআল্লাহ آمِنِينَ নিরাপদে مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ তখন তোমাদের কেউ মাথা মুড়াতে থাকবে وَمُقَصِّرِينَ আর কেউ চুল কাটতে থাকবে لَا تَخَافُونَ তোমাদের কোনো প্রকার ভয় থাকবে না فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا পরন্তু আল্লাহ ঐ সমস্ত বিষয় অবগত আছেন যা তোমরা জান না فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ অনন্তর তিনি এর পূর্বে প্রদান করেছেন فَتْحًا قَرِيبًا এক আশু বিজয়।

২৮. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ তিনি (আল্লাহ) এমন যে, তিনি আপন রাসূলকে পাঠিয়েছেন بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ হেদায়েত ও সত্য ধর্ম দিয়ে لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ যেন তাকে সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করেন। وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا আর আল্লাহই যথেষ্ট সাক্ষী।

২৯. মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল; আর যারা তাঁর সাহচার্যপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোরতর, (কিন্তু) নিজেদের মধ্যে সদয়, হে শ্রোতা! তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে– কখনো রুকূ' করছে, কখনো সেজদা করছে, (আর) আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় লিপ্ত রয়েছে, তাদের (বন্দেগির) চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলের উপর সেজদার কারণে পরিস্ফুট হয়ে আছে; এটা তাদের গুণাবলি তাওরাতে রয়েছে, আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন শস্য– সে (প্রথমে) স্বীয় অংকুর বের করল অতঃপর (জমি হতে খাদ্য আহরণ করে) তাকে শক্তিশালী করল, অতঃপর হৃষ্টপুষ্ট হলো, তৎপর তা নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেল, ফলে তা কৃষককে আনন্দ দিতে লাগল, যেন তাদের (এ উন্নতির) দ্বারা কাফেদেরকে (হিংসার আগুনে) পুড়িয়ে দেয়; যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা এবং বড় প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ؗ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۖۛ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ۟ۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۲۹﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ আর যারা তাঁর সহচার্যপ্রাপ্ত হয়েছে اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোরতর رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ (কিন্তু) নিজেদের মধ্যে সদয় تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا হে শ্রোতা! তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে কখনো রুকূ করছে, কখনো সেজদা করছে يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় লিপ্ত রয়েছে سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ তাদের চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হয়ে আছে مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ সেজদার কারণে ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ এটা তাদের গুণাবলি তাওরাতে রয়েছে وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ যেমন শস্য সে (প্রথমে) স্বীয় অঙ্কুর বের করল فَاٰزَرَهٗ অতঃপর তাকে শক্তিশালী করল فَاسْتَغْلَظَ অতঃপর হৃষ্টপুষ্ট হলো فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ তৎপর তা নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেল يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ফলে তা কৃষককে আনন্দ দিতে লাগল لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ যেন তাদের দ্বারা কাফেরদেরকে পুড়িয়ে দেয় وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ক্ষমা এবং বড় প্রতিদানের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا [২৪]

শানে নুযূল–১ : ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী হযরত আনাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হুদায়বিয়া অভিযান কালে মক্কাবাসীদের স্বশস্ত্র আশি জন মানুষ জাবালে তানঈমের উপর আক্রমণ করার জন্যে যখন অবতরণ করল, যাদের লক্ষ্য ছিল একমাত্র রাসূল ﷺ -এর ঘোড়াটি। তখন রাসূল ﷺ তাদের মোকাবিলা করার জন্যে আহবান করলেন। ফলে সাহাবায়ে কেরাম তাদের সবাইকে ধরে ফেলেন। তবে রাসূল ﷺ তাদেরকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলেন। ক্ষমার এমন অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : আহমদ, নাসায়ী ও হাকেম হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাজাল (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে কুরআনে বর্ণিত বৃক্ষটির নীচে ছিলাম, তখন ত্রিশ জন স্বশস্ত্র লোক আমাদের মোকাবিলায় নেমে এলো। এরা আমাদের মুখোমুখি জামায়েত হলে রাসূল ﷺ তাদের মোকাবিলা করার জন্যে ডাকলেন, অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বধির করে দেন। মতান্তরে আল্লাহ তাদের অন্ধ করে দেন। সুতরাং আমরা তাদেরকে ধরে নিয়ে এলাম। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি কারোও চুক্তির ভিত্তিতে এসেছ না কি কারো নিরাপত্তায় এসেছ? তারা বলল, না। তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ১৯২/৪ রূহুল মা'আনী ১১১/২৬/১৩, কুরতুবী ২৩৮/১৬,ফতহুল কাদীর ৫২/৫, দুররে মানছূর ৭৫/৫]

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ أَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا [٢٥]

শানে নুযূল : জুনাইদ বিন সাবী' এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে কাছীর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি দিনের প্রথম দিকে রাসূল ﷺ-এর মুকাবিলায় যুদ্ধ করেছি কাফের থেকে এবং দিনের শেষ দিকে রাসূল ﷺ -এর সাথে থেকে মুসলমান হয়ে জিহাদ করেছি। সে মুহূর্তে আমরা তিন পুরুষ এবং নয়জন মহিলা ছিলাম। আমাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ১৯৩/৪]

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا [٢٧]

শানে নুযূল–১ : হযরত কাতাদাহ বলেন, হুজুর ﷺ স্বপ্ন যোগে দেখতে পেয়ে ছিলেন যে, তিনি নিরাপদভাবে হলক করে মক্কায় প্রবেশ করছেন। অতঃপর কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়া যখন চুক্তি সম্পাদন করেন, তখন মুনাফিকরা সন্দেহ পোষণ করতে লাগল। তারা এমনও বলতে লাগল যে, রাসূল ﷺ বলছিলেন যে, তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন। তাদের সমালোচনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৪৬/২৬]

শানে নুযূল–২ : মুজাহিদ হতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ হুদাইবিয়ায় স্বপ্নে দেখতে পেয়েছেন যে, তিনি ও সাহাবায়ে কেরামগণ মক্কায় নিরাপদভাবেই প্রবেশ করলেন এবং হলক করেছেন এবং কেউ কেউ কসরও করেছেন। সেই স্বপ্ন রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামের নিকট বর্ণনা করে শোনালেন। সুতরাং তারা সুসংবাদ গ্রহণ করেন এবং ধারণা করেছেন যে, তারা এবৎসরই মক্কায় গমন করবেন। রাসূল ﷺ -এর স্বপ্ন সত্য বলেও তারা ব্যক্ত করেন। তবে বাস্তবিকভাবে তা প্রতিফলিত হতে যখন বিলম্ব দেখতে পেল, তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল, আব্দুল্লাহ বিন নুফাইল ও রিফাআহ বিন হারিছ প্রমুখ তিরস্কার স্বরূপ বলতে লাগল, আল্লাহর কসম আমরাতো হলক করিনি (মাথা কামাইনি) কসর (চুলখাটো) করিনি এবং মসজিদে হারামও দেখতে পাইনি। তাদের এ তিরস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

–[রূহুল মা'আনী ১২০/২৬/১৩, বাহরে মুহীত্ব ৯৯/৮]

بِبَطْنِ مَكَّةَ -এর আসল অর্থ মক্কা শহরই; কিন্তু এখানে হুদায়বিয়ার স্থান বোঝানো হয়েছে। মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ার কারণে হুদায়বিয়াকেই "বাতনে মক্কা" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ হুদয়বিয়ার কিছু অংশকে হরমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই আয়াত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ এ থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পর মক্কায় প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কুরবানি করে ইহরাম থেকে হালাল হওয়া তার পক্ষে অপরিহার্য। এতে কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এই কুরবানি বাধাপ্রাপ্তির স্থানেই হতে পারে, না অন্যান্য কুরবানির ন্যায় এর জন্যেও হরমের অভ্যন্তরে হওয়া শর্ত? হানাফীদের মতে এর জন্যে হারামের সীমানা শর্ত। আলোচ্য আয়াত তাদের প্রমাণ। এখানে এই কুরবানির জন্যে কুরআন একটি বিশেষ স্থান সাব্যস্ত করেছে, যেখানে পৌঁছতে কাফেররা মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল। এখানে কথা থাকে যে, খোদ হানাফী আলেমগণ একথাও বলেন যে, হুদায়বিয়ার কতক অংশ হরমের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় হরমে প্রবেশে বাধাদান কিরূপে প্রমাণিত হয়? জবাব এই যে, যদিও এই কুরবানি হরমের যে কোনো অংশে করে দেওয়া যথেষ্ট; কিন্তু মীনার অভ্যন্তরে "মানহার" (কুরবানগাহ্) নামে যে বিশেষ স্থান রয়েছে, সেখানে কুরবানি করা উত্তম। কাফেররা তখন মুসলমানদেরকে এই উত্তম স্থানে জন্তু নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছেন।

فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ - مَعَرَّة শব্দের অর্থ কেউ কেউ গোনাহ্ বর্ণনা করেছেন, কেউ সাধারণ ক্ষতি এবং কেউ দোষ বর্ণনা করেছেন। এ স্থলে শেষোক্ত অর্থই বাহ্যতঃ সঙ্গত। কারণ যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত এবং অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের হাতে মক্কায় আটক মুসলমানগণ নিহত হতো, তবে এটা একটা দোষ ও লজ্জাকর ব্যাপার হতো। কাফেররা মুসলমানদেরকে লজ্জা দিত যে, তোমরা তোমাদের দ্বীনি ভাইদেরকে হত্যা করেছ। এছাড়া এটা ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল। নিহত মুসলমানদের ক্ষতি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। হত্যাকারী মুসলমানগণও অনুতাপ ও আক্ষেপের অনলে দগ্ধ হতো।

সাহাবায়ে কেরামকে দোষত্রুটি থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : ইমাম কুরতুবী বলেন : অজ্ঞাতসারে এক মুসলমানের হাতে অন্য মুসলমান মারা যাওয়া গোনাহ্ তো নয়; কিন্তু দোষ, লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপের কারণ অবশ্যই; ভুলবশতঃ হত্যার কারণে রক্তপণ ইত্যাদি দেওয়ারও বিধান আছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের সাহাবীদেরকে এ থেকেও নিরাপদ রেখেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবায়েকেরাম যদিও পয়গম্বরগণের ন্যায় নিষ্পাপ নন, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁদেরকে ভুলভ্রান্তি ও দোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতির ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটাই তাঁদের সাথে আল্লাহর ব্যবহার।

لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের অন্তরে সংযম সৃষ্টি করে যুদ্ধ না হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি এবং মক্কায় আটক মুসলমানদের প্রতি রহমত করার জন্যে এসব আয়োজন করা হয়েছে।

لَوْ تَزَيَّلُوا - تَزَيُّلٌ শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মক্কায় আটক মুসলমানগণ যদি কাফেরদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হতো এবং মুসলমানগণ তাদেরকে চিনে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিতে পারত, তবে এই মুহূর্তেই কাফেরদেরকে মুসলমানদের হাতে শাস্তি প্রদান করা হতো। কিন্তু মুশকিল এই যে, আটক দুর্বল মুসলমান পুরুষ ও নারী কাফেরদের মধ্যেই মিশ্রিত ছিল। যুদ্ধ হলে তাদেরকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধই মওকুফ করে দিলেন।

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا –"কালেমায়ে- তাকওয়া" বলে তাকওয়া অবলম্বনকারী কালেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তাওহীদ ও রিসালাতের কালেমা। এই কালেমাই তাকওয়ার ভিত্তি। তাই একে কালেমায়ে-তাকওয়া বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামকে এই কালেমার অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত আখ্যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকের লাঞ্ছনা প্রকাশ করে দিয়েছেন, যা তাঁদের প্রতি কুফর ও নিফাকের দোষ আরোপ করে। আল্লাহ তো তাঁদেরকে কালেমায়ে ইসলামের অধিক যোগ্য বলেন, আর এই হতভাগারা তাঁদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

হুদায়বিয়ার সন্ধি চূড়ান্ত হয়ে গেলে একথা স্থির হয়ে যায় যে, এখন মক্কায় প্রবেশ এবং ওমরা পালন ব্যতিরেকেই মদিনায় ফিরে যেতে হবে। বলাবাহুল্য, সাহাবায়ে কেরাম ওমরা পালনের সংকল্প রসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে করেছিলেন, যা এক প্রকার ওহী ছিল। এখন বাহ্যতঃ এর বিপরীত হতে দেখে কারো কারো অন্তরে এই সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল যে, (নাউযুবিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বপ্ন সত্য হলো না। অপরদিকে কাফের-মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করল যে, তোমাদের রাসূলের স্বপ্ন সত্য নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[বায়হাকী]

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ - صِدْقٌ শব্দটি كِذْبٌ -এর বিপরীতে কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। যে কথা বাস্তবের অনুরূপ, তাকে صِدْقٌ এবং যে কথা অনুরূপ নয়, তাকে كِذْبٌ বলা হয়। মাঝে মাঝে কাজকর্মের জন্যেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। তখন এর অর্থ হয় কোনো কাজকে বাস্তবায়িত করা; যেমন কুরআনে আছে– رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ অর্থাৎ, তারা তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে। এ সময় صِدْقٌ শব্দের দু'টি مَفْعُولٌ থাকে, যেমন আলোচ্য আয়াতে প্রথম مَفْعُولٌ হচ্ছে رَسُولَهُ এবং দ্বিতীয় مَفْعُولٌ হচ্ছে رُؤْيَا আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নের ব্যাপারে সাচ্চা-সত্য দেখিয়েছেন। -(বায়যাভী) যদিও এই সাচ্চা দেখানো ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ছিল; কিন্তু একে অতীত পদ বাচ্য ব্যক্ত করে এর নিশ্চিত ও অকাট্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে– لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অর্থাৎ, মসজিদে হারামে প্রবেশ সংক্রান্ত আপনার স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ বছর নয়- এ বছরের পরে। স্বপ্নে মসজিদে-হারামে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। পরম ঔৎসুক্যবশতঃ সাহাবায়ে কেরাম এ বছরই সফরের সংকল্প করে ফেললেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ ও

তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। এতে আল্লাহ তা'আলার বিরাট রহস্য নিহিত ছিল, যা হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। সেমতে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) প্রথমেই হযরত ওমর (রা.)-এর জবাবে বলেছিলেনঃ আপনার সন্দেহ করা উচিত নয়, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বপ্নে কোনো সময় ও বছর নির্দিষ্ট ছিল না। এখন না হলে পরে অবশ্যই হবে। -[কুরতুবী]

ভবিষ্যৎ কাজের জন্যে "ইনশাআল্লাহ" বলার তাকীদ : এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মসজিদে হারামে প্রবেশের সাথে যা ভবিষ্যতে হওয়ার ছিল– 'ইনশাআল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ নিজের চাওয়া সম্পর্কে নিজেই জ্ঞাত। তাঁর এরূপ বলার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু স্বীয় রাসূল ﷺ ও বান্দাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এস্থানে আল্লাহ তা'আলাও 'ইনশাআল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। –(কুরতুবী)

مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ –সহীহ্ বোখারীতে আছে, পরবর্তী বছর কাযা ওমরায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র কেশ কাঁচি দ্বারা কর্তন করেছিলেন। এটা কাযা ওমরারই ঘটনা। কেননা বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ মস্তক মুণ্ডিত করেছিলেন। –[কুরতুবী]

فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا –অর্থাৎ, এ বছরই তোমাদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশ এবং ওমরাহ করিয়ে দিতে আল্লাহ তা'আলা সক্ষম ছিলেন। পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার মধ্যে বড় বড় রহস্য নিহিত ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা জানতেন- তোমরা জানতে না। তন্মধ্যে এক রহস্য এটাও ছিল যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছিল খায়বর বিজিত হয়ে মুসলমানদের শক্তি ও সাজ-সরঞ্জাম বর্ধিত হোক এবং তারা পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি সহকারে ওমরা পালন করুক। এ কারণেই বলা হয়েছে : فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا অর্থাৎ, স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করার আগে খায়বরে আসন্ন বিজয় মুসলমানগণ লাভ করুক। কেউ কেউ বলেন, এই আসন্ন বিজয় বলে খোদ হুদায়বিয়ার সন্ধি বোঝানো হয়েছে। কারণ এটা মক্কা বিজয় ও অন্যান্য সব বিজয়ের ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে সকল সাহাবীই একে বৃহত্তম বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ বছর তোমাদের সফরের সংকল্প করার পর ওমরা পালনে ব্যর্থতা ও সন্ধি সম্পাদনের মধ্যে যেসব রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা তোমাদের জানা ছিল না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সব জানতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এই স্বপ্নের ঘটনার আগে হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তোমাদেরকে একটা আসন্ন বিজয় দান করবেন। এই আসন্ন বিজয়ের ফলাফল সবাই প্রত্যক্ষ করেছে যে, হুদায়বিয়ার সফরে মুসলমানদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশি ছিল না। সন্ধির পর তাদের সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হয়ে গেল। –[কুরতুবী]

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ – পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিজয়, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা এবং বিশেষভাবে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবী ও সাধারণভাবে সকল সাহাবীর গুণাবলি ও সুসংবাদ উল্লেখিত হয়েছে। এখন সূরার উপসংহারে সেসব বিষয়বস্তুর সারমর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে। এসব নিয়ামত ও সুসংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনুগত্য ও সত্যায়নের কারণেই প্রদত্ত হয়েছে। তাই এই সত্যায়ন ও আনুগত্যের উপর জোর দেওয়ার জন্যে, রিসালাত অস্বীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন করার লক্ষ্যে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের অন্তরে যেসব সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, সেগুলো দূরীকরণের জন্যে আলোচ্য আয়াতসমূহে রিসালাত সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং জগতের সব ধর্মের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দীনকে জয়যুক্ত করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ –সমগ্র কুরআনে শেষনবী ﷺ -এর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে সাধারণতঃ গুণাবলি ও পদবীর মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে : আহ্বানের স্থলে- يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ - يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ ইত্যাদি বলা হয়েছে। এর বিপরীতে অপরাপর পয়গম্বরকে নাম সহকারে আহ্বান করা হয়েছে; যেমন– يٰعِيْسٰى - يٰمُوْسٰى - يٰٓاِبْرٰهِيْمُ - সমগ্র কুরআনে মাত্র চার জায়গায় তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' উল্লেখ করা হয়েছে। এসব স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করার মধ্যে উপযোগিতা এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে হযরত আলী (রা.) যখন তাঁর নাম "মুহাম্মদুর-রাসূলুল্লাহ" লিপিবদ্ধ করেন, তখন কাফেররা এটা মিটিয়ে "মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ" লিপিবদ্ধ করতে পীড়াপীড়ি করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর আদেশে তাই মেনে নেন। পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা এ স্থলে বিশেষভাবে তাঁর নামের সাথে "রাসূলুল্লাহ" শব্দ কুরআনে উল্লেখ করে একে চিরস্থায়ী করে দিলেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত লিখিত ও পঠিত হবে।

وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ এখান থেকে সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে। যদিও এতে সর্বপ্রথম হুদায়বিয়া ও বয়াতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে; কিন্তু ভাষায় ব্যাপকতার দরুন সকল সাহাবীই এতে দাখিল আছেন। কেননা সবাই তাঁর সহচর ও সঙ্গী ছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি : এস্থলে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রেসালত ও তাঁর দীনকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার কথা বর্ণনা করে সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এতে একদিকে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় গৃহীত তাঁদের কঠোর পরীক্ষার পুরস্কার আছে। কেননা অন্তরগত বিশ্বাস ও প্রেরণার বিরুদ্ধে সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার ফলে ওমরা পালনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁদের এতটুকু পদস্খলন হয়নি; বরং তাঁরা নজিরবিহীন আনুগত্য ও ঈমানী শক্তির পরিচয় দেন। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি ও লক্ষণাদি বিস্তারিত বর্ণনা করার মধ্যে এ রহস্য নিহিত থাকাও বিচিত্র নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর দুনিয়াতে আর কোনো নবী-রসূল প্রেরিত হবেন না। তিনি উম্মতের জন্যে কুরআনের সাথে সাহাবীদেরকে নমুনা হিসেবে ছেড়ে যাবেন এবং তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দেবেন। তাই কুরআনও তাঁদের গুণাবলি ও লক্ষণাদি বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে তাঁদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ স্থলে সাহাবায়ে কেরামের সর্বপ্রথম যে গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, তাঁরা কাফেরদের মোকাবেলায় তাঁদের কঠোরতা সর্বক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা ইসলামের জন্যে বংশগত সম্পর্ক বিসর্জন দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার ঘটনায় বিশেষভাবে এর বিকাশ ঘটেছে। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক সহানুভূতি ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তখন প্রকাশ পেয়েছে, যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আনসাররা তাঁদের সবকিছুতে মুহাজিরদেরকে অংশীদার করার আহ্বান জানায়। কুরআন সাহাবায়ে কেরামের এই গুণটি সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছে। কেননা এর সারমর্ম এই যে, তাঁদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ভালোবাসা অথবা হিংসাপরায়ণতা কোনো কিছুই নিজের জন্যে নয়; বরং সব আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের জন্যে হয়ে থাকে। এটাই পূর্ণ ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আছে مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهٗ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার ভালোবাসা ও শত্রুতা উভয়কে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়, সে তার ঈমানকে পূর্ণতা দান করে। এ থেকেই আরো প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের মোকাবিলায় কঠোর ছিলেন- একথার অর্থ এরূপ নয় যে, তাঁরা কোনো সময় কোনো কাফেরের প্রতি দয়া করেন না; বরং অর্থ এই যে, যে স্থলে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি কঠোরতা করার আদেশ হয়, সেই স্থলে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্ক একাজে অন্তরায় হয় না। পক্ষান্তরে দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপারে তো স্বয়ং কুরআনের ফয়সালা এই যে,

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ ...... اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ অর্থাৎ, যেসব কাফের মুসলমানদের বিপক্ষে কার্যতঃ যুদ্ধরত নয়, তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেন না। রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে-কেরামের অসংখ্য ঘটনা এমন পাওয়া যায়, সেগুলোতে দুর্বল, অক্ষম অথবা অভাবগ্রস্ত কাফেরদের সাথে দয়া-দাক্ষিণ্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারের মানদণ্ডও প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপক আদেশ রয়েছে। এমনকি, রণাঙ্গনের ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থি কোনো কার্যক্রম ইসলামে বৈধ নয়।

সাহাবায়ে কেরামের দ্বিতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সাধারণতঃ রুকু-সেজদা ও নামাজে মশগুল থাকেন। তাঁদেরকে অধিকাংশ সময় এ কাজেই লিপ্ত পাওয়া যায়। প্রথম গুণটি পূর্ণ ঈমানের আলামত এবং দ্বিতীয় গুণটি পূর্ণ আমলের পরিচায়ক। কারণ আমলসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে নামাজ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ অর্থাৎ, নামাজ তাঁদের জীবনের এমন ব্রত হয়ে গেছে যে, নামাজ ও সেজদার বিশেষ চিহ্ন তাঁদের মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়। এখানে "সেজদার চিহ্ন" বলে সেই নূরের আভা বোঝানো হয়েছে, যা দাসত্ব এবং বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে প্রত্যেক ইবাদতকারীর মুখমণ্ডলে প্রত্যক্ষ করা হয়। কপালে সেজদার কালো দাগ বোঝানো হয়নি। বিশেষতঃ তাহাজ্জুদ নামাজের ফলে উপরিউক্ত চিহ্ন খুব বেশি ফুটে উঠে। ইবনে মাজার এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ مَنْ كَثُرَ صَلٰوتُهٗ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهٗ بِالنَّهَارِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাত্রে বেশি নামাজ পড়ে, দিনের বেলায় তার চেহারা সুন্দর আলোকোজ্জ্বল হয়। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : এর অর্থ নামাজিদের মুখমণ্ডলের সেই নূর, যা কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে।

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ

উপরে সাহাবায়ে কেরামের সেজদা ও নামাজের যে আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই দৃষ্টান্তও তওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে, এরপর বলা হয়েছে যে, ইঞ্জিলে তাঁদের আরো একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হয়েছে। তা এই যে, তাঁরা এমন যেমন কোনো কৃষক মাটিতে বীজ বপন করে। প্রথমে এই বীজ একটি ক্ষুদ্র সূঁচের আকারে নির্গত হয়। এরপর তা থেকে ডালপালা অঙ্কুরিত হয়। অতঃপর তা আরও মজবুত ও শক্ত হয় এবং অবশেষে শক্ত কাণ্ড হয়ে

যায়। এমনিভাবে নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ শুরুতে খুবই নগণ্যসংখ্যক ছিলেন। এক সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত মাত্র তিন জন মুসলমান ছিলেন- পুরুষদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.) নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা.) ও বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা.)। এরপর আস্তে আস্তে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমনকি, বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হজে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে : (এক) فِى التَّوْرٰىةِ পাঠ-বিরতি করা এবং মুখমণ্ডলে নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা। এরপর وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ এ পাঠবিরতি না করা। তখন অর্থ এই হবে যে, সহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত সেই চারা গাছের ন্যায়, যা শুরুতে খুবই দুর্বল হয়। এরপর আস্তে আস্তে শক্তকাণ্ড বিশিষ্ট হয়ে যায়। (দুই) فِى التَّوْرٰىةِ এ পাঠবিরতি না করা বরং فِى الْاِنْجِيْلِ এ পাঠবিরতি করা। অর্থ এই হবে যে, মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তাওরাতেও রয়েছে, ইঞ্জীলেও রয়েছে। অতঃপর كَزَرْعٍ কে একটি আলাদা দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা। (তিন) فِى التَّوْرٰىةِ এ বাক্য না করা এবং فِى الْاِنْجِيْلِ এও শেষ না করা। অতঃপর ذٰلِكَ কে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের দিকে ইঙ্গিত সাব্যস্ত করা। এর অর্থ এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল আসল আকারে বিদ্যমান থাকলে সেগুলো দেখলেই কুরআনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলোতে বহু বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাই কোনো নিশ্চিত ফয়সালা সম্ভবপর নয়। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদ প্রথম সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন, যা থেকে জানা যায় যে প্রথম দৃষ্টান্ত তাওরাতে এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে আছে। ইমাম বগভী (র.) বলেন ঃ ইঞ্জীলে সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টান্ত আছে যে, তাঁরা শুরুতে নগণ্য সংখ্যক হবেন, এরপর তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তি অর্জিত হবে। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে লিখিত আছে যে, এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হবে, যারা চারা গাছের অনুরূপ বেড়ে যাবে। তারা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। –(মাযহারী) বর্তমান যুগের তওরাত ও ইঞ্জীলেও অসংখ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে :

খোদাওন্দ সিনা থেকে আগমন করলেন এবং শায়ীর থেকে তাদের কাছে যাহির হলেন। তিনি ফারান পর্বত থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং দশ হাজার পবিত্র লোক তাঁর সাথে আসলেন। তাঁর হাতে তাদের জন্যে একটি অগ্নিদীপ্ত শরিয়ত ছিল তিনি নিজের লোকদেরকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর সব পবিত্র লোক তোমার হাতে আছে এবং তোমার চরণের কাছে উপবিষ্ট আছে। তারা তোমার কথা মানবে। "-[তাওরাত ঃ বাবে এস্তেস্না]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাঁরা ফারান থেকে উদিত দীপ্তিময় মহাপুরুষের সাথে 'খলীলুল্লাহ' শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর হাতে অগ্নিদীপ্ত শরিয়ত থাকবে বলে اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ -এর প্রতি ইঙ্গিত বোঝা যায়। তিনি নিজের লোকদেরকে ভালোবাসবেন– কথা থেকে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ -এর বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। এযহারুল-হক, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়ে এর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গ্রন্থটি মওলানা রহমতুল্লাহ্ কিরানভী (র.) খ্রিস্টান মতবাদের স্বরূপ উদঘাটন করার জন্যে ফিন্ডার নামক পাদ্রীর জওয়াবে লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ইঞ্জীলে বর্ণিত দৃষ্টান্ত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ সে তাদের সামনে আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে বলল, আকাশের রাজত্ব সরিষার দানার মতো, যাকে কেউ ক্ষেতে বপন করে। এটা ক্ষুদ্রতম বীজ হলেও যখন বেড়ে যায়, তখন সব সব্জীর চাইতে বড় এমন এক বৃক্ষ হয়ে যায়, যার ডালে পাখী এসে বাসা বাঁধে। (ইঞ্জীল ঃ মাত্তা) ইঞ্জীল মরকাসের ভাষা কুরআনের ভাষার অধিক নিকটবর্তী। তাতে আছে : সে বলল, খোদার রাজত্ব এমন, যেমন কোনো ব্যক্তি মাটিতে বীজ বপন করে এবং রাত্রিতে নিদ্রা যায় ও দিনে জাগ্রত থাকে। বীজটি এমনভাবে অঙ্কুরিত হয় ও বেড়ে যায় যে, মনে হয় মাটি নিজেই বুঝি ফলদান করে। প্রথমে পাতা, এপর শীষ, এরপর শীষে তৈরি দানা। অবশেষে যখন শস্য পেকে যায়, তখন সে অনতিবিলম্বে কাঁচি লাগায়। কেননা কাটার সময় এসে গেছে। –(এযহারুল-হক, ৩য় খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা) আকাশের রাজত্ব বলে যে শেষ নবীর অভ্যুদয় বোঝানো হয়েছে, তা তওরাতের একাধিক জায়গা থেকে বোঝা যায়।

لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বলতার পর শক্তি এবং সংখ্যাল্পতার পর সংখ্যাধিক্য দান করেছেন, যাতে এগুলো দেখে কাফেরদের অন্তর্জ্বালা হয় এবং তারা হিংসার অনলে দগ্ধ হয়। হযরত আবূ ওরওয়া যুবায়রী (র.) বলেন : একবার আমরা ইমাম মালেক (র.)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি কোনো একজন সাহাবীকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য কিছু বক্তব্য রাখল। তখন ইমাম মালেক (র.) উপরিউক্ত আয়াতটি পূর্ণ তেলাওয়াত করতঃ যখন لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন

বললেন : যার অন্তরে কোনো একজন সাহাবীর প্রতি ক্রোধ আছে, সে এই আয়াতের শাস্তি লাভ করবে। -(কুরতুবী) ইমাম মালেক (র.) একথা বলেননি যে, সে কাফের হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে, সেও এই শাস্তি লাভ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, তার কাজটি কাফেরদের কাজের অনুরূপ হবে।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

مِنْهُمْ-এর مِنْ অব্যয়টি এখানে সবার মতে বর্ণনামূলক। অর্থ এই যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। এ থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, সব সাহাবায়ে কেরামই বিশ্বাস স্থাপন করতেন ও সৎকর্ম করতেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের সবাইকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এই বর্ণনামূলক مِنْ-এর ব্যবহার কুরআনে প্রচুর; যেমন فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ এখানে مِنَ الْاَوْثَانِ বলে رِجْسٌ-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে مِنْهُمْ বলে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এস্থলে مِنْ কে "কতক"-এর অর্থে ধরেছে এবং আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছে যে, সাহাবীগণের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী যাঁরা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাঁদেরকে এই ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এটা পূর্বাপর বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের পরিষ্কার পরিপন্থি। কেননা যেসব সাহাবী হুদায়বিয়ার সফর ও বয়াতে-রিযওয়ানে শরিক ছিলেন, তাঁরা তো নিঃসন্দেহে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং আয়াতের প্রথম উদ্দিষ্ট বলে তাঁদের সবার সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সন্তুষ্টির এই ঘোষণা করেছেন ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ – সন্তুষ্টির এই ঘোষণা নিশ্চয়তা দেয় যে, তাঁরা সবাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও সৎকর্মের উপর কায়েম থাকবেন। কারণ, আল্লাহ আলীম ও খবীর তথা সর্বজ্ঞ। যদি কারো সম্পর্কে তাঁর জানা থাকে যে, সে ঈমান থেকে কোনো না কোনো সময় মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে তার প্রতি আল্লাহ স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করতে পারেন না। ইবনে আবদুল বার (র.) ইস্তিয়াবের ভূমিকায় এই আয়াত উদ্ধৃত করে লিখেন : مَنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمْ يَسْخَطْ عَلَيْهِ اَبَدًا অর্থাৎ, আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তার প্রতি এরপর কখনো অসন্তুষ্ট হন না। এই আয়াতের ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বয়াতে-রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ জাহান্নামে যাবে না। অতএব, তাঁদের জন্যেই যখন মুখ্যতঃ এই ওয়াদা করা হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে কারও কারও বেলায় ব্যতিক্রম হওয়া নিশ্চিতই বাতিল। এ কারণেই সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম সবাই আদেল ও সিকাহ্।

সাহাবায়ে কেরাম সবাই জান্নাতী, তাঁদের পাপ মার্জনীয় এবং তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা গোনাহ্ : কুরআন পাকের অনেক আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তন্মধ্যে কতিপয় আয়াত এই সূরাতেই উল্লেখিত হয়েছে :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا

এছাড়া আরও অনেক আয়াতে এই বিষয়বস্তু রয়েছে–

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ـ وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ.

সূরা হাদীদে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ, তাঁদের সবাইকে আল্লাহ "হুসনা" তথা উত্তম পরিণতির ওয়াদা দিয়েছেন। এরপর সূরা আম্বিয়ায় হুসনা সম্পর্কে বলা হয়েছে : اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ অর্থাৎ, যাদের জন্যে আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই হুসনার ফয়সালা হয়ে গেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ অর্থাৎ, সমগ্র সময়কালের মধ্যে আমার সময়কাল উত্তম। এরপর সেই সময়কালের লোক উত্তম, যাদের সময়কাল আমার সময়কালের সংলগ্ন, এরপর তারা যারা তাদের সংলগ্ন। আরও এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বলো না। কেননা (ঈমানী শক্তির কারণে তাঁদের অবস্থা এই যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে, তবে তা তাঁদের ব্যয় করা এক মুদের সমানও হতে পারে না, এমনকি অর্ধ মুদেরও না। মুদ আরবের একটি ওজনের নাম যা আমাদের অর্ধ সেরের কাছাকাছি। -(বোখারী) হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা সারা জাহানের মধ্য থেকে আমার সাহীবগণকে পছন্দ করেছেন। এরপর আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে চার জনকে আমার জন্যে পছন্দ করেছেন– আবূ বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা.)।-(বাযযার) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে :

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَاتَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِيْ وَمَنْ اٰذَانِيْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ فَيُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهُ.

আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তাঁদেরকে নিন্দা ও দোষারোপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না। কেননা যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালোবাসে, সে আমার ভালোবাসার কারণে তাঁদেরকে ভালোবাসে এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। যে তাঁদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয় এবং যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, তাকে অচিরেই আল্লাহ আজাবে গ্রেফতার করবেন। –[তিরমিযী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَطَئُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার وَطْأً মূলবর্ণ (و - ط - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং مثال واوى) অর্থ– তাদের নিষ্পেষিত হওয়া।

مُحَلِّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْلِيْقٌ মূলবর্ণ (ح - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ– মুণ্ডনকারীগণ।

مُقَصِّرِيْنَ : ইসমে ফা'য়েল। সীগাহ جمع مذكر। বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْصِيْرٌ মূলবর্ণ (ق - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– চুল ছাটাইকারী, কমকারী।

اَشِدَّاءُ : شَدِيْدٌ-এর বহুবচন। অর্থ– কঠিন শক্ত, শক্তিশালী/ক্ষমতাবান। যেমন, حَبِيْبٌ-এর বহুবচন اَحِبَّاءُ

شَطْئَهٗ : ইহার অংকুর, ইহার আগা, ইহার পাতা। شَطْئٌ অর্থ, তৃণের অংকুর। এর বহুবচন شُطُوْءٌ এবং شَطَاءٌ আসে।

اِسْتَغْلَظَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِغْلَاظٌ মূলবর্ণ (غ - ل - ظ) জিনস صحيح অর্থ– হৃষ্টপুষ্ট হলো।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– দাড়িয়ে গেল।

سُوْقٌ : একবচন, বহুবচন اَسْوَاقٌ অর্থ– কাণ্ড।

يُعْجِبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْجَابُ মূলবর্ণ (ع - ج - ب) জিনস صحيح অর্থ– আনন্দদায়ক।

يَغِيْظُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغَاظَةُ মূলবর্ণ (غ - ى - ظ) জিনস اجوف يائى অর্থ– অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন, রাগান্বিত হন।

وَعَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ– প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

عَمِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَمَلُ মূলবর্ণ (ع - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– কর্ম করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ : এখানে مُحَمَّدٌ হলো মুবতাদা আর رَسُوْلُ اللّٰهِ হলো তার খবর। وَالَّذِيْنَ মুবতাদা مَعَهٗ টা উহ্য ফে'লের সাথে ظرف متعلق হয়ে সেলাহ। اَشِدَّاءُ হলো খবর। আর رُحَمَاءُ হলো দ্বিতীয় খবর। আর بَيْنَهُمْ-এর সাথে اَشِدَّاءُ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর عَلَى الْكُفَّارِ টা اَشِدَّاءُ-এর সাথে ظرف متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৩৯]

سُوْرَةُ الْحُجُرٰتِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা হুজুরাত

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৮, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱﴾

১. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (অনুমতির) আগে তোমরা (কোনো বিষয়ে) অগ্রণী হয়ো না, আর আল্লাহকে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۲﴾

২. হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের স্বর নবীর স্বর অপেক্ষা উচ্চ করো না এবং তাঁর সাথে এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না, যেমন তোমরা পরস্পর একে অন্যের সাথে উচ্চৈঃস্বরে বলে থাক, অন্যথায় তোমাদের আমলগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা টেরও পাবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۳﴾

৩. নিঃসন্দেহে যারা নিজেদের স্বর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে অনুচ্চ রাখে, তারা সেই সমস্ত লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া (পরহেজগারী)-এর জন্য বিশুদ্ধ করেছেন; তাদের জন্য মার্জনা ও মহান পুরস্কার রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ لَا تُقَدِّمُوْا তোমরা অগ্রণী হয়ো না بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (অনুমতির) আগে وَاتَّقُوا اللّٰهَ, আর আল্লাহকে ভয় কর اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

২. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মু'মিনগণ! لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ তোমরা নিজেদের স্বর উচ্চ করো না فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ নবীর স্বর অপেক্ষা وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ, এবং তার সাথে এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ যেমন তোমরা পরস্পর একে অন্যের সাথে উচ্চৈঃস্বরে বলে থাক اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ অন্যথায় তোমাদের আমলগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ, অথচ তোমরা টেরও পাবে না।

৩. اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ নিঃসন্দেহে যারা নিজেদের স্বর অনুচ্চ রাখে عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ তারা সে সমস্ত লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা বিশুদ্ধ করেছেন لِلتَّقْوٰى তাকওয়া (পরহেজগারী)-এর জন্য لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ তাদের জন্য মার্জনা ও মহান পুরস্কার রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

৪. নিশ্চয়, যারা হুজরার বাহির হতে আপনাকে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ (নতুবা তারা এমন দুঃসাহস করত না)।

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

৫. আর যদি তারা (একটু) ধৈর্যধারণ করত এ পর্যন্ত যে, আপনি স্বয়ং তাদের নিকট বের হয়ে আসেন, তবে তা তাদের জন্য উত্তম হতো; আর আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল, দয়াবান।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

৬. হে মু'মিনগণ! যদি কোনো দুষ্কার্যকারী তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে খুব অনুসন্ধান করে নাও, যেন অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না ফেল, অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে হয়।

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

৭. আর জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ রয়েছেন; অনেক বিষয় এমনও আছে যে, যদি তিনি তাতে তোমাদের মতানুসারে করেন, তবে তোমাদের বিশেষ ক্ষতি হবে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ঈমানের অনুরাগী করেছেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহে তা বাঞ্ছনীয় করে দিয়েছেন এবং কুফর ও দুষ্কার্য এবং অবাধ্যতার প্রতি তোমাদের মনে ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়েছেন; এ সমস্ত লোকই সরল পথে রয়েছে,

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

৮. আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহে; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ নিশ্চয় যারা আপনাকে ডাকে مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ হুজরার বাহির থেকে أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

৫. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا আর যদি তারা (একটু) ধৈর্য ধারণ করত এ পর্যন্ত যে حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ আপনি স্বয়ং তাদের নিকট বের হয়ে আসেন لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ তবে তা তাদের জন্য উত্তম হতো وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আর আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল দয়াবান।

৬. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে মুমিনগণ إِن جَاءَكُمْ যদি তোমাদের নিকট আসে فَاسِقٌ কোনো দুষ্কার্যকারী بِنَبَإٍ কোনো সংবাদ নিয়ে فَتَبَيَّنُوا তবে খুব অনুসন্ধান করে নাও أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ যেন অজ্ঞতাবশতঃ কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না ফেল فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে হয়।

৭. وَاعْلَمُوا আর জেনে রাখ যে أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ রয়েছেন لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ অনেক বিষয় এমনও আছে যে, যদি তিনি তাতে তোমাদের মতানুসরণ করেন لَعَنِتُّمْ তবে তোমাদের বিশেষ ক্ষতি হবে وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ঈমানের অনুরাগী করেছেন وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ এবং তোমাদের অন্তরসমূহে তা বাঞ্ছনীয় করে দিয়েছেন وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ, এবং তোমাদের মনে ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়েছেন الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ কুফর ও দুষ্কার্য এবং অবাধ্যতার প্রতি أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ এ সমস্ত লোকই সরল পথে রয়েছে।

৮. فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহে وَاللَّهُ,আর আল্লাহ عَلِيمٌ حَكِيمٌ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۹﴾

৯. আর যদি মুসলমানদের দুই দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দাও, অনন্তর যদি তাদের এক দল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর– যেই দল বাড়াবাড়ি করে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে, অতঃপর যদি তারা প্রত্যাবর্তিত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সন্ধি করে দাও, আর সুবিচারের প্রতি লক্ষ্য রেখ; নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ বান্দাদেরকে পছন্দ করেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۰﴾

১০. মু'মিনগণ তো সকলেই (পরস্পর) ভাই, সুতরাং তোমাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমাদের প্রতি দয়া বর্ষিত হয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۱﴾

১১. হে মু'মিনগণ! না পুরুষগণ পুরুষদের প্রতি উপহাস করা উচিত, বিচিত্র কি যে, তারা (আল্লাহর নিকট) তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হবে, আর না নারীগণ নারীদের প্রতি উপহাস করা উচিত, বিচিত্র কি যে, তারাও তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হবে, আর তোমরা একে অন্যকে খোঁটা দিও না এবং একে অন্যকে কলঙ্কযুক্ত উপাধিতে সম্বোধন করো না; ঈমান আনয়নের পর গুনাহর নাম যুক্ত হওয়া দূষণীয়, আর যারা (এরূপ কাজ হতে) প্রত্যাবর্তিত না হবে, ফলত তারাই জালিম।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আর যদি মুসলমানদের দুই দল اقْتَتَلُوْا পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا তবে তাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দাও فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى অনন্তর যদি তাদের একদল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ তবে সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে দল বাড়াবাড়ি করে حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে فَاِنْ فَآءَتْ অতঃপর যদি তারা প্রত্যাবর্তিত হয় فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ তবে উভয়ের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সন্ধি করে দাও وَاَقْسِطُوْا, আর সুবিচারের প্রতি লক্ষ্য রেখ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বানদেরকে পছন্দ করেন।

১০. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ মু'মিনগণ তো সকলেই পরস্পর ভাই فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ সুতরাং তোমাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও وَاتَّقُوا اللّٰهَ, এবং আল্লাহকে ভয় কর لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ যেন তোমাদের প্রতি দয়া বর্ষিত হয়।

১১. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মু'মিনগণ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ না পুরুষগণ পুরুষদের প্রতি উপহাস করা উচিত عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ বিচিত্র কি যে, তারা (আল্লাহর নিকট) তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হবে وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ, আর না নারীগণ নারীদের প্রতি উপহাস করা উচিত عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ বিচিত্র কি যে, তারাও তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হবে وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ আর তোমরা একে অন্যকে খোঁটা দিও না وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ, এবং একে অন্যকে কলঙ্কযুক্ত উপাধিতে সম্বোধন করো না بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ গুনাহের নাম যুক্ত হওয়া দূষণীয় بَعْدَ الْاِيْمَانِ ঈমান আনয়নের পর وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ, আর যারা (এরূপ কাজ হতে) প্রত্যাবর্তিত না হবে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ফলত তারাই জালিম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ [١]

শানে নুযূল–১ : বুখারী, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদূভিয়া প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বনূ তামীম গোত্রের একদল অশ্বারোহী এসে নবী করীম ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হয়, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন যে, কা'কা' বিন মা'বাদকে আমীর বানানো হোক। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আকরা বিন হাবেসকে আমীর বানানো হোক। এ প্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন যে, তুমি তো আমার বিরোধিতা করলে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি তো আপনার বিরোধিতা করিনি। সুতরাং তাঁরা দু'য়ের মাঝে কথা কাটা-কাটি করার ফলে উভয়ের আওয়াজ বড় হয়ে উঠল। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ হযরত হাসান (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূল ﷺ -এর আগেই ঈদুল আযহার সময়ে কুরবানি করে নেন। মতান্তরে ঈদের নামাজের পূর্বেই কুরবানি করেন। সুতরাং রাসূল ﷺ পুনরায় কুরবানি করার জন্যে তাদেরকে আদেশ করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৩ : আল্লামা মাওয়ার্দী (র.) যাহহাক এর সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ২৪ জন সাহাবীর সমন্বিত একটি ক্ষুদ্র প্লাটুন বনূ আমেরের প্রতি প্রেরণ করেন, তারা ৩ জন ছাড়া বাকি সকলকেই হত্যা করে দেয়। উক্ত ৩ জন সেখান থেকে পালিয়ে নিরাপদে এসে পৌঁছে এবং তারা মদিনার পথ অবলম্বন করেন। পথিমধ্যে বনু সুলাইম গোত্রের ২ জন লোকের সাথে তাদের সাক্ষাত হলে কোন গোত্রের সাথে তাদের মিত্রতা রয়েছে তা জিজ্ঞেস করলেন। তারা জবাবে বলল, বনু আমেরের সাথে। কারণ তারা ছিল বনু সুলাইম অপেক্ষা অতি প্রভাবশালী ও সম্পাদিত। সুতরাং তারা সুলাইম বাসীদেরকে হত্যা করেন। অতঃপর বনু সুলাইম হতে এক প্রতিনীধি দল রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করে বলল, আপনার ও আমাদের মাঝে তো মৈত্রী চুক্তি রয়েছে অথচ আমাদের থেকে ২ জন লোককে হত্যা করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ এ দু'জনের ফেদিয়া বা রক্তপণ স্বরূপ একশত উট তাদেরকে দান করেন। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৪ : তাবারানী আওসাত্ব গ্রন্থে ইবনে মারদূভিয়া হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক লোক রমজান মাস আসার পূর্ব থেকে রাসূল ﷺ-এর আগে রোজা রাখতে থাকে। রাসূল ﷺ -এর আগে আগে রোজা রাখার বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[রূহুল মা'আনী ১৩৩-৩৪/২৬/১৩, কুরতুবী ২৫৫-৫৬/১৬, ইবনে কাছীর ২০৫/৪, ফতহুল কাদীর ১৬১/৫, বাহরে মুহীত্ব ১০৫/৮, দুররে মানছুর ৮৪/৬]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ [٢]

শানে নুযূল–১ : ইমাম বুখারী ও তিরমিযী ইবনে আবী মুলাইকা এর সনদে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, একদা হযরত আকরা বিন হাবেস (রা.) নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে নিজ গোত্রের দলপতি নিয়োগ করা হোক। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! তাকে নয়। ফলে এদু'জনের মধ্যে কথা কাটা-কাটি করতে গিয়ে আওয়াজ বড় হয়ে উঠল। এক পর্যায়ে হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, তুমি আমার কেবল বিরোধিতা করছ। হযরত ওমর (রা.) বললেন যে, আমিতো আপনার বিরোধিতা করিনি। রাসূল ﷺ -এর সামনে এমনভাবে উচ্চ আওয়াজ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। –[কুরতুবী ২০৬/১৬, দুররে মানছুর ৮৪/৬]

শানে নুযূল : ২. ইবনে মারদূভিয়া, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত ছাবেত বিন কাইস বিন শাম্মাস সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে ছাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস তিনি ছিলেন উচ্চ আওয়াজ ও উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী একজন লোক। সে আওয়াজ ছিল রাসূল ﷺ -এর আওয়াজ অপেক্ষা বড় আওয়াজ। সে প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর ৬১/৫]

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيمٌ [٣]

শানে নুযূল : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَا تَرْفَعُوٓا أَصْوَاتَكُمْ (অর্থাৎ, তোমাদের আওয়াজ বড় করো না) আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম আমি একমাত্র আস্তেই কথা বলব উচ্চৈঃস্বরে কথা বলব না। হযরত আবূ সালমা (রা.) এর বর্ণনা অনুসারে لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهٖ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আপনাকে যিনি সত্য সহ প্রেরণ করেছেন সেই আল্লাহর শপথ! এখন থেকে আমি আপনার সাথে গোপনে আলাপ কারীর ন্যায় কথা বলব। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) বলেন, لَا تَرْفَعُوٓا أَصْوَاتَكُمْ যখন নাজিল হয়, তখন হতে হযরত ওমর (রা.) রাসূল ﷺ-এর নিকট অত্যন্ত ছোট আওয়াজে কথা বলতেন যা বুঝার জন্যে দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করা হতো। বুঝতে পারা যায় না এমন ক্ষীণ আওয়াজে কথা বলাতে নিষেধ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৬২/১৬]

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ [٤]

শানে নুযূল–১ : মুজাহিদ বলেন, বনূ তামীম গোত্রের বেদুঈনদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। তাদেরই একটি প্রতিনিধি দল রাসূল ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে মসজিদে গমন করে হুজরার বাইরে থেকে হযরত নবী করীম ﷺ-কে এভাবে ডাকতে থাকে যে, আপনি আমাদের নিকট বের হয়ে আসেন। কারণ আমরা যদি প্রশংসা করি তাহলে তা শোভা হবে আর আমরা যদি সমালোচনা করি, তাহলে তা হবে অবমাননাকর। তারা ছিল সত্তর জন লোক। রাসূল ﷺ-এর দুপুরের বিশ্রামের সময় এসেছিল। বাহির থেকে রাসূল ﷺ-কে এভাবে ডাক দিতে নিষেধ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : আহমদ, ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুভিয়া প্রমুখ বিশুদ্ধতম সনদ দ্বারা আকরা বিন হাবেস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ -এর খেদমতে গিয়ে এভাবে ডাকতে আরম্ভ করেন যে, হে মুহাম্মদ! আমাদের উদ্যেশ্যে বের হয়ে আসুন। এতে তিনি কোনো জবাব দেন নি। অতঃপর সে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার প্রশংসা সম্মান জনক আর আমার সমালোচনা দূর ভাগ্যতা। রাসূল ﷺ জবাবে বললেন, ভাল ও মন্দ সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৩ : যায়েদ বিন আরকাম বলেন যে, কিছু সংখ্যক মানুষ রাসূল ﷺ-এর খেদমতে আসেন। তারা পরস্পরের মাঝে একে অপরকে বলল যে, আমাদের সাথে অমুক ব্যক্তির নিকট চলো। তিনি যদি নবী হন, তাহলে সৌভাগ্যবান আর যদি তিনি কোনো বাদশাহ হন, তাহলে আমরা তার পাশেই থেকে যাব। সুতরাং তারা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে হুজরার (কক্ষের) বাইরে থেকে তাঁকে তারা ডাকল, হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মদ! রাসূল ﷺ-কে এরূপভাবে ডাকা সঙ্গত নয় বিধায় তাদের এরূপ ভাবে ডাক দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِينَ [٦]

শানে নুযূল : ১. আলোচ্য আয়াত ওয়ালিদ বিন উকবা বিন আবী মুঈত সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সাঈদ কাতাদাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে যা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম ﷺ ওয়ালিদ বিন উকবাকে সদকাহ ও জাকাত উসুল করার জন্যে বনূ মোস্তালিক গোত্রে প্রেরণ করেন। বনূ মোস্তালিক গোত্রের লোকজন তাকে দেখতে পেয়ে, তাকে স্বাগত ও সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে নেওয়ার জন্যে দলবদ্ধভাবে এগিয়ে এলো। তাদের এগিয়ে আসা দেখে সে পালিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরে গিয়ে বলল যে, তারাতো ইসলাম ত্যাগী হয়ে গেল। সুতরাং ঘটনার সততা তদন্ত করার জন্যে হযরত নবী করীম ﷺ খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে প্রেরণ করে বললেন, তাড়াহুড়া করবে না। স্থিতিশীলতার সাথে কাজ করে যাবে। সুতরাং হযরত খালেদ (রা.) রাতে এসে নিকটতম স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর গোয়েন্দা ও গুপ্তচর প্রেরণ করেন। তারা ঘুরে এসে জানালো যে, তারাতো ইসলামের উপর অটল ও অনড় রয়েছে। তারা তাদের আজান ও নামাজ শুনতে পেয়েছে। রাত যখন প্রভাত হলো তিনি তাদের নিকট এসে তাদের বর্ণনা সম্পূর্ণভাবেই বাস্তব যথাযথ পেয়েছেন। তখন রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে বাস্তব সংবাদ জানালেন। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

শানে নুযূল–২ : আবদ বিন হুমাইদ হাসান এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, একদা কোনো এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অমুক গোত্রটি আরবের একটি গোত্র। তারা সবে মাত্র নতুন ভাবে ইসলাম

গ্রহণ করেছে। তারা নাকি নামাজ ছেড়ে দিয়েছে এবং ধর্ম ত্যাগী হয়ে কুফরি করছে। রাসূল ﷺ এদের ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ কোনো ব্যবস্থা নেন নি। বরং সঠিকভাবে তথ্যানুসন্ধানের জন্যে তিনি খালেদ বিন ওয়ালিদকে প্রেরণ করেন এবং বললেন যে, নামাজের সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেবে ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। কোনো প্রকারের তাড়াহুড়া করবে না। সে গোত্রবাসীরা যদি নামাজ ছেড়েই দেয়, তাহলে তাদের ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তা ছাড়া কোনো প্রকারের তাড়াতাড়ি করবে না। সুতরাং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় তিনি সে গোত্রের নিকট পৌঁছেন, যাতে করে তাদের আজান ও নামাজ শুনতে পান। সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথেই মোয়াজ্জিন দাঁড়িয়ে আজান দিল এবং মাগরিবের নামাজ আদায় করল। তখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ ভাবলেন যে, এরা হয়তো এ নামাজ ব্যাতীত অন্য নামাজ ছেড়ে দিয়েছে। অতঃপর রাত যখন পশ্চিম আকাশের লাল আভা ডুবে গিয়ে রাত আধার হলো, মুয়াজ্জিন আজান দিল এবং তারা এশার নামাজ আদায় করল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তখন ভাবলেন এরা হয়তো অন্য কোনো নামাজ ছেড়ে দিয়েছে। অতঃপর রাত যখন গভীর হলো, তখন তিনি তার অশ্বগুলোকে নিয়ে নগরীর নিকটে গিয়ে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন, সে নগরবাসী যারাই কিছু কুরআন পাঠ করা জানত তারা তাহাজ্জুদ নামাজে দাঁড়িয়ে গেল এবং কুরআন তেলাওয়াতে মগ্ন হলো। পরক্ষণেই যখন সুবহে সাদিক বা প্রভাত হলো মুয়াজ্জিন আজান ও একামত দিল নগরের সকলেই ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করল। অতঃপর যখন নামাজ আদায় করে ফিরে এলো এবং চার দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তখন তারা নগরীর সন্নিকটে অশ্ব দেখতে পেয়ে বলল যে, এগুলো কি? তারা বললেন যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ। নগর বাসী বলল, হে খালিদ! উদ্দেশ্য কি আপনার? তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ-কে তথ্য দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা নাকি নামাজ ছেড়ে দিয়ে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছ! তৎক্ষণাৎ তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন আল্লাহর কসম আমরা কুফরিতে লিপ্ত হইনি কখনো। তখন অশ্ববাহিনী তাদের নিকট থেকে বিদায় হয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট পৌঁছে সংবাদ জানালেন। পরিবেশিত অসত্য সংবাদ এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৩ : অপর এক বর্ণনানুসারে ঘটনার বিবরণ এরূপভাবে রয়েছে যে, বনূ মোস্তালিকের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূল ﷺ তাদের কাছ থেকে সদকাহ ও জাকাতের মাল উসূল করার জন্যে যখন ওয়ালিদ বিন উকবাকে প্রেরণ করেন। তখন তারা জানতে পেরে তাকে স্বাগত জানিয়ে নেওয়ার জন্যে বের হলো। তাদের আগমন সম্পর্কে জানতে পেরে ভয়ে সে পালিয়ে গেল এবং রাসূল ﷺ-কে খবর দিল যে, তারাতো তাকে হত্যা করতে ইচ্ছা পোষণ করে ছিল। তারা তাদের সদকা দিতেও অস্বীকার করল। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদের মোকাবিলায় সৈন্যাভিযান চালানোর সংকল্প গ্রহণ করলেন। এরই মধ্যে তাদের থেকে এক প্রতিনিধি দল রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার দূত যাবার সংবাদ পেয়ে তাকে সম্মান জানানোর জন্যে আমরা বের হলাম, আমাদের পক্ষ থেকে তার নিকট সদকা ও জাকাতের মাল সোপর্দ করার জন্যে ঘোষণাও করে দিলাম। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি চলে আসল। আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, সে নাকি ধারণা করছে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলব। আল্লাহর শপথ! আমরা কখনোও এ উদ্দেশ্য নিয়ে বের হইনি। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৬৪/৯, রূহুল মা'আনী ১৪৫/২৬/১৩, ইবনে কাছীর ২০৯/৪, দুররে মানছূর ৮৮/৬, তাবারী ৩৮৩/১১, বাহরে মুহীত্ব ১০৯/৮, ফতহুল কাদীর ৬২/৫]

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ [٩]

শানে নুযূল–১ : বুখারী, মুসলিম, আহমদ, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন হযরত সাআদ বিন উবাদার শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁকে দেখার জন্যে পথ ধরে চললেন। পথিমধ্যে রাসূল ﷺ -এর নিকট কেউ বলল, হে আল্লাহর নবী আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর নিকটও যাবেন নাকি? সুতরাং রাসূল ﷺ তার উদ্দেশ্যে গাধায় আরোহণ করেন। মুসলমানরাও পায়ে হেঁটে চলল। নবী করীম ﷺ যখন তার নিকট পৌঁছলেন, তখন সে বলল, আমার নিকট থেকে দূরে থাক। আল্লাহর কসম আপনার গাধার দূর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তখন একজন আনসারী বললেন, আল্লাহর কসম নরাধম তোর অপেক্ষা রাসূল ﷺ -এর গাধার শরীর অত্যন্ত পবিত্র ও সুগন্ধময়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আব্দুল্লাহ বিন উবাই এবং আনসারীর মাঝে কথা কাটাকাটি হয়ে আনসারী ও আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর গোত্রদ্বয়ের মাঝে ঝগড়া বেঁধে যায়। ফলে উভয় দলের মাঝে হাতাহাতি ও জুতা পেটা শুরু হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াত আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা গোত্রদ্বয়ের মাঝে রাসূল ﷺ -এর সময়ে ঝগড়া লেগেই ছিল। সেই সংগঠিত বিবাদ-বিসংবাদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৩ : কাতাদাহ বলেন, আলোচ্য আয়াত আনসারী দু'ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, দু'জন আনসারীর মাঝে পারস্পরিকভাবে মৈত্রিতা ছিল। সুতরাং দু'জনের মধ্যে একজন বলল, আমার অধিকার আমার ক্ষমতা বলে আদায় করে নেব। কারণ তার লোকজন ছিল বেশি। অপরজন রাসূল ﷺ -এর নিকট বিচার নিয়ে যাওয়ার জন্যে বলল। তখন সে তাতে অসম্মতি জানালো, বিষয় শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে একটি ঝগড়ার রূপ ধারণ করে। ফলে হাতা-হাতি, জুতা পেটা ও তরবারি সহ এক যুদ্ধে পরিণত হয়ে যায়। উদ্ভূত এ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল : ৪ আল্লামা কালবী বলেন, আলোচ্য আয়াত সুমাইরা ও হাতেব পরস্পরের মাঝে সংঘটিত ঝগড়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সুমাইরা হাতেবকে হত্যা করেছিল। ফলে আউস ও খাজরাজের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী ঝগড়া বেধে যায়। অবশেষে নবী করীম ﷺ তাদের নিকট উপস্থিত হলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এতে আল্লাহ তদীয় নবী ও ঈমানদারদেরকে পরস্পরের মাঝে মীমাংসা করে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

শানে নুযূল : ৫ আল্লামা সুদ্দী (র.) বলেন, আনসারীদের মধ্যে উম্মে যায়েদ মতান্তরে উম্মে বদর নাম্নী এক মহিলা ছিল। তার স্বামী ছিল একজন মুহাজির। সে মহিলা তার স্বামীর সাথে ঝগড়ায় লেগে যায়। যার কারণ ছিল সে মহিলা তার পিত্রালয়ে যেতে চেয়েছিল, তবে স্বামী তাকে যেতে দেয়নি। স্বামী তাকে এমন গৃহে আবদ্ধ করে রাখে, যেখানে মহিলার পিত্রালয়ের কোনো মানুষ যেতে পারে না। মহিলা তার পিত্রালয়ে সংবাদ পাঠালে তারা তাকে উদ্ধার করার জন্যে চলে আসে। এদিকে স্বামীর ডাকে স্বগোত্রীয় লোকেরাও সে মহিলা ও তার পিত্রালয়ের লোকজনের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়। এতে করে তাদের মাঝে জুতা নিয়ে মার-ধর হয়ে যায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৬৭-৬৮/১৩, রূহুল মা'আনী ১৫১/১৩-২৬, ইবনে কাছীর ২১১/৪, বাহরে মুহীত্ব ১১১/৮, দুররে মানছুর ৯০/৬, ফতহুল কাদীর ৬৫/৫, তাবারী ৩৮৭/১১]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ [١١]

শানে নুযূল : ১. হযরত মুকাতিল হতে বর্ণিত আলোচ্য আয়াত বনূ তামীম গোত্র সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। বনূ তামীমের লোক হযরত বেলাল (রা.) হযরত সালমান (রা.) হযরত আম্মার (রা.) হযরত খাব্বাব (রা.) হযরত সুহাইব (রা.) হযরত ইবনে নুহাইরা (রা.) ও হযরত সালেহ মাওলা আবী হুযাইফা (রা.) সম্পর্কে তারা বিদ্রূপ করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতংশটি নাজিল করেন।

শানে নুযূল : ২. অপর এক বর্ণনানুসারে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ও হযরত হাফসা (রা.) দু'জনে হযরত উম্মে সালমা (রা.)-কে সাদা কাপড় দ্বারা তার কোমরকে বাঁধা দেখলেন এবং কাপড়ের অপর পার্শ্বটি পিছনের দিকে ঝুলিয়ে ফেলা দেখতে পেলেন। তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ও হযরত হাফসা (রা.) তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, সে ঝুলন্ত কাপড়টি কুকুরের লেজের ন্যায় দেখাচ্ছে। তখন আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল : ৩. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি হযরত যয়নব বিনতে খুজাইমা হেলালিয়া (রা.)-কে নিয়ে রসিকতা ও বিদ্রূপ করতেন। কারণ তিনি আকৃতিগত দিক থেকে কিছু খাটো ছিলেন। সেই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতংশটি নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল : ৪. কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতাংশটি হযরত ইকরিমা বিন আবী জাহল সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তিনি মদিনায় চলাফেরা করলে কাতিপয় লোক তাঁকে বলত যে, ইনি হচ্ছেন এ উম্মতের ফেরাউন পুত্র। তিনি এটাকে অত্যন্ত খারাপ মনে করে সে সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করে। তখন হযরত ইকরিমা (রা.) বিন আবী জাহলকে উপহাস করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করা হয়। এ ছাড়া আরোও বিভিন্ন মতামত রয়েছে। –[কুরতুবী ২৬৭/১৩, রূহুল মা'আনী ১৫২/১৩/২৬, ইবনে কাছীর ২১১/৪, বহরে মুহীত্ব ১১১/৮, দুররে মানছুর ৯১/৬, ফতহুল কাদীর ৬৬/৫]

وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

শানে নুযূল : এক বর্ণনায় আলোচ্য আয়াতাংশটি হযরত ইকরিমা হযরত আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সুফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতাব রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট এসে বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলারা আমাকে লজ্জা দিচ্ছে এবং আমাকে বলছে যে, হে ইহুদির কন্যা ইহুদি! তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কেন এ কথা বলছ না যে, আমার পিতা হলেন হারুন, চাচা হলেন মূসা এবং স্বামী হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ ! তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৭৭/১৬, বাহরে মুহীত্ব ১১৩/৮]

وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ

শানে নুযূল–১ : বর্ণিত রয়েছে, আলোচ্য আয়াতাংশটি সাবিত বিন কাইস সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, সে ছিল প্রভাবশালী একজন কাফের সুতরাং রাসূল ﷺ-এর বৈঠকে তাঁর জন্যে জায়গার প্রশস্ততা করা হতো, যাতে করে সে রাসূল ﷺ -এর বাণী শুনতে পায়। সেই সুবাধে সে একদা রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে বলল, প্রশস্ত করে দাও, এভাবে সে রাসূলে আকরাম ﷺ পর্যন্ত এসে পৌঁছে যায়। অতঃপর সে একজনকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি একটু সরে বস, তবে তিনি তা করেন নি। ফলে সে নরাধম বলল, সে কে? তখন ঐ ব্যক্তি বলল আমি অমুক। সে বলে উঠল তুমি হলে অমুক মহিলার পুত্র। এ কথার দ্বারা সে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। এতে করে সে ব্যক্তি লজ্জিত হলো। লোক সমক্ষে কাউকে এমনভাবে অপমানিত করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল–২ : বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ প্রমুখ ইবনে জুবাইর বিন যাহহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা বনী সালামা গোত্রবাসী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে রাসূল ﷺ যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন আমাদের মধ্যে সকলের একাধিক নাম ছিল। সুতরাং তাদের সে নামগুলো হতে কোনো একটি নাম নিয়ে যখন তাদেরকে ডাকতেন, তারা বলত, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ সে এ নামটিকে পছন্দ করে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করা হয়।

শানে নুযূল–৩ : অপর এক বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত উম্মুল মোমিনীন হযরত সুফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি একদা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন যে, মহিলারা আমাকে ইহুদির মেয়ে ইহুদি বলে। জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন যে, তুমি কেন এ কথা বল না যে, আমার পিতা হযরত হারুন, চাচা হযরত মূসা ও স্বামী হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ । তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করা হয়। –[কুরতুবী ২৮০/১৬, রূহুল মা'আনী ১৫৪/১৩/২৬, ইবনে কাছীর ১১২/৪, বাহরে মুহীত্ব ১১১/৮, দুররে মানছুর ৯১/৬, ফতহুল কাদীর ৬৫/৫, তাবারী ৩৯১/১১]

সূরার যোগসূত্র ও শানে নুযূল ঃ পূর্ববর্তী দুই সূরায় জেহাদের বিধান ছিল, যা দ্বারা বিশ্বজগতের সংশোধন উদ্দেশ্য। আলোচ্য সূরায় আত্মসংশোধনের বিধান ও শিষ্টাচারনীতি ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষতঃ সামাজিকতা সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতরণ সম্পর্কে কুরতুবীর ভাষ্য অনুযায়ী ছয়টি ঘটনা বর্ণিত আছে। কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী (র.) বলেন : সব ঘটনা নির্ভুল। কেননা, সবগুলোই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -এর আসল অর্থ بَيْنَ يَدَى দুই হাতের মধ্যস্থল। এর উদ্দেশ্য সামনের দিক। অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না। কি বিষয়ে অগ্রণী হতে নিষেধ করা হয়েছে কুরআন পাক তা উল্লেখ করেনি। এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ, যে কোনো কথায় অথবা কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অগ্রণী হয়ো না। বরং তাঁর জবাবের অপেক্ষা কর। তবে তিনি যদি কাউকে জবাব দানের আদেশ করেন, তবে সে জবাব দিতে পারে। এমনিভাবে যদি তিনি পথ চলেন তবে কেউ যেন তাঁর অগ্রে না চলে। খাওয়ার মজলিসে কেউ যেন তাঁর আগে খাওয়া শুরু না করে। তবে তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা অথবা শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি কাউকে অগ্রে প্রেরণ করতে চান তবে তা ভিন্ন কথা; যেমন সফর ও যুদ্ধের বেলায় কিছুসংখ্যক লোককে অগ্রে যেতে আদেশ করা হতো।

আলেম ও ধর্মীয় নেতাদের সাথেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত : কেউ কেউ বলেন, ধর্মের আলেম ও মাশায়েখের বেলায়ও এই বিধান কার্যকর। কেননা তাঁরা পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী। নিম্নোক্ত ঘটনা এর প্রমাণ। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-কে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অগ্রে অগ্রে চলতে দেখে সতর্ক করলেন এবং বললেন : তুমি কি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল, যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? তিনি আরও বললেন : দুনিয়াতে এমন কোনো ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি যে পয়গম্বরগণের পর হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। -(রূহুল বয়ান) তাই আলেমগণ বলেন যে, ওস্তাদ ও পীরের সাথে একই ধরনের আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

لَا تَرْفَعُوٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ নবী করীম ﷺ -এর মজলিসের এটা দ্বিতীয় আদব। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে কণ্ঠস্বরকে তাঁর কণ্ঠস্বরের চাইতে অধিক উঁচু করা অথবা তাঁর সাথে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা-যেমন, পরস্পরে বিনা দ্বিধায় করা হয়, এক প্রকার বেআদবী ও ধৃষ্টতা। সেমতে এই আয়াত অবতরণের পর সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা পাল্টে যায়। হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আল্লাহর কসম! এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানির অনুরূপ কথাবার্তা বলব। -(বায়হাকী) হযরত ওমর (রা.) এরপর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে হতো। -(সেহাহ্) হযরত সাবেত ইবনে কায়সের কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উঁচু ছিল। এই আয়াত শুনে তিনি ভয়ে সংযত হলেন এবং কণ্ঠস্বর নীচু করলেন। -[দুররে মানছূর]

রওজা মোবারকের সামনেও বেশি উচুঁস্বরে সালাম ও কালাম করা নিষিদ্ধ : কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী (র.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও আদব তাঁর ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। তাই কোনো কোনো আলেম বলেন : তাঁর পবিত্র কবরের সামনেও বেশি উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা আদবের খেলাফ। অনুরূপ যে মজলিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস পাঠ অথবা বর্ণনা করা হয়, তাতেও হট্টগোল করা বেআদবী। কেননা তাঁর কথা যখন তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হতো তখন সবার জন্যে চুপ করে শোনা ওয়াজিব ও জরুরি ছিল। এমনিভাবে ওফাতের পর যে মজলিসে সেসব বাক্যাবলি শুনানো হয়, সেখানে হট্টগোল করাও বেআদবী।

মাসআলা : পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে পয়গম্বরের আগে হাঁটা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার আওতায় যেমন আলেমগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, তেমনিভাবে আওয়াজ উঁচু করারও বিধান তাই। আলেমগণের মজলিসে এত উঁচুস্বরে কথা বলবে না, যাতে তাঁদের আওয়াজ চাপা পড়ে যায়। −(কুরতুবী)

اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ, তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু করো না এই আশঙ্কার কারণে যে, কোথাও তোমাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যায় এবং তোমরা টেরও পাও না। এস্থলে শরিয়তের স্বীকৃত মূলনীতির দিক দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয় (এক) আহলে সুন্নত ওয়াল জমাতের ঐকমত্যে একমাত্র কুফরিই সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। কোনো গোনাহের কারণে কোনো সৎকর্ম বিনষ্ট হয় না। এখানে মুমিন তথা সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শব্দযোগে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, কাজটি কুফরি নয়। অতএব, আমলসমূহ বিনষ্ট হবে কিরূপে? (দুই) ঈমান একটি ইচ্ছাধীন কাজ। যে পর্যন্ত কেউ স্বেচ্ছায় ঈমান গ্রহণ না করে, মুমিন হয় না। এমনিভাবে কুফরও একটি ইচ্ছাধীন কাজ। স্বেচ্ছায় কুফরি অবলম্বন না করা পর্যন্ত কেউ কাফের হতে পারে না। এখানে আয়াতের শেষাংশে স্পষ্টতঃ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা টেরও পাবে না। অতএব, এখানে খাঁটি কুফরির শাস্তি সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল হওয়া কিরূপে প্রযোজ্য হতে পারে।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে এর এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা দ্বারা সব প্রশ্ন দূর হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, আয়াতের অর্থ এই যে, হে মুসলমানগণ! তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কণ্ঠস্বর থেকে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করা এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা থেকে বিরত থেকো। কারণ এতে তোমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। আশঙ্কার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অগ্রণী হওয়া অথবা তাঁর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করার মধ্যে তাঁর শানে ধৃষ্টতা ও বেআদবী হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যা রাসূলকে কষ্টদানের কারণ। রাসূলের কষ্টের কারণ হয়, এরূপ কোনো কাজ সাহাবায়ে কেরাম ইচ্ছাকৃতভাবে করবেন, যদিও এরূপ কল্পনা করা যায় না, কিন্তু অগ্রণী হওয়া ও কণ্ঠস্বর উঁচু করার মতো কাজ কষ্টদানের ইচ্ছায় না হলেও তা দ্বারা কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই এই জাতীয় কাজ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও গোনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোনো গোনাহর বৈশিষ্ট্য এই যে, যারা এই গোনাহ করে, তাদের থেকে তওবা ও সৎ কর্মের তাওফীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তারা গোনাহে অহর্নিশি মগ্ন হয়ে পরিণামে কুফরি পর্যন্ত

পৌঁছে যায় যা সমস্ত নেক আমল নিষ্ফল হওয়ার কারণ। ধর্মীয় নেতা, ওস্তাদ অথবা পীরকে কষ্ট দেওয়া এমনি গোনাহ্ যা দ্বারা তাওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার আশঙ্কা আছে। এভাবে নবীর সামনে অগ্রণী হওয়া এবং কণ্ঠস্বর উঁচু করা দ্বারাও তাওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার এবং অবশেষে কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার আশংকা থাকে। ফলে সমস্ত সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। যারা এহেন কাজ করে, তারা যেহেতু কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করে না, তাই সে টেরও পাবে না যে, এই ঈমান ও সৎকর্ম নিষ্ফল হওয়ার আসল কারণ কি ছিল। কোনো কোনো আলেম বলেন : বুযুর্গ পীরের সাথে ধৃষ্টতা ও বেআদবীও মাঝে মাঝে তাওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার কারণ হয়ে যায়, যা পরিণামে ঈমানের মতো সম্পদও বিনষ্ট করে দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

-এই আয়াতে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি তৃতীয় আদব শেখানো হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি যখন নিজ বাসগৃহে তশরিফ রাখেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকা, বিশেষতঃ গোঁয়ার্তুমি সহকারে নাম নিয়ে আহ্বান করা বেআদবী। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। حجرات শব্দটি حجرة -এর বহুবচন। অভিধানে প্রাচীর চতুষ্টয় দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে حجرة বলা হয়, যাতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকে। নবী করীম ﷺ-এর নয় জন বিবি ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে পৃথক পৃথক হুজরা তথা কক্ষ ছিল। তিনি পালাক্রমে এসব হুজরায় তশরিফ রাখতেন।

ইবনে সা'দ আতা খোরাসানীর রেওয়ায়েতক্রমে লিখেন : এসব হুজরা খর্জুর শাখা দ্বারা নির্মিত ছিল এবং দরজায় মোটা কালো পশমী পর্দা ঝুলানো থাকত। ইমাম বোখারী (র.) 'আদাবুল-মুফরাদ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী দাউদ ইবনে কায়েসের উক্তি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি এসব হুজরার জেয়ারত করেছি। আমার ধারণা এই যে হুজরার দরজা থেকে ছাদবিশিষ্ট কক্ষ পর্যন্ত ছয় সাত হাতের ব্যবধান ছিল। কক্ষ দশ হাত এবং ছাদের উচ্চতা সাত-আট হাত ছিল। ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেক রাজত্বকালে তাঁরই নির্দেশে এসব হুজরা মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। মদিনার লোকগণ সেদিন অশ্রু রোধ করতে পারেননি।

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাঁদের আলেম ও মাশায়েখের সাথেও এই আদব ব্যবহার করেছেন। সহীহ্ বোখারী ও অন্যান্য কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– আমি যখন কোনো আলেম সাহাবীর কাছ থেকে কোনো হাদীস লাভ করতে চাইতাম, তখন তাঁর গৃহে পৌঁছে ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তাঁর কাছে হাদীস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেন : হে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাচাত ভাই! আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উত্তরে বলতেন : আলেম কোনো জাতির জন্যে পয়গম্বর সদৃশ। আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

হযরত আবূ ওবায়দা (র.) বলেন : আমি কোনো দিন কোনো আলেমের দরজায় যেয়ে কড়া নাড়া দেইনি; বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাত করব। –[রূহুল-মা'আনী]

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতে إِلَيْهِمْ কথাটি যুক্ত হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, ততক্ষণ সবর ও অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ তিনি আগন্তুকদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য বাইরে আসেন। যদি অন্য কোনো প্রয়োজনে তিনি বাইরে আসেন, তখনও নিজের মতলব সম্পর্কে কথা বলা সমীচীন নয়; বরং তিনি নিজে যখন আগন্তুকদের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তখন বলতে হবে।

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো দুষ্ট ও পাপাচারী ব্যক্তি যদি কোনো লোক কিংবা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে, তবে যথোপযুক্ত তদন্ত ব্যতিরেকে তার সংবাদ অথবা সাক্ষ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েজ নয়।

আয়াত সম্পর্কিত বিধান ও মাসআলা : ইমাম জাসসাস আহকামুল-কুরআনে বলেন : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো ফাসেক ও পাপাচারীর খবর কবুল করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েজ নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা এই আয়াতে এক কেরাত হচ্ছে فَتَثَبَّتُوا অর্থাৎ, তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তড়িঘড়ি করোনা; বরং অন্য উপায়ে এর সত্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাক। ফাসেকের খবর কবুল করা যখন না জায়েজ তখন সাক্ষ্য কবুল করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েজ হবে। কেননা সাক্ষ্য এমন একটি খবর, যাকে শপথ ও কসম দ্বারা জোরালো করা হয়। একারণেই অধিকাংশ আলেমের মতে ফাসেকের খবর অথবা সাক্ষ্য শরিয়তে

গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোনো কোনো ব্যাপারে ফাসেকের খবর ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সেটা এই বিধানের ব্যতিক্রম : কেননা আয়াতে এই বিধানের একটি বিশেষ কারণ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, যেসব ব্যাপারে এই কারণ অনুপস্থিত, সেগুলো আয়াতের বিধানে দাখিল নয়, অথবা এর ব্যতিক্রম। উদাহরণতঃ কোনো ফাসেক বরং কাফেরও যদি কোনো বস্তু এনে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে এটা হাদিয়া দিয়েছে, তবে তার এই খবর সত্য বলে মেনে নেওয়া জায়েজ। ফিকাহ গ্রন্থে এর আরো বিবরণ পাওয়া যাবে।

সাহাবীদের আদালত সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও জবাব : বিভিন্ন সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই আয়াতটি ওলীদ ইবনে ওকবা (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আয়াতে তাকে ফাসেক বলা হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত : জানা যায় যে, সাহাবীগণের মধ্যে কেউ ফাসেকও হতে পারে। এটা اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ এই স্বীকৃত ও সর্বসম্মত মূলনীতির পরিপন্থি। অর্থাৎ, সকল সাহাবীই সিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য। তাদের কোনো খবর ও সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা আলূসী (র.) রুহুল মা'আনীতে বলেন : অধিকাংশ আলেম এ সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করেন তাই সত্য ও নির্ভুল। তাঁরা বলেন : সাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপ নয়, তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহ্ সংঘটিত হতে পারে, যা ফিসক তথা পাপাচার। এরূপ গোনাহ্ হলে তাঁদের বেলায় শরিয়তসম্মত শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত হলে তাঁদের খবর এবং সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যান করা হবে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণনাদৃষ্টে আহলে-সুন্নত ওয়াল-জমাতের আকীদা এই যে, সাহাবী গোনাহ্ করতে পারেন, কিন্তু এমন কোনো সাহাবী নেই, যিনি গোনাহ্ থেকে তওবা করে পবিত্র হননি।

কুরআন পাক رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ বলে সর্বাবস্থায় তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছে। গোনাহ্ ক্ষমা করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হয় না। কাযী আবূ ইয়ালা (র.) বলেন : সন্তুষ্টি আল্লাহ তা'আলার একটি চিরাগত গুণ। তিনি সেসব লোকের জন্যেই সন্তুষ্টি ঘোষণা করেন, যাদের সম্পর্কে জানেন যে, সন্তুষ্টির কারণাদির উপরই তাদের ওফাত হবে।

সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কেরামের বিরাট দলের মধ্য থেকে গুণাগুণতি কয়েকজন দ্বারা কখনো কোনো গোনাহ্ হয়ে থাকলেও তাঁরা তাৎক্ষণিক তওবা করার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। রাসূলে কারীম ﷺ-এর সংসর্গের বরকতে শরিয়ত তাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজ অথবা গোনাহ্ তাঁদের পক্ষ থেকে খুবই দুর্বল ছিল। তাঁদের অসংখ্য সৎকর্ম ছিল। নবী করীম ﷺ ও ইসলামের জন্যে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণকে তাঁরা জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ জন্যে এমন সাধনা করেছিলেন, যার নজীর অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এসব গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বের মোকাবিলায় সারাজীবনে কোনো গোনাহ্ হয়ে গেলেও তা স্বভাবতই ধর্তব্য নয়। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর মাহাত্ম্য ও মহব্বতে তাঁদের অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। সামান্য গোনাহ্ হয়ে গেলেও তাঁরা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন এবং তাৎক্ষণিক তওবা করতেন; বরং নিজেকে শাস্তির জন্যে নিজেই পেশ করে দিতেন। কোথাও নিজেই নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন। এসব ঘটনা হাদীসে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায় যেন গোনাহ্ করেনি। তৃতীয়তঃ কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পুণ্যকাজ নিজের গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। বলা হয়েছে : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ। বিশেষতঃ সাহাবায়ে কেরামের পুণ্যকাজ গুনাহের কাফফারা হবেই। কারণ তাঁদের পুণ্যকাজ সাধারণ লোকদের মতো ছিল না। তাঁদের অবস্থা আবূ দাউদ ও তিরমিযী হযরত সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন-

وَاللّٰهِ لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَغْبَرُّ فِيْهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ. وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوْحٍ.

"আল্লাহর কসম তাঁদের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তির নবী করীম ﷺ-এর সাথে জেহাদে শরিক হওয়া- যাতে তাঁর মুখমণ্ডল ধুলি ধুসরিত হয়ে যায়-তোমাদের সারা জীবনের ইবাদত থেকে উত্তম, যদিও তোমাদেরকে হযরত নূহ (আ.)-এর আয়ুষ্কাল দান করা হয়।" অতএব, গোনাহ্ হয়ে গেলে যদিও তাঁদেরকে নির্ধারিত শাস্তিই দেওয়া হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোনো পরবর্তী ব্যক্তির জন্যে তাঁদের কাউকে ফাসেক সাব্যস্ত করা জায়েজ নয়। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কোনো সাহাবী দ্বারা ফিসক হওয়ার কারণে তাঁকে ফাসেক বলা হলেও এর কারণে তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ) পরবর্তীকালেও সর্বদা ফাসেক বলা বৈধ নয়। –[রুহুল মা'আনী]

আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ ওলীদ ইবনে ওকবা (রা.)-এর ঘটনা হলেও আয়াতে তাঁকে ফাসেক বলা হয়েছে- একথা অকাট্যরূপে জরুরি নয়। কারণ এই ঘটনার পূর্বে ফাসেক বলার মতো কোনো কাজ তিনি করেননি। এই ঘটনাও নিজ ধারণা অনুযায়ী সত্য মনে করেই তিনি মোস্তালিক গোত্র সম্পর্কে একটি বাস্তবে ভ্রান্ত সংবাদ দিয়েছিলেন। তাই আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ অনায়াসেই তা হতে পারে, যা উপরে তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এই আয়াত ফাসেকের খবর অগ্রহণীয় হওয়া সম্পর্কে একটি সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াত অবতরণের ফলে বিষয়টি এভাবে আরও জোরদার হয়েছে যে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রা.) ফাসেক না হলেও তাঁর খবর শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা অগ্রহণীয় মনে হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল তাঁর খবরের ভিত্তেতেই ব্যবস্থা গ্রহণ না করে খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে তদন্তের আদেশ দেন। সুতরাং একজন সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির খবরের ইঙ্গিতের ভিত্তিতে সন্দেহ হওয়ার কারণে যখন তদন্ত না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো না, তখন ফাসেকের খবর কবুল না করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা আরও সুস্পষ্ট। সাহাবীগণের 'আদালত' সম্পর্কিত আলোচনার কিছু অংশ পরবর্তী وَإِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতেও বর্ণিত হবে।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْيُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ الخ

এর আগের আয়াত ওলীদ ইবনে ওকবা মোস্তালিক গোত্র সম্পর্কে খবর দিয়েছিল যে, তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে এবং জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। এতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দেয়। তাঁদের মত ছিল যে, মোস্তালিক গোত্রের বিপক্ষে যুদ্ধাভিযান করা হোক। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ওলীদ ইবনে ওকবার খবরকে শক্তিশালী ইঙ্গিতের খেলাফ মনে করে কবুল করেননি এবং তদন্তের জন্যে খালেদ ইবনে ওলীদকে আদেশ করেন। আগের আয়াতে কুরআন এ বিষয়কে আইনের রূপ দান করেছে যে, যে ব্যক্তির খবরে শক্তিশালী ইঙ্গিতের মাধ্যমে সন্দেহ দেখা দেয়, তদন্তের পূর্বে তার খবর অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কেরামকে আরও একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও বনী-মোস্তালিক সম্পর্কিত খবর শুনে তোমাদের উত্তেজনা ধর্মীয় মর্যাদাবোধের কারণে ছিল; কিন্তু তোমাদের মতামত নির্ভুল ছিল না। রাসূলের অবলম্বিত পন্থাই উত্তম ছিল। –(মাযহারী) উদ্দেশ্য এই যে, পরামর্শ সাপেক্ষ ব্যাপারাদিতে কোনো মত পেশ করা তো দুরস্ত; কিন্তু এরূপ চেষ্টা করা যে, রাসূল ﷺ এই মত অনুযায়ীই কাজ করুন, এটা দুরস্ত নয়। কেননা সাংসারিক ব্যাপারাদিতে যদিও খুব কমই রাসূলের মতামত উপযোগিতার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা নবুয়তের পরিপন্থি নয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে যে দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন, তা তোমাদের নেই। তাই রাসূল ﷺ যদি তোমাদের মতামত মেনে চলেন, তবে অনেক ব্যাপারে তোমাদের কষ্ট ও বিপদ হবে। যদি কুত্রাপি কোথাও তোমাদের মতামতের মধ্যেই উপযোগিতা নিহিত থাকে এবং তোমরা রাসূলের আনুগত্যের খাতিরে নিজেদের মতামত পরিত্যাগ কর, যাতে তোমাদের সাংসারিক ক্ষতিও হয়ে যায়, তবে তাতে ততটুকু ক্ষতি নেই, যতটুকু তোমাদের মতামত মেনে চলার মধ্যে আছে। কেননা এমতাবস্থায় কিছু সাংসারিক ক্ষতি হয়ে গেলেও রাসূলের আনুগত্যের পুরস্কার ও ছওয়াব এর চমৎকার বিকল্প বিদ্যমান আছে। عَنِتُّمْ শব্দটি عَنَتٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গোনাহও হয় এবং কোনো বিপদে পতিত হওয়ারও হয়। এখানে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে। –[কুরতুবী]

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হক, আদব এবং তাঁর পক্ষে কষ্টদায়ক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত সমূহে সাধারণ দলগত ও ব্যক্তিগত রীতিনীতি এবং পারস্পরিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। অপরকে কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকাই আলোচ্য আয়াতগুলোর মূল প্রতিপাদ্য।

শানে-নুযূল ঃ এসব আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছে। এসব ঘটনায় খোদ মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়বস্তু আছে। এখন সকল ঘটনার সমষ্টি আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে অথবা কোনো একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য ঘটনাগুলোকে অনুরূপ দেখে সেগুলোকেও অবতরণের কারণের মধ্যে শরিক করে দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতে আসলে যুদ্ধ ও জেহাদের সরঞ্জাম ও

উপকরণের অধিকারী রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করা হয়েছে। –(বাহর, রূহুল মা'আনী) পরোক্ষভাবে সকল মুসলমানকেও সম্বোধন করা হয়েছে যে, তারা এ ব্যাপারে রাজন্যবর্গের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানে কোনো ইমাম, আমীর, সরদার, অথবা বাদশাহ নেই, সেখানে যতদূর সম্ভব বিবাদমান উভয়পক্ষকে উপদেশ দিয়ে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত করতে হবে। যদি উভয়ই সম্মত না হয়, তবে তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। কারো বিরোধিতা এবং কারো পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না।

–[বয়ানুল কুরআন]

মাসআলা : মুসলমানদের দুই দলের যুদ্ধ কয়েক প্রকার হতে পারে। এক. বিবাদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে কিংবা উভয়দল শাসনাধীন হবে না কিংবা একদল শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে এবং অন্যদল শাসন বহির্ভূত হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে উভয়দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি উপদেশে বিরত না হয়, তবে ইমামের পক্ষ থেকে মীমাংসা করা ওয়াজিব। যদি ইসলামি সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে উভয়পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে, তবে কেসাস ও রক্তবিনিময়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয়পক্ষের সাথে বিদ্রোহীর ন্যায় ব্যবহার করা হবে। এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ জুলুম ও নির্যাতন অব্যাহত রাখলে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে আদেল বলা হবে। বিদ্রোহীদের প্রতি প্রযোজ্য বিস্তারিত বিধান ফিকহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপে বিধান এই যে, যুদ্ধের আগে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। যুদ্ধরত অবস্থায় কিংবা যুদ্ধের পর তাদের সন্তান-সন্ততিকে গোলাম অথবা বাঁদি করা হবে না এবং তাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ বলে গণ্য হবে না। তবে তওবা না করা পর্যন্ত ধনসম্পদ আটক রাখা হবে। তওবার পর প্রত্যার্পণ করা হবে। আয়াতে বলা হয়েছে : فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا অর্থাৎ, যদি বিদ্রোহী দল বিদ্রোহ ও যুদ্ধ থেকে বিরত হয় তবে শুধু যুদ্ধ বিরতিই যথেষ্ট হবে না; বরং যুদ্ধের কারণ ও পারস্পরিক অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর, যাতে কোনো পক্ষের মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতা অবশিষ্ট না থাকে এবং স্থায়ী ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারা যেহেতু ইমামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে, তাই তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কুরআন পাক উভয় পক্ষের অধিকারের ব্যাপারে ইনসাফের তাকীদ করেছে। –[বয়ানুল-কুরআন]

মাসআলা : যদি মুসলমানদের কোনো শক্তিশালী দল ইমামের বশ্যতা অস্বীকার করে, তবে ইমামের কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ শ্রবণ করা, তাদের কোনো সন্দেহ কিংবা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করা। তারা যদি তাদের বিরোধিতার শরিয়তসম্মত বৈধ কারণ উপস্থিত করে, যা দ্বারা খোদ ইমামের অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রমাণিত হয় তবে সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে এই দলের সাহায্য ও সমর্থন করা, যাতে ইমাম জুলুম থেকে বিরত হয়। এক্ষেত্রে ইমামের জুলুম নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হওয়া শর্ত। –[মাযহারী]

পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য বর্জনের পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট ও সঙ্গত কারণ পেশ করতে না পারে এবং ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হালাল। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তারা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা জায়েজ হবে না। –[মাযহারী]

এই বিধান তখন, যখন এই দেশের বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হওয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। যদি উভয় পক্ষ কোনো শরিয়তসম্মত প্রমাণ রাখে এবং কে বিদ্রোহী ও কে আদেল, তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়, তবে প্রত্যেক মুসলমানই নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে আদেল মনে করবে সেই পক্ষকে সাহায্য ও সমর্থন করতে পারে। যার এরূপ কোনো প্রবল ধারণা নেই, সে নিরপেক্ষ থাকবে, যেমন জামাল ও সিফফীন যুদ্ধে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ : ইমাম আবূ বকর ইবনে আরাবী (র.) বলেন : এই আয়াত মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের যাবতীয় প্রকারের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। সেসব দ্বন্দ্ব-কলহও এই আয়াতের মধ্যে দাখিল, যাতে উভয় পক্ষ কোনো শরিয়তসম্মত প্রমাণের ভিত্তিতে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরামের বাদানুবাদ এই প্রকারের মধ্যে পড়ে। কুরতুবী ইবনে আরাবীর এই উক্তি উদ্ধৃতি করে এ স্থলে সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ তথা জঙ্গে-জামাল ও সিফফীনের আসল স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে পরবর্তী যুগের মুসলমানদের কর্মপন্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এখানে কুরতুবীর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হচ্ছে :

কোনো সাহাবীকে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত বলা জায়েজ নয়। কারণ তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমেই নিজ নিজ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন। সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। তাঁরা সবাই আমাদের নেতা। আমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, আমরা যেন তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি এবং সর্বদা উত্তম পন্থায় তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কেননা সাহাবী হওয়া বড়ই সম্মানের বিষয়। নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এছাড়া বিভিন্ন সনদে এই হাদীস প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত তালহা (রা.) সম্পর্কে বলেছেনঃ إِنَّ طَلْحَةَ شَهِيْدٌ يَمْشِيْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ -অর্থাৎ, তালহা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরাকারী শহীদ।

এখন হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে হযরত তালহার যুদ্ধের জন্যে বের হওয়া প্রকাশ্য গোনাহ্ ও নাফরমানি হলে এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি কিছুতেই শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না। এমনিভাবে হযরত তালহার এই কাজকে ভ্রান্ত এবং কর্তব্য পালনে ত্রুটি সাব্যস্ত করা সম্ভব হলেও তাঁর জন্যে শাহাদাতের মর্তবা অর্জিত হতো না। কারণ শাহাদাত একমাত্র তখনই অর্জিত হয়, যখন কেউ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জন দেয় কাজেই তাঁদের ব্যাপারে পূর্ববর্ণিত বিশ্বাস পোষণ করাই জরুরি।

এ ব্যাপারে খোদ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত সহীহ্ ও মশহুর হাদীস দ্বিতীয় প্রমাণ। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যুবায়রের হত্যাকারী জাহান্নামে আছে।

হযরত আলী (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি, সফিয়্যা-তনয়ের হত্যাকারীকে জাহান্নামের খবর দিয়ে দাও। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা.) এই যুদ্ধের কারণে পাপী ও গোনাহ্গার ছিলেন না। এরূপ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত তালহাকে শহীদ বলতেন না এবং যুবায়রের হত্যাকারী সম্পর্কে জাহান্নামের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন না। এছাড়া তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জন সাহাবীর অন্যতম। তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রায় সর্ববাদিসম্মত।

এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা এসব যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁদেরকেও ভ্রান্ত বলা যায় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এ মতের উপরই কায়েম রেখেছেন-এদিক দিয়ে তাঁদের কর্মপন্থাও সঠিক ছিল। সুতরাং এ কারণে তাঁদেরকে ভর্ৎসনা করা, তাঁদের ফজিলত, সাধনা ও মহান ধর্মীয় মর্যাদা অস্বীকার করা কিছুতেই দুরস্ত নয়। জনৈক আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হয় : সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদের ফলস্বরূপ যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি জবাবে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন :

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ, সেই উম্মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্যে। তারা কি করত না করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

একই প্রশ্নের জওয়াবে অন্য একজন বুযুর্গ বলেন : এটা এমন রক্ত যে, আল্লাহ এর দ্বারা আমার হাতকে রঞ্জিত করেননি। এখন আমি আমার জিহ্বাকে এর সাথে জড়িত করতে চাই না। উদ্দেশ্য এই যে, আমি কোনো এক পক্ষকে কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত ভ্রান্ত সাব্যস্ত করার ভুলে লিপ্ত হতে চাই না।

আল্লামা ইবনে ফওর বলেন : আমাদের একজন সহযোগী বলেছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যবর্তী বাদানুবাদ হযরত ইউসুফ (আ.) ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলির অনুরূপ। তাঁরা পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও বেলায়েত ও নবুয়তের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাননি। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক ঘটনাবলির ব্যাপারটিও হুবহু তাই।

হযরত মুহাসেবী (র.) বলেন : সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক রক্তপাতের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কিছু মন্তব্য করা সুকঠিন। কেননা এ ব্যাপারে খোদ সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। হযরত হাসান বসরী সাহাবীদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন : এসব যুদ্ধে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা অনুপস্থিত। তাঁরা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন। আমরা জানি না। যে ব্যাপারে সব সাহাবী একমত আমরা তাতে তাঁদের অনুসরণ করব এবং যে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, সেই ব্যাপারে আমরা নিশ্চুপ থাকব।

হযরত মুহাসেবী (র.) বলেন : আমিও তাই বলি, যা হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন। আমি জানি তাঁরা যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরা আমাদের চাইতেও অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁদের সর্বসম্মত বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকাই আমাদের কাজ। আমাদের তরফ থেকে নতুন কোনো পথ আবিষ্কার করা অনুচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করেছিলেন। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা সবাই সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ الخ

সূরা হুজুরাতের শুরুতে নবী করীম ﷺ-এর হক ও আদব, অতঃপর সাধারণ মুসলমানদের পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতি-নীতি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দুই আয়াতে মুসলমানদের দলগত সংশোধনের বিধান উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক হক, আদব ও সামাজিক রীতি-নীতি বিবৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (এক) কোনো মুসলমানকে ঠাট্টা ও উপহাস করা, (দুই) কাউকে দোষারোপ করা এবং (তিন) কাউকে অপমান করা অথবা পীড়াদায়ক নামে ডাকা।

কুরতুবী বলেন : কোনো ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্যে তার কোনো দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতারা হাসতে থাকে, তাকে سُخْرِيَةٌ - تَمَسْخُرٌ ও اِسْتِهْزَاءٌ বলা হয়। এটা যেমন মুখে সম্পন্ন হয়, তেমনি হস্তপদ ইত্যাদি দ্বারা ব্যঙ্গ অথবা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে থাকে। কারও কথা শুনে অপমানের ভঙ্গিতে বিদ্রূপ করার মাধ্যমেও হতে পারে। কেউ কেউ বলেন : শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক করে, এমনভাবে কারও সম্পর্কে আলোচনা করাকে سُخْرِيَةٌ ও تَمَسْخُرٌ বলা হয়। কুরআনের বর্ণনা মতে এগুলো সব হারাম।

কুরআন পাক এত গুরুত্ব সহকারে سُخْرِيَةٌ তথা উপহাস নিষিদ্ধ করেছে যে, এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী জাতিকে পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। পুরুষদের জন্যে কওম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ অভিধানে এ শব্দটি পুরুষদের জন্যেই নির্ধারিত, যদিও রূপকভঙ্গিতে নারীদেরকেও শামিল করা হয়ে থাকে। কুরআন পাক সাধারণতঃ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যে কওম শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু কুরআন এখানে কওম শব্দটি বিশেষভাবে পুরুষদের জন্য ব্যবহার করেছে এবং এর বিপরীতে نِسَاءٌ শব্দের মাধ্যমে নারীদের কথা উল্লেখ করেছে। উভয়কে বলা হয়েছে যে, যে পুরুষ অপর পুরুষকে উপহাস করে, সে আল্লাহর কাছে উপসাহকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। এমনিভাবে যে নারী অপর নারীকে উপহাস করে, সে আল্লাহর কাছে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। কুরআনে পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে উপহাস করা ও তা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ কোনো পুরুষ নারীকে এবং কোনো নারী পুরুষকে উপহাস করলে তাও হারাম। কিন্তু একথা উল্লেখ না করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের মেলামেশাই শরিয়তে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। মেলামেশা না হলে উপহাসের প্রশ্নই উঠে না। আয়াতের সারমর্ম এই যে, কোনো ব্যক্তির দেহে, আকার-আকৃতিতে অথবা গঠনপ্রকৃতিতে কোনো দোষ দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়ে কারো হাসাহাসি অথবা উপহাস করা উচিত নয়। কেননা তার জানা নেই যে, সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি সততা, আন্তরিকতা ইত্যাদির কারণে আল্লাহর কাছে তার চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। এ আয়াতে পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও মনীষীদের অন্তরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমর ইবনে শোরাহবিল (রা.) বলেন ঃ কোনো ব্যক্তিকে বকরির স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে যদি আমার হাসির উদ্রেক হয়, তবে আমি আশঙ্কা করতে থাকি যে, কোথাও আমিও এরূপই না হয়ে যাই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : কোনো কুকুরকেও উপহাস করতে আমার ভয় লাগে, আমিও নাকি কুকুর হয়ে যাই। –[কুরতুবী]

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের আকার-আকৃতি ও ধন-দৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। কুরতুবী (র.) বলেন : এই হাদীস থেকে এই বিধি ও মূলনীতি জানা যায় যে, কোনো ব্যক্তি বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিতরূপে ভালো অথবা মন্দ বলে দেওয়া জায়েজ নয়। কারণ যে ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মকে আমরা খুব ভালো মনে করছি, সে আল্লাহর কাছে নিন্দনীয় হতে পারে। কেননা আল্লাহ তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম মন্দ, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ তার কুকর্মের কাফফারা হয়ে যেতে পারে। তাই যে ব্যক্তিকে মন্দ অবস্থা ও কুকর্মে লিপ্ত দেখ, তার এই অবস্থাকে মন্দ মনে কর; কিন্তু তাকে হেয় ও

লাঞ্ছিত মনে করার অনুমতি নেই। আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে لَمْزٌ-এর অর্থ কারো দোষ বের করা, দোষ প্রকাশ করা এবং দোষের কারণে ভর্ৎসনা করা, ইরশাদ হয়েছে- وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের দোষ বের করো না। এই বাক্যটি وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ-এর মতোই, যার অর্থ তোমরা পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করো না এবং নিজেদের দোষ বের করার অর্থ এই যে, একে অন্যের দোষ বের করো না। এরূপ ভঙ্গিতে দোষ ব্যক্ত করার রহস্য একথা বলা যে, অপরকে হত্যা করা একদিক দিয়ে নিজেকেই হত্যা করার শামিল। কেননা প্রায়ই তো এরূপ হয়েই যায় যে, একজন অন্যজনকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির সমর্থকরা তাকেও হত্যা করে। এটা না হলেও প্রকৃত সত্য এই যে, মুসলমান সব ভাই ভাই। ভাইকে হত্যা করা যেন নিজেকে হত্যা করা এবং হস্তপদ বিহীন করে দেওয়া-وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ-এর অর্থও তাই। অর্থাৎ, তোমরা অন্যের দোষ বের করলে, সেও তোমাদের দোষ বের করবে। কারণ দোষ থেকে কোনো মানুষ মুক্ত নয়। জনৈক আলেম বলেন : وَفِيْكَ عُيُوْبٌ وَلِلنَّاسِ اَعْيُنٌ অর্থাৎ, তোমার মধ্যেও দোষ আছে এবং মানুষের চক্ষু আছে। তারা দোষ দেখে। তুমি কারো দোষ বের করলে সেও তোমার দোষ বের করবে। যদি সে সবর করে, তবে সে কথাই বলতে হবে যে, মুসলমান ভাইয়ের দুর্নাম নিজেরই দুর্নাম।

আলেমগণ বলেন, নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি রেখে তা সংশোধনের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকার মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য নিহিত। যে এরূপ করে, সে অপরের দোষ বের করা ও বর্ণনা করার অবসরই পায় না। হিন্দুস্তানের সর্বশেষ মুসলমান বাদশাহ, যুফর চমৎকার বলেছেন : نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر ٭ رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر ٭ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا

আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, অপরকে মন্দ নামে ডাকা, যদ্দরুন সে অসন্তুষ্ট হয়। উদাহরণতঃ কাউকে খঞ্জ, খোঁড়া অথবা অন্ধ বলে ডাকা অথবা অপমানজনক নামে সম্বোধন করা। হযরত আবূ জুবায়ের আনসারী (রা.) বলেন : এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমাদের অধিকাংশ লোকের দুই তিনটি করে নাম খ্যাত ছিল। তন্মধ্যে কোনো কোনো নাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লজ্জা দেওয়া ও লাঞ্ছিত করার জন্য লোকেরা খ্যাত করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা জানতেন না। তাই মাঝে মাঝে সেই মন্দ নাম ধরে তিনিও সম্বোধন করতেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম বলতেন : ইয়া রসূলুল্লাহ সে এই নাম শুনলে অসন্তুষ্ট হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ-এর অর্থ হচ্ছে কেউ কোনো গোনাহ্ অথবা মন্দকাজ করে তওবা করার পরও তাকে সেই মন্দকাজের নামে ডাকা। উদাহরণতঃ চোর, ব্যভিচারী অথবা শরাবী বলে সম্বোধন করা। যে ব্যক্তি চুরি, যেনা, শরাব ইত্যাদি থেকে তওবা করে নেয়, তাকে অতীত কুকর্ম দ্বারা লজ্জা দেওয়া ও হেয় করা হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন গোনাহ্ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তওবা করেছে, তাকে সেই গোনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন। –[কুরতুবী]

কোনো কোনো নাম-এর ব্যতিক্রম : কোনো কোনো লোকের এমন নাম খ্যাত হয়ে যায়, যা আসলে মন্দ, কিন্তু এ নাম ব্যতীত কেউ তাকে চেনে না। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে এ নামে ডাকা জায়েজ। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। যেমন, কোনো কোনো মুহাদ্দিসের নামের সাথে اَحْدَبُ - اَعْرَجُ ইত্যাদি খ্যাত আছে। খোদ রসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক অপেক্ষাকৃত লম্বা হাতবিশিষ্ট সাহাবীকে ذُو الْيَدَيْنِ নামে পরিচিত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় : হাদীসের সনদে কতক নামের সাথে কিছু পদবী যুক্ত হয়; যেমন مَرْوَانُ الْاَخْضَرُ - سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ - حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ ইত্যাদি এসব পদবী সহকারে নাম উল্লেখ করা জায়েজ কি না? তিনি বললেন : দোষ বর্ণনা করার ইচ্ছা না থাকলে এবং পরিচয় পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকলে জায়েজ। -[কুরতুবী]

ভালো নামে ডাকা সুন্নত : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মুমিনের হক অপর মুমিনের উপর এই যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে। একারণেই আরবে ডাকনামের প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তা পছন্দ করেছিলেন। তিনি বিশেষ বিশেষ সাহাবীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন যেমন– হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে আতীক, হযরত ওমর (রা.)-কে ফারূক, হযরত হামযা (রা.)-কে আসাদুল্লাহ এবং খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে সাইফুল্লাহ পদবী দান করেছিলেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اٰمَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (أ - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– মুমিনগণ।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

لَا تَشْعُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِشْعَارُ মূলবর্ণ (ش - ع - ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা টেরও পাবে না।

يَغُضُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغَضُّ মূলবর্ণ (غ - ض - ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– স্বর অনুচ্চরাখে।

اِمْتَحَنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِمْتِحَانُ মূলবর্ণ (م - ح - ن) জিনস صحيح অর্থ– বিশুদ্ধ করেছেন, পরীক্ষা করেছেন।

حُجُرَاتٌ : বহুবচন, একবচন حُجْرَةٌ অর্থ– হুজরা, প্রকোষ্ঠ।

تَبَيَّنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ খুব অনুসন্ধান করে নাও।

عَنِتُّمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার عَنَتٌ মূলবর্ণ (ع - ن - ت) জিনস صحيح অর্থ তোমাদের বিশেষ ক্ষতি হবে।

بَغَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بَغْىٌ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ বাড়াবাড়ি করে।

تَفِيْءَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف منصوب বাব ضَرَبَ মাসদার فَيْءٌ মূলবর্ণ (ف - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং اجوف يائى) অর্থ ফিরে আসে।

لَا تَلْمِزُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার لَمْزٌ মূলবর্ণ (ل - م - ز) জিনস صحيح অর্থ তোমরা খোঁটা দিও না।

لَا تَنَابَزُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَنَابُزٌ মূলবর্ণ (ن - ب - ز) জিনস صحيح অর্থ সম্বোধন করো না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ : এখানে وَاوْ টি হরফে আতফ। আর اِتَّقُوْا ফে'লে আমর, আর তার যমীর হলো ফায়েল, اللّٰهَ শব্দটি مفعول به এবং اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَللّٰهَ হলো اسم ان আর سَمِيْعٌ হলো ১ম خبر ان আর عَلِيْمٌ হলো ২য় خبر ان এ বাক্যটি হলো تعليليه -এর 'ইরাবে কোনো অবস্থান নেই।

–[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৪৩]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ؗ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

১২. হে মু'মিনগণ! অনেক অনুমান হতে বেঁচে থাক, কেননা কোনো কোনো অনুমান পাপজনক হয়ে থাকে এবং (কারো দোষ) অনুসন্ধান করো না, আর একে অন্যের গিবত (অগোচরে দুর্নাম)-ও করো না; তোমাদের মধ্যে কেউ কি স্বীয় মৃত ভ্রাতার গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তা তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করে থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় তওবা কবুলকারী, দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

১৩. হে মানবগণ! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার; তোমাদের মধ্যকার যে অধিক পরহেজগার, সে আল্লাহর নিকট অধিক সম্ভ্রান্ত; আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাতা, সর্ববিদিত।

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

১৪. এই গ্রাম্য লোকেরা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি; আপনি বলে দিন, তোমরা ঈমান তো আননি, বরং এরূপ বল যে, আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি এবং এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি; আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহ হতে কিছুমাত্র হ্রাস করবেন না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মু'মিনগণ اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ অনেক অনুমান হতে বেঁচে থাক اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ কেননা কোনো কোনো অনুমান পাপজনক হয়ে থাকে وَّلَا تَجَسَّسُوْا এবং (কারো দোষ) অনুসন্ধান করো না وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا আর একে অন্যের গিবত (অগোচরে দুর্নাম)-ও করো না; اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করবে اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا স্বীয় মৃত ভ্রাতার গোশ্ত খেতে فَكَرِهْتُمُوْهُ তা তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করে থাক وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহ কে ভয় কর اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় তওবা কবুলকারী, দয়ালু।

১৩. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ হে মানবগণ! اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি لِتَعَارَفُوْا যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার, সে আল্লাহর নিকট অধিক সম্ভ্রান্ত اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ আল্লাহ সম্যক জ্ঞাতা, সর্ববিদিত।

১৪. قَالَتِ الْاَعْرَابُ এই গ্রাম্য লোকেরা বলে যে اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি قُلْ আপনি বলে দিন لَّمْ تُؤْمِنُوْا তোমরা ঈমান তো আন নি وَلٰكِنْ قُوْلُوْۤا বরং এরূপ বল যে اَسْلَمْنَا আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ এবং এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا তবে আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহ হতে কিছু মাত্র হ্রাস করবেন না; اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫. পূর্ণ মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর তাতে সন্দেহ করেনি, অধিকন্তু স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে (ধর্মের জন্য) শ্রম স্বীকার করেছে; এরাই সত্যবাদী।	اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের ধর্ম (গ্রহণ) -এর সংবাদ দিচ্ছো? অথচ আল্লাহ সমগ্র আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে প্রত্যেক বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।	قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٦﴾
১৭. আর তারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণকে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করা বলে প্রকাশ করছে; আপনি বলে দিন, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ বলে মনে করো না; বরং আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন। যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. আল্লাহ আসমান ও জমিনের সমস্ত গোপনীয় বিষয় জানেন এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপও জানেন।	اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ পূর্ণ মু'মিন তো তারাই الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا অতঃপর তাতে সন্দেহ করেনি। وَجٰهَدُوْا অধিকন্তু (ধর্মের জন্য) শ্রম স্বীকার করেছে بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ এরাই সত্যবাদী।

১৬. قُلْ আপনি তাদেরকে বলে দিন اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের ধর্ম (গ্রহণ)-এর সংবাদ দিচ্ছো وَاللّٰهُ يَعْلَمُ অথচ আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ সমগ্র আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে প্রত্যেক বিষয় وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

১৭. يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ আর তারা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করা বলে প্রকাশ করছে اَنْ اَسْلَمُوْا নিজেদের ইসলাম গ্রহণ কে قُلْ আপনি বলে দিন لَا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ তোমাদের ইসলাম গ্রহণ দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ বলে মনে করো না بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ বরং আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ তিনি তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৮. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ আল্লাহ জানেন غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের সমস্ত গোপন বিষয় وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপও জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ [١٢]

শানে নুযূল–১ : ইবনে আবী হাতিম সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত দু'জন সাহাবী সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, রাসূল ﷺ কোনো সফরে বের হলে এক জন দরিদ্র মানুষকে স্বচ্ছল ও ধনাঢ্য এক জন লোকের সাথে সফর সঙ্গি করে দিতেন। কারণ গরিব লোকটি ধনীলোক গুলোর খেদমত করার সুবাদে সফর করার সুযোগ পায়। সে মতে হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-কেও দু'জন মানুষের সাথে সফর সঙ্গি করে দেওয়া হলো। তখন হযরত সালমান (রা.) ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ফলে আর খাবার তৈরি করার সুযোগ পাননি। অতঃপর তারা দু'জন খাবারের কিছুই পায়নি। সুতরাং তারা দু'জন তাকে বলল, নবী করীম ﷺ-এর নিকট গিয়ে আমাদের জন্যে খাবার ও তরকারি নিয়ে আস। ফলে তিনি গেলেন, নবী করীম ﷺ বললেন যে, তুমি উসামার নিকট গিয়ে বল যে, তার নিকট যদি অতিরিক্ত খাবার থেকে থাকে তোমাকে যেন দেয়। উসামা ছিলেন রাসূল ﷺ-এর কোষাধ্যক্ষ। উসামার নিকট গেলে উসামা বললেন যে, আমার নিকট কিছুই নেই। হযরত সালমান (রা.) তাদের নিকট এসে তা জানানোর পর তারা মন্তব্য করল যে, তার নিকট তো রয়েছে বটে, কিন্তু সে বখিল, দেবে না। অতঃপর তারা দু'জন বের হয়ে খুজতে লাগল যে, সালমান এর নিকট কিছু রয়েছে কি না? এ সময় রাসূল ﷺ তাদেরকে দেখে বললেন যে, "তোমাদের মুখে তো গোশ্তের তরকারি দেখতে পাচ্ছি" তারা জবাবে বলল, হে নবী ﷺ অদ্য গোশ্ত বা অন্য কিছুই তো খাইনি। রাসূল ﷺ বললেন যে, "তবে তোমরা উসামা ও সালমানের গোশ্ত খাচ্ছ" তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–২ : ইবনুল মুনযির ইবনে জুরাইজ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন যে, লোকজনের ধারণা হলো আলোচ্য আয়াত হযরত সালমান ফার্সী (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি আহার করে শুয়ে পড়লেন এবং শ্বাস প্রশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তখন দু'জন মানুষ বলল যে, তার খাওয়া ও ঘুমানোটা। তা তুচ্ছ করেই বলল। তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[রূহুল মা'আনী ১৫৯/২৬/১৩, দুররে মানছূর ৯৪/৬, কুরতুবী ২৮২/১৬]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [١٣]

শানে নুযূল–১ : ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম ও দালায়েল গ্রন্থে বাইহাকী প্রমুখ ইবনে আবী মুলাইকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিনে হযরত বেলাল (রা.) যখন কা'বা গৃহে আরোহণ করে আজান দিলেন, তখন হারিছ বিন হিশাম ও এতাব বিন উসাইদ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, এ কৃষ্ণ দাস এসে কা'বা গৃহের উপর উঠে আজান দিচ্ছে। তাদের এ শ্রেণি বৈষম্যতার মূলোৎপাটন করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে, হযরত নবী করীম ﷺ-এর দরবারে কোনো ব্যক্তি ছাবেত বিন কায়স এর সরে বসার কথা বলেছিল তিনি তা না করার কারণে সে বলে ছিল يَا ابْنَ فُلَانَةَ (হে অমুক নারীর পুত্র)! তখন রাসূল ﷺ তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, তুমি তো দীন ও তাকওয়া খোদা ভীতি ব্যতিরেকে প্রাধান্যতা নিতে পারবে না। সে প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৩ : ইমাম আবূ দাউদ স্বীয় মারাসেল গ্রন্থে, ইবনে মারদূভিয়া প্রমুখ যুহরী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বনূ বাইয়াযা গোত্রের লোক জনকে বললেন যে, তারা যেন তাদেরই একটি মহিলাকে আবূ হিন্দের নিকট বিবাহ দান করে। তখন তারা বলল যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের একজন মহিলাকে আমাদেরই একজন দাসের সাথে বিবাহ সম্পাদন করব? সেই শ্রেণি বৈষম্যতা দূরীকরণার্থে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর এক বর্ণনা মতেও আলোচ্য আয়াত বনু বাইয়াযা বাসীদের শ্রেণি বৈষম্য মূলক চিন্তা ধারার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল–৪ : ইয়াযীদ বিন শাজারাহ (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম ﷺ একদা মদীনার বাজার অতিক্রম করছিলেন, এমন সময় একটি কৃষ্ণাঙ্গ দাসকে দেখতে পেলেন যে, সে বলছে আমাকে ক্রয় করবে এশর্তে যে, সে আমাকে রাসূলের পিছনে নামাজ পড়তে বাধা দেবে না। সুতরাং এশর্ত সাপেক্ষে এক ব্যক্তি তাকে খরিদ করে। অতঃপর রাসূল ﷺ

প্রতি নামাজের সময়ে তাকে দেখেন। ঘটনা চক্রে একদা তাকে না দেখতে পেয়ে তার মনিবকে জিজ্ঞেস করলেন সে দাস সম্পর্কে। উত্তরে বলল, সে তো জ্বরে আক্রান্ত রাসূল ﷺ তাকে দেখতে যান। অতঃপর কতক দিন পর তাকে সে গোলামটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সে বলল, গোলামটি মারা গেছে। অতঃপর রাসূল ﷺ দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে গোসল করিয়ে দাফন করেন। এ কাজটি মুহাজির ও আনসার সকলের অন্তরেই রেখাপাত করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৬৩/১৩/২৬, দুররে মানছূর ৯৭/৯৮/৬, ফতহুল কাদীর ৬৯/৫, কুরতুবী ২৯২/১৬]

قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ [١٤]

শানে নুযূল : মুজাহিদ (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত বনূ আসাদ বিন খুযাইমা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কাতাদা বলেন, আলোচ্য আয়াত এমন সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে, যারা তাদের ঈমান গ্রহণ করার বিষয়টি নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট তাদের অনুকম্পার কথা শুনাত।

মুজাহিদ যে মতপোষণ করেছেন, তার বিবরণ হচ্ছে এই যে, বনূ আসাদ বিন খুযাইমার লোকেরা মদীনা অতিক্রম করে যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় তারা ইসলাম প্রকাশ করল অথচ তাদের অন্তর রয়েছিল কলুষিত। একমাত্র গনিমতের মাল ও জাগতিক ভোগ সম্ভারই তাদের কামনা ছিল।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, দুর্ভিক্ষের বৎসরে তারা মদীনায় এসে ইসলাম প্রকাশ করে রাসূল ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলছিল যে, আমরা আপনাদের সাথে। আমরা এবং আমাদের পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ সহ আপনার নিকট এসেছি। আমরা আপনার সাথে মোকাবিলা করিনি এবং অমুক গোত্রবাসীদের ন্যায় আমরা আপনার মোকাবিলা করবও না। বেদুঈনদের এ কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[ইবনে কাছীর ২১৯/৪, কুরতুবী ২৯৯/১৬, রূহুল মা'আনী ১৬৮/১৩/২৬, দুররে মানছূর ১০০/৬]

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

শানে নুযূল–১ : হযরত নবী করীম ﷺ হুনাইনের যুদ্ধের দিনে আনসারদেরকে বললেন, হে আনসারগণ আমি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট কি পাইনি অতঃপর আমার রব আল্লাহ তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন কি করেননি? তোমরা বহুধা দলে বিভক্ত কি ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে কী দেননি? তোমরা কী দরিদ্র ছিলে না? আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ধনাঢ্য করে কী দেননি? রাসূল ﷺ যা কিছুই বলেছেন, উত্তরে তারা বলেছেন যে, আল্লাহ ও রাসূল অনুগ্রহ করেছেন।

সাইদ বিন যুবাইর (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বনূ আসাদের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আরবের মোকাবিলায় যুদ্ধ করেছি, আপনার মোকাবিলায় যুদ্ধ করিনি, অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন যে, এদের বুঝ কম তবে শয়তান এদের ভাষ্যে কথা বলছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ২১৯/৪]

শানে নুযূল–২ : ইবনে মুনযির ও ইবনে মারদূভিয়া প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবী আউফা (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিন বলেন যে, আরবে কোনো এক গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার মোকাবিলায় যুদ্ধ করিনি, যেরূপভাবে অমুক গোত্রের লোকেরা আপনার মোকাবিলায় যুদ্ধ করেছে। তখন সে বাকপটুতার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। নাসাই ও বায্যার প্রমুখ উলামায়ে কেরাম অনুরূপ এক বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। –[ফতহুল কাদীর ৬৯/৫, দুররে মানছূর]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا الخ

এই আয়াতেও পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি ব্যক্ত হয়েছে এবং এতেও তিনটি বিষয় হারাম করা হয়েছে। (এক) ظَنٌّ তথা ধারণা, (দুই) تَجَسُّس অর্থাৎ, কোনো গোপন দোষ সন্ধান করা এবং (তিন) গিবত অর্থাৎ, কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে শুনলেও অসহনীয় মনে করত। প্রথম বিষয় ظَنٌّ –এর অর্থ প্রবল ধারণা। এ সম্পর্কে কুরআন প্রথমতঃ বলেছে যে, অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। এরপর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, কতক ধারণা পাপ। এ থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়। অতএব, কোন ধারণা পাপ, তা জেনে নেওয়া ওয়াজিব হবে, যাতে তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় এবং জায়েজ না জানা পর্যন্ত তার কাছেও না যায়। আলেম ও ফিকহ্‌বিদগণ এর বিস্তারিত বর্ণনা

দিয়েছেন। কুরতুবী বলেন : ধারণা বলে এস্থলে অপবাদ বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির প্রতি শক্তিশালী প্রমাণ ব্যতিরেকে কেনো দোষ অথবা গোনাহ্ আরোপ করা। ইমাম আবূ বকর জাসসাস (র.) আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ধারণা চার প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার হারাম, দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজিব, তৃতীয় প্রকার মোস্তাহাব এবং চতুর্থ প্রকার জায়েজ। হারাম ধারণা এই যে, আল্লাহর প্রতি কুধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে শাস্তিই দেবেন অথবা বিপদেই রাখবেন। এটা যেন আল্লাহর মাগফেরাত ও রহমত থেকে নৈরাশ্য। হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ তোমাদের কারও আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়। অন্য এক হাদীসে আছে اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ -অর্থাৎ, আমি আমার বান্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে। এখন তার আমার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক। এ থেকে জানা যায় যে আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করা ফরজ এবং কুধারণা পোষণ করা হারাম। এমনিভাবে যেসব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কুধারণা পোষণ করা হারাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ অর্থাৎ, ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর। এখানে সবার মতেই ধারণা বলে প্রমাণ ব্যতিরেকে মুসলমানের প্রতি কুধারণা বোঝানো হয়েছে। যেসব কাজের কোনো এক দিককে আমলে আনা আইনত : জরুরি এবং সে সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই; সেখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব; যেমন পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ ও মোকদ্দমার ফয়সালায় নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া। কারণ যে বিচারকের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়, তার জন্যে ফয়সালা দেওয়া জরুরি ও ওয়াজিব এবং এই বিশেষ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোনো বর্ণনা নেই। এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা বিচারকের জন্যে জরুরি। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরও মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকে। তার সত্যবাদিতা নিছক একটা প্রবল ধারণা মাত্র। সেমতে এই ধারণা অনুযায়ী আমল করাই ওয়াজিব। এমনিভাবে যে জায়গায় কেবলার দিক অজ্ঞাত থাকে এবং জেনে নেওয়ার মতো কোনো লোকও না থাকে, সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কোনো ব্যক্তির উপর কোনো বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হলে সেই বস্তুর মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারেও প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। জায়েজ ধারণা এমন, যেমন নামাজের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহ হলো যে, তিন রাকাত পড়া হয়েছে, না চার রাকাত। এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়েজ। যদি সে প্রবল ধারণা বাদ দিয়ে নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ, তিন রাকাত সাব্যস্ত করে চতুর্থ রাকাত পড়ে নেয়, তবে তাও জায়েজ। প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মোস্তাহাব। এর জন্যে ছওয়াবও পাওয়া যায়। –[জাসসাস]

কুরতুবী বলেন : কুরআনে বলা হয়েছে :
لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا -এতে মুমিনদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার তাকিদ আছে। অপর পক্ষে একটি সুবিদিত বাক্য আছে اِنَّ مِنَ الْحَزْمِ سُوْءَ الظَّنِّ অর্থাৎ, প্রত্যেকের প্রতি কুধারণা পোষণ করাই সাবধানতা। এর উদ্দেশ্য এই যে, কুধারণার বশবর্তী হয়ে যেরূপ ব্যবহার করা হয়, প্রত্যেকের সাথে সেরূপ ব্যবহার করবে। অর্থাৎ, আস্থা ব্যতিরেকে নিজের জিনিস কাউকে সোপর্দ করবে না। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অপরকে চোর মনে করে লাঞ্ছিত করবে। মোটকথা, কোনো ব্যক্তিকে চোর অথবা বিশ্বাসঘাতক মনে না করে নিজের ব্যাপারে সতর্ক হবে। শেখ সাদী (র.)-এর নিম্নোক্ত উক্তির অর্থও তাই। نگہ دار وآں شوخ در کیسہ در * کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بر

আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে تَجَسُّسْ অর্থাৎ, কারো দোষ সন্ধান করা। এ শব্দে দু'টি কেরাত আছে। (এক) لَا تَجَسَّسُوْا জীম সহকারে এবং (দুই) لَا تَحَسَّسُوْا হা সহকারে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে এই দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে لَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَسَّسُوْا উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি। আখফাশ উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, জীম সহকারে تَجَسُّس -এর অর্থ কোনো গোপন বিষয় সন্ধান করা এবং হা-সহকারে تَحَسُّسْ -এর অর্থ সাধারণ সন্ধান করা। সূরা ইউসুফে فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيْهِ আয়াতে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে দোষ তোমার সামনে আছে, তা ধরতে পার, কিন্তু কোনো মুসলমানের যে দোষ প্রকাশ্য নয়, তা সন্ধান করা জায়েজ নয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ অর্থ– মুসলমানদের গিবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বগৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন। –[কুরতুবী]

বয়ানুল-কুরআনে আছে, গোপনে অথবা নিদ্রার ভান করে কারো কথাবার্তা শোনাও নিষিদ্ধ, تَجَسُّسْ এর অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য মুসলমানের হেফাজতের উদ্দেশ্য থাকে, তবে ক্ষতিকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান জায়েজ। আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে গিবত। অর্থাৎ, কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কষ্টকর কথাবার্তা বলা, যদিও তা সত্যকথা হয়। কেননা মিথ্যা হলে সেটা অপবাদ, যা কুরআনের অন্য আয়াত দ্বারা হারাম। এখানে "অনুপস্থিতিতে" কথা থেকে এরূপ বোঝা সঙ্গত নয় যে, উপস্থিতিতে কষ্টকর কথা বলা জায়েজ হবে। কেননা এটা গিবত নয়, কিন্তু لَمْز তথা দোষ বের করারও অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী আয়াতে এর নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে।

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا -এই আয়াত কোনো মুসলমানের বেইজ্জতী অপমানকে তার গোশ্‌ত খাওয়ার সমতুল্য সাব্যস্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত থাকলে এই বেইজ্জতী জীবিত মানুষের গোশ্‌ত টেনে ভক্ষণ করার সমতুল্য হবে। لَمْز শব্দের মাধ্যমে কুরআন একে হারাম সাব্যস্ত করেছে; যেমন বলা হয়েছে, وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ এবং আরও পরে এক আয়াত আসবে وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ -সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত না থাকলে তার পশ্চাতে কষ্টদায়ক কথাবার্তা বলা মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য। মৃত মানুষের গোশ্‌ত ভক্ষণ করলে যেমন তার কোনো কষ্ট হয় না, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত গিবতের কথা না জানে, তারও কোনো কষ্ট হয় না। কিন্তু কোনো মৃত মুসলমানের গোশ্‌ত খাওয়া যেমন হারাম ও চূড়ান্ত নীচতা, তেমনি গিবত করাও হারাম এবং নীচতা। কারণ অসাক্ষাতে কাউকে মন্দ বলা কোনো বীরত্বের কাজ নয়।

এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে গিয়ে গিবতের নিষিদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একে মৃত মুসলমানের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য প্রকাশ করে এর নিষিদ্ধতা ও নীচতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, কারও উপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ করা পীড়াদানের কারণে হারাম, কিন্তু তার প্রতিরোধ সে নিজেও করতে পারে। প্রতিরোধের আশঙ্কায় প্রত্যেকেরই এরূপ দোষ প্রকাশ করার সাহসও হয় না এবং এটা স্বভাবতঃই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে গিবতের মধ্যে কোনো প্রতিরোধকারী থাকে না। নীচ থেকে নীচতর ব্যক্তি কোনো উচ্চতর ব্যক্তির গিবত অনায়াসে করতে পারে। প্রতিরোধ না থাকার কারণে এর ধারা সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়ে থাকে এবং এতে মানুষ লিপ্তও হয় বেশি। এসব কারণে গিবতের নিষিদ্ধতার উপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য করা হয়েছে যে, কেউ গিবত শুনলে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধের শক্তি না থাকলে কমপক্ষে তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকবে। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে গিবত শোনাও নিজে গিবত করার মতোই।

হযরত মায়মুন (রা.) বলেন : একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক সঙ্গি ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং একব্যক্তি আমাকে বলছে একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম, আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল : কারণ, তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গি গোলামের গিবত করেছ। আমি বললাম : আল্লাহর কসম! আমি তো তার সম্পর্কে কখনো কোনো ভালোমন্দ কথা বলিনি। সে বলল : হ্যাঁ, একথা ঠিক, কিন্তু তুমি তার গিবত শুনেছ এবং এতে সম্মত রয়েছ। এই ঘটনার পর হযরত মায়মূন (রা.) নিজে কখনো কারো গিবত করেননি এবং তাঁর মজলিসে কারো গিবত করতে দেননি।

হযরত হাসান ইবনে মালেক (রা.) বর্ণিত শবে মে'রাজের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে নিয়ে যাওয়া হলে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহের মাংস আঁচড়াচ্ছিল। আমি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? তিনি বললেন : এরা তাদের ভাইয়ের গিবত করত এবং তাদের ইজ্জতহানি করত। –[মাযহারী]

হযরত আবূ সায়ীদ (রা.) ও জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا অর্থাৎ, গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক গোনাহ। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, একব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে তার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু যে গিবত করে, তার গোনাহ্ প্রতিপক্ষের মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না। –[মাযহারী]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গিবতের মাধ্যমে আল্লাহর হক ও বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করা হয়। তাই যার গিবত করা হয়, তার কাছ থেকে মাফ নেওয়া জরুরি। কোনো কোনো আলেম বলেন : যার গিবত করা হয়, গিবতের সংবাদ তার কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত বান্দার হক হয় না। তাই তার কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়া জরুরি নয়।–(রূহুল মা'আনী) কিন্তু বয়ানুল-কুরআনে একথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে : এমতাবস্থায় যদিও তার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরি নয়, কিন্তু যার সামনে গিবত করা হয়, তার সামনে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা এবং নিজ গোনাহ্ স্বীকার করা জরুরি। যদি সেই ব্যক্তি মারা যায়, কিংবা

লাপাত্তা হয়ে যায়, তবে তার কাফ্ফারা এই যে, যার গিবত করা হয়েছে, তার জন্যে আল্লাহর কাছে মাগফেরাতের দোয়া করবে এবং এরূপ বলবে : হে আল্লাহ, আমার ও তার গোনাহ্ মাফ কর। হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই বলেছেন।

মাসআলা ঃ শিশু, উন্মাদ এবং কাফের জিম্মির গিবতও হারাম। কেননা তাদেরকে পীড়া দেওয়াও হারাম। হরবী কাফেরকে পীড়া দেওয়া হারাম না হলেও নিজের সময় নষ্ট করার কারণে তার গিবতও মাকরূহ।

মাসআলা ঃ গিবত যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। উদাহরণতঃ খঞ্জকে হেয় করার উদ্দেশ্যে তার মতো হেঁটে দেখানো।

মাসআলা ঃ কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে সব গিবতকেই হারাম করা হয়নি এবং কতক গিবতের অনুমতি আছে। উদাহরণতঃ কোনো প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারও দোষ বর্ণনা করা জরুরি হলে তা গিবতের মধ্যে দাখিল নয়, তবে প্রয়োজন ও উপকারিতাটি শরিয়তসম্মত হতে হবে। উদাহরণতঃ কোনো অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী এমন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করা, যে তার অত্যাচার দূর করতে সক্ষম। কারো সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা, কোনো ঘটনা সম্পর্কে ফতওয়া গ্রহণ করার জন্যে ঘটনার বিবরণ দান করা, মুসলমানদেরকে কোনো ব্যক্তির সাংসারিক অথবা পারলৌকিক অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে তার অবস্থা বর্ণনা করা, কোনো ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহ করে এবং নিজের পাপাচারকে নিজেই প্রকাশ করে, তার কুকর্ম আলোচনা করাও গিবতের মধ্যে দাখিল নয়, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে নিজের সময় নষ্ট করার কারণে মাকরূহ।–(বয়ানুল-কুরআন, রূহুল মা'আনী) এসব মাসআলায় অভিন্ন বিষয় এই যে, কারো দোষ আলোচনা করার উদ্দেশ্যে তাকে হেয় করা না হওয়া চাই; বরং প্রয়োজনবশতঃই আলোচনা চাই।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا

উপরের আয়াতসমূহে মানবিক ও ইসলামি অধিকার এবং সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয়কে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণ হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে মানবিক সাম্যের একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা রয়েছে যে, কোনো মানুষ অপর মানুষকে যেন নীচ ও ঘৃণা মনে না করে বরং নিজের বংশগত মর্যাদা, পরিবার, অথবা ধন-সম্পদ ইত্যাদির ভিত্তিতে গর্ব না করে। কেননা এগুলো প্রকৃতপক্ষে গর্বের বিষয় নয়। এই গর্বের কারণে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই বলা হয়েছে : সব মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান হওয়ার দিক দিয়ে ভাই ভাই এবং পরিবার, গোত্র, অথবা ধন-দৌলতের দিক দিয়ে যে প্রভেদ আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন, তা গর্বের জন্যে নয়, পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যে।

শানে নুযূল : এই আয়াত মক্কা বিজয়ের সময় তখন নাজিল হয়, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বেলাল হাবশী (রা.)-কে মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেন। এতে মক্কার অমুসলমান কুরাইশদের একজন বলল : আল্লাহকে ধন্যবাদ যে, আমার পিতা পূর্বেই মারা গেছেন। তাকে এই কু-দিন দেখতে হয়নি। হারেস ইবনে হেশাম বলল : মুহাম্মদ ﷺ মসজিদে হারামে আজান দেওয়ার জন্যে এক কালো কাক ব্যতীত অন্য কোনো মানুষ পেলেন না? আবূ সুফিয়ান বলল : আমি কিছুই বলব না; কারণ আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি কিছু বললেই আকাশের মালিক তার (মুহাম্মদের) কাছে তা পৌঁছিয়ে দেবেন। এসব কথাবার্তার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের সব কথাবার্তা বলে দিলেন। তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কি বলেছিলে? অগত্যা তাদেরকে স্বীকার করতে হলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, গর্ব ও ইজ্জতের বিষয় প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও তাকওয়া, যা তোমাদের মধ্যে নেই এবং হযরত বেলাল (রা.)-এর মধ্যে আছে। তাই তিনি তোমাদের চাইতে উত্তম ও সম্ভ্রান্ত।–(মাযহারী) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করেন। (যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পারে।) তওয়াফ শেষে তিনি এই ভাষণ দেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَكَبُّرَهَا ـ اَلنَّاسُ رَجُلَانِ بَرٌّ تَقِىٌّ كَرِيْمٌ عَلَى اللّٰهِ وَفَاجِرٌ شَقِىٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللّٰهِ ثُمَّ تَلَا يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ الاية ـ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি অন্ধকার যুগের গর্ব ও অহংকার তোমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন। এখন সব মানুষ মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত : (এক) সৎ, পরহেজগার ও আল্লাহর কাছে সম্ভ্রান্ত, (দুই) পাপাচারী, হতভাগা ও আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ তেলাওয়াত করেন।–[তিরমিযী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : দুনিয়ার মানুষের কাছে ইজ্জত হচ্ছে ধনসম্পদের নাম এবং আল্লাহর কাছে ইজ্জত পরহেজগারীর নাম।

شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ - شُعُوْبٌ শব্দটি شَعْبٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ এক মূল থেকে উদ্ভূত বিরাট দল, যার মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও পরিবার থাকে। বড় পরিবার এবং তার বিভিন্ন অংশের জন্যেও আলাদা আলাদা নাম আছে। সর্ববৃহৎ অংশকে شَعْبٌ এবং ক্ষুদ্রতম অংশকে عَشِيْرَةٌ বলা হয়। আবূ রওয়াফ বলেন : অনারব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত নেই। তাদেরকে شَعْبٌ বলা হয় এবং আরব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত আছে, তাদেরকে قَبَائِلُ বলা হয়। أَسْبَاطٌ শব্দটি বনী ইসরাঈলের জন্যে ব্যবহৃত হয়।

বংশগত, দেশগত, অথবা ভাষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য পারস্পরিক পরিচয় : কুরআন পাক আলোচ্য আয়াতে ফুটিয়ে তুলেছে যে, যদিও আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে একই পিতামাতা থেকে সৃষ্টি করে ভাই ভাই করে দিয়েছেন, কিন্তু তিনিই তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষের পরিচিতি ও সনাক্তকরণ সহজ হয়। উদাহরণতঃ একনামের দুই ব্যক্তি থাকলে পরিবারের পার্থক্য দ্বারা তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। মোটকথা, বংশগত পার্থক্যকে পরিচিতির জন্যে ব্যবহার করা- গর্ব নয়।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا الخ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠি হচ্ছে পরহেজগারী। এই পরহেজগারী একটি অপ্রকাশ্য বিষয় যা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কোনো ব্যক্তির পক্ষেই নিজের পবিত্রতার দাবি করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, ঈমানের আসল ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে শুধু মুখে নিজেকে মুমিন বলা ঠিক নয়। সমগ্র সূরার প্রথমে নবী করীম ﷺ-এর হক, অতঃপর পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে উপসংহারে বলা হচ্ছে যে, আন্তরিক বিশ্বাস এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের উপরই পরকালে সৎকর্ম গ্রহণীয় হওয়ার ভিত্তি স্থাপিত।

শানে-নুযূল : ইমাম বগভীর (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতটি অবতরণের ঘটনা এই যে, বনূ-আসাদের কতিপয় ব্যক্তি নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তারা অন্তরগতভাবে মুমিন ছিল না। শুধু সদকা-খয়রাত লাভের জন্যে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করছিল। বাস্তবে মুমিন না হওয়ার কারণে ইসলামি বিধি-বিধান ও রীতিনীতি সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ও বেখবর ছিল। মদিনার পথে-ঘাটে তারা মলমূত্র ও আবর্জনা ছড়িয়ে দিল এবং বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়ে দিল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ধন্য করেছে বলে প্রকাশ করল। তারা বলল : অনান্য লোক দীর্ঘকাল পর্যন্ত আপনার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে, অনেক যুদ্ধ করেছে, এরপর মুসলমান হয়েছে। কিন্তু আমরা কোনোরূপ যুদ্ধ ছাড়াই আপনার কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছি। কাজেই আমাদের সদিচ্ছাকে মূল্য দেওয়া দরকার। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানে এক প্রকার ধৃষ্টতা। কারণ এই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করার পেছনে মুসলমানের সদকা-খয়রাত আকর্ষণ করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। যদি তারা বাস্তবিকই খাঁটি মুসলমান হয়ে যেত, তবে এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নয়– স্বয়ং তাদেরই উপকার ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয় এবং তাদের মিথ্যা দাবি ও অনুগ্রহ প্রকাশের মুখোশ উম্মোচন করা হয়।

وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا -তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না, শুধু বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে তারা মিথ্যা দাবি করছিল। তাই কুরআন তাদের ঈমান না থাকা এবং ঈমানের দাবি মিথ্যা হওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেছে : তোমাদের "ঈমান এনেছি" বলা মিথ্যা। তোমরা বড় জোর اَسْلَمْنَا "ইসলাম কবুল করেছি" বলতে পার। কেননা ইসলামের শাব্দিক অর্থ বাহ্যিক কাজেকর্মে আনুগত্য করা। তারা তাদের ঈমানের দাবি সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যে কিছু কাজকর্ম মুসলমানদের মতো করতে শুরু করেছিল। তাই আক্ষরিক দিক দিয়ে এক প্রকার আনুগত্য হয়ে গিয়েছিল। অতএব, আভিধানিক অর্থে اَسْلَمْنَا বলা শুদ্ধ ছিল।

ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে সম্পর্ক : উপরের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ইসলামের আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। তাই আয়াতে এ বিষয়ের প্রমাণ হতে পার না যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পরিভাষাগত পার্থক্য আছে। পারিভাষিক ঈমান ও পারিভাষিক ইসলাম অর্থের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। শরিয়তের পরিভাষায় অন্তরগত বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, অর্থাৎ, অন্তর দ্বারা আল্লাহর একত্ব ও রাসূলের রিসালাতকে সত্য জানা; পক্ষান্তরে বাহ্যিক কাজকর্ম আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরিয়তে অন্তরগত বিশ্বাস ততক্ষণ ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ তার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকর্মে প্রতিফলিত না হয়। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মুখে কালেমার

স্বীকারোক্তি করা। এমনিভাবে ইসলাম বাহ্যিক কাজ-কর্মের নাম হলেও শরিয়তে ততক্ষণ ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি না হয়। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে সেটা হবে' নেফাক' তথা মুনাফেকী। এভাবে ইসলাম ও ঈমান সূচনা ও শেষ প্রান্তের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে বাহ্যিক কাজকর্ম পর্যন্ত পৌঁছে এবং ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্ম থেকে শুরু হয়ে অন্তরের বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলামের ও ঈমান একটি অপরটি সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমান ইসলাম ব্যতীত ধর্তব্য নয় এবং ইসলামও ঈমান ব্যতীত শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। শরিয়তে এটা অসম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে মুমিন হবে না এবং মুমিন হবে-মুসলিম হবে না। এটা পারিভাষিক ইসলামের ও ঈমানের বেলায়ই প্রযোজ্য। আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে এটা সম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে - মুমিন হবে না; যেমন মুনাফিকদের অবস্থা তাই ছিল। বাহ্যিক আনুগত্যের কারণে তাদেরকে মুসলিম বলা হতো, কিন্তু অন্তরে ঈমান না থাকার কারণে তারা মুমিন ছিল না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِجْتَنِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِجْتِنَابُ মূলবর্ণ (ج - ن - ب) জিনস صحيح অর্থ– বেঁচে থাক।

لَا يَغْتَبْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى غائب معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِغْتِيَابُ মূলবর্ণ (غ - ى - ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– গিবত যেন না করে।

شُعُوْبًا : শব্দটি شعب -এর বহুবহচন। জাতিসমূহ। গোত্রগুলো। অর্থ– গোত্রের ঐ প্রবীণ ব্যক্তি যেখানে পৌঁছে গোত্র মিলে যায় অথবা এমন ভ্রাতৃত্ব যা বংশানুক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে।

قَالَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– বলে।

اَعْرَابُ : বহুবচন, একবচন اَعْرَابِىْ অর্থ– বেদুঈনরা।

اٰمَنَّا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (أ - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমরা ঈমান আনলাম।

اَسْلَمْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْلَامُ মূলবর্ণ (س - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– আমরা আত্ম-সম্পর্ণ করেছি।

يَدْخُلُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّخُوْلُ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– প্রবেশ করে।

تُطِيْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجزوم বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা মান্য করো।

لَا يَلِتْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَللَّيْتُ মূলবর্ণ (ل - ى - ت) জিনস اجوف يائى অর্থ–হ্রাস করবেন না।

يَمُنُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَنُّ মূলবর্ণ (م - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা অনুগ্রহ প্রকাশ করছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لَّاتَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلَامَكُمْ : এখানে يَمُنُّوْنَ ফে'ল, যমীর ফায়েল আর عَلَيْكَ টা قُلْ -এর সাথে متعلق হয়েছে এবং اَنْ ও তার অধীনে যা রয়েছে তা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে। আর يَمُنُّوْنَ হলো ফে'ল। তার যমীর انت ফায়েল। আর لَا تَمُنُّوْنَ বাক্যটি قول -এর مقول হয়েছে আর لَا تَمُنُّوْا টা عَلَىَّ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর اِسْلَامَكُمْ টা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৬১]

سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ

সূরা ক্বাফ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪৫, রুকূ'– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. ক্বাফ। মহিমান্বিত কুরআনের শপথ।	قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ﴿١﴾
২. বরং তারা এতে বিস্মিত হয়েছে যে, তাদের প্রতি তাদেরই মধ্য হতে একজন ভয় প্রদর্শনকারী এসেছেন, অতঃপর কাফেররা বলতে লাগল, এটা বিস্ময়কর ব্যাপার।	بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٢﴾
৩. আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি হয়ে যাব, তখন কি পুনরায় জীবিত হবো? এটা সুদূরপরাহত।	ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ ﴿٣﴾
৪. (আল্লাহ বলেন,) আমি তাদের ঐ অংশগুলো যা মাটি কম করে দেয়, তা অবগত আছি, আর আমার নিকট কিতাব (লওহে মাহফূজে) সুরক্ষিত আছে।	قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ﴿٤﴾
৫. বরং তারা সত্যকে অবিশ্বাস করে যখন তা তাদের নিকট পৌছে, ফলকথা, তারা এক দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে।	بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قٓ ক্বাফ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ, মহিমান্বিত কুরআনের শপথ।

২. بَلْ عَجِبُوْٓا বরং তারা এতে বিস্মিত হয়েছে যে اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ তাদের প্রতি তাদেরই মধ্য হতে একজন ভয় প্রদর্শনকারী এসেছেন فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ অতঃপর কাফেররা বলতে লাগল هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ এটা বিস্ময়কর ব্যাপার।

৩. ءَاِذَا مِتْنَا আমরা যখন মরে যাব وَكُنَّا تُرَابًا, এবং মাটি হয়ে যাব তখন কি পুনরায় জীবিত হবো? ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ এটা সুদূরপরাহত।

৪. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ (আল্লাহ বলেন) আমি তাদের ঐ অংশগুলো যা মাটি কম করে দেয়, তা অবগত আছি وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ, আর আমার নিকট কিতাব (লওহে মাহফূজে) সুরক্ষিত আছে।

৫. بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ বরং তারা সত্যকে অবিশ্বাস করে لَمَّا جَآءَهُمْ যখন তা তাদের নিকট পৌছে فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ফলকথা তারা এক দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে।

৬. তারা কি তাদের উপরে আসমানকে দেখে না যে, আমি তাকে কিরূপে নির্মাণ করেছি? এবং তাকে সজ্জিত করেছি এবং তাতে কোনো ছিদ্র পর্যন্ত নেই।	أَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ﴿٦﴾
৭. আর আমি জমিনকে সম্প্রসারিত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা সংস্থাপিত করেছি, এবং তাতে সর্বপ্রকার সদৃশ্য বস্তুসমূহ জন্মিয়েছি।	وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَأَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ﴿٧﴾
৮. যা প্রত্যেক মনোনিবেশকারী বান্দার জন্য জ্ঞান দর্শনের ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ।	تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ﴿٨﴾
৯. আর আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছি, বরকতময় পানি, অতঃপর আমি তা দ্বারা বাগ-বাগিচা ও কৃষিজাত শস্য উৎপন্ন করেছি।	وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ﴿٩﴾
১০. এবং দীর্ঘকায় খেজুর বৃক্ষগুলো যার গুচ্ছসমূহ ঘন সন্নিবেশিত,	وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ﴿١٠﴾
১১. বান্দাগণের উপজীবিকার জন্য, আর আমি তা দ্বারা মৃত জমিনকে সজীব করেছি; এরূপেই (মৃতদের) জমিন হতে বের হতে হবে।	رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَأَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ﴿١١﴾
১২. (এই কাফেরদের ন্যায়) এদের পূর্বে অসত্যারোপ করেছিল নূহ-সম্প্রদায় ও রস্‌স অধিবাসীগণ এবং ছামূদ।	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّأَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ﴿١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. أَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ তারা কি তাদের উপরে আসমানকে দেখেনা যে كَيْفَ بَنَيْنٰهَا আমি তাকে কিরূপে নির্মাণ করেছি وَزَيَّنّٰهَا এবং তাকে সজ্জিত করেছি وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ এবং তাতে কোনো ছিদ্র পর্যন্ত নেই।

৭. وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا আর আমি জমিনকে সম্প্রসারিত করেছি وَأَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ এবং তাতে পর্বতমালা সংস্থাপিত করেছি وَأَنْۢبَتْنَا فِيْهَا এবং তাতে জন্মিয়েছি مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ সর্বপ্রকার সদৃশ্য বস্তুসমূহ।

৮. تَبْصِرَةً যা জ্ঞান দর্শনের وَّذِكْرٰى ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ প্রত্যেক মনোনিবেশকারী বান্দার জন্য।

৯. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ আর আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছি مَآءً مُّبٰرَكًا বরকতময় পানি فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ অতঃপর আমি তা দ্বারা উৎপন্ন করেছি جَنّٰتٍ বাগ-বাগিচা وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ও কৃষিজাত শস্য।

১০. وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ এবং দীর্ঘকায় খেজুর বৃক্ষ গুলো لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ যার গুচ্ছসমূহ ঘন সন্নিবেশিত।

১১. رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ আর বান্দগণের উপজীবিকার জন্য وَأَحْيَيْنَا بِهٖ আমি তা দ্বারা সজীব করেছি بَلْدَةً مَّيْتًا মৃত জমিনকে كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ এরূপেই (মৃতদের) জমিন হতে বের হতে হবে।

১২. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ এদের পূর্বে অসত্যারোপ করেছিল قَوْمُ نُوْحٍ নূহ সম্প্রদায় وَّأَصْحٰبُ الرَّسِّ ও রস্‌স অধিবাসীগণ وَثَمُوْدُ এবং ছামূদ।

১৩. আর 'আদ ও ফেরাউন এবং লূত-সম্প্রদায়।	وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ﴿١٣﴾
১৪. আর আইকা (বন)–বাসীগণ এবং তুব্বা; সকলেই (নিজ নিজ) রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছিল, সুতরাং আমার প্রতিশ্রুত শাস্তি (তাদের উপর) কার্যকরী হয়ে গেল।	وَّاَصْحٰبُ الْاَیْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِیْدِ ﴿١٤﴾
১৫. তবে কি আমি প্রথমবারের সৃষ্টিতে পরিশ্রান্ত হয়েছি? বরং তারা নুতনভাবে সৃষ্টি করা সম্বন্ধে সন্দেহে রয়েছে।	اَفَعَیِیْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِیْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَعَادٌ আর 'আদ وَفِرْعَوْنُ ও ফেরাউন وَاِخْوَانُ لُوْطٍ এবং লূত সম্প্রদায়।

১৪. وَاَصْحٰبُ الْاَیْكَةِ আর আইকা (বন) বাসীগণ وَقَوْمُ تُبَّعٍ এবং তুব্বা; كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ সকলেই (নিজ নিজ) রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছিল فَحَقَّ وَعِیْدِ সুতরাং আমার প্রতিশ্রুত শাস্তি (তাদের উপর) কার্যকরী হয়ে গেল।

১৫. اَفَعَیِیْنَا তবে কি আমি পরিশ্রান্ত হয়েছি? بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ প্রথম বারের সৃষ্টিতে بَلْ هُمْ فِیْ لَبْسٍ বরং তারা সন্দেহে রয়েছে مِّنْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ নতুনভাবে সৃষ্টি করা সম্বন্ধে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির প্রথম অক্ষর হলো- قٓ আর এর দ্বারাই এ সূরার নাম সূরা ক্বাফ রাখা হয়েছে। এখানে تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ -এর নীতির অনুসরণ করা হয়েছে। যেমনটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় করা হয়েছে। আর ق টি حُرُوْف مُقَطَّعَاتٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

এ সূরাটি পবিত্র নগরী মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে তিনটি রুকূ', ৪৫ টি আয়াত, ৩৯৫ টি বাক্য এবং ১৪৯০ টি অক্ষর রয়েছে। -[তানভীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস]

ইবনে মারদূভিয়া এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, সূরা ক্বাফ মক্কা মুয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মারদূভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) হতেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

সূরার আলোচ্য বিষয় : সূরা ক্বাফে অধিকাংশ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

সূরার ফজিলত : হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ -এর গৃহের সন্নিকটেই আমার গৃহ ছিল। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রাসূল ﷺ-এর রুটি পাকানোর চুল্লিও ছিল অভিন্ন, তিনি প্রতি শুক্রবার জুমার খুতবায় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি আমার মুখস্থ হয়ে যায়। -[মুসলিম, কুরতুবী]

হযরত 'ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) আবূ ওয়াকেদ লাইসী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূল ﷺ উভয় ঈদের নামাজে কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন– قٓ - وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ এবং اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ফজরের নামাজে অধিকাংশ সময় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। সূরাটি বেশ বড়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও নামাজ হালকা মনে হতো। -[কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ ও তাঁর তেলাওয়াতের বিশেষ প্রভাব ও বরকতেই বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম নামাজ ও মুসল্লিদের কাছে হালকা মনে হতো।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ এ সূরাটি ফজরের নামাজের প্রথম রাকাতে তেলাওয়াত করতেন।

ইবনে মাজাহ, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল ﷺ সূরাটি ঈদের নামাজেও তেলাওয়াত করতেন।

আবুল আ'লা থেকে বর্ণিত ইবনে মারদূভিয়া সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল ﷺ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা সূরা ক্বাফ শিক্ষা কর।

আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন যে, এ সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সূরার গুরুত্ব এবং বরকত অনেক বেশি।

এ সূরার আমল : বর্ণিত আছে যে গৃহে সূরা ক্বাফ পাঠ করা হয়, সে গৃহে সর্বদা আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকে।

এ সূরার শুরু থেকে كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে বৃষ্টির পানিতে ধৌত করে পান করলে দাঁতের এবং পেটের ব্যথা দূর হয়। আর যে শিশুর দাঁত উঠে না তাকে ঐ পানি পান করানো হলে সহজে দাঁত উঠে।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করছে, সে এমন ইলম অর্জন করবে যা মানুষের জন্য উপকারী হবে এবং সে কল্যাণকর কাজে শরিক হওয়ার তৌফিক পাবে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় : এ সূরাটি ঠিক কখন নাজিল হয়েছিল তা কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে জানা যায়নি। তবে সূরাটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয় যে, এর নাজিল হওয়ার সময় নবুয়তের তৃতীয় বর্ষ হতে শুরু করে পঞ্চম বর্ষের মধ্যে। এটা মক্কী জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। সূরাটির বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এটা নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে নাজিল হয়েছে। তখন কাফেরদের বিরোধিতা ও শত্রুতা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। অবশ্য প্রকাশ্য নির্যাতন তখনো শুরু হয়নি।

সূরার মূল বক্তব্য : এ সূরায় বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম অবস্থা, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়, হিসাব-নিকাশের কথা, জান্নাতের ছওয়াব এবং দোজখের আজাব সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে এবং পরিশেষে জান্নাতের জন্য অনুপ্রাণিত করে দোজখের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পবিত্র কুরআনের যে সূরাসমূহকে 'মুফাসসাল' বলা হয়, তন্মধ্যে এটি সর্বপ্রথম সূরা।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারিছা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট শুনে শুনেই এ সূরা কণ্ঠস্থ করেছি। কেননা তিনি প্রত্যেক জুমার খুতবার সময় এ সূরাটি পাঠ করতেন। সকল বড় বড় মজলিসে তিনি এ সূরা পাঠ করতেন। যেমন ঈদের দিনেও তিনি এ সূরা পাঠ করতেন, কেননা এ সূরায় সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত এমনকি জান্নাত ও দোজখের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে নবী করীম ﷺ দুই ঈদের নামাজে এ সূরাটি প্রায় পাঠ করতেন। উম্মে হিশাম নামের এক মহিলা নবী করীম ﷺ -এর প্রতিবেশিনী ছিলেন। তিনি বলেন, জুমার খুতবাসমূহে আমি নবী করীম ﷺ -এর মুখে এ সূরাটি প্রায় শুনতে পেতাম। এভাবে শুনতে শুনতেই এটা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য বর্ণনা হতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ নামাজেও এ সূরাটি প্রায় পাঠ করতেন। এটা হতে সাব্যস্ত হয় যে, সূরাটি নবী করীম ﷺ-এর দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে জন্য তিনি বেশি বেশি পাঠের মাধ্যমে এর বিষয়বস্তু অধিক সংখ্যক লোকদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সূরাটি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে অতি সহজেই এই গুরুত্বের কারণ অনুধাবন করা যায়। সমগ্র সূরার বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হচ্ছে পরকাল। নবী করীম ﷺ মক্কা শরীফে যখন তাঁর দীনি দাওয়াত ও আন্দোলনের সূচনা করলেন, তখন তাঁর যে কথাটা শুনে লোকেরা বেশি স্তম্ভিত হয়েছিল তা হলো মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থিত হওয়া এবং যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব দেওয়া। লোকেরা বলত, এটা সম্পূর্ণ নতুন কথা। এটাকে কোনো বিবেক-বুদ্ধি মেনে নিতে পারে না। আমাদের দেহের বিন্দু যখন বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তখন এ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত দেহাংশ হাজার হাজার

বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় একত্র হয়ে আমাদের এ দেহাবয়ব সম্পূর্ণ নতুনভাবে অস্তিত্ব লাভ করবে এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াব- এটা কি করে সম্ভবপর হতে পারে? এর জবাব স্বরূপ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ ভাষণটি নাজিল হয়েছে। এ সূরাতে খুব সংক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট বাক্যে একদিকে পরকালের সম্ভাব্যতা এবং এটা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। অপরদিকে লোকদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা বিস্মিত হও, স্তম্ভিত হও বা এটাকে বিবেক-বুদ্ধি বহির্ভূত মনে কর অথবা এটাকে মিথ্যা মনে করে উড়িয়ে দাও তাতে প্রকৃত সত্য কখনো পরিবর্তিত হয়ে যাবে না। প্রকৃত ও চূড়ান্ত সত্য হলো- তোমাদের দেহের এককেটি অণু মাটিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় বটে; কিন্তু তা কি অবস্থায় পড়ে আছে তা আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানেন। এ সমস্ত বিক্ষিপ্ত ও মাটির সাথে মিলে-মিশে যাওয়া অণু পুনরায় একত্র করে তোমাদের দেহাবয়বকে আবার দাঁড় করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার একটু ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

তোমরা মনে করে নিয়েছ যে, তোমাকে এখানে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, বাধা-বন্ধনহীন ও লাগাম ছাড়া করে দেওয়া হয়েছে এবং কারো নিকট তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। এটা নিছক ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত আল্লাহ নিজে সরাসরিভাবে তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ সম্পর্কে অবগত আছেন। শুধু তাই নয়; তোমাদের মনে আবর্তনশীল চিন্তা-কল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। তাঁর নিয়োজিত ফেরেশতাগণও তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছায়ার মতো থেকে তোমাদের প্রত্যেকটি গতিবিধি রেকর্ড ও সংরক্ষণ করছেন। যখন সময় হবে তখন একটি ডাকে ঠিক তেমনিভাবে তোমরা সকলে মাথা তুলে দাঁড়াবে, যেমন করে বৃষ্টির এক পশলা পড়তেই মাটির বুক বিদীর্ণ করে উদ্ভিদের অঙ্কুর মাথা তুলে দাঁড়ায়। বর্তমানে এ দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর যে আবরণ পড়ে আছে তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে, তোমাদের জ্ঞানের আলো দিবালোকের মতোই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং আজ যেই মহাসত্যকে তোমরা মেনে নিতে পারছ না বলে অস্বীকার করছ, তখন তোমরা নিজেদের চোখেই তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে। তখন তোমরা তাও জানতে পারব যে, দুনিয়ায় তোমরা কিছুমাত্র দায়িত্বহীন ও শৃগাল কুকুরের ন্যায় বাধামুক্ত ছিলে না। বাস্তবিকই তোমরা দায়িত্বশীল ছিলে। তোমাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কর্মফল ভালো বা মন্দ, পুরস্কার-শাস্তি, আজাব ও ছওয়াব, জান্নাত ও দোজখ ইত্যাদিকে আজ তোমরা বিস্ময় উদ্দীপক গল্প কাহিনী বলে মনে করছ; কিন্তু সেদিন এসব তোমাদের প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হয়ে মহাসত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সত্যের সাথে শত্রুতা পোষণের শাস্তি স্বরূপ তোমাদেরকেই সেই জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে যাকে তোমরা অবাস্তব ও অবোধগম্য বলে মনে করছ। অপরদিকে মহান আল্লাহকে ভয় করে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী লোকেরা তোমাদের চোখের সামনে সে জান্নাতেই প্রবেশ করবে যার কথা শুনে আজ তোমরা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো।

মক্কী সূরাসমূহে সাধারণত তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ সূরায় আখেরাত সম্পর্কেই সবিশেষ আলোচনা করা হয়েছে।

সূরাটির যোগসূত্র : পূর্বোক্ত সূরা হুজুরাতের শেষ আয়াত হলো- وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ [আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন] এর দ্বারা আমলের জাযা বা প্রতিদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল। আর এ সূরা ক্বাফ-এর সম্পূর্ণ অংশ জুড়েই রয়েছে কিয়ামত ও আমলের প্রতিদানের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা।

قوله قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ الخ : শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ মক্কার লোকদের নিকট যেসব বিষয়াদি পেশ করেছেন তন্মধ্যে তাওহীদের ন্যায় পুনরুত্থানের বিষয়টিও তাদের নিকট অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। তাওহীদের কথা শুনে যেমন তারা বলত যে, হাজার হাজার খোদা যখন দুনিয়াটাকে সামাল দিতে পারছে না, তখন এক খোদা কি করে তা পারবে? نَعُوْذُ بِاللّٰهِ তেমনটি পুনরুত্থানের ব্যাপারে তারা বলত যে, আমরা মৃত্যুবরণ করে যখন মাটির সাথে মিশে যাব, তখন আমাদেরকে কিভাবে জীবিত করা হবে- এটা কি করে সম্ভবপর হতে পারে? তাদের উক্ত ভ্রান্ত ধারণাকে নিরসন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাজিল করেন।

সূরা ক্বা-ফের বৈশিষ্ট্য : সূরা ক্বা-ফে অধিকাংশ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা হুজুরাতের উপসংহারেও এমনি বিষয়বস্তুও উল্লেখ ছিল। এটাই সূরাদ্বয়ের যোগসূত্র।

আকাশ দৃষ্টিগোচর হয় কি? اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু একথাই সুবিদিত যে, উপরে যে নীলাভা রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তা শূন্যমণ্ডলের রঙ। কিন্তু আকাশের রঙও যে তাই হবে- একথা অস্বীকার করার কোনো প্রমাণ নেই। এ ছাড়া আয়াতে نَظَرٌ শব্দের অর্থ চর্মচক্ষে দেখা না হয়ে অন্তর চক্ষে দেখা অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করাও হতে পারে।–[বয়ানুল-কুরআন]

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কিত একটি বহুল উত্থাপিত প্রশ্নের জওয়াব : قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ কাফের ও মুশরিকরা কেয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করে। তাদের সর্ববৃহৎ প্রমাণ এই বিস্ময় যে, মৃত্যুর পর মানুষের দেহের অধিকাংশ অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে দিকবিদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পানি ও বায়ু মানবদেহের প্রতিটি কণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। কেয়ামতে পুনরুজ্জীবন দান করার জন্যে এই বিক্ষিপ্ত কণাসমূহের অবস্থানস্থল জানা এবং প্রত্যেকটি কণাকে আলাদাভাবে একত্রিত করার সাধ্য কার আছে? কুরআন পাকের ভাষায় এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, মানুষ তার সসীম জ্ঞানের মাপকাঠিতে আল্লাহ তা'আলার অসীম জ্ঞানকে পরিমাপ করার কারণেই এই পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান এতই বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী যে, মৃত্যুর পর মানব দেহের প্রতিটি অংশ তাঁর দৃষ্টিতে উপস্থিত থাকে। তিনি জানেন মৃতের কোন কোন অংশ মৃত্তিকা গ্রাস করেছে। মানব দেহের কিছু কিছু অস্থি আল্লাহ তা'আলা এমন তৈরি করেছেন যে, এগুলোকে মৃত্তিকা গ্রাস করতে পারে না। অবশিষ্ট যেসব অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যায়, সেগুলো সবই আল্লাহর দৃষ্টিতে থাকে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, সবগুলোকে এক জায়গায় একত্রিত করবেন। সামান্য চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, এখন প্রত্যেক মানুষের দেহ যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তাতেও সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের উপাদান সন্নিবেশিত রয়েছে; কোনোটি খাদ্যের আকারে এবং কোনোটি ওষুধের আকারে সন্নিবেশিত হয়ে বর্তমান মানবদেহ গঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় পুনর্বার এসব উপাদানকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার পর আবার এক জায়গায় একত্রিত করা আল্লাহর পক্ষে কঠিন হবে কি? মৃতুর পর এবং মৃত্তিকায় পরিণত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা মানবদেহের এসব উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন, শুধু তাই নয়, বরং মানব-সৃষ্টির পূর্বেই তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পরিবর্তন এবং মৃত্যু-পরবর্তী প্রতিটি অবস্থা আল্লাহ তা'আলার কাছে 'লওহে-মাহফুজে' লিখিত আকারে বিদ্যমান আছে।

অতএব, এমন সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ সম্পর্কে উপরিউক্ত বিস্ময় প্রকাশ করা স্বয়ং বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ আয়াতের এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। –[বাহরে মুহীত]

فِىْ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ অভিধানে مَرِيْجٍ শব্দের অর্থ মিশ্র, যাতে বিভিন্ন প্রকার বস্তুর মিশ্রণ থাকে এবং যার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। এরূপ বস্তু সাধারণতঃ ফাসেদ ও দূষিত হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) مَرِيْجٍ শব্দের অনুবাদ করেছেন ফাসেদ ও দুষ্ট। যাহহাক, কাতাদাহ, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ এর অনুবাদ করেছেন মিশ্র ও জটিল। উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা নবুয়ত অস্বীকার করার ব্যাপারেও এক কথার উপর অটল থাকে না। রাসূলকে কখনো জাদুকর, কখনো কবি, কখনো অতীন্দ্রিয়বাদী এবং কখনো জ্যোতিষী বলে। তাদের কথাবার্তা স্বয়ং মিশ্র ও দুষ্ট। অতএব, কোন কথার জওয়াব দেওয়া যায়।

এরপর নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বিশালকায় বস্তুসমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় শক্তি বিধৃত করা হয়েছে। নভোমণ্ডল সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ – فُرُوْجٌ শব্দটি فَرْجٌ –এর বহুবচন। এর অর্থ ফাটল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশের এই বিশালকায় গোলক সৃষ্টি করেছেন। এটি মানুষের হাতে নির্মিত হলে এতে হাজারো জোড়াতালি ও ফাটলের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হতো। কিন্তু তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এতে না কোনো তালি আছে এবং না কোথাও ভগ্নাংশ বা সেলাইয়ের চিহ্ন আছে। আকাশগাত্রে নির্মিত দরজা এর পরিপন্থি নয়। কারণ, দরজাকে ফাটল বলা হয় না।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের রেসালত ও পরকাল প্রত্যাখ্যানের বিষয় বর্ণিত হয়েছিল। এটা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে মর্মপীড়ার কারণ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সান্ত্বনার জন্যে অতীত যুগের পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন : প্রত্যেক পয়গম্বরের সাথেই কাফেররা পীড়াদায়ক আচরণ করেছে। এটা পয়গম্বরগণের চিরন্তন প্রাপ্য। এতে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনী কুরআনে বার বার বর্ণিত হয়েছে। তিনি সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত তাদের হেদায়েতের জন্য প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তারা শুধু তাঁকে প্রত্যাখ্যানই করেনি; বরং নানাভাবে উৎপীড়নও করেছে।

وَاَصْحَابُ الرَّسِّ কারা? : رَسّ শব্দটি আরবি ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থে ইট, পাথর ইত্যাদি দ্বারা পাকা করা হয় না এরূপ কাঁচা কূপকে رَسّ বলা হয়। وَاَصْحَابُ الرَّسِّ বলে আজাবের পর ছামূদ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদেরকে বুঝানো হয়। যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরকারকের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের কাহিনী এই যে, হযরত সালেহ্ ﷺ-এর সম্প্রদায়ের উপর যখন আজাব নাজিল হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে চার হাজার ঈমানদার ব্যক্তি এই আজাব থেকে নিরাপদ থাকে। আজাবের পর তারা এই স্থান ত্যাগ করে হাযরা মাউতে বসতি স্থাপন করে। হযরত সালেহ্ (আ.)- ও তাদের সাথে ছিলেন। তারা একটি কূপের আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। অতঃপর হযরত সালেহ্ (আ.) মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ কারণেই এই স্থানের নাম حَضَرَ مَوْتُ (হাযারা-মাউত অর্থাৎ, মৃত্যু হাজির হলো) হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশধরদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তারা তাঁকে হত্যা করে। ফলে আজাবে পতিত হয় এবং তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কূপটি অকেজো হয়ে যায় ও দালান-কোঠা শ্মশানে পরিণত হয়। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই উল্লেখিত হয়েছে : وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ অর্থাৎ, তাদের অকেজো কুয়া এবং মজবুত জনশূন্য দালান-কোঠা শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট।

ثَمُوْدُ হযরত সালেহ (আ.)-এর উম্মত। তাদের কাহিনী কুরআনে বার বার উল্লেখিত হয়েছে।

عَادٌ –বিশাল বপু এবং শক্তি ও বীরত্বে আদ জাতি প্রবাদ বাক্যের ন্যায় খ্যাত ছিল। হযরত হুদ (আ.) তাদরে প্রতি প্রেরিত হন। তারা নাফরমানি করে এবং তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে ঝঞ্ঝার আজাবে সব ফানা হয়ে যায়।

وَاِخْوَانُ لُوْطٍ -হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়। তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে।

وَاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ -ঘন জঙ্গল ও বনকে اَيْكَةٌ বলা হয়। তারা এরূপ জায়গাতেই বসবাস করত। হযরত শোয়ায়েব (আ.) তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন । তারা অবাধ্যতা করে এবং আজাবে পতিত হয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যায়।

وَقَوْمُ تُبَّعٍ ইয়ামেনের জনৈক সম্রাটের উপাধি ছিল তোব্বা। সূরা দোখানে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ الخ

যারা হাশর ও নশর অস্বীকার করত এবং মৃতদের জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস্য যুক্তিবহির্ভূত বলত, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের সন্দেহ এভাবে নিরসন করা হয়েছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানকে নিজেদের জ্ঞানের মাপকাঠিতে পরিমাপ করে রেখেছ; তাই এই খটকা দেখা দিয়েছে যে, মৃতের দেহ-উপাদান মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পর এগুলোকে কিভাবে একত্রিত করা সম্ভব হবে? কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : সৃষ্টজগতের প্রতিটি অনু-পরমাণু আমার জ্ঞানের আওতায় রয়েছে। এগুলোকে যখন ইচ্ছা একত্রিত করে দেওয়া আমার জন্যে মোটেই কঠিন নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহেও আল্লাহর জ্ঞানের বিস্তৃতি ও সর্বব্যাপকতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে : মানুষের বিক্ষিপ্ত দেহ-উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়ার চাইতে বড় বিষয় এই যে, আমি প্রত্যেক মানুষের মনের নিভৃতে জাগরিত কল্পনা সমূহকেও সর্বদা ও সর্বাবস্থা জানি। দ্বিতীয় আয়াতে এর কারণ বর্ণনা হয়েছে যে, আমি গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও মানুষের অধিক নিকটবর্তী। যে ধমনীর উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল, তাও তার এতটুকু নিকটবর্তী নয়, যতটুকু আমি নিকটবর্তী। তাই তার হাল-অবস্থা সম্বন্ধে তার চাইতে আমি বেশি জানি।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَجِيْدٌ : صِفَت صَيِغَه অর্থ– সম্মানিত। مَجْدٌ মাসদার। আভিধানে مَجْدٌ-এর মূল অর্থ, প্রশস্ততা ও আধিক্য। বাবে : كَرُمَ

بَنَيْنٰهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بِنَاءٌ মূলবর্ণ (ب - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ আমি তাকে নির্মাণ করেছি।

زَيَّنّٰهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ز - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ আমি তাকে সজ্জিত করেছি।

اَلْقَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ সংস্থাপিত করেছি।

رَوَاسِىَ : অর্থ– বোঝা, ভারী বস্তু, পাহাড়। رَوَاسِىَ-এর ব্যবহার স্থির পাহাড়ের জন্য হয়ে থাকে।

بَهِيْجٍ : صفت مشبه অর্থ– চাকচিক্য, তরুতাজা টাটকা, মানোরম সুদৃশ্য বস্তু। মূলবর্ণ (ب - ه - ج) বাবে سَمِعَ অর্থ– প্রফুল্ল হওয়া, আন্দোলিত হওয়া।

بَاسِقَاتٍ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার بُسُوْقٌ মূলবর্ণ (ب - س - ق) জিনস صحيح অর্থ– দীর্ঘকায়।

عَيِيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার عَيٌّ মূলবর্ণ (ع - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ আমি পরিশ্রান্ত হয়েছি।

نَزَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْزِيْلُ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ– আমি বর্ষণ করি।

اَحْيَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সজিব করছি।

كَذَّبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْذِيْبُ মূলবর্ণ (ك - ذ - ب) জিনস صحيح অর্থ– অসত্যারোপ করেছিল।

حَقَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার اَلْحَقُّ মূলবর্ণ (ح - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– কার্যকরী হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ : এখানে قَدْ হলো حرف تحقيق আর عَلِمْنَا হলো ফে'ল ও ফায়েল। আর مَا হলো موصوله মাফউলে বিহী। আর تَنْقُصُ الْاَرْضُ বাক্যটি সেলাহ। আর مِنْهُمْ টা ظرف متعلق -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর و টি হলো حاليه আর عِنْدَنَا টা উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে تَنْقُصُ خبر مقدم হয়েছে। আর كِتَابٌ হলো مبتدامؤخر আর حَفِيْظٌ হলো كِتَابٌ-এর সিফত। আর পূর্ণ বাক্যটি حال হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৬৪-২৬৫]

১৬. আর আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি, আর তার অন্তরে যে কল্পনার উদয় হয় তা আমি অবগত আছি, আর আমি মানুষের এত নিকটে রয়েছি যে, তার স্কন্ধ-শিরা অপেক্ষায়ও অধিকতর।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾
১৭. যখন গ্রহণকারী ফেরেশতাদ্বয় (মানুষের কার্যাবলি) গ্রহণ করতে থাকে, যারা ডানে ও বামে উপবিষ্ট আছে।	اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾
১৮. সে কোনো বাক্য মুখ হতে বের করে মাত্র তার নিকটেই একজন নেগাহবান (ফেরেশতা) প্রস্তুত রয়েছে (সে লিপিবদ্ধ করে)	مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾
১৯. আর মৃত্যু-কষ্ট প্রকৃতপক্ষে এসে পৌঁছেছে; এটা সেই বস্তু, যা হতে তুমি এড়িয়ে চলতে।	وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾
২০. আর (দ্বিতীয়বার) শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে (ফলে সকলে জীবিত হবে); এটাই (আজাবের) প্রতিশ্রুত দিবস।	وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾
২১. আর (সেদিন) প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামতের মাঠে) এরূপে আগমন করবে যে, তার সঙ্গে একজন (ফেরেশতা) পরিচালক, আর একজন সাক্ষী হবে।	وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ আর আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি وَنَعْلَمُ আর আমি অবগত আছি مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ তার অন্তরে যে কল্পনার উদয় হয় তা وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ আর আমি মানুষের এত নিকটে রয়েছি যে مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ তার স্কন্ধ-শিরা অপেক্ষাও অধিকতর।

১৭. اِذْ يَتَلَقَّى যখন গ্রহণ করতে থাকে الْمُتَلَقِّيٰنِ গ্রহণকারী ফেরেশতাদ্বয় عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ যারা ডানে ও বামে উপবিষ্ট আছে।

১৮. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ সে কোনো বাক্য মুখ হতে বের করা মাত্র اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ তার নিকটেই একজন নেগাহবান (ফেরেশতা) প্রস্তুত রয়েছে।

১৯. وَجَآءَتْ আর এসে পৌঁছেছে سَكْرَةُ الْمَوْتِ মৃত্যু-কষ্ট بِالْحَقِّ প্রকৃতপক্ষে ذٰلِكَ এটা সেই বস্তু مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ যা হতে তুমি এড়িয়ে চলতে।

২০. وَنُفِخَ আর ফুৎকার দেওয়া হবে فِى الصُّوْرِ শিঙ্গায় ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ এটাই (আজাবের) প্রতিশ্রুত দিবস।

২১. وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ আর প্রত্যেক ব্যক্তি এরূপে আগমন করবে যে مَّعَهَا তার সঙ্গে হবে سَآئِقٌ একজন পরিচালক وَّشَهِيْدٌ আর একজন সাক্ষী।

২২. (কাফেরদেরকে বলা হবে,) তুমি এ দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে সুতরাং এখন আমি তোমার হতে তোমার আবরণ সরিয়ে ফেলেছি, অতএব আজ তোমার দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ ।	لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾
২৩. আর তার সঙ্গীয় ফেরেশতা বলবে, এটা তাই যা আমার নিকট প্রস্তুত রয়েছে ।	وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾
২৪. (নির্দেশ হবে) এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে দোজখে নিক্ষেপ কর– যারা কাফের হঠকারী ছিল ।	اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾
২৫. (এবং) নেক কাজে প্রতিরোধকারী, সীমালঙ্ঘনকারী (এবং ধর্মে) সন্দেহ সৃষ্টিকারী ছিল,	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ﴿٢٥﴾
২৬. (আর) যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করেছে, সুতরাং এরূপ ব্যক্তিকে কঠোর আজাবে নিক্ষেপ কর ।	الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾
২৭. তার সঙ্গীয় শয়তান বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে ভ্রান্ত করিনি, কিন্তু সে নিজেই সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে পতিত ছিল ।	قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾
২৮. আল্লাহ বলবেন, আমার সম্মুখে বিতর্ক করো না, আমি তো পূর্বেই তোমাদের নিকট আজাবের প্রতিশ্রুতি প্রেরণ করেছিলাম ।	قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. لَقَدْ كُنْتَ তুমি ছিলে فِيْ غَفْلَةٍ উদাসীন مِّنْ هٰذَا এ দিবস সম্বন্ধে فَكَشَفْنَا সুতরাং এখন আমি সরিয়ে ফেলেছি عَنْكَ তোমাহতে غِطَآءَكَ তোমার আবরণ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ অতএব আজ তোমার দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ ।

২৩. وَقَالَ قَرِيْنُهٗ, আর তার সঙ্গীয় ফেরেশতা বলবে। هٰذَا এটা তাই مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ যা আমার নিকট প্রস্তুত রয়েছে ।

২৪. اَلْقِيَا এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিক্ষেপ কর فِيْ جَهَنَّمَ দোজখে كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ যারা কাফের হঠকারী ছিল ।

২৫. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ নেক কাজে প্রতিরোধকারী مُعْتَدٍ সীমালঙ্ঘনকারী مُّرِيْبٍ (এবং ধর্মে) সন্দেহ সৃষ্টিকারী ছিল ।

২৬. الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করেছে فَاَلْقِيٰهُ সুতরাং এরূপ ব্যক্তিকে নিক্ষেপ কর فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ কঠোর আজাবে ।

২৭. قَالَ قَرِيْنُهٗ তার সঙ্গীয় শয়তান বলবে رَبَّنَا হে আমার প্রতিপালক مَآ اَطْغَيْتُهٗ আমি তাকে ভ্রান্ত করিনি وَلٰكِنْ كَانَ, কিন্তু সে নিজেই ছিল فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে পতিত ।

২৮. قَالَ আল্লাহ বলবেন لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ আমার সম্মুখে বিতর্ক করো না وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ, আমি তো পূর্বেই তোমাদের নিকট প্রেরণ করে ছিলাম بِالْوَعِيْدِ আজাবের প্রতিশ্রুতি ।

২৯. (অতএব) আমার দরবারে কথা পরিবর্তিত হবে না, আর আমি বান্দাগণের প্রতি অবিচারকও নই।	مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٢٩﴾
৩০. যেদিন আমি দোজখকে বলব যে, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? এবং সে বলবে, আরো কিছু আছে কি?	يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾
৩১. আর বেহেশতকে মুত্তাকীগণের নিকট আনা হবে, একটুকুও দূরে থাকবে না।	وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣١﴾
৩২. (এবং বলা হবে,) এটা সেই বস্তু, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হতো যে, তা প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে, যে (আল্লাহর প্রতি) আকৃষ্ট (এবং ইবাদতে) পাবন্দ থাকে।	هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿٣٢﴾
৩৩. (আর) অদৃশ্যভাবে আল্লাহকে ভয় করে এবং (আল্লাহর প্রতি) মনোনিবেশকারী অন্তরসহ উপস্থিত হবে,	مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ﴿٣٣﴾
৩৪. (আরও বলা হবে যে,) তোমরা নিরাপদে এ বেহেশতে প্রবেশ কর; এ দিন হচ্ছে সর্বদা অবস্থানের (নির্দেশ হওয়ার দিন)।	ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ আমার দরবারে কথা পরিবর্তিত হবে না وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ আর আমি অবিচারকও নই لِّلْعَبِيْدِ বান্দাগণের প্রতি।

৩০. يَوْمَ نَقُوْلُ যেদিন আমি বলব لِجَهَنَّمَ দোজখকে هَلِ امْتَلَأْتِ তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? وَتَقُوْلُ এবং সে বলবে هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ আরো কিছু আছে কি?

৩১. وَاُزْلِفَتِ আর নিকটে আনা হবে الْجَنَّةُ বেহেশতকে لِلْمُتَّقِيْنَ মুত্তাকীগণের غَيْرَ بَعِيْدٍ একটুকুও দূরে থাকবে না।

৩২. هٰذَا এটা সেই বস্তু مَا تُوْعَدُوْنَ যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হতো যে لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ তা প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে যে, (আল্লাহর প্রতি) আকৃষ্ট (এবং ইবাদতে) পাবন্দ থাকে।

৩৩. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ আল্লাহকে ভয় করে بِالْغَيْبِ অদৃশ্যভাবে وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ এবং মনোনিবেশকারী অন্তরসহ উপস্থিত হবে।

৩৪. اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ তোমরা নিরাপদে এ জান্নাতে প্রবেশ কর ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ এ দিন হচ্ছে সর্বদা অবস্থানের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ [٢٥]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত ওয়ালীদ বিন মুগীরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে তার গোত্রীয় লোকজনকে বলত যে, তোমাদের মধ্য হতে যে কেউই ইসলাম গ্রহণ করবে আমি তার জাগতিক জীবনে কোনো উপকার করব না। সে নরাধম কর্তৃক মানুষদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার ছল-চাতুরী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

আল্লাহ গ্রীবাস্থিত ধমনীর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী– একথার তাৎপর্য : وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ - অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এই আয়াতে জ্ঞানগত নৈকট্য বুঝানো হয়েছে, স্থানগত নৈকট্য উদ্দেশ্য নয়।

আরবি ভাষায় وَرِيْد শব্দের অর্থ প্রত্যেক প্রাণীর সেই সমস্ত শিরা-উপশিরা যেগুলো দিয়ে সারাদেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এ জাতীয় শিরা-উপশিরাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। (এক) যা কলিজা থেকে উদ্ভূত হয়ে সারা দেহে খাঁটি রক্ত পৌঁছে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই প্রকার শিরাকেই وَرِيْد বলা হয়। (দুই) যা হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত হয়ে রক্তের সূক্ষ্ম বাষ্প সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্তের এই সূক্ষ্ম বাষ্পকে রূহ বলা হয়। প্রথম প্রকার শিরা মোটা এবং দ্বিতীয় প্রকার শিরা চিকন হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী وَرِيْد শব্দটি কলিজা থেকে উদ্ভূত শিরার অর্থে নেওয়াই জরুরি নয়। বরং হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত ধমনীকেও আভিধানিক দিক দিয়ে وَرِيْد বলা যায়। কেননা এতেও এক প্রকার রক্তই সঞ্চালিত হয়। এস্থলে আয়াতের উদ্দেশ্য মানুষের হৃদয়গত অবস্থা ও চিন্তাধারা অবগত হওয়া। তাই এ অর্থই অধিক উপযুক্ত। মোটকথা, উল্লেখিত দুই অর্থের মধ্যে যে কোনো অর্থই নেওয়া হোক সর্বাবস্থায় প্রাণীর জীবন এর উপর নির্ভরশীল। এসব শিরা কেটে দিলে প্রাণীর আত্মা বের হয়ে যায়। অতএব, সারকথা এই দাঁড়াল যে, যে ধমনীর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল, আমি সে ধমনীর চাইতেও তার অধিক নিকটবর্তী। অর্থাৎ, তার সবকিছুই আমি জানি।

সূফী বুযুর্গগণের মতে আয়াতে কেবল জ্ঞানগত নৈকট্যই উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে বিশেষ এক ধরনের সংলগ্নতা বুঝানো হয়েছে, যার স্বরূপ ও গুণাগুণ তো কারো জানা নেই, কিন্তু এই সংলগ্নতার অস্তিত্ব অবশ্যই বিদ্যমান আছে। কুরআন পাকের একাধিক আয়াত এবং অনেক সহীহ্ হাদীস এ তথ্যের সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ অর্থাৎ, সেজদা কর এবং আমার নৈকট্যশীল হয়ে যাও। হিজরতের ঘটনায় রসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বলেছিলেন : اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন : اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা আমার সঙ্গে আছেন। হাদীসে আছে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক নিকটবর্তী তখন হয়, যখন সে সেজদায় থাকে। হাদীসে আরো আছে, আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে।

ইবাদতের মাধ্যমে এবং মানুষের নিজের কর্মফলস্বরূপ অর্জিত এই নৈকট্য বিশেষভাবে মু'মিনের জন্যে নির্দিষ্ট। এরূপ মু'মিন "আল্লাহর ওলী" বলে অভিহিত হন। এই নৈকট্য সেই নৈকট্য নয়, যা প্রত্যেক মু'মিন ও কাফেরের প্রাণের সাথে আল্লাহ তা'আলা সমভাবে রয়েছে। মোটকথা, উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ তা'আলার সাথে মানুষের এক বিশেষ প্রকার সংলগ্নতা আছে, যদিও আমরা এর স্বরূপ ও গুণাগুণ উপলব্ধি করতে সক্ষম নই। মাওলানা রূমী (র) তাই বলেন, اتصالے بے مثال وبے قیاس ٥ هست رَبُّ النَّاسْ را باجان ناس

অর্থাৎ মানবাত্মার সাথে তার পালনকর্তার এমন একটা গভীর নৈকট্য বিদ্যমান, যার কোনো স্বরূপ বা তুলনা বর্ণনা করা যায় না।

এই নৈকট্য ও সংলগ্নতা চোখে দেখা যায় না; বরং ঈমানী দূরদর্শিতা দ্বারা জানা যায়। তাফসীরে মাযহারীতে এই নৈকট্য ও সংলগ্নতাকেই আয়াতের মর্ম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের উক্তি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে জ্ঞানগত সংলগ্নতা বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাছীর এই দুই অর্থ থেকে আলাদা এক তৃতীয় তাফসীর এই বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতে نَحْنُ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা বুঝানো হয়নি। বরং তাঁর ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা মানুষের সাথে সাথে থাকে। তারা মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে এতটুকু ওয়াকিফহাল, যতটুকু খোদ মানুষ তার প্রাণ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয়।

প্রত্যেক মানুষের সাথে দুজন ফেরেশতা আছে إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ - تَلَقِّيْ শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা, নেওয়া এবং অর্জন করে নেওয়া। فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ অর্থাৎ, নিয়ে নিলেন আদম তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য। আলোচ্য আয়াতে مُتَلَقِّيَانِ বলে দুই জন ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে সদাসর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে। عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ অর্থাৎ, তাদের একজন ডান দিকে থাকে এবং সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বাম দিকে থাকে এবং অসৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। قَعِيْد শব্দটি قَاعِد (উপবিষ্ট) অর্থে একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। قَعِيْد-এর অর্থ قَاعِد হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, قَاعِدٌ শুধু উপবিষ্ট অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قَعِيْد শব্দটি ব্যাপক। যে ব্যক্তি কারো সংঙ্গে থাকে, তাকে قَعِيْد বলা হয়-উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক অথবা চলাফেরা রত হোক। উপরিউক্ত ফেরেশতাদ্বয়ের অবস্থাও তাই। তারা সর্বদা-সর্বাবস্থায় মানুষের সঙ্গে থাকে- সে উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক, চলাফেরা রত হোক অথবা নিদ্রিত হোক। কেবল প্রস্রাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী সহবাসের প্রয়োজনে যখন সে গুপ্তাঙ্গ খোলে তখন ফেরেশতাদ্বয় সরে যায়। কিন্তু তদবস্থায়ও সে কোনো গোনাহ্ করলে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি বলে তারা তা জানতে পারে।

ইবনে কাছীর আহনাফ ইবনে কায়স (র.) -এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন : এই ফেরেশতাদ্বয়ের মধ্যে ডানদিকের ফেরেশতা নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বাম দিকের ফেরেশতারও দেখা-শুনা করে। মানুষ যদি কোনো গোনাহ্ করে, তবে ডানদিকের ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে বলে : এখনি এটা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না। তাকে সময় দাও। যদি সে তওবা করে তবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় আমলনামায় লিপিবদ্ধ কর।–[ইবনে আবী হাতেম]

আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা : হযরত হাসান বসরী (র.) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন :

হে আদম সন্তানগণ। তোমাদের জন্য আমলনামা বিছানো হয়েছে এবং দুজন সম্মানিত ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে। একজন তোমার ডানদিকে, অপরজন বাম-দিকে। ডান দিকের ফেরেশতা তোমার নেক আমল লিখে এবং বামদিকের ফেরেশতা গুনাহ্ ও কুকর্ম লিপিবদ্ধ করে। এখন এই সত্য সামনে রেখে তোমার মনে যা চায়, তাই কর এবং কম আমল কর কিংবা বেশি কর। অবশেষে যখন তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তখন এই আমলনামা বন্ধ করে তোমার গ্রীবায় রেখে দেওয়া হবে। এটা কবরে তোমার সাথে যাবে এবং থাকবে। অবশেষে তুমি কিয়ামতের দিন যখন কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন :

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ـ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ـ

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক মানুষের আমলনামা তার ঘাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন সে তা খোলা অবস্থায় পাবে। এখন নিজের আমলনামা নিজেই পাঠ কর। তুমি নিজেই তোমার হিসাব করার জন্য যথেষ্ট।

হযরত হাসান বসরী (র.) আরো বলেন, আল্লাহর কসম, তিনি বড়ই ন্যায় ও সুবিচার করেছেন, যিনি স্বয়ং তোমাকেই তোমার ক্রিয়াকর্মে হিসাবকারী করেছেন। (ইবনে কাছীর) বলা বাহুল্য, আমলনামা কোনো পার্থিব কাগজ নয় যে, এর কবরে সঙ্গে যাওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকার ব্যাপারে খটকা হতে পারে। এটা এমন একটা অর্থগত বস্তু যার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাই এর প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠহার হওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়।

মানুষের প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হয় : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই পরিদর্শক ফেরেশতা রেকর্ড করে নেয়। হযরত হাসান বসরী (র.) ও কাতাদাহ (র.) বলেন : এই ফেরেশতা মানুষের প্রতিটি বাক্য রেকর্ড করে। তাতে কোনো গোনাহ্ অথবা ছওয়াব থাকুক বা না থাকুক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : কেবল সেসব বাক্য লিখিত হয়, যেগুলো ছওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য। ইবনে কাছীর (র.) উভয় উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলেন : আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে প্রথমোক্ত উক্তি অগ্রগণ্য মনে হয়। এরপর তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেই আলী ইবনে আবী তালহা (রা.)-এর এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যা দ্বারা উভয় উক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এই রেওয়ায়েতে আছে, প্রথমে তো প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়, তাতে কোনো গোনাহ্ অথবা ছওয়াব থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দিনে ফেরেশতা লিখিত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করে এবং যেসব উক্তি ছওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য এবং ভালো অথবা মন্দ সেগুলো রেখে বাকিগুলো মিটিয়ে দেয়। অপর এক আয়াতে আছে : يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتٰبِ-এর অর্থ তাই।

ইমাম আহমদ (র.) হযরত বিলাল ইবনে হারিস মুযানী (রা) থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

মানুষ মাঝে মাঝে কোনো ভালো কথা বলে। এতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু সে মামুলি বিষয় মনে করেই কথাটি বলে এবং টেরও পায় না যে, এর ছওয়াব এতই সুদূর-প্রসারী যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সন্তুষ্টি লিখে দেন। এমনিভাবে মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোনো বাক্য মামুলি মনে করে উচ্চারণ করে। সে ধারণাও করতে পারে না যে, এর গুনাহ্ ও শাস্তি কতদূর পরিব্যাপ্ত হবে। এই বাক্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী অসন্তুষ্টি লিখে দেন। –(ইবনে কাছীর)

হযরত আলকামাহ্ (র.) এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন : এই হাদীস আমাকে অনেক কথা মুখে উচ্চারণ করা থেকে বিরত রেখেছে। –(ইবনে কাছীর)

মৃত্যু যন্ত্রণা : وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

سَكْرَةُ الْمَوْتِ-এর অর্থ মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর সময় মূর্ছা যাওয়া। আবূ বকর ইবনে আম্বারী (র.) হযরত মাসরূক (র.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর মধ্যে যখন মৃত্যুর ক্রিয়া শুরু হয়, তখন তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে কাছে ডাকলেন। পিতার অবস্থা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে এই কবিতাংশ উচ্চারিত হয়ে যায় : إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ অর্থাৎ, আত্মা একদিন অস্থির হবে এবং বক্ষ সংকুচিত হয়ে যাবে। হযরত আবূ বকর (রা.) শুনে বললেন : তুমি বৃথাই এই কবিতা পাঠ করেছ। এর পরিবর্তে এই আয়াত পাঠ করলে না কেন? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

ওফাতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে এই অবস্থা দেখা দিলে তিনি হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে মালিশ করতেন এবং বলতেন : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ অর্থাৎ, কালেমা তাইয়েবা পাঠ করে বলতেন : মৃত্যুযন্ত্রণা বড় সাংঘাতিক। بِالْحَقِّ-এখানে بَاءٌ অব্যয়টি تَعْدِيَةٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, মৃত্যুযন্ত্রণা সত্য বিষয়কে নিয়ে এলো। অর্থাৎ মৃত্যুযন্ত্রণা এমন বিষয়কে সামনে উপস্থিত করেছে, যা সত্য ও প্রতিষ্ঠিত এবং যা থেকে পলায়নের অবকাশ নেই। –[মাযহারী]

ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ - تَحِيْدُ শব্দটি حَيْد থেকে উদ্ভূত। অর্থ সরে যাওয়া, পলায়ন করা। আয়াতের অর্থ এই যে, এই মৃত্যু থেকেই তুমি পলায়ন করতে।

বাহ্যতঃ সাধারণ মানুষকে এ সম্বোধন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি স্বভাবগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে আপদ মনে করে এ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। এটা শরিয়তের দৃষ্টিতে গোনাহ্ নয়। কিন্তু আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের এই স্বভাব ও প্রকৃতিগত বাসনা পুরোপুরিভাবে কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। একদিন না একদিন মৃত্যু আসবেই; তুমি যতই পলায়ন কর না কেন।

মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিতকারী ফেরেশতাদ্বয় : وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ-এ আয়াতের পূর্বে কিয়ামত কায়েম হওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে মানুষের হাজির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন سَائِقٌ থাকবে। سَائِقٌ সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জন্তুদের অথবা কোনো দলের পেছনে থেকে তাকে কোনো বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দেয়। شَهِيْدٌ-এর অর্থ সাক্ষী। سَائِقٌ যে ফেরেশতা হবে এব্যাপারে সব রেওয়ায়েতই একমত। شَهِيْدٌ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কারো কারো মতে সেও একজন ফেরেশতাই হবে। এভাবে প্রত্যেকের সাথে দুই জন ফেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের ময়দানে পৌঁছাবে এবং অপরজন তার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এই ফেরেশতাদ্বয় ডান ও বামে বসে আমল লিপিবদ্ধকারী কিরামুন-কাতেবীন ফেরেশতাও হতে পারে এবং অন্য দুই ফেরেশতাও হতে পারে।

وَّشَهِيْدٌ সম্পর্কে কেউ বলেন : সে হবে মানুষের আমল এবং কেউ খোদ মানুষকেই وَّشَهِيْدٌ বলেছেন। ইবনে কাছীর (র.) বলেন : ফেরেশতা হওয়াই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বুঝা যায়। হযরত ওসমান গনী (রা.) খোতবায় এই আয়াত তেলাওয়াত করে এই তাফসীরই করেছেন। হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও ইবনে যায়েদ (রা.) থেকেও তাই বর্ণিত আছে।

মৃত্যুর পর মানুষ এমন সবকিছু দেখবে, যা জীবিতাবস্থায় দেখতে পেত না : فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ -অর্থাৎ, আমি তোমাদের সামনে থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমাদের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম। এখানে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে জারীর (র.) ইবনে-কাসীর

প্রমুখের মতে মু'মিন, কাফের, মুত্তাকী ও ফাসেক ও নির্বিশেষে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া স্বপ্নজগত সদৃশ এবং পরকাল জাগরণ সদৃশ। স্বপ্নে যেমন মানুষের চক্ষুদ্বয় বন্ধ থাকে এবং কিছুই দেখে না, এমনিভাবে পরজগত সম্পর্কিত বিষয়াবলি দুনিয়াতে চর্মচক্ষে দেখে না। কিন্তু এই চর্মচক্ষু বন্ধ হওয়া মাত্রই স্বপ্নজগত খতম হয়ে জাগরণের জগত শুরু হয়ে যায়। এ জগতে পরকাল সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সামনে এসে যায়। এ কারণেই কোনো কোনো আলেম বলেন : اَلنَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَاتُوْا اِنْتَبَهُوْا অর্থাৎ, আজিকার পার্থিব জীবনে সব মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, তখন জাগ্রত হবে।

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ –এখানে সঙ্গী অর্থ সেই ফেরেশতা, যে ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্যে মানুষের সাথে থাকত। পূর্বেই জানা গেছে যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা দুজন। কিন্তু কিয়ামতে উপস্থিত হওয়ার সময় একজনকে চালক ও অপরজনকে সাক্ষী এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে। তাই পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয়কে হাশরের ময়দানে উপস্থিতির সময় দু'টি কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। একজনকে পশ্চাতে থেকে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে পৌঁছানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়াতে তাকেই سَائِقٌ তথা চালক বলা হয়েছে। অপরজনের দায়িত্বে তার আমলনামা দেওয়া হয়েছে। তাকে شَهِيْدٌ তথা সাক্ষী নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। হাশরের ময়দানে পৌঁছার পর আমলনামার ফেরেশতা আরজ করবে : هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ অর্থাৎ, তাঁর লিখিত আমলনামা আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে জারীর (র.) বলেন : এখানে قَرِيْنٌ শব্দটি দ্বারা উভয় ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে।

اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ - اَلْقِيَا শব্দটি দ্বিবাচক পদ। আয়াতে কোন ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে? বাহ্যতঃ পূর্বোক্ত চালক ও সাক্ষী ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ অন্য কথাও বলেছেন। –[ইবনে কাছীর]

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهٗ - قَرِيْنٌ শব্দের দ্বারা আসলে সে ব্যক্তিকে বুঝায় যে অন্তরঙ্গভাবে সঙ্গে থাকে। এই অর্থের দিক দিয়ে আগের আয়াতে এর দ্বারা আমল লিবিদ্ধকারী ফেরেশতা বোঝানো হয়েছিল। উপরিউক্ত ফেরেশতাদ্বয় যেমন মানুষের সঙ্গি হয়ে থাকে, তেমনি শয়তানও মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে অবস্থান করে এবং মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও পাপের দিকে প্ররোচিত করে। আলোচ্য আয়াতে قَرِيْنٌ বলে এই শয়তানই বুঝানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ হয়ে যাবে; তখন এই শয়তান বলবে : পরওয়ারদেগার, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি; বরং সে নিজেই পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করত এবং সদুপদেশে কর্ণপাত করত না। বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, এর আগে জাহান্নামী ব্যক্তি নিজেই এর অজুহাত পেশ করবে যে, আমাকে এই শয়তান বিভ্রান্ত করেছিল। নতুবা আমি সৎকাজ করতাম। এর জবাবে শয়তান পূর্বোক্ত কথা বলবে। উভয়ের বাকবিতণ্ডার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন :

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ অর্থাৎ, আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তোমাদের অসার ওজরের জবাব দিয়েছি এবং ঐশীগ্রন্থের মাধ্যমে প্রমাণাদি সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। আজ এই অনর্থক তর্কবিতর্ক কোনো উপকারে আসবে না।

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ –আমার কথা রদবদল হয় না। যা ফয়সালা করেছি, তা কার্যকর হবেই। আমি কারো প্রতি জুলুম করিনি। ইনসাফের ফয়সালা করেছি।

لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ : কারা اَوَّابٌ -অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক اَوَّابٌ ও حَفِيْظٌ -এর জন্যে রয়েছে। اَوَّابٌ -এর অর্থ অনুরাগী। অথাৎ, যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অনুরক্ত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, শা'বী, মুজাহিদ (রা.) বলেন : যে ব্যক্তি নির্জনতায় গোনাহ্ স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই اَوَّابٌ হযরত ওবায়দ ইবনে ওমর বলেন : اَوَّابٌ এমন ব্যক্তি যে প্রত্যেক উঠাবসায় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি আরো বলেন : আমাকে বলা হয়েছে যে, اَوَّابٌ ও حَفِيْظٌ এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا اَصَبْتُ مِنْ مَجْلِسِىْ هٰذَا অর্থ– আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ও তাঁরই প্রশংসা। হে আল্লাহ্ আমি এই মজলিসে যেসব গোনাহ্ আমার উপর এসে আপতিত হয়েছে, সেগুলো থেকে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার এই মজলিসে কৃত সব গোনাহ্ মাফ করে দেন। দোয়া এই :
سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং প্রশংসা তোমারই। তোমা ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : حَفِيْظ এমন ব্যক্তি যে নিজ গোনাহসমূহ স্মরণ রাখে, যাতে সেগুলো মোচন করিয়ে নেয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে حَفِيْظ এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলার বিবিধ-বিধান স্মরণ রাখে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে (এশরাকের) চার রাকাত নামাজ পড়ে, সে اَوَّابٌ ও حَفِيْظ -[কুরতুবী]
وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيْبٍ -আবূ বকর ওয়াররাক (র.) বলেন : مُنِيْب (বিনীত) -এর আলামত এই যে, সে আল্লাহ তা'আলার আদবকে সর্বদা চিন্তায় উপস্থিত রাখবে, তাঁর সামনে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকবে এবং মনের কুবাসনা পরিত্যাগ করবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُوَسْوِسُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার وَسْوَسَةٌ মূলবর্ণ (و - س - و - س) জিনস مضاعف رباعى অর্থ- কল্পনার উদয় হয়।

تَحِيْدُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার حَيْدٌ মূলবর্ণ (ح - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ- তুমি এড়িয়ে চলতে।

سَآئِقٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার سُوْقٌ মূলবর্ণ (س - و - ق) জিনন اجوف واوى অর্থ- একজন পরিচালক।

مُعْتَدٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِعْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ع - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- সীমালঙ্ঘনকারী।

مَزِيْدٌ : اسم مصدر - اسم مفعول অর্থ- অতিরিক্ত, বর্ধিত করা, বর্ধিত হওয়া, অধিক করা, অধিক হওয়া। বাব ضَرَبَ ; اِزْدِيَادٌ বাব افتعال অধিক হওয়া, কষ্ট বৃদ্ধি করা। تَزَايَدَ ও تَزِيْدُ অধিক হওয়া।

اُزْلِفَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِزْلَافٌ মূলবর্ণ (ز - ل - ف) জিনস صحيح অর্থ- নিকটে আনা হবে।

تُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ- তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

خَشِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَشْىُ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ভয় করে।

جَآءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِئُ মূলবর্ণ (ج - ى - أ) জিনস মুরাক্কাব (اجوف يائى ও مهموز لام) অর্থ- উপস্থিত হয়।

اُدْخُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّخُوْلُ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা প্রবেশকর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ : এখানে واو টি আতেফা; আর جَاءَتْ ফে'ল এবং كُلُّ نَفْسٍ হলো ফায়েল। আর مَعَهَا হলো مبتدا আর سَآئِقٌ হলো خبر مقدم যা উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে ظرف مكان মুবতাদা মুআখখার; আর شَهِيْدٌ শব্দটি سَآئِقٌ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর جمله اسمية টা رفع -এর স্থানে হয়ে كُلّ -এর সিফত হয়েছে। অথবা نصب -এর স্থলে হয়ে مَا -এর সিফত হয়েছে অর্থাৎ مَعَهَا مَنْ يَسُوْقُهَا وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا আর এটাকে حال ও বলা যেতে পারে। -[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৭১]

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾	৩৫. তারা বেহেশতে যা চাবে, তা সমস্তই প্রাপ্ত হবে, আর আমার নিকটে আরো অধিক রয়েছে।
وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ ؕ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾	৩৬. আর আমি এদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে (কুফরের দরুন) ধ্বংস করেছি, যারা এদের চেয়েও শক্তিতে অধিকতর ছিল এবং নগরসমূহে ঘুরে বেড়াত; কোথাও তারা পলায়নের স্থান পায়নি।
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾	৩৭. এতে সেই ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপদেশ রয়েছে, যার অন্তর আছে অথবা সে মনোনিবেশ সহকারে কর্ণপাত করে।
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿٣٨﴾	৩৮. আর আমি আসমানসমূহ ও জমিনকে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, অথচ ক্লান্তি আমাকে স্পর্শও করেনি।
فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ﴿٣٩﴾	৩৯. অতএব, আপনি তাদের (এ সমস্ত) উক্তিতে ধৈর্য ধরুন, আর নিজ প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতে থাকুন, (নামাজও এর অন্তর্ভুক্ত) সূর্য উদয়ের পূর্বে (ফজর) এবং তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে (জোহর ও আসরের সময়)।
وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿٤٠﴾	৪০. আর রাত্রিকালেও (মাগরিব ও এশার সময়) তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন, আর ফরজ নামাজের পরেও।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৫. لَهُمْ সমস্তই প্রাপ্ত হবে مَا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا তারা জান্নাতে যা চাবে তা وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ আর আমার নিকট আরো অধিক রয়েছে।

৩৬. وَكَمْ اَهْلَكْنَا আর আমি ধ্বংস করেছি قَبْلَهُمْ এদের পূর্বে مِنْ قَرْنٍ বহু সম্প্রদায়কে هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا যারা এদের চেয়েও শক্তিতে অধিকতর ছিল فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ এবং নগরসমূহে ঘুরে বেড়াত هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ কোথাও তারা পলায়নের স্থান পায়নি।

৩৭. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى এতে সেই ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপদেশ রয়েছে لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ যার অন্তর আছে اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ অথবা সে মনোনিবেশ সহকারে কর্ণপাত করে।

৩৮. وَلَقَدْ خَلَقْنَا আর আমি সৃষ্টি করেছি السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিনকে وَمَا بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ছয় দিনে وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ অথচ ক্লান্তি আমাকে স্পর্শও করেনি।

৩৯. فَاصْبِرْ অতএব আপনি ধৈর্য ধরুন عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ তাদের উক্তিতে وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ আর নিজ প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতে থাকুন قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ সূর্য উদয়ের পূর্বে وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ এবং তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে।

৪০. وَمِنَ الَّيْلِ আর রাত্রিকালেও فَسَبِّحْهُ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ আর ফরজ নামাজের পরেও।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾

৪১. এবং শুনে রাখ! যেদিন এক আহ্বানকারী আহ্বান করবে নিকটবর্তী স্থান হতে।

يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾

৪২. যেদিন ঐ হুঙ্কারকে নিশ্চিতরূপে সকলে শ্রবণ করবে; এটা হবে বহির্গত হওয়ার দিন।

اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾

৪৩. আমিই জীবন দান করি এবং আমিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি এবং আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে,

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۗ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾

৪৪. যেদিন জমিন তাদের (মৃতদের) উপর হতে বিদীর্ণ হয়ে যাবে, যখন তারা (ময়দানের) দিকে দৌড়াতে থাকবে; এটা আমার পক্ষে এক সহজ একত্রীকরণ।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۚ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾ ع ١٧

৪৫. এরা যা কিছু বলছে, আমি খুব অবগত আছি আর আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নন। অতএব, আপনি কুরআনের মাধ্যমে সে লোকদেরকে নসিহত করতে থাকুন, যারা আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে চলে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. وَاسْتَمِعْ এবং শুনে রেখ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ যেদিন এক আহ্বানকারী আহ্বান করবে مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ নিকটবর্তী স্থান হতে।

৪২. يَوْمَ যেদিন يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ ঐ হুঙ্কারকে সকলে শ্রবণ করবে بِالْحَقِّ নিশ্চিতরূপে ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ এটা হবে বাহির্গত হওয়ার দিন।

৪৩. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِيْ আমিই জীবন দান করি وَنُمِيْتُ এবং আমিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ এবং আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে।

৪৪. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ যেদিন জমিন বিদীর্ণ হয়ে যাবে عَنْهُمْ তাদের (মৃতদের) উপর হতে سِرَاعًا যখন তারা (ময়দানের) দিকে দৌড়াতে থাকবে ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ এটা আমার পক্ষে এক সহজ একত্রীকরণ।

৪৫. نَحْنُ اَعْلَمُ আমি খুব অবগত আছি بِمَا يَقُوْلُوْنَ এরা যা কিছু বলছে وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ আর আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নন فَذَكِّرْ অতএব আপনি সেই লোকদেরকে নসিহত করতে থাকুন بِالْقُرْاٰنِ কুরআনের মাধ্যমে مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ যারা আমার সতর্ক বাণীকে ভয় করে চলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ [٣٨]

শানে নুযূল–১ : ইবনে মুনযির যাহ্হাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইহুদিরা বলে থাকে আল্লাহ তা'আলা রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি করেন এবং শনিবার দিন আল্লাহ তা'আলা বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তাদের এহেন অশোভনীয় মন্তব্য করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : খতীব তদীয় ইতিহাস গ্রন্থে আওয়াম বিন হাওশাব এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি বলেন, আমি আবূ মিযলাজকে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সে এক "পা" কে অপর পায়ের উপর রেখে বসে কেন? আবূ মিযলাজ বলল, এতে কোনো দূষণীয়তা নেই। ইহুদিরা এরূপভাবে বসাকে অপছন্দ মনে করে। তাদের ধারণা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ জমিনকে ছয় দিনের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর শনিবার দিন আল্লাহ বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। সে সময়ে আল্লাহ অনুরূপভাবে বসেছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছূর ১১০/৬]

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ [٤٥]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ -কে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আমাদেরকে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করুন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করা হয়েছে।

–[দুররে মানছূর ১১১/৬, ফতহুল কাদীর ৮২/৫, কুরতুবী ২৯/১৭, রূহুল মা'আনী ১৯৫/১৩/২৬]

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا -অর্থাৎ, জান্নাতীরা যা চাইবে, তা-ই পাবে। অর্থাৎ চাওয়া মাত্রই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিলম্ব ও অপেক্ষার বিড়ম্বনা সইতে হবে না। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জান্নাতে কারো সন্তানের বাসনা হলে গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের কায়িক বৃদ্ধি এগুলো সব এক মূহুর্তের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে যাবে। –[ইবনে কাছীর]

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ অর্থাৎ, আমার কাছে এমন নিয়ামতও আছে, যার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। ফলে তারা এগুলোর আকাঙ্ক্ষাও করতে পারবে না। হযরত আনাস ও জাবের (রা.) বলেন : এই বাড়তি নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দীদার তথা সাক্ষাত, যা জান্নাতীরা লাভ করবে। لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ আয়াতের তাফসীরে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, জান্নাতীরা প্রতি শুক্রবার আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত লাভ করবে। –[কুরতুবী]

فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ - نَقَّبُوا শব্দটি تَنْقِيبٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিদ্র করা, বিদীর্ণ করা। বাক-পদ্ধতিতে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مَحِيصٍ -এর অর্থ আশ্রয়স্থল। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা তোমাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল এবং যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। কিন্তু দেখ পরিণামে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কোনো ভূখণ্ড অথবা গৃহ তাদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে আশ্রয় দিতে পারল না।

জ্ঞানার্জনের দুই পন্থা : لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : এখানে কলব বলে বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। বোধশক্তির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কলব তথা অন্তঃকরণ। তাই একে কলব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোনো কোনো তফসীরবিদ বলেন : এখানে কলব বলে হায়াত তথা জীবন বোঝানো হয়েছে। কারণ কলবের উপরই হায়াত ভিত্তিশীল। আয়াতের অর্থ এই যে, এই সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা সেই ব্যক্তিই উপদেশ ও শিক্ষার উপকার লাভ করতে পারে, যার বোধশক্তি অথবা হায়াত আছে। বোধশক্তিহীন অথবা মৃত ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ - إِلْقَاءُ سَمْعٍ -এর অর্থ কোনো কথা কান লাগিয়ে শোনা এবং شَهِيدٌ -এর অর্থ উপস্থিত। উদ্দেশ্য এই যে, দুই ব্যক্তি উল্লেখিত আয়াতসমূহের দ্বারা উপকার লাভ করে। (এক) যে স্বীয় বোধশক্তি দ্বারা সব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে (দুই) অথবা সে আয়াতসমূহকে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে ; অন্তরকে অনুপস্থিত রেখে শুধু কানে শুনে না। তাফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে : কামেল বুযুর্গগণ প্রথমোক্ত প্রকারের মধ্যে এবং তাঁদের অনুসারী ও মুরিদগণ দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে দাখিল।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ - سَبِّحْ শব্দটি تَسْبِيحٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ্ (পবিত্রতা বর্ণনা) করা। মুখে হোক কিংবা নামাজের মাধ্যমে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন : সূর্যোদয়ের পূর্বে তাসবীহ্ করার অর্থ ফজরের নামাজ এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তাসবীহ্ করার অর্থ আসরের নামাজ। হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَاتَغْلِبُوا عَلَى صَلٰوةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.

চেষ্টা কর, যাতে তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাজগুলো ফওত না হয়ে যায়, অর্থাৎ, ফজর ও আসরের নামাজ। এর প্রমাণ হিসেবে জরীর উপরিউক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন।–[কুরতুবী]।

সেসব তাসবীহ্ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সকাল-বিকাল পাঠ করার প্রতি সহীহ্ হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশত বার করে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে, তার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশি হয়। –[মাযহারী]

وَأَدْبَارَ السُّجُوْدِ –হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন : سُجُوْد বলে ফরজ নামাজ বোঝানো হয়েছে, এবং পশ্চাতে বলে সেইসব তাসবীহ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফজিলত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং এক বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' পাঠ করবে, তার গোনাহ্ মাফ করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ডেউয়ের সমান হয়। –(বোখারী-মুসিলম) ফরজ নামাজের পরে যেসব সুন্নত নামাজ পড়ার কথা সহীহ্ হাদীসমূহে বর্ণিত আছে, وَأَدْبَارَ السُّجُوْدِ বলে সেগুলোও বোঝানো যেতে পারে। –[মাযহারী]।

يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ অর্থাৎ, যেদিন আহ্বানকারী ফেরেশতা নিকট থেকেই আহ্বান করবে। ইবনে-আসাকির জায়েদ ইবনে-জাবের থেকে বর্ণনা করেন, এই ফেরেশতা আর কেউ নয়-স্বয়ং হযরত ইসরাফীল (আ.)। তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের মৃতদেরকে এই বলে সম্বোধন করবে : হে পচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থিসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! শোন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হিসাবের জন্যে সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন। –[মাযহারী]।

আয়াতে কেয়ামতের দ্বিতীয় ফুঁৎকার বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা বিশ্বজগতকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। নিকটবর্তী স্থানের অর্থ এই যে, তখন এই আওয়াজটি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে শুনবে, যেন কানের কাছে থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন : আওয়াজটি এমনভাবে শোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন : নিকটবর্তী স্থানের অর্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরা। এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক থেকে এর দূরত্ব সমান। –[কুরতুবী]।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا –অর্থাৎ যখন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে সব মৃত বের হয়ে আসবে এবং ছুটাছুটি করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, সবাই শাম দেশের দিকে দৌড়াতে থাকবে। সেখানে বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় ইসরাফীল (আ.) সবাইকে আহ্বান করবেন।

তিরমিযীতে মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাম দেশের দিকে ইশারা করে বলেন :

مِنْ هٰهُنَا اِلٰى هٰهُنَا تُحْشَرُوْنَ رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَتُجَرُّوْنَ عَلٰى وُجُوْهِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

এখান থেকে সেই পর্যন্ত তোমরা উত্থিত হবে। কেউ সওয়ার হয়ে, কেউ পদব্রজে এবং কেউ উপুড় হয়ে কিয়ামতের ময়দানে নীত হবে।

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে আপনি কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন।" উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রচারকার্য ব্যাপক হলেও একমাত্র তারাই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে, যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে।

হযরত কাতাদাহ (রা.) এই আয়াত পাঠ করে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَّخَافُ وَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْ مَوْعُوْدَكَ يَا بَارُّ يَا رَحِيْمُ

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার ওয়াদার আশা করে। হে ওয়াদাপূরণকারী, হে দয়াময়!

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَقَّبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَنْقِيْبٌ মূলবর্ণ (ن - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা ঘুরে বেড়াত।

اِسْتَمِعْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِمَاعٌ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– শুনে রাখ। মনোযোগ দিয়ে (শুন)

اَلْمُنَادِىْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُنَادَاةٌ মূলবর্ণ (ن - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আহ্বানকারী।

تَشَقَّقُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَشَقُّقٌ মূলবর্ণ (ش - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

يَسْمَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلسَّمْعُ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– সকলে শ্রবণ করবে।

اَلْخُرُوْجُ : মাসদার। বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ– বহির্গত হওয়া।

نُحْيِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– আমিই জীবনদান করি।

حَشْرٌ : মাসদার। বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– একত্রিকরণ।

اَعْلَمُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– আমি অবগত আছি।

يَقُوْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা যা কিছু বলছে।

ذَكِّرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসাদার اَلتَّذْكِيْرُ মূলবর্ণ (ذ - ك - ر) জিনস صحيح অর্থ– নসিহত করতে থাকুন।

لُغُوْبٌ : ইহা ইসমে মাসদার, বাব كَرُمَ - فَتَحَ - سَمِعَ থেকে মাসদার لَغْبًا ও لُغُوْبًا মূলবর্ণ (ل - غ - ب) জিনস صحيح অর্থ– ক্লান্তি।

يُنَادِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে আহ্বান করবে।

اَلصَّيْحَةُ : মাসদার ও حاصل مصدر বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ص - ى - ح) জিনস اجوف يائى অর্থ– হুঙ্কার।

سِرَاعًا : سَرِيْعٌ-এর বহুবচন, যেমন كِرَامٌ টা كَرِيْمٌ-এর বহুবচন মূলবর্ণ (س - ر - ع) জিনস صحيح অর্থ– দৌড়াতে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاصْبِرْ عَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ এখানে : فَاء টা হলো فصيحة ; আর اِصْبِرْ ফে'লে আমর তার উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল, আর عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ হলো اِصْبِرْ-এর সাথে متعلق আর سَبِّحْ হলো ফে'লে আমর। তার উহ্য যমীর ফায়েল। আর بِحَمْدِ رَبِّكَ হলো سَبِّحْ-এর ফায়েল থেকে حال অর্থাৎ صَلِّ حَامِدًا; আর قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ টা سَبِّحْ-এর সাথে ظرف متعلق হয়েছে। আর قَبْلَ الْغُرُوْبِ টা ظرف-এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৮০]

سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা যারিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৬০, রুকূ'– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. সে বায়ুর শপথ, যা ধুলাবালিকে উড়িয়ে থাকে।	وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ﴿١﴾
২. অনন্তর শপথ সেই মেঘমালার– যা বোঝা বহন করে।	فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ﴿٢﴾
৩. অতঃপর শপথ সেই নৌকাসমূহের– যা ধীরভাবে চলে।	فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ﴿٣﴾
৪. শপথ সেই ফেরেশতাগণের– যারা বস্তুসমূহ বণ্টন করে।	فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ﴿٤﴾
৫. তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা নিশ্চিত সত্য।	اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾
৬. আর (কার্যাবলির) প্রতিদান অবশ্যই ঘটবে।	وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾
৭. আসমানের শপথ– যাতে (চলার) পথসমূহ রয়েছে।	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾
৮. তোমরা (কিয়ামত সম্বন্ধে) বিভিন্ন মত পোষণ করে থাক।	اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالذّٰرِيٰتِ সে বায়ুর শপথ। ذَرْوًا যা ধুলা-বালিকে উড়িয়ে থাকে।

২. فَالْحٰمِلٰتِ অনন্তর শপথ সেই মেঘমালার। وِقْرًا যা বোঝা বহন করে।

৩. فَالْجٰرِيٰتِ অতঃপর শপথ সেই নৌকাসমূহের। يُسْرًا যা ধীরভাবে চলে।

৪. فَالْمُقَسِّمٰتِ অতঃপর শপথ সেই ফেরেশতাদের যারা বণ্টন করে। اَمْرًا বস্তুসমূহ।

৫. اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে لَصَادِقٌ তা নিশ্চিত সত্য।

৬. وَّاِنَّ الدِّيْنَ আর কার্যাবলির প্রতিদান لَوَاقِعٌ অবশ্যই ঘটবে।

৭. وَالسَّمَآءِ আসমানের শপথ ذَاتِ الْحُبُكِ যাতে (চলার) পথসমূহ রয়েছে।

৮. اِنَّكُمْ তোমরা لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ (কিয়ামত সম্বন্ধে) বিভিন্ন মত পোষণ করে থাক।

অনুবাদ	আয়াত
৯. তা (-র সমর্থন) হতে সেই ব্যক্তিই নিরস্ত থাকে, যে (সম্পূর্ণরূপে মঙ্গল হতে) বিরত থাকতে চায়।	يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ﴿٩﴾
১০. ভিত্তিহীন উক্তিকারীরা ধ্বংস হোক।	قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ﴿١٠﴾
১১. যারা (কিয়ামতকে অবিশ্বাস করে এবং) মূর্খতার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে আছে।	الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١١﴾
১২. তারা (বিদ্রূপচ্ছলে) জিজ্ঞাসা করে– সেই প্রতিফল দিবস কখন আসবে?	يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾
১৩. (আল্লাহ বলেন,) যেদিন তাদেরকে আগুনে তাপানো হবে [আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে]।	يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. (এবং বলা হবে যে,) নিজেদের সে শাস্তির স্বাদ উপভোগ কর; এটা তাই যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করতে।	ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۭ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ উদ্যানসমূহ ও নহরসমূহের মধ্যে থাকবে।	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٥﴾
১৬. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা প্রদান করবেন, তারা তা (আনন্দচিত্তে) গ্রহণ করতে থাকবে; (যেহেতু) তারা এর পূর্বে (পৃথিবীতে) নেককার ছিল।	اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. তারা (ইবাদত রত থাকার দরুন) রাত্রিকালে কমই ঘুমাত।	كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. يُؤْفَكُ عَنْهُ তা (-র সমর্থন) হতে সেই ব্যক্তিই নিরস্ত থাকে مَنْ اُفِكَ যে (সম্পূর্ণ রূপে মঙ্গল হতে) বিরত থাকতে চায়।

১০. قُتِلَ ধ্বংস হোক الْخَرّٰصُوْنَ ভিত্তিহীন উক্তিকারীরা।

১১. الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ যারা মুর্খতার মধ্যে سَاهُوْنَ বিভ্রান্ত হয়ে আছে।

১২. يَسْـَٔلُوْنَ তারা (বিদ্রূপচ্ছলে) জিজ্ঞাসা করে اَيَّانَ কখন আসবে يَوْمُ الدِّيْنِ সেই প্রতি ফল দিবস।

১৩. يَوْمَ هُمْ যেদিন তাদেরকে عَلَى النَّارِ আগুনে يُفْتَنُوْنَ তাপানো হবে।

১৪. ذُوْقُوْا স্বাদ উপভোগ কর فِتْنَتَكُمْ নিজেদের সেই শাস্তির هٰذَا الَّذِيْ এটা তাই كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ যার জন্য তেমরা তাড়াহুড়া করতে।

১৫. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ উদ্যানসমূহ ও নহরসমূহের মধ্যে থাকবে।

১৬. اٰخِذِيْنَ তারা তা অনন্দ চিত্তে গ্রহণ করবে مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা প্রদান করবেন اِنَّهُمْ তার كَانُوْا ছিল قَبْلَ ذٰلِكَ এর পূর্বে مُحْسِنِيْنَ নেককার।

১৭. كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ তারা রাত্রিকালে কমই ঘুমাত।

১৮. এবং শেষ রাত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করত।	وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾
১৯. আর (তাদের আর্থিক ইবাদত এরূপ ছিল যে,) তাদের ধনসম্পদের মধ্যে প্রার্থী এবং অপ্রার্থী (নির্বিশেষে) সবারই অংশ ছিল।	وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾
২০. আর ঈমানদার লোকদের জন্য ভূপৃষ্ঠে বহু নিদর্শন রয়েছে।	وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾
২১. এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও; তবুও কি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না?	وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾
২২. তোমাদের রিজিক, আর তোমাদেরকে যে (কিয়ামতের) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে এসব (-এর নির্দিষ্ট সময়) আসমানে (অর্থাৎ লওহে-মাহফূযে লিপিবদ্ধ) রয়েছে।	وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. অতএব, আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের শপথ! তা (কিয়ামত) এমন সত্য, যেমন তোমাদের পরস্পরের কথাবার্তা বলা।	فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. (হে মুহাম্মদ!) ইবরাহীমের সম্মানিত অতিথিদের ঘটনা আপনার নিকট পৌছেছে কি?	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾
২৫. যখন তাঁরা তাঁর নিকট আসলেন, অতঃপর তাঁকে সালাম করলেন; ইবরাহীমও (উত্তরে) বললেন, সালাম, (এবং বলতে লাগলেন) অপরিচিত লোক (বলে মনে হচ্ছে)।	إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَبِالْأَسْحَارِ এবং শেষ রাত্রে هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ক্ষমা প্রার্থনা করত।

১৯. وَفِي أَمْوَالِهِمْ আর তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে حَقٌّ অংশ ছিল لِّلسَّائِلِ প্রার্থী وَالْمَحْرُومِ এবং অপ্রার্থী সকলেরই।

২০. وَفِي الْأَرْضِ আর ভূপৃষ্ঠে রয়েছে آيَاتٌ বহু নিদর্শন لِّلْمُوقِنِينَ ঈমানদার লোকদের জন্য।

২১. وَفِي أَنفُسِكُمْ এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও أَفَلَا تُبْصِرُونَ তবুও কি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

২২. وَفِي السَّمَاءِ আসমানে রয়েছে رِزْقُكُمْ তোমাদের রিজিক وَمَا تُوعَدُونَ আর তোমাদের কে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

২৩. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ অতএব, আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের শপথ إِنَّهُ لَحَقٌّ তা (কিয়ামত এমন) সত্য مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ যেমন তোমাদের পরস্পরের কথাবার্তা বলা।

২৪. هَلْ أَتَاكَ আপনার নিকট পৌছেছে কি حَدِيثُ ঘটনা ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ইবরাহীম এর সম্মানিত অতিথিদের।

২৫. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ যখন তাঁরা তাঁর নিকট আসলেন فَقَالُوا سَلَامًا অতঃপর তাঁকে সালাম করলেন قَالَ سَلَامٌ ইবরাহীমও বললেন সালাম قَوْمٌ مُّنكَرُونَ অপরিচিত লোক।

২৬. অতঃপর তিনি নিজ গৃহের দিকে চলে গেলেন এবং একটি হৃষ্টপুষ্ট (ভাজা) গো-বাছুর আনয়ন করলেন।	فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং তা তাদের সম্মুখে রাখলেন, (কিন্তু তাঁরা স্পর্শও করলেন না,) ইবরাহীম বললেন, আপনারা খাচ্ছেন না কেন?	فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. (তথাপি যখন তাঁরা খেলেন না,) তখন তিনি তাঁদের সম্বন্ধে মনে মনে ভীত হয়ে পড়লেন, তাঁরা বললেন, আপনি ভয় করবেন না (আমরা ফেরেশতা) এবং তাঁকে একটি সন্তানের সুসংবাদ দিলেন, যে বড় আলেম হবে।	فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾
২৯. ইতোমধ্যে তাঁর স্ত্রী (হযরত সারা) চিৎকার করতে করতে আসলেন, অতঃপর স্বীয় গাল চাপড়ে বললেন, (আমি তো) বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা (কিরূপে আমার সন্তান হবে)!	فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ﴿٢٩﴾
৩০. ফেরেশতাগণ বললেন, তোমার রব এরূপই বলেছেন; নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।	قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ অতঃপর তিনি নিজ গৃহের দিকে চলে গেলেন فَجَآءَ এবং অনয়ন করলেন بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ একটি হৃষ্টপুষ্ট (ভাজা) গো-বাছুর।

২৭. فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ এবং তা তাদের সম্মুখে রাখলেন قَالَ ইবরাহীম বললেন اَلَا تَاْكُلُوْنَ আপনারা খাচ্ছেন না কেন?

২৮. فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً তখন তিনি তাঁদের সম্বন্ধে মনে মনে ভীত হয়ে পড়লেন قَالُوْا তারা বললেন لَا تَخَفْ আপনি ভয় করবেন না وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ এবং তাকে একটি সন্তানের সুসংবাদ দিলেন, যে বড় আলেম হবে।

২৯. فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ ইতোমধ্যে তাঁর বিবি (হযরত সারা) আসলেন فِيْ صَرَّةٍ চিৎকার করতে করতে فَصَكَّتْ وَجْهَهَا অতঃপর স্বীয় গাল চাপড়ে وَقَالَتْ, এবং বললেন عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ (আমি তো) বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা (কিরূপে আমার সন্তান হবে!)।

৩০. قَالُوْا ফেরেশতাগণ বললেবন كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ তোমার রব এরূপই বলেছেন اِنَّهٗ هُوَ নিঃসন্দেহে তিনি الْحَكِيْمُ বড়ই প্রজ্ঞাময় الْعَلِيْمُ মহাজ্ঞানী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা যারিয়াত প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : সূরা যারিয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মারদূবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা যারিয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে জোবায়ের (রা.) থেকেও অনুরূপ কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সূরায় তিনটি রুকূ', ষাট আয়াত, ৩৬০টি বাক্য ১২৮৭ টি অক্ষর রয়েছে।

এ সূরার আমল : রুগ্ণ ব্যক্তির নিকট এ সূরা পাঠ করলে রোগের প্রকোপ হ্রাস পায়।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে, তার সকল বন্ধু তার অনুগত থাকবে এবং তার রিজিক বৃদ্ধি পাবে

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূববর্তী সূরা ক্বাফে হাশরের কথা বলা হয়েছে এবং দলিল দ্বারা হাশরের বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। আর এ সূরায়ও হাশর, তাওহীদ এবং নবুয়তের আলোচনা স্থান পেয়েছে। সূরা ক্বাফের পরিসমাপ্তিতে হাশরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেই শপথ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তোমাদেরকে যে হাশরের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই ঘটবে।

সূরা যারিয়াতের বর্ণনা-ভঙ্গি : সূরা ক্বাফে হাশরের সত্যতার দলিল প্রমাণ উপস্থাপনা করা হয়েছে, কিন্তু সমাজে এমন কিছু লোক থাকে, যারা দলিল প্রমাণের ব্যাপারে চিন্তা করে না। তাদেরকে যে পন্থায় বুঝানো হলে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সেই পন্থাই আলোচ্য সূরায় অবলম্বন করা হয়েছে। তদানীন্তন আরব জাতির মধ্যে অনেক দোষ থাকলেও একটি বিরাট গুণ ছিল, তার মিথ্যাবাদিতাকে অপছন্দ করতো, বিশেষত শপথ করে মিথ্যা বলাকে তারা ভীষণ অন্যায় মনে করতো। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, যে শপথ করে মিথ্যা বলে, সে ধ্বংস হয়ে যায়, এজন্যে কোনো ব্যক্তি যদি শপথ করে কোনো কথা বলতো, তবে তার সত্যতায় তারা পূর্ণ বিশ্বাস করতো।

মূলত এ কারণেই আলোচ্য সূরার শুরুতে কয়েকটি জিনিসের শপথ করে কিয়ামতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এমন বস্তুসমূহের শপথ করা হয়েছে, যা কিয়ামতের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সূরা যারিয়াতেও পূর্বেকার সূরা ক্বাফ-এর ন্যায় বেশির ভাগ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং ছওয়াব ও আজাব সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কতিপয় বস্তুর কসম খেয়ে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত কিয়ামত সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সত্য। মোট চারটি বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে। যথা-১. اَلذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ২. اَلْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ৩. اَلْجٰرِيٰتِ يُسْرًا এবং ৪. اَلْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا

আল্লামা ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য একটি হাদীস এবং হযরত ওমর ফারূক (রা.) ও আলী মুর্তাজা (রা.)-এর উক্তিতে এই বস্তু চতুষ্টয়ের তাফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে–

ذٰرِيٰتِ বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট ঝঞ্ঝাবায়ু বোঝানো হয়েছে। حٰمِلٰتِ وِقْرًا -এর শাব্দিক অর্থ- বোঝাবাহী। অর্থাৎ যে মেঘমালা বৃষ্টির বোঝা বহন করে। اَلْجٰرِيٰتِ يُسْرًا বলে পানিতে সচ্ছল গতিতে চলমান জলযান বুঝানো হয়েছে। مُقَسِّمٰتِ اَمْرًا -এর অর্থ- সেই সব ফেরেশতা, যারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধিলিপি অনুযায়ী রিজিক, বৃষ্টির পানি এবং কষ্ট ও সুখ বন্টন করে। –[ইবনে কাছীর, কুরতুবী, দুররে মানছুর]

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ [١٨]

শানে নুযূল ঃ- ইবনে ওহাব ও মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াত আনসারগণ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আনসাররা রাসূল ﷺ-এর সাথে মসজিদে নববীতে মাগরিব ও এশার নামাজ আদায় করতেন । অতঃপর তারা কুবা যেতেন। মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাসান বলেন যে, তারা রাতের এক তৃতীয়াংশে নামাজ আদায় করেই ঘুমাতেন। তাদের স্বল্প ঘুম যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ৩৫/১৭]

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ [١٩]

শানে নুযূল–১ : বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম ﷺ কোনো এক অভিযানে একটি ক্ষুদ্র দল প্রেরণ করেন। তারা আক্রমণ করে বিজয়ী হলেন এবং গনিমতের সম্পদও অর্জন করেন। অতঃপর কিছু লোকজন আসে। তখন সেই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ৩৮/১৭]

শানে নুযূল–২ : ছাওরী হাসান বিন মুহাম্মদ (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ কোনো এক অভিযানে একটি ক্ষুদ্রদল বা ছোট বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা গনিমত অর্জন করেন। অতঃপর রাসূল ﷺ-এর নিকট কিছু লোকজন আসে যারা যুদ্ধে উপস্থিত ছিল না। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।–[ইবনে কাছীর ২৩৫/৪]

সূরা যারিয়াতেও পূর্বেকার সূরা ক্বাফ-এর ন্যায় বেশির ভাগ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং ছওয়াব ও আজাব সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ - حُبُكٌ শব্দটি حَبِيْكَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ কাপড় বয়নে উদ্ভূত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও حُبُكٌ বলা হয়। অনেক তাফসীরবিদের মতে এস্থলে এই অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, পথবিশিষ্ট আকাশের কসম। পথ বলে এখানে ফেরেশতাদের যাতায়াতের পথ এবং তারকা ও নক্ষত্রের কক্ষপথ উভয়ই বুঝানো যেতে পারে।

বয়নে উদ্ভূত পাড় কাপড়ের শোভা ও সৌন্দর্যও হয়ে থাকে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে حُبُكٌ এর অর্থ নিয়েছেন শোভা ও সৌন্দর্য। আয়াতের অর্থ এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশের কসম। যে বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্যে এখানে কসম খাওয়া হয়েছে, তা এই إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ -বাহ্যতঃ এতে মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে বিভিন্নরূপ উক্তি করত এবং কখনো উন্মাদ, কখনো জাদুকর, কখনো কবি ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত। মুসলিম ও কাফের নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে এখানে সম্বোধন করার সম্ভাবনাও আছে; তখন বিভিন্ন রূপ উক্তির অর্থ হবে এই যে, তাদের মধ্যে কেউ তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে সত্যবাদী মনে করে এবং কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে। −[মাযহারী]

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ - أُفِكَ-এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। عَنْهُ -এর সর্বনামের দু'টি আলাদা আলাদা সম্ভাবনা আছে। (এক) এই সর্বনাম দ্বারা কুরআন ও রাসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কুরআন ও রাসূল থেকে সেই হতভাগাই মুখ ফেরায়, যার জন্যে বঞ্চনা অবধারিত হয়ে গেছে।

(দুই) এই সর্বনাম দ্বারা قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ (বিভিন্ন উক্তি) বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের বিভিন্নরূপ ও পরস্পর বিরোধী উক্তির কারণে সেই ব্যক্তি কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুখ ফেরায়, যে কেবল হতভাগ্য ও বঞ্চিত।

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ - خَرَّاصٌ -এর অর্থ অনুমানকারী, যে ব্যক্তি অনুমানের উপর ভিত্তি করে কথা বলে। এখানে সেই কাফের ও অবিশ্বাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা কোনো প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে মিথ্যাবাদীর দল বললেও অযৌক্তিক হবে না। এই বাক্যে তাদের জন্য অভিশাপের অর্থে বদদোয়া রয়েছে। −(মাযহারী) কাফেরদের আলোচনার পর কয়েক আয়াতেই মুমিন ও পরহেজগারদের আলোচনা করা হয়েছে।

ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ও তার বিবরণ : كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - يَهْجَعُونَ শব্দটি هُجُوعٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া। এখানে মুমিন পরহেজগারদের এই গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক জাগ্রত থাকে। ইবনে জারীর এই তাফসীর করেছেন। হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে তাই বর্ণিত আছে যে, পরহেজগারগণ রাত্রিতে জাগরণ ও ইবাদতের ক্লেশ স্বীকার করে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কাতাদাহ, মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন : এখানে مَا শব্দটি 'না' বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশে নামাজ ইত্যাদি ইবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোনো অংশে ইবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ পড়ে, হযরত আনাস ও আবুল আলিয়া (রা.)-এর মতে সেও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবূ জাফর বাকের (র.) বলেন : যে ব্যক্তি এশার নামাজের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে।−[ইবনে কাছীর]।

হযরত হাসান বসরী (র.)-এর বর্ণনামতে আহনাফ ইবনে কায়সের উক্তি এই : আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জান্নাতবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আমার চাইতে অনেক উচ্চে, উর্ধ্বে ও স্বতন্ত্র। আমার ক্রিয়াকর্ম তাদের মর্তবা পর্যন্ত পৌছে না। কারণ, তারা রাত্রিতে কম নিদ্রা যায় এবং ইবাদত বেশি করে। এরপর আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জাহান্নামবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং কিয়ামত অস্বীকার করে। আল্লাহর রহমতে আমি এগুলো থেকে মুক্ত। তাই তুলনা করার সময় আমার ক্রিয়াকর্ম না জান্নাতবাসীদের সীমা পর্যন্ত পৌছে এবং না আল্লাহর রহমতে জাহান্নামবাসীদের সাথে খাপ খায়। অতএব, জানা গেল ক্রিয়াকর্মের দিক দিয়ে আমার মর্তবা তাই, যা কুরআন পাক নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছে :

خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا –অর্থাৎ যারা ভালোমন্দ ক্রিয়াকর্ম মিশ্রিত করে রেখেছে। অতএব, আমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে কমপক্ষে এই সীমার মধ্যে থাকে। আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, বনী তামীমের জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে বলল : হে আবূ উসামা, আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদের জন্য যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ) আমরা নিজেদের মধ্যে তা পাই না। কারণ, আমরা রাত্রি বেলায় খুব কম জাগ্রত থাকি ও ইবাদত করি। আমার পিতা এর জবাবে বললেন :

طُوْبٰى لِمَنْ رَقَدَ اِذَا نَعِسَ وَاتَّقَى اللّٰهَ اِذَا اسْتَيْقَظَ তার জন্য সুসংবাদ, যে নিদ্রা আসলে নিদ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন জাগ্রত থাকে, তখন তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ করে না। –(ইবনে কাছীর)

উদ্দেশ্য এই যে, কেবল রাত্রিবেলায় অধিক জাগ্রত থাকলেই আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়া যায় না; বরং যে ব্যক্তি নিদ্রা যেতে বাধ্য হয় এবং রাত্রিতে অধিক জাগ্রত থাকে না, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, সে-ও ধন্যবাদের পাত্র।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَاَفْشُوا السَّلَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

লোক সকল! তোমরা মানুষকে আহার করাও, আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম কর এবং রাত্রিবেলায় তখন নামাজ পড়, যখন মানুষ নিদ্রামগ্ন থাকে। এভাবে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। –(ইবনে কাছীর)

রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার বরকত ও ফযিলত : وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ –অর্থাৎ, মুমিন পরহেজগারগণ রাত্রি শেষপ্রহরে গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। اَسْحَارٌ শব্দটি سَحَرٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ রাত্রির ষষ্ঠপ্রহর। এই প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনা করার ফজিলত অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে : وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ –সহীহ্ হাদীসের সব কয়টি কিতাবেই এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন। (কিন্তু কিভাবে বিরাজমান হন, তার স্বরূপ কেউ জানে না।) তিনি ঘোষণা করেন : কোনো তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবুল করব? কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব? –[ইবনে কাছীর]

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শেষপ্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনার আয়াতে সেইসব পরহেজগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বিবৃত করা হয়েছে যে, তারা রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় ক্ষমাপ্রার্থনা করার বাহ্যতঃ কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়। যারা সমগ্র রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করে, তারা শেষ রাত্রে কোনো গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

জবাব এই যে, তাঁরা আল্লাহ তা'আলা আধ্যাত্ম জ্ঞানে জ্ঞানী এবং আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা তাঁদের ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্যের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করেন না। তাই এই ত্রুটি ও অবহেলার কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। –[মাযহারী]

সদকা-খয়রাতকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ : وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বুঝানো হয়েছে, যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারো কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে। আয়াতে মুমিন-মুত্তাকীদের এই গুণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করার সময় কেবল ভিক্ষুক অর্থাৎ, স্বীয় অভাব প্রকাশকারীদেরকেই দান করে না; বরং যারা স্বীয় অভাব কারো কাছে প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে এবং তাদের খোঁজ-খবর নেয়।

বলাবাহুল্য, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন-মুত্তাকীগণ কেবল দৈহিক ইবাদত তথা নামাজ ও রাত্রি জাগরণ করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং আর্থিক ইবাদতেও অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ভিক্ষুকদের ছাড়া তারা এমন লোকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে, যারা ভদ্রতা রক্ষার্থে নিজেদের অভাব কাউকে জানায় না। কিন্তু কুরআন পাক এই আর্থিক ইবাদত وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, তারা যেসব ফকির ও মিসকিনকে দান করে, তাদের কাছে নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না; বরং এরূপ মনে করে দান করে যে, তাদের ধন-সম্পদে এই ফকিরদেরও অংশ ও হক আছে এবং হকদারকে তার হক দেওয়া কোনো অনুগ্রহ হতে পারে না; বরং এতে স্বীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার সুখ রয়েছে।

বিশ্বচরাচর ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলি রয়েছে : وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ -অর্থাৎ, বিশ্বাসকারীদের জন্যে পৃথিবীতে কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে। (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে কাফেরদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে।) অতঃপর মুমিন পরহেজগারদের অবস্থা, গুণাবলি ও উচ্চ মর্তবা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আবার কাফের ও কিয়ামত অবিশ্বাসকারীদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার এবং আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলি তাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে অস্বীকারে বিরত হওয়ার নির্দেশ দান করা হচ্ছে। অতএব, এই বাক্যের সম্পর্ক পূর্বোল্লিখিত اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ বাক্যের সাথে রয়েছে, যাতে কুরআন ও রাসূলকে অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে একেও মুমিন-মুত্তাকীদেরই গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং مُوْقِنِيْنَ -এর অর্থ আগের مُتَّقِيْنَ- -ই করা হয়েছে। এতে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা পৃথিবী ও আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলিতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়; যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

পৃথিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগ-বাগিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ, এক একটি পত্রের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ার হাজারো বৈচিত্র্য রয়েছে। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠে নদীনালা কূপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিগুহা রয়েছে। মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হেকমতের এত বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন।

وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ –এস্থলে নিদর্শনাবলির বর্ণনার আকাশ ও শূন্য জগতের সৃষ্টবস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে : ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠের সৃষ্টবস্তুও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক একটি অঙ্গকে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের এক একটি পুস্তক দেখতে পাবে। তোমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান হয়েছে। একারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে আল্লাহ তা'আলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

কিভাবে একফোঁটা বীর্য বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সূক্ষ্ম উপাদানের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্য থেকে একটি জমাট রক্ত তৈরি হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয়? এরপর কিভাবে তাতে অস্থি তৈরি করা হয় এবং অস্থিকে মাংস পরানো হয়? অতঃপর কিভাবে এই নিষ্প্রাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়ার আলো বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন সুধী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কিভাবে মানুষের আকার-আকৃতিকে বিভিন্নরূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিগোচর হয়? এই কয়েক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র্য রাখার সাধ্য আর কার আছে? এরপর মানুষের মন ও মেজাজের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একত্ব সেই আল্লাহ তা'আলারই কুদরতের লীলা, যিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ।

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষ বাইরে ও দূরে নয়-স্বয়ং তার অস্তিত্বের মধ্যেই দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহ তা'আলাকে সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে, তাকে অন্ধ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় নেই। একারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা কি দেখ না? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেশি জ্ঞানবুদ্ধি দরকার হয় না, দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ –অর্থাৎ, আকাশে তোমাদের রিজিক ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তাফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ "লাওহে-মাহফুযে" লিপিবদ্ধ থাকা। বলাবাহুল্য প্রত্যেক মানুষের রিজিক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম সবই লওহে-মাহফূজে লিপিবদ্ধ আছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার নির্ধারিত রিজিক থেকে বেঁচে থাকার ও পলায়ন করারও চেষ্টা করে তবে রিজিক তার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড় দিবে। মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে যেমন আত্মরক্ষা করতে পারে না, তেমনি রিজিক থেকেও পলায়ন সম্ভবপর নয়। –(কুরতুবী)

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : এখানে রিজিক অর্থ বৃষ্টি এবং আকাশ বলে শূন্য জগৎসহ উর্ধ্বজগৎ বুঝানো হয়েছে। ফলে মেঘমালা থেকে বর্ষিত বৃষ্টিকেও আকাশের বস্তু বলা যায়। مَا تُوعَدُونَ বলে জান্নাত ও তার নিয়ামতরাজি বুঝানো হয়েছে।

إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ –অর্থাৎ, তোমরা যেমন নিজেদের কথাবার্তা বলার মাধ্যমে কোনো সন্দেহ করো না, কিয়ামতের আগমনও তেমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা বলাকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এই যে, উপরিউক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগব্যাধি ইত্যাদির কারণে ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত লাগে, কিন্তু বাকশক্তিতে কখনো কোনো ধোঁকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। –[কুরতুবী]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ আলোচ্য আয়াত থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্ত্বনার জন্যে অতীত যুগের কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ –ফেরেশতাগণ বলেছিল سَلَامًا হযরত ইবরাহীম (আ.) জওয়াবে বললেন سَلَامٌ কেননা এতে সার্বক্ষণিক শান্তির অর্থ নিহিত রয়েছে। কুরআন পাকে নির্দেশ আছে, সালামের জওয়াব সালামকারী ভাষা অপেক্ষা উত্তম ভাষায় দাও। হযরত ইবরাহীম (আ.) এভাবে সেই নির্দেশ পালন করলেন।

مُنْكَرٌ - قَوْمٌ مُنْكَرُونَ শব্দের অর্থ অপরিচিত। ইসলামে গোনাহের কাজও অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গোনাহকেও مُنْكَرٌ বলে দেওয়া হয়। বাক্যের অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদেরকে চিনতে পারেননি। তাই মনে মনে বললেন : এরা তো অপরিচিত লোক। এটাও সম্ভবপর যে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে শুনিয়েই একথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা।

فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ - رَاغَ শব্দটি رَوْغٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ গোপনে চলে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্যে এভাবে গৃহে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের পায়নি। নতুবা তারা একাজে বাধা দিত।

মেহমানদারির উত্তম রীতিনীতি : ইবনে কাছীর বলেন, এই আয়াতে মেহমানদারির কতিপয় উত্তম রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথম এই যে, তিনি প্রথমে মেহমানদেরকে আহার্য আনার কথা জিজ্ঞাসা করেন নি; বরং চুপিসারে গৃহে চলে গেলেন। অতঃপর অতিথি আপ্যায়নের জন্য তাঁর কাছে যে উত্তম বস্তু অর্থাৎ গোবৎস ছিল, তাই জবেহ করলেন এবং ভাজা করে নিয়ে এলেন। দ্বিতীয়ত, আনার পর তা খাওয়ার জন্য মেহমানদেরকে ডাকলেন না; বরং তারা যেখানে উপবিষ্ট ছিল, সেখানে এনে সামনে রেখে দিলেন। তৃতীয়ত, আহার্য বস্তু পেশ করার সময় কথাবার্তার ভঙ্গিতে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি ছিল না। বরং বলেছেন أَلَا تَأْكُلُونَ -অর্থাৎ তোমরা কি খাবে না এতে ইঙ্গিত ছিল যে, খাওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও আমার খাতিরে কিছু খাও।

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ –অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের না খাওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করতে লাগলেন। কেননা তখন ভদ্র সমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না, কিছু আহার্য গ্রহণ করত। কোনো মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী শত্রু বলে আশঙ্কা করা হতো। সেই যুগের চোর-ডাকাতদেরও এতটুকু ভদ্রতা জ্ঞান ছিল যে, তারা যার বাড়িতে কিছু খানা খেত, তার ক্ষতিসাধন করত না। তাই না খাওয়া বিপদাশঙ্কার কারণ ছিল।

صَرَّةٌ - فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ -এর অর্থ অসাধারণ আওয়াজ। কলসের শব্দকে صَرِيْرٌ বলা হয়। হযরত সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পুত্র-সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিচ্ছে, আর একথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান-স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে; তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল। তিনি বললেন : عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ অর্থাৎ, প্রথমতঃ আমি বৃদ্ধা, এরপর বন্ধ্যা। যৌবনেও আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না। এখন বার্ধক্যে এটা কিরূপে সম্ভব হবে? জবাবে ফেরেশতাগণ বললেন : كَذٰلِكِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন। এ কাজও এমনিভাবেই হবে। এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক (আ.) জন্মগ্রহণ করেন, তখন হযরত সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বয়স একশত বছর ছিল।–[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلذّٰرِيٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার ذَرْوًا মূলবর্ণ (ذ - ر - و) জিনস ناقص يائى অর্থ প্রবল বাতাস। ঝঞ্ঝাবায়ু।

اَلْجٰرِيٰتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার جَرْىٌ মূলবর্ণ (ج - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ নৌকাসমূহ।

تُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমাদের প্রতি শ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

اَلْحُبُكُ : বহুবচন। হয়ত حَبِيْكَةٌ -এর বহুবচন। যেমন, طَرِيْقَةٌ -এর বহুবচন طُرُقٌ আসে অথবা حُبَاكٌ - এর বহুবচন; যেমন, مثال -এর বহুবহন مثل আসে। উভয়ের অর্থ, নক্ষত্রের রাস্তা। (গ্রহের কক্ষপথ)।

يُؤْفَكُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اِفْكٌ মূলবর্ণ (ا - ف - ك) জিনস مهموز فاء অর্থ নিরস্ত থাকে।

سَاهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার سَهْوٌ মূলবর্ণ (س - ه - و) জিনস ناقص واوى অর্থ বিভ্রান্ত হয়ে আছে।

يُفْتَنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنٌ মূলবর্ণ (ف - ت - ن) জিনস صحيح অর্থ তাপানো হবে।

يَهْجَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার هُجُوْعٌ মূলবর্ণ (ه - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ ঘুমাতো, নিদ্রা মগ্ন থাকত।

قَرَّبَهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার تَقْرِيْبٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ সম্মুখে রাখলেন। নিকটবর্তী করলেন।

لَا تَخَفْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَوْفٌ মূলবর্ণ (خ - و - ف) জিনস اجوف واوى অর্থ আপনি ভয় করবেন না।

صَكَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَكٌّ মূলবর্ণ (ص - ك - ك) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ হাত মারলেন।

اَلْحٰمِلٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحَمْلُ মূলবর্ণ (ح - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– বহনকারী।

اَلْمُقَسِّمٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث اسم فاعل বহছ বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْسِيْم মূলবর্ণ (ق ـ س ـ م) জিনস صحيح অর্থ– বণ্টনকারী এখানে উদ্দেশ্য সেই সকল ফেরেশতাগণ যারা (বস্তু সমূহ) বণ্টন করে।

اُفِكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اِفْكٌ মূলবর্ণ (ا ـ ف ـ ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– বিরত থাকতে চায়।

خَرّٰصُوْنَ : اسم مبالغه ـ خَرَّاصٌ -এর বহুবচন, বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার خَرْصًا মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ص) জিনস صحيح অর্থ– ভিত্তিহীন উক্তিকারীর।

ذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– স্বাদ উপভোগ কর।

تَسْتَعْجِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعْجَالُ মূলবর্ণ (ع ـ ج ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাড়া হুড়া করতে।

تَنْطِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنُّطْقُ মূলবর্ণ (ن ـ ط ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের কথা বার্তা বলা।

اَلْمُكْرَمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِكْرَامُ মূলবর্ণ (ك ـ ر ـ م) জিনস صحيح অর্থ– সম্মানিত।

رَاغَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَوْغٌ ـ رَوْغَانٌ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ غ) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি চলে গেলেন।

اَوْجَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْجَاسٌ মূলবর্ণ (و ـ ج ـ س) জিনস مثال واوى অর্থ– ভীত হয়ে পড়লেন, শংকিত হওয়া।

بَشَّرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তাঁরা সুসংবাদ দিলেন।

اَقْبَلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْبَالُ মূলবর্ণ (ق ـ ب ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তিনি আসলেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا : এখানে واو টি হরফে জার যা কসমের জন্য হয়েছে। اَلذّٰرِيٰتِ হলো মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উহ্য ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক হয়েছে। আর তা হলো اُقْسِمُ আর ذَرْوًا হলো مفعول مطلق এবং এর আমেল হলো اسم فاعل আর মাফউলে বিহী উহ্য রয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৮৪]

পারা : ২৭

অনুবাদ	আয়াত
৩১. ইবরাহীম বলতে লাগলেন, হে ফেরেশতাগণ! তবে তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কি?	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾
৩২. ফেরেশতাগণ বললেন, আমরা একটি অপরাধী [লূত] সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।	قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾
৩৩. যেন আমরা তাদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা বর্ষণ করি।	لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. যার উপর সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট চিহ্নও রয়েছে।	مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾
৩৫. তখন আমি সেখান থেকে সমস্ত মুমিনদেরকে সরিয়ে দিলাম।	فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾
৩৬. ফলতঃ আমি সেখানে মুসলমানদের একটি গৃহ ব্যতীত অন্য কোনো গৃহ পাইনি।	فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾
৩৭. আর আমি এ ঘটনার মধ্যে একটি উপদেশ রেখেছি, সেই লোকদের জন্য যারা যন্ত্রণাময় আজাবকে ভয় করে।	وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর মূসার কাহিনীর মধ্যেও উপদেশ রয়েছে, যখন আমি তাকে ফেরাউনের নিকট একটি প্রকাশ্য প্রমাণ দিয়ে পাঠালাম।	وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. قَالَ ইবরাহীম বলতে লাগলেন فَمَا خَطْبُكُمْ তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কি أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ হে ফেরেশতাগণ!

৩২. قَالُوا ফেরেশতাগণ বললেন إِنَّا أُرْسِلْنَا আমরা প্রেরিত হয়েছি إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ একটি অপরাধী (লূত) সম্প্রদায়ের প্রতি।

৩৩. لِنُرْسِلَ যেন আমরা বর্ষণ করি عَلَيْهِمْ তাদের উপর حِجَارَةً مِنْ طِينٍ মাটির শক্ত ঢেলা।

৩৪. مُسَوَّمَةً যার উপর নির্দিষ্ট চিহ্নও রয়েছে عِنْدَ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে لِلْمُسْرِفِينَ সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য।

৩৫. فَأَخْرَجْنَا তখন আমি সরিয়ে দিলাম مَنْ كَانَ فِيهَا সেখান থেকে مِنَ الْمُؤْمِنِينَ সমস্ত মুমিনদেরকে।

৩৬. فَمَا وَجَدْنَا ফলত: আমি পাইনি فِيهَا সেখানে غَيْرَ بَيْتٍ একটি গৃহ ব্যতীত অন্য কোনো গৃহ مِنَ الْمُسْلِمِينَ মুসলমানদের।

৩৭. وَتَرَكْنَا فِيهَا আর আমি এ ঘটনার মধ্যে রেখেছি آيَةً একটি উপদেশ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ সেই লোকদের জন্য যারা ভয় করে الْعَذَابَ الْأَلِيمَ যন্ত্রণাময় আজাবকে।

৩৮. وَفِي مُوسَىٰ আর মূসার কাহিনীর মধ্যেও উপদেশ রয়েছে। إِذْ أَرْسَلْنَاهُ যখন আমি তাঁকে পাঠালাম إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের নিকট بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ একটি প্রকাশ্য প্রমাণ দিয়ে।

৩৯. তখন সে তার সভাসদবৃন্দ সহকারে অবাধ্যতা প্রদর্শন করল এবং বলতে লাগল, এ ব্যক্তি জাদুকর অথবা পাগল।	فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٣٩﴾
৪০. ফলে আমি তাকেও তার সৈন্য সামন্তকে ধরে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করলাম, আর সে কাজই করেছিল তিরস্কারের।	فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿٤٠﴾
৪১. আর আ'দ সম্প্রদায়ের ঘটনার মধ্যেও উপদেশ রয়েছে, যখন আমি তাদের উপর অশুভ ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করলাম।	وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿٤١﴾
৪২. তা যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতো তাকে এমন করে ছাড়ত, যেমন কোনো বস্তু চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।	مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ﴿٤٢﴾
৪৩. আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ঘটনার মধ্যেও উপদেশ রয়েছে, যখন [সালেহ (আ.) কর্তৃক] তাদেরকে বলা হলো যে, আরো কিছুদিন উপভোগ করে নাও।	وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. তথাপি তারা স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল, ফলে আজাব তাদেরকে পাকড়াও করল এবং তারা [তা] দেখছিল।	فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. অনন্তর তারা দাঁড়াতেও সক্ষম হলো না এবং প্রতিরোধ করতেও পারল না।	فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ তখন সে তার সভাসদবৃন্দ সহকারে অবাধ্যতা প্রকাশ করল وَقَالَ এবং বলতে লাগল سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ এই ব্যক্তি জাদুকর অথবা পাগল।

৪০. فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ ফলে আমি তাকে ও তার সৈন্য সামন্তকে ধরে فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করলাম وَهُوَ مُلِيْمٌ আর সে কাজই করেছিল তিরস্কারের।

৪১. وَفِىْ عَادٍ আর আদ সম্প্রদায়ের ঘটনার মধ্যেও উপদেশ রয়েছে اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ অশুভ ঝঞ্ঝা বায়ু।

৪২. مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ তা যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতো তাকে এমন করে ছাড়ত كَالرَّمِيْمِ যেমন কোনো বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

৪৩. وَفِىْ ثَمُوْدَ আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ঘটনার মধ্যেও উপদেশ রয়েছে اِذْ قِيْلَ لَهُمْ যখন তাদেরকে বলা হলো تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ আরো কিছুদিন উপভোগ করে নাও।

৪৪. فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ তথাপি তারা স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ ফলে আজাব তাদেরকে পাকড়াও করল وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ এবং তারা (তা) দেখছিল।

৪৫. فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ অনন্তর তারা দাড়াতেও সক্ষম হলো না وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ এবং প্রতিশোধ নিতেও পারল না।

৪৬. আর তাদের পূর্বে নূহ সম্প্রদায়ের এরূপ অবস্থাই হয়েছিল। তারা বড়ই অবাধ্য সম্প্রদায় ছিল।	وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর আমি আসমানকে [নিজ] কুদরতে সৃষ্টি করেছি, আর আমিই বিশাল ক্ষমতাশালী।	وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর আমি জমিনকে বিছানা [স্বরূপ] বানিয়েছি, ফলতঃ আমি [কেমন] উত্তম বিস্তারকারী।	وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আর আমি প্রত্যেক বস্তু দুই দুই প্রকারের সৃষ্টি করেছি। যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার।	وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾
৫০. সুতরাং [তাদেরকে বলে দিন] তোমরা আল্লাহরই দিকে ধাবিত হও; আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।	فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾
৫১. আর আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য স্থির করো না; আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।	وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾
৫২. এরূপভাবেই যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে তাদের নিকট এমন কোনো রাসূল আগমন করেননি, যাকে তারা জাদুকর অথবা উন্মাদ বলেনি।	كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ আর তাদের পূর্বে নূহ সম্প্রদায়ের এরূপ অবস্থাই হয়েছিল إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ তারা বড়ই অবাধ্য সম্প্রদায় ছিল।

৪৭. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ আর আমি আসমানকে নিজ কুদরতে সৃষ্টি করেছি وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ আর আমিই বিশাল ক্ষমতাশালী।

৪৮. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا আর আমি জমিনকে বিছানা (স্বরূপ) বানিয়েছি فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ফলত: আমি (কেমন) উত্তম বিস্তারকারী।

৪৯. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ আর প্রত্যেক বস্তু خَلَقْنَا আমি সৃষ্টি করেছি زَوْجَيْنِ দুই দুই প্রকারের لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার।

৫০. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ সুতরাং (তাদেরকে বলে দিন) তোমরা আল্লাহরই দিকে ধাবিত হও إِنِّي لَكُمْ আমি তোমাদের জন্য مِنْهُ আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে نَذِيرٌ مُبِينٌ প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।

৫১. وَلَا تَجْعَلُوا আর স্থির করো না مَعَ اللَّهِ আল্লাহর সাথে إِلَٰهًا آخَرَ অন্য উপাস্য إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।

৫২. كَذَٰلِكَ এরূপভাবেই مَا أَتَى আগমন করেননি الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ এদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে مِنْ رَسُولٍ তাদের নিকট এমন কোনো রাসূল إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ যাকে তারা জাদুকর বা উন্মাদ বলেনি।

৫৩. তারা কি একে অন্যকে তারই অসিয়ত করে আসছিল? বরং তারা সকলেই অবাধ্যপরায়ণ লোক।	أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾
৫৪. অতএব, আপনি তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না, এতে আপনার প্রতি কোনো প্রকার অনুযোগ নেই।	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ উপদেশ দেওয়া মুমিনগণকে সুফ প্রদান করে।	وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾
৫৬. আর আমি জিন ও মানুষকে এ জন্য সৃষ্টি করেছি, যেন তারা আমারই ইবাদত করে।	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾
৫৭. আমি তাদের নিকট [অন্যান্য সৃষ্টজীবকে] রিজিক দেওয়ার আবেদনও করি না, আর তাও ইচ্ছা করি না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।	مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾
৫৮. আল্লাহ নিজেই সকলের রিজিকদাতা [এবং তিনি] শক্তিশালী, অত্যন্ত ক্ষমতাবান।	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾
৫৯. অতএব, [এ কাফেররা শুনে রাখুক যে,] এ জালিমদেরও [শাস্তির] পালা রয়েছে, যেমন তাদের [পূর্ববর্তী] সহধর্মীদের পালা ছিল, সুতরাং তারা যেন আমা হতে [আজাবের ব্যাপারে] তাড়াহুড়া না করে।	فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾
৬০. মোটকথা, সেই দিনের আগমনে এ কাফেরদের বড়ই সর্বনাশ হবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।	فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. أَتَوَاصَوْا بِهِ তারা কি একে অন্যকে তারই অসিয়ত করে আসছিল بَلْ هُمْ বরং তারা সকলেই قَوْمٌ طَاغُونَ অবাধ্যপরায়ণ লোক।

৫৪. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ অতএব, আপনি তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ কেননা আপনার প্রতি কোনো প্রকার অনুযোগ নেই।

৫৫. وَذَكِّرْ আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ যেহেতু আপনার উপদেশ দেওয়া تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করবে।

৫৬. وَمَا خَلَقْتُ আর আমি এজন্য সৃষ্টি করেছি الْجِنَّ وَالْإِنسَ জিন ও মানুষকে إِلَّا لِيَعْبُدُونِ যেন তারা আমারই ইবাদত করে।

৫৭. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ আমি তোমাদের নিকট রিজিক দেওয়ার আবেদনও করি না وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ আর ইচ্ছাও করি না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।

৫৮. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ আল্লাহ নিজেই সকলের রিজিকদাতা ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ শক্তিশালী, অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

৫৯. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا এই জালিমদেরও রয়েছে ذَنُوبًا (শাস্তির) পালা مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ যেমন তাদের (পূর্ববর্তী) সহধর্মীদের পালা ছিল فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ সুতরাং তারা যেন আমা হতে (আজাবের ব্যাপারে) তাড়াহুড়া না করে।

৬০. فَوَيْلٌ মোটকথা বড়ই সর্বনাশ হবে لِّلَّذِينَ كَفَرُوا এই কাফেরদের জন্য مِن يَوْمِهِمُ সেই দিনের আগমনে الَّذِي يُوعَدُونَ যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ (৫৫)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম (র.) প্রমুখ হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওজহাহু এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُوْمٍ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন আমাদের সকলেরই ধ্বংস অনিবার্য বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নিয়েছি, হঠাৎ করে নবী করীম ﷺ আদেশপ্রাপ্ত হলেন, তিনি আমাদের হতে বিমুখ হয়ে যাওয়ার জন্যে। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। কাতাদা (র.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম ধারণা করেছিলেন যে, ওহী নিশ্চিতভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর আজাব ও অবশ্যই অত্যাসন্ন বা সন্নিকটে হয়ে পড়েছে। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। জিহাদের আয়াত দ্বারা আলোচ্য আয়াতের আদেশ রহিত করা হয়েছে।—(রূহুল মা'আনী ২০/১৪/২৭)

এই কথোপকথনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ আল্লাহর ফেরেশতা। অতএব, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি অভিযানে আগমন করেছেন? তারা হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আজাব নাজিল করার কথা বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দ্বারা নয়–মাটি নির্মিত কংকর দ্বারা হবে। مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ অর্থাৎ, কংকরগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ চিহ্নযুক্ত হবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক কংকরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্যে কংকরটি প্রেরিত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে। অন্যান্য আয়াতে কওমে–লূতের উপর আপতিত আজাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) গোটা জনপদকে উপরে তুলে উল্টিয়ে দেন। অর্থাৎ প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং পরে সমগ্র ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কওমে লূতের পর হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়, ফেরাউন এবং তার অনুসারীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরাউনকে যখন হযরত মূসা (আ.) সত্যের পয়গাম দেন, তখন বলা হয়েছে ঃ فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ অর্থাৎ, ফেরাউন হযরত হযরত মূসা (আ.)-এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনাবাহিনী ও পারিষদবর্গের উপর ভরসা করে। رُكْن-এর শাব্দিক অর্থ শক্তি। হযরত লূত (আ.) -এর বাক্যে أَوْ اٰوِيْ إِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ :

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কেয়ামত ও পরকালের বর্ণনা এবং অস্বীকারকারীদের শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় শক্তি বর্ণিত হয়েছে। এতে করে কেয়ামত ও কেয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তার নিরসন হয়ে যায়। এছাড়া আয়াতসমূহে তাওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং রেসালতে বিশ্বাস স্থাপনের তাকীদ হয়েছে।

بَنَيْنٰهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ : أَيْد শব্দের অর্থ– শক্তি ও সামর্থ্য। এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ তাফসীরই করেছেন। فَفِرُّوْا إِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গোনাহ থেকে ছুটে পালাও। আবূ বকর ওয়াররাক ও জুনায়েদ বাগদাদী (র.) বলেন ঃ প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে গোনাহের দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা এগুলো থেকে ছুটে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। –(কুরতুবী)

জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এখানে বাহ্যদৃষ্টিতে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। যথা– ১. যাকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তার জন্যে সেই কাজ থেকে বিরত থাকা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব, অপ্রকৃত। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিপরীতে কোনো কাজ করা অসম্ভব। ২. আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব সৃষ্টিকে কেবল ইবাদতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের সৃষ্টিতে ইবাদত ব্যতীত আরও অনেক উপকারিতা ও রহস্য বিদ্যমান আছে।

প্রথম প্রশ্নের জবাবে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, এই বিষয়বস্তু শুধু মুমিনদের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি মুমিন জিন ও মুমিন মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। বলাবাহুল্য যারা মুমিন, তারা কমবেশি ইবাদত করে থাকে। যাহহাক, সুফিয়ান (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এই উক্তি করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত এই আয়াতে এক কেরাতে مُؤْمِنِيْنَ শব্দও উল্লেখ করা হয়েছে এবং আয়াত এভাবে পাঠ করা হয়েছে– وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ; এই কেরাত থেকে উপরিউক্ত তাফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের

জবাবে বলা হয়েছে যে, আয়াতে জবরদস্তিমূলক ইচ্ছা বোঝানো হয়নি, যার বিপরীত হওয়া অসম্ভব; বরং আইনগত ইচ্ছা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে কেবল এজন্যে সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে ইবাদত করার আদেশ দেই। আল্লাহর আদেশকে মানুষের ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত রাখা হয়েছে। তাই আদেশের বিপরীত হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ সবাইকে ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন; কিন্তু সাথে সাথে ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্ষমতাও দিয়েছেন। তাই কোনো কোনো লোক আল্লাহপ্রদত্ত ইচ্ছা যথার্থ ব্যয় করে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং কেউ এই ইচ্ছার অসদ্ব্যবহার করে ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই উক্তি ইমাম বগভী (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে এর সরল তাফসীর এই বর্ণিত হয়েছে যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার সময় তাদের মধ্যে ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। সেমতে প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে এই প্রতিভা প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে। এরপর কেউ এই প্রতিভাকে সঠিক পথে ব্যয় করে কৃতকার্য হয় এবং কেউ একে গোনাহ ও কুপ্রবৃত্তিতে বিনষ্ট করে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ অর্থাৎ, প্রত্যেক সন্তান প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে ইহুদি অথবা, নাসারা বা অগ্নিপূজারীতে পরিণত করে। অধিকাংশ আলেমের মতে "প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ" করার অর্থ ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করা। অতএব এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগতভাবে ইসলাম ও ঈমানের যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। এরপর তার পিতা-মাতা এই প্রতিভাকে বিনষ্ট করে কুফরের পথে পরিচালিত করে। এই হাদীসের অনুরূপ আলোচ্য আয়াতেরও এরূপ অর্থ হতে পারে যে, প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইবাদত করার গোত্যতা ও প্রতিভা রেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব এই যে, ইবাদতের জন্যে কাউকে সৃষ্টি করা তার কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়ার পরিপন্থি নয়। مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোনো উপকার চাই না যে, তারা রিজিক সৃষ্টি করবে আমার জন্যে অথবা নিজেদের জন্যে অথবা আমার অন্যান্য সৃষ্টজীবের জন্যে। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই কথাগুলো বলা হয়েছে। কেননা যত বড়লোকই হোক না কেন– কেউ যদি কোনো গোলাম ক্রয় করে এবং তার পিছনে অর্থ-কড়ি ব্যয় করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, গোলাম তার কাজকর্মের প্রয়োজন মেটাবে এবং রুজি–রোজগার করে মালিকের হাতে সমর্পণ করবে। আল্লাহ তা'আলা এসব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে আমার কোনো উপকার উদ্দেশ্য নয়।

ذَنُوْبًا শব্দের আসল অর্থ– কূয়া থেকে পানি তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ কূয়াগুলোতে পানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ذَنُوْبٌ শব্দের অর্থ করা হয়েছে পালা ও প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে নিজ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পালা দেওয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পালায় কাজ করেনি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুশরিকদের জন্যেও পালা ও সময় নির্ধারিত আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুফর থেকে বিরত না হয়, তবে আল্লাহর আজাব তাদেরকে দুনিয়াতে না হয় পরকালে অবশ্যই পাকড়াও করবে। তাই তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন ত্বরিত আজাব চাওয়া থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ কাফেররা অস্বীকারের ভঙ্গিতে বলে থাকে যে, আমরা বাস্তবিকই অপরাধী হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের উপর আজাব আসে না কেন? এর জবাব এই যে, আজাব নির্দিষ্ট সময় ও পালা অনুযায়ী আগমন করবে। তোমাদের পালাও এসে যাবে!। কাজেই তাড়াহুড়া করো না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْمُرْسَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْسَالُ মূলবর্ণ (ر - س - ل) জিনস صحيح অর্থ– প্রেরিতগণ। ফেরেশতাগণ।

مُجْرِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِجْرَامُ মূলবর্ণ (ج - ر - م) জিনস صحيح অর্থ– অপরাধীগণ।

مُسَوَّمَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْوِيْمُ মূলবর্ণ (س - و - م) জিনস اجوف واوى। অর্থ– নির্দিষ্ট চিহ্ন। কোনো বস্তুর সন্ধানে যাওয়া।

مَا وَجَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِجْدَانُ মূলবর্ণ (و - ج - د) জিনস مثال واوى অর্থ– পাইনি।

مُبِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبَانَةُ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– প্রকাশ্য।

مَجْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْجُنُوْنُ ـ اَلْجَنُّ মূলবর্ণ (ج - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পাগল।

اَلرَّمِيْمُ : صفت مشبه ـ رمة থেকে নির্গত। رِمَامٌ ও اَرْمَامٌ-এর একবচন বাব ضَرَبَ অর্থ– চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া বস্তু।

تَمَتَّعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّمَتُّعُ মূলবর্ণ (م - ت - ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা উপভোগ করে নাও।

مُنْتَصِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْتِصَارُ মূলবর্ণ (ن - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– প্রতিরোধকারীগণ।

بَنَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ ـ نَصَرَ মাসদার بِنَاءٌ মূলবর্ণ (ب - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমরা সৃষ্টি করেছি।

مُوْسِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْسَاعُ মূলবর্ণ (و - س - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– ক্ষমতাশালীগণ।

مَاهِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَهْدُ মূলবর্ণ (م - ه - د) জিনস صحيح অর্থ– বিস্তারকারীগণ।

تَوَاصَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَوَاصِىٌ মূলবর্ণ (و - ص - ى) জিনস মুরাক্কাব (مثال واوى ও ناقص يائى) অর্থ– তারা একে অন্যকে অসিয়ত করে আসছিল।

طَاغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل মূলত: طَاغِيُوْنَ ছিল। বাব فَتَحَ মাসদার اَلطُّغْيَانُ মূলবর্ণ (ط - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অবাধ্যপরায়ণ।

يُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

مُلِيْمٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বা اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاَمَةُ মূলবর্ণ (ا - ل - م) জিনস مهموز فاء অর্থ– তিরস্কারকারী, ভর্ৎসনাকারী।

عَتَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُتُوُّ মূলবর্ণ (ع - ت - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– অবাধ্যতা করেছে, ঔদ্ধত্য করেছে, অহংকার করেছে, সীমা অতিক্রম করেছে।

اِسْتَطَاعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– অক্ষম হলো না।

فَرَشْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفَرْشُ মূলবর্ণ (ف - ر - ش) জিনস صحيح অর্থ– আমি বিছানা বানিয়েছি।

يُوْعَدُوْنَ সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ– প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ : এখানে فاء টি হরফে আতফ, تَوَلّٰى ফে'লে মাযী তার উহ্য যমীর ফায়েল যা ফেরাউনের দিকে ফিরেছে। আর بِرُكْنِهٖ টা ফায়েলের যমীর থেকে حال হয়েছে। আর قَالَ টা تَوَلّٰى-এর উপর আতফ হয়েছে। আর سَاحِرٌ হলো উহ্য মুবতাদার খবর। অর্থাৎ هُوَ سَاحِرٌ আর او হলো হরফে আতফ এবং مَجْنُوْنٌ টা سَاحِرٌ-এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ২৯২]

سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা তূর

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪৯, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. শপথ তূর পর্বতের।	وَالطُّوْرِ ﴿١﴾
২. আর সেই লিখিত কিতাবের।	وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ﴿٢﴾
৩. যা খোলা কাগজে রয়েছে [অর্থাৎ আমলনামার]	فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ﴿٣﴾
৪. আর বায়তুল মা'মূরের।	وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ﴿٤﴾
৫. আর সুউচ্চ ছাদের [অর্থাৎ আসমানের]।	وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ﴿٥﴾
৬. আর লবণাক্ত সমুদ্রের যা [পানিতে] পরিপূর্ণ।	وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ﴿٦﴾
৭. নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের আজাব অবশ্যই সংঘটিত হবে।	اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾
৮. তাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।	مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾
৯. যেদিন আসমান প্রবলভাবে থর থর করতে থাকবে।	يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ﴿٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالطُّوْرِ শপথ তূর পর্বতের। ২. وَكِتٰبٍ আর সেই কিতাবের مَّسْطُوْرٍ যা লিখিত।

৩. فِيْ رَقٍّ যা আছে কাগজে مَّنْشُوْرٍ খোলা। ৪. وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ আর বায়তুল মা'মূরের।

৫. وَالسَّقْفِ আর ছাদের الْمَرْفُوْعِ সুউচ্চ (আসমানের) ৬. وَالْبَحْرِ আর লবণাক্ত সমুদ্রের الْمَسْجُوْرِ যা পানিতে পরিপূর্ণ।

৭. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের আজাব لَوَاقِعٌ অবশ্যই সংঘটিত হবে।

৮. مَا لَهٗ তাকে কেউই مِنْ دَافِعٍ টলাতে পারবে না। ৯. يَّوْمَ যেদিন تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا আসমান থরথর করতে থাকবে।

১০. আর পর্বতসমূহ দ্রুত স্থানচ্যুত হবে [কিয়ামত হবে]।	وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾
১১. অনন্তর সেদিন তাদের বড় দুর্ভাগ্য হবে, যারা অবিশ্বাসী ছিল।	فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾
১২. যারা [মিথ্যা প্রতিপন্ন করার] কাজে অনর্থকভাবে লিপ্ত রয়েছে।	الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. যেদিন তাদেরকে ঠেলে ঠেলে দোজখের আগুনের দিকে আনা হবে।	يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾
১৪. [এবং বলা হবে] এটা সে দোজখ যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।	هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. তবে এটা [-ও] কি জাদু? [স্বচক্ষে দর্শন করে বল,] অথবা [এখনো] তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।	اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. [আচ্ছা, তবে এখন] তাতে প্রবেশ কর, অতঃপর চাই তোমরা সহ্য কর অথবা সহ্য না কর, উভয়ই তোমাদের পক্ষে সমান; যেমন তোমরা করতে তেমনই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হবে।	اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. [আর] মুত্তাকীগণ নিঃসন্দেহে জান্নাতের উদ্যানসমূহ ও সুখ-সম্পদের মধ্যে থাকবে।	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ﴿١٧﴾
১৮. [এবং] তাদের প্রভু তাদেরকে যে সমস্ত বস্তু দান করবেন, তারা তাতে আনন্দিত হবে এবং তাদের প্রভু তাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করবেন।	فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا আর পর্বতসমূহ দ্রুত স্থানচ্যুত হবে।

১১. فَوَيْلٌ অনন্তর বড় দুর্ভাগ্য হবে তাদের يَّوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِيْنَ যারা অবিশ্বাসী ছিল।

১২. الَّذِيْنَ هُمْ যারা فِيْ خَوْضٍ (মিথ্যা প্রতিপন্ন করার) কাজে লিপ্ত আছে يَّلْعَبُوْنَ অনর্থকভাবে।

১৩. يَوْمَ যেদিন يُدَعُّوْنَ তাদেরকে আনা হবে اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ দোজখের আগুনের দিকে دَعًّا ঠেলে ঠেলে।

১৪. هٰذِهِ النَّارُ (এবং বলা হবে) এটা সেই দোজখ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

১৫. اَفَسِحْرٌ هٰذَا তবে এটা কি জাদু اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ অথবা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।

১৬. اِصْلَوْهَا (তবে এখন) তাতে প্রবেশ কর فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا অতঃপর তোমরা চাই সহ্য কর অথবা সহ্য না কর سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ উভয়ই তোমাদের পক্ষে সমান اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ যেমন তোমরা করতে তেমনই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হবে।

১৭. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ আর নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ থাকবে فِيْ جَنّٰتٍ জান্নাতের উদ্যানসমূহে وَّنَعِيْمٍ ও সুখ-সম্পদের মধ্যে।

১৮. فٰكِهِيْنَ তারা তাতে আনন্দিত হবে بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ তাদের প্রভু তাদেরকে যে সমস্ত বস্তু দান করবেন وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ এবং তাদের প্রভু তাদেরকে রক্ষা করবেন عَذَابَ الْجَحِيْمِ দোজখের আজাব হতে।

১৯. খুব মজার সাথে খাও এবং পান কর, তোমাদের [কৃত] আমলসমূহের বিনিময়ে।	كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾
২০. সারি সারি সাজানো আসনসমূহের উপর হেলান দিয়ে, আর আমি তাদেরকে ডাগর নয়ন বিশিষ্ট সুন্দরীগণের সাথে বিবাহ করিয়ে দিব।	مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾
২১. আর যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের সন্তান সন্ততিগণও ঈমান আনায় তাদের সঙ্গী হয়েছে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও [মর্যাদায়] তাদের সাথে শামিল করে দিব, আর [এ জন্য] আমি তাদের আমলসমূহ হতে কিছুমাত্রও কম করব না; [কাফেরদের] প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ আমলের দরুন [দোজখে] আবদ্ধ থাকবে।	وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾
২২. আর আমি তাদেরকে [বেহেশতবাসীদেরকে] ফল ও গোশত দৈনন্দিন বাড়িয়ে দিব, যেরূপ তাদের অভিরুচি হয়।	وَأَمْدَدْنَٰهُم بِفَٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. [আর] তথায় তারা পরস্পর [কৌতুক করে] শরাব পাত্র নিয়ে কাড়াকাড়িও করবে, তাতে না প্রলাপ হবে আর না অন্য কোনো বেহুদা কথা হবে।	يَتَنَٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. كُلُوا খাও وَاشْرَبُوا এবং পান কর بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমাদের আমলসমূহের বিনিময়।

২০. مُتَّكِـِٔينَ হেলান দিয়ে عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ সারি সারি সাজানো আসনসমূহের উপর وَزَوَّجْنَٰهُم আমি তাদেরকে বিবাহ করিয়ে দিব بِحُورٍ عِينٍ ডাগর নয়ন বিশিষ্ট সুন্দরীগণের সাথে।

২১. وَالَّذِينَ ءَامَنُوا আর যারা ঈমান এনেছে وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم এবং যাদের সন্তান-সন্ততিগণও তাদের সঙ্গী হয়েছে بِإِيمَٰنٍ ঈমান আনয়নে أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের সাথে শামিল করে দিব وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ আর (এই জন্য) আমি তার আমলসমূহ হতে কিছু মাত্র কম করব না كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (কাফেরদের) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ আমলের দরুন (দোজখে) আবদ্ধ থাকবে।

২২. وَأَمْدَدْنَٰهُم আর আমি তাদেরকে (বেহেশতবাসীদেরকে) দৈনন্দিন বাড়িয়ে দিব بِفَٰكِهَةٍ ফল وَلَحْمٍ ও গোশত مِّمَّا يَشْتَهُونَ যেরূপ তাদের অভিরুচি হয়।

২৩. يَتَنَٰزَعُونَ فِيهَا তথায় তারা পরস্পর (কৌতুক করে) কাড়া-কাড়ি করবে كَأْسًا শরাবপাত্র নিয়ে لَّا لَغْوٌ فِيهَا তাতে না প্রলাপ হবে وَلَا تَأْثِيمٌ আর না অন্য কোনো বেহুদা কথা হবে।

২৪. আর তাদের নিকট এমন বালকগণ ঘুরে বেড়াবে যারা বিশেষভাবে তাদেরই [সেবার] জন্য থাকবে, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা।	وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾
২৫. আর তারা একে অন্যের দিকে মুখোমুখি হয়ে কথাবার্তা বলবে।	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾
২৬. তাও বলবে যে, আমরা তো ইতঃপূর্বে স্বীয় গৃহে [দুনিয়াতে পরিণাম সম্বন্ধে] বড় ভীত থাকতাম।	قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾
২৭. বস্তুত আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করেছেন।	فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾
২৮. আমরা ইতঃপূর্বে [পৃথিবীতে] তার নিকট প্রার্থনা করতাম; বস্তুত তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল, দয়ালু।	إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾
২৯. অতএব, আপনি মানুষকে বুঝাতে থাকুন। কেননা আপনি আল্লাহর অনুগ্রহে গণকও নন এবং উন্মাদও নন।	فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾
৩০. তবে কি তারা এরূপ বলে যে, এই ব্যক্তি কবি, [এবং] আমরা তার সম্বন্ধে মৃত্যু সংঘটনের প্রতীক্ষা করছি।	أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣٠﴾
৩১. আপনি বলে দিন, [আচ্ছা] তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষাকারী হিসেবে রইলাম।	قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ আর তাদের নিকট এমন বালকগণ ঘুরে বেড়াবে لَّهُمْ যারা বিশেষভাবে তাদেরই (সেবার) জন্য থাকবে كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা।

২৫. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ আর তারা একে অন্যের দিকে মুখোমুখি হয়ে يَتَسَاءَلُونَ কথাবার্তা বলবে।

২৬. قَالُوا এটাও বলবে যে, إِنَّا كُنَّا قَبْلُ আমরা তো ইতঃপূর্বে থাকতাম فِي أَهْلِنَا স্বীয় গৃহে مُشْفِقِينَ বড় ভীত।

২৭. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا বস্তুত আল্লাহ আমাদের উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন وَوَقَانَا এবং আমাদেরকে রক্ষা করেছেন عَذَابَ السَّمُومِ দোজখের আজাব হতে।

২৮. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ আমরা ইতঃপূর্বে (পৃথিবীতে) তাঁর নিকট প্রার্থনা করতাম إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ বস্তুত তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল الرَّحِيمُ দয়ালু।

২৯. فَذَكِّرْ অতএব আপনি মানুষকে বুঝাতে থাকুন فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ কেননা আপনি আল্লাহর অনুগ্রহে গণকও নন وَلَا مَجْنُونٍ এবং উন্মাদও নন।

৩০. أَمْ يَقُولُونَ তবে কি এরা এরূপ বলে যে, شَاعِرٌ এই ব্যক্তি কবি نَّتَرَبَّصُ بِهِ তার সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করছি رَيْبَ الْمَنُونِ মৃত্যু সংঘটনের।

৩১. قُلْ আপনি বলে দিন تَرَبَّصُوا তোমরা প্রতীক্ষা কর فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষাকারী হিসেবে রইলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ২৯

শানে নুযূল ঃ আল্লাহ তা'আলার সত্য ধর্ম ইসলাম যখন দিন দিন প্রচার প্রসার লাভ করতে লাগল। তখন মক্কার মুশরিকরা হাজীদের আসার পথে অবস্থান নিয়ে হজে আগমনকারীদেরকে বলত, মক্কার যে লোকটি নবুয়তের দাবি করছে সে একজন গণক ও পাগল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল যাতে অচেনা লোকেরা রাসূলের সংশ্রবে না আসে। তাদের এ ধরনের নির্লজ্জ আচরণে রাসূলুল্লাহ ﷺ চিন্তিত ও ব্যথিত হতেন। তাই আল্লাহ পাক রাসূলে করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই আয়াত নাজিল করেন।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ৩০

শানে নুযূল ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য যখন কুরাইশরা দারুন নদওয়াতে একত্রিত হলো, তন্মধ্যে একজন মত প্রকাশ করল যে, তোমরা (মুহাম্মদ ﷺ -এর পায়ে বেড়ি পরিয়ে জেলে আটকে দাও, অতঃপর সময়ের পরিবর্তনের অপেক্ষা করতে থাক। সে যেন জেলেই জুহাইর এবং নাবেগা কবির মতো ধ্বংস হয়ে যায়। সে তো তাদের মতো একজন কবি বৈ কিছুই নয়। অর্থাৎ তাদের মতো একজন কবিই তো। তখন আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –(মুখতাছার ইবনে কাসীর ৩/৩৯২, কানযুল নুকূল ঃ ৯৫)

وَالطُّوْرِ : হিব্রু ভাষায় এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদগত হয়। এখানে তূর বলে মাদইয়ানে অবস্থিত তূরে সিনীন বুঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি পাহাড় আছে। তন্মধ্যে তূর একটি– (কুরতুবী) তূরের কসম খাওয়ার মধ্যে উপরিউক্ত বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্যে কিছু কালাম ও আহকাম করেছে। এগুলো মেনে চলা ফরজ।

وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ - رَقٌّ –শব্দের আসল অর্থ লেখার জন্যে কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। লিখিত কিতাব বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে কুরআন পাক বুঝানো হয়েছে।

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ –আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল মামূর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, মেরাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বায়তুল মামূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্যে প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর আসে। –(ইবনে কাসীর)

সপ্তম আকাশে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মামূর। এ কারণেই মেরাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে পৌঁছে হযরত ইবরাহীম (আ.)–কে বায়তুল মামূরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। –(ইবনে কাসীর)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ : مَسْجُوْرٌ শব্দটি سَجْرٌ থেকে উদ্ভূত। এটা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অগ্নি প্রজ্বলিত করা। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ঃ সমুদ্রের কসম, যাকে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য এক আয়াতে আছে-

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ : অর্থাৎ চতুর্দিকের সমুদ্রে অগ্নি হয়ে হাশরের ময়দানে একত্র মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তাফসীরই হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, আলী, ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ ও ওবায়দুল্লাহ, ইবনে উমায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। –(ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রা.)-কে জনৈক ইহুদি প্রশ্ন করল ঃ জাহান্নাম কোথায়? তিনি বললেন ঃ সমুদ্রেই জাহান্নাম। পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থে অভিজ্ঞ ইহুদি এই উত্তর সমর্থন করল। –(কুরতুবী) হযরত কাতাদা (র.) প্রমুখ مَسْجُوْرٌ –এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জরীর (র.) এই অর্থই পছন্দ করেছেন। –(ইবনে কাসীর)

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ : **আপনার পালনকর্তার আজাব অবশ্যম্ভাবী।** একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা পূর্বোল্লেখিত কসমসমূহের জবাব।

একবার হযরত ওমর (রা.) সূরা তূর পাঠ করে যখন এই আয়াতে পৌঁছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না। –(ইবনে কাসীর)

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতইম (রা.) বলেন ঃ মুসলমান হওয়ার পূর্বে আমি একবার বদরের যুদ্ধে বন্দিদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে মদীনা পৌঁছেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মাগরিবের নামাজে সূরা তূর পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি যখন إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ পাঠ করলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হলো যেন অন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি আজাবে গ্রেফতার হয়ে যাব। –(কুরতুবী)

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا : অভিধানে অস্থির নড়াচড়াকে مَوْرٌ বলা হয়। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন আকাশ অস্থিরভাবে নড়াচড়া করবে।

ঈমান থাকলে বুযুর্গদের সাথে বংশগত সম্পর্ক পরকালেও উপকারে আসবে ঃ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ –অর্থাৎ, যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকে জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়–যাতে বুযুর্গদের চক্ষু শীতল হয়। –(মাযহারী)

সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলেন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এরই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোথায় আছে? জবাবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তাই তারা জান্নাতে আলাদা জায়গায় আছে। এই ব্যক্তি আরজ করবে ঃ পরওয়ারদেগার, দুনিয়াতে নিজের জন্যে ও তাদের সবার জন্যে আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ হবেঃ তাদেরকেও জান্নাতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক। –(ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর (র.) এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন ঃ এসব রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। অপরদিকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদের পিতা-মাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। মুসনাদে-আহমদে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো নেক বান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবে ঃ পরওয়ারদেগার, আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেওয়া হলো? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তর হবে ঃ তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা ও দোয়া করেছে। এটা তারই ফল।

وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ : أَلَتٌ ও إِيلَاتٌ এর শাব্দিক অর্থ হ্রাস করা। –(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই ঃ সন্তান-সন্ততিকে তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা হবে না যে, বুজুর্গদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে; বরং আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় তাদেরকে সমান করে দেবেন।

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ : অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্যে দায়ী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে নেককর্মের বেলায় সৎকর্মশীল পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু গোনাহের বেলায় এরূপ করা হবে না। একের গোনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না। –(ইবনে কাসীর)

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَسْطُورٌ সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার سَطْرٌ মূলবর্ণ (س ـ ط ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- লিখিত।

مَنْشُورٌ সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার نَشْرٌ মূলবর্ণ (ن ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- খোলা।

مَسْجُورٌ সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّجُوْرُ মূলবর্ণ (س ـ ج ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- পরিপূর্ণ, উত্তপ্ত, স্ফীত, উত্তাল।

تَمُوْرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَوْرٌ মূলবর্ণ (م - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ–থরথর করতে থাকবে।

يَلْعَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَللَّعْبُ মূলবর্ণ (ل - ع - ب) জিনস صحيح অর্থ– অনর্থকভাবে লিপ্ত রয়েছে। খেলাধুলায় মত্ত রয়েছে।

مَصْفُوْفَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّفُّ মূলবর্ণ (ص - ف - ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সারি সারি সাজানো।

يَتَنَازَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّنَازُعُ মূলবর্ণ (ن - ز - ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা পরস্পর কাড়াকাড়ি করবে।

مَكْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُنُوْنُ - اَلْكَنُّ মূলবর্ণ (ك - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সুরক্ষিত।

اِصْلَوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার صَلْىٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাতে প্রবেশ কর।

مُتَّكِئِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّكَاءٌ মূলবর্ণ (و - ك - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– হেলান দেওয়া, টেক লাগানো।

كَاهِنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ - فَتَحَ মাসদার كَهَانَةٌ মূলবর্ণ (ك - ه - ن) জিনস صحيح অর্থ– অদৃশ্য জ্ঞানের দাবিদার, অন্যের কাজের অভিভাবক ও চেষ্টাকারী।

فَمَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَنُّ মূলবর্ণ (م - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– অনুগ্রহ করেছেন।

تَرَبَّصُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّرَبُّصُ মূলবর্ণ (ر - ب - ص) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা প্রতীক্ষা কর।

تَسِيْرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّيْرُ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– স্থানচ্যুত হবে।

يُدَعُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার دَعٌّ মূলবর্ণ (د - ع - ع) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদেরকে ঠেলে ঠেলে আনা হবে।

هَنِيْئًا : বাব صفت مشبة বাব نَصَرَ - فَتَحَ - ضَرَبَ মাসদার هَنَاءٌ মূলবর্ণ (ه - ن - أ) জিনস مهموز لام অর্থ– মজার সাথে।

يَشْتَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِهَاءُ মূলবর্ণ (ش - ه - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাদের অভিরুচি হয়।

مُشْفِقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِشْفَاقُ মূলবর্ণ (ش - ف - ق) জিনস صحيح অর্থ– ভীতুগণ।

نَتَرَبَّصُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّرَبُّصُ মূলবর্ণ (ر - ب - ص) জিনস صحيح অর্থ– আমরা প্রতীক্ষা করছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর الْمُتَّقِيْنَ হলো اسم اِنَّ আর فِىْ جَنّٰتٍ হলো خبر اِنَّ আর وَّعُيُوْنٍ টা جَنّٰتٍ-এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ৩১০]

অনুবাদ	আয়াত
৩২. তবে কি তাদের বিবেক তাদেরকে তা শিখাচ্ছে, নাকি তারা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়?	أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আচ্ছা, তারা কি এটা [-ও] বলে যে, তিনি এটা নিজে রচনা করেছেন; বরং তারা বিশ্বাস করে না ।	أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. তবে তারা [রচনা করে] এটার অনুরূপ কোনো বাণী উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয় ।	فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾
৩৫. তারা কি কোনো স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা ।	أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. অথবা তারা কি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না ।	أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তাদের নিকট কি আপনার প্রভুর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, নাকি তারা এগুলোর মালিক?	أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾
৩৮. তাদের নিকট কি কোনো সিঁড়ি আছে তাতে [আরোহণ করে] তারা কথাবার্তা শ্রবণ করে? তবে তাদের মধ্যে যে শুনে আসে, সে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক ।	أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. আল্লাহর জন্য কি কন্যাগণ, আর তোমাদের জন্য [বুঝি] পুত্রগণ?	أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. أَمْ تَأْمُرُهُمْ তবে কি তাদের শিখাচ্ছে أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا তাদের বিবেক এটা أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ নাকি তারা দুষ্ট লোক ।

৩৩. أَمْ يَقُولُونَ আচ্ছা তারা কি এটা (ও) বলে যে تَقَوَّلَهُ তিনি নিজে এটা রচনা করেছেন بَل لَّا يُؤْمِنُونَ বরং তারা বিশ্বাস করে না ।

৩৪. فَلْيَأْتُوا তবে তারা আনয়ন করুক بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ অনুরূপ কোনো বাণী إِن كَانُوا صَادِقِينَ যদি তারা সত্যবাদী হয় ।

৩৫. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ তারা কি কোনো স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে । أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা ।

৩৬. أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ অথবা তারা কি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে بَل لَّا يُوقِنُونَ বরং তারা বিশ্বাস করে না ।

৩৭. أَمْ عِندَهُمْ তাদের নিকট কি রয়েছে خَزَائِنُ رَبِّكَ আপনার প্রভুর ভাণ্ডারসমূহ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ নাকি তারা মালিক ।

৩৮. أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ তাদের নিকট কি কোনো সিঁড়ি আছে يَسْتَمِعُونَ فِيهِ তাতে (আরোহণ করে) তারা কথাবার্তা শ্রবণ করে فَلْيَأْتِ তবে সে উপস্থিত করুক مُسْتَمِعُهُم তাদের মধ্যে যে শুনে আসে بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ কোনো স্পষ্ট প্রমাণ ।

৩৯. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ আল্লাহর জন্য কি কন্যাগণ وَلَكُمُ الْبَنُونَ আর তোমাদের জন্য পুত্রগণ ।

৪০. আপনি কি তাদের নিকট কোনো বিনিময় চাচ্ছেন যে, সে খেসারত তাদের নিকট ভারি মনে হচ্ছে?	أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾
৪১. অথবা তাদের নিকট কি কোনো গায়বি ইলম আছে যে, তারা [তা] লিপিবদ্ধ করে রাখে?	أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾
৪২. তারা কি কোনো চক্রান্ত করতে ইচ্ছা করে? অনন্তর এই কাফেররা নিজেরাই [সে] চক্রান্তে ফেঁসে পড়বে।	أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾
৪৩. তাদের কি আল্লাহ ব্যতীত অপর কোনো উপাস্য আছে? আল্লাহ তাদের শিরক হতে পবিত্র।	أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর যদি তারা আসমানের কোনো খণ্ডকে দেখতে পায় যে, [তাদের] উপর পতিত হচ্ছে, তবুও এরূপই বলবে যে, এটা তো স্তরে স্তরে পূঞ্জীকৃত মেঘমাত্র।	وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾
৪৫. সুতরাং তাদেরকে [তাদের অবস্থায়] থাকতে দিন, যে পর্যন্ত না তারা সেদিনের সম্মুখীন হয়, যেদিন তারা অচৈতন্য হয়ে পড়বে।	فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾
৪৬. যে দিন তাদের চক্রান্ত [যা ইসলামের বিরোধিতায় করত] তাদের কিছুমাত্র কাজে আসবে না, আর তারা কোনো সাহায্যও পাবে না।	يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪০. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا আপনি কি তাদের নিকট কোনো বিনিময় চাচ্ছেন যে, فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ সেই খেসারত তাদের নিকট ভারি মনে হচ্ছে।

৪১. أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ অথবা তাদের নিকট কি কোনো গায়বি ইলম আছে যে, فَهُمْ يَكْتُبُونَ তারা তা লিপিবদ্ধ করে রাখে।

৪২. أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا এরা কি কোনো চক্রান্ত করতে ইচ্ছা করে। فَالَّذِينَ كَفَرُوا অনন্তর এই কাফেররা هُمُ الْمَكِيدُونَ নিজেরাই সেই চক্রান্তে ফেঁসে পড়বে।

৪৩. أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ তাদের কি কোনো উপাস্য আছে غَيْرُ اللَّهِ আল্লাহ ব্যতীত سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ আল্লাহ তাদের শিরক হতে পবিত্র।

৪৪. وَإِن يَرَوْا আর যদি তারা দেখতে পায় كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ আসমানের কোনো খণ্ডকে যে, سَاقِطًا (তাদের উপর) পতিত হচ্ছে يَقُولُوا এরূপই বলবে سَحَابٌ مَّرْكُومٌ এটাতো স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃত মেঘমাত্র।

৪৫. فَذَرْهُمْ সুতরাং তাদেরকে থাকতে দিন। حَتَّىٰ يُلَاقُوا যে পর্যন্ত না তারা সম্মুখীন হয় يَوْمَهُمُ সেই দিনের الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ যেদিন তারা অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

৪৬. يَوْمَ সেদিন لَا يُغْنِي عَنْهُمْ তাদের কাজে আসবে না كَيْدُهُمْ তাদের চক্রান্ত شَيْئًا কিছুমাত্র وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ আর তারা কোনো সাহায্যও পাবে না।

৪৭. আর ঐ জালিমদের জন্য তার পূর্বে [পৃথিবীতে] -ও শাস্তি রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অবগত নয়।	وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর আপনি আপনার প্রভুর এ ব্যবস্থার উপর ধৈর্য ধরে থাকুন। কেননা আপনি আমার হেফাজতে আছেন, আর আপনি [নিদ্রা হতে] উঠবার সময় নিজ প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করুন।	وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤٨﴾
৪৯. এবং রাত্রিতেও তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন, আর নক্ষত্ররাজি অস্তগমনের পরও।	وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿٤٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا আর ঐ অনাচারীদের জন্য রয়েছে عَذَابًا শাস্তি دُوْنَ ذٰلِكَ তার পূর্বেও (পৃথিবীতে) وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু তাদের অধিকাংশই অবগত নয়।

৪৮. اصْبِرْ, আপনি ধৈর্য ধরে থাকুন لِحُكْمِ رَبِّكَ আপনার প্রভুর এই অবস্থার উপর فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا কেননা আপনি আমার হেফাজতে রয়েছেন وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, আর আপনি নিজ প্রভুর পবিত্রতাও প্রশংসা বর্ণনা করুন حِيْنَ تَقُوْمُ (নিদ্রা হতে) উঠবার সময়।

৪৯. وَمِنَ الَّيْلِ এবং রাত্রিতেও فَسَبِّحْهُ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ আর নক্ষত্র রাজি অস্তগমনের পরও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا –শত্রুদের শত্রুতা–বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে উক্ত সূরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ, আমার হেফাজতে আছেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখব। আপনি তাদের পরওয়া করবেন না। অন্য এক আয়াতে আছে- وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনার হেফাজত করবেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিকারও। বলা হয়েছে ঃ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার প্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এর এক অর্থ- নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান করা। ইবনে জারীর (রহ.) তাই বলেন। এক হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, সে যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়। বাক্যগুলো এই ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এরপর যদি সে অজু করে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজ কবুল করা হবে। –(ইবনে কাসীর)

মজলিসের কাফফারা ঃ মুজাহিদ ও আবুল আহওয়াস (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, "যখন দণ্ডায়মান হন" –এর অর্থ এই যে, যখন কেউ মজলিস থেকে ওঠে, তখন এই বাক্য পাঠ করবে– سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ –এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.) বলেন ঃ তুমি যখন মজলিস থেকে ওঠ, তখন তাসবীহ্ ও তাহমীদ কর। তুমি এই

মজলিসে কোনো সৎকাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোনো পাপ কাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

হযরত আবূ হুরায়ারা (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে ভালো-মন্দ কথা-বার্তা হয় সে যদি মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এই মজলিসের যেসব গোনাহ হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করেন। বাক্যগুলো এই ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

-(তিরমিযী, ইবনে কাসীর)

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ : অর্থাৎ, রাত্রে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। মাগরিব ও এশার নামাজ এবং সাধারণ তাসবীহ পাঠ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ অর্থাৎ, তারকা অস্তমিত হওয়ার পর। এখানে ফজরের নামাজ ও তখনকার তাসবীহ্ পাঠ বুঝানো হয়েছে। -(ইবনে কাসীর)

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَأْمُرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَمْرُ মূলবর্ণ (ء - م - ر) জিনস مهموز فاء অর্থ- শিখাচ্ছে, নির্দেশ দিচ্ছে।

صٰدِقِيْنَ : সীগাহ جمع مزكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلصِّدْقُ মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ- সত্যবাদীগণ।

خُلِقُوْا : সীগাহ جمع مزكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْقُ মূলবর্ণ (خ - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ- তারা সৃষ্টি হয়েছে।

خَزَائِنُ : শব্দটি বহুবচন : একবচনে خزينة অর্থ- ভাণ্ডারসমূহ।

مُصَيْطِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَعْلَلَة মাসদার اَلسَّيْطَرَةُ মূলবর্ণ (س - ط - ر - ة) জিনস صحيح অর্থ– সালিক।

سُلَّمٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে سَلَالِيْمُ ، سَلَالِمُ অর্থ- সিঁড়ি, ধাপ, স্তর।

مَكِيْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَوْدُ মূলবর্ণ (ك - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– চক্রান্তে ফেঁসে পড়বে।

يُصْعَقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلصَّعْقُ মূলবর্ণ (ص - ع - ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

مُثْقَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِثْقَالٌ মূলবর্ণ (ث - ق - ل) জিনস صحيح অর্থ– ভারি।

سَاقِطًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّقُوْطُ মূলবর্ণ (س - ق - ط) জিনস صحيح অর্থ– পতিত হওয়া।

سَبِّحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْبِيْحُ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– আপনি পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ : এখানে اَمْ হলো হরফে আতফ لَهُ হলো خبر مقدم এবং اَلْبَنَاتُ হলো مبتدأ موخر আর وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ টা لَهُ الْبَنَاتُ -এর উপর আতফ হয়েছে। -[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ৩১৭]

سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ

সূরা নাজম

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৬২, রুকূ'– ৩
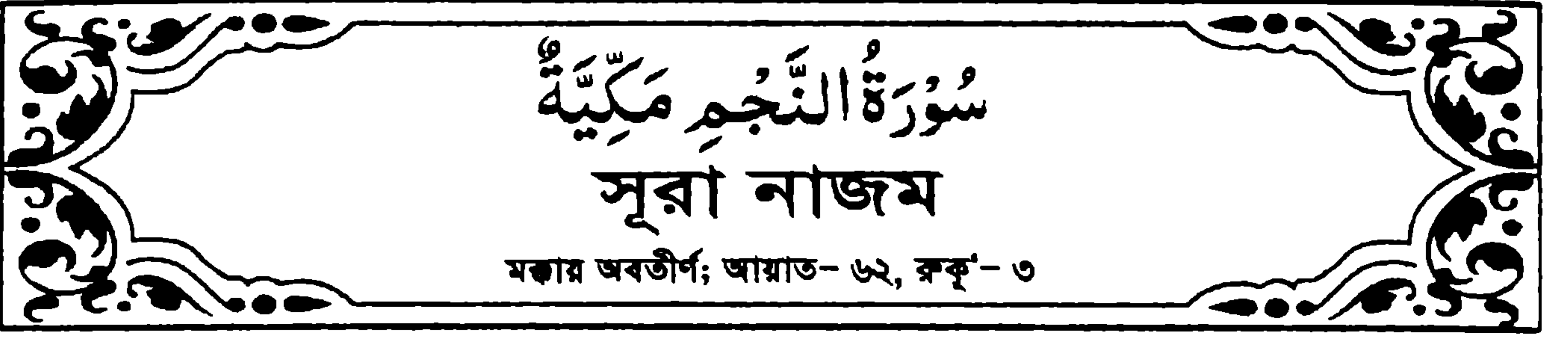
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. নক্ষত্রের শপথ যখন তা অস্ত যেতে থাকে।	وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ﴿١﴾
২. তোমাদের সঙ্গে অবস্থানকারী [এই রাসূল] পথভ্রষ্টও হননি এবং বিপথগামীও হননি।	مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ﴿٢﴾
৩. আর তিনি নিজ প্রবৃত্তি হতে কিছুই রচনা করেন না।	وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿٣﴾
৪. তাঁর উক্তি কেবল ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়।	اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ﴿٤﴾
৫. তাঁকে মহাশক্তিশালী এক ফেরেশতা শিক্ষা দেয়।	عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ﴿٥﴾
৬. সৃষ্টিগত শক্তিশালী; অনন্তর সে আসল আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়েছিল।	ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ﴿٦﴾
৭. এভাবে যে, সে উচ্চপ্রান্তে ছিল।	وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ﴿٧﴾
৮. তৎপর সে নিকটে আসল, আরো নিকটে আসল।	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالنَّجْمِ নক্ষত্রের কসম اِذَا هَوٰى যখন তা অস্ত যেতে থাকে।

২. مَا ضَلَّ পথভ্রষ্টও হননি صَاحِبُكُمْ তোমাদের সঙ্গে অবস্থানকারী (এই রাসূল) وَمَا غَوٰى এবং বিপথগামীও হননি।

৩. وَمَا يَنْطِقُ আর তিনি কিছুই রচনা করেন না عَنِ الْهَوٰى নিজ প্রবৃত্তি হতে।

৪. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ তার উক্তি কেবল ওহী يُّوْحٰى যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়।

৫. عَلَّمَهٗ তাকে শিক্ষা দেয় شَدِيْدُ الْقُوٰى মহাশক্তিশালী এক ফেরেশতা।

৬. ذُوْ مِرَّةٍ সৃষ্টিগত শক্তিশালী فَاسْتَوٰى অনন্তর সে আসল আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়েছিল।

৭. وَهُوَ এভাবে যে, সে ছিল بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى উচ্চপ্রান্তে।

৮. ثُمَّ دَنَا তৎপর সে নিকটে আসল فَتَدَلّٰى আরো নিকটে আসল।

৯. এমন কি [উভয়ের মধ্যে] দুই ধনুক পরিমাণ দূরত্ব রইল; বরং আরো কম।	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۝٩
১০. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দার প্রতি ওহী নাজিল করলেন যা নাজিল করবার ছিল।	فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ۝١٠
১১. যা সে দেখেছে সে সম্পর্কে [তাঁর] অন্তর কোনো ভুল করেনি।	مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ۝١١
১২. তবুও কি তোমরা তাঁর দৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে তাঁর সাথে ঝগড়া করছ?	اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ۝١٢
১৩. নিশ্চয় তিনি সে ফেরেশতাকে আরো একবার দেখেছেন।	وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۝١٣
১৪. সিদরাতুল মুনতাহা (প্রান্তবর্তী বৃক্ষ)-এর নিকট।	عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝١٤
১৫. তার নিকটেই জান্নাতুল মাওয়া রয়েছে।	عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ۝١٥
১৬. যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তা দ্বারা আচ্ছাদিত হচ্ছিল।	اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۝١٦
১৭. দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং লক্ষ্যচ্যুত হয়নি।	مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۝١٧
১৮. তিনি নিজ প্রতিপালকের বিরাট বিরাট আশ্চর্য নিদর্শন দর্শন করেছেন।	لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ۝١٨

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ এমনকি দুই ধনুক পরিমণ দূরত্ব রইল اَوْ اَدْنٰى বরং আরও কম।

১০. فَاَوْحٰى অতঃপর আল্লাহ ওহী নাজিল করলেন اِلٰى عَبْدِهٖ নিজ বান্দার প্রতি مَاۤ اَوْحٰى যা নাজিল করার ছিল।

১১. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ (তাঁর) অন্তর কোনো ভুল করেনি مَا رَاٰى যা সে দেখেছে সে সম্পর্কে।

১২. اَفَتُمٰرُوْنَهٗ তবুও কি তোমরা তাঁর সাথে ঝগড়া করছ عَلٰى مَا يَرٰى তাঁর দৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে।

১৩. وَلَقَدْ رَاٰهُ আর তিনি সেই ফেরেশতাকে দেখেছেন نَزْلَةً اُخْرٰى আরো একবার।

১৪. عِنْدَ নিকট سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى সিদরাতুল মুন্তাহার (প্রান্তবর্তী বৃক্ষের)।

১৫. عِنْدَهَا তার নিকটেই রয়েছে جَنَّةُ الْمَاْوٰى জান্নাতুল মাওয়া।

১৬. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ যখন বৃক্ষটি আচ্ছাদিত হচ্ছিল তা দ্বারা مَا يَغْشٰى যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার।

১৭. مَا زَاغَ الْبَصَرُ দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি وَمَا طَغٰى এবং লক্ষ্যচ্যুত হয়নি।

১৮. وَلَقَدْ رَاٰى আর তিনি দর্শন করেছেন مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى নিজ প্রতিপালকের বিরাট বিরাট আশ্চর্য নিদর্শন।

১৯. আচ্ছা, তোমরা কি লাত ও উযযা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ?	أَفَرَأَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾
২০. এবং তৃতীয় একটি মানাতের অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য করেছ?	وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى ﴿٢٠﴾
২১. তোমাদের জন্য তো পুত্রসন্তান আর আল্লাহর জন্য [বুঝি] কন্যাসন্তান?	أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى ﴿٢١﴾
২২. এমতাবস্থায় তো তা বড় অশোভনীয় বণ্টন হলো।	تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزٰى ﴿٢٢﴾
২৩. এগুলো তো নির্জলা নামমাত্র, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা সাব্যস্ত করে নিয়েছ, আল্লাহ তো তার কোনো প্রমাণ প্রেরণ করেননি, এরা শুধু ভিত্তিহীন কল্পনা এবং স্বীয় প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষার উপর চলছে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রভুর পক্ষ হতে হেদায়েত এসেছে।	إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾
২৪. মানুষ কি তার প্রত্যেক কাঙ্ক্ষিত বস্তু পায়?	أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾
২৫. পরন্তু আল্লাহরই আয়ত্তাধীনে আছে পরলোক ও ইহলোক।	فَلِلّٰهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولٰى ﴿٢٥﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. أَفَرَأَيْتُمُ আচ্ছা তোমরা কি ভেবে দেখেছ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى লাত ও উযযা সম্পর্কে।

২০. وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى এবং তৃতীয় একটি মানাতের অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য করেছ।

২১. أَلَكُمُ الذَّكَرُ তোমাদের জন্য তো পুত্রসন্তান وَلَهُ الْأُنْثٰى আর আল্লাহর জন্য (বুঝি) কন্যাসন্তান।

২২. تِلْكَ إِذًا এমতাবস্থায় তো তা قِسْمَةٌ ضِيزٰى বড় অশোভনীয় বন্টন হলো।

২৩. إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ এগুলো তো নির্জলা নামমাত্র سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা সাব্যস্ত করে নিয়েছ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ আল্লাহ তো তার কোনো প্রমাণ প্রেরণ করেননি إِنْ يَتَّبِعُونَ এরা শুধু চলছে إِلَّا الظَّنَّ ভিত্তিহীন কল্পনা وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ এবং স্বীয় প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষার উপর وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدٰى অথচ তাদের নিকট তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে হেদায়েত এসেছে।

২৪. أَمْ لِلْإِنْسَانِ মানুষ কি পায় مَا تَمَنّٰى তার প্রত্যেক কাঙ্ক্ষিত বস্তু!

২৫. فَلِلّٰهِ পরন্তু আল্লাহরই আয়ত্তাধীনে আছে الْآخِرَةُ পরলোক وَالْأُولٰى ও ইহলোক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নাজমের বৈশিষ্ট্য ঃ সূরা নাজম প্রথম সূরা, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ঘোষণা করেন। –(কুরতুবী) এই সূরাতেই সর্বপ্রথম সেজদার আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াতের সেজদা করেন। মুসলমান ও কাফের সবাই এই সেজদায় শরিক হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় মজলিসে যত কাফের ও মুশরিক উপস্থিত ছিল, সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সেজদায় আভূমি নত হয়ে যায়। কেবল এক অহংকারী ব্যক্তি যার নাম সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে, সে সেজদা করেনি। কিন্তু সে এক মুষ্টি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলল ঃ ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন ঃ আমি সেই ব্যক্তিকে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। –(ইবনে কাসীর)

শানে নুযূল ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -কে রাসূল বানিয়ে পাঠানোর ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্মের পূর্বে অধিকহারে তারকার ছুটা-ছুটি করতে দেখতে পেয়ে আরবের লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের মাঝে জারীর নামক এক জ্যোতিষীর নিকট তাদের এ শঙ্কার কথা ব্যক্ত করল। সে তারকার গতিবিধির মাধ্যমে তাদেরকে অনেক দুর্ঘটনা সম্পর্কেই অবগত করত। সুতরাং সে তাদেরকে বলল যে, তোমরা বারটি কক্ষ পথকে লক্ষ্য রাখবে সেই বারটি কক্ষ পথ হতে কোনো একটি তারকা যদি ছুটে পড়ে, তাহলে দুনিয়াতে কোনো তাৎপর্যবহ কোনো ঘটনা ঘটবে। তার প্রতি তোমরা খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। রাসূল ﷺ যখন নবী হিসেবে প্রেরিত হলেন, তখনই তারা সে তাৎপর্যবহ ঘটনা সম্পর্কে অনুভব করতে পারল। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী ৭৪/১৭)

এই সূরার শুরুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্য নবী হওয়া এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى : নক্ষত্রমাত্রকেই نَجْمٌ বলা হয় এবং এর বহুবচন نُجُوْمٌ ; কখনও এই শব্দটি কয়েকটি নক্ষত্রের সমষ্টি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতেও কেউ কেউ নজমের তাফসীর "সুরাইয়া" অর্থাৎ, সপ্তর্ষিমণ্ডল দ্বারা করেছেন। ফাররা ও হযরত হাসান বসরী (রহ.) প্রথম তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। –(কুরতুবী)। هَوٰى শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অস্তমিত হওয়া। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নক্ষত্রের কসম খেয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওহী সত্য, বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। সূরা সাফফাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশেষ উপযোগিতা ও তাৎপর্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ বিশেষ সৃষ্টবস্তুর কসম খেতে পারেন। কিন্তু অন্য কারও জন্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর কসম খাওয়ার অনুমতি নেই। এখানে নক্ষত্রের কসম খাওয়ার এক তাৎপর্য এই যে, অন্ধকার রাত্রে দিক ও রাস্তা নির্ণয়ের কাজে নক্ষত্র ব্যবহৃত হয়, তেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমেও আল্লাহর পথের দিকে হেদায়েত অর্জিত হয়।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى : এই বিষয়বস্তুর কারণেই কসম খাওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন; তাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের বিশুদ্ধ পথ। তিনি পথ ভুলে যাননি এবং বিপথগামীও হননি।

রাসূলের পরিবর্তে সঙ্গী বলার রহস্য ঃ এ স্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম অথবা নবী শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে 'তোমাদের সঙ্গী' বলে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ বাইরে থেকে আগত কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নন, যার সত্যবাদিতায় তোমরা সন্দিগ্ধ হবে; বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানেই শৈশব অতিবাহিত করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর জীবনের কোনো দিক তোমাদের কাছে গোপন নয়। তোমরা পরীক্ষা করে দেখেছ যে, তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। তোমরা তাঁকে শৈশবেও কোনো মন্দকাজে লিপ্ত দেখনি। তাঁর চরিত্র, অভ্যাস, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি তোমাদের এতটুকু আস্থা ছিল যে, সমগ্র মক্কাবাসী তাঁকে 'আল-আমীন' বলে সম্বোধন করত। এখন নবুয়ত দাবি করায় তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করেছ। সর্বনাশের কথা এই যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে কখনও মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে মিথ্যা বলছেন বলে তোমরা তাঁকে অভিযুক্ত করছ। তাই অতঃপর বলা হয়েছেঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى : অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কথা তৈরি করে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন না। এর কোনো সম্ভাবনাই নেই; বরং তিনি যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। বোখারীর বিভিন্ন হাদীসে ওহীর অনেক প্রকার বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে যথা– ১. যার অর্থ ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, এর নাম কুরআন। ২. যার কেবল অর্থ আল্লাহ তা'আলার তরফ

থেকে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অর্থ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন, এর নাম হাদীস ও সুন্নাহ। এরপর হাদীসে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে বিষয়বস্তু বিধৃত হয়, কখনও তা কোনো ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা তথা বিধান হয়ে থাকে এবং কখনও কেবল সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়। এই নীতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইজতিহাদ করে বিধানাবলি বের করেন। এই ইজতিহাদে ভ্রান্তি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তথা পয়গাম্বরকুলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান বর্ণনা করেন, সেগুলোতে ভুল হয়ে গেলে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর সাহায্যে শুধরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য মুজতাহিদ আলেম ইজতিহাদে ভুল করলে তারা তার উপর কায়েম থাকতে পারেন। তাদের এই ভুলও আল্লাহ তা'আলার কাছে কেবল ক্ষমাই নয়; বরং ধর্মীয় বিধান হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে তাঁরা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তজ্জন্যে তাঁরা কিঞ্চিৎ ছওয়াবেরও অধিকারী হন।

এই বক্তব্য দ্বারা আলোচ্য আয়াত সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জবাব হয়ে গেছে। প্রশ্ন এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব কথাই যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী হয়ে থাকেন, তখন জরুরি হয়ে পড়ে যে, তিনি নিজ মতামত ও ইজতিহাদ দ্বারা কোনো কিছু বলেন না। অথচ সহীহ্ হাদীসমূহের একাধিক ঘটনা এমন বর্ণিত আছে যে, প্রথমে তিনি এক নির্দেশ দেন, অতঃপর ওহীর আলোকে সেই নির্দেশ পরিবর্তন করেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রথম নির্দেশটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ছিল না; বরং তিনি স্বীয় মতামত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। এর জবাব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহী কখনও সামগ্রিক নীতির আকারে হয়, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইজতিহাদ করে বিধানাবলি বের করেন। এই ইজতিহাদের ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى : এখান থেকে অষ্টাদশতম আয়াত لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত সব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওহীতে কোনো প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহর কালাম তাঁকে এভাবে দান করা হয়েছে যে, এতে কোনোরূপ ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকতে পারে না।

এই আয়াতসমূহের তাফসীরে তাফসীরবিদদের মতভেদ ঃ এসব আয়াতের ব্যাপারে দু'প্রকার তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। ১. হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তাফসীরের সারমর্ম এই যে, এসব আয়াতে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ ও আল্লাহর দর্শন ও নৈকট্যলাভের কথা আলোচিত হয়েছে। মহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন, فَاسْتَوٰى এবং دَنٰى فَتَدَلّٰى এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার বিশেষণ ও কর্ম। তাফসীরে মাযহারীতে এই তাফসীর অবলম্বিত হয়েছে। ২. অন্যান্য অনেক সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদের মতে, এসব আয়াতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং মহাশক্তিশালী ইত্যাদি শব্দ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বিশেষণ। এই তাফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা নজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সূরা নজম। বাহ্যতঃ মে'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি তর্কাতীত নয়। আসল কারণ এই যে, হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব আয়াতের যে তাফসীর করেছেন, তাতে জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখিত আছে। মুসনাদে-আহমদে বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এরূপ ঃ

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلَيْسَ اللّٰهُ يَقُوْلُ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ - وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى فَقَالَتْ اَنَا اَوَّلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ اِنَّمَا ذَاكَ جِبْرَائِيْلُ لَمْ يَرَهُ فِىْ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ خُلِقَ عَلَيْهَا اِلَّا مَرَّتَيْنِ رَاٰهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ سَادًّا عَظْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -

শা'বী হযরত মাসরূক থেকে বর্ণনা করেন– তিনি একদিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মাসরূক বলেন ঃ আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى - وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ হযরত আয়েশা (রা.) বললেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন ঃ আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে হযরত জিবরাঈল (আ.)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মাত্র দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে বর্ণিত দেখার অর্থ এই যে, তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তার দেহাকৃতি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। –(ইবনে কাসীর)।

সহীহ মুসলিমেও এই রেওয়ায়েত প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত আছে। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ফতহুল বারী গ্রন্থেই ইবনে মারদুবিয়াহ (রহ.) থেকে এই রেওয়ায়েত একই সনদে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত আয়েশার (রা.)-এর বক্তব্য এরূপঃ

أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هٰذَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا رَأَيْتُ جِبْرَائِيْلَ مُنْهَبِطًا -

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ এই আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি কি আপনার পালনকর্তাকে দেখেছেন? তিনি বললেন ঃ না, বরং আমি জিবরাঈলকে নীচে অবতরণ করতে দেখেছি।

–(ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩)

সহীহ বোখারীতে শায়বানী (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আবূ যরকে এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى فَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهٖ مَا أَوْحٰى তিনি জবাবে বলেন ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈলকে ছয়শত বাহুবিশিষ্ট দেখেছেন। ইবনে জারীর (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে রফরফের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে রেখেছিল।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.)-এর বক্তব্য ঃ ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীরে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, সূরা নজমের উল্লিখিত আয়াতসমূহে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বলে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবূ যর গেফারী, আবূ হোরায়রা (রা.) প্রমুখ সাহাবীর এই উক্তি। তাই ইবনে কাসীর আয়াতসমূহের তাফসীরে বলেন ঃ

আয়াতসমূহে উল্লিখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটবর্তী হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন। প্রথমবারে দেখা নবুয়তের সম্পূর্ণ প্রাথমিক জমানায় হয়েছিল। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, যদ্দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করার ধারণা বারবার তাঁর মনে জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো, তখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) দৃষ্টির অন্তরালে থেকে আওয়াজ দিতেনঃ হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ তা'আলার সত্য নবী, আর আমি জিবরাঈল। এই আওয়াজ শুনে তাঁর মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। যখনই মনে বিরূপ কল্পনা দেখা দিত, তখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) অদৃশ্য থেকে এই আওয়াজের মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। অবশেষে একদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) মক্কার উন্মুক্ত ময়দানে তাঁর আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর ছয়শত বাহু ছিল এবং তিনি গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছিলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসেন এবং তাঁকে ওহী পৌঁছান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিবরাঈলের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুঠে উঠে।

–(ইবনে কাসীর)

সারকথা এই যে, ইমাম ইবনে কাসীরের মতে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর তাই যা উপরে বর্ণনা করা হলো। এই প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, জিবরাঈলকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকটে আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন।

দ্বিতীয়বার দেখার কথা وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। মে'রাজের রাত্রিতে এই দেখা হয়। উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই তাফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আবু হাইয়ান, ইমাম রাযী (র.) প্রমুখ এই তাফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাফসীরের সার সংক্ষেপে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) ও এই তাফসীর অবলম্বন করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, সূরা নজমের শুরুভাগের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি; বরং জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম নবভী (র.) মুসলিম শরীফের টীকায় এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ফতহুল বারী গ্রন্থেও এই তাফসীর অবলম্বন করেছেন।

ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى : مِرَّةٍ শব্দের অর্থ– শক্তি। হযরত জিবরাঈল (আ)-এর অধিক শক্তি বর্ণনা করার জন্যে এটাও তাঁরই বিশেষণ। এতে করে এই ধারণার অবকাশ থাকে না, ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাজে কোনো শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কারণ হযরত জিবরাঈল (আ.) এতই শক্তিশালী যে, শয়তান তাঁর কাছেও ঘেঁষতে

পারে না। فَاسْتَوٰى -এর অর্থ– সোজা হয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য এই যে, জিবরাঈলকে যখন প্রথম দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নীচে অবতরণ করছিলেন। অবতরণের পর তিনি উর্ধ্ব দিগন্তে সোজা হয়ে বসে যান। দিগন্তের সাথে উর্ধ্ব সংযুক্ত করার রহস্য এই যে, ভূমির সাথে মিলিত যে দিগন্ত তা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই জিবরাঈলকে উর্ধ্ব দিগন্তে দেখানো হয়েছে।

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى : دَنٰى শব্দের অর্থ– নিকটবর্তী হলো এবং تَدَلّٰى শব্দের অর্থ– ঝুলে গেল। অর্থাৎ, ঝুঁকে পড়ে নিকটবর্তী হলো। فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى : ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সুতার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে قَابَ বলা হয়। এই ব্যবধান আনুমানিক এক হাত হয়ে থাকে। قَابَ قَوْسَيْنِ তথা দুই ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধান বলার কারণ আরবদের একটি বিশেষ অভ্যাস। দুই ব্যক্তি পরস্পরে শান্তিচুক্তি ও সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলে এর এক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত আলামত ছিল হাতের উপর হাত মারা। অপর একটি আলামত ছিল এই যে, উভয়েই আপন আপন ধনুকের কাঠ নিজের দিকে এবং ধনুকের সূতা অপরের দিকে রাখত। এভাবে উভয় ধনুকের সূতা পরস্পরে মিলিত হয়ে যাওয়াকে সম্প্রীতি ও সখ্যতার ঘোষণা মনে করা হতো। এ সময় উভয় ব্যক্তির মাঝখানে দুই ধনুকের 'কাবের' ব্যবধান থেকে যেত অর্থাৎ প্রায় দুই হাত বা একগজ। এপর اَوْ اَدْنٰى বলে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই মিলন সাধারণত প্রথাগত মিলনের অনুরূপ ছিল না; বরং এর চেয়েও গভীর ছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌঁছিয়েছেন তা শ্রবণে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই নৈকট্য ও মিলনের কারণে জিবরাঈল (আ)-কে না চেনা এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ করার আশঙ্কাও বাতিল হয়ে যায়।

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى –এখানে اَوْحٰى ক্রিয়াপদের কর্তা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং عَبْدِهٖ – এর সর্বনাম দ্বারা তাঁকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে শিক্ষক হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সন্নিকটে প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী নাজিল করলেন।

একটি শিক্ষাগত খটকা ও তার জবাব : এখানে বাহ্যত একটি খটকা দেখা দেয় যে, উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে সব সর্বনাম দ্বারা অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় শুধু فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ আয়াতে সর্বনাম দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো পূর্বাপর বর্ণনার বিপরীত এবং اِنْتِشَار ضَمَائِرْ তথা সর্বনামসমূহের বিক্ষিপ্ততার কারণ।

মাওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র) এর জবাবে বলেন : এখানে পূর্বাপর বর্ণনায় কোনো ত্রুটি নেই এবং সর্বনামসমূহের বিক্ষিপ্ততাও নেই; বরং সত্য এই যে, সূরার শুরুতে اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰى বলে যে, বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছিল, তারই ধারাবাহিক বর্ণনা এভাবে করা হয়েছে যে, ওহী প্রেরণকারী স্পষ্টত আল্লাহ ব্যতীত কেউ নয়। কিন্তু এই ওহী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে জিবরাঈল (আ) ছিলেন মাধ্যম। কয়েকটি আয়াতে এই মাধ্যমের পূর্ণ সত্যায়ন করার পর পুনরায় اَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ করা হয়েছে। সুতরাং এটা প্রথম বাক্যেরই পরিশিষ্ট। একে সর্বনামের বিক্ষিপ্ততা বলা যায় না। কারণ, اَوْحٰى এবং عَبْدِهٖ এসবের সর্বনাম দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো ছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনাই যে নেই, এটা স্বতঃসিদ্ধ। مَاۤ اَوْحٰى অর্থাৎ যা ওহী করার ছিল। এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা অস্পষ্ট রেখে এর মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারীর হাদীস থেকে জানা যায় যে, তখন সূরা মুদ্দাসসিরের শুরু ভাগের কতিপয় আয়াত ওহী করা হয়েছিল।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন বাস্তবিকই সত্য কালাম। হাদীসবিদগণ যেমন হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পুরোপুরি বর্ণনা করেন, তেমনি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম হচ্ছেন জিবরাঈল (আ)। আয়াতসমূহে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর উচ্চমর্যাদা ও শক্তিসম্পন্ন হওয়ার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা যেন সনদের মাধ্যমে ন্যায়ানুগ সত্যায়ন।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى : فُؤَادُ শব্দের অর্থ– অন্তঃকরণ। উদ্দেশ্য এই যে, চক্ষু যা কিছু দেখেছে, অন্তঃকরণও তা যথাযথ উপলব্ধি করতে কোনো ভুল করেনি। এই ভুল ও ত্রুটিকেই আয়াতে كَذَبَ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ, দেখা বস্তু উপলব্ধি করার ব্যাপারে অন্তঃকরণ মিথ্যা বলেনি। مَا رَاٰى শব্দের অর্থ– যা কিছু দেখেছে। কি দেখেছে, কুরআনে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদগণের উক্তি দ্বিবিধ। কারও কারও মতে স্বয়ং আল্লাহ

তা'আলাকে দেখেছে এবং কারও কারও মতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে আসল আকৃতিতে দেখেছে। এই তাফসীর অনুযায়ী رای শব্দটি আক্ষরিক অর্থে (চর্মচক্ষে দেখার অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা দেখার অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আয়াতে অন্তঃকরণকে উপলব্ধি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতে উপলব্ধি করা বোধশক্তির কাজ। এই প্রশ্নের জবাব এই যে, কুরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, উপলব্ধির আসল কেন্দ্র অন্তঃকরণ। তাই কখনও বোধশক্তিকেও কলব (অন্তঃকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দেওয়া হয়; যেমন لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ আয়াতে কলব বলে বিবেক ও বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। কুরআন পাকের لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى : نَزْلَةً اُخْرٰى -এর অর্থ– দ্বিতীয়বারের অবতরণ। এই অবতরণও হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে প্রথম দেখার স্থান যেমন মক্কার উর্ধ্ব দিগন্ত বলা হয়েছিল, তেমনি দ্বিতীয়বার দেখার স্থান সপ্তম আকাশের 'সিদরাতুল-মুন্তাহা' বলা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, মে'রাজের রাত্রিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন এতে করে দ্বিতীয়বার দেখার সময়ও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অভিধানে 'সিদরাহ' শব্দের অর্থ– বদরিকা বৃক্ষ। মুন্তাতাহা শব্দের অর্থ– শেষপ্রান্ত। সপ্তম আকাশে আরশের নীচে এই বদরিকা বৃক্ষ অবস্থিত। মুসলিমের রেওয়ায়েতে একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় রেওয়ায়েতের সমম্বয় এভাবে হতে পারে যে, এই বৃক্ষের মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। –(কুরতুবী) সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে মুন্তাহা বলা হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ তা'আলার বিধানবলি প্রথমে 'সিদরাতুল-মুন্তহায়' নাজিল হয় এবং এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী আমলনামা ইত্যাদিও ফেরেশতাগণ এখানে পৌঁছায় এবং এখান থেকে অন্য কোনো পন্থায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। মুসনাদে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে একথা বর্ণিত আছে।–(ইবনে-কাসীর)।

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى - مَاْوٰى শব্দের অর্থ– ঠিকানা, বিশ্রামস্থল। জান্নাতকে مَاْوٰى বলার কারণ এই যে, এটাই মানুষের আসল ঠিকানা। হযরত আদম (আ.) এখানেই সৃজিত হন, এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং এখানেই জান্নাতীরা বসবাস করবে।

জান্নাত ও জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান : এই আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, জান্নাত এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস তাই যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কেয়ামতের পর সৃজিত হবে না। এখনও এগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এই আয়াত থেকে একথাও জানা গেল যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপর আরশের নীচে অবস্থিত। সপ্তম আকাশ যেমন জান্নাতের ভূমি এবং আরশ তার ছাদ। কুরআনের কোনো আয়াতে অথবা হাদীসের কোনো রেওয়ায়েতে জাহান্নামের অবস্থানস্থল পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়নি। সূরা তূরের আয়াত وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ থেকে কোনো কোনো তাফসীরবিদ এই তথ্য উদ্ধার করেছেন যে, জাহান্নাম সমুদ্রের নিম্নদেশে পৃথিবীর অর্ভল গভীরে অবস্থিত। বর্তমানে তার উপর কোনো ভারি ও শক্ত আচ্ছাদন রেখে দেওয়া হয়েছে। কেয়ামতের দিন এই আচ্ছাদন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের অগ্নি বিস্তৃত হয়ে সমুদ্রকে অগ্নিতে রূপান্তরিত করে দিবে। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ মৃত্তিকা খনন করে ভূগর্ভের অপর প্রান্তে যাওয়ার প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত রেখেছে। তারা বিপুলায়তন যন্ত্রপাতি এ কাজের জন্যে আবিষ্কার করেছে। যে দল একাজে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে, তারা মেশিনের সাহায্যে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ছয় মাইল গভীর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। এরপর শক্ত পাথরের এমন একটা স্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যার কারণে তাদের খননকার্য এগুতে পারেনি। তারা অন্য জায়গায় খনন আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখানেও ছয় মাইলের পর তারা শক্ত পাথরের সম্মুখীন হয়েছে। এভাবে একাধিক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ছয় মাইলের পর সমগ্র ভূগর্ভের উপর এমন একটি কঠিন শীলার আবরণ রয়েছে, যাতে কোনো মেশিন কাজ করতে সক্ষম নয়। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর ব্যাস হাজার হাজার মাইল। তন্মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে বিজ্ঞান মাত্র ছয় মাইল পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর প্রস্তরাবরণের অস্তিত্ব স্বীকার করে প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, সমগ্র ভূগর্ভকে কোনো প্রস্তরাবরণ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। যদি কোনো সহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম এই প্রস্তরাবরণের নীচে অবস্থিত, তবে তা মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না।

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى : অর্থাৎ যখন বদরিকা বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আচ্ছন্নকারী বস্তু। মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তখন বদরিকা বৃক্ষের উপর স্বর্ণ নির্মিত প্রজাপতি চতুর্দিক থেকে এসে পতিত হচ্ছিল মনে হয়, আগন্তুক মেহমান রাসূলে কারীম ﷺ-এর সম্মানার্থে সেদিন বদরিকা বৃক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল।

مَازَاغَ الْبَصَرُ وَ مَاطَغٰى - زَاغَ শব্দটি زَيْغٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বক্র হওয়া, বিপদগামী হওয়া। طَغٰى শব্দটি طُغْيَانٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– সীমালঙ্ঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু দেখেছেন, তাতে দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি। এতে সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, মাঝে মাঝে মানুষেরও দৃষ্টিবিভ্রম করে বিশেষ করে যখন সে কোনো বিস্ময়কর অসাধারণ বস্তু দেখে। এর জবাবে কুরআন দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা দুই কারণে দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে– ১. দৃষ্টি দেখার বস্তু থেকে সরে গিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেলে مَا زَاغَ বলে এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলের দৃষ্টি অন্য বস্তুর উপর নয়; বরং যা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তার উপরই পতিত হয়েছে। ২. দৃষ্টি উদ্দিষ্ট বস্তুর উপর পতিত হয়; কিন্তু সাথে সাথে এদিক-সেদিক অন্য বস্তুও দেখতে থাকে। এতেও মাঝে মাঝে বিভ্রম হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ধরনের দৃষ্টিবিভ্রমের জবাবে وَمَاطَغٰى বলা হয়েছে।

যারা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীরে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখার কথা বলেন, তাদের মতে এই আয়াতেরও অর্থ এই যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখার ব্যাপারে দৃষ্টি ভুল করেনি। এই বর্ণনার প্রয়োজন এজন্যে দেখা দিয়েছে যে, জিবরাঈল (আ.) হলেন ওহীর মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তাঁকে উত্তমরূপে না দেখেন এবং না চেনেন, তবে ওহী সন্দেহমুক্ত থাকে না।

পক্ষান্তরে যারা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীরে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার কথা বলেন, তারা এখানেও বলেন যে, আল্লাহর দীদারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টি কোনো ভুল করেনি; বরং ঠিক ঠিক দেখেছে। তবে এই আয়াত চর্মচক্ষে দেখার বিষয়টিকে আরও অধিক ফুটিয়ে তুলেছে।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহের তাফসীরে আরও একটি বক্তব্য : সূরা নাজমের আয়াতসমূহে সাহাবী, তাবেয়ী, মুজতাহিদ ইমাম, হাদীসবিদ ও তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি ও শিক্ষাগত খট্‌কা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। 'মুশকিলাতুল কুরআন' গ্রন্থে মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র.) এসব আয়াতের তাফসীর এভাবে করেছেন যে, উপরিউক্ত বিভিন্ন রূপ উক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়। এই তাফসীরে দেখার পূর্বে কতিপয় সর্ববাদীসম্মত বিষয় দৃষ্টির সামনে থাকা উচিত।

এক. রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। এই উভয়বার দেখার কথা সূরা নজমের আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয়বার দেখার বিষয়টি আয়াত থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এই দেখা সপ্তম আকাশে 'সিদরাতুল-মুন্তাহার' নিকটে হয়েছে। বলা বাহুল্য, মি'রাজের রাত্রিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। এভাবে দেখার স্থান ও সময়কাল উভয়ই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। প্রথম দেখার স্থান ও সময়কাল আয়াত দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। কিন্তু সহীহ বুখারীতে বর্ণিত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে এই দু'টি বিষয় নির্দিষ্টরূপে জানা যায়।

قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهٖ بَيْنَ اَنَا اَمْشِيْ اِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَ نِيْ بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَرَعَبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ اِلٰى قَوْلِهٖ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর বিরতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন : একদিন আমি যখন পথে চলমান ছিলাম, হঠাৎ আকাশের দিক থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি উপরের দিকে দৃষ্টি তুলতেই দেখি যে, ফেরেশতা হেরা গিরিগুহায় আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত একটি কুরসীতে উপবিষ্ট রয়েছেন। এই দৃশ্য দেখার পর আমি ভীত হয়ে গৃহে ফিরে এলাম এবং বললাম : আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করে দাও। তখন আল্লাহ তা'য়ালা সূরা মুদ্দাসসিরের আয়াত وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ পর্যন্ত নাযিল করলেন এবং এরপর অবিরাম ওহীর আগমন অব্যাহত থাকে।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখার প্রথম ঘটনা ওহীর বিরতিকালে মক্কায় তখন সংঘটিত হয়, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা শহরে কোথাও গমনরত ছিলেন। কাজেই প্রথম ঘটনা মেরাজের পূর্বে মক্কায় এবং দ্বিতীয় ঘটনা মেরাজের রাত্রিতে সপ্তম আকাশে ঘটে।

দুই. এ বিষয়টিও সর্ববাদীসম্মত যে, সূরা নাজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহ (কমপক্ষে وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى থেকে لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত) মে'রাজের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

উপরিউক্ত বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র) সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহের তাফসীর এভাবে করেছেন। :

কুরআন পাক সাধারণ রীতি অনুযায়ী সূরা নাজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। যথা–

১. জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতেই তখন দেখা, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর বিরতিকালে মক্কায় কোথাও গমনরত ছিলেন। এটা মে'রাজের পূর্ববর্তী ঘটনা।

২. মে'রাজের ঘটনা। এতে জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দ্বিতীয়বার দেখার চেয়ে আল্লাহর অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ এবং মহান নির্দশনাবলি দেখার কথা অধিক বিধৃত হয়েছে। এসব নির্দশনের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহর জেয়ারত ও দীদার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রেসালাত ও তাঁর ওহীর ব্যাপারে সন্দেহকারীদের জবাব দেওয়াই সূরা নাজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহের আসল উদ্দেশ্য। নক্ষত্রের কসম খেয়ে আল্লাহ বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে যা কিছু বলেন এতে কোনো ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তির আশঙ্কা নেই। তিনি নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো কিছু বলেন না; বরং তাঁর কথা সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ হয়ে থাকে। অত:পর এই ওহী যেহেতু জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয় তিনি গুরু ও প্রচারক হিসেবে ওহী পৌছান তাই জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলি ও মাহাত্ম্য কয়েক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ের বিবরণ অধিক মাত্রায় বর্ণনা করার কারণ সম্ভবত এই যে, মক্কার কাফেররা ইসরাফিল ও মিকাঈল ফেরেশতা সম্পর্কে অবগত ছিল, জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। মোটকথা, জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলি উল্লেখ করার পর পুনরায় আসল বিষয়বস্তু ওহীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে– فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى এ পর্যন্ত এগারটি আয়াতে ওহী ও রেসালত সপ্রমাণ করার প্রসঙ্গে জিবরাঈল (আ.)-এর গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব গুণ জিবরাঈল (আ.)-এর জন্যই স্বাভাবিকভাবে প্রযোজ্য। কোনো কোনো তাফসীরবিদের অনুরূপ এগুলোকে যদি আল্লাহ তা'আলার গুণ সাব্যস্ত করা হয়, তবে দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। উদাহরণত دَنٰى فَتَدَلّٰى এবং فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى - ذُوْ مِرَّةٍ - شَدِيْدُ الْقُوٰى ইত্যাদি বিশ্লেষণকে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে তো আল্লাহ তায়ালার জন্য প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এগুলো জিবরাঈল (আ.)-এর জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত দেখা, নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি সব জিবরাঈল (আ.)-কে দেখার সাথে সম্পৃক্ত করাই অধিক সঙ্গত ও নিরাপদ মনে হয়।

তবে এরপর দ্বাদশতম আয়াত مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى থেকে لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ.)-কে দ্বিতীয়বার আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণিত হলেও তা অন্য নিদর্শনাবলি বর্ণনায় দিক দিয়ে প্রাসঙ্গিক। এর এসব নিদর্শনের মধ্যে আল্লাহর দীদার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও উপেক্ষণীয় নয়। সমর্থনে সহীহ হাদীস এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্ত রয়েছে। তাই مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى আয়াতের তাফসীর এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চর্মচক্ষে যা দেখেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ তার সত্যায়ন করেছে যে, ঠিকই দেখেছেন। এই সত্যায়নে অন্তঃকরণ কোনো ভুল করেনি। এখানে "যা কিছু দেখেছেন" –এই ভাষ্যের মধ্যে জিবরাঈল (আ.)-কে দেখাও শামিল আছে এবং মি'রাজের রাত্রিতে যা যা দেখেছেন সবই অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণবিষয় হচ্ছে আল্লাহ দীদার জিয়ারত। পরবর্তী আয়াত দ্বারাও এর সমর্থন হয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى -এতে কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, পয়গাম্বর যা কিছু দেখেছেন এবং ভবিষ্যতে দেখবেন, তা সন্দেহ ও বিতর্কের বিষয়বস্তু নয়-চাক্ষুষ সত্য। আয়াতে مَا يَرٰى -এর পরিবর্তে مَا قَدْرًا হয়নি। এতে মে'রাজের রাত্রিতে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী দেখার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى আয়াতে এর পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতেও জিবরাঈল (আ)-কে দেখা এবং আল্লাহকে দেখা-এই উভয় উদ্দেশ্য হতে পারে। জিবরাঈল (আ.)-কে দেখার বিষয়টি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। আল্লাহকে দেখার প্রতি এভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, দেখার জন্য নৈকট্য স্বভাবতই জরুরি। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা শেষ রাত্রিতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। আয়াতের অর্থ এই যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নৈকট্যের স্থান 'সিদরাতুল-মুন্তাহার' কাছে ছিলেন, তখন দেখেছেন। এতে আল্লাহর জেয়ারতও উদ্দেশ্য হওয়ার পক্ষে এই হাদীস সাক্ষ্য দেয় ঃ

وَاَتَيْتُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَتْنِىْ ضَبَابَةٌ خَرَرْتُ لَهَا سَاجِدًا وَهٰذِهِ الضَّبَابَةُ فِى الظُّلَلِ مِنَ الْغَمَامِ الَّتِىْ يَاْتِىْ فِيْهَا اللّٰهُ وَيَتَجَلّٰى -

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি 'সিদরাতুল মুন্তাহা'র নিকটে পৌছলে মেঘমালার ন্যায় এক প্রকার বস্তু আমাকে ঘিরে ফেলল। আমি এর পরিপ্রেক্ষিতে সেজদাবনত হয়ে গেলাম। কুরআন পাকের এক আয়াতে উল্লিখিত আছে যে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা এমনভিাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। মেঘমালার ছায়ার ন্যায় এক প্রকার বস্তুতে আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করবেন।

এমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى -এর অর্থেও উভয় দেখা শামিল রয়েছে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই দেখা জাগ্রত অবস্থায় চর্মচক্ষে হয়েছে। সারকথা এই যে, মে'রাজের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতসমূহে দেখা সম্পর্কে যেসব বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, সবগুলোতে জিবরাঈল (আ) -কে দেখা ও আল্লাহ তা'আলাকে দেখা- উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। কেউ কেউ এসব আয়াতের তাফসীরে আল্লাহকে দেখার কথা বলেছেন এবং কুরআনের ভাষায় এরূপ অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে।

আল্লাহর দীদার ঃ সকল সাহাবী, তাবেয়ী এবং অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, পরকালে জান্নাতীগণ তথা সর্বশ্রেণির মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করবেন। সহীহ হাদীসসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর দীদার কোনো অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। তবে দুনিয়াতে এই দীদারকে সহ্য করার মতো শক্তি মানুষের দৃষ্টিতে নেই। তাই দুনিয়াতে কেউ এই দীদার লাভ করতে পারে না। পরকালের ব্যাপারে খোদ কুরআন বলে ঃ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ অর্থাৎ, পরকালে মানুষের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী করে দেওয়া হবে এবং যবনিকা সরিয়ে নেওয়া হবে। কেননা, মানুষের দৃষ্টি ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ তা'আলা অক্ষয়। পরকালে যখন মানুষকে অক্ষয় দৃষ্টি দান করা হবে, তখন আল্লাহর দীদারে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কাযী আয়ায (রহ.) থেকেও প্রায় এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে এবং সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে একথা প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتّٰى تَمُوْتُوْا ; এ থেকে এ বিষয়ের সম্ভাবনাও বুঝা যায় যে, দুনিয়াতেও কোনো সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দৃষ্টিতে বিশেষভাবে সেই শক্তি দান করা যেতে পারে, যা দ্বারা তিনি আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মে'রাজের রাত্রিতে যখন সপ্ত আকাশ, জান্নাত, জাহান্নাম ও আল্লাহর বিশেষ নিদর্শনাবলি অবলোকন করার জন্যই তিনি স্বতন্ত্রভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার দীদারের ব্যাপারটি দুনিয়ার সাধারণ বিধি থেকেও ব্যতিক্রম ছিল। কারণ, তখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন না। সম্ভাবনাময় প্রমাণিত হওয়ার পর প্রশ্ন থেকে যায় যে, দীদার বাস্তবে হয়েছে কি না? এ ব্যাপারে হাদীসের রেওয়ায়েত বিভিন্নরূপ এবং কুরআনের আয়াত সম্ভাবনা ও অবকাশযুক্ত। এ কারণেই এ বিষয়ে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণের পূর্বাপর মতভেদ চলে আসছে। ইবনে কাছীর (র.) এসব আয়াতের তাফসীরে বলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করেছেন। কিন্তু সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইবনে কাছীর (র.) অতঃপর উভয় দলের প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই মতবিরোধ উল্লেখ করার পর কিছু উক্তি এমনও উদ্ধৃত করেছেন, যা দ্বারা উপরিউক্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। তিনি আরো বলেছেন কুরতুবীর মতে এ ব্যাপারে কোনো ফয়সালা না করা এবং নীরব থাকাই শ্রেয়। কেননা, এ বিষয়টির সঙ্গে কোনো 'আমল' জড়িত নয়; বরং এটা বিশ্বাসগত প্রশ্ন। এতে অকাট্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভবপর নয়। কোনো বিষয় অকাট্যরূপ না জানানো পর্যন্ত সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই বিধান। আমার মতে এটাই নিরাপদ ও সাবধানতার পথ। তাই এ প্রশ্নের দ্বি-পাক্ষিক যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ করা হলো না।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত, রেসালাত ও তাঁর ওহী সংরক্ষিত হওয়ার প্রমাণাদি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা কোনো দলিল ব্যতিরেকেই বিভিন্ন প্রতিমাকে উপাস্য ও কার্যনির্বাহী সাব্যস্ত করে রয়েছে এবং ফেরেশতাকুলকে আল্লাহর কন্যা আখ্যায়িত করেছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা প্রতিমাদেরকেও আল্লাহর কন্যা বলত।

আরবের মুশরিকরা অসংখ্য প্রতিমার পূজা করত। তন্মধ্যে তিনটি প্রতিমা ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। আরবের বড় বড় গোত্র এগুলোর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছিল। প্রতিমাত্রয়ের নাম ছিল লাত, ওযযা ও মানাত। লাত তায়েফের অধিবাসী সকীফ গোত্রের, ওযযা কুরাইশ গোত্রের এবং মানাত বনী হেলালের প্রতিমা ছিল। এসব প্রতিমার অবস্থানস্থলে মুশরিকরা বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব গৃহকে কা'বার অনুরূপ মর্যাদা দান করা হতো। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব গৃহ ভূমিসাৎ করে দেন। -(কুরতুবী)

قِسْمَةٌ ضِيْزٰى . ضِيْزٰى শব্দটি ضَيْزٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ- জুলুম করা, অধিকার খর্ব করা। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) قِسْمَةٌ ضِيْزٰى -এর অর্থ করেছেন নিপীড়নমূলক বন্টন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

هَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهَوٰى মূলবর্ণ (ه - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তা অস্ত যেতে থাকে, নিচে নেমে পড়ে।

مَا غَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَوَايَةُ ও اَلْغَىُّ মূলবর্ণ (غ – و – ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তিনি বিপথগামী হননি, বিভ্রান্তি হননি।

تَدَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّدَلِّىْ মূলবর্ণ (د - ل - ى) জিনস ناقص يائ অর্থ– সে নিকটবর্তী হলো।

اَدْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّنُوُّ মূলবর্ণ (د – ن – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে আরো নিকট হলো।

اَوْحٰى : সীগাহ واحد مزكرغائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ(و – ح – ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- আল্লাহ ওহী নাজিল করলেন।

مَا كَذَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكِذْبُ মূলবর্ণ (ك – ذ –ب) জিনস صحيح অর্থ- সে কোনো ভুল করেনি।

تُمَارُوْنَهٗ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُمَارَةُ মূলবর্ণ (م - ر - ة) জিনস صحيح; ه যমীরে واحد مذكر غائب মাফউলে বিহী; অর্থ– তোমরা ঝগড়া করছ, বিতর্ক করছ কোনো বিষয়ে সন্দেহ করা।

تَهْوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْهَوٰى মূলবর্ণ (ه - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– স্বীয় প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষার উপর আসক্ত হয়।

قَوْسَيْنِ : قَوْسٌ-এর দ্বিবচন, অর্থ– দুই ধনুক قَوْسٌ যদিও جَامِدٌ ; কিন্তু এর থেকে মাসদার এবং মাসদার থেকে বানানো হয়েছে, বাবে تَفْعِيْل এবং تَفَعُّلٌ থেকে সাধারণত এর বিভিন্ন ইসমে ফে'ল আসে। اِفْعَالٌ এ ثلاثى مجرد। تَقَوَّسَ ঝুঁকে যাওয়া, দাঁড়িয়ে যাওয়া। قَوَّسَ الشَّيْخُ وَتَقَوَّسَ বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে গেছে। এর ব্যবহার বাবে سَمِعَ থেকে হয়েছে। মূলবর্ণ (ق - و - س) জিনস اَجْوَف وَاوى

مَا زَاغَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزَّيْغُ মূলবর্ণ (ز - ى - غ) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে বিভ্রম হয়নি।

ضِيْزٰى : صِفَتٌ বাব ضَرَبَ . فَتَحَ মাসদার اَلضَّيْزُ মূলবর্ণ (ض - ى - ز) জিনস اجوف يائى অর্থ– অশোভনীয়।

تَمَنّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَمَنِّىْ মূলবর্ণ (م - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى : এখানে ما টি نافيه এবং زَاغَ الْبَصَرُ শব্দে زاغ ফে'লে মাজি এবং اَلْبَصَرُ টি فاعل আর وَمَا طَغٰى হচ্ছে مَا زَاغَ -এর উপর عطف অর্থাৎ مَا مَالَ بَصَرُه عَنْ مَرْئِيِّهٖ، وَلَاجَاوَزَه تِلْكَ اللَّيْلَةَ - (ই'রাবুল কুরআন খ. ৭, পৃ. ৩২৬)

২৬. আর আসমানসমূহে অসংখ্য ফেরেশতা আছে, তাদের সুপারিশ কিছু কাজে আসবে না, কিন্তু তার পর যে, আল্লাহ যার জন্য চান অনুমতি প্রদান করেন এবং [তার সুপারিশে] সন্তুষ্ট হন।	وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾
২৭. যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী, তারাই ফেরেশতাগণকে নামকরণ করে ‘কন্যা’ নামে।	اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ﴿٢٧﴾
২৮. অথচ তাদের নিকট তার কোনো প্রমাণ নেই। শুধু ভিত্তিহীন কল্পনার উপর চলছে, আর নিঃসন্দেহে ভিত্তিহীন কল্পনা সত্য বিষয় প্রতিপাদনে একটুও ফলপ্রদ হয় না।	وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾
২৯. সুতরাং আপনি এরূপ ব্যক্তি হতে নিজের খেয়াল ফিরিয়ে নিন যে আমার নসিহতের প্রতি লক্ষ্য করে না এবং পার্থিব জীবন ব্যতীত তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য না হয়।	فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾
৩০. তাদের জ্ঞানের দৌড় এই [পার্থিব জীবন] পর্যন্তই; আপনার প্রভু খুব জ্ঞাত আছেন কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে, আর তিনি তাকেও খুব জানেন যে সৎপথে রয়েছে।	ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ আর আসমানসমূহে অসংখ্য ফেরেশতা আছে لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا তাদের সুপারিশ কিছু কাজে আসবে না اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ কিন্তু তার পর যে, اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ আল্লাহ অনুমতি প্রদান করেন لِمَنْ يَّشَآءُ যার জন্য চান وَيَرْضٰى এবং সন্তুষ্ট হন।

২৭. اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ তারাই ফেরেশতাগণকে নামকরণ করেন تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى কন্যা নামে।

২৮. وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ অথচ তাদের নিকট এর কোনো প্রমাণ নেই اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ শুধু ভিত্তিহীন কল্পনার উপর চলছে وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا আর নিঃসন্দেহে ভিত্তিহীন কল্পনা সত্য বিষয়ে (প্রতিপাদনে) একটুও ফলপ্রদ হয় না।

২৯. فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى সুতরাং আপনি এরূপ ব্যক্তি হতে নিজের খেয়াল ফিরিয়ে নিন عَنْ ذِكْرِنَا যে আমার নসিহতের প্রতি লক্ষ্য করে না وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا এবং পার্থিব জীবন ব্যতীত তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য না হয়।

৩০. ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ আপনার প্রভু খুব জ্ঞাত আছেন بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে وَهُوَ اَعْلَمُ আর তিনি তাকেও জানেন بِمَنِ اهْتَدٰى যে সৎপথে রয়েছে।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾

৩১. আর যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে আছে, তা আল্লাহরই ক্ষমতাধীন, পরিণামে যারা মন্দ কাজ করেছে, তিনি তাদেরকে তাদের কর্মের বিনিময়ে প্রতিফল প্রদান করবেন, আর যারা ভালো কাজ করেছে, তাদেরকে তাদের নেক কাজের বিনিময়ে প্রতিদান দিবেন।

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿٣٢﴾

৩২. তারা কবিরা গুনাহসমূহ হতে এবং নির্লজ্জতার বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ ব্যতীত; নিঃসন্দেহে আপনার প্রভুর ক্ষমা বড়ই ব্যাপক; তিনি তোমাদেরকে খুব জানেন যখন তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন, আর যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে, অতএব, তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করো না; পরহেজগারদেরকে তিনিই খুব জানেন।

اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى ﴿٣٣﴾

৩৩. আচ্ছা, আপনি কি এমন লোককে দেখেছেন? যে [সত্য পথ হতে] মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ﴿٣٤﴾

৩৪. আর [নিজ স্বার্থে] সামান্য অর্থ দান করে এবং বন্ধ করে দেয়।

اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ﴿٣٥﴾

৩৫. এ ব্যক্তির নিকট কি কোনো গায়বি জ্ঞান আছে যে, তা দেখছে [যে অমুক ব্যক্তি তার পক্ষ হতে আজাব ভোগ করবে]?

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ আর যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে আছে তা আল্লাহরই ক্ষমতাধীন لِيَجْزِيَ পরিণামে তিনি প্রতিফল প্রদান করবেন الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا যারা মন্দ কাজ করেছে তাদেরকে بِمَا عَمِلُوْا তাদের কর্মের বিনিময়ে وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى আর যারা ভালো কাজ করেছে তাদেরকে তাদের নেক কাজের বিনিময়ে প্রতিদান দিবেন।

৩২. اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ তারা বেঁচে থাকে كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ কবিরা গুনাহসমূহ হতে وَالْفَوَاحِشَ এবং নির্লজ্জতার বিষয়সমূহ হতে اِلَّا اللَّمَمَ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ ব্যতীত اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ নিঃসন্দেহে আপনার প্রভুর ক্ষমা বড়ই ব্যাপক هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ তিনি তোমাদেরকে খুব জানেন اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ যখন তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ আর যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ অতএব তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করো না هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى পরহেজগারদেরকে তিনিই খুব জানেন।

৩৩. اَفَرَءَيْتَ আচ্ছা, আপনি কি এমন লোককে দেখেছেন الَّذِيْ تَوَلّٰى যে (সত্য পথ হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৩৪. وَاَعْطٰى قَلِيْلًا আর (নিজ স্বার্থে) সামান্য অর্থ দান করে وَّاَكْدٰى এবং বন্ধ করে দেয়।

৩৫. اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ এ ব্যক্তির নিকট কি কোনো গায়বি জ্ঞান আছে যে, فَهُوَ يَرٰى তা দেখছে।

৩৬. তার নিকট কি এর সংবাদ পৌছেনি? যা মূসার সহীফাগুলোতে রয়েছে।	أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾
৩৭. এবং ইবরাহীমের [সহীফাগুলোতে]-ও যিনি নির্দেশাবলি পুরাপুরি পালন করেছেন।	وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾
৩৮. [সে বিষয়টি] এই যে, কেউ কারো গুনাহ নিজের উপর নিতে পারে না।	أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾
৩৯. আর মানুষ শুধু নিজের অর্জিত বস্তুই প্রাপ্ত হবে।	وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾
৪০. আর এটাও যে, মানুষের চেষ্টা অচিরেই দেখা যাবে।	وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾
৪১. অতঃপর তাকে পূর্ণ বিনিময় দেওয়া হবে।	ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾
৪২. আর এটাও যে, [সকলকে] আপনার প্রভুর নিকটেই পৌছতে হবে।	وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴿٤٢﴾
৪৩. আর এটাও যে, তিনিই হাসান এবং কাঁদান।	وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর তিনিই মারেন এবং তিনিই বাঁচান।	وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾
৪৫. আর এটাও যে, তিনিই উভয় প্রকার সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ নর ও নারীকে সৃষ্টি করেন–	وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾
৪৬. শুক্র দ্বারা, যখন তা [মাতৃগর্ভে] নিক্ষেপ করা হয়।	مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ

৩৬. أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ তার নিকট কি এর সংবাদ পৌছেনি? بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ যা মূসার সহীফাগুলোতে রয়েছে।

৩৭. وَإِبْرَاهِيمَ এবং ইবরাহীমেরও الَّذِي وَفَّىٰ যিনি নির্দেশাবলি পুরাপুরি পালন করেছেন।

৩৮. أَلَّا تَزِرُ (সে বিষয়টি) এই যে, কেউ নিজের উপর নিতে পারে না وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ কারো গুনাহ।

৩৯. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ আর মানুষ শুধু প্রাপ্ত হবে إِلَّا مَا سَعَىٰ নিজের অর্জিত বস্তুই।

৪০. وَأَنَّ سَعْيَهُ আর এটাও যে, মানুষের চেষ্টা سَوْفَ يُرَىٰ অচিরেই দেখা যাবে।

৪১. ثُمَّ يُجْزَاهُ অতঃপর তাকে দেওয়া হবে الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ পূর্ণ বিনিময়।

৪২. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ আর এটাও যে, (সকলকে) আপনার প্রভুর নিকটেই الْمُنتَهَىٰ পৌছতে হবে।

৪৩. وَأَنَّهُ هُوَ আর এটাও যে, أَضْحَكَ তিনিই হাসান وَأَبْكَىٰ এবং কাঁদান।

৪৪. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ আর তিনিই মারেন وَأَحْيَا এবং তিনিই বাঁচান।

৪৫. وَأَنَّهُ আর এটাও যে خَلَقَ তিনিই সৃষ্টি করেন الزَّوْجَيْنِ উভয় প্রকার الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ অর্থাৎ নর ও নারীকে।

৪৬. مِن نُّطْفَةٍ শুক্র দ্বারা إِذَا تُمْنَىٰ যখন তা (মাতৃগর্ভে) নিক্ষেপ করা হয়।

অনুবাদ	আয়াত
৪৭. এবং পুনরায় সৃষ্টি করা তাঁরই জিম্মায়।	وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর তিনিই সম্পদশালী করেন এবং পুঁজি স্থায়ী রাখেন।	وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾
৪৯. আর তিনিই শে'রা নক্ষত্রেরও মালিক।	وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾
৫০. আর তিনিই [কুফরির কারণে] প্রাচীন আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন।	وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾
৫১. এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও এমনভাবে যে, [তাদের] কাউকেও অবশিষ্ট রাখেননি।	وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾
৫২. আর তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও [ধ্বংস করেছেন]। নিঃসন্দেহে তারা সর্বাপেক্ষা অধিক জালিম ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল।	وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾
৫৩. আর [লূত সম্প্রদায়ের] উল্টানো জনপদগুলোকেও সজোরে নিক্ষেপ করেছিলেন।	وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾
৫৪. অতঃপর ঐ জনপদগুলোকে আচ্ছন্ন করেছিল যা আচ্ছন্ন করেছিল।	فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾
৫৫. হে মানব! তবে তুমি নিজ প্রভুর কোনো কোনো নিয়ামত সম্বন্ধে সন্দেহ করতে থাকবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾
৫৬. তিনিও পূর্ববর্তী সতর্ককারীগণের ন্যায় একজন সতর্ককারী নবী।"	هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. وَأَنَّ عَلَيْهِ এবং তারই জিম্মায় النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ পুনরায় সৃষ্টি করা।

৪৮. وَأَنَّهُ هُوَ আর তিনিই أَغْنَىٰ সম্পদশালী করেন, وَأَقْنَىٰ এবং পুঁজি স্থায়ী রাখেন।

৪৯. وَأَنَّهُ هُوَ আর তিনিই رَبُّ الشِّعْرَىٰ শে'রা নক্ষত্রেরও মালিক।

৫০. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ আর তিনিই (কুফরির কারণে) ধ্বংস করেছেন عَادًا الْأُولَىٰ প্রাচীন আ'দ সম্প্রদায়কে।

৫১. وَثَمُودَا এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও فَمَا أَبْقَىٰ এমনভাবে যে, (তাদের) কাউকেও অবশিষ্ট রাখেননি।

৫২. وَقَوْمَ نُوحٍ আর নূহ সম্প্রদায়কেও مِنْ قَبْلُ তাদের পূর্বে। إِنَّهُمْ كَانُوا নিঃসন্দেহে তারা ছিল هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ সর্বাপেক্ষা অধিক জালিম ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক।

৫৩. وَالْمُؤْتَفِكَةَ আর (লূত সম্প্রদায়ের) উল্টানো জনপদ গুলোকেও أَهْوَىٰ সজোরে নিক্ষেপ করেছিলেন।

৫৪. فَغَشَّاهَا অতঃপর ঐ জনপদগুলোকে আচ্ছন্ন করেছিল مَا غَشَّىٰ যা আচ্ছন্ন করেছিল।

৫৫. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ হে মানব! তবে তুমি নিজ প্রভুর কোনো কোনো নিয়ামত সম্বন্ধে تَتَمَارَىٰ সন্দেহ করতে থাকবে।

৫৬. هَٰذَا نَذِيرٌ তিনিও একজন সতর্ককারী নবী مِنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ পূর্ববর্তী সতর্ককারী নবীগণের ন্যায়।

৫৭. সে আসন্ন ব্যাপার [কিয়ামত] নিকটে এসে পৌছেছে।	أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾
৫৮. আল্লাহ ব্যতীত কেউই তার অপসারণকারী নেই।	لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾
৫৯. তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্মিত হচ্ছ।	أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾
৬০. এবং হাসছ আর কাঁদছ না।	وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾
৬১. আর তোমরা অহংকারী।	وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾
৬২. অতএব, আল্লাহর অনুগত হও, আর ইবাদত কর।	فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩ ﴿٦٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৭. أَزِفَتِ নিকটে এসে পৌছেছে الْآزِفَةُ সে আসন্ন ব্যাপার।

৫৮. لَيْسَ لَهَا কেউই তার নেই مِنْ دُونِ اللَّهِ আল্লাহ ব্যতীত كَاشِفَةٌ অপসারণকারী।

৫৯. أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ তবে কি এ কথায় تَعْجَبُونَ তোমরা বিস্মিত হচ্ছ।

৬০. وَتَضْحَكُونَ এবং হাসছ وَلَا تَبْكُونَ আর কাঁদছ না।

৬১. وَأَنْتُمْ আর তোমরা سَامِدُونَ অহংকারী।

৬২. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ অতএব আল্লাহর অনুগত হও وَاعْبُدُوا আর ইবাদত কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى

শানে নুযূল : ১. মুকাতিল বিন সুলাইমান (র.) বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত নাবহান নামক একজন খেজুর ব্যবসায়ী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তার একটি খেজুরের দোকান ছিল। তার নিকট একদা খেজুর ক্রয় করার উদ্দেশ্যে এক মহিলা আসে। সুতরাং সে মহিলাটিকে বলল যে, ঘরের ভিতরে তদাপেক্ষা উন্নত খেজুর রয়েছে। অত:পর মহিলাটি যখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন সে তার কাম-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাকে ফুসলিয়ে রাজি করাতে চেয়েছে, কিন্তু মহিলাটি রাজি হয়নি বরং সে ফিরে চলে আসে। এতে করে সে অত্যন্ত লজ্জিত হয়। পরক্ষণে রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ একমাত্র মিলন ছাড়া একটি মানুষ মহিলার সাথে যা কিছু করে আমি তো সব কিছুই করেছি, রাসূল ﷺ বললেন, তার স্বামী হয়তো গাজী হবে। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। (কুরতুবী : ৯৪/১৭)

শানে নুযূল : ২. ইবনে লাহী'আ (র.) হযরত ছাবেত বিন হারেছ আনসারী (র.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, তাদের ছোট ছোট সন্তানেরা যখন মারা যেত, তখন তারা বলত যে, সে হচ্ছে সিদ্দীক। সে সংবাদ রাসূল ﷺ -এর নিকট পৌছলে তিনি বলেন, ইহুদিরা মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সে মাতৃগর্ভেই সৌভাগ্যবান বা হতভাগা। সে সময়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের وَاَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ আয়াতাংশটি নাজিল করেন। –(দুররে মানছুর : ১২৮/৬, কুরতুবী : ৯৮/১৭, রূহুল মা'আনী : ৬৪/১৪/২৭)

শানে নুযূল : ৩. এক বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াতের هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى অংশটুকু ঈমানদারদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে, যারা সৎকাজ করছিল এবং বলত যে, আমাদের নামাজ, রোজা, হজ যখন গর্ব ও লোকদেখানোর জন্য হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণভাবেই নিষিদ্ধ এমন না হলে কোনো ধরনের সমস্যা নেই। এমন না হলে কোনো দূষণীয় নয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য অংশটুকু আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন। -(রূহুল মা'আনী : ৬৪/১৪২৭)

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى - وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى

শানে নুযূল : ১. মুজাহিদ, ইবনে যায়েদ ও মুকাতিল (র.) প্রমুখ বলেন, আলোচ্য আয়াত ওয়ালীদ বিন মুগীরা (রা.) সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। সে ধর্মগত দিক দিয়ে রাসূল ﷺ -এর অনুসরণ করেছিল। অতঃপর কোনো এক মুশরিক তাকে মন্দাচারী করে বলল, পৈত্রিক ধর্ম ছেড়ে দিলে কেন এবং তাদেরকে ভ্রান্ত মনে করে জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করলে কেন? সে বলল, আমি তো আল্লাহর আজাবকে ভয় করি। তখন সেই নরাধম মুশরিক তাকে কিছু মাল দেওয়ার শর্তে তার সমুদয় পাপ-পঙ্কিলতা বহন করে নেবে বলে দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়। অতঃপর ওয়ালীদ সেই নরাধম আল্লাহর আজাব বহন করে নেয়ার শর্তে এ হতভাগা আবার মুশরিক হয়ে যায়। পরবর্তীতে ভর্ৎসনাকারী মুশরিক নরাধমকে যা কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল তার আংশিক দেওয়া হয়েছিল অবশিষ্টটুকু আর দেয়নি। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। মুকাতিল (র.) বলেন, ওয়ালীদ কুরআনের প্রশংসাকারী ছিল। অতঃপর সে তা থেকে সরে দাঁড়াল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। মুকাতিল হতে অপর এক বর্ণনা রয়েছে যে, সে রাসূল ﷺ -কে ঈমান গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অতঃপর তা প্রত্যাখ্যান করে নিল।

শানে নুযূল : ২. হযরত ইবনে আব্বাস, সুদ্দী, কালবী ও মুসাইয়্যিব বিন শরীফ বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এর কারণ ছিল তিনি বেশি দান খয়রাত করতেন। সে জন্য তার দুধভাই আব্দুল্লাহ বিন আবূ সুরাহ বললেন, তুমি এ গুলো কি করছ? আশঙ্কা হচ্ছে এমনভাবে তো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। তখন হযরত উছমান (রা.) বললেন, আমার অনেক পাপ-পঙ্কিলতা ও ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। আমি যা করছি, তা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টিতা অর্জন করাই কাম্য। তখন আব্দুল্লাহ বিন আবূ সুরাহ বলল, তোমার আরোহণের উটটি আমাকে দিয়ে দাও। তোমার সমুদয় পাপ-পঙ্কিলতা আমি বহন করে নেব। সুতরাং তিনি তা তাকে দিয়ে দিলেন এবং সাক্ষী রাখলেন। পরন্তু সদকা খয়রাত যা করতেন তা কিছু কমিয়ে নিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। ইবনে আতীয়া (র.)-এর মতে এ মতামত ভ্রান্ত এর কোনো সঠিক তথ্য নেই।

শানে নুযূল : ৩. সুদ্দী (র.)-এর অপর এক বর্ণনা অনুপাতে আলোচ্য আয়াত আস বিন ওয়ায়েল আসসাহামী সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। এর কারণ ছিল সে কোনো কোনো সময় রাসূল ﷺ -এর সাথে ঐক্যতা পোষণ করত।

শানে নুযূল : ৪. মুহাম্মদ বিন কা'আব আল কারাযী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল বিন হিশাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে বলত যে, মুহাম্মদ একমাত্র সৎচরিত্র সম্পর্কে হুকুম করে থাকেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى আয়াত নাজিল করেন।

–(কুরতুবী : ৯৮-৯৯/১৭, রুহুল মা'আনী : ৬৪-৬৫/১৪/১৭, দুররে মানছূর : ১২৯/৬, বহরে মুহীত্ব : ১৬৩/৮)

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى -

শানে নুযূল : ১. আব্দুর রাজ্জাক ও ইবনে মুনযির প্রমূখ হযরত কাতাদা (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে মানুষেরা শে'রা নামক তারকাটির ইবাদত করত। নক্ষত্র পূঁজা করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল : ২. ফাকেহী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত খুযা'আ বাসীদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। তারা শে'রা নক্ষত্রের ইবাদত করছিল, সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। -(দুররে মানছূর : ১৩১/৬)

وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ .... الآيَة

শানে নুযূল : রাসূল ﷺ যখন নামাজ পড়তেন তখন লোকেরা তার সামনে দিয়ে অহংকারের সাথে যাতায়াত করত। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। -(কানযুন নুকূল : ৯৬, লুবাবুন নুকূল)

ধারণার বিভিন্ন প্রকার ও বিধান : ظَنٌّ শব্দটি আরবি ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। আয়াতে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এটাই মুশরিকদের প্রতিমাপূজার কারণ ছিল। (দুই) এমন ধারণা যা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীতে আসে। "ইয়াকীন" তথা দৃঢ়বিশ্বাস সেই বাস্তবসম্মত অকাট্য জ্ঞানকে বলা হয়, যাতে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই; যেমন কুরআন পাক অথবা হাদীসে মুতাওয়াতির থেকে অর্জিত জ্ঞান। এর বিপরীতে ظَنٌّ তথা ধারণা সেই জ্ঞানকে বলা হয়, যা ভিত্তিহীন কল্পনা তো নয়, বরং দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই দলিল অকাট্য নয়, যাতে অন্য কোনো সম্ভাবনাই না থাকে; যেমন সাধারণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিধি-বিধান। প্রথম প্রকারকে "একিনিয়্যাত" তথা দৃঢ়বিশ্বাসপ্রসূত বিধানাবলি এবং দ্বিতীয় প্রকারকে 'যন্নীয়্যাত' তথা ধারণাপ্রসূত বিধানাবলি বলা হয়ে থাকে। এই প্রকার ধারণা শরিয়তে ধর্তব্য। এর পক্ষে কুরআন ও হাদীসে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এই ধারণাপ্রসূত বিধান অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে সবাই একমত। আলোচ্য আয়াতে যে ধারণাকে নাকচ করা হয়েছে, তার অর্থ অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। তাই কোনো খটকা নেই।

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى .... مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ অর্থাৎ, যারা আল্লাহর স্মরণে বিমুখ এবং একমাত্র পার্থিব জীবনই কামনা করে, আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের দৌড় পার্থিব জীবন পর্যন্তই।

কুরআন পাক পরকালে ও কিয়ামতে অবিশ্বাসীদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছে। পরিতাপের বিষয়, ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন শিক্ষা এবং পার্থিব লোভ-লালসা আজকাল মুসলমানদের অবস্থা তাই করে দিয়েছে। আজকাল আমাদের সকল জ্ঞান-গরিমা ও শিক্ষাগত উন্নতির প্রচেষ্টা কেবল অর্থনীতিকেই কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। আমরা পরকালীন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করি না। আমরা রাসূলে পাক ﷺ -এর নাম উচ্চারণ করি এবং তাঁর সুপারিশ আশা করি কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এহেন অবস্থাসম্পন্নদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেন। (নাউযুবিল্লাহি মিনহা।)

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনকারী সৎকর্মীদের প্রশংসাসূচক আলোচনা করে তাদের পরিচয় এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সাধারণভাবে কবিরা তথা বড় বড় গোনাহ থেকে এবং বিশেষভাবে নির্লজ্জ কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে। এতে لَمَمَ শব্দের মাধ্যমে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম উপরে তাফসীরের সারসংক্ষেপে লিখিত হয়েছে যে, ছোটখাট গোনাহে লিপ্ত হওয়া তাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি থেকে বঞ্চিত করে না।

لَمَمْ শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে দু'রকম উক্তি বর্ণিত আছে। যথা– ১. এর অর্থ সগীরা অর্থাৎ, ছোটখাট গোনাহ। সূরা নিসার আয়াতে একে سَيِّئَاتٌ বলা হয়েছে। اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ এই উক্তিটি হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে ইবনে কাছীর (র.) বর্ণনা করেছেন।

২. এর অর্থ সেসব গোনাহ, যা কদাচিৎ সংঘটিত হয়, অতঃপর তা থেকে তওবা করত: চিরতরে বর্জন করা হয়। এই উক্তিও ইবনে কাছীর (র.) প্রথমে হযরত মুজাহিদ থেকে এবং পরে হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হোরায়রা (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এর সারমর্মও এই যে, কোনো সৎলোক দ্বারা ঘটনাচক্রে কবীরা গোনাহ হয়ে গেলে যদি সে তওবা করে, তবে সে-ও সৎকর্মী ও মুত্তাকীদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে না।

সূরা আলে ইমরানের এক আয়াতে মুত্তাকীদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আয়াত এই :

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ তারাও মুত্তাকীদের তালিকাভুক্ত, যাদের দ্বারা কোনো অশ্লীল কার্য ও কবীরা গোনাহ হয়ে যায় অথবা গোনাহ করে নিজেদের উপর জুলুম করে বসলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহকে স্মরণ করে ও গোনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে গোনাহ ক্ষমা করতে পারে? যা গোনাহ হয়ে যায়, তার উপর অটল থাকে না। অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, সগীরা তথা ছোটখাট গোনাহ বারবার করা হলে এবং অভ্যাস করে নিলে তা কবীরা হয়ে যায়। لَمَمْ হচ্ছে এমন গুনাহ যা বারবার করা হয় না।

সগীরা ও কবীরা গোনাহের সংজ্ঞা সূরা নিসার اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ : اَجِنَّةٌ শব্দটি جَنِيْنٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ– গর্ভস্থিত ভ্রূণ। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ তার নিজের সম্পর্কে ততটুকু জ্ঞান রাখে না, যতটুকু তার স্রষ্টা রাখেন। কেননা, মাতৃগর্ভে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার কোনো জ্ঞান ও চেতনা থাকে না, কিন্তু তার স্রষ্টা বিজ্ঞসুলভ সৃষ্টিকুশলতায় তাকে গড়ে তোলেন। আয়াতে মানুষের অক্ষমতা ও অজ্ঞানতা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, মানুষ যে কোনো ভাল ও সৎকাজ করে, সেটা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহপ্রদত্ত অনুগ্রহ। কারণ, কাজ করার জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনিই তৈরি করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিনিই গতিশীল করেছেন। অন্তরে সৎকাজের প্রেরণা ও সংকল্প তাঁরই তৌফিক দ্বারা হয়। অতএব, মানুষ যতবড় সৎকর্মী, মুত্তাকী ও পরহেজগারই হোক না কেন, নিজ কর্মের জন্যে গর্ব করার অধিকার তার নেই। এছাড়া ভালো-মন্দ সব সমাপ্তি ও পরিণামের উপর নির্ভরশীল। সমাপ্তি ভালো হবে কি মন্দ হবে, তা এখনো জানা নেই। অতএব, গর্ব ও অহংকার কিসের উপর? পরবর্তী আয়াতে এ কথাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى –অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের পবিত্রতা দাবি করো না। কারণ, আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন কে কতটুকু পানির মাছ। শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহভীতির উপর নির্ভরশীল– বাহ্যিক কাজ-কর্মের উপর নয়। আল্লাহভীতিও তা-ই ধর্তব্য, যা মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম থাকে।

হযরত যয়নব বিনতে আবূ সালামা (রা.)-এর পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বাররা' যার অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ আয়াত তেলাওয়াত করত: এই নাম রাখতে নিষেধ করেন। কারণ, এতে সৎ হওয়ার দাবি রয়েছে। অতঃপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে যয়নব রাখা হয়। –(ইবনে কাছীর)

ইমাম আহমদ (র.) আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেন : তুমি যদি কারো প্রশংসা করতেই চাও, তবে একথা বলে করো যে, আমার জানা মতে এই ব্যক্তি সৎ, আল্লাহভীরু। সে আল্লাহর কাছেও পাক পবিত্র কিনা আমি জানি না।

اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى : تَوَلّٰى –এর শাব্দিক অর্থ– মুখ ফেরানো। উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য থেকে মুখ ফেরানো। اَكْدٰى শব্দটি كُدْيَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– সেই প্রস্তরখণ্ড, যা কূপ অথবা ভিত্তি খনন করার সময় মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয় এবং খননকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে اَكْدٰى -এর অর্থ এই যে, প্রথমে কিছু দিল, এরপর হাত গুটিয়ে নিল। উপরে আয়াতের শানে-নুযূলে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করে অতঃপর তা পরিত্যাগ করে অথবা শুরুতে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে কিছু আকৃষ্ট হয়, অতঃপর আনুগত্য বর্জন করে বসে। এই তাফসীর হযরত মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। –(ইবনে কাছীর)

اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى : শানে নুযূলের ঘটনা অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি কোনো এক বন্ধুর এই কথায় ইসলাম ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আজাব আমি মাথা পেতে নেব, সেই নির্বোধ লোকটি বন্ধুর এই কথায় কীরূপে বিশ্বাস স্থাপন করল? তার কাছে কি অদৃশ্যের কোনো জ্ঞান আছে, যা দ্বারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বন্ধু তার শাস্তি মাথা পেতে নেবে এবং তাকে বাঁচিয়ে দেবে? বলাবাহুল্য, এটা নিরেট প্রতারণা। তার কাছে কোনো অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং অন্য কেউ তার পরকালীন শাস্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাঁচাতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি শানে নুযূলের ঘটনা [illegible] দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে যে, দানকার্য শুরু করে তা বন্ধ করে দেওয়ার কারণ এই [illegible] হতে পারে যে, উপস্থিত সম্পদ ব্যয় করে দিলে আবার কোথা থেকে আসবে? এই ধারণা খণ্ডন করার জন্য বলা [illegible] তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যা দ্বারা সে যেমন দেখতে পাচ্ছে যে, এই সম্পদ খতম হয়ে যাবে এবং [illegible] অন্য সম্পদ সে লাভ করতে পারবে না? এটা ভুল। তার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং তার এই ধারণাও সঠিক নয়। [illegible], কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ [illegible] : অর্থাৎ তোমরা যা ব্যয় কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে [illegible] দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা। চিন্তা করলে দেখা যায়, কুরআনের এই বাণীর সত্যতা কেবল টাকা-[illegible] সীমাবদ্ধ নয়; ববং মানুষ দুনিয়াতে যে কোনো শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে, আল্লাহ তা'আলা তার দেহে তার [illegible] সৃষ্টি করতে থাকেন। নতুবা মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি ইস্পাত নির্মিতও হত, তবে ষাট-সত্তর বছর

ব্যবহার করার দরুন তা ক্ষয় হয়ে যেত। পরিশ্রমের ফলে মানুষের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতটুকু ক্ষয় হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের ন্যায় তার বিকল্প ভিতর থেকেই সৃষ্টি করে দেন। অর্থ-সম্পদের ব্যাপারেও তদ্রূপ। মানুষ ব্যয় করতে থাকে আর তার বিকল্প আগমন করতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেন : اَنْفِقْ يَا بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِى الْعَرْشِ اَقْلَالًا অর্থাৎ হে বেলাল! আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাক এবং আশঙ্কা করো না যে, আরশের অধিপতি আল্লাহ তোমাকে নি:স্ব করে দেবেন।- (ইবনে কাছীর)

اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى –এই আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে وَفّٰى বলা হয়েছে। وَفَاء শব্দের অর্থ ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ গুণ, অঙ্গীকার পূরণের কিঞ্চিৎ বিবরণ : উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর আনুগত্য করবেন এবং মানুষের কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি এই অঙ্গীকার সকল দিক দিয়েই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। এতে তাঁকে অনেক অগ্নিপরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হতে হয়েছে وَفّٰى শব্দের এই তাফসীর ইবনে কাছীর, ইবনে জারীর (র.) প্রমুখের মতে।

কোনো কোনো হাদীসে হযরত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ বিশেষ কর্মকাণ্ড বুঝানোর জন্য وَفّٰى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা উপরিউক্ত তাফসীরের পরিপন্থি নয়। কেননা, অঙ্গীকার পালন শব্দটি আসলে ব্যাপক। এতে নিজস্ব কর্মকাণ্ডসহ আল্লাহর বিধানাবলি প্রতিপালন এবং আল্লাহর আনুগত্যও অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়া রেসালাতের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশোধনও এর পর্যায়ভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত কর্মকাণ্ডও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণত: আবূ উসামা (রা.)–এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى আয়াত তেলাওয়াত করে তাঁকে বললেন : তুমি জান এর মর্মার্থ কী? আবূ উসামা (রা) আরজ করলেন : আল্লাহও তাঁর রাসূল ﷺ -ই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: অর্থ এই যে, وَفّٰى عَمَلَ يَوْمِهٖ بِاَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِىْ اَوَّلِ النَّهَارِ অর্থাৎ, তিনি দিনের কাজ এভাবে পূর্ণ করে দেন যে, দিনের শুরুতে (এশরাকের) চার রাকাত নামাজ পড়ে নেন। –(ইবনে কাছীর)

তিরমিযীতে আবূ যর (রা.) বর্ণিত এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اِبْنَ اٰدَمَ اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهٗ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে বনী আদম, দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকাত নামাজ পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সব কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

হযরত মুয়ায ইবনে আনাস (রা.) এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আমি তোমাদেরকে বলছি, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-কে اَلَّذِىْ وَفّٰى খেতাব কেন দিলেন। কারণ এই যে, তিনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল এ আয়াত পাঠ করতেন : فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ –(ইবনে কাছীর)

হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফার বিশেষ নির্দেশ ও শিক্ষা :

কুরআন পাক পূর্ববর্তী কোনো পয়গাম্বরের উক্তি অথবা শিক্ষা উদ্ধৃত করার অর্থ এই হয় যে, এই উম্মতের জন্যও সেটা অবশ্য পালনীয়। তবে এর বিপক্ষে কোনো আয়াত অথবা হাদীস থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। পরবর্তী আঠারো আয়াতে সেই সব বিশেষ শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফায় ছিল। তন্মধ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মগত বিধান মাত্র দুটি। অবশিষ্টগুলো শিক্ষা, উপদেশ ও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলির সাথে সম্পৃক্ত। কর্মগত বিধানদ্বয় এই : اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى এবং وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى - وِزْرَ শব্দের আসল অর্থ– বোঝা। প্রথম আয়াতের অর্থ এই যে, কোনো বোঝা বহনকারী নিজের ছাড়া অপরের বোঝা বহন করবে না। এখানে বোঝা অর্থ হচ্ছে পাপ ও শাস্তির বোঝা। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির শাস্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং অপরের শাস্তি নিজে বরণ করার ক্ষমতাও কারো হবে না।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ অর্থাৎ, কোনো শক্তি যদি পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহন কর, তবে তার বোঝার কিয়দংশও বহন করার সাধ্য কারো হবে না।

একের গোনাহে অপরকে ধৃত করা হবে না : এ আয়াতের শানে নুযূলে বর্ণিত ব্যক্তির ধারণাও অসার প্রমাণিত হয়েছে । সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল। তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করল এবং নিশ্চয়তা দিল যে, কিয়ামতে কোনো আজাব হলে সে নিজে তা গ্রহণ করে তাকে বাঁচিয়ে দেবে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর তা'আলার দরবারে একজনের গোনাহের কারণে অপরকে ধৃত করার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকজন অবৈধ বিলাপ ও ক্রন্দন করলে তাদের এই কর্মের কারণে মৃতের আজাব হয়। এটা সেই ব্যক্তির ব্যাপারে, যে নিজেও মৃতের জন্য বিলাপ ও আহাজারিতে অভ্যস্ত হয় অথবা যে ওয়ারিসদেরকে ওসিয়ত করে যে, তার মৃত্যুর পর যেন বিলাপ ও ক্রন্দনের ব্যবস্থা করা হয়। -(মাযহারী) এমতাবস্থায় তার আজাব তার নিজের কারণে হয়, অন্যের কর্মের কারণে নয়।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ; এর সারমর্ম এই যে, অপরের আজাব যেমন কেউ নিজে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি অপরের কাজ নিজে করার অধিকারও কারো নেই। এতে করে সে অপরকে কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে না। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ফরজ নামাজ আদায় করতে পারে না এবং ফরজ রোজা রাখতে পারে না। এভাবে যে, অপর ব্যক্তি এই ফরজ নামাজ ও রোজা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ঈমান কবুল করতে পারে না, যার ফলে অপরকে মুমিন সাব্যস্ত করা যায়।

আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীরে কোনো আইনগত খট্কা ও সন্দেহ নেই। কেননা হজ্জ ও জাকাতের প্রশ্নে বেশির বেশি এই সন্দেহ হতে পারে যে, প্রয়োজন দেখা দিলে আইনত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করতে পারে অথবা অপরের যাকাত তার অনুমতিক্রমে দিতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই সন্দেহ ঠিক নয়। কারণ, কাউকে নিজের স্থলে বদলী হজ্জের জন্য প্রেরণ করা এবং তার ব্যয়ভার নিজে বহন করা অথবা কাউকে নিজের তরফ থেকে জাকাত আদায় করার আদেশ দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তির নিজের কাজ ও চেষ্টারই অংশ বিশেষ। তাই এটা আয়াতের পরিপন্থি নয়।

'ঈসালে সওয়াব' তথা মৃতকে সওয়াব পৌছানো : উপরে আয়াতের অর্থ এই জানা গেল যে, এক ব্যক্তি অপরের ফরজ ঈমান, ফরজ নামাজ ও ফরজ রোজা আদায় করে তাকে ফরজ থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এতে জরুরি হয় না যে, এক ব্যক্তির নফল ইবাদতের উপকারিতা ও ছওয়াব অন্য ব্যক্তি পেতে পারে না; বরং এক ব্যক্তির দোয়া ও দান-খয়রাতের ছওয়াব অপর ব্যক্তি পেতে পারে। এটা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং আলেমগণের সর্বসম্মত ব্যাপারে। -(ইবনে কাছীর)

কেবল কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব অপরকে দান করা ও পৌছানোর জায়েজ কিনা, এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) মতভেদ করেন। তাঁর মতে এটা জায়েজ নয়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাপক অর্থদৃষ্টে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ ইমাম ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দোয়া ও দান-খয়রাতের ছওয়ার যেমন অপরকে পৌছানো যায়, তেমনি কুরআন তেলাওয়াত ও প্রত্যেক নফল ইবাদতের ছওয়াব অপরকে পৌছানো জায়েজ। এরূপ ছওয়াব পৌছালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা পাবে। কুরতুবী বলেন : অনেক হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, মুমিন ব্যক্তি অপরের সৎ কর্মের ছওয়াব পায়। তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে এসব হাদীস বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফার বরাত দিয়ে যে দু'টি বিধান বর্ণিত হলো, এগুলো অন্যান্য পয়গম্বরের শরিয়তেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাদের আমলে এই মূর্খতাসুলভ প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল যে, পিতার পরিবর্তে পুত্রকে এবং পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে অথবা ভ্রাতা-ভগ্নীকে হত্যা করা হতো। তাঁদের শরিয়ত এই কুপ্রথা বিলীন করেছিল।

وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى : অর্থাৎ, কেবল বাহ্যিক প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রত্যেকের প্রচেষ্টার আসল স্বরূপও দেখা হবে যে, তা একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে করা হয়েছে, না অন্যান্য জাগতিক স্বার্থও এতে শামিল আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ, কেবল দৃশ্যতঃ কর্মই যথেষ্ট নয়। কর্মে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আদেশ পালনের খাঁটি নিয়ত থাকা জরুরি।

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى -উদ্দেশ্য এই যে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহ তা'আলার দিকেই ফিরে যেতে হবে এবং কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে।

কোন কোনো তাফসীরবিদ এই বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনার গতিধারা আল্লাহ তা'আলার সত্তায় পৌঁছে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর সত্তা ও গুণাবলির স্বরূপ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার অনুমতিও নেই; যেমন কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ তা'আলার অবদান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর তাঁর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো না। এটা তোমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। কাজেই বিষয়টিকে আল্লাহর জ্ঞানে সোপর্দ কর।

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى –অর্থাৎ, মানবজাতির মধ্যে আনন্দ ও শোক এবং এর পরিণতিতে হাসি ও কান্না প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করে এবং এতদুভয়কে তাদের বাহ্যিক কারণাদির সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যাপার শেষ করে দেয়। অথচ ব্যাপারটি চিন্তা-ভাবনা সাপেক্ষ। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বুঝা যায় যে, কারো আনন্দ অথবা শোক এবং হাসি ও কান্না স্বয়ং তার কিংবা অন্য কারো করায়ত্ত নয়। এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেন এবং তিনিই কারণ দিকে ক্রিয়াশক্তি দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে ক্রন্দনকারীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন এবং হাস্যরতদেরকে এক মিনিটের মধ্যে কাঁদিয়ে দিতে পারেন।

কবি চমৎকার বলেছেন : بگوش گل چہ سخن گفتہ کہ خندان ست * بعندلیب چہ فرمودۂ کہ نالان ست

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى : غناء শব্দের অর্থ ধনাঢ্যতা এবং اغناء শব্দে অর্থ অপরকে ধনাঢ্য করা। أَقْنَى শব্দটি قِنْيَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– সংরক্ষিত ও রিজার্ভ সম্পদ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে ধনবান ও অভাবমুক্ত করেন এবং তিনিই যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন যাতে সে তা সংরক্ষিত করে।

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى : شِعْرَى একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোনো কোনো সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূঁজা করত। তাই বিশেষভাবে এর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাই; যদিও সমস্ত নক্ষত্র, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, মালিক ও পালনকর্তা তিনি।

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَى –'আদ জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্ষতম জাতি। তাদের দু'টি শাখা পর পর প্রথম ও দ্বিতীয় নামে পরিচিত। তাদের প্রতি হযরত হুদ (আ.)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়। অবাধ্যতার কারণে ঝঞ্ঝা বায়ুর আজাব আসে। ফলে সমগ্র জাতি নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। কওমে নূহের পর তারাই সর্বপ্রথম আজাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। –(মাযহারী) ছামূদ সম্প্রদায়ও তাদের অপর শাখা। তাদের প্রতি হযরত সালেহ (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়। যারা অবাধ্যতা করে, তাদের প্রতি বজ্রনিনাদের আজাব আসে। ফলে তাদের হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى : مُؤْتَفِكَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ সংলগ্ন। এখানে কয়েকটি জনপদ ও শহর একত্রে সংলগ্ন ছিল। হযরত লূত (আ.) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতার শাস্তিস্বরূপ জিবরাঈল (আ.) তাদের জনপদসমূহ উল্টে দেন।

فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى : অর্থাৎ, আচ্ছন্ন করে নিল জনপদগুলোকে উল্টে দেওয়ার পর। তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল। এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। এ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিতাবের বরাত দিয়ে বর্ণিত 'শিক্ষা' সমাপ্ত হলো।

فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى : تَمَرٍ শব্দের অর্থ বিবাদ ও বিরোধিতা করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : এখানে প্রত্যেক মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াত এবং হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফায় বর্ণিত আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর শিক্ষার সত্যতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও আজাবের ঘটনাবলি শুনে বিরোধিতা বর্জন করার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়। এটা আল্লাহ তা'আলার একটা নিয়ামত। এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোনো কোনো নিয়ামত সম্পর্কে বিবাদ ও বিরোধিতা করতে থাকবে।

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى . هَذَا শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা কুরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ, ইনিও অথবা এই কুরআনও পূর্ববর্তী পয়গাম্বর অথবা কিতাবসমূহের ন্যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারীরূপে প্রেরিত। ইনি সরল পথ এবং দীন ও দুনিয়ার সাফল্য সম্বলিত নির্দেশাবলি নিয়ে আগমন করেছেন এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখান।

أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ : অর্থাৎ, নিকটে আগমনকারী বস্তু নিকটে এসে গেছে। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না। এখানে কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের বয়সের দিক দিয়ে কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। কারণ, উম্মতে মুহাম্মদী বিশ্বের সর্বশেষও কিয়ামতের নিকটবর্তী উম্মত।

هٰذَا الْحَدِيْثِ : اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ বলে কুরআন বুঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কুরআন স্বয়ং একটি মু'জিযা। এটা তোমাদের সামনে এসে গেছে। এ জন্যও কি তোমরা আশ্চর্যবোধ করছ, উপহাসের ছলে হাস্য রহস্য করছ এবং গোনাহ ও ত্রুটির কারণে ক্রন্দন করছ না?

وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ : سُمُوْدٌ-এর আভিধানিক অর্থ– গাফলতি ও নিশ্চিন্ততা। এর অপর অর্থ– গানবাজনা করা। এ স্থলে এই অর্থও হতে পারে।

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا : অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ চিন্তাশীল মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশের সবক দেয়। এসব আয়াতের দাবী এই যে, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নত হও এবং সেজদা কর ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।

সহীহ্ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নাজমের এ আয়াত পাঠ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদা করলেন এবং তাঁর সাথে সব মুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানব সেজদা করল। বোখারী ও মুসলিমের অপর এক হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা নাজম পাঠ করত তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করলে তাঁর সাথে উপস্থিত সকল মুমিন ও মুশরিক সেজদা করল, একজন কুরায়শি বৃদ্ধ ব্যতীত। সে একমুষ্টি মাটি তুলে নিয়ে কপালে স্পর্শ করে বলল : আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : এ ঘটনার পর আমি বৃদ্ধকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, তখন যেসব মুশরিক মজলিসে উপস্থিত ছিল, আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তারাও সেজদা করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য কুফরের কারণে তখন এই সেজদার কোনো ছওয়াব ছিল না। কিন্তু এই সেজদার ভাবে পরবর্তীকালে তাদের সবারই ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করার তওফীক হয়ে যায়। যে বৃদ্ধ সেজদা থেকে বিরত ছিল, একমাত্র সে-ই কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে সূরা নাজম আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, কিন্তু তিনি সেজদা করেননি। এই হাদীস দৃষ্টে জরুরি হয় না যে, সেজদা ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কেননা এতে সম্ভাবনা আছে যে, তখন তাঁর অজু ছিল না অথবা সেজদার পরিপন্থি অন্য কোনো ওযর বিদ্যমান ছিল। এমতাবস্থায় তাৎক্ষণিক সিজদা জরুরী হয় না, পরেও করা যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا تُغْنِيْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– কাজে আসবে না।

يَأْذَنُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاِذْنُ মূলবর্ন (أ - ذ - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– অনুমতি প্রদান করেন।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (اجوف يائى এবং مهموز لام) অর্থ– তিনি চান।

اَسَاءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسَاءَةً মূলবর্ণ (س - و - أ) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام ও اجوف واوى) অর্থ– (যারা) মন্দকাজ করেছে।

يَجْتَنِبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِجْتِنَابُ মূলবর্ণ (ج - ن - ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা বেঁচে থাকে।

كَبَائِرَ : صفت مشبه. كَبِيْرَةٌ-এর বহুবচন অর্থ– কবিরা গুনাহসমূহ।

لَمَمَ : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ,

اَجِنَّةٌ : جَنِيْنٌ-এর বহুবচন অর্থ– ভ্রূণ, যতদিন পর্যন্ত শিশু মাতৃগর্ভে থাকে তাকে جَنِيْنٌ বলা হয়।

لَا تُزَكُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْكِيَةً মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা পবিত্র মনে করো না।

أَضْحَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِضْحَاكٌ মূলবর্ণ (ض - ح - ك) জিনস صحيح অর্থ– তিনি হাসান।

أَبْكَى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِبْكَاءٌ মূলবর্ণ (ب - ك - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি কাঁদান।

تُمْنٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার مَنْىٌ মূলবর্ণ (م - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিক্ষেপ করা হয়।

شِعْرٰى : শে'রা নক্ষত্রের নাম, বিশেষভাবে একে উল্লেখ করার কারণ হলো, আরবের একগোত্র 'কবীলায়ে বনু খুযাআ' এ নক্ষত্রের উপাসনা করত। شِعْرٰى মা'বূদ হিসেবে মানত।

يُسَمُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْمِيَةُ মূলবর্ণ (ق – ن – و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তারা নামকরণ করেন, অভিহিত করেন।

أَكْدٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِكْدَاءُ মূলবর্ণ (ك - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বন্ধ করেছিল, বিরতি ছিল।

أَقْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِقْنَاءُ মূলবর্ণ (ق – ن – و) জিনস ناقص يائى অর্থ– পূঁজি স্থায়ী রাখেন, সম্পদশালী করেন।

اَلْمُؤْتَفِكَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِئْتِفَاكُ মূলবর্ণ (ا – ف – ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– উল্টানো জনপদ।

اَلْآءُ : বহুবচন, একবচনে الى অর্থ– নিয়ামতসমূহ, অনুগ্রহসমূহ।

اَزِفَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاَزَفُ মূলবর্ণ (ا - ز - ف) জিনস مهموز فاء অর্থ– নিকটে এসে পৌছেছে।

سَامِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّمُوْدُ মূলবর্ণ (س – م – د) জিনস صحيح অর্থ– অহংকার করছ।

فَاسْجُدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّجُوْدُ মূলবর্ণ (س – ج – و) জিনস صحيح অর্থ- অনুগত হও, সেজদা কর।

وَاعْبُدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعِبَادَةُ মূলবর্ণ (ع – ب – د) জিনস صحيح অর্থ- ইবাদত কর, দাসত্ব কর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا : এখানে إِنْ টি نافيه আর يَتَّبِعُوْنَ হলো فعل মারফু مضارع এবং واو টি فاعل আর اِلَّا হচ্ছে اداة حصر ; اَلظَّنَّ হলো مفعول به এবং واو টি حال -এর জন্য। إِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل এবং الظَّنَّ হলো তার اسم এবং لَا يُغْنِىْ হলো তার خبر আর مِنَ الْحَقِّ হলো متعلق হয়েছে يُغْنِىْ -এর সাথে এবং شَيْئًا হচ্ছে مفعول به অথবা مفعول مطلق।

–[ই'রাবুল কুরআন খ: ৭, পৃ. ৩৩৩]

سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ক্বামার

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫৫, রুকূ'– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. কিয়ামত নিকটে এসে পড়েছে এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে।	اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝١
২. আর যদি তারা কোনো মু'জিযা দেখে, তবে টালবাহানা করে এবং বলে– "এতো জাদু এখনই এর অবসান ঘটবে।"	وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝٢
৩. আর তারা [সত্যকে] অবিশ্বাস করেছে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে, আর প্রত্যেক বস্তু [কিয়ৎকাল পর স্বীয় প্রকৃত স্বরূপে] স্থিতিশীল হয়ে যায়।	وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣
৪. আর তাদের নিকট এ পরিমাণ সংবাদসমূহ পৌঁছেছে, যাতে সাবধানবাণী রয়েছে।	وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۝٤
৫. অর্থাৎ উচ্চস্তরের [জ্ঞান অর্জনের] উপাদান রয়েছে, বস্তুতঃ ভীতি সঞ্চারক বস্তুসমূহ তাদের কোনো উপকারে আসে না।	حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝٥

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِقْتَرَبَتِ নিকটে এসে পড়েছে اَلسَّاعَةُ কিয়ামত وَانْشَقَّ الْقَمَرُ এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে।

২. وَاِنْ يَّرَوْا আর যদি তারা দেখে اٰيَةً কোনো মু'জিযা يُّعْرِضُوْا তবে এতো টালবাহানা করে وَيَقُوْلُوْا এবং বলে سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ জাদু, এখনই এর অবসান ঘটবে।

৩. وَكَذَّبُوْا আর তারা অবিশ্বাস করেছে وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ আর প্রত্যেক বস্তু স্থিতিশীল হয়ে যায়।

৪. وَلَقَدْ جَآءَهُمْ আর তাদের নিকট পৌঁছেছে مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ এ পরিমাণ সংবাদ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ যাতে সাবধানবাণী রয়েছে।

৫. حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ অর্থাৎ উচ্চস্তরের (জ্ঞান অর্জনের) উপাদান রয়েছে فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ বস্তুতঃ ভীতি সঞ্চারক বস্তুসমূহ তাদের কোনো উপকারে আসে না।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾	৬. সুতরাং আপনি তাদের সম্পর্কে কোনো চিন্তা করবেন না। যেদিন এক আহ্বানকারী ফেরেশতা এক অপ্রীতিকর বস্তুর দিকে ডাকবে।
خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿٧﴾	৭. [আর] তাদের নয়নসমূহ [অপমানে] অবনমিত হবে, কবরসমূহ হতে এরূপে বের হতে থাকবে, যেমন পঙ্গপাল ছড়িয়ে পড়ে।
مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾	৮. [অতঃপর] আহ্বানকারীর দিকে দৌড়ে যেতে থাকবে ভীত-বিহবল হয়ে; কাফেররা বলবে যে, এ দিনটি বড় কঠিন।
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾	৯. তাদের পূর্বে নূহ সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল, অর্থাৎ তারা আমার বান্দা [নূহ]-কে অবিশ্বাস করেছিল এবং বলেছিল যে, এই ব্যক্তি পাগল এবং তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।
فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴿١٠﴾	১০. তখন নূহ নিজ প্রভুর নিকট দোয়া করলেন, আমি পরাভূত, অতএব, আপনি প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।
فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾	১১. অতঃপর আমি অধিক বর্ষণশীল পানি দ্বারা আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম।
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾	১২. এবং জমিন হতে ফোয়ারাসমূহ জারি করে দিলাম, অতঃপর [উভয়] পানি অবধারিত কাজের জন্য সম্মিলিত হলো।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ সুতরাং আপনি তাদের সম্পর্কে কোনো চিন্তা করবেন না يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ যেদিন এক আহ্বানকারী ফেরেশতা ডাকবে إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ এক অপ্রীতিকর বস্তুর দিকে।

৭. خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ (আর) তাদের নয়নসমূহ অবনমিত হবে يَخْرُجُونَ এরূপে বের হতে থাকবে مِنَ الْأَجْدَاثِ কবরসমূহ হতে كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ যেমন পঙ্গপাল ছড়িয়ে পড়ে।

৮. مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ আহ্বানকারীর দিকে দৌড়ে যেতে থাকবে ভীত-বিহবল হয়ে يَقُولُ الْكٰفِرُوْنَ কাফেররা বলবে যে هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ এ দিনটি বড় কঠিন।

৯. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ তাদের পূর্বে অবিশ্বাস করেছিল قَوْمُ نُوحٍ নূহ সম্প্রদায় فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا অর্থাৎ আমার বান্দা (নূহ) কে অবিশ্বাস করেছিল وَقَالُوا, এবং বলেছিল مَجْنُونٌ এই ব্যক্তি পাগল وَازْدُجِرَ এবং তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

১০. فَدَعَا رَبَّهُ তখন নূহ নিজের প্রভুর নিকট দোয়া করলেন أَنِّي مَغْلُوبٌ আমি পরাভূত فَانتَصِرْ অতএব আপনি প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

১১. فَفَتَحْنَا অতঃপর আমি খুলে দিলাম أَبْوَابَ السَّمَاءِ আসমানের দ্বারসমূহ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ অধিক বর্ষণশীল পানি দ্বারা।

১২. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا এবং জমিন হতে ফোয়ারাসমূহ জারি করে দিলাম فَالْتَقَى الْمَاءُ অতঃপর [উভয়] পানি সম্মিলিত হলো عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ অবধারিত কাজের জন্য।

১৩. আর আমি নূহকে তক্তা ও পেরেকযুক্ত নৌকাতে আরোহণ করালাম।	وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ﴿١٣﴾
১৪. যা আমার তত্ত্বাবধানে চলছিল, এ সবকিছু তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য করেছিলাম, যার অমর্যাদা করা হয়েছিল।	تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾
১৫. আর আমি তাকে উপদেশ গ্রহণের জন্য থাকতে দিলাম, অতএব, কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?	وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾
১৬. অনন্তর আমার আজাব ও ভীতি প্রদর্শন কীরূপ হলো?	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿١٦﴾
১৭. আর আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিলাম, আচ্ছা কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾
১৮. 'আদ সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল, সুতরাং আমার আজাব ও ভীতি প্রর্শন কীরূপ হলো?	كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾
১৯. আমি তাদের প্রতি এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠালাম এক চির অশুভ দিনে।	اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾
২০. তা মানুষকে এমনভাবে উপড়ে ফেলেছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষ।	تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَحَمَلْنٰهُ, আর আমি নূহকে আরোহণ করালাম عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ তক্তা ও পেরেকযুক্ত নৌকাতে।

১৪. تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا যা আমার তত্ত্বাবধানে চলছিল جَزَآءً এ সবকিছু তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য করেছিলাম لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ যার অমর্যাদা করা হয়েছিল।

১৫. وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَا, আর আমি তাকে থাকতে দিলাম اٰيَةً উপদেশ গ্রহণের জন্য فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

১৬. فَكَيْفَ كَانَ অনন্তর কীরূপ হলো عَذَابِىْ আমার আজাব وَنُذُرِ ও ভীতি প্রদর্শন।

১৭. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ, আর আমি কুরআনকে সহজ করে দিলাম لِلذِّكْرِ উপদেশ গ্রহণের জন্য فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ আচ্ছা, কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

১৮. كَذَّبَتْ عَادٌ আদ সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল فَكَيْفَ كَانَ সুতরাং কীরূপ হলো عَذَابِىْ আমার আজাব وَنُذُرِ ও ভীতি প্রদর্শন।

১৯. اِنَّآ اَرْسَلْنَا আমি পাঠালাম عَلَيْهِمْ তাদের প্রতি رِيْحًا صَرْصَرًا এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ এক চির অশুভ দিনে।

২০. تَنْزِعُ النَّاسَ তা মানুষকে এমনভাবে উপড়ে ফেলেছিল كَاَنَّهُمْ যেন তারা اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষ।

২১. অনন্তর আমার আজাব ও ভীতি প্রদর্শন কেমন হলো?	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٢١﴾
২২. আর আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব, কেউ উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾
২৩. ছামূদ সম্প্রদায় [-ও] রাসূলগণকে অবিশ্বাস করল।	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾
২৪. আর বলল, আমরা কি এমন ব্যক্তির অনুসরণ করব, যে আমাদের মতো মানুষ এবং একা? তবে এমতাবস্থায় আমরা মহা ভুল ও পাগলামির মধ্যে পড়ে যাব।	فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. فَكَيْفَ كَانَ অনন্তর কেমন হলো عَذَابِي আমার আজাব وَنُذُرِ ও ভীতি প্রদর্শন।

২২. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ আর আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি لِلذِّكْرِ উপদেশ গ্রহণের জন্য فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ অতএব কেউ উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

২৩. كَذَّبَتْ ثَمُودُ ছামূদ সম্প্রদায় অবিশ্বাস করল بِالنُّذُرِ রাসূলগণকে।

২৪. فَقَالُوا আর বলল أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ আমরা কি এমন ব্যক্তির অনুসরণ করব যে আমাদের মতো মানুষ এবং একা إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ তবে এমতাবস্থায় আমরা মহাভুল ও পাগলামির মধ্যে পড়ে যাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ -

শানে নুযূল ঃ ১. আবূ নু'আঈম (র.) আত্বা এর সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন একদা মক্কার লোকেরা রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে জড়ো হয়ে বলল, এমন কোনো নিদর্শন আছে কি যার দ্বারা আপনি যে আল্লাহ তা'আলার রাসূল, সে সম্পর্কে আমরা পরিচয় পাব? এ মুহূর্তেই হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! মক্কাবাসীকে বলে দিন এ রাতেই যেন তারা একত্র হয়, তাহলে তারা নিদর্শন দেখতে পাবে। জিবরাঈল (আ.)-এর নিয়ে আসা সংবাদ সম্পর্কে রাসূল ﷺ তাদেরকে অবহিত করলেন। সে রাতটি ছিল চাঁদের চৌদ্দ তারিখ তথা পূর্ণিমার রাত্র। সুতরাং তারা চাঁদের চৌদ্দ তারিখ রাতে বের হয়ে জড়ো হলো। সে সময় তারা চাঁদকে দু'টুকরো হতে দেখতে পেল। অর্ধাংশ সাফা পর্বতে এবং অপর অর্ধাংশ মারওয়া পর্বতের উপর। তখন তারা তা দেখে চক্ষু বুঝে মুছে নিল। আবারো দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখে চক্ষু বুঝে মুছে নেয়। অতঃপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দু'টুকরো চাঁদ দেখতে পেয়ে বলল, এতো জাদুর প্রভাব বৈ অন্য কিছু নয়। মক্কার মুশরিক কাফের সম্প্রদায় বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।-(রূহুল মা'আনী : ৭৫/২৭/১৪, দুররে মানছুর : ১৩৩/৬)

শানে নুযূল ঃ ২. কুরাইশের মুশরিকরা রাসূল ﷺ কে লক্ষ্য করে বলল যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আমাদেরকে চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত করে দেখান। এমন করতে পারলে, তারা ঈমান আনবে বলেও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করল। সে রাতটি ছিল পূর্ণিমার রাত। সুতরাং রাসূল ﷺ তাঁর রবের নিকট প্রার্থনা করলেন। ফলে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। অর্ধেক সাফা পর্বতে আর অর্ধেক কাইকুআন পর্বতে। তখন অর্ধেক মক্কাবাসীরা বলল যে, এতো হচ্ছে আকাশমণ্ডলীর কাজ। সেখানে জাদু কোনো প্রভাব ফেলবে না। আবূ জাহল বলল, একটু ধৈর্য ধারণ কর। আমাদের নিকট গ্রামের

মানুষেরা আসুক। তারা যদি এর সত্যতা স্বীকার করে, তাহলে তা সত্য ও সঠিক হবে। নতুবা বুঝা যাবে যে, মুহাম্মদ আমাদের দৃষ্টিশক্তির উপর ভেল্কিবাজী জাদু করেছে। অতঃপর গ্রামের লোকেরাও তখন এ সংবাদের সত্যতা ব্যক্ত করল; তখন আবূ জাহল বিমুখতা অবলম্বন করে বলল, তাতো গতানুগতিক জাদু। আবূ জাহল কর্তৃক সত্যকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(বাহরে মুহীত্ব : ১৭০/৮ কুরতুবী : ১১২/১৭)

পূর্ববর্তী সূরা নাজম أَزِفَتِ الْآزِفَةُ বলে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাকে এই বিষয়বস্তু দ্বারাই অর্থাৎ, اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বলেই শুরু করা হয়েছে। এরপর কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি দলিল চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা আলোচিত হয়েছে। কেননা, কিয়ামতের বিপুল সংখ্যক আলামতের মধ্যে সর্ববৃহৎ আলামত হচ্ছে খোদ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত। এক হাদীসে তিনি বলেন : আমার আগমন ও কিয়ামত হাতের দুই আঙ্গুলির ন্যায় অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আরো কতিপয় হাদীসে এই নৈকট্যের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মু'জিযা হিসেবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াও কিয়ামতের একটি বড় আলামত। এছাড়া এ মু'জিযাটি আরো এক দিক দিয়ে কিয়ামতের আলামত। তা এই যে, চন্দ্র যেমন আল্লাহর কুদরতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনিভাবে কিয়ামতে সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা : মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তার রিসালাতের স্বপক্ষে কোনো নিদর্শন চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা প্রকাশ করেন। এই মু'জিযার প্রমাণ কুরআন পাকের وَانْشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে আছে এবং অনেক সহীহ হাদীসেও আছে। এসব হাদীস সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দলের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, জুবায়ের ইবনে মুত'ইম, ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রা.) প্রমুখ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ একথাও বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং মু'জিযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইমাম তাহাভী (রহ.) ও ইবনে কাছীর এই মু'জিযা সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েতকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন। তাই এই মু'জিযার বাস্তবতা অকাট্য রূপে প্রমাণিত।

ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার মিনা নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তার কাছে নবুয়তের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। আল্লাহ তা'আলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে একখণ্ড পূর্বদিকে ও অপরখণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত সবাইকে বললেন ঃ দেখ এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মু'জিযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্র হয়ে গেল। কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মু'জিযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগল : মুহাম্মদ সারা বিশ্বের মানুষকে জাদু করতে পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের জন্য অপেক্ষা কর। তারা কী বলে? শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, মক্কায় এই মু'জিযা দুইবার সংঘটিত হয়। কিন্তু সহীহ্ রেওয়ায়েতসমূহে একবারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। –(বয়ানুল কুরআন)

এ সম্পর্কিত কয়েকটি রেওয়ায়েত তাফসীরে ইবনে কাছীর থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন :

اِنَّ اَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُرِيَهُمْ اٰيَةً فَاَرَاهُمُ الْقَمَرَ شَقَّيْنِ حَتّٰى الْحِرَاءَ بَيْنَهُمَا -

মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে নবুয়তের কোনো নিদর্শন দেখতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বত গুহাকে উভয় খণ্ডের মাঝখানে দেখতে পেল। –(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন :

اِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَقَّيْنِ حَتّٰى نَظَرُوْا اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল। সবাই এই ঘটনা অবলোকন করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– তোমরা সাক্ষ্য দাও।

ইবনে জারীর (রহ.)ও নিজ সনদে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আরও উল্লিখিত আছে :

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ للّٰهِ ﷺ بِمِنًى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ فَاَخَذَتْ فِرْقَةٌ خَلْفَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং একখণ্ড পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সাক্ষ্য দাও, সাক্ষ্য দাও।

আবূ দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়াতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন ঃ

اِنْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ حَتّٰى صَارَ فِرْقَتَيْنِ فَقَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ اَهْلِ مَكَّةَ هٰذَا سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ ابْنُ اَبِىْ كَبْشَةَ اُنْظُرُوا السَّفَارَ فَاِنْ كَانُوْا رَاَوْا مَا رَاَيْتُمْ فَقَدْ صَدَقَ - وَاِنْ كَانُوْا لَمْ يَرَوْا مِثْلَ مَا رَاَيْتُمْ فَهُوَ سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ فَسُئِلَ السُّفَارُ قَالَ وَقَدِمُوْا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ فَقَالُوْا رَاَيْنَا -

মক্কায় (অবস্থানকালে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যায়। কুরাইশ কাফেররা বলতে থাকে, এটা জাদু, মুহাম্মদ তোমাদেরকে জাদু করেছে। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবি সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা জাদু আর ব্যতীত কিছু নয়। এরপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করে। –(ইবনে কাছীর)

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও জবাব :

গ্রীক দর্শনের নীতি এই যে, আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের পক্ষে বিদীর্ণ হওয়া ও সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব। জবাব এই যে, দার্শনিকদের এই নীতি নিছক একটি দাবি মাত্র। এর পক্ষে যত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, সবগুলো অসার ও ভিত্তিহীন। আজ পর্যন্ত কোনো যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলে প্রমাণ করা যায়নি। তবে অজ্ঞ জনসাধারণ প্রত্যেক সুকঠিন বিষয়কে অসম্ভব বলে ধারণা করে থাকে। বলাবাহুল্য, মু'জিযা বলাই হয় এমন কাজকে, যা সাধারণ অভ্যাসবিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধ্যাতীত এবং বিস্ময়কর হয়ে থাকে। সচরাচর ঘটে এরূপ মামুলী ঘটনাকে তো কেউ মু'জিযা বলবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এরূপ বিরাট ঘটনা ঘটে থাকলে বিশ্বের ইতিহাসে তা স্থান পেত। কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, ঘটনাটি মক্কায় রাত্রিকালে ঘটেছিল। তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল। সুতরাং সেসব দেশে এই ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। কোনো কোনো দেশে অর্ধ রাত্রি এবং কোনো কোনো দেশে শেষ রাত্রি ছিল। তখন সাধারণত সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে। যারা জাগ্রত থাকে, তারাও তো সর্বক্ষণ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে না। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে তার আলোকরশ্মিতে তেমন কোনো প্রভেদ হয় না যে, এই প্রভেদ দেখে মানুষ চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে। এছাড়া এটা ছিল স্বল্পক্ষণের ঘটনা। আজকাল দেখা যায় যে, কোনো দেশে চন্দ্রগ্রহণ হলে পূর্বেই পত্র-পত্রিকা ও বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এতদসত্ত্বেও হাজারো লাখো মানুষ চন্দ্রগ্রহণের কোনো খবর রাখে না। তারা টেরই পায় না। জিজ্ঞাসা করি, এটা কি চন্দ্রগ্রহণ আদৌ না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লিখিত না হওয়ার কারণে এই ঘটনাকে মিথ্যা বলা যায় না।

এতদ্ব্যতীত ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 'তারীখে ফেরেশতা' গ্রন্থে এই ঘটনা উলিখিত হয়েছে। মালবারের জনৈক মহারাজা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তার রোজ-নামচায় তা লিপিবদ্ধও করেছিলেন। এই ঘটনাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। উপরে আবূ দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা বহিরাগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে।

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ : مُسْتَمِرٌّ শব্দের প্রচলিত অর্থ– দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আরবি ভাষায় কোনো সময়ে مَرَّ ও اِسْتَمَرَّ চলে যাওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অর্থেও আসে। তাফসীরবিদ মুজাহিদ ও কাতাদা (রহ.) এ স্থলে এই অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা স্বল্পক্ষণ স্থায়ী জাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। مُسْتَمِرٌّ শব্দের এক অর্থ শক্ত ও কঠোর হয়। আবুল আলীয়া ও যাহহাক (রা.) এই তাফসীরই করেছেন। অর্থাৎ, এটা বড় শক্ত জাদু। মক্কাবাসীরা যখন চাক্ষুষ দেখাকে মিথ্যা বলতে পারল না, তখন জাদু ও শক্ত জাদু বলে নিজেদেরকে প্রবোধ দিল।

وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ : اِسْتِقْرَارٌ -এর শাব্দিক অর্থ– স্থির হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যের উপর জালিয়াতির যে পর্দা ফেলে রাখা হয়, তা পরিণামে উন্মুক্ত হয়েই যায় এবং সত্য সত্যরূপে এবং মিথ্যা মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়ে যায়।

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ : اَلْاِهْطَاعُ -এর শাব্দিক অর্থ মাথা তোলা। আয়াতের অর্থ এই যে, আহ্বানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। আগের আয়াতে দৃষ্টি অবনমিত থাকার কথা বলা হয়েছে। উভয় বক্তব্যে মিল এভাবে যে, হাশরে বিভিন্ন স্থান হবে। কোনো কোনো স্থানে মস্তক অবনমিতও থাকবে।

مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ : اُزْدُجِرَ -এর শাব্দিক অর্থ– হুমকি প্রদর্শন করা হলো। উদ্দেশ্য এই যে, তারা হযরত নূহ (আ.)-কে পাগলও বলল এবং তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করে রিসালাতের কর্তব্য পালন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা হযরত নূহ (আ.)-কে হুমকি প্রদর্শন করে বলল : যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন তবে আমরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব।

আবদ ইবনে হুমায়েদ (রহ.) মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাঁকে পথে-ঘাটে কোথাও পেলে গলা টিপে ধরত। ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন এরপর হুঁশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন : আল্লাহ আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। তারা অজ্ঞ। সাড়ে নয়শ' বছর পর্যন্ত সম্প্রদায়ের এহেন নির্যাতনের জবাব দোয়ার মাধ্যমে দিয়ে অবশেষে নিরূপায় হয়ে তিনি বদদোয়া করেন, যার ফলে সমগ্র জাতি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়।

فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ : অর্থাৎ, ভূমি থেকে স্ফীত পানি এবং আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এভাবে পরস্পরে মিলিত হয়ে গেল যে, সমগ্র জাতিকে ডুবিয়ে মারার যে পরিকল্পনা আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়ে গেল। ফলে পাহাড়ের চূড়ায়ও কেউ আশ্রয় পেলো না।

ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ : اَلْوَاحٌ শব্দটি لَوْحٌ-এর বহুবচন। অর্থ– কাঠের তক্তা। دُسُرٌ শব্দটি دِسَارٌ-এর বহুবচন। অর্থ– পেরেক, কীলক, যার সাহায্যে তক্তাকে সংযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য নৌকা।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ : ذِكْرٌ -এর অর্থ দ্বিবিধ : ১. মুখস্থ করা এবং ২. উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন করা। এখানে উভয় অর্থ বুঝানো যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ইতঃপূর্বে অন্য কোনো ঐশীগ্রন্থ এরূপ ছিল না। তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবূর মানুষের মুখস্থ ছিল না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সহজকরণের ফলশ্রুতিতেই কোটি কোটি বালক বালিকারাও সমগ্র কুরআন মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাতে একটি যের যবরের পার্থক্যও হয় না। চৌদ্দশ' বছর ধরে প্রতি স্তরে প্রতি ভূখণ্ডে হাজারো লাখো হাফেজের বুকে আল্লাহর কিতাব কুরআন সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।–ইনশাআল্লাহ।

এ ছাড়া কুরআন পাক তার উপদেশ ও শিক্ষার বিষয়বস্তুকে খুবই সহজ করে বর্ণনা করেছে। ফলে বড় বড় আলেম, বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক যেমন এর দ্বারা উপকৃত হয়, তেমনি গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিরাও এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

ইজতিহাদ তথা বিধানাবলি চয়ন করার জন্য কুরআনকে সহজ করা হয়নি : আলোচ্য আয়াতে يَسَّرْنَا-এর সাথে لِلذِّكْرِ সংযুক্ত করে আরো বলা হয়েছে যে, মুখস্থ করা ও উপদেশ গ্রহণ করার সীমা পর্যন্ত কুরআনকে সহজ করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক আলেম ও জাহেল, ছোট ও বড় সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এতে জরুরি হয় না যে, কুরআন পাক থেকে বিধানাবলি চয়ন করাও তেমনি সহজ হবে। বলাবাহুল্য, এটা একটা স্বতন্ত্র ও কঠিন শাস্ত্র। যেসব প্রগাঢ় জ্ঞানী আলেম এই শাস্ত্রের গবেষণায় জীবনপাত করেন, কেবল তারাই এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন। এটা প্রত্যেকের বিচরণক্ষেত্র নয়।

কোনো কোনো মুসলমান উপরিউক্ত আয়াতকে সম্বল করে কুরআনের মূলনীতি ও ধারাসমূহ পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করেই মুজতাহিদ হতে চায় এবং বিধানাবলি চয়ন করতে চায়। উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে। বলাবাহুল্য, এটা পরিষ্কার পথভ্রষ্টতা।

কয়েকটি শব্দার্থের ব্যাখ্যা : سُعُرٌ শব্দটি দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে ছামূদ গোত্রের আলোচনায় তাদেরই উক্তিতে। এখানে এর অর্থ পাগলামি দ্বিতীয় فِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ বাক্যাংশে। এখানে سُعُرٌ-এর অর্থ– জাহান্নামের অগ্নি। অভিধানে এই শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِقْتَرَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِرَابُ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– নিকটে এসে পড়েছে।

اِقْتَرَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِرَابُ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– নিকটে এসে পড়েছে।

اِنْشَقَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْشِقَاقُ মূলবর্ণ (ش - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে।

يَرَوْا : সীগাহ বহছ جمع مذكر غائب مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز عين এবং ناقص يائى) অর্থ– তারা দেখে।

يُعْرِضُوْا : সীগাহ বহছ جمع مذكر غائب مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْرَاضُ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– তারা টালবাহানা করে, মুখ ফিরিয়ে নেয়।

يَقُوْلُوْا : সীগাহ বহছ جمع مذكر غائب مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বলে।

مُسْتَمِرٌّ : সীগাহ বহছ واحد مذكر اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِمْرَارُ মূলবর্ণ (م ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– অবসান ঘটবে।

مُسْتَقِرٌّ : সীগাহ বহছ واحد مذكر اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقْرَارُ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– স্থিতিশীল হয়ে যায়, স্থির হয়ে যায়।

مُزْدَجَرٌ : সীগাহ বহছ واحد ظرف مكان বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِزْدِجَارُ মূলবর্ণ (ز ـ ج ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– উপদেশ, সতর্কীকরণ।

مُهْطِعِيْنَ : সীগাহ বহছ جمع مذكر اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِهْطَاعُ মূলবর্ণ (ه ـ ط ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– দৌড়াতে থাকবে, মাথা ঝুঁকিয়ে দ্রুত বেগে দৌড়ায় যারা।

مُنْهَمِرٌ : সীগাহ বহছ واحد مذكر اسم فاعل বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْهِمَارُ মূলবর্ণ (ه ـ م ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অধিক বর্ষণশীল, বর্ষণকারী।

مُنْقَعِرٌ : সীগাহ বহছ واحد مذكر اسم فاعل বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْقِعَارُ মূলবর্ণ (ق ـ ع ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– উৎপাটিত, মূলোৎপাটিত।

يَسَّرْنَا : সীগাহ বহছ جمع متكلم ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّيْسِيْرُ মূলবর্ণ (ى – س – ر) জিনস مثال يائى অর্থ- আমি সহজ করে দিলাম।

اَلنُّذُرُ : اَلنَّذِيْرُ -এর বহুবচন, অর্থ– ভীতি সঞ্চারক বস্তুসমূহ।

اَلْاَجْدَاثُ : جَدَثٌ -এর বহুবচন, অর্থ– কবরসমূহ।

عَسِرٌ : صفت مشبه অর্থ– বড় কঠিন।

دُسُرٌ : دِسَارٌ -এর বহুবচন; অর্থ– পেরেক।

مُدَّكِرٌ : সীগাহ বহছ واحد مذكر اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِذْتِكَارٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– উপদেশ গ্রহণকারী।

صَرْصَرٌ : صَرَاصِرُ -এর একবচন অর্থ– প্রবল ঝঞ্ঝা (বায়ু)।

تَنْزِعُ : সীগাহ বহছ واحد مؤنث غائب مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّزْعُ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– উপড়ে ফেলেছিল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ এখানে كَذَّبَتْ শব্দটি فعل ماضى এবং ت টি مؤنث-এর জন্য। قَبْلَهُمْ শব্দটি ظرف زمان منصوب আর قَوْمُ نُوْحٍ শব্দটি كَذَّبَتْ -এর فاعل এবং فَكَذَّبُوْا-এর ف টি عاطفة আর كَذَّبُوْا শব্দটি فعل ও فاعل এবং عَبْدَنَا হলো مفعول به ; قَالُوْا-এর উপর كَذَّبُوْا-এর عطف হয়েছে। مَجْنُوْنٌ শব্দটি উহ্য مبتدأ -এর خبر অর্থাৎ هُوَ مَجْنُوْنٌ [ই'রাবুল কুরআন, খ: ৭, পৃ. ৩৫০]

২৫. তবে কি আমাদের সকলের মধ্যে কেবল তাঁরই উপর ওহী নাজিল হলো? বরং এ ব্যক্তি বড় মিথ্যাবাদী ও অহংকারী।	ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾
২৬. তারা শীঘ্রই জানবে যে, কে মিথ্যাবাদী, অহংকারী ছিল?	سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾
২৭. আমি তাদের পরীক্ষার জন্য উট বের করেছি, অতএব আপনি তাদেরকে লক্ষ্য করতে থাকুন এবং ধৈর্য ধরে থাকুন।	اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾
২৮. আর তাদেরকে বলে দিন যে, [কূপের] পানি তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালাক্রমে [পান করতে] উপস্থিত হবে।	وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾
২৯. পরন্তু তারা তাদের বন্ধু [কেদার] কে ডাকল, অনন্তর সে আঘাত করল এবং মেরে ফেলল।	فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾
৩০. অতএব, আমার আজাবও ভয় প্রদর্শন কেমন হলো?	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾
৩১. আমি তাদের উপর একটিমাত্র ধ্বনি পাঠালাম, ফলে তারা এমন হয়ে গেল যেমন কাঁটার বেড়া নির্মাণকারীর [বেড়ার শুষ্ক] চূর্ণসমূহ।	اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ তবে কি কেবল তাঁরই উপর ওহী নাজিল হলো مِنْۢ بَيْنِنَا আমাদের সকলের মধ্যে بَلْ هُوَ বরং এ ব্যক্তি كَذَّابٌ اَشِرٌ বড় মিথ্যাবাদী ও অহংকারী।

২৬. سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا তারা শীঘ্রই জানবে যে مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ কে মিথ্যাবাদী, অহংকারী ছিল।

২৭. اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ আমি উট বের করেছি فِتْنَةً لَّهُمْ তাদের পরীক্ষার জন্য فَارْتَقِبْهُمْ অতএব, আপনি তাদেরকে লক্ষ্য করতে থাকুন وَاصْطَبِرْ এবং ধৈর্য ধরে থাকুন।

২৮. وَنَبِّئْهُمْ আর তাদেরকে বলে দিন যে اَنَّ الْمَآءَ (কূপের) পানি قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালাক্রমে উপস্থিত হবে।

২৯. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ পরন্তু তারা তাদের বন্ধু (কেদার) কে ডাকল فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ অনন্তর সে আঘাত করল এবং মেরে ফেলল।

৩০. فَكَيْفَ كَانَ অতএব কেমন হলো عَذَابِيْ আমার আজাব وَنُذُرِ ও ভয় প্রদর্শন।

৩১. اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ আমি তাদের উপর পাঠালাম صَيْحَةً وَّاحِدَةً একটিমাত্র ধ্বনি فَكَانُوْا ফলে তারা كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ এমন হয়ে গেল যেমন কাঁটার বেড়া নির্মাণকারীর (বেড়ার শুষ্ক) চূর্ণসমূহ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে হুরদের সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে যে, হুরগণ চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিময় হবে। তারা থুথু ফেলবে না, তাদের নাক থেকে কোনো প্রকার ময়লা বের হবে না, তাদের মলমূত্র ত্যাগেরও কোনো প্রয়োজন হবে না। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তারা কখনো অসুস্থ হবে না। তাদের তৈজষপত্র, তাদের চিরুনি প্রভৃতি স্বর্ণ ও রৌপ্যের হবে। তাদের দেহের ঘাম হবে কস্তুরী, প্রত্যেকের এমনি দু'জন স্ত্রী থাকবে। তারা হবে অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী। জান্নাতে কোনো প্রকার মতভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তারা এক মনের অধিকারী হবে। সকাল-সন্ধ্যায় তারা আল্লাহপাকের পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল থাকবে।

তিরমিযী এবং বায়হাকী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে যে দলটি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে তারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর হবে। আর দ্বিতীয় দলও আসমানের সুন্দরতম নক্ষত্রের ন্যায় হবে, তাদের প্রত্যেকের জন্য দু'জন জীবন-সঙ্গিনী হবে।

ইমাম আহমদ (র.) ইবনে হিব্বান (র.) এবং বায়হাকী (র.) প্রমুখ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো হুরদের চেহারা এত সুন্দর হবে যে, পর্দার আড়াল থেকেও আয়নার ন্যায় পরিচ্ছন্ন দেখা যাবে। আর তারা যে মুক্তা পরিধান করবে, তা প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত আলোকময় করে তুলবে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে ইরশাদ করেছেন– দেখ, ইয়াকূত একটি পাথর, আল্লাহপাক তার মধ্যে এমনি পরিচ্ছন্নতা রেখেছেন যে, তার মধ্যখান দিয়ে যদি কোনো সূতা ব্যবহার হয়, তবে তার বাইরে থেকে তা দেখা যাবে। –[ইবনে আবী হাতিম]

তিরমিযী শরীফেও এ বিবরণ সংকলিত হয়েছে।

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ (٦٠) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦١)

'উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে? অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে, এভাবে দুনিয়াতে যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আখেরাতে তারা অবশ্যই এর শুভ পরিণতি লাভ করবে।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আলোচ্য আয়াত هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ তেলাওয়াত করে ইরশাদ করেন, তোমরা কি জান যে, তোমাদের প্রতিপালক কি ইরশাদ করেছেন? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, যাকে আমি তাওহীদের নিয়ামত দান করেছি, তার বদলা জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কালেমায়ে তৈয়্যিবা পাঠ করে তার মর্মের অঙ্গীকার করবে এবং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যে জীবন-বিধান নিয়ে এসেছেন, তার উপর আমল করবে, তার বদলা জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ (٦٢) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٣)

'ঐ দু'টি বাগান ব্যতীত আরো দু'টি বাগান রয়েছে। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহপাকের দরবারে হাজির হওয়ার কথা স্মরণ রাখবে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য সম্বল সংগ্রহ করবে, তার জন্য চারটি জান্নাত থাকবে, দু'টির কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট দু'টির কথা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইতঃপূর্বে জান্নাতের যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে, তা মর্যাদার দিক থেকে এ আয়াতে উল্লিখিত বাগান দু'টি থেকেও উচ্চতর।

ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বাগান দু'টি পূর্বে বর্ণিত বাগানগুলো থেকে কম মর্যাদার।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বলেছেন, ইতঃপূর্বে যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো স্বর্ণের আর সে বাগানগুলো তাদের জন্য, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন,। আর আলোচ্য আয়াতে যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে, তা সেসব লোকদের জন্য, যারা পূর্ববর্তী লোকদের অনুসরণ করেছে, আর এ বাগান দু'টি হবে রৌপ্যের।

অনুবাদ	আয়াত
৩৯. [এবং বলা হলো যে,] বস, আমার আজাব এবং ভয় প্রদর্শনের স্বাদ গ্রহণ কর।	فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾
৪০. আর আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের নিমিত্তে সহজ করে দিয়েছি, সুতরাং কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾
৪১. আর ফেরাউন বংশীয়গণের নিকটও ভয় প্রদর্শনের বহু বিষয় এসেছিল।	وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾
৪২. তারা আমার সমস্ত নিদর্শনকে অবিশ্বাস করল, অতএব, আমি তাদেরকে পরাক্রান্ত শক্তিমানের মতো পাকড়াও করলাম।	كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾
৪৩. তোমাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের মধ্যে কি এদের অপেক্ষা অধিক কোনো শ্রেষ্ঠত্ব আছে, নাকি তোমাদের জন্য [আসমানি] কিতাবসমূহে কোনো অব্যাহতি রয়েছে।	اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾
৪৪. নাকি তারা বলে যে, আমাদের এমন দল রয়েছে যারা বিজয়ী থাকবে?	اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾
৪৫. অচিরেই এ দল পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করবে।	سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾
৪৬. বরং কিয়ামত তাদের জন্য প্রতিশ্রুত রয়েছে, আর কিয়ামত বড় কঠোর ও তিক্তকর।	بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. فَذُوْقُوْا স্বাদ গ্রহণ কর عَذَابِيْ আমার আজাব وَنُذُرِ এবং ভয় প্রদর্শনের।

৪০. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ আর আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি لِلذِّكْرِ উপদেশ গ্রহণের নিমিত্তে فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ সুতরাং কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

৪১. وَلَقَدْ جَآءَ আর এসেছিল اٰلَ فِرْعَوْنَ ফেরাউন বংশীয়গণের নিকটও النُّذُرُ ভয় প্রদর্শনের বহু বিষয়।

৪২. كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا তারা আমার সমস্ত নিদর্শনকে অবিশ্বাস করল فَاَخَذْنٰهُمْ অতএব আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ পরাক্রান্ত শক্তিমানের মতো।

৪৩. اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ তোমাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের মধ্যে কি এদের অপেক্ষা অধিক কোনো শ্রেষ্ঠত্ব আছে اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ নাকি তোমাদের জন্য (আসমানি) কিতাবসমূহে কোনো অব্যাহতি রয়েছে।

৪৪. اَمْ يَقُوْلُوْنَ নাকি তারা বলে যে نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ আমাদের এমন দল রয়েছে যারা বিজয়ী থাকবে।

৪৫. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ অচিরেই এ দল পরাজিত হবে وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করবে।

৪৬. بَلِ السَّاعَةُ বরং কিয়ামত مَوْعِدُهُمْ তাদের জন্য প্রতিশ্রুত রয়েছে। وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ আর কিয়ামত বড় কঠোর ও তিক্তকর।

অনুবাদ	আয়াত
৪৭. এ অপরাধীরা ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতার মধ্যে রয়েছে।	إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾
৪৮. যেদিন তাদেরকে তাদের মুখমণ্ডলের উপর ভর করিয়ে দোজখের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে; তখন তাদেরকে বলা হবে, দোজখের স্পর্শ আস্বাদন কর।	يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ط ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আমি প্রত্যেক বস্তুকে [এক নির্দিষ্ট] পরিমাণ দিয়ে সৃষ্টি করেছি।	إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾
৫০. আমার হুকুম এমন যে, একবারেই হয়ে যাবে, যেমন চক্ষুর পলক।	وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾
৫১. আর আমি তোমাদের সপন্থিদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছি, আচ্ছা, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿٥١﴾
৫২. আর এরা যা কিছুই করে থাকে সবই আমলনামাসমূহে [লিপিবদ্ধ] রয়েছে।	وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾
৫৩. আর প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিষয় লিখিত হয়ে আছে।	وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾
৫৪. মুত্তাকীগণ [বেহেশতের] উদ্যানসমূহ ও নহরসমূহের মধ্যে থাকবে।	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. এক উত্তম স্থানে সর্বশক্তিমান বাদশাহের সান্নিধ্যে অবস্থান করবে।	فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ এ অপরাধীরা فِي ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতার মধ্যে রয়েছে।

৪৮. يَوْمَ يُسْحَبُونَ যেদিন তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে فِي النَّارِ দোজখের মধ্যে عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ তাদের মুখমণ্ডলের উপর ভর করিয়ে ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ তখন তাদেরকে বলা হবে দোজখের স্পর্শ আস্বাদন কর।

৪৯. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ আমি প্রত্যেক বস্তুকে خَلَقْنَٰهُ সৃষ্টি করেছি بِقَدَرٍ পরিমাণ দিয়ে।

৫০. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَٰحِدَةٌ, আমার হুকুম এমন একবারেই হয়ে যাবে كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ যেমন চক্ষুর পলক।

৫১. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا, আর আমি ধ্বংস করে ফেলেছি أَشْيَاعَكُمْ তোমাদের সপন্থিদেরকে فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ আচ্ছা উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

৫২. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ, আর এরা যা কিছুই করে থাকে فِي الزُّبُرِ সবই আমলনামাসমূহে [লিপিবদ্ধ] রয়েছে।

৫৩. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ, আর প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিষয় مُسْتَطَرٌ লিখিত হয়ে আছে।

৫৪. إِنَّ الْمُتَّقِينَ মুত্তাকীগণ فِي جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ উদ্যানসমূহ ও নহরসমূহের মধ্যে থাকবে।

৫৫. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ এক উত্তম স্থানে عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ সর্বশক্তিমান বাদশাহের সান্নিধ্যে অবস্থান করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ-أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ

শানে নুযূল ঃ হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আবূ জাহল তার ঘোড়াকে চাবুক মেরে সামনে অগ্রসর হয়ে বলল, আজকের সংঘটিত যুদ্ধে আমাদের মাঝে ও মুহাম্মদ ও তদ্বীয় অনুসারীদের মধ্যে আমরাই সাহায্যপ্রাপ্ত দল হব। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। (কুরতুবী : ১২৭/৭)

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ -

শানে নুযূল ঃ ইবনে মারদূভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন দু'টি দল রয়েছে, ইসলামের সাথে যাদের কোনো প্রকারের সম্পর্ক নেই। তারা হচ্ছে মুরজিয়া ও কাদরিয়া। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

–(দুররে মানছূর : ১৩৮/৬, রূহুল মা'আনী : ৯৪/২৭/১৪)

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ - إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

শানে নুযূল ঃ ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ প্রমূখ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা কুরাইশের মুশরিকেরা এসে রাসূল ﷺ এর সাথে তকদীর বা ভাগ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বির্তক করে। তাদের সেই বির্তক সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–(কুরতুবী : ১২৮/১৭, রূহুল মা'আনী : ৯৩/২৭/১৪)

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ : مُرَاوَدَةٌ শব্দের অর্থ– কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য কাউকে ফুসলানো। কওমে লূত বালকদের সাথে অপকর্মে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের পরীক্ষার জন্যই কয়েকজন ফেরেশতাকে সুশ্রী বালকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্বৃত্তরা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য হযরত লূত (আ.)-এর গৃহে উপস্থিত হয়। হযরত লূত (আ.) দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা প্রাচীর টপকিয়ে ভিতরে আসতে থাকে। হযরত লূত (আ.) বিব্রতবোধ করলে ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন, আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই আগমন করেছি।

সূরা ক্বামার কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার লোভ-লালসায় পতিত এবং পরকাল বিমুখ কাফেরদের চৈতন্য ফিরে আসে। প্রথমে কিয়ামতের আজাব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাদের পার্থিব মন্দ পরিণাম ব্যক্ত করার জন্য বিশ্ববিশ্রুত পাঁচটি সম্প্রদায়ের অবস্থা, পয়গাম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের অশুভ পরিণতি এবং ইহকালেও নানা আজাবে পতিত হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, তারাই বিশ্বের সর্বপ্রথম জাতি, যাদেরকে আল্লাহর আজাব ধ্বংস করে দেয়। এই কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে 'আদ' ছামূদ, কওমে-লূত ও কওমে ফেরাউন এই চার সম্প্রদায়ের আলোচনা রয়েছে। তাদের ঘটনাবলি কুরআন পাকের কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

এই পাঁচটি জাতি ছিল বিশ্বের শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত জনগোষ্ঠী। কোনো শক্তির কাছে তারা মাথা নত করত না। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের উপর আল্লাহর আজাব আগমনের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। প্রত্যেক জাতির বর্ণনা শেষে কুরআন পাক এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছে :

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ অর্থাৎ, এত শক্তিশালী ও জনবহুল জাতির উপর যখন আল্লাহর আজাব নেমে এল, তখন দেখ, তারা কীভাবে মশা-মাছির ন্যায় নিপাত হয়ে গেল। এতদসঙ্গে মুমিন ও কাফেরদের উপদেশের জন্য এই বাক্যটিও বার বার উল্লেখ করা হয়েছে :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ –অর্থাৎ, আল্লাহর এই মহা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন। উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সীমা পর্যন্ত আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। কাজেই সেই ব্যক্তি চরম হতভাগা ও বঞ্চিত, যে কুরআন দ্বারা উপকৃত হয় না। পরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে বিদ্যমান লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যুগের কাফেররা ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শক্তি ও সাহসে 'আদ, ছামূদ ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি নয়। এমতাবস্থায় তারা কীরূপে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে।

কয়েকটি শব্দার্থের ব্যাখ্যা : زُبُرٌ শব্দটি زَبُوْرٌ -এর বহুবচন। অভিধানে প্রত্যেক লিখিত কিতাবকে زَبُوْرٌ বলা হয়। হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ আসমানি কিতাবের নামও যবুর। اَدْهٰى -এর অর্থ– অত্যধিক ভয়াবহ এবং وَاَمَرُّ শব্দের অর্থ– তিক্ততর। এটা مُرٌّ থেকে উদ্ভূত। কঠোর ও কষ্টকর বিষয়কেও اَمَرُّ ও مُرٌّ বলা হয়। سُعُرٌ শব্দের অর্থ এখানে জাহান্নামের অগ্নি। اَشْيَاعٌ শব্দটি شِيْعَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী; অর্থাৎ যারা তাদের অনুসারী ও সমমনা مَقْعَدٌ এর অর্থ মজলিস, বসার জায়গা এবং صِدْقٍ -এর অর্থ– সত্য। উদ্দেশ্য এই যে, এই মজলিস মহতী হবে। এতে কোনো অসার ও বাজে কথাবার্তা হবে না।

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ : قَدَرٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিমাপ করা, কোনো বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরূপে তৈরি করা। আয়াতে এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জাহানের সকল শ্রেণির বস্তু বিজ্ঞসুলভ পরিমাপ সহকারে ছোট বড় ও বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে তৈরি করেছেন। অঙ্গুলিসমূহ একই রূপ তৈরি করেননি দৈর্ঘ্যে পার্থক্য রেখেছেন। হাত পায়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ রেখেছেন। খোলা, বন্ধ হওয়া এবং সংকোচন ও সম্প্রসারণের জন্য স্প্রিং সংযোজিত করেছেন। এক এক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের বিস্ময়কর দ্বার উন্মোচিত হতে দেখা যাবে।
শরিয়তের পরিভাষায় 'কদর শব্দটি আল্লাহর তাকদীর তথা বিধিলিপির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ কোনো কোনো হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন।
মুসনাদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, কুরাইশ কাফেররা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর সাথে তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু তাকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ, আদিকালে সৃজিত বস্তু, তার পরিমাণ, সময়কাল, হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ বিশ্ব অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই লিখে দেওয়া হয়েছিল। এখন বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি লাভ করে, তা এই আদিকালীন তাকদীর অনুযায়ীই সৃষ্টি লাভ করে।
তাকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্মবিশ্বাস। যে একে সরাসরি অস্বীকার করে, সে কাফের। আর যারা দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার করে, তারা ফাসেক। আহমদ, আবূ দাউদ ও তাবারানী বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণনায় : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রত্যেক উম্মতে কিছুলোক মজুসী (অগ্নিপূজারী কাফের) থাকে। আমার উম্মতের মজুসী তারা, যারা তাকদীর মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের খবর নিও না এবং মরে গেলে কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করো না।
–(রূহুল মা'আনী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُحْتَضَرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِحْتِضَارُ মূলবর্ণ (ح . ض . ر) জিনস صحيح অর্থ– উপস্থিত হবে।

هَشِيْمِ : সিফাতে মুশাব্বাহ اسم مفعول -এর অর্থে– চূর্ণসমূহ।

مُحْتَظِرِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِحْتِظَارُ মূলবর্ণ (ح . ظ . ر) জিনস صحيح অর্থ– কাঁটার বেড়া নির্মাণকারী।

رَاوَدُوْهُ সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُرَاوَدَةُ মূলবর্ণ (ر – و –د) জিনস اجوف واوى : ه যমীরে واحد مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ– তারা অসৎ উদ্দেশ্যে লূত (আ.) হতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, ফুসলিয়ে ছিল।

سَيُهْزَمُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهَزِيْمَةُ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ م) জিনস صحيح অর্থ– অচিরেই পরাজিত হবে।

اَدْهٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার اَلدَّهَاءُ মূলবর্ণ (د – ه – ى) জিনস صحيح অর্থ– বড় কঠোর, বড় বিপদ।

مُسْتَطَرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطَارُ মূলবর্ণ (س ـ ط ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– লিখিত হয়ে আছে।

مَقْعَدٌ : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَعْدُ মূলবর্ণ (ق ـ ع ـ د) জিনস صحيح অর্থ– এক স্থানে, বসার স্থান, আসন।

مُقْتَدِرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِدَارُ মূলবর্ণ (ق – د – ر) জিনস صحيح অর্থ- সর্বশক্তিমান, মহাশক্তিধর।

تَعَاطٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّعَاطِىُّ মূলবর্ণ (ع ـ ط ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে আঘাত করল।

عَقَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَقْرُ মূলবর্ণ (ع ـ ق ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সে সেরে ফেলল।

حَاصِبًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلْحَصْبُ মূলবর্ণ (ح ـ ص ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– প্রস্তর বৃষ্টি।

صَبَّحَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف এখানে هم যমীর مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْبِيْحُ মূলবর্ণ (ص ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তাদের উপর এসে পৌঁছল।

بَرَاءَةٌ : মাসদার অর্থ– অব্যাহতি।

يُسْحَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسَّحْبُ মূলবর্ণ (س ـ ح ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ : এখানে পূর্ণ বাক্যটি পূর্বের বাক্যের উপর عطف হয়েছে। رَاوَدُوْهُ -এর সাথে متعلق হয়েছে। فَطَمَسْنَا শব্দটি رَاوَدُوْهُ -এর উপর عطف হয়েছে। فَقُلْنَا لَهُمْ শব্দটি اَعْيُنَهُمْ মাফউল عَنْ ضَيْفِهٖ ... হয়েছে। فَقُلْنَالَهُمْ শব্দটি اَعْيُنَهُمْ مفعول به আর فاء টি حرف عاطفة এবং তার معطوف উহ্য। অর্থাৎ فَقُلْنَالَهُمْ আর ذُوْقُوْا বাক্যটি উহ্য قول-এর مقول এবং عَذَابِىْ হচ্ছে ذُوْقُوْا-এর مفعول আর نُذُرِ শব্দটি عَذَابِىْ -এর উপর عطف হয়েছে এবং ياء متكلم -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। [ই'রাবুল কুরআন, খ: ৭, পৃ. ৩৬৩]

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ

সূরা রাহমান

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৭৮, রুকূ'– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. অনন্ত দয়াময় [আল্লাহ্]।	اَلرَّحْمٰنُ ۙ﴿۱﴾
২. তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।	عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ﴿۲﴾
৩. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ﴿۳﴾
৪. [অতঃপর] তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন।	عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۙ﴿۴﴾
৫. সূর্য ও চন্দ্র হিসাবের সাথে [চলমান] রয়েছে।	اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۙ﴿۵﴾
৬. আর কাণ্ডবিহীন গাছ ও কাণ্ড বিশিষ্ট বৃক্ষ উভয়ই [আল্লাহর] অনুগত রয়েছে।	وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿۶﴾
৭. আর তিনিই আসমানকে সুউচ্চ করেছেন এবং তিনিই [ভূপৃষ্ঠে] মানদণ্ড স্থাপন করেছেন।	وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ﴿۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلرَّحْمٰنُ অনন্ত দয়াময় (আল্লাহ)

২. عَلَّمَ তিনি শিক্ষা দিয়েছেন اَلْقُرْاٰنَ কুরআন।

৩. خَلَقَ তিনি সৃষ্টি করেছেন اَلْاِنْسَانَ মানুষকে।

৪. عَلَّمَهُ তাকে শিখিয়েছেন اَلْبَيَانَ কথা বলতে।

৫ اَلشَّمْسُ ,اَلْقَمَرُ সূর্য ও চন্দ্র بِحُسْبَانٍ হিসাবের সাথে [চলমান] রয়েছে।

৬. اَلنَّجْمُ, আর কাণ্ডবিহীন গাছ اَلشَّجَرُ, ও কাণ্ডবিশিষ্ট গাছ يَسْجُدٰنِ উভয়ই (আল্লাহর) অনুগত রয়েছে।

৭ اَلسَّمَآءَ ,رَفَعَهَا, তিনিই আসমানকে সুউচ্চ করেছেন وَضَعَ ,اَلْمِيْزَانَ, এবং তিনিই (ভূপৃষ্ঠে) মানদণ্ড স্থাপন করেছেন।

অনুবাদ	আয়াত
৮. যেন তোমরা পরিমাপে সীমালঙ্ঘন না কর।	اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ﴿٨﴾
৯. আর ন্যায় পরায়ণতার সাথে ওজন ঠিক রেখো এবং পরিমাপে কম করো না।	وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿٩﴾
১০. আর তিনিই সৃষ্টজীবের জন্য জমিনকে স্থাপন করেছেন।	وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ﴿١٠﴾
১১. তাতে ফল এবং খোসাযুক্ত খর্জুর বৃক্ষ রয়েছে।	فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ﴿١١﴾
১২. আর তাতে তুষযুক্ত শস্য ও সুগন্ধযুক্ত ফুল [-ও] রয়েছে।	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾
১৩. অতএব, হে জিন ও মানব! [এত অফুরন্ত নিয়ামত দেওয়া সত্ত্বেও] তোমরা স্বীয় প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٣﴾
১৪. তিনি মানুষকে পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾
১৫. আর জিনকে খাঁটি আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।	وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾
১৬. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾
১৭. তিনিই উভয় উদয়াচল এবং উভয় অস্তাচলের মালিক।	رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. اَلَّا تَطْغَوْا যেন তোমরা সীমালঙ্ঘন না কর فِي الْمِيْزَانِ পরিমাপে।

৯. وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ আর ওজন ঠিক রেখ بِالْقِسْطِ ন্যায় পরায়ণতার সাথে। وَلَا تُخْسِرُوا এবং কম করো না الْمِيْزَانَ পরিমাপে।

১০. وَالْاَرْضَ আর জমিনকে وَضَعَهَا তিনিই স্থাপন করেছেন لِلْاَنَامِ সৃষ্টজীবের জন্য।

১১. فِيْهَا فَاكِهَةٌ তাতে রয়েছে ফল وَّالنَّخْلُ এবং খর্জুর বৃক্ষ ذَاتُ الْاَكْمَامِ খোসাযুক্ত।

১২. وَالْحَبُّ আর তাতে শস্য রয়েছে ذُو الْعَصْفِ তুষযুক্ত وَالرَّيْحَانُ ও সুগন্ধযুক্ত ফুল।

১৩. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ অতএব, হে জিন ও মানব কোন কোন নিয়ামতকে رَبِّكُمَا স্বীয় প্রভুর تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

১৪. خَلَقَ الْاِنْسَانَ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন مِنْ صَلْصَالٍ শুষ্ক মৃত্তিকা হতে كَالْفَخَّارِ পোড়ামাটির মতো।

১৫. وَخَلَقَ الْجَآنَّ আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ খাঁটি আগুন দ্বারা।

১৬. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

১৭. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ তিনিই উভয় উদয়াচলের মালিক وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ এবং উভয় অস্তাচলের মালিক।

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
১৮. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٨
১৯. তিনি দুটি সমুদ্রকে সম্মিলিত করেছেন, ফলে পরস্পরে মিলিত হয়ে আছে।	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۝١٩
২০. এতদুভয়ের মধ্যে একটি অনতিক্রমণীয় অন্তরায় রয়েছে।	بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۝٢٠
২১. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٢١
২২. এতদুভয়ের মধ্য হতে মুক্তা ও প্রবাল রত্নসমূহ বের হয়ে থাকে।	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝٢٢
২৩. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٢٣
২৪. আর তাঁরই [আয়ত্তে] রয়েছে নৌযানসমূহ যা সমুদ্রের মধ্যে পর্বতমালার ন্যায় সুউচ্চ দাঁড়িয়ে আছে।	وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝٢٤
২৫. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٢٥
২৬. ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত সমস্ত বস্তুই ধ্বংস হবে।	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝٢٦

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোনো কোনো নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।
১৯. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ তিনি দুটি সমুদ্রকে সম্মিলিত করেছেন يَلْتَقِيٰنِ ফলে পরস্পরে মিলিত হয়ে আছে।
২০. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ এতদুভয়ের মধ্যে একটি অন্তরায় রয়েছে لَّا يَبْغِيٰنِ অনতিক্রমণীয়।
২১. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।
২২. يَخْرُجُ বের হয়ে থাকে مِنْهُمَا এতদুভয়ের মধ্য হতে اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ মুক্তা ও প্রবাল রত্নসমূহ।
২৩. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।
২৪. وَلَهُ الْجَوَارِ আর তাঁরই (আয়ত্তে) রয়েছে নৌযানসমূহ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ যা সমুদ্রের মধ্যে সুউচ্চ দাঁড়িয়ে আছে كَالْاَعْلَامِ পর্বত মালার ন্যায়।
২৫. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব; তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।
২৬. كُلُّ مَنْ সমস্ত বস্তুই عَلَيْهَا ভূ-পৃষ্ঠের উপর অবস্থিত فَانٍ ধ্বংস হবে।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
২৭. আর আপনার প্রভুর সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে। যিনি মহত্ত্ব এবং দয়ার অধিপতি।	وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾
২৮. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾
২৯. আসমানসমূহ ও জমিনের অধিবাসীগণ সবাই তারই সমীপে প্রার্থী হয়; তিনি সর্বদা কোনো না কোনো কাজে রত থাকেন।	يَسْئَلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾
৩০. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾
৩১. হে জিন ও মানব! আমি তোমাদের [হিসাব গ্রহণের] নিমিত্ত শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করব।	سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾
৩২. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾
৩৩. হে জিন ও মানব দল! যদি তোমাদের এ ক্ষমতা থাকে, যে তোমরা আসমান ও জমিনের সীমা হতে কোথাও বের হয়ে যেতে পার, তবে বের হয়ে যাও; [কিন্তু] সামর্থ্য ব্যতীত বের হতে পারবে না।	يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. وَّيَبْقٰى আর অবশিষ্ট থাকবে وَجْهُ رَبِّكَ আপনার প্রভুর সত্তাই ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ যিনি মহত্ত্ব ও দয়ার অধিপতি।

২৮. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

২৯. يَسْئَلُهٗ তারই সমীপে প্রার্থী হয় مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের অধিবাসীগণ كُلَّ يَوْمٍ সর্বদা هُوَ فِيْ شَاْنٍ তিনি কোনো না কোনো কাজে রত থাকেন।

৩০. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৩১. سَنَفْرُغُ لَكُمْ আমি তোমাদের নিমিত্ত শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করব اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ হে জিন ও মানব!

৩২. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৩৩. يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ হে জিন ও মানবদল! اِنِ اسْتَطَعْتُمْ যদি তোমাদের এ ক্ষমতা থাকে اَنْ تَنْفُذُوْا যে তোমরা কোথাও বের হয়ে যেতে পার مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের সীমা হতে فَانْفُذُوْا তবে বের হয়ে যাও لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ (কিন্তু) সামর্থ্য ব্যতীত বের হতে পারবে না।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾	৩৪. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?
يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾	৩৫. তোমাদের উভয়ের উপর অগ্নিশিখা ও ধুম্র নিক্ষেপ করা হবে, তখন তোমরা [তা] অপসারণ করতে পারবে না।
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾	৩৬. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?
فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾	৩৭. মোটকথা, যখন আসমান বিদীর্ণ হবে এবং লাল বর্ণ হয়ে যাবে যেমন লাল রঙ্গে রঞ্জিত চর্ম।
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾	৩৮. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾	৩৯. অনন্তর সেদিন না কোনো মানবকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে, আর না কোনো জিনকে।
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾	৪০. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾	৪১. অপরাধীরা তাদের মুখাকৃতি দ্বারা চিনা যাবে, অতএব, [তাদের] মাথার চুল ও পা-সমূহ ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৩৫. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا তোমাদের উভয়ের উপর নিক্ষেপ করা হবে شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ অগ্নি শিখা وَّنُحَاسٌ ও ধুম্র فَلَا تَنْتَصِرٰنِ তখন তোমরা (তা) অপসারণ করতে পারবে না।

৩৬. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৩৭. فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ মোটকথা যখন আসমান বিদীর্ণ হবে فَكَانَتْ وَرْدَةً এবং লালবর্ণ হয়ে যাবে كَالدِّهَانِ যেমন লাল রঙ্গে রঞ্জিত চর্ম।

৩৮. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৩৯. فَيَوْمَئِذٍ অনন্তর সেদিন لَّا يُسْـَٔلُ না জিজ্ঞাসা করা হবে عَنْ ذَنْۢبِهٖ তার অপরাধ সম্পর্কে اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ কোনো মানবকে আর না কোনো জিনকে।

৪০. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৪১. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ অপরাধীদের চেনা যাবে بِسِيْمٰهُمْ তাদের মুখাকৃতি দ্বারা فَيُؤْخَذُ অতএব নিয়ে যাওয়া হবে بِالنَّوَاصِيْ মাথার চুল وَالْاَقْدَامِ ও পা-সমূহ ধরে।

অনুবাদ	আয়াত
৪২. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾
৪৩. এটাই সেই দোজখ, যাকে অপরাধীরা অবিশ্বাস করত।	هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. তারা দোজখের এবং ফুটন্ত পানির মধ্যস্থলে ঘুরতে থাকবে।	يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾
৪৬. আর যে ব্যক্তি নিজ প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করতে থাকে, তার জন্য [বেহেশতে] দুটি উদ্যান থাকবে।	وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾
৪৭. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾
৪৮. উদ্যান দুটি বহু শাখাবিশিষ্ট হবে।	ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾
৪৯. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾
৫০. এতদুভয়ের মধ্যে দুটি প্রস্রবণ বইতে থাকবে।	فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪২. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৪৩. هٰذِهٖ جَهَنَّمُ এটাই সেই দোজখ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ যাকে অপরাধীরা অবিশ্বাস করত।

৪৪. يَطُوْفُوْنَ তারা ঘুরতে থাকবে بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ দোজখের ফুটন্ত পানির মধ্যস্থলে।

৪৫. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৪৬. وَلِمَنْ خَافَ আর যে ব্যক্তি ভয় করতে থাকে مَقَامَ رَبِّهٖ নিজ প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে جَنَّتٰنِ তার জন্য দুটি উদ্যান থাকবে।

৪৭. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৪৮. ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ উদ্যান দুটি বহু শাখাবিশিষ্ট হবে।

৪৯. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৫০. فِيْهِمَا এতদুভয়ের মধ্যে عَيْنٰنِ দুটি প্রস্রবণ تَجْرِيٰنِ বইতে থাকবে।

৫১. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾
৫২. ঐ উদ্যান দুটির মধ্যে প্রত্যেক ফলের দু দু প্রকার হবে?	فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾
৫৩. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾
৫৪. তারা এমন বিছানার উপর হেলান দিয়ে বসবে যার অভ্যন্তরীণ আবরণ পুরু রেশমের হবে; আর সে উদ্যান দুটির ফল অতি নিকটে হবে।	مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾
৫৬. তাদের মধ্যে আনত দৃষ্টিসম্পন্না [হূর] গণ থাকবে যে, তাদেরকে তাদের পূর্বে না কোনো মানুষ স্পর্শ করেছে, আর না কোনো জিন।	فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾
৫৭. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾
৫৮. তারা যেন ইয়াকূত ও প্রবাল রত্ন।	كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫১. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৫২. فِيْهِمَا ঐ উদ্যান দুটির মধ্যে مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ প্রত্যেক ফলের زَوْجٰنِ দু দু প্রকার হবে।

৫৩. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৫৪. مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍ তারা এমন বিছানার উপর হেলান দিয়ে বসবে بَطَآئِنُهَا যার অভ্যন্তরীণ আবরণ হবে مِنْ اِسْتَبْرَقٍ পুরু রেশমের وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ আর সে উদ্যান দুটির ফল অতি নিকটে হবে।

৫৫. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৫৬. فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ তাদের মধ্যে আনত দৃষ্টিসম্পন্না (হূর)-গণ থাকবে لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ তাদেরকে তাদের পূর্বে না কোনো মানুষ স্পর্শ করেছে وَلَا جَآنٌّ, আর না কোনো জিন।

৫৭. فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৫৮. كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ তারা যেন ইয়াকূত وَالْمَرْجَانُ ও প্রবাল রত্ন।

অনুবাদ	আয়াত
৫৯. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾
৬০. আচ্ছা, উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত অন্যকিছু কি হতে পারে?	هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾
৬১. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾
৬২. আর সে উদ্যান দুটি অপেক্ষা নিম্নস্তরের আরো দুটি উদ্যান রয়েছে।	وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾
৬৩. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾
৬৪. সে উদ্যান দুটি গাঢ় সবুজ বর্ণের।	مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾
৬৫. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾
৬৬. সে উদ্যানদ্বয়ের মধ্যে দুটি ঝরনা উথলিত হতে থাকবে।	فِیْهِمَا عَیْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾
৬৭. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾
৬৮. সে উদ্যান দুটিতে নানাবিধ ফল এবং খেজুর ও ডালিম থাকবে।	فِیْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৯. فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৬০. هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ আচ্ছা, উত্তম কাজের প্রতিদান অন্য কিছু কি হতে পারে? اِلَّا الْاِحْسَانُ উত্তম পুরস্কার ব্যতীত।

৬১. فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৬২. وَمِنْ دُوْنِهِمَا আর সে উদ্যান দুটি অপেক্ষা নিম্নস্তরের جَنَّتٰنِ আরো দুটি উদ্যান রয়েছে।

৬৩. فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৬৪. مُدْهَآمَّتٰنِ সে উদ্যান দুটি গাঢ় সবুজ বর্ণের।

৬৫. فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৬৬. فِیْهِمَا সে উদ্যানদ্বয়ের মধ্যে عَیْنٰنِ দুটি ঝরনা نَضَّاخَتٰنِ উথলিত হতে থাকবে।

৬৭. فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبٰنِ তোমরা অস্বীকার করবে।

৬৮. فِیْهِمَا সে উদ্যান দুটিতে থাকবে فَاكِهَةٌ নানাবিধ ফল وَّنَخْلٌ এবং খেজুর وَّرُمَّانٌ ও আনার।

অনুবাদ	আয়াত
৬৯. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾
৭০. তন্মধ্যে উত্তম স্বভাবসম্পন্না রূপসীগণ থাকবে।	فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾
৭১. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾
৭২. সেই নারীগণ গৌর বর্ণের হবে, [এবং] খীমাসমূহের মধ্যে সুরক্ষিত থাকবে।	حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾
৭৩. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾
৭৪. তাদের পূর্বে এদেরকে না কোনো মানুষ স্পর্শ করেছে, আর না কোনো জিন।	لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾
৭৫. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾
৭৬. তারা সবুজ নকশীদার এবং অতি সুন্দর কাপড়ের [বিছানার] উপর হেলান দিয়ে বসবে।	مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾
৭৭. অতএব, হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾
৭৮. বড় বরকতপূর্ণ নাম আপনার প্রভুর, যিনি মর্যাদাবান ও দয়ালু।	تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৯. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبَانِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৭০. فِيهِنَّ তন্মধ্যে থাকবে خَيْرَاتٌ حِسَانٌ উত্তম স্বভাব সম্পন্না রূপসীগণ।
৭১. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبَانِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৭২. حُورٌ সে নারীগণ গৌর বর্ণের হবে مَقْصُورَاتٌ সুরক্ষিত থাকবে فِي الْخِيَامِ খীমাসমূহের মধ্যে।
৭৩. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبَانِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৭৪. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ এদেরকে না কোনো মানুষ স্পর্শ করেছে قَبْلَهُمْ তাদের পূর্বে وَلَا جَانٌّ আর না কোনো জিন।
৭৫. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! স্বীয় প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبَانِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৭৬. مُتَّكِئِينَ তারা হেলান দিয়ে বসবে عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ সবুজ নকশীদার কাপড়ের (বিছানার) উপর وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ এবং অতি সুন্দর।
৭৭. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا অতএব, হে জিন ও মানব! তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামতকে تُكَذِّبَانِ তোমরা অস্বীকার করবে।
৭৮. تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ বড় বরকতপূর্ণ নাম আপনার প্রভুর ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ যিনি মর্যাদাবান ও দয়ালু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল ঃ ১. মুকাতিল (র.) এর বর্ণনা মতে সূরা ফুরকানের ৬০ তম আয়াত إِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ যখন নাজিল হয়, মুশরিকেরা বলেছিল যে, আমরাতো রহমান বলতে কাউকে চিনি না। মুশরিকদের এহেন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন। –(বাহরে মুহীত্ব : ১৮৬/৮)

শানে নুযূল ঃ ২. মক্কাবাসীরা বলেছিল যে, কুরআন নামে মুহাম্মদ যা বলছে তা মানুষই তাকে শিক্ষা দিচ্ছে। সে মানুষটি হলো রহমানুল ইমামা অর্থাৎ মুসাইয়াতুল কায্‌যাব। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী ১৩৪/১৭, ফতহুল কাদীর : ১৩১/৫)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

শানে নুযূল ঃ ১. ইবনে শোআয়ব ও আত্বা খোরাসানী বলেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম, আত্বীয়া বিন কায়েস এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলেছিল, আমি মারা গেলে আমাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে। আল্লাহ হয়তো আমাকে ভুলেও যেতে পারেন। অতঃপর সে লোকটি একদা এক রাতভর আল্লাহর নিকট তওবা করে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার তওবা গ্রহণ করে তাকে বেহেশেতে দাখিল করে দেন। সে ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল ঃ ২. ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ শায়খ আত্বা (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একদিন কিয়ামত, মীযান, জান্নাত, দোজখ ও ফেরেশতাগণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর মানুষ কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে, নাফরমানী করার জন্য? ফলে তাদের জন্য দুঃখ-দুদর্শা ও শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে তা স্মরণ করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং অবস্থার ভয়াবহতার এমন রূপ দাঁড়াল যে, তিনি বলতে লাগলেন, হায় আমি যদি বৃক্ষরাজি হয়ে যেতাম, তাহলে তো চতুস্পদ প্রাণীরা আমাকে গ্রাসের বস্তু বানিয়ে নিত! সে মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হৃদয়কে ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা দান করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(ইবনে কাছীর : ২৮৬/২৭/১৪, রূহুল মা'আনী : ১১৭/১৪-২৭)

নামকরণ : সূরা রাহমানের অন্য একটি নাম হলো 'উরূসুল কুরআন'। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– "প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটি সৌন্দর্য আছে, এ সৌন্দর্যের কারণে সে জিনিসটি দুলহানের ন্যায় হয়, আর কুরআনে কারীমের সৌন্দর্য হলো সূরা রাহমান। সূরা রাহমানের আয়াত সংখ্যা ৭৮, বাক্য সংখ্যা ৩৫১ আর অক্ষর হলো ১,৬৩৬। আল্লামা আলূসী (রহ.) তাঁর তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে লিখেছেন, অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ মত পোষণ করেন যে, সূরা রাহমান মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনে মারদূভিয়া (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং ইবনুন নুহাস (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। বায়হাকী (র.) 'দালায়েলে' লিখেছেন যে, এ সূরা মদীনা মুনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.)-এ মতই পোষণ করতেন।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাঁর 'তাফসীরে আদদুররুল মানসূরে' উভয় মতের উল্লেখ করেছেন।

এ সূরার তাফসীরে হযরত হাসান বসরী (র.), ওরওয়া (র.), ইকরিমা (র.), হযরত জাবের (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত হলো, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা ক্বামারে নবুয়তের সত্যতার দলিল হিসেবে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর মু'জিযার কথা উল্লেখ রয়েছে। এরপর অতীতের বিভিন্ন জাতির নাফরমানীর উল্লেখ করে তাদের উপর যে আজাব এসেছে, তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামতের বর্ণনা রয়েছে।

এ সূরার বৈশিষ্ট্য : সূরা রাহমান আপন বৈশিষ্ট্য এবং মহিমায় সমুজ্জ্বল। এ সূরার ভাব ও ভাষা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এবং হৃদয়গ্রাহী। এ সূরার মিষ্টি মধুর শব্দচয়ন এবং আশাব্যঞ্জক ভাব মানুষমাত্রকে আকৃষ্ট করে। আল্লাহ পাকের অসীম রহমতের আশীষে মানুষ আশান্বিত হয়। মানব-মন কৃতজ্ঞ হয়। এ সূরাটির ছন্দের মাধুর্য, সুর লহরী এবং ভাষার অলংকারে মুগ্ধ হয়ে পৌত্তলিকরা পর্যন্ত সৎকাজে অনুপ্রাণিত হতো।

ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে আগমন করেন এবং এ সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন। সাহাবায়ে কেরাম নীরব থেকে মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ করতে থাকেন। এরপর হুজুর ﷺ ইরশাদ করেন, হে লোকসকল! আমি এ সূরা জিনদেরকে শুনিয়েছি, আমি যখনই এ আয়াত فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ তেলাওয়াত করেছি, তখন জিনেরা এই বলে জবাব দিয়েছে, হে পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করি না, তোমারই জন্য রয়েছে সকল প্রশংসা। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিন্তু তোমরা এ সূরা শ্রবণ করে নীরব রইলে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সূরা নামাজ ব্যতীত অন্য সময় যদি তেলাওয়াত বা শ্রবণ করা হয়, তবে সুন্নত হলো উল্লিখিত আয়াতের পর জবাব প্রদান করা। আর নামাজের অবস্থায় জবাব দেওয়া যাবে না, তবে বিষয়টি চিন্তায় আসতে পারে।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা আর রাহমান পাঠ করছে, সে মক্কায়ে মোয়াজ্জমা অথবা বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতিবেশী হবে।

এ সূরার আমল : যে কেউ এ সূরা পাঠ করবে, সে দুনিয়াও আখেরাত উভয় জাহানের অশেষ কল্যাণ লাভ করবে। যে ব্যক্তি সূরা রাহমান এগারো বার পাঠ করবে, আল্লাহ পাকের রহমতে তার মকছুদ হাসিল হবে। নিয়মিতভাবে যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে, কিয়ামতের দিন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। চক্ষু রোগীর জন্যও এ সূরার আমল উপকারী হয়।

শানে নুযূল : যখন قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ এ আয়াত নাজিল হয়, তখন মক্কার কাফেরদের মধ্যে আবূ জাহল, ওয়ালীদ, ওতবা, শায়বা গং বলতে লাগল, রহমান কে? আমরা তা জানি না, তখন সূরা রাহমান নাজিল হলো এবং দয়াময় আল্লাহ পাকের অনেক গুণাবলি বর্ণিত হলো। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের কথা এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর অনন্ত অসীম নিয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করা হলো।

বস্তুত মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দানের কোনো সীমা নেই, শেষও নেই। মানুষের অস্তিত্ব, জীবন, যৌবন, জীবনের যাবতীয় উপকরণ এক কথায় সব কিছুই আল্লাহ পাকের মহান দান। এই অসীম দানের মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য সূরায় এবং জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের কোনো কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

اَلرَّحْمٰنُ 'আর রহমান' শব্দটি মোবালাগা, অর্থাৎ এতে রহমতের আধিক্য বুঝায়। আল্লাহ পাক মুমিন, কাফের, ভালো-মন্দ সকলের প্রতি অতীব দয়াবান। প্রত্যেকটি নিয়ামত তিনিই দান করেন। রহমান শব্দটি শুধু আল্লাহ পাকের জন্যই ব্যবহৃত হয়, আর কারো জন্য নয়।

পক্ষান্তরে রাহীম শব্দটি অন্যের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, বিশ্ববাসীর প্রতি যিনি দয়া করেন তাঁকে রহমান বলা হয়। 'রহমান' ও 'রাহীম' উভয় শব্দই পরম করুণাময় অসীম দয়ালু অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, 'রহমান' তিনি, যাঁর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি তা প্রদান করেন, আর 'রাহীম' তিনি, যাঁর নিকট কিছু চাওয়া না হলে তিনি রাগান্বিত হন।

'রাহমান' তিনি, যিনি মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করেন, যিনি মানুষকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, যিনি দুনিয়ার জীবনের সকল বিপদাপদ দূর করেন।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ **: দয়াময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দান :** পরম করুণাময় আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর কালাম পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ, যা মহান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত, যা তিনি দয়া করে মানবজাতিকে দান করেছেন। দয়াবান আল্লাহ পাকই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তার মনোভাব প্রকাশ করার শক্তি দান করেছেন। মানুষের অস্তিত্ব, তার জীবন-যৌবন সবই আল্লাহ পাকের দান, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো পবিত্র কুরআন, আর মানব জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হয় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। মানুষকে সৃষ্টি করার কথা ঘোষণা করার কথায়ও পবিত্র কুরআন দানের উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় নিয়ামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো পবিত্র কুরআন। যাবতীয় কল্যাণ সম্পৃক্ত রয়েছে পবিত্র কুরআনের সাথে। যাবতীয় জ্ঞানের উৎস হলো পবিত্র কুরআন। সমস্ত আসমানি গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো পবিত্র কুরআন। মানব-অন্তরের যাবতীয় রোগের অব্যর্থ মহৌষধ হলো পবিত্র কুরআন। আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পন্থা হলো পবিত্র কুরআন। মহান আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম হলো পবিত্র কুরআন।

ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক সবকিছুর ইলম পবিত্র কুরআনেই দান করেছেন। আমাদের জন্য পবিত্র কুরআন সবকিছু বর্ণনা করেছে। পূর্বের এবং পরবর্তী কালের সকল জ্ঞান পবিত্র কুরআনেই একত্র করা হয়েছে। আর সে জ্ঞান পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর নিকট থেকে সাহাবায়ে কেরাম তা হাসিল করেছেন। এ পর্যায়ে খোলাফায়ে রাশেদীন তাঁদের উপর ফজিলত অর্জন করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের পর তাঁদের নিকট থেকে তাবেয়ীগণ সে ইলম হাসিল করেছেন। জ্ঞানের এ সাধনা আজও অব্যাহত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। তবে যুগের আবর্তন-বিবর্তনে জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা হ্রাস পাচ্ছে, অথচ কুরআনে কারীমের জ্ঞান-ভাণ্ডার রয়েছে পরিপূর্ণ, এটি নিঃসন্দেহে দয়াময় আল্লাহ পাকের মহান দান। এ দান লাভের জন্য যারা সাধনায় রত হয়, আল্লাহ পাক দয়া করে তাদেরকে তা দান করেন। কিন্তু যারা গাফলতি করে, তারা এ দান থেকে বঞ্চিত হয়। সারা বিশ্বে যে যখন ঈমান নিয়ে, আন্তরিক ভক্তি নিয়ে, একনিষ্ঠভাবে পবিত্র কুরআনের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান লাভ করতে প্রয়াসী হয়েছে, আল্লাহ পাক তার জন্য পবিত্র কুরআনের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার তখনই উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মানব-জীবনে এমন কোনো সমস্যা নেই, যার সমাধান পবিত্র কুরআনে নেই। বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শান্তিকে সুরক্ষিত করতে হলে পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন ব্যতীত কোনো গত্যন্তর নেই। তাই নিখিল বিশ্বের শান্তির শ্রেষ্ঠতম উপায় হলো পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ এবং যাঁর প্রতি পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে তথা শান্তি-দূত হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শের অনুসরণ। যারা এ উপায় গ্রহণ করে, তাদের এ জীবন ও পরজীবন সার্থক ও সুন্দর হয়।

পক্ষান্তরে, যারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও প্রিয়নবী ﷺ-এর অনুসরণ থেকে বিমুখ হয়, তাদের জীবন-সাধনা হয় ব্যর্থ। কাফেররা আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করতো, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য অনেক কিছুর পূজা করতো, আল্লাহ পাকের অগণিত নিয়ামত ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকতো, এমনকি তারা 'রহমান কে? আমরা তা জানি না' এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করতেও দ্বিধাবোধ করতো না। তাদের উদ্দেশ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে, 'রহমান তিনিই, যিনি তোমাদের হেদায়েতের জন্য সার্বিক কল্যাণের প্রতীক পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।' আর এ সূরায় ৩১ বার আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ : দয়াময় আল্লাহ পাক হেদায়েতের মূল উৎস পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, এ মহা সত্য যদি উপলব্ধি করতে না পার, তবে হে আত্মবিস্মৃত মানবজাতি! তোমার অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য কর, তোমার নিজের দিকে নজর দাও, তোমাকে সেই দয়াময় আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন, তুমি ইতঃপূর্বে এ পৃথিবীতে ছিলে না, তোমাকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই লালন-পালন করছেন, তিনিই তোমাকে শক্তি সামর্থ্য দান করছেন, তোমার যাবতীয় গুণাবলি তাঁরই দান, তোমার দেহ মন, তোমার অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই দান। সত্য উপলব্ধির জন্য, সত্য পথ লাভের জন্য তোমাকে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন দান করেছেন। পবিত্র কুরআনই বলবে, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কী? তোমার জীবন চলার পথ কী? পাথেয় কী?

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ : আর দয়াময় আল্লাহ পাকই তোমাকে দান করেছেন তোমার মনের ভাব প্রকাশ করার শক্তি। পবিত্র কুরআন পাঠ করতে হলে এর প্রয়োজন অনেক বেশি। বাকশক্তির মাধ্যমেই প্রকাশ পায় মনের অভিব্যক্তি। এসব কিছুই মানুষের প্রতি দয়াময় আল্লাহ পাকের মহান দান। তবে এসব দানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো পবিত্র কুরআন, এমনকি মানুষের জীবনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কেননা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ব্যতীত জীবন শুধু ব্যর্থ নয়, বিপজ্জনকও, পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে ভোগ করতে হবে দোজখের কঠিন শাস্তি। বুখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের ময়দানে আদম সন্তান একটু নড়াচড়াও করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে পাঁচটি প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেয়। সে প্রশ্ন পাঁচটি হলো–

১. আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জীবন কি কাজে ব্যয় করেছ?
২. যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করেছ?
৩. অর্থ-সম্পদ কি কি পন্থায় রোজগার করেছ?
৪. আর তা কি কি কাজে ব্যয় করেছ?
৫. যা তুমি জানতে পেরেছিলে, তার উপর কতখানি আমল করেছ?

যারা এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে, তারাই সাফল্যমণ্ডিত হবে। পক্ষান্তরে যারা এর জবাব দিতে পারবে না, তারাই হবে বিপদগ্রস্ত। অতএব, দয়াময় আল্লাহ পাকের দয়ামায়া ভোগ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর মহান বাণী পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করা কল্যাণকামী বাস্তববাদী মানুষের একান্ত কর্তব্য।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতের اَلْاِنْسَانَ শব্দ দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীর সব কিছুর নাম ও গুণাগুণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ পাক সাত লক্ষ ভাষার জ্ঞান দান করেছিলেন।

তাফসীরকার আবুল আলীয়া এবং হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন , আলোচ্য আয়াতে اَلْاِنْسَانَ শব্দ দ্বারা শুধু হযরত আদম (আ.) নয়; বরং সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলার, লিখার, বুঝার এবং বুঝাবার ক্ষমতা দিয়েছেন। এভাবে মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ গ্রহণ করার এবং কুরআনের বাহক হওয়ার যোগ্য হয়েছে।

তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, আল্লাহ পাক প্রত্যেক জাতিকে তার ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন– اَلْاِنْسَانَ শব্দ দ্বারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর اَلْبَيَانَ দ্বারা কুরআনে কারীমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য পথ-প্রদর্শক এবং হযরত রাসূলে কারীম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের প্রকৃত প্রমাণ। এতে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হবে, তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। ইতঃপূর্বে নবী রাসূলগণ এ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা দিয়েছেন, পবিত্র কুরআনের বর্ণনা তারই অনুরূপ।

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ : [তিনিই তাকে কথাবার্তা বলাও শিখিয়েছেন]।

আলোচ্য আয়াতের البيان শব্দটির ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম কাতাদা (র) বলেছেন, আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতের বর্ণনা দিয়েছেন এবং হালাল হারামে বিস্তারিত বিবরণ তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।

কাতাদা (র.)-এর আরেকটি মত হলো, আল্লাহ পাক ভালো-মন্দ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং যা করণীয় এবং যা বর্জনীয় তারও শিক্ষা দিয়েছেন।

আর ইবনে জায়েদ (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো- মানুষকে আল্লাহ পাক তার মনের কথা প্রকাশ করার শক্তি দান করেছেন। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ পাক মানুষকে বাকশক্তি দান করেছেন, যেন সে আল্লাহ পাকের কালাম পবিত্র কুরআন পাঠ করতে পারে, শিখতে পারে, তেলাওয়াত করতে পারে, কেননা বাকশক্তি না থাকলে পবিত্র কুরআন পাঠ করা সম্ভব হতো না। আর এ বাকশক্তির মাধ্যমেই মানুষ অন্য লোকদের নিকট পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করতে পারে, সত্যের দিকে আহবান জানাতে পারে এবং মন্দ ও নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে।

হযরত হাসান বসরী (র.) এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, বাকশক্তির কারণেই মানুষ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে এটিও নিঃসন্দেহে মানুষের প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের মহান দান। আল্লামা আলুসী (র.) লিখেছেন, কাতাদা (র.) বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহ পাক মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের ইলম দান করেছেন।

আর যাহহাক (র.) বলেছেন, আল্লাহ পাক মানুষকে ভালো-মন্দের ইলম দান করেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীর সবকিছুর নাম এবং গুণাবলি শিক্ষা দিয়েছেন।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো- আল্লাহ পাক মানুষকে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার শক্তি দান করেছেন। আর ইমাম জাফর সাদেক (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো- আল্লাহ পাক মানুষকে ইসমে আজম শিক্ষা দিয়েছেন, যার মাধ্যমে সব কছু পাওয়া যায়।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ [সূর্য ও চন্দ্রের জন্য একটি নির্দিষ্ট হিসাব রয়েছে। ঐ হিসাব মোতাবেকই তারা চলমান থাকে] :

অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যের জন্য গতিবেগ সুনির্দিষ্ট রয়েছে। সে হিসেব অনুযায়ীই তারা পরিক্রমণ করে, আর ঐ হিসেব মোতাবেকই পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নির্ধারিত রয়েছে। মাস ও বছর তা দিয়েই নির্ধারিত হয়। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত প্রভৃতি কাজের সময় ঐ হিসেব মোতাবেকই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ [কাণ্ডবিহীন বৃক্ষ এবং কাণ্ড বিশিষ্ট বৃক্ষ উভয়ই আল্লাহ পাকের অনুগত রয়েছে]।

অর্থাৎ উভয়ই আল্লাহপাকের হুকুমের তাবেদার, যেভাবে মানুষ সেজদা করার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, ঠিক সেভাবে বৃক্ষ-তরুলতাও আল্লাহপাকের প্রতি অনুগত থাকে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, বৃক্ষের ছায়া আল্লাহপাকের মহান দরবারে সেজদারত হয়।

একথা সর্বজনবিদিত, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভৃতিকে আল্লাহপাক মানব জাতির প্রয়োজনের আয়োজনেই সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্র সূর্যের উদয়-অস্ত আল্লাহপাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। এক আল্লাহপাকের নির্দেশক্রমে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই চন্দ্র-সূর্য তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে পরিক্রমণ করে চলেছে। তাই তো সূরা ইয়াসীনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ [আর সূর্য পরিভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ পাকের নিয়ন্ত্রণ]।

যেভাবে উর্ধ্বলোকে সবকিছু আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে অধঃলোকে তথা পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহপাকের কর্তৃত্বাধীন রয়েছে। আল্লাহপাক সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা মানুষের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত রেখেছেন। মানুষ যখন বিশাল সৃষ্টির কোনো কিছুকে ব্যবহার করতে চায়, তখন তা মানুষের প্রতিও আনুগত্য প্রকাশ করে, কেননা আল্লাহ পাক তাদেরকে এর আদেশ দিয়েছেন।

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ (٧) اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ (٨) [এবং আকাশকে তিনিই করেছেন সুউচ্চ এবং তিনিই স্থাপন করেছেন দাড়িপাল্লা, যেন তোমরা পরিমাণে কম বেশি না কর]। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী আল্লাহপাকই সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁরই নির্দেশক্রমে আসমানকে সুউচ্চে রাখা হয়েছে। তিনি স্থাপন করেছেন (দুনিয়াতে) দাড়িপাল্লা।

তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ميزان শব্দের অর্থ যদিও দাড়িপাল্লা হয়, কিন্তু এর তাৎপর্য হলো ন্যায়বিচার করা। আল্লাহ পাক ন্যায়বিচার কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন এবং প্রত্যেককে ন্যায়বিচার কায়েম করার ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আর এভাবেই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা সঠিক হয়েছে।

কাতাদা এবং যাহহাক (র.) বলেছেন, এ আয়াতে ميزان শব্দ দ্বারা কোনো কিছুর পরিমাণ জানার বাহনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ওজন করার আভিধানিক অর্থ হলো আন্দাজ করা।

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ [যেন তোমরা পরিমাপে কম বেশি না কর] অর্থাৎ আল্লাহপাক দাড়িপাল্লা এ জন্য রেখেছেন, যেন তোমরা সীমালজ্ঘন না কর, কারো হক বিনষ্ট না কর। ন্যায়বিচার বা ইনসাফ কায়েম করা প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য, আর ইনসাফ কায়েমের প্রশ্ন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্থিত হয়। দুনিয়াতে মানুষকে ন্যায়বিচার কায়েম করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। আখেরাতে ন্যায় বিচারের ভিত্তিতেই মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে। আর এ জন্যই দুনিয়াতে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে ওজন করার তাগিদ করে ইরশাদ হয়েছে।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ (٧) : অর্থাৎ ন্যায্যভাবে ওজনের মান ঠিক রেখ এবং ওজনে কম দিও না। সঠিক ওজন দেওয়ার এবং কারো প্রতি অবিচার না করার এবং মানুষের হক বিনষ্ট না করার তাগিদ রয়েছে এ আয়াতে। আলোচ্য আয়াতের এ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। কথা বলার সময় হক কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত না রাখা, হক বা সত্যের উপর আমল করা, বান্দার হক থেকে আল্লাহ পাকের হক পর্যন্ত যথানিয়মে আদায় করা, চলাফেরা, উঠা-বসা এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার কায়েম করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের বিশেষ তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এরপর ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ [তোমার ওজনে কম দিও না]।

এ সম্পর্কে পুনরায় তাগিদ করে ইরশাদ হয়েছে যে, কখনো কোনো অবস্থাতেই ওজনে কম দিও না। যদি তা কর তবে কিয়ামতের দিন তোমাদের আমল যখন পাল্লায় পরিমাপ করা হবে, তখন তোমরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ (١٠) فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ (١١) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢)

সৃষ্টজীবের জন্য আল্লাহপাক জমিনকে বিছিয়ে রেখেছেন। তাতে ফলমূল, খেজুর বৃক্ষ রয়েছে, যার ফল আবৃত থাকে। আর তাতে রয়েছে ভূষিযুক্ত তরিতরকারি এবং সুগন্ধি পুষ্পও'।

পরম করুণাময় আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সৃষ্টজীবের বসবাসের জন্য জমিনকে বিছিয়ে রেখেছেন এবং তাতে রেখেছেন রকমারি ফল ফুলারী, তরি তরকারি এবং সুগন্ধি ফুলের বিপুল সমারোহ। আর এসব মানুষের উপকারার্থেই আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

তিনিই সেই আল্লাহ পাক, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীর সবকিছু'।

এজন্য মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহপাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (١٣) অতএব, (হে জিন ও মানবজাতি! এত অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করা সত্ত্বেও) স্বীয় পরওয়ারদেগারের কোন কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

বস্তুত আল্লাহ পাকের কোনো নিয়ামতকেই অস্বীকার করা যায় না, আমরা তাঁর নিয়ামতকে অস্বীকার করি না, তিনি মহান দাতা, সকল প্রশংসা শুধু তাঁরই।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ (١٥)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের অনেক নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, এরপর মানুষ ও জিন জাতিকে সম্বোধন করে এ প্রশ্ন করা হয়েছে, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা আল্লাহ পাকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পার? অর্থাৎ কোনো নিয়ামত অস্বীকার করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আলোচ্য সূরায় বিভিন্ন নিয়ামতের উল্লেখ করে একত্রিশ বার এ প্রশ্ন করা হয়েছে। এর দ্বারা মহান দাতা আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীনের অগণিত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর শোকরগুজার হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। লব্ধ নিয়ামতের হক্ব আদায়ের পন্থা হলো নিয়ামতদাতার বিধি-নিষেধ পালন করা, তাঁর বিধানের বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করা এবং সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

আর আলোচ্য আয়াতে মানব ও জিনজাতির সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষকে আল্লাহ পাক পোড়ামাটির পাত্রের ন্যায় খনখনে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আর জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তিনি অগ্নি-শিখা থেকে। আর ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেছেন নূর থেকে।

আল্লামা আবূ হাইয়ান লিখেছেন আলোচ্য আয়াতের اَلْاِنْسَانَ শব্দ দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং جَانَّ শব্দ দ্বারা ইবলীসকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

মাটি থেকে সৃষ্টি করা মানুষকে আল্লাহ পাক সৃষ্টির সেরা বা আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছেন। তাকে দান করেছেন তাঁর অফুরন্ত নিয়ামত। আল্লাহপাক মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, আর মানুষকে আল্লাহপাক তাঁর বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, তাই ইরশাদ হয়েছে– وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আর আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যই সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার পরিচয় লাভ করে, আমার মারেফাত হাসিল করে এবং শুধু আমার বন্দেগীতে মশগুল হয়। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর প্রবর্তিত বিধি-নিষেধ পালনে তৎপর হওয়া। এ মর্মে উক্ত সূরায় বারবার ইরশাদ হয়েছে–

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ অর্থাৎ হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧) [তিনি দু'মাশরিক (পূর্ব) এবং দু'মাগরিবেরই (পশ্চিম) মালিক] :

দু'মাশরিক, দু'মাগরিব দ্বারা চন্দ্র-সূর্যের, শীত-গ্রীষ্মের উদয় ও অস্ত যাওয়ার দু'টি স্থানকে উদ্দশ্যে করা হয়েছে। শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয় ও অস্তের স্থান পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্ব মানবের অনেক হিত সাধিত হয়, তাই এর পরিবর্তনও আল্লাহপাকের একটি নিয়ামত।

এ নিয়ামতের উপলব্ধি করে আল্লাহপাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও মানুষের কর্তব্য। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা আল্লাহপাকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ (٢٠) : তিনিই প্রবাহিত করেছেন দু'টি সাগরকে, যারা পরস্পর মিলিত হয়ে বয়ে চলে।

আল্লাহপাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রবহমান দু'টি সাগরের মাঝে একটি অদৃশ্য অন্তরাল রয়েছে, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। একটির পানি লবণাক্ত, আর অন্যটির পানি মিষ্ট। উভয়টিই পাশাপাশি মিলে মিশে থাকে, কিন্তু একটি আরেকটির মাঝে প্রবেশ করতে পারে না, একটি অন্যটির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একত্র হয়ে প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পানির বর্ণনা ও স্বাদে পার্থক্য বর্তমান থাকে। মহান আল্লাহ পাকের হুকুমের প্রতি উভয় সাগরই আনুগত্য প্রকাশ করে চলেছে।

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ অতএব, (হে জিন ও মানবজাতি!) এই সমুদ্রসমূহের সৃষ্টিতে তোমাদের যে বিশেষ এবং অনেক উপকার রয়েছে এবং আল্লাহপাকের বিস্ময়কর কুদরত ও হেকমতের যে বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে, তার কোনটিকে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (٢٢) উভয় সমুদ্র থেকে মণি-মুক্তা এবং মারজান নামক মূল্যবান পাথর বের হয় :

সমুদ্র-গর্ভের মণি-মুক্তা এবং সমুদ্রের উপরে চলমান নৌযান আল্লাহপাকের দান স্বরূপই মানুষ লাভ করে। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা আল্লাহপাকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

বছরের প্রথম বৃষ্টিপাত যখন হয়, তখন সমুদ্রের ঝিনুকগুলো তাদের মুখ খুলে রাখে, ঝিনুকের মুখে বৃষ্টির প্রথম ফোটাটি যদি পড়ে, তবে তা মুক্তায় রূপান্তরিত হয়।

আলোচ্য আয়াতের اَللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ –এর ব্যাখ্যায় ইবনে জারীর (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, لُؤْلُؤُ হলো বড় বড় মুক্তা, আর مَرْجَانٌ হলো ছোট মুক্তা।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) এবং মুজাহিদ (র.) বলেছেন, لُؤْلُؤُ হলো ছোট মুক্তা, আর مَرْجَانٌ হলো বড় মুক্তা।

ইবনে ওহাব (র.) বলেছেন– مَرْجَانٌ হলো বড় বড় মুক্তা।

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئَاتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ (٢٤) فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٢٥)

সমুদ্র বক্ষে পর্বতের ন্যায় উঁচু জাহাজগুলো তাঁরই। অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সমুদ্রগামী জাহাজগুলো মানুষই তৈরি করে এবং সমুদ্রের বুক চিরে মানুষই দেশ থেকে দেশান্তরে গমন করে। কিন্তু জাহাজ নির্মাণের বুদ্ধি এবং জাহাজ পরিচালনার ক্ষমতা এবং সাহস নিঃসন্দেহে আল্লাহপাকের দান। তাই ইরশাদ হয়েছে–

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئَاتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ

সমুদ্র বক্ষের পর্বত-প্রমাণ উঁচু জাহাজগুলো তাঁরই, এমনিভাবে সমুদ্রের তলদেশে সংরক্ষিত বহু মূল্যবান মণিমুক্তোগুলোও তাঁরই দান। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ (٢٧) : **ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, আর অবিনশ্বর শুধু আপনার প্রতিপালকের মহান সত্তা।** অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছুই কেয়ামতের দিন ধ্বংস হবে। অথবা যখন আল্লাহপাকের ইচ্ছা হবে, তখন সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অথবা এর অর্থ হলো, পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু তার সৃষ্টির দিক থেকে নশ্বর, ধ্বংসশীল, কারোই নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ পাকের দান, যা স্থায়ী নয়। চিরস্থায়ী বা অবিনশ্বর শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা, যিনি, চিরস্থায়ী, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, যিনি সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী। কখনো যাঁর লয় নেই, ক্ষয় নেই, অথচ সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে, ক্ষয় আছে। তিনি সর্বদা আছেন, সর্বদা থাকবেন , তিনি মৃত্যু বা লয় থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আল্লাহপাক ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা "ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম" সর্বদা পাঠ করতে থাক।

হিসনে হাসীন কিতাবে রয়েছে, এক ব্যক্তি "ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম" আমল করছিল, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ সেদিক দিয়ে অতিক্রম করার সময় তা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার দোয়া কবুল হবে, তুমি যা কিছু চাওয়ার থাকে চেয়ে নাও।

বস্তুত মানুষ ও জিনজাতির প্রতি এটিও আল্লাহর একটি বিশেষ দান যে, তিনি তাঁর দিকে মনোনিবেশ করার তৌফিক দান করেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁর আরেকটি দান হলো দুনিয়াতে যাদের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, তিনি তাদেরকে তাঁর বিশেষ রহমতে আখেরাতে চিরস্থায়ী অস্তিত্ব দান করবেন। এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসান ঘটবে সত্য, কিন্তু আখেরাতে প্রত্যেককে তিনি চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

ইমাম শা'বী (র.) বলেছেন, যখন তুমি كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ পাঠ কর, তখন সঙ্গে সঙ্গে وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ পাঠ করবে।

ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, আল্লাহপাক প্রথমে বিশ্বসৃষ্টির অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছেন, এরপর আলোচ্য আয়াতে সৃষ্টি জগতের লয়প্রাপ্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এ পর্যায়ে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর একটি দোয়া উল্লেখযোগ্য, তিনি এভাবে দোয়া করতেন।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنَا اِلٰى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا اِلٰى اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ۔

يَسْئَلُهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ ....

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের এখানেই যা কিছু আছে, সকলেই আল্লাহপাকের মুখাপেক্ষী, তাঁর দানের মুখাপেক্ষী। জিন, মানুষ, ফেরেশতা, সকলেই তাঁর দুয়ারের ভিখারী, সকলের আবেদন এবং করজোড়ে বিনীত প্রার্থনা এক আল্লাহপাকের মহান

দরবারেই, তাঁর দানে সকলেই ধন্য, তাঁর দয়ায় সকলেই মুগ্ধ, সমগ্র সৃষ্টিজগতই তাঁর রহমতের কাঙ্গাল। তাই ইরশাদ হয়েছে- يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান জমিনের প্রত্যেকে তাঁর নিকটই প্রার্থনা করে থাকে। রহমত, মাগফেরাত, রিজিক, দৌলত, ইবাদত করার তৌফিকে কথায় সবকিছুর জন্যই আল্লাহপাকের মহান দরবারে সকলেই সর্বদা আরজি পেশ করতে থাকে।

(২৯) كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ **তিনি প্রত্যেক দিন নতুন নতুন কার্যে রত।** প্রত্যেকদিনই আল্লাহ পাকের স্বতন্ত্র কাজ, নতুন নতুন শান এবং নতুন নতুন সাজ। কাউকে তিনি সৃষ্টি করেন আর কারো মৃত্যু ঘটান। কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে সম্মানিত করেন, আর কাউকে অপমানিত করেন। কোনো রিজিকপ্রার্থীকে রিজিক দান করেন, আর কাউকে অভাবগ্রস্ত করেন। কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করেন, আর কাউকে করেন অসুস্থ। কারো বিপদ দূর করে দেন, আর কাউকে করেন বিপদগ্রস্ত, দয়াপ্রার্থীকে দান করেন, মোমেনকে করেন ক্ষমা, আর কাফেরদেরকে দোজখের আদেশ প্রদান করেন। যারা আল্লাহপাকের মহান দরবারে হাজিরীর বিষয়কে ভয় করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে সম্মানিত করেন এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহপাকের শান হলো এই যে, তিনি গুনাহ মাফ করে দেন, বিপদগ্রস্ত মানুষের বিপদ দূর করে দেন, কোনো জাতিকে উচ্চ মর্যাদায় অসীন করেন, আর কোনো জাতিকে অপমানিত করেন। -[ইবনে মাজাহ]

হোসাইন ইবনুল ফজল (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাকের শান হলো এই যে, তিনি পৃথিবীর সব কিছু যা তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে, সঠিক সময়ে স্ব-স্ব স্থানে পৌঁছে দেন।

সুলায়মান ইবনে উয়াইনাহ (র.) বলেছেন, সময়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। পৃথিবীর শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কে একদিন বলা যায়। আর দ্বিতীয় দিন হলো কিয়ামতের দিন। দুনিয়ার জীবনে আল্লাহপাক কোনো কাজ করার এবং কোনো কাজ না করার আদেশ দিয়ে থাকেন। তিনিই দান করেন জীবন, আর তিনিই মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের অবসান ঘটান। কোনো লোককে তিনি রিজিক বাড়িয়ে দেন আর কোনো লোকের রিজিক তিনি হ্রাস করে দেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহপাকের শান হবে আমলের প্রতিদান দেওয়া হিসাব গ্রহণ করা এবং ছওয়াব বা আজাব দেওয়া।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহপাকের শান হলো এই যে, আল্লাহপাক প্রত্যেক দিনই এক দল লোককে পৃথিবীতে পৌঁছে দেন, আরেক দল লোককে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেন। অবশেষে একদিন সকলকে আল্লাহপাকের দরবারে হাজির হতে হবে।

তাফসীরকার মোকাতিল (র.) বলেছেন, ইহুদিরা বলত, আল্লাহপাক শনিবার দিন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না, তাদের এ ভিত্তিহীন মন্তব্যের প্রতিবাদ স্বরূপই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহপাক প্রত্যেক দিনই নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত থাকেন এবং প্রত্যেক দিনই তার নতুন শান, নতুন সাজ, নতুন কাজ।

অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৩১) سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ **'হে জিন ও মানব জাতি! অতি শীঘ্রই আমি তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব। অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?**

অর্থাৎ অচিরেই দুনিয়ার সকল কর্মব্যস্ততার অবসান ঘটবে, আল্লাহপাক সমগ্র মানব ও জিন জাতির যাবতীয় হিসাব গ্রহণ করবেন। অবাধ্য কাফেররা কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করবে এবং ঈমানদার ও নেককারগণ চিরশান্তির কেন্দ্র জান্নাত লাভ করবে।

আলোচ্য আয়াতের سَنَفْرُغُ শব্দটির ব্যাখ্যায় জুযাজ (র.) কেসায়ী (র.) ইবনুল আরাবী এবং আবূ আলী ফারসী (র.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটিতে যে فَرَاغ কথাটি রয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহপাক কোনো কাজে বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছেন, পরে অবসর পাবেন, বরং এতে এ মর্মে সতর্কবাণী রয়েছে যে, অচিরেই আমি তোমাদের জীবনে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব গ্রহণ করবো। তখন তোমাদের মধ্যে কে ভালো, কে মন্দ তার হিসাব হবে, কেননা আল্লাহপাকের একটি শান আরেকটি শানকে বাধা দিতে পারে না; তিনি যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা করেন, যেহেতু মানব জাতি এবং জিনজাতির জন্য আল্লাহপাকের বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন রয়েছে, আল্লাহপাকের বিধি-নিষেধ পালনের মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মানব ও জিনজাতির উপরে, প্রকৃতপক্ষেই এটি বিরাট বোঝা, বিশেষ আমানত, তাই জিন ও মানুষ সম্পর্কে ثَقَلٰنِ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

১. হে মানব ও জিন জাতি! তোমাদেরকে শাস্তি অথবা পুরস্কার দেওয়ার জন্য অদূর ভবিষ্যতে আমি তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব।

২. এ কথাটি দ্বারা মানব ও জিনজাতিকে তাদের জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের হিসাব নিকাশের জন্য সতর্ক করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং যাহহাক (র.) ও এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

৩. হে মানব ও জিনজাতি! বর্তমানে তোমাদেরকে যেভাবে অবকাশ দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে আর এ রকম অবকাশ দেওয়া হবে না। অচিরেই তোমাদের এ অবকাশের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। তোমাদেরকে তোমাদের যাবতীয় হিসাব প্রদানের জন্য দাঁড়াতে হবে এবং অচিরেই আমি তোমাদের বিষয়ে ফয়সালা করে দেব।

৪. আল্লাহপাক ইতঃপূর্বে নেককারগণের পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন এবং অপরাধীদের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। আর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, আমার পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং শাস্তির ঘোষণা অবশ্যই কার্যকর হবে।

হযরত হাসান বসরী (র.) এবং কাতাদা (র.) ও এ ব্যাখ্যা করেছেন।

মানব ও জিনজাতির ব্যাপারে ثَقَلَانِ শব্দটি ব্যবহারের কারণ হলো, ثَقَلٌ শব্দটির অর্থ হলো বোঝা, মানুষ ও জিন জীবিত হোক কিংবা মৃত তারা জমিনের উপর একটি বোঝা স্বরূপ। ইমাম জাফর আস সাদেক (র.) বলেছেন, যেহেতু মানব ও জিনজাতি গুনাহের বোঝা নিয়ে চলে, তাই তাদেরকে ثَقَلَانِ বলা হয়েছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যার মর্তবা উচ্চে তাকে ثَقَلَانِ বলা হয়। যেমন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর হাদীসে রয়েছে– اِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِىْ

"আমি তোমাদের নিকট অতি গুরুত্বপূর্ণ দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, একটি আল্লাহর কিতাব (পবিত্র কুরআন) এবং আর একটি আমার আহলে বায়ত"।

হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি বিষয়ের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং উচ্চ মর্তবার কারণে এ পর্যায়ে ثَقَلَيْنِ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ثَقَلَيْنِ শব্দটির এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে, অচিরেই তোমাদের বিষয়ে আমি মনোনিবেশ করব, তোমাদের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করব। বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ যর (রা.) আরজ করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ কিয়ামতের দিন আমরা কি কোনো আড়াল ব্যতীত মহান আল্লাহপাকের দিদার লাভ করতে পারব? তিনি জবাবে ইরশাদ করলেন, কেন নয়? তখন আমি আরজ করলাম, সৃষ্টি জগতে এর কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি? হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রকে তোমরা বিনা বাধায় দেখতে পার না? আমি আরজ করলাম অবশ্যই। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, চন্দ্র তো আল্লাহর একটি সৃষ্টি মাত্র, আল্লাহপাকের শান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বোচ্চে। [আবূ দাউদ]

যেহেতু এ আয়াতে কিয়ামতের দিনের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে, আর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করাও একটি নিয়ামত, যাতে মানুষ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে, তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, অতএব হে মানব ও জিনজাতি! তোমরা আল্লাহপাকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ -

হে জিন ও মানবজাতি! যদি তোমরা আসমান ও জমিনের সীমা অতিক্রম করে বের হয়ে যেতে পার তবে বের হয়ে যাও, কিন্তু তোমরা তা পারবে না শক্তি ব্যতীত।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এক আল্লাহপাকেরই আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। নিখিল বিশ্বের এমন কিছুই নেই যা আল্লাহপাকের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, যদি আল্লাহপাকের বিধান অপছন্দনীয় হয় তবে আসমানের নীচ থেকে এবং জমিনের উপর থেকে তোমরা বের হয়ে যাও, কিন্তু আল্লাহর দুনিয়া থেকে বের হয়ে আত্মরক্ষার কোনো স্থান নেই।

কোনো কোনো তাফসীরকার বর্ণনা করেছেন, আসমান ও জমিনের প্রান্ত অতিক্রম করে যদি মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করতে পার তবে বের হয়ে যাও। তবে মনে রেখ যেখানেই তোমরা থাক, মৃত্যু তোমাদের নিকট পৌঁছবেই। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ কথাগুলো কিয়ামতের দিন হবে।

ইবনে জারীর ও ইবনে মোবারক (র.) যাহহাক (র.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, বর্ণিত আছে যে মানব ও জিনজাতিকে কিয়ামতের দিন কথাটি বলা হবে, আল্লাহপাকের হুকুমে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান ফেটে যাবে, ফেরেশতাগণ আসমানের প্রান্তসমূহে থাকবেন এবং আল্লাহপাকের হুকুমে তারা পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। আর পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীদেরকে

চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে ফেলবেন। এরপর একের পর এক সাতটি আসমানের ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে যাবে (এবং পৃথিবীর সকল অধিবাসীদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে) এরপর স্বয়ং মহান আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন আত্মপ্রকাশ করবেন, বাঁ দিকে দোজখ থাকবে, দোজখকে দেখে জমিনের অধিবাসীগণ পলায়নপর হবে, কিন্তু জমিনের যে প্রান্তেই পৌঁছবে সেখানেই দেখবে ফেরেশতাদের সাতটি দল তাদেরকে ঘেরাও করে আছে, তখন বাধ্য হয়ে যে যেখান থেকে পলায়ন করেছিল সেখানে ফিরে আসবে, আর এ কথাই কুরআনে কারীমের সূরা ওয়াল ফাজরে ইরশাদ হয়েছে– وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا - وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ - يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى -

"এবং (হে রাসূল!) যখন আপনার প্রতিপালকের শুভাগমন হবে এবং ফেরেশতাগণও সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত থাকবে, আর সেদিন দোজখকে আনা হবে, সেদিন মানুষ সত্য উপলব্ধি করবে কিন্তু এ উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে?

কিয়ামতের সেই কঠিন দিনেই মানব ও জিনজাতিকে সম্বোধন করে ঘোষণা করা হবে- يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

"হে জিন ও মানবজাতি! যদি তোমরা পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করে যেতে পার তবে বের হয়ে যাও, তবে বের হতে পারবে না শক্তি ব্যতীত"।

আর এ শক্তি সেদিন কারোরই হবে না, কেননা মানুষের যা শক্তি আছে তা-তো আল্লাহপাকেরই দান।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ "অতএব, আল্লাহপাকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পার?

কুরআনে কারীমের মাধ্যমে এবং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর মাধ্যমে মানবজাতিকে কিয়ামতের কঠিন দিনের ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে, যেন সেই বিপদের দিনের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, নিঃসন্দেহে মানবজাতির জন্য এটিও আল্লাহপাকের রহমত, অতএব তোমরা আল্লাহপাকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে।

ইমাম রাজী (র.) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতের এ কথাটি আখেরাতে বলা হবে। যখন দোজখের আজাব দেখে মানুষ পলায়নের চেষ্টা করবে এবং চতুর্দিকে অগণিত ফেরেশতার প্রহরা দেখবে তখন তারা বুঝবে, আল্লাহপাকের দরবার থেকে পলায়নের শক্তি কারো নেই।

আল্লামা আলূসী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতের মর্ম দুনিয়ার ব্যাপারেও হতে পারে, আখেরাতের ব্যাপারেও হতে পারে, দুনিয়ার ব্যাপারে হলে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এভাবে– হে মানবজাতি! যদি মৃত্যু থেকে পালিয়ে যেতে পার, তবে পলায়ন কর, কিন্তু তা অসম্ভব, অচিন্তনীয়। যদি আয়াতের মর্ম আখেরাতের ব্যাপারে গ্রহণ করা হয় তবে এর অর্থ হবে এই যে, কিয়ামতের দিন অগণিত ফেরেশতাগণ বিশ্ববাসীকে ঘেরাও করে রাখবে, তাদের পলায়নের কোনো পথ থাকবে না।

তাফসীরকার হযরত যাহহাক (র.) বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বক্ষণে লোকেরা যখন হাঁটে বাজারে ব্যবসায় বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকবে, এমন সময় কিয়ামতের ঘোষণা হবে। ফেরেশতাগণ অবতরণ করবে, এমন অবস্থায় মানুষ পলায়নের কোনো পথই পাবে না।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ (٣٥) "তোমাদের প্রতি ছুঁড়ে মারা হবে অগ্নি-শিখা ও ধুম্রকুণ্ড, তোমরা তখন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না, অর্থাৎ হে জিন ও মানবজাতি! কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতি ছুঁড়ে মারা হবে অগ্নি-শিখা এবং নিক্ষেপ করা হবে ধুম্রকুণ্ড।

আলোচ্য আয়াতের شُوَاظٌ –এর অর্থ হলো এমন অগ্নি-শিখা যাতে ধুম্র না থাকে, অধিকাংশ তাফসীরকারগণ শব্দটির এ ব্যাখ্যা করেছেন।

তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, شُوَاظٌ বলা হয় সেই সবুজ অগ্নি-শিখাকে যা বন্ধ হওয়ার পর বের হয়ে আসে।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের এবং কালবী (র.) نُحَاسٌ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন 'ধুম্র'।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, কখনো তাদের প্রতি অগ্নি-শিখা নিক্ষেপ করা হবে আর কখনো ধুম্র ছুঁড়ে মারা হবে।

ইবনে জারীর (র.) লিখেছেন, অগ্নি-শিখা এবং ধুম্র একই সঙ্গে ছাড়া হবে, আর মুজাহিদ (র.) এবং কাতাদা (র.) বলেছেন, نُحَاسٌ হলো গলানো তামা, যা কাফেরদের মাথার উপর ঢালা হবে।

উফী (র.) এবং কাতাদা (র.) বলেছেন, نُحَاسٌ হলো গলানো তামা যা কাফেরদের মাথার উপর ঢালা হবে। উফী (র.) এর সূত্রে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) এ মত পোষণ করতেন, তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবে না বা এর অর্থ হলো– তোমরা তখন কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে গমনের সময় কাফেরদের প্রতি অগ্নি-শিখা নিক্ষেপ করা হবে। সে কঠিন বিপদের সময় তারা কোনো সাহায্যকারী পাবে না, যে তাদেরকে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে।

যেসব কারণে কিয়ামতের দিন আজাব হবে সেগুলো সম্পর্কে সাবধান করা নিঃসন্দেহে রহমত আর এ রহমত লাভ করার পর ইচ্ছা করলে মানুষ আত্মরক্ষা করার পথ অবলম্বন করতে পারে। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের কোনো কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পার?

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (৩৭) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (৩৮)

[যেদিন আসমান বিদীর্ণ হয়ে রক্তে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে। অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? যখন আসমান বিদীর্ণ হবে সেদিন আসমানের বর্ণ রক্তে রঞ্জিত লাল চামড়ার ন্যায় হবে। আসমান বিদীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে ফেরেশতাগণের অবতরণের পথ হবে, এদিকে সমগ্র মানবজাতিকে কবর থেকে উঠানো হবে, সেদিন আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও ভয়-ভীতি প্রকাশ পাবে। কিয়ামতের সে ভয়াবহ অবস্থার কারণেই আসমানের বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তখন আসমানের বর্ণ হবে লাল চামড়ার ন্যায়।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আসমানের বর্ণ গোলাপী হবে।

আবূ সালেহ (র.) বলেছেন, আসমানের বর্ণ প্রথমে গোলাপী হবে, এরপর লাল হয়ে যাবে।

আজকে আকাশের বর্ণ নীল আর সেদিন হয়ে যাবে লাল, এভাবে আল্লাহপাকের বিস্ময়কর কুদরত ও হেকমতের বহিঃপ্রকাশ পাবে।

অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

আলোচ্য আয়াতের وردة শব্দটির অর্থ সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তা হবে লাল গোলাপের ন্যায় বা লাল চামড়ার ন্যায়।

যাহহাক (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, তা হলো লাল চামড়ার ন্যায়, কালবী (র.) ও এ অর্থই করেছেন।

কাতাদা (র.) বলেছেন, আসমানের বর্ণ এখন যা আছে কিয়ামতের দিন তা পরিবর্তন হয়ে যাবে, সেদিন তা লাল বর্ণের হবে।

যাহহাক (র.), মুজাহিদ (র.) ও কাতাদা (র.) সবাই এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আতা ইবনে আবিরুবাহ (র.) বলেছেন, আসমানের বর্ণ পরিবর্তন হতে থাকবে, আর তা যয়তুনের তেলের ন্যায় হয়ে যাবে।

আর ইবনে জোরায়েজ (র.) বলেছেন, আসমান যয়তুনের তৈলের ন্যায় হয়ে যাবে আর তা হবে দোজখের আগুনের প্রতিক্রিয়া।

يَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ....

আলোচ্য আয়াত সমূহে কেয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে–

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ (৩৬) [সেদিন কোনো জিন বা মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না]।

অর্থাৎ একথা জিজ্ঞাসা করা হবে না, এ কাজটি কি তুমি করেছিলে? বা এ কাজটি তুমি করনি? কেননা এ সম্পর্কে আল্লাহপাক সম্পূর্ণ অবগত, কে কি করেছে আর কে কি করেনি?

দ্বিতীয়ত: প্রত্যেকের আমলনামায় তার কর্মজীবনের ছোট-বড় যাবতীয় কথা লিপিবদ্ধ থাকবে। ফেরেশতাগণ প্রত্যেকটি মানুষের সমগ্র জীবনের আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখছেন।

তৃতীয়ত: যদি কোনো ব্যক্তি আমলনামায় লিপিবদ্ধ বিবরণকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমি এ কাজ করিনি, তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, যেমন সূরা ইয়াসীনে ইরশাদ হয়েছে–

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۔

আজকের দিনে আমি তাদের মুখে মোহর করে দেব, তাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে, আর তাদের পা গুলো তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে।

لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔ [আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব।]

এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের মর্মের বিরোধী নয়, কেননা মানুষকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হবে না যে, এ কাজটি সে করেছে কিনা? বরং এ কথা জিজ্ঞাসা করা হবে, যখন তোমাদের জন্য এ কাজটি নিষিদ্ধ ছিল, তবু কেন তা তুমি করেছ? অথবা জিজ্ঞাসা করা হবে তোমাকে অমুক আদেশ দেওয়া হয়েছিল কেন তা পালন করনি?

ইকরিমা (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, কিয়ামতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থা হবে। কোনো স্থানে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে– কেন আল্লাহপাকের আদেশ অমান্য করেছ? সে স্থানের জন্যই ঘোষণা করা হয়েছে–

لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔ [আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব]

আর এমনও স্থান থাকবে যেখানে জিজ্ঞাসা করা হবে না, সে স্থানের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

তাফসীরকার আবুল আলীয়া বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, কোনো অপরাধী ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অন্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এতদ্ব্যতীত ফেরেশতাগণ মানুষের চেহারা দেখেই চিনে ফেলবে কে ঈমানদার ও নেককার, আর কে বেঈমান ও পাপিষ্ঠ আর হাদীস শরীফে এ কথাও উল্লিখিত আছে, মানুষের সে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অজু করার সময় ধৌত করা হয়, সেগুলো কিয়ামতের দিন চাঁদের ন্যায় দীপ্তিময় হবে।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ (٤١) সেদিন পাপিষ্ঠদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারাতে, তখন পাকড়াও করা হবে তাদেরকে তাদের পা এবং কপালের চুল ধরে।

পাপিষ্ঠদের পরিণতি : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, সেদিন মানুষ ও জিনকে তাদের পাপাচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। কারো মনে প্রশ্ন হতে পারে, কেন জিজ্ঞাসা করা হবে না? এর জবাবেই যেন এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠদের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনই হবে না কেননা তাদের চেহারা থেকেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে। অপরাধের চিহ্ন থাকবে তাদের চেহারায়, যেমন কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ .... هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔ [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৬-০৭]

সেদিন কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কিছু মুখ হবে কালো, যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনয়নের পর সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলে? অতএব, তোমরা শাস্তি ভোগ কর, তোমাদের কুফরি ও নাফরমানির কারণে, আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহপাকের রহমতের মধ্যে থাকবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

যাহোক, কিয়ামতের দিন নাফরমানদের চেহারাতেই তাদের পরিচয় ফুটে উঠবে, তাদেরকে দেখলেই বুঝতে বাকি থাকবেনা যে, তারা অপরাধী। তখন তাদের পা এবং কপালের চুল একত্র করে বেঁধে ফেলা হবে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, পিঠের দিক থেকে জিঞ্জির দিয়ে ঘাড় এবং পা একত্র করে বেঁধে দেওয়া হবে এবং কোমর ভেঙ্গে দেওয়া হবে ও দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ কিয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে জানিয়েছেন আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন) মুসলমানের মৃত্যুর সময়, কবরে অবস্থানের সময় এবং কবর থেকে বের হওয়ার সময় কালেমায়ে তৈয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ভয়-ভীতি লাঘব হওয়ার কারণ হবে। হে মুহাম্মদ! (আপনি বিস্মিত হবেন) যখন দেখবেন যে, (কিয়ামতের দিন) লোকেরা মাথার মাটি ঝেড়ে কবর থেকে বের হচ্ছে এবং কেউ বলছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালহামদুলিল্লাহ। দেখবেন, তার চেহারা উজ্জ্বল। আর অন্য একজন বলবে, হায়! আক্ষেপ! আল্লাহপাকের বিষয়ে আমি বড় অপরাধ করেছি, এসব লোকদের চেহারা হবে কৃষ্ণ বর্ণের।

আবূ ইয়া'লা (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا– এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা সুদখোর, তারা কিয়ামতের দিন উন্মাদ অবস্থায় হাজির হবে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হবে যে, তারা ছিল দুনিয়াতে সুদখোর।

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে আবী হাতেম এবং আবূ ইয়া'লা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন কিয়ামতের দিন কিছু লোক এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, তাদের মুখ থেকে অগ্নি-শিখা বের হতে থাকবে। তখন আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ এরা কারা? তিনি ইরশাদ করলেন, এরা সেসব লোক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন– اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا۔

যারা এতিমের অর্থ-সম্পদ জুলুম করে হজম করে তারা মূলত অগ্নি দ্বারা উদর পূর্ণ করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এবং হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, কিয়ামতের দিন অহংকারী লোকদেরকে ক্ষুদ্র পিপীলিকার আকৃতি দিয়ে হাজির করা হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে অর্থ-সম্পদ চেয়ে ফিরবে, কিয়ামতের দিন সে আহত অবস্থায় হাজির হবে, তার চেহারায় জখম থাকবে।

ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস শরীফ সংকলিত হয়েছে। যে ব্যক্তি মুমিনের হত্যাকাণ্ডে অর্ধেক বাক্য উচ্চারণ করেও সাহায্য করবে, সে (কেয়ামতের দিন) এমন অবস্থায় আল্লাহপাকের দরবারে হাজির হবে যে, তার দু'চক্ষুর মাঝে লেখা থাকবে, "আল্লাহপাকের রহমত থেকে নিরাশ"।

আবূ নু'আঈম হযরত ওমর (রা.) থেকে এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত এমনি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যে ব্যক্তি (মসজিদের) কেবলার দিকের দেয়ালে তার নাকের ময়লা নিক্ষেপ করবে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, নাকের ঐ ময়লাটি তার চেহারায় লেগে থাকবে।

তাবারানী 'আলআওসাতে' হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, তার দু'টি আগুনের চেহারা থাকবে।

তাবারানী এবং ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, দুনিয়াতে যে দ্বিমুখী কথা বলে, আল্লাহপাক তাকে কিয়ামতের দিন দু'টি আগুনের জিহ্বা দিয়ে দিবেন।

হাকেম এবং ইবনে হাব্বান হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যে ব্যক্তির দু'স্ত্রী থাকবে এবং সে তাদের মাঝে সমান ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, তার একটি পাঁজর ঝুকে থাকবে।

অন্য একখানা হাদীসে রয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমার উম্মতের হাশর দশটি দলের সঙ্গে হবে যাদের মধ্যে একদল বানরের আকৃতিতে হাজির হবে।

অন্য হাদীসে এ কথাও রয়েছে, যারা দুনিয়াতে কোনো মানুষের হক অন্যায়ভাবে নিয়ে যায়, কিয়ামতের দিন তা ঐ লোকদের ঘাড়ে চড়িয়ে দেওয়া হবে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে চুরি করবে, কিয়ামতের দিন ঐ চুরি করা বস্তু তার ঘাড়ের উপর চড়িয়ে দেওয়া হবে।

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ (٤٣) يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ (٤٤)

এটিই সেই জাহান্নাম, যাকে পাপিষ্ঠরা মিথ্যাজ্ঞান করতো, তারা অগ্নি এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, কাফেরদেরকে কপালের চুল ধরে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে পায়ের সঙ্গে বেধে এবং তাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়ে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, তখন তাদেরকে বলা হবে, এটিই সেই জাহান্নাম যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে, নবী রাসূলগণ যখন তোমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে এ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করতেন, তখন তোমরা তাদের মিথ্যাজ্ঞান করতে, এখন সেই দোজখের আগুন ভোগ কর এবং ফুটন্ত পানির স্বাদ গ্রহণ কর।

আলোচ্য আয়াতের اٰنٍ শব্দের অর্থ হলো, অত্যন্ত গরম পানি।

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিরমিযী এবং বায়হাকীতে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, কিয়ামতের দিন কাফেররা জঠর জ্বালায় চিৎকার করবে এবং খাদ্যের জন্য ফরিয়াদ করতে থাকবে। তাদেরকে তখন এমন খাবার দেওয়া হবে, যাতে তাদের ক্ষুধা নিবারণ হবে না, তাদের দেহও পুষ্ট হবে না, আর সে খাদ্য তাদের গলায় আটকে যাবে, তখন তারা স্মরণ করবে দুনিয়াতে গলায় খাবার আটকে গেলে পানির সাহায্যে সে কষ্ট দূর করত, তাই তারা তখন পানির জন্যে ফরিয়াদ করবে, আর তখন তাদেরকে এত গরম পানি দেওয়া হবে যে, তাদের চেহারা ঝলসে যাবে এবং পেটের ভেতর যখন ঐ পানি পৌঁছবে তখন নাড়ি-ভুঁড়ি ফেটে বের হয়ে পড়বে।

হযরত কা'বে আহবার বলেছেন, اٰنٍ হলো দোজখের একটি উপত্যকা, যাতে দোজখীদের রক্ত, পূঁজ একত্র হবে এবং তাতে দোজখীদেরকে নিমজ্জিত করা হবে, পরিণামে তাদের দেহের প্রত্যেকটি জোড়া ছুটে যাবে, এরপর দোজখীদেরকে ঐ উপত্যকা থেকে বের করা হবে এবং তাদের দেহ নতুন করে সৃষ্টি করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। আলোচ্য আয়াত يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ–এর এটিই ব্যাখ্যা।

فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٦) অতএব, তোমরা আল্লাহপাকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দোজখের শাস্তির বিবরণ স্থান পেয়েছে, যাতে করে মানুষ দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরকালীন চিরস্থায়ী

জীবনের সম্বল সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারে এবং আল্লাহপাকের নাফরমানী থেকে বিরত থাকে। আল্লাহপাকের নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষার মাধ্যমেই আখেরাতের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহের সতর্কবাণীও আল্লাহপাকের বিশেষ নিয়ামত, আর এজন্যেই ইরশাদ হয়েছে, অতএব, তোমরা আল্লাহপাকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ (٤٦) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٧) আর যে কেউ তার প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য দু'টি বাগান রয়েছে। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম এবং আবুশ শেখ হযরত আতা (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একদিন হযরত আবূ বকর (রা.) কিয়ামতের কঠিন দিন, হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাত ও দোজখের চিন্তায় অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বলেন, হায় আক্ষেপ! যদি আমার জন্মই না হতো! হায়! যদি আমি ঘাস হয়ে জন্ম নিতাম, তবে কোনো চতুষ্পদ জন্তু আমাকে খেয়ে নিত। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াতে সুসংবাদ রয়েছে সেসব লোকদের জন্য, যারা আল্লাহপাককে ভয় করে জীবন যাপন করে, যারা আল্লাহপাকের বিধান যথাযথভাবে পালন করে। যারা কখনো আল্লাহপাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয় না, যারা প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে, যারা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের লোভে মোহে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীকে ভুলে যায় না, যারা দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের চিন্তা করে অধিক পরিমাণে, যারা আল্লাহপাকের নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে নিজেকে বিরত রাখে, যারা অবশেষে আল্লাহপাকের মহান দরবারে হিসাব নিকাশের জন্য দণ্ডায়মান হতে হবে বলে চিন্তা করে এবং সে অবস্থাকে অত্যন্ত বেশি ভয় করে, তাদের জন্য জান্নাতে দু'টি বাগান রয়েছে।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, এ দু'টির মধ্যে একটি হলো জান্নাতে আদন, আরেকটি হলো জান্নাতে নায়ীম। হাদীস শরীফে এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে, দু'টি জান্নাত রৌপ্যের, আর দু'টি হবে স্বর্ণের, রৌপ্যের জান্নাতে যা কিছু থাকবে, তৈজষপত্র সহ সবই রৌপ্যের হবে। আর স্বর্ণের তৈরি জান্নাতের সবকিছুই স্বর্ণের হবে। জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে আদনে আল্লাহপাকের দীদার লাভে ধন্য হবেন।

ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ (٤٨) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٩)

"উভয় বাগানই বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষে পরিপূর্ণ। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

اَفْنَانٌ শব্দটি فَنَنٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো, বৃক্ষ-শাখা থেকে যে প্রশাখা বের হয়, যা দ্বারা বৃক্ষের ছায়া হয়। মুজাহিদ (র.) এবং কালবী (র.) افنان –এর এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

তাফসীরকার হযরত ইকরিমা (র.) বলেছেন, فَنَنٌ বৃক্ষশাখার সে ছায়াকে বলা হয় যা বাগানের দেওয়ালে পড়ে। আর কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষ। আর তাফসীরকার সাঈদ ইবনে জুবায়ের এবং যাহহাক (র.) বলেছেন, জান্নাতের এ বৃক্ষসমূহে বিভিন্ন আকৃতিরও স্বাদের রকমারি ফল থাকে। একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-ও এ ব্যাখ্যা করেছেন।

অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা আল্লাহপাকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ (٥٠) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥١) "উভয় বাগানের মধ্যেই দু'টি ঝর্ণা প্রবাহিত রয়েছে। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

অর্থাৎ জান্নাতে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। এ নহর পানিরও হবে, দুধেরও হবে এবং মধুর নহরও থাকবে। শারাবান তুহুরার নহরও থাকবে, পানির ফোয়ারাগুলোতে স্বচ্ছ নির্মল পানি থাকবে, যা কখনো শুষ্ক হবে না। তাতে কখনো ময়লা দেখা দেবে না। আল্লামা বগভী (র.) হযরত হাসান (র.)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে চারটি নহর থাকবে, তন্মধ্যে দু'টি আরশের নিচে থেকে প্রবাহিত হবে, আর দু'টি হলো সালসাবীল ও তাসনীম। একটিতে স্বচ্ছ পানি রয়েছে, আর একটিতে সুস্বাদু, নেশাবিহীন শরাব রয়েছে।

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ (٥٢) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٣)

উভয় বাগানে রয়েছে প্রত্যেক ফল জোড়া জোড়া। ফলগুলো দেখতে মানুষের পরিচিত হবে, কিন্তু তার স্বাদ হবে বিস্ময়কর, যার কথা কেউ শোনেনি, দুনিয়াতে যা কেউ কল্পনাও করেনি। অতএব, হে মানব ও জিনজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহপাকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, দুনিয়াতে যত মিঠা কড়া ফল রয়েছে, সবই জান্নাতে থাকবে।

ইবনে জারীর ও বায়হাকী বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, দুনিয়াতে শুধু তার নামই রয়েছে, স্বাদ, অবস্থা প্রকৃতি জান্নাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে।

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍ الـخ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতবাসীগণের জন্য জান্নাতে যে অসংখ্য নিয়ামত রয়েছে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াতসমূহেও জান্নাতের আরো অনেক নিয়ামতের বিবরণ স্থান পেয়েছে, ইরশাদ হয়েছে–

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (٥٤)

'তারা জান্নাতের দু'বাগানে এমন বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, যার আস্তর রেশমের তৈরি এবং উক্ত দু'বাগানের ফল থাকবে তাদের নিকটবর্তী।

জান্নাতের কয়েকটি নিয়ামত : যারা আল্লাহপাককে ভয় করে জীবন যাপন করে, যারা এ কথায় বিশ্বাস করে যে, আল্লাহপাকের সম্মুখে একদিন দাঁড়াতে হবে, তারা জান্নাতে রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় পরম সুখে হেলান দিয়ে বসবে। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহপাককে ভয় করে জীবন যাপন করে, আল্লাহপাক তাদের জন্য রেখে দিয়েছেন রেশমের আস্তর বিশিষ্ট আরামদায়ক বিছানা, যাতে তারা হেলান দিয়ে মহা আনন্দে বসবে এবং জান্নাতের ফলমূল তাদের নিকটবর্তী হবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) আরো বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে জান্নাতীদের বিছানার শুধু আস্তরের কথা বলা হয়েছে, অতঃপর বিছানার উপরের সৌন্দর্য কত বেশি হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতে জান্নাতীদের বিছানার আস্তরের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা রেশমের কাপড় দ্বারা তৈরি হবে; কিন্তু বিছানা কেমন হবে তা বলা হয়নি; কেননা এ পৃথিবীতে সে মূল্যবান বিছানা সম্পর্কে কেউই অবগত নয় এবং তা কত সুন্দর হবে, তা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ কল্পনাতীত।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জান্নাতের বিছানা নূরের হবে।

আবূ নাঈম সাঈদ ইবনে জোবায়েরের পক্ষ থেকেও এ বিবরণেরই উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আর জান্নাতীদের জন্য ফল নিকটবর্তী হবে, তারা দণ্ডায়মান থাকুক, অথবা উপবিষ্ট কিংবা শায়িত, সকল অবস্থায় তারা জান্নাতী ফল হাতের কাছেই পাবে অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই জান্নাতী ফল তাদের নাগালের বাইরে থাকবে না।

হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, জান্নাতীগণ জান্নাতের ফল সর্বাবস্থায় স্বহস্তে ছিঁড়ে খাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ফলের বৃক্ষগুলো জান্নাতবাসীগণের এত নিকটবর্তী হবে যে, আল্লাহতা'আলার প্রিয় বান্দা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই খেতে পারবে।

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ (٥٦)

'তাদের মাঝে রয়েছে বহু আনত-নয়না রমণী, যাদেরকে পূর্বে কোনো মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি'।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, ইতঃপূর্বে জান্নাতী বিছানার উল্লেখ রয়েছে, আর এ আয়াতে জান্নাতীদের পবিত্র সহধর্মিনীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা হবে আনত-নয়না, স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি তারা দৃষ্টিপাত করবে না, তারা তাদের স্বামীদেরকে বলবে, আলহামদু লিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহপাকের জন্য, যিনি আমাকে আপনার সহধর্মিনী করেছেন এবং আপনার খেদমতের সুযোগ দান করেছেন। তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, ইতঃপূর্বে কেউ তাদেরকে স্পর্শ করবে না। কেননা আল্লাহপাক তার ঈমানদার ও নেককার বান্দাদের জন্য জান্নাতেই তাদেরকে সৃষ্টি করবেন। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ (٥٨) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٩)

'তারা যেন রক্তবর্ণ হীরক ও মুক্তা। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

সৌন্দর্যে, স্বচ্ছতায় জান্নাতের হূরগণ ইয়াকূত এবং মারজান পাথরের ন্যায়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে হুরদের সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে যে, হুরগণ চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিময় হবে। তারা থুথু ফেলবে না, তাদের নাক থেকে কোনো প্রকার ময়লা বের হবে না, তাদের মলমূত্র ত্যাগেরও কোনো প্রয়োজন হবে না। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তারা কখনো অসুস্থ হবে না। তাদের তৈজষপত্র, তাদের চিরুনি প্রভৃতি স্বর্ণ ও রৌপ্যের হবে। তাদের দেহের ঘাম হবে কস্তুরী, প্রত্যেকের এমনি দু'জন স্ত্রী থাকবে। তারা হবে অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী। জান্নাতে কোনো প্রকার মতভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তারা এক মনের অধিকারী হবে। সকাল-সন্ধ্যায় তারা আল্লাহপাকের পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল থাকবে।

তিরমিযী এবং বায়হাকী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে যে দলটি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে তারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর হবে। আর দ্বিতীয় দলও আসমানের সুন্দরতম নক্ষত্রের ন্যায় হবে, তাদের প্রত্যেকের জন্য দু'জন জীবন-সঙ্গিনী হবে।

ইমাম আহমদ (র.) ইবনে হিব্বান (র.) এবং বায়হাকী (র.) প্রমুখ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো হুরদের চেহারা এত সুন্দর হবে যে, পর্দার আড়াল থেকেও আয়নার ন্যায় পরিচ্ছন্ন দেখা যাবে। আর তারা যে মুক্তা পরিধান করবে, তা প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত আলোকময় করে তুলবে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে ইরশাদ করেছেন– দেখ, ইয়াকূত একটি পাথর, আল্লাহপাক তার মধ্যে এমনি পরিচ্ছন্নতা রেখেছেন যে, তার মধ্যখান দিয়ে যদি কোনো সুতা ব্যবহার হয়, তবে তার বাইরে থেকে তা দেখা যাবে। –[ইবনে আবী হাতিম]

তিরমিযী শরীফেও এ বিবরণ সংকলিত হয়েছে।

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ (٦٠) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦١)

'উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে? অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে, এভাবে দুনিয়াতে যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আখেরাতে তারা অবশ্যই এর শুভ পরিণতি লাভ করবে।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আলোচ্য আয়াত هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ তেলাওয়াত করে ইরশাদ করেন, তোমরা কি জান যে, তোমাদের প্রতিপালক কি ইরশাদ করেছেন? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, যাকে আমি তাওহীদের নিয়ামত দান করেছি, তার বদলা জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কালেমায়ে তৈয়্যিবা পাঠ করে তার মর্মের অঙ্গীকার করবে এবং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যে জীবন-বিধান নিয়ে এসেছেন, তার উপর আমল করবে, তার বদলা জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ (٦٢) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٣)

'ঐ দু'টি বাগান ব্যতীত আরো দু'টি বাগান রয়েছে। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহপাকের দরবারে হাজির হওয়ার কথা স্মরণ রাখবে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য সম্বল সংগ্রহ করবে, তার জন্য চারটি জান্নাত থাকবে, দু'টির কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট দু'টির কথা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইতঃপূর্বে জান্নাতের যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে, তা মর্যাদার দিক থেকে এ আয়াতে উল্লিখিত বাগান দু'টি থেকেও উচ্চতর।

ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বাগান দু'টি পূর্বে বর্ণিত বাগানগুলো থেকে কম মর্যাদার।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বলেছেন, ইতঃপূর্বে যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো স্বর্ণের আর সে বাগানগুলো তাদের জন্য, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন, । আর আলোচ্য আয়াতে যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে, তা সেসব লোকদের জন্য, যারা পূর্ববর্তী লোকদের অনুসরণ করেছে, আর এ বাগান দু'টি হবে রৌপ্যের।

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহপাকের আরশ ছিল পানির উপর, এরপর আল্লাহপাক নিজের জন্য জান্নাত তৈরি করেছেন, এরপর তাতে দ্বিতীয় জান্নাত তৈরি করেছেন এবং এই জান্নাতকে একটি মুক্তা দ্বারা ঢেকে দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন–

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتٰنِ [এ দু'টি বাগান ব্যতীত আরো দু'টি বাগান রয়েছে]

ইমাম কেসায়ী (র.) مِنْ دُونِهِمَا শব্দের তরজমা করেছেন এভাবে "ঐ দু'টি বাগানের সম্মুখে দু'টি বাগান রয়েছে।

তাফসীরকার যাহহাক (র.) বলেছেন, দু'টি বাগান স্বর্ণের, আর দু'টি বাগান ইয়াকূত পাথরের। এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বোল্লিখিত বাগানগুলোর চেয়ে পরে উল্লিখিত বাগান দু'টির মর্তবা কম নয়; কেননা স্বর্ণ নির্মিত বাগানগুলোর চেয়ে ইয়াকূত পাথরের তৈরি বাগানের মর্তবা কম হতে পারে না।

مُدْهَآمَّتٰنِ (٦٤) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٥)

'গাঢ় সবুজ ঐ দু'টি বাগান। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

গাঢ় সবুজ হওয়ার কারণে বাগান দু'টির বর্ণ প্রায় কালো হয়ে গেছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন, পূর্বোল্লেখিত বাগানগুলোর মর্তবা পরে উল্লিখিত বাগানগুলো থেকে অধিকতর হবে।

فِيهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ (٦٦) [ঐ দু'টি বাগানে রয়েছে দু'টি উচ্ছাসিত ঝর্ণা]।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার যাহহাক (র.) বলেছেন, ঐ ঝর্ণার পানি কখনো বন্ধ হয় না, সর্বদা প্রবাহিত হতে থাকে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٧) ....

পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, জান্নাতে আরো দু'টি বাগান রয়েছে, তার বর্ণ হলো গাঢ় সবুজ, আর তাতে দু'টি উচ্ছাসিত ঝর্ণা রয়েছে, যা সর্বদা প্রবাহিত হতে থাকে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ (٦٨) [ঐ দু'বাগানে রয়েছে নানা প্রকার ফল এবং খেজুর ও আনার]।

জান্নাতের ফলের বিবরণ : তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন فَاكِهَةٌ শব্দটি এমন ফল সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, যা শুধু স্বাদ লাভের জন্য খাওয়া হয়, আর খেজুর খাদ্য হিসেবে এবং আনার ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করা হয়, এজন্য খেজুর এবং আনারের কথা আলাদাভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, যদি কেউ শপথ করে বলে, আমি فَاكِهَةٌ খাব না, এরপর খেজুর বা আনার খেয়ে নেয়, তবে তার শপথ বিনষ্ট হবে না, অবশ্য অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম খেজুর এবং আনারকেও এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।

فَاكِهَةٌ শব্দটি দ্বারা সাধারণত সকল ফলকেই বুঝানো হয়, তবে খেজুর এবং আনার হলো বিশেষ প্রকার ফল, যেমন হযরত জিবরাঈল (আ.) এবং হযরত মিকাঈল (আ.) নিঃসন্দেহে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিশেষ ফেরেশতা হিসেবে তাঁদের নাম আলাদাভাবে উল্লিখিত হয়।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) লিখেছেন, জান্নাতের খেজুর বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সবুজ বর্ণের জমরজদ পাথরের, আর বৃক্ষগুলোর পাতা লাল বর্ণের হবে। দুধের চেয়ে ধবধবে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্ট এবং মাখনের চেয়ে নরম হবে। খেজুরগুলোতে দানা থাকবে না।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জান্নাতের একটি খেজুর লম্বা হবে বার হাত, আর তাতে কোনো দানা থাকবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথাও বলেছেন যে, জান্নাতের একটি আনারের পার্শ্বে অনেক লোক একত্র হবে এবং তা খাবে। যদি খাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে তা সেখানে পাওয়া যাবে।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি জান্নাতে এত বড় আনার দেখেছি যেমন একটি উষ্ট্র তার উপর হাওদা স্থাপন করা হয়েছে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ 'অতএব, হে জিনও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (٧٠) ঐ বাগান দু'টিতে সুশীলা সুন্দরী রমণীগণ থাকবে, অর্থাৎ হুরগণ থাকবে। একদা হযরত উম্মে সালামা (রা.) হুজুর পাক ﷺ-এর দরবারে এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, হুরগণ উন্নত স্বভাবের অধিকারী এবং সুন্দরী হবে। –(তাবারানী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) ইমাম আওজায়ী (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, হুরগণ সুন্দরী হবে, তবে অহংকারী হবে না এবং কোনো কষ্ট দেবে না।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 'অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (٧٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٣) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (٧٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٥)

'তারা তাঁবুর মধ্যে অবস্থানকারী হুরগণ। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ইতঃপূর্বে কোনো জিন ও মানুষ তাদেরকে স্পর্শ করেনি। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

তাবারানী (র.) হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন হুরদের দেহ জাফরান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। বায়হাকী (র.)ও এ হাদীসের উল্লেখ করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ মর্মের হাদীস সংকলিত হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) বর্ণনা করেন যে, জায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেছেন, আল্লাহপাক হুরদেরকে মাটি দ্বারা নয়; বরং কস্তুরী, কাফুর এবং জাফরান দ্বারা তৈরি করেছেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের ভিতর এতখানি জায়গা, যাতে তোমাদের তীর কামানের অর্ধেক রাখা যায়, তা এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু থেকে উত্তম। জান্নাতের কোনো হুর যদি একবার এ পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে আসমান জমিনের মধ্যস্থল আলোকিত হয়ে যাবে এবং সমগ্র পৃথিবী সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তার মাথার ওড়না পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু থেকে উত্তম। –[বুখারী শরীফ]

ইবনে আবিদ্দুনিয়া কা'বে আহবারের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যদি কোনো হুর তার একটি হাত আসমান থেকে নিচের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখে, তবে সারা পৃথিবী এমনিভাবে আলোকিত হবে, যেমন সূর্য বিশ্ববাসীর জন্য আলোর উৎস হয়ে থাকে।

مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ আল্লামা বগভী (র.) مَقْصُورَةٌ শব্দটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন এর অর্থ হলো হুরগণ তাদের স্বামীদের প্রতিই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে, তাদের স্বামী ব্যতীত অন্যদের দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না।

ইমাম বায়হাকী ও মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি مَقْصُورَةٌ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন যে, হুরগণ তাদের তাঁবুতে সংরক্ষিত থাকবে, সেখানে ইমাম বায়হাকী হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি শবে মেরাজে জান্নাতের একটি স্থানে পৌঁছি, তাকে 'বিদাহ' বলা হয়, সেখানে মুক্তা, সবুজ বর্ণের জবরযদ পাথর এবং লাল বর্ণের ইয়াকূত পাথর দ্বারা তাঁবু নির্মিত হয়ে আছে, ঐ তাঁবুগুলোর ভেতর থেকে হুরগণ বলল আসসালামু আলাইকা ﷺ! আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এটি কার কথা, যাতে আমাকে সম্বোধন করা হয়েছে? হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এই তাঁবুগুলোর মধ্যে হুরগণ রয়েছে, তারা আল্লাহপাকের দরবারে আপনাকে সালাম দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছে, আল্লাহপাক তাদেরকে এর অনুমতি প্রদান করেছেন। হুরগণ তখন বলল সর্বদা সন্তুষ্ট থাকব, কখনো অসন্তুষ্ট হবো না, আমরা এখানে সর্বদা থাকব, কখনো এখান থেকে যাব না। এরপর হুজুর পাক ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েসের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে মুক্তা দ্বারা তৈরি একটি তাঁবু রয়েছে, যার প্রশস্ততা ষাট মাইল, যার এক প্রান্তের লোকেরা অন্য প্রান্তের লোকদের দেখবেন। ঐ বৃহদায়তন তাঁবুটি মুমিনগণের ব্যবহারে থাকবে। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বর্ণিত এ মর্মের হাদীস বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, মুক্তা নির্মিত এ তাঁবুটি প্রস্থে এক ফার্লং এবং দৈর্ঘ্যে এক ফার্লং হবে। তাতে চার হাজার স্বর্ণ নির্মিত দ্বার থাকবে। মুজাহিদ এবং ইবনে আওয়াস (র.)-এর সূত্রেও এমন বিবরণ রয়েছে।

ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনে আবিদ্দুনিয়া (র.) হযরত ইবনে মেসওয়ারের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি পছন্দনীয় স্থান নির্দিষ্ট থাকবে। আর প্রত্যেক পছন্দনীয় স্থানে একটি তাঁবু থাকবে, প্রত্যেক তাঁবুর চারটি দ্বার থাকবে, প্রত্যেক দ্বার দিয়ে এমন একটি হাদিয়া প্রতিদিন প্রবেশ করবে, যা ইতঃপূর্বে কখনো আসেনি (অর্থাৎ প্রতিদিন নতুন হুরগণ আসবে) তারা অহংকারিণী হবেন না।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেন, হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি হুজুর ﷺ -এর খেদমতে আরজ করেছিলাম, দুনিয়ার স্ত্রীলোকগণ উত্তম, নাকি হুরগণ? হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, দুনিয়ার স্ত্রী লোকগণ হুরগণ থেকে এমনই উত্তম যেমন কোনো পোষাকের উপরিভাগ উত্তম তার আস্তর থেকে। আমি আরজ করলাম, এর কারণ কি? তিনি ইরশাদ করলেন, তাদের নামাজ রোজার কারণে, আল্লাহপাক তাদের চেহারাকে নূরানী করে দেবেন, তাদের পোষাক হবে সবুজ এবং তাদের অলংকার হবে হলুদ, তারা বলবে, আমরা এখানে সর্বদা থাকব,কখনো আর আমাদের মৃত্যু আসবে না। আমরা আরামপ্রাপ্ত, আমরা কখনো দুঃখী হব না, আমরা এখানের স্থায়ী অধিবাসী, কখনো এখান থেকে যাব না, আমরা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকব, কখনো অসন্তুষ্ট হব না, আনন্দ সে সব লোকদের জন্য, যাদের জন্য আমরা রয়েছি, আর যারা আমাদের জন্য রয়েছে।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) আরেকটি প্রশ্ন করেছেন। তিনি আরজ করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! যদি কোনো স্ত্রীলোকের দু'তিন বা চার স্বামী হয়ে থাকে, এরপর তার মৃত্যু হয়ে যায় এবং সে জান্নাতবাসী হয়, আর তার সমস্ত স্বামীরাও জান্নাতী হয়, এমন অবস্থায় সে কোনো স্বামীর স্ত্রী হিসেবে থাকবে।

এ প্রশ্নের জবাবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তাকে এ অধিকার দেওয়া হবে, যাকে ইচ্ছা তাকে চিরস্থায়ী স্বামী রূপে বরণ করে নিতে। তখন সে স্বামীকেই সে বরণ করে নেবে দুনিয়াতে যার ব্যবহার ছিল মধুর।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, মধুর ব্যবহার, চরিত্র মাধুর্য, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের যাবতীয় কল্যাণের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (٧٦) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (৭৭)

'তারা সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচায় হেলান দিয়ে উপবিষ্ট হবে। অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

জান্নাতবাসীগণ সবুজ তাকিয়ায় এবং অতি সুন্দর গালিচায় হেলান দিয়ে বসবে।

আরবি ভাষার সুবিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ 'আলকামূসে' رَفْرَفٌ শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে, সবুজ কাপড়, যার দ্বারা বসার আসন কুশন তৈরি করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– رَفْرَفٌ হলো এমন কাপড়, যা দ্বারা মজলিসে উপবিষ্ট হওয়ার কুশন তৈরি করা হয়।

হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, রফরফ হলো সেই কাপড়, যা মজলিসে বিছানার উপর ব্যবহৃত হয়।

عَبْقَرِيٌّ অভিধান গ্রন্থ 'আলকামূসে' লিপিবদ্ধ রয়েছে, 'আবকার' এমন একটি স্থান ছিল, যেখানে অধিক সংখ্যক জিনেরা থাকত, আর সেখানের কাপড়ও অত্যন্ত সুন্দর হতো। প্রত্যেক পরিপূর্ণ বস্তুকে عَبْقَرِيٌّ বলা হয়।

প্রত্যেক সমাজে নেতা এবং যার থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কেউ না থাকে, তাকে عَبْقَرِيٌّ বলা হয়। আর এদিক থেকে প্রত্যেক বুজুর্গ, উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে عَبْقَرِيٌّ বলা হয়।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ 'অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ (৭৮)

'কত বরকতময় আপনার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহান এবং মহিমাময়'।

ইতঃপূর্বে এ সূরার শানে নুযূলে বর্ণিত হয়েছে, কাফেররা বলেছিল, 'রহমান কে? আমরা তা জানি না, তাদের এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির জবাবেই সূরা আর রহমান নাজিল হয়েছে এবং সূরার প্রারম্ভেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, পরম করুণাময় আল্লাহপাকই মানুষকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই মানুষকে বাকশক্তি দান করেছেন, অতএব, তাকে না জানা চরম মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর সূরার সর্বশেষ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে– تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ

অর্থাৎ পরম করুণাময় আল্লাহপাকের পবিত্র নাম কত বরকতময়, যাঁর অপার রহমত, অগণিত নিয়ামত মানুষ অহরহ ভোগ করে, যিনি মহান, যিনি মহিমাময়, যাঁর মহিমা বর্ণনাতীত।

আলোচ্য সূরায় বিভিন্ন নিয়ামতের উল্লেখ করে বারংবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? কোনো জিনিসের খবর দেওয়া এবং সে সম্পর্কে মানুষকে শুধু অবগত করানো একটি কাজ, এ উদ্দেশ্যে উক্ত বিষয়টি একবার উল্লেখ করাই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে, কোনো বিষয়ে মানব মনকে প্রস্তুত করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে এ বিষয়টি বার বার উল্লেখ করা একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়ে। কুরআনে কারীমের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি আদেশ শুধু শুনিয়ে দেওয়া যথেষ্ট নয়; বরং মানুষ মাত্রকেই তা পালন করার জন্য প্রস্তুত করা একান্ত জরুরি, তাই সূরা রহমানে কোনো একটি নিয়ামতের উল্লেখ করে মানুষ ও জিনজাতিকে এ প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহপাকের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? যাতে করে প্রত্যেকটি মানুষ এ নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করে এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে মানুষ আল্লাহপাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত অহরহ ভোগ করছে, এ সত্য যেন মর্মে মর্মে সে উপলব্ধি করে। আর বর্ণনাশৈলীর এ বৈশিষ্ট্য আরবি ভাষায় নতুন কিছু নয়; বরং বক্তব্যকে মানব-মনে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত কার্যকর একটি পন্থা।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا تَطْغَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلطُّغْيَانُ মূলবর্ণ (ط - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা কম বেশি করো না, তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না।

تُكَذِّبَانِ : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّكْذِيْبُ মূলবর্ণ (ك - ذ - ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অস্বীকার করবে, তোমরা মিথ্যা বলবে।

لَا يَبْغِيَانِ : সীগাহ تثنيه مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অনতিক্রমণীয়, তারা সীমারেখা থেকে অগ্রসর হয় না।

مُنْشَأٰتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْشَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ش - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– দাঁড়িয়ে আছে, উঁচু জাহাজসমূহ।

فَانٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفَنَاءُ মূলবর্ণ (ف – ن – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ধ্বংস করে, ধ্বংসশীল।

نَفْرُغُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف মাসদার فَرَاغٌ বাব نَصَرَ আমরা ইচ্ছা করব। আমরা মনোযোগী হবে (হিসাবের প্রতি)।

ثَقَلَانِ : ثَقَلٌ-এর দ্বিবচন। দুটি ভারী বস্তু। দুটি কঠিন সৃষ্টি তথা মানব-দানব, মানুষ ও জিন।

تَنْفُذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف মানসূব। তোমরা বের হও। তোমরা বাইরে চলে যাও। মাসদার نُفُوْذٌ বাব نَصَرَ

اَقْطَارٌ : ইসম। কিনারা, প্রান্ত। قُطْرٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ- পার্শ্ব এবং প্রান্ত।

وَرْدَةً : اسم جنس অর্থ– গোলাপ ফুল, লাল, রক্তবর্ণ।

الدِّهَانِ : دُهْنٌ-এর বহুবচন। তেলের খাদ। মালিশের তৈল।

اَفْنَانٌ : হয়ত فَنٌّ-এর বহুবচন। যার অর্থ- পত্র-পল্লবিত। অথবা فَنَنٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ- পাতলা, নরম ও চিকন ডাল। আল্লামা ইবনে জাওযী এমনই বর্ণনা করেছেন।

بَطَائِنُهَا : এর আস্তর। بَطَائِنُ শব্দটি بَطَانَةٌ-এর বহুবচন অর্থ– আস্তর।

جَنَا : ফল। যে দামী বস্তু ফল-মূল, স্বর্ণ বা মধু ইত্যাদি থেকে লাভ হয়। এখানে উদ্দেশ্য ফল। বহুবচন اَجْنٌ ও اَجْنَاءٌ

دَانٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل অর্থ– ধাবমান। নিকটবর্তী। دُنُوٌّ থেকে, নিকটবর্তী হওয়া, কাছে হওয়া।

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ : সীগাহ هُنَّ - مضارع معروف منفى بلم واحد مذكر غائب বহছ যমীরে মাফউল। তাদের সাথে সঙ্গম করা হয়নি। মাসদার طَمْثٌ বাব ضَرَبَ অর্থ– সঙ্গম করা। বাবে سَمِعَ - نَصَرَ থেকে মাসদার طَمْثٌ মুতা'আদ্দী আসে এবং ضَرَبَ, طَمْثٌ থেকে মুতা'আদ্দী আসে। অর্থ– কুমারিত্ব নষ্ট করা, ঘর্ষণ করা, স্পর্শ করা। অর্থাৎ তাদের সাথে মানুষ এবং জিন সঙ্গম করে নি।

جَانٌّ : সাপ। جِنٌّ -এর বহুবচন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, যেভাবে আবুল বাশার (মানুষের পিতা)-এর নাম আদম, অনুরূপভাবে আবুল জিন (জিনদের পিতা)-এর নাম جَانٌّ

خَيْرَاتٌ : সীগাহ (بتشديد الياء) থেকে তাখফীফ করা হয়েছে। অর্থ- ঐ রমণীগণ যারা কল্যাণের সাথে খাস। কেউ কেউ বলেছেন, خَيْرَاتٌ হল خَيْرَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ- সুন্দরী রমণীগণ। خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ভালো সুন্দরী রমণীগণ।

مَقْصُوْرَاتٌ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مفعول পর্দানশীল নারীগণ। যাঁটি পর্দার ভিতর লুকায়িত (বগভী মা'লিম) অথবা ঐ সমস্ত নারী যারা তাদের দৃষ্টি নিজেদের স্বামীদের প্রতি নিবদ্ধ রেখেছে; আল্লামা মুজাহিদ (রহ)-এর এ উক্তি মতে مَقْصُوْرَاتٌ অর্থ قَاصِرَاتٌ হবে তথা اسم مفعول -এর শব্দ اسم فاعل -এর অর্থে।

خِيَامٌ : তাঁবু। শিবির, শামিয়ানা এটি خَيْمَةٌ -এর বহুবচন।

حِسَانٌ : চমৎকার সুশ্রী, দাসী, উৎকৃষ্ট। বহুবচন, এর একবচন حَسَنٌ - حُسْنٌ - حُسَيْنٌ এবং حَسْنَاءُ আসে।

تَبٰرَكَ : সীগাহ ماضى معروف واحد مذكر غائب বহছ তিনি অত্যন্ত বরকতময়। পুণ্যময়। মাসদার تَبَارُكٌ বরকতময় হওয়া। এ ফেলের রূপান্তর হয় না। শুধু ماضى -এর এই একটি সীগাহ ব্যবহার হয় এবং শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য। তাই অনেকেই একে اسم فعل বলেছেন।

اَلْاَكْمَامُ : كُمٌّ -এর বহুবচন, অর্থ– ফলের খোসা।

اٰلَاءِ : اَلْيٌ -এর বহুবচন, অর্থ– নিয়ামত।

يَلْتَقِيَانِ : সীগাহ تثنيه مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِلْتِقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পরস্পরে মিলিত হয়ে আছে।

اَللُّؤْلُؤُ : لَالِيْ -এর একবচন, অর্থ– মুক্তা, মোতি।

اَلْمَرْجَانُ : اسم جمع অর্থ– প্রবাল রত্ন, اَلْمَرْجَانَةُ মুফরাদ।

اٰنٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَنْيٌ মূলবর্ণ (ا - ن - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– ফুটন্ত পানি।

مُدْهَامَّتَانِ : সীগাহ تثنيه مؤنث বহছ اسم فاعل ও اسم مفعول বাব اِفْعِيْلَالٌ মাসদার اِدْهِيْمَامٌ মূলবর্ণ (د - ه - م) জিনস صحيح অর্থ– গাঢ় সবুজ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ : এখানে خَلَقَ শব্দটি فعل ماضى এবং তার فاعل উহ্য রয়েছে; اَلْاِنْسَانَ শব্দটি مفعول به এবং عَلَّمَهُ الْبَيَانَ বাক্যটি فعل ماضى আর তার فاعل টি উহ্য। اَلْاِنْسَانَ শব্দে الف ولام টি جنس -এর জন্য।

– [ই'রাবুল কুরআন খ. ৭, পৃ. ৩৬৮]

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ওয়াকি‘আ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৯৬, রুকূ‘– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে।	إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾
২. যা সংঘটিত হওয়াতে কোনো অস্বীকারকারী নেই।	لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾
৩. তা [কতককে] অবনত করবে, আর [কতককে] সমুন্নত করবে।	خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾
৪. যখন জমিন ভীষণ কম্পনে কম্পিত হবে।	إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾
৫. আর পর্বতসমূহ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।	وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾
৬. অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা হয়ে যাবে।	فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًّا ﴿٦﴾
৭. আর তোমরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যাবে।	وَّكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿٧﴾
৮. অতঃপর যারা ডান দিকওয়ালা হবে, সে ডান দিকওয়ালাগণ কতইনা ভালো।	فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. إِذَا وَقَعَتِ যখন সংঘটিত হবে الْوَاقِعَةُ কিয়ামত।

২. لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا যা সংঘটিত হওয়াতে নেই كَاذِبَةٌ কোনো অস্বীকারকারী।

৩. خَافِضَةٌ তা (কতককে) অবনত করবে رَّافِعَةٌ আর (কতককে) সমুন্নত করবে।

৪. إِذَا رُجَّتِ যখন কম্পিত হবে الْأَرْضُ জমিন رَجًّا ভীষণ কম্পনে।

৫. وَّبُسَّتِ আর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে الْجِبَالُ পর্বতসমূহ بَسًّا সম্পূর্ণরূপে।

৬. فَكَانَتْ অতঃপর তা হয়ে যাবে هَبَآءً مُّنْبَثًّا বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা।

৭. وَّكُنْتُمْ আর তোমরা হয়ে যাবে أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।

৮. فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ অতঃপর যারা ডান দিক ওয়ালা হবে مَآ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ সেই ডান দিক ওয়ালাগণ কতইনা ভালো!

অনুবাদ	আয়াত
৯. আর যারা বাম দিকওয়ালা হবে, সে বাম দিকওয়ালাগণ কতইনা মন্দ।	وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ۬ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿٩﴾
১০. আর যারা অগ্রবর্তী, তারা অগ্রবর্তী হবে।	وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾
১১. এরাই বিশেষ নৈকট্যের অধিকারী।	اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾
১২. এরাই নিয়ামতপূর্ণ উদ্যানসমূহে থাকবে।	فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾
১৩. তাদের এক বৃহৎ দল তো পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে।	ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾
১৪. আর অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য হতে হবে।	وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾
১৫. তারা থাকবে স্বর্ণের তার দ্বারা বুনানো আসনসমূহের উপর।	عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾
১৬. হেলান দিয়ে সামনাসামনি উপবিষ্ট থাকবে।	مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. তাদের আশেপাশে এমন বালকগণ যারা সর্বদা বালকই থাকবে– ঘুরে বেড়াবে।	يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. আবখোরা ও পানপাত্র এবং বহমান শরাবে পরিপূর্ণ পেয়ালাসমূহ নিয়ে।	بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ۬ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ আর যারা বাম দিকওয়ালা হবে مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ সেই বাম দিক ওয়ালাগণ কতইনা মন্দ।

১০. وَالسّٰبِقُوْنَ আর যারা অগ্রবর্তী السّٰبِقُوْنَ তারা অগ্রবর্তী হবে।

১১. اُولٰٓئِكَ এরাই الْمُقَرَّبُوْنَ বিশেষ নৈকট্যের অধিকারী।

১২. فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ এরাই শান্তির উদ্যানসমূহে থাকবে।

১৩. ثُلَّةٌ তাদের এক বৃহৎ দল তো مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে।

১৪. وَقَلِيْلٌ আর অল্প সংখ্যক مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ পরবর্তীদের মধ্য হতে হবে।

১৫. عَلٰى سُرُرٍ তারা থাকবে আসনসমূহের উপর مَّوْضُوْنَةٍ স্বর্ণের তার দ্বারা বুনানো।

১৬. مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে مُتَقٰبِلِيْنَ সামনাসামনি।

১৭. يَطُوْفُ ঘুরে বেড়াবে عَلَيْهِمْ তাদের আশেপাশে وِلْدَانٌ এমন বালকগণ مُّخَلَّدُوْنَ যারা সর্বদা বালকই থাকবে।

১৮. بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ আবখোরা ও পান পাত্র وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ এবং বহমান শরাবে পরিপূর্ণ পেয়ালাসমূহ নিয়ে।

১৯. না তাতে তাদের মাথা ব্যথা হবে আর না এতে তাদের জ্ঞানে ত্রুটি আসবে।	لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. আর ফলসমূহ যা তারা পছন্দ করবে।	وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾
২১. আর পাখীর গোশত যা তাদের রুচিসম্মত হবে।	وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. আর তাদের জন্য গৌরবর্ণের ডাগর ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা নারীগণ থাকবে।	وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾
২৩. যেন তারা লুক্কায়িত মুক্তা।	كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾
২৪. তারা এ সমস্ত নিজেদের কৃতকর্মের বিনিময়ে প্রাপ্ত হবে।	جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. সেখানে তারা না কোনো প্রলাপ শুনবে, আর না কোনো অনর্থক কথা।	لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾
২৬. কেবল সালামই সালাম -এর আওয়াজ আসতে থাকবে।	اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾
২৭. আর যারা ডান পার্শ্বওয়ালা, সে ডান পার্শ্বওয়ালাগণ কতইনা ভাগ্যবান।	وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾
২৮. তারা সে উদ্যানসমূহে অবস্থান করবে যেখানে কাটাবিহীন কুলবৃক্ষ থাকবে।	فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا না তাতে তাদের মাথা ব্যথা হবে وَلَا يُنْزِفُوْنَ আর না এতে তাদের জ্ঞানে ত্রুটি আসবে।

২০. وَفَاكِهَةٍ আর ফলমূলসমূহ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ যা তারা পছন্দ করবে।

২১. وَلَحْمِ طَيْرٍ আর পাখির গোশত مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ যা তাদের রুচিসম্মত হবে।

২২. وَحُوْرٌ আর তাদের জন্য থাকবে গৌরবর্ণের عِيْنٌ ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট নারীগণ।

২৩. كَاَمْثَالِ যেন তারা اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ লুক্কায়িত মুক্তা।

২৪. جَزَآءً এই সমস্ত তারা প্রাপ্ত হবে بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ নিজেদের কৃতকর্মের বিনিময়।

২৫. لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا সেখানে তারা না শুনবে। لَغْوًا কোনো প্রলাপ وَلَا تَاْثِيْمًا আর না কোনো অনর্থক কথা।

২৬. اِلَّا قِيْلًا কেবল আসতে থাকবে سَلٰمًا سَلٰمًا সালামই সালাম -এর আওয়াজ।

২৭. وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ আর যারা ডান পার্শ্বওয়ালা مَاۤ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ সেই ডান পার্শ্বওয়ালাগণ কতইনা ভাগ্যবান।

২৮. فِيْ سِدْرٍ তারা সেই উদ্যানসমূহে অবস্থান করবে যেখানে থাকবে কুলবৃক্ষ مَّخْضُوْدٍ কাটাবিহীন।

২৯. এবং সারি সারি কলা [গাছ] থাকবে।	وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾
৩০. এবং সুবিস্তৃত ছায়া থাকবে।	وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾
৩১. আর প্রবহমান পানি থাকবে।	وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾
৩২. এবং প্রচুর পরিমাণে ফলমূল থাকবে।	وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾
৩৩. যা না নিঃশেষিত হবে, আর না তাতে কোনো বাধাবিঘ্ন থাকবে।	لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. আর উঁচু উঁচু বিছানা থাকবে।	وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾
৩৫. আমি ঐ নারীদেরকে বিশেষ ধরনে সৃষ্টি করেছি।	اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾
৩৬. অর্থাৎ আমি তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছি যে, তারা কুমারী।	فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾
৩৭. সোহাগিনী সমবয়স্কা হবে।	عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾
৩৮. এ সবগুলোই ডানদিকওয়ালাদের জন্য।	لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. وَّطَلْحٍ এবং কলা (গাছ) থাকবে مَّنْضُوْدٍ সারি সারি।

৩০. وَّظِلٍّ এবং ছায়া থাকবে مَّمْدُوْدٍ সুবিস্তৃত।

৩১. وَّمَآءٍ আর পানি থাকবে مَّسْكُوْبٍ প্রবহমান।

৩২. وَّفَاكِهَةٍ এবং ফল থাকবে كَثِيْرَةٍ প্রচুর পরিমাণে।

৩৩. لَّا مَقْطُوْعَةٍ যা না নিঃশেষিত হবে وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ আর না তাতে কোনো বাধাবিঘ্ন থাকবে।

৩৪. وَّفُرُشٍ আর বিছানা থাকবে مَّرْفُوْعَةٍ উঁচু উঁচু।

৩৫. اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ আমি ঐ নারীদেরকে সৃষ্টি করেছি اِنْشَآءً বিশেষ ধরনে।

৩৬. فَجَعَلْنٰهُنَّ আমি তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছি যে, اَبْكَارًا তারা কুমারী।

৩৭. عُرُبًا সোহাগিনী اَتْرَابًا সমবয়স্কা হবে।

৩৮. لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ এ সমস্তই ডানদিক ওয়ালাদের জন্য।

৩৯. তাদের একটি বৃহৎদল পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে।	ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. আর একটি বৃহৎ দল পরবর্তীদের মধ্য হতে হবে।	وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. আর যারা বাম দিকওয়ালা, সে বাম দিকওয়ালারা কতইনা হতভাগা।	وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ۬ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾
৪২. তারা অগ্নির মধ্যে এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে থাকবে।	فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾
৪৩. আর কালো ধোঁয়ার ছায়াতে থাকবে।	وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. যা ঠাণ্ডাও নয় এবং আরামদায়কও নয়।	لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. তারা এর পূর্বে অর্থাৎ দুনিয়াতে বড়ই সুখ সম্পদে মগ্ন থাকত।	اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. এবং তারা গুরুতর পাপকার্যে নিরত ছিল।	وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾
৪৭. এবং তারা এরূপ বলত যে, যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড় হয়ে যাব, তখন কি আমরা পুনরায় জীবিত হব?	وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ۬ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. ثُلَّةٌ তাদের বৃহৎ দল হবে مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে।

৪০. وَثُلَّةٌ, এবং একটি বৃহৎ দল হবে مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ পরবর্তীদের মধ্য হতে।

৪১. وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ আর যারা বাম দিকওয়ালা مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ সেই বামদিকওয়ালা কতইনা হতভাগা।

৪২. فِيْ سَمُوْمٍ তারা অগ্নির মধ্যে وَّحَمِيْمٍ এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে থাকবে।

৪৩. وَّظِلٍّ আর ছায়াতে থাকবে مِّنْ يَّحْمُوْمٍ কালো ধোঁয়ার।

৪৪. لَّا بَارِدٍ যা ঠাণ্ডাও নয় وَّلَا كَرِيْمٍ এবং আরামদায়কও নয়।

৪৫. اِنَّهُمْ كَانُوْا তারা থাকত قَبْلَ ذٰلِكَ এর পূর্বে مُتْرَفِيْنَ বড়ই সুখ-সম্পদে।

৪৬. وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ এবং তারা নিরত ছিল عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ গুরুতর পাপকার্যে।

৪৭. وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ এবং তারা এরূপ বলত যে, اَئِذَا مِتْنَا যখন আমরা মরে যাব وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا এবং মাটি ও হাড় হয়ে যাব ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ তখন কি আমরা পুনরায় জীবিত হব?

৪৮. আর আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণও কি [পুনরায় জীবিত হবে]?	اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আপনি বলে দিন, অবশ্যই পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণ।	قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. সকলকে সমবেত করা হবে, এক স্থিরীকৃত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।	لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾
৫১. অনন্তর [সমবেত হওয়ার পর] নিশ্চয় তোমাদেরকে হে বিভ্রান্ত অস্বীকারকারীরা।	ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. যাক্কুম বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করতে হবে।	لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾
৫৩. অনন্তর তোমাদেরকে তা দ্বারা উদরসমূহ পূর্ণ করতে হবে।	فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. অতঃপর তার উপরে ফুটন্ত পানি পান করতে হবে।	فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾
৫৫. আবার পান করাও হবে পিপাসার্ত উটের ন্যায়।	فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾
৫৬. কিয়ামত দিবসে তাদের এই আতিথ্য হবে।	هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾
৫৭. আমিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, [যা তোমরাও স্বীকার কর] তবে তোমরা কেন [তার] সত্যতা স্বীকার করছ না?	نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. اَوَ কি اٰبَآؤُنَا আমাদের পিতৃপুরুষগণও الْاَوَّلُوْنَ পূর্ববর্তী।

৪৯. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ وَالْاٰخِرِيْنَ এবং পরবর্তীগণ।

৫০. لَمَجْمُوْعُوْنَ সকলকে সমবেত করা হবে اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ এক স্থিরীকৃত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।

৫১. ثُمَّ অনন্তর اِنَّكُمْ নিশ্চয় তোমাদেরকে اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ হে বিভ্রান্তগণ الْمُكَذِّبُوْنَ অসত্যারোপকারীগণ।

৫২. لَاٰكِلُوْنَ ভক্ষণ করতে হবে مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ যাক্কুম বৃক্ষ হতে।

৫৩. فَمَالِـُٔوْنَ অনন্তর তোমাদেরকে পূর্ণ করতে হবে مِنْهَا তা দ্বারা الْبُطُوْنَ উদরসমূহ।

৫৪. فَشٰرِبُوْنَ অতঃপর পান করতে হবে عَلَيْهِ তার উপরে مِنَ الْحَمِيْمِ ফুটন্ত পানি।

৫৫. فَشٰرِبُوْنَ আর পান করাও شُرْبَ الْهِيْمِ পিপাসার্ত উটের ন্যায়।

৫৬. هٰذَا এটাই نُزُلُهُمْ তাদের আতিথ্য হবে يَوْمَ الدِّيْنِ কিয়ামত দিবসে।

৫৭. نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ আমিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ তবে তোমরা কেন (তার) সত্যতা স্বীকার করছ না

অনুবাদ	আয়াত
৫৮. আচ্ছা, তবে বল তো, তোমরা [নারীর গর্ভে] যে শুক্রবিন্দু পৌঁছিয়ে থাক।	أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾
৫৯. তাকে তোমরাই মানুষ বানাও, নাকি আমিই সৃজনকারী?	ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٥٩﴾
৬০. [তা স্পষ্ট যে, আমিই সৃজন করি, এবং] আমিই তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছি, আর আমি তাতে অসমর্থ নই যে,	نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾
৬১. তোমাদের স্থলে তোমাদের অনুরূপ অন্য [মানুষ] সৃষ্টি করি এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতিতে গঠন করি যা তোমরা অবগতও নও।	عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾
৬২. আর তোমাদের প্রথম সৃষ্টি [সম্বন্ধে] জানা আছে [যে তা আমারই কুদরতে হয়েছে] তবে কেন তোমরা অনুধাবন করছ না?	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾
৬৩. আচ্ছা, তোমরা কি চিন্তা করেছ, তোমরা যা বপন করে থাক।	أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾
৬৪. তা কি তোমরাই অঙ্কুরিত কর, নাকি আমি অঙ্কুরণকারী?	ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾
৬৫. যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাকে [তার উৎপন্ন ফসলকে] চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব, তখন তোমরা বিস্মিত হয়ে যাবে।	لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾
৬৬. যে, [এবার তো] আমাদের খেসারতই হয়ে গেল।	إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. أَفَرَءَيْتُمْ আচ্ছা তবে বলতো مَّا تُمْنُونَ তোমরা (নারীর গর্ভে) যেই শুক্রবিন্দু পৌঁছিয়ে থাক।

৫৯. ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ তাকে তোমরাই মানুষ বানাও أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ নাকি আমিই সৃজনকারী।

৬০. نَحْنُ قَدَّرْنَا আমিই নির্ধারণ করে রেখেছি بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ তোমাদের মধ্যে মৃত্যু وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ, আর আমি তাতে অসমর্থ নই যে।

৬১. عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ তোমাদের স্থলে তোমাদের অনুরূপ অন্য (মানুষ) সৃষ্টি করি وَنُنشِئَكُمْ এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতিতে গঠন করি فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ যা তোমরা অবগত নও।

৬২. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ, আর তোমাদের জানা আছে ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ প্রথম সৃষ্টি (সম্বন্ধে) فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ তবে কেন তোমরা অনুধাবন করছ না

৬৩. أَفَرَءَيْتُمْ আচ্ছা তোমরা কি চিন্তা করেছ مَّا تَحْرُثُونَ তোমরা যা বপন করে থাক।

৬৪. ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ তা কি তোমরাই অঙ্কুরিত কর أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ নাকি আমি অঙ্কুরণকারী।

৬৫. لَوْ نَشَآءُ যদি আমি ইচ্ছা করি لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا তবে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ তখন তোমরা বিস্মিত হয়ে যাবে

৬৬. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ যে, আমাদের খেসারতই হয়ে গেল।

৬৭. বরং আমরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রয়ে গেলাম।	بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. আচ্ছা তোমরা কি চিন্তা করেছ, যে পানি তোমরা পান করে থাক।	اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. তা কি তোমরা মেঘ হতে বর্ষণ কর, নাকি আমি বর্ষণকারী [আবার তা দ্বারা উপকৃত হওয়া, তাও আমারই হাতে]?	ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তাকে লবণাক্তও করে ফেলতে পারি, তবে কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না?	لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. আচ্ছা তোমরা কি চিন্তা করেছ, যে অগ্নি তোমরা প্রজ্বলিত করে থাক।	اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾
৭২. তবে কি তোমরাই তার বৃক্ষকে সৃষ্টি করেছ, নাকি আমি সৃজনকারী?	ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. আমি তাকে [দোজখের আগুনের] নিদর্শন এবং পথিকদের জন্য হিতকর বস্তু করেছি।	نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. অতএব, আপনার সে মহা মহিমান্বিত প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾
৭৫. অনন্তর আমি শপথ করছি নক্ষত্রসমূহের অস্ত গমনের।	فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾
৭৬. আর যদি তোমরা জানতে, তবে এটা একটি বড় শপথ।	وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৭. بَلْ نَحْنُ বরং আমরা مَحْرُوْمُوْنَ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রয়ে গেলাম।

৬৮. اَفَرَءَيْتُمْ আচ্ছা তোমরা কি চিন্তা করেছ الْمَآءَ যে পানি الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ তোমরা পান করে থাক।

৬৯. ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ তা কি তোমরা বর্ষণ কর مِنَ الْمُزْنِ মেঘ হতে اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ নাকি আমি বর্ষণকারী।

৭০. لَوْ نَشَآءُ যদি আমি ইচ্ছা করি جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا তবে তাকে লবণাক্তও করে ফেলতে পারি فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ তবে কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

৭১. اَفَرَءَيْتُمْ আচ্ছা তোমরা কি চিন্তা করেছ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ যে অগ্নি তোমরা প্রজ্বলিত করে থাক–

৭২. ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ তবে কি তোমরা সৃষ্টি করেছ شَجَرَتَهَآ তার বৃক্ষকে اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ নাকি আমি সৃজনকারী।

৭৩. نَحْنُ جَعَلْنٰهَا আমি তাকে করেছি تَذْكِرَةً নিদর্শন وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ এবং পথিকদের জন্য হিতকর বস্তু।

৭৪. فَسَبِّحْ অতএব পবিত্রতা বর্ণনা করুন بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ আপনার সেই মহা মহিমান্বিত প্রতিপালকের নামের।

৭৫. فَلَآ اُقْسِمُ অনন্তর আমি শপথ করছি بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ নক্ষত্রসমূহের অস্তগমনের।

৭৬. وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ আর এটা একটি শপথ لَوْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা জানতে তবে عَظِيْمٌ বড়।

৭৭. এটা এক মহা সম্মানিত কুরআন।	اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾
৭৮. যা এক সুরক্ষিত কিতাবে লিখিত রয়েছে।	فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾
৭৯. তাকে নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারে না।	لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. তা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত।	تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. তবে কি তোমরা এ বাণীকে সাধারণ কথা মনে করছ?	اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾
৮২. আর এ অবিশ্বাস করাকে নিজেদের উপজীবিকা করে নিয়েছ?	وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. সুতরাং [যদি এটা সত্য হয়, তবে] যখন [কারো] প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌছে।	فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾
৮৪. আর তোমরা তখন [বসে পরিতাপের দৃষ্টিতে] তাকাতে থাক।	وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটবর্তী থাকি, কিন্তু তোমরা দেখতে পার না।	وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. সুতরাং যদি তোমাদের হিসাব-নিকাশ না হবারই হয়।	فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৭. اِنَّهٗ এটা لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ এক মহা সম্মানিত কুরআন

৭৮. فِيْ كِتٰبٍ যা এক সুরক্ষিত কিতাবে مَّكْنُوْنٍ লিখিত রয়েছে।

৭৯. لَّا يَمَسُّهٗٓ তাকে কেউ স্পর্শ করতে পারে না اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ ব্যতীত।

৮০. تَنْزِيْلٌ এটা প্রেরিত مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।

৮১. اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ তবে কি এই বাণীকে اَنْتُمْ তোমরা مُّدْهِنُوْنَ সাধারণ কথা মনে করছ।

৮২. وَتَجْعَلُوْنَ আর করে নিয়েছ رِزْقَكُمْ নিজেদের উপজীবিকা اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ এই অবিশ্বাস করাকে।

৮৩. فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ সুতরাং যখন (কারো) প্রাণ এসে পৌছে الْحُلْقُوْمَ কণ্ঠ পর্যন্ত।

৮৪. وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ আর তোমরা তখন تَنْظُرُوْنَ তাকাতে থাক।

৮৫. وَنَحْنُ আর আমি اَقْرَبُ اِلَيْهِ তার অধিক নিকটবর্তী مِنْكُمْ তোমাদের অপেক্ষা وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না।

৮৬. فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ সুতরাং যদি তোমাদের হিসাব নিকাশ না হবার হয়।

৮৭. তবে কেন তোমরা সে প্রাণকে ফিরিয়ে আননা? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. অনন্তর যে ব্যক্তি সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. তার জন্য শান্তি রয়েছে, আর [নানাবিধ] খাদ্যসামগ্রী এবং আরামের বেহেশত রয়েছে।	فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾
৯০. আর যে ব্যক্তি ডান দিকওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾
৯১. তবে তাকে বলা হবে যে, তোমার জন্য নিরাপত্তা রয়েছে, কেননা তুমি ডান দিকওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত।	فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾
৯২. আর যে অবিশ্বাসী, পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. তবে ফুটন্ত পানি দ্বারা তার আতিথ্য করা হবে।	فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾
৯৪. এবং তাকে দোজখে প্রবেশ করতে হবে।	وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾
৯৫. নিঃসন্দেহে তা যথার্থ সুনিশ্চিত কথা।	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾
৯৬. অতএব, সেই মহা মহিমান্বিত প্রভুর নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৭. تَرْجِعُوْنَهَا তবে কেন তোমরা সেই প্রাণকে ফিরিয়ে আন না اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৮৮. فَاَمَّا অনন্তর যে ব্যক্তি اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৮৯. فَرَوْحٌ তার জন্য শান্তি রয়েছে وَّرَيْحَانٌ আর (নানাবিধ) খাদ্যসামগ্রী وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ এবং আরামের বেহেশত রয়েছে।

৯০. وَاَمَّا আর যে ব্যক্তি اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ডান দিক ওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৯১. فَسَلٰمٌ لَّكَ তবে তাকে বলা হবে, তোমার জন্য নিরাপত্তা রয়েছে مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ কেননা তুমি ডান দিকওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত।

৯২. وَاَمَّآ اِنْ كَانَ আর যে অন্তর্ভুক্ত হবে مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ অবিশ্বাসী, পথভ্রষ্টদের।

৯৩. فَنُزُلٌ তবে তার আতিথ্য করা হবে مِّنْ حَمِيْمٍ ফুটন্ত পানি দ্বারা।

৯৪. وَّتَصْلِيَةُ এবং তাকে প্রবেশ করতে হবে جَحِيْمٍ দোজখে।

৯৫. اِنَّ هٰذَا নিঃসন্দেহে এটা لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ যথার্থ সুনিশ্চিত কথা।

৯৬. فَسَبِّحْ অতএব, পবিত্রতা বর্ণনা করুন بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ সেই মহা মহিমান্বিত প্রভুর নামে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ - ١٠

এ সূরার আয়াত– ৯৬, বাক্য– ৮৭৮, আর অক্ষর সংখ্যা হলো ১,৯০৩ টি।

নামকরণ : আল-ওয়াকি'আ কেয়ামতের নামসমূহের মধ্যে অন্যতম, যেহেতু এ সূরায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, তাই আলোচ্য সূরার এ নামকরণ করা হয়েছে।

মূলবক্তব্য : এ সূরায় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম শক্তি ও অপূর্ব মহিমার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। এতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন মানুষ মাত্রকে তার সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ডের পরিণতি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

জীবনের ন্যায় মৃত্যুও সত্য, আর মৃত্যুর ন্যায় হাশরের ময়দানের পুণরুত্থানও সত্য। এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আল্লাহপাকের অনন্ত অসীম কুদরতে কামেলার প্রতি প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করলে কেয়ামতের দিনের মহাবিচারের ঘটনার প্রতি বিশ্বাস করা আদৌ কঠিন নয়।

এতদ্ব্যতীত এ সূরায় বেহেশতের সৌন্দর্য এবং প্রাচুর্যের বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে তা যেমন বিস্ময়কর তেমনই মনোমুগ্ধকর।

এ সূরার ফজিলত : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা সূরা ওয়াকি'আ পাঠ কর এবং তোমাদের সন্তান সন্ততিকেও তা শেখাও, এটি হলো "সূরাতুল গেনা"।

হযরত আনাস (রা.) থেকে এ মর্মের হাদীস বর্ণিত আছে। –[ইবনে আসাকের, দারামী]

সূরা ওয়াকি'আ আমল

১. তাফসীরে হাক্কানীতে আছে–
প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছে, এটি প্রাচুর্যের সূরা যে ব্যক্তি প্রতিরাতে এ সূরা পাঠ করবে সে কখনও দারিদ্র্য ও অভাবে পতিত হবে না।

২. যদি কেউ নিজের আর্থিক অবস্থার স্বচ্ছলতা এবং রিজিকের প্রাচুর্য কামনা করে, তবে তাকে এক শুক্রবার থেকে আরেক শুক্রবার পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ২৫ বার এ সূরা পাঠ করতে হবে এবং পরবর্তী শুক্রবার রাতে মাগরিবের নামাজের পর ২৫ বার এ সূরা পাঠ করতে হবে এবং এশার নামাজের পর ২১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে। তারপর প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর এবং মাগরিবের নামাজের পর ১ বার এ সূরা পাঠ করতে হবে। এ আমলের বরকতে এর পাঠক শীঘ্রই প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হবে।

৩. এ সূরা লিখে তাবিজ করে সঙ্গে রাখলে সকল প্রকার বালা মসিবত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং প্রচুর রিজিকপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আসন্ন সন্তান প্রসবা নারীর সঙ্গে এ সূরা বেঁধে দিলে অতি সহজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।
হাফেজ ইবনে আসাকির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আলোচনায় আমর ইবনে রবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) যখন অসুস্থ হলেন, [আর এ রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়], তখন হযরত ওসমান (রা.) তাঁর নিকট আগমন করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কী কষ্ট? তিনি বললেন, আমার গুনাহ (অর্থাৎ গুনাহের চিন্তাই কষ্টের কারণ)। হযরত ওসমান (রা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা আছে কি? তিনি জবাব দিলেন, শুধু আমার প্রতিপালকের রহমতের। হযরত ওসমান (রা.) প্রশ্ন কররেন, আপনার জন্যে কোনো চিকিৎসকের ব্যবস্থা করব কি? তিনি জবাব দিলেন, চিকিৎসক নিজেই তো আমাকে অসুস্থ করেছেন। অর্থাৎ যাঁর হাতে রয়েছে স্বাস্থ্য-সুখ, যাঁর হুকুমে হয় জীবন ও মৃত্যু, তাঁরই হুকুমে আমি অসুস্থ হয়েছি। হযরত ওসমান (রা.) পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আপনার জন্যে কিছু অর্থ-সম্পদের ব্যবস্থা করব? তিনি জবাব দিলেন, এর আমার কোনো প্রয়োজন নেই। হযরত ওসমান (রা.) বললেন, আপনার পরে অর্থ-সম্পদ আপনার কন্যাগণের কাজে লাগবে। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, আপনি কি আমার কন্যাদের অভাবগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করেন, অথচ আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, তারা যেন প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকি'আ তেলাওয়াত করে। আমি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট শ্রবণ করেছি, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকি'আ তেলাওয়াত করে, সে কখনো অভাবগ্রস্ত হবে না।

যদি কোনো ব্যক্তি একই মজলিসে একচল্লিশবার সূরা ওয়াকি'আ পাঠ করে, তবে তার আর্থিক প্রয়োজন মিটে যাবে।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা ওয়াকি'আ পাঠ করছে, তবে তার রিজিক বৃদ্ধি করা হবে এবং আসমানি জমিনি বালা-মসিবত থেকে তাকে হেফাজত করা হবে।

শানে নুযূল ঃ ইবনে মারদূভিয়া (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত ফেরাউন বংশীয় ঈমানদার হযরত হিযকীল (আ.), হাবীব নাজ্জার, এবং এ উম্মতের হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.) -এ ধরনের আরও অন্যান্য সকলই তাঁরা পরবর্তীদের অপেক্ষা অধিক উত্তম, পরবর্তীদের উপর তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।–(রূহুল মা'আনী : ১৩২/২৭/২৪, ফতহুল কাদীর : ১৫১/৫)

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ - فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ . ٢٧ - ٢٨

শানে নুযূল ঃ আবুল আলিয়া ও যাহহাক বলেন, একদা মুসলমানেরা তায়েফের কোনো এক সবুজে ঘেরা একটি জনপদে একটি বরই গাছ দেখে তারা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে আক্ষেপ করে বলতে লাগল, হায় আফসোস আমাদের যদি এমন এমন বরই গাছ হতো! তাদের এহেন আক্ষেপ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বরই গাছের সু-সংবাদ স্বরূপ আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। (কুরতুবী : ১৭৮/১৭, রূহুল মা'আনী : ১৪০/২৭/১৪)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ - (٢٩ - ٣٠)

শানে নুযূল ঃ আহমদ, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম (র.) প্রমুখ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ দু'টি আয়াত যখন নাজিল হয়,তখন তা সাহাবায়ে কেরামের নিকট অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে পড়ল। (কারণ উম্মতে মুহাম্মদী তুলনামূলক ভাবে কম হচ্ছে) তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ বললেন, আমি আশা করেছিলাম যে, তোমরা (উম্মতে মুহাম্মদী) হবে জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ বরং তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধেক এবং দ্বিতীয় অর্ধেকেও তোমাদের ভাগ বা অংশ থাকবে। (ফতহুল কাদীর : ১৫১/৫, রূহুল মা'আনী : ১৩৪/২৭/১৪)
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে মারদূভিয়া এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) এ মতই পোষণ করতেন।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ .... الْاٰيَةَ - (٧٥ - ٨٢)

অর্থ : অতএব আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করে বলছি এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (আয়াত : ৭৫-৮২)

শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ -এর সময়ে একদা বৃষ্টি হলে রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, কিছু লোক আল্লাহপাকের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে থাকে আর কিছু লোক তার নিয়ামতের শুকরিয়া না করে থাকে। তখন কিছু লোক বলে বৃষ্টি হলো আল্লাহপাকের একটি বিশেষ রহমত। তিনি তার রহমতকে যার উপর ইচ্ছা বর্ষণ করে থাকেন। কিন্তু কিছু লোক বলে, এখন বৃষ্টি হওয়ার দ্বারা অমুক তারকার সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণিত হয়ে গেল। সে প্রেক্ষিতেই অত্র আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়। -(কানুযুন নুকূল : ৯৭)

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা রহমানের শুরুতে আল্লাহপাকের কুদরত হেকমত এবং শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা রয়েছে, এরপর এ ক্ষণস্থায়ী জগতের উল্লেখ করে কিয়ামত কায়েম হওয়ার মাধ্যমে এ জগতের ধ্বংসের ঘোষণা রয়েছে। আর এ সূরার প্রারম্ভেই কেয়ামত কায়েম হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা রহমানে আল্লাহপাকের নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এ সূরায় কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ দিয়ে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা রহমানে আল্লাহপাকের অনন্ত অসীম রহমত এবং দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এ সূরায় কেয়ামতের ভয়াবহতার উল্লেখ করে সে কঠিন দিনের জন্যে আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের তাগিদ করা হয়েছে। এ সূরায় এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামত এমনি এক মহা সত্য, যাকে অস্বীকার করা যায় না, যাকে মিথ্যাজ্ঞান করা যায় না, যাকে প্রতিরোধ করা যায় না। আর এ কথাও ঘোষণা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন একদল লোক সম্মানিত হবে, আরেকদল লোক অপমানিত হবে। যারা আল্লাহপাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করবে, তারা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে চিরশান্তি লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহপাকের প্রতি ঈমান আনে না এবং তাঁর বিধান অমান্য করে, তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন কঠোর, ইরশাদ হয়েছে–

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٢) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ (٣)

যখন কেয়ামত ঘটবে, যার সংঘটনে এতটুকু মিথ্যা নেই, যা কিছু লোককে করবে অবনত আর কিছু লোককে করবে সমুন্নত।

সূরা আর রাহমানের সর্বশেষ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

[কত বরকতময় আপনার প্রতিপালকের, নাম, যিনি মহান এবং মহিমাময়]

আর এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে, কখন প্রকাশিত হবে আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমা। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন– إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ [কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে]

যখন কেয়ামত ঘটবে, যা অবশ্যই ঘটবে, তখন আল্লাহপাকের মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে। অথবা বলা যায়, সূরা আর-রহমানে আল্লাহপাক জান্নাতের অনন্ত অসীম নিয়ামতের উল্লেখ করেছেন। যারা হয় ঈমানদার ও নেককার, যারা সত্য-সাধনায় থাকে মশগুল, তাদের মনের গহীনে এ প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, সূরা আর-রহমানে বর্ণিত এ নিয়ামতসমূহ কখন পাওয়া যাবে? তারই জবাবে ইরশাদ হয়েছে–

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ [যখন কেয়ামত ঘটবে]

যেহেতু কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে, তাই তাকে "ওয়াকি'আ" বলা হয়েছে। لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ "যার সংঘটনে এতটুকু মিথ্যা নেই" অর্থাৎ কেয়ামত সম্পর্কীয় এ ঘোষণা সত্য নয়, এ কথা কেউ বলতে পারবে না।

অথবা কেয়ামত কায়েম হওয়ার কারণে আর কেউ মিথ্যাবাদী থাকে না।

অথবা যে ব্যক্তি কেয়ামতের ব্যাপারে খবর দেবে, সে সঠিক খবরই দেবে।

অথবা কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়াবহ অবস্থাকে সহ্য করার সাহস কারোই হবে না।

অথবা কেয়ামত হওয়ার কথা মহা সত্য, এর সত্যে মিথ্যার লেশমাত্রও নেই। তাফসীরকার জুযাজ (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো কেয়ামতের ঘটনা হবে অপ্রতিরোধ্য, আর এ ব্যাখ্যাই করেছেন হযরত হাসান বসরী (র.) এবং কাতাদা (র.)।

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ [যা কিছু লোককে করবে অবনত, আর কিছু লোককে করবে সমুন্নত]।

যারা দুনিয়ার মায়ায় মোহে মুগ্ধ থাকে, সর্বদা অর্থ-সম্পদের লোভে-লাভের সংগ্রহে মত্ত থাকে, এ জীবনকেই সব কিছু মনে করে এবং আখেরাতকে বিশ্বাস করে না, আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলের বিধি-নিষেধকে অমান্য করে, কেয়ামতের দিন তারা হবে অবনত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, কোপগ্রস্ত এবং দোজখে নিক্ষিপ্ত। আল্লাহর দুশমনদেরকে অপমানিত করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

পক্ষান্তরে, যারা দুনিয়ার জীবনে ঈমানদার ও নেককার হবে, আল্লাহপাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করবে, তাঁর প্রিয়নবী ﷺ-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে এবং জীবনকে জীবনের মালিক আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় অতিবাহিত করবে, কেয়ামতের দিন তাদের মর্যাদা উন্নীত হবে, জান্নাতে উচ্চাসনে তারা আসীন হবে।

নিরীহ নিরহংকার মুত্তাকী, পরহেজগার মুমিনগণ সেদিন লাভ করবে উচ্চাসন।

দুনিয়াতে যারা বিনয়ী ছিল, বিনীত হয়ে জীবন যাপন করেছে, তারাই সেদিন পাবে উচ্চ মর্তবা।

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا (٦)

অর্থাৎ যখন পৃথিবী দারুণভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং তা একেবারে বাতাসে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকনার ন্যায় হয়ে যাবে, পাহাড় পর্বত সেদিন ধূলিস্মাত হয়ে যাবে, আকাশচুম্বি ইমারতগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সারা পৃথিবী দারুণ কম্পনে প্রকম্পিত হবে।

وَّكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً [এবং তোমরা সকলের বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণিতে]।

মানব জাতি তিনভাগে বিভক্ত হবে: : ঈমান ও আমলের নিরীখে দুনিয়ার মানুষ তখন তিনভাগে বিভক্ত হবে। একদল আল্লাহপাকের আরশের ডান দিকে থাকবে। সৃষ্টির প্রথম দিন যারা হযরত আদম (আ.)-এর ডান পাঁজর থেকে বের হয়েছিল, যাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা হবে জান্নাতবাসী, তাই ইরশাদ হয়েছে–

فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ (٨)

ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের লোকেরা! কেননা তারা চিরশান্তির কেন্দ্র জান্নাতের অধিবাসী হবে। وَأَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ (٩) [এবং বাম দিকের দল, কত ভাগ্যাহত বাম দিকের লোকেরা]।

কিয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হবে, প্রথম ভাগ যারা আরশের ডান দিকে থাকবে, তাদের আলোচনা ইতঃপূর্বে হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে তাদের কথা ইরশাদ হয়েছে, যারা আরশের বাঁদিকে থাকবে, যাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা কত ভাগ্যাহত, কেননা তারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহপাকের প্রতি বিশ্বাস করেনি, জীবনের মালিক আল্লাহপাকের বিধানকে অমান্য করেছে, তাদের অপকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে [আল্লাহপাক আমাদেরকে রক্ষা করুন]।

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ (١٠) اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ (١١) فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ (١٢)

'আর যারা অগ্রবর্তী, তো অগ্রবর্তীই। তারাই বিশেষভাবে নৈকট্য-ধন্য, তারা নিয়ামতের উদ্যানসমূহে থাকবে'।

অগ্রবর্তী কারা? : আর তৃতীয় দল হলো, তারা যারা অগ্রবর্তী, তারা তো অগ্রবর্তীই। তারা বিশেষভাবে আল্লাহপাকের নৈকট্য-ধন্য হবে এবং তারা নিয়ামতের উদ্যানসমূহে অবস্থান করবে। তারাই জান্নাতবাসীদের নেতৃত্ব পাবেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসরারীগণ এবং আরো রয়েছেন সিদ্দীকগণ, শহীদগণ।

রবী এবং হাসান (র.) বলেছেন, اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ হলেন সে সব লোক, যাদের জীবন আল্লাহপাকের বন্দেগিতে অতিবাহিত হয়েছে। আর اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ হলো সে সব লোক, যারা দুনিয়াতে আল্লাহপাকের অবাধ্য হয়ে জীবন যাপন করেছে, তাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। আর যারা 'সাবেকূন' বা অগ্রবর্তী তারা ইসলাম গ্রহণে, আল্লাহপাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনে অগ্রবর্তী। তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম রয়েছেন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসারীগণ, যাঁরা সরাসরি তাঁদের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইসলামের সূচনাকালে যখন মক্কা মোয়াজ্জমায় মুসলমানগণ অত্যন্ত নিপীড়িত ও উৎপীড়িত অবস্থায় ছিলেন, তখন যারা সত্য ও ন্যায়ের জন্যে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য হিজরত করেছেন, অর্থ-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, আপনজন এমনকি ভিটা-মাটি ফেলে মক্কাশরীফ থেকে হিজরত করেছেন, তাঁরাই আখেরাতে "সাবেকূন" এর তথা অগ্রবর্তী লোকদের মর্তবা লাভ করবেন।

হযরত ইকরামা (র.) বলেছেন, সাবিকূন আউয়্যালুন তারা, যারা মুহাজির এবং আনসার, যারা উভয় কেবলার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছেন।

রবী ইবনে আনাস (র.) বলেছেন, যাঁরা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এর প্রতি ঈমান আনয়নে অগ্রবর্তী ছিলেন, তারাই সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

এ পর্যায়ে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দিকে যারা অগ্রগামী হয়, সাবেকূন দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন, এসব কথা একত্রিত করলে যা প্রমাণিত হয় তা হলো, সাহাবায়ে কেরামই হলেন সাবেকূনাল আউয়্যালুন। হযরত আলী (র.) বলেছেন, তোমাদের সকলের পূর্বে আমি ইসলামের দিকে অগ্রসর হয়েছি, যখন আমি কিশোর ছিলাম, যৌবনে পদার্পণও করিনি।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) বলেছেন, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম নবুয়তের গুণাবলির মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান ছিলেন। তাবেয়ীনদের মধ্যে অনেকে এবং তাবে তাবেয়ীনদের মধ্যে কিছু লোক এ মর্যাদা লাভ করেছেন, এরপর এক হাজার বছর যাবত নবুয়তের নূর কমতে থাকে, বেলায়েতের গুণাবলি প্রকাশিত হতে থাকে, বেলায়েতের নূর আউলিয়ায়ে কেরামের কারামতের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে, এর এক হাজার বছর পর কোনো কোনো লোককে আল্লাহপাক নবুয়তের গুণাবলির অংশ বিশেষ দান করেছেন, তাঁরা নবীর সঠিক অনুসারী হয়েছেন, এজন্যে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির ন্যায়, এ কথা জানা যায়না যে বৃষ্টির প্রথমাংশ অধিকতর উপকারী, না শেষ অংশ। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবুদদারদা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের উত্তম অংশ হলো এর প্রথম ও শেষ অংশ।

বস্তুতঃ সাবেকূন তারাই, যারা জান্নাতে সবার আগে প্রবেশ করবে, আর তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছেন–

اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ـ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ـ

তারাই হবে আল্লাহর পাকের নৈকট্য-ধন্য। তারা নিয়ামতের উদ্যানসমূহে থাকবে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ (١٣) وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ (١٤)

তাদের বহু সংখ্যক লোক পূর্ববর্তীদের মধ্যে থেকে হবে, আর অল্প সংখ্যক লোক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে তাফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো আলোচ্য আয়াতে এ সুসংবাদ রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবে

তাবেয়ীনদের উদ্দেশ্যে, কেননা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, এতে যারা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর যুগ পেয়েছেন, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম তাঁরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এরপর সে সব লোক, যারা আমার যুগের নিকবর্তী অর্থাৎ তাবেয়ীন, এরপর সে সব লোক, যারা তাদের যুগের নিকটবর্তী অর্থাৎ তাবে' তাবেয়ীন। এরপর এমন লোক আসবে, যারা সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজন না থাকলেও সাক্ষ্য দেবে, খেয়ানত করবে, আমানতদার হবে না, মানত মানবে, কিন্তু মানত পূর্ণ করবে না।

এ হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার সাহাবীদেরকে মন্দ বলো না, যদি তোমাদের কেউ ওহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ আল্লাহর রাহে দান করে তবে আমার কোনো সাহাবীর এক সের বা আধা সের খেজুরে সমান হবে না। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একমত।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ [তাদের বহু সংখ্যক পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে] এর দ্বারা হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে হুজুর ﷺ পর্যন্ত যত উম্মত এসেছে, সকলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ [আর অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে] এর দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে ইমাম আহমদ এবং তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাবের (রা.) বলেছেন, আমি স্বয়ং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন, আমি আশা করি যে জান্নাতবাসিদের মধ্যে আমার অনুসারী এক চতুর্থাংশ হবে। এ কথা শ্রবণ করে আমরা উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহু আকবার" বলি। এরপর হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি আশা করি, সমস্ত জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকে আমার উম্মত এক তৃতীয়াংশ হবে। আমরা পুনরায় তাকবীর বলি।

এরপর হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, আমি আশা করি, সকল জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে আমার উম্মত।

ইমাম বোখারী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা কি পছন্দ করবে যে জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ তোমরা হও? আমরা বললাম জি-হ্যাঁ। এরপর তিনি ইরশাদ করলেন, শপথ সেই আল্লাহপাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, সমস্ত জান্নাতবাসীদের মধ্যে তোমরা হবে অর্ধেক।

ইমাম তিরমিযী, হাকেম ও বায়হাকী হযরত বোরায়দা (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, জান্নাতবাসীদের একশত বিশটি কাতার হবে, তন্মধ্যে আশিটি হবে তোমাদের, আর অবশিষ্ট চল্লিশ কাতার হবে অন্য উম্মতদের।

তাবারানী হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۔ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ

'তারা স্বর্ণখচিত আসনসমূহের উপর থাকবে, তারা হেলান দিয়ে বসবে একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে। অর্থাৎ যারা অগ্রবর্তী দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন, তারা জান্নাতের মধ্যে স্বর্ণখচিত আসনে একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে বসবেন।

مُتَقَابِلِينَ শব্দটির ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র.) বলেছেন, একে অন্যের সামনা সামনি মুখ করে তারা বসবেন, কাউকে পেছন দিয়ে তারা বসবেন না।

আল্লামা বগভী (র.) مُتَقَابِلِينَ শব্দটির এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহপাক এ শব্দটি দ্বারা জান্নাতবাসীগণের আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক, বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক প্রীতি ভালোবাসার একটি নমুনা পেশ করেছেন। يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ .... الخ আলোচ্য আয়াতসমূহে বেহেশতবাসীগণের জন্যে সুরক্ষিত কিছু নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে।

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ (١٧) তাদের কাছে চির কিশোর বালকরা তাদের খেদমতের জন্যে ঘুরে বেড়াবে।

জান্নাতবাসীদের খাদেম : আলোচ্য আয়াতের مُخَلَّدُونَ শব্দটির ব্যাখ্যা হলো, বেহেশতবাসীদের খাদেমের এই অবস্থা হবে যে, কখনও তারা বৃদ্ধ হবে না, সর্বদা তারা কিশোর থাকবে, আর তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তনও আসবে না। ইবনে কায়সান বলেছেন, তারা সর্বদা কিশোর থাকবে, তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

সাঈদ ইবনে যুবায়ের (র.) مُخَلَّدُونَ হলো সে সব কিশোর, যাদের কানে বালি পরানো হবে।

হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এই কিশোর খাদেমগণ মানুষেরই সন্তান হবে, শৈশব ও কৈশোরে তাদের মৃত্যু হয়েছে, তারা কোনো ছওয়াবের কাজ করেনি যে জান্নাত পাবে, আর কোনো গুনাহও করেনি যে আজাব হবে, বরং তাদেরকে জান্নাতবাসীদের খাদেম বানিয়ে দেওয়া হবে।

ইবনে মোবারক (র.) হান্নাদ (র.) ও বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, সবচেয়ে কম মর্তবার জান্নাতীর একটি কাজের জন্যে এক হাজার খাদেম দৌড়ে আসবে।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সকল বেহেশতীদের মধ্যে সবচেয়ে কম মর্তবার বেহেশতীর খেদমতের জন্যে দশ হাজার খাদেম থাকবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, জান্নাতীদের মধ্যে যার মর্তবা সবচেয়ে কম, তার নিকট সকল-সন্ধ্যা পাঁচ হাজার খাদেম আসা যাওয়া করবে। আর প্রত্যেক খাদেমের নিকট রকমারি খাদ্য-দ্রব্য ও ফল ফলাদি থাকবে।

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (١٨) لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ (١٩)

চির কিশোর খাদেমগণ পান-পাত্র ও প্রস্রবণ মিশ্রিত সূরা পূর্ণ পেয়ালা নিয়ে হাজির হবে, সেই সূরা পানে তাদের মাথা ব্যথা হবে না এবং নেশাও হবে না।

দুনিয়ার সূরা পানে মাথা ব্যয় হয়, নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে মানুষ মাতাল হয়ে যায়, কিন্তু জান্নাতে যে সূরার ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে মাথা ব্যথাও হবে না এবং কোনো প্রকার উন্মাদনাও আসবে না।

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (٢٠) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (٢١)

এবং ফলের মধ্যে যা তারা পছন্দ করে এবং তাদের মনের মতো গোশত নিয়ে বেহেশেতের চির কিশোরগণ হাজির হবে। অর্থাৎ নানা প্রকার ফলমূল সর্বদা তাদের নিকট হাজির করা হবে, এমনিভাবে পরিচারকরা পাখির গোশত পেশ করবে।

জান্নাতের খাবার : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখনই কোনো জান্নাতী ব্যক্তি কোনো প্রকার পাখির কথা মনে করবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাখিটি তার সম্মুখে উপস্থিত হবে।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের মধ্যে তোমরা যে পাখিকে দেখে তা খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, সঙ্গে সঙ্গে তা ভুনা হয়ে তোমাদের সম্মুখে হাজির হবে।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, জান্নাতের মধ্যে কোনো জান্নাতী ব্যক্তি যখন কোনো প্রকার পাখির গোশত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে তখন সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাখিটি, যা বখতী নামক উষ্ট্রের ন্যায় হবে, জান্নাতবাসীদের দস্তরখানে এসে পড়বে। অবস্থা এই হবে যে, কোনো প্রকার অগ্নি তাকে স্পর্শ করবে না, এমনকি কোনো প্রকার ধোঁয়াও তার কাছে যাবে না। জান্নাতীগণ সেই পাখির গোশত পেট ভরে, খাবে, এরপর তা উড়ে চলে যাবে।

বায়হাকী হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের মধ্যে পাখিগুলো বখতী নামক উষ্ট্রের ন্যায় হৃষ্ট-পুষ্ট হবে, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, তাহলে তো ঐ পাখিগুলো অত্যন্ত আনন্দে থাকবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, হ্যাঁ তাদের চেয়ে অধিকতর আনন্দে থাকবে সেসব লোক, যারা ঐ পাখিগুলোর (গোশত) খাবে। আর হে আবূ বকর! আপনিও ঐ গোশত ভক্ষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

আহমদ, তিরমিযী এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– জান্নাতে কিছু পাখি বখতী নামক উষ্ট্রীর ন্যায় হবে এবং সেই পাখি জান্নাতীদের নিকট নিজেই চলে আসবে। জান্নাতবাসীগণ স্বীয় ইচ্ছা মাফিক ঐ পাখির গোশত খেয়ে নেবে। এরপর পাখিটি উড়ে যাবে, মনে হবে যে, তার দেহের কোনো অংশ কমেনি।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন পাখি থাকবে, যা সত্তর হাজার ডানা বিশিষ্ট হবে, সে নিজেই জান্নাতীদের খাবার পাত্রে এসে পড়বে, এরপর সে তার বাহু নাড়াচাড়া করবে, প্রত্যেক ডানা থেকে একটি রং বের হবে, যা বরফ থেকে সাদা হবে, মাখন থেকে নরম, মধু থেকে মিষ্ট হবে। এরপর সে পাখিটি উড়ে চলে যাবে।

মুগীস ইবনে সামহী বর্ণনা করেন, জান্নাতে "তুবা" নামক একটি বৃক্ষ রয়েছে, জান্নাতে এমন কোনো ইমারত নেই, যার উপর এ বৃক্ষের ছায়া পড়ে না। ঐ বৃক্ষে রকমারি ফল রয়েছে। বখতী নামক উষ্ট্রীর ন্যায় পাখিগুলো ঐ বৃক্ষের উপর অবতরণ করবে। জান্নাতবাসীগণ যখন ঐ পাখিটির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে, তখন তাকে তারা ডাকবে এবং পাখিটি সঙ্গে সঙ্গে দস্তরখানে এসে পড়বে। জান্নাতবাসীগণ একদিক থেকে তার ভুনা গোশত খাবে, আর অন্যদিক থেকে যেমন ছিল তেমন হয়ে যাবে। এরপর তা উড়ে চলে যাবে।

وَحُورٌ عِينٌ (٢٢) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (٢٣) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤)

আর তাদের জন্যে থাকবে ডাগর চোখা গৌরকর্ণের হুরগণ, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা, এসব তাদের আমলেরই প্রতিদান।

হুরদের বিবরণ :ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেছেন, আমি আরজ করেছি, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে حُوْرٌ عِيْنٌ-এর অর্থ বলে দিন। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, গৌরবর্ণ ডাগর আঁখি বিশিষ্ট হুরগণ, বেহেশতবাসীদের চিত্ত বিনোদনের জন্যে থাকবে। হযরত উম্মে সালমা (র.) বলেন, আমি আরজ করেছি, كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ

প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যেভাবে ঝিনুকের মধ্যে মণি মুক্তা সযত্নে সুরক্ষিত থাকে, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন থাকে এবং কোনো প্রাণীর স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকে; ঠিক তেমনি হুরগণ পরিচ্ছন্নতায় মণি-মুক্তার ন্যায় হবে এবং সমস্ত প্রাণীর স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকবে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে একটি নূর চমকাবে, তখন লোকেরা বলবে, কোনো হুর তার স্বামীর সাথে হেসেছে, এটি তার অতি পরিচ্ছন্ন দাঁতের চমক।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا (٢٥)) اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا (٢٤)

তারা সেখানে বাজে কথা বা পাপের কথা শুনবে না, তারা শুনবে শুধুমাত্র শান্তি, শান্তি।

বেহেশতের পরিবেশ : বেহেশতের পরিবেশ হবে অত্যন্ত মনোরম ও শান্ত, যেখানে কোনো চিৎকার হাহাকার গোলমাল নেই, সেখানে কোনো গুনাহ্‌র কাজ নেই, কোনো গুনাহ্‌র কথাও নেই, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সম্ভাষণে "সালাম" শব্দটিই ব্যবহৃত হবে।

যেমন পবিত্র কুরআনে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন– لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا

বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে বাজে কথা শুনবে না এবং মিথ্যা কথাও শুনবে না। এমনিভাবে সূরা মুমিনূনে ইরশাদ হয়েছে- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ অর্থাৎ[সফলকাম হবে তাদের জীবন] যারা বাজে ও অহেতুক কথা থেকে বিরত তাকে। سَلٰمًا অর্থাৎ জান্নাতে পরস্পরের অভিবাদনে ব্যবহৃত "সালাম" শব্দটি শ্রুত হবে।

যারা বেহেশতে সর্ব প্রথম প্রবেশ করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে জান্নাতে সর্বপ্রথম সে মুহাজিরগণ প্রবেশ করবে, যারা ইসলামের জন্যে, সত্যের জন্যে হিজরত করেছে, নিঃস্ব-হৃত-সর্বস্ব হয়েছে, যাদের দ্বারা ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্তের হেফাজত হয় এবং মন্দ কাজকে প্রতিরোধ করা হয় এতদসত্ত্বেও তাদের মনে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা পৃথিবী থেকে বিদায় হয়, সে আশা আকাঙ্ক্ষা দুনিয়াতে পূরণ হয়না। আল্লাহপাক তাঁর ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে হুকুম দেবেন, এ মুহাজিরদের নিকট যাও তাদেরকে সালাম কর। ফেরেশতাগণ বিনীতভাবে আরজ করবে, হে পরওয়ারদেগার! আমরা আসমানের অধিবাসী এবং তোমার সৃষ্টির মধ্যে উত্তম, এতদসত্ত্বেও তাদের নিকট যাওয়ার এবং তাদেরকে সালাম জানানোর আদেশ দিয়েছ? [অর্থাৎ তারা কত উচ্চ মর্তবার অধিকারী!] আল্লাহপাক ইরশাদ করবেন, তারা আমার বান্দা ছিল, শুধু আমারই ইবাদত করতো, আমার ইবাদতে কাউকে শরিক করতো না, তাদের দ্বারা মুসলমানদের সীমান্তের হেফাজত হতো এবং মন্দ কাজ প্রতিরোধ করা হতো, তাদের প্রয়োজনের কথা তারা অপূর্ণ অবস্থায় মনেই রেখে দিত এবং মৃত্যুবরণ করতো। তখন আল্লাহপাকের হুকুম মোতাবেক ফেরেশতাগণ মুহাজিরদের নিকট যাবে। বেশেতের প্রত্যেকটি দরজা দিয়ে তারা প্রবেশ করবে এবং মুহাজিরদেরকে বলবে,

তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কেননা তোমরা ছবর অবলম্বন করেছো, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কেননা তোমরা ছবর অবলম্বন করেছো, তোমাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল কত উত্তম।

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ (٢٧) فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ (٢٨) وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ (٢٩) وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ (٣٠) وَّمَاۤءٍ مَّسْكُوْبٍ (٣١) وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ (٣٢) لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ (٣٣)

'আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা থাকবে এক উদ্যানে, সেখানে রয়েছে কাঁটাবিহীন কুলবৃক্ষ এবং রয়েছে সারিবদ্ধ কলাগাছ, দীর্ঘায়তন ছায়া, প্রবাহিত ঝর্ণাধারা। অফুরন্ত ফল, যা কখনো শেষ হবে না এবং যা নিষিদ্ধ হবে না এবং তারা থাকবে উঁচু বিছানাসমূহে।

শানে নুযূল : সাঈদ ইবনে মানসূর "সুনানে" এবং বায়হাকী "আল বা' ছে' আতা (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তায়েফবাসীদের দরখাস্ত অনুযায়ী যখন তায়েফের উৎপন্ন মধু সে এলাকার জন্যে সংরক্ষণ করা হয়, তায়েফের বাইরের জন্যে তা নিষিদ্ধ করা হয়, তখন কিছু লোক বলল, জান্নাতে তো অনেক নিয়ামত থাকবে, যদি জান্নাতে মধুর এমন প্রচুর ব্যবস্থা থাকতো, তবে কত ভালো হতো! তখন এ আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

যারা أَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ বা ডান দিকের দলে থাকবে, তাদের জন্যে জান্নাতে যে সব নিয়ামত রয়েছে, তার কিছু বিবরণ আলোচ্য আয়াতসমূহে স্থান পেয়েছে। জান্নাতে রয়েছে কাঁটা বিহীন কুলবৃক্ষ, এ কুল হবে অত্যন্ত সুস্বাদু, এ বৃক্ষের ছায়া হবে সুদীর্ঘ।

দ্বিতীয়তঃ সেখানে শীতও নেই, গ্রীষ্মও নেই। অতি প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে সময়টি যেমন মধুর হয়, ঠিক তেমনি পরিবেশ জান্নাতে সর্বদা বিরাজমান থাকবে। জান্নাতের ছায়া এত সুদীর্ঘ হবে যে, একটি দ্রুতগামী ঘোড়া যদি একশত বছরও দৌড়াতে থাকে, তবু তা অতিক্রম করতে পারবে না।

এতদ্ব্যতীত, জান্নাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল, উঁচু বিছানা, এক কথায় অনন্ত অসীম নিয়ামত রয়েছে ঈমানদার ও নেককারদের সমগ্র জীবনের সাধনার পুরস্কার স্বরূপ।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন, এসব পুরস্কার হলো– أَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ বা ডান দিকে অবস্থানকারী মুমিনদের জন্যে, আর ডান দিকে অবস্থানকারী মুমিনগণ হবে সে মুত্তাকী পরহজেগারগণ, যাদের অন্তর থাকবে আলোকময়, যারা সারা জীবন আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের সাধনায় রত থাকবে। এরপর আখেরাতে গুনাহগার ঈমানদারদেরকে আম্বিয়ায়ে কেরামের সুপারিশক্রমে মাফ করা হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবশাধিকার দেওয়া হবে।

বায়হাকী হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আল্লাহপাক কুরআনে কারীমে এমন বৃক্ষের আলোচনা করেছেন, যার কাঁটার কারণে মানুষের কষ্ট হয়, তিনি ইরশাদ করলেন সে কেমন বৃক্ষ? ঐ ব্যক্তি বলল, কুল বৃক্ষ, তাতে কাঁটা থাকে। তখন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহপাক فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ বলেছেন, অর্থাৎ আল্লাহপাক কুল ভেঙ্গে দেবেন এবং প্রত্যেকটি কাঁটার স্থলে একটি ফল সৃষ্টি করবেন, আর প্রত্যেক ফল ফেটে গেলে তা থেকে বাহাত্তরটি বর্ণের খাদ্য-দ্রব্য বের হয়ে আসবে, একটি বর্ণ আরেকটি বর্ণের ন্যায় হবে না।

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ অভিধান গ্রন্থ "কামূসে" রয়েছে, طَلْح হলো বড় বৃক্ষ, আর مَنضُود হলো একের পর এক ফলে পরিপূর্ণ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) হাম্মাদ (র.) এবং বায়হাকী (র.) লিখেছেন যে, তাফসীরকারক মাসরূক (র.) বলেছেন, জান্নাতে যে খুরমা বৃক্ষ রয়েছে। তা ফলে পরিপূর্ণ থাকবে, আর যখন একটি ফল ছেড়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থলে আরেকটি ফল সৃষ্টি হবে।

কা'বে আহবার বলেছেন, শপথ সেই আল্লাহপাকের, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি তাওরাত এবং হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কুরআন নাজিল করেছেন। যদি কোনো ব্যক্তি পাঁচ বা চার বছর বয়স্ক কোনো উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে জান্নাতের এই কুল বৃক্ষের পার্শ্বে চলতে থাকে, তবে বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত তার এ সফর শেষ হবে না। আল্লাহপাক তার দস্তে মোবারকে বৃক্ষটি রোপণ করেছেন। তার শাখা-প্রশাখাগুলো জান্নাতের বাইরেও ছড়িয়ে আছে। জান্নাতের মধ্যে যে সমুদ্র রয়েছে, তা এ বৃক্ষটির ভিত্তিমূল থেকেই প্রবাহিত হয়েছে।

لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ যা কখনো শেষ হবে না এবং যা নিষিদ্ধও হবে না, অর্থাৎ জান্নাতের ফল কখনও শেষ হবে না এবং কখনও নিষিদ্ধও হবে না।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, কোনো বৃক্ষ থেকে ফল ছিঁড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্থলে অন্য ফল সৃষ্টি করা হবে, তাই ফল কখনো শেষ হবে না। আর যে ফল ছিড়তে চায়, তাকে বাধা দেওয়া হবে না।

এ হাদীসের মর্মের সমর্থনে হযরত ছাওবান (রা.) বর্ণিত হাদীস রয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো জান্নাতী ব্যক্তি যখনই বৃক্ষ থেকে জান্নাতী ফল ছিড়বে, তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহপাক অন্য একটি ফল সৃষ্টি করে দেবেন।– [তাবারানী]

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ এবং তারা থাকবে উঁচু বিছানাসমূহে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন যে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, জান্নাতবাসীদের বিছানা হবে সুউচ্চ।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যদি সর্বোচ্চ স্থানে বিছানা সর্বনিম্নের বিছানার উপর ফেলা হয়, তবে চল্লিশ বছরেও তা পৌঁছতে পারবে না।

إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً (٣٥) فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا (٣٦) عُرُبًا أَتْرَابًا (٣٧) لِّأَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ (٣٨)

নিশ্চয় আমি সে সমস্ত রমণীদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষভাবে। লাস্যময়ী সমবয়স্কা, আর তারা ডান দিকের লোকদের জন্যেই রয়েছে।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াতে যে রমণীগণের কথা বলা হয়েছে, তারা হলেন দুনয়ার সেই বৃদ্ধা নারীগণ, যাদের কিছু চুল সাদা হয়েছে এবং কিছু কালো ছিল, তাদেরকে জান্নাতে কুমারী করে হাজির করা হবে।

ইবনে জারীর এবং বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে তিনি ইরশাদ করেছেন, এর দ্বারা দুনিয়ার সে সব স্ত্রীলোকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা দুনিয়াতে বৃদ্ধা ছিল এবং কুমারীও ছিল।

বায়হাকী এবং ইবনুল মুনজির অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো বৃদ্ধা মহিলা বেহেশতে প্রবেশ করবে না, এ কথা শ্রবণ করে এক বৃদ্ধা কাঁদতে লাগল, তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, সেদিন সে বৃদ্ধা থাকবে না; বরং যৌবন লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আমার নিকট তশরিফ আনেন, তখন আমার নিকট একজন বৃদ্ধা বসেছিলেন। হুজুর ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? আমি আরজ করলাম, ইনি আমার একজন খালা। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, জেনে রাখ, কোনো বৃদ্ধা বেহেশেতে যাবে না।

বৃদ্ধা এ কথা শুনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনে কারীমের এ আয়াত اِنَّا اَنْشَأْنَا خَلْقًا اُخَرَ তেলাওয়াত করলেন।

তাবারানী (র.) অন্য সূত্রে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একজন বৃদ্ধা হযরত রাসূলে কারীমে ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোয়া করুন যেন আল্লাহপাক আমাকে জান্নাত নসীব করেন। তিনি ইরশাদ করলেন, জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম আপনার কথায় সে কষ্ট পেয়েছে, তিনি ইরশাদ করলেন, ইনশাআল্লাহ কথা এটিই হবে, যখন আল্লাহপাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করবেন তখন তাকে কুমারী করেই প্রবেশ করাবেন।

তাফসীরকার মোকাতিল (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা হুরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, দুনিয়ার স্ত্রী লোকদেরকে নয়, আল্লাহপাক তাদেরকে কুমারী করেই সৃষ্টি করেছেন।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, কি পুরুষ কি নারী, তারা তেত্রিশ বছর বয়সের হবে। সকলেই হযরত আদম (আ.)-এর অবয়বের সমান হবে। হযরত আদম (আ.) দৈর্ঘ্যে ছিলেন ষাট হাত, আর প্রস্থে ছিলেন সাত হাত।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে কেউ অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করুক, অথবা বৃদ্ধ অবস্থায় তাকে তেত্রিশ বছর বয়স্ক অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এর অধিক হবে না। দোজখীদের অবস্থাও তাই হবে।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে দৈর্ঘ্যে ষাট হাত হবে এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য তাকে দান করা হবে এবং হযরত ঈসা (রা.)-এর বয়সের সমান তথা তেত্রিশ বছর বয়স্ক হবে। আর তার ভাষা হবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ভাষা অর্থাৎ আরবি। নগ্ন দেহ এবং দাড়ি গোফহীন অবস্থায় থাকবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যাদের কথা বলা হলো, তারা সব ডানদিকের লোকদের জন্যেই থাকবে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ (٣٩) وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ (٤٠) তাদের এক বিরাট দল পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে থেকে আর পরবর্তীদেরও একটি থাকবে।

অর্থাৎ এ উম্মতের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে থেকে ডানদিকে এক বিরাট দল এবং পরবর্তীদেরও একটি দল থাকবে। আবুল আলীয়া, মুজাহিদ, আতা ইবনে আবীরাবাহ এবং যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আল্লামা বগভী (র.) সাঈদ ইবনে জোবায়েরের (র.) সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় দলই আমার উম্মত থেকে হবে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত মুআবিয়া (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এমন একদল লোক থাকবে, যারা আল্লাহপাকের হুকুমের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা তাদের সাহায্য করবে না এবং যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এমন অবস্থায় আল্লাহপাকের হুকুম এসে পড়বে অর্থাৎ কেয়ামত কায়েম হবে।

উম্মতে মোহাম্মদিয়ার বিশেষ মর্যাদা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেভাবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তাঁকে নবুয়তের আকাশের সূর্য (সিরাজুম মুনীরা) বলে ঘোষণা করেছেন এবং হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পূর্বে তিনি নবী ছিলেন বলে তিনি নিজেও ঘোষণা করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে হুজুর ﷺ -এর উম্মতকেও সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং সর্বোত্তম উম্মত বলে ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ তোমরা হলে উত্তম, মানবজাতির উপকারার্থেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে। ভালো কাজের নির্দেশ দেবে, আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহপাকের প্রতি ঈমান আনবে।

আলোচ্য সূরার শুরুতে যখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ [পূর্ববর্তীদের একদল এবং পরবর্তীদের কিছু সংখ্যক লোক] নাজিল হয়, তখন হযরত ওমর (রা.) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু ﷺ পূর্ববর্তী উম্মত থেকে অনেক লোক জান্নাতগামীদের মধ্যে অগ্রবর্তী হবে, আর এ উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক হবে, এর কিছুদিন পর আলোচ্য আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ নাজিল হয়, তখন হুজুর ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে ডাক দিয়ে বললেন, আল্লাহপাকের ইরশাদ শ্রবণ কর, হযরত আদম (আ.) থেকে এ পর্যন্ত এক দল, আর শুধু আমার উম্মতই এক দল। এ উচ্চ মর্যাদাই এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য আল্লামা আলুসী (র.), ইমাম কুরতবী (র.) এবং হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের আরো একটি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اَوَّلِيْنَ শব্দ দ্বারা এ উম্মতের প্রথমাংশকে বুঝানো হয়েছে, আর اٰخِرِيْنَ শব্দ দ্বারা শেষ অংশকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মত পোষণ করতেন।

তাফসীরে ইবনে হাতেমে রয়েছে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন, আমার সম্মুখে পূর্ববর্তী নবীগণকে তাদের উম্মতসহ পেশ করা হয়, নবীগণ গমন করছিলেন এবং তাঁদের উম্মতও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন, কোনো নবীর সঙ্গে মাত্র তিনজন লোক ছিলেন, হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ.) যখন গমন করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে বনি ইসরাঈলের এক বিরাট দল ছিল, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ! আমার উম্মত কোথায়? আল্লাহপাক ইরশাদ করলেন, নিজের ডানে নিচের দিকে লক্ষ্য কর, আমি দেখলাম এক বিরাট দল রয়েছে, এবং মানুষের চেহারা চমকাচ্ছিল, তখন আল্লাহপাক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তো খুশি হয়েছ? আমি আরজ করলাম, জী-হ্যাঁ, হে পরওয়ারদেগার! এরপর আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, এবার নিজের বাম দিকে লক্ষ্য কর, আমি দেখলাম সেখানেও অগণিত লোক রয়েছে। এরপর আল্লাহপাক ইরশাদ করলেন, এখন তো রাজি হয়েছ? আমি আরজ করলাম, হে পরওয়ারদেগার! আমি রাজি। এরপর আল্লাহপাক ইরশাদ করেন আরো শ্রবণ করে হযরত উক্কাশা (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন, তিনি কবীলায়ে বনূ আসাদের মোহসেন নামক ব্যক্তির পুত্র ছিলেন, তিনি বদরের যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোয়া করুন, যেন আল্লাহপাক বিনা হিসাবে জান্নাতগামীদের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্যে দোয়া করলেন। এরপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী! আমার জন্যেও দোয়া করুন। তখন তিনি ইরশাদ কররেন, উক্কাশা (রা.) তোমার পূর্বেই সুযোগ গ্রহণ করে ফেলেছে। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, হে লোক সকল! যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর। যদি তা না হয় তবে অন্ততঃ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ বা ডান দিকের দলে শামিল হও, আর যদি তা-ও না হয় তবে অন্ততঃ যারা এর প্রান্তে থাকবে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হও।

.... وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ ডান দিকের লোকদের জন্যে জান্নাতে যেসব নিয়ামত রয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে, আর এ আয়াত থেকে যারা ভাগ্যহত, বদনসীব, যারা কাফের, মুশরিক ও পাপিষ্ঠ, যারা বাম দিকের দলে থাকবে, তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ (٤١) فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ (٤٢) وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ (٤٣) لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ (٤٤)

আর বাম দিকের দল, কত ভাগ্যহত বাম দিকের লোকেরা। তারা থাকবে উত্তপ্ত বাতাস এবং ফুটন্ত পানিতে। তারা থাকবে ধোঁয়াচ্ছন্ন ছায়ায়। যা ঠাণ্ডা ও হবে না এবং আরামদায়কও হবে না। তাদের সুখও থাকবে না, শান্তিও থাকবে না, আর থাকবেনা তাদের মান সম্মান। অপমান এবং লাঞ্ছনা-গাঞ্জনা হবে তাদের জীবনসাথি। দুঃখ-দুর্দশায়, বিপদাপদে তারা থাকবে জর্জরিত, এর কারণ এই যে, তারা দুনিয়ার জীবনে ছিল আনন্দ উল্লাসে মত্ত, অন্যায় অনাচারে লিপ্ত, কুফরি ও

নাফরমানিতে ব্যস্ত, আল্লাহপাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ, দম্ভ ও অহংকার ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য, তারা ছিল আত্মাবিস্মৃত, তারা বিস্মৃত হয়েছিল তাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে। শিরক ও কুফরকে তারা কল্যাণের পথ মনে করেছিল, পাপাচারে লিপ্ত হয়ে তারা জেদ বজায় রেখেছিল, তাই ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ (٤٥) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (٤٦)

ইতঃপূর্বে তারা (অর্থাৎ দুনিয়াতে) ভোগ বিলাসে মত্ত থাকত এবং তারা গুরুতর পাপকার্যে লিপ্ত থাকতো এবং জেদ করতো।

الْحِنْثِ الْعَظِيمِ অর্থাৎ অত্যন্ত বড় অপরাধ যেমন শিরক। ইমাম শা'বী (র.) বলেছেন, এটি হলো জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করা, কেননা কাফেররা মিথা শপথ করে বলতো যে, তাদেরকে পুনর্জীবন দেওয়া হবে না, তাদের পুনরুত্থান হবে না।

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٤٧) أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (٤٨)

আর তারা বলতো, আমরা যখন মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাব, অস্থি কঙ্কালে পরিণত হওয়ার পরও কি আবার জীবিত হবো? আমাদের কি পুনরুত্থান হবে? আমাদের পূর্বপুরুষদেরও কি একই অবস্থা? তা কি সম্ভব? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الْحِنْثِ الْعَظِيمِ শব্দটি দ্বারা কুফর ও শিরককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর আল্লাহপাক কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন– إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ নিশ্চয় আল্লাহপাক তাঁর সঙ্গে শিরক করাকে মাফ করবেন না, এতদ্ব্যতীত অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি মাফ করতেও পারেন।

বস্তুত কাফেররা শুধু যে দুনিয়ার জীবনে ভোগ বিলাসে মত্ত এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিল তাই নয়; বরং তারা আখেরাতেরও বিশ্বাস করতো না। কেয়ামতকে অস্বীকার করতো এবং তারা বিদ্রূপ করে বলতো, আমরা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হবো, চিরতরে মাটির সঙ্গে মিশে যাব, এরপর কি আবার জীবিত হবো? তা কি করে সম্ভব? তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহপাক তাদের এ ভ্রান্ত মতের জবাবে ইরশাদ করেছেন–

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (٤٩) لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (٥٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (٥١)

[হে রাসূল!] আপনি ঘোষণা করুন, পূর্ববর্তীদের এবং পরবর্তীদের সকলকে এক নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে একত্র করা হবে। এরপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! [তোমাদের ভয়াবহ পরিণতির জন্যে তথা দোজখের শাস্তির জন্যে অপেক্ষা কর]।

এ আয়াতে আল্লাহপাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন যে, হে রাসূল! আপনি জানিয়ে দিন যে, তোমাদের সকলকে অবশেষে একদিন তথা কিয়ামতের দিন একত্র করা হবে, তোমাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ কিয়ামতের কঠিন দিন সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন দোজখ থেকে একটি গর্দান বের হবে, তার দু'টি চক্ষু এবং দুটি কানও থাকবে, এর দ্বারা সে দেখবে শুনবে। তার একটি রসনা থাকবে তার দ্বারা সে কথা বলবে। সে বলবে, আমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তিন প্রকার লোকের উপর (১) প্রত্যেক অবাধ্য এবং একগুয়ে লোকের উপর, (২) যে ব্যক্তি আল্লাহপাকের সাথে অন্য কিছুকে শরিক করে আল্লাহপাক ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করে, (৩) যে ছবি প্রস্তুত করে। তিরমিযী শরীফে এ হাদীস সংকলিত হয়েছে।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন কিয়ামতের দিন এমন এক দোজখী ব্যক্তিকে একবার দোজখে ডুবিয়ে আনা হবে, যে দুনিয়ার জীবনে সর্বাধিক ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল, এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম সন্তান। তুমি কি কখনো ভোগ বিলাস করেছো? কখনো কি তুমি সুখ-শান্তি ভোগ করার সুযোগ পেয়েছ? তখন সে বলবে, আল্লাহপাকের শপথ কখনো না [অর্থাৎ অল্পক্ষণ দোজখে কঠোর শাস্তি দেখার পর অবস্থা এমন হবে যে, সে ব্যক্তি সারা জীবনের ভোগ বিলাসকে এক মুহূর্তে ভুলে যাবে]।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন এমন একজন জান্নাতী ব্যক্তিকে জান্নাতে ডুবিয়ে আনা হবে যে দুনিয়াতে সর্বাধিক কষ্টে ছিল, এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো দুঃখ কষ্ট দেখেছ? সে বলবে, আল্লাহপাকের শপথ, আমি কখনো কোনো রকম দুঃখ কষ্ট দেখিনি [অর্থাৎ ক্ষণিকের জন্যে জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করার পর সে দুনিয়ার জীবনের সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যাবে]

মূলত আলোচ্য আয়াতসমূহে দোজখের কঠিন শাস্তির কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে দোজখের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যাতে করে মানুষ পরিণামদর্শী হয়, এবং পরকালীন জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا

তারা দোজখে গরম পানি এবং পুঁজ ব্যতীত কোনো পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করবে না।

আরো ইরশাদ হয়েছে– يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ

'তাদের মাথায় উত্তপ্ত পানি ঢালা হবে, পরিণামে তাদের উদরের সবকিছু এবং চামড়াসমূহ গলে বের হয়ে যাবে।

এমনি আরো বহু আয়াতে দোজখের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে (আল্লাহপাক আমাদেরকে রক্ষা করুন)!

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ ....

পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ [হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা!]

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে, তবে অধিকাংশ তাফসীরকারগণের মতে, পৃথিবীর সকল পথভ্রষ্ট মিথ্যা আরোপকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যারা মহাপাপে তথা শিরকে লিপ্ত থাকে, তারা আল্লাহপাকের পথ থেকে দূরে সরে পড়ে।

দ্বিতীয়ত তারা আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে অবিশ্বাস করেছে, তাঁর মহান বাণীকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে এবং তাঁর অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

তৃতীয়ত তারা পরকালীন জীবনকেও মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তারা বলে আমরা যখন মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যাব, তখনও কি আবার জীবিত হবো? হে পথভ্রষ্ট মিথ্যা আরোপকারীর দল বলে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করে ইরশাদ হয়েছে–

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ (٥٢) তোমরা অবশ্যই যাক্কুম বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করবে।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, যাক্কুম এমনি একটি বস্তু যা অত্যন্ত তিক্ত, অত্যধিক গরম এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময়, আর দেখতে অতীব কুৎসিত, যাকে খেতে দেওয়া হয় সে তা গিলতে পারবে না।

আর এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ

অর্থাৎ নিশ্চয় যাক্কুম একটি বৃক্ষ, যা দোজখের তলদেশ থেকে উৎপন্ন হয়, তার ফল যেন সাপের ফনা।

فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ (٥٣)

অর্থাৎ জঠর-জ্বালায় তোমরা যাক্কুম বৃক্ষের অত্যন্ত দুগর্ন্ধময় বিস্বাদ ফল দ্বারা তোমাদের উদর পূর্ণ করবে।

فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ (٥٤) فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ (٥٥)

তদুপরি তোমরা পান করবে ফুটন্ত পানি, পান করবে তোমরা তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রীর ন্যায়।

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ (٥٦)

আর এই হবে কেয়ামতের দিন তোমাদের আপ্যায়ন।

نُزُلٌ শব্দটির অর্থ হলো আপ্যায়ন। তাফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ করেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। শাস্তির সুসংবাদ হয় না কিন্তু বিদ্রূপার্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ (٥٧)

নিশ্চয় আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবু কেন তোমরা বিশ্বাস কর না?

অর্থাৎ প্রথমবার আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এ কথাতো তোমরা স্বীকার কর, আমিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবো, এ কথা তোমরা কেন মান না?

কিয়ামতকে যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে লা-জবাব করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন– যখন তোমাদের অস্তিত্ব ছিল না, তখন আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। এখন মৃত্যুর পর তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ হবে? যেমন কুরআনে কারীমের অন্যত্র আল্লাহপাক কথাটিকে এভাবে ইরশাদ করেছেন– وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ.

আল্লাহপাকই প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করবেন। আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অতি সহজ।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আল্লাহপাকই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তাঁর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাকে তোমরা কেন অস্বীকার কর? অথচ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আদৌ কঠিন নয়।

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ (٨٥) ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَٰلِقُونَ (٩٥)

তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? তোমরা কি তা সৃষ্টি কর? নাকি আমি সৃষ্টি করি?। অর্থাৎ মানুষ যদি তার সৃষ্টির ইতিকথা সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে, তবে আল্লাহপাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে থাকতে পার না, আল্লাহপাকের অগণিত দানকে অস্বীকার করতে পারে না, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক জিজ্ঞাসা করেছেন হে আত্মবিস্মৃত মানবজাতি! যে শুক্রবিন্দু দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়, তা কি তোমাদের তৈরি? আর মাতৃউদরে মানুষকে কি তোমরা সৃষ্টি কর? একটি শুক্রবিন্দু থেকে এমন সুন্দর উত্তম আকৃতিতে কে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন? তিনি আল্লাহপাক, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন, আর তিনিই মাতৃউদরে তোমাদেরকে লালন পালন করেন।

যাহোক, এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আল্লাহপাকই মানবজাতিকে সৃষ্টি করেন, কিন্তু তিনি কি তোমাদেরকে চির দিনের জন্যে পৃথিবীতে রেখে দেবেন? অবশ্যই নয়। মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়, এরপর পুনরায় আল্লাহ মানবজাতিকে কিয়ামতের দিন হাজির করবেন। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٢٠) عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢١)

অর্থ– আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যু স্থির করে রেখেছি, এ বিষয়ে আমি অক্ষম নই। তোমাদের স্থলে তোমাদের ন্যায় অন্যকে আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতি দান করতে, যে সম্পর্কে তোমরা অবগত নও।

অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি, কারো বয়স বেশি, কারো কম কিন্তু প্রত্যেকের সময় নির্দিষ্ট রয়েছে, তাতে কোনো পরিবর্তন হয় না, হবে না, আর আল্লাহপাক তোমাদের স্থলে অন্যকে আনয়ন করতে অক্ষম নন, তাই অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

অর্থাৎ যদি আল্লাহপাক ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে বিদায় করে নতুন জাতি আনয়ন করেন।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (٢٦)

'আর নিশ্চয় তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত হয়েছ, তবুও কেন সত্য অনুধাবন কর না?

বস্তুত পৃথিবীতে মানুষের আগমন, অবস্থান এবং পৃথিবী থেকে প্রস্তান সব কিছুই এক আল্লাহপাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই হয়, মানুষের ইচ্ছা এর কোনো পর্যায়েই কার্যকর হয় না। এ সত্য প্রতিনিয়ত দেখা যায়, অতএব প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহপাকের মহান দরবারে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা। আর এ কথা বিশ্বাস করা যে, অবশেষে পুনরায় আল্লাহপাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আদৌ কঠিন কিছুই নয়।

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ (٦٣) ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّٰرِعُونَ (٦٤) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٦٥) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (٦٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٢٧)

'লক্ষ্য কর, তোমরা যা বপন করে থাক, সে সম্পর্কে তোমরা কি কিছু ভেবেছে? তোমরা কি তা অঙ্কুরিত কর, নাকি আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটোয় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে, তোমরা তখন বলবে, আমাদের তো সর্বনাশ হয়ে গেল, আমরা রিজিক থেকে মাহরূম হয়ে গেলাম।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষকে তার সৃষ্টি-রহস্যের উপর চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহপাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের তা'লীম দেওয়া হয়েছে।

আর এ আয়াতসমূহে মানুষের খাদ্য-দ্রব্যের ব্যাপারে তার অক্ষমতা বর্ণনা করে এ সত্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহপাক দয়া করে মানুষকে রিজিক দান না করেন, সে ক্ষেত্রে মানুষ শত চেষ্টা করেও রিজিক অর্জনে ব্যর্থ হবে, তাই ইরশাদ হয়েছে– أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ 'তোমরা যা বপন করে থাক, সে সম্পর্কে তোমরা কি ভেবে দেখেছ? বীজ বপন পর্যন্তই তোমাদের কাজ শেষ, এরপর তোমাদের কি কোনো ক্ষমতা থাকে? মাটির বুক চিরে নরম মসৃণ চারা গাছটি কি

তোমরা বের কর? ফসল কি তোমরা উৎপন্ন কর? নাকি আল্লাহপাক তা উৎপন্ন করেন? অবশ্যই আল্লাহপাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই ফসলাদি উৎপন্ন হয়, তাঁর হুকুমে বৃষ্টিপাত হয়, তোমরা জমিনে বীজ বপন কর, এরপর আল্লাহপাকের নির্দেশেই জমিন তা গ্রহণ করে। যদি তোমাদের বপন করা বীজ জমিন থেকে ফেরত নিতে চাও, তবে অবশ্যই ব্যর্থ হবে, কেননা জমিন আল্লাহপাকের সম্পূর্ণ অনুগত, তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করা জমিনের পক্ষে সম্ভব নয়।

জমিনে বীজ বপন করার পর আল্লাহপাকের নির্দেশে সূর্যের আলোক রশ্মি তাতে তাপ পৌঁছায়, এরপর বাতাস এবং মৌসুমের উষ্ণতা আল্লাহপাকের আদেশেই একটি সামঞ্জস্য বিধান করে। পানির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাতে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করে, আর তা এক আল্লাহর নির্দেশক্রমেই করে থাকে, এসব একটি বিশেষ ওজন, আন্দাজ এবং নিয়মনীতি মাফিক হওয়া ফসল উৎপাদনের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। কথা এখানেই শেষ নয়; বরং বীজ গলে মাটির সাথে মিশে যাওয়া এবং চারার রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করা, এরপর ক্রমশঃ তা বেড়ে উঠা এবং ডালা মেলা, অবশেষে ফলমূলের সৃষ্টি হওয়া, সবকিছুই মহান আল্লাহপাকের কুদরত হেকমত এবং মর্জিতেই হয়ে থাকে। জমিনের জন্যে আল্লাহপাকের নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি রয়েছে, এ নিয়ম-নীতির বরখেলাফ করা জমিনের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়।

অতএব, ফল এবং ফসল উৎপন্ন করা এক আল্লাহপাকেরই কাজ, আর বান্দার কাজ হলো আল্লাহপাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং নিয়ামতের ব্যবহারবিধি মেনে চলে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা।

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ

'আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটোয় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।'

অর্থাৎ ফল-ফসল উৎপন্ন করার পর আমি তা ধ্বংসও করে দিতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ - بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ : তখন তোমরা বলবে, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল, আমরা যা কিছু ব্যয় করেছি, সবই শেষ হয়ে গেছে। مُغْرَمٌ সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যার অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়।

এ ব্যাখ্যা করেছেন তাফসীরকার যাহহাক (র.) এবং ইবনে কিসান (র.)। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং কাতাদা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো আমরা আজাবে গ্রেফতার হয়ে গেছি। আমরা আমাদের রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়েছি, এখন জঠর জ্বালায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي .... : পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষের খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা করার আহবান জানানো হয়েছে, যাতে করে এ সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, এ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব যেমন আল্লাহপাকের দান, তেমনিভাবে মানুষের খাদ্যও তাঁর দান ব্যতীত আর কিছুই নয়, খাদ্যের জন্যে মানুষ বীজ বপন করতে পারে, কিন্তু খাদ্য উৎপন্ন করার ক্ষমতা মানুষের নেই। সে ক্ষমতা হলো একমাত্র আল্লাহপাকের, অতএব মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহপাকের দানের কথা উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।

আর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে খাদ্যের ন্যায় পানিও আল্লাহপাকের বিশেষ দান। এ ব্যাপারেও মানুষের অক্ষমতা সুস্পষ্ট। পানির অপর নাম প্রাণ, পানি না থাকলে মানুষের জীবনযাত্রা অচল, পিপাসায় কাতর মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

আধুনিক যুগে যাবতীয় উন্নতি অগ্রগতি মূলতঃ বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু বিদ্যুৎ তৈরি হয় পানির বদৌলতে। হে আত্মবিস্মৃত মানবজাতি! পানি কি মানুষ তৈরি করতে পারে? পানি কি মানুষ বর্ষণ করে? না কখনও নয়, মেঘমালা থেকে আল্লাহপাকই পানি বর্ষণ করেন। তাই ইরশাদ হয়েছে –

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٢٨) ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (٢٩)

'তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা কি ভেবে দেখেছ? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, নাকি আমি তা বর্ষণ করি?

বস্তুত আল্লাহপাক ইচ্ছা করলে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিতে পারেন এবং সারা পৃথিবীকে শুকিয়ে দিতে পারেন। কখনও কখনও এমন অবস্থা হয়েছেও, এজন্যে ইসলামি শরিয়তে এস্তেস্কার নামাজের বিধান রয়েছে, অর্থাৎ পানি চেয়ে আল্লাহপাকের দরবারে দু'রাকাত নামাজ পড়ে কান্নাকাটি করা। কেননা আল্লাহপাক দয়া করে পানি না দিলে তা কেউ দিতে পারে না, শুধু তাই নয়; যদি আল্লাহপাক পানিকে লবণাক্ত করে দিতে ইচ্ছে করেন, অর্থাৎ পানিকে পানের অযোগ্য করে দেন, তবু কারো কিছুই করার নেই। তাই ইরশাদ হয়েছে–

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ (٧٠) 'আমি ইচ্ছা করলে এ পানিকে লবণাক্ত করে দিতে পারি, তবুও কেন তোমরা শোকরগুজার হও না।'

অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্ব, খাদ্য ও পানীয় সবই আল্লাহপাকের দান, তাই মহান আল্লাহপাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ (٧١) ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ (٧٢)

'তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত করে থাক, সে সম্পর্কে কি ভেবে দেখেছো? তোমরাই কি ঐ অগ্নির বৃক্ষ সৃষ্টি কর, নাকি আমিই তা সৃষ্টি করি।'

খাদ্য ও পানীয়ের পর আলোচ্য আয়াতে অগ্নির উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা মানুষের জীবন ধারণে অগ্নির প্রয়োজনীয়তা প্রতি মুহূর্তে হয়ে থাকে, প্রশ্ন হলো অগ্নি কার দান? তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক জিজ্ঞাসা করেছেন, ভেবে দেখেছ, হে মানবজাতি! কে সৃষ্টি করেছেন, অগ্নির বৃক্ষ? উত্তর একটিই যে, আল্লাহপাকই সৃষ্টি করেছেন অগ্নি। তিনিই মানুষের সকল প্রয়োজনের আয়োজন করেছেন। তাঁর দান ব্যতীত মানুষের কাছে কিছুই নেই। অতএব, এসব দানের জন্যে আল্লাহপাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের কর্তব্য।

نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ (٧٣) 'আমিই অগ্নিকে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তু। বস্তুত যারা পথচারী, মরুচারী অন্ধকারে আলো প্রজ্বলিত থাকলে তাদের পথ চলার সহায়ক হয়, এভাবে তারা জীবনের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার এ অগ্নি দোজখের অগ্নির একটি নমুনা। দুনিয়ার অগ্নির প্রতি লক্ষ্য করে দোজখের অগ্নির কথা মনে করা এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে দুনিয়ার এ অগ্নি উপদেশ হিসেবেও কাজ করে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন তোমাদের এ অগ্নি দোজখের অগ্নির সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। তখন আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ পোড়ানোর জন্যে এ অগ্নিইতো যথেষ্ট। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, দোজখের অগ্নি এ অগ্নি থেকে উনসত্তর (৬৯) গুণ বেশি, দোজখের অগ্নির সামান্যতম অংশ এই অগ্নির সমান। -[বোখারী ও মুসলিম]

وَ مَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ

مُقْوِيْنَ শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে, পথিক, মুসাফির অর্থাৎ যারা মরুচারী তারা এ অগ্নির সাহায্যে পথ দেখে। দ্বিতীয়ত হিংস্র জন্তু থেকে পথিক মুসাফিরকে আত্মরক্ষা করতে অগ্নি সহায়ক হয়। এতদ্ব্যতীত তুহিন শীতের সময় শীতের কষ্ট দূরীভূত করার জন্যে অগ্নির ব্যবহার হয়, তাই পথিক মুসাফিরের জন্যে অগ্নি উপকারী হয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

তাফসীকার মুজাহিদ ও ইকরিমা (র.) এ শব্দটির ব্যাখ্যা বলেছেন, এর অর্থ হলো উপকার গ্রহণকারী, অর্থাৎ পথিক মুসাফির হোক, বা বাড়ি ঘরে অবস্থানকারী হোক, যে কোনো ব্যক্তির জন্যে অগ্নি হয় উপকারী। তাফসীরকার ইবনে জায়েদ (র.) বলেছেন, مُقْوِيْنَ শব্দটির অর্থ হলো ক্ষুধার্ত অর্থাৎ যে ক্ষুধার্ত তার জন্যে অগ্নি উপকারী হয়, কেননা খাদ্য প্রস্তুত করতে অগ্নির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অতএব অগ্নি মানবজীবনের জন্যে শুধু উপকারীই নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও বটে, আর আল্লাহপাকের দান স্বরূপই মানুষ পেয়েছে এ উপকারী ও প্রয়োজনীয় বস্তুটি।

মানুষের কর্তব্য : অতএব মানুষের কর্তব্য হলো, আল্লাহপাকের পবিত্র নাম স্মরণ করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা।

তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (٧٤) অতএব [হে রাসূল!] আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন।

অর্থাৎ যখন তোমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারলে যে, মানুষের এ জীবন, তার খাদ্য ও পানীয় এবং যাবতীয় প্রয়োজনের আয়োজন এক আল্লাহপাকের তরফ থেকেই হয়, তখন মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহপাকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

দ্বিতীয়ত যারা আল্লাহপাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করে না, অহরহ তাঁর অনন্ত অসীম নিয়ামত ভোগ করেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, তাদের এ অন্যায় আচরণ নিতান্ত নিন্দনীয়। অতএব, তোমরা আল্লাহপাকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাক। অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহপাকের নিয়ামতসমূহের জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করতে থাক।

আল্লাহপাকের শোকরগুজার হও : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করুণাময় আল্লাহপাক তোমাদেরকে দান করেছেন তোমাদের জীবন, তোমাদের খাদ্য-দ্রব্য, পানীয় এক কথায় সবকিছু। অতএব তোমরা সর্বক্ষণ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাক এবং তার শোকরগুজার হও। দুনিয়াতে যেভাবে আল্লাহপাকের নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে পার, যদি তোমরা তাঁর শোকর আদায় কর, তবে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতেও তোমরা জান্নাতের অসংখ্য নিয়ামত লাভে ধন্য হবে। আল্লাহপাক মানুষের উপকারার্থে অগ্নি সৃষ্টি করেছেন, আর এজন্যে যেন মানুষ দোজখের অগ্নি সম্পর্কে ধারণা করতে পারে, অতএব মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো, আল্লাহপাকের বিধি-নিষেধ পালন করা, যেন দোজখের অগ্নি থেকে নাজাত পাওয়া যায়।

ইমাম রাযী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহপাক তৌহিদ বিরোধী লোকদের অবস্থা বর্ণনা করার পর তৌহিদের দলিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন মানব জাতির সৃষ্টির কথা, তাঁর প্রদত্ত রিজিকের কথা, কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা ভাগ্যাহত, তারা আল্লাহপাকের প্রতি ঈমান আনেনি, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে রাসূল! আপনি আল্লাহপাকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন, তার তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন। কেননা আপনি আপনার প্রতিপালককে জানেন, এ কাফেররা জানে না। আর আপনার যাবতীয় কাজ আপনার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্যে, অতএব, আপনার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকুন।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ (٧٥) وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ.

'আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তগমনের, আর নিশ্চয় তা এক মহাশপথ! যদি তোমরা জানতে পার এবং সত্য উপলব্ধি কর। কোনো বক্তব্যের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করার উদ্দেশ্যে কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে শপথ করার প্রথা রয়েছে, আলোচ্য আয়াতেও শপথের উল্লেখ রয়েছে পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করার লক্ষ্যে।

ইরশাদ হয়েছে– فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের لَا অক্ষরটি বাড়তি, তাই এর অর্থ হলো, 'আমি শপথ করছি, নক্ষত্ররাজির অস্তগমনের আর এ শপথ অত্যন্ত বড় ব্যাপারে।'

আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন– لَا অক্ষরটি বাড়তি বলার প্রয়োজন নেই; বরং বাক্যটির অর্থ হলো, আমি শপথ করি না, কেননা যে কথা বলছি তা এত সুস্পষ্ট এবং সর্বজনবিদিত যে তার জন্যে শপথ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর সে বিষয়টি প্রকাশ করার জন্যে এ শপথের উল্লেখ রয়েছে, তা হলো সমগ্র মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের প্রতীক, তার আলোচনা পরবর্তী আয়াতেই রয়েছে। অনন্ত আকাশে অসংখ্য তারকারাজি রয়েছে, মহাকাশে আল্লাহপাকের অপূর্ব কলাকৌশলের বিস্ময়কর নিদর্শন হলো এ তারকারাজি। রাত্রিকালে তারকারাজির এ কলাকৌশল বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে রাখে, কখনও এর পরিবর্তন হয় না, কখনও এর মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না, ঠিক তেমনিভাবে যে মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের কথা তারকারাজির অস্তগমনের শপথ করে বলা হয়েছে, তাতেও কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয় না। পবিত্র কুরআন চিরন্তন সত্য, সর্বকালের মহাসত্য, যুগের আবর্তন-বিবর্তনে তাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন হয় না, তাই সকল যুগের মানুষের জন্যেই রয়েছে পবিত্র কুরআনে পরিপূর্ণ হেদায়েত ও সার্বিক কল্যাণ।

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ..............................

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহপাকের কুদরত হেকমত এবং তাঁর সৃষ্টির অনেক দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। আর এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহপাকই মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তার খাদ্য ও পানীয় এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু তিনিই সরবরাহ করেছেন, অতএব মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহপাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর নিয়ামতসমূহের জন্যে শোকরগুজার হওয়া। এ পর্যন্ত যত নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ছিল জাগতিক নিয়ামত। আর আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো স্বয়ং আল্লাহপাকের চিরন্তন মহান বাণী পবিত্র কুরআন। এ ঘোষণার পূর্বে আল্লাহপাক বিষয়টির উপর যথার্থ গুরুত্বারোপ করার লক্ষ্যে নক্ষত্রপুঞ্জের অস্তগমনের শপথ করে পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছেন। আর এ কথাও বলেছেন যে, তোমরা এ সত্য উপলব্ধি কর যে, নক্ষত্রপুঞ্জের গতি-প্রকৃতি, উদয় অস্তের ব্যবস্থা কত বিস্ময়কর এবং কত সুদৃঢ় যে, তাতে কখনো কোনো পার্থক্য বা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না, তাহলে তোমরা এ শপথের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে এবং যে পবিত্র কুরআনের সম্পর্কে এ শপথ করা হয়েছে, তার গুরুত্ব সম্পর্কেও কিছুটা আঁচ করতে পারবে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে ইরশাদ হয়েছে– اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ (٧٧) فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ (٧٨) 'নিশ্চয় কুরআনে কারীম অবশ্যই অত্যন্ত সম্মানিত গ্রন্থ যা লিখিত রয়েছে সুরক্ষিত কিতাবে [লওহে মাহফুজে]।'

এ মহান গ্রন্থের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য, সম্মান এবং মর্যাদা বর্ণনাতীত। যেহেতু এটি মহান আল্লাহপাকের চিরন্তন বাণী, তাই পৃথিবীতে এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই, যা আল্লাহপাকের দরবার থেকে তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে, মানবজাতির দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ এতে নিহিত রয়েছে। আর এ কুরআনে কারীম লওহে মাহফুজে রয়েছে সংরক্ষিত, যেভাবে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির উপর স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর মহান বাণীর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। এর বর্ণনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য অদ্বিতীয়, এতে কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না, অথচ সর্বকালের জন্যে পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা সমভাবে প্রযোজ্য।

(৭৯) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ 'পবিত্র কুরআন এমনি এক মহান গ্রন্থ, যা পবিত্র অবস্থা ব্যতীত স্পর্শ করা যায় না।

অজু ব্যতীত পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা যায় না : ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, অপবিত্র এবং অজুহীন অবস্থায় পবিত্র কুরআনের স্পর্শ করা যায় না, তবে গেলাফে আবৃত অবস্থায় থাকলে তার উপর স্পর্শ করা এবং বহন করা বৈধ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মত পোষণ করেছেন। তবে পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা ব্যতীত অজুহীন অবস্থায় তেলাওয়াত করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বর্ণনা করেন, আমি আমার খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনা (রা.)-এর গৃহে এক রাত অতিবাহিত করি। রাসূলে কারীম ﷺ ঐ রাতে সেই গৃহে ছিলেন। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর হুজুর ﷺ জাগ্রত হলেন এবং উঠে বসলেন তিনি তাঁর চেহারা মোবারককে তাঁর দস্ত মোবারক ফিরিয়ে নিদ্রার ভাব দূর করে দিলেন, এরপর তিনি সূরা আল ইমরানের দশটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন, এরপর তিনি দাঁড়িয়ে একটি ঝুলন্ত পানির মশক থেকে পানি নিয়ে অজু করলেন।

এ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, অজু ব্যতীত কুরআনের কারীমের আয়াত তেলাওয়াত করা বৈধ। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের مُطَهَّرُونَ শব্দটির অর্থ مُوَحِّدٌ অর্থাৎ যারা তৌহিদে বা আল্লাহপাকের একত্ববাদে বিশ্বাসী, তারা ব্যতীত কেউ পবিত্র কুরআন স্পর্শ করবে না। আর সুফী সাধকগণের মতে مُوَحِّدٌ শুধু সে ব্যক্তিকেই বলা হয়, যার জীবন-সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভ, এছাড়া আর কিছুই নয়। এ জন্যে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে পর্যন্ত কোনো লোকের আশা আকাঙ্ক্ষা আমার নিয়ে আসা দীনের অনুগত না হবে, সে পর্যন্ত সে প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না।

তাফসীরকার ইকরিমা (র.) বলেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে পবিত্র কুরআন পাঠের অনুমতি দিতে বাধা দিতেন। হাদীস শরীফে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ দুশমনের দেশে কুরআনে কারীম নিয়ে যেতে নিষেধ করেছিলেন। এ সমস্ত বর্ণনা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কুরআনে কারীমের আদব রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

ফাররা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, কুরআনে কারীমের স্বাদ সেই ব্যক্তিই পাবে, যে এর উপর ঈমান আনবে, আর এ বক্তব্যের সমর্থনে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) বলেছেন, নিজের কুপ্রবৃত্তিকে বিনাশ করা এবং চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কুরআনে কারীমের বরকত হাসিল করা সম্ভব নয়। কু-প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে মুক্ত করার পরই কুরআনে কারীমের মাধ্যমে আল্লাহপাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। দুনিয়া এবং আখেরাত, উভয় জাহানের জন্যেই এই নীতি প্রযোজ্য।

তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং নাসায়ী শরীফে সংকলিত এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– (বেহেশতে প্রবেশ করার সময়) বলা হবে, কুরআন পাঠ কর এবং উপরের দিকে যেতে থাক এবং ধীরে ধীরে কুরআন পাঠ কর, যেখানে পৌঁছার পর তোমার কুরআন পাঠ করা শেষ হবে, সেখানেই তোমার মঞ্জিল।

(৮০) تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'এই কিতাব বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

যিনি বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি সর্বশ্রোতা, যিনি সর্বজ্ঞাত, তাঁরই মহান চিরন্তন বাণী হলো পবিত্র কুরআন, যা তিনি নাজিল করেছেন বিশ্বনবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি, যা বিশ্ব মানবের কল্যাণার্থে আল্লাহপাক সংরক্ষণ করে রেখেছেন।

(৮১) أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ 'তবে কি তোমরা এ মহান বাণীকে সাধারণ কথা মনে করছে?

যে পবিত্র কুরআন এত সম্মানিত, এত মর্যাদাসম্পন্ন, তাকে কি তোমরা সাধারণ কথা মনে কর? কুরআনে কারীমের ন্যায় অমূল্য সম্পদের সাদর অভ্যর্থনার মাধ্যমেই মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ ঘটে, যারা পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা থেকে

বঞ্চিত বা এ সম্পর্কে যারা উদাসীন, তাদের চেয়ে অধিকতর দুর্ভাগ্য আর কারোরই নেই। কেননা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতি, অগ্রগতি নির্ভুল করে পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পর। তাই যারা পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তারা নিশ্চয় ভাগ্যবিড়ম্বিত, চির বঞ্চিত।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতে مُدْهِنُوْنَ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন, মিথ্যাজ্ঞানকারী। অর্থাৎ তোমরা কি পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষাকে মিথ্যাজ্ঞান কর? আর মোকাতেল ইবনে হাসান (র.) বলেছেন– مُدْهِنُوْنَ শব্দটির অর্থ হলো, পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষাকে অস্বীকারকারী। وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ (৮২) "আর এই অবিশ্বাস করাকে তোমাদের উপজীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করেছ?

কাফের মুশরিকদের কুরআন বিরোধী দৌরাত্ম্য দেখলে মনে হয় যে পবিত্র কুরআনের প্রচার প্রসারে বাধা দেওয়ার পবিত্র কুরআনকে মিথ্যা জ্ঞান করার এবং এর বিরোধিতাকে কাফেররা তাদের আহার্য বা উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে, পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধাচরণই যেন তাদের একমাত্র কাজ, আর এ কাজকে তারা তাদের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে।

فَلَوْلَاۤ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ (৮৩) وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ (৮৪)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক কাফের মুশরিকদের লক্ষ্য করে একটি প্রশ্ন করেছেন, যে তোমরা অসঙ্কোচে এবং নির্ভীক চিত্তে পবিত্র কুরআনকে মিথ্যা জ্ঞান করছ, তার বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করছ, তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা কারোই অধীন নও? তাহলে যখন কোনো লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তখন তোমরা অসহায় অবস্থায় তার দিকে চেয়ে থাক, তখন তোমরা থাক বড়ই অসহায় নিরুপায়। তার কোনো উপকারই তোমরা করতে পার না, তাকে মৃত্যুর হাত থেকে কোনোভাবেই রক্ষা করতে পার না।

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ (৮৫)

অথচ আমি তোমাদের চেয়ে মৃত্যুপথের ঐ যাত্রীর অনেক বেশি নিকটবর্তী থাকি, তার সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে আমিই সর্বাধিক অবগত থাকি, আর তোমরা তা দেখতেও পাও না।

فَلَوْلَاۤ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ (৮৬) تَرْجِعُوْنَهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (৮৭)

'যদি তোমরা কারো কর্তৃত্বাধীন না হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা ঐ প্রাণকে ফিরিয়ে দাও না, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। অর্থাৎ যদি তোমরা কারো অধীন না হও, যদি তোমরা পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস না কর এবং কিয়ামতের ময়দানে তোমাদেরকে হাজির করা হবে– এ কথায়ও বিশ্বাস না হয়, তবে এই প্রাণকে তোমরা কেন যেতে দিলে? যদি তোমাদের শক্তি থাকতো, তবে তোমরা কণ্ঠাগত প্রাণকে স্ব-স্থানে ফিরিয়ে দিতে এবং মৃত্যুপথের যাত্রী পৃথিবী থেকে বিদায় হতো না; বরং তার বাড়ি ঘরেই ফিরে আসতো, কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা কখনও সম্ভব হবে না, অতএব মনে রেখ যিনি তোমাদের দেহে প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন, আর তিনিই তোমাদের পুনর্জীবন দান করে হাশরের ময়দানে একত্র করবেন। অতএব, পরকালীন জীবন সম্পর্কে উদাসীন থাকা বোকামি ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে অমার্জনীয় অপরাধ। যে এ পৃথিবীতে আগমন করে থাকে অবশ্যই তাকে এ পৃথিবী থেকে গমনও করতেই হবে, যিনি জীবন দান করেছেন, তিনিই জীবনের অবসান ঘটাবেন, আর তিনিই কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সকলকে একত্র করবেন, এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। কেয়ামতের ময়দানে হাজির হওয়ার পর কি অবস্থা হবে, তা ঘোষণা করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে–

فَاَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (৮৮) فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ (৮৯)

"অতঃপর যদি মৃত ব্যক্তি আল্লাহপাকের নৈকট্য ধন্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার জন্যে রয়েছে শান্তি, উত্তম জীবিকা এবং রয়েছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত।"

এ জীবনের পর কি হবে : এ সূরার শুরুতে সমগ্র মানবজাতিকে তিনভাগে বিভক্ত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে–

১. সেসব লোক যারা আল্লাহপাকের নৈকট্য ধন্য।

২. আসহাবুল ইয়ামীন তথা ডান দিকে অবস্থানকারীগণ।

৩. বাম দিকে অবস্থানকারীগণ।

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লেখিত এই তিন শ্রেণির পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে।

১. যারা আল্লাহপাকের নৈকট্য ধন্য হতে তাদের জন্যে চিরসুখ, চিরশান্তি, চির আনন্দ চির, আরাম, পবিত্র রিজিক এবং জান্নাতের অসংখ্য নিয়ামত রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের رَوْحٌ শব্দটির অর্থ– আনন্দ এবং আরাম। এ ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহিদ (র.) এবং সাঈদ ইবনে যুবায়ের (র.) আর যাহহাক (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো মাগফেরাত এবং রহমত। আলোচ্য আয়াতের رَيْحَانٌ শব্দটির অর্থ হলো পবিত্র রিজিক। এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত মুজাহিদ (রা.), হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা.) এবং হযরত মোকাতেল (র.)।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ লিখেছেন, রায়হান এমনি একটি সুগন্ধি যার ঘ্রাণ নেওয়া হয়।

তাফসীরকার আবূ ইয়ালা (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহপাকের নৈকট্য ধন্য হয় সে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বে জান্নাতের সুগন্ধ পায়, এরপর তার রূহ কবজ করা হয়।

হযরত আবূ বকর ওয়াররাক (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের رَوْحٌ শব্দটির অর্থ হলো দোজখ থেকে জান্নাত লাভ করা, আর رَيْحَانٌ শব্দটি দ্বারা চিরশান্তির কেন্দ্র বেহেশতে প্রবেশ করাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ (٩٠) فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ (٩١)

২. আর যদি সে ডান দিকের একজন হয় [তবে তাকে বলা হবে] তোমার জন্যে রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, বাক্যটির অর্থ হলো হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার উম্মতের ডানদিকের লোকদের সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তাদের সম্পর্কে আদৌ কোনো চিন্তা করবেন না, তারা আল্লাহপাকের আজাব থেকে নিরাপদ রয়েছে। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হবেন।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, আল্লাহপাক ডান দিকে অবস্থানকারী লোকদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন এবং তাদের নেক আমলসমূহ কবুল করবেন।

ফাররা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো হে মুহাম্মদ ﷺ ডান দিকের লোকদের পক্ষ থেকে সালাম গ্রহণ করুন। অথবা এর অর্থ হলো, ডান দিকের লোকদের বলা হবে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ (٩٢) فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ (٩٣) وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ (٩٤)

৩. আর যদি মৃত ব্যক্তি অবিশ্বাসী পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তাকে ফুটন্ত পানি দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে এবং তাকে দোজখে প্রবেশ করতে হবে। যারা বেঈমান, পথভ্রষ্ট, দুরাত্মা, তাদের শাস্তি অবধারিত; ফুটন্ত পানি এবং দোজখের ভয়ঙ্কর শাস্তিই তাদের পরিণতি।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (٩٦)

নিশ্চয় এ সিদ্ধান্ত ধ্রুব সত্য, অতএব, [হে রাসূল!] আপনার মহা মহিমান্বিত প্রতিপালকের মোবারক নামের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন, অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের স্মরণে তন্ময় থাকুন, তাঁর আদেশ মোতাবেক নামাজ আদায় করুন, তাঁর পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

وَقَعَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْوُقُوْعُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ع) জিনস مثال واوى অর্থ– সংঘটিত হবে।

خَافِضَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার خَفْضٌ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– অবনত করবে। অবনতকারী।

مَوْضُوْنَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার وَضْنٌ মূলবর্ণ (و ـ ض ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– স্বর্ণের তার দ্বারা বুনানো।

مَعِيْنٌ : একবচন : বহুবচনে مُعُنٌ – مُعُنَاتٌ বাব فَتَحَ মাসদার مَعْنٌ মূলবর্ণ (م ـ ع ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত পানি, জান্নাতের শরাব, যা চোখের সামনে প্রবাহিত হবে, খাঁটি মদ, বিশুদ্ধ শরাব, স্বচ্ছ সুরা।

فَاكِهَةٌ : একবচন; বহুবচনে فَوَاكِهُ. فَاكِهَاتٌ অর্থ- ফল।

لَحْمٌ : একবচন; বহুবচনে لُحُوْمٌ অর্থ- গোশত, মাংস।

طَيْرٌ : একবচন; বহুবচনে طُيُوْرٌ অর্থ- পাখি।

يَشْتَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِهَاءُ মূলবর্ণ (ش - ه - ى) জিনস ناقص يائ অর্থ- তাদের রুচিসম্মত হবে, মন:পুত হবে।

مَكْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার كَنٌّ মূলবর্ণ (ك - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– লুক্কায়িত।

اَبْكَارٌ : বহুবচন; একবচনে بَكْرٌ অর্থ– অবিবাহিতা, নারী, কুমারী, বালিকা, কন্যা, প্রথম, নতুন, জ্যেষ্ঠ সন্তান।

اَتْرَابٌ : বহুবচন; এক বচনের تِرْبٌ অর্থ– সমবয়স্কা, সঙ্গী, বন্ধু সমকক্ষ।

مُتْرَفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتْرَافٌ মূলবর্ণ (ت - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– সুখ-সম্পদ মগ্ন; আরাম ও ভোগ বিলাসে জীবন-যাপনকারী।

مَالِئُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার مَلْاءٌ মূলবর্ণ (م - ل - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– ভরা।

تُمْنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْنَاءٌ মূলবর্ণ (م - ن - ى) জিনস .... অর্থ– বীর্যপাত করে শুক্রবিন্দু পৌঁছিয়ে থাকো।

مُغْرَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِغْرَامٌ মূলবর্ণ (غ - ر - م) জিনস صحيح অর্থ– খেসারত, জরিমানা নেওয়া, লোভী হওয়া, ধ্বংস করা।

مَدِيْنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلدِّيْنُ মূলবর্ণ (د - ي - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– হিসাব-নিকাশ।

رُجَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجٌّ মূলবর্ণ (ر - ج - ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– কম্পিত হবে।

بُسَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার بَسٌّ মূলবর্ণ (ب - س - س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

مَعِيْنٍ : صيغه صفت - فعيل -এর ওজনে, বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَعْنُ মূলবর্ণ (م - ع - ن) জিনস صحيح অর্থ– বহমান, অর্থাৎ জান্নাতের শরাব, যা চোখের সামনে বহমান হবে।

لَا يُنْزِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْزَافُ মূলবর্ণ (ن - ز - ف) জিনস صحيح অর্থ– তাদের জ্ঞানে ত্রুটি আসবে না।

يَتَخَيَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّخَيُّرُ মূলবর্ণ (خ - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা পছন্দ করবে।

حُطَامًا : حَطْمٌ থেকে নির্গত, এটি বাব ضَرَبَ -এর মাসদার, মূলবর্ণ (ح - ط - م) জিনস صحيح অর্থ– চূর্ণ-বিচূর্ণ কর।

مُقْوِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْوَاءُ মূলবর্ণ (ق - و - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى و اجوف واوى) অর্থ– পথিক।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُوْنَ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ এখানে : يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ টা يَطُوْفُ ফে'ল এর সাথে متعلق আর وِلْدَانٌ হলো ফায়েল আর مُخَلَّدُوْنَ হলো وِلْدَانٌ-এর সিফত। আর بِاَكْوَابٍ টাও يَطُوْفُ-এর সাথে متعلق এবং এর পরবর্তী অংশ بِاَكْوَابٍ-এর উপর আতফ হয়েছে আর مِنْ مَّعِيْنٍ হলো كَاْسٍ-এর সিফত।

–[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ.৩৯৬]

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা হাদীদ

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২৯, রুকূ'– ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে সকলেই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছে এবং তিনি মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١
২. তাঁরই আধিপত্য রয়েছে আসমানসমূহ ও জমিনে, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর তিনিই প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।	لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢
৩. তিনিই [সকল সৃষ্টির] প্রথম, আর তিনি [সকলের বিলীন হওয়ার] পরেও থাকবেন এবং তিনিই প্রকাশ্য ও গুপ্ত। আর তিনিই প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক জ্ঞাতা।	هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٣
৪. তিনিই এমন যে, আসমানসমূহ ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন;	هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ

শাব্দিক অনুবাদ :

১. سَبَّحَ لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করছে مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে সকলেই وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ এবং তিনি মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

২. لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ তারই আধিপত্য রয়েছে আসমানসমূহ ও জমিনে يُحْيٖ তিনি জীবন দান করেন وَيُمِيْتُ এবং মৃত্যু ঘটান وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ, আর তিনিই প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

৩. هُوَ الْاَوَّلُ তিনিই প্রথম وَالْاٰخِرُ, আর তিনি পরেও থাকবেন وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ, এবং তিনিই প্রকাশ্য ও গুপ্ত وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ, আর তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক জ্ঞাতা।

৪. هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ তিনিই এমন যে সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিনকে فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ছয় দিনে ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন;

** তিনি সবই অবগত আছেন, যা জমিনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, আর যা তা হতে বহির্গত হয় এবং যা আসমান হতে নাজিল হয় এবং যা তাতে আরোহণ করে; আর তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন; এবং আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকে দেখেন।	يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾
৫. আসমানসমূহ ও জমিনের আধিপত্য তাঁরই রয়েছে; আর আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় ফিরে যাবে।	لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾
৬. তিনিই রাত্রিকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন এবং তিনিই দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট করেন। আর তিনি অন্তরের বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত আছেন।	يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾
৭. তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, আর যে সম্পদে তিনি তোমাদেরকে অন্যের স্থলাভিষিক্ত করেছেন তা হতে [আল্লাহর পথে] ব্যয় কর, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও [আল্লাহর পথে] ব্যয় করে তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে।	آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** يَعْلَمُ তিনি সবই অবগত আছেন مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ যা জমিনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا আর যা তা হতে বহির্গত হয় وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ এবং যা আসমান হতে নাজিল হয় وَيَعْرُجُ فِيهَا এবং যা তাতে আরোহণ করে وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ আর তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ এবং তিনি তোমাদের সমস্ত কার্যকে দেখেন।

৫. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের আধিপত্য তাঁরই রয়েছে وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ আর আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় ফিরে যাবে।

৬. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ তিনিই রাত্রিকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ এবং তিনিই দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট করেন وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ আর তিনি অন্তরের বিষয়সমূহ অবগত আছেন।

৭. آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর وَأَنْفِقُوا আর ব্যয় কর مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ যে সম্পদে তিনি তোমাদেরকে অন্যের স্থলাভিষিক্ত করেছেন তা হতে فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে وَأَنْفَقُوا এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ তাদের মহা পুরস্কার রয়েছে।

৮. তোমাদের জন্য এর কি কারণ আছে যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনছ না? অথচ রাসূল ﷺ তোমাদেরকে এর প্রতি আহ্বান করছেন যে, তোমরা স্বীয় প্রভুর প্রতি ঈমান আন, আর স্বয়ং আল্লাহ তোমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও [তবে এটাই যথেষ্ট]।	وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾
৯. তিনিই আপন বিশিষ্ট বান্দার উপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাজিল করেন, যেন তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে আনেন; আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় স্নেহশীল, করুণাময়।	هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩﴾
১০. আর তোমাদের নিকট এটার কি কারণ রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমানসমূহ ও জমিন অবশেষে আল্লাহরই রয়ে যাবে; যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে [আল্লাহর পথে] ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করছে তারা সমান নয়; [বরং] তারা ঐ সমস্ত লোক অপেক্ষা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, যারা [মক্কা বিজয়ের] পরে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে; আর আল্লাহ সকলকে মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন; এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত কার্যাবলির পূর্ণ খবর রাখেন।	وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ তোমাদের জন্য এর কি কারণ আছে যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনছ না, وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ অথচ রাসূল তোমাদেরকে এর প্রতি আহ্বান করছেন لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ তোমরা স্বীয় প্রভুর প্রতি ঈমান আন, وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ আর স্বয়ং আল্লাহ তোমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমার বিশ্বাসী হও।

৯. هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ তিনি আপন বিশিষ্ট বান্দার উপর নাজিল করেন اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ لِيُخْرِجَكُمْ যেন তিনি তোমাদেরকে আনেন مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ অন্ধকার হতে আলোর দিকে وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় স্নেহশীল, করুণাময়।

১০. وَمَا لَكُمْ আর তোমাদের নিকট এর কি কারণ রয়েছে যে, اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছ না, وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অথচ আসমানসমূহ ও জমিন অবশেষে আল্লাহরই থেকে যাবে لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ তারা সমান নয় مَنْ اَنْفَقَ যারা ব্যয় করেছে مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ মক্কা বিজয়ের পূর্বে وَقٰتَلَ, এবং জিহাদ করেছে اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً তারা ঐ সমস্ত লোক অপেক্ষা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ যারা পরে ব্যয় করেছে وَقٰتَلُوْا, এবং জিহাদ করেছে وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى, আর আল্লাহ সকলকে মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ, এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কার্যাবলির পূর্ণ খবর রাখেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ الخ الاية (٧)

শানে নুযূল ঃ গযওয়ায়ে তাবুকের সময় যেহেতু অতি দূরের সফর ছিল তদুপরি মুসলমানদের নিকট জিহাদের আসবাব পত্রও রশদের স্বল্পতা ছিল তাই সে যুদ্ধকে গযওয়ায়ে উসরও বলা হয়। এই জন্যে ঐ জিহাদে মুসলমানদেরকে চাঁদা দান এবং মুসলিম বাহিনীকে সহযোগিতা করার প্রতি উৎসাহিত করতে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। (কানযুল নুকূল : ৯৭)

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ الاية (١٠)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) -এর শানে নাজিল হয়েছে। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। (কুরতুবী ঃ ১৭, কানযুন নুকূল ঃ ৯৭)

সূরা হাদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ যে পাঁচটি সূরার শুরুতে سَبَّحَ অথবা يُسَبِّحُ আছে, সেগুলোকে হাদীসে مُسَبِّحَاتٌ তথা তাসবীহ্‌যুক্ত সূরা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তন্মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় সূরা হাশর, তৃতীয় ছফ, চতুর্থ জুমুআ এবং পঞ্চম তাগাবুন। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হযরত ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এসব সূরায় একটি আয়াত এমন আছে, যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের এই আয়াত ঃ

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

এই পাঁচটি সূরার মধ্য থেকে তিনটিতে অর্থাৎ, হাদীদ, হাশর ও ছফে سَبَّحَ অতীত পদবাচ্য সহকারে এবং সূরা জুমুআ ও তাগাবুনে يُسَبِّحُ ভবিষ্যত পদবাচ্য সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ্ ও জিকির অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্বকালেই অব্যাহত থাকা বিধেয়। –(মাযহারী)

শয়তানি কুমন্ত্রণার প্রতিকার ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ কোনো সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানি কুমন্ত্রণা দেখা দিলে هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও। -(ইবনে কাসীর)

এই আয়াতের তাফসীর এবং আউয়াল, আখের, জাহের ও বাতেনের অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের দশটিরও অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই– সবগুলোরই অবকাশ আছে। আউয়াল শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট; অর্থাৎ, অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। কারো কারো মতে আখেরের অর্থ এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমন, كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিলীনতা দুই প্রকার। (এক) যা কার্যতঃ বিলীন হয়ে যায়; যেমন– কেয়ামতের দিন সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। (দুই) যা কার্যতঃ বিলীন হয় না, কিন্তু সত্তাগতভাবে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। এরূপ বস্তুকে বিদ্যমান অবস্থায়ও ধ্বংসশীল বলা যায়। এর উদাহরণ জান্নাত ও দোজখ এবং এগুলোতে প্রবেশকারী ভালো-মন্দ মানুষ। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে না; কিন্তু বিলীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্তও হবে না। একমাত্র আল্লাহর সত্তাই এমন যে, পূর্বেও বিলীন ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনও বিলীন হবে না। তাই তিনি সবার অন্ত।

ইমাম গাযালী (র) বলেন : আল্লাহ তা'আলার মারেফত সবার শেষে হয়। এই দিক দিয়ে তিনি আখের তথা অন্ত। মানুষ জ্ঞান ও মারেফতে ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু মানুষের অর্জিত এসব স্তর আল্লাহর পথের বিভিন্ন মনযিল বৈ কিছু নয়। এর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে আল্লাহর মারেফত। -(রূহুল মা'আনী)

'যাহের' বলে সেই সত্তা বোঝানো হয়েছে, যেমন্ত বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশমান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্রে, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চেয়ে অধিক কোনো বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তিসামর্থ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটি কণায় দেদীপ্যমান।

স্বীয় সত্তার স্বরূপের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা 'বাতেন' তথা অপ্রকাশমান। জ্ঞান-বুদ্ধি ও কল্পনা তাঁর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম নয়। কবি বলেন :

اے برتر از قیاس وگمان خیال ووہم * وز ہرچہ دیدہ ایم وشنیدہ ایم وخواندہ ایم

اے برون از جملہ قال وقیل من * خاک بر فرق من وتمثیل من-

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ : অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন। এই 'সঙ্গের' স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা মানুষের জ্ঞানসীমার অতীত। কিন্তু এর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। এটা না হলে মানুষের টিকে থাকা এবং তার দ্বারা কোনো কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তি বলেই সবকিছু হয়। তিনি সর্বাবস্থায় ও সর্বত্র মানুষের সঙ্গে আছেন।

وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ –এর অর্থ আদিকালীন অঙ্গীকারও হতে পারে, যখন আল্লাহ তা'আলা মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই ভবিষ্যতে আগমনকারী সব আত্মাকে একত্র করে তাদের কাছ থেকে তিনিই যে তাদের একমাত্র পালনকর্তা একথার স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কুরআন পাকে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى বলে এই অঙ্গীকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই অঙ্গীকারও হতে পারে, যা পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণও তাদের উম্মতের কাছ থেকে শেষ নবী ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁকে সাহায্য করা সম্পর্কে নিয়েছিলেন।

কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এই অঙ্গীকারের উল্লেখ আছে :

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ - قَالُوْا اَقْرَرْنَا - قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ -

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ : অর্থাৎ, যদি তোমরা মুমিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এ কথাটি সেই কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মুমিন না হওয়ার কারণে ইতঃপূর্বে وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে 'তোমরা যদি মুমিন হও' বলা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে?

জবাব এই যে, কাফের ও মুশরিকরাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى –অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য পথ অবলম্বন কর। এটা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে রাসূলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে হতে পারে।

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : অভিধানে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত মালিকানাকে مِيْرَاثٌ বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক– মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনা-আপনি মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে مِيْرَاثٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে যে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আল্লাহ তা'আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃপাবশত কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে করে দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে না। সর্বতোভাবে আল্লাহরই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই এই মুহূর্তে যখন বাহ্যিক মালিকানা তোমাদের হাতে আছে, তখন এ থেকে আল্লাহর নামে যা ব্যয় করবে, তা পরকালে পেয়ে যাবে। এভাবে যেন আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত বস্তুর মালিকানা তোমাদের জন্যে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেনঃ একদিন আমরা একটি ছাগল জবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বন্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্যে রাখলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বন্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে? আমি আরজ করলাম ঃ শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। কেননা গোটা ছাগলই আল্লাহর পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহর কাছে তোমার জন্যে থেকে যাবে। যে হাতটি নিজের খাওয়ার জন্যে রেখেছ, পরকালে এর কোনো প্রতিদান পাবে না। কেননা এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে। –(মাযহারী)

আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেওয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যা কিছু যে কোনো সময় ব্যয় করবে ছওয়াব পাওয়া যাবে; কিন্তু ঈমান, আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশত ছওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছে ঃ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। (এক) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে।

(দুই) যারা মক্কাবিজয়ের পর মুমিন হয়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে। এই দুই শ্রেণির লোক আল্লাহর কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় এক শ্রেণি অপর শ্রেণি থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কাবিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জেহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণি অপেক্ষা বেশী।

মক্কা বিজয়কে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাভেদের মাপকাঠি করার রহস্যঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। (এক) যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে ইসলামি কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং (দুই) যারা মক্কাবিজয়ের পর এ কাজে শরিক হয়েছেন। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত সাহাবীগণের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার কাছে শেষোক্ত সাহাবীগণের তুলনায় বেশি।

মক্কা বিজয়কে উভয় শ্রেণির মর্যাদা নিরূপণের মাপকাঠি করার এক বড় রহস্য তো এই যে, মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুসলমানদের টিকে থাকা ও বিলীন হয়ে যাওয়া, ইসলামের প্রসার লাভ ও বিলোপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিতে একই রূপ ছিল। যারা হুঁশিয়ার ও চালাক, তারা এমন কোনো দলে অথবা আন্দোলনে যোগদান করে না, যার পরাজিত হওয়ার অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সামনে থাকে। তারা পরিণামের অপেক্ষায় থাকে। যখন সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে তখনই তারা তড়িঘড়ি করে তাতে যোগদান করে। কিছুসংখ্যক লোক আন্দোলনকে সত্য ও ন্যায়ানুগ বিশ্বাস করলেও বিপক্ষ দলের নির্যাতনের ভয়ে ও নিজেদের দুর্বলতার কারণে তাতে যোগদান করতে সাহাবী হয় না। অপরপক্ষে যারা অসীম সাহসী ও দৃঢ়চেতা, তারা কোন মতবাদ ও বিশ্বাসকে সত্য এবং বিশুদ্ধ মনে করলে জয় ও পরাজয় এবং দলের সংখ্যাল্পতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা মুসলমান হয়েছিল, তাদের সামনে মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা, শক্তিহীনতা ও মুশরিকদের নির্যাতনের এক জাজ্বল্যমান ইতিহাস ছিল। বিশেষত ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করা জীবনের ঝুঁকি নেওয়া এবং বাস্তভিটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর ছিল। বলা বাহুল্য, এহেন পরিস্থিতিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাহায্য এবং ইসলামের সেবায় জীবন ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করেছে তাদের ঈমানী শক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার তুলনা চলে কি?

আস্তে আস্তে পরিস্থিতির পট পরিবর্তন হতে থাকে। অবশেষে মক্কা বিজিত হয়ে সমগ্র আরবের উপর ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়। তখন কুরআন পাকের ভাষায় দলে দলে লোকজন এসে ইসলামের দীক্ষিত হতে থাকে; ইরশাদ হচ্ছে– يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াত তাদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং তাদেরকে কল্যাণ তথা ক্ষমা ও অনুকম্পার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে একথা বলে দিয়েছে যে, তাদের মর্যাদা পূর্ববর্তীদের সমান হতে পারে না। কারণ তারা অসীম সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তির কারণে বিরোধিতা ও নির্যাতন আশঙ্কার উর্ধ্বে উঠে ইসলাম ঘোষণা করেছে এবং বিপদমুহূর্তে ইসলামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সারকথা এই যে, সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তি পরিমাপ করার জন্য মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিস্থিতির ব্যবধান একটি মাপকাঠির মর্যাদা রাখে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই উভয় শ্রেণি সমান হতে পারে না।

সকল সাহাবীর জন্যে মাগফেরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং অবিশিষ্ট উম্মত থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার পারস্পরিক তারতম্য উল্লেখ করে শেষে বলা হয়েছে ঃ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى -অর্থাৎ, পারস্পরিক তারতম্য সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ অর্থাৎ, জান্নাত ও মাগফেরাতের ওয়াদা সবার জন্যেই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে কেরামের সেই শ্রেণিদ্বয়ের জন্যে, যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে কেরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। কেননা তাঁদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি খুবই দুর্লভ, যিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পথে কিছুই ব্যয় করেননি এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলায় অংশগ্রহণ করেননি। তাই মাগফেরাত ও রহমতের এই কুরআনি ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে।

ইবনে হাযম (র.) বলেন : এর সাথে সূরা আম্বিয়ার অপর একটি আয়াতকে মিলাও, যাতে বলা হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ - لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ -

অর্থাৎ যাদের জন্য আমি পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিয়েছি তারা জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান করবে। জাহান্নামের কষ্টদায়ক আওয়াজও তাদের কানে পৌঁছবে না। তারা পছন্দমত অবদানে চিরকাল বসবাস করবে।

আলোচ্য আয়াতে كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى বলা হয়েছে এবং সূরা আম্বিয়ার এই আয়াতে যাদের জন্য কল্যাণের ওয়াদা করা হয়েছে, তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, কুরআন পাক এই নিশ্চয়তা দেয় যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ যদি সারা জীবনের কোনো মুহূর্তে কোনো

গোনাহ করেও ফেলেন, তবে তিনি তার উপর কায়েম থাকবেন না– তওবা করে নেবেন। নতুবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংসর্গ, সাহায্য, ধর্মের মহান সেবামূলক কার্যক্রম এবং তাঁর অসংখ্য পূণ্যের খাতিরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন। গোনাহ মাফ হয়ে পূত-পবিত্র হওয়া অথবা পার্থিব বিপদাপদ ও বেশির বেশি কষ্টের মাধ্যমে গোনাহের কাফফারা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু ঘটবে না।

কতক হাদীসে কোনো কোনো সাহাবীর মৃত্যুর পর আজাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই আজাব পরকাল ও জাহান্নামের আজাব নয়; বরং বরযখ তথা কবর-জগতের আজাব। এটা অসম্ভব নয় যে, কোনো সাহাবী কোনো গোনাহ করে ঘটনাচক্রে তওবা ব্যতীতই মৃত্যুবরণ করলে তাকে কবর-জগতের আজাব দ্বারা পবিত্র করে নেওয়া হবে, যাতে পরকালের আজাব ভোগ করতে না হয়।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়– ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা নয় ঃ সারকথা এই যে, সাহাবায়ে-কেরাম সাধারণ উম্মতের ন্যায় নন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উম্মতের মাঝখানে আল্লাহর তৈরি সেতু। তাঁদের মাধ্যম ব্যতীত উম্মতের কাছে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা পৌঁছার কোনো পথ নেই। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের এই মর্যাদা ইতিহাসগ্রন্থের সত্য মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নয়; বরং কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়। তাঁদের দ্বারা কোনো পদস্খলন বা ভ্রান্তিমূলক কোনো কিছু হয়ে থাকলে তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজতিহাদী ভুল। যে কারণে সেগুলোকে গোনাহের মধ্যে গণ্য করা যায় না; বরং সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা দ্বারা তাঁরা একটি ছওয়াব পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোনো গোনাহ্ হয়েই যায়, তবে প্রথমত তা তাঁদের সারা জীবনের সৎকর্ম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের সাহায্য ও সেবার মোকাবিলায় শূন্যের কোঠায় থাকে। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ছিলেন অসাধারণ আল্লাহভীরু। সামান্য গোনাহের কারণেও তাঁদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং নিজের উপর গোনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতেন। কেউ নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন এবং তওবা কবুল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তদবস্থায়ই দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের পুণ্য এত অধিক ছিল যে, সেগুলোর দ্বারা গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মাগফেরাতের ব্যাপক ঘোষণা আলোচ্য আয়াতে এবং অন্য আয়াতেও করে দিয়েছেন। শুধু মাগফেরাতই নয়; رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাউকে মন্দ বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতরূপে হারাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি অনুযায়ী তা অভিশপ্ত হওয়ার কারণ এবং নিজের ঈমানকে বিপন্ন করার শামিল।

আজকাল ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা ও গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য বর্ণনার ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক লোক সাহাবায়ে কেরামকে দোষারোপের শিকারে পরিণত করছে। প্রথম যেসব বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁর এসব লিখেছেন, সেগুলোর ভিত্তিই অত্যন্ত দুর্বল। যদি কোনো পর্যায়ে তাদের যেসব ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ মেনেও নেওয়া যায়, তবে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনার মুকাবিলায় তার কোনো মর্যাদা নেই। কেননা, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম সবাই ক্ষমাযোগ্য।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত বিশ্বাস : সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অন্তরে ভালবাসা করা এবং তাঁদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা ওয়াজিব। তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে সীরব থাকা কোনো এবং পক্ষকেই দোষী সাব্যস্ত না করা জরুরি। আকায়েদের সকল কিতাবে এই সর্বসম্মত বিশ্বাসের বর্ণনা আছে। ইমাম আহমদের এক পুস্তিকায় বলা হয়েছে :

لَا يَجُوْزُ لِاَحَدٍ اَنْ يَّذْكُرَ شَيْئًا مِنْ مَسَاوِيْهِمْ وَلَا يَطْعَنَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ بِعَيْبٍ وَلَا نَقْصٍ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ وَجَبَ تَادِيْبُهٗ -

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের কোনো দোষ বর্ণনা করা অথবা তাঁদের কাউকে দোষী ও ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করা কারও জন্য বৈধ নয়। কেউ এরূপ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব। –(শরহু আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা : ৩৮৯ পৃ.)

ইবনে তাইমিয়া (র.) 'ছারিমুল মসলূল' গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদীস লিপিবদ্ধ করার পর বলেন :

وَهٰذَا مِمَّا لَا نَعْلَمُ فِيْهِ خِلَافًا بَيْنَ اَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ وَسَائِرِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَاِنَّهُمْ مُجْمِعُوْنَ عَلٰى اَنَّ الْوَاجِبَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَالتَّرَحُّمُ عَلَيْهِمْ وَالتَّرَاضِيْ عَنْهُمْ وَاعْتِقَادُ مَحَبَّتِهِمْ وَمُوَالَاتِهِمْ وَعُقُوْبَةِ مَنْ اَسَاءَ فِيْهِمُ الْقَوْلَ -

অর্থাৎ আমাদের জানামতে এ ব্যাপারে আলেম, ফিকহবিদ, সাহাবী, তাবেয়ী ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে কেনো মতভেদ নেই। সবাই একমত যে, সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা, তাঁদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা, আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টিবাক্য উচ্চারণ সহকারে তাঁদের উল্লেখ করা এবং তাঁদের প্রতি মহব্বত ও সহায়তার মনোভাব পোষণ করা সকলের জন্য ওয়াজিব। তাঁদের ব্যাপারে কেউ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করলে তাকে শাস্তি দিতে হবে।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.) 'শরহে আকিদায়ে ওয়াসিতিয়্যা' গ্রন্থে সমগ্র উম্মত তথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস বর্ণনা করে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে লিখেন :

وَيُمْسِكُوْنَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَيَقُوْلُوْنَ هٰذِهِ الْاٰثَارُ الْمَرْوِيَّةُ فِىْ مَسَاوِيْهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كِذْبٌ وَمِنْهَا مَا زِيْدَ فِيْهَا وَنَقَصَ وَغَيِّرَ وَجْهُهُ وَالصَّحِيْحُ مِنْهُ هُمْ فِيْهِ مَعْذُوْرُوْنَ اَمَّا مُجْتَهِدُوْنَ مُصِيْبُوْنَ وَاَمَّا مُجْتَهِدُوْنَ مُخْطِئُوْنَ - وَهُمْ مَعَ ذَالِكَ لَا يَعْتَقِدُوْنَ اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُوْمٌ مِنْ كَبَائِرِ الْاِثْمِ وَصَغَائِرِهِ بَلْ يَجُوْزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوْبُ فِى الْجُمْلَةِ وَلَهُمْ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالسَّوَابِقِ مَا يُوْجِبُ مَغْفِرَةً مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ حَتّٰى اَنَّهُمْ يَغْفِرُلَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يَغْفِرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ -

অর্থাৎ আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আত সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ ব্যাপারদিতে নিশ্চুপ থাকেন। তাঁরা বলেন : যেসব রেওয়ায়েত থেকে তাঁদের মধ্যকার কারোও দোষ বোঝা যায়, সেগুলোর কতক সম্পূর্ণ মিথ্যা, কতক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত এবং যেগুলো সহীহ ও বিশুদ্ধ, সেগুলোর ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ক্ষমার্হ। কেননা, তাঁরা যা কিছু করেছেন, আল্লাহর ওয়াস্তে ইজতিহাদের মাধ্যমে করেছেন। এই ইজতিহাদে হয় তাঁরা অভ্রান্ত ছিলেন (তাহলে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী ছিলেন) এসব সত্ত্বেও আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন না যে, প্রত্যেক সাহাবী সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে মুক্ত; বরং তাঁদের দ্বারা গোনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাঁদের গুণ-গরিমা ও ইসলামের জন্য ত্যাগ ও তিক্ষামূলক কার্যাবলির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সব গোনাহ মাফ হয়ে যেতে পারে; এমনকি তাঁদের এমন সব গোনাহও হতে পারে, যা উম্মতের পরবর্তী লোকদের মাফ হবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَلِجُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার عُرُوْجٌ মূলবর্ণ (ع - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ– প্রবেশ কর।

اَلْفَجْرُ : ইসমে ফে'ল। মাসদার فَجْرٌ অর্থ- ফেটে যাওয়া, সকালের আলো প্রকাশিত হওয়া, বিদীর্ণ করে প্রবাহিত করা, গোনাহ করা। বখশিশ, উদারতা, দয়া, মাল ও প্রচুর মাল। কুরআন মাজিদে এর ব্যবহার কেবল ফজরের সময় ও প্রভাত উদিত হওয়ার অর্থে হয়েছে।

مُسْتَخْلَفِ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِخْلَافُ মূলবর্ণ (خ – ل – ف) জিনস صحيح অর্থ– অন্যের স্থলাভিষিক্ত।

تُرْجَعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلرُّجُوْعُ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ– ফিরে যাবে।

يَعْرُجُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُرُوْجُ মূলবর্ণ (ع - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ– আরোহণ করে।

اَلْحُسْنٰى : كَرُمَ বাব اسم تفضيل বহছ واحد مؤنث সীগাহ। থেকে নির্গত حَسَنٌ -এর ওজনে فُعْلٰى মাসদার اَلْحُسْنُ মূলবর্ণ (ح - س - ن) জিনস صحيح অর্থ– মঙ্গল।

مِيْرَاثٌ : এটা اسم مصدر বাব ضرب মাসদার تُرَاثٌ ও اِرْثٌ আর বাবে حَسِبَ থেকে মাসদার ارث ও وارث অর্থ– মালিকানা। মূলবর্ণ (و - ر - ث) জিনস مثال واوى

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : এখানে واو টি আতেফা আর هُوَ মুবতাদা আর قدير হলো তার খবর এবং عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ জার মাজরুর হয়ে قَدِيْرٌ -এর সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড: পৃ. ৪১৭]

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿۱۱﴾

১১. কেউ আছে কি, যে আল্লাহকে উত্তমরূপে [খাঁটি অন্তরে] ঋণ দান করে, অনন্তর আল্লাহ তার জন্য তার [ছওয়াব] বৃদ্ধি করতে থাকেন, আর তার জন্য সম্মানজনক বিনিময় [নির্ধারিত] রয়েছে।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۲﴾

১২. আর [সে দিনটিও উল্লেখযোগ্য] যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের সম্মুখ দিকে এবং তাদের ডানদিকে দৌড়াচ্ছে, [এবং বলা হবে] আজ তোমাদেরকে [বেহেশতের] এমন উদ্যানসমূহের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে যাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে; এটা বিরাট সফলতা।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿۱۳﴾

১৩. যেদিন মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারীরা মুসলমানদেরকে [পুলসিরাতের উপর] বলবে, আমাদের জন্য [একটু] অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের নূর হতে কিছু আলোক গ্রহণ করি! তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা তোমাদের পশ্চাতে ফিরে যাও তৎপর আলো তালাশ কর; অতঃপর তাদের [উভয়ের] মধ্যে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। যাতে একটি দরজা থাকবে; তার অভ্যন্তর ভাগে রহমত হবে, আর বহির্ভাগে আজাব হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا কেউ আছে কি? যে, আল্লাহকে উত্তমরূপে [খাঁটি অন্তরে] ঋণ দান করে فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ অনন্তর আল্লাহ তার জন্য তা বৃদ্ধি করতে থাকেন وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ আর তার জন্য সম্মানজনক বিনিময় রয়েছে।

১২. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণকে দেখবেন যে, يَسْعٰى نُوْرُهُمْ তাদের নূর দৌড়াচ্ছে بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ তাদের সম্মুখ দিকে এবং তাদের ডান দিকে بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ আজ তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে جَنّٰتٌ এমন উদ্যানসমূহের تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا যাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এটা বিরাট সফলতা।

১৩. يَوْمَ يَقُوْلُ যেদিন বলবে الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারীরা لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا মুসলমানদেরকে انْظُرُوْنَا আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ আমরাও তোমাদের নূর হতে কিছু আলোক গ্রহণ করি قِيْلَ তাদেরকে বলা হবে ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ তোমরা তোমাদের পশ্চাতে ফিরে যাও فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا তৎপর আলো তালাশ কর فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ অতঃপর তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে لَّهٗ بَابٌ যাতে একটি দরজা থাকবে بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ তার অভ্যন্তর ভাগে রহমত হবে وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ আর বহির্ভাগে আজাব হবে।

১৪. এরা [মুনাফিকরা] তাদেরকে ডেকে বলবে আমরা কি [পৃথিবীতে] তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা [মুসলমানগণ] বলবে, হ্যাঁ, ছিলে; কিন্তু [তোমাদের অবস্থা তো এই ছিল যে,] তোমরা নিজেদেরকে পথভ্রষ্টতায় আবদ্ধ রেখেছিলে, আর তোমরা অপেক্ষা করছিলে [আমাদের বিপর্যয়ের] এবং তোমরা সন্দিহান ছিলে; বরং তোমাদের অযথা আকাঙ্ক্ষাসমূহ তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল, এমনকি তোমাদের উপর আল্লাহর নির্দেশ এসে পৌঁছল, আর প্রতারণাকারী [শয়তান] তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল।	يُنَادُونَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۚ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿١٤﴾
১৫. ফলকথা, আজ না তোমাদের থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে, আর না কাফেরদের নিকট হতে; তোমাদের সকলের আবাসস্থল দোজখ; [অনন্তকালের জন্য] সেটাই তোমাদের সঙ্গী; আর তা [প্রকৃতপক্ষে] বড়ই নিকৃষ্ট ঠিকানা।	فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ۚ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾
১৬. ঈমানদারদের জন্য কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তরসমূহ আল্লাহর নসিহতের এবং যে সত্য ধর্ম অবতীর্ণ হয়েছে তার সম্মুখে অবনমিত হয়,	اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. يُنَادُونَهُمْ এরা তাদেরকে ডেকে বলবে اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? قَالُوْا তারা বলবে بَلٰى হ্যাঁ ছিলে وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ কিন্তু তোমরা নিজেদেরকে পথভ্রষ্টতায় আবদ্ধ রেখেছিলে وَتَرَبَّصْتُمْ আর তোমরা অপেক্ষা করছিলে وَارْتَبْتُمْ এবং তোমরা সন্দিহান ছিলে وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ বরং তোমাদের অযথা আকাঙ্ক্ষাসমূহ তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ এমনকি তোমাদের উপর আল্লাহর নিদর্শন এসে পৌঁছল وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ আর প্রতারণাকারী (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ সম্বন্ধে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল।

১৫. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ ফলকথা আজ না তোমাদের থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর না কাফেরদের নিকট থেকে مَاْوٰىكُمُ النَّارُ তোমাদের সকলের আবাসস্থল দোজখ هِيَ مَوْلٰىكُمْ সেটাই তোমাদের সঙ্গী وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ আর তা বড়ই নিকৃষ্ট ঠিকানা।

১৬. اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ঈমানদারদের জন্য কি এখনও সময় আসেনি যে, اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ তাদের অন্তরসমূহ অবনমিত হয় لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ আল্লাহর নসিহত এবং যে সত্য ধর্ম অবতীর্ণ হয়ে তার সম্মুখে

** আর ঐ সমস্ত লোকের ন্যায় যেন না হয়, যারা এদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল, অনন্তর [পাপে লিপ্ত অবস্থায়] তাদের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেল, অতঃপর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল; আর তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক লোকই পথভ্রষ্ট।	وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ﴿١٦﴾
১৭. এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ জমিনকে তার শুষ্ক হওয়ার পর জীবিত করে দেন; আমি তোমাদের নিকট এর বহু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যেন তোমরা বুঝ।	اِعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَلَا يَكُونُوا এবং যেন না হয় كَالَّذِينَ ঐ সমস্ত লোকের ন্যায় যারা أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ এদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ অনন্তর তাদের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেল فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ অত:পর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ, আর তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক লোকই পথভ্রষ্ট।

১৭. اِعْلَمُوٓا এটা জেনে রাখ যে, أَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْأَرْضَ আল্লাহ জমিনকে জীবিত করে দেন بَعْدَ مَوْتِهَا তার শুষ্ক হওয়ার পর قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ আমি তোমাদের নিকট এর বহু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ যেন তোমরা বুঝ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوٓا أَنْ تَخْشَعَ .... قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ الخ – (١٦)

শানে নুযূল : ১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো মুমিনের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি লক্ষ্য করে এই আয়াত নাজিল করেছেন।

ইমাম আ'মাশ (র.) বলেন, মদীনায় পৌঁছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোনো কোনো সাহাবীর কামোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –(রূহুল মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উপরিউক্ত রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে, এই হুশিয়ারি সংকেত কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার তের বছর পরে নাজিল হয়। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুশিয়ার করা হয়। মোটকথা, এই হুঁশিয়ারির সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎকর্মের জন্যে তৎপর থাকার শিক্ষা দেওয়া এবং একথা বলা যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎকর্মের ভিত্তি।

শানে নুযূল : ২. সাহাবায়ে কেরাম মদীনাতে আরাম আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে লাগলেন। তখন তারা অধিক হাসাহাসি করতে লাগলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –(কুরতুবী : ১৭:২৪৯)

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ, সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে।

'সেদিন' বলে কেয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে। নূর দেওয়ার ব্যাপারটি পুলসিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে। হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি নাতিদীর্ঘ। এতে আছে যে, হযরত আবূ উমামা (রা.) একদিন দামেশকে এক জানাযায় শরিক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেওয়া হলো :

অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরে ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনজিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনজিলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেওয়া হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেওয়া হবে। অপর এক মনজিলে সমবেত সব মুমিন ও কাফেরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বন্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেওয়া হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেওয়া হবে। ফলে কারও নূর পর্বতসম, কারও খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারও মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে; তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে। –(ইবনে কাসীর)

অত:পর হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন : মুনাফিক ও কাফেরদেরকে নূর দেওয়া হবে না। কুরআন পাক এই ঘটনা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেছে–

اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا - وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّوْرٍ -

তিনি আরো বলেন, মুমিনদেরকে যে নূর দেওয়া হবে, তা দুনিয়ার নূরের মত হবে না। দুনিয়ার নূর দ্বারা আশেপাশের লোকেরা আলো লাভ করতে পারে। অন্ধ ব্যক্তি যেমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চোখের জ্যোতি দ্বারা দেখতে পারে না তেমনি মুমিনের নূর দ্বারা কোনো কাফের ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে না। –(ইবনে কাছীর)

হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.)-এর এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, যে মনজিলে গভীর অন্ধকারের পর নূর বন্টন করা হবে, সেই মনজিল থেকেই কাফের মুনাফিকরা নূর থেকে বঞ্চিত হবে, তারা কোন প্রকার নূর পাবেই না।

কিন্তু তাবারানী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

পুলসিলাতের নিকটে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুমিনকে নূর দান করবেন এবং প্রত্যেক মুনাফিককেও। কিন্তু পুলসিরাতে পৌছা মাত্রই মুনাফিকদের নূর ছিনিয়ে নেওয়া হবে। –(ইবনে কাছীর)

এ থেকে জানা গেল যে, মুনাফিকদেরকেও প্রথমে নূর দেওয়া হবে। কিন্তু পুলসিরাতে পৌছার পর তা বিলীন হয়ে যাবে। বাস্তবে যাই হোক, মুনাফিকরা তখন মুমিনগণকে অনুরোধ করবে– একটু এসো, আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা একটু উপকৃত হই। কারণ, দুনিয়াতেও নামাজ, জাকাত, হজ, জিহাদ, ইত্যাদি কাজে আমরা তোমাদের অংশীদার ছিলাম। তাদের এ অনুরোধের নেতিবাচক জবাব দেওয়া হবে, যা পরে বর্ণিত হবে। প্রথমে মুনাফিকদেরকেও মুসলমানদের ন্যায় নূর দেওয়া এবং পরে তা ছিনিয়ে নেওয়াই তাদের অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কারণ, তারা দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টায়ই লেগে থাকত। কাজেই কিয়ামতে তাদের সাথে তদ্রূপ ব্যবহারই করা হবে। তাদের সম্পর্কে কুরআন পাক বলে :

يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকা দেন। প্রথমে তাদেরকে নূর দেওয়া হবে এরপর ঠিক প্রয়োজন মুহূর্তে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এ সময়ে মু'মিনগণও তাদের নূর বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবে। তাই তারা শেষ পর্যন্ত নূর বহাল রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি উল্লেখ আছে–

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا

মুসলিম, আহমদ ও দারাকুতনীতে বর্ণিত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-এর বর্ণিত হাদীসেও বলা হয়েছে : প্রথমে মুমিন ও মুনাফিক – উভয় সম্প্রদায়কে নূর দেওয়া হবে, এরপর পুলসিরাতে পৌছে মুনাফিকদের নূর বিলীন হয়ে যাবে।

উপরিউক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে যেসব মুনাফিক ছিল, তারাই আসল মুনাফিক। তারা প্রথম থেকেই কাফেরদের ন্যায় নূর পাবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরও এই উম্মতে মুনাফিক হবে। তবে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাদেরকে 'মুনাফিক' নাম দেওয়া যাবে না। অকাট্য ওহী ব্যতীত কাউকে মুনাফিক বলার অধিকার উম্মতের কারও নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন, কার অন্তরে ঈমান আছে এবং কার অন্তরে নেই? অতএব আল্লাহর জ্ঞানে যারা মুনাফিক হবে, তাদেরকে প্রথমে নূর দিয়ে পরে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

এই উম্মতে এ ধরনের মুনাফিক তারা, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুরআন ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করে। (নাউজুবিল্লাহ মিনহু)

হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকার কি কি কারণে হবে : তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকারের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো :

১. আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এবং ইবনে মাজাহ বর্ণিত হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যারা অন্ধকার রাত্রে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। এই বিষয়বস্তুরই রেওয়ায়েত হযরত সাহল ইবনে সা'দ, যায়েদ ইবনে হারেসা, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, হারেসা ইবনে ওয়াহাব, আবূ উমামা, আবূদ্দারদা, আবু সাঈদ, আবূ মুসা, আবূ হুরায়রা, আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকেও বর্ণিত আছে।

২ মুসনাদে আহমদ ও তাবারানী উল্লিখিত এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাঞ্জেগানা নামাজ যথাসময়ে ও যথানিয়মে আদায় করে, কিয়ামতের দিন এই নামাজ তার জন্য নূর, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যথাসময়ে ও যথানিয়মে নামাজ আদায় করে না, তার জন্য নূর প্রমাণ ও মুক্তির কারণ কিছুই হবে না। সে কারূন, হামান ও ফেরাউনের সাথে থাকবে।

৩. তাবারানী উল্লিখিত এবং আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত বিস্তৃত নূর হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হবে।

৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতও তেলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন সেই আয়াত তার জন্য নূর হবে।– (মুসনাদে আহমদ)

৫. দায়লামী বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার প্রতি দরূদ পাঠ পুলসিলাতে নূরের কারণ হবে।

৬. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হজ্জের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন : হজ্জ ও ওমরার ইহরাম খোলার জন্য যে মাথা মুণ্ডন করা হয়, তাতে মাটিতে পতিত কেশ কিয়ামতের দিন নূর হবে। –(তাবরানী)

৭. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, মিনায় কংকর নিক্ষেপ কিয়ামতের দিন নূর হবে। –(মুসনাদে বাযযার)

৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি আছে যে, মুসলমান অবস্থায় যার মাথার চুল সাদা হয়ে যায়, কিয়ামতের দিন সেই চুল তার জন্য নূর হবে। -(তিরমিযী)

৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে একটি তীরও নিক্ষেপ করবে, কিয়ামতের সেই তীর তার জন্য নূর হবে। –(বাযযার)

১০. হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি বাজারে আল্লাহর যিকির করে, সে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে কিয়ামতের দিন একটি নূর পাবে। –(বায়হাকী)

১১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের বিপদ ও কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পুলসিরাতে নূরের দু'টি শাখা করে দেবেন, তা দ্বারা এক জাহান আলোকিত হয়ে যাবে। –(তাবারানী)

১২. বুখারী ও মুসলিম ইবনে ওমর (রা) থেকে মুসলিম হযরত জাবের (রা.) থেকে হাকেম হযরত আবূ হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রা.) থেকে এবং তাবারানী ইবনে যিয়াদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, اِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَاِنَّهُ هُوَ الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা জুলুম ও নিপীড়ন থেকে বেঁচে থাক। জুলুমই কিয়ামতের দিন অন্ধকারের রূপ লাভ করবে।

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَنَسْأَلُهُ النُّوْرَ التَّامَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ-

অর্থাৎ যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে : আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা উপকৃত হই।

قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا - অর্থাৎ তাদেরকে বলা হবে : যেখানে নূর বন্টন হয়েছিল সেখানে ফিরে যাও এবং নূরের সন্ধান কর। এ কথা মুমিনগণ বলবে অথবা ফেরেশতাগণ জবাব দেবে।

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ অর্থাৎ মু'মিন অথবা ফেরেশতাগণের জবাব শুনে মুনাফিকরা সে স্থানে ফিরে গিয়ে কিছুই পাবে না। আবার এদিকে আসবে, কিন্তু তখন তারা মুমিনগণের কাছে পৌঁছতে পারবে না। তাদের ও মুমিনগণের মাঝখানে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। এর অভ্যন্তরভাগ মু'মিনদের জায়গায় থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে মুনাফিকদের জায়গায় থাকবে আজাব।

রূহুল মা'আনীতে ইবনে যায়েদ (রা.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, এটা হবে মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যবর্তী আ'রাফের প্রাচীর। অপর কয়েকজনের মতে এটা ভিন্ন প্রাচীর হবে। এতে যে দরজা থাকবে, এটা হয় মুমিন ও কাফেরদের পারস্পরিক কথাবার্তা বলার জন্য, না হয় মুমিনগণ এই দরজা দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার পর তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

নূরের ব্যাপারে কুরআনে কাফেরদের কোনো উল্লেখই হয়নি। কারণ তাদের নূর পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। মুনাফিকদের নূর সম্পর্কে দ্বিবিধ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম থেকেই তারা নূর পাবে না কিংবা পাওয়ার পর পুলসিরাতে উঠতেই নিভিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাদের ও মুমিনদের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে। এই সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, শুধু মুমিনগণই পুলসিরাত দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করবে। কাফের ও মুশরিকরা পুলসিরাতে উঠবে না। তাদেরকে জাহান্নামের প্রবেশপথ দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মুমিনগণ পুলসিরাতের পথ অতিক্রম করবে। পাপী মুমিনগণকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ কিছু দিন জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে। তারা পুলসিরাত থেকে নিম্নে পতিত হয়ে জাহান্নামে পৌঁছবে। অন্যান্য মুমিন নিরাপদে পুলসিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

– (শাহ আ: কাদের দেহলভী)

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ -

অর্থাৎ, মুমিনদের জন্যে কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির এবং যে সত্য নাজিল করা হয়েছে তৎপ্রতি নম্র ও বিগলিত হবে?

خُشُوْعِ قَلْبٍ –এর অর্থ– অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবুল করা ও আনুগত্য করা। –(ইবনে-কাসীর) কুরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি পালন করার জন্যে প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোনো অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। –(রূহুল মা'আনী)

এটা মুমনিদের জন্যে হুশিয়ারি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো মুমিনদের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ করে এই আয়াত নাজিল করেন। (ইবনে কাসীর)

ইমাম আ'মাশ (র.) বলেন ঃ মদীনায় পৌঁছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোনো কোনো সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। –(রূহুল মা'আনী)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উপরিউক্ত রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে, এই হুশিয়ারি সংকেত কুরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাজিল হয়। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুশিয়ার করা হয়।

মোটকথা, এই হুশিয়ারীর সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎকর্মের জন্যে তৎপর থাকার শিক্ষা দেওয়া এবং একথা ব্যক্ত করা যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎকর্মের ভিত্তি।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা উঠিয়ে নেওয়া হবে। –(ইবনে কাসীর)

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُنَادُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوف বাব مُفَاعَلَةَ মাসদার مُنَادَاةٌ মূলবর্ণ (ن ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ডেকে বলবে। আহ্বান করবে।

فَتَنْتُمْ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার فَتْنٌ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– পথভ্রষ্টতায় আবদ্ধ রেখেছিলে।

اِرْتَبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِيَابٌ মূলবর্ণ (ر ـ ى ـ ب) জিনস اجوف يائ অর্থ– তোমরা সন্দিহান ছিলে, সন্দেহ পোষণ করে ছিলে।

اَلَمْ يَأْنِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاَنْىُ মূলবর্ণ (ا ـ ن ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهوز فاء এবং ناقص يائ অর্থ– সময় কি আসেনি।

نَعَّمَهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف ;ه যমীর মাফউল। অর্থ- তাকে নিয়ামত দিয়েছেন। মাসদার تَنْعِيْمٌ বাব تَفْعِيْل

تَحْضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف মাসদার مُحَضَّةٌ বাব مُفَاعَلَةٌ অর্থ- তোমরা উৎসাহিত করছ, তোমরা নিজেরা জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছ।

قَسَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার قَسْوَةٌ মূলবর্ণ (ق ـ س ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– কঠিন হয়ে গেল।

اَلْفَجْرُ : ইসমে ফে'ল। মাসদার। অর্থ- ফেটে যাওয়া, সকালের আলো প্রকাশিত হওয়া, বিদীর্ণ করে প্রবাহিত করা, গোনাহ করা। বখশিশ, উদারতা, দয়া, মাল ও প্রচুর মাল। কুরআন মাজিদ এর ব্যবহার কেবল ফজরের সময় ও প্রভাত উদিত হওয়ার অর্থে হয়েছে।

نَقْتَبِسُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف সাকিন হয়েছে امر -এর জবাবে আসার কারণে, বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِبَاسُ মূলবর্ণ (ق ـ ب ـ س) জিনস صحيح অর্থ– আমরা আলোক গ্রহণ করি।

اِلْتَمِسُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِلْتِمَاسُ মূলবর্ণ (ل ـ م ـ س) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তালাশ কর।

غَرَّتْكُمْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُرُوْرُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى : كُمْ যমীর মাফউল অর্থ– (তোমাদেরকে) প্রতারিত করেছিল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِىُّ حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ : এখানে و টি আতেফা আর غَرَّتْكُمْ ফে'ল আর كُمْ মাফউল اَلْاَمَانِىُّ হলো ফায়েল আর حَتّٰى হলো حرف جر আর جَاءَ ফেল اَمْرُ اللّٰهِ হলো ফায়েল অর্থাৎ اَلْمَوْتُ (মৃত্যু)। আর غَرَّكُمْ টা غَرَّتْكُمْ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর بِاللّٰهِ টা غَرَّكُمْ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর اَلْغَرُوْرُ হলো ফায়েল অর্থাৎ শয়তান। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ৪১৭]

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৮. নিঃসন্দেহে দানশীল পুরুষ এবং দানশীল নারীগণ, আর যারা খাঁটি অন্তরে আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দান করছে, ঐ দান [-এর ছওয়াব] তাদের জন্য বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে এবং তাদের জন্য পছন্দনীয় বিনিময় রয়েছে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٩﴾

১৯. আর যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলগণের উপর বিশ্বাস রাখে, এরূপ লোকই স্বীয় প্রভুর নিকট সত্যবাদী এবং শহীদ [অর্থাৎ আল্লাহর জন্য আত্মোৎসর্গকারী] তাদের জন্য [বেহেশতে] তাদের পুরস্কার এবং [পুলসিরাতের উপর] তাদের নূর খাছ হবে; আর যারা কাফের হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করেছে, এরাই দোজখবাসী।

ع ١٨

اِعْلَمُوْۤا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا ؕ

২০. জেনে রাখ যে, [পরলোকের তুলনায়] পার্থিব জীবন তো [কখনো বাঞ্ছিত হওয়ার যোগ্য নয়, কেননা তা তো] কেবল খেলা ও তামাশা এবং [একটা বাহ্যিক] জাঁকজমক এবং পরস্পর একে অন্যের প্রতি আত্মগর্ব করা, আর ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে একে অন্য অপেক্ষা প্রাচুর্য বর্ণনা করা মাত্র; যেমন, বৃষ্টি [বর্ষিত] হলে। তার উৎপন্ন ফসল কৃষকদের ভালো বোধ হয়, অনন্তর তা শুষ্ক হয়ে যায়, তখন তুমি তাকে হরিদ্রা বর্ণের দেখতে পাও, অতঃপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় [পার্থিব জীবনের আনন্দ এরূপই]

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ নিঃসন্দেহে দানশীল পুরুষ وَالْمُصَّدِّقٰتِ এবং দানশীল নারীগণ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا আর যারা খাঁটি অন্তরে আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দান করছে يُّضٰعَفُ لَهُمْ ঐ দান তাদের জন্য বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ এবং তাদের জন্য পছন্দনীয় বিনিময় রয়েছে।

১৯. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ আর যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস রাখে اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ এরূপ লোকই সত্যবাদী وَالشُّهَدَآءُ এবং শহীদ عِنْدَ رَبِّهِمْ স্বীয় প্রভুর নিকট لَهُمْ اَجْرُهُمْ তাদের জন্য তাদের পুরস্কার وَنُوْرُهُمْ এবং তাদের নূর খাস হবে وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কাফের হয়েছে وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا এবং আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করেছে اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ এরাই দোজখবাসী।

২০. اِعْلَمُوْٓا জেনে রাখ যে اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا পার্থিব জীবন তো لَعِبٌ وَّلَهْوٌ কেবল খেলা ও তামাশা وَّزِيْنَةٌ এবং জাঁকজমক وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ এবং পরস্পর একে অন্যের প্রতি আত্মগর্ব করা وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ আর ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে একে অন্য অপেক্ষা প্রাচুর্য বর্ণনা করা মাত্র كَمَثَلِ غَيْثٍ যেমন বৃষ্টি হলে اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ তার উৎপন্ন ফসল কৃষকদের ভালো বোধ হয় ثُمَّ يَهِيْجُ অনন্তর তা শুষ্ক হয়ে যায় فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا তখন তুমি তাকে হরিদ্রা বর্ণের দেখতে পাও ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا অতঃপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿٢٠﴾

** আর পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে, আর [মুমিনদের জন্য] আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে; আর পার্থিব জীবন [অস্থায়ী এবং] প্রতারণার উপকরণ মাত্র।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾

২১. তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে ধাবিত হও, এবং এরূপ বেহেশতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের প্রশস্তার সমান, তা ঐ সকল লোকের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে; তা [অর্থাৎ ক্ষমা ও সন্তুষ্টি] আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, তিনি নিজ অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন; আর আল্লাহ তা'আলা বড় অনুগ্রহশীল।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٢﴾

২২. কোনো বিপদ না পৃথিবীতে আসে, আর না বিশেষ করে তোমাদের প্রাণের উপর, কিন্তু তা [সমস্তই] এক বিশেষ কিতাবে [অর্থাৎ লওহে মাহফূজে] লিপিবদ্ধ রয়েছে, এর পূর্বে যে, আমি ঐ প্রাণসমূহকে সৃষ্টি করি; এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সহজ কাজ।

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ﴿٢٣﴾

২৩. যা তোমাদের হস্তচ্যুত হয়, তাতে যেন তোমরা দুঃখিত না হও, আর যা তোমাদেরকে দান করেছেন, তাতে যেন তোমরা গর্বিত না হও; আর আল্লাহ কোনো অহংকারী, গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ আর পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ আর আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ আর পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ মাত্র।

২১. سَابِقُوْٓا তোমরা ধাবিত হও اِلٰى مَغْفِرَةٍ ক্ষমার দিকে مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর وَجَنَّةٍ এবং এরূপ বেহেশতের দিকে عَرْضُهَا যার প্রশস্ততা كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার সমান اُعِدَّتْ তা ঐ সকল লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে ذٰلِكَ তা فَضْلُ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ তিনি নিজ অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ আর আল্লাহ তা'আলা বড় অনুগ্রহশীল।

২২. مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ কোনো বিপদ না পৃথিবীতে আসে وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ আর না বিশেষ করে তোমাদের প্রাণের উপর اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ কিন্তু তা এক বিশেষ কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا এর পূর্বে যে, আমি ঐ প্রাণসমূহকে সৃষ্টি করি اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সহজ কাজ।

২৩. لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ যা তোমাদের হস্তচ্যুত হয়, তাতে যেন তোমরা দুঃখিত না হও وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ আর যা তোমাদেরকে দান করেছেন তাতে যেন তোমরা গর্বিত না হও وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ আর আল্লাহ কোনো অহংকারী গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না।

২৪. যারা এরূপ যে, নিজেও [নেক কাজে] কৃপণতা করে থাকে, আর অন্য লোকদেরকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয়; আর যে [সত্য ধর্ম হতে] বিমুখ হবে, তবে [এতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই। কেননা] আল্লাহ অভাবহীন, প্রশংসনীয়।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ যারা এরূপ যে, নিজেও কৃপণতা করে থাকে وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ আর অন্য লোকদেরকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় وَمَنْ يَّتَوَلَّ আর যে বিমুখ হবে فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ তবে আল্লাহ অভাবহীন, প্রশংসনীয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রত্যেক মুমিনই কি সিদ্দীক ও শহীদ? وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মু'মিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত কাতাদাহ ও আমর ইবনে মায়মূন (রা.) বলেন, যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্দিক ও শহীদ।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- مُؤْمِنُوْ اُمَّتِيْ شُهَدَآءُ অর্থাৎ আমার উম্মতের সব মুমিন শহীদ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। –(ইবনে জারীর)

একদিন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর কাছে কিছুসংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলবেন ঃ كُلُّكُمْ صِدِّيْقٌ وَشَهِيْدٌ অর্থাৎ, আপনারা প্রত্যেকেই সিদ্দীক ও শহীদ। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা! আপনি এ কি বলছেন? তিনি জবাবে বললেন ঃ আমার কথা বিশ্বাস না করলে কুরআনের এই আয়াত পাঠ করুন :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ

কিন্তু কুরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মুমিন সিদ্দীক ও শহীদ নয় বরং মুমিনদের একটি উচ্চ শ্রেণিকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই:

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

এই আয়াত পয়গম্বরগণের সাথে মুমিনদের তিনটি শ্রেণি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে যথা, সিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহ। বাহ্যতঃ এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন: সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণির লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণগরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য আয়াতে সব মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মুমিনকেও কোনো না কোনো দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাঁদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে।

রূহুল-মা'আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামেল ও ইবাদতকারী মুমিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুবা যেসব মুমিন অসাবধান ও খেয়ালখুশিতে মগ্ন তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না। এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন اَللَّعَّانُوْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شُهَدَآءَ অর্থাৎ, যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হযরত ওমর ফারূক (রা.) একবার উপস্থিত জনতাকে বললেনঃ তোমাদের কি হলো যে, তোমরা কাউকে অপরের ইজ্জতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে করো না? জনতা আরজ করলঃ আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইজ্জতের উপরও হামলা চালাবে এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। হযরত ওমর (রা.) বললেন ঃ যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কিয়ামতর দিন পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উম্মতদের মোকাবিলায় সাক্ষ্য দিবে। –(রূহুল-মা'আনী)

তাফসীরে-মাযহারীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তার পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। আয়াতে هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ বাক্য থেকে বুঝা যায় যে, একমাত্র

সাহাবায়ে-কেরামই সিদ্দীক, অন্য কোনো মুমিন নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) বলেন ঃ সাহাবায়ে-কেরাম সকলেই পয়গম্বরসুলভ গুণগরিমার বাহক ছিলেন। যে ব্যক্তি একবার মুমিন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছে, সেই পয়গম্বরসুলভ গুণগরিমায় নিমজ্জিত হয়েছে।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ -

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরকালীন চিরস্থায়ী অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। মানুষের পরকালের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আজাবে ধৃত হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ ও তাতে নিমগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়।

পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এই ঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজ-সজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

لَعِبٌ শব্দের অর্থ এমন খেলা, যাতে মোটেই উপকার লক্ষ্য থাকে না যেমন কচি শিশুদের অঙ্গ চালনা। لَهْوٌ এমন খেলাধূলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন ও সময়ক্ষেপণ হলেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যায়াম অথবা অন্য কোনো উপকারও অর্জিত হয়ে যায়। যেমন-বড় বালকদের ফুটবল, লক্ষ্যভেদ অর্জন ইত্যাদি খেলা। হাদীসে লক্ষ্যভেদ অর্জন ও সাঁতার অনুশীলনকে উত্তম খেলা বলা হয়েছে। অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজন বিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لَعِبٌ এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لَهْوٌ শুরু হয়। এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তরেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং একেই সর্বোত্তম জ্ঞান করে। কিন্তু যখন এক স্তর ডিঙিয়ে অন্য স্তরে গমন করে, তখন বিগত স্তরের দুর্বলতা ও অসারতা তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বালক-বালিকারা খেলা-ধূলাকে জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ ও সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ধন মনে করে। কেউ কেউ তাদের খেলার সামগ্রী ছিনিয়ে নিলে তারা এত ব্যথা পায়, যেমন বয়স্কদের ধনসম্পদ, কুঠি, বাংলো ছিনিয়ে নিলে তারা ব্যথা পায়। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলে পর তারা বুঝতে পারে যে, যেসব বস্তুকে তারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছিল অসার ও অর্থহীন বস্তু। যৌবনে সাজসজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকাই থাকে জীবনের লক্ষ্য। বার্ধক্যে ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু যৌবনে যেমন শৈশবের কার্যকলাপ অসার মনে হয়েছিল, বার্ধক্যে পৌঁছেও তেমনি যৌবনের কার্যকলাপ অনর্থক মনে হতে থাকে। বার্ধক্য হচ্ছে জীবনের সর্বশেষ মনযিল। এ মনযিলে ধন ও জনের প্রাচুর্য এবং জাঁকজমক ও পদের জন্য গর্ব জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন পাক বলে যে, এই অবস্থাও সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর পরবর্তী দুটি স্তর বরযখ ও কিয়ামতের চিন্তা কর। এগুলোই আসল। অতঃপর কুরআন পাক বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে :

كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا -

- غَيْثٌ শব্দের অর্থ বৃষ্টি। كُفَّارٌ শব্দটি মু'মিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ كُفَّارٌ শব্দটিকে প্রসিদ্ধ অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফেররা আনন্দিত হয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ-শ্যামল ফসল দেখে কাফেররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসলমানরাও হয়। জবাব এই যে, মু'মিনের আনন্দ ও কাফেরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। মু'মিন আনন্দিত হলে তার চিন্তাধারা আল্লাহ তা'আলার দিকে থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, এই সুন্দর ফসল আল্লাহর কুদরত ও রহমতের ফল। সে একেই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে না। তার আনন্দের সাথে পরকালের চিন্তাও সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধনরত্ন পেয়েও মু'মিন কাফেরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে 'কাফের আনন্দিত হয়' বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ-শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফেররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে

পীত বর্ণ হয়, এর পরে সম্পূর্ণ খড়কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য-পরকালের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ অর্থাৎ পরকালে মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে-কোনো একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য কঠোর আজাব রয়েছে। অপরটি মুমিনের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

এখানে প্রথমে আজাব উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রথম আয়াতে উল্লিখিত দুনিয়া নিয়ে মাতাল ও ঔদ্ধত্য হওয়ার পরিণামও কঠোর আজাব। কঠোর আজাবের বিপরীতে দুটি বিষয় ক্ষমা ও সন্তুষ্টি উল্লেখ করা হয়েছে। ইঙ্গিত আছে যে, পাপ মার্জনা করা একটি নিয়ামত, যার পরিণতিতে মানুষ আজাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু পরকালে এতটুকুই হয় না; বরং আজাব থেকে বাঁচার পর মানুষ জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়ামত দ্বারাও ভূষিত হয়। এটা রিযওয়ান তথা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে।

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে : وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ অর্থাৎ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ-প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর পরকালের আজাব ও ছওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশি করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

–অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে, জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের কোনো ভরসা নেই অতএব, সৎকাজে শৈথিল্য ও টালবাহানা করো না। এরূপ করলে কোনো রোগ অথবা ওজর তোমার সৎকাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎকাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌঁছতে পার।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎকাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। হযরত আলী (রা.) তাঁর উপদেশাবলিতে বলেন : তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমনকারী এবং সর্বশেষ নির্গমনকারী হও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন ঃ জেহাদে সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্যে অগ্রসর হও। হযরত আনাস (রা.) বলেন ঃ জামাতের নামাজের প্রথম তাকবীরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর। –(রূহুল মা'আনী)

জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আল-ইমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سَمٰوٰتٌ বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্র করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশি হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্তম আকাশ ঐ পৃথিবীর আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশি عَرْضٌ শব্দটি কোনো সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতিই বুঝা যায়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ পূর্বের আয়াতে জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জান্নাত ও তার অক্ষয় নিয়ামতরাজি মানুষের কর্মের ফল এবং মানুষের কর্মই এর জন্যে যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম জান্নাত লাভের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব নিয়ামত লাভ করেছেন, তার সারাজীবনের সৎকর্ম এগুলোর বিনিময়ও হতে পারে না, জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামতরাজির মূল্য তো হওয়া দূরের কথা। অতএব আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ও বোখারী বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে-কেরাম বললেন " আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেন হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারি না– আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি। –(মাযহারী)

দু'টি পার্থিব বিষয় মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাফেল করে দেয়। এক. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। এ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। দুই. বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ ও আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

مَآاَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا –অর্থাৎ, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে-মাহফূযে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ –আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ তা'আলা লওহে-মাহফূযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজন্যে দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভালো-মন্দ অবস্থা নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লাসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোনো কোনো বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোনো কোনো বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে পরকালের পুরস্কার ও ছওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও ছওয়াব হাসিল করতে হবে। -(রূহুল মা'আনী)

পরবর্তী আয়াতে সুখ ও ধন-সম্পদের কারণে ঔদ্ধত্য ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ –অর্থাৎ, আল্লাহ ঔদ্ধত্য ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নিয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহর কাছে ঘৃণার্হ। কিন্তু পছন্দ করেন না, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো প্রত্যেক কাজে আল্লাহর পছন্দ ও অপছন্দের প্রতি চিন্তা করা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُصَّدِّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَصَدُّقٌ মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ– দানশীল পুরুষ।

اَلصِّدِّيْقُوْنَ : শব্দটি صديق -এর বহুবচন اسم مبالغة অর্থ– সত্যবাদী।

اِعْلَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহস বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– জেনে রাখ। অর্থ- তোমরা উৎসাহিত করছ, তোমরা নিজেরা জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছ।

تَفَاخُرٌ : বাবে تَفَاعُلٌ -এর মাসদার। মূলবর্ণ (ف - خ - ر) জিনস صحيح অর্থ– পরস্পরে আত্মগর্ব কর।

تَكَاثُرٌ : বাবে تَفَاعُلٌ -এর মাসদার, মূলবর্ণ (ك - ث - ر) জিনস صحيح অর্থ– পরস্পরে প্রাচুর্য বর্ণনা কর।

سَابِقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُسَابَقَةٌ ও سِبَاقٌ মূলবর্ণ (س - ب - ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ধাবিত হও।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ : এখানে اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা لَايُحِبُّ বাক্যটি তার খবর। আর لَايُحِبُّ ফে'ল তার উহ্য যমীর ফায়েল, আর كُلَّ مُخْتَالٍ হলো মাফউল এবং فَخُوْرٍ হলো مُخْتَالٍ-এর সিফত। [ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৫]

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

২৫. আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি দিয়ে প্রেরণ করেছি এবং আমি তাদের সঙ্গে কিতাব ও ইনসাফ [করার নির্দেশ] -কে অবতারণ করেছি, যেন মানুষ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, আর আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে কঠোর ভীতি রয়েছে এবং মানুষের জন্য আরো নানাবিধ উপকার রয়েছে, আর যেন আল্লাহ জেনে নেন যে, কে তাঁকে এবং তাঁর রাসূলগণকে প্রত্যক্ষ না করে সাহায্য করে; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রান্ত।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ۚ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فٰسِقُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, আর আমি তাঁদের বংশধরগণের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব প্রচলিত রেখেছি, বস্তুতঃ তাদের মধ্যে কতিপয় সৎপথ প্রাপ্ত হলো, আর তাদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট ছিল।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنٰهُ الْإِنْجِيلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۗ

২৭. অনন্তর তাদের পরে আমার অন্যান্য রাসূলগণকে ক্রমান্বয়ে পাঠাতে থাকলাম, আর তাদের পরে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করলাম এবং তাঁকে ইনজিল প্রদান করলাম, আর যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল, আমি তাদের অন্তরসমূহে মমতা ও রহমত সৃষ্টি করে দিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. لَقَدْ أَرْسَلْنَا আমি প্রেরণ করেছি رُسُلَنَا আমার রাসূলগণকে بِالْبَيِّنٰتِ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি দিয়ে وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ এবং আমি তাদের সাথে অবতারণ করেছি الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ কিতাব ও ইনসাফকে لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ যেন মানুষ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ আর আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ যাতে কঠোর ভীতি রয়েছে وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ এবং মানুষের জন্য আরো নানাবিধ উপকার রয়েছে وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ আর যেন আল্লাহ জেনে নেন যে مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ কে তাঁকে এবং তাঁর রাসূলগণকে প্রত্যক্ষ না করে সাহায্য করে إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রান্ত।

২৬. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا আর আমি রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি نُوحًا وَإِبْرٰهِيمَ নূহ ও ইবরাহীমকে وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا আর আমি তাদের বংশধরগণের মধ্যে প্রচলিত রেখেছি النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ নবুয়ত ও কিতাব فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ বস্তুত তাদের মধ্যে কতিপয় সৎপথ প্রাপ্ত হলো وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فٰسِقُونَ আর তাদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট ছিল।

২৭. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا অনন্তর তাদের পরে আমার অন্যান্য রাসূলগণকে ক্রমান্বয়ে পাঠাতে থাকলাম وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ আর তাদের পরে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করলাম وَآتَيْنٰهُ الْإِنْجِيلَ এবং তাকে ইঞ্জীল প্রদান করলাম وَجَعَلْنَا আর আমি সৃষ্টি করে দিলাম فِي قُلُوبِ তাদের অন্তরসমূহে الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল رَأْفَةً وَرَحْمَةً মমতা ও রহমত

** আর তারা বৈরাগ্যকে নিজেরা প্রবর্তন করে নিল আমি তাদের উপর তা বিধিবদ্ধ করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা অবলম্বন করেছিল; কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি, সুতরাং তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আমি তাদেরকে তাদের বিনিময় প্রদান করেছি, আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই পথভ্রষ্ট।	وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. হে [ঈসার প্রতি] ঈমান আনয়নকারীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় রহমত হতে দ্বিগুণ অংশ দান করবেন, আর তোমাদেরকে এমন এক নূর দিবেন যে, তা নিয়ে তোমরা চলাফেরা করবে, তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন; আর আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল, করুণাময়।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾
২৯. যেন কিতাবীগণ [যারা ঈমান আনেনি, তারা] জানতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের কোনো অংশের উপর তাদের অধিকার নেই, আর এটাও [জানতে পারে] যে, অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, আর আল্লাহ তা'আলা সুমহান করুণার অধিপতি।	لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا আর তারা বৈরাগ্যকে নিজেরা প্রবর্তন করে নিল مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ আমি তাদের উপর তা বিধি-বদ্ধ করিনি اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা অবলম্বন করেছিল فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ সুতরাং তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আমি তাদেরকে প্রদান করেছি اَجْرَهُمْ তাদের বিনিময় وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ, আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই পথভ্রষ্ট।

২৮. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে ঈমান আনয়নকারীগণ اتَّقُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় রহমত হতে দ্বিগুণ অংশ দান করবেন وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا আর তোমাদেরকে এমন এক নূর দিবেন যে, تَمْشُوْنَ بِهٖ তা নিয়ে তোমরা চলাফেরা করবে وَيَغْفِرْ لَكُمْ তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ, আর আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল, করুণাময়।

২৯. لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ যেন কিতাবীগণ জানতে পারে যে اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ আল্লাহর অনুগ্রহের কোনো অংশের উপর তাদের অধিকার নেই وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ আর এটাও যে, অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ, আর আল্লাহ তা'আলা সুমহান করুণার অধিপতি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

শানে নুযূলঃ তাবারানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক এবং ইবনে আবী হাতেম সাঈদ বিন জুবাইর (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা দু'জন বলেন যে, নাজ্জাশীর চল্লিশজন সহচর রাসূল ﷺ এর নিকট আগমন করেন। অতঃপর রাসূল ﷺ-এর সাথে ওহুদ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। তাদের অনেকেই আহত হলেন তবে তাদের হতে কেউই নিহত বা শাহাদাত বরণ করেন নি। সে সময়ে তারা মুমিনদের অর্থাভাবের সংকটে নিপতিত দেখতে পেয়ে তারা রাসূল ﷺ কে বললেন হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমরাতো স্বচ্ছল আমাদেরকে অনুমতি দান করুন। আমরা মালামাল নিয়ে আসি এবং তা দ্বারা মুসলমানদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করব। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ...... بِمَا جَهَدُوْا আয়াত নাজিল করেন। সুতরাং তাদের জন্যে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। উক্ত আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন তারা বলল, হে মুসলমানগণ! আমাদের থেকে যারা ঈমান গ্রহণ করবে তাদের দ্বিগুণ প্রতি দান দেওয়া হবে। আর তোমাদের কিতাবের প্রতি যারা ঈমান গ্রহণ করবে না তাদের জন্যে রয়েছে তোমাদের ন্যায় প্রতিদান। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–(রুহুল মা'আনী : ১৯৩/২৭/১৪, কুরতুবী : ২২৭/১৭, দুররে মানছূর : ১৭৮/৬)

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

শানে নুযূল ঃ- হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, আহলে কিতাব ইহুদি এবং নাসারা সম্প্রদায়গুলো মুসলমানদের প্রতি যখন ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল, তাদের সম্পর্কে তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। মুজাহিদ (র.) বলেন, ইহুদিরা বলল, খুব শীঘ্রই, আমাদের থেকে একজন নবী আগমন করবেন তিনি হাত পা কেটে দিবেন। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন আরব বংশে আগমন করেন, তখন তারা নবীকে অস্বীকার করে বসল। তাদের সেই ঈর্ষার বহি:প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী : ২২৮/১৭, দুররে মানছূর)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ الخ

ঐশী কিতাব ও পয়গম্বর প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা ঃ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

بَيِّنَاتٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিধানাবলিও হতে পারে; এবং এর উদ্দেশ্য মু'জেযা এবং রিসালাতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে। –(ইবনে কাছীর) পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাজিলের আলাদা উল্লেখ বাহ্যতঃ শেষোক্ত তাফসীরের সমর্থক। অর্থাৎ, بَيِّنَاتٌ বলে মু'জেযা ও প্রমাণাদি বুঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলির জন্যে কিতাব নাজিল করার কথা বলা হয়েছে।

কিতাবের সাথে 'মীযান' নাজিল করারও উল্লেখ আছে। মীযানের আসল অর্থ পরিমাপযন্ত্র। প্রচলিত দাঁড়িপাল্লা ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ওজন করার জন্যে নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও 'মীযান'-এর অর্থে শামিল আছে; যেমন আজকাল আলো, উত্তাপ ইত্যাদির পরিমাপযন্ত্র প্রচলিত আছে।

আয়াতে কিতাবের ন্যায় 'মীযানের' বেলায়ও নাজিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাজিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গম্বরগণ পর্যন্ত পৌঁছা সুবিদিত। কিন্তু 'মীযান নাজিল করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে তাফসীরে রূহুল-মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মীযান নাজিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহারও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলি নাজিল করা। কুরতুবী বলেন, প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাজিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আরবদের বাকপদ্ধতিতে এর নজির বিদ্যমান আছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ اَنْزَلْنَا الْكِتَابَ وَوَضَعْنَا الْمِيزَانَ অর্থাৎ, আমি কিতাব নাজিল করেছি ও দাঁড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। সূরা আর-রহমানের وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে مِيزَانَ শব্দের সাথে وَضَعَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে দাঁড়িপাল্লা নাজিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে, এর সাহায্যে ওজন করে দায়-দেনা পূর্ণ করতে হবে।

কিতাব ও 'মীযানের পর লৌহ নাজিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাজিল করার মানে সৃষ্টি করা। কুরআন পাকের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাজিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুষ্পদ জন্তু আসমান থেকে নাজিল হয় না-পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাজিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহুপূর্বেই লওহে-মাহফুজে লিখিত ছিল-এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ। -(রূহুল মা'আনী)

আয়াতে লৌহ নাজিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। **(এক)** এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে আল্লাহর বিধান ও ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। **(দুই)** এতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোনো শিল্প চলতে পারে না।

এখানে আরো একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ, মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, পয়গম্বরগণও আসমানি কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। 'মীযান ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, তারা কোনো প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূরপরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে।

এখানে আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কুরআন পাক ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিতাব ও মীযানকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করেছে। কিতাব থেকে দেনা-পাওয়া পরিশোধ ও তাতে হ্রাসবৃদ্ধির নিষেধাজ্ঞা জানা যায় এবং 'মীযান দ্বারা অপরের দেনা-পাওনার অংশ নির্ধারিত হয়। এই বস্তুদ্বয় নাজিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে লৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকল্পে লৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। এটা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃতপক্ষে চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। রাষ্ট্রের তরফ থেকে জোর-জবরদস্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্যে নয়; বরং পথের বাধা দূর করার জন্য বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে। চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ রূহুল-মা'আনীতে আছে এখানে واو অব্যয়টি এই বাক্যকে একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ لِيَنْفَعَهُمْ-আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়, মানুষ এর দ্বারা শিল্পকাজে উপকৃত হয় এবং আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ জেনে নেন কে লৌহের সমরাস্ত্র দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে ও ধর্মের জন্যে জিহাদ করে। আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু পূর্বেই জানেন। কিন্তু মানুষ কাজ করার পর তা আমলনামায় লিখিত হয়। এর মাধ্যমেই কাজটি আইনগত প্রকাশ লাভ করে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ الخ -

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পার্থিব হেদায়েত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পয়গম্বর প্রেরণ এবং তাদের সাথে কিতাব ও 'মীযান অবতরণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আ.)-এর এবং পরে পয়গম্বরগণের শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত পয়গম্বর ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তার সব এঁদেরই বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ, হযরত নূহ

(আ.)-এর সেই শাখাকে এই গৌরব অর্জনের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তারা সব ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর।

এই বিশেষ আলোচনার পর পয়গম্বরগণের সমগ্র পরম্পরাকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا অর্থাৎ, এরপর তাঁদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আ.)-এর উল্লেখ করে শেষনবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর শরিয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً –অর্থাৎ, যারা হযরত ঈসা (আ.) অথবা ইঞ্জীলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। رَاْفَةً ও رَحْمَتً শব্দদ্বয়কে সমার্থবোধক মনে করা হয়। এখানে ভিন্নমুখী করে উল্লেখ করায় কেউ কেউ বলেন ঃ رَاْفَةً এর অর্থ অতি দয়া। সাধারণ দয়ার চাইতে এতে যেমন আতিশয্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : কারও প্রতি দয়া করার দু'টি অভ্যাসগত কারণ থাকে। **এক**, সে কষ্টে পতিত থাকলে তার কষ্ট দূর করে দেওয়া। একে رَاْفَةً বলা হয়। **দুই,** কোনো বস্তুর প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করা। একে رَحْمَتٌ বলা হয়। মোটকথা رَاْفَةً -এর সম্পর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং رَحْمَتً -এর সম্পর্ক উপকার অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সর্বদিক দিয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই এই শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে رافة কে অগ্রে আনা হয়।

এখানে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাহাবী তথা হাওয়ারীগণের দু'টি বিশেষ গুণ رَاْفَةً ও رَحْمَتً উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবায়ে-কেরামের কয়েকটি বিশেষ গুণ সূরা ফাত্হ-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ কিন্তু এর আগে সাহবায়ে-কেরামের আরো একটি বিশেষ গুণ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ও বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ তাঁরা কাফেরদের প্রতি বজ্রকঠোর। পার্থক্যের কারণ এই যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের বিধান ছিল না। তাই কাফেরদের বিপক্ষে কঠোরতা প্রকাশ করার কোনো স্থানই সেখানে ছিল না।

সন্ন্যাসবাদের অর্থ ও জরুরি ব্যাখ্যা ঃ وَرَهْبَانِيَّةَنِ ابْتَدَعُوْهَا - رَهْبَانِيَّةً শব্দটি رُهْبَانٌ –এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। ও رَاهِبٌ رُهْبَانٌ –এর অর্থ যে ভয় করে। হযরত ঈসা (আ.)-এর পর বনী-ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষতঃ রাজন্যবর্গ ও শাসকশ্রেণি ইঞ্জীলের বিধানাবলির প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী-ইসলাঈলের মধ্যে কিছুসংখ্যক খাঁটি আলেম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে রুখে দাঁড়ালে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেন তারা দেখলেন যে, মোকাবেলার শক্তি তাঁদের নেই; কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাঁদের দ্বীন-ঈমান ও বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্যে জরুরি করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দিবেন, বিবাহ করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোনো জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দিবেন যাতে ধর্মের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আল্লাহর ভয়ে এই কর্ম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন; তাই তাঁরা رَاهِبٌ অথবা رُهْبَانٌ তথা সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হলো এবং তাঁদের উদ্ভাবিত মতবাদ رُهْبَانِيَّتٌ তথা সন্ন্যাসবাদ নামে খ্যাতি লাভ করল।

তাদের এ মতবাদ পরিস্থিতির চাপে অপারগ হয়ে নিজেদের ধর্মের হেফাজতের জন্য ছিল। তাই এটা মূলত ঃ নিন্দনীয় ছিল না। তবে কোনো বিষয়কে আল্লাহর জন্যে নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেয়ার পর তাতে ত্রুটি ও বিরুদ্ধাচরণ করা গুরুতর পাপ। উদাহরণতঃ মানত আসলে কারো উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোনো ব্যক্তি নিজে কোনো বস্তুকে মানত করতঃ নিজে উপর হারাম অথবা ওয়াজিব করে নিলে শরিয়তের আইনে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা গোনাহ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কতক লোক সন্ন্যাসবাদ নামের আড়ালে দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। কেননা জনসাধারণ তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং তাদের নিকট হাদিয়া ও নযর-নিয়ায নিয়ে আগমন করতে থাকে। তাদের চারপাশে নারী-পুরুষের ভিড় জমতে থাকে। ফলে বেহায়াপনাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে কুরআন পাক এ বিষয়েই তাদের সমালোচনা করেছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ বিলাস বিসর্জন দেওয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল-আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ করা হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল এটা পালন করা, কিন্তু তারা তাও ঠিকমতো পালন করতে পারেনি।

তাদের এই কর্মপন্থা মূলতঃ নিন্দনীয় ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর বর্ণিত এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি দল আজাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দলটি হযরত ঈসা (আ.)-এর পর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ ও ঐশ্বর্যশালী পাপাচারীদেরকে পূর্ণ শক্তি সহকারে রুখে দাঁড়ায়, সত্যের বাণী সর্বোচ্চে তুলে ধরে এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু অশুভ শক্তির মোকাবেলায় পরাজিত হয়ে তারা নিহত হয়। তাদের স্থলে অপর একদল দণ্ডায়মান হয়। তাদের মোকাবেলা করার এতটুকুও শক্তি ছিল না, কিন্তু তারা জীবনপণ করে মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়। পরিণামে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। কতককে করাত দ্বারা চিরা হয় এবং কতককে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় বিপদাপদে সবর করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে। এরপর তৃতীয় দল তাদের জায়গায় আসে। তাদের মধ্যে মোকাবেলারও শক্তি ছিল না এবং পাপাচারীদের সাথে থেকে নিজেদে ধর্ম বরবাদ করারও তারা পক্ষপাতী ছিল না। তাই তারা জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ বেছে নেয় এবং সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَاكَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ আয়াতে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা সন্যাসবাদ অবলম্বন করে তা যথাযথভাবে পালন করেছে এবং বিপদাপদে ছবর করেছে, তারাও মুক্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীরের সারমর্ম এই যে, যে ধরনের সন্যাসবাদ প্রথমে তারা অবলম্বন করেছিল, তা নিন্দনীয় ও মন্দ ছিল না তবে সেটা শরিয়তের বিধানও ছিল না। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর তা জরুরি করে নিয়েছিল। কিন্তু জরুরি করার পর কেউ কেউ একে যথাযথভাবে পালন করেনি। এখান থেকেই এর নিন্দনীয় ও মন্দ দিক শুরু হয়। যারা পালন করেনি; তাদের সংখ্যাই বেশি হয়ে গিয়েছিল। তাই অধিকাংশের কাজকে সবার কাজ ধরে নিয়ে কুরআন গোটা বনী-ইসরাঈল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, তারা যে সন্যাসবাদকে নিজেদের উপর জরুরি করে নিয়েছিল, তা যথাযথ পালন করেনি। فَمَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

এ থেকে আরো জানা গেল যে, اِبْتَدَعُوْ শব্দটি بِدْعَتْ থেকে উদ্ভূত হলেও এস্থলে এর আভিধানিক অর্থ বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, উদ্ভাবন করা। এখানে পারিভাষিক বিদআত বুঝানো হয়নি, যে সম্পর্কে হাদীসে আছে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ অর্থাৎ, প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা।

কুরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করলে উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সত্যতা ফুটে উঠে। সর্বপ্রথম এই বাক্যের প্রতিই লক্ষ্য করুন : وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً وَّرَهْبَانِيَّةَ

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামত প্রকাশ করার জায়গায় বলেছেনঃ আমি তাদের অন্তরে স্নেহ, দয়া ও সন্যাসবাদ সৃষ্টি করেছি। এ থেকে বুঝা যায় যে, স্নেহ ও দয়া যেমন নিন্দনীয় নয়, তেমনি তাদের অবলম্বিত সন্যাসবাদও সত্তাগতভাবে নিন্দনীয় ছিল না। নতুবা এ স্থলে একে স্নেহ ও দয়ার সাথে উল্লেখ করার কোনো কারণ ছিল না। এ কারণেই যারা সন্যাসবাদকে সর্বাবস্থায় দূষণীয় মনে করেন, তাদেরকে এ স্থলে বাক্যের সাথে رَهْبَانِيَّةَ শব্দটির সংযুক্তির ব্যাপারে অনাবশ্যক ব্যাকরণিক হেরফেরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারা বলেন যে, এখানে رَهْبَانِيَّةَ শব্দের আগে اِبْتَدَعُوْا বাক্যটি উহ্য আছে। ইমাম কুরতুবী তাই বলেছেন। কিন্তু উপরিউক্ত তাফসীর অনুযায়ী এই হেরফেরের কোনো প্রয়োজন থাকে না। এরপরও কুরআন পাক তাদের এই উদ্ভাবনের কোনোরূপ বিরূপ সমালোচনা করেনি; বরং সমালোচনা এ বিষয়ের কারণে করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের উদ্ভাবিত এই সন্যাসবাদ যথাযথ পালন করেনি। এটাও اِبْتِدَاعْ শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে নিলেই সম্ভবপর। পারিভাষিক অর্থে হলে কুরআন স্বয়ং এর বিরূপে সমালোচনা করত। কেননা, পারিভাষিক বিদআতও একটি পথভ্রষ্টতা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর পূর্বোক্ত হাদীসেও সন্যাসবাদ অবলম্বনকারী দলকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল গণ্য করা হয়েছে। তারা যদি পারিভাষিক বিদআতের অপরাধে অপরাধী হতো, তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়-পথভ্রষ্টদের মধ্যে গণ্য হতো।

সন্ন্যাসবাদ সর্বাবস্থায়ই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ ঃ বিশুদ্ধ কথা এই যে, رَهْبَانِيَّةً শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে, ভোগ-বিলাস বিসর্জন ও অবৈধ কাজ-কর্ম বর্জন। এর কয়েকটি স্তর আছে। (এক) কোনো অনুমোদিত ও হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করা। এই অর্থে সন্ন্যাসবাদ নিশ্চিত হারাম। কারণ এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি।

কুরআন পাকের يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা ও অবৈধতা বিধৃত হয়েছে। এই আয়াতে لَا تُحَرِّمُوْا শব্দটিই ব্যক্ত করছে যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহর বিধানাবলি পরিবর্তন ও বিকৃত করার নামান্তর।

(দুই) অনুমোদিত কাজকর্মকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত ঃ হারাম সাব্যস্ত করে না, কিন্তু কোনো কোনো পার্থিব কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদিত কাজ বর্জন করে। পার্থিব প্রয়োজন যেমন কোনো রোগব্যাধির আশঙ্কা করে কোনো অনুমোদিত বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় প্রয়োজন-যেমন, পরিণামে কোনো গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কোনো বৈধ কাজ বর্জন করা। উদাহরণতঃ মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি গোনাহ, থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ মানুষের সাথে মেলামেশাই বর্জন করে; কিংবা কোনো কু-স্বভাবের প্রতিকারার্থে কিছুদিন পর্যন্ত কোনো কোনো বৈধ কাজ বর্জন করতঃ তা ততদিন অব্যাহত রাখা, যতদিন কু-স্বভাব সম্পূর্ণ দূর না হয়ে যায়। সুফী বুযুর্গগণ মুরীদকে কম আহার, কম নিদ্রা ও কম মেলামেশার জোর আদেশ দেন। কারণ এটা প্রবৃত্তি বশীভূত হয়ে গেলে এবং অবৈধতায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দূর হয়ে গেলে এই সাধনা ত্যাগ করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসবাদ নয়; বরং তাকওয়া, যা ধর্মপরায়ণদের কাম্য এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে প্রমাণিত।

(তিন) কোনো অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত আছে সেরূপ ব্যবহার বর্জন করা এবং একেই ছওয়াব ও উত্তম মনে করা। এটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে لَا رَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই। এতে এই তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো হয়েছে। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে যে সন্ন্যাসবাদের গোড়াপত্তন হয়, তা ধর্মের হেফাজতের প্রয়োজনে হলে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ, তাকওয়ার মধ্যে দাখিল। কিন্তু কিতাবধারীদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ছিল। এই বাড়াবাড়ির ফলে তারা প্রথম স্তর অর্থাৎ, হালালকে হারাম করা পর্যন্ত পৌঁছে থাকলে তারা হারাম কাজ করেছে। আর তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছে থাকলেও এক নিন্দনীয় কাজের অপরাধী হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ ....

এই আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাসী কিতাবধারী মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে কেবল মুসলমানগণকে সম্বোধন করাই কুরআন পাকের সাধারণ রীতি। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বেলায় 'আহলে কিতাব' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট ও ধর্তব্য নয়। কাজেই তারা اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারণ রীতির বিপরীতে খ্রিস্টানদের জন্য اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত ঃ এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ এটাই হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দাবি। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরিউক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও ছওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক ছওয়াব হযরত মূসা (আ.) অথবা ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও তাঁদের শরিয়ত পালন করার এবং দ্বিতীয় ছওয়াব শেষনবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান ও তাঁর শরিয়ত পালন করার এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কাফের ছিল এবং কাফেরদের কোনো ইবাদত গ্রহণীয় নয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিগত শরিয়তানুযায়ী তাদের সব কাজকর্ম নিষ্ফল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফের মুসলমান হয়ে গেলে তার কাফের অবস্থায় কৃত সব সৎকর্ম বহাল করে দেওয়া হয়। ফলে সে দুই ছওয়াবের অধিকারী হয়।

لِئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ এখানে لَا অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত বিধানাবলি এজন্যে বর্ণনা করা হলো যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে কেবল হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই আল্লাহ তা'আলার কৃপা লাভের যোগ্য নয়। যদি তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা আল্লাহর কৃপালাভে সমর্থ হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْحَدِيْدُ : একবচন, বহুবচনে حَدِيْدَاتٌ ও حَدَائِدُ অর্থ– লৌহ।

اِبْتَدَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِدَاعٌ মূলবর্ণ (ب - د - ع) জিনস صحيح অর্থ– প্রবর্তন করল, আবিষ্কার করল।

مَا رَعَوْهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার رِعَايَةٌ মূলবর্ণ (ر - ع - ى) জিনস ناقص يائ অর্থ– তারা পালন করেনি।

قَفَّيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْفِيَةُ মূলবর্ণ (ق - ف - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পাঠাতে থাকলাম।

رَأْفَةً : বাব فَتَحَ-এর মাসদার। মূলবর্ণ رَأَفَ জিনস مهموز عين অর্থ– মমতা।

كِفْلَيْنِ : সীগাহ تثنيه مذكر মানসূব। كِفْلٌ-এর দ্বিবচন অর্থ– দ্বিগুণ অংশ।

تَمْشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَشْىٌ মূলবর্ণ (م - ش - ى) জিনস ناقص يائ অর্থ– চলাফেরা করবে।

اَنْ لَّا يَقْدِرُوْنَ : এখানে اَنْ অব্যয়টি তাশদীদযুক্ত اَنَّ থেকে সহজিকৃত, هُمْ যমীরে শান উহ্য আছে।

لَا يَقْدِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَدْرُ মূলবর্ণ (ق - د - ر) জিনস صحيح অর্থ– তাদের অধিকার নেই, তারা সক্ষম নয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ : এখানে فاء টি تعريفية আর مِنْهُمْ হলো خبر قدم আর مُّهْتَدٍ হলো مبتدا موخر এবং كَثِيْرٌ হলো মুবতাদা আর مِنْهُمْ হলো كثير-এর সিফত এবং فَاسِقُوْنَ হলো كَثِيْرٌ-এর খবর। [ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড: পৃ. ৪৩৮-৪৩৯]

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : এখানে اللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা ذُو الْفَضْلِ হলো তার খবর আর اَلْفَضْلُ الْعَظِيْمِ হলো اَلْفَضْلُ-এর সিফত। [ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ৪৪২]

পারা : ২৮

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ
সূরা মুজাদালাহ

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২২, রুকূ'– ৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. নিশ্চয় আল্লাহ্ ঐ স্ত্রীলোকটির কথা শুনেছেন, যে স্বীয় স্বামীর ব্যাপারে আপনার নিকট বাদানুবাদ করছিল এবং আল্লাহর সমীপে অভিযোগ করছিল, আর আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শ্রবণ করছিলেন; আল্লাহ্ সব শুনেন সব দেখেন।	قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللهِ ۖ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ اِنَّ اللهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿١﴾
২. তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি যেহার করে, তারা তাদের মা নয়; তাদের মা তো কেবল তারাই, যারা তাদেরকে প্রসব করেছে; আর নিঃসন্দেহে তারা একটি অসঙ্গত ও মিথ্যা উক্তি করছে; আর নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী।	اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۚ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۚ وَاِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٢﴾
৩. আর যারা নিজ নিজ স্ত্রীদের প্রতি যেহার করে, অতঃপর নিজেদের উক্ত কথার সংশোধন করতে চায়,	وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قَدْ سَمِعَ اللهُ নিশ্চয় আল্লাহ শুনেছেন قَوْلَ الَّتِيْ ঐ স্ত্রীলোকটির কথা تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا যে স্বীয় স্বামীর ব্যাপারে আপনার নিকট বাদানুবাদ করছিল وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللهِ এবং আল্লাহর সমীপে অভিযোগ করছিল وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শ্রবণ করছিলেন اِنَّ اللهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ আল্লাহ সব শুনেন, সব দেখেন।

২. اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ যারা যেহার করে مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে مِّنْ نِّسَآئِهِمْ নিজেদের স্ত্রীর প্রতি مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ তারা তাদের মাতা নয় اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ তাদের মাতা তো কেবল তারাই যারা তাদেরকে প্রসব করেছে وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ নিঃসন্দেহে তারা করছে مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا একটি অসঙ্গত ও মিথ্যা উক্তি وَاِنَّ اللهَ আর নিশ্চয় আল্লাহ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী।

৩. وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ আর যারা নিজ নিজ স্ত্রীদের প্রতি যেহার করে ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا অতঃপর নিজেদের উক্ত কথার সংশোধন করতে চায়

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٣﴾

** তবে তাদের কর্তব্য যে, একটি দাস অথবা দাসী আজাদ করে এর পূর্বে যে, উভয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করে; এটা দ্বারা তোমাদেরকে নসিহত করা হচ্ছে, আর আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤﴾

৪. অনন্তর যার সামর্থ্য না থাকে, তার জিম্মায় উভয়ের পরস্পর মিলনের পূর্বে ধারাবাহিক দুই মাস রোজা রাখা, অনন্তর যে তা না পারে, তবে ষাট জন মিসকিনকে আহার করাবে; এ নির্দেশ এই জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন; আর এটা আল্লাহর (নির্ধারিত) বিধান; আর কাফেরদের জন্য কঠোর যন্ত্রণাময় আজাব রয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥﴾

৫. যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা (পৃথিবীতেও) এরূপ লাঞ্ছিত হবে যেরূপ এদের পূর্ববর্তী লোকেরা লাঞ্ছিত হয়েছিল। আর আমি স্পষ্ট বিধানসমূহ অবতীর্ণ করেছি; আর (পরলোকেও) কাফেরদের অবমাননাকর আজাব হবে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٦﴾

৬. যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে (পুনর্বার) জীবিত করবেন, অতঃপর তাদের সমস্ত কৃতকর্ম তাদেরকে জানিয়ে দিবেন; আল্লাহ্ তা রক্ষিত রেখেছেন অথচ তারা তা ভুলে গেছে; আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে অবহিত রয়েছেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

** فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ তবে তার কর্তব্য একটি দাস অথবা দাসী আজাদ করা مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا এর পূর্বে যে, উভয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করে ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ এটা দ্বারা তোমাদেরকে নসিহত করা হচ্ছে وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন।

৪. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ অনন্তর যার সামর্থ্য না থাকে فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ তার জিম্মায় দুমাস রোজা রাখা مُتَتَابِعَيْنِ ধারাবাহিক مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا উভয়ের পরস্পর মিলনের পূর্বে فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ অনন্তর যে এটাও না পারে فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا তবে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে ذٰلِكَ এই নির্দেশ এজন্য যে, لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর বিধান وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ আর কাফেরদের কঠোর যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

৫. اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে। كُبِتُوْا তারা এরূপ লাঞ্ছিত হবে كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যেরূপ এদের পূর্ববর্তী লোকেরা লাঞ্ছিত হয়েছিল وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ আর আমি স্পষ্ট বিধান সমূহ অবতীর্ণ করেছি وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ আর কাফেরদের অবমাননাকর আজাব হবে।

৬. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে জীবিত করবেন فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا অতঃপর তাদের সমস্ত কৃতকর্ম তাদেরকে জানিয়ে দিবেন اَحْصٰىهُ اللّٰهُ আল্লাহ তা রক্ষিত রেখেছেন وَنَسُوْهُ অথচ তারা তা ভুলে গেছে وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে অবহিত রয়েছেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧﴾

৭. আপনি কি তা লক্ষ্য করেননি যে, আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন, যা আসমানসমূহে আছে, আর যা জমিনে আছে? এমন কোনো তিন জনের কানাঘুষা হয় না, যাতে তিনি (আল্লাহ্) চতুর্থ না হন, আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না হন, আর না এটা অপেক্ষা কম আর না এটা অপেক্ষা অধিক হয়, কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন তারা যেখানেই হোক না কেন, অনন্তর তাদেরকে কিয়ামত দিবসে তাদের কৃতকর্মসমূহ জানিয়ে দিবেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ অবগত আছেন।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ؗ وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٨﴾

৮. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি যে যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তৎপরও তারা যা নিষেধ করা হয়েছিল তা করে থাকে? এবং কানাঘুষা করে থাকে পাপ কার্যের এবং উৎপীড়নের এবং রাসূলের অবাধ্যতার, আর যখন তারা আপনার নিকট উপস্থিত হয়, তখন আপনাকে এমন শব্দ দ্বারা সালাম করে, যা দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে সালাম করেননি, এবং নিজেদের মনে মনে বলে, আমাদের এ উক্তির জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে কেন শাস্তি প্রদান করেন না? তাদের জন্য দোজখই যথেষ্ট, তাতে তারা প্রবেশ করবে, বস্তুতঃ তা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. اَلَمْ تَرَ আপনি কি তা লক্ষ্য করেননি اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ আল্লাহ সবকিছুই জানেন مَا فِى السَّمٰوٰتِ যা আসমানসমূহে আছে وَمَا فِى الْاَرْضِ আর যা জমিনে আছে مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى এমন কোনো কানাঘুষা হয় না ثَلٰثَةٍ তিন জনের اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ যাতে তিনি চতুর্থ না হন وَلَا خَمْسَةٍ আর পাঁচ জনেরও হয় না اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ যাতে তিনি ষষ্ঠ না হন وَلَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ আর না এটা অপেক্ষা কম وَلَاۤ اَكْثَرَ আর না এটা অপেক্ষা অধিক হয় اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন اَيْنَ مَا كَانُوْا তারা যেখানেই হোক না কেন ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ অনন্তর তাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا عَمِلُوْا তাদের কৃতকর্ম সমূহ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ অবগত আছেন।

৮. اَلَمْ تَرَ আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ তৎপরও তারা তা করে থাকে لِمَا نُهُوْا عَنْهُ যা নিষেধ করা হয়েছিল وَيَتَنٰجَوْنَ এবং কানাঘুষা করে থাকে بِالْاِثْمِ পাপ কার্যের وَالْعُدْوَانِ এবং উৎপীড়নের وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ এবং রাসূলের অবাধ্যতার وَاِذَا جَآءُوْكَ আর যখন তারা আপনার নিকট উপস্থিত হয় حَيَّوْكَ তখন আপনাকে এমন শব্দ দ্বারা সালাম করে بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ যা দ্বারা আল্লাহ আপনাকে সালাম করেননি وَيَقُوْلُوْنَ فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ আর নিজেদের মনে মনে বলে لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ আল্লাহ কেন আমাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন না بِمَا نَقُوْلُ আমাদের এই উক্তির জন্য حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ তাদের জন্য দোজখই যথেষ্ট يَصْلَوْنَهَا তাতে তারা প্রবেশ করবে فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ বস্তুত তা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩﴾

৯. হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোনো প্রয়োজনে পরামর্শ কর, তখন তোমরা পাপ ও উৎপীড়ন এবং রাসূলের অবাধ্যতার কানাঘুষা করো না, বরং পরোপকার ও পরহেজগারির বিষয়ে পরামর্শ কর; আর আল্লাহকে ভয় কর, যার সম্মুখে তোমরা সকলে একত্রিত হবে।

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. এরূপ কানাঘুষা শুধু শয়তানের পক্ষ হতে হয়, যেন মুমিনদেরকে কষ্টে ফেলে, আর সে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারে না; আর মুমিনদের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

১১. হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসের মধ্যে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও, আল্লাহ তোমাদেরকে (জান্নাতে) প্রশস্ত স্থান প্রদান করবেন, আর যখন বলা হয় যে, (মজলিস হতে) উঠে পড়, তখন উঠে পড়, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার, আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন, এবং তাদেরকেও (বাড়িয়ে দিবেন) যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে; আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে মুমিনগণ اِذَا تَنَاجَيْتُمْ যখন তোমরা কোনো প্রয়োজনে পরামর্শ কর فَلَا تَتَنَاجَوْا তখন তোমরা কানাঘুষা করো না بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ পাপ ও উৎপীড়ন وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ এবং রাসূলের অবাধ্যতার وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوٰى বরং পরোপকার ও পরহেজগারির বিষয়ে পরামর্শ কর وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ যার সম্মুখে তোমরা সকলে সমবেত হবে।

১০. اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ এরূপ কানাঘুষা শুধু শয়তানের পক্ষ হতে لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যেন মুসলমানদেরকে কষ্টে ফেলে وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا আর সে তাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারে না اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ আর মুমিনদের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।

১১. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে মুমিনগণ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ যখন তোমাদেরকে বলা হয় تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ মজলিসের স্থান প্রশস্ত করে দাও فَافْسَحُوْا তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ত স্থান প্রদান করবেন وَاِذَا قِيْلَ আর যখন বলা হয় যে انْشُزُوْا উঠে পড় فَانْشُزُوْا তখন উঠে পড় يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ এবং তাদেরকেও যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
১২. হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা রাসূলের সাথে পরামর্শ (করতে ইচ্ছা) কর, তখন তোমাদের এ পরামর্শের পূর্বে কিছু সদকা প্রদান কর; এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পবিত্র থাকার উত্তম উপায়; অনন্তর যদি তোমাদের সামর্থ্য না থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়ালু।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾
১৩. তোমরা কি তোমাদের পরামর্শের পূর্বে সদকা করতে কষ্টকর মনে কর? অতএব, যখন তোমরা তা করতে পারলে না, আর আল্লাহ তোমাদের অবস্থার উপর অনুগ্রহ করলেন, তখন তোমরা নামাজের পাবন্দি কর এবং জাকাত আদায় কর, আর আল্লাহ্ ও তার রাসূলের নির্দেশ পালন কর; আর আল্লাহ তোমাদের সকল কাজ পূর্ণভাবে জানেন।	ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳﴾
১৪. আপনি কি ঐ লোকদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে, যাদের উপর আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন; তারা (অর্থাৎ এ মুনাফেকরা) তোমাদের মধ্যেও নয় এবং তাদের মধ্যেও নয়, আর তারা মিথ্যা কথার উপর শপথ করে বসে অথচ তারা জানে।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে মুমিনগণ اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ যখন তোমরা রাসূলের সাথে পরামর্শ কর فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً তখন তোমাদের এই পরামর্শের পূর্বে কিছু সদকা করো ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর وَاَطْهَرُ এবং পবিত্র থাকার উত্তম উপায়। فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا অনন্তর যদি তোমাদের সামর্থ্য না থাকে فَاِنَّ اللّٰهَ তবে আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ ক্ষমাশীল رَّحِيْمٌ দয়ালু।

১৩. ءَاَشْفَقْتُمْ তোমরা কি ভয় পেয়েছ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ তোমাদের পরামর্শের পূর্বে সদকা করতে فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا অতএব যখন তোমরা তা করতে পারলে না وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ আর আল্লাহ তোমাদের অবস্থার উপর অনুগ্রহ করলেন فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ তখন তোমরা নামাজের পাবন্দি কর وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত আদায় কর وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন কর وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ আর আল্লাহ তোমাদের সকল কাজ পূর্ণভাবে জানেন।

১৪. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ আপনি কি ঐ লোকদের প্রতি লক্ষ্য করেননি تَوَلَّوْا قَوْمًا যারা এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ যাদের উপর আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ এরা তোমাদের মধ্যেও নয় এবং তাদের মধ্যেও নয় وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ আর তারা মিথ্যা কথার উপর শপথ করে বসে وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অথচ তারা জানে।

أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

১৫. আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন; নিঃসন্দেহে তারা মন্দ কার্যসমূহ করত।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٦﴾

১৬. তারা তাদের (সে মিথ্যা) শপথগুলোকে (আত্মরক্ষার) ঢালস্বরূপ করে নিয়েছে, অতঃপর (অন্যান্যকেও) আল্লাহর রাস্তা হতে বিরত রাখে, সুতরাং তাদের জন্য অবমাননাকর আজাব হবে।

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۚ أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

১৭. (তখন) তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে আল্লাহ (-র আজাব) হতে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে না; এরা দোজখের অধিবাসী; তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾

১৮. যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনর্বার জীবিত করবেন, তখন তারা তার সম্মুখেও (মিথ্যা) শপথ করে বসবে যেরূপ তোমাদের নিকট শপথ করে থাকে, আর এরূপ ধারণা করবে যে, আমরা ভালো অবস্থায় রয়েছি; খুব শুনে রাখ, তারা বড় মিথ্যাবাদী।

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۚ أُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

১৯. শয়তান তাদের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে, অনন্তর সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে; এরা শয়তানের দল; ভালোরূপে শুনে রাখ, এ শয়তানের দল নিশ্চয় ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন عَذَابًا شَدِيدًا কঠোর শাস্তি إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ নিঃসন্দেহে তারা মন্দ কার্য সমূহ করত।

১৬. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ তারা তাদের শপথ গুলোকে করে নিয়েছে جُنَّةً ঢালস্বরূপ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ অতঃপর আল্লাহর রাস্তা হতে বিরত রাখে فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ সুতরাং তাদের জন্য অবমাননাকর আজাব হবে।

১৭. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا আল্লাহ হতে কিছু মাত্র أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ এরা দোজখের অধিবাসী هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

১৮. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনর্বার জীবিত করবেন فَيَحْلِفُونَ لَهُ তখন তারা তার সম্মুখেও মিথ্যা শপথ করে বসবে كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ যেরূপ তোমাদের নিকট শপথ করে থাকে وَيَحْسَبُونَ আর এরূপ ধারণা করবে أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ আমরা ভালো অবস্থায় রয়েছি أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ খুব শুনে রাখ, এরা বড় মিথ্যাবাদী।

১৯. اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ শয়তান তাদের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ অনন্তর সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে أُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ এরা শয়তানের দল أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ভালোরূপে শুনে রাখ এই শয়তানের দল নিশ্চয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

২০. যারা আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ط إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

২১. আল্লাহ তা'আলা এ কথা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, আমি এবং আমার রাসূল জয়ী থাকব; নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমতাবান, মহাপরাক্রান্ত।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ط أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ط رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ط أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ط أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

২২. যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আপনি তাদেরকে এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী, যদিও তারা তাদের পিতা অথবা তাদের পুত্র অথবা তাদের ভ্রাতা অথবা তাদের বংশধরই হউক না কেন; আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহে ঈমান দৃঢ় করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে শক্তিসম্পন্ন করেছেন; আর তাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে; আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন, আর তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে; এরাই আল্লাহ তা'আলার দল; খুব শুনে রাখ –আল্লাহ তা'আলার দলই সফলকাম হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. إِنَّ الَّذِينَ যারা يُحَادُّونَ বিরোধিতা করে اللَّهَ وَرَسُولَهُ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ তারা চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২১. كَتَبَ اللَّهُ আল্লাহ তা'আলা একথা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي আমি এবং আমার রাসূল জয়ী থাকব إِنَّ اللَّهَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ক্ষমতাবান, মহাপরাক্রান্ত।

২২. لَا تَجِدُ قَوْمًا আপনি তাদেরকে দেখবেন না يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ যারা আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী وَلَوْ كَانُوا যদিও হোক না কেন তারা آبَاءَهُمْ তাদের পিতা أَوْ أَبْنَاءَهُمْ অথবা তাদের পুত্র أَوْ إِخْوَانَهُمْ অথবা তাদের ভ্রাতা أَوْ عَشِيرَتَهُمْ অথবা তাদেরই বংশধর أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহে ঈমান দৃঢ় করে দিয়েছেন وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে শক্তি সম্পন্ন করেছেন وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ আর তাদেরকে এমন উদ্যান সমূহে দাখিল করবেন تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নহর সমূহ বইতে থাকবে خَالِدِينَ فِيهَا তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন وَرَضُوا عَنْهُ আর তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ এরাই আল্লাহ তা'আলার দল أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ আল্লাহ তা'আলার দলই هُمُ الْمُفْلِحُونَ সফলকাম হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ কথা স্বীকৃত যে, تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ সে হিসেবে অত্র প্রথম আয়াতে উল্লিখিত تُجَادِلُكَ শব্দ হতে গ্রহণ করে এর নামকরণ করা হয়েছে মুজাদালাহ। مجادلة -এর অর্থ হলো– বাদানুবাদকারী বা বিতর্ককারী নারী। কেননা এ সূরার প্রথমেই এমন একজন মহিলার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে নিজ স্বামীর যিহার [أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ তুমি আমার মায়ের পিঠের ন্যায়] সংক্রান্ত মামলা দায়ের করেছিল এবং বারবার এমন দাবি উত্থাপন করছিল যে, আপনি এমন কোনো উপায় ও ব্যবস্থা করে দিন যার ফলে তার ও তার সন্তানদের জীবন নিশ্চিত ধ্বংস হতে রক্ষা পেতে পারে। তার এরূপ পৌনঃপুনিক কথাকে মহান আল্লাহ মুজাদালাহ বলেছেন। যার ফলে এ সূরার নাম রাখা হয়েছে মুজাদালাহ। এতে ৩টি রুকূ'; '২২টি আয়াত, ৪৭৩ টি বাক্য এবং ১৯৯২ টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : মুজাদালার এ ঘটনা করে ও কখন সংঘটিত হয়েছে হাদীসের কোনো বর্ণনায় তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য মূল সূরার বিষয়বস্তুতে এ বিষয়ে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তার উপর ভিত্তি করে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, এ ঘটনা আহযাব যুদ্ধের [৫ম হিজরির শাওয়াল মাসের] পরে সংঘটিত হয়েছিল। সূরা আহযাবে 'মুখে ডাকা পুত্র প্রকৃত পুত্র নয়' এ কথা বলার পর শুধু এতটুকু বলা হয়েছিল– وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰئِيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ "তোমরা তোমাদের যেসব স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' কর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি। কিন্তু 'যিহার' করা যে কি রকমের পাপ বা অপবাদ তা সেখানে কিছুই বলা হয়নি; এ ধরনের কাজ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি সে সম্বন্ধেও কিছু বলা হয়নি; কিন্তু আলোচ্য সূরায় যিহার সংক্রান্ত সমস্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তা হতে জানা গেল যে, সূরা আহযাবে বলা উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত কথারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরবর্তী সময়ে এ সূরায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু :

১. সূরার শুরুতে ১ নম্বর হতে ৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত যিহার সংক্রান্ত শরিয়তের বিধি-বিধান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. ৭ নম্বর আয়াত হতে ১০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত 'তানাজী' অর্থাৎ গোপন কান-পরামর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ইহুদি ও মুনাফিকরা মু'মিনদের কষ্ট দেওয়ার জন্য এ কান-পরামর্শে লিপ্ত হতো। এখানে কান-পরামর্শের হুকুম ও তার পরিণাম সম্বন্ধে মু'মিনদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পরে মু'মিনদেরকে সান্ত্বনার বাণীও শুনানো হয়েছে এ কথা বলে যে, মুনাফিক ও ইহুদিদের এরূপ আচরণে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। পরে ইহুদিদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ১১ নম্বর আয়াত হতে ১৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত মুসলিম জনগণকে বৈঠক ও মজলিসের সভ্যতা সংক্রান্ত আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি শেখানো হয়েছে। বিশেষত নবী করীম ﷺ-এর মজলিসে কি রকম আদব-কায়দা মেনে চলতে হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. ১৪ নম্বর আয়াত হতে সূরার শেষ পর্যন্ত মুসলিম সমাজের লোকদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সে মানদণ্ডের কথা, যার ভিত্তিতে দীন ইসলামের প্রকৃত নিষ্ঠাবান লোক কে, তা যাঁচাই করা হয়। অর্থাৎ সেই হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগযু ফিল্লাহ'র হাকীকত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, ঈমানের পূর্ণতা লাভের জন্য যা নিতান্তই প্রয়োজন। –[সাফওয়া ও যিলাল]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণের উল্লেখ রয়েছে। আর অত্র সূরায় এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-এর মাধ্যমে এমন হেদায়েতনামা প্রেরণ করেন যার দ্বারা মানব জীবনের কঠিন ও জটিল সমস্যার সমাধান হয় এবং শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করা হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে–

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا

মূলত প্রাক-ইসলামি যুগে যদি কোনো মানুষ তার স্ত্রীকে মা বলে বসত তবে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যেত এবং তাদের উভয়ের মিলনের পথ চিররুদ্ধ হয়ে যেত। –[নূরুল কুরআন]

সূরার আমল : এ সূরা কোনো রুগ্ণ ব্যক্তির নিকট পাঠ করলে সে নিদ্রিত হয়ে পড়ে। আর যদি কেউ এ সূরা লিপিবদ্ধ করে খাদ্যদ্রব্যে রাখে, তবে খাদ্যসামগ্রী নিরাপদ থাকে। কারো জ্বর হলে আসরের নামাজের পর এ সূরা তিনবার পাঠ করে দম করলে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তার জ্বর ভালো হয়ে যায়। –[নূরুল কুরআন]

সূরার [স্বপ্নের] তা'বীর : যদি কোনো ব্যক্তি সূরা মুজাদালাহ স্বপ্নে পাঠ করতে দেখে– যদি সে আলেম হয় তবে তার শত্রু পরাজিত হয়, আর যদি যে আলেম না হয় তবে দুশমনের বিজয়ী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। –[নূরুল কুরআন]

১. বুখারী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, কত পবিত্র সত্তার অধিকারী সেই আল্লাহ তা'আলা, যিনি সমগ্র বিশ্বের কথা শ্রবণ করেন। ঐ স্ত্রীলোকটি যখন এ ঝগড়া নিয়ে এসেছিল। সে আমার কক্ষেই বসেছিল এবং এ কথা বলছিল তখন আমি আমার ঘরের এক কোণে বসা ছিলাম কিন্তু আমি তার সব কথা শুনতে পারিনি অথচ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সপ্ত আসমানের উপরে বসে তার কথা শ্রবণ করেছিলেন। সে যখন বলছিল, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ফরিয়াদ করি। তখন অল্প সময়ের মধ্যেই হযরত জিবরাঈল (আ.) আলোচ্য আয়াতগুলো নিয়ে হাজির হলেন। –[মাযহারী, বুখারী, তাবারী]

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জাহিলিয়া যুগে যখন কোনো লোক নিজের স্ত্রীকে أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ [তুমি আমার উপর আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়] এ কথাটি বলত তখন সে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যেত। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে লোক নিজের স্ত্রীর সাথে যেহার করেছিলেন, তিনি হলেন আউস। অতঃপর লজ্জিত হয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, রাসূল ﷺ-এর কাছে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করো। যখন সে [স্ত্রী] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল। তখনই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো। –[দুররে মানছূর, বায়হাকী]

৩. খাওলা বিনতে ছা'লাবা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার স্বামী আউস ইবনে সামেত আমার সাথে যেহার করেছিলেন, তখন আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়েছিলাম অভিযোগ করার জন্য। তখন তিনি [রাসূল ﷺ] আমার সাথে সে ব্যাপারে কথোপকথন করছিলেন এবং বলছিলেন, আল্লাহকে ভয় করো, আউস তোমার চাচাতো ভাই।

আমি চলে আসার পূর্বেই কুরআনের আয়াত قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا হতে فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে একজন দাস আজাদ করতে হবে। উত্তরে আমি বললাম, সে দাস আজাদ করতে পারবে না। তখন তিনি বললেন, তাহলে লাগাতার দু'মাস রোজা রাখতে হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে বৃদ্ধ লোক, তার রোজা রাখার শক্তি নেই। তখন তিনি বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে। আমি বললাম, সদকা করার মতো তার কাছে কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন, আমি তাকে এক আরক খেজুর দিয়ে সাহায্য করবো। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে আরও এক আরক খেজুর দিয়ে সাহায্য করবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলরেন, তুমি এ ইহসান করে ভালো করলে। যাও সেগুলো দিয়ে তার পক্ষ থেকে ষাট জন মিসকিনকে খাবার খাওয়াও এবং তোমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে যাও। অপর এক বর্ণনায় ষাট সা' বলা হয়েছে। –[রাওয়ায়েউল বয়ান, আবূ দাউদ, ইমাম আহমদ]

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ إِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿١﴾

শানে নুযূল : একটি বিশেষ ঘটনা এই সূরার প্রথমিক কয়েকটি আয়াত অবতরণের হেতু। হযরত আওস ইবনে সামেত (রা.) একবার তার স্ত্রী খাওলাকে বলে দিলেন أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ অর্থাৎ তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়; মানে হারাম। ইসলাম পূর্বকালে এই বাক্যটি স্ত্রী চিরতরে হারাম করার জন্যে বলা হতো, যা ছিল চূড়ান্ত তালাক অপেক্ষাও কঠোরতর। এই ঘটনার পর হযরত খাওলা (রা.)-এর শরিয়তসম্মত বিধান জানার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ দরবারে উপস্থিত হলেন তখন পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কোনো ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি পূর্ব থেকে প্রচলিত নীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন مَا أَرَاكِ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ অর্থাৎ আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে গেছো। খাওলা এ কথা শুনে বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন। আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করেছি। এখন বার্ধক্যে সে আমার সাথে এই ব্যবহার করল। আমি কোথায় যাব। আমারও আমার বাচ্চাদের ভরণ পোষণ কিরূপে হবে। এ রেওয়ায়েতে খাওলার এ উক্তিও বর্ণিত আছে مَا ذَكَرَ طَلَاقًا আমার স্বামীতো

তালাক উচ্চারণ করেনি। এমতাবস্থায় তালাক কিরূপে হয়ে গেল? অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে খাওলা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলল اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَشْكُوْ اِلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহ আমি তোমার কাছে অভিযোগ করছি। এক রেওয়ায়েতে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওলাকে এ কথা বললেন مَا اُمِرْتُ فِىْ شَانِكِ بِشَيْءٍ حَتّٰى الْاٰنَ অর্থাৎ তোমার মাসআলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়নি। [এসব রেওয়ায়েতে কোনো বৈপরীত্য নেই। সবগুলোই সঠিক হতে পারে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। –[সূত্র- মা'আরিফুল কুরআন বাংলা ১৩৪৫, দুররে মানসুর, ইবনে কাসীর]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ

শানে নুযূল : ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু ইহুদিরা যখন কোনো মুসলমানকে দেখত বা কোনো মুসলমান তাদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা পরস্পর কানাঘুষা শুরু করে দিত। তাতে মুসলমান ব্যক্তি মনে করত যে, তার বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত করা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা বিরত হলো ন। এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (٨)

শানে নযূল : ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলে দুষ্টমির ছলে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ-এর পরিবর্তে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বলত। سَامٌ অর্থ– মৃত্যু। আর মনে মনে বলত এ আমাদের এরূপ বলার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছে না কেন? এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[মা'রিফুল কুরআন বাংলা ১৩৪৫, কানযুন নুকূল, লুবাবুন নুকূল]

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (١٠)

শানে নুযূল : মুনাফিকরাও পরস্পর কানাঘুষা করত তাতে মু'মিনগণ রাগন্বিত হতো এবং তাদের এ ধরনের আচরণকে খারাপ মনে করতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[কানযুন নুকুল ৯৮, লুবাবুন নুকুল]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا ....وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (١١)

শানে নুযূল : একবার হুজুর ﷺ মসজিদে সুফফায় অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদে অনেক লোক সমাগত ছিল। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থান পেলেন না। মজলিসের লোকজনও চেপে চেপে বসে স্থান করে দিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নির্বিকার দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোককে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন। মুনাফিকরা 'এটা কেমন ইনসাফ' বলে আপত্তি জানালো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, যে আপন ভাইয়ের জন্যে জায়গা খালি করে দেয়। এরপর লোকেরা জায়গা খালি করে দিল। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

রেওয়ায়েতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে জায়গা খালি করে দেওয়ার কথা বলেন তখন কেউ কেউ খালি করে দিল, যা পর্যাপ্ত ছিল না। এবং কেউ কেউ খালি করল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে উঠে যেতে বলেছেন, যা মুনাফিকদের মনঃপুত হয়নি।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٢)

শানে নুযূল–১ : কোনো কোনো বিত্তশালী লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কানকথা বলত। ফলে নিঃস্ব মুসলমানগণ কথাবার্তা বলে উপকৃত হওয়ার সময় কম পেত। রাসূলুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছেও ধনীদের দীর্ঘক্ষণ বসে কানকথা অপছন্দনীয় ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

–[সূত্র- তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন বাংলা ১৩৪৫]

শানে নুযূল–২ : ফাতহুল বয়ানে বর্ণিত আছে ইহুদি ও মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনাবশ্যত কানকথা বলত। মুসলমানগণ কোনো ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে কান কথা হচ্ছে ধারণা করে তা পছন্দ করতো না। ফলে তাদেরকে নিষেধ করা হয় যা نُهُوْا عَنْهُ বাক্যে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু যখন তারা বিরত হলো না তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এর ফলশ্রুতিতে বাতিলপন্থিরা কানাকানি করা থেকে বিরত হয়। কারণ অর্থ প্রীতির কারণে সদকা প্রদান করা তাদের জন্যে কষ্টকর ছিল।

শানে নুযূল–৩ : মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আলাদাভাবে অনেক মাসআলা মাসায়েল জিজ্ঞেস করতো। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট হতো। তাই আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর বোঝা হালকা করার জন্যে রাসূলের সাথে কানকথা বলার পূর্বশর্ত হিসাবে সদকা পেশ করার নির্দেশ জারি করে এ আয়াত নাজিল করেন। –[সূত্র- কুরতুবী ১৭ : ৩০১]

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۚ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا.........وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٣)

শানে নুযূল–১ : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করার আদেশ হলো তখন অনেক জরুরি কথাও বন্ধ করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

এ আয়াতের মাধ্যমে সদকার আদেশও রহিত হয়ে যায়। কারণ এর ফলে সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। হযরত আলী (রা.) প্রায় বলতেন, কুরআনে একটি আয়াত এমন আছে যা আমাকে ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি। আমার পূর্বেও না, আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ হলো যে, সদকা প্রদানের নির্দেশ নাজিল হওয়ার পর একমাত্র হযরত আলী (রা.) সর্ব প্রথম একে বাস্তবায়িত করে। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন। এবং পরে এই নির্দেশ রহিত হয়ে যায় ফলে কেউ বাস্তবায়ন করার সুযোগ পাননি।

শানে নুযূল–২ : এ আয়াতের আরও একটি শানে নুযূল হযরত আলী ইবনে আবী তালেব থেকে এভাবে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যখন يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الخ অর্থাৎ হে মুমিনগণ তোমরা রাসূলে সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে এর পূর্বে সদকা প্রদান করবে। আলোচ্য আয়াত নাজিল হলে তখন নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি ভাবছ? এক দীনার করে দিতে পারবে? আমি বললাম, এর ক্ষমতা নেই আমার। তিনি বললেন, তা হলো অর্ধ দীনার? আমি বললাম তাতেও আমি সক্ষম নই। তিনি বললেন তবে কত পারবে? আমি বললাম, একটা যব পরিমাণ পারি। তিনি বললেন, তুমি তো খুবই গরিব। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমার কারণেই আল্লাহ পাক এই উম্মতকে এই বিধান সহজ করে দিলেন। –[তিরমিযী ২য় খণ্ড]

শব্দের কিছুটা পরিবর্তনের সাথে উক্ত আয়াতের শানে নুযূল কুরতুবীর ১৭ নং খণ্ডে এবং মুখতাসার ইবনে কাসীরের ৩ নং খণ্ডে বর্ণিত আছে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (١٤)

শানে নুযূল : কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে এই আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল মুনাফিক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের সাথে বসা ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ দেহবয়ব বেঁটে গোধুম বর্ণ এবং সে ছিল হালকা শ্মশ্রুমণ্ডিত। নবী করীম ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দেও কেন? সে শপথ করে বলল, আমি এরূপ করিনি। এরপর সে তারা সঙ্গীদেরকেও ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন। –[কুরতুবী : ১৭]

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ...........اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٢٢)

শানে নুযূল : এ আয়াত হযরত আবূ উবাইদাহ ইবনে জাররাহ সম্পর্কে ঐ সময় নাজিল হয়েছে যখন তিনি বদর কিংবা উহুদ যুদ্ধে তার মুশরিক পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে জাররাহকে হত্যা করেছেন।

উক্ত আয়াতে তার তথা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর ভক্ত অর্থাৎ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখে না। যদিও সে কাফের তাদের পিতা পুত্র ভ্রাতা অথবা নিকটাত্মীয়ও হয় সাহাবায়ে কেরাম সবারই এই অবস্থা ছিল এ স্থলে তাফসীরবিদগণ অনেক সাহাবীর এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন যাতে পিতা পুত্র ভ্রাতা প্রমুখের মুখ থেকে ইসলাম অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছেন তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এবং কতককে হত্যাও করেছেন। –[কুরতুবী ১৭ : ৩০৭]

শানে- নুযূল–১ : অবতরণের হেতুঃ একটি বিশেষ ঘটনা এই সূরার প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত অবতরণের হেতু। হযরত আওস ইবনে সামেত (রা.) একবার তাঁর স্ত্রী খাওলাকে বলে দিলেন ঃ اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ অর্থাৎ তুমি আমার পক্ষে আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়; মানে হারাম। ইসলাম-পূর্বকালে এই বাক্যটি স্ত্রীকে চিরতরে হারাম করার জন্যে বলা হতো, যা ছিল চূড়ান্ত তালাক অপেক্ষাও কঠোরতর। এই ঘটনার পর হযরত খাওলা (রা.) এর শরিয়তসম্মত বিধান জানার জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি কোনো ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন ঃ مَا اَرَاكِ اِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ অর্থাৎ আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে গেছ। খাওলা একথা শুনে বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করেছি। এখন বার্ধক্যে সে আমার সাথে এই ব্যবহার করল। আমি কোথায় যাব। আমার ও আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ কিরূপে হবে। এক রেওয়ায়েতে খাওলার এ উক্তিও বর্ণিত আছে ঃ مَا ذَكَرَ طَلَاقًا অর্থাৎ আমার স্বামী তো তালাক উচ্চারণ করেনি। এমতাবস্থায় তালাক কিরূপে হয়ে গেল? অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, খাওলা আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَشْكُوْ اِلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অভিযোগ করছি। এক রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওলাকে একথা বললেন ঃ مَا اُمِرْتُ فِيْ شَاْنِكِ بِشَيْءٍ حَتّٰى الْاٰنَ অর্থাৎ তোমার মাসআলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়নি (এসব রেওয়ায়েতে কোনো বৈপরীত্য নেই। সবগুলোই সঠিক হতে পারে।) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

-(দুররে-মানসূর, ইবনে-কাসীর)

ফিকহের পরিভাষায় এই বিশেষ মাসালাটিকে 'যেহার' বলা হয়। এই সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহে যেহারের শরিয়তসম্মত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাওলার (রা.) ফরিয়াদ শুনে তার জন্যে তার সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন। তার খাতিরে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে এসব আয়াত নাজিল করেছেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিন খলীফা হযরত ওমর (রা.) একদল লোকের সাথে গমনরত ছিলেন। পথিমধ্যে এই মহিলা সামনে এসে দণ্ডায়মান হলে তিনি দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন। কেউ কেউ বলল ঃ আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে রাখলেন। খলীফা বললেন ঃ জানো ইনি কে? এ সেই মহিলা, যার কথা আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশের উপরে শুনেছেন। অতএব, আমি কি তাঁর কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহর কসম, তিনি যদি স্বেচ্ছায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রাত্রি পর্যন্ত তার সাথে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকাতাম। -(ইবনে-কাসীর)

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ -পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব আয়াতে উল্লিখিত নারী হলেন হযরত আওস ইবনে সামেত (রা.)-এর স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামী তাঁর সাথে যেহার করেছিলেন। তিনি এই অভিযোগ নিয়ে রাসূলে কারীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সম্মান দান করে এসব আয়াত নাজিল করলেন। আল্লাহ তা'আলা এসব আয়াতে কেবল যেহারের শরিয়তসম্মত বিধান বর্ণনা এবং তাঁর কষ্ট দূর করার ব্যবস্থাই করেননিঃ বরং তাঁর মনোরঞ্জনের জন্যে শুরুতেই বলে দিলেন ঃ যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল, আমি তার কথা শুনেছি। একবার জওয়াব দেওয়া সত্ত্বেও মহিলা বার বার নিজের কষ্ট বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আয়াতে একেই مُجَادَلَة বলা হয়েছে। কতক রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জওয়াবে খাওলাকে বললেন ঃ তোমার ব্যাপারে আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোনো বিধান নাজিল হয়নি। তখন দুঃখিনীর মুখে একথা উচ্চারিত হলো ঃ আপনার প্রতি তো প্রত্যেক ব্যাপারে বিধান নাজিল হয়। আমার ব্যাপারে কি হলো যে, ওহীও বন্ধ হয়ে গেল। -(কুরতুবী) এরপর খাওলা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। এর প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাজিল হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন ঃ সেই সত্তা পবিত্র, যিনি সব আওয়াজ ও প্রত্যেকের ফরিয়াদ শুনেন; খাওলা বিনতে সা'লাবা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমি তার কোনো কেনো কথা শুনতে পারিনি। অথচ আল্লাহ তা'আলা সব শুনেছেন এবং বলেছেন ঃ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ (বোখারী, ইবনে-কাসীর)

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ : يُظٰهِرُوْنَ শব্দটি ظِهَارٌ থেকে উদ্ভূত। স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে ظِهَارٌ বলা হয়। এটা ইসলাম– পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। পদ্ধতিটি এই ঃ স্বামী স্ত্রীকে বলে দিবে– اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ অর্থাৎ তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের মতো হারাম। এখানে পেটই আসল উদ্দেশ্য, কিন্তু রূপকভঙ্গিতে পৃষ্ঠদেশের উল্লেখ করা হয়েছে। –(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইসলামি শরিয়ত এই প্রথার দ্বিবিধ সংস্কার সাধন করেছেন। প্রথমত ঃ স্বয়ং যেহারের প্রথাকেই অবৈধ ও গোনাহ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ কাম্য হলে তার বৈধ পন্থা হচ্ছে তালাক। সেটা অবলম্বন করা দরকার। যেহারকে একাজের জন্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা স্ত্রীকে মাতা বলে দেওয়া একটা অসার ও মিথ্যা বাক্য। কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ مَا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـئِيْ وَلَدْنَهُمْ অর্থাৎ তাদের এই অসার উক্তির কারণে স্ত্রী মাতা হয়ে যায় না। মাতা তো সে-ই যার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে ঃ এরপর বলেছে ঃ

وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا

অর্থাৎ তাদের এই উক্তি মিথ্যা এবং পাপও। কারণ বাস্তব ঘটনার বিপরীতে স্ত্রীকে মাতা বলছে।

দ্বিতীয় সংস্কার এই করেছে যে, যদি কোনো মূর্খ অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামি শরিয়তে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তাকে দেওয়া হবে না বরং তাকে জরিমানাস্বরূপ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সে যদি এই উক্তি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাফ্ফারা আদায় করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কাফ্ফারা আদায় না করলে স্ত্রী হালাল হবে না।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا আয়াতের অর্থ তাই। এখানে لِمَا قَالُوْا শব্দটি عَمَّا قَالُوْا শব্দের অর্থে। ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আপন উক্তি প্রত্যাহার করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) يَعُوْدُوْنَ শব্দের অর্থ করেন يَنْدَمُوْنَ অর্থাৎ একথা বলার পর তারা অনুতপ্ত হয় এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়। -[মাযহারী]

এই আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ যেহার কাফ্ফারার কারণ নয়। বরং যেহার করা এমন গোনাহ যার কাফ্ফারা হচ্ছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আয়াত শেষে وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই কোনো ব্যক্তি যদি যেহার করার পর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তবে কোনো কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন করা না জায়েজ। স্ত্রী দাবি করলে কাফ্ফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা তালাক দিয়ে মুক্ত করা ওয়াজিব। স্বামী স্বেচ্ছায় এরূপ না করলে স্ত্রী আদালতে রুজু হয়ে স্বামীকে এরূপ করতে বাধ্য করতে পারে।

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ : অর্থাৎ যেহারের কাফ্ফারা এই যে, একজন দাস অথবা দাসীকে মুক্ত করবে। এরূপ করতে সক্ষম না হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোজা রাখবে। রোগ-ব্যাধি কিংবা দুর্বলতাবশতঃ এতগুলো রোজা রাখতেও সক্ষম না হলে সাত জন মিসকিনকে জনপ্রতি একজনের ফিতরা পরিমাণ গম কিংবা তার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওজনে একজনের ফিতরার পরিমাণ হচ্ছে পৌনে দু'সের গম।

যেহারের বিস্তরিত বিধান ও কাফ্ফারার মাস'আলা ফিকহর কিতাবসমূহে দ্রষ্টব্য। হাদীসে আছে, খাওলা বিনতে সা'লাবার ফরিয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আলোচ্য আয়াতসমূহে যেহারের বিধান অবতীর্ণ হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্বামীকে ডাকলেন। দেখা গেল যে, সে একজন ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন বৃদ্ধ লোক। তিনি তাকে আয়াত ও কাফ্ফারার বিধান শুনিয়ে বললেন : একজন দাস অথবা দাসী মুক্ত করে দাও। সে বলল : একজন দাস ক্রয় করে মুক্ত করার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই। তিনি বললেন : তা হলে ধারাবাহিক দুই মাস রোজা রাখ। সে বলল : সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করেছেন– আমার অবস্থা এই যে, আমি দিনে দু'তিন বার আহার না করলে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। তিনি বললেন : তা হলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে আরজ করল : আপনি সাহায্য না করলে এরূপ করার সমর্থ্যও আমার নেই। অগত্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কিছু গম দিলেন এবং অন্যরাও কিছু গম চাঁদা তুলে এনে দিল। এভাবে ষাটজন মিসকিনকে ফিতরার পরিমাণে গম দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা হলো। –[ইবনে কাসীর]

ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : এই আয়াতে ঈমান বলে শরিয়ত ও বিধানাবলি পালন বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ কাফ্ফারা ইত্যাদির বিধান আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। এই সীমা ডিঙানো হারাম। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইসলাম বিবাহ, তালাক, যেহার ও অন্যান্য সব ব্যাপারে মূর্খতা যুগের প্রথা-পদ্ধতি বিলোপ করে সুষম ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। যারা এসব সীমা মানে না তারা কাফের, তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহর সীমা ও ইসলামের বিধানাবলি পালন করার তাকীদ ছিল। এই আয়াতে বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এতে পার্থিব লাঞ্ছনা ও উদ্দেশ্যে ব্যর্থতা এবং পরকালে কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ : এতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে পাপাচার করে যায় এবং তা তার স্মরণও থাকে না। স্মরণ না থাকার কারণ হচ্ছে একে মোটেই গুরুত্ব না দেওয়া। কিন্তু তার সব পাপাচার আল্লাহর কাছে লিখিত আছে। আল্লাহ তা'আলার সব স্মরণ আছে। এজন্যে আজাব হবে।

শানে নুযূল : উপরিউক্ত আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ কয়েকটি ঘটনা (এক) ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু ইহুদিরা যখন কোনো মুসলমানকে দেখত, তখন তার চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে পরস্পরে কানাকানি শুরু করে দিত। মুসলমান ব্যক্তি মনে করত যে, তার বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত করা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা বিরত হলো না। এর পরিপ্রেক্ষিতে اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(দুই) মুনাফিকরাও এমনিভাবে পরস্পরে কানাকানি করত। এর পরিপ্রেক্ষিতে اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا আয়াত নাজিল হলো। (তিন) ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলে দুষ্টুমির ছলে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার পরিবর্তে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বলত। سَامٌ শব্দের অর্থ মৃত্যু। (চার.) মুনাফিকরাও এমনিভাবে বলত। উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনে-কাসীর ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, ইহুদিরা এভাবে সালাম করে চুপিসারে বলত ঃ

لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ - অর্থাৎ আমাদের এই গোনাহের কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? (পাঁচ) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে সুফ্ফায় অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদে অনেক লোক সমাগম ছিল। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থান পেলেন না। মজলিসের লোকজনও চেপে চেপে বসে স্থান করে দিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নির্বিকার দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোককে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন। মুনাফিকরা 'এটা কেমন ইনসাফ' বলে আপত্তি জানাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বললেন ঃ আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, যে আপন ভাইয়ের জন্যে জায়গা খালি করে দেয়।

এরপর লোকেরা জায়গা খালি করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। -(ইবনে-কাসীর)

রেওয়ায়েতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে জায়গা খালি করে দেওয়ার কথা বলে থাকবেন। কেউ কেউ খালি করে দিল, যা পর্যাপ্ত ছিল না এবং কেউ কেউ খালি করল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে উঠে যেতে বলেছেন, যা মুনাফিকদের মনঃপুত হয়নি। (ছয়) কোনো কোনো বিত্তশালী লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কানকথা বলত। ফলে নিঃস্ব মুসলমানগণ কথাবার্তা বলে উপকৃত হওয়ার সময় কম পেত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছেও ধনীদের দীর্ঘক্ষণ বসে কানকথা অপছন্দনীয় ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিত اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফতহুল বয়ানে বর্ণিত আছে-ইহুদি ও মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনাবশ্যক কানকথা বলত। মুসলমানগণ কোনো ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে কানকথা হচ্ছে ধারণা করে তা পছন্দ করত না। ফলে তাদেরকে নিষেধ করা হয়, যা نُهُوْا عَنْهُ বাক্যে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু যখন তারা বিরত হলো না, তখন اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ আয়াত অবতীর্ণ হলো। এর ফলশ্রুতিতে বাতিলপন্থিরা কানাকানি করা থেকে বিরত হয়। কারণ অর্থ প্রীতির কারণে সদকা প্রদান করা তাদের জন্যে কষ্টকর ছিল।

ﷺ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করার আদেশ হলো, তখন অনেকে জরুরি কথাও বন্ধ করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে .... ءَاَشْفَقْتُمْ আয়াত নাজিল হলো। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন ঃ সদকা প্রদান করার আদেশে পূর্ব থেকেও فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا আয়াত অসমর্থ লোকদের বেলায় আদেশ শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক সম্পূর্ণ অসমর্থও ছিল না এবং পুরোপুরি বিত্তশালীও ছিল না। কম সামর্থ্য এবং অক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহের কারণে সম্ভবতঃ তাদের জন্যেই সদকা প্রদান করা কষ্টকর হয়েছিল। তাই তারা সদকা প্রদান করতে পারেনি এবং নিজেদেরকে আদেশের আওতা বহির্ভূতও মনে করেনি। আর কানকথা বলা ইবাদতও ছিল না যে, এটা ত্যাগ করলে নিন্দার পাত্র হয়ে যাবে। তাই তার কানকথা বলা বন্ধ করেছিল। -(সবগুলো রেওয়ায়েতই দুররে-মানসূরে বর্ণিত আছে।) অবতরণের এসব হেতু জানার ফলে আয়াতসমূহের তাফসীর বোঝা সহজ হবে। -(বয়ানুল কুরআন)

❖ আলোচ্য আয়াতসমূহ শানে-নুযূলে বর্ণিত বিশেষ ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও কুরআনি নির্দেশসমূহ ব্যাপক হয়ে থাকে। এগুলোতে আকায়েদ, ইবাদত, পারস্পরিক লেন-দেন ও সামাজিকতার যাবতীয় বিধি-বিধান বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও পারস্পরিক কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে এমনি ধরনের কতিপয় বিধান আছে।

গোপন পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ ঃ গোপন পরামর্শ সাধারণতঃ বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে হয়ে থাকে, যাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা এই গোপন রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না। তাই এরূপ ক্ষেত্রে কারও প্রতি জুলুম করা, কাউকে হত্যা করা, কারও বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করা ইত্যাদি বিষয়েরও পরিকল্পনা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলেছেন যে, আল্লাহর জ্ঞান সমগ্র বিশ্বজগতকে পরিবেষ্টিত। তোমরা যেখানে যত আত্মগোপন করেই পরামর্শ কর, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ ও দৃষ্টির দিক দিয়ে তোমাদের কাছে থাকেন এবং তোমাদের প্রত্যেক কথা শুনেন, দেখেন ও জানেন। যদি তাতে কোনো পাপ কাজ কর, তবে শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এতে বলা উদ্দেশ্য তো এই যে, তোমরা যতই কম বা বেশি মানুষের সাথে পরামর্শ ও কানাকানি কর না কেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। উদাহরণস্বরূপ তিন ও পাঁচের সংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তিন জনে পরামর্শ কর, তবে বুঝে নাও যে, চতুর্থজন আল্লাহ তা'আলা সেখানে বিদ্যমান আছেন। আর যদি পাঁচ জনে পরামর্শ কর, তবে ষষ্ঠ জন আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান আছেন। তিন ও পাঁচের সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, দলের জন্যে আল্লাহর কাছে বেজোড় সংখ্যা পছন্দনীয়। مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ আয়াতের সারমর্ম তাই।

কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى –শানে নুযূলের ঘটনায় বলা হয়েছে, ইহুদি ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা চালাতে পারত না। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্তর্নিহিত জিঘাংসা চরিতার্থ করার এক পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিল। তা এই যে, তারা যখন সাহাবীগণের মধ্যে থেকে কাউকে কাছে আসতে দেখত, তখন পারস্পরিক কানাকানি ও গোপন পরামর্শের আকারে জটলা সৃষ্টি করত এবং আগন্তুক মুসলমানের দিকে কিছু ইশারা-ইঙ্গিত করত। ফলে আগন্তুক ধারণা করত যে, তার বিরুদ্ধেই কোনো ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এতে সে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদেরকে এরূপ কানাকানি করতে নিষেধ করে দেন। نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى বাক্যে এই নিষেধাজ্ঞাই বর্ণিত হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মুসলমমানদের জন্যেও আইন হয়ে যায় যে, তারাও পরস্পরে এনভাবে কানাকানি ও পরামর্শ করবে না, যা দ্বারা অন্য মুসলমান মানসিক কষ্ট পেতে পারে।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :

اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَا رَجُلَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى يَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ فَاِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ -

অর্থাৎ যেখানে তোমরা তিন জন একত্রিত সেখানে দুই জন তৃতীয় জনকে ছেড়ে পরস্পরে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরও লোক না এসে যায়। কারণ এতে সে মনঃক্ষুণ্ন হবে, সে নিজেকে পর বলে ভাববে এবং তার বিরুদ্ধেই কথাবার্তা হচ্ছে বলে সে সন্দেহ করবে। –(মাযহারী)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদেরকে অবৈধ কানাকানির কারণে হুশিয়ার করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সব অবস্থা ও কথাবার্তা জানেন, তারা যেন তাদের কানাকানি ও পরামর্শের মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই লক্ষ্য রাখার সাথে তারা যেন চেষ্টা করে যাতে তাদের পরামর্শ ও কানকথার মধ্যে পাপাচার, জুলুম অথবা শরিয়ত বিরুদ্ধ কোনো প্রসঙ্গ না থাকে; বরং সৎকাজের জন্যেই যেন তারা পরস্পরে পরামর্শ করে।

কাফেররা দুষ্টুমি করলেও নম্র ও ভদ্রসুলভ প্রতিরোধের নির্দেশ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদি মুনাফিকদের এই দুষ্টুমি উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার পরিবর্তে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বলতো। سَامٌ শব্দের অর্থ মৃত্যু। উচ্চারণে তেমন পার্থক্য না থাকায় মুসলমানদের দৃষ্টিতে তা সহজে ধরা পড়ত না। একদিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপস্থিতিতে যখন তারা اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বলল, তখন হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বললেন : اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমরা অভিশপ্ত ও আল্লাহর গজবে পতিত হও। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে এরূপ জওয়াব দিতে নিষেধ করে বললেন : আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল কথাবার্তা পছন্দ করেন না। তোমার উচিত কটুকথা পরিহার করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। হযরত আয়েশা (রা.) আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি শুনেন নি ওরা আপনাকে কি বলেছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, শুনেছি এবং এর সমান প্রতিশোধও নিয়েছি। আমি উত্তরে বলেছি : عَلَيْكُمْ অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও। এটা জানা কথা যে, তাদের দোয়া কবুল হবে না এবং আমার দোয়া কবুল হবে। কাজেই তাদের দুষ্টুমির প্রত্যুত্তর হয়ে গেছে। –[মাযহারী]

মজলিসের কতিপয় শিষ্টাচার : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا মুসলমানদের সাধারণ মজলিসসমূহের বিধান এই যে, কিছু লোক পরে আগমন করলে উপবিষ্টরা তাদের বসার জায়গা করে দিবে এবং চেপে চেপে বসবে। এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে প্রশস্ততা সৃষ্টি করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এই প্রশস্ততা পরকালে তো প্রকাশ্যই, সাংসারিক জীবিকায় এই প্রশস্ততা হলেও তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এই আয়াতে মজলিসের শিষ্টাচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় নির্দেশ এই ঃ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا অর্থাৎ যখন তোমাদের কাউকে মজলিস থেকে উঠে যেতে বলা হয়, তখন উঠে যাও। আয়াতে কে বলবে, তার উল্লেখ নেই। তবে সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং আগন্তুক ব্যক্তি নিজের জন্যে জায়গা করার উদ্দেশ্যে কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিলে তা জায়েজ হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهٖ فَيَجْلِسُ فِيْهِ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا

অর্থাৎ একজন অপরজনকে দাঁড় করিয়ে তার জায়গায় বসবে না। বরং তোমরা চেপে বসে আগন্তুকের জন্যে জায়গা করে দাও।– (বোখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে-কাসীর)।

এ থেকে বোঝা গেল যে, কাউকে তার জায়গা থেকে উঠে যাওয়ার জন্য বলা স্বয়ং আগন্তুকের জন্য জায়েজ নয়। কাজেই একথা সভাপতি অথবা সভার ব্যবস্থাপকমণ্ডলী বলতে পারে। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই : যদি সভাপতি অথবা তাঁর নিযুক্ত ব্যবস্থাপক মণ্ডলী কাউকে তার জায়গা থেকে উঠে যেতে বলে, তবে উঠে যাওয়াই মজলিসের শিষ্টাচার। কারণ মাঝে মাঝে স্বয়ং সভাপতি কোনো প্রয়োজনে একান্তে থাকতে চায়; কিংবা বিশেষ লোকদের সাথে গোপন কথা বলতে চায়; কিংবা পরে আগমনকারীদের জন্য একমাত্র ব্যবস্থা এরূপ থাকতে পারে যে, কিছু জানা শোনা লোককে উঠিয়ে দিয়ে আগন্তুকদেরকে সুযোগ দেওয়া। যাদেরেক উঠানো হবে, তারা হয়ত অন্য সময়ও মজলিসে বসে উপকৃত হতে পারবে।

তবে সভাপতি ও ব্যবস্থাপকদের অবশ্য কর্তব্য হবে এমনভাবে উঠে যেতে বলা, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লজ্জিত না হয় এবং তার মনে কষ্ট না লাগে।

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়েছে, তা এই : রাসূলুল্লাহ ﷺ সুফফা মসজিদে অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদ জনাকীর্ণ ছিল। পরে কয়েকজন প্রধান সাহাবী সেখানে আগমন করেন। তাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিধায় অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন। কিন্তু জায়গা না থাকার কারণে বসার সুযোগ পেলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে

সবাইকে চেপে বসে জায়গা করে দেওয়ার আদেশ দিলেন। কোনো কোনো সাহাবীকে উঠে যেতেও বললেন। যাদেরকে উঠালেন, তারা হয়তো এমন লোক ছিলেন, যারা সর্বক্ষণ মজলিসে হাজির থাকতে পারেন। কাজেই তাদের উঠে যাওয়া তেমন ক্ষতিকর ছিল না। অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন চেপে বসতে আদেশ করলেন, তখন কেউ কেউ এই আদেশ পালন করেনি। তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মজলিস থেকে উঠে যেতে বললেন।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে মজলিসের কয়েকটি শিষ্টাচার জানা গেল। এক. মজলিসে উপস্থিত লোকদের উচিত পরে আগমনকারীদের জন্য জায়গা করে দেওয়া। দুই. যারা পরে আগমন করে, তারা কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিতে পারবে না। তিন. প্রয়োজন মনে করলে সভাপতি কিছু লোককে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন। আরও কতিপয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরে আগমনকারীরা প্রথম থেকে উপবিষ্ট লোকদের ভেতরে অনুপ্রবেশ না করে শেষ প্রান্তে বসে যাবে। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে তিনজন আগন্তুকের বর্ণনা আছে। তাদের মধ্যে একজন মজলিসে জায়গা না পেয়ে এক প্রান্তে বসে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রশংসা করেন।

মাস'আলা : মজলিসের অন্যতম শিষ্টাচার এই যে, দুই উপবিষ্ট ব্যক্তির মাঝখানে তাদের অনুমতি ব্যতীত বসা যাবে না। কেননা তাদের একত্রে বসার মধ্যে কোনো বিশেষ উপযোগিতা থাকতে পারে। আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا অর্থাৎ একত্রে উপবিষ্ট দুই ব্যক্তির মধ্যে তাদের অনুমতি ব্যতীত ব্যবধান সৃষ্টি করা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির জন্য হালাল নয়। –[ইবনে কাসীর]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ : রাসূলুল্লাহ ﷺ জনশিক্ষা ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয়বাণী শুনে উপকৃত হতো। এই সুবাদে কিছু লোক তাঁর সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলাবাহুল্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেওয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টামিও শামিল হয় গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলমানও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই বোঝা হালকা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রাসূলের সাথে একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। কুরআনে এই সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) সর্বপ্রথম একে বাস্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন।

একমাত্র হযরত আলী (রা.) ই আদেশটি বাস্তবায়িত করেন, এরপর তা রহিত হয়ে যায় এবং আর কেউ বাস্তবায়নের সুযোগ পাননি ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আদেশটি জারি করার পর খুব শীঘ্রই রহিত করে দেওয়া হয়। কারণ এর ফলে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। হযরত আলী প্রায়ই বলতেনঃ কুরআনে একটি আয়াত এমন আছে, যা আমাকে ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি– আমার পূর্বেও না এবং আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ তো জানা। পরে বাস্তবায়ন না করার কারণ এই যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, আগে সদকা প্রদান করার আলোচ্য আয়াতই সেই আয়াত। –(ইবনে কাসীর)

আদেশটি রহিত হয়ে গেছে ঠিক; কিন্তু এর ইঙ্গিত লক্ষ্য এভাবে অর্জিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ তো আন্তরিক মহব্বতের তাগিদেই এরূপ মজলিস দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত হয়ে গেল এবং মুনাফিকরা যখন দেখল যে, সাধারণ মুসলমানদের কর্মপন্থার বিপরীতে এরূপ করলে তারা চিহ্নিত হয়ে যাবে এবং মুনাফেকি ধরা পড়বে, তখন তারা এ থেকে বিরত হয়ে গেল।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকের দুরবস্থা ও পরিণামে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহর শত্রু কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা অন্য যে কোনো প্রকার কাফেরের সাথে কোনো মুসলমানের বন্ধুত্ব রাখা জায়েজ নয়। এটা যুক্তিগতভাবে সম্ভবপরও নয়। কেননা

মু'মিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহর মহব্বত। কাফের আল্লাহর দুশমন। যার অন্তরে কারও প্রতি সত্যিকার মহব্বত ও বন্ধুত্ব আছে, তার শত্রুর প্রতিও মহব্বত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কুরআন পাকের অনেক আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফেরদেরই দলভুক্ত মনে করার শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আন্তরিক বন্ধুত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

কাফেরদের সাথে সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে দাখিল নয়। এগুলো কাফেরদের সাথেও করা জায়েজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের প্রকাশ্য কাজ-করবার এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা জরুরি যে, এগুলো যেন নিজ ধর্মের জন্যে ক্ষতিকর না হয়, ঈমান ও আমলে শৈথিল্য সৃষ্টি না করে এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্যেও ক্ষতিকর না হয়।

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ –কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন ঃ এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ দেহাবয়ব বেঁটে, গোধূম বর্ণ এবং সে ছিল হালকা শ্মশ্রুমণ্ডিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দাও কেন? সে শপথ করে বলল ঃ আমি এরূপ করিনি। এরপর সে তার সঙ্গীদেরকেও ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন। –(কুরতুবী)

মুসলমানের আন্তরিক বন্ধুত্ব কাফেরের সাথে হতে পারে না ঃ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا اٰبَاءَهُمْ الخ প্রথম আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বকারীদের প্রতি আল্লাহর গজব ও কঠোর শাস্তির বর্ণনা ছিল। এই আয়াতে তাদের বিপরীতে খাঁটি মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহর শত্রু অর্থাৎ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখে না, যদিও সেই কাফের তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা নিকটাত্মীয়ও হয়।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সবারই এই অবস্থা ছিল। এস্থলে তাফসীরবিদগণ অনেক সাহাবীর এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রমুখের মুখ থেকে ইসলাম অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনে সব সম্পর্কচ্ছেদ করে দিয়েছেন, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এবং কতককে হত্যাও করেছেন।

একবার সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ (রা.)-এর সামনে তাঁর মুনাফিক পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে দৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন না। একবার হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সামনে তাঁর পিতা আবূ কোহাফা রাসূলে কারীম ﷺ সম্পর্কে কিছু দৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করলে দয়ার প্রতীক হযরত আবূ বকর (রা.) ক্রোধান্বিত হয়ে পিতাকে সজোরে চপেটাঘাত করেন। ফলে আবূ কোহাফা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। খবর শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ভবিষ্যতে এরূপ করো না। হযরত আবূ ওবায়দা (রা.)-এর পিতা জাররাহ্ ওহুদ যুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সে বারবার হযরত আবূ ওবায়দা (রা.)-এর সামনে আসলে কিন্তু তিনি এড়িয়ে যেতেন। এরপরও যখন সে নিবৃত্ত হলো না এবং পুত্রকে হত্যা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখল, তখন হযরত আবূ ওবায়দা (রা.) বাধ্য হয়ে পিতাকে হত্যা করলেন। সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী]

মাসআলা ঃ পাপাসক্ত ফাসেক-ফাজের ও কার্যতঃ ধর্মবিমুখ মুসলমানদের বেলায়ও অনেক ফিকহবিদ এই বিধান রেখেছেন যে, তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখা কোনো মুসলমানের পক্ষে জায়েজ হতে পারে না। কাজকর্মের প্রয়োজনে সহযোগিতা অথবা প্রয়োজন মাফিক সাহচর্য ভিন্ন কথা, যার মধ্যে ফিসক তথা পাপাসক্তির জীবাণু বিদ্যমান আছে, একমাত্র

তার অন্তরেই কোনো ফাসেক ও পাপাসক্তের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা থাকতে পারে। তাই রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর দোয়ায় বলতেন : لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عَلَيَّ يَدًا অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে কোনো পাপাসক্ত ব্যক্তির কাছে ঋণী করো না। অর্থাৎ তার কোনো অনুগ্রহ যেন আমার উপর না থাকে। কেননা সম্ভ্রান্ত মানুষ স্বভাবগত গুণের কারণে অনুগ্রহকারীর প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখতে বাধ্য হয়। কাজেই ফাসেকদের অনুগ্রহ কবুল করা তাদের প্রতি মহব্বতের সেতু। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সেতু নির্মাণ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। -(কুরতুবী)

وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ : এখানে কেউ কেউ রূহ-এর তাফসীর করেছেন নূর, যা মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এই নূরই তার সৎকর্ম ও আন্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এই প্রশান্তি একটি বিরাট শক্তি। আবার কেউ কেউ রূহ-এর তাফসীর করেছেন কুরআন ও কুরআনের প্রমাণাদি। কারণ এটাই মুমিনের আসল শক্তি। −(কুরতুবী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

قَدْ سَمِعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى قريب معروف বাব سَمِعَ মাসদার سَمْعٌ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– শুনেছেন।

تُجَادِلُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُجَادَلَةٌ মূলবর্ণ (ج - د - ل) জিনস صحيح অর্থ– বাদানুবাদ করছিল।

تَشْتَكِي : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِشْتِكَاءٌ মূলবর্ণ (ش - ك - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অভিযোগ করছিল।

تَحَاوُرَكُمَا : كما শব্দটি ضمير مجرور بالاضافة শব্দটি مصدر বাব تَفَاعُلٌ মূলবর্ণ (ح - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমাদের কথাবার্তা।

تَحْرِيرٌ : আজাদ করা। বাবে تَفْعِيل -এর মাসদার। تَحْرِيرِ وَلَد -এর উদ্দেশ্য হলো, শিশুকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সোপর্দ করা। ইসরাঈলী শরিয়তে এমনভাবে সোপর্দ করা বৈধ ছিল।

يَتَمَاسَّا : সীগাহ تثنيه مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَمَاسٌّ মূলবর্ণ (م - س - س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পরস্পরকে স্পর্শ করে।

مُتَتَابِعَيْنِ : সীগাহ تثنيه مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَتَابُعٌ মূলবর্ণ (ت - ب - ع) জিনস صحيح অর্থ– ধারাবাহিক।

اَحْصٰهُ : ه শব্দটি ضمير منصوب متصل সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْصَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ص - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তা রক্ষিত রেখেছেন।

نَسُوْهُ : ه শব্দটি ضمير منصوب متصل সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার نِسْيَانٌ মূলবর্ণ (ن - س - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা তা ভুলে গেছে।

نَجْوٰى : ইসম। নাকেরা। কানাঘুষা। اَلتَّنَاجِيُّ মাসদারের অর্থে তথা কানাঘুষা করা। কানাকানি কথা বলা, কানে কানে, চুপিসারে কথা বলা।

يَتَنٰجَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَنَاجِيٌّ মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা কানাঘুষা করে।

تَفَسَّحُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَفَسُّحٌ মূলবর্ণ (ف - س - ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দাও।

قَدِّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ امر বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْدِيْمٌ মূলবর্ণ (ق ـ د ـ م) জিনস صحيح অর্থ– প্রদান কর।

اَشْفَقْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِشْفَاقٌ মূলবর্ণ (ش ـ ف ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা কষ্টকর মনে কর।

يُحَادُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَه মাসদার مُحَادَّةٌ মূলবর্ণ (ح – د – د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিরোধিতা করে।

كُبِتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার كَبْتٌ মূলবর্ণ (ك ـ ب ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– তারা লাঞ্ছিত হবে।

نُهُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব سَمِعَ মাসদার نَهْىٌ মূলবর্ণ (ن – ه – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিষেধ করা হয়েছিল।

حَيُّوْكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحِيَّةٌ মূলবর্ণ (ح – ى – ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তারা আপনাকে সালাম করে।

اُنْشُزُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَشْزٌ মূলবর্ণ (ن – ش – ز) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা উঠে পড়।

إِسْتَحْوَذَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مطلق معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِحْوَاذٌ মূলবর্ণ (ح – و – ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ– অধিপত্য বিস্তার করে।

عَشِيْرَةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে عشائر অর্থ- বংশধর।

يُوَادُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُوَادَّةٌ মূলবর্ণ (و ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তাঁরা বন্ধুত্ব স্থাপন করে নিবে।

اَيَّدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مطلق معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَاْيِيْدٌ মূলবর্ণ (ء ـ ى ـ د) জিনস মুরাক্কাব (اجوف يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- সাহায্য করা, শক্তিশালী করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ : এখানে واو টি حاليه আর اللّٰهُ আর শব্দটি মুবতাদা। আর يَسْمَعُ বাক্যটি খবর। আর يَسْمَعُ ফে'ল তার উহ্য যমীর যা اللّٰهُ শব্দের দিকে ফিরেছে তা ফায়েল। আর تَحَاوُرَكُمَا হলো مفعول به এবং اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। اللّٰهَ শব্দটি اسم ان আর سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ হলো خبر اِنَّ।

–[ই'রাবুল কুরআন পঞ্চম খণ্ড : পৃ. ৪৪৪]

سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ
সূরা হাশর

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২৪, রুকূ'– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যা আসমানসমূহে এবং জমিনে আছে, সকলেই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, আর তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾
২. তিনিই কিতাবপ্রাপ্ত কাফেরদেরকে তাদের গৃহ হতে প্রথমবারই একত্রিত করে বহিষ্কৃত করেছেন; তোমাদের ধারণাও ছিল না যে, তারা (কখনো) বহিষ্কৃত হবে, আর তারা এ ধারণা করে রেখেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ (-র আজাব) হতে বাঁচাবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের উপর (আজাব) এমন স্থান হতে পৌঁছালেন যে, তাদের ধারণাও ছিল না, আর তাদের অন্তরসমূহে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিলেন, ফলে তারা (তার দরুন) নিজেদের গৃহগুলোকে বিনষ্ট করছিল– স্বয়ং নিজেদের হাতেও এবং মুসলমানদের হাতেও, অতএব, হে জ্ঞানীগণ! উপদেশ গ্রহণ কর।	هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. سَبَّحَ لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা বর্ণনা করছে مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ যা আসমান সমূহে ও জমিনে আছে সকলেই وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আর তিনি মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

২. هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ তিনিই বহিষ্কৃত করেছেন الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ কিতাব প্রাপ্ত কাফেরদেরকে مِنْ دِيَارِهِمْ তাদের গৃহ হতে لِاَوَّلِ الْحَشْرِ প্রথমবারই একত্রিত করে مَا ظَنَنْتُمْ তোমাদের ধারণাও ছিল না যে, اَنْ يَّخْرُجُوْا তারা (কখনো) বহিষ্কৃত হবে وَظَنُّوْٓا আর তারা এ ধারণা করে রেখেছিল যে, اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ হতে বাঁচাবে। فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا কিন্তু আল্লাহ তাদের উপর (আজাব) এমন স্থান হতে পৌঁছালেন যে, তাদের ধারণাও ছিল না وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ আর তাদের অন্তর সমূহে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিলেন يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ ফলে তারা নিজেদের গৃহ গুলোকে বিনষ্ট করছিল بِاَيْدِيْهِمْ স্বয়ং নিজেদের হাতেও وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ এবং মুসলমানদের হাতেও। فَاعْتَبِرُوْا অতএব উপদেশ গ্রহণ কর يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ হে জ্ঞানীগণ।

অনুবাদ	আয়াত
৩. আর যদি আল্লাহ তাদের ভাগ্যে নির্বাসিত হওয়া লিখে না রাখতেন, তবে পৃথিবীতেই শাস্তি প্রদান করতেন; আর তাদের জন্য পরলোকে দোজখের আজাব রয়েছে।	وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾
৪. এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আর যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾
৫. যে খেজুর বৃক্ষগুলো তোমরা কেটে ফেলেছ কিংবা যেগুলোকে তাদের মূলসমূহের উপর দণ্ডায়মান থাকতে দিয়েছ, তা আল্লাহরই নির্দেশানুযায়ী হয়েছে, (যেন মুসলমানদেরকে সম্মানিত করেন,) আর যেন কাফেরদেরকে অপদস্থ করেন।	مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥﴾
৬. আর যা কিছু আল্লাহ নিজ রাসূলকে তাদের থেকে দিলেন, তজ্জন্য তোমরা না অশ্ব চালনা করেছ, আর না উষ্ট্র, কিন্তু আল্লাহ নিজ রাসূলগণকে যার উপর ইচ্ছা পরাক্রান্ত করে দেন; আর প্রত্যেক বস্তুর উপর আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।	وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩. وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহ লিখে না রাখতেন عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ তাদের ভাগ্যে নির্বাসিত হওয়া لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا তবে পৃথিবীতেই শাস্তি প্রদান করতেন وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ আর তাদের জন্য পরলোকে রয়েছে عَذَابُ النَّارِ দোজখের আজাব।

৪. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ এটা একারণে যে, তারা شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ আর যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ তবে নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা।

৫. مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ যে খেজুর বৃক্ষগুলো তোমরা কেটে ফেলেছ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا কিংবা যেগুলোকে তাদের মূল সমূহের উপর দণ্ডায়মান থাকতে দিয়েছ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ তা আল্লাহরই নির্দেশানুযায়ী হয়েছে وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ আর যেন কাফেরদেরকে অপদস্থ করেন।

৬. وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ আর যার কিছু আল্লাহ নিজ রাসূলকে তাদের থেকে দিলেন فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ তজ্জন্য তোমরা না অশ্ব চালনা করেছ وَّلَا رِكَابٍ আর না উষ্ট্র وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ কিন্তু আল্লাহ يُسَلِّطُ পরাক্রান্ত করে দেন رُسُلَهٗ নিজ রাসূলগণকে عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ যার উপর ইচ্ছা وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর প্রত্যেক বস্তুর উপর আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝۷

৭. যা কিছু আল্লাহ তা'আলা নিজ রাসূলকে অন্য জনপদসমূহের অধিবাসীগণ থেকে দিয়ে দেন, তা আল্লাহর হক, আর রাসূলের হক, আর আত্মীয়-স্বজনদের, আর এতিমদের, আর গরিবদের, আর মুসাফিরদের, (এ নির্দেশ এই হেতু) যেন তা তোমাদের ধনীদের হস্তগত হয়ে না পড়ে; আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক, আর আল্লাহকে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝۸

৮. (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে) সে অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের (বিশেষভাবে) হক রয়েছে, যাদেরকে নিজেদের গৃহ ও ধন-সম্পদ হতে (বলপূর্বক) উৎখাত করা হয়েছে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী, আর তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের (ধর্মের) সাহায্য করে; এরাই সত্যপরায়ণ।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ

৯. আর তাদের (-ও হক রয়েছে) যারা দারুল ইসলামে (অর্থাৎ মদিনায়) এবং ঈমানের মধ্যে তাদের (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্ব হতে অটল রয়েছে, যারা তাদের নিকট হিজরত করে আসে তাদেরকে এরা ভালোবাসে,

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা দিয়ে দেন عَلٰى رَسُوْلِهٖ নিজ রাসূলকে مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى অন্য জনপদসমূহের অধিবাসীগণ হতে فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ তা আল্লাহর হক আর রাসূলের হক وَلِذِى الْقُرْبٰى আর আত্মীয়-স্বজনদের وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ আর এতিমদের আর গরিবদের وَابْنِ السَّبِيْلِ আর মুসাফিরদের كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً যেন তা হস্তগত না হয়ে পড়ে بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ তোমাদের ধনীদের وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ আর রাসূল তোমাদেরকে যা দান করেন فَخُذُوْهُ তা গ্রহণ কর وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন। فَانْتَهُوْا তা হতে বিরত থাক وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ নিঃসন্দেহে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

৮. لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ সেই অভাবগ্রস্ত মুসাফিরদের হক রয়েছে। الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا যাদের কে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ নিজেদের গৃহ ও ধন সম্পদ হতে (বল পূর্বক) يَبْتَغُوْنَ তারা অন্বেষণকারী فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ এরাই সত্য পরায়ণ।

৯. وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ আর তাদের যারা অটল রয়েছে الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ দারুল ইসলামে এবং ঈমানের মধ্যে مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের (আগমনের) পূর্ব হতে يُحِبُّوْنَ এরা ভালোবাসে তাদেরকে مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ যারা তাদের নিকট হিজরত করে আসে

وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۖ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٩﴾

** আর মুহাজিরগণ যা প্রাপ্ত হয়, এরা তজ্জন্য নিজেদের মনে কোনো ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে, যদিও তারা ক্ষুধার্তই থাকে। আর যে নিজের স্বাভাবিক কৃপণতা হতে রক্ষিত থাকে, এরূপ লোকেরাই সুফল প্রাপ্ত হবে।

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠﴾

১০. আর (তাদের জন্যও) যারা (ইসলাম ধর্মে) তাদের (আনসার ও মুহাজিরদের) পরে এসেছে– যারা প্রার্থনা করে হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের সে ভাইদেরকেও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে, এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন ঈর্ষা না হয়, হে আমাদের প্রভু! আপনি বড় স্নেহশীল, করুণাময়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١١﴾

১১. আপনি কি সে মুনাফিকদের অবস্থা দেখেননি– যারা তাদের কিতাবপ্রাপ্ত ভাইদেরকে বলে যে, আল্লাহর কসম! যদি তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হয়, তবে আমরা তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব, আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না, আর যদি তোমাদের সাথে কারো যুদ্ধ বাধে, তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করব; অথচ আল্লাহ সাক্ষী রয়েছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

শাব্দিক অনুবাদ :

** حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا মুহাজিরগণ যা وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ আর এরা তজ্জন্য নিজেদের মনে কোনো ঈর্ষা পোষণ করে না। প্রাপ্ত হয় وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ এবং নিজেদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ যদিও তারা ক্ষুধার্তই থাকে وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ আর যে নিজের স্বাভাবিক কৃপণতা হতে রক্ষিত থাকে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এরূপ লোকেরাই সুফল প্রাপ্ত হবে।

১০. وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ আর যারা তাদের পরে এসেছে يَقُوْلُوْنَ যারা প্রার্থনা করে رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা করুন وَلِاِخْوَانِنَا আর আমাদের সেই ভাইদেরকেও الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا এবং আমাদের অন্তরে যেন ঈর্ষা না হয় لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ঈমানদারদের প্রতি رَبَّنَآ হে আমাদের প্রভু اِنَّكَ رَءُوْفٌ আপনি বড় স্নেহশীল رَّحِيْمٌ করুণাময়।

১১. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا আপনি কি সেই মুনাফিকদের অবস্থা দেখেননি يَقُوْلُوْنَ যারা বলে لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ তাদের কিতাব প্রাপ্ত ভাইদেরকে لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ যদি তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হয় لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ তবে আমরা তোমাদের সাথে বের হয়ে যাবো وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ আর যদি তোমাদের সাথে কারো যুদ্ধ বাধে لَنَنْصُرَنَّكُمْ তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করব وَاللّٰهُ يَشْهَدُ অথচ আল্লাহ সাক্ষী রয়েছেন যে اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ যে তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

১২. আল্লাহর কসম! যদি কিতাবপ্রাপ্তগণ বহিষ্কৃত হয়, তবে এরা তাদের সাথে বের হবে না, আর যদি তাদের সাথে কারো যুদ্ধ বাধে, তবে এরা তাদেরকে সাহায্যও করবে না, আর যদি এরা তাদের সাহায্যও করে, তথাপি পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করবে। অতঃপর তাদের কোনোই সাহায্য করা হবে না।	لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٢﴾
১৩. নিঃসন্দেহে তোমাদের ভয় তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় অপেক্ষাও অধিক; এটা এই হেতু যে, তারা (আল্লাহর মাহাত্ম্য) বুঝতে পারে না।	لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾
১৪. তারা সকলে মিলেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, কিন্তু সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে অথবা প্রাচীরের অন্তরালে (থেকে); তাদের যুদ্ধ পরস্পরের মধ্যে কঠোরতর হয়ে থাকে; [হে শ্রোতা!] তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছ অথচ তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন; এটা এ কারণে যে, তারা (ধর্মীয়) জ্ঞান রাখে না।	لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾
১৫. এরা সে সমস্ত লোকের দৃষ্টান্তের ন্যায়- যারা এদের কিছু পূর্বে (অতীত) হয়েছে– যারা (পৃথিবীতেও) নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করেছে, আর (পরলোকেও) তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি (প্রস্তুত) রয়েছে (এরা বনূ কাইনূকা গোত্রের ইহুদি)।	كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. لَئِنْ أُخْرِجُوا আল্লাহর কসম যদি কিতাবপ্রাপ্তগণ বহিষ্কৃত হয় لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ তবে এরা তাদের সাথে বের হবে না وَلَئِنْ قُوتِلُوا আর যদি তাদের সাথে কারো যুদ্ধ বাধে لَا يَنْصُرُونَهُمْ তবে এরা তাদেরকে সাহায্যও করবে না وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ যদি এরা তাদের সাহায্যও করে لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ তথাপি পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করবে ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ অতঃপর তাদের কোনোই সাহায্য করা হবে না।

১৩. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً নিঃসন্দেহে তোমাদের ভয় অধিক فِي صُدُورِهِمْ তাদের অন্তরে مِنَ اللَّهِ আল্লাহর ভয় অপেক্ষাও ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ এটা এই হেতু যে, তারা (আল্লাহর মাহাত্ম্য) বুঝতে পারে না।

১৪. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا তারা সকলে মিলেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ কিন্তু সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ অথবা প্রাচীরের অন্তরালে (থেকে) بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ তাদের যুদ্ধ পরস্পরের মধ্যে কঠোরতর হয়ে থাকে تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا [হে শ্রোতা] তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ অথচ তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ এটা এ কারণে যে, তারা (ধর্মীয়) জ্ঞান রাখে না।

১৫. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا এরা সেই সমস্ত লোকদের দৃষ্টান্তের ন্যায় যারা এদের কিছু পূর্বে (অতীত) হয়েছে ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ যারা নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করেছে وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ আর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

১৬. আর (মুনাফিকরা) শয়তানের দৃষ্টান্তের ন্যায়, (প্রথমতঃ) সে মানুষকে বলে, কাফের হয়ে যাও, অতঃপর যখন সে কাফের হয়ে যায়, তখন সে বলে দেয় যে, তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।	كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. অতএব, এতদুভয়ের পরিণাম এই হলো যে, তারা দোজখে গেল, তথায় তারা সর্বদা অবস্থান করবে; আর এটাই জালিমদের শাস্তি।	فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক, আর প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছে, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত আছেন।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে রয়েছে, অতএব, আল্লাহ তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পর্কেও বে-পরোয়া করেছেন; এরাই পথভ্রষ্ট।	وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. দোজখের অধিবাসীরা আর জান্নাতের অধিবাসীগণ পরস্পর সমান নয়; যারা জান্নাতের অধিবাসী তারাই সফলকাম।	لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۗ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ আর (মুনাফিকরা) শয়তানের দৃষ্টান্তের ন্যায় اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ সে মানুষকে বলে اكْفُرْ কাফের হয়ে যাও فَلَمَّا كَفَرَ অতঃপর যখন সে কাফের হয়ে যায় قَالَ তখন সে বলে দেয় اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ আমি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

১৭. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ অতএব এতদুভয়ের পরিণাম এই হলো যে اَنَّهُمَا فِي النَّارِ তারা দোজখে গেল خَالِدَيْنِ فِيْهَا তথায় তারা সর্বদা অবস্থান করবে وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ আর এটাই জালিমদের শাস্তি।

১৮. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ اتَّقُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ আর প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য করা উচিত مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ সে আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছে وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত আছেন।

১৯. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না যারা نَسُوا اللّٰهَ যারা আল্লাহকে ভুলে রয়েছে فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ অতএব আল্লাহ তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্বন্ধেও বে-পরোয়া করেছেন اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ এরাই পথভ্রষ্ট।

২০. لَا يَسْتَوِيْٓ পরস্পর সমান নয় اَصْحٰبُ النَّارِ দোজখের অধিবাসীরা وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ আর জান্নাতের অধিবাসীগণ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ যারা জান্নাতের অধিবাসী هُمُ الْفَآئِزُوْنَ তারাই সফলকাম।

২১. যদি আমি এ কুরআনকে কোনো পর্বতের উপর নাজিল করতাম, তবে তুমি দেখতে পেতে যে, তা আল্লাহর ভয়ে ধসে যেত এবং বিদীর্ণ হয়ে যেত; আর আমি এ আশ্চর্য বর্ণনাসমূহ মানুষের জন্য বিবৃত করে থাকি, যেন তারা চিন্তা করে।	لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. তিনি এমন মা'বূদ যে, তিনি ভিন্ন আর কেউ মা'বূদ নেই, তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞাতা, তিনি বড় মেহেরবান পরম দয়ালু।	هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾
২৩. তিনি এমন মা'বূদ যে, তিনি ভিন্ন আর কেউ মা'বূদ (হওয়ার যোগ্য) নেই, তিনি বাদশাহ, তিনি পবিত্র, (সমস্ত কলঙ্ক হতে) নিরাপত্তা প্রদানকারী, রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রান্ত, বিকৃতের সংস্কারক, সুমহান; আল্লাহ তা'আলা মানুষের অংশীবাদ হতে পবিত্র।	هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. তিনি মা'বূদ, সৃষ্টিকারী, ঠিক ঠিক সৃষ্টিকারী, আকৃতি নির্মাণকারী, তারই জন্য উত্তম উত্তম নামসমূহ রয়েছে; সমস্ত বস্তুই তার পবিত্রতা বর্ননা করছে– যা আসমানসমূহ ও জমিনে রয়েছে, আর তিনি মাহাপরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।	هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. لَوْ اَنْزَلْنَا যদি আমি নাজিল করতাম هٰذَا الْقُرْاٰنَ এই কুরআনকে عَلٰى جَبَلٍ কোনো পর্বতের উপর لَّرَاَيْتَهٗ তবে তুমি দেখতে পেতে যে خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ তা আল্লাহর ভয়ে ধসে যেত এবং বিদীর্ণ হয়ে যেত وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ আর এই আশ্চর্য বর্ণনাসমূহ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ মানুষের জন্য বিবৃত করে থাকি لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ যেন তারা চিন্তা করে।

২২. هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি এমন মাবুদ যিনি ভিন্ন আর কেউ মাবুদ নেই عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞাতা هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ তিনি বড় মেহেরবান, পরম দয়ালু।

২৩. هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি এমন মাবুদ যে, তিনি ভিন্ন আর কেউ মাবুদ নেই اَلْمَلِكُ তিনি বাদশাহ الْقُدُّوْسُ পবিত্র السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ নিরাপত্তা প্রদানকারী الْمُهَيْمِنُ রক্ষাকর্তা الْعَزِيْزُ মহাপরাক্রান্ত الْجَبَّارُ বিকৃতের সংস্কার الْمُتَكَبِّرُ সুমহান سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ আল্লাহ তা'আলা মানুষের অংশীবাদ হতে পবিত্র।

২৪. هُوَ اللّٰهُ তিনি মাবুদ الْخَالِقُ সৃষ্টিকারী الْبَارِئُ ঠিক ঠিক সৃষ্টিকারী الْمُصَوِّرُ আকৃতি নির্মাণকারী لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى তারই জন্য উত্তম উত্তম নামসমূহ রয়েছে يُسَبِّحُ لَهٗ সমস্ত বস্তুই তার জন্য পবিত্রতা বর্ণনা করছে مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা আসমানসমূহ ও জমিনে রয়েছে وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আর তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতের اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ -এর হাশর শব্দটির নামে সূরার নামকরণ করা হয়েছে, অর্থাৎ এটা এমন সূরা যাতে الحشر শব্দটি রয়েছে।

এ সূরার অপর নাম হলো সূরা বনূ নাযীর। হযরত ইবনে জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বললাম, এটি সূরা হাশর। তিনি বললেন একে সূরা বনূ নাযীর বলো, কেননা এ সূরায় মদীনা শরীফ থেকে বনূ নাযীর গোত্রের বহিষ্কারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অত্র সূরায় ৪টি রুকূ', ২৪টি আয়াত, ৭৪৬টি বাক্য ও ১৭১২টি অক্ষর রয়েছে। -[রূহুল মা'আনী, মাযহারী]

সূরা নাজিল হওয়ার সমকাল : সহীহ বুখারী ও মুসলিম হাদীসগ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে সূরা হাশর সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, এটা বনূ নাযীর যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল, যেমন বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল সূরা আনফাল। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইরের অপর একটি বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে– قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ। অর্থাৎ সূরা হাশর না বলে সূরা নাযীর বলো। মুজাহিদ, কাতাদাহ, যুহরী, ইবনে যায়েদ, ইয়াযীদ ইবনে রূমান, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ মনীষীগণও এরূপ বর্ণনা করেছেন। এদের সকলের সম্মিলিত বর্ণনা হলো, এ সূরায় যে আহলে কিতাবী লোকদের বহিষ্কার করার কথা উল্লেখ হয়েছে তা বনূ নাযীর সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বক্তব্য হলো, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এ গোটা সূরাটিই বনূ নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, বনূ নাযীরের এ যুদ্ধটি কবে সংঘটিত হয়েছে? ইমাম যুহরী এ প্রসঙ্গে উরওয়া ইবনে জুবাইরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের ছয়মাস পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়; কিন্তু ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম ও বালাযূরীর বর্ণনায় তা চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আর তাই ঠিক। কেননা সব বর্ণনাই এ ব্যাপারে একমত যে, বীরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনার পর তা ঘটেছিল। আর বীরে মাউনার ঘটনা যে বদর যুদ্ধের পরই সংঘটিত হয়েছিল তা ঐতিহাসিক ভিত্তিতেই প্রমাণিত। -[যিলাল]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং তাদের অপমানজনক শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। আর অত্র সূরায় ইহুদি ও মুনাফিকদের শাস্তির বিবরণ স্থান পেয়েছে। কেননা তারা নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে সর্বদা চক্রান্তে লিপ্ত থাকত।

ইমাম বুখারী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা আনফালে বদরের যুদ্ধের বিবরণ নাজিল হয়েছে, আর সূরা হাশরে বনূ নাযীর গোত্রের বিবরণ নাজিল হয়েছে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, বনূ নাযীরকে মদীনা মোনাওয়ারা থেকে তখন বহিষ্কার করা হয়, যখন নবী করীম ﷺ উহুদ যুদ্ধ শেষে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন, আর বনূ কুরায়জার ঘটনা ঘটে আহযাবের যুদ্ধের পর দু'টি ঘটনার মধ্যে দু'বছরের ব্যবধান ছিল। -[নূরুল কুরআন]

সূরাটির বিশেষত্ব : মুফাসসিরগণ বলেন, যদি কারো শরীরের কোনো একটি অঙ্গ ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন অজু করে বিসমিল্লাহ -এর সাথে উক্ত সূরার শেষাংশে বর্ণিত আয়াত (الْاٰيَةَ) لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا পড়ে ব্যথাস্থানে ফুঁক দিয়ে দেয়, তাহলে উক্ত যন্ত্রণা দূরীভূত হয়ে যাবে।

আর যদি সূরা হাশর -এর শেষ আয়াত অথবা পূর্ণ সূরাটি মৃতব্যক্তির মাথার পার্শ্বে বসে কিংবা মৃতদের উদ্দেশ্যে পাঠ করে ছওয়াব বখশিশ করে দেওয়া হয়, তাহলে মৃতগণ কবরের আজাব হতে রক্ষা পাবেন।

সূরাটির বিষয়বস্তু :

১. সূরাহ আল-হাশর এর বিষয়বস্তু কয়েকটি রয়েছে। তন্মধ্যে সূরার প্রথমাংশে আল্লাহর গুণাবলি ও কাফের বনূ নাযীর গোত্রের মদীনা হতে নির্বাসনের বিশেষ ঘটনার পর্যালোচনা করা হয়েছে। যাতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণের বর্ণনাও রয়েছে। বনূ নাযীর গোত্র পক্ষান্তরে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ছিল। তারা তাদের সময়কালে ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের তুলনায় কম ছিল না। অপর দিকে তাদের যুদ্ধ হাতিয়ার অজস্র পরিমাণ ছিল। তাদের বাসস্থান মদীনার ভূমিতে শত শত বছর পূর্ব থেকেই ছিল এবং তারা অত্যন্ত সুকঠিন ও দৃঢ় দূর্গের পত্তন করেছিল। তাদের হীন ধারণা মতে তাদেরকে কোনো শক্তি পরাস্ত করতে সক্ষম হবে না। এতদসত্ত্বেও সর্বশেষ তাদের পরাজয় ঘটল এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও মুসলিম সেনাবাহিনী জয়ী হলেন। শত শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা আল্লাহর শক্তির মোকাবিলায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এতে এ কথাটিই প্রকাশ পেয়েছে যে, যখনই যে জাতি আল্লাহর শক্তির মোকাবিলায় নামবে তখনই তারা চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২. দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ ৫ম আয়াতে বর্ণিত বাণী দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কীয় আইনের ধারার ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ধর্মযুদ্ধ ও সামরিক সৈনিক কর্তৃক কোনো এলাকায় শত্রুদের মোকাবিলায় (শত্রু এলাকায়) পরিচালিত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপসমূহ ইসলামি আইন বহির্ভূত কার্যকলাপ তথা কুরআনে নিষিদ্ধ "ফাসাদ ফিল আরদ" -এর অন্তর্ভুক্ত কাজ নয়।

৩. তৃতীয়াংশে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ হতে ১০ম আয়াতে ইসলামি জিহাদ ও মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত অঞ্চল বা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আপস মীমাংসার ফলে অর্থ সম্পদসমূহ বিলি-বন্টনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৪. চতুর্থাংশে উক্ত বনূ নাযীর গোত্রের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধকালীন মুনাফিকগণের আচার-আচরণ ও কু-প্রবৃত্তির আলোচনা করা হয়েছে।

৫. পঞ্চমাংশে (শেষাংশে) আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে উপদেশবাণী, ঈমানের মূল উপকরণ এবং ঈমানদার ও বেঈমানের মাঝে পার্থক্য, আর ঈমানের গুরুত্বসহ আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনার প্রকাশ করা হয়েছে।

সূরাটির ফজিলত : হযরত ইরবাছ ইবনে সারিয়াহ (রা.) হতে একটি হাদীস রয়েছে, তাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বদা নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে মুসাব্বাহাত (অর্থাৎ এসব সূরাগুলো যেগুলোর পূর্বে سَبَّحَ يُسَبِّحُ سُبْحَانَ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে) পড়তেন। আর বলতেন উক্ত সূরাগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াত হতেও উত্তম। তন্মধ্যে সূরা-হাশর একটি। কেউ কেউ মতানৈক্যে করে বলেন, তার উত্তম আয়াতটি হলো- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى الخ উক্ত বর্ণিত হাদীসটি হলো-

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَنْ يَرْقُدَ يَقُوْلُ اِنَّ فِيْهِنَّ اٰيَةً خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ اٰيَةٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

অনুরূপভাবে তিরমিযী শরীফে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে প্রতিদিন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠান্তে সূরা হাশর -এর শেষ তিন আয়াত هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ .... وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ পাঠ করে থাকে, তখন তার জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন ৭০,০০০[সত্তর হাজার] ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন যারা সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া প্রার্থনা করতে থাকে। যদি উক্ত দিবসে সে ব্যক্তি মারা যায় তাহলে শহীদরূপে মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি সন্ধ্যাবেলায় পড়ে থাকে, তাহলেও সারা রাত তাকে উক্ত গুণে ভূষিত করা হবে। -[মাযহারী ও ইতকান]

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١) هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ .... فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِى الْاَبْصَارِ (٢)

শানে নুযূল : রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় আগমন করার পর ইহুদিদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। ইহুদিদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র ছিল বনূ নাযীর। তারাও শান্তি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মদিনা থেকে দুই মাইল দূরে বসবাস করত। একবার আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দুটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত

বিনিময় আদায় করা মুসলমান ইহুদি সকলেরই কর্তব্য ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যে মুসলমানদের কাছে থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইহুদিদের কাছ থেকে রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সে মতে তিনি বনূ নাযীর গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, পয়গম্বরকে হত্যা করার এটাই প্রকৃত সুযোগ। তাই তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল, আপনি ওখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর তারা গোপনে পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে বসে আছেন, এক ব্যক্তি ঐ প্রাচীরের উপর উঠে একটি বিরাট ও ভারি পাথর তার উপর ছেড়ে দিবে যাতে তিনি মারা যান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন।

তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইহুদিদেরকে বলে পাঠালেন তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লঙ্ঘন করেছ। অতএব তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেওয়া হলো এ সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এ সময়ের পর কেউ এ স্থানে দেখা গেলে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। বনু নাযীর মদিনা ছেড়ে চলে যেতে সম্মত হলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বলল, তোমরা এখানেই থাক। অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দিবে কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আচড় লাগতে দিবে না। রূহুল মা'আনীতে আছে, এ ব্যাপারে ওদিয়া ইবনে মালেক মুবায়েদ এবং রায়েস ও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর সাথে শরিক ছিল। বনূ নাযীর তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সদর্পে বলে পাঠাল আমরা কোথাও যাব না আপনি যা ইচ্ছা হয় করতে পারেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে বনু নাযীর গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনূ নাযীর দূর্গের ফটক বন্ধ করে বসে রইল। মুনাফিকরা আত্মগোপন করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন। তাদের খর্জুর বৃক্ষে আগুন ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা নির্বাসনে যেতে সম্মত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অবস্থায় ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাব পত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোনো অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবে না। এগুলো বাজেয়াপ্ত কার হবে। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত সমূহ নাজিল হয়। বর্ণিত আছে তখন বনু নাযীরের কিছু লোক সিরিয়ায় চলে যায় এবং কিছু লোক খায়বরে চলে যায়। সংসারের প্রতি অসাধারণ ভালোবাসার কারণে তারা ঘরের কড়ি, কাঠ, তক্তা ও কপাট পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায়। ওহুদ যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর হযরত ওমর (রা.) তার খেলাফত কালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইহুদির সাথে খায়বর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন।

–(মা'আরিফুল কুরআন বাংলা ১৩৪৯)

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ (٥)

শানে নুযূল : ইহুদিদের কেল্লা থেকে নেমে আসতে এবং আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এতদুদ্দেশ্যে তাদের খর্জুর গাছপালা কেটে ফেলতে সাহাবীদের নির্দেশ দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে তাদের মাঝে কিছু দ্বিধা সন্দেহের উদ্রেক হয়। সাহাবীগণের কেউ কেউ বললেন, আমরা তো কিছু খর্জুর গাছ কেটে ফেলেছি, আর কিছু রেখে দিয়েছি। এই বিষয়ে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করব যে, আমরা যেগুলো কেটেছি তাতে কি কোনো ছওয়াব পাব কি না, আর যেগুলো ছেড়ে রেখে দিয়েছি সেগুলোর জন্য কি আমাদের কোনো গুনাহ হবে? এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

–(তিরমিযি শরীফ : ২)

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

শানে নুযূল ঃ মুহাম্মদ বিন সা'আদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তদ্বীয় নবীকে বনূ কুরাইজা ও বনূ নাযীর গোত্র সমূহের উপর অভিযান চালানোর জন্যে আদেশ করেন। তৎকালে মুসলমানদের ঘোড়া ও সাওয়ারীর ব্যবস্থা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। সেই অভিযান সমূহের মধ্যে খায়বার, ফদক এবং আরবীয় অন্যান্য গোত্র সমূহও অন্তরর্ভুক্ত ছিল। গোত্রগুলো হতে যা কিছু মালা-মালই যুদ্ধবিহীন ফায় স্বরূপ অর্জিত হয়েছিল। সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশানুযাই রাসূল ﷺ নিজ কর্তৃত্বে রাখেন। ফলে কেউ কেউ বলল যে, এ

সম্পদ আমাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হচ্ছে না কেন? ফায় হিসেবে অর্জিত সম্পদ বণ্টন না করার কারণে কারো কারো পক্ষ হতে যে অভিযোগ ছিল, সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–(ফতহুল কাদীর ১৯৯/৫ তাবারী ৩৫/১২, কুরতুবী ১৩/১৮, দূররে মানছুর ১৯২/৬)

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا

শানে নুযুল ঃ মদীনার আনসারগণ নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জমিন আমাদের এবং মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দিন। তখন হুজুর ﷺ বললেন, না তোমাদের জমিন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা বাগান করবে এবং ফলসমূহে তাদের অংশ বণ্টন করে দিবে। আনসাররা তখন বলল, আমরা এ ফয়সালায় সন্তুষ্ট আছি। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

শানে নুযুল ঃ এক অনাহারী লোক রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসে জানাল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ আমি ক্ষুধার্ত। নবীজী তখন তাকে তাঁর স্ত্রীগণের নিকট পাঠালেন। কিন্তু তাদের কাছেও দেওয়ার মতো কিছু ছিল না। নবী করীম ﷺ তখন উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামগণকে লক্ষ্য করে বললেন যে, এমন কেউ কি আছে যে, আজ রাতের জন্য তাকে মেহমান করে নিবে? নিশ্চয় আল্লাহ তাতে তার উপর রহমত নাজিল করবেন। তখন একজন আনসারী সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন যে, আমি তার মেহমানদারী করতে চাই ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর সে তা নিয়ে ঘরে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলল যে, তিনি রাসূল ﷺ -এর মেহমান। তার মেহমানদারীর আয়োজন কর। স্ত্রী উত্তর দিলেন যে, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া অন্য কিছুই যে ঘরে নেই। আনসারী সাহাবী তখন বললেন, বাচ্চাদেরকে এশার পর ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর বাতি নিভিয়ে দাও। আমরা আজ রাতে উপবাস কাটাব। (অতঃপর মেহমানের সামনে খানা দেওয়ার পর তারা এমন ভান করলেন যে, তারাও যেন খানা খাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুই খাননি। সকালে ঐ আনসারী সাহাবী যখন নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি ইরশাদ করলেন যে, আল্লাহ পাক অমুক পুরুষ ও অমুক মহিলার প্রতি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। সে প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। (সূত্র- বোখারী শরীফ, কানযুন নুকূল ঃ ৯৯, সংক্ষিপ্ত আকারে তিরমিযী ২য় খণ্ডেও বর্ণিত আছে)

শানে নুযুল– ২ : হাকেম, ইবনে মারদুভিয়া হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, সাহাবীগণের মধ্য থেকে কাউকে একটি ছাগলের মাথা হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি বললেন যে, আমার ভাই অমুক এবং তার পরিবারের লোকজন অপেক্ষাকৃত আমার থেকে অধিক পাওয়ার যোগ্য সুতরাং তার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এমন ভাবে সাতজনের ঘরে প্রেরণ করা হলো। অবশেষে প্রথম ব্যক্তির নিকটই প্রত্যার্বিত হলো। তখন রাসূল ﷺ -এর সাহাবীগণের পারস্পরিক এহেন অপূর্ব সহমর্মিতা প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

(রুহুল মা'আনী, কুরতুবী ২৫/২৮ তাবারী ৪১/১২ দূররে মানছুর ১৯৫/৬, ইবনে কাছীর ৩৩৮/৪, ফতহুল কাদীর ২০২/৫)

শানে নুযুল –৩ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বনূ নাযীর অভিযান যেদিন হয়েছিল, সেদিন নবী করীম ﷺ আনসারী সাহাবীগণকে বললেন যে, তোমরা যদি একমত পোষণ কর, তাহলে তোমাদের ধন-সম্পদ মুহাজির এবং তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দেই আর বনূ নাযীরের অর্জিত গনিমতের মালা-মালের মধ্যে তোমাদেরও অংশ নির্ধারিত করে দেই। আর যদি মনে কর যে, তোমাদের সম্পদ তোমাদের হাতেই থাকুক, গনিমতের মালা-মালের মধ্যে তোমাদের আর কোনো অধিকার থাকবেনা। তখন আনসারীগণ বলেছিলেন যে, আমাদের মালামাল আমাদের মুহাজির ভাইদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হোক এবং গনিমতের মালেরও অধিকারী তাদেরকে বানিয়ে দেওয়া হোক। মুহাজিরগণের প্রতি আনসারীগণের এহেন সহমর্মিতা দেখানোর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। (কুরতুবী ২৫/১৮)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . . . وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾

শানে নুযুল ঃ যখন বনী কুরায়জার কিছু লোক মুসলমান হলো। যাদের কতিপয় ছিল মুনাফিক। তারা বনী নাযীরকে বলত যে, তোমরা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর তবে আমরাও তোমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করব। তাদের ব্যাপারেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সূত্র-কানযুন নুকূল ঃ ৯৯)

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (١٦)

শানে নুযূল ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক ও ইহুদিদের পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান করার প্রতিশ্রুতির স্বরূপ বর্ণনা করে পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ে সংঘটিত একটি অপকর্মের সাথে শয়তানের সম্পৃক্ততার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আ'লা ইবনে ত্বাওস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ে একজন তাদের ধর্মযাজক ছিল, সে অত্যন্ত একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করতো। সে তার নিকট আগতদেরকে চিকিৎসাও করত। সুতরাং অত্যন্ত সুন্দরী ও রূপসী এক পাগল তরুণীকে চিকিৎসা করার জন্যে তার নিকট আনা হয়। এমনকি তার নিকটেই তাকে রেখে দেওয়া হয়। তরুণীটি সে আবেদের নিকট পছন্দ হবার কারণে সে তার সাথে ব্যভিচারীতে লিপ্ত হয়। এতে করে তরুণীটি গর্ভবর্তী হয়ে যায়। অতঃপর শয়তান এসে বলল যে, লোক সমাজে তা যদি জানা জানি হয়ে যায়, তাহলে তোমাকে অপমানিত করা হবে। কাজেই তাকে হত্যা করে তোমার ঘরের ভিতরেই দাফন করে নাও। সে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে সে তরুণীটিকে হত্যা করে নিজ ঘরেই দাফন করে নেয়। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হবার পর তার অভিভাবকগণ এসে আবেদকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আবেদ বলল, সে তো মারা গেল। অভিভাবকরা তার প্রতি কোনো অভিযোগ আরোপ করেনি। অতঃপর শয়তান তাদের নিকট এসে বলল যে, মেয়েটি মারা যায়নি বরং তার সাথে অপকর্ম করে মেয়েটিকে হত্যা করে তার ঘরেই অমুক জায়গায় দাফন করে রেখেছে। সুতরাং পাগল মেয়েটির পরিবারের লোকজন আবেদের নিকট এসে বলল, আমরা আপনার প্রতি কোনো অভিযোগ বা অপবাদ আরোপ করিনি। আপনি তাকে কোথায় কাকে সঙ্গে নিয়ে দাফন করেছেন? সুতরাং অনুসন্ধান করে তরুণীকে দাফন করার স্থানের সন্ধান পেয়ে গেল। অতঃপর মাটি খনন করে তাকে যেমন দাফন করেছিল, তেমনই পাওয়া গেল। সে অপরাধে তৎক্ষণাৎ তাকে বন্দি করা হলো। তখন শয়তান তার নিকট এসে বলল, তুমি তোমার বন্দিশালা থেকে যদি উদ্ধার পেতে চাও, তাহলে তুমি কুফরিতে লিপ্ত হও। সুতরাং সে আবেদ শয়তানের কথা মান্য করে আল্লাহর কুফরিতে লিপ্ত হয়ে গেল। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তুমি যদি এ বিপদ হতে বাচতে চাও তাহলে আমাকে সেজদা কর। ফলে আবেদ শয়তানকে সেজদা করল। পরক্ষণেই তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হলো। সে সময়ে শয়তান স্বীয় দায়মুক্তিতা প্রকাশ করে দূর হয়ে গেল। শয়তানের সেই অবস্থা বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–(তাবারী ৪৮/১২, দুররে মানছুর ২০০/৬)

সূরা হাশরের বৈশিষ্ট্য ও বনূ-নুযায়ের গোত্রের ইতিহাস ঃ সমগ্র সূরা হাশর ইহুদি বনূ-নুযায়ের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। -(ইবনে-ইসহাক) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই সূরার নামই 'সূরা বনূ-নুযায়ের বলতেন। -(ইবনে কাসীর) বনূ-নুযায়ের হযরত হারুন (আ.)-এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একটি ইহুদি গোত্র। তাদের পিতৃপুরুষগণ তাওরাতের পণ্ডিত ছিলেন। তাওরাতে খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সংবাদ, আকার-অবয়ব ও আলামত বর্ণিত আছে এবং তাঁর মদীনায় হিজরতের কথাও উল্লেখিত আছে । এই পরিবার শেষনবী ﷺ-এর সাহচর্যে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক তাওরাতের পণ্ডিত ছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় আগমনের পর তাঁকে আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই শেষনবী ﷺ কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে, শেষনবী হযরত হারুন (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেষনবী প্রেরিত হয়েছেন বনী-ইসরাঈলের পরিবর্তে নবী-ইসমাঈল বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিল। এতদসত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ লোক মনে মনে জানত এবং চিনত যে, ইনিই শেষনবী। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর স্বীকারোক্তি তাদের মুখে শোনাও গিয়েছিল, কিন্তু এই বাহ্যিক জয়-পরাজয়কে সত্য ও মিথ্যা চিনার মাপকাঠি করাটাই ছিল অসার ও দুর্বল ভিত্তি। ফলে ওহুদ যুদ্ধের প্রথম দিকে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখা দিল এবং কিছু সাহাবী শহীদ হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টলটলায়মান হয়ে গেল। এরপরই তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করে দিল।

এর আগে ঘটনা এই হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদি গোত্রসমূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোনো আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শান্তিচুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল। 'সীরাতে ইবনে-হিশামে' এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এমনিভাবে বনূ-নুযায়েরসহ ইহুদিদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনূ নুযায়েরের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগ-বাগিচা ছিল।

ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদেরকে বাহ্যতঃ এই শান্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের পর তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দূরভিসন্ধি শুরু করে দেয়। এই বিশ্বসঘাতকতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনূ নুযায়রের জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে-আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশজন ইহুদিকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং ওহুদ যুদ্ধ থেকে ফেরত কুরায়শী কাফেরদের সাথে সাক্ষাত করে। দীর্ঘ আলোচনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়। চুক্তিটি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশজন ইহুদিসহ এবং প্রতিপক্ষের আবু সুফিয়ান চল্লিশ জন কুরায়শী নেতাসহ কাবা গৃহে প্রবেশ করে এবং বায়তুল্লাহর গেলাফ স্পর্শ করতঃ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে।

চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে-আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং মুহাম্মদ ইবনে-মসলামা (রা.) সাহাবী তাকে হত্যা করেন।

এরপর বনূ নুযায়রের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবহিত হতে থাকেন। তন্মধ্যে একটি উপরে শানে-নুযূলে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাৎক্ষণিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এই ষড়যন্ত্রে সফলকাম হয়ে যেত। কেননা যে গৃহের নীচে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বসিয়েছিল, তার ছাদে চড়ে একটি প্রকাণ্ড ভারি পাথর তাঁর মাথায় ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল, তার নাম ওমর ইবনে-জাহহাশ, আল্লাহ তা'আলার হেফাজতের কারণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

একটি শিক্ষা : আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী পর্যায়ে বনূ নুযায়েরের সবাই নির্বাসিত হয়ে মদীনা ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মদীনাতেই নিরাপদ জীবন যাপন করতে থাকে। তাদের একজন ছিল এই ওমর ইবনে জাহহাশ, দ্বিতীয়জন তার পিতৃব্য ইয়ামীন ইবনে আমর ইবনে কা'ব। –[ইবনে কাসীর]

আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর ঘটনা ঃ শানে-নুযূলের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। এ ব্যাপারেই বনূ-নুযায়রের চাঁদা লাভ করার জন্যে তিনি তাদের জনপদে গমন করেছিলেন। এর পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে-কাসীর লিখেন ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও উৎপীড়নের কাহিনী অতিদীর্ঘ। তন্মধ্যে বীরে-মাউনার ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে সুবিদিত। একবার কিছু সংখ্যক মুনাফিক ও কাফের তাদের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে একদল সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সত্তর জন সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিছক একটা চক্রান্ত ছিল। কাফেররা মুসলমানগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং এতে তারা সফলও হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আমর ইবনে যমরী কোনোরূপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। যিনি এইমাত্র কাফেরদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর উনসত্তর জন সঙ্গীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন, কাফেরদের মোকাবিলায় তাঁর মনোবৃত্তি কি হবে, তা অনুমান করা কারও পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। ঘটনাক্রমে মদীনায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তিনি দুজন কাফেরের মুখোমুখি হন। তিনি কালবিলম্ব না করে উভয়কে হত্যা করেন। পরে জানা যায় যে, তারা ছিল বনী-আমের গোত্রের লোক, যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শান্তি চুক্তি ছিল।

আজকালকার রাজনৈতিক চুক্তিসমূহে প্রথমেই চুক্তিভঙ্গের পথ খুঁজে নেওয়া হয়। কিন্তু রাসূলে করীম ﷺ -এর চুক্তি এরূপ ছিল না। এখানে যা কিছু মুখ অথবা কলম দিয়ে বের হয়ে যেত, তা ধর্মীয় ও আল্লাহর নির্দেশের মর্যাদা রাখত এবং তা যথাযথ পালন করা অপরিহার্য হয়ে যেত। আমরের এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ শরিয়তের আইনানুযায়ী নিহত ব্যক্তিদের রক্ত বিনিময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং চাঁদার ব্যাপারে তাঁকে বনূ নুযায়ের গোত্রেও গমন করতে হয়।

ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতা বর্তমান রাজনীতিকদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার : আজকালকার বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার মানবাধিকার সংরক্ষণ কল্পে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন, এর জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং বিশ্বে মানবাধিকারের হর্তাকর্তা কথিত হন। প্রিয় পাঠক, উপরিউক্ত ঘটনার প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। বনূ নুযায়েরের উপর্যুপরি চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা, রাসূল ﷺ -কে হত্যার পরিকল্পনা ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক রাসূলে কারীম ﷺ -এর গোচরে আসতে থাকে। যদি এসব ঘটনা আজকালকার কোনো মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধানের গোচরীভূত হতো তবে ইনসাফের সাথে বলুন তারা এহেন লোকদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন? আজকাল তো জীবিত লোকদের উপর পেট্রোল ঢেলে ময়দান পরিষ্কার করে দেওয়া কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তিরও মুখাপেক্ষী নয়। কিছু গুণ্ডা, দুষ্কৃতকারী সংঘবদ্ধ হয়ে অনায়াসে এ কাজ সমাধা করে ফেলে। রাজকীয় রাগ ও গোস্বার লীলাখেলা এর চাইতে বেশিই থাকে।

কিন্তু এই রাষ্ট্রে আল্লাহর ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বনূ নুযায়েরের বিশ্বাসঘাতকতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখনও তিনি তাদের গণহত্যার সংকল্প করেন নি। তাদের মাল ও আসবাবপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা করা হয়নি; বরং তিনি –১. সব আসবাবপত্র নিয়ে কেবল শহর খালি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; ২. এর জন্যও তাদেরকে দশ দিনের সময় দেন, যাতে অনায়াসে সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারে। বনূ নুযায়ের এরপরেও যখন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল, তখন জাতীয় পদক্ষেপে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়; তাই ৩. কিছু খর্জুর বৃক্ষ কাটা হয় এবং কিছু বৃক্ষে অগ্নি সংযোগ করা হয়, যাতে তারা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু দুর্গে অগ্নি সংযোগ অথবা গণহত্যার নির্দেশ তখনও জারি করা হয়নি; ৪. অতঃপর তারা যখন বেগতিক হয়ে শহর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, তখন সামরিক অভিযান সত্ত্বেও এক ব্যক্তি এক উটের পিঠে যে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যেতে পারে সে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হলো। ফলে তারা গৃহের কড়িকাঠ, তক্তা এবং দরজার কপাট পর্যন্ত উটের পিঠে তুলে নিল; ৫. তারা সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কোনো মুসলমান তাদের প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকান নি। শান্ত ও মুক্ত পরিবেশে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ অবস্থায় তারা আসবাবপত্র নিয়ে বিদায় হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সময় শত্রুর কাছ থেকে ষোল আনা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মতো শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সেই সময় বনূ নুযায়েরের প্রতি তিনি এহেন উদারতা প্রদর্শন করেন। এই বিশ্বাসঘাতক, কুচক্রী শত্রুদের সাথে তাঁর এহেন উদার ব্যবহার, সেই ব্যবহারের নযীর, যা তিনি মক্কা বিজয়ের পর তাঁর পুরাতন শত্রুদের সাথে করেছিলেন।

لِأَوَّلِ الْحَشْرِ –বনূ-নুযায়রের এই নির্বাসনকে কুরআন পাক 'আউয়ালে হাশর' তথা প্রথম সমাবেশ আখ্যা দিয়েছে। এর এক কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা এক জায়গায় বসবাস করত। স্থানান্তর ও নির্বাসনের ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথমবার সংঘটিত হয়েছিল। এর আরও একটি কারণ এই যে, ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রকৃত নির্দেশ ছিল আরব উপদ্বীপকে অমুসলিমদের থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে এটা ইসলামের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। এর ফলে নির্বাসনের আকারে দ্বিতীয় সমাবেশ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এটা হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর খেলাফতকালে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যারা খায়বরে বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকে আরব উপদ্বীপ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিক দিয়ে বনূ নুযায়র এই নির্বাসন প্রথম সমাবেশ এবং হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন, দ্বিতীয় সমাবেশ নামে অভিহিত হয়।

فَأَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا : এর শাব্দিক অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তারা কল্পনাও করেনি। বলাবাহুল্য, আল্লাহর আগমন করার অর্থ তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশবাহক ফেরেশতা আগমন করা।

يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ : গৃহের দরজা, কপাট ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, তখন তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যে মুসলমানগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস করছিল।

لِيْنَةٍ : مَاقَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ –শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ। বনু-নুযায়রের খর্জুর বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভিতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলমান তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জন্যে তাদের কিছু খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নিসংযোগ করে খতম করে দিলেন। অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ বিজয় তাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগ-বাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তাঁরা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গরমিল। পরে যখন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হলো, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলো। এতে উভয়দলের কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে।

রাসূলের নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই নির্দেশ : হাদীস অস্বীকারকারীদের প্রতি হুশিয়ারি : এই আয়াত বৃক্ষ কর্তন, পোড়ান ও অক্ষত ছেড়ে দেওয়ার উভয় প্রকার কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ কুরআনের কোনো আয়াতে এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোনো কর্মের আদেশ উল্লেখ করা হয়নি। অতএব বাহ্যত বোঝা যায় যে, উভয় দল নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে এ কাজ করেছে। বেশির বেশি তারা হয় তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে এর অনুমতি নিয়ে থাকবে, কিন্তু কুরআন এই অনুমতি তথা হাদীসকে আল্লাহর ইচ্ছা প্রতিপন্ন করে ব্যক্ত করেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে এবং তিনি যে আদশ জারি করবেন, তা আল্লাহরই আদেশ বলে গণ্য হবে। এই আদেশ পালন করা কুরআনের আয়াত পালন করার মতো ফরজ।

ইজতিহাদী মতভেদে কোনো পক্ষকে গুনাহ্ বলা যাবে না : এই আয়াত থেকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান এই জানা গেল যে, যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন, কোনো ব্যাপারে তাদের ইজতিহাদ ভিন্নমুখী হলে অর্থাৎ একদল জায়েজ ও অন্যদলে নাজায়েজ বললে আল্লাহর কাছে উভয়টিই শুদ্ধ হবে। উভয় ইজতিহাদের মধ্যে কোনোটিই গুনাহ বলা যাবে না। এ কারণে তাদের উপর দৃষ্টের দমন আইন প্রযোজ্য হবে না। কেননা তাদের মধ্যে কোনো এক পক্ষও শরিয়তানুযায়ী অশিষ্ট নয়। وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ বাক্যে বৃক্ষ কর্তন ও অগ্নি সংযোগের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা অনর্থ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে এটা ছওয়াবের কাজ।

মাসআলা : যুদ্ধাবস্থায় কাফেরদের গৃহ বিধ্বস্ত করা, অগ্নি সংযোগ করা এবং বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করা জায়েজ কি না, এ সম্পর্কে ফিকহ্‌বিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) বলেন : যুদ্ধাবস্থায় এসব কাজ জায়েজ। কিন্তু শায়খ ইবনে হুমাম (র.) বলেন : এটা তখন জায়েজ, যখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যতীত কাফেরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সুদূর পরাহত হয় অথবা যখন মুসলমানদের বিজয় অনিশ্চিত হয়। কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে অথবা বিজয় অর্জিত না হলে তাদের ধনসম্পদ বিনষ্ট করে তাদেরকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তখন এসব কাজ জায়েজ হবে। –[মাযহারী]

اَفَاءَ : وَمَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ শব্দটি فَيْءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও فَيْءٌ বলা হয়। কাফেরদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের স্বরূপ এই যে, কাফেররা বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের ধন-সম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ফিরে যায়। তাই এগুলো অর্জনকে اَفَاءَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ তো এই ছিল যে, কাফেরদের কাছ থেকে অর্জিত সকল প্রকার ধন-সম্পর্কেই فَيْءٌ বলা হতো। কিন্তু যুদ্ধ ও জেহাদের মাধ্যম যে ধন-সম্পদ অর্জিত হয়, তাতে মানুষের কর্ম ও অধ্যবসায়েরও এক প্রকার দখল থাকে। তাই এই প্রকার ধন-সম্পদকে 'গনিমত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ –কিন্তু যে ধন-সম্পদ অর্জনে যুদ্ধ ও জেহাদের প্রয়োজন পড়ে না, তাকে فَيْءٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে ধন-সম্পদ যুদ্ধ ও জেহাদ ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও

যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আইনানুযায়ী বণ্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা করবেন দিবেন, অথবা নিজের জন্যে রাখবেন। তবে যে কয়েক প্রকার হকদার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই এই সম্পদে বণ্টন সীমিত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى : এখানে اَهْلِ الْقُرٰى বলে বনূ-নুযায়েরের এবং তাদের মতো বনূ কুরায়যা ইত্যাদি গোত্র বোঝানো হয়েছে, যাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই অর্জিত হয়েছিল। এরপর পাঁচ প্রকার হকদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব আয়াতে উপরিউক্ত প্রকার ধন-সম্পদের বিধান, হকদার ও হকদারদের মধ্যে বণ্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনফালের শুরুতে গনিমতের মাল ও ফায়-এর মালের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জেহাদের ফলশ্রুতিতে যে ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গনিমতের মাল এবং যুদ্ধ ও জেহাদ ব্যতিরেকে যা অর্জিত হয়, তা ফায়-এর মাল। কাফেররা যে ধন-সম্পদ রেখে পলায়ন করে কিংবা যা সম্মতিক্রমে জিযিয়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যাক্সের আকারে প্রদান করে, সবই ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত।

এর কিঞ্চিত বিবরণ মা'আরেফুল-কুরআনের চতুর্থ খণ্ডে সূরা আনফালের শুরুতে এবং আরও কিছু বিবরণ সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে ফায়-এর সম্পর্কে প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা আনফালে বলা হয়েছে :

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

উভয় আয়াতে ছয় প্রকার হকদারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে– আল্লাহ, রাসূল, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, মুসাফির। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা তো ইহকাল, পরকাল এবং সমগ্র সৃষ্ট জগতের আসল মালিক। অংশ বর্ণনায় তাঁর নাম নিছক বরকতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে ইঙ্গিত হয়ে যায় যে, এই ধনসম্পদ অভিজাত, হালাল ও পূত-পবিত্র। এক্ষেত্রে অধিকাংশ তাফসীরবিদের বক্তব্য তাই। –[মাযহারী]

আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করার ফলে এই ধনসম্পদের অভিজাত, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্র হওয়ার দিকে কিভাবে ইঙ্গিত হলো, এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আনফালের তাফসীরে প্রদান করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে অর্জিত সদকার মাল হালাল করেন নি। ফায় ও গনিমতের মাল কাফেরদের কাছ থেকে অর্জিত হয়। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই মাল পয়গম্বরগণের জন্য কিরূপে হালাল হলো? এর স্থলে আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করে এই প্রশ্নর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বস্তুর মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনি কৃপাবশত বিশেষ আইনের অধীনে মানুষকে মালিকানা দান করেছেন। কিন্তু যে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যায়, তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রথমে পয়গম্বরগণকে ঐশী নির্দেশসহ প্রেরণ করা হয়েছে। যারা এতেও সঠিক পথে আসে না, তাদেরকে কমপক্ষে ইসলামি আইনের বশ্যতা স্বীকার করে নির্ধারিত জিযিয়া, খারাজ ইত্যাদি আদায় করে বসবাস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যারা এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে, তাদের মোকাবিলায় জিহাদ ও যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, তাদের জান ও মাল সম্মানার্হ নয়। তাদের ধনসম্পদ আল্লাহর সরকারে বাজেয়াপ্ত। জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে যে ধনসম্পদ অর্জিত হয়, তা কোনো মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়– বরং তা সরাসরি আল্লাহর মালিকানায় ফিরে যায়। 'ফায়' শব্দের মধ্যে এই ফিরে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিতও আছে। কারণ এর আসল অর্থ ফিরে যাওয়া। সত্যিকার মালিক আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় ফিরে যাওয়ার কারণেই এই সম্পদকে 'ফায়' বলা হয়। এখন এতে মানুষের মালিকানার কোনো দখল নেই। যেসব হকদারকে এ থেকে অংশ দেওয়া হবে; তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। কাজেই এই ধনসম্পদ আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এবং স্বউদগত ঘাসের ন্যায় আল্লাহর দান হিসাবে মানুষের জন্য হালাল ও পবিত্র হবে।

সারকথা এই যে, এ স্থলে আল্লাহর নাম উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার; তাঁর পক্ষ থেকে হকদারদেরকে প্রদান করা হয়। এটা কারও সদকা খয়রাত নয়।

এখন সর্বমোট হকদার পাঁচ রয়ে গেল- রাসূল, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফির। গনিমতের পঞ্চমাংশের হকদারও তারাই, যা সূরা আনফালে বর্ণিত হয়েছে। গনিমত ও ফায় উভয় প্রকারের বিধান এই যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সম্পূর্ণ ইখতিয়ারে থাকবে। তাঁরা ইচ্ছা করলে এগুলো কাউকে না দিয়ে মুসলিম জনগণের স্বার্থে বায়তুলমালে জমা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে বন্টনও করতে পারেন। তবে বন্টন করলে তা উপরিউক্ত পাঁচ প্রকার হকদারের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে। –[কুরতুবী]

খালাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারাদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে তো ফায় -এর মাল তাঁর ইখতিয়ারে ছিল। তিনি যেখানে ভালো বিবেচনা করতেন ব্যয় করতেন। তাঁর ওফাতের পর এই মাল খলীফাগণের ইখতিয়ারে ছিল।

এই মালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে অংশ ছিল তা তাঁর ওফাতের পর মওকুফ হয়ে যায়। তাঁর আত্মীয়বর্গকে এই মাল থেকে অংশ দেওয়ার দ্বিবিধ কারণ ছিল। এক. তাঁরা ইসলামি কর্মকাণ্ডে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহায্য করতেন। তাই বিত্তশালী আত্মীয়বর্গকেও এ থেকে অংশ দেওয়া হতো।

দুই. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বজনদের জন্য সদকার মাল হারাম করা হয়েছিল। তাই তাঁদের নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তগণকে ফায় -এর মাল থেকে এর পরিবর্তে অংশ দেওয়া হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর সাহায্য খতম হয়ে যায়। ফলে বিত্তশালী স্বজনদের অংশও রাসূল ﷺ-এর অংশের ন্যায় মওকুফ হয়ে যায়। তবে অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনদের অংশ অভাবগ্রস্ততার কারণে অব্যাহত রয়েছে। তারা অন্য অভাবগ্রস্তদের মোকাবিলায় অগ্রগণ্য হবেন। –[হিদায়া]

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ : যে সম্পদ পরস্পরে আদান-প্রদান হয়, তাকে دُوْلَة বলা হয়। –(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই যে, উপরিউক্ত ধন-সম্পদের হকদার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে এই সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ও বিত্তশালীদের মধ্যকার পুঞ্জীভূত সম্পদ না হয়ে যায়। এতে মুর্খতাযুগের একটি কু-প্রথার মূলোৎপাটনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কু-প্রথা ছিল এই যে, এ ধরনের সকল ধন-সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত এবং এতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোনো অংশ থাকত না।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার প্রতি ইসলামি আইনের মরণাঘাত : আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব প্রতিপালক। তাঁর সৃজিত হওয়ার দিকে দিয়ে মানবিক প্রয়োজনের সম্পদরাজিতে সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। এতে মুমিন ও কাফেরের মধ্যেও কোনো পার্থক্য রাখা হয়নি। অতএব পরিবারগত ও শ্রেণিগত এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য রাখার তো প্রশ্নই উঠে না। বায়ু, শূন্যমণ্ডল, সূর্য, চন্দ্র ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের আলো, শূন্যমণ্ডলে সৃষ্ট মেঘমালা, বৃষ্টি-এগুলো মানুষের সহজাত ও আসল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী। এগুলো ব্যতীত মানুষ সামান্যক্ষণও জীবিত থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এগুলো স্বহস্তে রেখে এভাবে বন্টন করেছেন, যাতে প্রতি স্তর ও প্রতি ভূখণ্ডের দুর্বল ও সবল মানুষ এগুলো দ্বারা সমভাবে উপকৃত হতে পারে। এ ধরনের দ্রব্য সামগ্রীকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রজ্ঞা বলে সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়া ও একচ্ছত্র অধিকারের উর্ধ্বে রেখেছেন। ফলে এগুলোর উপর ব্যক্তিগত দখল প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য কারও নেই। এগুলো ওয়াকফে আম। কোনো বৃহত্তম সরকার ও পরাশক্তি এগুলোকে কুক্ষিগত করতে সক্ষম নয়। সৃষ্ট জীব সর্বত্রই এগুলো সমভাবে লাভ করে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দ্বিতীয় কিস্তি হচ্ছে ভূগর্ভ থেকে উদগত পানি ও আহার্য বস্তু। এগুলো যদিও সাধারণ ওয়াক্‌ফ নয়, কিন্তু ইসলামি আইনে পাহাড়, অনাবাদি জঙ্গল ও প্রাকৃতিক জলস্রোতকে সাধারণ ওয়াক্‌ফ রেখে এগুলোর কতকাংশের উপর বিশেষ বিশেষ লোকের বৈধ মালিকানার অধিকারও দেওয়া হয়। অপরদিকে অবৈধ দখল প্রতিষ্ঠাকারীরাও ভূমির উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে নেয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কোনো বৃহত্তম পুঁজিপতি ও দরিদ্র, কৃষক ও শ্রমিকদেরকে সাথে না নিয়ে ভূগর্ভে নিহিত সম্পদরাজি অর্জন করতে পারে না। কাজেই দখল প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও পুঁজিপতিরা অপরাপর দরিদ্রদেরকে অংশীদার করতে বাধ্য থাকে।

তৃতীয় কিস্তি হচ্ছে স্বর্ণ, রৌপ্য ও টাকা-পয়সা। এগুলো আসল প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর তালিকাভুক্ত নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অর্জনের উপায় করেছেন। খনি থেকে উত্তোলন করার পর বিশেষ আইনের অধীনে এগুলো উত্তোলনকারীর মালিকানাধীন হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন পন্থায় অন্য লোকদের দিকে মালিকানা

স্থানান্তরিত হতে থাকে। যদি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে এগুলো যথাযথ পন্থায় আবর্তিত হয়, তবে কোনো মানুষ ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষ এগুলো দ্বারা কেবল নিজেই উপকৃত হতে চায়, অন্যান্য লোকও উপকৃত হোক, তা চায় না। এই কার্পণ্য ও লালসা দুনিয়াতে সম্পদ ও পুঁজি আহরণের নতুন ও পুরাতন অনেক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যার ফলে সম্পদের আবর্তন কেবল পুঁজিপতি ও বিত্তশালীদের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ দরিদ্র ও নিঃস্বদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এর অশুভ প্রতিক্রিয়াই আজ দুনিয়াতে কমিউনিজম ও সোশ্যালিজমের মতো অযৌক্তিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে।

ইসলামি আইন একদিকে ব্যক্তি মালিকানার প্রতি এতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেছে যে, এক ব্যক্তির সম্পদকে তার প্রাণের সমান এবং প্রাণকে বায়তুল্লাহর সমান গুরুত্ব দান করেছে। এর উপর কারও অবৈধ হস্তক্ষেপকে কঠোরভাবে বারণ করেছে। অপরদিকে যে হাত অবৈধ পন্থায় এই সম্পদের দিকে অগ্রসর হয় সেই হাত কেটে দিয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে দ্রব্যসামগ্রীর উপর কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

অর্থোপার্জনের প্রচলিত পন্থাসমূহের মধ্যে সুদ সট্টা ও জুয়ার মাধ্যমে সম্পদ সংকুচিত হয়ে কতিপয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। ইসলাম এগুলোকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা ইত্যাদি কাজ-কারবারে এগুলোর মূল কেটে দিয়েছে। যে অর্থ- সম্পদ কোনো ব্যক্তির কাছে বৈধ পন্থায় সঞ্চিত হয়, তাতেও জাকাত, ওশর, ফিতরা, কাফ্ফারা ইত্যাদি ফরজ কর্মের আকারে এবং অতিরিক্ত স্বেচ্ছামূলক দানের আকারে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এসব ব্যয়বহনের পরও মৃত্যুর সময় ব্যক্তির কাছে যে অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায়, তা এক বিশেষ প্রজ্ঞাভিত্তিক নীতিমালা অনুযায়ী মৃতের নিকট থেকে নিকটতম স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। ইসলাম এই ত্যাজ্য সম্পদ সাধারণ দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করার আইন রচনা করেনি। কারণ এরূপ করলে মৃত ব্যক্তির পূর্বেই তার সম্পদ অযথা ব্যয় করে নিঃশেষ করে দিতে স্বভাবগত কারণেই আগ্রহী হতো। এখন তারই আত্মীয় ও প্রিয়জন পাবে দেখে তার অন্তরে এই প্রেরণা লালিত হবে না।

অর্থোপার্জনের অপর পন্থা হচ্ছে যুদ্ধ ও জিহাদ। এই পন্থায় অর্জিত ধনসম্পদ সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য ইসলাম যে নীতিমালা অবলম্বন করেছে, তার কিয়াদংশ সূরা আনফালে এবং কিয়াদংশ এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেমন জ্ঞানপাপী তারা, যারা ইসলামের এহেন ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ছেড়ে নতুন ইজম অবলম্বন করে বিশ্ব শান্তির পায়ে কুঠারাঘাত করছে।

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ : এই আয়াত ফায়-এর মাল বণ্টন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর উপযুক্ত অর্থ এই যে, ফায় -এর মাল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা হকদারদের শ্রেণি বর্ণনা করেছেন ঠিক, কিন্তু তাদের মধ্যে কাকে কতটুকু দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুবিবেচনার উপর রেখে দিয়েছেন। তাই এই আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে যে পরিমাণ দেন, তা সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ কর এবং যা দেন না, তা পেতে চেষ্টা করো না। অতঃপর وَاتَّقُوا اللّٰهَ বলে এই নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ভ্রাতা ছলচাতুরীর মাধ্যমে অতিরিক্ত আদায় করে নিলেও আল্লাহ তা'আলা সব খবর রাখেন। তিনি এজন্যে শাস্তি দেবেন।

রাসূলের নির্দেশ কুরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয় :

কিন্তু আয়াতের ভাষা ধন-সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং শরিয়তের বিধি-বিধানও এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপকভঙ্গিতে আয়াতের অর্থ- এই যে, যে কোনো নির্দেশ অথবা ধন-সম্পদ অথবা অন্য কোনো বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তিনি যে বিষয় নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা দরকার।

অনেক সাহাবায়ে কেরাম আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রত্যেক নির্দেশকে কুরআনের নির্দেশের অনুরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন ঃ আয়াতে اٰتٰى শব্দে বিপরীতে نَهٰى শব্দ ব্যবহার করায় বোঝা যায় যে, এখানে اٰتٰى শব্দের অর্থ اَمَرَ অর্থাৎ যা আদেশ করেন। কারণ এটাই نَهٰى -এর বিশুদ্ধ বিপরীত শব্দ তবে কুরআন পাক এর পরিবর্তে اٰتٰى শব্দ এজন্য ব্যবহার করেছে যাতে 'ফায়' এর মাল বণ্টন সম্পর্কিত

বিষয়বস্তুও এতে শামিল থাকে। কারণ এ প্রসঙ্গে আয়াতটি আনা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে ইহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে আদেশ করেন। লোকটি বলল : আপনি এ সম্পর্কে কুরআনে কোনো আয়াত বলতে পারেন কি যাতে সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এ সম্পর্কে আয়াত আছে অতঃপর তিনি وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ আয়াতটি পাঠ করে দিলেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) একবার উপস্থিত লোকজনকে বললেন : আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াব কুরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞাসা কর, যা জিজ্ঞাসা করতে চাও। এক ব্যক্তি আরজ করল : এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় প্রজাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেয়ী (র.) এই আয়াত তেলাওয়াত করে হাদীস থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন। –(কুরতুবী)।

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ : রুকুর শেষ পর্যন্ত এই কয়েকটি আয়াতে দরিদ্র মুহাজির, আনসার ও তাঁদের পরবর্তী সাধারণ উম্মত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাকরণিক দিক দিয়ে لِلْفُقَرَاءِ শব্দটি وَلِذِى الْقُرْبٰى থেকে بَدَل হয়েছে, যা পূর্বের আয়াতে আছে। -(মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণত : এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্থতার কারণে ফায়-এর মালের হকদার গণ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদিও সকল দরিদ্র ও মিসকিন এই মালের হকদার, কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগণ্য। কারণ তাঁদের ধর্মীয় খেদমত এবং ব্যক্তিগত গুণ-গরিমা সুবিদিত।

সদকার মালে ধর্মপরায়ণ ও দীনের খেদমতে নিয়োজিত অভাবগ্রস্তদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত : এ থেকে বোঝা গেল যে, সদকার মাল বিশেষত ফায় -এর মাল সাধারণ অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করার জন্য হলেও তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, ধার্মিক, বিশেষত দীনের খেদমতে নিয়োজিত তালেবে-ইলম ও আলেম, তাদেরকে অন্যদের চাইতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এ কারণেই ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষা, প্রচার ও জনসংস্কারের কাজে নিয়োজিত আলেম, মুফতি ও বিচারকগণকে ফায় -এর মাল থেকে খোরপোশ দেওয়ার প্রচলন ছিল। কেননা আলোচ্য আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কেরামকেও প্রথমে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এক. মুহাজির, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য অভূতপূর্ব ত্যাগ স্বীকার করেন এবং ইসলামের জন্য ঘোরতর বিপদাপদ হাসিমুখে বরণ করে নেন। অবশেষে সহায়-সম্পত্তি স্বদেশ ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেন। দুই. আনসার যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গী-সাথি মুহাজিরগণকে মদীনায় ডেকে এনে সারা দুনিয়ার মানুষকে নিজেদের শত্রুতে পরিণত করেন এবং তাঁদের এমন আতিথেয়তা করেন, যার নজির বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দুই শ্রেণির পর তৃতীয় শ্রেণি সেসব মুসলমানের সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা সাহাবায়ে কেরামের পর ইসলাম গ্রহণ করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই তিন শ্রেণির কিছু শ্রেষ্ঠত্ব, গুণ গরিমা ও দীনের খেদমত বর্ণনা করা হয়েছে।

মুহাজিরদের শ্রেষ্ঠত্ব : اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰۤئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ এতে মুহাজিরগণের প্রথম গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁরা স্বদেশ ও সহায় সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমর্থক ও সাহায্যকারী শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফেররা তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি, ধন-সম্পদ ও বাস্তু-ভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীত বস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাপট থেকে আত্মরক্ষা করতেন। –(মাযহারী, কুরতুবী)।

মুসলমানদের ধন-সম্পদের উপর কাফেরদের দখল সম্পর্কিত বিধান : আলোচ্য আয়াতে মুহাজিরগণকে ফকির বলা হয়েছে। ফকির সেই ব্যক্তি, যার মালিকানায় কিছু না থাকে অথবা নেসাব পরিমাণ কোনো কিছু না থাকে। মক্কায় তাঁদের অধিকাংশই ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্বলের অধিকারী ছিলেন। হিজরতের পরও যদি সেই ধনসম্পদ তাঁদের মালিকানায় থাকত, তবে তাঁদেরকে ফকির ও নিঃস্ব বলা ঠিক হতো না। কুরআন পাক তাঁদেরকে ফকির বলে ইঙ্গিত করেছে যে, হিজরতের পর তাঁদের মক্কায় পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁদের মালিকানা থেকে বের হয়ে কাফেরদের দখলে চলে গেছে।

এ কারণেই ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.) বলেন : যদি মুসলমান কোনো জায়গায় হিজরত করে চলে যায় এবং তাদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি কাফেররা দখল করে নেয় অথবা আল্লাহ না করুন কোনো দারুল-ইসলামের কাফেররা অধিকার করে মুসলমানদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তবে এসব ধনসম্পদ কাফেরদের পুরোপুরি দখলের পর তাদের মালিকানায় চলে যায়। এগুলো বেচাকেনা ইত্যাদি কার্যকলাপ আইনসিদ্ধ হয়। বিভিন্ন হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এ স্থলে তাফসীরে মাযহারীতে সেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাজিরগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا অর্থাৎ তাঁরা কোনো জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করেননি; কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম্য ছিল। এ থেকে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা বোঝা যায়। فَضْلٌ শব্দটি প্রায়শঃ পার্থিব নিয়ামতের জন্যে এবং وَرِضْوَانٌ শব্দটি পারলৌকিক নিয়ামতের জন্যে ব্যবহৃত হয়। কাজেই অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা তাঁদের সাবেক ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছায়াতলে সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরকালের নিয়ামত কামনা করছেন।

মুহাজিরগণের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে ঃ وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলকে সাহায্য করার জন্যে তাঁর উপরিউক্ত সবকিছু করেছেন। আল্লাহ তা'আলাকে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দীনকে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ত্যাগ ও তিতীক্ষা বিস্ময়কর।

তাঁদের চতুর্থ গুণ হচ্ছে ঃ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ –অর্থাৎ তাঁরা কথা ও কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কালেমা পাঠ করে তাঁরা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই আয়াত সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী বলে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে। অতএব যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলে, সে এই আয়াত অস্বীকার করার কারণে মুসলমান হতে পারে না। (নাউজুবিল্লাহ্) রাফেযী সম্প্রদায় তাঁদেরকে মুনাফিক আখ্যা দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। রাসূলে কারীম ﷺ এই ফকির মুহাজিরগণের অসিলা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করতেন। এতই বোঝা যায় যে, হুযুরের কাছে তাঁদের কি মর্যাদা ছিল। –(মাযহারী)

আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ : تَبَوُّءٌ শব্দের অর্থ অবস্থান গ্রহণ করা। دَارٌ বলে হিজরতের স্থান তথা মদীনা তাইয়্যেবা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হযরত ইমাম মালেক (র.) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দুনিয়ার যেসব শহরে ইসলাম পৌঁছেছে ও প্রসার লাভ করেছে, সেগুলো জেহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে; এমনকি মক্কা মোকাররমাও। একমাত্র মদীনা শহরই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঈমান ও ইসলামকে বুকে ধারণ করেছে। –(কুরতুবী)

আয়াত تَبَوَّءُوا ক্রিয়াপদের পর دَارٌ-এর সাথে ঈমানও উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অবস্থান গ্রহণ কোনো স্থান বা জায়গাতেই শুধু হতে পারে। ঈমান কোনো জায়গা নয় যে, এতে অবস্থান গ্রহণ করা হবে। তাই কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে خَلَصُوْا অথবা تَمَكَّنُوْا ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন, ঈমানে খাঁটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন। এখানে এরূপও হতে পারে যে, ঈমানকে রূপক ভঙ্গিতে জায়গা ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। مِنْ قَبْلِهِمْ অর্থাৎ মুহাজিরগণের পূর্বে। এতে আনসারগণের একটি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তা এই যে, যে শহর আল্লাহ তা'আলার কাছে 'দারুল-হিজরত' ও দারুল ঈমান হওয়ার ছিল, তাতে তাঁদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মুহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা ঈমান কবুল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আনসারগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ অর্থাৎ তাঁরা তাদেরকে ভালোবাসে, যারা হিজরত করে তাদের শহরে আগমন করেছেন। এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থি। সাধারণতঃ লোকেরা এহেন ভিটা-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেওয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাঁদেরকে স্থানই দেননি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধন-সম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইজ্জত ও সম্ভ্রমের সাথে তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেওয়ার জন্যে এক সাথে কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি করতে হয়েছে। –(মাযহারী)।

তাঁদের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা বনূ-নুযায়েরের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল।

বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদ বন্টনের ঘটনা : যে সময় বনূ নুযায়ের গোত্রের ফায় -এর ধনসম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টনের ইখতিয়ার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া হয়, তখন মুহাজিরগণ ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। তাঁদের না ছিল নিজস্ব কোনো বাড়ি–ঘর এবং না ছিল বিষয়-সম্পত্তি। তাঁরা আনসারগণের গৃহে বাস করতেন এবং তাঁদেরই বিষয়-সম্পত্তিতে মেহনত মজদুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফায় -এর সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারগণের সর্দার সাবেত ইবনে কায়স (রা.)-কে ডেকে বললেন : তুমি আনসারগণকে আমার কাছে ডেকে আন। সাবেত জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিজের গোত্র খাযরাজের আনসারগণকে ডাকব, না সব আনসারকে ডাকব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, সবাইকে ডাকতে হবে। অতঃপর তিনি আনসারগণের এক সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। হামদ ও সালাতের পর তিনি মদীনার আনসারগণের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন : আপনারা আপনাদের মুহাজির ভাইদের সাথে যে ব্যবহার করেছেন, তা নিঃসন্দেহে অনন্য সাধারণ সাহসিকতার কাজ। অতঃপর তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদ আপনাদের করতলগত করে দিয়েছেন। যদি আপনারা চান, তবে আমি এই সম্পদ মুহাজির ও আনসার সবার মধ্যে বন্টন করে দেব এবং মুহাজিরগণ পূর্ববৎ আপনাদের গৃহেই বসবাস করবে। পক্ষান্তরে আপনারা চাইলে আমি এই সম্পদ কেবল গৃহহীন ও সহায়-সম্বলহীন মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করে দেব এবং এরপর তারা আপনাদের গৃহ ত্যাগ করে আলাদা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে নেবে।

এই বক্তৃতা শুনে আনসারগণের দুই জন প্রধান নেতা সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.) দণ্ডায়মান হলেন এবং আরজ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমাদের অভিমত এই যে, এই ধনসম্পদ আপনি সম্পূর্ণই কেবল মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন এবং তাঁরা এরপরও পূর্ববৎ আমাদের গৃহে বসবাস করুন। নেতাদ্বয়ের এই উক্তি শুনে উপস্থিত আনসারগণ সমস্বরে বলে উঠলেন : আমরা এই সিদ্ধান্তে সম্মত ও আনন্দিত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল আনসার ও তাঁদের সন্তানগণকে দোয়া দিলেন এবং ধনসম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আনসারগণের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি অর্থাৎ সহল ইবনে হানীফ ও আবূ দুজানাকে অত্যধিক অভাবগ্রস্ততার কারণে অংশ দিলেন। গোত্রনেতা সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.)-কে ইবনে আবী হাকীমের একটি বিখ্যাত তরবারি প্রদান করা হলো। –[মাযহারী]

উল্লেখিত আয়াতে حَاجَةً বলে প্রয়োজনের বস্তু এবং مِّمَّا أُوتُوا এর সর্বনাম দ্বারা মুহাজিরগণকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, এই বন্টনে যা কিছু মুহাজিরগণকে দেওয়া হলো, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা গ্রহণ করে নিলেন; যেন তাঁদের এসব জিনিসের কোনো প্রয়োজন ছিল না। মুহাজিরগণকে দেওয়াকে খারাপ মনে করা অথবা অভিযোগ করার তো সামান্যতম কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। এর মোকাবিলায় যখন বাহরাইন বিজিত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রাপ্ত ধন-সম্পদ সম্পূর্ণই আনসারগণের মধ্যে বিলি বন্টন করে দিতে চাইলেন; কিন্তু তাঁরা তাতে রাজি হলেন না, বরং বললেন ঃ আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধন-সম্পদ থেকে অংশ না দেওয়া হয়। –(বোখারী, ইবনে-কাসীর)।

আনসারগণের চতুর্থ গুণ এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ : خَصَاصَةٌ শব্দের অর্থ দারিদ্র্য ও উপবাস। إِيثَارٌ -এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্রে রাখা। আয়াতের অর্থ এই যে, আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন ; যদিও নিজেরাও অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র-প্রপীড়িত ছিলেন।

সাহাবীগণের, বিশেষত আনসারগণের আত্মত্যাগের কয়েকটি ঘটনা : আয়াতের তাফসীরের জন্য ঘটনাবলি বর্ণনা করা জরুরি নয়, কিন্তু এসব ঘটনা মানুষকে উৎকৃষ্ট মানবতা শিক্ষা দেয় এবং জীবনে বিপ্লব আনয়ন করে। তাই তাফসীরবিদগণ এ স্থলে এসব ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এখানে তাফসীরে কুরতুবী থেকে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হলো।

তিরমিযীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, জনৈক আনসারীর গৃহে রাত্রিবেলায় একজন মেহমান আগমন করল। তাঁর কাছে এই পরিমাণ খাদ্য ছিল, যা তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তানগণ খেতে পারেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন : বাচ্চাদেরকে কোনোরূপে শুইয়ে দাও। অতঃপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে মেহমানের সামনে আহার্য রেখে কাছাকাছি বসে যাও, যাতে মেহমান মনে করে যে, আমরাও খাচ্ছি, কিন্তু আসলে আমরা খাব না। এভাবে মেহমান পেট ভরে খেতে পারবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ আয়াতখানি নাজিল হয়।

তিরমিযীতেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল : আমি ক্ষুধায় অতিষ্ঠ। তিনি একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে জওয়াব আসল : আমার কাছে এক্ষণে পানি ব্যতীত কিছুই নেই। অন্য একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে সেখানে থেকেও তাই জওয়াব আসল। অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ এমনকি, সকল বিবির কাছে খোঁজ নেওয়া হলে সবার কাছ থেকে একই জওয়াব পাওয়া গেল যে, পানি ব্যতীত গৃহে কিছুই নেই। অগত্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন : কে আছ, যে এই ব্যক্তিকে আজ রাতে অতিথি করে নেবে? জনৈক আনসারী আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি করব। অতঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং গৃহে পৌঁছে স্ত্রীকে জিজ্ঞসা করলেন : কিছু খাবার আছে কি? উত্তর হলো আমাদের বাচ্চারা খেতে পারে, এই পরিমাণ খাদ্য আছে। আনসারী বললেন : বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দাও। অতঃপর মেহমানের সামনে খাবার রেখে আমরাও সাথে বসে যাব। এরপর বাতি নিভিয়ে দেবে, যাতে মেহমান আমাদের না খাওয়ার বিষয় জানতে না পারে। সেমতে মেহমান আহার করল। সকালে আনসারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন : গতরাতে তুমি মেহমানের সাথে যে ব্যবহার করেছ, তা আল্লাহ তা'আলা অত্যধিক পছন্দ করেছেন।

মেহদভী হযরত সাবেত ইবনে কায়সের সাতে জনৈক আনসারীর এমনি ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতে প্রত্যেক ঘটনার সাথে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

কুশায়রী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মান্যবর সাহাবীর কাছে এক ব্যক্তি একটি বকরির মাথা উপঢৌকন পেশ করেন। সাহাবী মনে করলেন আমার অমুক ভাই ও তাঁর বাচ্চারা আমার চাইতে বেশি অভাবগ্রস্ত : সেমতে তিনি মাথাটি তার কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও এমনিভাবে তৃতীয় জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে সাতটি গৃহে যাওয়ার পর মাথাটি আবার প্রথম সাহাবীর গৃহে ফিরে এলো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। সা'লাবী হযরত আনাস (রা.) থেকেও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে কিছু চাইল। তাঁর গৃহে তখন একটি মাত্র রুটি ছিল এবং তিনি সেদিন রোজা রেখেছিলেন। তিনি পরিচারিকাকে বললেন : এই রুটি তাকে দিয়ে দাও। পরিচারিকা বলল : এই রুটি দিয়ে দিলে আপনার ইফতার কারার কিছু থাকবে না। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন : না থাক, তুমি দিয়ে দাও। পরিচারিকা বর্ণনা করে– যখন সন্ধ্যা হলো, তখন উপঢৌকন প্রেরণে অভ্যস্ত নয়– এমন এক ব্যক্তি হযরত আয়েশার কাছে একটি আস্ত ভাজা করা বকরি উপঢৌকন করল। তার উপর ময়দার আটার আবরণী ছিল। আরবে একে সর্বোত্তম খাদ্য মনে করা হতো। হযরত আয়েশা (রা.) পরিচারিকাকে ডেকে বললেন : খাও, এটা তোমার সেই রুটি থেকে উত্তম।

নাসায়ী বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) অসুস্থ অবস্থায় আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে এক দিরহামের বিনিময়ে এক গুচ্ছ আঙ্গুর কিনে আনা হয়। ঘটনাক্রমে তখন এক মিসকীন এসে উপস্থিত হলো এবং কিছু চাইল। অসুস্থ ইবনে ওমর বললেন : আঙ্গুরের গুচ্ছটি তাকে দিয়ে দাও। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি গোপনে মিসকীনের পেছনে পেছনে গেল এবং গুচ্ছটি তার কাছ থেকে কিনে হযরত ইবনে ওমরের সামনে পেশ করল। কিন্তু ভিক্ষুকটি আবার আসল এবং কিছু চাইল। হযরত ইবনে ওমর পুনরায় গুচ্ছটি তাকে দিয়ে দিলেন। আবার এক ব্যক্তি গোপনে ভিক্ষুকের পেছনে পেছনে যেয়ে এক দিরহামের বিনিময়ে গুচ্ছটি কিনে আনল এবং হযরত ইবনে ওমরের কাছে পেশ করল। ভিক্ষুকটি আবার ধরনা দিতে চাইলে সবাই তাকে নিষেধ করল। হযরত ইবনে ওমর যদি জানতে পারতেন যে, এটা সেই সদকায় দেওয়া গুচ্ছ, তবে কিছুতেই তা খেতেন না। কিন্তু তিনি বাজার থেকে আনা হয়েছে ভেবে তা ব্যবহার করলেন।

ইবনে মুবারক নিজ সনদে বর্ণনা করেন, একবার খলীফা ওমর ফারূক (রা.) একটি থলিয়ায় চারশ দীনার ভরে থলিয়াটি চাকরের হাতে দিয়ে বললেন : এটি আবূ ওবায়দা ইবনে জাররাহের কাছে নিয়ে যাও এবং বল : খলীফার পক্ষ থেকে এই

হাদিয়া কবুল করে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করুন। তিনি চাকরকে আরও বলে দিলেন : হাদিয়া পেশ করার পর তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে এবং দেখবে যে, আবূ ওবায়দা কি করেন। চাকর নির্দেশ অনুযায়ী থলিয়াটি হযরত আবূ ওবায়দা (রা.)-এর কাছে পেশ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। আবূ ওবায়দা (রা.) থলিয়া হাতে নিয়ে দোয়া করলেন : আল্লাহ তা'আলা ওমরের প্রতি রহম করুন এবং তাকে উত্তম বিনিময় দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ দাসীকে ডেকে বললেন : নাও, এই সাত অমুককে এবং পাঁচ অমুককে দিয়ে এসো। এভাবে গোটা চারশ দীনার তিনি তখনই বণ্টন করে দিলেন।

চাকর ফিরে এসে ঘটনা বর্ণনা করল। হযরত ওমর (রা.) এমনিভাবে আরও চারশ দীনার অপর একটি থলিয়ায় ভর্তি করে চাকরের হাতে দিয়ে বললেন : এটি মুয়ায ইবনে জাবালকে দিয়ে এসো এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে লক্ষ্য কর তিনি কি করেন। চাকর নিয়ে গেল। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) থলিয়া হাতে নিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর জন্য দোয়া করলেন। তিনিও থলিয়া খুলে কালবিলম্ব না করে বণ্টনে বসে গেলেন। তিনি দীনারগুলো অনেক ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন গৃহে প্রেরণ করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী ব্যাপার দেখে যাচ্ছিলেন। অবশেষে বললেন : আমিও তো মিসকীনই। আমাকেও কিছু দিন না কেন? তখন থলিয়াতে মাত্র দু'টি দীনার অবশিষ্ট ছিল। সে মতে তাই তাঁকে দিয়ে দিলেন। চাকর এই দৃশ্য দেখে ফিরে এলো এবং খলীফার কাছে বর্ণনা করল। খলীফা বললেন : এরা সবাই ভাই ভাই। সবার স্বভাব একই রূপ।

হুযায়ফা আদভী বলেন : আমি ইয়ারমুক যুদ্ধে আমার চাচাত ভাইয়ের খোঁজে শহীদদের লাশ দেখার জন্য বের হলাম। সাথে কিছু পানি নিলাম যাতে তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখলে পান করিয়ে দিতে পারি। তার নিকটে পৌঁছে দেখলাম যে, প্রাণের স্পন্দন এখনও নিঃশেষ হয়নি। আমি বললাম : আপনাকে পানি পান করাব কি? তিনি ইঙ্গিতে 'হ্যাঁ বললেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কাছে থেকে অন্য একজন শহীদের আহ আহ্ শব্দ কানে এলো। আমার ভাই বললেন : এই পানি তাকে দিয়ে দাও। আমি তার কাছে পৌঁছে পানি দিতে চাইলে তৃতীয় একজনের কাতরানোর আওয়াজ কানে এলো। সেও এই তৃতীয়জনকে পানি দিয়ে দিতে বলল। এমনিভাবে একের পর এক করে সাতজন শহীদের সাথে একই ঘটনা সংঘটিত হলো। আমি যখন সপ্তম শহীদের কাছে গেলাম, তখন সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। সেখান থেকে আমি আমার ভাইয়ের কাছে এসে দেখি তিনিও খতম হয়ে গেছেন।

কিছু আনসারগণের এবং কিছু মুহাজিরগণের মিলিয়ে এই কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। অধিকাংশ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে কোনো বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই। কারণ যে ধরনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় যদি সেই ধরনের অন্য কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়, তবে বলে দেওয়া হয় যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃত সত্য এই যে, সবগুলো ঘটনাই আয়াত অবতরণের কারণ।

একটি সন্দেহ নিরসন : সাহাবায়ে কেরামের উপরিউক্ত আত্মত্যাগের ঘটনাবলি সম্পর্কে হাদীসদৃষ্টে একটি সন্দেহ দেখা দেয়। তা এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ মুসলমানগণকে তাদের সম্পূর্ণ ধনসম্পদ সদকা করতে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে আছে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে একটি ডিম্ব পরিমাণ স্বর্ণের টুকরা সদকার জন্য পেশ করলে তিনি তা লোকটির দিকে নিক্ষেপ করে বললেন : তোমাদের কেউ কেউ তর যথাসর্বস্ব সদকা করার জন্য নিয়ে আসে। এরপর অভাবগ্রস্ত হয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত পাতে।

এসব রেওয়ায়েত থেকেই এই সন্দেহের জওয়াব পাওয়া যায় যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। প্রত্যেক অবস্থার জন্য আলাদা আলাদা বিধানও হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ ধনসম্পদ দান করার নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্য ও উপবাস দেখা দিলে সবর করতে সক্ষম নয় এবং কৃতদানের জন্য আফসোস করে অথবা মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে যারা অসম সাহসিক ও দৃঢ়চেতা, সবকিছু ব্যয় করার পর দারিদ্র্য ও উপবাসের কারণে পেরেশান হয় না; বরং সাহসিকতার সাথে সবর করতে সক্ষম, তাদের জন্য সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেওয়া জায়েজ। উদাহরণত এক জিহাদের সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর যথা সর্বস্ব চাঁদা হিসাবে পেশ করে দিয়েছেন। উপরিউক্ত ঘটনাবলি এরই দৃষ্টান্ত। এহেন দৃঢ়চেতা লোকগণ তাঁদের সন্তান-সন্ততিকেও সবর ও দৃঢ়তায় অভ্যস্ত করে রেখেছিলেন। ফলে এতে তাদেরও কোনো অধিকার ক্ষুণ্ন হতো না। স্বয়ং সন্তানদের হাতে ধনসম্পদ থাকলে তারাও তাই করত। –[কুরতুবী]

মুহাজিরগণের পক্ষ থেকে আনসারগণের ত্যাগের বিনিময় : দুনিয়াতে কোনো সঙ্ঘবদ্ধ মহতী উদ্যোগ একতরফা উদারতা ও আত্মত্যাগ দ্বারা কায়েম থাকতে পারে না, যে পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে এমনি ধরনের ব্যবহার না হয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন মুসলমানদেরকে পরস্পরে উপঢৌকন আদান-প্রদান করে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেছেন, তেমনি যাকে উপঢৌকন দেওয়া হয়, তাকেও উপঢৌকন দাতার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : যদি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকে, তবে আর্থিক প্রতিদান, নতুবা দোয়ার মাধ্যমেই তার অনুগ্রহের বিনিময় দান কর। অর্বাচীনের ন্যায় কারও অনুগ্রহের বোঝা মাথায় নিতে থাকা ভদ্রতা ও সাধু চরিত্রের পরিপন্থি।

মুহাজিরগণের ব্যাপারে আনসারগণ অপূর্ব আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। নিজেদের গৃহে, দোকানে, কাজ-কারবারে ও শস্যক্ষেত্রে তাঁদেরকে অংশীদার করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাজিরগণকে সচ্ছলতা দান করলেন তখন তাঁরাও আনসারগণের অনুগ্রহের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করেন নি।

কুরতুবী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত ছিলেন এবং মদীনার আনসারগণ বিষয়সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আনসারগণ তাঁদেরকে সব বস্তুই অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দেন এবং বাগানের অর্ধেক ফল বাৎসরিক তাঁদেরকে দিতে থাকেন। হযরত আনাস (রা.)-এর জননী উম্মে সুলায়ম নিজের কায়েকটি খর্জুর বৃক্ষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিয়েছিলেন। তিনি তা উসামা ইবনে যায়দের জননী উম্মে আয়মানকে দান করে দেন।

ইমাম যুহরী (র.) বলেন : আমাকে হযরত আনাস (রা.) জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বর যুদ্ধ থেকে বিজয়ীবেশে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন, তখন প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানগণ লাভ করেন। এ সময় সকল মুহাজিরই আনসারগণের দান হিসাব করে তাঁদেরকে প্রত্যর্পণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জননীর খর্জুর বৃক্ষ উম্মে আয়ামনের কাছ থেকে নিয়ে আমার জননীর হাতে প্রত্যর্পণ করেন। উম্মে আয়মনকে এর পরিবর্তে নিজের বাগান থেকে বৃক্ষ দিলেন।

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ : আনসারগণের আত্মত্যাগ ও আল্লাহ তা'আলার পথে সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার কথা বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসেবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ তা'আলার কাছে সফলকাম। شُحّ ও بُخْل শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থবোধক। তবে شُحّ শব্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আছে। ফলে এর অর্থ অতিশয় কৃপণতা। জাকাত, ফিতরা, ওশর, কুরবানি ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার ওয়াজিব হক আদায়ের অথবা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বান্দার ওয়াজিব হক আদায়ের কৃপণতা করা হলে তা নিশ্চিতরূপে হারাম। যে কৃপণতা মোস্তাহাব বিষয় ও দান খয়রাতের ফজিলত অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়, তা মাকরূহ ও নিন্দনীয় এবং যা প্রথাগত কাজে প্রতিবন্ধক হয়, তা শরিয়তের আইনে কৃপণতা নয়।

কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। কুরআন ও হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিন্দা করা হয়েছে এবং যারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত, তাদের জন্যে সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে আনসারগণের যে গুণাবলি উল্লেখিত হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাঁরা কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র হওয়া জান্নাতী হওয়ার আলামত : ইমাম আহমদ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন : আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন : এক্ষণি তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে। সেমতে কিছুক্ষণ পরই জনৈক আনসারী আগমন করলেন। তাঁর দাড়ি থেকে অজুর পানি টপকে পড়ছিল এবং তাঁর বাম হাতে জুতা জোড়া ছিল। দ্বিতীয় দিনও এমনি ঘটনা ঘটল এবং সেই ব্যক্তি একই অবস্থায় আগমন করলেন। তৃতীয় দিনও তাই হলো এবং এই ব্যক্তি উল্লিখিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। এ দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মজলিস ত্যাগ করলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) এই ব্যক্তির পেছনে লাগলেন (যাতে তাঁর জান্নাতী হওয়ার ভেদ জানতে পারেন)। তিনি আনসারীকে বললেন : পরিবারিক কলহের কারণে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তিন দিন নিজের গৃহে যাব না। আপনি যদি অসুবিধা মনে না করেন, তবে তিন দিন আমাকে নিজের বাড়িতে থাকতে দিন। আনসারী সনন্দে এই প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর তিন রাত্রি তাঁর বাড়িতে অতিবাহিত করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আনসারী রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য 'গাত্রোত্থান' করেন না। তবে নিদ্রার জন্য শয্যা গ্রহণের পূর্বে কিছু

আল্লাহর জিকির করেন। এরপর ফজরের নামাজের জন্য উঠেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন : তবে এই সময়ের মধ্যে আমি তাঁর মুখে ভালো কথা ছাড়া কিছু শুনিনি। এভাবে তিন রাত্রি কেটে গেল। আমার অন্তরে যখন তাঁর আমল সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ভাব বদ্ধমূল হওয়ার উপক্রম হলো, তখন আমি তাঁর কাছে আমার আগমনের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে দিলাম এবং বললাম : আমার গৃহে কোনো কলহ-বিবাদ ছিল না। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে তিন দিন পর্যন্ত শুনলাম যে, তোমাদের কাছে এখন একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে। এরপর তিন দিনই আপনি আসলেন। তাই আমার ইচ্ছা হলো যে, আপনার সাথে থেকে দেখব কি আমলের কারণে আপনি এই ফজিলত অর্জন করলেন! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি আপনাকে কোনো বড় আমল করতে দেখলাম না। অতএব, কি বিষয়ের দরুন আপনি এই স্তরে উন্নীত হয়েছেন? তিনি বললেন : আপনি যা দেখলেন, এছাড়া আমার কাছে অন্য কোনো আমল নেই। আমি একথা শুনে প্রস্থানোদ্যত হলে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন : হ্যাঁ, একটি বিষয় আছে। তা এই যে, আমি আমার অন্তরে কোনো মুসলমানদের প্রতি জিঘাংসা ও কুধারণা খুঁজে পাই না এবং এমন কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করি না, যাকে আল্লাহ তা'আলা কোনো কল্যাণ দান করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন : ব্যস, এ গুণটিই আপনাকে এই উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে।

ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন : ইমাম নাসায়ীও 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

মুহাজির ও আনসারগণের পর উম্মতের সাধারণ মুসলমান : وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ –এই আয়াতের بعد অর্থে সাহাবায়ে কেরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান শামিল আছে এবং এই আয়াত তাদের সবাইকে 'ফায়' –এর মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রা.) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করেননি; বরং এগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াক্‌ফ হিসেবে রেখে দিয়েছেন, যাতে এসব সম্পত্তির আমদানি ইসলামি বায়তুল-মালে জমা হয় এবং তা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোনো কোনো সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়ার আবেদন করলে তিনি এই আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রশ্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকার করতাম, তার সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের সম্পত্তি বণ্টন করে দিয়েছিলেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্যে কি অবশিষ্ট থাকবে? –(মালেক-কুরতুবী)।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা ও মাহাত্ম্য অন্তরে পোষণ করা মুসলমানদের সত্যপন্থি হওয়ার পরিচায়ক : এস্থলে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন– মুহাজির, আনসার ও অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান। মুহাজির ও আনসারগণের বিশেষ গুণাবলি ও শ্রেষ্ঠত্বও এস্থলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলির মধ্য থেকে মাত্র একটি বিষয় এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানে অগ্রগামিতা এবং তাদের কাছে ঈমান পৌঁছানোর মাধ্যম হওয়ার গুণটিকে সম্যক বুঝে এবং সবার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে। এছাড়া নিজেদের জন্যেও এরূপ দোয়া করে : আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি হিংসা– বিদ্বেষ রেখো না।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানদের ঈমান ও ইসলাম কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্যে দোয়া করা। যার মধ্যে এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই হযরত মুসাব ইবনে সা'দ (রা.) বললেন : উম্মতের সকল মুসলমান তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার। এখন সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত পোষণকারী এক শ্রেণি বাকি রয়ে গেছে। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে কানো আসন কামনা কর, তবে এই তৃতীয় শ্রেণিতে দাখিল হয়ে যাও।

হযরত হুসাইন (রা.)-কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রা.) সম্পর্কে (তাঁর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর) প্রশ্ন করেছিল। তিনি পাল্টা প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত? সে নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি

আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তবে কি আনসারগণের একজন? সে বলল ঃ না। হযরত হুসাইন (রা.) বললেন ঃ এখন তৃতীয় আয়াত وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ বাকি রয়ে গেছে। তুমি যদি হযরত ওসমান গনী (রা.) সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করতে চাও, তবে এই তৃতীয় শ্রেণি থেকেও খারিজ হয়ে যাবে।

কুরতুবী (র.) বলেন ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা রাখা আমাদের জন্যে ওয়াজিব। ইমাম মালেক (র.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস রাখে, মুসলমানদের 'ফায়' -এর মালে তার কোনো অংশ নেই। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। যেহেতু ফায়-এর মালে প্রত্যেক মুসলমানের অংশ আছে, তাই যার অংশ বাদ পড়বে তার ইসলাম ও ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে সাহাবায়ে-কেরামের জন্যে ইস্তেগফার ও দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, তাঁদের পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহও হবে। তাই তাঁদের পারস্পরিক বাদানুবাদের কারণে তাঁদের মধ্য থেকে কারও প্রতি কুধারণা পোষণ করা কোনো মুসলমানের জন্যে জায়েজ নয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন ঃ আমি তোমাদের নবী ﷺ-এর মুখে শুনেছি ঃ এই উম্মত ততদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, যতদিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ ও ভর্ৎসনা না করে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন ঃ তুমি যদি কাউকে দেখ যে, কেউ কোনো সাহাবীকে মন্দ বলছে, তবে তাকে বল ঃ যে তোমাদের মধ্য থেকে অধিক মন্দ, তার উপর আল্লাহ তা'আলার লানত হোক। বলাবাহুল্য, অধিক মন্দ সাহাবী হতে পারেন না-যে তাঁকে মন্দ বলে সেই হবে। সারকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা লানতের কারণ।

আওয়াম ইবনে হাওশাব বলেন ঃ এই উম্মতের পূর্ববর্তীগণ মানুষকে সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলি বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন, যাতে মানুষের অন্তরে তাঁদের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আমি এ ব্যাপারে তাঁদেরকে একনিষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে দেখেছি। তাঁরা আরও বলতেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে মতবিরোধ ও বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করো না; করলে মানুষের ধৃষ্টতা বেড়ে যাবে।–(কুরতুবী)

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا…… : এটা বনূ-নুযায়রের দৃষ্টান্ত اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ কারা? এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ এরা হচ্ছে বদরের কাফের যোদ্ধা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ এরা ইহুদি বনূ-কায়নুকা। উভয়েরই অশুভ পরিণতি তথা নিহত, পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা তখন জনসমক্ষে ফুটে উঠেছিল। কেননা বনূ-নুযায়রের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় এবং বনূ-কায়নুকার ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। বদরে মুশরিকদের সত্তর জন নেতা নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, হযরত মুজাহিদ (র.)–এর উক্তি অনুযায়ী ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ বাক্যের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে। এটা পরকালের আগে দুনিয়াতেই তারা ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ইহুদি বনূ-কায়নুকা হলে তাদের ঘটনাও তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

বনূ কায়নুকার নির্বাসন ঃ রাসূলে কারীম ﷺ মদীনায় আগমন করার পর মদীনার পার্শ্ববর্তী সবগুলো ইহুদি গোত্রের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। এর এক শর্ত ছিল এই যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের কোনো শত্রুকে সাহায্য করবে না। বনূ কায়নুকাও এই শান্তিচুক্তির অধীনে ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তারা চুক্তির বিপরীত কাজকর্ম শুরু করে দেয়। বদর যুদ্ধের সময় মক্কার কাফেরদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ও সাহায্যের কিছু ঘটনাও সামনে আসে। তখন কুরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনের পর যদি কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে আপনি তাদের শান্তিচুক্তি ভণ্ডুল করে দিতে পারেন। বনূ-কায়নুকা নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে এই চুক্তি ভঙ্গ করে দিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন এবং হযরত হামযা (রা.)-এর হাতে পতাকা দিলেন। মদীনা শহরে হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-কে স্থলাভিষিক্ত করে তিনি নিজেও জেহাদে রওয়ানা হলেন। মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে বনূ-কায়নুকা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। পনের দিন অবরুদ্ধ থাকার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, মোকাবিলা ফলপ্রসূ হবে না অগত্যা তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে বলল ঃ আমাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সিদ্ধান্ত নিবেন, আমরা তাতেই সম্মত আছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পুরুষকুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন; কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক বাধ সাধল। সে চূড়ান্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন ঃ তারা বসতি ত্যাগ করে চলে যাবে এবং তাদের ধন-সম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। এই মীমাংসা অনুযায়ী বনূ-কায়নুকা মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ার আমরুয়াত এলাকায় চলে গেল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ধন-সম্পত্তি বণ্টন করতঃ একভাগ বায়তুলমালে এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন।
বদর যুদ্ধের পর এই প্রথম বায়তুলমালে গনিমতের পাঁচ ভাগের একভাগ জমা হলো। এই ঘটনা হিজরতের বিশ মাস পর ১৫ই শাওয়াল তারিখে সংঘটিত হয়।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ : এটা মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত, যারা বনূ-নুযায়রকে নির্বাসনের আদেশ অমান্য করতে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ যখন তাদেরকে অবরোধ করে নেয়, তখন কোনো মুনাফিক সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়নি। কুরআন পাক শয়তানের একটি ঘটনা দ্বারা তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে। শয়তান মানুষকে কুফরি করতে প্ররোচিত করেছিল এবং তার সাথে নানারকম ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কুফরে লিপ্ত হলো, তখন সে ওয়াদা ভঙ্গ করল।

আল্লাহ তা'আলা জানেন শয়তানের এ ধরনের ঘটনা কত হয়ে থাকবে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা তো স্বয়ং কুরআনে সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْۤءٌ مِّنْكُمْ
এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এতে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অথবা মানবাকৃতিতে সামনে এসে মুশরিকদের মুসলমানদের মোকাবিলায় উৎসাহিত করে এবং সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কিন্তু যখন বাস্তবিকই মোকাবিলা শুরু হয়, তখন সাহায্য করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখিত হয়েছে।
আলোচ্য আয়াতে যদি এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, তখন আপত্তি দেখা দেয় যে, এই ঘটনায় শয়তান বাহ্যত ঃ কুফর করার আদেশ দেয়নি। তারা তো পূর্ব থেকেই কাফের ছিল। শয়তান কেবল তাদেরকে মোকাবিলায় একত্রিত হতে বলেছিল। এই আপত্তির জওয়াব এই যে, কুফরে অটল থাকতে বলা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলাও কুফর করতে বলারই অনুরূপ।
তাফসীরে মাযহারী, কুরতুবী, ইবনে কাসীর ইত্যাদি গ্রন্থে শয়তানের এই দৃষ্টান্তের ঘটনাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে বনী ইসরাঈলের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও যোগীকে শয়তান কর্তৃক বিপথগামী করে কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। উদাহরণত বনী ইসরাঈলের জনৈক সন্ন্যাসী যোগী সদাসর্বদা উপাসনালয়ে যোগসাধনায় রত থাকত এবং দশ দিন অন্তর মাত্র একবার ইফতার করে রোজা রাখত। সত্তর বছর এমনিভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর অভিশপ্ত শয়তান তার পেছনে লাগে। সে তার সর্বাধিক ধূর্ত ও চালাক অনুচরকে তার কাছে সন্ন্যাসী যোগী বেশে প্রেরণ করে। সে তার কাছে পৌঁছে তার চাইতেও বেশি যোগসাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। এভাবে সন্ন্যাসী তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠে।

অবশেষে কৃত্রিম সন্ন্যাসী আসল সন্ন্যাসীকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিল, যা দ্বারা জটিল রোগীও আরোগ্য লাভ করত। এরপর সে অনেক লোককে নিজের প্রভাব দ্বারা রোগগ্রস্ত করে আসল সন্ন্যাসীর কাছে পাঠিয়ে দিত। যখন সন্ন্যাসী রোগীদের উপর দোয়া পাঠ করত, তখন শয়তান তার প্রভাব সরিয়ে নিত। ফলে রোগীরা আরোগ্য লাভ করত। সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই কারবার অব্যাহত রাখার পর সে জনৈক ইসরাঈলী সরদারের পরমা সুন্দরী কন্যার উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করল এবং তাকে রোগগ্রস্ত করে সন্নাসীর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিল। শেষ পর্যন্ত সে বালিকাটিকে সন্ন্যাসীর মন্দিরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হলো এবং কালক্রমে তাকে বালিকার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত করতেও কামিয়াব হয়ে গেল। এর ফলে বালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেল। অপমানের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শয়তান বালিকাকে হত্যা করার পরামর্শ দিল। হত্যার পর শয়তান নিজেই ব্যভিচার ও হত্যার কাহিনী ফাঁস করে জনগণকে সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। অতঃপর জনগণ মন্দির বিধ্বস্ত করে সন্নাসীকে শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। তখন শয়তান সন্ন্যাসীর কাছে যেয়ে বলল : এখন তোমার প্রাণরক্ষার কোনো উপায় নেই। তবে তুমি যদি আমাকে সেজদা কর, তবে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব।

সন্ন্যাসী পূর্বেই অনেক পাপ কর্ম করেছিল। ফলে কুফরের পথ অবলম্বন করা তার জন্য মোটেই কঠিন ছিল না। সে শয়তানকে সেজদা করল। তখন শয়তান পরিষ্কার বলে দিল : আমি তোমাকে কুফরীতে লিপ্ত করার জন্যই এসব অপকৌশল অবলম্বন করেছিলাম। এখন আমি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারি না। তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ الخ.

সূরা হাশরে শুরু থেকে কিতাবী, কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করার পর, সূরার শেষ পর্যন্ত মুমিনদেরকে হুঁশিয়ারি ও সৎকর্ম পরায়ণতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত প্রথম আয়াতে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে পরকালের চিন্তা ও তজ্জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ আছে। বলা হয়েছে ঃ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ অর্থাৎ মুমিনগণ! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পরকালের জন্যে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এ আয়াতে কেয়ামত বোঝাতে গিয়ে غد শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথম, সমগ্র ইহকাল পরকালের মোকাবিলায় স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ এক দিনের সমান। হিসাব করলে একদিনের সমান হওয়াও কঠিন। কেননা পরকাল চিরন্তন, যার কোনো শেষ ও অন্ত নেই। মানব বিশ্বের বয়স তো কয়েক হাজার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি থেকে হিসাব করা হয়, তবে কয়েক লাখ বছর হয়ে যাবে। তবুও এটা সীমিত সময়কাল। অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এর কোনো তুলনাই হয় না।

এক হাদীসে আছে – اَلدُّنْيَا يَوْمٌ وَلَنَا فِيْهِ صَوْمٌ –সারা দুনিয়া একদিন এবং এই দিনে আমাদের রোজা আছে। মানব সৃষ্টি থেকে শুরু করা হোক কিংবা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি থেকে, চিন্তা করলে উভয়টিই মানুষের জন্য গুরুত্ববহ নয়; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির দুনিয়া তার বয়সের বছর ও দিনগুলোই। এই বছর ও দিনগুলো পরকালের তুলনায় কত যে তুচ্ছ ও নগণ্য, তা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত সুনিশ্চিত; যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারে না। এমনিভাবে দুনিয়ার পরে কিয়ামত ও পরকালের আগমনে কোনো সন্দেহ নেই।

তৃতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামীকাল যেমন দূরে নয়-খুব নিকটবর্তী, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও খুব নিকটবর্তী।

কিয়ামত দুই প্রকার-সমগ্র বিশ্বের কিয়ামত ও ব্যক্তি বিশেষের কিয়ামত। প্রথমোক্ত কিয়ামতের অর্থ, আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধ্বংসপ্রাপ্তি। এটা লাখো বছর পরে হলেও পারলৌকিক সময়কালের তুলনায় নিকটবর্তীই। শেষোক্ত কিয়ামত, ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর সাথে সাথে সংঘটিত হয়। তাই বলা হয়েছে ঃ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মারা যায়, তার কিয়ামত তখনই কায়েম হয়ে যায়। কারণ কবর থেকেই পরজগতের ক্রিয়াকর্ম শুরু হয়ে যায় এবং আজাব ও ছওয়াবের নমুনা সামনে এসে যায়। কবরজগৎ যার অপর নাম বরযখ, এটা দুনিয়ার "ওয়েটিং রুম" (বিশ্রামাগার) সদৃশ। "ওয়েটিং রুম" ফার্স্ট ক্লাস থেকে নিয়ে থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের জন্যে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। অপরাধীদের ওয়েটিং রুম হচ্ছে হাজত ও জেলখানা। এই বিশ্রামাগার থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের নিজস্ব কিয়ামত এসে যায়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের মৃত্যুকে একটি ধাঁ-ধার রূপ দিয়ে রেখেছেন। ফলে বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণও এর নিশ্চিত সময় নিরূপণ করতে পারে না, বরং প্রতিটি মুহূর্তেই মানুষ আশঙ্কা করতে থাকে যে, পরের ঘণ্টাটি তার জীবদ্দশায় অতিবাহিত নাও হতে পারে, বিশেষতঃ বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলি একে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছে।

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতকে আগামীকাল বলে উদাসীন মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামতকে বেশি দূরে মনে করো না। কিয়ামত আগামীকালের মতো নিকটবর্তী; এমনকি আগামীকালের পূর্বেও এসে যাওয়া সম্ভবপর। আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা এতে মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, নিশ্চিত ও নিকটবর্তী কিয়ামতের জন্য তুমি কি সম্বল প্রেরণ করেছ, তা ভেবে দেখ। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের আসল বাসস্থান হচ্ছে পরকাল। দুনিয়াতে সে মুসাফিরদের ন্যায় বসবাস করে। আসল বাসস্থানে অনন্তকাল অবস্থান করার জন্য এখান থেকেই কিছু সম্বল প্রেরণ করা জরুরি। দুনিয়াতে আসার আসল উদ্দেশ্যই এই যে, এখানে থেকে কিছু উপার্জন

করবে, এরপর তা পরকালের দিকে পাঠিয়ে দেবে। বলা বাহুল্য, এখান থেকে দুনিয়ার আসবাববপত্র, ধনদৌলত ইত্যাদি কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। বরং তা পাঠাবার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। দুনিয়াতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা-পয়সা নিয়ে যাওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি এই যে, এই দেশের ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে অন্য দেশে প্রচলিত মুদ্রা অর্জন করতে হয়। পরকালের ব্যাপারেও একই পদ্ধতি চালু আছে। দুনিয়াতে যা কিছু আল্লাহর পথে ও আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যয় করা হয়, তা আসমানি সরকারের ব্যাংকে (স্টেট ব্যাংক) জমা হয়ে যায়। এরপর ছওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা তার নামে লিখে দেওয়া হয়। পরকালে পৌঁছার পর দাবি-দাওয়া ব্যতিরেকেই এই ছওয়াব তার হস্তগত হয়ে যায়।

مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ : বলে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার কর্ম বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎকর্ম প্রেরণ করে, সে ছওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অসৎকর্ম প্রেরণ করে, সে সেখানে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এরপর وَاتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ তাকিদ করা।

এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, প্রথম وَاتَّقُوا اللّٰهَ বলে খোদায়ী নির্দেশাবলি পালন করে পরকালের জন্যে সম্বল প্রেরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার وَاتَّقُوا اللّٰهَ বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সম্বল প্রেরণ কর, তা কৃত্রিম ও পরকালে অচল কি না, তা দেখে নাও। পরকালে অচল সম্বল তাই, যা দৃশ্যতঃ সৎকর্ম, কিন্তু তা খাঁটিভাবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে করা হয় না; বরং নাম-যশ অথবা কোনো মানসিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করা হয় অথবা সেই আমল, যা দৃশ্যতঃ ইবাদত হলেও ধর্মে তার কোনো প্রমাণ না থাকার কারণে বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা। অতএব, দ্বিতীয় وَاتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যের সারমর্ম এই যে, পরকালের জন্যে কেবল দৃশ্যতঃ সম্বল যথেষ্ট নয়; বরং তা অচল কিনা তা দেখে প্রেরণ কর।

فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ : অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই আত্মভোলা হয়ে গেছে। ফলে ভালো-মন্দের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ : এটা একটা দৃষ্টান্ত; অর্থাৎ যদি কুরআন পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ও ভারি জিনিসের উপর অবতীর্ণ করা হতো এবং পাহাড়কে মানুষের ন্যায় জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দেওয়া হতো তবে পাহাড়ও কুরআনের মাহাত্ম্যের সামনে নত-বরং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ খেয়াল-খুশি ও স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে তার স্বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কুরআন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব, এটা যেন এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। কারণ বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা নেই। কেউ কেউ বলেন ঃ পাহাড়, বৃক্ষ ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই এটা কাল্পনিক নয়-বাস্তব ভিত্তিক দৃষ্টান্ত। -(মাযহারী)।

পরকালের চিন্তা ও কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর উপসংহারে আল্লাহ তা'আলার কতিপয় পূর্ণত্ববোধক গুণ উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দৃশ্য– অদৃশ্য ও উপস্থিত-অনুপস্থিত বিষয় পুরোপুরি জানেন। اَلْقُدُّوْسُ –এমনি সত্তা, যিনি প্রত্যেক দোষ থেকে মুক্ত এবং অশালীন বিষয়াদি থেকে পবিত্র। اَلْمُؤْمِنُ –এই শব্দটি মানুষের জন্যে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাসী। আল্লাহ তা'আলার জন্যে ব্যবহার করলে অর্থ হয় নিরাপত্তা বিধায়ক অর্থাৎ তিনি ঈমানদারগণকে সর্বপ্রকার আজাব ও বিপদ থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন।

اَلْمُهَيْمِنُ –এর অর্থ দেখাশোনাকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র.) তাই বলেছেন। -(মাযহারী, কামূস)।

اَلْجَبَّارُ –প্রতাপশালী মহান। এই শব্দটি جَبْرٌ থেকেও উদ্ভূত হতে পারে, যার অর্থ ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার পর যে পট্টি বাঁধা হয়, তাকে جَبِيْرَةٌ বলা হয়। অতএব, অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যেক ভাঙা ও অকেজো বস্তুর সংস্কারক। -(মাযহারী)।

اَلْمُتَكَبِّرُ –এটা كِبْرِيَاءٌ ও تَكَبُّرٌ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বড়ত্ব, প্রত্যেক বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার জন্যে নির্দিষ্ট। তিনি কোনো বিষয়ে কারও মুখাপেক্ষী নন। যে মুখাপেক্ষী, সে বড় হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্যে এই শব্দটি দোষ ও গোনাহ। কারণ সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্ব দাবি করা মিথ্যা এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণে শরিক হওয়ার দাবি। তাই এটা আল্লাহ তা'আলার জন্যে পূর্ণত্বের গুণ এবং অন্যের জন্যে মিথ্যা দাবি।

اَلْمُصَوِّرُ –অর্থাৎ রূপদানকারী। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র সৃষ্টবস্তুকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি দান করেছেন, যদ্দরুন এক বস্তু অপর বস্তু থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়েছে। আকাশস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল সৃষ্টবস্তু বিশেষ আকারের মাধ্যমেই পরিচিত হয়। সৃষ্টবস্তুর অসংখ্য প্রকারের আলাদা আলাদা আকার-আকৃতি, মানুষের একই শ্রেণির মধ্যে পুরুষ ও

নারীর আকার-আকৃতিতে পার্থক্য, কোটি কোটি নারী ও পুরুষের চেহারায় এমন স্বাতন্ত্র্য যে, একজনের মুখাবয়ব অন্যজনের সাথে মিলে না–এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই অপার শক্তির কারসাজি। এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়। বড়ত্ব যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে বৈধ নয় এটা একমাত্র তাঁরই গুণ, তেমনি চিত্র ও আকার-আকৃতি নির্মাণ অন্যের জন্যে বৈধ নয়। এটাও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণে তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব দাবি করার নামান্তর।

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উত্তম উত্তম নাম আছে। কুরআন পাকে এসব নামের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। সহীহ হাদীসসমূহে ৯৯টি নামক বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক হাদীসে সবগুলোই উল্লিখিত হয়েছে।

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : এই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা অবস্থার মাধ্যমে হলে তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়; কেননা সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার অন্তর্নিহিত কারিগরি এবং আকার-আকৃতি নিজ নিজ অবস্থার মাধ্যমে অহর্নিশ স্রষ্টার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মশগুল আছে। সত্যিকার উক্তির মাধ্যমে তাসবীহ পাঠও হতে পারে। কেননা সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রত্যেক বস্তুই নজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনভূতি সম্পন্ন। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার সর্বপ্রথম দাবি হচ্ছে স্রষ্টাকে চেনা ও তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর সত্যিকার তাসবীহ পাঠ করা অসম্ভব নয়। তবে আমরা নিজ কানে তা শুনি না। একারণেই কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ –অর্থাৎ তোমরা তাদের তসবীহ শোন না, বুঝ না।

সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াতসমূহের উপকারিতা ও কল্যাণ ঃ তিরমিযীতে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে, ব্যক্তি সকালে তিন বার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ করার পর সূরা হাশরের هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ থেকে শেষপর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্যে রহমতের দোয়া করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই মর্তবা লাভ করবে। –(মাযহারী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

حَشْرِ : মাসদার মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح বাবে نَصَرَ অর্থ– একত্র করে, জামাত বা দল একত্রিত করা, সমবেত করা।

مَانِعَةً : সীগাহ واحد مؤنث اسم فاعل বহছ বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَنْعُ মূলবর্ণ (م - ن - ع) জিনস صحيح অর্থ– বাঁচাবে।

حُصُوْنُهُمْ : তাদের দূর্গ। حُصُوْنٌ (ইসম) মুযাফ। هم যমীর মুযাফ ইলাইহি। একবচন حِصْنٌ দূর্গ।

قَذَفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَذْفُ মূলবর্ণ (ق - ذ - ف) জিনস صحيح অর্থ– সৃষ্টি করে দিলেন।

يُخْرِبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْرَابٌ মূলবর্ণ (خ - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা ধ্বংস করবে। বিধবস্ত করবে।

اِعْتَبِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِبَارُ মূলবর্ণ (ع - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ- উপদেশ গ্রহণ কর।

جَلَاءَ : মাসদার মূলবর্ণ (ج - ل - و) জিনস ناقص واوى বাবে نَصَرَ অর্থ– নির্বাসিত হওয়া, নির্বাসন।

يُخْزِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْزَاءٌ মূলবর্ণ (خ - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অপদস্থ করেন। লাঞ্ছিত করেন।

لِيْنَةٍ এ শব্দটি اسم جنس অর্থ- তরুতাজা খেজুর বৃক্ষ। এক জাতীয় বৃক্ষ।

اَوْجَفْتُمْ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْجَافٌ মূলবর্ণ (و - ج - ف) জিনস مثال واوى অর্থ– চালনা করছ।

تَبَوَّءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَوُّءٌ মূলবর্ণ (ب - و - ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف واوى এবং مهموز لام অর্থ– অটল রয়েছে।

يُوْقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার وِقَايَةٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– রক্ষিত থাকে।

شَتّٰى : শব্দটি কারো কারো মতে مفرد আবার কেউ شَتِيْتٌ -এর বহুবচন বলেছেন। অর্থ- জীর্ণশীর্ণ, বিভিন্ন, নানারকম, ছিন্নভিন্ন, খণ্ড, খণ্ড।

اَفَاءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِفَاءَةٌ মূলবর্ণ (ف - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং اجوف يائى) অর্থ– তিনি প্রদান করেছেন।

رِكَابٌ : ইসম। অর্থ– উট, সওয়ারী। কাযী বায়যাবী (র.) স্পষ্ট করে বলেছেন, رِكَابٌ হলো, উটের সওয়ারী যেমনিভাবে رَاكِبٌ শব্দটি উষ্ট্রারোহীর জন্য অধিক ব্যবহৃত। شَتَرٌ সওয়ারী জন্য গালেব। (আত-তানযীল : ২/৩১২) -এর অশাব্দিক একবচন رَاحِلَةٌ আর বহুবচন رُكُوْبٌ - رَكَائِبُ এবং رِكَابَاتٌ।

هَاجَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُهَاجَرَةٌ মূলবর্ণ (ه - ج - ر) জিনস صحيح অর্থ– তিনি হিজরত করেছেন।

شُحٌّ : মাসদার। বাবে نَصَرَ . ضَرَبَ . سَمِعَ তিনটি থেকেই এই ফে'ল আসে অর্থ– স্বার্থপর। কৃপণ, কার্পণ্য, লোভ।

غِلًا : اسم فعل অর্থ– বিদ্বেষ, অন্তরে লুক্কায়িত শত্রুতা, মনের কদর্যতা।

رَهْبَةٌ : বাবে سَمِعَ -এর মাসদার। অর্থ– ভয় ভীতি, প্রভাব। এমন ভয়, যার মধ্যে মুক্তির চিন্তা এবং বিপদাশঙ্কা বিদ্যমান।

مُحَصَّنَةٍ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْصِيْنٌ মূলবর্ণ (ح - ص - ن) জিনস صحيح অর্থ– পুতঃপবিত্র।

جُدُرٌ : শব্দটি جِدَارٌ -এর বহুবচন। অর্থ– দ্বার, দরজা।

فَائِزُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার فَوْزٌ মূলবর্ণ (ف - و - ز) জিনস اجوف واوى অর্থ– সফলতা লাভকারীগণ।

مُتَصَدِّعًا সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَصَدُّعٌ মূলবর্ণ (ص - د - ع) জিনস صحيح অর্থ– বিদীর্ণ হয়ে যেত।

اَلْمُهَيْمِنُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَيْعَلَةٌ মাসদার هَيْمَنَةٌ মূলবর্ণ (ه - م - ن) জিনস صحيح অর্থ– রক্ষা কর্তা

وَالْقُدُّوْسُ : অর্থ - অধিক পবিত্র, বরকতময়। مفعول -এর ওযনে।

وَالْمُؤْمِنُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মূলবর্ণ (ء - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– বিশ্বাসী।

اَلْبَارِئُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبَرْءُ মূলবর্ণ (ب - ر - ء) জিনস مهموز لام অর্থ- সৃষ্টি কারী।

اَلْمُصَوِّرُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْوِيْرٌ মূলবর্ণ (ص - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– আকৃতি নির্মাণকারী।

حُسْنٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْحُسْنُ মূলবর্ণ (ح - س - ن) জিনস صحيح অর্থ– উত্তম উত্তম।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ : এখানে واو টি আতেফা। আর لَا تَكُوْنُوْا ফেলে নাকেস। তার যমীর হলো ইসমে নাকেস। আর كَالَّذِيْنَ হলো তার খবর। আর نَسُوا اللّٰهَ বাক্যটি হলো সেলাহ। আর فَاَنْسٰهُمْ - এর فاء টি হলো আতেফা। اَنْسٰهُمْ হলো ফে'ল, উহ্য যমীর ফায়েল। আর هُمْ হলো প্রথম مفعول به আর اَنْفُسَهُمْ হলো দ্বিতীয় مفعول به ; –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ৪৮৬]

سُوْرَةُ الْمُمْتَحَنَةِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা মুমতাহিনা

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৩, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱﴾

১. হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রুদেরকে এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে থাক, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্যধর্ম এসেছে, তারা তা অবিশ্বাস করে, তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে এ কারণে দেশান্তরিত করেছে যে, তোমরা স্বীয় প্রভু আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ (সুতরাং এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করো না); যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার এবং আমার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাক, (তবে কি করে) তোমরা গোপনে তাদের সহিত বন্ধুত্বসূচক কথাবার্তা বল, অথচ আমি সমস্ত বিষয়ই পূর্ণ অবগত আছি, তোমরা যা গোপন করে থাক আর যা প্রকাশ্যে করে থাক; আর তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে সত্যপথ হতে সরে পড়ল।

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ। لَا تَتَّخِذُوْا তোমরা গ্রহণ করো না عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ আমার শত্রুদেরকে এবং তোমাদের শত্রুদেরকে اَوْلِيَآءَ বন্ধুরূপে تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ যে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে থাক। وَقَدْ كَفَرُوْا অথচ তারা তা অবিশ্বাস করে بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ তোমাদের নিকট যে সত্য ধর্ম এসেছে يُخْرِجُوْنَ তারা দেশান্তরিত করেছে الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ রাসূলকে এবং তোমাদেরকে اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ যে, তোমরা স্বীয় প্রভু আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ যদি তোমরা বের হয়ে থাকো جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ আমার পথে জেহাদ করার وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ এবং আমার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ তোমরা গোপনে তাদের সাথে কথাবার্তা বল بِالْمَوَدَّةِ বন্ধুত্ব সূচক وَاَنَا اَعْلَمُ, অথচ আমি সমস্ত বিষয়ই পূর্ণ অবগত আছি بِمَآ اَخْفَيْتُمْ তোমরা যা গোপন কর وَمَآ اَعْلَنْتُمْ, আর যা প্রকাশ্যে করে থাক وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ, আর তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি এরূপ করবে فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ সে সত্য পথ হতে সরে পড়ল।

২. যদি তারা তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারে, তবে শত্রুতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করবে, আর তোমাদের অনিষ্ট সাধনে হস্তসমূহ এবং রসনাসমূহ চালনা করতে থাকবে, আর তারা এ কামনা করে যে, তোমরা কাফের হয়ে যাও।	اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٢﴾
৩. তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং সন্তান-সন্ততিগণ কিয়ামতের দিন তোমাদের (কিছুমাত্র) কাজে আসবে না, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন; আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্য খুব প্রত্যক্ষ করেন।	لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣﴾
৪. তোমাদের জন্য ইবরাহীমের মধ্যে এবং সে সমস্ত লোকদের মধ্যে যারা তার সঙ্গী ছিল এক আদর্শ রয়েছে, যখন তাঁরা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন যে, আমরা তোমাদের হতে এবং তোমরা আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে উপাস্য মনে করছ–তাদের হতে অসন্তুষ্ট, আমরা তোমাদেরকে অমান্য করি, আর আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়ে গেল, যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আন,	قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ

শাব্দিক অনুবাদ :

২. اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ যদি তারা তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারে يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً তবে শত্রুতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করবে وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ আর তোমাদের চালনা করতে থাকবে اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ হস্তসমূহ এবং রসনাসমূহ بِالسُّوْٓءِ অনিষ্ট সাধনে وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ আর তারা এই কামনা করে যে, তোমরা কাফের হয়ে যাও।

৩. لَنْ تَنْفَعَكُمْ তোমাদের কাজে আসবে না اَرْحَامُكُمْ তোমাদের আত্মীয় স্বজন وَلَآ اَوْلَادُكُمْ এবং সন্তান-সন্ততিগণ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্য খুব প্রত্যক্ষ করেন।

৪. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ তোমাদের জন্য রয়েছে اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ উত্তম আদর্শ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীমের মধ্যে وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ এবং সেই লোকদের মধ্যে যারা তার সঙ্গী ছিল اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ যখন তাঁরা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন اِنَّا بُرَءٰٓؤُا আমরা অসন্তুষ্ট مِنْكُمْ তোমাদের থেকে وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এবং তোমরা আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে উপাস্য মনে করছ তাদের হতে كَفَرْنَا بِكُمْ আমরা তোমাদেরকে অমান্য করি وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ আর আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেল الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ শত্রুতা ও বিদ্বেষ اَبَدًا চিরকালের জন্য حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন,

إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤﴾

** কিন্তু স্বীয় পিতার সাথে ইবরাহীমের এতটুকুই কথাবার্তা হয়েছিল যে, আমি তোমার জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার সম্পর্কে আল্লাহর সমীপে আমার আর কোনো বিষয়ের অধিকার নেই; হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার উপর ভরসা করছি এবং আপনারই অভিমুখী হচ্ছি, আর আপনারই দিকে (সকলকে) ফিরে যেতে হবে।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٥﴾

৫. হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে কাফেরদের পরীক্ষার স্থল করবেন না, এবং হে আমাদের প্রভু! আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন, নিঃসন্দেহে আপনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٦﴾

৬. নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অর্থাৎ এমন লোকদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে; আর যে মুখ ফিরিয়ে নিবে [সে জেনে রাখুক], তবে আল্লাহ সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত, প্রশংসনীয়।

عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

৭. আল্লাহর নিকট আশা করা যায় যে, তিনি তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে–যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে– বন্ধুত্ব কায়েম করে দিবেন, আর আল্লাহ মহা শক্তিমান; আর আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, দয়ালু।

শাব্দিক অনুবাদ :

** إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ কিন্তু ইবরাহীমের এতটুকুই কথাবার্তা হয়েছিল যে, لِأَبِيهِ স্বীয় পিতার সাথে لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ আমি তোমার জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করব وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ, এবং তোমার সম্বন্ধে আমার অধিকার নেই مِنَ ٱللَّهِ আল্লাহর সমীপে, مِن شَىْءٍ আর কোনো رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا আমরা আপনার উপর ভরসা করছি وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, এবং আপনার দিকেই রুজু হচ্ছি إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ, আর আপনারই দিকে ফিরে সকলকে যেতে হবে।

৫. لَا تَجْعَلْنَا رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু আমাদেরকে করবেন না। فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا কাফেরদের পরীক্ষার স্থল وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا এবং হে আমাদের প্রভু! আমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিন إِنَّكَ أَنتَ নিঃসন্দেহে আপনি ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

৬. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অর্থাৎ এমন লোকদের জন্য রয়েছে أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ উত্তম আদর্শ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا যারা বিশ্বাস রাখে ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি وَمَن يَتَوَلَّ, আর যে মুখ ফিরিয়ে নিবে فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ তবে আল্লাহ সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত প্রশংসনীয়।

৭. عَسَى ٱللَّهُ আল্লাহর নিকট আশা করা যায় যে أَن يَجْعَلَ তিনি কায়েম করে দিবেন بَيْنَكُمْ তোমাদের মধ্যে وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم এবং তাদের মধ্যে যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে مَّوَدَّةً বন্ধুত্ব وَٱللَّهُ قَدِيرٌ, আর আল্লাহ মহা শক্তিমান وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, আর আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল দয়ালু।

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۸﴾

৮. আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি, ঐ সকল লোকের সাথে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুদ্ধ করেনি, এবং তোমাদেরকে তোমাদের গৃহ হতে বহিষ্কৃত করেনি যে, তোমরা সদ্ব্যবহার ও ন্যায়-পরায়ণতা কর; বস্তুতঃ আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۹﴾

৯. আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল সেই লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের গৃহসমূহ হতে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদেরকে বের করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে, আর যে এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, বস্তুতঃ তারাই জালিম হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ

১০. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের নিকট মুসলমান নারীগণ হিজরত করে আসে, তখন তোমরা তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে) পরীক্ষা করে নাও; তাদের (প্রকৃত) ঈমান সম্বন্ধে আল্লাহই ভালোভাবে জানেন, অনন্তর যদি তাদেরকে মুসলমান মনে কর, তবে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফিরিয়ে দিও না;

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি عَنِ الَّذِيْنَ ঐ সকল লোকের সাথে لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি فِى الدِّيْنِ ধর্মীয় ব্যাপারে وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেনি مِّنْ دِيَارِكُمْ তোমাদের গৃহ হতে اَنْ تَبَرُّوْهُمْ তোমরা সদ্ব্যবহার কর وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ও ন্যায়– পরায়ণতা কর اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ বস্তুত আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।

৯. اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল নিষেধ করেন عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে فِى الدِّيْنِ ধর্মীয় ব্যাপারে وَاَخْرَجُوْكُمْ এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে مِّنْ دِيَارِكُمْ তোমাদের গৃহসমূহ হতে وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে اَنْ تَوَلَّوْهُمْ সেই লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ আর যে এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ বস্তুত তারাই জালিম হবে।

১০. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে ঈমানদারগণ! اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ যখন তোমাদের নিকট মুসলমান নারীগণ আসে مُهٰجِرٰتٍ হিজরত করে فَامْتَحِنُوْهُنَّ তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও اَللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহই ভালো জানেন بِاِيْمَانِهِنَّ তাদের ঈমান সম্বন্ধে فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ অনন্তর যদি তাদেরকে মনে কর مُؤْمِنٰتٍ মুসলমান فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ তবে তাদেরকে ফিরিয়ে দিও না اِلَى الْكُفَّارِ কাফেরদের নিকট

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّاۤ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَاۤ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَاۤ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۰﴾

** (কেননা) না এ নারীগণ ঐ কাফেরদের জন্য হালাল আর না ঐ কাফেররা এ নারীদের জন্য হালাল; আর ঐ কাফেররা যা কিছু ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে দিয়ে দাও; আর এ নারীদেরকে বিবাহ করতে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না, যখন তোমরা তাদেরকে তাদের মহর দান কর; আর তোমরা কাফের পত্নীদের সম্পর্ক বজায় রেখ না এবং যা ব্যয় করেছ তা চেয়ে নাও, আর (অনুরূপভাবে) ঐ কাফেররা যা ব্যয় করেছে চেয়ে নিক; এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে (সঙ্গতরূপেই) মীমাংসা করে থাকেন; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَاۤ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾

১১. আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য হতে কেউ কাফেরদের নিকট থেকে যাওয়ার দরুন তোমাদের হস্তগত না হয়, (ঐ স্ত্রী বা তার মহর কিছুই প্রাপ্ত না হয়,) অনন্তর (কাফেরদেরকে মহর দেওয়া) তোমাদের পালা আসে, তবে যাদের স্ত্রী হস্তচ্যুত হয়েছে, তারা যে পরিমাণ খরচ করেছিল সেই পরিমাণ তোমরা তাদেরকে দিয়ে দাও; আর আল্লাহকে ভয় কর, যার উপর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ।

শাব্দিক অনুবাদ :

** لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ না এই নারীগণ কাফেরদের জন্য হালাল وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ আর না ঐ কাফেররা এই নারীদের জন্য হালাল وَاٰتُوْهُمْ আর তা তাদেরকে দিয়ে দাও مَّاۤ اَنْفَقُوْا ঐ কাফেররা যা কিছু ব্যয় করেছে وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ আর তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ এই নারীদেরকে বিবাহ করাতে اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ যখন তোমরা তাদেরকে তাদের মহর প্রদান কর وَلَا تُمْسِكُوْا আর তোমরা সম্পর্ক বজায় রেখ না بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ কাফের পত্নীদের সম্পর্ক وَسْـَٔلُوْا এবং চেয়ে নাও مَاۤ اَنْفَقْتُمْ যা ব্যয় করেছ وَلْيَسْـَٔلُوْا আর চেয়ে নিক مَاۤ اَنْفَقُوْا ঐ কাফেররা যা ব্যয় করেছে ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর বিধান يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ তিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে থাকেন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, حَكِيْمٌ প্রজ্ঞাময়।

১১. وَاِنْ فَاتَكُمْ আর যদি তোমাদের হস্তগত না হয় شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ اِلَى الْكُفَّارِ কাফেরদের নিকট থেকে যাওয়ার দরুন فَعَاقَبْتُمْ অনন্তর তোমাদের পালা আসে فَاٰتُوْا তবে তোমরা তাদেরকে দিয়ে দাও الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ যাদের স্ত্রী হস্তচ্যুত হয়েছে مِّثْلَ مَاۤ اَنْفَقُوْا তারা যে পরিমাণ খরচ করেছিল সেই পরিমাণ وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ যার উপর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

১২. হে নবী! যখন মুসলমান নারীগণ আপনার নিকট (এ উদ্দেশ্যে) আগমন করে যে, আপনার হস্তে এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে যে, আল্লাহর সাথে কোনো বস্তুকে শরিক করবে না, আর না চুরি করবে, আর না ব্যভিচার করবে, আর না নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে, আর না কোনো মিথ্যা সন্তান আনবে-যাকে নিজেদের হস্তসমূহ ও পাসমূহের মধ্যস্থলে (অর্থাৎ স্বামীর ঔরসে জন্ম) বলে দাবি করবে এবং শরিয়তের বিধানসমূহে তারা আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে না, তবে আপনি তাদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষামশীল, দয়ালু।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٣﴾

১৩. হে ঈমানদারগণ! তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না, যাদের উপর আল্লাহ গজব পাঠিয়েছেন, ফলে তারা পরকাল হতে এমনভাবে নিরাশ হয়ে গিয়েছে, যেমন, কবরে (সমাহিত) কাফেরগণ (পরকাল প্রত্যক্ষ করার পর ছওয়াব হতে) নিরাশ হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ হে নবী إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ যখন মুসলমান নারীগণ আপনার নিকট (এই উদ্দেশ্যে) আগমন করে যে, يُبَايِعْنَكَ আপনার হস্তে এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে যে عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا আল্লাহর সাথে কোনো বস্তুকে শরিক করবে না وَلَا يَسْرِقْنَ আর না চুরি করবে وَلَا يَزْنِينَ, আর না ব্যভিচার করবে وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ, আর না নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ, আর না কোনো মিথ্যা সন্তান আনবে-যাকে يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ, নিজেদের হস্তসমূহ ও পা সমূহের মধ্যস্থলে বলে দাবি করবে وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ এবং শরিয়তের বিধানসমূহে তারা আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে না فَبَايِعْهُنَّ তবে আপনি তাদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নিন وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ, এবং তাদের জন্য আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করুন إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল দয়ালু।

১৩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ হে ঈমানদারগণ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ যাদের উপর আল্লাহ গজব পাঠিয়েছেন قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ফলে তারা পরকাল হতে এমনভাবে নিরাশ হয়ে গিয়েছে كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ যেমন কাফেরগণ নিরাশ হয়ে আছে مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ কবরে (সমাহিত)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ـ

"যে সব স্ত্রীলোক হিজরত করে আসবে ও মুসলমান হওয়ার দাবি করবে তাদের যাচাই ও পরীক্ষা করতে হবে।" উপরিউক্ত فَامْتَحِنُوْهُنَّ শব্দ হতে সূরার নামকরণ اَلْمُمْتَحِنَةُ (আল-মুমতাহিনাহ) করা হয়েছে। এ শব্দটির উচ্চারণ 'মুমতাহিনাহ' করা হয়েছে অর্থাৎ ইমতিহান হতে ইসমে ফায়েল, যার অর্থ– পরীক্ষা গ্রহণকারী সূরা। আর কেউ কেউ এর উচ্চারণ মুমতাহানাহ করেছেন অর্থাৎ ইসমে মাফউল, যার অর্থ– সে স্ত্রীলোক যার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

অত্র সূরার অপর নাম হলো সূরাতুল মোয়াদ্দা। এতে ১৩টি আয়াত, ৩৪৮টি বাক্য এবং ১৫১০টি অক্ষর রয়েছে।

-[নূরুল কুরআন]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যে ঈমানের দাবিদার হলেও কাফেরদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের, আর এ সূরায় মুমিনদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তারা কাফেরদের সাথে কোনো প্রকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখে। -[রূহুল মা'আনী]

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরায় এমন দু'টি ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে, যার সময়কাল ঐতিহাসিকভাবে সর্বজন জ্ঞাত। প্রথম ব্যাপার হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া (রা.) সম্পর্কিত। তিনি মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে কুরাইশ সরদারদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কা আক্রমণের সংবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে একখানা গোপন চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যেসব মুসলমান স্ত্রীলোক মক্কা হতে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলমান পুরুষদের ন্যায় মুসলমান স্ত্রীলোকদেরকে কাফেরদের হাতে প্রত্যর্পণ করতে হবে কি হবে না এ বিষয়ে একটা জটিল প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। এ দু'টি ব্যাপারে উল্লেখ এ কথা নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, এ সূরাটি হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে নাজিল হয়েছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু :

১. এ সূরার প্রথমে শুরু হতে ৯ নং আয়াত পর্যন্ত হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া যিনি নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার মানসে রাসূলে কারীম ﷺ -এর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সামরিক গোপন তথ্য শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তার নিন্দা করা হয়েছে। এখানে প্রথমেই অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অতঃপর বলা হয়েছে– এ দুনিয়ার বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা এবং সম্পর্ক পরকালে কোনো কাজে আসবে না। পরকালে কেবল ঈমান এবং আমলে সালেহই কাজে আসবে। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর অনুসারীদের আদর্শ হতে শিক্ষা অর্জন করতে বলা হয়েছে। -[সাফওয়া]

২. ১০ নং এবং ১১ নং আয়াত দু'টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে। সমস্যাটি তখন খুব বেশি জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। সমস্যাটি ছিল এই যে, মক্কায় বহুসংখ্যক মুসলিম পুরুষ এমন ছিলেন যাদের স্ত্রীরা ছিল কাফের আর তারা মক্কাতেই থেকে গিয়েছিল। অতঃপর এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অক্ষত আছে কিনা? সে সম্পর্কে তীব্র প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত কয়টিতে সে সমস্যাটির চূড়ান্ত সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো এই যে, মুসলিম নারীর জন্য কাফের স্বামী হালাল নয় এবং মুসলিম পুরুষের জন্যও জায়েজ নয় কাফের নারীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে রাখা।

৩. ১২ নং আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেসব স্ত্রীলোক ইসলাম কবুল করবে তাদের নিকট হতে জাহেলিয়াতের যুগে আরব নারীদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত বহু বড় বড় দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন। সে সঙ্গে এ কথারও অঙ্গীকার গ্রহণ করুন যে, ভবিষ্যতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলে কারীম ﷺ -এর পক্ষ হতে উপস্থাপিত যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গলময় নিয়মনীতি, আইন-কানুন অনুসরণ ও পালন করে চলতে তারা বাধ্য ও প্রস্তুত থাকবেন।

৪. সূরার শেষ আয়াত অর্থাৎ ১৩ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করতে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতটিও প্রথম দিকের আয়াতগুলোর সাথে সম্পৃক্ত।

সূরাটির শানে নুযূল : তাফসীরে মাযহারী, কুরতুবী ও খতীব গ্রন্থের বর্ণনা মতে উক্ত সূরার শানে নুযূল হচ্ছে– হযরত কুশায়রী ও ছা'লাবী (রা.) বর্ণনা করেন ৮ম হিজরিতে রাসূল ﷺ মদীনা শরীফ হতে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য গুপ্তভাবে কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের সাথে আলোচনাক্রমে তৈরি হতে লাগলেন। সারাহ্ নামক একজন মহিলা ছিল। হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কা বিজয়ের প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে সংবাদ জানিয়ে উক্ত সারাহ্ নামক মহিলার মাধ্যমে একটি পত্র মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বার্তাবাহক মহিলাটি মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে ঘটনাটি জানিয়ে দিলেন এবং তাও অবহিত করে দিলেন যে, অমুক স্থানে এই এই আকৃতি প্রকৃতির বার্তাবাহক একটি মহিলাকে পাওয়া যাবে। তার নিকট অবশ্যই চিঠি রয়েছে। তাকে অবশ্যই ধরে আনতে হবে। সে মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী ও হযরত জোবায়ের (রা.)-কে পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন যে, তাকে পাওয়া মাত্রই তার থেকে চিঠি নিয়ে আসবে। তখন হযরত আলী (রা.) উক্ত মহিলাকে যথাস্থানে গিয়ে পেলেন এবং চিঠি খোঁজ করলে প্রথমত মহিলাটি তা অস্বীকার করল। অতঃপর হযরত আলী ও হযরত জোবায়ের (রা.) বললেন, আমরাও সত্য বলছি এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও সত্যই বলেছেন, তোমার সাথে হাতিব (রা.)-এর লিখিত পত্র রয়েছে। সুতরাং তা তাড়াতাড়ি বের করে দাও। অন্যথায় তোমাকে উলঙ্গ করে চিঠি বের করবো।

এ ধমকি শুনে মহিলাটি ভয়ে তার চুলের খোপা হতে পত্রখানা বের করে দিলেন। অতঃপর হযরত আলী (রা.) ও জোবায়ের (রা.) তা এনে নবী করীম ﷺ -এর নিকট পৌঁছালেন। এরপর হযরত হাতিব (রা.)-কে ডাকানো হলে তিনি উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি অত্যন্ত মিনতির সুরে শপথ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঈমানদার, মুনাফিক নই। দীন ইসলামের জন্য আমার আত্মা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি। ইসলামের সাথে শত্রুতার মানসে এ পত্র লিখিনি; বরং তার কারণ এই যে, আমার ছোট ছোট সন্তানগণ মক্কায় রয়ে গেছে। তাদের ভালোবাসার কারণে আমার হতে এহেন কার্য ঘটেছে? এ কাজের বদৌলতে আমার সন্তান-সন্ততিদের তারা রক্ষণাবেক্ষণ করতে মর্জি করবে। হযরত হাতিব (রা.)-এর বর্ণনা শ্রবণ করে হযরত ওমর (রা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি নির্দেশ দেন তবে এ মুনাফিকের শিরশ্ছেদ করে দিতে চাই।

উত্তরে হুজুর ﷺ বললেন, ওমর এটা কখনো হয় না, কারণ আল্লাহ তা'আলা বদরের মুজাহিদগণের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। হাতিব ইবনে আবূ বালতায়াহ আমার সাথে বদরের ময়দানে শরিক ছিল। আর বদরের অংশীদার সকলকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং আরো বলেছেন– اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ সুতরাং তাকে ক্ষমা করা যায়। এটা শুনে হযরত ওমর (রা.) থমকে গেলেন এবং তার চক্ষু যুগল থেকে কান্নার পানি বের হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, হযরত হাতিব (রা.) বলেন, মুসলমান ও ইসলামের ক্ষতির লক্ষ্যে আমি এ পত্র লিখিনি। সুতরাং হাতেব (রা.)-এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সূরা নাজিল হলো। -[নূরুল কুরআন]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا .... اَلْاٰيَة

শানে নুযূল : হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আবূ রাফে (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবূ তালেব (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং যুবায়র ও মেকদাদ ইবন আসওয়াদকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি বললেন, তোমরা রওজাকে খাক (মদিনা থেকে ১২ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান) নামক স্থানে যাবে। সেখানে এক উষ্ট্রারোহিণী মহিলা পাবে। তার কাছে একটি গোপন পত্র আছে। তা তার কাছ থেকে সংগ্রহ করে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমরা বের হয়ে পড়লাম এবং আমাদের ঘোড়া দ্রুত ছুটিয়ে রওয়ানা হয়ে 'খাকে' এসে সেখানে এক উষ্ট্রারোহিণী মহিলাকে পেলাম। আমরা বললাম, পত্রটি বের কর। সে বলল, আমার সাথে কোনো পত্র নেই। আমরা বললাম, পত্রটি বের কর নয়তো কাপড় খুলে ফেলা হবে। হযরত আলী (রা.) বলেন, সে তার চুলের বেনীর ভিতর থেকে পত্রটি বের করে দিল। আমরা সেটি নিয়ে রাসূল ﷺ -এর কাছে এলাম। দেখা গেল যে, হাতিব ইবনে আবূ বালতাআ এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকদের কাছে লেখা হয়েছে এবং এতে নবী করীম ﷺ -এর কিছু বিশেষ বিষয় যথা মক্কার অভিযান সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ তখন বললেন, হে হাতিব! এটি কি?

হাতিব বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ক্ষেত্রে ফয়সালা দিতে তাড়াহুড়া করবেন না। আমি মূলত কুরায়শী নই। তাদের সঙ্গে সংযুক্ত এক ব্যক্তি মাত্র। আপনার সঙ্গে যে সকল মুহাজির রয়েছেন তাদের সবারই কুরায়শদের সাথে নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে কুরায়শরা তাদের মক্কায় অবস্থানরত পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদের হেফাজত

করে থাকে। আমি চাইলাম তাদের সঙ্গে উক্ত সম্পর্ক না থাকায় যখন ঐ সুযোগ আমার নেই, তখন তাদের সঙ্গে ইহসান ও দয়ার ব্যবহার করি, যাতে আমার আত্মীয় পরিজনদের সেখানে তারা হেফাজত করে। এ কাজটি আমি কুফরি এবং আমার ধর্মচ্যুতি বা কুফরির প্রতি সন্তুষ্টির কারণে করিনি। নবী করীম ﷺ বললেন, সে সত্য কথা বলেছে। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, আমাকে ছেড়ে (অনুমতি) দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মুনাফিকটির গর্দান উড়িয়ে দিই। নবী করীম ﷺ বললেন এ (হাতিব) তো বদরে হাজির ছিল। তোমার তো জানা আছে আল্লাহ তা'আলা বদরীদের প্রতি নজর দিবেন এবং বলে দিবেন তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার তোমাদের আমি মাফ করে দিলাম। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। বর্ণনাকারী আমর (র.) বলেন, আমি ইবনে আবূ রাফে (র.)-কে দেখেছি, তিনি ছিলেন হযরত আলী (রা.) এর লিপিকার।-(তিরমিযী : ২)

একই ঘটনা কিছুটা পরিবর্তনের সাথে তাফসীরে মাজহারী, কুরতুবী ও মাআরিফুল কুরআন এবং অন্যান্য তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নাম্নী একজন গায়িকা নারী প্রথমে মদিনায় আগমন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কি হিজরত করে মদিনায় এসেছ? সে বলল, না আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছো? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে কি উদ্দেশ্যে এসেছ? সে বলল, আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে। আমি মারাত্মক বিপদে পড়ে ও অভাব গ্রস্থ হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত? সে বলল, বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসব পর্ব ও গান বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল মুত্তালিব বংশের লোকদেরকে তাকে সাহায্য করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা পয়সা, পোশাক পরিচ্ছেদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাফেররা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই গোপন তথ্য মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্ব প্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবি বালতায়া (রা.)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভুত এবং মক্কায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। মক্কায় তার স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তার স্ত্রী ও সন্তানগণ তখনও মক্কায় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফেররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয় স্বজন মক্কায় ছিল, তাদের সন্তান সন্ততিরা কোনোরূপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তার সন্তান-সন্ততিরা শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তার সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন।

হাতেব (রা.) মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তার কিংবা ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়ে দেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলে-পেলেদের হেফাজত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতেব (রা.) এই ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন। (কুরতুবী, আজহারী) এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরো জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এ সময়ে রওযায়ে খাক নামক স্থানে পৌঁছে গেছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে, আবূ মারসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওয়ামকে আদেশ করলেন, অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে রওযায়ে খাকে পাবে তার সাথে মক্কাবাসীদের নামে হাতেব ইবনে আবী বালতাআর পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমরা নির্দেশমতো দ্রুত গতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেস্থানের কথা বলে দিলেন, ঠিক সেখানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম পত্রটি বের কর। সে বলল, আমার কাছে কারো কোনো পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর

তালাশ করে কোনো চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংবাদ মিথ্যা হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম হয় পত্র বের কর না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে দিব। অগত্যা সে নিরুপায় হয়ে পায়জামার ভিতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে চলে এলাম। হযরত ওমর (রা.) ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন এই ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফেরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে অতএব অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতেব (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ঈমানে এখনও কোনো তফাত হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার সন্তানদের কোনো ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোনো মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবার পরিজনের হেফাজত করে। রাসূল ﷺ হাতেবের জবানবন্দী শুনে বললেন, সে সত্য বলেছে। অতএব তার ব্যাপারে তোমরা ভালো ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত ওমর (রা.) ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ তা'আলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমার ও তাদের জন্যে জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরজ করলেন, আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলই আসল সত্য জানেন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে, আমি একাজ ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য করিনি। কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুমতাহিনার শুরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে উপরিউক্ত ঘটনার জন্যে হুশিয়ার করা হয় এবং কাফেরদের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়।

-(মা'আরেফুল কুরআন বাংলা ১৩৫৮-৫৯)

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (٨)

শানে নুযূল : একবার হযরত আসমা বিনতে আবী বকর (রা.) -এর মুশরিকা মাতা তার সাথে দেখা করার জন্য মদীনায় আসল, তখন তিনি হুজুর ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি আমার মাতার সাথে সদাচারণ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –(বুখারী শরীফ)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۗءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ............ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۭ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (١٠)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতগুলো একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সূরা ফাতহের শুরুতেই এই সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সন্ধির যেসব শর্ত ছিল, তম্মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি কাফেরদের কাছে চলে যায় তবে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না, পরন্তু কাফেরদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে চলে যায় তবে তাকে ফেরত দিতে হবে। সেমতে কিছু মুসলমান পুরুষ কাফেরদের মধ্য থেকে আগমন করে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর কয়েকজন নারী মুসলমান হয়ে আগমন করে। তাদেরকে কাফের আত্মীয়রা তাদেরকে প্রত্যাবর্তনের আবেদন জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো হুদাইবিয়ায় অবতীর্ণ হয়। এতে নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সন্ধিপত্রের ব্যাপকতা সংকুচিত ও রহিত হয়ে গেছে।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ (١١)

শানে নুযূল : এই আয়াত সুফিয়ান কন্যা উম্মুল হাকাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সে ইসলাম গ্রহণের পর আবার মুরতাদ হয়ে জনৈক সাকাফীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উল্লেখ্য, কুরাইশদের মধ্যে অত্র মহিলা ব্যতীত অন্য কেউ মুরতাদ হয়নি। –(কানযুন নুকূল : ১০০)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاۗءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓي اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا............وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٢)

শানে নুযূল : মক্কা বিজয়ের দিন যখন মহিলারা ইসলামের বাইআত গ্রহণ করার জন্য হুজুরে পাক ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলো, তখন তাদেরকে বাইআত করার পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলা হুজুর ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করেন এবং এই আয়াত নাজিল করেন। (কানযুন নুকূল : ১০০)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (١٣)

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও যায়েদ বিন হারেস (রা.) কতিপয় ইহুদির সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করেছিলেন। তাদের ব্যাপারেই উক্ত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়। –(কানযুন নুকূল : ১০০)

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - (١٠)

শানে নুযূল : ইবনে মুনী' হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেননি, মুশরিকা ছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। মতান্তরে ইয়াযীদ বিন আখনাস (র.) যখন সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেনি, সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে।

-(ফতহুল কাদীর ২১৭/৫, দুররে মানছুর ২০৮/৩, কানযুন নুকূল : ১০০)

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ- (١٠)

শানে নুযূল : আদব বিন হুমাইদ হযরত ইকরিমা (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন কোনো এক মহিলা হিজরত করে মক্কা হতে মদীনায় চলে আসে। সুতরাং তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তুমি কেন চলে আসলে? স্বামীর প্রতি ক্রোধবশত: চলে আসলে, নাকি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল এর উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়ে চলে আসলে? মহিলাটি তখন বলল যে, আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বের হয়ে চলে এসেছি। তখন সে মহিলাকে কাফেরদের হাতে তুলে না দেওয়ার জন্যে নির্দেশ জারি করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(দুররে মানছুর ২০৬/৬)

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ - (١١)

শানে নুযূল–১ : আবদ বিন হুমাইদ, আবূ দাউদ ও ইবনে জারীর প্রমুখ হযরত যুহরী (র.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম হুদাইবিয়ায় অবস্থান করা কালেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, মহিলারা যখন চলে আসত সে ব্যাপারের বিধান হলো যে, তাদের স্বামীদেরকে মহরের টাকা গুলো ফেরত দিয়ে দেওয়া। মুশরিকদের জন্যে এ বিধান ছিল যে, মুসলমানদের নিকট হতেও কোনো মহিলা যদি তাদের নিকট মুরতাদ হয়ে চলে যায়, তারাও যেন মুসলমান স্বামীকে মহরে ব্যয়িত টাকা গুলো ফেরত দিয়ে দেয়, মুসলমানেরা তা যথা-যথ ভাবে পালন করছিলেন, কিন্তু মুশরিকেরা তা পালন করতে অস্বীকার করল। তখন সে বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : ইবনে আবী হাতেম হযরত হাসান (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হেকাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, উম্মে হেকাম ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে মুরতাদ বা ধর্ম ত্যাগী হয়ে একজন ছাকাফী লোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। কুরায়শীদের মধ্যে এ মহিলা ছাড়া আর অন্য কোনো মহিলা ধর্ম ত্যাগী হয়নি। ধর্মত্যাগী সে মহিলাটির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবর্তীণ হয়েছে। –(দুররে মানছুর ২০৮/৬)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ - (١٣)

শানে নুযূল ঃ আবূ ইসহাক ও ইবনুল মুনযির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) যায়েদ বিন হারেছ দু'জনে একজন ইহুদি ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন তখন কোনো ইহুদি বা বিধর্মীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে নিষেধ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –(ফতহুল কাদীর ২১৮/৫)

এই সূরার শুরুভাগে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ অর্থাৎ মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করবে। এতে উল্লেখিত ঘটনার প্রতিই

ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের পত্র কাফেরদেরকে লিখা বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করারই নামান্তর। আয়াতে কাফের শব্দ বাদ দিয়ে 'আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু বলে প্রথমতঃ এই নির্দেশের কারণ ও দলিল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহর শত্রুর কাছে বন্ধুত্বের আশা করা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ নয়। অতএব, এ থেকে বিরত থাক। দ্বিতীয়তঃ এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফের যে পর্যন্ত কাফের থাকবে, সে কোনো মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। সে আল্লাহর দুশমন। অতএব, যে মুসলমান আল্লাহর মহব্বত দাবি করে, তার সাথে কাফেরের বন্ধুত্ব কিরূপে সম্ভবপর?

وَقَدْكَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ :

এখানে حق বলে কুরআন অথবা ইসলাম বোঝানো হয়েছে। এই আয়াতে তাদের শত্রুতার আসল কারণ কুফর বর্ণনা করার পর তাদের বাহ্যিক শত্রুতাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের রাসূলকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছেন। এই বহিষ্কারের কারণ কোনো পার্থিব বিষয় নয়। বরং একমাত্র তোমাদের ঈমানই এর কারণ ছিল। অতএব, একথা আর গোপন রইল না যে, তোমরা যে পর্যন্ত মুমিন থাকবে তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। হাতেব (রা.) মনে করেছিল যে, তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা তার পরিবার-পরিজনের হেফাজত করবে। তার এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ ঈমানের কারণে তারা তোমাদের শত্রু। খোদা না করুন, তোমাদের ঈমান বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুত্বের আশা করা ধোঁকা বৈ নয়।

اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ : এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আল্লাহর জন্যে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ছিল, তবে আল্লাহর শত্রু কাফেরদের কাছে এই আশা কিরূপে রাখা যায় যে, তারা তোমাদের খাতির করবে?

تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ

এতেও আরও বলা হয়েছে যে, যারা কাফেরদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব রাখে তারা যেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজকর্মরে খবর রাখেন; যেমন উল্লিখিত ঘটনায় তিনি তাঁর রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করে চক্রান্ত ধরিয়ে দিয়েছেন।

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاءً وَّيَبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْءِ : অর্থাৎ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তোমাদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, তাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশ্যা করা দুরাশা মাত্র। তারা যখনই তোমাদের উপর প্রাধান্য হাসিল করবে, তখনই তাদের বাহু ও রসনা তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া কোনো দিকে প্রসারিত হবে না।

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ : এতে ইঙ্গিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে, তখন তাদের বন্ধুত্ব কেবল তোমাদের ঈমানের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। তোমরা কুফরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْلَمُوْنَ بَصِيْرٌ : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা সেদিন এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিবেন। সন্তানরা পিতা-মাতার কাছ থেকে ও পিতা-মাতা সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এতে হযরত হাতেবের ওজর খণ্ডন করা হয়েছে যে, যে সন্তানদের মহব্বতে তুমি একাজ করেছিলে, মনে রেখ, কিয়ামতের দিন তারা তোমার কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহর কাছে কোনো কিছু গোপন নয়।

পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের সমর্থনে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত জ্ঞাতিগোষ্ঠী মুশরিক ছিল। তিনি সবার সাথে শুধু সম্পর্কচ্ছেদই নয়-শত্রুতাও ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যে পর্যন্ত তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করবে এবং শিরক থেকে বিরত না হবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতার প্রাচীর অন্তরায় হয়ে থাকবে:

قَدْكَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ থেকে حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ উপরের আয়াতে মুসলমানদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তম আদর্শ ও সুন্নত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) তার মুশরিক পিতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন বলেও প্রমাণিত আছে। সূরা তাওবায় এর উল্লেখ আছে। অতএব, সন্দেহ হতে পারত যে, মুশরিক পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও মাগফেরাতের দোয়া করা ইবরাহিমী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা জায়েজ হওয়া উচিত। তাই ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্যসব বিষয়ে ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ জরুরি,

কিন্তু তাঁর এই কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের জন্যে জায়েজ নয়। إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ আয়াতের মর্ম তাই। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ওজর সূরা তওবায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া নিষেধাজ্ঞার পূর্বে করেছিলেন, অথবা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, সে আল্লাহর দুশমন, তখন এবিষয় থেকেও নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন। فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ আয়াতের উদ্দেশ্য তা-ই।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيْمَ কে বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যে, পিতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করেছিলেন, এটা তাঁর আদর্শের পরিপন্থি নয়। কেননা তার পিতা মুসলমান হয়ে গেছে–এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দোয়া করেছিলেন। এরপর যখন তিনি আসল সত্য জানতে পারেন, তখন দোয়া ছেড়ে দেন এবং সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। এরূপ করা এখনও জায়েজ। কোনো কাফের সম্পর্কে যদি কারও প্রবল ধারণা থাকে যে, সে মুসলমান, তবে তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করায় কোনো দোষ নেই। –(কুরতবী)

عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً الخ.

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, যদিও সেই কাফের আত্মীয়তায় খুবই নিকটবর্তী হয়। সাহাবায়ে-কেরাম আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলি পালনের ব্যাপারে নিজেদের খাহেশ ও আত্মীয় স্বজনের পরওয়া করতেন না। তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞাও বাস্তবায়িত করলেন। ফলে দেখা গেল যে, ঘরে ঘরে পিতা-পুত্রের সাথে এবং পুত্র-পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। বলাবাহুল্য, মানবপ্রকৃতি ও স্বভাবের জন্যে এ কাজ সহজ ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা এই সংকটকে অতিসত্বর দূর করার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, আজ যারা কাফের, ফলে তারা তোমাদের শত্রু ও তোমরা তাদের শত্রু, অতি সত্বরই হয়তো আল্লাহ তা'আলা এই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পর্যবসিত করে দিবেন। অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের তাওফীক দিয়ে তোমাদের পারস্পরিক সুসম্পর্ককে নতুন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী মক্কাবিজয়ের সময় বাস্তবরূপ লাভ করে। ফলে নিহতদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল কাফের মুসলমান হয়ে যায়। –(মাযহারী) কুরআন পাকের এক আয়াতে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا অর্থাৎ তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে; বাস্তবেও তাই হয়েছে।

বোখারী ও মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রা.)-এর জননী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্ত্রী কবীলা হুদায়বিয়া সন্ধির পর কাফের অবস্থায় মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্যে কিছু উপঢৌকনও সাথে নিয়ে যান। কিন্তু হযরত আসমা (রা.) সেই উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমার জননী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, কিন্তু তিনি কাফের। আমি তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ জননীর সাথে সদ্ব্যবহার কর।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রা.)-এর জননী কবীলাকে হযরত আবূ বকর (রা.) ইসলাম পূর্বকালেই তালাক দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অপর স্ত্রী উম্মে রোমানের গর্ভজাত ছিলেন। উম্মে রোমান মুসলমান হয়ে যান। –(ইবনে-কাসীর, মাযহারী)।

যেসব কাফের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কারেও অংশগ্রহণ করেনি, আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যেক কাফেরের সাথেও জরুরি। এতে জিম্মি কাফের, চুক্তিতে আবদ্ধ কাফের এবং শত্রু কাফের সবই সমান; বরং ইসলামে জন্তু-জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব; অর্থাৎ তাদের পৃষ্ঠে সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না এবং ঘাস, পানি ও বিশ্রামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

إِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ : এই আয়াতে সেই সব কাফেরের বর্ণনা আছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে এবং মুসলমানদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কারে অংশগ্রহণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন। এতে অনুগ্রহমূলক কাজ কারবার করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং শুধু আন্তরিক বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কেবল যুদ্ধরতশত্রুদের সাথেই নয়; বরং জিম্মি ও চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের সাথেও জায়েজ নয়। এ থেকে তাফসীরে-মাযহারীতে মাসআলা বের করা হয়েছে যে, যুদ্ধরত

কাফেরদের সাথে ন্যায় ও সুবিচার করা তো জরুরিই; নিষিদ্ধ নয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেও জায়েজ। তবে অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে এর জন্যে শর্ত এই যে, তাদের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহারের কারণে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা যেন না থাকে। আশঙ্কা থাকলে জায়েজ নয়। তবে ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যেকের সাথে সর্বাবস্থায় জরুরি ও ওয়াজিব।

হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির কতিপয় শর্ত বিশ্লেষণ : সূরা ফাত্হতে হুদায়বিয়ার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এতে অবশেষে মক্কার কাফের ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে একটি দশ বছর মেয়াদী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির কতিপয় শর্ত এমন ছিল যে, এতে কাফেরদের কাছে মুসলমানদের মাথা নত করা ও বাহ্যিক পরাজয় মেনে নেওয়ার ভাব পরিস্ফুট ছিল। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা চাপা অসন্তোষ ও ক্ষোভের ভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর ইঙ্গিতে অনুভব করছিলেন যে, এই ক্ষণস্থায়ী পরাজয় অবশেষে চিরস্থায়ী প্রকাশ্য বিজয়েরই পূর্বাভাস হবে। তাই তিনি শর্তগুলো মেনে নেন এবং সাহাবায়ে কেরাম ও অতঃপর আর উচ্চবাচ্য করেন নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মক্কাবাসীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার বিখ্যাত শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মক্কা থেকে কোনো ব্যক্তি মদিনায় চলে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন যদিও সে মুসলামন হয়। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কুরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই বাহ্যত ঃ অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কোনো মুসলমান পুরুষ অথবা নারী মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ফেরত পাঠাবেন।

এই চুক্তি সম্পদান শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হুদায়বিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন তখন মুসলমানদের জন্যে অগ্নি পরীক্ষাতুল্য একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হযরত আবু জন্দল (রা.)-এর। কুরাইশরা তাকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি কোনো রকমে সেখান থেকে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিল যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁকে ফেরত পাঠানো উচিত কিন্তু আমরা আমাদের একজন নির্যাতিত ভাইকে জালেমদের হাতে পুনরায় তুলে দিব এটা কিরূপে সম্ভব?

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি শরিয়তের নীতিমালায় হেফাজত ও তৎপ্রতি দৃঢ়তা এক ব্যক্তির কারণে বিসর্জন দিতে পারতেন না। এর সাথে সাথে তাঁর দূরদর্শী অন্তদৃষ্টি সত্ত্বরই এই নির্যাতিতদের বিজয়ীসুলভ মুক্তিও যেন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল। স্বভাবগত কারণেই তিনিও আবু জন্দল (রা.)-কে ফেরত প্রত্যর্পণে দুঃখিত হয়ে থাকবেন, কিন্তু চুক্তি পালনের খাতিরে তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিদায় করে দিলেন।

এর সাথে সাথেই দ্বিতীয় একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। মুসলমান সাঈদা বিনতে হারেস (রা.) কাফের সায়ফী ইবনে আনসারের পত্নী ছিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে সায়ফীর নাম মুসাফির মখযূমী বলা হয়েছে। তখন পর্যন্ত মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এই মুসলমান মহিলা মক্কা থেকে পালিয়ে হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে স্বামীও হাজির। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দাবি জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করা হোক। কেননা আপনি এই শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তিপত্রের কালি এখনও শুকায়নি।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। এর পরিণতিতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোনো মুসলমান নারী হিজরত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছে গেলে তাকে কাফেরদের হাতে ফেরত দেওয়া হবে না-সে পূর্ব থেকেই মুসলমান হোক; যেমন উল্লিখিত সাঈদা অথবা হিজরতের পর তার মুসলমানিত্ব প্রমাণতি হোক। তাকে ফেরত না দেওয়ার কারণ এই যে, সে তার কাফের স্বামীর জন্যে হালাল নয়। তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

মোটকথা উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, চুক্তিপত্রের উপরিউক্ত শর্তটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয় যে, পুরুষ অথবা নারী যে কোনো মসুলমান আগমন করুক, তাকে ফেরত দিতে হবে। বরং এই শর্তটির ব্যাপকতা কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়-নারীদের ক্ষেত্রে নয়। নারীদের ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, যে নারী মুসলমান হয়ে হিজরত করে, তার কাফের স্বামী মোহরানায় আকারে যা কিছু তার পিছনে ব্যয় করেছে, তা তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এসব আয়াতের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তিপত্রের উল্লিখিত এই শর্তের সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুযায়ী সাঈদা (রা.)-কে কাফেরদের কাছে ফেরত প্রেরণে বিরত থাকেন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম বিনতে-ওতবা মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়। তার পরিবারের লোকেরা শর্তের ভিত্তিতে তাকে ফেরত দানের দাবি জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ নাজিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম আমর ইবনে-আস (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। স্বামী তখনও মুসলমান ছিল না। উম্মে-কুলসুম ও তাঁর দুই ভাই মক্কা থেকে পলায়ন করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে চলে যান। সাথে সাথেই তাঁদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবি উঠে। রাসূলুল্লাহ (সা.)– শর্ত অনুযায়ী আম্মারা ও ওলীদ ভ্রাতৃদ্বয়কে ফেরত পাঠিয়ে দেন; কিন্তু উম্মে কুলসুমকে ফেরত দেননি। তিনি বললেন ঃ এই শর্ত পুরুষদের জন্যে, নারীদের জন্যে নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্যায়নে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এমনি ধরনের আরও কয়েকজন নারীর ঘটনা রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। বলাবাহুল্য এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। সবগুলা ঘটনাই সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লিখিত শর্ত থেকে নারীদের ব্যতিক্রম চুক্তি ভঙ্গের শমিল নয়; বরং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একটি শর্তের ব্যাখ্যা মাত্র : কুরতুবীর উল্লেখিত রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, চুক্তির উপরিউক্ত ধারার ভাষা যদিও ব্যাপক ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতে তাতে নারীরা শামিল ছিল না। তাই তিনি হুদায়বিয়াতেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেন এবং এরই সত্যায়নে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শর্তটিকে ব্যাপক ভিত্তিতেই মেনে নিয়েছিলেন এবং তাতে নারীরাও শামিল ছিল। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে ব্যাপকতা রহিত হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনই কাফেরদেরকে অবহিত করে দেন যে, মহিলারা এই শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেমতে তিনি কোনো নারীকে ফেরত পাঠান নি। এ থেকে বোঝা গেল যে, এটা চুক্তির বরখেলাফ কাজ ছিল না এবং চুক্তি খতম করে দেওয়াও ছিল না; বরং একটি শর্তের ব্যাখ্যা ছিল মাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্দেশ্য পূর্ব থেকেই এরূপ ছিল কিংবা আয়াত নাজিল হওয়ার পর তিনি শর্তটিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে সীমিত রাখার জন্য প্রতিপক্ষকে বলে দিয়েছিলেন। সর্বাবস্থায় এই ব্যাখ্যার পরও চুক্তিপত্রটি উভয় পক্ষ বহাল রাখে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা বাস্তব রূপ লাভ করতে থাকে। এই শান্তিচুক্তির ফলশ্রুতিতেই রাস্তাঘাট বিপদমুক্ত হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বের রাজন্যবর্গের নামে পত্র লিখেন। এরই সুবাদে আবূ সুফিয়ানের কাফেলা নিশ্চিন্তে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে। সেখানে সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে রাজদরবারে ডেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থাদি জিজ্ঞাস করেন।

সারকথা এই যে, এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক। নারীরা এর অন্তর্ভুক্ত না থাকার বিষয়টি পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দৃষ্টিতে ছিল; কিংবা আয়াত নাজিল হওয়ার পর তিনি নারীদেরকে শর্ত থেকে খারিজ করে দেন। উভয় অবস্থাতেই কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে এই চুক্তি এরপরও পূর্ণাঙ্গরূপে বলবৎ ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা পালিত হয়। কাজেই এক ব্যাখ্যাকে চুক্তিভঙ্গকরণ অথবা চুক্তি খতমকরণ রূপে গণ্য করা যায় না। অতঃপর ভাষাদৃষ্টে আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করুন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَاجَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ : আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নারীদের মুসলমান ও মুমিন হওয়াই সন্ধির শর্ত থেকে তাদের ব্যতিক্রমভুক্ত হওয়ার কারণ। মক্কা থেকে মদীনায় আগমনকারিণী নারীদের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনাও ছিল যে, তাদের কেউ ইসলাম ও ঈমানের খাতিরে নয়, বরং স্বামীর সাথে ঝগড়া করে অথবা মদীনার কোনো ব্যক্তির প্রেমে পড়ে বা অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে হিজরত করেছে। এরূপ নারী আল্লাহর কাছে এই শর্তের ব্যতিক্রমভুক্ত নয়; বরং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাকে ফেরত পাঠানো জরুরি। তাই মুসলমানগণকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেসব নারী হিজরত করে মদীনায় আসে, তাদের ঈমান পরীক্ষা করে নাও। এর সাথেই বলা হয়েছে ঃ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যিকার ও আসল ঈমানের সম্পর্ক তো অন্তরের সাথে, যার খবর আল্লাহ. ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। তবে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লক্ষণাদিদৃষ্টে ঈমান সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সুতরাং মুসলমানগণকে এ বিষয়েরই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন ঃ মুহাজির নারীকে শপথ করানো হতো যে, সে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোনো ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি; বরং একান্তভাবে আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আগমন করেছেন। যে নারী এই শপথ করত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন। –(কুরতুবী)

তিরমিযীতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বলা হয়েছে ঃ নারীদের পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই আনুগত্যের শপথ, যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ মুহাজির নারীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে আয়াতে বর্ণিত বিষয়সমূহের শপথ করত। এটাও অসম্ভব নয় যে, প্রথমে তাদেরকে সেসব বাক্যও উচ্চারণ করানো হতো, যেগুলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে। এরপর আয়াতে বর্ণিত শপথ দ্বারা তা পূর্ণ করা হতো।

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ : অর্থাৎ পরীক্ষার পর যদি তারা মুমিন প্রতিপন্ন হয়, তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠানো বৈধ নয়।

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ : অর্থাৎ এই নারীরা কাফের পুরুষদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফের পুরুষরাও তাদের জন্যে হালাল নয় যে, তাদেরকে পুনর্বিবাহ করবে।

এই আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, যে নারী কোনো কাফেরের বিবাহাধীনে ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তার বিবাহ কাফেরের সাথে আপনা-আপনি ভঙ্গ হয়ে গেছে, তারা একে অপরের জন্যে হারাম। নারীদেরকে সন্ধির শর্ত থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত রাখার কারণ এটাই।

وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا : অর্থাৎ মুহাজির মুসলমান নারীর কাফের স্বামী বিবাহের মোহরানা ইত্যাদি বাবদ যা ব্যয় করেছে, তা সবই তার স্বামীকে ফেরত দাও। কেননা নারীকে ফেরত দেওয়াই কেবল সন্ধি-শর্তের ব্যতিক্রমভুক্ত ছিল, যা হারাম হওয়ার কারণে সম্ভবপর নয়, কিন্তু স্বামীর প্রদত্ত ধন-সম্পদ শর্ত অনুযায়ী ফেরত দেওয়া উচিত। মুহাজির নারীকে সরাসরি এই ধন-সম্পদ ফেরত দিতে বলা হয়নি; বরং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ফেরত দাও। কারণ স্বামী প্রদত্ত ধন-সম্পদ খতম হয়ে যাওয়ার সম্ভবপর নয় বিধায় বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। যদি বায়তুল মাল থেকে দেওয়া সম্ভবপর হয়, তবে সেখান থেকে, নতুবা মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে দেওয়া হবে। –(কুরতুবী)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : পূর্বের আয়াত থেকে বোঝা গেছে যে, মুহাজির মুসলমান নারীর বিবাহ তার কাফের স্বামীর সাথে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এই আয়াতে তারই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, এখন মুসলমান পুরুষের সাথে তার বিবাহ হতে পারে; যদিও প্রাক্তন কাফের স্বামী জীবিত থাকে এবং তালাকও না দেয়।

কাফের পুরুষের স্ত্রী মুসলমান হয়ে গেলে তাদের পারস্পরিক বিবাহ বন্ধন যে ছিন্ন হয়ে যায়, এ কথা পূর্বের আয়াত থেকে জানা গেছে। কিন্তু অন্য একজন মুসলমানের সাথে তার বিবাহ কখন জায়েজ হবে, এ সম্পর্কে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) বলেন : আসল বিধি এই যে, যে কাফের পুরুষের স্ত্রী মুসলমান হয়, ইসলামি বিচারক তাকে ডেকে বলবে : যদি তুমিও মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমাদের বিবাহ বহাল থাকবে নতুবা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এরপরও যদি সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তখন মুসলমান নারী কোনো মুসলমান পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। বলা বাহুল্য ইসলামি রাষ্ট্রেই ইসলামি বিচারক কাফের স্বামীকে আদালতে হাজির করতে পারে। কাফের দেশে কিংবা শত্রুদেশে এরূপ ঘটনা ঘটলে সেখানে স্বামীকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলা সম্ভবপর নয়। ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা হতে পারবে না। তাই এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ তখন সম্পন্ন হবে, যখন মুসলমান নারী হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে অথবা মুসলমানদের সেনা ছাউনিতে চলে আসে। উপরিউক্ত ঘটনাবলিতে দারুল ইসলামের আসা মদীনায় পৌঁছার মাধ্যমে হতে পারে এবং সেনা ছাউনীতে আসা হুদায়বিয়ায় পৌঁছার মাধ্যমে হতে পারে। কারণ তখন হুদায়বিয়ায় মুসলিম বাহিনী অবস্থানরত ছিল। ফিকহ্‌বিদগণের পরিভাষায় একে 'ইখতিলাফে দারাইন' বলা হয়েছে অর্থাৎ যখন কাফের পুরুষ ও তার মুসলমান স্ত্রীর মধ্যে দুই দেশের ব্যবধান হয়ে যায়– একজন কাফের দেশে ও অন্যজন মুসলিম দেশে থাকে, তখন তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে নারী অপরকে বিবাহ করার জন্য মুক্ত হয়ে যায়। –[হিদায়া]

আলোচ্য আয়াতে إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ বাক্যটি শর্তরূপে উল্লেখিত হয়েছে; অর্থাৎ তোমরা এই নারীদেরকে মোহরানা দিয়ে দেওয়ার শর্তে বিবাহ করতে পার। এটা প্রকৃতপক্ষে বিবাহের শর্ত নয়। কেননা সবার মতেই বিবাহ মোহরানা আদায় করার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে বিবাহের কারণে মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব অবশ্যই। এখানে একে শর্তরূপে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই মাত্র এক মোহরানা কাফের স্বামীকে ফেরত দেওয়ানো হয়েছে। কাজেই বিবাহকারী মুসলমান মনে করতে পারে যে, নতুন মোহরানা দেওয়ার আর আবশ্যকতা নেই। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্যে বলা হয়েছে যে, বিগত মোহরানার সম্পর্ক বিগত বিবাহের সাথে ছিল। এটা নতুন বিবাহ; কাজেই এর জন্যে নতুন মোহরানা অপরিহার্য।

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ : عِصَمٌ এর বহুবচন। এর আসল অর্থ সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহবন্ধন ইত্যাদি সংরক্ষণযোগ্য বিষয় বোঝানো হয়েছে।

كَوَافِرُ শব্দটি كَافِرَةٌ -এর বহুবচন। এখানে মুশরিক রমণী বোঝানো হয়েছে। কেননা কিতাবী কাফের রমণীকে বিবাহ করা কুরআনে সিদ্ধ রাখা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ পর্যন্ত মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ছিল, তা খতম করে দেওয়া হলো। এখন কোনো মুসলমানের বিবাহ মুশরিক নারীর সাথে বৈধ নয়। পূর্বে যে বিবাহ হয়েছে, তাও খতম হয়ে গেছে। এখনও কোনো-মুশরিক নারীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখা হালাল নয়।

এই আয়াত নাজিল হওয়ার সময় যে সাহাবীর কোনো মুশরিক স্ত্রী ছিল, তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর বিবাহে দুজন মুশরিক নারী ছিল। হিজরতের সময় তারা মক্কায় রয়ে গিয়েছিল। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর তিনি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন।- (মাযহারী) এখানে তালাকের অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ করা। পরিভাষিক তালাকের এখানে প্রয়োজনই নেই। কেননা আয়াত বলেই তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়।

وَاسْئَلُوا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا اَنْفَقُوا : অর্থাৎ যখন মুসলমান নারীকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে না এবং তার মোহরানা স্বামীকে ফেরত দেওয়া হবে, এমনিভাবে যদি কোনো মুসলমান নারী ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কায় চলে যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফের থাকার কারণে মুসলমান স্বামীর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলমান স্বামীকে তার মোহরানা ফেরত দেওয়া কাফেরদের দায়িত্ব হয়, তখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব লেনদেনের মীমাংসা করে নেওয়া কর্তব্য। উভয় পক্ষ যে মোহরানা ইত্যাদি দিয়েছে তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী লেনদেন করে নেওয়া উচিত।

এই আদেশ মুসলমানগণ সানন্দে পালন করেছে। কারণ কুরআনের আদেশ পালন করা তাদের কাছে ফরজ। কাজেই যে যে নারী হিজরত করে এসেছিল, তাদের সবার মোহরানা ইত্যাদি কাফের স্বামীদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মক্কার কাফেররা কুরআনে বিশ্বাস না থাকার কারণে এই আদেশ পালন করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ : এখানে عَاقَبْتُمْ শব্দটি مُعَاقَبَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রতিশোধ নেয়াও হয়ে তাকে। এখানে এই অর্থও হতে পারে। (কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোক যদি কাফেরদের হাতে থেকে যায়, তবে তাদের মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ইত্যাদি ফেরত দেওয়া কাফেরদের জন্যে জরুরি ছিল, যেমন মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুহাজির নারীদের কাফের স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এরূপ করল না এবং মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দিল না। এখন তোমরা যদি এর প্রতিশোধ নাও এবং কাফেরদের প্রাপ্য মোহরানা তোমাদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক কর, তবে এর বিধান এই যে,

فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا اَنْفَقُوا : অর্থাৎ তোমরা মুহাজির নারীদের দেওয়া আটককৃত মোহরানা থেকে সেই মুসলমান স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রী কাফেরদের হাতে রয়ে গেছে।

عَاقَبْتُمْ -এর অপর অর্থ যুদ্ধে সম্পদ হাসিল করাও হয়ে থাকে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যেসব মুসলমানের স্ত্রী কাফেরদের হাতে চলে গেছে এবং শর্ত অনুযায়ী কাফেররা মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা দেয়নি, এরপর মুসলমানেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেছে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকেই মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য দিতে হবে। -(কুরতুবী)

কিছু মুসলমান নারী ধর্মত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল কি? এই আয়াতে যে ব্যাপারে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, তার ঘটনা কারও কারও মতে মাত্র একটিই সংঘটিত হয়েছিল। তা এই যে, হযরত আয়ায ইবনে গানাম কুরায়শীর স্ত্রী উম্মুল হাকাম বিনতে আবূ সুফিয়ান ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সে ফিরে এসেছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এছাড়া আরও পাঁচজন নারীর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা হিজরতের সময়েই মক্কায় কাফেরদের সাথে থেকে গিয়েছিল এবং পূর্ব থেকেই কাফের ছিল। কুরআনের এই আয়াত নাজিল হওয়ার ফলে যখন মুসলমান পুরুষ ও কাফের নারীর বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়, তখনও তারা ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। ফলে তারাও সেই নারীদের মধ্যে গণ্য হয়, যাদের মোহরানা কাফেরদের কাছে মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য ছিল। কাফেররা যখন এই প্রাপ্য পরিশোধ করল না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে পরিশোধ করে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, ধর্ম ত্যাগ করে মদীনা থেকে মক্কায় চলে যাওয়ার ঘটনা মাত্র একটিই ছিল। অবশিষ্ট পাঁচজন নারী পূর্ব থেকেই কাফের ছিল এবং কাফের থাকার কারণে আয়াতের ভিত্তিতে মুসলমানদের সাথে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। যে নারী ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল, সেও পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল -(কুরতুবী) বগভী (র.) বর্ণনা করেন যে, অবশিষ্ট পাঁচজনও পরে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল। -[মাযহারী]

নারীদের আনুগত্যের শপথ ঃ يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ এ আয়াতে মুসলমান নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও আকায়েদসহ শরিয়তের বিধি-বিধান পালন করারও অঙ্গীকার রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতদৃষ্টে যদিও এই শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিষ্ট হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলমান নারীরাও শপথ করেছে। সহীহ বোখারীর রেওয়ায়েতে হযরত ওমায়মা (রা.) বর্ণনা করেন ঃ আমি আরও কয়েকজন মহিলা সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরিয়তের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেন এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উচ্চারণ করান فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاَطَقْتُنَّ অর্থাৎ আমরা এসব বিষয় পালনে অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলায়। হযরত ওমায়মা (রা.) এরপর বলেন ঃ এ থেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্নেহ-মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশি ছিল। আমরা তো নিঃশর্ত অঙ্গীকারই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবে না।–(মাযহারী)

সহীহ বোখারীতে হযরত আয়েশা (রা.) এই শপথ সম্পর্কে বলেন ঃ মহিলাদের এই শপথ কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে– হাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হতো। বস্তুত ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত কখনও কোনো গায়রে মাহরাম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি। –(মাযহারী)

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হুদায়বিয়ার ঘটনার পরেই নয়; বরং বারবার হয়েছে। এমনকি, মক্কা বিজয়ের দিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাক্যাবলি নীচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন।

তখন যারা আনুগত্যের শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। সে প্রথমে লজ্জাবশত ঃ নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিজ্ঞাসা করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। –(মাযহারী)

পুরুষদের শপথ সংক্ষেপে এবং নারীদের শপথ বিশদরূপে হয়েছে : পুরুষদের কাছ থেকে সাধারণত ইসলাম ও জিহাদের শপথ নেওয়া হয়েছে। এতে কার্যগত বিধি-বিধানের বিশদ বিবরণ ছিল না; কিন্তু মহিলাদের শপথে তা ছিল। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, পুরুষদের কাছ থেকে ঈমান ও আনুগত্যের শপথ নেওয়ার মধ্যে এসব বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। নারীরা সাধারণত বুদ্ধি-বিবেচনায় পুরুষদের অপেক্ষা কম হয়ে থাকে। তাই বিস্তারিত বিবরণ সমীচীন মনে করা হয়েছে এবং নারীদের কাছ থেকে এই শপথ নেওয়ার সূচনা করা হয়েছে। এরপর পুরুষদের কাছ থেকেও এসব বিষয়েরই শপথ নেওয়ার কথা হাদীস থেকে জানা যায়। –[কুরতুবী]

এ ছাড়া নারীদের কাছ থেকে যেসব বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে, নারীরা সাধারণত এসব বিষয়ে বিচ্যুতির শিকার হয়ে থাকে। এ কারণেও তাদের আনুগত্যের শপথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ –মহিলাদের জন্যে শপথের প্রথম বিষয় ছিল ঈমান অবলম্বন করা এবং শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সাধারণ পুরুষদের শপথেও ছিল। দ্বিতীয় বিষয় চুরি না করা। অনেক নারীই স্বামীর ধন-সম্পদ চুরি করতে অভ্যস্ত থাকে। তাই এটা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয় ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা। এতে নারীরা পাকাপোক্ত হলে পুরুষদের জন্যেও আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে যায়। চতুর্থ বিষয় নিজ সন্তানকে হত্যা না করা।

মূর্খতা যুগে কন্যাসন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করার প্রচলন ছিল। আয়াতে একে রোধ করা হয়েছে। পঞ্চম বিষয় মিথ্যা অপবাদ ও কলংক আরোপ না করা। এই নিষেধাজ্ঞার সাথে একথাও আছে যে, بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ অর্থাৎ নিজের হাত ও পায়ের মাঝখানে যেন অপবাদ আরোপ না করে। এর কারণ এই যে, কেয়ামতের দিন মানুষের হস্তপদই তার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের পাপকর্ম করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আমি চারজন সাক্ষীর মাঝখানে এই কাজ করছি। এরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

এখানে স্বামীর প্রতি অথবা অন্য যে কারও প্রতি অপবাদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা কাফেরের প্রতিও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হারাম। এমতাবস্থায় স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা আরও বেশি কঠোর গুনাহ হবে। স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপের এক প্রকার এই যে, স্ত্রী অন্য কোনো ব্যক্তির সন্তানকে স্বামীর সন্তানরূপে প্রকাশ করে এবং তার বংশভুক্ত করে দেয়। আরেক প্রকার এই যে, নাউযুবিল্লাহ, ব্যভিচারের ফলে যে গর্ভ সঞ্চার হয়, তাকে স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দেয়।

ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে একটি সাধারণ বিধি। তা এই যে, وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ অর্থাৎ তারা ভালো কাজে আপনার আদেশ অমান্য করবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কোনো কাজের আদেশ দিবেন, তা ভালো না হয়ে পারে না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চিত অসম্ভব। এমতাবস্থায় 'ভালোকাজে' কথাটি যুক্ত করার কারণ কি? এর এক কারণ তো এই যে, মুসলমানরা যেন ভালো করে বুঝে নেয় যে, আল্লাহর আদেশের বিপরীতে কোনো মানুষের আনুগত্য করা জায়েজ নয়; এমনকি, সেই মানুষটি যদি রাসূলও হন, তবুও নয়। তাই রাসূলের আনুগত্যের সাথেও এই শর্তটি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানে ব্যাপার নারীদের। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো আদেশেরই খেলাফ করবে না, এরূপ ব্যাপক আনুগত্যের কারণে শয়তান কারও মনে পথভ্রষ্টতার কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারত। এই পথ বন্ধ করার জন্যে শর্তটি যুক্ত করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُلْقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– প্রকাশ করতে থাক।

تُسِرُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْرَارٌ মূলবর্ণ (س ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা গোপনে কথাবার্তা বল।

اَخْفَيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْفَاءٌ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা গোপন করে থাক।

اَعْلَنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْلَانٌ মূলবর্ণ (ع ـ ل ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– প্রকাশ্যে করে থাক।

ضَلَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার ضَلَالٌ মূলবর্ণ (ض ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে সত্য পথ হতে সরে পড়ল।

يَثْقَفُوْكُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بإن বাব سَمِعَ মাসদার ثَقْفٌ মূলবর্ণ (ث – ق – ف) জিনস صحيح অর্থ– তারা তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারে।

اَلْسِنَةٌ : শব্দটি বহুবচন। একবচনে لسان অর্থ- রসনা সমূহ।

وَدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَدُّ মূলবর্ণ (و – د – د) জিনস মুরাক্কাব مضاعف ثلاثى এবং مثال واوى অর্থ– তারা এ কামনা করে।

بُرَءٰٓؤُا : শব্দটি বহুবচন ; একবচনে بَرِئٌ অর্থ- অসন্তুষ্ট। নাখোশ।

بَدَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَدْوُ মূলবর্ণ (ب – د – و) জিনস ناقص واوى অর্থ- প্রকাশিত হয়ে গেল।

يَرْجُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجَاءٌ মূলবর্ণ (ر – ج – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– বিশ্বাস রাখে। আশা করে। কামনা করে।

عَادَيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُعَادَاةُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমাদের শত্রুতা রয়েছে।

يَنْهٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَهْىٌ মূলবর্ণ (ن ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিষেধ করে।

لَمْ يُقَاتِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُقَاتَلَةٌ মূলবর্ণ (ق ـ ت ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা যুদ্ধ করেনি।

ظَاهَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُظَاهَرَةٌ মূলবর্ণ (ظ ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা সাহায্য করেছে।

مُهَاجِرَاتٍ : সীগাহ جمع مؤنث اسم فاعل বহছ باب مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُهَاجَرَةٌ মূলবর্ণ (ه - ج - ر) জিনস صحيح অর্থ– হিজরতকারিণীগণ।

اِمْتَحِنُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ باب اِفْتِعَالٌ মাসদার اِمْتِحَانٌ মূলবর্ণ (م - ح - ن) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও।

عَلِمْتُمُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكرحاضر ماضى معروف বহছ باب سَمِعَ মাসদার عِلْمٌ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে মনে কর।

اَنْ تَبَرُّوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر مضارع منصوب বহছ باب تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَرُّءٌ মূলবর্ণ (ب - ر - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তোমরা সদ্ব্যবহার কর।

اٰتُوْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ باب اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ- তোমরা দিয়ে দাও।

اٰتَيْتُمُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر ماضى معروف বহছ باب اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– তাদের কে দান কর।

اُجُوْرَهُنَّ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে اَجْرٌ অর্থ- তাদের মোহর। তাদের হক, প্রতিদান।

كَوَافِرِ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে كَافِرَةٌ অর্থ- একত্ববাদ অস্বীকার কারিণী মহিলাগণ।

عَاقَبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر ماضى معروف বহছ باب مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُعَاقَبَةٌ মূলবর্ণ (ع - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের পালা আসে।

لَا يَسْرِقْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب مضارع منفى معروف বহছ باب ضَرَبَ মাসদার سَرَقَةٌ মূলবর্ণ (س - ر - ق) জিনস صحيح অর্থ– আর না চুরি করবে।

لَا يَزْنِيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب مضارع منفى معروف বহছ باب ضَرَبَ মাসদার زِنَاءٌ মূলবর্ণ (ز - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আর না ব্যভিচার করবে।

لَا يَقْتُلْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب مضارع منفى معروف বহছ باب نَصَرَ মাসদার قَتْلٌ মূলবর্ণ (ق - ت - ل) জিনস صحيح অর্থ– আর না হত্যা করবে।

يَفْتَرِيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب مضارع معروف বহছ باب اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– দাবি করবে।

لَا يَعْصِيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب مضارع منفى معروف বহছ باب ضَرَبَ মাসদার عِصْيَانٌ মূলবর্ণ (ع - ص - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বিরুদ্ধাচারণ করবে না।

لَايَأْتِيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب مضارع منفى معروف বহছ باب ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ء - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ- আনবে না।

يَئِسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب ماضى معروف বহছ باب سَمِعَ মাসদার يَأْسٌ মূলবর্ণ (ى - ء - س) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং مثال يائى অর্থ– তারা নিরাশ হয়ে গেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ : এখানে واو টি হলো حاليه আর قَدْ হলো হরফে তাহকীক كَفَرُوْا হলো ফে'ল ও ফায়েল, আর এ বাক্য টি لَا تَتَّخِذُوْا বা تُلْقُوْنَ থেকে حال হয়েছে। আর بِمَا টা كَفَرُوْا -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর বাক্যটি সেলাহ আর مِّنَ الْحَقِّ হলো جَاءَكُمْ এর حال। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯০]

وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ : এখানে واو টি আতেফা। لَا تُمْسِكُوْا ফে'ল ও ফায়েল আর بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ টা تُمْسِكُوْا -এর সাথে متعلق হয়েছে।

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ

সূরা সাফ্‌ফ

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৪, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. সমস্ত বস্তু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, যা আসমানসমূহে আছে আর যা জমিনে আছে, আর তিনিই প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।	سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾
২. হে ঈমানদারগণ! এরূপ কথা কেন বলছ যা করো না?	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾
৩. আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির কারণ যে, তোমরা এরূপ কথা বল যা করো না।	كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٣﴾
৪. আল্লাহ তো ঐ সমস্ত লোককে ভালোবাসেন, যারা তার রাস্তায় এরূপ মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা একটি অট্টালিকা, যাতে সিসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে।	اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ﴿٤﴾
৫. আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত [রাসূলরূপে] আগমন করেছি;	وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ

শাব্দিক অনুবাদ :

১. سَبَّحَ لِلّٰهِ সমস্ত বস্তু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে مَا فِي السَّمٰوٰتِ যা আসমান সমূহে আছে وَمَا فِي الْاَرْضِ আর যা জমিনে আছে وَهُوَ الْعَزِيْزُ আর তিনিই প্রবল প্রতাপশালী الْحَكِيْمُ প্রজ্ঞাময়।

২. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ لِمَ تَقُوْلُوْنَ এরূপ কথা কেন বলছ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ যা করো না।

৩. كَبُرَ مَقْتًا এটা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির কারণ عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ তোমরা এরূপ কথা বল যা করো না

৪. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ আল্লাহ তো ঐ সমস্ত লোককে ভালোবাসেন الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ যারা যুদ্ধ করে فِيْ سَبِيْلِهٖ তাঁর রাস্তায় صَفًّا এরূপ মিলিত হয়ে كَاَنَّهُمْ যেন তারা بُنْيَانٌ একটি অট্টালিকা مَّرْصُوْصٌ যাতে সিসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

৫. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায় لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ অথচ তোমরা জান যে, اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত (রাসূলরূপে) আগমন করেছি;

অনুবাদ	আয়াত
** অনন্তর যখন তারা বক্রই রইল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে আরো বক্র করে দিলেন; আর আল্লাহ এরূপ অবাধ্যদেরকে হেদায়েত দান করেন না।	فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۵﴾
৬. আর যখন মারইয়ামের পুত্র ঈসা বললেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত (রাসূল)-রূপে আগমন করেছি, আমি সত্যতা প্রতিপাদনকারী– আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের এবং আমার পরে যে একজন রাসূল আগমন করবেন, আমি তার সুসংবাদ প্রদানকারী, যার নাম আহমদ হবে; অনন্তর যখন তিনি তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাবলি আনলেন, তখন তারা বলতে লাগল, এটা স্পষ্ট জাদু।	وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۶﴾
৭. আর সে ব্যক্তি হতে অধিক জালিম কে হবে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তাকে ইসলামের প্রতিই আহ্বান করা হচ্ছে; আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ জালিমদেরকে হেদায়েত দান করেন না।	وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۷﴾
৮. তারা চায় যে, আল্লাহর নূরকে (দীন-ইসলামকে) নিজেদের মুখ দ্বারা নির্বাপিত করে অথচ আল্লাহ তা'আলা নিজ নূরকে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌছিয়ে ছাড়বেন, চাই কাফেররা যতই অসন্তুষ্ট হউক না কেন।	يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** فَلَمَّا زَاغُوْا অনন্তর যখন তারা বক্রই রইল اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ তখন আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে আরো বক্র করে দিলেন وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ, আর আল্লাহ এরূপ অবাধ্যদেরকে হেদায়েত দান করেন না।

৬. وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ, আর যখন মারইয়ামের পুত্র ঈসা বললেন يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ হে বনী ইসরাঈল اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রাসূলরূপে আগমন করেছি مُصَدِّقًا আমি সত্যতা প্রতিপাদনকারী لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের وَمُبَشِّرًا এবং তাঁর সুসংবাদ প্রদানকারী بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِي আমার পরে যে একজন রাসূল আগমন করবেন اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ যার নাম আহমদ হবে فَلَمَّا جَآءَهُمْ অনন্তর যখন তিনি তাদের নিকট আনয়ন করলেন بِالْبَيِّنٰتِ স্পষ্ট নিদর্শনাবলি قَالُوْا তখন তারা বলতে লাগল هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা স্পষ্ট জাদু।

৭. وَمَنْ اَظْلَمُ, আর সেই ব্যক্তি হতে অধিক জালিম কে হবে مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ অথচ তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ জালিমদেরকে হেদায়েত দান করেন না।

৮. يُرِيْدُوْنَ তারা চায় যে لِيُطْفِـُٔوْا নির্বাপিত করে نُوْرَ اللّٰهِ আল্লাহর নূরকে بِاَفْوَاهِهِمْ নিজেদের মুখ দ্বারা وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ, অথচ আল্লাহ তা'আলা নিজ নূরকে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌছিয়ে ছাড়বেন وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ, চাই কাফেররা যতই অসন্তুষ্ট হউক না কেন।

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٩﴾	৯. সে আল্লাহ এমন, যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়েত এবং সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তাকে সকল ধর্মের উপর প্রভাবশালী করে দেন, চাই মুশরিকরা যতই অসন্তুষ্ট হউক।
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿١٠﴾	১০. হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসার কথা বলে দিব–যা তোমাদেরকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তি হতে রক্ষা করবে?
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾	১১. (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ কর; এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা কিছু জ্ঞান রাখ।
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾	১২. আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে আর উত্তম গৃহসমূহে (দাখিল করবেন) যা সর্বদা অবস্থানের উদ্যানসমূহে হবে; এটা বিরাট সফলতা।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. هُوَ الَّذِىْ সেই আল্লাহ এমন اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ যিনি স্বীয় রাসূলকে প্রেরণ করেছেন بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ হেদায়েত এবং সত্য ধর্ম দিয়ে لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ যেন তাকে সকল ধর্মের উপর প্রভাবশালী করে দেন وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ চাই মুশরিকরা যতই অসন্তুষ্ট হউক।

১০. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসার কথা বলে দিব تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ যা তোমাদেরকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তি হতে রক্ষা করবে।

১১. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কর بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা কিছু জ্ঞান রাখ।

১২. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً আর উত্তম গৃহসমূহে فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ যা সর্বদা অবস্থানের উদ্যানসমূহে হবে ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এটা বিরাট সফলতা।

১৩. এবং অন্য আর একটি (প্রতিদান)-ও রয়েছে তোমরা তা পছন্দ কর; (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং দ্রুত বিজয়; আর আপনি মুমিনগণকে সুসংবাদ প্রদান করুন।	وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾
১৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর (ধর্মের) সাহায্যকারী হও, যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম হাওয়ারীগণকে বললেন যে, আল্লাহ তা'আলার পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? সেই হাওয়ারীগণ বলল, আমরা আল্লাহ তা'আলার পথে সাহায্যকারী হলাম, অতঃপর বনী ইসরাঈলদের মধ্য হতে কতক লোক ঈমান আনল, আর কতক লোক কাফের থেকে গেল, সুতরাং আমি মু'মিনদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় সাহায্য করলাম, ফলতঃ তারা বিজয়ী হলো।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا এবং অন্য আর একটি (প্রতিদান) ও রয়েছে তোমরা তা পছন্দ কর نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ এবং দ্রুত বিজয় وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ আর আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন।

১৪. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহর (ধর্মের) সাহায্যকারী হও كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম বললেন যে لِلْحَوَارِيّٖنَ হাওয়ারীগণকে مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ সেই হাওয়ারীগণ বলল نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ আমরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী হলাম فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ অতঃপর বনী ইসরাঈলদের মধ্য হতে কতক লোক ঈমান আনল وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ আর কতক লোক কাফের থেকে গেল فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا সুতরাং আমি মুমিনদেরকে সাহায্য করলাম عَلٰى عَدُوِّهِمْ তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ফলতঃ তারা বিজয়ী হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার চতুর্থ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا এখানকার صَفّ শব্দটি হতে অত্র সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা 'আস্ সাফ্‌ফ' তথা এ সূরায় উল্লিখিত 'সাফ্‌ফ' শব্দের মাধ্যমে একে صَفّ নামে নামকরণ করা হয়েছে। আল্লামা আলুসী (র.) লিখেছেন যে, এ সূরার অপর নাম হলো সূরাতুল হাওয়্যারিয়্যীন এবং একে সূরাতু ঈসাও বলা হয়। এতে ২ রুকূ', ১৪টি আয়াত ২২১টি বাক্য এবং ৯২৬টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কুরআন]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে এ সূরাটির নাজিল হওয়ার সময়কাল জানা যায়নি; কিন্তু এর বিষয়বস্তু হতে অনুমান করা যায়, সম্ভবত সূরাটি উহুদ যুদ্ধের সমসাময়িক কালে নাজিল হয়ে থাকবে। কেননা এতে যে অবস্থাবলির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তা এ সময়ই বিরাজ করছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু : ১-৪ আয়াত কয়টি ঈমানের ক্ষেত্রে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা গ্রহণ এবং আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৫-৭ আয়াত পর্যন্ত রাসূলে কারীম ﷺ -এর উম্মতকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তোমাদের রাসূল ও তোমাদের দীন ইসলামের সাথে তোমাদের সেরূপ আচরণ হওয়া উচিত নয় যা হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর সাথে বনী ইসরাঈলের লোকেরা অবলম্বন করেছিল।

৮-৯ আয়াতে পুনঃ বলিষ্ঠতা সহকারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদি, খ্রিস্টান ও তাদের সাথে যোগ-সাজশকারী মুনাফিকরা আল্লাহর এ নূরকে চিরতরে নির্বাপিত করার জন্য যত চেষ্টাই করুক না কেন এটা পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে দুনিয়ায় বিস্তার ও প্রসার লাভ করতে থাকবেই। আর মুশরিকদের পক্ষে যতই অসহ্য ব্যাপার হোক না কেন মহান রাসূলের প্রচারিত দীন ইসলাম অন্যান্য প্রত্যেকটি দীন ও ধর্মের উপর পূর্ণ মাত্রায় বিজয়ী হবেই।

১০-১৩ আয়াতে ঈমানদার লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভের একটি মাত্র উপায় আছে। তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সত্যিকারভাবে এ ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল নিয়োগ করে জিহাদ করা। পরকালে এটার ফলশ্রুতিতে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং চির সুখের জান্নাত পাওয়া যাবে, আর দুনিয়াতেও বিজয় ও সাফল্য পাওয়া যাবে।

১৪ নম্বর আয়াতে ঈমানদার লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীরা যেভাবে আল্লাহর পথে তাঁকে সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে মু'মিনরাও যেন আল্লাহর আনসার ও সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে কাফেরদের মোকাবিলায় তারাও ঠিক তেমনি আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করতে পারবে, যেমন আগের কালের ঈমানদার লোকেরা লাভ করেছিল।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ (٢)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী একবার এক সঙ্গে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। আমরা বললাম, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি তা যদি জানতে পারতাম তবে তা আমরা করতাম। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন। (তিরমিযী শরীফ ২:১৬৯)

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ (٨)

শানে নুযূল ঃ একদা চল্লিশ দিন পর্যন্ত নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ওহী প্রেরণ বন্ধ ছিল। তখন কাব বিন আশরাফ ইহুদিদের কাছে যেয়ে বলতে থাকে যে, হে ইহুদি সম্প্রদায় তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, আল্লাহ পাক মুহাম্মদ ﷺ -এর নূরকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। আর ইসলাম ধর্ম শেষ হতে চলছে। এ কথার কারণে মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগল। তখন আল্লাহ পাক নবীজীর প্রতি এই আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী ১৮:৮৫)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (١٠)

শানে নুযূল ঃ যখন লোকেরা বলাবলি করছিল যে, হায় আমরা যদি জানতে পারতাম যে, কোন আমলটি আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে উত্তম ও কোনটি তিনি সর্বাধিক পছন্দ করেন তাহলে আমরা তাই করতাম। তখন এই আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়। কিন্তু কতিপয় লোক জিহাদের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করায় لِمَا تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। -(সূত্র কানযুন নুকূল : ১০০)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُوْنُوْآ أَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنْ أَنْصَارِيْ إِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ فَآمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوْا ظَاهِرِيْنَ- (١٤)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা কুরতুবী (র.) আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত ঈসা (আ.) -এর পক্ষ হতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত ব্যক্তিগণের বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা করার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত ঈসা (রা.) তাদেরকে যে সকল অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন, সে সকল হচ্ছে ত্বারস ও বূলাস রোমে, আন্দারায়েস ও মাছাক যে জনপদের অধিবাসীরা মানুষ খেত সে জনপদে, তোমাসক পাশ্চাত্যের অন্তরগত বাবেল

নগরীতে, ফীলাবাসক আফ্রিকার কুর্তাজান্নায়, ইউহান্নাসক, আসহাবে কাহাফের নগরী দিকয়ানুস, ইয়া'কুবাসক, আওয়ারশালীম বায়তুল মুকাদ্দাসে, ইবনে তিলমাক আরব তথা হিজাযে, সামীনক বার্বারে এবং ইয়াহূদা ও বারদাসক ইস্কান্দার ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রেরণ করেন। সুতরাং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজ শত্রু বাহিনীর মোকাবিলায় বিজয় দান করেছেন। তাঁদের বিজয় গাঁথা দাস্তান বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -(কুরতুবী ৮০/১৮)

তিরমিযী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একদল সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। আল্লামা বগভী (র.) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্জন্যে জান ও মাল সর্ব বিসর্জন করতাম। –(মাযহারী)

ইবনে-কাসীর মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যে প্রেরণ করতে চাইলেন, কিন্তু কারও সাহস হলো না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। (ফলে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।) তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে সমগ্র সূরা ছফ্ পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাজিল হয়েছিল।

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহর পথে জেহাদ। তাঁরা এ সম্পর্কে যেসব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপণ করার দাবি উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কেও সূরায় সাথে সাথে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোনো মুমিনের জন্যে এ ধরনের বুলি আওড়ানো দুরস্ত নয়। কারণ যথাসময়ে সে তার সংকল্প পূর্ণ করতে পারবে কি না, তা তার জানা নেই। সংকল্প পূর্ণ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং বাধা অপসারিত হওয়া তার ক্ষমতাধীন নয়। এছাড়া স্বয়ং তার হাত, পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি আন্তরিক সংকল্পও তার কব্জায় নয়। এ কারণেই কুরআন পাকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আগামীকালের করণীয় কাজ বর্ণনা করতে হলে ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ যদি আল্লাহ চান বলে করবেন। বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ সাহাবায়ে কেরামের নিয়ত ও ইচ্ছা বুলি আওড়ানো না হলেও দৃশ্যত ঃ তাই বোঝা যাচ্ছিল। আল্লাহর কাছে এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ কোনো কাজ করার বড় গলায় দাবি করবে, ইনশাআল্লাহ বলা ব্যতীত। মোটকথা, তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না, তা করার দাবি কর কেন? এতে এ ধরনের কাজের দাবি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বোঝা গেল, যা করার ইচ্ছাই মানুষের অন্তরে নেই। কারণ এটা একটা মিথ্যা দাবি বৈ নয়, যা নাম ও যশ অর্জনের খাতিরে হতে পারে। বলাবাহুল্য, উপরিউক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কেরাম যে দাবি করেছিলেন, তা না করার ইচ্ছায় ছিল না। কাজেই এটাও আয়াতের অর্থে অন্তর্ভুক্ত যে, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল্প থাকলেও নিজের উপর ভরসা করে কোনো কাজ করার দাবি করা দাসত্বের পরিপন্থি। প্রথমত ঃ তা বলারই প্রয়োজন নেই। কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করা উচিত। কোনো উপযোগিতাবশত ঃ বলার দরকার হলেও ইনশাআল্লাহ সহ বলতে হবে। তাহলে এটা আর দাবি থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যে কাজ করার ইচ্ছাই নেই, সে কাজের দাবি করা কবীরা গুনাহ এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। যে ক্ষেত্রে অন্তরে কাজটি করার ইচ্ছা থাকে, সেখানেও নিজের শক্তি ও ক্ষমতার উপর ভরসা করে দাবি করা নিষিদ্ধ ও মাকরূহ।

দাবি ও দাওয়াতের পার্থক্য : উপরিউক্ত তাফসীর থেকে জানা গেল যে, দাবির সাথে এসব আয়াত সম্পৃক্ত অর্থাৎ মানুষ যে কাজ করবে না; তা করার দাবি করা আল্লাহ তা'আলার কাছে অসন্তোষজনক। মানুষ যে সৎ কাজ নিজে করে না, সেই সৎ কাজের দাওয়াত, প্রচার ও উপদেশ অন্যকে দেওয়ার বিষয়টি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ সম্পর্কিত বিধি বিধান অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। উদাহরণত কুরআন বলে :

اَتَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ : অর্থাৎ তোমরা মানুষকে তো সৎ কাজের আদেশ কর, কিন্তু নিজেকে ভুলে যাও অর্থাৎ নিজে এই সৎ কাজ কর না। এই আয়াতদ্বয় সৎ কাজের আদেশ ও ওয়াজ উপদেশ দাতাদেরকে লজ্জা দিয়েছে যে, অন্যকে তো সৎ কাজ করার দাওয়াত দাও, কিন্তু নিজে তা কর না, এটা লজ্জার কথা। উদ্দেশ্য এই যে, অপরকে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজেকে উপদেশ দাও এবং অপরকে যে কাজ করতে বল, নিজেও তা কর।

কিন্তু একথা বলা হয়নি যে, নিজে যখন কর না, তখন অপরকেও করতে বলো না। এ থেকে জানা গেল যে, যে সৎ কাজ নিজে করার সাহস ও তাওফীক নেই, তার প্রতি অপরকে উদ্বুদ্ধ করতে ও উপদেশ দিতে ক্রটি করা উচিত নয়। আশা করা যায় যে, এই উপদেশের কল্যাণে কোনো সময় তার নিজেরও এ কাজ করার তাওফীক হয়ে যাবে। বিস্তর অভিজ্ঞতা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে সে কাজটি যদি ওয়াজিব অথবা সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ্ পর্যায়ের হয়, তবে উপরিউক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে মনে মনে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়াও ওয়াজিব। মোস্তাহাব পর্যায়ের হলে অনুতাপ করাও মোস্তাহাব।

পরের আয়াতে এই সূরা অবতরণের আসল কারণ বিবৃত হয়েছে; অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ অর্থাৎ যুদ্ধের সেই কাতার আল্লাহ কাছে প্রিয়, যা আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলায় তাঁর বাণী সমুন্নত করার জন্যে কায়েম করা হয় এবং মুজাহিদদের অসাধারণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার কারণে তা একটি সীসা লাগানো দুর্ভেদ্য প্রাচীরের রূপ পরিগ্রহ করে।

এরপর হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর আল্লাহর পথে জেহাদ এবং শত্রুদের নির্যাতন সহ্য করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর পুনরায় মুসলমানদেরকে জেহাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখানে বর্ণিত হযরত মূসা ও ঈসার (আ.) ঘটনাবলিতেও অনেক শিক্ষাগত ও কর্মগত উপকারিতা এবং দিক নির্দেশ রয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর কাহিনীতে আছে যে, তিনি যখন বনী-ইসরাঈলকে তাঁর নবুয়ত মেনে নেওয়ার ও আনুগত্য করার দাওয়াত দেন, তখন বিশেষভাবে দু'টি বিষয় উল্লেখ করেন। (এক) তিনি কোনো অভিনব রাসূল নন এবং অভিনব বিষয় নিয়ে আগমন করেননি বরং এমনসব বিষয় নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এ পর্যন্ত বলে এসেছেন এবং পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবে উল্লিখিত আছে। পরে যে সর্বশেষ পয়গম্বর আগমন করবেন, তিনিও এ ধরনের দিকনির্দেশনা নিয়ে আসবেন।

এখানে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ বনী-ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ নিকটতম কিতাব একটিই ছিল। নতুবা পয়গম্বরগণ পূববর্তী সব কিতাবেরই সত্যায়ন করেছেন। এ ছাড়া এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়ত যদিও স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু তার অধিকাংশ বিধি-বিধান হযরত মূসা (আ.)–এর শরিয়ত ও তাওরাতের অনুরূপ। স্বল্পসংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র।

হযরত ঈসা (আ.) দ্বিতীয় বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরে আগমনকারী রাসূলের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর দিক নির্দেশও তদনুরূপ হবে। তাই তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বুদ্ধি এবং সততার দাবি। সাথে সাথে তিনি বনী ইসরাঈলকে পরে আগমনকারী রাসূলের নাম-ঠিকানাও ইঞ্জীলে বলে দিয়েছেন। এভাবে বনী-ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যখন আগমন করবেন, তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ বাক্যে তাই বর্ণিত হয়েছে। এতে সেই রাসূলের নাম বলা হয়েছে আহমদ। আমাদের প্রিয় শেষনবী ﷺ-এর মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। কিন্তু ইঞ্জীলে তাঁর নাম আহমদ উল্লেখ করার উপযোগিতা সম্ভবত ঃ এই যে, আরবে প্রাচীনকাল থেকেই মুহাম্মদ নাম রাখার প্রচলন ছিল। ফলে এই নামের আরও লোক আরবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আহমদ নাম আরবে প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল না। এটা একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরই বিশেষ নাম ছিল।

ইঞ্জীলে রাসূলে কারীম ﷺ-এর সুসংবাদ : একথা সুবিদিত এবং স্বয়ং ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের বিষয়বস্তু বিকৃত হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই কিতাবদ্বয়ে এত বেশি পরিবর্তন হয়েছে যে, এখন প্রকৃত কালাম চিনাও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বর্তমান বিকৃত ইঞ্জীলের ভিত্তিতে আজকালকার খ্রিস্টানরা কুরআনের এই বক্তব্য স্বীকার করে না যে, ইঞ্জীলে কোথাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম আহমদ উল্লেখ করে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাফসীরে মারেফুল কুরআনের সার-সংক্ষেপে এর সংক্ষিপ্ত ও যথেষ্ট জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে।

বিস্তারিত জওয়াবের জন্য হযরত মাওলানা 'রহমতুল্লাহ' কেরানভীর কিতাব 'ইজ-হারুল হক' পাঠ করা দরকার। এটা খ্রিস্টধর্মের স্বরূপ, ইঞ্জীলে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুসংবাদ ইঞ্জীল বিদ্যমান থাকা সম্পর্কেও একটা নযীরবিহীন কিতাব। বড় বড় খ্রিস্টান পণ্ডিতদের এই উক্তিও মুদ্রিত আছে যে, এই কিতাব প্রকাশিত হতে থাকলে কখনও খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হতে পারবে না।

এই কিতাব আরবি ভাষায় লিখিত হয়েছিল। পরে তুর্কী এবং ইংরেজি ভাষায়ও এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি দারুল উলূম করাচী থেকে এর উর্দূ অনুবাদও তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

এই আয়াতে ঈমান এবং ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ বাণিজ্যে যেমন কিছু ধন-সম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহর পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী নিয়ামত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস-ব্যসনের সরঞ্জাম থাকবে। অতঃপর পরকালীন নিয়ামতের সাথে কিছু ইহকালীন নিয়ামতেরও ওয়াদা করা হয়েছে ঃ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ : এখানে وَاُخْرٰى শব্দটি نِعْمَتٌ এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নিয়ামাত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই; ইহকালেও একটি নগদ নিয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অর্থাৎ শত্রুদের বিজিত হওয়া। এখানে قَرِيْبٌ শব্দটি পরকালের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত قَرِيْبٌ ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খয়বর বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়। تُحِبُّوْنَهَا অর্থাৎ তোমরা এই নগদ নিয়ামত খুব পছন্দ কর। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে। কুরআনে বলা হয়েছে। وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا অর্থাৎ মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে। এর অর্থ এই নয় যে, পরকালীন নিয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নিয়ামত তো তাদের প্রিয় কাম্যই, কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নিয়ামতও তারা দুনিয়াতে চায়। তাও দেওয়া হবে।

كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ :

حَوَارِيّٖنَ শব্দটি حَوَارِىٌّ এর বহুবচন। -এর অর্থ আন্তরিক বন্ধু। যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে حَوَارِىٌّ বলা হতো। সূরা আলে-ইমরানে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল বার জন। এই আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলের একটি ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে দীনের সাহায্যের জন্যে তৈরি হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেন ঃ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন প্রচারে কে আমার সাহায্যকারী হবে? প্রত্যুত্তরে বার জন লোক আনুগত্যের শপথ করে এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অতএব মুসলমানদেরকেও আল্লাহর দ্বীন প্রচারে সাহায্যকারী হওয়া উচিত।

فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ :

খ্রিস্টানদের তিন দল ঃ আল্লামা বগভী (র.) এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা (আ.) আসমানে উত্থিত হওয়ার পর খ্রিস্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল বলল ঃ তিনি আল্লাহ ছিলেন এবং আসমানে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দল বলল : তিনি আল্লাহ খোদা ছিলেন না বরং খোদার পুত্র ছিলেন। এখন আল্লাহ তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শত্রুদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ ও সত্যকথা বলল তারা বলল ঃ তিনি আল্লাহও ছিলেন না, আল্লাহর পুত্রও ছিলেন না; বরং আল্লাহর দাস ও রাসূল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শত্রুদের কবল থেকে হেফাজত ও উচ্চ মর্তবা দান করার জন্যে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তারাই ছিল সত্যিকার ঈমানদার। প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণও যোগদান করে এবং পারস্পরিক কলহ বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে উভয় কাফের দল মুমিনদের মোকাবিলায় প্রবল হয়ে উঠে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ পয়গম্বর রাসূল ﷺ-কে প্রেরণ করেন। তিনি মুমিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবে পরিণামে মুমিন দল যুক্তি প্রমাণের নিরীখে বিজয়ী হয়ে যায়। –(মাযহারী)

এই তাফসীর অনুযায়ী اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মতের মুমিনগণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহায্য ও সমর্থনে বিজয়গৌরব অর্জন করবে। –(মাযহারী) কেউ কেউ বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ.)-এর আসমানে উত্থিত হওয়ার পর খ্রিস্টানদের মধ্যে দুদল হয়ে যায়। একদল হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করে মুশরিক হয়ে যায় এবং অপরদল বিশুদ্ধও খাঁটি দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর দাস ও রাসূল মান্য করে। এরপর মুশরিক ও মুমিন দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে কাফের দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। কিন্তু একথাই প্রসিদ্ধ যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মে জেহাদ ও যুদ্ধের বিধান ছিল না। তাই মুমিন দলের যুদ্ধ করার কথা অবান্তর মনে হয়। –(রূহুল-মা'আনী) উপরে এর জওয়াবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্ভবত ঃ যুদ্ধের সূচনা কাফের খ্রিস্টান দলের পক্ষ থেকে হয়েছিল এবং মুমিনরা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা প্রকৃতপক্ষে জেহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পড়ে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

سَبَّحَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ- আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করা।

كَبُرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ كِبَارَةٌ বাব سَمِعَ . كَرُمَ মাসদার كَبُرٌ মূলবর্ণ (ك - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– অত্যন্ত। বড় হয়েছে।

مَرْصُوْصٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّصُّ মূলবর্ণ (ر – ص – ص) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সিসা ঢালাই। মজবুত।

تُؤْذُوْنَنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْذَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ذ - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ–আমাকে কষ্ট দিচ্ছ।

زَاغُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার زَيْغٌ মূলবর্ণ (ز – ى – غ) জিনস اجوف يائى অর্থ– বক্র রইল।

اَزَاغَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِزَاغَةٌ মূলবর্ণ (ز - ى – غ) জিনস اجوف يائى অর্থ– বক্র করে দিলেন।

قَالَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার قَوْلٌ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে বলল।

مُصَدِّقًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْدِيْق মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ– সত্যতা প্রতিপাদনকারী।

مُبَشِّرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْشِيْرٌ মূলবর্ণ (ب - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– সুসংবাদ প্রদানকারী।

يَاْتِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ء - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– আগমন করবেন।

اِفْتَرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف – ر – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– মিথ্যা আরোপ করে।

يُدْعٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার دَعْوَةٌ মূলবর্ণ (د – ع – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আহবান করা হচ্ছে।

لِيُطْفِئُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطْفَاءً মূলবর্ণ (ط - ف - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– নির্বাপিত করে।

اَفْوَاهِهِمْ : শব্দটি বহুবচন : একবচন فَمٌ অর্থ– নিজেদের মুখ।

يُرِيْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা চায়।

مُتِمٌّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتْمَامٌ মূলবর্ণ (ت - م - م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পূর্ণতা পর্যন্ত পৌছিয়ে ছাড়বেন।

كَرِهَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার كَرَاهِيَةً মূলবর্ণ (ك - ر - ه) জিনস صحيح অর্থ– অসন্তুষ্ট হউক।

لِيُظْهِرَهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِظْهَارٌ মূলবর্ণ (ظ - ه - ر) জিনস صحيح অর্থ– প্রভাবশালী করে দেন।

اَدُلُّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার دَلَالَةً মূলবর্ণ (د - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমি বলে দিব।

تُنْجِيْكُمْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْجَاءً মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমাদেরকে রক্ষা করবে।

اٰمَنَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মূলবর্ণ (ء - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– ঈমান আনল।

اَيَّدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَائِيْدٌ মূলবর্ণ (ء - ى - د) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى এবং مهموز فاء অর্থ- আমি সাহায্য করলাম। শক্তিশালী করলাম।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ : এখানে فاء টি হলো আতেফা। আর اَيَّدْنَا হলো ফে'ল ও ফায়েল। আর عَلٰى عَدُوِّهِمْ টা اَيَّدْنَا-এর সাথে متعلق আর হলো الَّذِيْنَ আর مفعول به আর اٰمَنُوْا বাক্যটি সেলাহ। আর হয়েছে। فَاَصْبَحُوْا টা فَاَيَّدْنَا-এর উপর আতফ হয়েছে। اَصْبَحُوْا ফেলে নাকেস যমীর হলো اسم ناقص আর ظَاهِرِيْنَ হলো خبر ناقص অর্থাৎ غَالِبِيْنَ قَاهِرِيْنَ –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ৫১৮]

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা জুমু'আহ

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১১, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যা আসমানসমূহ ও জমিনের মধ্যে আছে, সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, যিনি বাদশাহ পবিত্র– মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾
২. তিনিই উম্মি লোকদের মধ্যে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য হতে প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, আর তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন, আর এরা পূর্ব হতে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল,	هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢﴾
৩. আর (উপস্থিতগণ ব্যতীত) অন্যান্য লোকদের জন্যও –যারা তাদের সাথে শামিল হবে, কিন্তু এখনো শামিল হয়নি; আর তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ যা আসমানসমূহ ও জমিনের মধ্যে আছে الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ যিনি বাদশাহ পবিত্র الْعَزِيْزِ মহাপরাক্রান্ত الْحَكِيْمِ প্রজ্ঞাময়।

২. هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ তিনিই প্রেরণ করেছেন فِي الْاُمِّيّٖنَ উম্মি লোকদের মধ্যে رَسُوْلًا একজন রাসূল مِّنْهُمْ তাদেরই মধ্য হতে يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনান وَيُزَكِّيْهِمْ আর তাদেরকে পবিত্র করেন وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ আর এরা পূর্ব হতে ছিল لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে।

৩. وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ আর অন্যান্য লোকদের জন্যও لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ যারা তাদের সাথে শামিল হবে, কিন্তু এখনও শামিল হয়নি وَهُوَ الْعَزِيْزُ আর তিনি মহাপরাক্রান্ত الْحَكِيْمُ প্রজ্ঞাময়।

অনুবাদ	আয়াত
৪. এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করে থাকেন; আর আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল।	ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٤﴾
৫. যাদেরকে তাওরাত কিতাব অনুসারে আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অতঃপর তারা তদনুসারে আমল করেনি, তাদের অবস্থা সে গাধার অবস্থার ন্যায়– যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করেছে; ঐ সম্প্রদায়ের অবস্থা নিকৃষ্ট–যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অবিশ্বাস করেছে; আর আল্লাহ এরূপ জালিমদেরকে হেদায়েত দান করেন না।	مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾
৬. আপনি বলে দিন, হে ইহুদিগণ! যদি তোমাদের দাবি এই হয় যে, অন্যান্য মানুষ ব্যতীত শুধু তোমরাই আল্লাহর প্রিয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾
৭. আর তারা কখনো এটার কামনা করবে না, সে আমলসমূহের দরুন যা তারা নিজ হস্তে সঞ্চয় করেছে; আর এ জালিমদের বিষয় আল্লাহর খুব জানা আছে।	وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٧﴾
৮. আপনি বলে দিন, যে মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করছ, তা (একদিন) তোমাদেরকে এসে পাকড়াও করবে,	قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ তিনি যাকে ইচ্ছা এই অনুগ্রহ দান করে থাকেন وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ আর আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল।

৫. مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ যাদেরকে তাওরাত কিতাব অনুসারে আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا অতঃপর তারা তদনুসারে আমল করেনি كَمَثَلِ الْحِمَارِ তাদের অবস্থা সেই গাধার অবস্থার ন্যায় يَحْمِلُ اَسْفَارًا যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করে আছে بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ কওমের অবস্থা নিকৃষ্ট الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অবিশ্বাস করেছে وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ এরূপ জালিমদেরকে হেদায়েত দান করেন না।

৬. قُلْ আপনি বলে দিন يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا হে ইহুদিগণ اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ তোমাদের দাবি এই হয় যে, শুধু তোমরাই আল্লাহর প্রিয় مِنْ دُوْنِ النَّاسِ অন্যান্য মানুষ ব্যতীত فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৭. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًا আর তারা কখনো এটার কামনা করবে না بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ সেই আমলসমূহের দরুন যা তারা নিজ হস্তে সঞ্চয় করেছে وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ আর এই জালিমদের বিষয় আল্লাহর খুব জানা আছে।

৮. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ যে মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করছ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ তা তোমাদেরকে এসে পাকড়াও করবে,

ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

** অতঃপর তোমাদেরকে গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞাতা (আল্লাহ)-র নিকটে উপস্থিত করা হবে, অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মসমূহ জানিয়ে দিবেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

৯. হে ঈমানদারগণ! যখন জুমার দিনে (জুমার) নামাজের জন্য আজান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর; এটা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম, যদি তোমাদের কিছু জ্ঞান থাকে।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. অনন্তর যখন নামাজ সমাপ্ত হয়, তখন তোমরা জমিনের উপর চলাফেরা কর এবং আল্লাহর (প্রদত্ত) জীবিকা অন্বেষণ কর এবং (তাতেও) আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে থাক, যেন তোমাদের সফলতা লাভ হয়।

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْۤا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١﴾

১১. আর যখন তারা কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা মগ্ন হওয়ার মতো (বস্তু) দেখতে পায়, তখন তার দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য ছড়িয়ে পড়ে, আর আপনাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছেড়ে যায়; আপনি বলে দিন, যে বস্তু (ছওয়াব ও নৈকট্য লাভ) আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা এরূপ মগ্নতা ও ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম; আর (যদি এটা হতে অধিকতর জীবিকার লালসা হয়, তবে জেনে রাখ যে,) আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম জীবিকা প্রদানকারী।

শাব্দিক অনুবাদ :

** ثُمَّ تُرَدُّوْنَ অতঃপর তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ তোমাদেরকে গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয় সমূহের জ্ঞাতা (আল্লাহ)-র নিকটে فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সমূহ জানিয়ে দিবেন।

৯. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে মুমিনগণ اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ যখন নামাজের জন্য আজান দেওয়া হয় مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ জুমার দিনে فَاسْعَوْا তখন তোমরা ধাবিত হও اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ আল্লাহর জিকিরের দিকে وَذَرُوا এবং ত্যাগ কর الْبَيْعَ ক্রয়-বিক্রয় ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এটা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমাদের কিছু জ্ঞান থাকে।

১০. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ অনন্তর যখন নামাজ সমাপ্ত হয় فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ তখন তোমরা জমিনে চলাফেরা কর وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর (প্রদত্ত) জীবিকা অন্বেষণ কর وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে থাক لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ যেন তোমাদের সফলতা লাভ হয়।

১১. وَاِذَا رَاَوْا যখন তারা দেখতে পায় تِجَارَةً ব্যবসা-বাণিজ্য اَوْ لَهْوًا কিংবা মগ্ন হওয়ার মতো (বস্তু) انْفَضُّوْۤا اِلَيْهَا তখন তার দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য ছড়িয়ে পড়ে وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا, আর আপনাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছেড়ে যায় قُلْ আপনি বলে দিন مَا عِنْدَ اللّٰهِ যে বস্তু আল্লাহর নিকট রয়েছে خَيْرٌ তা বহুগুণে উত্তম مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ এরূপ মগ্নতা ও ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ, আর আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম জীবিকা প্রদানকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : নবম আয়াতের অংশ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ হতে এ সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। এ সূরায় জুমার সালাতের বিধানও উল্লিখিত হয়েছে বটে, কিন্তু এটাতে আলোচিত বিষয়াদির দৃষ্টিতে 'জুমুআহ' তার সামষ্টিক শিরোনাম নয়, অন্যান্য সূরার মতো এখানেও একটি চিহ্ন হিসেবেই এ নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত; ১৮০টি বাক্য এবং ৭৪৮টি অক্ষর রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং বনী ইসরাঈল জাতিকে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗ أَحْمَدُ

আর অত্র সূরা মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পর রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রেরিত হওয়ার কথা ইরশাদ হয়েছে যে– هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ الخ

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরার প্রথম রুকূর আয়াতসমূহ সপ্তম হিজরিতে নাজিল হয়েছে। আর সম্ভবত এটা 'খায়বার' বিজয়কালে কিংবা তারপর নিকটবর্তী সময়ে নাজিল হয়েছে। ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে জারীর (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর দরবারে বসা অবস্থায় ছিলাম, সে সময়ই এ আয়াত নাজিল হয়েছে। আর ইতিহাস হতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সম্পর্কে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি হুদায়বিয়া সন্ধির পর ও খায়বার বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী খায়বার বিজয় সপ্তম হিজরির মহররমে আর ইবনে সা'দের বর্ণনানুযায়ী (ঐ বছরের) জামাদিউল আউয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অতএব, অনুমান করা যায়, ইহুদিদের এ সর্বশেষ প্রাণকেন্দ্র জয় করার পরই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্বোধনপূর্বক এ আয়াতসমূহ নাজিল করে থাকবেন; কিন্তু এটা নাজিল হয় তখন, যখন খায়বার-এর পরিণতি দেখে উত্তর হিজাযের সমস্ত ইহুদি বসতিগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের অধীন হয়ে গিয়েছিল।

সূরার দ্বিতীয় রুকূর আয়াতসমূহ হিজরতের পর নিকটবর্তী সময়ে নাজিল হয়েছে। কেননা নবী করীম ﷺ মদীনা শরীফ উপস্থিত হয়েই প্রথম দিনে জুমার সালাত কায়েম করেছিলেন, তা স্পষ্ট বলছে যে, জুমা কায়েম হওয়ার ধারাবাহিকতা শুরু হওয়ার পর তা অবশ্যই এমন কোনো সময় সংঘটিত হয়ে থাকবে যখন লোকেরা দীনি সভা সম্মেলনের রীতি-নীতি ও আদব-কায়দা তখন পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় শিক্ষালাভ করতে পারেনি।

এ দুই রুকূ'র আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার সময়কালের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও একটি বিশেষ সম্পর্ক সামঞ্জস্যের কারণে তা এ সূরায় শামিল করে দেওয়া হয়েছে। আর তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের জন্য 'সাবত' বা শনিবারের মোকাবিলায় মুসলমানদেরকে জুমা দান করেছেন। তিনি মুসলমানগণকে সাবধান করে দিতে ইচ্ছা করেছেন যে, তারা যেন জুমার সঙ্গে সেরূপ আচরণ না করে যা ইহুদিরা করেছে সাবতের সঙ্গে। এ রুকূ'র আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছিল এবং তারা ঢোল-বাদ্যের আওয়াজ শুনা মাত্র বারোজন লোক ছাড়া উপস্থিত সমস্ত মুসল্লি মসজিদে নববী হতে বের হয়ে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের দিকে দৌড়ে গিয়েছিল। অথচ এ সময় রাসূলে কারীম ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। এ কারণেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, জুমার আজান হওয়ার পর সর্ব প্রকার ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সব ব্যস্ততা সম্পূর্ণ হারাম। এ সময় সমস্ত কাজ-কর্ম পরিহার করে আল্লাহর জিকির-এর জন্য দৌড়ে যাওয়া ঈমানদার লোকদের কর্তব্য। তবে সালাত শেষ হওয়ার পর নিজেদের কায়-কারবার চালাবার জন্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার অধিকার তাদের রয়েছে। জুমার সালাত সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম সমন্বিত এ রুকূ'টিকে একটি স্বতন্ত্র সূরাও বানানো যেত। কিংবা অন্য কোনো সূরায়ও তাকে শামিল করে দেওয়া অসম্ভব ছিল না; কিন্তু তা করা হয়নি। তার পরিবর্তে বিশেষভাবে এ আয়াত কয়টিকে এখানে সে আয়াতসমূহের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে ইহুদিদের মর্মান্তিক দুঃখময় পরিণতির কার্যকরণ উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এটার অন্তর্নিহিত মূলকথা তাই যা আমরা উপরে লিখেছি।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : অত্র সূরায় দু'টি রুকূ' রয়েছে এবং উভয় রুকূ' ভিন্ন ভিন্ন সময় নাজিল হয়েছে, তাই আলোচ্য বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। এ দু'টি অংশের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্যও রয়েছে বলেই এ দু'টি অংশকে একই সূরার মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু এ সামঞ্জস্য কি তা জানবার পূর্বে উভয় অংশের আলোচ্য বিষয় পৃথকভাবেই বুঝবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, সকল জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, তরুলতা অর্থাৎ আসমান জমিনের সকল সৃষ্টি জগতের মতো তোমরা মানবজাতিও তাঁর গুণকীর্তন বর্ণনা করো।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলি এবং বহু কার্যাদির বিবরণ দিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব তেলাওয়াত করেন এবং মানুষকে শিরক, বিদআত, জেনা, হত্যা, ছিনতাই, রাহাজানি ও মানুষকে কষ্ট প্রদান ইত্যাদি থকে বিরত থাকার শিক্ষা দেন। তাঁর এ কার্য সাহাবী ও তাবেয়ীন এবং তৎপরবর্তী আগমনকারীদের জন্য বাস্তবায়ন হবে। এটা আল্লাহর রহমত স্বরূপ।

পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ তাওরাতপ্রাপ্ত ইহুদিদেরকে তাদের কিতাবের আহকামসমূহকে বুঝে-শুনেও অবমাননা করার কারণে গাধার সাথে সামঞ্জস্য প্রদান করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত এবং অসন্তুষ্টির কথা বলেছেন।

৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে সকল ইহুদি আল্লাহর বন্ধু ও প্রিয় পাত্র হওয়ার দাবি করে, তাদের সে দাবি সত্যায়িত করার মৃত্যু কামনা করতে বলা হয়েছে। যেহেতু তাদের অত্র দাবি মিথ্যা ছিল, তাই তারা সে আকাঙ্ক্ষা জাহির করবে না। আল্লাহর এটা অজানা নয়। আর মুহাম্মদ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, তারা মৃত্যু হতে বাঁচতে যতই চেষ্টা করুক, মৃত্যু অবধাতির এটা শুনিয়ে দিন।

শেষ রুকূ'তে জুমার নামাজ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং জুমার আজান দেওয়ার পর যাবতীয় কার্যাদি ও ক্রয়-বিক্রয় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং জুমার দিকে সায়ী করা ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে। আর নামাজান্তে দুনিয়াবি সকল কাজকর্ম হালালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদেরকে আল্লাহর প্রতি তারগীব দেওয়া হয়েছে। কারণ যাবতীয় কাজকর্ম ও ধন-দৌলত হতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অতি উত্তম।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٦)

শানে নুযূল ঃ আহলে কিতাবরা আল্লাহর সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক আছে ও তারা নিজেদেরকে আল্লাহ পাকের বন্ধু বলে অহংকার করত। তারা আরো বলত, আমরা আল্লাহ পাকের অতি প্রিয় বান্দা। সে প্রেক্ষিতেই এই আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়। –(কানযুন নুকূল ১০০)

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (١١)

শানে নুযূল ঃ হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদা নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় মদীনায় এক ব্যবসায়ী কাফেলার আগমন ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীরা তখন সেদিকে দ্রুত ছুটে যান। তাদের মধ্য থেকে ১২ জন ছাড়া আর কেউ বাকি থাকলেন না, এদের মধ্যে হযরত আবূ বকর ওমর (রা.) ছিলেন অন্যতম। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। –(তিরমিযী, কুরতুবী ১৮:১০৯, মুসলিম শরীফ)

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ : কুরআন পাকের যেসব সূরা سَبَّحَ ও يُسَبِّحُ শব্দ দ্বারা হয়, সেগুলোকে 'মুসাব্বাহাত' বলা হয়। এসব সূরায় নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর জন্যে আল্লাহ পবিত্রতা পাঠ সপ্রমাণ করা হয়েছে। অবস্থার মাধ্যমে এই পবিত্রতা পাঠ সবারই বোধগম্য। কারণ সৃষ্টজগতের প্রতিটি অনু-পরমাণু তার প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও অপার শক্তি-সামর্থ্যের সাক্ষ্যদাতা। এটাই তার পবিত্রতা পাঠ। নির্ভুল সত্য এই যে, প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আক্ষরিক অর্থেও পবিত্রতা পাঠ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে তার সাধ্যানুযায়ী চেতনা ও অনুভূতি রেখেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতির অপরিহার্য দাবি হচ্ছে পবিত্রতা পাঠ। কিন্তু এসব বস্তুর পবিত্রতা পাঠ মানুষ শ্রবণ করে না। তাই কুরআনে বলা হয়েছে وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ অধিকাংশ সূরার শুরুতে অতীত পদবাচ্যে سَبَّحَ বলা হয়েছে। কেবল সূরা জুমুআহ ও সূরা তাগাবুনে ভবিষ্যৎ পদবাচ্যে يُسَبِّحُ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ভাষাগত অলংকার এই যে, অতীত পদবাচ্য নিশ্চয়তা বোঝায়। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ব্যবহৃত হয়েছে। ভবিষ্যৎ পদবাচ্য সদাসর্বদা হওয়া বোঝায়। এই অর্থ বোঝাবার জন্যে দুই জায়গায় এই পদ ব্যবহার করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا : اُمِّيّٖنَ শব্দটি اُمِّىٌّ-এর বহুবচন। এর অর্থ নিরক্ষর। আরবরা এই পদবিতে সুবিদিত। কারণ তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। লেখাপড়া জানা লোক খুব কম ছিল। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তি প্রকাশ করার জন্যে বিশেষভাবে আরবদের জন্যে এই পদবি অবলম্বন করা হয়েছে এবং একথাও বলা হয়েছে যে, প্রেরিত রাসূলও তাদেরই একজন অর্থাৎ নিরক্ষর। কাজেই এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, গোটা জাতি নিরক্ষর এবং তাদের কাছে যে রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, তিনিও নিরক্ষর। অথচ যেসব কর্তব্য এই রাসূলকে সোপর্দ করা হয়েছে, সেগুলো সবই এমন শিক্ষামূলক ও সংস্কারমূলক যে, কোনো নিরক্ষর ব্যক্তি এগুলো শিক্ষা দিতে পারে না। এবং কোনো নিরক্ষর জাতি এগুলো শিখার যোগ্য নয়।

একে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিবলে রাসূলে কারীম ﷺ-এর অলৌকিক ক্ষমতাই আখ্যা দেওয়া যায় যে, তিনি যখন শিক্ষা ও সংস্কারের কাজ শুরু করেন, তখন এই নিরক্ষরদের মধ্যেই এমন সুপণ্ডিত ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটল, যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ও কুশলতা এবং উৎকৃষ্ট কর্মপ্রতিভা সারাবিশ্বের স্বীকৃতি ও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পয়গম্বর প্রেরণের তিন উদ্দেশ্য : يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে : (এক) কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত, (দুই) উম্মতকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, (তিন) কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেওয়া। এই তিনটি বিষয়ই উম্মতের জন্যে যেমন আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত তেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যেরও অন্তর্ভুক্ত।

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ : تِلَاوَتٌ এর আসল অর্থ অনুসরণ করা। পরিভাষায় শব্দটি আল্লাহর কালাম পাঠ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। اٰيٰتٌ বলে কুরআনের আয়াত বোঝানো হয়েছে عَلَيْهِمْ শব্দে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রেরণ করার এক উদ্দেশ্য যে, তিনি মানুষকে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য يُزَكِّيْهِمْ এটা تَزْكِيَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ পবিত্র করা। আভ্যন্তরীণ দোষ থেকে পবিত্র করার অর্থে অধিকতর ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ কুফর, শিরক ও কুচরিত্রতা থেকে পবিত্র করা। কোনো সময় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পবিত্রতার জন্যেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এই ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য।

তৃতীয় উদ্দেশ্য وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ 'কিতাব' বলে কুরআন পাক এবং 'হিকমত' বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বোঝানো হয়েছে। তাই অনেক তফসীরকারক এখানে হিকমতের তাফসীর করেছেন সুন্নাহ।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর : এখানে প্রশ্ন হয় যে, তেলাওয়াতের পরই কিতাব শিক্ষাদানের কথা এবং এরপর পবিত্র করার কথা উল্লেখ করা বাহ্যত সঙ্গত ছিল। কেননা এই বিষয় ত্রয়ের স্বাভাবিক ক্রম তাই। প্রথমে তেলাওয়াত অর্থাৎ ভাষা ও অর্থ সম্ভার শিক্ষা দেওয়া হয়। এর পরিণতিতে কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের পালা আসে। কুরআন পাকে এই আয়াত কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করে তেলাওয়াত ও শিক্ষাদানের মাঝখানে তাযকিয়া তথা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

রূহুল মা'আনীতে এর জওয়াবে বলা হয়েছে, যদি স্বাভাবিক ক্রম অবলম্বন করা হতো, তবে এই বিষয়ত্রয় মিলে এক-একটি স্বতন্ত্র বিষয় হতো,যেমন চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রে কয়েক প্রকার ঔষধের সমষ্টিকে একই ঔষধ বলা হয়ে থাকে। এখানেও এই সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এই বিষয়ত্রয়ে আলাদাভাবে স্বতন্ত্র নিয়ামত এবং পৃথক পৃথকভাবে রিসালতের কর্তব্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। ক্রম পরিবর্তন করার ফলে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে।

সূরা বাকারায় এই আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়সহ বর্ণিত হয়েছে।

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : وَاٰخَرِيْنَ এর শাব্দিক অর্থ- অন্য লোক। لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ এর অর্থ যারা এখন পর্যন্ত তাদের অর্থাৎ নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে প্রথম কাতারের মুমিন অর্থাৎ সাহাবায়ে-কেরামের সাথে সংযুক্ত মনে করা হবে। এটা নিঃসন্দেহে পরবর্তী মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ। -(রূহুল-মা'আনী)

কেউ কেউ وَاٰخَرِيْنَ শব্দটিকে اُمِّيّٖنَ-এর উপর عطف করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নিরক্ষরদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করার বিষয়টি বোধগম্য, কিন্তু যারা এখনও দুনিয়াতে আগমনই করেনি, তাদের

মধ্যে রাসূল প্রেরণ করার মানে কি? বয়ানুল কুরআনে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রেরণ করার অর্থ তাদের জন্যে প্রেরণ করা, فى শব্দটি আরবি ভাষায় এই অর্থেও আসে।

কেউ কেউ واخرين শব্দের عطف মেনেছেন وَيُعَلِّمُهُمْ-এর সর্বনামের উপর। এর অর্থ এই হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দেন নিরক্ষরদেরকে এবং তাদেরকে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। –(মাযহারী)

সহীহ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় সূরা জুমুআহ অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাদের তা পাঠ করে শুনান। তিনি وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ পাঠ করলে আমরা আরজ করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, এরা কারা? তিনি নিরুত্তর রইলেন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার প্রশ্ন করার পর তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর গায়ে হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের সমান উচ্চতায়ও থাকে, তবে তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক সেখান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে। –(মাযহারী)

এই রেওয়ায়েতেও পারস্যবাসীদের কোনো বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না; বরং এতটুকু বোঝা যায় যে, তারাও اٰخَرِيْنَ। অর্থাৎ অন্য লোকদের সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসে অনারবদের যথেষ্ট ফজিলত ব্যক্ত হয়েছে। –(মাযহারী)

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا :

اَسْفَار শব্দটি سِفْر –এর বহুবচন। এর অর্থ বড় পুস্তক। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাব ও নবুয়ত এবং তাঁকে প্রেরণ করার তিনটি উদ্দেশ্য যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, তাওরাতেরও তা প্রায় একই ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখামাত্রই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইহুদিদের উচিত ছিল। কিন্তু পার্থিব জাঁকজমক ও ধনৈশ্বর্য তাদেরকে তাওরাত থেকে বিমুখ করে রেখেছে। ফলে তারা তাওরাতের পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তাওরাতের নির্দেশাবলি বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অনভিজ্ঞের পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তাওরাতের বাহক করা হয়েছিল, অর্থাৎ অযাচিতভাবে আল্লাহর এই নিয়ামত দান করা হয়েছিল, তারা যথাযথভাবে একত্রে বহন করেনি; অর্থাৎ তারা তাওরাতের নির্দেশাবলির পরওয়া করেনি। ফলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গর্দভ, যার পিঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহদাকার গ্রন্থ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই গর্দভ সেই বোঝা বহন তো করে, কিন্তু তার বিষয়বস্তুর কোনো খবর রাখে না এবং তাতে তার কোনো উপকার হয় না। ইহুদিদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্যে তাওরাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাকজমক ও প্রতিপত্তি লাভ করতে চায়, কিন্তু এর দিকনির্দেশ দ্বারা কোনো উপকার লাভ করে না।

তাফসীরবিদগণ বলেন ঃ যে আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করে না, তার দৃষ্টান্তও ইহুদিদের দৃষ্টান্তের অনুরূপ।

نہ محقق بود نہ دانشمند * چارپائے برو کتاب ورق بے چند

আমলহীন আলিম চিন্তাবিদ ও সুধীজন কোনোটাই নয়- সে কয়েকটি কিতাব বহনকারী চতুষ্পদ জন্তু মাত্র।

قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا ... اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : ইহুদিরা তাদের কুফর, শিরক ও চরিত্রহীনতা সত্ত্বেও দাবি করত যে, نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ অর্থাৎ আমরা তো আল্লাহর সন্তান সন্ততি ও প্রিয়জন। তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে জান্নাতের যোগ্য অধিকারী মনে করত না; বরং তাদের বক্তব্য ছিল ঃ

لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا : অর্থাৎ ইহুদি না হয়ে কেউ জান্নাতের দাখিল হতে পারবে না। তারা যেন নিজেদেরকে পরকালের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করত এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহকে তাদের ব্যক্তিগত জায়গীর মনে করত বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, পরকালের নিয়ামতসমূহ ইহকালের নিয়ামত অপেক্ষা হাজারো গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সে আরও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরই সে এসব মহান ও চিরন্তন নিয়ামত অবশ্যই লাভ করবে, তার মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি থাকলে সে অবশ্যই মনে-প্রাণে মৃত্যু কামনা করবে। তার আন্তরিক বাসনা হবে যে, মৃত্যু শীঘ্রই আসুক, যাতে সে দুনিয়ার মলিন ও দুঃখ- বিষাদের পূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অকৃত্রিম সুখ ও শান্তির চিরকালীন জীবনে প্রবেশ করতে পারে তাই আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ আপনি ইহুদিদের বলুন, যদি তোমরা দাবি কর যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একমাত্র তোমরাই আল্লাহর বন্ধু ও প্রিয়পাত্র এবং পরকালের আজাব সম্পর্কে তোমরা মোটেই কোনো আশঙ্কা না কর, তবে জ্ঞান-বুদ্ধির দাবি এই যে, তোমরা মৃত্যু কামনা কর এবং মৃত্যুর জন্যে আগ্রহান্বিত থাক।

এরপর কুরআন নিজেই বলে ঃ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ তারা পরকালের জন্যে কুফর, শিরক ও কুকর্ম ব্যতীত আর কিছুই পায়নি। অতএব তারা ভালোরূপে জানে যে, পরকালে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিই অবধারিত রয়েছে। তারা আল্লাহর প্রিয়জন হওয়ার যে দাবি করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা স্বয়ং তাদের অজানা নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা লাভ করার জন্যে তারা এ ধরনের দাবি করে। তারা আরও জানে যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে তবে তা অবশ্যই কবুল হবে এবং তারা মরে যাবে। তাই বলা হয়েছে, ইহুদিরা মৃত্যু কামনা করতেই পারে না।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যদি সে সময় তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করত, তবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হতো। –(রূহুল-মা'আনী)

মৃত্যু কামনা জায়েজ কি না : সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ এই যে, দুনিয়াতে কারও এরূপ বিশ্বাস করার অধিকার নেই যে, সে মৃত্যুর পর অবশ্যই জান্নাতে যাবে এবং কোনো প্রকার শাস্তির আশঙ্কা নেই। এমতাবস্থায় মৃত্যু কামনা করা আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করারই নামান্তর।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ : অর্থাৎ ইহুদিরা উপরিউক্ত দাবি সত্ত্বেও মৃত্যু কামনা থেকে বিরত থাকত। এর সারমর্ম মৃত্যু থেকে পলায়ন করা বৈ নয়। অতএব আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর, তা অবশ্যই আসবে। আজ নয় তো কিছুদিন পর। সুতরাং মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্পূর্ণত কারও সাধ্যে নেই ।

মৃত্যুর কারণাদি থেকে পলায়নের বিধান : যেসব বিষয় স্বভাবত মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে পলায়ন জ্ঞান-বুদ্ধি ও শরিয়তের পরিপন্থি নয়। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কাত হয়ে পড়া প্রাচীরের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত চলে যান। কোথাও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে সেখান থেকে পলায়ন না করা বিবেক ও শরিয়ত উভয়ের পরিপন্থি। কিন্তু আয়াতে যে মৃত্যু থেকে পলায়নের নিন্দা করা হয়েছে, এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি বিশ্বাস অক্ষুণ্ন থাকে এবং জানে যে, মৃত্যুর সময় এলে তা থেকে পলায়ন নিষ্ফল। যেহেতু তার জানা নেই যে, এই অগ্নি অথবা বিষ অথবা অন্য কোনো মারাত্মক বস্তুর মধ্যে নির্দিষ্টভাবে তার মৃত্যু লিখিত আছে কি না, তাই এ থেকে পলায়ন মৃত্যু থেকে পলায়ন নয়, যার নিন্দা করা হয়েছে।

কোনো জনপদে প্লেগ অথবা মহামারী দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করা জায়েজ কিনা, এটা একটা স্বতন্ত্র মাসআলা। ফিকহ ও হাদীসগ্রন্থে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের তাফসীরেও এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তা উদ্ধৃত করার অবকাশ নেই।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ : يَوْمُ الْجُمُعَةِ এই দিনটি মুসলমানদের সমাবেশের দিন তাই এই দিনকে 'ইয়াওমুল জুমুআ' বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও সমস্ত জগতকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই ছয়দিনের শেষদিন ছিল জুমার দিন। এই দিনেই হযরত আদম (আ.) সৃজিত হন. এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। কেয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে। এই দিনে এমন একটি মুহূর্তে আসে, যাতে মানুষ যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়। এসব বিষয় সহীহ হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে। –(ইবনে-কাসীর)

আল্লাহ তা'আলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্যে এই দিন রেখেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইহুদিরা 'ইয়াওমুস সাবত' তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং খ্রিস্টানরা রবিবারকে। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকেই তাওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে। –(ইবনে-কাসীর) মূর্খতাযুগে শুক্রবারকে 'ইয়াওমে আরূবা' বলা হতো। আরবে কা'ব ইবনে লুয়াই সর্বপ্রথম এর নাম 'ইয়াওমুল জুমু'আহ রাখেন। এই দিনে কুরাইশদের সমাবেশ হতো এবং কা'ব ইবনে লুয়াই ভাষণ দিতেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বের ঘটনা।

কা'ব ইবনে লুয়াই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্বপুরুষদের অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা মূর্খতাযুগেও তাকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করেন এবং একত্ববাদের বিশ্বাস রাখার তাওফীক দান করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের সুসংবাদও

মানুষকে শুনিয়েছিলেন। কুরাইশ গোত্র তাঁকে একজন মহান ব্যক্তি হিসেবে সম্মান করত। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুয়ত লাভের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বে যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই কুরাইশরা তাদের বছর গণনা শুরু করে। শুরুতে কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন থেকে আরবদের বছর গণনা আরম্ভ করা হতো। কা'ব ইবনে লুয়াই-এর মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুদিবস থেকেই বছর গণনা প্রচলিত হয়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মের বছর যখন হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন এদিন থেকেই তারিখ গণনা আরম্ভ হয়। সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা'ব ইবনে লুয়াই-এর আমলে শুক্রবার দিনকে গুরুত্ব দান করা হতো। তিনিই এই দিনের নাম জুমার দিন রেখেছিলেন। –(মাযহারী)

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে মদীনার আনসারগণ হিজরত ও জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বেই স্বকীয় মতামতের মাধ্যমে জুমার দিনে সামাবেশ ও ইবাদতের ব্যবস্থা করত। –[মাযহারী]

نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ - نِدَاءِ صَلٰوةٍ বলে আজান বোঝানো হয়েছে। سَعْى শব্দের এক অর্থ দৌড়ানো এবং অপর অর্থ কোনো কাজ গুরুত্ব সহকারে করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ নামাজের জন্যে দৌড়ে আসতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ শান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে নামাজের জন্যে গমন কর। আয়াতের অর্থ এই যে, জুমার দিনে জুমার আজান দেওয়া হলে আল্লাহর জিকিরের দিকে ত্বরা কর। অর্থাৎ নামাজ ও খোতবার জন্যে মসজিদে যেতে যত্নবান হও। যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে অন্য কোনো কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তোমরাও তেমনি আজানের পর নামাজ ও খোতবা ব্যতীত অন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না। –(ইবনে-কাসীর)

ذِكْرُ اللّٰهِ বলে জুমার নামাজ এবং এই নামাজের অন্যতম শর্ত খোতবাও বোঝানো হয়েছে। –(মাযহারী)

وَذَرُوا الْبَيْعَ অর্থাৎ বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এতে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, জুমার আজানের পর বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে। এই আদেশ পালন করা বিক্রেতা ও ক্রেতা সবার উপর ফরজ। বলাবাহুল্য, দোকানপাট বন্ধ করে দিলেই ক্রয়-বিক্রয় আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্য : জুমার আজানের পর কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমসহ সকল কর্মব্যস্ততা নিষিদ্ধ করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কুরআন পাক কেবল বেচাকেনার কথা উল্লেখ করেছেন। এতে ইঙ্গিত হতে পরে যে, ছোট ও বড় শহরের অধিবাসীদেরকে জুমার নামাজ পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট গ্রাম ও অনাবাদ জায়গায় জুমা হবে না। তাই শহরবাসীদের সাধারণ কর্মব্যস্ততা ও বেচাকেনাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে বেচাকেনা বলে এমন প্রত্যেক কাজ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা জুমার নামাজে গমনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অতএব আজানের পর পানাহার করা, নিদ্রা যাওয়া, কারও সাথে কথা বলা, অধ্যয়ন করা ইত্যাদি সব নিষিদ্ধ। কেবল জুমার প্রস্তুতি সম্পর্কিত কাজকর্ম করা যেতে পারে।

শুরুতে জুমার আজান একটি ছিল, যা খোতবার পূর্বে ইমামের সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়া হতো। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.)-এর আমল পর্যন্ত এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। হযরত ওসমান (রা.)-এর আমলে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেল এবং মদীনার চতুষ্পার্শ্বে ছড়িয়ে পড়ল তখন সেই আজান দূর পর্যন্ত শুনা যেত না। তখন হযরত ওসমান (রা.) মসজিদের বাইরে নিজ বাসগৃহ যাওরায় আরও একটি আজানের ব্যবস্থা করলেন। এই আজান সমগ্র মদীনা শহরে শোনা যেত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ এই নতুন ব্যবস্থায় আপত্তি করেন নি। ফলে এই প্রথম আজান সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা সিদ্ধ হয়ে গেল। আজানের পর বেচাকেনা ও অন্যান্য কর্মব্যস্ততা নিষিদ্ধ হওয়ার যে আদেশ খোতবার আজানের পর কার্যকর ছিল, তা এখন থেকে প্রথম আজানের পরই কার্যকর হয়ে গেল। হাদীস, তাফসীর ও ফিকহর কিতাবাদিতে এসব বিষয় কোনো প্রকার মতবিরোধ ছাড়াই বর্ণিত আছে।

সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, জুমার দিন যোহরের পরিবর্তে জুমার নামাজ ফরজ। তারা এ ব্যাপারেও একমত যে, জুমার নামাজ সাধারণত পাঞ্জেগানা নামাজের মতো নয়, এর জন্য কিছু অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে। পাঞ্জেগানা নামাজ একাকী জামাত ছাড়াও পড়া যায় এবং দুইজনেও পড়া যায়, কিন্তু জুমার নামাজ জামাত ব্যতীত আদায় হয় না। জামাতের সংখ্যায় ফিকহবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। এমনিভাবে পাঞ্জেগানা নামাজ নদী, পাহাড়, জঙ্গল সর্বত্র আদায় হয়, কিন্তু জুমার নামাজ এসব জায়গায় কারও মতে আদায় হয় না। নারী, রোগী ও মুসাফিরের উপর জুমার নামাজ ফরজ নয়। তারা জুমার

পরিবর্তে যোহর পড়বে। কি ধরনের জনপদে জুমা ফরজ, এ সম্পর্কে ইমামগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে যে জনপদে চল্লিশ জন মুক্ত, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ বাস করে, সেখানে জামাত হতে পারে। এর কম হলে জুমা হবে না। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে জুমার জন্য এমন জনপদ জরুরি, যার গৃহ সংলগ্ন এবং যাতে বাজারও আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে জুমার জন্য ছোট বড় শহর অথবা বড় গ্রাম হওয়া শর্ত, যাতে অলিগলি ও বাজার আছে এবং পারস্পরিক ব্যাপারাদি মীমাংসা করার জন্য কোনো বিচারক আছে।

সারকথা এই যে, উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে উম্মতের অধিকাংশ আলেম একমত যে, সর্বাবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের উপর জুমা ফরজ নয়; বরং সবার মতে কিছু কিছু শর্ত আছে। শর্তগুলো কি কি, কেবল সে ব্যাপারেই মতবিরোধ আছে। তবে যাদের উপর ফরজ, তাদের উপর গুরুত্ব ও তাকিদ সহকারেই ফরজ। তাদের মধ্যে কেউ শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে জামাত ছেড়ে দিলে তার জন্য সহীহ হাদীসসমূহে কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শর্তাদি সহকারে জুমার নামাজ আদায় করে, তাদের জন্য বিশেষ ফজিলত ও বরকতের ওয়াদা আছে।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ : পূর্বের আয়াতসমূহে জুমার আজানের পর বেচাকেনা ইত্যাদি পার্থিব কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আয়াতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, জুমার নামাজ সমাপ্ত হলে ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং রিজিক হাসিলের চেষ্টা সবাই করতে পারে।

জুমার পরে ব্যবসায়ে বরকত : হযরত এরাক ইবনে মালেক (র.) যখন জুমার নামাজান্তে বাইরে আসতেন তখন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيْضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا اَمَرْتَنِىْ فَارْزُقْنِىْ مِنْ فَضْلِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি, তোমার ফরজ নামাজ পড়েছি এবং তোমার আদেশ মতো নামাজান্তে বাইরে যাচ্ছি। অতএব তুমি স্বীয় কৃপায় আমাকে রিজিক দান কর। তুমি উত্তম রিজিকদাতা। –[ইবনে কাসীর]

কোনো কোনো পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমার পরে ব্যবসায়িক কাজ-কারবার করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তরবার বরকত নাজিল করেন। –[ইবনে কাসীর]

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا ِۨانْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

এই আয়াতে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যারা জুমার খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ-কারবারে মনোযোগ দিয়েছিল। ইবনে-কাসীর বলেন ঃ এই ঘটনা তখনকার, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার নামাজের পর জুমার খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের নামাজে অদ্যাবধি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এক জুমার দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজান্তে খোতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং ঢোল ইত্যাদি পিটিয়ে তা ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বল্পসংখ্যক সাহাবীসহ মসজিদে থেকে যান। তাদের সংখ্যা বার জন বর্ণিত আছে। –(আবূ দাউদ) কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন ঃ যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, তবে মদীনার উপত্যকা আজাবের অগ্নিতে পূর্ণ হয়ে যেত। –(ইবনে কাসীর)

তাফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই বাণিজ্যিক কাফেলাটি ছিল দেহইয়া ইবনে খলফ কালবীর। সে সিরিয়া থেকে মাল-সম্ভার নিয়ে এসেছিল। তার কাফেলায় সাধারণত ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু থাকত। তার আগমনের সংবাদ পেলে মদীনার নারী-পুরুষ সবাই দৌড়ে কাফেলার কাছে যেত। দেহইয়া ইবনে খলফ তখন পর্যন্ত মুসলমান ছিল না; পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হাসান বসরী ও আবূ মালেক (র.) বলেন : এই কাফেলার আগমনের সময় মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল। –(মাযহারী) এসব কারণেই বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম বাণিজ্যিক কাফেলার আওয়াজ শুনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। ফরজ নামাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। জানা ছিল না যে, এটা শ্রবণ করা অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত ঃ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য এবং তৃতীয়ত ঃ বাণিজ্যিক কাফেলার উপর সবার ঝাঁপিয়ে পড়া-এসব কারণে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, দেরীতে গেলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া যাবে না।

এসব কারণেই সাহাবায়ে কেরামের পদস্খলন হয় এবং উল্লিখিত হাদীসে তাঁদের প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়। এ ব্যাপারে তাদেরকে লজ্জা দেওয়া ও হুঁশিয়ার করার জন্যে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়ম পরিবর্তন করে জুমার নামাজের পূর্বে খোতবা দেওয়া শুরু করেন। বর্তমান তাই সুন্নত। –(ইবনে কাসীর)

আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলে দিতে আদেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে যে ছওয়াব আছে, তা এই বাণিজ্য থেকে উত্তম। এটাও অবান্তর নয় যে, যারা নামাজ ও খোতবার খাতিরে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও বিশেষ বরকত নাজিল হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُسَبِّحُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– পবিত্রতা বর্ণনা করে।

يَتْلُوا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةً মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পড়ে শুনান।

يُزَكِّيْهِمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْكِيَةً মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাদেরকে পবিত্র করবেন।

يُعَلِّمُهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْلِيْمٌ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে শিক্ষা দেন।

اُمِّيِّيْنَ : এ শব্দটি বহুবচন : একবচনে امى অর্থ- নিরক্ষর। যারা লিখতে পড়তে জানেনা।

لَمَّا يَلْحَقُوْا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى বাব سَمِعَ মাসদার لُحُوْقٌ মূলবর্ণ (ل - ح - ق) জিনস صحيح অর্থ– এখানে শামিল হয়নি। পৌছায়নি।

اَسْفَارًا : শব্দটি বহুবচন ; একবচনে سَفَرٌ অর্থ- বহু কিতাবের বোঝা। পুস্তক সমূহ।

لَا يَهْدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– হেদায়েত দান করেন না।

هَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَوْدُ মূলবর্ণ (ه - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– ইহুদিগণ।

زَعَمْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার زَعْمٌ মূলবর্ণ (ز - ع - م) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের দাবি এই হয় যে।

لَا يَتَمَنَّوْنَهٗ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَمَنِّى মূলবর্ণ (م - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– কামনা করবে না।

نُوْدِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আজান দেওয়া হয়। ডাক দেওয়া হয়। আহ্বান করা হয়।

اِسْعَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فتح মাসদার سَعْىٌ মূলবর্ণ (س - ع - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ধাবিত হও। দৌড়াও। প্রচেষ্টা চালাও।

ذَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سمع মাসদার وَذْرٌ মূলবর্ণ (و - ذ - ر) জিনস مثال واوى অর্থ– ত্যাগ করা। তোমরা ছেড়ে দাও।

قَدَّمَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْدِيْم মূলবর্ণ (ق - د - م) জিনস صحيح অর্থ– সঞ্চয় করেছে।

تَفِرُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার فِرَار মূলবর্ণ (ف - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা পলায়ন করছ।

مُلَاقِيْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُلَاقَاةٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমাদেরকে এসে পাকড়াও করবে।

تُرَدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার رَدٌّ মূলবর্ণ (ر - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

يُنَبِّئُكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْبِئَةٌ মূলবর্ণ (ن - ب - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

قُضِيَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার قَضَاءٌ মূলবর্ণ (ق - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সমাপ্ত হয়।

إِنْتَشِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِنْتِشَارٌ মূলবর্ণ (ن - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– চলাফেলা কর। ছড়িয়ে পড়।

اِبْتَغُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِغَاءٌ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অন্বেষণ কর।

رَاَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং ناقص يائى অর্থ– দেখতে পায়। তারা দেখেছে। অবলোকন করেছে।

اِنْفَضُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْفِضَاضٌ মূলবর্ণ (ف - ض - ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ছড়িয়ে পড়ে। তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ : এখানে يُسَبِّحُ ফে'ল, আর لِلّٰه টা উভয়ের সাথে متعلق অথবা মাফউল লাম টি অতিরিক্ত। আর مَا টি হলো ফায়েল। আর وَالسَّمٰوٰتِ-এর সাথে متعلق হয়ে مَا- এর সেলাহ হয়েছে। আর مَا فِى الْاَرْضِ টা مَا فِى السَّمٰوٰتِ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ শব্দগুলো الْمَلِكِ শব্দের সিফাত বা বদল হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ৫২০]

سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ

সূরা মুনাফিকূন

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত- ১১, রুকূ'- ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যখন এ মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। আর তা তো আল্লাহ অবগত আছেন যে, আপনি আল্লাহর রাসূল; আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এ মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।	اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ﴿۱﴾
২. তারা নিজেদের শপথগুলোকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে, অতঃপর তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে প্রতিরোধ করে; নিঃসন্দেহে তাদের এ সমস্ত কার্য নিতান্ত মন্দ।	اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲﴾
৩. এটা এ হেতু যে, তারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কাফের হয়েছে, অতএব, তাদের অন্তরসমূহের উপর মহর মেরে দেওয়া হয়েছে; সুতরাং তারা বঝছে না।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۳﴾
৪. আর যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন, তাদের দৈহিক গঠন আপনাকে চমৎকৃত করবে; আর যদি তারা কথা বলতে থাকে, আপনি তাদের কথা শ্রবণ করবেন;	وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ যখন এই মুনাফেকরা আপনার নিকট আসে قَالُوْا তখন বলে نَشْهَدُ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল وَاللّٰهُ يَعْلَمُ, আর তা তো আল্লাহ অবগত আছেন যে, اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ আপনি আল্লাহর রাসূল وَاللّٰهُ يَشْهَدُ, আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।

২. اِتَّخَذُوْا তারা করে রেখেছে اَيْمَانَهُمْ নিজেদের শপথগুলোকে جُنَّةً ঢালস্বরূপ فَصَدُّوْا অতঃপর তারা প্রতিরোধ করে মানুষকে عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথ হতে اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ নিঃসন্দেহে তাদের এই সমস্ত কার্য নিতান্ত মন্দ

৩. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ এটা এই হেতু যে, তারা اٰمَنُوْا ঈমান এনেছে ثُمَّ كَفَرُوْا অতঃপর কাফের হয়েছে فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ অতএব তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ সুতরাং তারা বুঝছে না

৪. وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ, আর যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ তাদের দৈহিক গঠন আপনাকে চমৎকৃত করবে وَاِنْ يَّقُوْلُوْا, আর যদি তারা কথা বলতে থাকে تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ আপনি তাদের কথা শ্রবণ করবেন

كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ؗ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝٤

** যেন এরা কাঠসমূহ–যা (দেয়ালের) সহায়তায় লাগানো রয়েছে; প্রত্যেক চীৎকারকে নিজেদেরই উপর (সমাগত বিপদ) মনে করে; এরাই শত্রু, আপনি এদের হতে সতর্ক থাকুন; আল্লাহ তাদেরকে বিনাশ করুন, তারা (সত্য হতে ফিরে) কোথায় যাচ্ছে?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝٥

৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো! তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয়, আর আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা অহংকারভরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٦

৬. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করেন অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, তাদের জন্য উভয়ই সমান; আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ এমন অবাধ্য লোকদেরকে হেদায়েত দান করেন না।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝٧

৭. এরা ঐ সমস্ত লোক–যারা বলে, আল্লাহর রাসূলের নিকট যারা আছে তাদের জন্য কিছুই ব্যয় করো না, যেন তারা নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে; অথচ আল্লাহরই (অধিকারে) আছে আসমানসমূহ ও জমিনের ভাণ্ডারগুলো, কিন্তু মুনাফিকরা বুঝে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

** كَاَنَّهُمْ যেন এরা خُشُبٌ কাঠসমূহ مُسَنَّدَةٌ যা (দেয়ালের) সহায়তায় লাগানো রয়েছে يَحْسَبُوْنَ মনে করে كُلَّ صَيْحَةٍ প্রত্যেক চীৎকারকে عَلَيْهِمْ নিজেদেরই উপর (সমাগত বিপদ) هُمُ الْعَدُوُّ এরাই শত্রু فَاحْذَرْهُمْ আপনি এদের থেকে সতর্ক থাকুন قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তাদেরকে বিনাশ করুন اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ (সত্য হতে ফিরে) কোথায় যাচ্ছে?

৫. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ যখন তাদেরকে বলা হয় تَعَالَوْا আস يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ক্ষমা প্রার্থনা করবেন لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ তখন তারা নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয় وَرَاَيْتَهُمْ আর তাদেরকে দেখবেন يَصُدُّوْنَ তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ অহংকারভরে।

৬. سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ তাদের জন্য উভয়ই সমান اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না করেন لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى নিঃসন্দেহে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন না الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ এমন অবাধ্য লোকদেরকে।

৭. هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ এরাই সেই লোক যারা বলে لَا تُنْفِقُوْا তাদের জন্য কিছুই ব্যয় করো না عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রাসূলের নিকট যা আছে حَتّٰى يَنْفَضُّوْا এমনকি তারা নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অথচ আল্লাহরই (অধিকারে) আছে আসমান সমূহ ও জমিনের ভাণ্ডারগুলো وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ কিন্তু মুনাফিকরা বুঝে না।

৮. তারা এরূপ বলে যে, যদি আমরা এখন মদিনায় ফিরে যাই, তবে সম্মানীগণ হীন লোকদেরকে তথা হতে বহিষ্কৃত করে দিবে; আর (নিজদেরকে সম্মানী এবং মুসলমানদেরকে হীন মনে করা তাদের মূর্খতা। কেননা প্রকৃত) ইজ্জত আল্লাহরই জন্য রয়েছে, আর তার রাসূলের এবং মুসলমানগণের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা এটা অবগত নয়।	يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ط وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨﴾ ع
৯. হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে যেন আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে গাফেল করতে না পারে, আর যারা এরূপ করবে, তারাই বিফল থাকবে। (কেননা পার্থিব উপভোগ নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর পরকালের ক্ষতি স্থায়ী থেকে যাবে)।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩﴾
১০. আর আমি যা তোমাদেরকে দান করেছি, তা হতে ব্যয় কর এটার পূর্বে যে, তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, অনন্তর সে বলে, হে আমার প্রভু! আমাকে কেন আরো কিছু দিনের অবকাশ প্রদান করলেন না যে, আমি দান-সদকা করে নিতাম এবং নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত হতাম।	وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠﴾
১১. আর আল্লাহ কাউকে কখনো অবকাশ দেন না, যখন তার নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে; আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যাবলি সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।	وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١١﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. يَقُوْلُوْنَ তারা এরূপ বলে যে, لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ যদি আমরা এমন মদিনায় ফিরে যাই لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ তবে সম্মানীগণ হীন লোকদেরকে তথা হতে বহিষ্কৃত করে দিবে وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ ইজ্জত আল্লাহরই জন্য রয়েছে وَلِرَسُوْلِهٖ আর তাঁর রাসূলের وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ, এবং মুসলমানগণের জন্য وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু মুনাফেকরা এটা অবগত নয়।

৯. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ لَا تُلْهِكُمْ তোমাদের যেন গাফেল করতে না পারে اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ আল্লাহর জিকির হতে وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ, আর যারা এরূপ করবে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ তারাই বিফল থাকবে।

১০. وَاَنْفِقُوْا, আর ব্যয় কর مِّنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ আমি যা তোমাদেরকে দান করেছি তা হতে مِّنْ قَبْلِ এর পূর্বে যে, اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় فَيَقُوْلَ অনন্তর সে বলে رَبِّ হে আমার প্রভু لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ আমাকে কেন অবকাশ প্রদান করলেন না اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ আরো কিছু দিনের যে فَاَصَّدَّقَ আমি দান-সদকা করে নিতাম وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ, এবং নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

১১. وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا, আর আল্লাহ কাউকেও অবকাশ দেন না اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا যখন তার নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে وَاللّٰهُ, خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নাকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম আয়াত إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ হতে তার নামটি গৃহীত। মূলত তা এ সূরাটির নাম এবং তা আলোচিত বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কেননা এ গোটা সূরায় মুনাফিকদের আচরণ এবং কর্মনীতির সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ১৮০টি বাক্য ও ৭৬টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ হতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রত্যাবর্তন কালে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়, কিংবা মদিনায় পৌঁছে যাওয়ার পর পরই তা নাজিল হয়েছে। বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরি সনের শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এ সূরাটি নাজিল হওয়া সংক্রান্ত ইতিহাস এভাবেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়।

সূরার বিষয়বস্তু :

এক : ১ থেকে ৮ নং আয়াত পর্যন্ত নিফাক মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম দিকে বলা হয়েছে মুনাফিকরা যখন নবী করীম ﷺ -এর সামনে আসে তখন তাঁকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করে; কিন্তু আসলে তারা তা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে না। অতঃপর নবী ও সাহাবীদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্বন্ধে তাদের মারাত্মক কথা,–"রাসূলের দাওয়াত, দীন অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে; তারা বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ হতে মদিনায় ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং রাসূলের মুহাজির সাহাবীগণকে মদিনা হতে বের করে দিবে" -প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই : ৯ থেকে ১১ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে দুনিয়ার লোভ-লালসা, সৌন্দর্য, ফ্যাশনে পড়ে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য হতে দূরে সরে না যেতে বলা হয়েছে। যেমনিভাবে মুনাফিকরা সরে পড়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি হতে বিরত থাকা হলো মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, সময় থাকতে আল্লাহর পথে দান করো, সময় চলে গেলে আবার জীবন ফিরে চাইলেও পাওয়া যাবে না। তখন আল্লাহর পথে দান না করার কারণে আফসোস করা ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না। -[সাফওয়া]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ও ঐতিহাসিক পটভূমিক : যে বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে এ সূরাটি নাজিল হয়েছে তার উল্লেখের পূর্বে মদিনার মুনাফিকদের ইতিহাস পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা আবশ্যক। কেননা যে বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সূরাটি নাজিল হয়, তা কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা ছিল না। তার পশ্চাতে বহু ঘটনা পরম্পরায় একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে এবং তা-ই শেষ পর্যন্ত সে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার কারণ হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মদিনায় হিজরত করার কিছু দিন পূর্বে মদিনার প্রধান দু'বিবদমান গোত্র খাযরাজ গোত্রের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে মদিনার বাদশাহ বানাবার জন্য একমত হয়েছিল। ইতঃমধ্যে উভয় গোত্রের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মদিনায় হিজরত করে চলে আসতে আহ্বান জানায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় চলে আসলে মদিনার অধিকাংশ লোকই ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই অসহায় হয়ে পড়ল। স্বীয় নেতৃত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য অবশেষে সে-ই তার দলবল নিয়ে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাফেরই রয়ে গেল। তার অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মদিনায় আগমনের ফলে সে মদিনার বাদশাহ হতে পারল না। এ কারণেই সে বিভিন্নভাবে ইসলাম। মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে জাল বুনছিল। তার এ সব ষড়যন্ত্র দিন দিন স্পষ্ট হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলমানদের সামনে ধরা পড়ছিল। সে বিভিন্ন যুদ্ধের প্রাক্কালে ইসলামের শত্রুদের সাথে গোপনে হাত মিলাতে লাগল, অনেক সময় প্রকাশ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতাও করল।

ষষ্ঠ হিজরি সনে সে তার সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বনূ মুস্তালিক অভিযানে অংশগ্রহণ করল। এ যুদ্ধে সে এমন দু'টি ঘটনা ঘটাল যা মুসলমানদের সংহতি ঐক্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারত; কিন্তু কুরআন মাজীদের শিক্ষা এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর সংস্পর্শে ঈমানদার লোকেরা যে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন তার দরুন এ উভয় ফেতনার মূল উৎপাটন সম্ভব হয়েছিল। এ সূরাতে তন্মধ্যে একটি ফেতনার উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় ফেতনার আলোচনা সূরা নূরে রয়েছে।

ঘটনার বিবরণ : মুরাইসী নামক পানির কূপের পার্শ্বে একটি জনবসতি অবস্থিত ছিল। বনূ মুস্তালিকদের পরাজিত করার পর মুসলিম বাহিনী এখানেই অবস্থান করছিল। এ সময় হঠাৎ পানি নিয়ে দু' ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। তাদের একজনের নাম ছিল জাহজাহ ইবনে মাসউদ গিফারী। তিনি ছিলেন হযরত ওমর (রা.)-এর কর্মচারী। তাঁর ঘোড়া সামলানোর দায়িত্বও এ লোকটিই পালন করতেন। আর দ্বিতীয়জন ছিলেন সিনান ইবনে ওয়াবর আল-জুহানী। তাঁর গোত্র খাযরাজের একটি গোত্রের মিত্র ছিল। ঝগড়া মুখের তিক্ত কথাবার্তা ছাড়িয়ে হাতাহাতি পর্যন্ত পৌঁছেছিল। জাহজাহ সিনানকে একটি লাথি মেরেছিলেন। প্রাচীন ইয়ামেনী ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে আনসাররা এ ব্যাপারটিকে খুবই অপমানকর মনে করতেন। তখন সিনান আনসারদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকলেন, আর জাহাজাহ মুহাজিরদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করলেন। ইবনে উবাই এ ঝগড়ার কথা শুনতে পেয়ে আউস ও খাযরাজের লোকদেরকে উসকানি দেওয়ার জন্য চিৎকার করে বলতে লাগল, শীঘ্র দৌড়াও এবং মিত্র গোত্রের লোককে সাহায্য করো। অপর দিক হতে কতিপয় মুহাজিরও বের হয়ে আসলেন। খুব বিরাট ধরনের সংঘর্ষ ঘটে যাওয়ার উপক্রম হলো এবং তখনই আনসার ও মুহাজিরগণ পরস্পর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারতেন। আর তা এমন এক স্থানে যেখানে অল্পদিন পূর্বেই তারা সকলেই সম্মিলিতভাবেই এক দুশমন গোত্রের সাথে লড়াই করে তাকে পরাজিত করে বিজয়ী বেশে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। চিৎকার শুনে রাসূলে কারীম ﷺ বের হয়ে আসলেন এবং বললেন–

مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَكُمْ وَلِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ. دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ.

"এ বর্বতার চিৎকর কেন? তোমরা কোথায় আর এ জাহেলিয়াতের চিৎকার কোথায়? [অর্থাৎ তা তোমাদের জন্য শোভা পায় না] তোমরা তা ত্যাগ করো। তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও হীন কাজ।"

তখন উভয় দিকের নেককার লোকেরা অগ্রসর হয়ে আসলেন এবং ব্যাপারটি সঠিকরূপে মিটমাট করে দিলেন। সিনান জাহজাহকে মাফ করে দিয়ে সন্ধি করলেন।

অতঃপর যার যার অন্তরে মুনাফেকি ছিল এমন প্রত্যেকটি লোক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর নিকট উপস্থিত হলো। তারা সকলে একত্রিত হয়ে তাকে বলল, এতদিন তোমার প্রতি তো আমাদের অনেক আশা ভরসা ছিল। তুমি প্রতিরোধ করতেও ছিলে; কিন্তু এখন মনে হয়েছে; তুমি আমাদের বিরুদ্ধে এ কাঙ্গালিদের সাহায্যকারী হয়ে গেছ। ইবনে উবাই আগে হতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বসেছিল। লোকদের এ কথা শুনে সে যেন ক্রোধে ফেটে পড়ল। বলল, সব কিছু তোমাদের নিজেদেরই কৃতকর্ম, তোমরাই এ লোকদেরকে নিজেদের দেশে স্থান দিয়েছ। নিজেদের ধনমাল এদের মধ্যে বণ্টন করেছ। শেষ পর্যন্ত এরা ফুলে-ফেঁপে খোদ আমাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের কুকুরকে খাইয়ে পরিয়ে মোটাতাজা করেছ তোমাকেই ছিন্নভিন্ন করার উদ্দেশ্য। এ উপমাটা আমাদের ও এ কুরাইশ কাঙ্গালদের [হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং সাহাবীদের] সম্পর্কে হুবহু খেটে যায়। তোমরাই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো, হাত গুটিয়ে নাও তখন তারা কোথাও থাকবে না। আল্লাহর শপথ! মদিনায় পৌঁছার পর আমাদের সম্মানিত পক্ষ, হীন ও লাঞ্ছিত পক্ষকে বহিষ্কৃত করবে।

এ বৈঠকে ঘটনা বশত হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) ও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি ছিলেন এক অল্প বয়স্ক বালক মাত্র। তিনি এসব কথাবার্তা শুনে তাঁর চাচাকে বলে দিলেন। তাঁর চাচা ছিলেন আনসারদের মধ্যে একজন ধনী ব্যক্তি, তিনি গিয়ে সমস্ত কথাবার্তা রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট পেশ করে দিলেন। [অপর এক বর্ণনা মতে হযরত যায়েদ নিজেই সব ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছেন।] নবী করীম ﷺ হযরত যায়েদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আদ্যপান্ত সব কিছুই শুনিয়ে দিলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, সম্ভবত তুমি ইবনে উবাই-এর কথা শুনতে ভুল করেছ। ইবনে উবাই এ কথা বলেছে– এ ব্যাপারে তোমার হয়তো সংশয় বা সন্দেহ হয়ে থাকবে; কিন্তু হযরত যায়েদ এ কথার জবাবে বললেন, না হুজুর! আল্লাহর শপথ! আমি তাকেই এসব কথাবার্তা বলতে শুনেছি। অতঃপর নবী করীম ﷺ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালে; জিজ্ঞাসা করা হলে সে সুস্পষ্টরূপে অস্বীকার করল। শপথ করে বলতে লাগল, আমি এসব কথা কখনোই বলিনি। আনসারগণও বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটি বালকের কথা কি করে বিশ্বাস করা যায়? সম্ভবত তার ভুল হয়েছে। ইবনে উবাইতো আমাদের খুবই সম্মানিত ও বুজুর্গ ব্যক্তি। তার বিপরীত একজন বালকের কথা আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। গোত্রের বয়োবৃদ্ধরাও হযরত যায়েদকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি অবস্থা দেখে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চুপচাপ বসে থাকলেন; কিন্তু নবী করীম ﷺ যেমন যায়েদকে জানতেন, তেমনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকেও জানতেন। কাজেই প্রকৃত ব্যাপার যে কি ঘটেছিল তা তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) এ ব্যাপারটি জানতে পেরে রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। বললেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। আর আমাকে অনুমতি দেওয়া সমীচীন মনে না হলে মুয়ায ইবনে জাবাল, উব্বাদ ইবনে বিশর, সাঈদ ইবনে মুয়ায, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা প্রমুখ আনসারদের মধ্য হতে কোনো একজন আনসারকে তাকে হত্যা করার অনুমতি দিন; কিন্তু নবী করীম ﷺ বললেন, না তা করো না। লোকেরা বলবে, দেখ! মুহাম্মদ নিজেই তাঁর সঙ্গী-সাথিদের হত্যা করাচ্ছেন। অতঃপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, যদিও রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এখনো রওয়ানা হওয়ার সময় উপস্থিত হয়নি। ক্রমাগত ৩০ ঘণ্টা চলতে থাকলেন। লোকেরা ক্লান্ত -শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। পরে একটি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। ক্লান্ত-শ্রান্ত লোকেরা মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। বস্তুত মুরাইসী নামক স্থানে যা কিছু ঘটেছিল তার প্রভাব লোকদের মন-মগজ থেকে বিলীন করার উদ্দেশ্যেই নবী করীম ﷺ এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। পথিমধ্যে আনসার সর্দার হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা.) নবী করীম ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনি এমন সময় যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন যখন সফরের উপযুক্ত সময় ছিল না। আপনি কখনো এরূপ সময় সফর শুরু করতেন না। নবী করীম ﷺ জবাবে বললেন, তুমি শুননি? তোমাদের এ সাহেব কি কথাটি বলেছে? হযরত উসাইদ জিজ্ঞাসা করলেন– কোন সাহেব? বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি বলেছেন? তিনি জবাবে বললেন, বলেছেন মদীনায় পৌঁছার পর সম্মানিতগণ হীন-নিকৃষ্টদের বহিষ্কৃত করবে। উসাইদ বললেন, আল্লাহর শপথ! সম্মানিত তো আপনি, আর হীন নিকৃষ্ট তো সে। আপনি যখনই ইচ্ছা তাকে বহিষ্কৃত করতে পারেন।

ক্রমে ক্রমে কথাটি আনসার গোত্রের সমস্ত লোকের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়ল, ইবনে উবাইর বিরুদ্ধে তাদের মনে তীব্র ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হলো। লোকেরা ইবনে উবাইকে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে ক্ষমা চাও; কিন্তু সে তীব্র বিদ্রূপাত্মক স্বরে জবাব দিল, তোমরা বলেছ তার প্রতি ঈমান আনো, আমি ঈমান এনেছি। তোমরা বললে, নিজের ধনমালের জাকাত দাও, আমি জাকাতও দিয়েছি। এখনতো বাকি আছে শুধু এতটুকু যে, আমি মুহাম্মদ ﷺ -কে সেজদা করবো। এসব কথার দরুন তার বিরুদ্ধে মু'মিন আনসারদের মনে অসন্তোষ ও ক্ষোভ অধিকতর বৃদ্ধি পেল এবং চারদিক হতে তার উপর অভিশাপ বর্ষিত হতে লাগল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র আব্দুল্লাহ নগ্ন তরবারি উত্তোলিত করে তার পিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, আপনি বলেছেন, মদিনা পৌঁছে সম্মানিতগণ অসম্মানিতকে বহিষ্কার করবে। সম্মানিত আপনি না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল? তা এখন আপনি জানতে পারবেন। আল্লাহর শপথ! রাসূলে কারীম ﷺ অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত আপনি মদিনায় প্রবেশ করতে পারবেন না। একথা শুনে ইবনে উবাই চিৎকার করে বলল, হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা দেখে যাও, আমার নিজের পুত্রই আমাকে মদিনায় প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে। লোকেরা নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছাল। নবী করীম ﷺ আব্দুল্লাহ কে বলে পাঠালেন। তিনি যেন তাঁর পিতাকে নিজ ঘরে যেতে দেন। আব্দুল্লাহ এ কথা শুনে বললেন। নবী করীম ﷺ যদি অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে আপনি ঘরে যেতে পারেন। তখন নবী করীম ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, হে ওমর! কি মনে কর তুমি, যে সময় ইবনে উবাইকে হত্যা করতে চেয়েছিলে তখন তাকে হত্যা করা হলে নানা রকমের কথা উঠত; কিন্তু আজ অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, আমি যদি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেই তবে তা অনায়াসেই করা যেতে পারে। হযরত ওমর নিবেদন করলেন, আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পেরেছি, আমার অপেক্ষা আল্লাহর রাসূলের কথা অধিকতর বিচক্ষণতাপূর্ণ। এ পটভূমিতে এ সূরাটি নাজিল হয় এবং নাজিল হয় সম্ভবত নবী করীম ﷺ -এর মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পরে।

উপরোল্লিখিত ঘটনা হতে প্রাপ্ত ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

১. ইসলামি প্রশাসনিক ক্ষমতার মূল ভিত্তি হলো, প্রকৃত ইসলাম বা মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা।

২. ইসলামে বর্ণবাদ, গোত্রীয়, দেশীয় ও বৈদেশিক জাতীয়তাবাদ-এর পার্থক্যকে চিরতরে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়।

৩. ইসলামের জন্য সাহাবায়ে কেরামগণ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ইসলামের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য জগতবাসিকে শিক্ষা দিয়েছেন। যার কোনো প্রকার উপমা বর্তমান বিশ্বে দেখা যায় না।

৪. মুসলমানদের সর্বসাধারণের জন্য হিতকর কার্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান।

৫. মুসলমানদের পরস্পর ভুল ধারণা হতে রক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরাতে নবী করীম ﷺ -এর শুভাগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে এবং এরপর যারা তাঁকে অন্তরে বিশ্বাস করত এবং প্রকাশ্যে সমালোচনা করত সে অভিশপ্ত ইহুদিদের কথা আলোচিত হয়েছে, আর অত্র সূরায় মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা মুখে ঈমানের দাবিদার; কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না।

দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী সূরার শেষে নবী করীম ﷺ -এর সম্মানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, মুনাফিকরা প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্মান করলেও তাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভক্তি ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি আন্তরিক ভক্তি বা সম্মান না করা মুনাফেকির লক্ষণ। এমন গর্হিত কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা মুসলমানদের একান্তই কর্তব্য। -[নূরুল কুরআন]

শানে নুযূল :

১. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন বলেছিল– لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ নিশ্চয়ই মদিনায় পৌঁছার পর সম্মানিত ব্যক্তিগণ অসম্মানিতদেরকে মদিনা হতে বের করে দিবে, এ অসৎ আচরণের উপর ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য তাকে যেতে বলা হয়েছিল; তখন সে এ কথার উপর মাথা ঝাঁকুনি দেয় এবং রাসূলের দরবারে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাজিল হয়।

২. কেউ কেউ বলেন– আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই -এর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যে আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছিল, তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে তার আত্মীয়-স্বজনদের ঈমানদার ব্যক্তিগণ তাকে বলতে লাগল, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর আয়াতের মাধ্যমে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং তুমি রাসূলের দরবারে যাও এবং তোমার গুনাহ মার্জনা করে নাও এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমার দোয়া করিয়ে নাও। তখন ইবনে উবাই বলল, واه واه হায় হায়! তোমরা প্রথমে ঈমান আনয়নের জন্য বললে, তখন ঈমান এনেছি। অতঃপর জাকাত প্রদানের জন্য বলেছ, তাও ইচ্ছা অনিচ্ছায় পালন করেছি। এখন সর্বশেষ তোমাদের কথানুসারে মুহাম্মদকে সেজদা করতে বলতে চাও নাকি? তা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি নাজিল করেন। -[আশরাফী, কাবীর, মা'আরিফ]

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন উহুদের ময়দান হতে ইবনে উবাই বহুসংখ্যক (তিনশত -এর মতো) লোক নিয়ে ফিরে আসল, তখন মু'মিনরা তার সমালোচনা ও নিন্দা শুরু করল, তখন তার কোনো এক ভাই তাকে বলল, তুমি মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট যাও এবং ক্ষমা চাও তবে তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমার জন্য দোয়া করবেন। তখন সে বলল, না আমি যাবো না, সে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক বা নাই করুক, এই বলে মাথা নেড়ে-ঝেড়ে হেলতে লাগল, এমন সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন। তাফসীরে মাযহারী গ্রন্থে বলা হয় এ অবস্থার পর ইবনে উবাই অতিশয় মরে গেল।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন ঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পিছনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থেকে উদ্ভূত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় সফর শুরু করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে উপদেশচ্ছলে বললেন ঃ তুমি এক কাজ কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নাও। তিনি তোমার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। এতে তোমার মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। হযরত ওবাদা (রা.) তখনই বললেন ঃ আমার মনে হয়, তোমার এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কুরআনের আয়াত নাজিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বার বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কুরআন নাজিল হবে। হঠাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তাঁর শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর উষ্ট্রী বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে। হযরত যায়েদ (রা.) আশাবাদি হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোনো ওহী নাজিল হবে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। হযরত যায়েদ (রা.) বলেন ঃ আমার সওয়ারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এই কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন ঃ

يَا غُلَامُ صَدَّقَ اللّٰهُ حَدِيْثَكَ وَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْمُنَافِقِيْنَ فِيْ ابْنِ اُبَيٍّ مِنْ اَوَّلِهَا اِلٰى اٰخِرِهَا -

অর্থাৎ হে বালক! আল্লাহ তা'আলা তোমরা কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকূন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই রেওয়ায়েত থেকে জানা যেল যে, সূরা মুনাফিকুন সফরের মধ্যেই নাজিল হয়েছে। কিন্তু বগভী (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় পৌঁছে যান এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) অপমানের ভয়ে গৃহে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরা নাজিল হয়েছে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনার নিকটবর্তী আকিক উপত্যকায় পৌঁছেন, তখন ইবনে উবাইয়ের মুমিন পুত্র আব্দুল্লাহ (রা.) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং খুঁজতে খুঁজতে পিতা ইবনে উবাইয়ের কাছে পৌঁছে তার উষ্ট্রীকে বসিয়ে দেন। তিনি উষ্ট্রীর হাঁটুতে পা রেখে পিতাকে বললেন ঃ আল্লাহর কসম! তুমি মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত সবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে' –এ কথার ব্যাখ্যা না কর। এই বাক্যে সবল কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ, না তুমি? পুত্র পিতার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল এবং যারা এ পথ অতিক্রম করছিল তারা পুত্র আব্দুল্লাহকে তিরস্কার করছিল যে, পিতার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করছ কেন? অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উষ্ট্রী তাদের কাছে আসল, তখন তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল ঃ আব্দুল্লাহ এই বলে তার পিতার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন যে, মুনাফিক ইবনে উবাই বেগতিক হয়ে পুত্রের কাছে বলে যাচ্ছে ঃ আমি তো ছেলেপেলে ও নারীদের চাইতেও অধিক লাঞ্ছিত। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ পুত্রকে বললেন ঃ তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে মদিনায় যেতে দাও।

সূরা মুনাফিকূন অবতরণের পটভূমি এতটুকুই। এই কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে একথাও বলা হয়েছে যে, বনি-মুস্তালিক যুদ্ধের জন্যে আসলে উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা.)-এর পিতা হারেস ইবনে যেরার দায়ী ছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা হযরত জুয়ায়রিয়া (রা.)-কে ইসলাম গ্রহণ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্নী হওয়ার গৌরব দান করেন। তাঁর পিতা হারেসও পরে মুসলমান হয়ে যান।

এ ঘটনা মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ ইত্যাদি কিতাবে এভাবে বর্ণিত আছে যে, মুস্তালিক গোত্র পরাজিত হলে তাদের কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীও মুসলমানদের করতলগত হয়। ইসলামি আইন অনুযায়ী সব কয়েদী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। কয়েদীদের মধ্যে হারেস ইবনে যেরারের কন্যা জুয়ায়রিয়াও ছিলেন। তিনি সাবেত ইবনে কায়েস (রা.)-এর ভাগে পড়েন। সাবেত (রা.) জুয়ায়রিয়াকে কিতাবতের প্রথায় মুক্ত করে দিতে চাইলেন। এর অর্থ এই যে, দাস অথবা দাসী মেহনত-মজুরি করে অথবা ব্যবসায়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে মালিককে দিলে সে মুক্ত হয়ে যেত।

জুয়ায়রিয়ার জিম্মায় মোটা অংকের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা পরিশোধ করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন ঃ আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ এক তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর নিজের ঘটনা শুনালেন যে, সাবেত ইবনে কায়েস (রা.) আমার সাথে কিতাবতের চুক্তি করেছে। কিন্তু কিতাবতের অর্থ পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং সাথে সাথে তাঁকে মুক্ত করে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জুয়ায়রিয়ার জন্যে এর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারত! তিনি সানন্দে প্রস্তাব মেনে নিলেন।

এইভাবে তিনি পুণ্যময়ী বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উম্মুল-মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা.) বর্ণনা করেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বনি-মুস্তালিক যুদ্ধে গমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, ইয়াসরিবের (মদিনার) দিক থেকে চাঁদ রওয়ানা হয়ে আমার কোলে এসে লুটিয়ে পড়েছেন। তখন আমি এই স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্তু এখন তার ব্যাখ্যা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

তিনি ছিলেন গোত্রপতির কন্যা। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুণ্যময়ী বিবিদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন, তখন এর শুভ প্রতিক্রিয়া তাঁর গোত্রের উপরও প্রতিফলিত হয়। তাঁর সাথে বন্দিনী অন্যান্য নারীরাও এই শুভবিবাহের উপকারিতা লাভ করল। কেননা এই বিবাহের কথা জানাজানি হওয়ার পর যে যে মুসলমানের কাছে তাঁর আত্মীয় কোনো বন্দিনী ছিল, তারা সবাই তাদেরকে মুক্ত করে দিল। এভাবে একশ' বন্দিনী তাঁর সাথে মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তাঁর পিতাও রাসলুল্লাহ ﷺ -এর একটি মু'জিযা দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন।

এই ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ : উপরিউক্ত ঘটনা সূরা মুনাফিকূনের তাফসীর বোঝার পক্ষে যেমন সহায়ক, তেমনি এতে প্রসঙ্গত নৈতিক চরিত্র, রাজনীতি ও সামাজিকতা সম্পর্কত অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ এবং সমস্যার সমাধানও নিহিত রয়েছে। তাই এখানে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সঙ্গত মনে করা হচ্ছে। দিকনির্দেশগুলো এই :

ইসলামে বর্ণ, বংশ, ভাষা এবং দেশি বিদেশীর পার্থক্য মূল্যহীন : বনি-মুস্তালিক যুদ্ধে সংঘটিত একজন আনসার ও একজন মুহাজিরের ঝগড়া এবং উভয় পক্ষ থেকে আনসার ও মুহাজির সম্প্রদায়কে আহ্বান করার সমগ্র ব্যাপারটি ছিল বিলীয়মান জাহিলিয়াত যুগের একটি প্রভাব বিশেষ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অপপ্রভাবের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন এবং যে কোনো স্থানের অধিবাসী, যে কোনো বর্ণ, ভাষা, বংশ ও সম্প্রদায়ের মুসলমানদেরকে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় ভ্রাতৃত্ববন্ধনের অনুভূতিতে উদ্বেলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি আনসার ও মুজাজিরগণের মধ্যে নিয়মিত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে তাদেরকে অভিন্ন ইসলামি সমাজে গ্রথিত করেছিলেন। কিন্তু শয়তান তার চিরাচরিত জালে মানুষকে আবদ্ধ করে পারস্পরিক ঝগড়-বিবাদের সময় সম্প্রদায়, দেশ, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদিকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ভিত্তিরূপে প্রকট করে তোলে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামি মাপকাঠির ন্যায় ও সুবিচার মানুষের চিন্তাধারা থেকে উধাও হয়ে যায় এবং শুধু গোষ্ঠী ও জাতীয়তার ভিত্তিতে একে অপরকে সাহায্য করার নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে শয়তান মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত করে। উপরিউক্ত ঝগড়ার ঘটনায়ও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যথাসময়ে অকুস্থলে পৌছে এই অনর্থের অবসান ঘটান এবং বলেন যে, এটা মূর্খতা ও কুফরের দুর্গন্ধযুক্ত অনুভূতি। এ থেকে বিরত হও। অতঃপর তিনি সবাইকে কুরআনি সহযোগিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এই নীতি হচ্ছে :

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য কাউকে সাহায্য করা ও কারও কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার মাপকাঠি এই যে, যে ব্যক্তি ন্যায় ও সুবিচারে অবিচল, তাকে সাহায্য কর, যদিও সে বংশ, পরিবার, ভাষা ও দেশগতভাবে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে, তাকে কখনও সাহায্য করো না, যদিও সে তোমার পিতা ও ভ্রাতা হয়। এই যৌক্তিক ও ন্যায়ভিত্তিক মাপকাঠিই ইসলাম কায়েম করেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি পদক্ষেপে এ নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন ও সবাইকে এর অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি বিদায় হজের সর্বশেষ ভাষণে ঘোষণা করেন : মূর্খতা যুগের সকল কু-প্রথা আমার পদতলে পিষ্ট হয়েছে। এখন আরব, অনারব, কৃষ্ণকায়, শ্বেতকায় এবং দেশী ও বিদেশীর প্রতিমা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামি ভিত্তি একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ। সবাইকে এর অনুগামী হতে হবে।

এই ঘটনা আমাদেরকে এ শিক্ষাও দিয়েছে যে, ইসলামের শত্রুরা আজ থেকে নয়, আদিকাল থেকেই মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য গোষ্ঠীগত ও দেশগত জাতীয়তার অস্ত্র ব্যবহার করেছে। তারা যখন ও যে মুহূর্তে সুযোগ পায়, এই অস্ত্র ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

পরিতাপের বিষয়, দীর্ঘকাল থেকে মুসলমানরা আবার এই শিক্ষা ভুলে গেছে এবং বিজাতীয় শত্রুরা মুসলমানদের ইসলামী ঐক্য খণ্ড-বিখণ্ড করার কাজে আবার সে শয়তানি চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছে। ধর্ম ও ধর্মীয় মূলনীতির প্রতি উদাসীনতার করছে আজকের যুগের মুসলমানরা এই জালে আবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে গেছে এবং কুফর ও ধর্মদ্রোহিতার মোকাবিলায় তাদের একক শক্তি বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেবল আরব ও অনারবই নয়, মিসর, সিরীয়া, হেজাযী, ইয়ামেনীও আজ পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ নয়। এ উপমহাদেশেও পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধী, হিন্দী, পাঠান এবং বেলুচরাও পারস্পরিক কলহের শিকার হয়ে গেছে। ইসলামের শত্রুরা আমাদের মধ্যকার তুচ্ছ বৈষয়িক কলহবিবাদ নিয়ে খেলায় মেতেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে এবং আমরা সর্বত্রই পরাজিত ও দাসসুলভ চিন্তাধারার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে তাদের কাছেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছি। আল্লাহ করুন, আজও যদি মুসলমানরা কুরআনের মূলনীতি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, বিজাতির ভরসায় জীবন ধারণ করার পরিবর্তে স্বয়ং ইসলামি সমাজকে সুসংহত করে এবং বর্ণ, বংশ, ভাষা ও স্ব-স্ব ভৌগোলিক সীমারেখার প্রতিমাকে আবার একবার ভেঙ্গে মিসমার করে দেয়, তবে আজও তারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সমর্থন খোলা চোখেই প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে।

ইসলামি মূলনীতিতে সাহাবায়ে কেরামের অপূর্ব দৃঢ়তা : উপরিউক্ত ঘটনা এ কথাও ব্যক্ত করেছে যে, যদিও শয়তান সাময়িকভাবে কিছু লোককে মূর্খতা যুগের শ্লোগানে লিপ্ত করে দিয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। সামান্য হুশিয়ারি পেয়ে সবাই ভ্রান্ত ধারণা থেকে তওবা করে নেয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত এবং সম্ভ্রম এমনই বদ্ধমূল ছিল, যাতে আত্মীয়তা ও জাতীয়তা সম্পর্কে কোনোরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। এর প্রমাণ এই ঘটনায় প্রথমে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-এর বিবৃতি থেকে ফুটে উঠেছে। তিনি নিজেও ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক এবং ইবনে উবাই ছিল গোত্রের সরদার। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) ও তার সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু যখন মাননীয় সরদারের মুখে মু'মিন, মুহাজির ও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কথাবার্তা উচ্চারিত হলো, তখন তিনি সহ্য করতে পরলেন না। সেই মজলিসেই সরদারকে দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলেন। আজ-কালকার গোষ্ঠী প্রীতি হলে তিনি কখনও আপন গোত্র সরদারের এই কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছাতেন না।

এই ঘটনায় স্বয়ং ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ (রা.)-এর আচরণ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছে যে, তার মহব্বত ও সম্ভ্রম কেবল আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি যখন পিতার মুখে বিরুদ্ধাচরণের কথাবার্তা শুনলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে হাজির হয়ে নিজ হাতে পিতার মস্তক কেটে আনার প্রস্তাব রাখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করে দিলে মদিনার সন্নিকটে পৌঁছে পিতার সওয়ারী বসিয়ে দিলেন এবং মদিনায় প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে পিতাকে এ কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করলেন যে, সম্মানের অধিকারী একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সে নিজে হেয় ও লাঞ্ছিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুমতি লাভের পূর্বে পিতার পথ খুলে দিলেন না। এই দৃশ্য দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখে উচ্চারিত হয়।

تونخل خوش ثمر کیستی که سرو و سمن * همه زخویش بریدند وبا تو پیوستند

এ ছাড়া বদর, ওহুদ ও আহযাবের যুদ্ধগুলো তো তরবারির মাধ্যমে এই সম্প্রদায় প্রীতি ও স্বদেশ প্রীতির প্রতিমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে উড়িছে দিয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোনো সম্প্রদায়, দেশ, বর্ণ ও ভাষার মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই। যারা আল্লাহ ও রাসূলকে মানে না, তারা সত্যিকার ভাই ও পিতা হলেও দুশমন।

هزار خویش که بیگانه ازخدا باشد * خدائے یك تن بیگانه کا شنا باشد

মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদেরকে ভুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা করার গুরুত্ব : এই ঘটনা আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, যে কাজ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বৈধ, কিন্তু তা বাস্তবায়নে মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থেকে অথবা শত্রুরা ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করে, সেই কাজ না করাই কর্তব্য। উদাহরণত রাসূলুল্লাহ ﷺ মুনাফিক সরদার ইবনে উবাইয়ের কপটতা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠার পরও হযরত ওমর (রা.)-এর এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নি যে, তাকে হত্যা করা হোক। কেননা এতে আশঙ্কা ছিল যে, শত্রুরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করবে এবং বলবে : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকেও হত্যা করেন।

কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, যে সব কাজ শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য নয়, সে সব কাজ মোস্তাহাব হলেও ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কার কারণে বর্জন করা যায়। কিন্তু শরিয়তের মূল উদ্দেশ্যকে এ ধরনের আশঙ্কার কারণে ত্যাগ করা যায় না; বরং এরূপ ক্ষেত্রে আশঙ্কা অবসানের চেষ্টা করতে হবে এবং কাজটি বাস্তবায়ন করতে হবে। এখন সূরার বিশেষ বিশেষ বাক্যের ব্যাখ্যা দেখুন :

وَاِذَاقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ : মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সূরা মুনাফিকূন নাজিল হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কসম সবই মিথ্যা। এই মুনাফিক সরদারের হিতাকাঙ্ক্ষায় কেউ কেউ তাকে বলল ঃ তুই জানিস কুরআনে তোর সম্পর্কে কি নাজিল হয়েছে? এখনও সময় আছে, তুই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাজির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোর জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। সে উত্তরে বলল ঃ তোমরা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছিলে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এরপর তোমরা আমাকে অর্থ-সম্পদের জাকাত দিতে বলেছিলেন, আমি তাও দিতেছি। এখন আর কি বাকি রইল? আমি কি মুহাম্মদ ﷺ-কে সেজদা করব? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যখন তার অন্তরে ঈমানই নেই, তখন তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা উপকারী হতে পারে না।

এই ঘটনার পর ইবনে উবাই মদিনায় পৌঁছে বেশিদিন জীবিত থাকেনি- শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। –(মাযহারী)

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا

জাহজাহ মুহাজির ও সিনান আনসারীর ঝগড়ার সময় ইবনে উবাই-ই একথা বলেছিল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহর হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোনো সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির পরিচায়ক। তাই কুরআন পাক এস্থলে لَا يَفْقَهُوْنَ বলে ব্যক্ত করেছে যে, যে এরূপ মনে করে, সে বেওকুফ ও নির্বোধ।

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ : এটাও ইবনে উবাইয়ের উক্তি। এই উক্তির ভাষা অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ছিল না যে, সে নিজেকে এবং মদিনার আনসারগণকে শক্তিশালী ও ইজ্জতদার এবং এর বিপরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুহাজির সাহাবায়ে-কেরামকে দূর্বল ও হেয় বলে প্রকাশ করেছিল। সে মদীনার আনসারগণকে উত্তেজিত করেছিল, যাতে তারা এই দূর্বল ও 'হেয়' লোকদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা এর জওয়াবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়েছেন যে, যদি ইজ্জতওয়ালারা 'হেয়' লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কুফল তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কেননা ইজ্জত তো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদের প্রাপ্য। কিন্তু মূর্খতার কারণে তোমরা এ সম্পর্কে বে-খবর। এখানে কুরআন لَا يَعْلَمُوْنَ এবং এর আগে لَا يَفْقَهُوْنَ শব্দ ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, কোনো মানুষ নিজেকে অন্যের রিজিকদাতা মনে করলে এটা নিরেট জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপন্থি এবং নির্বুদ্ধিতার আলামত। পক্ষান্তরে ইজ্জত ও অপমান দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে লাভ করে। তাই এত বিভ্রান্তি হলে সেটা বেখবর ও অনভিজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ। তাই এখানে لَا يَعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ : এই সূরার প্রথম রুকুতে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াই ছিল এসব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহ্যত ঃ নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পিছনে ব্যয় করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল, এর পশ্চাতেও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় রুকুতে খাঁটি মুমিনদেকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দু'টি সর্ববৃহৎ-ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দু'টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সম্ভারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েজই নয়-ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে পাঞ্জেগানা নামাজ, কারও মতে হজ ও জাকাত এবং কারও মতে কুরআন। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন ঃ স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদত। এই অর্থ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। –(কুরতুবী)

সারকথা এই যে, আল্লাহর স্মরণ তথা ইবাদত থেকে মানুষকে গাফেল করে না, এতটুকু পর্যন্ত সাংসারিক বিষয়াদিতে ব্যাপৃত থাকার অনুমতি আছে। সাংসারিক বিষয়াদিতে এতটুকু ডুবে যাওয়া উচিত নয় যে, ফরজ ও ওয়াজিব কর্মে বিঘ্ন দেখা দেয় অথবা হারাম ও মাকরূহ কাজে লিপ্ত হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। যারা সাংসারিক কাজে এরূপ মগ্ন হয়ে পড়ে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : اُولٰۤئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ অর্থাৎ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ তারা পরকালের মহান ও চিরন্তন নিয়ামতসমূহের পরিবর্তে দুনিয়ার নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত অবলম্বন করে। এর চাইতে বড় ক্ষতি আর কি হবে!

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ : এই আয়াতে মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট থাকা অবস্থায় তোমাদের ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে পরকালের পুঁজি করে নাও। নতুবা মৃত্যুর পর এই ধন-সম্পদ তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ যাবতীয় ইবাদত ও শরিয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করা।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার দু'টি কারণ হতে পারে। (এক) আল্লাহ ও তাঁর আদেশ নিষেধ পালনে মানুষকে গাফেলকারী সর্ববৃহৎ বস্তু হচ্ছে ধন-সম্পদ। তাই জাকাত, ওশর, হজ ইত্যাদি আর্থিক ইবাদত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। (দুই) মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, কাযা নামাজগুলো পড়ে নেবে, কাযা হজ আদায় করবে অথবা কাযা রোজা রাখবে, কিন্তু ধন-সম্পদ সামনে থাকে এবং এ বিশ্বাস হয়েই যায় যে, এখন এই ধন তার হাত থেকে চলে যাবে। তখনও তাড়াতাড়ি ধন-সম্পদ ব্যয় করে আর্থিক ইবাদতের ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া দান-খয়রাত যাবতীয় আপদ-বিপদ দূর করার ব্যাপারেও কার্যকর।

সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল : কোন সদকায় সর্বাধিক ছওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেন : যে সদকা সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে– অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকা অবস্থায় করা হয়। তিনি আরও বললেন : আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না যখন আত্মা তোমার কণ্ঠনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বল : এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় কর।

فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, যে ব্যক্তির জিম্মায় জাকাত ফরজ ছিল; কিন্তু আদায় করেনি অথবা হজ ফরজ ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে : আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই; অর্থাৎ মৃত্যু আরও কিছু বিলম্বে আসুক, যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে নেই এবং ফরজ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাই। وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ কিছু অবকাশ পেলে এমন সৎকর্ম করে নেব, যা দ্বারা সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরজ বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারাম ও মাকরূহ কাজ করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নিরর্থক।

শব্দ বিশ্লেষণ :

جَآءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَجِيْئٌ মূলবর্ণ (ج - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং اجوف يائى) অর্থ– আসে। আগমন করে।

اِتَّخَذُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (ا - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা ব্যবহার করে, গ্রহণ করে।

اَلْمُنَافِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَافَقَةُ মূলবর্ণ (ن - ف - ق) জিনস صحيح অর্থ- মুনাফিক পুরুষ, কপট ব্যক্তি, দ্বিচারী বা দ্বিমুখী লোক।

نَشْهَدُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার شَهَادَةٌ মূলবর্ণ (ش - ه - د) জিনস صحيح অর্থ– আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।

يَعْلَمُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার عِلْمٌ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– অবগত আছেন।

اَيْمَانَهُمْ : তাদের শপথ। এটি يَمِيْنٌ -এর বহুবচন। يَمِيْنٌ -এর আসল অর্থ, ডান হাত বা ডান দিক। যা রূপকভাবে কসমের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

جُنَّةً : অর্থ- ঢাল, রক্ষাবর্ম, আশ্রয়, রক্ষা, বহুবচনে جُنَنٌ আসে। এটি جَنٌّ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ, ঢেকে নেওয়া ও আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা, কোনো জিনিস ইন্দ্রিয় থেকে গোপন থাকা। বস্তুতঃ ঢাল দ্বারা দেহকে গোপন করা হয়। বিধায় একে جُنَّةٌ বলা হয়।

صَدُّوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَدٌّ. صُدُوْدٌ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা প্রতিরোধ করে।

سَاءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার سَوْءٌ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ء) জিনস মুরাক্কাব, (مهموز لام এবং اجوف واوى) অর্থ– মন্দ হয়েছে।

طُبِعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَتَحَ মাসদার طَبْعٌ মূলবর্ণ (ط ـ ب ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– মহর মেরে দেওয়া হয়েছে।

لَا يَفْقَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف نفى বাব سَمِعَ মাসদার فِقْهٌ মূলবর্ণ (ف ـ ق ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– তারা বুঝছে না।

رَاَيْتَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ টা هُمْ ضمير منصوب متصل মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ– আপনি তাদেরকে দেখবেন।

تُعْجِبُكَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْجَابٌ ضمير منصوب متصل ـ ك মূলবর্ণ (ع ـ ج ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– আপনাকে চমৎকৃত করবে।

اَجْسَامُهُمْ : অর্থ, তাদের অবয়ব বা শরীর। এটি جسم -এর বহুবচন।

خُشُبٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে خَشَبٌ অর্থ– লাকড়ি। কাঠ।

مُسَنَّدَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَسْنِيْدٌ মূলবর্ণ (س – ن – د) জিনস صحيح অর্থ– যা (দেয়ালের) সহায়তায় লগানো রয়েছে।

يُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اِفْكٌ মূলবর্ণ (ا – ف – ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা (সত্য হতে ফিরে) যাচ্ছে।

تَعَالَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَعَالِىْ মূলবর্ণ (ع – ل – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আসা। উচ্চ হওয়া।

لَوَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَلْوِيَةٌ মূলবর্ণ ل – و – ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তারা ঘুরিয়ে নেয়।

يَصُدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَدٌّ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ-- তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

مُسْتَكْبِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِكْبَارٌ মূলবর্ণ (ك ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অহংকার ভরে।

لَمْ تَسْتَغْفِرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل مضارع منفى بلم বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِغْفَارٌ মূলবর্ণ (غ ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– ক্ষমা প্রার্থনা না করেন।

لَا تُنْفِقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْفَاقٌ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– ব্যয় করো না।

يَنْفَضُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْفِضَاضٌ মূলবর্ণ (ف ـ ض ـ ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে।

لَاتُلْهِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر معروف নহী حاضر বহছ افعال বাব إلهاء মাসদার (ل - ه - و) মূলবর্ণ জিনস ناقص واوى অর্থ– উদাসীন করো না, গাফেল করো না।

خٰسِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ سَمِعَ বাব خُسْرٌ মাসদার (خ - س - ر) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ- ক্ষতিগ্রস্ত, লোকসানগ্রস্ত, হীনকর্মকারী।

يَاْتِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع منصوب বহছ ضَرَبَ বাব إتْيَانٌ মাসদার (ا - ت - ى) মূলবর্ণ জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– এসে উপস্থিত হয়।

اَخَّرْتَنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر ماضى معروف বহছ تَفْعِيْل বাব تَاخِيْرٌ মাসদার (ء - خ - ر) মূলবর্ণ জিনস مهموز فاء অর্থ– অবকাশ প্রদান করলেন।

اَجَلٌ : অর্থ– মৃত্যু, নির্দিষ্ট সময়। তাই মৃত্যুকেও اَجَلٌ বলা হয়। কারণ মৃত্যুর সময়ও নির্ধারিত। বহুবচন اجال।

فَاَصَّدَّقَ : সীগাহ واحد متكلم مضارع معروف বহছ تَفَعُّلٌ বাব تَصَدُّقٌ মাসদার (ص - د - ق) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– আমি সদকা করে দিতাম।

خَزَائِنُ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে خَزِيْنَةٌ অর্থ– ধনভাণ্ডার সমূহ। গোডাউন। খাজানা।

لَيُخْرِجَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب فعل مستقبل معروف বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله در বাব إفْعَالٌ মাসদার إخْرَاجٌ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ– বহিষ্কার করে দিবে। বের করা।

اَعَزُّ : সীগাহ واحد مذكر اسم تفضيل বহছ ضَرَب বাব اَلْعِزُّ মাসদার (ع - ز - ز) মূলবর্ণ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সম্মানীগণ। বেশি ক্ষমতাশালী। অধিক শক্তিশালী।

اَذَلُّ : সীগাহ واحد مذكر اسم تفضيل বহছ ضَرَبَ বাব اَلذُّلُّ মাসদার (ذ - ل - ل) মূলবর্ণ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– হীন লোক। অধিক লাঞ্ছিত।

يَنْفَضُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ اِنْفِعَالٌ বাব اِنْفِضَاضٌ মাসদার মূলবর্ণ (ف - ض - ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা ছড়িয়ে যাবে, বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

لَنْ يُّؤَخِّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع منصوب بلن বহছ تَفْعِيْل বাব تَاخِيْرٌ মাসদার মূলবর্ণ (ء - خ - ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– কখনো অবকাশ দেন না।

تَعْمَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر مضارع معروف বহছ سَمِعَ বাব عَمَلٌ মাসদার (ع - م - ل) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের সমস্ত কার্যাবলি সম্বন্ধে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : এখানে اِتَّخَذُوْا ফে'ল আর যমীর হলো ফায়েল। আর اَيْمَانَهُمْ হলো প্রথম মাফউলে বিহী। আর جُنَّةً হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। আর فَصَدُّوْا -এর فاء টি আতেফা। صَدُّوْا ফে'ল যমীর ফায়েল। আর عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ টা صَدُّوْا -এর সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ৫২৭]

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা তাগাবুন

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত- ১৮, রুকূ'- ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. যা আসমানসমূহে, আর যা জমিনে রয়েছে, সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তার জন্যই আধিপত্য, আর তিনিই প্রশংসার যোগ্য, আর তিনিই সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।	يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ①
২. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, পরন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কাফের এবং কেউ কেউ মুমিন; আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি দেখছেন।	هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ②
৩. তিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন। এবং সুন্দর আকৃতি গঠন করেছেন, আর তারই নিকট (সকলের) ফিরে যেতে হবে।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③
৪. তিনি সবকিছু অবগত আছেন- যা আসমানসমূহ ও জমিনে আছে, আর ঐ সমস্ত বিষয়ও অবগত আছেন- যা তোমরা গোপনে করে থাক আর যা তোমরা প্রকাশ্যে করে থাক; আর আল্লাহ অন্তরসমূহের কথাও অবগত আছেন।	يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ④

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ যা আসমান সমূহে আর যা জমিনে রয়েছে لَهُ الْمُلْكُ তার জন্যই আধিপত্য وَلَهُ الْحَمْدُ, আর তিনিই প্রশংসার যোগ্য وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ, আর তিনিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

২. هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন فَمِنْكُمْ كَافِرٌ পরন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কাফের وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ এবং কেউ কেউ মুমিন وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ, আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি দেখছেন।

৩. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ তিনি আসমান সমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন بِالْحَقِّ যথাযথ ভাবে وَصَوَّرَكُمْ, এবং তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ এবং সুন্দর আকৃতি গঠন করেছেন وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ, আর তারই নিকট ফিরে যেতে হবে।

৪. يَعْلَمُ তিনি সবকিছু অবগত আছেন مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ আসমান সমূহ ও জমিনে যা আছে وَيَعْلَمُ, আর ঐ সমস্ত বিষয়ও অবগত আছেন مَا تُسِرُّوْنَ যা তোমরা গোপনে করে থাক وَمَا تُعْلِنُوْنَ, আর যা তোমরা প্রকাশ্যে করে থাক وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ, আর আল্লাহ অন্তর সমূহের কথাও অবগত আছেন।

৫. তোমাদের নিকট কি ঐ সমস্ত লোকের সংবাদ পৌছেনি? যারা পূর্বে কুফরি করেছে, অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের কঠোর পরিণাম (ইহজগতেও) আস্বাদন করেছে আর (পরজগতেও) তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।	اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ز فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٥﴾
৬. এটা এ কারণে যে, তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের নিকট আসলেন, তখন তারা বলল, তবে কি মানুষ আমাদেরকে হেদায়েত করবে? ফলকথা, তারা কুফরি করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, আর আল্লাহ (-ও তাদের কোনো) পরোয়া করেনি; আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসনীয়।	ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٦﴾
৭. কাফেররা এই দাবি করে যে, তাদেরকে কখনো পুনর্জীবিত করা হবে না; আপনি বলে দিন কেন করা হবে না? আল্লাহর কসম, নিশ্চয় তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে, অনন্তর তোমরা যা কিছু করেছ, সমস্তই তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে; আর তা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।	زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧﴾
৮. অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর, আর সে নূরের উপর যা আমি নাজিল করেছি, ঈমান আন; আর আল্লাহ তো তোমাদের সমস্ত কার্যের পূর্ণ খবর রাখেন।	فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. اَلَمْ يَاْتِكُمْ তোমাদের নিকট কি পৌছেনি نَبَؤُا الَّذِيْنَ ঐ সমস্ত লোকের সংবাদ যারা كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ পূর্বে কুফরি করেছে فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ অতঃপর তারা তাদের কৃত কর্মের কঠোর পরিণাম আস্বাদন করেছে وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ আর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

৬. ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ এটা এ কারণে যে, كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট আসলেন بِالْبَيِّنٰتِ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ فَقَالُوْٓا তখন তারা বলল اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا তবে কি মানুষ আমাদেরকে হেদায়েত করবে فَكَفَرُوْا ফলকথা তারা কুফরি করল وَتَوَلَّوْا মুখ ফিরিয়ে নিল وَاسْتَغْنَى اللّٰهُ আর আল্লাহ-ও তাদের কোনো পরওয়া করেননি وَاللّٰهُ غَنِيٌّ আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী حَمِيْدٌ প্রশংসনীয়।

৭. زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا কাফেররা এই দাবি করে যে, اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا তাদেরকে কখনো পুনর্জীবিত করা হবে না قُلْ আপনি বলে দিন بَلٰى কেন করা হবে না وَرَبِّيْ আল্লাহর কসম لَتُبْعَثُنَّ তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ অনন্তর সমস্তই তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে بِمَا عَمِلْتُمْ তোমরা যা কিছু করেছ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ আর এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

৮. فَاٰمِنُوْا অতএব তোমরা ঈমান আন بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا এবং সেই নূরের উপর যা আমি নাজিল করেছি وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ আর আল্লাহ তো তোমাদের সমস্ত কাজের পূর্ণ খবর রাখেন।

৯. যেদিন তোমাদেরকে ঐ সমবেত হওয়ার দিবসে একত্রিত করবেন, এটাই লাভ-লোকসানের দিন; আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, আল্লাহ মোচন করে দিবেন, তার গুনাহসমূহ এবং তাকে এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নহরসমূহ বইবে, যেখানে তারা সর্বদা অবস্থান করবে; এটা বিরাট সফলতা।	يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾
১০. আর যারা কুফরি করে এবং আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে, তারা দোজখের অধিবাসী, তথায় তারা সর্বদা থাকবে; আর তা নিকৃষ্ট আবাসস্থল।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٠﴾
১১. কোনো বিপদই আল্লাহর নির্দেশ ভিন্ন আসে না; আর যে আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান রাখে, আল্লাহ তার অন্তরকে (ধৈর্যধারণ ও সন্তুষ্ট থাকার) পথ দেখিয়ে দেন; আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন।	مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١﴾
১২. আর তোমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন কর এবং রাসূলের নির্দেশ পালন কর, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল পৌঁছে দেওয়া।	وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ যেদিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন لِيَوْمِ الْجَمْعِ ঐ সমবেত হওয়ার দিবসে ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ এটাই লাভ-লোকসানের দিন وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে وَيَعْمَلْ صَالِحًا এবং নেক কাজ করবে يُّكَفِّرْ عَنْهُ আল্লাহ মোচন করে দিবেন سَيِّاٰتِهٖ তার গুনাহ সমূহ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ এবং তাকে এমন উদ্যানে দাখিল করবেন تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশে নহর সমূহ বইবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا যেখানে তারা সর্বদা অবস্থান করবে ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এটা বিরাট সফলতা।

১০. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কুফরি করে থাকবে وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ এবং আমার আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করে থাকবে اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ তারা দোজখের অধিবাসী خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তথায় তারা সর্বদা থাকবে وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ আর তা নিকৃষ্ট আবাসস্থল।

১১. مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ কোনো বিপদই আসে না اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর নির্দেশ ভিন্ন وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ আর যে আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান রাখে يَهْدِ قَلْبَهٗ আল্লাহ তার অন্তরকে পথ দেখিয়ে দেন وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন।

১২. وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ আর আল্লাহর নির্দেশ পালন কর وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ এবং রাসূলের নির্দেশ পালন কর فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল পৌঁছে দেওয়া।

১৩. আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন কেউ মা'বূদ নেই; আর আল্লাহর উপরই মুমিনগণের ভরসা রাখা উচিত।	اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١٣
১৪. হে মুমিনগণ! (তোমাদের এরূপ মনে করা উচিত যে,) তোমাদের কতক স্ত্রী এবং কতক সন্তান তোমাদের (ধর্মের) শত্রু (যখন তারা তোমাদেরকে এমন নির্দেশ দেয়, যা পরলোকের ক্ষতির কারণ হয়), সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাক, আর যদি (তারা তওবা করে তখন) তোমরা ক্ষমা কর এবং (শাস্তি না দিয়ে) এড়িয়ে যাও এবং মার্জনা কর, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, অনুগ্রহশীল।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٤
১৫. তোমাদের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা মাত্র; আর (যে তাতে নিমগ্ন থেকেও আল্লাহকে স্মরণ রাখে, তার জন্য) আল্লাহর নিকট বিরাট প্রতিদান রয়েছে।	اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝١٥
১৬. অতএব, তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং (তার বিধানাবলি) শ্রবণ কর ও মান্য কর, আর ব্যয় কর, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে; আর যে প্রবৃত্তির লালসা হতে রক্ষিত রয়েছে, এরূপ লোকই সফলকাম হবে।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝١٦

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন কেউ মাবুদ নেই وَعَلَى اللّٰهِ আর আল্লাহর উপরই فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ মুমিনগণের ভরসা রাখা উচিত।

১৪. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে মুমিনগণ اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ তোমাদের কতক স্ত্রী এবং কতক সন্তান عَدُوًّا لَّكُمْ তোমাদের (ধর্মের) শত্রু فَاحْذَرُوْهُمْ সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাক وَاِنْ تَعْفُوْا আর যদি তোমরা ক্ষমা কর وَتَصْفَحُوْا এবং এড়িয়ে যাও وَتَغْفِرُوْا এবং মার্জনা কর فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল رَّحِيْمٌ অনুগ্রহশীল ;

১৫. اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ তোমাদের ধন সম্পত্তি এবং সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা মাত্র وَاللّٰهُ عِنْدَهٗۤ আর আল্লাহর নিকট রয়েছে اَجْرٌ عَظِيْمٌ বিরাট প্রতিদান।

১৬. فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক مَا اسْتَطَعْتُمْ যথাসম্ভব وَاسْمَعُوْا এবং (তাঁর বিধানাবলি) শ্রবণ কর وَاَطِيْعُوْا ও মান্য কর وَاَنْفِقُوْا আর ব্যয় কর خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে وَمَنْ يُّوْقَ আর যে রক্ষিত রয়েছে شُحَّ نَفْسِهٖ প্রবৃত্তির লালসা হতে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এরূপ লোকই সফলকাম হবে।

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে উত্তমরূপে ঋণ দাও, তবে তিনি তা তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করতে থাকবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন; বস্তুতঃ আল্লাহ অতিশয় গুণগ্রাহী, সহিষ্ণু ।	إِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٧﴾
১৮. তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য (বিষয়) -এর জ্ঞাতা, মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় ।	عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. إِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম রূপে কর্জ দাও يُضٰعِفْهُ لَكُمْ তবে তিনি তা তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করতে থাকবেন وَيَغْفِرْ لَكُمْ এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ বস্তুত আল্লাহ অতিশয় গুণগ্রাহী, সহিষ্ণু ।

১৮. عٰلِمُ তিনি জ্ঞাতা الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ গুপ্ত ও প্রকাশ্য (বিষয়) -এর الْعَزِيْزُ মহা পরাক্রান্ত الْحَكِيْمُ প্রজ্ঞাময় ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরায় বর্ণিত নয় নং আয়াত ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ -এর- تَغَابُنْ শব্দ হতে এ সূরার নাম রাখা হয়েছে । আর ধোঁকা বা প্রতারণা সাদৃশ্য হবে কিয়ামতের দিন, অর্থাৎ সেদিন ঈমানদারগণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানগুলো কাফেররা দখল করবে । অথবা তার বিপরীত হবে, আপাত দৃষ্টিতে তখন তা ধোঁকা বলে মনে হবে, সে বিষয়টি সম্পর্কেও অত্র সূরায় বর্ণনা রয়েছে । সে একটি বিষয়ের উপর পূর্ণ সূরার নামকরণ করা হয়েছে । অত্র সূরায় ২টি রুকূ', ১৮টি আয়াত, ২৪১টি বাক্য এবং ১০৭০টি অক্ষর রয়েছে । -[নূরুল কুরআন]

সূরাটির অবতীর্ণ কাল : হযরত মুকাতিল ও কালবী (র.) বলেন, এ সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর অপর অংশ মদিনায় । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) বলেন, শুরু হতে ১৩নং আয়াত পর্যন্ত অংশটুকু মাক্কী আর ১৪নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মাদানি; কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এ পূর্ণ সূরাটিই মাদানি, হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে । যদিও এ সূরায় এমন কোনো ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে তার নাজিল হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু তার মূল বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করলে একটা ধারণা এই হয় যে, সম্ভবত তা হিজরতের পর মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়ে থাকবে । এ কারণেই হয়তো তাতে কিছুটা মাক্কী সূরার ভাবধারা আর কিছুটা মাদানী সূরার ভাবধারা পাওয়া যায় ।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এক. এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো ঈমান ও আনুগত্য গ্রহণের আহ্বান এবং উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদান । কথার পরম্পরা এরূপ যে, প্রথম চারটি আয়াতে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে । এখানে আল্লাহ তা'আলার কুদরত, মহত্ত্ব এবং বড়ত্বের আলোচনার পর মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহকে স্বীকার করে আর যারা তাঁকে স্বীকার করে না তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে । অতঃপর আবার আল্লাহর সিফাত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে ।

দুই : পঞ্চম আয়াত হতে **দশম** আয়াত পর্যন্ত সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে যারা কুরআনের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করেছে । এ ক্ষেত্রে অতীতের লোকদের উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে যারা মানুষ নবী হওয়ার কারণে নবীদের আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করেছিল, তাদের এ অস্বীকৃতির ফলে তাদের উপর যে আল্লাহর আজাব ও ক্ষোভ পতিত হয়েছিল পরে তা আলোচনা করা হয়েছে ।

তিন : একাদশ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহে কুরআনের আহ্বান যারা মেনে নিয়েছে তাদের লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে এবং তাদের আনুগত্য হতে বিমুখ না হতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর স্ত্রী-পুত্র ও সন্তানাদির শত্রুতা হতে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। শেষের দিকে আল্লাহর দীন কায়েমের লক্ষ্যে দান-সদকা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : ইমাম রাযী (র.) উভয় সূরার সম্পর্কের ব্যাপারে বলেছেন যে, সূরা আল-মুনাফিকূনে মিথ্যুক মুনাফিকদের মিথ্যাবাদিতা এবং প্রতারণার বিবরণ দিয়ে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর অত্র সূরায় মুনাফিকদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ হয়েছে যে, يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ অর্থাৎ 'আসমান জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন এবং তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর তিনি সবই জানেন।'

অতএব, প্রত্যেকের কর্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলার আজাবকে ভয় করা এবং পরকালীন জীবনের জন্য সম্বল সংগ্রহ করা। –(কাবীর)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ - (١٣)

শানে নুযূল–১ : ইমাম তিরমিযী ও হাকিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, মক্কার কিছু সংখ্যক লোক মুসলমান হয়ে মদিনায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ বাসস্থান হতে মদিনাভিমুখে রওয়ানা হলেন। এমতাবস্থায় তাদের সন্তানসন্ততি ও স্ত্রী-পুত্রগণ হায় হায় করে রোদন করতে লাগল, আরো বলতে লাগল, আমাদের কি উপায় হবে! আমাদের জীবন কিভাবে চলবে, আমাদেরকে কার নিকট রেখে যাচ্ছেন? এসব ক্রন্দন ও শোকাক্রান্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি তাকিয়ে তারা তাদের সমবেদনায় ভেঙ্গে পড়ল, অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তাই তারা এ সময় হিজরত করেননি। পরবর্তী কিছুদিন অপেক্ষা করে পুনরায় হিজরত করে মদিনায় চলে আসলেন। মদিনায় এসে দেখলেন, তাদের পূর্বে মক্কা হতে মদিনায় হিজরতকৃত সাহাবীগণ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সোহবত পেয়ে নবুয়তের আকর্ষণ গ্রহণ করে কেউ বা ফকীহ হলেন, আর কেউ বা ওলী হয়ে গেলেন। এটা দেখে তারা তাঁদের ওই সকল স্ত্রী পুত্রগণকে সাজা দিতে ও মারধর করতে চাইলেন। কেউ কেউ খাদ্য ইত্যাদি বন্ধ করে দিতে চাইলেন, যা তাদেরকে হিজরত করার জন্য প্রথম বাধা দান করেছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। (মা'আরিফ, আসবাবুন নুযূল, মায়ালিমুত তানযীল, ফাতহুল কাদীর, তিরমিযী, হাকিম (فِى الْمُسْتَدْرَكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

২. হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আতা ইবনে রাবাহ (রা.) বর্ণনা করেন। উক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা.)-এর প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছিল। তার ঘটনা এই ছিল যে, তিনি মদিনায় অবস্থান করতেন, যখন কোনো যুদ্ধ ও জিহাদের ডাক আসত তখন তিনি যুদ্ধের ময়দানের উদ্দেশ্যে বাহির হতেন; কিন্তু স্ত্রী পুত্রের কেউই তাঁকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পথ ছেড়ে দিত না। শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধে যেতেন না, কারণ সন্তান-সন্ততিরা বলতে থাকত যে, 'আমাদেরকে কার নিকট রেখে যাচ্ছেন, আমাদের কি উপায় হবে' এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করলেন। -[রূহুল বয়ান, ইবনে কাছীর]

উভয় বর্ণনা-ই শানে নুযূল হতে পারে। উভয়ের حَاصِلْ একই প্রতীয়মান হচ্ছে। কেননা আল্লাহর ফরজ আদায় করতে যে কেউ বাধা প্রদান করবে তারাই আল্লাহর শত্রু হবে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٤)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি এ আয়াতটি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, মক্কাবাসীদের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তারা নবী করীম ﷺ -এর কাছে হিজরত করে চলে আসতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসার জন্য ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে হিজরত করে আসতে সক্ষম হলেন, তখন দেখতে পেলেন যে, লোকেরা দ্বীনের বিষয়ে অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান হয়ে গেছে। এতদ্দর্শনে তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন। (কুরতুবী ১৮:১৪১, তিরমিযী)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا .... الاية (١٦)

শানে নুযূল : যখন সূরা আলে ইমরানের ১০২ নং আয়াত নাজিল হয় তখন এ হুকুমটি মুসলমানদের জন্য খুব কঠিন হয়ে গেল। এমনকি তারা এতো দীর্ঘ সময় নামাজে দাঁড়িয়ে থাকত যে, তাদের পা ফুলে যেত। তাদের কপাল ক্ষত হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা উক্ত হুকুমকে সহজ করার জন্য এই আয়াত নাজিল করেন। (কুরতুবী ১৮:১৪৫)

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন হয়ে গেছে। এখানে فَمِنْكُمْ এর فَاء অব্যয়টি এই অর্থ জ্ঞাপন করে যে, প্রথমে সৃষ্টি করার সময় কোনো কাফের ছিল না। এই কাফের ও মুমিনের বিভেদ পরে সেই ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীনে হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে দান করেছেন। এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার কারণেই মানুষের উপর গোনাহ্ ও ছওয়াব আরোপিত হয়। এক হাদীসেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান নির্মল স্বভাবধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। (যার ফলে তার মুমিন হওয়া স্বাভাবিক ছিল) কিন্তু এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান ইত্যাদিতে পরিণত করে। –(কুরতুবী)

দ্বিজাতি তত্ত্ব : কুরআন পাক এ স্থলে মানব জাতিকে দুই দলে বিভক্ত করেছে– কাফের ও মু'মিন। এতে বোঝা যায় যে, আদম সন্তানরা সবই এক গোষ্ঠীভুক্ত এবং বিশ্বের সমস্ত মানুষ এই গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গ। এই গোষ্ঠীকে ছিন্নকারী এবং আলাদা দল সৃষ্টিকারী বিষয় হচ্ছে একমাত্র কুফর। যে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়, সে মানবগোষ্ঠীর এই সম্পর্ককে ছিন্ন করে। এভাবে সমগ্র বিশ্বে মানুষের দলাদলি একমাত্র ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে হতে পারে। বর্ণ, ভাষা, বংশ, পরিবার ও দেশ ইত্যাদির মধ্য থেকে কোনোটিই মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে পারে না। এক পিতার সন্তানরা যদি বিভিন্ন শহরে বসবাস করে অথবা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে অথবা তাদের বর্ণ বিভিন্ন রূপ হয়, তবে তারা আলাদা আলাদা দল হয়ে যায় না। এসব বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা সবাই পরস্পরে ভাই ভাই গণ্য হয়ে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ তাদেরকে বিভিন্ন আখ্যা দিতে পারে না।

মূর্খতা যুগে বংশ ও গোত্রের বিভেদকে জাতীয়তা ও দলাদলির ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছিল। এমনিভাবে দেশ ও মাতৃভূমির ভিত্তিতে কিছু দলাদলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব প্রতিমাকে ভেঙ্গে দেন। তাঁর মতে মুসলমান যে কোনো দেশ, যে কোনো ভূখণ্ড, যে কোনো বর্ণ ও পরিবারের হোক, তারা এক গোষ্ঠীভুক্ত। কুরআন বলে : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ মু'মিনগণ সবাই পরস্পরে ভাই ভাই। এমনিভাবে কাফের যে কোনো দেশ অথবা সম্প্রদায়ের হোক, তারা সবাই এক মিল্লাত ও এক জাতি।

কুরআন পাকের উপরিউক্ত আয়াতও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এতে সমগ্র আদম সন্তানকে মু'মিন ও কাফের-এই দুই দলে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্ণ ও ভাষার বিভেদকে কুরআন আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং মানুষের জীবিকা সম্পর্কিত অনেক উপকার অর্জনের ভিত্তি হওয়ার কারণে একটি মহান অবদান আখ্যা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একে মানব জাতির মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির উপায় হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়নি।

ঈমান ও কুফরের কারণে দুই জাতির বিভেদ একটি ইচ্ছাধীন বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল। কেননা ঈমান ও কুফর উভয়টিই মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কেউ এক জাতীয়তা ত্যাগ করে অন্য জাতীয়তা অবলম্বন করতে চাইলে অতি সহজেই তা করতে পারে অর্থাৎ নিজের বিশ্বাস ও মতবাদ পরিবর্তন করে অন্য দলে শামিল হতে পারে। এর বিপরীতে বংশ, পরিবার, বর্ণ, ভাষা ও দেশ কোনো মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। কেউ নিজের বংশ ও বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে না। ভাষা ও দেশ যদিও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু যেসব জাতি ভাষা ও দেশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তারা স্বভাবত অন্য ভাষাভাষী ও অন্য দেশের অধিবাসীকে নিজেদের মধ্যে সাদরে গ্রহণ করতে সম্মত হয় না, যদিও সে তাদের ভাষা বলতে শুরু করে এবং তাদের দেশে বসবাস অবলম্বন করে।

এই ইসলামি গোষ্ঠী ও ঈমানী ভ্রাতৃত্বই অল্পদিনের মধ্যে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের এবং কৃষ্ণকায়, শ্বেতকায়, আরব ও আজমে অসংখ্য ব্যক্তিকে এক সুতায় গ্রথিত করে দিয়েছিল। এই শক্তির মোকাবিলা বিশ্বের জাতিসমূহ করতে পারেনি। তাই তারা সেই প্রতিমাগুলোকে পুনরায় জীবিত করার প্রয়াস পেল, যেগুলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছিলেন। তারা মুসলমানদের মহান ঐক্য শক্তিকে দেশ, ভাষা, বর্ণ, বংশ ও পরিবারের বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে

তাদেরকে পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত করে দিল। এভাবে শত্রুদের হীন মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ এরই অশুভ পরিণতি চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে মুসলমান একদা এক জাতি ও এক প্রাণ ছিল, তারা এখন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। অপরপক্ষে শয়তানি শক্তিগুলো পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও মুসলমানদের মোকাবিলায় এক জাতিই প্রতীয়মান হয়।

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ : তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুশ্রী করেছেন। আকৃতি তৈরি করা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্রষ্টার বিশেষ গুণ। এজন্যেই আল্লাহর নাম সমূহের মধ্যে مُصَوِّرٌ অর্থাৎ আকৃতিদাতা বর্ণিত আছে। চিন্তা করুন, সৃষ্টজগতে কত বিভিন্ন জাতি রয়েছে, প্রত্যেক জাতিতে কত বিভিন্ন শ্রেণি রয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণিতে লাখো বিভিন্ন ব্যক্তি রয়েছে। তাদের একজনের আকৃতি অপরজনের আকৃতির সাথে খাপ খায় না। একই মানব শ্রেণির মধ্যে দেশ ও ভূখণ্ডের বিভিন্নতার কারণে এবং বংশ ও জাতির বিভিন্নতার কারণে আকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তদুপরি তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির মুখাবয়ব অন্য সবার থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই বিস্ময়কর কারিগরি ও ভাস্কর্য দেখে জ্ঞানবুদ্ধি দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানুষের চেহারা ছয়-সাত বর্গ ইঞ্চির অধিক নয়। কোটি কোটি মানুষের একই ধরনের চেহারা সত্ত্বেও একজনের আকার অন্যজনের সাথে পুরোপুরি মিলে না যে, চেনা কঠিন হয়। আলোচ্য আয়াতে আকার নির্মাণের নিয়ামত উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ অর্থাৎ তিনি মানবাকৃতিকে সমগ্র সৃষ্টজগত ও সৃষ্টজীবের আকৃতি অপেক্ষা অধিক সুন্দর ও সুষম করেছেন। কোনো মানুষ তার দলের মধ্যে যতই কুৎসিত ও কদাকার হোক না কেন, অবশিষ্ট সকল জীবজন্তুর আকৃতির তুলনায় সে-ও সুশ্রী।

قَالُوٓا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا : بَشَرٌ শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থ দেয়। তাই يَهْدُونَ বহুবচন ক্রিয়াপদ তার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। মানবত্বকে নবুয়ত ও রেসালতের পরিপন্থি মনে করাও কাফেরদের একটি অলীক ধারণা ছিল। কুরআনে স্থানে স্থানে এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ এমন দেখা যায়, যারা নবী করীম ﷺ-এর মানবত্ব অস্বীকার করে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কোনপথে অগ্রসর হচ্ছে? মানব হওয়া নবুয়তেরও পরিপন্থি নয় এবং রেসালতের উচ্চমর্যাদারও প্রতিকূল নয়। রাসূল ﷺ নূর হলেও মানব হতে পারেন। তিনি নূরও এবং মানবও। তাঁর নূরকে প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্রের নূরের নিরীখে বিচার করা ভুল।

فَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا –(বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি, যা আমি নাজিল করেছি।) এখানে নূর বলে কুরআন বোঝানো হয়েছে। কারণ নূরের স্বরূপ এই যে, সে নিজেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল এবং অপরকেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল করে। কুরআন স্বকীয় অলৌকিকতার কারণে নিজে যে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণাদি, বিধি-বিধান, শরিয়ত এবং পরজগতের সঠিক তথ্যাবলি উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলো জানা মানুষের জন্যে জরুরি।

কেয়ামতকে লোকসানের দিন বলার কারণ ঃ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ যেদিন আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন একত্রিত করার দিবসে। এই দিনটি হবে লোকসানের। يَوْمُ الْجَمْعِ একত্রিত হওয়ার দিবস ও يوم التَّغَابُنِ। লোকসানের দিবস–এই উভয়টি কেয়ামতের নাম। একত্রিত হওয়ার দিন এ কারণে যে, সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্যে একত্রিত করা হবে। পক্ষান্তরে تَغَابُنٌ শব্দটি غَبْنٌ থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে غَبْنٌ বলা হয়।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল কুরআনে বলেন ঃ আর্থিক লোকসান জ্ঞাপন করার জন্যে এই শব্দটি صِيْغَةُ مَجْهُوْلٌ এ ব্যবহৃত হয় এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান জ্ঞাপন করার জন্যে بَابُ سَمِعَ থেকে ব্যবহৃত হয়। تَغَابُنٌ শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্যে বলা হয়, অর্থাৎ একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে, অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে। কিন্তু আয়াতে একতরফা লোকসান প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। এই শব্দের এই ব্যবহারও খ্যাত ও সুবিদিত। কিয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার কারণ এই যে, সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্য পরকালে দুইটি গৃহ নির্মাণ করেছেন একটি জাহান্নামে অপরটি জান্নাতে। জান্নাতীদেরকে জান্নাতে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে, যা ঈমান ও সৎকর্মের অবর্তমানে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, যাতে সেই গৃহ দেখার পর

জান্নাতের গৃহের যথার্থ কদর তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ তা'আলার অধিক কৃতজ্ঞ হয়। এমনিভাবে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে যা ঈমান ও সৎকর্ম বর্তমান থাকলে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল যাতে তাদের পরিতাপ আরো বাড়ে। জাহান্নামে জান্নাতীদের যেসব গৃহ ছিল, সেগুলোও জাহান্নামীদের ভাগে পড়বে। পক্ষান্তরে কাফের, পাপাচারী ও হতভাগাদের যেসব গৃহ জান্নাতে ছিল, সেগুলোও জান্নাতীদের অধিকারে চলে যাবে। তখন জাহান্নামীরা তাদের লাভ-লোকসান সত্যি সত্যি অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, তারা কি ছাড়ল এবং কি পেল। এসব রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে।

মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা জান, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, যার কাছে ধন-সম্পদ নেই, আমরা তাকে নিঃস্ব মনে করি। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিঃস্ব, যে কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা, যাকাত ইত্যাদির পুঁজি নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল, কাউকে প্রহার কিংবা হত্যা করেছিল এবং কারো ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, হাশরের মাঠে তারা সবাই উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ দাবি পেশ করবে। কেউ তার নামাজ নিয়ে যাবে, কেউ রোজা, কেউ জাকাত এবং কেউ অন্যান্য সৎকর্ম নিয়ে যাবে। যখন তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন তার হাতে উৎপীড়িত লোকদের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রাপ্য চুকানো হবে। এর পরিণতিতে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

বোখারীর এক রেওয়ায়েতে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তির কাছে কারও কোনো পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। নতুবা কেয়ামতের দিন দিরহাম ও দীনার থাকবে না। কারও কোনো দাবি থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। –(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য তাফসীরবিদ কেয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার উপরিউক্ত কারণই বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে সেদিন কেবল কাফের, পাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান অনুভব করবে না; বরং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও এভাবে লোকসান অনুভব করবে যে, হায়। আমরা যদি আরও বেশি সৎকর্ম করতাম, তবে জান্নাতের সুউচ্চ মর্তবা লাভ করতাম। সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই সময়ের জন্যে পরিতাপ করবে, যা অযথা ব্যয় করেছে। হাদীসে আছে ঃ مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসে এবং সমগ্র মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ না করে, কেয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে।

কুরতুবীতে আছে, প্রত্যেক মুমিনও সেদিন সৎকর্ম ত্রুটির কারণে স্বীয় লোকসান অনুভব করবে। সূরা মরিয়মে কেয়ামতের নাম يَوْمَ الْحَسْرَةِ তথা পরিতাপ দিবস বলে বর্ণিত হয়েছে। তারই অনুরূপ এখানে লোকসান দিবস নাম রাখা হয়েছে। সূরা মরিয়মে বলা হয়েছে : وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, সেদিন জালিম ও দুষ্কর্মীরা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পরিতাপ করবে এবং কর্মকে অধিকতর সুন্দর করতে সচেষ্ট হয়নি। এমন সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও পরিতাপ করবে। এভাবে কিয়ামতের দিন সবাই নিজ নিজ ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হবে এবং কম আমল করার কারণে লোকসান অনুভব করবে। তাই একে লোকসান দিবস বলা হয়েছে।

مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ

অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কারও উপরে কোনো বিপদ আসে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোথাও সামান্যতম বস্তু নড়াচড়া করতে পারে না। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কারও কোনো ক্ষতি এবং উপকার করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তকদীরে বিশ্বাসী নয়, বিপদ মুহূর্তে তার জন্যে কোনো স্থিরতা ও শান্তির উপকরণ থাকে না। সে বিপদ দূরীকরণের উদ্দেশ্য হা-হুতাশ ও ছটফট করতে থাকে। এর বিপরীতে তকদীরে বিশ্বাসী মুমিনের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাসী করে দেন যে, যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছাক্রমে হয়েছে। যে বিপদ তাকে স্পর্শ করেছে, তা অবধারিত ছিল, কেউ একে টলাতে পারত না এবং যে বিপদ থেকে সে মুক্ত

রয়েছে, তা থেকে মুক্ত থাকাই অবধারিত ছিল। তাকে এই বিপদে জড়িত থাকার সাধ্য কারও ছিল না। এই ঈমান ও বিশ্বাসের ফলে পরকালের ছওয়াবের ওয়াদাও তার সামনে থাকে, যা দ্বারা দুনিয়ার বিপদও সহজ হয়ে যায়।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

অর্থাৎ মুসলমানগণ, তোমাদের কতক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা কর। তিরমিযী, হাকেম প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত সেই মুসলমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হিজরত করে চলে যেতে মনস্থ করে, কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনরা তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়। –(রূহুল-মা'আনী)

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কা থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ ছিল। আলোচ্য আয়াতে এরূপ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিতে মানুষের শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা তার চাইতে বড় শত্রু মানুষের কেউ হতে পারে না, যে তাকে চিরকালীন আজাব ও জাহান্নামের অগ্নিতে লিপ্ত করে দেয়।

হযরত আতা ইবনে আবূ রাবাহ (রা.) বর্ণনা করেন, এই আয়াত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মদিনায় ছিলেন এবং যখনই কোনো যুদ্ধ ও জিহাদের সুযোগ আসত, তিনি তাতে যোগদান করার ইচ্ছা করতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা এই বলে ফরিয়াদ শুরু করে দিত : আমাদেরকে কার কাছে ছেড়ে যাবে। তিনি তাদের ফরিয়াদে প্রভাবান্বিত হয়ে সংকল্প ত্যাগ করতেন। –[ইবনে কাসীর]

উপরিউক্ত উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। উভয় ঘটনা আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। কেননা হিজরত হোক কিংবা জিহাদ, যে স্ত্রী ও সন্তান আল্লাহর ফরজ পালনে বাধ সাধে, তারা শত্রু।

وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ : পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার ইচ্ছা করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের এই অংশে বলা হয়েছে ঃ যদিও এই স্ত্রী ও সন্তানরা তোমাদের জন্যে শত্রুর ন্যায় কাজ করেছে এবং তোমাদেরকে ফরজ পালনে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করো না ;বরং মার্জনা, উপেক্ষা ও ক্ষমার ব্যবহার কর। এটা তোমাদর জন্যে কল্যাণকর। কেননা আল্লাহ তা'আলার অভ্যাসও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা।

গোনাহগার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও বিদ্বেষ রাখা অনুচিত ঃ আলেমগণ আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে, পরিবার-পরিজনের কেউ কোনো শরিয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্যে বদদোয়া করা উচিত নয়। –(রূহুল–মা'আনী)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ : فِتْنَةٌ শব্দের অর্থ পরীক্ষা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের পরীক্ষা নেন যে, এসবের মহব্বতে লিপ্ত হয়ে সে আল্লাহর বিধানাবলিকে উপেক্ষা করে, না মহব্বতকে যথাসীমায় রেখে স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।

ধনসম্পদ সন্তান-সন্ততি মানুষের জন্য বিরাট পরীক্ষা : সত্য বলতে কি ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত মানুষের জন্য একটি অগ্নিপরীক্ষা। মানুষ অধিকাংশ সময় তাদের মহব্বতের কারণেই গুনাহে-বিশেষত অবৈধ-উপার্জনে লিপ্ত হয়। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যাকে দেখে অন্যেরা বলবে : أَكَلَ عِيَالُهُ حَسَنَاتِهِ অর্থাৎ তার পুণ্যগুলোকে তার পরিজনেরা খেয়ে ফেলেছে। –(রূহুল-মা'আনী) এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ সন্তানদের সম্পর্কে বলেন : مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি হচ্ছে মানুষের কৃপণতা ও কাপুরুষতার কারণ। তাদের মহব্বতের কারণে মানুষ আল্লাহর পথে টাকা-পয়সা ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে এবং তাদেরই মহব্বতের কারণে জিহাদে যোগদান করা থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন : اَلْعِيَالُ سُوسُ الطَّاعَاتِ অর্থাৎ পরিবার-পরিজন মানুষের পুণ্যসমূহের জন্য ঘুণ বিশেষ। ঘুণ যেমন শস্যকে খেয়ে ফেলে, তেমনি পরিবার-পরিজনও মানুষের পুণ্যসমূহকে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ : অর্থাৎ যথাসাধ্য তাকওয়া ও খোদাভীতি অবলম্বন কর। এর আগে কুরআন পাকে এই আয়াত নাজিল হয়েছিল اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে এমন ভয় কর, যেমন ভয় করা তাঁর প্রাপ্য। এই আয়াত সাহাবায়ে-কেরামের কাছে খুবই দুঃসাধ্য ও কঠিন মনে হয়। কারণ আল্লাহর প্রাপ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করার সাধ্য কার আছে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার মুক্তি ও সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু করার আদেশ করেন না। কাজেই তাকওয়াও সাধ্যানুযায়ী ওয়াজিব বুঝতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাকওয়া অর্জনে কেউ তার পূর্ণ শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করলেই আল্লাহর প্রাপ্য আদায় হয়ে যাবে।

–(রূহুল–মা'আনী–সংক্ষেপিত)

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُسَبِّحُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ- পবিত্রতা বর্ণনা করা। তাসবীহ বয়ান করা।

خَلَقَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার خَلْقٌ মূলবর্ণ (خ - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ– তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

مُؤْمِنٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মূলবর্ণ (ء - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– বিশ্বাসী। মুমিন।

تُعْلِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْلَانٌ মূলবর্ণ (ع - ل - ن) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা প্রকাশ্যে করে থাক।

عَلِيْمٌ : মুবালাগার সীগাহ অর্থ– সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী عِلْم হতে নির্গত। বহুবচন عُلَمَاءُ ; উল্লেখ্য যে, عَلِيْمٌ আল্লাহর সিফাতের জন্য বহুল ব্যবহৃত। কারণ প্রকৃত ইলম তো তারই।

صُدُوْرٌ : صَدْرٌ-এর বহুবচন। অর্থ– বুক, বক্ষ।

صَوَّرَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْوِيْرٌ মূলবর্ণ (ص - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন।

لَمْ يَاْتِكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف منفى بلم বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ء – ت – ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– তোমাদের নিকট পৌঁছেনি।

نَبَؤٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَنْبَاءٌ অর্থ– খবর। সংবাদ।

ذَاقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার ذَوْقٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা আস্বাদন করেছে।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– মুখ ফিরিয়ে নিল।

لَتُنَبَّؤُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ لام تاكيد بانون ثقيله در فعل مستقبل معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْبِيَةٌ মূলবর্ণ (ن – ب – ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

اٰمِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মূলবর্ণ (ء - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর।

اَنْزَلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْزَالٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ– আমি অবতীর্ণ করেছি।

يُكَفِّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْفِيْرٌ মূলবর্ণ (ك - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ– মাফ করে দিবেন। মিটিয়ে দিবেন।

سَيِّئَاتِهٖ : سَيِّاٰتُ মুযাফ ةٖ যমীর মুযাফ ইলাইহি। سَيِّئَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– তার পাপসমূহ, তার গোনাহসমূহ।

يُدْخِلْهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْخَالٌ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– তিনি তাকে দাখিল করবেন।

تَجْرِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جِرْيَانٌ মূলবর্ণ (ج - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বইতে থাকবে।

خَالِدِيْنَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার خُلُوْدٌ মূলবর্ণ (خ - ل - د) জিনস صحيح অর্থ– সর্বদা অবস্থান করবে।

يَهْدِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بجواب شرط বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি পথ দেখাবেন।

اَطِيْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা পালন কর।

تَوَلَّيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও।

تَعْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَفْوٌ মূলবর্ণ (ع - ف - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা ক্ষমা কর।

اَلْمُبِيْنُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِبَانَةٌ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– স্পষ্ট, প্রকাশ।

اِحْذَرُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার حَذَرٌ মূলবর্ণ (ح - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাক।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় করতে থাক।

اِسْمَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلسَّمْعُ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– শ্রবণ কর।

اَنْفِقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْفَاقٌ মূলবর্ণ (ن - ف - ق) জিনস صحيح অর্থ– ব্যয় কর।

يُضَاعِفْهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بجواب شرط বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُضَاعَفَةُ মূলবর্ণ (ض - ع - ف) জিনস صحيح অর্থ– তিনি বৃদ্ধি করতে থাকবেন।

اِسْتَطَعْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– যথাসম্ভব, তোমরা সক্ষম হয়েছ। সমর্থ হয়েছ।

يُوْقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার وِقَايَةٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– রক্ষিত হয়েছে।

تُقْرِضُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم বাব إِفْعَال মাসদার إِقْرَاضٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ঋণ দাও।

بَيِّنٰتٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন بَيِّنَةٌ অর্থ- স্পষ্ট দলিলসমূহ, প্রকাশ্য দলিল।

يَهْدُوْنَنَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ(ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আমাদের পথ দেখান।

كَفَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার كُفْرٌ মূলবর্ণ (ك - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ- তারা অস্বীকার করছে।

إِسْتَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِسْتِفْعَالٌ মাসদার إِسْتِغْنَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অমুখাপেক্ষী।

زَعَمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার زَعْمٌ মূলবর্ণ (ز - ع - م) জিনস صحيح অর্থ- দাবি করে।

لَنْ يُّبْعَثُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منصوب بلن বাব فَتَحَ মাসদার بَعْثٌ মূলবর্ণ (ب - ع - ث) জিনস صحيح অর্থ- তাদেরকে কখনো পুনর্জীবিত করা হবে না।

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার قَوْلٌ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- আপনি বলে দিন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ : এখানে يَعْلَمُ ফে'ল আর তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ হলো ফায়েল যা اَللّٰهُ -এর দিকে ফিরেছে, আর مَا হলো مفعول به এবং فِى السَّمٰوٰتِ টা উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে مَا -এর সেলাহ হয়েছে। اَلسَّمٰوٰتِ -এর উপর وَالْاَرْضِ টা আতফ হয়েছে। আর وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ টাও আতফ হয়েছে। -[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ৪৩৫]

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা তালাক

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১২, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ﴿۱﴾

১. হে রাসূল! (লোকদেরকে বলে দিন যে,) যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তবে তাদেরকে ইদ্দত (হায়েয) -এর পূর্বে তালাক প্রদান কর, আর (তালাক প্রদানের পর) ইদ্দত স্মরণ রেখ, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক– যিনি তোমাদের প্রভু, সে স্ত্রীদেরকে (ইদ্দতের মধ্যে) তাদের গৃহ হতে বের করে দিও না, আর তারা নিজেরাও যেন স্বেচ্ছায় বের না হয়, কিন্তু যদি কেউ প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় তবে স্বতন্ত্র কথা; আর এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধানসমূহ; আর যে আল্লাহর বিধানাবলি লঙ্ঘন করবে, সে নিজেরই উপর অত্যাচার করল; তুমি জান না, সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা (তোমার অন্তরে) সৃষ্টি করে দিবেন– এর (এ তালাক প্রদানের) পর কোনো নতুন বিষয় ।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

২. অনন্তর যখন ঐ স্ত্রীলোকগণ স্বীয় ইদ্দত অতিক্রান্ত করার নিকটবর্তী হয়, তখন হয়তো তাদেরকে যথারীতি বিবাহের মধ্যে থাকতে দাও অথবা যথারীতি তাদেরকে মুক্ত করে দাও,

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ হে রাসূল (লোকদেরকে বলে দিন যে) اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও فَطَلِّقُوْهُنَّ তবে তাদেরকে তালাক প্রদান কর لِعِدَّتِهِنَّ ইদ্দত (হায়েয) -এর পূর্বে وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ আর ইদ্দত স্মরণ রেখ وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক رَبَّكُمْ যিনি তোমাদের প্রভু لَا تُخْرِجُوْهُنَّ সে স্ত্রীদেরকে বের করে দিও না مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ তাদের গৃহ হতে وَلَا يَخْرُجْنَ আর তারা নিজেরাও যেন স্বেচ্ছায় বের না হয় اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ কিন্তু যদি কেউ প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় তবে স্বতন্ত্র কথা وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ আর এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধানসমূহ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ আর যে আল্লাহর বিধানাবলি লঙ্ঘন করবে فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ সে নিজেরই উপর অত্যাচার করল لَا تَدْرِيْ তুমি জাননা لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ সম্ভবত আল্লাহ সৃষ্টি করে দিবেন بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا এর পর কোনো নতুন বিষয় ।

২. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ অনন্তর যখন ঐ স্ত্রী লোকগণ স্বীয় ইদ্দত অতিক্রান্ত করার নিকটবর্তী হয় فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ তখন হয়তো তাদেরকে যথারীতি বিবাহের মধ্যে থাকতে দাও اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ অথবা যথারীতি তাদেরকে মুক্ত করে দাও

وَّاَشْهِدُوْا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِیْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ یُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ۬ؕ وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ﴿۲﴾

** আর (উভয়াবস্থায়) নিজেদের মধ্য হতে দু জন নির্ভরশীল ব্যক্তিকে সাক্ষী করে নাও, আর তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে সঠিক সাক্ষ্য প্রদান কর; এটা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে, যে আল্লাহর উপর এবং কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে; আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন।

وَّیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ یَّتَوَكَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا ﴿۳﴾

৩. আর তাকে এমন স্থান হতে রিজিক পৌছিয়ে থাকেন, যা তার ধারণাও হয় না; আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট; আল্লাহ নিজের কাজ পূর্ণ করে থাকেন; আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের একটা পরিমাণ নির্ধারিত করে রেখেছেন।

وَالّٰٓـِٔیْ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔیْ لَمْ یَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ یَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ یُسْرًا ﴿۴﴾

৪. আর তোমাদের (তালাক প্রদত্ত) স্ত্রীদের মধ্য হতে যারা ঋতু হতে নিরাশ হয়ে গেছে, যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে তাদের ইদ্দত তিন মাস, আর এরূপই যাদের ঋতু শুরু হয়নি; আর গর্ভবতীদের ইদ্দত তাদের ঐ গর্ভ প্রসব হওয়া; আর যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার প্রত্যেক বিষয় সহজ করে দিবেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَاَشْهِدُوْا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ আর নিজেদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরশীল ব্যক্তিকে সাক্ষী করে নাও وَاَقِیْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ আর তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে সঠিক সাক্ষ্য প্রদান কর ذٰلِكُمْ یُوْعَظُ بِهٖ এটা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ যে বিশ্বাস রাখে بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ আল্লাহর উপর এবং কিয়ামত দিবসের উপর وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ আর যে আল্লাহকে ভয় করে یَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا আল্লাহ তা'আলা তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন।

৩. وَیَرْزُقْهُ আর তাকে এমন স্থান হতে রিজিক পৌছিয়ে থাকেন مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ যা তার ধারণাও হয় না وَمَنْ یَّتَوَكَّلْ عَلَی اللّٰهِ আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে فَهُوَ حَسْبُهٗ তবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ আল্লাহ নিজের কাজ পূর্ণ করে থাকেন قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন لِكُلِّ شَیْءٍ প্রত্যেক বিষয়ের জন্য قَدْرًا একটি পরিমাণ।

৪. وَالّٰٓـِٔیْ یَئِسْنَ আর যারা নিরাশ হয়ে গেছে مِنَ الْمَحِیْضِ ঋতু হতে مِنْ نِّسَآئِكُمْ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য হতে اِنِ ارْتَبْتُمْ যদি তোমাদের সন্দেহ হয় فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ তবে তাদের ইদ্দত তিন মাস وَّالّٰٓـِٔیْ لَمْ یَحِضْنَ আর এরূপই যাদের ঋতু শুরু হয়নি وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ আর গর্ভবতীদের ইদ্দত اَنْ یَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ তাদের ঐ গর্ভ প্রসব হওয়া وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ আর যে আল্লাহকে ভয় করবে یَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ یُسْرًا আল্লাহ তার প্রত্যেক বিষয় সহজ করে দিবেন

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ﴿۵﴾

৫. এটা আল্লাহর নির্দেশ যা তিনি তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন; আর যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার গুনাহ মোচন করে দিবেন, আর তাকে বিরাট পুরস্কার প্রদান করবেন।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ﴿۶﴾

৬. তোমরা ঐ (তালাক প্রদত্ত) স্ত্রীদেরকে তোমাদের আর্থিক সচ্ছলতা অনুপাতে থাকবার ঘর দাও যেখানে তোমরা বাস কর, আর তাদেরকে উত্ত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে (বাসস্থান সম্বন্ধে) কষ্ট দিও না; আর যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে গর্ভ প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে খরচ দাও, অতঃপর যদি ঐ স্ত্রীগণ তোমাদের (সন্তানদের) জন্য স্তন্য দান করে, তবে তোমরা তাদেরকে তাদের (নির্ধারিত) বিনিময় প্রদান কর, আর (এ সম্বন্ধে) পরস্পরের মধ্যে যথোচিতরূপে পরামর্শ করে নিও, আর যদি তোমরা পরস্পরে অনমনীয় হও, তবে অন্য স্ত্রীলোক স্তন্য দান করবে;

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ﴿۷﴾

৭. অবস্থাশীলদের উচিত যে, সে স্বীয় অবস্থানুসারে [শিশুর জন্য] ব্যয় করে; আর যার আয় কম তার উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে যতটুকু করেছেন তা হতে ব্যয় করে; আল্লাহ কাউকেও তদপেক্ষা অধিক কষ্ট দেন না, যতটুকু তাকে (সামর্থ্য) দিয়েছেন; আল্লাহ অভাবের পর সত্বরই সচ্ছলতাও প্রদান করবেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর নির্দেশ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ যা তিনি তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ আর যে আল্লাহ কে ভয় করবে يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ আল্লাহ তার গুনাহ মোচন করে দিবেন। وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا আর তাকে বিরাট পুরস্কার প্রদান করবেন।

৬. اَسْكِنُوْهُنَّ তোমরা ঐ (তালাক প্রদত্ত) স্ত্রীদেরকে থাকবার ঘর দাও مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ যেখানে তোমরা বাস কর مِّنْ وُّجْدِكُمْ তোমাদের আর্থিক সচ্ছলতা অনুপাতে وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ আর কষ্ট দিও না لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ তাদেরকে উত্ত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ আর যদি তারা গর্ভবতী হয় فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ তবে তাদেরকে খরচ দাও حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ গর্ভ প্রসব হওয়া পর্যন্ত فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ অতঃপর যদি ঐ স্ত্রীগণ তোমাদের (সন্তানদের) জন্য স্তন্য দান করে فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ তবে তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় প্রদান করো وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ আর পরস্পরের মধ্যে যথোচিত রূপে পরামর্শ করে নিও وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ আর যদি তোমরা পরস্পরে অনমনীয় হও فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى তবে অন্য স্ত্রীলোক স্তন্য দান করবে।

৭. لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ অবস্থাশীলদের উচিত যে, সে স্বীয় অবস্থানুসারে ব্যয় করে وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ আর যার আয় কম فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ তার উচিত যে, আল্লাহ তাকে যতটুকু দান করেছেন তা হতে ব্যয় করে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا আল্লাহ কাউকে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট দেন না اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا যতটুকু তাকে (সামর্থ্য) দিয়েছেন سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا আল্লাহ অভাবের পর সত্বরই তাকে সচ্ছলতাও প্রদান করবেন।

৮. আর বহু জনপদ ছিল, যারা নিজ প্রভুর নির্দেশ (পালনে) এবং তার রাসূলগণের অবাধ্যতা করল, সুতরাং আমি তাদের (কার্যাবলির) কঠোর হিসাব গ্রহণ করলাম, আর আমি তাদেরকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করলাম।	وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾
৯. ফলকথা, তারা স্বীয় কর্মসমূহের পরিণাম আস্বাদন করল, আর তাদের কার্যের পরিণাম ক্ষতিই হলো।	فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾
১০. আল্লাহ তাদের জন্য এক কঠিন আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব, হে জ্ঞানবানগণ! যারা ঈমান এনেছ– আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের নিকট একটি উপদেশ-পত্র প্রেরণ করেছেন।	اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ ۚۖ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾
১১. এমন একজন রাসূল (প্রেরণ করেছেন), যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ পড়ে পড়ে শুনাচ্ছেন, যেন এমন লোকদেরকে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে–অন্ধকার হতে আলোর দিকে আনয়ন করেন;	رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ আর বহু জনপদ ছিল عَتَتْ যারা অবাধ্যতা করল عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ নিজ প্রভুর নির্দেশ (পালনে) এবং তাঁর রাসূলগণের فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا সুতরাং আমি তাদের কঠোর হিসাব গ্রহণ করলাম وَعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا আর আমি তাদেরকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করলাম।

৯. فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا ফলকথা তারা স্বীয় কর্মসমূহের পরিণাম আস্বাদন করল। وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا আর তাদের কার্যের পরিণাম ক্ষতিই হলো।

১০. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। عَذَابًا شَدِيْدًا এক কঠিন আজাব فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতএব আল্লাহকে ভয় কর يٰاُولِي الْاَلْبَابِ হে জ্ঞানবানগণ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ আল্লাহ তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। ذِكْرًا একটি উপদেশ পত্র।

১১. رَسُوْلًا এমন একজন রাসূল يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ যিনি তোমাদেরকে পড়ে পড়ে শুনাচ্ছেন اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ لِيُخْرِجَ যেন এমন লোকদেরকে আনয়ন করেন। الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান আনে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং সৎকাজ করে مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ অন্ধকার হতে আলোর দিকে

** আর যে আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, আল্লাহ তাকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করাবেন, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তন্মধ্যে তারা সর্বদা অবস্থান করবে; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে উত্তম জীবিকা দান করবেন।	وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ﴿۱۱﴾
১২. আল্লাহ এমন যে, তিনি সাত আসমানকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার অনুরূপ জমিনও; (আর) এগুলোর মধ্যে (আল্লাহর) নির্দেশাবলি নাজিল হতে থাকে, যেন তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে ক্ষমতাবান, আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে (নিজের) জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন।	اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۗ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴿۱۲﴾ ع ۲ / ۱۸

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ আর যে আল্লাহর উপর ঈমান আনবে وَيَعْمَلْ صَالِحًا এবং সৎকাজ করবে يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ আল্লাহ তাকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করাবেন تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا তন্মধ্যে তারা সর্বদা অবস্থান করবে قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে উত্তম জীবিকা দান করবেন।

১২. اَللّٰهُ الَّذِىْ আল্লাহ এমন যে خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ তিনি সাত আসমানকে সৃষ্টি করেছেন وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ এবং তার অনুরূপ জমিনও يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ এগুলোর মধ্যে নির্দেশাবলি নাজিল হতে থাকে لِتَعْلَمُوْٓا যেন তোমরা বুঝতে পার اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে ক্ষমতাবান وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম আত-তালাক। কেবল নামই নয়, এটার বিষয়বস্তুর শিরোনামও তালাক। কেননা এতে তালাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) এ সূরাকে اَلنِّسَاءُ الْقُصْرٰى তথা সংক্ষিপ্ত সূরা নিসা নাম দিয়েছেন। এতে ২টি রুকূ', ১২টি আয়াত, ২৪৭টি বাক্য এবং ১১৭০টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কুরআন]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সূরার আলোচিত বিষয়াদির অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হতেও প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি আল-বাকারার তালাক সংক্রান্ত আইন-বিধান সম্বলিত প্রথম নাজিল হওয়া আয়াতসমূহের পর নাজিল হয়েছে। যদিও নাজিল হওয়ার নির্দিষ্ট সময়কাল ঠিক করা সহজ নয়; কিন্তু হাদীসের বর্ণনাসমূহ হতে এতটুকু অবশ্যই জানা যায় যে, সূরা আল-বাকারাতে দেওয়া আইন-বিধানসমূহ বুঝার ব্যাপারে লোকেরা যখন ভুল করতে লাগল এবং কার্যতও তাদের ভুলভ্রান্তি দেখা যেতে লাগল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের জন্য এ হেদায়েতসমূহ নাজিল করেছেন।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরার সম্পূর্ণ অংশের মূলত তালাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। এসব বিধি-বিধানের মধ্যে রয়েছে–

১. তালাকে সুন্নী এবং তালাকে বিদ'য়ী সম্বন্ধে আলোচনা। এক পর্যায়ে দাম্পত্য জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলে, অতঃপর একসাথে আর জীবনযাপন অসম্ভব মনে হলে তালাকের উত্তম পন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিধান মতে, যথাসময়ে তালাক দিতে বলা হয়েছে। আর তা হলো সহবাসহীন পবিত্র অবস্থায় তালাক দিয়ে অতঃপর ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকা।

২. তালাকের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে সুস্থ-মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। কারণ তালাক হালাল হলেও আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। নিতান্ত প্রয়োজনেই এটা হালাল করা হয়েছে।

৩. ইদ্দতকে যথার্থভাবে পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সময় দীর্ঘ হয়ে মহিলার ক্ষতি না হয়। আর যেন 'নসব' মিশ্রিত হয়ে না যায়।

৪. ইদ্দতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'আয়েসা' অর্থাৎ যে মহিলার ঋতু চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে, নাবালেগ মেয়ে এবং গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত সম্বন্ধে পরিষ্কার করে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশ-নিষেধও করা হয়েছে।

৫. এসব বিধি-বিধানের আলোচনার সাথে সাথে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি অবলম্বনের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। যাতে স্বামী-স্ত্রী কারো কোনো রকমের ক্ষতি না হয়।

৬. ইদ্দতের সময় 'নাফকা' আর 'সুকনা' অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া ও থাকার খরচ সংক্রান্ত বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে যারা সীমালঙ্ঘন করবে তাদের পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। -[সাফওয়া]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে বলা হয়েছে যে, কোনো কোনো স্ত্রী-পুত্রাদি আল্লাহ ও মানুষের শত্রু বটে। কখনো এটা তাদের ওয়াজিব হকসমূহ পালনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত তখন তাতে প্রকাশ্য বিচ্ছেদও ঘটে যায়। সুতরাং অত্র সূরায় তালাকপ্রাপ্তা ও দুগ্ধপোষ্য শিশু সম্পর্কিত বিধানাবলি বর্ণনা দ্বারা উক্ত শত্রুতার ধারণা সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। যে বিচ্ছেদের অবস্থায়ও তাদের প্রকৃত হক আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব। আর ঐক্যতার সময় তো সে হকসমূহ আদায় করা আরো অধিক ওয়াজিব ছিল। যেহেতু উক্ত নির্দেশসমূহের ভিতর দিয়ে চার স্থানে আল্লাহভীতির নির্দেশ ও তৎপ্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কাজেই দ্বিতীয় রুকূ'র বিষয়গুলোর অবতারণা উক্ত নির্দেশ এবং উৎসাহ প্রদানের দৃঢ়তা সাবধানের জন্যই করা হয়েছে, এতদ্ভিন্ন তা দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, পার্থিব কাজ কারবারেও শরিয়তের নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কোনো কোনো লোক এ ধারণা করে বসে যে, পার্থিব কাজকর্মে শরিয়ত পালন করা নিষ্প্রয়োজন।

আয়াতের শানে নুযূল : (١) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ الخ

১. সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনে জোবাইর, হযরত ইবনে আব্বাস ও ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসা (রা.)-কে তালাক দিয়েছিলেন, অতঃপর রাজয়াত করেছিলেন। কাতাদাহ হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসা (রা.)-কে তালাক দিলে তিনি পিতার বাড়ি চলে যান। তখন আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয় তুমি রাজয়াত করো। কারণ সে সারা দিন রোজা রাখে আর সারা রাত নফল ইবাদত করে। সে জান্নাতে তোমার স্ত্রীদের মধ্যে শামিল থাকবে।

২. হযরত কালবী (র.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ হলো, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসাকে কিছু গোপন কথা বলেন, হযরত হাফসা (রা.) সে কথাগুলো হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলে দিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপর রাগান্বিত হলেন এবং তাঁকে একটি তালাক দিলেন, তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো।

৩. সুদ্দী (র.) বলেছেন, এ আয়াতসমূহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সম্বন্ধে নাজিল হয়। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুস্রাবের সময় এক তালাক দিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এবং যতদিন পর্যন্ত সে পবিত্র

না হবে ততদিন পর্যন্ত স্ত্রী বানিয়ে রাখতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আবার স্রাব হতে পবিত্র হলে, যদি ইচ্ছা হয় তখন তালাক দিতে পরামর্শ দিলেন। এমন পবিত্র অবস্থায় যে অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হয়নি। এটা হচ্ছে সে ইদ্দত যার জন্য তালাক দিতে স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, কাবীর]

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا .... الاية (٢)

শানে নুযূল ঃ হযরত আওফ বিন মালেক আশজায়ী (রা.) নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ দুশমনরা আমার ছেলে সালেমকে ধরে নিয়ে গেছে। তার মাতা তাতে অত্যন্ত কাতর হয়ে গেছে। নবীজি ﷺ তখন বললেন, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর ও ধৈর্য্য ধারণ কর আর তোমরা 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা' বেশি বেশি পাঠ করতে থাক। তার স্ত্রী সে কথা শুনে বললেন, নবী করীম ﷺ আমাদের জন্য অতি উত্তম আদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তারা উভয়ে অধিক মাত্রায় উক্ত দোয়া পাঠ করতে থাকেন। তারপর এক সময় শত্রুরা তার ছেলের প্রতি অসতর্ক হয়ে যায়। সে তার পিতার কাছে একটি বকরির পাল নিয়ে ফিরে আসে। যাতে চার হাজারের অধিক বকরি ছিল। সে প্রেক্ষিতেই এই আয়াত নাজিল হয়। (কুরতুবী ১৮:১৬০)

وَالّٰٓـئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ .... الاية

শানে নুযূল ঃ যখন সূরা বাকারার ২২৮ নম্বর আয়াত .... وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ অর্থাৎ আর তালাক প্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েজ পর্যন্ত। এই আয়াতে যখন তালাক প্রাপ্তা হায়েজা নারীদের ইদ্দত বর্ণনা করা হলো তখন খল্লাদ ইবনে নোমান আনসারী (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে সমস্ত মেয়েদের কম বয়সি হওয়ার কারণে অথবা অধিক বয়সি হওয়ার কারণে কিংবা গর্ভবতী হওয়ার সুবাদে হায়েজ আসে না তাদের ইদ্দত কি হবে? তখন এই আয়াত নাজিল হয়। –(কুরতুবী ১৮:২১৬২)

বিবাহ ও তালাকের শরিয়তসম্মত মর্যাদা ও প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থা : সূরা বাকারার তাফসীরে এই শিরোনামেই এ বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া উচিত। সংক্ষেপে তা এই যে, বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারটি প্রত্যেক ধর্মে বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ লেনদেন নয় যে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যেভাবে ইচ্ছা করে নেবে বরং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী লোকই স্মরণতীতকাল থেকে এ বিষয়ে একমত যে, এসব ব্যাপার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে বিশেষ পবিত্র এবং ধর্মের নির্দেশানুযায়ীই এসব কাজ সম্পন্ন হওয়া উচিত। কিতাবধারী ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তো একটি ঐশী ধর্ম ও ঐশী কিতাবের সাথে সম্পর্কযুক্তই। তাতে শত শত পরিবর্তন সত্ত্বেও তারা আজও এসব ব্যাপারে কিছু ধর্মীয় বিধিবিধানের অনুসরণ করে। কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায় কোনো ঐশী কিতাব ও ঐশী ধর্মের অধিকারী নয় কিন্তু কোনো-না- কোনো প্রকারে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে। যেমন হিন্দু, আর্য, শিখ, অগ্নিপূজারী, নক্ষত্রপূজারী সম্প্রদায়। তারাও বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারাদিতে বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ লেনদেন মনে করে না। তারাও এসব ব্যাপারে কিছু ধর্মীয় প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান পালনকে অপরিহার্য জ্ঞান করে। ধর্মের এসব নীতিও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ীই সকল ধর্মাবলম্বী পারিবারিক আইন চালু থাকে।

কেবল নাস্তিক ও আল্লাহ অস্বীকারকারী এক সম্প্রদায় আছে যারা আল্লাহ ও ধর্মের সাথেই সম্পর্কচ্ছেদ করে রয়েছে। তারা এসব ব্যাপারকেও ইজারার অনুরূপ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নিষ্পন্ন করে থাকে। বলা বাহুল্য, এর লক্ষ্য তাদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিতাপের বিষয়, আজকাল বিশ্বে এই মতবাদই ব্যাপক প্রসার লাভ করছে, যা মানুষকে জংলী-জানোয়ারদের কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ইসলামী শরিয়ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পবিত্র জীবনব্যবস্থার নাম। এতে বিবাহকে কেবল একটি লেনদেন ও চুক্তি নয় বরং এক প্রকার ইবাদতের মর্যাদা দান করা হয়েছে। এই ইবাদতের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার পক্ষ থেকে মানবচরিত্রে গচ্ছিত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উত্তম ও পবিত্র উপকরণও রয়েছে এবং নারী ও পুরুষের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত বংশবৃদ্ধি ও সন্তান পালনের সুষম ও প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাও বিদ্যমান আছে।

বৈবাহিক ব্যাপারাদির সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার উপর সাধারণ মানবগোষ্ঠীর সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া নির্ভরশীল : তাই কুরআন পাক বৈবাহিক ও পারিবারিক বিষয়াদিকে অন্যসব বিষয় অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। কুরআন পাকে

গভীর মনোনিবেশকারী ব্যক্তি এটা প্রত্যক্ষ করবে যে, বিশ্বের অর্থনৈতিক বিষয়াদির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য, শেয়ার-ইজারা ইত্যাদি। কুরআন পাক এসব বিষয়ের কেবল নীতিই ব্যক্ত করেছে। এগুলোর শাখাগত ব্যাপারাদির বর্ণনা কুরআন পাকে খুবই বিরল। কিন্তু কুরআন পাক বিবাহ ও তালাকের শুধু মূলনীতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং এসবের অধিকাংশ শাখাগত মাসআলা ও খুঁটিনাটি ব্যাপার আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে নাজিল করেছেন। এসব মাসআলা কুরআনের অধিকাংশ সূরায় বিচ্ছিন্নভাবে এবং সূরা নিসায় অধিক বিস্তারিত বিবরণসহ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য 'সূরা তালাকে' বিশেষভাবে তালাক, ইদ্দত ইত্যাদির বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই কোনো কোনো হাদীসে একে 'সূরা নিসা সুগরা' অর্থাৎ 'ছোট সূরা নিসা' বলা হয়েছে। −[কুরতুবী]

ইসলামী মূলনীতির গতিধারা এই যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে ইসলামী নীতি অনুযায়ী স্থাপিত বৈবাহিক সম্পর্ক অটল ও আজীবন স্থায়ী সম্পর্ক হতে হবে, যাতে উভয়ের ইহকাল ও পরকাল সংশোধিত হয় এবং তাদের মধ্য থেকে জন্মগ্রহণকারী সন্তান-সন্ততির কর্মধারা এবং চরিত্রও সংশোধিত হয়। এ কারণেই বিবাহের ব্যাপারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে ইসলামের দিকনির্দেশ এই যে, এ সম্পর্ককে সকল প্রকার তিক্ততা ও মন কাষাকষি থেকে পবিত্র রাখতে হবে। যদি কোনো সময় তিক্ততা হয়ে যায়, তবে তা নিরসনের জন্য পুরোপুরি চেষ্টা ইসলামে করা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার মধ্যেই উভয় পক্ষের জীবনের সাফল্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেসব ধর্মে তালাকের বিধান নেই, সেগুলোতে এরূপ পরিস্থিতিতে নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হতে হয় এবং মাঝে মাঝে চরম কুফল সামনে আসে। তাই ইসলাম বিবাহ আইনের সাথে সাথে তালাকের বিধি-বিধানও নির্ধারিত করেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও বলেছে যে, তালাক আল্লাহ তা'আলা কাছে খুবই ঘৃণার্হ অপছন্দনীয় কাজ। যথাসম্ভব এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক ঘৃণার্হ বিষয় হচ্ছে তালাক। হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : تَزَوَّجُوْا وَلَا تُطَلِّقُوْا فَاِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ –অর্থাৎ বিবাহ কর কিন্তু তালাক দিও না। কেনন তালাকের কারণে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে। হযরত আবূ মূসা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোনে ব্যভিচার ব্যতিরেকে স্ত্রীদেরকে তালাক দিও না। কারণ যেসব পুরুষ ও নারী কেবল স্বাদ আস্বাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না। −(কুরতুবী) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে দাসদেরকে মুক্ত করা আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং পৃথিবীতে সৃষ্ট বিষয়াদির মধ্যে তালাক সর্বাপেক্ষা ঘৃণার্হ ও অপছন্দনীয়। −[কুরতুবী]

সারকথা, ইসলাম যদিও তালাক দিতে উৎসাহিত করেনি বরং যথাসাধ্য বারণ করেছে কিন্তু কোনো কোনো প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কতিপয় বিধি-বিধানের অধীনে অনুমতি দিয়েছে। এসব বিধি-বিধানের সারমর্ম এই যে, বৈবাহিক সম্পর্ক খতম করাই অপরিহার্য হলে তা সুন্দরভাবে ও যথোপযুক্ত পন্থায় নিষ্পন্ন হতে হবে−একে নিছক মনের ঝাল মিটানো ও প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার খেলায় পরিণত করা যাবে না। আলোচ্য সূরায় তালাকের বিধান শুরু করে প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'হে নবী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী যেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধান সকল উম্মতের জন্য ব্যাপক হয়ে থাকে, সেসব ক্ষেত্রেই এই সম্বোধান ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে কোনো বিধান বিশেষভাবে রাসূলের সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, সেখানে 'হে রাসূল' বলে সম্বোধন করা হয়।

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ –বাক্যের দাবি ছিল এই যে, এরপরেও একবচনের বিধান বর্ণনা করা হতো। কিন্তু এখানে বহুবচন ব্যবহার করে اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ বলা হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু বহুবচনে সম্বোধন করার মধ্যে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে এবং এদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এ বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্য নয়−সমগ্র উম্মতের জন্য।

কেউ কেউ এস্থলে বাক্য উহ্য সাব্যস্ত করে এরূপ তাফসীর করেছেন যে, হে নবী। আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন যে, তারা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়, তখন যেন পরে বর্ণিত আইন পালন করে। অতঃপর তালাকের কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বিধান, فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . عِدَّتٌ -এর শাব্দিক অর্থ গণনা করা। শরিয়তের পরিভাষায় সেই

সময়কালকে ইদ্দত বলা হয়, যাতে স্ত্রী এক স্বামীর বিবাহ বের হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাধীন থাকে। কোনো স্বামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার উপায় দু'টি। (এক) স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে। এই ইদ্দতকে "ইদ্দতে-ওফাত" বলা হয়। গর্ভবতী নয়–এমন মহিলাদের জন্যে এই ইদ্দত চার মাস দশদিন। (দুই) বিবাহ থেকে বের হওয়ার দ্বিতীয় উপায় তালাক। গর্ভবতী নয়-এমন মহিলাদের জন্যে তালাকের ইদ্দত ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে তালাকের ইদ্দত তিন তোহর (পবিত্রতাকাল)। সারকথা, এর জন্যে কোনো দিন ও মাস নির্ধারিত নেই; বরং যত মাসে তিন হায়েয অথবা তিন তোহর পূর্ণ হয়, তাই তালাকের ইদ্দত। যেসব নারীর বয়সের স্বল্পতা হেতু এখনও হায়েজ হয় না অথবা বেশি বয়স হওয়ার কারণে হায়েজ আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের বিধান পরে আলাদাভাবে বর্ণিত হচ্ছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দতও পরে বর্ণিত হচ্ছে। এতে ওফাতের ইদ্দত ও তালাকের ইদ্দত একইরূপ। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতকে فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ পাঠ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আববাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ও এক রেওয়ায়েতে فِىْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ বর্ণিত আছে। –(রূহুল-মা'আনী)

বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোচরীভূত করলে তিনি খুব নারাজ হয়ে বললেন :

لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ فَاِنْ بَدَالَهٗ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِىْ اَمَرَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يُطَلَّقَ بِهَا النِّسَاءُ.

তার উচিত হায়েজ অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং স্ত্রীকে বিবাহে রেখে দেওয়া। এই হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর হায়েজ হবে এবং তা থেকে পবিত্র হবে, তখন যদি তালাক দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে। এই ইদ্দতের আদেশই আল্লাহ তা'আলা (আলোচ্য) আয়াতে দিয়েছেন।

এই হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়– (এক) হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। (দুই) কেউ এমতাবস্থায় তালাক দিলে সেই তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া ওয়াজিব (যদি প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হয়। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ঘটনায় তদ্রূপ ছিল।) (তিন) যে তোহরে তালাক দিবে, সেই তোহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস না হওয়াই চাই (চার) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতের তাফসীর তাই।

উপরিউক্ত কেরাতদ্বয় এবং হাদীসদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, কোনো স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে ইদ্দত শুরু হওয়ার পূর্বে তালাক দিতে হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হায়েজ থেকে, ইদ্দত শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে তোহরে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা থাকে সেই হোতরে সহবাস করবে না এবং তোহরের শেষ ভাগে হায়েজ আসার পূর্বে তালাক দিবে। ইমাম শাফেঈ (র.) প্রমুখের মতে ইদ্দত হোতর থেকে শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোহরের শুরুতেই তালাক দিবে। ইদ্দত তিন হায়েজ হবে, না তিন তোহর হবে– এই আলোচনা সূরা বাকারার ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ বাক্যে করা হয়েছে।

সারকথা, এই আয়াত থেকে তালাক সম্পর্কে প্রথম সর্বসম্মত বিধান এই জানা গেল যে, হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম এবং যে তোহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে, সেই তোহরে তালাক দেওয়াও হারাম। উভয় ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার কারণ হলো স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়া যা তার জন্য কষ্টকর। কেননা যে হায়েজে তালাক দেবে, সেই হায়েজ তো ইদ্দতে গণ্য হবে না বরং হায়েজের দিনগুলো অতিবাহিত হবে। এরপর হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পরবর্তী তোহরও অযথা অতিবাহিত হয়ে দ্বিতীয় হায়েজ থেকে ইদ্দতের গণনা শুরু হবে। এভাবে দীর্ঘদিন পর ইদ্দত শেষ হবে। শাফেঈ মাজহাব অনুযায়ীও ইদ্দতের পূর্বে অতিবাহিত হায়েজের অবশিষ্ট দিনগুলো কমপক্ষে বেশি হবে। তালাকের এই প্রথম বিধানই দিকনির্দেশ করে যে, তালাক কোনো রাগ মেটানোর অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয় নয় বরং এটা অপারগ অবস্থায় উভয় পক্ষের সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা। তাই তালাক দেওয়ার সময়েই এদিক খেয়াল রাখা জরুরি যে, স্ত্রীকে যেন দীর্ঘদিন ইদ্দত অতিবাহিত করার অহেতুক কষ্ট ভোগ করতে না হয়। এই বিধান কেবল সেই স্ত্রীদের জন্য, যাদের পক্ষে হায়েজ অথবা তোহর দ্বারা ইদ্দত অতিবাহিত করা জরুরি। পক্ষান্তরে যে স্ত্রীর সাথে এখনও স্বামীর নির্জনবাসই হয়নি, তার যেহেতু

কোনো ইদ্দতই নেই, তাই তাকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া জায়েজ। এমনিভাবে যেসব স্ত্রীর স্বল্প বয়স অথবা বেশি বয়স হেতু হায়েজ আসে না, তাদেরকে যে কোনো অবস্থায় এমনকি সহবাসের পরে তালাক দেওয়া জায়েজ। কেননা তাদের ইদ্দত মাসের হিসাবে তিন মাস হবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে একথা বর্ণিত হবে। –[মাযহারী]

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে ঃ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ - اِحْصَاءٌ শব্দের অর্থ গণনা করা। আয়াতের অর্থ এই যে, ইদ্দতের দিনগুলো সযত্নে স্মরণ রেখো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই শেষ মনে করে নেওয়ার মতো ভুল করো না। ইদ্দতের দিনগুলো স্মরণে রাখার এই দায়িত্ব পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের। কিন্তু আয়াতে পুরুষবাচক পদ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা সাধারণভাবে সেসব বিধান পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে অভিন্ন, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত ঃ পুরুষবাচক পদই ব্যবহার করা হয়; স্ত্রীরা প্রসঙ্গত ঃ তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বিশেষক্ষেত্রে বিশেষ রহস্যও থাকতে পারে যে, স্ত্রীরা অধিক আনমনা, তাই সরাসরি পুরুষদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় বিধান হচ্ছে ঃ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এখানে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তাতে তাদের বসবাস বহাল রাখা কোনো কৃপা নয়; বরং প্রাপ্য আদায়। বসবাসের হকও স্ত্রীর অন্যতম হক। আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, এই হক কেবল তালাক দিলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। বরং ইদ্দতের দিনগুলোতে এই গৃহে বসবাস করার অধিকার স্ত্রীর আছে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জুলুম ও হারাম। এমনিভাবে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় বের হয়ে যাওয়াও হারাম; যদিও স্বামী এর অনুমতি দেয়। কেননা এই গৃহেই ইদ্দত অতিবাহিত করা স্বামীরই হক নয় আল্লাহরও হক, যা ইদ্দত পালনকারিণীর উপর ওয়াজিব। হানাফী মাজহাবও তা-ই।

চতুর্থ বিধান হচ্ছে ঃ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ অর্থাৎ ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রী কোনো প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হারাম নয়। এটা তৃতীয় বিধানর ব্যতিক্রম। প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে।

(এক) নির্লজ্জ কাজ বলে খোদ গৃহ থেকে বের হয়ে যাওয়াই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা দৃশ্যতঃ ব্যতিক্রম, যার উদ্দেশ্য গৃহ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া নয়; বরং নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরদার করা। উদাহরণতঃ এরূপ বলা যে, এই কাজ করা কারও উচিত নয় সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে মনুষ্যত্বই বিসর্জন দেয় অথবা তুমি তোমার জননীকে গালি দিও না এটা ব্যতীত যে, তুমি জননীর সম্পূর্ণই অবাধ্য হয়ে যাও। বলাবাহুল্য, প্রথম দৃষ্টান্তে ব্যতিক্রম দ্বারা সেই কাজের বৈধতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য নয় এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে জননীর অবাধ্যতার বৈধতা প্রমাণ করা লক্ষ্য নয়; বরং বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তার আরও বেশি অবৈধতা ও মন্দ হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব, আয়াতের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ এই হলো যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর গৃহ থেকে বের হবে না, কিন্তু যদি তারা অশ্লীলতায়ই মেতে উঠে ও বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এর অর্থ বের হয়ে যাওয়ার বৈধতা নয়; বরং আরও বেশি নিন্দা ও নিষিদ্ধতা প্রমাণ করা। নির্লজ্জ কাজের এই তাফসীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সুদ্দী, ইবনে সায়েব, নাখয়ী (রহ.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) এই তাফসীরই গ্রহণ করেছেন। –(রূহুল–মা'আনী)

(দুই) নির্লজ্জ কাজ বলে ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যতিক্রম যথার্থ অর্থেই বুঝতে হবে অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ব্যভিচার করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি শরিয়তের শাস্তি প্রয়োগ করার জন্যে অবশ্যই তাকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বের করা হবে। এই তাফসীর হযরত কাতাদাহ, হাসান বসরী, শা'বী যায়েদ ইবনে আসলাম, যাহ্হাক, ইকরিমা (রহ.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এই তাফসীরই গ্রহণ করেছেন।

(তিন) নির্লজ্জ কাজ বলে কটু কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জায়েজ নয়। কিন্তু যদি তারা কটুভাষিণী ও ঝগড়াটে হয় এবং স্বামীর আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যাবে। এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতে হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাত এরূপ ঃ اِلَّا اَنْ يُّفْحِشْنَ এই শব্দের বাহ্যিক অর্থ অশ্লীল কথাবার্তা বলা। এই কেরাত থেকেও সর্বশেষ তাফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। –(রূহুল–মা'আনী) এই অবস্থায়ও ব্যতিক্রম আক্ষরিক অর্থে থাকবে।

এ পর্যন্ত তালাক সম্পর্কে চারটি বিধান বর্ণিত হলো। পরে আরও বিধান বর্ণিত হবে। কিন্তু মাঝখানে বর্ণিত বিধানসমূহের প্রতি জোর দেওয়া এবং বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কতিপয় উপদেশ বাক্যের অবতারণা করা হচ্ছে। কুরআন পাকের বিশেষ পদ্ধতি এই যে, প্রত্যেক বিধানের পর আল্লাহর ভয় এবং পরকালের চিন্তা স্মরণ করিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ রুদ্ধ করা হয়। এখানেও তাই করা হয়েছে। কেননা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং পারস্পরিক প্রাপ্য পূর্ণরূপে আদায় করার ব্যবস্থা কোনা আইনের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। আল্লাহভীতি ও পরকাল চিন্তাই প্রকৃষ্ট উপায়।

حُدُوْدُ اللّٰهِ - وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا শরিয়তের নির্ধারিত আইন-কানুন বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো লঙ্ঘন করে অর্থাৎ আইন-কানুনের বিরোধিতা করে, সে নিজের উপর জুলুম করে; অর্থাৎ আল্লাহ অথবা শরিয়তের কোনো ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতিসাধন করে। এই ক্ষতি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ই হতে পারে। পারলৌকিক ক্ষতি তো শরিয়তবিরোধী কাজের গোনাহ ও পরকালের শাস্তি এবং ইহলৌকিক ক্ষতি এই যে, যে ব্যক্তি শরিয়তের নির্দেশাবলির তোয়াক্কা না করে স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে অধিকাংশ সময় তিন তালাক পর্যন্ত পৌঁছে ক্ষান্ত হয়, যার পর পারস্পরিক প্রত্যাহার অথবা পুনর্বিবাহও হতে পারে না। মানুষ প্রায়ই তালাক দিয়ে অনুতাপ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হয়; বিশেষ করে সন্তান-সন্ততি থাকলে। অতএব, তালাকের বিপদ দুনিয়াতেই তার ঘাড়ে চেপে বসে। অনেকেই স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার নিয়তে অন্যায়ভাবে তালাক দেয়। এরূপ তালাকের কষ্ট স্ত্রীও ভোগ করে। কিন্তু পুরুষের জন্য এটা জুলুমের উপর জুলুম এবং দ্বিগুণ শাস্তির কারণ হয়ে যায়। (এক) আল্লাহর নির্ধারিত আইন-কানুন লঙ্ঘন করার শাস্তি এবং (দুই) স্ত্রীর উপর জুলুম করার শাস্তি।

لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا –অর্থাৎ তুমি জান না সম্ভবত ঃ আল্লাহ তা'আলা এই রাগ-গোস্বার পর অন্য কোনো অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন। অর্থাৎ স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আরাম, সন্তানের লালন-পালন এবং গৃহের সহজ ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করে তুমি তাকে পুনরায় বিবাহে রাখার ইচ্ছা করতে পার। এমতাবস্থায় আবার বিবাহে থাকা তখন সম্ভবপর হবে, যখন তুমি তালাক দেওয়ার সময় শরিয়তের আইন-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং অহেতুক বাইন তালাক না দিয়ে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দাও। এরূপ তালাক দেওয়ার পর প্রত্যাহার করে নিলে পূর্ববিবাহ যথারীতি বহাল থাকে। তুমি তিন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে তালাক দিও না, যার প্রত্যাহারের অধিকার থাকে না এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি সত্ত্বেও পরস্পরে পূর্ণর্বিবাহও হালাল হয় না।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ এখানে اَجَلْ শব্দের অর্থ ইদ্দত এবং اَجَلْ পর্যন্ত পৌঁছার অর্থ ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হওয়া।

তালাক সম্পর্কে পঞ্চম বিধান ঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হয়, তখন স্থির মস্তিষ্কে পুনরায় চিন্তা করে দেখ যে, বিবাহ বহাল রাখা উত্তম। না সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করে দেওয়া ভালো। এ চিন্তার জন্য এ সময়টি উত্তম। কারণ ততদিনে পুরুষের সাময়িক রাগ-গোস্বা দমিত হয়ে যায়। যদি স্ত্রীকে বিবাহে রাখা স্থির হয়, তবে রেখে দাও। পরবর্তী আয়াতের ইঙ্গিত এবং হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, মুখে বলে দাও আমি তালাক প্রত্যাহার করলাম। অতঃপর এর জন্যে দু'জন সাক্ষী রাখ।

পক্ষান্তরে যদি বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়াই সিদ্ধান্ত হয়, তবে স্ত্রীকে সুন্দর পন্থায় মুক্ত করে দাও। অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হতে দাও। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলেই স্ত্রী মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়।

ষষ্ঠ বিধান ঃ ইদ্দত সমাপ্ত হলে স্ত্রীকে রাখার সিদ্ধান্ত হোক অথবা মুক্ত করে দেওয়ার, উভয় অবস্থাতে কুরআন পাক তা মা'রূফ অর্থাৎ যথোপযুক্ত পন্থায় সম্পন্ন করতে বলেছে। "মা'রূফ' শব্দের অর্থ পরিচিত পন্থা। উদ্দেশ্য এই যে যে পন্থা শরিয়ত ও সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত এবং মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে খ্যাত, সেই পন্থা অবলম্বন কর। তা এই যে, বিবাহে রাখা এবং তালাক প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হলে স্ত্রীকে মুখে অথবা কাজে কর্মে কষ্ট দিও না, তার উপর অনুগ্রহ রেখো না এবং তার যে কর্মগত ও চরিত্রগত দুর্বলতা তালাকের কারণ হচ্ছিল, অতঃপর নিজেও তজ্জন্যে সবর করার সংকল্প কর, যাতে পুনরায় সেই তিক্ততা সৃষ্টি না হয়। পক্ষান্তরে মুক্ত করা সিদ্ধান্ত হলে তার বিদিত ও সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে অথবা গালমন্দ দিয়ে গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না; বরং সদ্ব্যহারের মাধ্যমে বিদায় কর। কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, তাকে কোনো বস্ত্রজোড়া দিয়ে বিদায় করা কমপক্ষে মোস্তাহাব এবং কোনো কোনো অবস্থায় ওয়াজিবও। ফিকাহর কিতাবাদিতে এর বিবরণ পাওয়া যাবে।

৬ষ্ঠ বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে বিবাহে রাখা অথবা মুক্ত করে দেওয়ার দ্বিবিধ ক্ষমতা দেওয়া থেকে এবং পূর্ববর্তী لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا আয়াত থেকে প্রসঙ্গক্রমে বোঝা গেল যে, আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে তালাক যদি দিতেই হয়, তবে এমন তালাক দিবে, যাতে প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে। এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, পরিষ্কার ভাষায় কেবল এক তালাক দিবে এবং সাথে সাথে রাগ-গোস্বা প্রকাশার্থে এমন কেনো বাক্য বলবে না, যা বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করার অর্থ জ্ঞাপন করে। উদাহরণত এরূপ বলবে না, আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও, তোমাকে খুব শক্ত তালাক দিচ্ছি, এখন তোমার সাথে আমার কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক রইল না। এ ধরনের বাক্য পরিষ্কার তালাকের সাথে বলে দিলে অথবা তালাকের নিয়তে কেবল এ ধরনের বাক্য বলে দিলেও প্রত্যাহারের অধিকার বাতিল হয়ে যায় এবং শরিয়তের পরিভাষায় 'বাইন' তালাক হয়ে যায়। ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক তাৎক্ষণিকভাবে ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রত্যাহারের ক্ষমতা থাকে না। তদপেক্ষা কঠোর তালাক হচ্ছে তালাককে তিন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া। এর ফলশ্রুতিতে স্বামীর প্রত্যাহার ক্ষমতাই কেবল রহিত হয় না; বরং ভবিষ্যতে পুরুষ ও নারী উভয়ে সম্মত হয়ে বিবাহ করতে চাইলেও নতুন বিবাহ হতে পারে না। সূরা বাকারার আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ

তিন তালাক একযোগে দেওয়া হারাম, কিন্তু কেউ দিলে তিন তালাকই হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) আছে ঃ আজকাল ধর্ম ও ধর্মীয় বিধানাবলির প্রতি অবহেলা ও ঔদাসীন্য ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ছে। মূর্খদের তো কথাই নেই, অনেক লেখাপড়া জানা দলিল লেখকরাও তিন তালাকের কম তালাককে যেন তালাকই মনে করেন না। অথচ দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করা হয় যে, যারা তিন তালাক দেয়, তারা পরে অনুতাপ করে এবং স্ত্রী যাতে কোনোক্রমেই হাতছাড়া না হয়, সে চিন্তায়ই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। ইমাম নাসায়ী (র.) মাহমুদ ইবনে লবীদ-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, একযোগে তিন তালাক দেওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন। এ কারণেই সমগ্র উম্মতের ইজমা বলে একযোগে তিন তালাক দেওয়া হারাম ও নাজায়েজ। যদি কোনো ব্যক্তি তিন তোহরে আলাদা আলাদা তিন তালাক দেয়, তবে তাও অপছন্দনীয়। এ বিষয়টি উম্মতের ইজমা এবং কুরআনী আয়াতসমূহের ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত। তবে এটাও হারাম ও বিদ'আতি তালাকের মধ্যে দাখিল কি না, শুধু এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে হারাম। ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.) হারাম বলেন না কিন্তু তাঁদের মতেও এটা অপছন্দনীয় ও সুন্নতবিরোধী কাজ। এর বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে সূরা বাকারার তাফসীরে দেখুন।

কিন্তু একযোগে তিন তালাক দেওয়া হারাম– এ ব্যাপারে যেমন সমগ্র উম্মতের ইজমা রয়েছে, তেমনি হারাম হওয়া সত্ত্বেও কেউ এরূপ করলে তিন তালাক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও সমগ্র উম্মতের ইজমা রয়েছে। তিন তালাক একযোগে দেওয়ার পর ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নতুন বিবাহও হালাল হবে না। সমগ্র উম্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক আহলে হাদীস সম্প্রদায় এবং শিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত গোটা মাজহাব চতুষ্টয় এ ব্যাপারে একমত যে, তিন তালাক একযোগে দিলেও তা কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা কোনো কাজ হারাম হলে তার প্রতিক্রিয়ার কার্যকারিতা প্রভাবিত হবে না। যেমন কেউ কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করলে হত্যা করা হারাম হওয়া সত্ত্বেও যাকে হত্যা করা হয়, সে সর্বাবস্থায় মরেই যাবে। এমনিভাবে একযোগে তিন তালাক দেওয়া যদিও হারাম, তথাপি এর বাস্তবতা অপরিহার্য। কেবল মাজহাব চতুষ্টয়ই নয়; বরং সাহাবায়ে কেরাম ও হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফতকালে এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন বলে বর্ণিত আছে। এ বিষয়েরও বিশদ বর্ণনা প্রথম খণ্ডে দেখুন।

وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী করে নাও এবং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সঠিক সাক্ষ্য কায়েম কর।

অষ্টম বিধান ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার সময় প্রত্যাহার করা সিদ্ধান্ত হোক কিংবা মুক্ত করা, উভয় অবস্থাতে এ কাজের জন্য দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে এ বিধানটি মোস্তাহাব, এর উপর প্রত্যাহার নির্ভরশীল নয়। প্রত্যাহারের অবস্থায় সাক্ষী করার তাৎপর্য এই যে, পরবর্তীকালে স্ত্রী যাতে প্রত্যাহার অস্বীকার করে বিবাহ চূড়ান্তরূপে ভঙ্গ হওয়ার দাবি না করে বসে। মুক্ত করার অবস্থায় এ জন্যে সাক্ষী করতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে স্বয়ং স্বামীই দুষ্টুমিচ্ছলে অথবা স্ত্রীর ভালোবাসায় পরাভূত হয়ে দাবি না করে বসে যে, সে ইদ্দত শেষ হওয়ার

আগেই প্রত্যাহার করেছিল। সাক্ষীদ্বয়ের জন্যে ذَوَىْ عَدْلٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শরিয়তের পরিভাষা অনুযায়ী সাক্ষীদ্বয়ের নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরি। অন্যথায় তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কোনো বিচারক ফয়সালা দিবে না। وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ বাক্যে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোনো প্রত্যাহার কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনায় সাক্ষী হও এবং বিচারকের এজলাসে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে কারও মুখ চেয়ে অথবা বিরোধিতা ও শত্রুতার কারণে সত্য সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয়ো না।

ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ –অর্থাৎ উপরিউক্ত বিষয়বস্তু দ্বারা সে ব্যক্তিকে উপদেশ দান করা হচ্ছে, যে আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এতে বিশেষভাবে পরকালের উল্লেখ করার কারণ এই যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার আদায় আল্লাহভীতি ও পরকাল চিন্তা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

অপরাধ ও শাস্তির আইন-কানুনে কুরআন পাকের অভূতপূর্ব প্রজ্ঞাভিত্তিক ও মুরুব্বীসুলভ নীতি ঃ বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে আইন-কানুন ও অপরাধসমূহের দণ্ডবিধি প্রণয়নের প্রাচীন পদ্ধতি চালু আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং দেশে আইন-কানুন ও দণ্ডবিধির পুস্তক রচনা করা হয়। কুরআন পাকও আল্লাহ তায়ালার আইন পুস্তক। কিন্তু এর বর্ণনাভঙ্গি সারা বিশ্বের আইন পুস্তক থেকে পৃথক ও অভূতপূর্ব। এর প্রত্যেকটি আইনের অগ্রে-পশ্চাতে আল্লাহভীতি ও পরকাল চিন্তা দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে দেওয়া হয়, যাতে প্রত্যেক মানুষ কোনো পুলিশ ও পরিদর্শকের ভয়ে নয়; বরং আল্লাহর ভয়ে আইন মেনে চলে এবং কেউ দেখুক কিংবা না দেখুক, নির্জনে ও জনসমক্ষে সর্বাবস্থায় আইন মেনে চলাকে জরুরি মনে করে। একমাত্র এ কারণেই যারা কুরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান রাখে, তাদের মধ্যে কঠোরতর আইন প্রয়োগ করাও তেমনি কঠিন হয় না। এজন্য ইসলামী সরকারকে পুলিশ, স্পেশাল পুলিশ ও তদুপরি গোয়েন্দা পুলিশের জাল বিস্তৃত করার প্রয়োজন হয় না।

কুরআন পাকের এই মুরুব্বীসুলভ নীতি সকল আইনের ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কিত আইনসমূহে এই নীতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা এই সম্পর্কই এমন যে, এতে প্রত্যেক কাজে কোনো সাক্ষ্য সংগৃহীত হতে পারে না এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে না। এটা সম্পূর্ণতই খোদ স্বামী-স্ত্রীরই অন্তর ও তাদের ক্রিয়াকর্মের ওপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই বিবাহের খুতবায় কুরআন পাকের যে তিনটি আয়াত পাঠ করা সুন্নতরূপে প্রমাণিত আছে; সেই আয়াতত্রয় আল্লাহভীতির আদেশ দ্বারা শুরু ও সমাপ্ত হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা বিবাহ করে, তাদেরও এখন থেকেই বুঝে নিতে হবে যে, কেউ দেখুক বা না দেখুক, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজকর্ম, এমনকি গোপন চিন্তাধারা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল আছেন। আমরা পারস্পরিক অধিকার আদায়ে ত্রুটি করলে, একে অপরকে কষ্ট দিলে আলিমুল গায়েব আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এমনিভাবে সূরা তালাকে তালাকের কয়েকটি বিধান বর্ণনা করতে যেয়ে প্রথম বিধানের পরেই وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ বলে আল্লাহভীতির নির্দেশ দেওয়া আছে। এরপর চারটি বিধান উল্লেখ করার পর وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এসব বিধান অমান্য করে, সে অন্য কারো ওপর নয়, নিজের ওপরই জুলুম করে। এর অশুভ পরিণতি তাকেই ছারখার করে দেবে। এরপর আরো চারটি প্রাসঙ্গিক বিধান ও আইন উল্লেখ করার পর ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ বলে সেই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অতঃপর এক আয়াতে আল্লাহভীতির ফজিলত ও তার ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ বর্ণনা করে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর ওপর ভরসা করার কল্যাণ বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আবার ইদ্দতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান বর্ণনা করে পরবর্তী দুই আয়াতে আল্লাহভীতির আরো কল্যাণ ও ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আবার বিবাহ ও তালাকের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও সন্তানকে স্তন্যদানের বিধান বর্ণিত হয়েছে। তালাক, ইদ্দত এবং স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ, স্তন্যদান ইত্যাদি বিধানের মধ্যে বারবার কোথাও পরকাল চিন্তা, কোথাও আল্লাহভীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ এবং কোথাও তাওয়াক্কুলের কল্যাণ ও কিছু বিধান বর্ণনা করে আল্লাহভীতির বিষয়বস্তু দ্বিতীয়বারে তৃতীয়বার উল্লেখ করা বাহ্যত বেখাপ্পা মনে হয়। কিন্তু কুরআনের উপরিউক্ত মুরুব্বীসুলভ নীতির রহস্য বুঝে নেওয়ার পর এর গভীর মিল সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এবার আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকট ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত রিজিক দান করেন।

تقوى শব্দের আসল অর্থ আত্মরক্ষা করা। শরিয়তের পরিভাষায় গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করার অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হলে এর অনুবাদ করা হয় আল্লাহকে ভয় করা। উদ্দেশ্যে আল্লাহর অবাধ্যতা ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও ভয় করা।

আলোচ্য আয়াতে تقوى তথা আল্লাহভীতির দু'টি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে -(এক) আল্লাহভীতি অবলম্বনকারীর জন্যে আল্লাহ তা'আলা নিষ্কৃতির পথ করে দেন। কি থেকে নিষ্কৃতি? এ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, দুনিয়ার যাবতীয় সংকট ও বিপদ থেকে এবং পরকালের সব বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতি। (দুই) তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দান করেন, যা কল্পনায়ও থাকে না। এখানে রিজিকের অর্থও ইহকাল এবং পরকালের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু। এই আয়াতে মুমিন-মুত্তাকীর জন্যে আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদা ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি তার প্রত্যেক সমস্যাও সহজসাধ্য করেন এবং তার অভাব-অনটন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে এমন পথে তার প্রয়োজনাদি সরবরাহ করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না। -(রূহুল মা'আনী)

স্থানের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে কোনো কোনো তাফসীরবিদ এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন ঃ তালাক দাতা স্বামী ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উভয়ই অথবা তাদের মধ্যে যে কেউ খোদাভীতি অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী সকল সঙ্কট ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন। পুরুষকে তার যোগ্যা স্ত্রী এবং স্ত্রীকে তার উপযুক্ত স্বামী দান করবেন। বলাবাহুল্য, আয়াতের যে আসল অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই অর্থও তাতে শামিল আছে। -(রূহুল মা'আনী)

মাসআলা ঃ এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, কোনো মুসলমান যদি কাফেরদের হাতে বন্দি হয় এবং সে তাদের কিছু ধনসম্পদ নিয়ে ফিরে আসে, তবে সেই ধনসম্পদ গনিমতের মালরূপে গণ্য হবে এবং হালাল হবে। গনিমতের মালের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এই ধন সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ সরকারি বায়তুল মালে দেওয়াও জরুরি নয়। যেমন হাদীসের ঘটনায় তা নেওয়া হয়নি। ফিকহবিদগণ বলেন- কোনো মুসলমান গোপনে ছাড়পত্র ছাড়াই দারুল হরব তথা শত্রুদেশে চলে গেলে যদি সেখান থেকে কাফেরদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তবে তাও হালাল। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি আজকাল প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ভিসা নিয়ে শত্রুদেশে যায়, তবে তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের কোনো ধনসম্পদ নিয়ে আসা তার জন্য জায়েজ নয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি বন্দি হয়ে তাদের দেশে যায়, অতঃপর কোনো কাফের তার কাছে কোনো অর্থ গচ্ছিত রাখে, সেই গচ্ছিত অর্থ নিয়ে আসাও হালাল নয়। কারণ ভিসা নিয়ে যাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে একটি অলিখিত চুক্তি হয়ে গেছে। অতএব, তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করা চুক্তির বরখেলাফ কাজ। শেষোক্ত মাসআলায়ও আমানতকারী ব্যক্তির সাথে তার কার্যগত চুক্তি থাকে। অতএব যখন সে চাইবে, তখন গচ্ছিত অর্থ তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এটা ফেরত না দেওয়া আত্মসাৎ ও চুক্তিভঙ্গের শামিল, যা শরিয়তে হারাম। -(মাযহারী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হিজরতের পূর্বে অনেক কাফের অর্থ-সম্পদ আমানত রাখত। হিজরতের সময় তাঁর হাতে এমন কিছু আমানত ছিল। তিনি এসব আমানত মালিককে প্রত্যার্পণের জন্য হযরত আলী (রা.)-কে পশ্চাতে রেখে যান।

বিপদাপদ থেকে মুক্তি এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র ঃ উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আওফ ইবনে মালিক (রা.)-কে বিপদ থেকে মুক্তি ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বেশি পরিমাণে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করতে বলেছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) বলেন- ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার বিপদ ও ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা এবং উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য বেশি পরিমাণে এই কালেমা পাঠ একটি পরীক্ষিত আমল। হযরত মুজাদ্দিদের বর্ণনা অনুযায়ী এই বেশির পরিমাণ হচ্ছে দৈনিক পাঁচশ বার এবং এর শুরুতে ও শেষে এক'শ বার করে দরূদ পাঠ করে উদ্দেশ্যের জন্য দোয়া করতে হবে। -(মাযহারী) হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا আয়াতটি বারবার তেলাওয়াত করতে থাকেন। অতঃপর তিনি বললেন- আবূ যর, যদি সব মানুষ কেবল এ আয়াতটি অবলম্বন করে নেয়, তবে এটা সবার জন্য যথেষ্ট। -(রূহুল মা'আনী)

অর্থাৎ সকল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্য কামিয়াব হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ، اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহ তার মুশকিল কাজের জন্য যথেষ্ট। কেননা আল্লাহ তাঁর কাজ যেভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করে ছাড়েন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তদনুয়ায়ী সব কাজ সম্পন্ন হয়। তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْا خِمَاصًا وَّتَرُوْحُ بِطَانًا যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে পশু-পক্ষীর ন্যায় রিজিক দান করতেন। পশু-পক্ষি সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনাহিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম গুণ এই যে, তারা আল্লাহর উপর ভরসা করবে। –(মাযহারী)

অবশ্য তাওয়াক্কুলের অর্থ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট উপায়াদি ত্যাগ করা নয়; বরং উদ্দেশ্য এই যে, ইচ্ছাধীন উপায়াদি অবশ্যই অবলম্বন করবে কিন্তু উপায়াদির ওপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। কারণ তাঁর ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কোনো কাজ হতে পারে না। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহভীতি ও তাওয়াক্কুলের ফজিলত এবং বরকত বর্ণনা করার পর তালাক ও ইদ্দতের আরো কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَالّٰٓـئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـئِىْ لَمْ يَحِضْنَ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ –

এ আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দতের আরও বিবরণ আছে। এতে ইদ্দতের সাধারণ বিধি থেকে ভিন্ন তিন প্রকার স্ত্রীদের ইদ্দতের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের ইদ্দত সম্পর্কিত নবম বিধান ঃ সাধারণ অবস্থায় তালাকের ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েজ। কিন্তু যেসব মহিলার বয়োঃবৃদ্ধি অথবা কোনো রোগ ইত্যাদির কারণে হায়েজ আসা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনিভাবে যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হায়েয আসা শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত আলোচ্য আয়াতে তিন হায়েজের পরিবর্তে তিন মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা যতদিনেই হোক।

اِنِ ارْتَبْتُمْ –অর্থাৎ যদি তোমাদের সন্দেহ হয়। সাধারণ ইদ্দত হায়েজ দ্বারা গণনা করা হয়, কিন্তু এসব মহিলার হায়েজ বন্ধ; অতএব, তাদের ইদ্দত কিভাবে গণনা করা হবে–এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাকেই আয়াতে সন্দেহ বলা হয়েছে।

অতঃপর আবার খোদাভীতির ফজিলত ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া ও পরকালের কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এরপর আবার তালাক ও ইদ্দতের বর্ণিত বিধানাবলি পালন করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে ঃ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗ اِلَيْكُمْ –এটা আল্লাহর বিধান, যা তোমাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে। এরপর তাকওয়ার আরও একটি ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا –অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করেন এবং তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহভীতির পাঁচটি কল্যাণ ঃ পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহভীতির পাঁচটি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে– (১) আল্লাহ তা'আলা খোদাভীরুদের জন্যে ইহকাল ও পরকালের বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন। (২) তার জন্যে রিজিকের এমন দ্বার খুলে দেন যা কল্পনায়ও থাকে না। (৩) তার সব কাজ সহজ করে দেন। (৪) তার পাপসমূহ মোচন করে দেন। (৫) তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন। অন্য এক জায়গায় আল্লাহভীতির এই কল্যাণও বর্ণিত হয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহভীরুর পক্ষে সত্য ও মিথ্যার পরিচয় সহজ হয়ে যায়।

اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর আবার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দত, তাদের ভরণ-পোষণ এবং সাধারণ স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ -এই আয়াত উপরে বর্ণিত প্রথম বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এই আয়াতে তার ইতিবাচক দিক উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাসের জায়গা দাও। তোমরা যে গৃহে থাক, সেই গৃহের কোনো অংশে তাদেরকে রাখ। প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে কোনো প্রকার পর্দা করারও প্রয়োজন নেই। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অবশ্য বিবাহ ছিন্ন হওয়ার কারণে তালাকদাতা স্বামীর কাছে পর্দা সহকারে সেই গৃহে বাস করতে হবে।

দশম বিধান ঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে ইদ্দতকালে উত্যক্ত করো না ঃ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ এর অর্থ এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা যখন ইদ্দতকালে তোমাদের সাথে থাকবে, তখন তিরস্কার করে অথবা তার অভাবপূরণে কৃপণতা করে তাকে উত্যক্ত করো না, যাতে সে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।

একাদশ বিধান ঃ তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দতকালী ভরণপোষণ ঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে তার ভরণ-পোষণ সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্বামীর উপর ওয়াজিব। এ কারণেই এ ব্যাপারে সমগ্র উম্মত একমত। তবে যে স্ত্রী গর্ভবতী নয়, তাকে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে তার ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা স্বামীর উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে তাকে 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে, অথবা সে খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ করিয়ে থাকলে, তার ভরণ-পোষণ ইমাম শাফেঈ, আহমদ (র.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম আযম (র.)-এর মত তার ভরণ-পোষণ তখনও স্বামীর উপর ওয়াজিব। তিনি বলেন ঃ বসবাসের অধিকার যেমন সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, তেমনি ভরণ-পোষণ ও সর্বপ্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, যা তালাকদাতা স্বামী আদায় করবে। তাঁর দলিল পূর্বোক্ত এই আয়াত- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم কেননা এই আয়াতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাত এরূপ ঃ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِن وُّجْدِكُمْ - সাধারণত ঃ এ কেরাত অন্য কেরাতের তাফসীর করে। অতএব, প্রসিদ্ধ কেরাতে যদিও أَنفِقُوا শব্দটি উল্লিখিত নেই, কিন্তু তা উহ্য আছে। প্রসিদ্ধ কেরাত যেভাবে বসবাসের অধিকার স্বামীদের উপর ওয়াজিব করেছে, তেমনি ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ স্বামীদের জিম্মায় অপরিহার্য করে দিয়েছে। হযরত ওমর ফারূক (র.) ও অন্য কয়েকজন সাহাবীর এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.)-কে তার স্বামী তিন তালাক দিয়েছিল। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে বলেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ভরণ-পোষণ তার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেননি। হযরত ওমর (রা.) ও কয়েকজন সাহাবী ফাতেমার এই কথা খণ্ডন করে বলেছিলেন ঃ আমরা এই বর্ণনার ভিত্তিতে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নতকে বর্জন করতে পারি না। এতে আল্লাহর কিতাব বলে বাহ্যত ঃ এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, হযরত ওমর (রা.)-এর মতে ভরণ-পোষণ ও আয়াতের মধ্যে দাখিল। রাসূলের সুন্নত বলে তাহাভী, দারা কুতনী ও তাবারানী বর্ণিত সেই হাদীসকে বোঝানো হয়েছে, যাতে স্বয়ং হযরত ওমর (রা.) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছি, তিনি তিন তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যেও ভরণ-পোষণ এবং বসবাসের অধিকার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেছেন।

সারকথা এই যে, গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ এই আয়াত পরিষ্কারভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে উম্মতের ইজমা আছে। এমনিভাবে প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তার বিবাহ ভঙ্গ না হওয়ার কারণে তার ভরণ-পোষণও সবার মতে ওয়াজিব। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তাদের ব্যাপারে ফিকহবিদগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আযম (রহ.)-এর মতে তাদের ভরণ-পোষণও ওয়াজিব। এর পূর্ণ বিবরণ তাফসীরে মাযহারীতে দেখুন।

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ -অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে এবং সন্তান প্রসব হয়ে গেলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তাই তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব থাকে না। কিন্তু প্রসূত সন্তানকে যদি তালাকপ্রাপ্তা মা স্তন্যদান করে, তবে স্তন্যদানের বিনিময় নেওয়া জায়েজ।

দ্বাদশ বিধান ঃ স্তন্যদানের পারিশ্রমিক ঃ যে পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহাধীন থাকে, সে পর্যন্ত সন্তানদেরকে স্তন্যদান করা স্বয়ং জননীর জিম্মায় কুরআনের আদেশ বলে ওয়াজিব। বলা হয়েছে وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ -যে কাজ কারও দায়িত্বে

এমনিতেই ওয়াজিব, সেই কাজের জন্যে পারিশ্রমিক নেওয়া ঘুষের শামিল, যা দেওয়া ও নেওয়া উভয়ই নাজায়েজ। এ ব্যাপারে ইদ্দতকালও বিবাহের মধ্যে গণ্য। কেননা বিবাহ অবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যেমন স্বামীর উপর ওয়াজিব, ইদ্দতকালেও তেমনি ওয়াজিব। তবে সন্তান প্রসবের পর যখন ইদ্দত খতম হয়ে যা, তখন তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে না। এখন যদি সে প্রসূত সন্তানকে স্তন্যদান করে, তবে আলোচ্য আয়াত এর পারিশ্রমিক নেওয়া ও দেওয়া জায়েজ সাব্যস্ত করেছে।

ত্রয়োদশ বিধান ঃ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ - اِئْتِمَارٌ -এর শাব্দিক অর্থ পরামর্শ করা এবং একজন অন্যজনের কথা মেনে নেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, স্তন্যদানের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীকে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যেন সাধারণ পারিশ্রমিক অপেক্ষা বেশি না চায় এবং স্বামী সাধারণ পারিশ্রমিক দিতে যেন অসম্মত না হয় এবং এ ব্যাপারে তারা যেন একে অপরের সাথে উদার ব্যবহার করে।

চতুর্দশ বিধান ঃ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ অর্থাৎ স্তন্যদান করার ব্যাপারটি যদি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে মীমাংসা না হয়, অথবা স্ত্রী যদি তার সন্তানকে পারিশ্রমিক নিয়েও স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে আইনত ঃ তাকে বাধ্য করা যাবে না, বরং মনে করতে হবে যে, সন্তানের প্রতি জননীর সর্বাধিক মায়ামমতা সত্ত্বেও যখন অস্বীকার করছে, তখন কোনো বাস্তব ওজর আছে। কিন্তু যদি বাস্তবে ওজর না থাকে, কেবল রাগ-গোস্বার কারণে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহর কাছে সে গোনাহগার হবে। তবে বিচারক তাকে স্তন্যদান করতে বাধ্য করবে না।

এমনিভাবে যদি স্বামী দারিদ্র্যের কারণে পারিশ্রমিক দিতে অক্ষম হয় এবং অন্য কোনো মহিলা বিনা পারিশ্রমিকে অথবা কম পারিশ্রমিকে স্তন্যদান করতে সম্মত হয়, তবে স্বামীকে জননীর দাবি মেনে নিয়ে তার স্তন্য পান করাতেই বাধ্য করা হবে না; বরং উভয় অবস্থাতে অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো যেতে পারে। হ্যাঁ, যদি অন্য মহিলা জননীর সমান পারিশ্রমিক দাবি করে, তবে সব ফিকহবিদের ঐকমতো অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো স্বামীর জন্য জায়েজ নয়।

মাসআলা ঃ অন্য মহিলার স্তন্য পান করানো স্থির হলে স্তন্যদাত্রী মহিলা সন্তানকে তার জননীর কাছে রেখে স্তন্যদান করবে, এটা জরুরি। জননীর কাছ থেকে আলাদা করে স্তন্যদান করানো জায়েজ নয়। কেননা সহীহ্ হাদীসদৃষ্টে 'হিযানত' তথা লালন-পালন ও দেখাশোনায় রাখা জননীর হক। এই হক ছিনিয়ে নেওয়া জায়েজ নয়।– (মাযহারী)

পঞ্চদশ বিধান ঃ স্ত্রী ভরণ-পোষণের পরিমাণ নির্ধারণে স্বামীর আর্থিক সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ –অর্থাৎ বিত্তশালী ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার রিজিক সীমিত, সে আমদানি অনুযায়ী ব্যয় করবে। এ থেকে জানা গেল যে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থা ধর্তব্য হবে না; বরং স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। স্বামী বিত্তবান হলে বিত্তবানসুলভ ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্তশালী না হয়; বরং দরিদ্র ও ফকির হয়। স্বামী দরিদ্র হলে দরিদ্রসুলভ ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্তশালীনী হয়। ইমাম আযম (রা.)-এর মাজহাব তাই। কোনো কোনো ফিকহবিদের উক্তি এর বিপরীত।–(মাযহারী)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا –এটা আগের বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কাজের দায়িত্ব দেন না। তাই দরিদ্র ও নিঃস্ব স্বামীর উপর তারই অবস্থা অনুযায়ী ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে। এরপর স্ত্রীকে দরিদ্রসুলভ ভরণ-পোষণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার ও সবর করার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ঃ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا অর্থাৎ কারও এরূপ মনে করা উচিত নয়, বর্তমান দারিদ্র্য-চিরকাল বজায় থাকবে; বরং দারিদ্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহর হাতে। তিনি দারিদ্র্যের পর স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

জ্ঞাতব্য : এই আয়াতে সেই স্বামীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে বলে ইঙ্গিত আছে, যারা যথাসাধ্য স্ত্রীদের ওয়াজিব ভরণ-পোষণ আদায় করতে সচেষ্ট থাকে এবং স্ত্রীকে কষ্টে রাখার মনোবৃত্তি পোষণ না করে। –(রূহুল মা'আনী)

فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا –আয়াতে উল্লেখিত এসব জাতির হিসাব ও আজাব পরকালে হবে, কিন্তু এখানে এক অতীত পদবাচ্যে ব্যক্ত করার কারণ এর নিশ্চিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা, যেন হয়েই গেছে। –(রূহুল মা'আনী) আর এরূপ হতে পারে যে, এখানে হিসাবের অর্থ জিজ্ঞাসাবাদ নয়; বরং শাস্তি নির্ধারণ করা। এটাও হতে পারে যে, কঠোর হিসাব যদিও পরকালে হবে, কিন্তু আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। একেই হিসাব করা হয়েছে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আজাবের অর্থ ইহকালীন আজাব, যা অনেক পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের উপর নাজিল হয়েছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا বাক্যে বর্ণিত আজাব কেবল পরকালে হবে।

قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُوْلًا এ আয়াতের সহজ ব্যাখ্যা এই যে, اَرْسَلَ শব্দ উহ্য মেনে এই অর্থ করা যে, নাজিল করেছেন কুরআন এবং প্রেরণ করেছেন রাসূল ﷺ। অন্যরা অন্য ব্যাখ্যাও লিখেছেন। উদাহরণত ঃ 'জিকির' এর অর্থ স্বয়ং রাসূল ﷺ এবং অধিক জিকিরের কারণে তিনি নিজেই যেন জিকির হয়ে গেছেন। -(রূহুল মা'আনী)

সপ্ত পৃথিবী কোথায় কোথায় কিভাবে আছে ঃ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ -এই আয়াত থেকে এতটুকু বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, আকাশ যেমন সাতটি পৃথিবীও তেমনি সাতটি। এখন এই সপ্ত পৃথিবী কোথায় ও কি আকারে আছে, উপরে নীচে স্তরে স্তরে আছে, না প্রত্যেক পৃথিবীর স্থান ভিন্ন ভিন্ন? যদি উপরে নীচে স্তরে স্তরে থাকে, তবে সপ্ত আকাশের মধ্যে আলাদা আলাদা ফেরেশতা আছে, তেমনি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মাঝখানেও ব্যবধান, বায়ুমণ্ডল, শূন্যমণ্ডল ইত্যাদি আছে কি না, তাতে কোনো সৃষ্টজীব আছে কি না অথবা সপ্ত পৃথিবী পরস্পরে গ্রথিত কি না? এসব প্রশ্নের ব্যাপারে কুরআন পাক নীরব। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সেসব হাদীসের অধিকাংশ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ এগুলোকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং কেউ জাল এবং মনগড়া পর্যন্ত বলে দিয়েছেন। উপরে যেসব সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তির নিরিখে সবগুলোই সম্ভবপর। বলতে কি, এসব তথ্যানুসন্ধানের উপর আমাদের কোনো ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। কবরে অথবা হাশরে আমাদেরকে এ সম্পর্কে প্রশ্নও করা হবে না। তাই নিরাপদ পন্থা এই যে, আমরা ঈমান আনব এবং বিশ্বাস করব আকাশের ন্যায় পৃথিবীও সাতটিই। সবগুলোকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কুরআনের বর্ণনা এতটুকুই, যে বিষয় বর্ণনা করা কুরআন জরুরি মনে করেনি, আমরাও তার পেছনে পড়ব না। এ জাতীয় বিষয়াদিতে পূর্ববর্তী মনীষীগণের কর্মপন্থা তাই ছিল। তাঁরা বলেছেন ঃ اَبْهِمُوْا مَا اَبْهَمَهُ اللّٰهُ। অর্থাৎ যে বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বিশেষতঃ বহমান তাফসীর সর্বসাধারণের জন্য লিখিত হয়েছে। জনসাধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় নয়-এমন বিরোধপূর্ণ আলোচনা এতে সন্নিবেশিত করা হয়নি।

يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আদেশ সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবীর মাঝখানে অবতীর্ণ হতে থাকে। আল্লাহর আদেশ দ্বিবিধ। -(আইনগত, যা আল্লাহর আদিষ্ট বান্দাদের জন্যে ওহী ও পয়গম্বরগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীতে মানব ও জিনের জন্যে আকাশ থেকে ফেরেশতাগণ এই আইনগত আদেশ পয়গম্বরগণের কাছে নিয়ে আসে। এতে আকাইদ, ইবাদত, চরিত্র, পারস্পরিক লেন-দেন, সামাজিক বিধি ইত্যাদি থাকে এগুলো মেনে চললে ছওয়াব এবং অমান্য করলে আজাব হয়। (২) দ্বিতীয় প্রকার আদেশ সৃষ্টিগত। অর্থাৎ আল্লাহর তকদীর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধি-বিধান : এতে জগত সৃষ্টি, জগতের ক্রমোন্নতি, হ্রাসবৃদ্ধি এবং জীবন ও মরণ দাখিল আছে। এসব বিধি-বিধান সমগ্র সৃষ্ট বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। তাই যদি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মধ্যস্থলে শূন্যমণ্ডল, ব্যবধান এবং তাতে কোনো সৃষ্টজীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে সেই সৃষ্টজীব শরিয়তের বিধি-বিধানের অধীন না হলেও তার প্রতি আল্লাহর আদেশ অবতীর্ণ হতে পারে। কারণ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগত আদেশ তাতেও ব্যাপ্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

طَلَّقْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَطْلِيْق মূলবর্ণ (ط - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা তালাক দিতে চাও।

يَتَعَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّل মাসদার تَعَدُّد মূলবর্ণ (ع - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- লঙ্ঘন করবে।

يُحْدِثُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اِحْدَاث মূলবর্ণ (ح - د - ث) জিনস صحيح অর্থ- তিনি সৃষ্টি করেন।

فَارِقُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُفَارَقَة মূলবর্ণ (ف - ر - ق) জিনস صحيح অর্থ- তাদেরকে মুক্ত করে দাও।

يَئِسْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার يَأْسٌ মূলবর্ণ (ى ـ ء ـ س) জিনস মুরাক্কাব مثال يائى এবং مهموز عين অর্থ– তারা সকল স্ত্রী লোক নিরাশ হয়েছে।

اَلْمَحِيْضُ : যরফে যামান, (হায়েজের সময়) যরফে মাকান, (হায়েজের স্থান) মাসদার– حَيْض অর্থ– হায়েজ আসা বা হায়েজ অর্থাৎ সাবালিকা নারীর যে গর্ভবতী নয়, তার জরায়ু থেকে বিশেষ সময় এবং বিশেষ দিনে যে রক্ত বের হয়, তাকে হায়েজ বলা হয়।

لَمْ يَحِضْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحَيْضُ মূলবর্ণ (ح – ى – ض) জিনস اجوف يائى অর্থ– যাদের ঋতু শুরু হয়নি।

يُعْظِمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْظَامٌ মূলবর্ণ (ع ـ ظ ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তিনি বড় করেন। সম্মান করেন। মর্যাদা দেন। মহান করেন।

سَكَنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার سُكُوْنٌ মূলবর্ণ (س ـ ك ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বসবাস করেছ। আবাদ হয়েছে।

وُجْدِكُمْ : শব্দটি ইসম كُمْ যমীর হলো মুযাফ ইলাইহি, অর্থ– তোমাদের আর্থিক সচ্ছলতা অনুপাতে।

لِتُضَيِّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَضْيِيْقٌ মূলবর্ণ (ض – ى – ق) জিনস اجوف يائى অর্থ– উত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে।

إِئْتَمِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْإِئْتِمَارُ মূলবর্ণ (ا – م – ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– পরামর্শ করে নিও।

تَعَاسَرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَعَاسُرٌ মূলবর্ণ (ع ـ س ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তার ব্যাপারে সংকীর্ণতা করেছ। পারস্পরিক কাজে জটিলতা/ কাঠিন্যতা সৃষ্টি করা।

تُرْضِعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرْضَاعٌ মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তিনি দুধ পান করান।

قُدِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول অর্থ– রিজিক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ

ذَاقَتْ : সীগাহ– واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার ذَوْقٌ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– স্বাদ গ্রহণ করেছে। মজা নিয়েছে।

وَبَالٌ : শব্দটি ইসম, অর্থ– পরিহার, খারাপ পরিণতি, কঠিন শাস্তি।

مُبَيِّنٰتٍ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ب – ى – ن) জিনস اجوف يايى অর্থ– সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ : এখানে اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, আর اَلَّذِىْ তার খবর, আর خَلَقَ বাক্যটি সেলাহ, আর سَبْعَ سَمٰوٰتٍ হলো মাফউল। আর مِنَ الْاَرْضِ হলো حال এবং مِثْلَهُنَّ টা سَبْعَ -এর ওপর আতফ হয়েছে, অথবা এটা واو-এর পর উহ্য ফে'ল থাকার কারণে منصوب হয়েছে। অর্থাৎ وَخَلَقَ-سَمٰوٰتٍ আবার এটা رفع -এর সাথে مِثْلُهُنَّ-ও পড়া যায় এ হিসেবে যে, এটা মুবতাদা মুয়াখখার আর তার পূর্বে جار এবং مجرور তথা مِنَ الْاَرْضِ টা হলো خبر مقدم –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৫)

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ مَدَنِيَّةٌ
সূরা তাহরীম

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত- ১২, রুকূ'- ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١﴾

১. হে নবী! যে বস্তুকে আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন, আপনি কেন (কসম করে) তাকে (নিজের উপর) হারাম করছেন। আপন পত্নীগণের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে; আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, দয়ালু।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾

২. আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের শপথসমূহ ভঙ্গ করা (এবং কাফফারার পন্থা) নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আর আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের কার্যনির্বাহক, আর তিনি মহাজ্ঞানী, অতিশয় হেকমতওয়ালা।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ

৩. আর যখন রাসূল নিজের কোনো এক পত্নীর নিকট গোপনে একটি কথা বললেন, তৎপর যখন সে তা (অন্য পত্নীর নিকট) বলে দিল, আর আল্লাহ তা'আলা (ওহীর মাধ্যমে) রাসূলকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন তিনি কতক কথা বলে দিলেন আর কতক কথা গোপন রাখলেন,

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী لِمَ تُحَرِّمُ আপনি কেন তাকে হারাম করেছেন مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ যে বস্তুকে আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ আপন পত্নীগণের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, দয়ালু।

২. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ তোমাদের শপথসমূহ ভঙ্গ করা وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ আর আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের কার্যনির্বাহক وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ আর তিনি মহাজ্ঞানী, অতিশয় হেকমতওয়ালা।

৩. وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ আর যখন রাসূল গোপনে বললেন اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ নিজের কোনো এক পত্নীর নিকট حَدِيْثًا একটি কথা فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ তৎপর যখন সে তা (অন্যপত্নীর নিকট) বলে দিল وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ আর আল্লাহ তা'আলা (ওহীর মাধ্যমে) রাসূলকে তা জানিয়ে দিলেন عَرَّفَ بَعْضَهٗ তখন তিনি কতক কথা বলে দিলেন وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ আর কতক কথা গোপন রাখলেন।

** অতঃপর যখন তিনি ঐ স্ত্রীকে তা জানালেন, তখন সে বলল, কে আপনাকে তা জানিয়ে দিল? তিনি বললেন, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে ওয়াকেফহাল, তিনিই আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।	فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِیَ الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ ﴿۳﴾
৪. হে (নবীর) স্ত্রীদ্বয়! যদি তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করে তওবা কর, তবে (উত্তম, কেননা) তোমাদের অন্তর আকৃষ্ট হচ্ছে, আর যদি তোমরা উভয়ে রাসূলের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা করতে থাক, তবে জেনে রেখ। আল্লাহ ও জিবরাঈল এবং নেক মুসলমানগণ রাসূলের সহায় আছেন, আর এতদ্ভিন্ন ফেরেশতাগণ (তার) সাহায্যকারী রয়েছেন।	اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَی اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَیْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِیْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِیْرٌ ﴿۴﴾
৫. যদি তিনি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অচিরেই তাঁর প্রতিপালক তাকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে অতি উত্তমা পত্নীসমূহ প্রদান করবেন, যারা মুসলিমা, মু'মিনা, অনুগতা, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোজা পালনকারিণী, কতক বিধবা ও কতক কুমারী হবে।	عَسٰی رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ یُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَیْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَیِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ﴿۵﴾
৬. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিজনদেরকে সে অগ্নি হতে রক্ষা কর যার ইন্ধন মানুষ ও প্রস্তরসমূহ হবে, যাতে কঠোর স্বভাব, শক্তিশালী ফেরেশতাগণ (নিয়োজিত) রয়েছেন।	یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِیْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

শাব্দিক অনুবাদ :

** فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ অতঃপর যখন তিনি ঐ স্ত্রীকে তা জানালেন قَالَتْ তখন সে বলল। مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا কে আপনাকে এটা জানিয়ে দিল قَالَ তিনি বললেন نَبَّاَنِیَ الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল তিনিই আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।

৪. اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَی اللّٰهِ হে [নবীর] স্ত্রীদ্বয় যদি তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করে তওবা কর فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا তবে (উত্তম, কেননা) তোমাদের অন্তর আকৃষ্ট হচ্ছে وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَیْهِ আর যদি তোমরা উভয়ে রাসূলের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা করতে থাক فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ তবে জেনে রেখ আল্লাহ রাসূলের সহায় আছেন وَجِبْرِیْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ ও জিবরাঈল এবং নেক মুসলমানগণ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِیْرٌ, আর এতদ্ভিন্ন ফেরেশতাগণ (তার) সাহায্যকারী রয়েছেন।

৫. عَسٰی رَبُّهٗ তবে অচিরেই তাঁর প্রতিপালক اِنْ طَلَّقَكُنَّ যদি তিনি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন اَنْ یُّبْدِلَهٗ তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে প্রদান করবেন اَزْوَاجًا خَیْرًا مِّنْكُنَّ তোমাদের চেয়ে অতি উত্তমা পত্নীসমূহ مُسْلِمٰتٍ যারা মুসলিমা مُّؤْمِنٰتٍ মু'মিনা قٰنِتٰتٍ অনুগতা تٰٓئِبٰتٍ তওবাকারিণী عٰبِدٰتٍ ইবাদত কারিণী سٰٓئِحٰتٍ রোজা পালনকারিণী ثَیِّبٰتٍ কতক বিধবা وَّاَبْكَارًا ও কতক কুমারী হবে।

৬. یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ। قُوْۤا তোমরা রক্ষা কর اَنْفُسَكُمْ নিজেদেরকে وَاَهْلِیْكُمْ ও তোমাদের পরিজনদিগকে نَارًا সেই অগ্নি হতে وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তরসমূহ عَلَیْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ যাতে কঠোর স্বভাব, শক্তিশালী ফেরেশতাগণ (নিয়োজিত) রয়েছেন।

لَّا يَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ ﴿٦﴾

** তারা কোনো বিষয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করে না যা তাদেরকে আদেশ করেন, আর যা তাদেরকে আদেশ করা হয় তারা (তৎক্ষণাৎ) তা পালন করে ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَا تَعۡتَذِرُوا الۡيَوۡمَ ؕ اِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿٧﴾

৭. হে কাফেররা! আজ তোমরা কোনো ওজর [আপত্তি] পেশ করো না তোমরা তো কেবল তারই সাজা ভোগ করছ, যা তোমরা [পৃথিবীতে] করতে ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا تُوۡبُوۡۤا اِلَى اللّٰهِ تَوۡبَةً نَّصُوۡحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمۡ اَنۡ يُّكَفِّرَ عَنۡكُمۡ سَيِّاٰتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ۙ يَوۡمَ لَا يُخۡزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ ۚ نُوۡرُهُمۡ يَسۡعٰى بَيۡنَ اَيۡدِيۡهِمۡ وَبِاَيۡمَانِهِمۡ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اَتۡمِمۡ لَنَا نُوۡرَنَا وَاغۡفِرۡ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿٨﴾

৮. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার সমীপে খাঁটি তওবা কর; আশা রয়েছে যে, তোমাদের প্রভু (তওবার ফলে) তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন, আর তোমাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, (এটা সেই দিন হবে) যে দিন আল্লাহ নবীকে এবং ঐ সমস্ত মুসলমানকে যারা তাঁর সাথে রয়েছে– অপমানিত করবেন না, তাদের নূর তাদের ডান দিকে এবং তাদের সম্মুখ দিকে দৌড়াতে থাকবে, (আর) এরূপ দোয়া করতে থাকবে যে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য এ নূরকে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী রাখুন, আর আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, নিঃসন্দেহে আপনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান ।

শাব্দিক অনুবাদ :

** لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ তারা কোনো বিষয়ে আল্লাহর নাফরমানি করে না যা তাদেরকে আদেশ করেন وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ আর যা তাদেরকে আদেশ করা হয় তারা (তৎক্ষণাৎ) তা পালন করে ।

৭. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا হে কাফেররা لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ আজ তোমরা কোনো ওজর পেশ [আপত্তি] করো না اِنَّمَا تُجْزَوْنَ তোমরা তো কেবল তারই সাজা ভোগ করছ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ যা তোমরা (পৃথিবীতে) করতে ।

৮. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ تُوْبُوْۤا তোমরা তওবা কর اِلَى اللّٰهِ আল্লাহর সমীপে تَوْبَةً نَّصُوْحًا খাঁটি তওবা عَسٰى رَبُّكُمْ আশা রয়েছে যে, তোমাদের প্রভু اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ আর তোমাদেরকে এমন উদ্যানে দাখিল করবেন تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্ন-দেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে يَوْمَ যে দিন لَا يُخْزِى اللّٰهُ আল্লাহ অপমানিত করবেন না النَّبِىَّ নবীকে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ এবং ঐ সমস্ত মুসলমানকে যারা তাঁর সাথে রয়েছে نُوْرُهُمْ তাদের নূর يَسْعٰى দৌড়াতে থাকবে بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ তাদের ডান দিকে وَبِاَيْمَانِهِمْ এবং তাদের সম্মুখ দিয়ে يَقُوْلُوْنَ (আর) এরূপ দোয়া করতে থাকবে যে رَبَّنَاۤ হে আমাদের প্রভু اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا আমাদের জন্য এ নূরকে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী রাখুন وَاغْفِرْ لَنَا, আর আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে আপনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান ।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٩﴾

৯. হে নবী! কাফেরদের সাথে এবং মুনাফেকদের সাথে জিহাদ করুন, আর তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন; আর তাদের বাসস্থান দোজখ হবে; বস্তুতঃ তা নিকৃষ্ট নিবাস।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ۗ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ﴿١٠﴾

১০. আল্লাহ কাফেরদের (উপদেশের) জন্য নূহের পত্নী ও লূতের পত্নীর অবস্থা বর্ণনা করছেন; তারা উভয়ে আমার বিশিষ্ট বান্দাগণের অন্তর্গত দু জন বান্দার বিবাহবন্ধনে ছিল, কিন্তু তারা উভয়েই সে বান্দাদ্বয়ের হক নষ্ট করেছে, সুতরাং সে দু জন নেককার বান্দা আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কিছুমাত্র কাজে আসতে পারেনি এবং উভয়কে নির্দেশ প্রদান করা হলো, অন্যান্য প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও দোজখে প্রবেশ কর।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١١﴾

১১. আর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের (সান্ত্বনার) জন্য ফেরাউনের স্ত্রী (আছিয়া)-র অবস্থা বর্ণনা করছেন। যখন সে দোয়া করল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য জান্নাতের মধ্যে আপনার সন্নিধানে গৃহ বানিয়ে দিন, আর আমাকে ফেরাউন হতে এবং তার (কুফরি) আচরণ হতে রক্ষা করুন, আর আমাকে সমস্ত অত্যাচারী লোকগণ হতে উদ্ধার করুন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী! جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ কাফেরদের সাথে এবং মুনাফেকদের সাথে জিহাদ করুন وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ আর তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ আর তাদের বাসস্থান দোজখ হবে وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ বস্তুত : তা নিকৃষ্ট নিবাস।

১০. ضَرَبَ اللّٰهُ আল্লাহ বর্ণনা করছেন مَثَلًا অবস্থা لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا কাফেরদের জন্য امْرَاَتَ نُوْحٍ নূহের পত্নী وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ও লূতের পত্নীর كَانَتَا তারা উভয়ে ছিল تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ আমার বিশিষ্ট বান্দাগণের অন্তর্গত দু'জন বান্দার বিবাহ বন্ধনে فَخَانَتٰهُمَا কিন্তু তারা উভয়েই সেই বান্দাদ্বয়ের হক নষ্ট করেছে فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا সুতরাং সেই দুই জন নেককার বান্দা তাদের কাজে আসতে পারে নি مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর মোকাবেলায় شَيْـًٔا কিছু মাত্র وَقِيْلَ এবং উভয়কে নির্দেশ প্রদান করা হলো ادْخُلَا النَّارَ তোমরাও দোজখে প্রবেশ কর مَعَ الدّٰخِلِيْنَ অন্যান্য প্রবেশকারীদের সাথে।

১১. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا আর আল্লাহ তা'আলা অবস্থা বর্ণনা করছেন لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا মুসলমানদের (সান্ত্বনার) জন্য امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের স্ত্রীর অবস্থা اِذْ قَالَتْ যখন সে দোয়া করল رَبِّ হে আমার প্রতিপালক ابْنِ لِيْ আমার জন্য বানিয়ে দেন عِنْدَكَ بَيْتًا আপনার সন্নিধানে গৃহ فِى الْجَنَّةِ জান্নাতের মধ্যে وَنَجِّنِيْ আর আমাকে রক্ষা করুন مِنْ فِرْعَوْنَ ফেরাউন হতে وَعَمَلِهٖ এবং তার (কুফরি) আচরণ হতে وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ আর আমাকে সমস্ত অত্যাচারী লোকগণ হতে উদ্ধার করুন।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿١٢﴾

১২. আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যিনি নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন, অনন্তর আমি তার জামার ফাঁক অংশের মধ্যে আমার (সন্নিধান হতে) আত্মা-ফুৎকার করে দিলাম, আর তিনি নিজ প্রতিপালকের বাণীসমূহ ও তার কিতাবসমূহের সত্যতা সমর্থন করেছেন, আর তিনি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا যিনি তাঁর সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا অনন্তর আমি তাঁর জামার ফাঁক অংশের মধ্যে আমার (সন্নিধান হতে) আত্মা-ফুৎকার করে দিলাম وَصَدَّقَتْ, আর তিনি সমর্থন করেছেন بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا নিজ প্রতিপালকের বাণীসমূহ وَكُتُبِهٖ ও তাঁর কিতাব সমূহের وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ, আর তিনি ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম সূরার প্রথম শব্দ لِمَ تُحَرِّمُ হতে গৃহীত। এটি এ সূরায় আলোচিত বিষয়াদির শিরোনাম নয়। এরূপ নামকরণের অর্থ হলো, এটা সেই সূরা যাতে 'তাহরীম' (হারামকরণ) সংক্রান্ত একটা ঘটনার উল্লেখ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ১২টি আয়াত, ৩৪৯টি বাক্য ও ১০৬০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরায় তাহরীম তথা কোনো কিছু হারাম করে নেওয়া সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে দু'জন মহিলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু'জন মহিলা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হেরেমভুক্ত ছিলেন। তাঁদের একজন হলেন হযরত সফিয়া (রা.), আরেকজন হলেন হযরত মারিয়ায়ে কিবতীয়া (রা.)। খায়বর বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হযরত সফিয়ার বিবাহ হয়। এ খায়বার বিজয় সর্বসম্মতভাবে ৭ম হিজরিতে হয়েছিল। দ্বিতীয় মহিলা হযরত মারিয়াকে ৭ম হিজরিতে মিসর অধিপতি মুকাউকাস নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা হতে প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, সূরাটি ৭ম বা ৮ম হিজরির কোনো এক সময় নাজিল হয়েছিল।

সূরাটির শানে নুযূল : অত্র সূরা নাজিলের কয়েকটি শানে নুযূল রয়েছে। যথা–

১. বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের স্ত্রীদের সাথে থাকার পালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যখন হযরত হাফসার দিন আসল, তিনি তাঁর মাতাপিতাকে দেখতে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অনুমতি চাইলেন। রাসূল তাঁকে অনুমতি দিলেন। হযরত হাফসা (রা.) চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসার ঘরে হযরত মারিয়াকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর সেখানে একাকিত্বে অবস্থান করলেন। ইতোমধ্যেই হযরত হাফসা চলে আসলে তাঁর ঘরে হযরত মারিয়াসহ রাসূল ﷺ -কে দেখতে পেলেন। এটা দেখে হযরত হাফসা (রা.) অত্যন্ত রেগে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমার ঘরে আমার অনুপস্থিতিতে একে নিয়ে আসলেন এবং একাকিত্বে কাটালেন, এটা আমাকে অপমানিত করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে নয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে খুশি করার উদ্দেশ্যে বললেন, ঠিক আছে আমি আজ হতে তাকে নিজের জন্য হারাম করে নিলাম। এ সংবাদ তুমি অন্য কাউকেও দিও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর হতে বের হয়ে গেলে হযরত হাফসা এ সংবাদ হযরত আয়েশা (রা.)-কে জানিয়ে দেন এবং গোপন কথাও ফাঁস করে দেন। এটা শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে শপথ করলেন যে, আগামী এক মাস তিনি তাঁর স্ত্রীগণের ঘরে প্রবেশ করবেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের হতে আলাদা থাকলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ আয়াতটি নাজিল করলেন। -[সাফওয়া, আসবাব, কুরতুবী, তাবারী, সাবী]

২. সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের পর আসতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায়ই স্ত্রীগণের কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গমন করতেন। একদিন হযরত যয়নবের কাছে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হযরত হাফসার সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছেই আসবেন সেই বলবে, আপনি 'মাগাফীর' পান করেছেন। [মাগাফীর হলো এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠা] সে মতে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না আমিতো মধু পান করেছি। সে স্ত্রী বললেন, সম্ভবত কোনো মৌমাছি মাগাফীর বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল এ কারণেই মধু দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু হতে সযত্নে বেঁচে থাকতেন, তাই তিনি অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। হযরত যয়নব মনঃক্ষুণ্ন হবে চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করবার জন্যও বলেছিলেন, কিন্তু সে স্ত্রী বিষয়টি অন্য স্ত্রীর কাছে বলে দিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। -[মা'আরিফ, আসবাব]

কোনো কোনো বর্ণনায় হযরত সাওদার কাছে, আর কোনো কোনো রেওয়ায়াতে হযরত হাফসার কাছে মধু পান করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার কারণ উভয় ঘটনা হতে পারে। (আসবাব, সুয়ূতী) দ্বিতীয় কারণটি প্রথম কারণ হতে সনদের দিক দিয়ে অধিক সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হলেও মুফাসসিরগণের কাছে প্রথম কারণটিই অধিক প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় কারণটিকে অনেকেই এ সূরা নাজিল হওয়ার কারণ হিসেবে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁরা নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলির প্রতি লক্ষ্য করে প্রথম কারণকেই এ সূরা নাজিল হওয়ার কারণ বলে মত পোষণ করেছেন।

১. মধু পান হারামকরণের মাধ্যমে নবীজী ﷺ কোনো স্ত্রীকে খুশি করতে চেয়েছিলেন এটা অবান্তর। মধু পান হারাম করেছিলেন মূলত দুর্গন্ধের কথা শুনে-স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। সুতরাং স্ত্রীকে খুশি করানোর জন্য মারিয়াকে হারাম করাই যুক্তিসঙ্গত।

২. আলোচ্য সূরায় রাসূল ﷺ -এর স্ত্রীদের প্রতি যে কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদেরকে যে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে তা হতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীগণের মধ্যে ঈর্ষা ছড়িয়ে পড়েছিল, যার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেয়েছিলেন এবং তাঁর কোনো দাসীকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। মধু পান হারাম করার কারণে স্ত্রীদেরকে এ রকম কঠোর হুশিয়ারি দান অসম্ভব মনে হয়। এ সব কারণেই আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, كَوْنُ قَضِيَّةِ شُرْبِ الْعَسَلِ سَبَبًا لِلنُّزُوْلِ فِيْهِ نَظَرٌ.

অর্থাৎ মধুপানের ব্যাপারটিকে সূরাটি নাজিল হওয়ার কারণ হিসেবে গ্রহণ করা কঠিন।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : পবিত্র কুরআনের সূরাগুলোর মাঝে এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্রা স্ত্রীদের কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

প্রথমে বলা হয়েছে– হারাম-হালাল বা জায়েজ ও নাজায়েজ সম্পর্কে সীমা নির্ধারণ করার বিশেষ ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর হস্তে সুনিশ্চিতরূপে নিবদ্ধ রয়েছে, এ বিষয়ে সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, নবীর হাতেও এটার ইখতিয়ার সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

আল্লাহর ইঙ্গিত ব্যতীত নবীও নিজ ক্ষমতা বলে কোনো হালালকে হারাম করার ক্ষমতা পাননি। আল্লাহর সাথে যোগাযোগ ব্যতীত কোনো কাজ করার ক্ষমতা নবীকে দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, মানবসমাজে একজন নবীর মর্যাদা অতি উচ্চে। সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনো জঘন্য ঘটনা ঘটানো তেমন মারাত্মক ব্যাপার নয়। তবে নবীগণের সামান্যতম অপরাধও জঘন্য অপরাধের কারণ। যেহেতু তাদের কার্যাবলি জগতের জন্য নিখুঁত দলিল-প্রমাণ রূপে গ্রহণযোগ্য। তাই নবীগণের প্রতি রাব্বুল আলামীনের তীব্র দৃষ্টি রক্ষিত হয়, তাই আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের জীবনে কোনো কলঙ্ক আসতে দেওয়া হয়নি। যদিও কোথাও পদস্খলন ঘটতে চায় তাও তৎক্ষণাৎ শোধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ ইসলামের আইন কেবল কুরআনের নির্দেশই নয়; বরং নবীর পালনীয় আদর্শও ইসলামের আইন। সুতরাং তা সঠিকরূপে বান্দাদের নিকট যেন পৌঁছতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়ার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যে পরস্পর দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তা কেবল তাদের মধ্যেই সীমিত থাকলে মূলত তা আল্লাহ ও সকল ফেরেশতাগণ পর্যন্ত অবগত হয়ে গেছেন। চতুর্থত বলা হয়েছে- নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণ যেন পরস্পর হিংসা ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না করে। নবীর কোনো আচরণ তাদের নিকট অপছন্দনীয় হলে সেজন্য নবীর পক্ষে স্ত্রীগণের তোয়াক্কা করতে হবে না।

ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলা বর্তমান স্ত্রীদের অপেক্ষা আরো অধিক উত্তম স্ত্রী ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। নবীর স্ত্রীগণকে এতে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

এরপর ঈমানদারগণের প্রতি সতর্কবাণী পেশ করা হয়েছে এবং ঈমানদারগণের সন্তানসন্তানাদি সহ যেন তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং পরকালীন দোজখের শাস্তি হতে নাজাত পাওয়ার ব্যবস্থা করে আল্লাহর নির্দেশ সকলের জন্যই সমানভাবে কার্যকরি করে। পরবর্তী আয়াতে কাফেরগণকে সতর্ক করা হয়েছে। কাফেররা যতই পরকালকে অস্বীকার করুক না কেন একদিন তা সত্য প্রমাণিত হবে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করা আবশ্যক। ভালো কাজের প্রতিদান ভালো এবং মন্দ কাজের প্রতিফল নিতান্ত মন্দ হবে।

তৎপরবর্তী আয়াতে সকল ঈমানদারকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, আর আল্লাহ তা'আলার দরবারে তওবা করলে খাঁটি মনেই প্রতিজ্ঞার সাথে তওবা করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে নবীর সংশ্রবে থাকলে পরকালে জান্নাত পাওয়া যাবে।

এরপর কাফেরদের সাথে জিহাদ করার জন্য হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতগণকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

পরিশেষে হযরত নূহ (আ.) ও হযরত লূত (আ.) -এর স্ত্রী এবং ফেরাউনের স্ত্রীর করুণ ঘটনা বলে সূরা তাহরীম শেষ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা তালাক ও ইদ্দত সম্পর্কে বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ সূরায়ও বিশেষত নারী জাতি সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি কিভাবে অর্জিত হয় তার পথ-নির্দেশ রয়েছে এ সূরায়। এ পর্যায়ে ধৈর্য ও সহনশীলতা, ন্যায়বিচার, পরস্পরের হক আদায়ের প্রেরণা একান্ত অনুসরণীয় মূলনীতি। –[নূরুল কুরআন]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ .... الاية (١)

শানে নুযূল ঃ সহীহ বোখারী ইত্যাদি কিতাবে হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল বিবির কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্যে গমন করতেন। একদিন হযরত যয়নব (রা.) -এর কাছে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং হযরত হাফসা (রা.) এর সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সেই বলবে আপনি মাগাফির পান করছেন। (মাগাফির এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়) সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন না, আমি তো মধু পান করেছি। সেই বিবি বললেন, সম্ভবত কোনো মৌমাছি মাগাফির বৃক্ষে বসে তার রস চুষে ছিল। এ কারণেই মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে সযত্নে বেচে থাকতেন। তাই আর কখনো মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। হযরত যয়নব (রা.) মনঃক্ষুন্ন হবেন চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যেও বলে দিলেন। কিন্তু সেই বিবি বিষয়টি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত হাফসা (রা.) মধু পান করিয়ে ছিলেন। কতক রেওয়ায়েতে ঘটনাটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটা অমূলক নয় যে, একাধিক ঘটনার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –(বয়ানুল কুরআন)

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ .... الاية (٥)

قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ عـــ ٢

শানে নুযূল-১ : হাইছাম বিন কালীব হযরত ওমর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ হযরত হাফসা (রা.)-কে বলেছিলেন যে, ইবরাহীমের মাতা মারিয়া আমার জন্যে হারাম, এ সংবাদটি তুমি কাউকে জানাবে না। হযরত হাফসা (রা.) বললেন যে, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করে দিয়েছেন, আপনি কী তা আপনার জন্যে হারাম করে দিবেন? রাসূল ﷺ আল্লাহর শপথ করে বললেন, আমি তার নিকটেও যাব না। রাসূল ﷺ মারিয়া (রা.)-এর নিকট যাননি। এর মধ্যে হাফসা (রা.) আয়েশা (রা.) -এর নিকট সে সংবাদটি জানিয়ে দিলেন রাসূল ﷺ শপথ গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(ইবনে কাছীর ৩৮৬, ফতহুল কাদীর ২৫২/৫)

শানে নুযূল-২ : হারেছ বিন আবী উসামা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত মিসতাহকে কোনো প্রকারের দান-দাক্ষিণ্য না করার প্রতিশ্রুতি যখন করেন, তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(ফতহুল কাদীর : ২৫২/৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত ওমর (রা.) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিরা রাসূল ﷺ -এর খেলাফ আচরণ করে ফেলল, তখন আমি তাদেরকে বললাম, এটা কোনো বিচিত্র বিষয় নয় যে, রাসূল ﷺ তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দিবেন এবং তাঁর প্রতিপালক তাঁকে তোমাদের থেকে উত্তম বিবি দান করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হুবহু আমার শব্দে এই আয়াত নাজিল করেন। (সূত্র- বুখারী শরীফ, কানযুন নুকূল : ১০২)

আয়াতসমূহের সার-সংক্ষেপ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি হালাল বস্তু অর্থাৎ মধুকে কসমের মাধ্যমে নিজের জন্যে হারাম করে নিয়েছিল। এ কাজ কোনো প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে হলে জায়েজ; গোনাহ নয়, কিন্তু আলোচ্য ঘটনায় এমন কোনো প্রয়োজন ছিল না যে, এর কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট স্বীকার করে নিবেন এবং একটি হালাল বস্তু বর্জন করবেন। কেননা একাজ রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল বিবিগণকে খুশি করার জন্যে করেছিলেন। এরূপ ব্যাপারে বিবিগণকে খুশি করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যে অপরিহার্য ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা সহানুভূতিচ্ছলে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –এই আয়াতেও কুরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম নিয়ে সম্বোধন না করে 'হে নবী' বলা হয়েছে। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রম। এরপর বলা হয়েছে যে, স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আপনি নিজের উপর একটি হালাল বস্তুকে হারাম করেছেন কেন? বাক্যটি যদিও সহানুভূতিচ্ছলে বলা হয়েছে, কিন্তু দৃশ্যতঃ এতে জওয়াব তলব করা হয়েছে। এ থেকে ধারণা হতে পারত যে, সম্ভবতঃ তিনি খুব বড় ভুল করে ফেলেছেন। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছে وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ গোনাহ্ হলেও আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মাসআলা ঃ তিন প্রকারে কোনো হালাল বস্তুকে নিজের ওপর হারাম করা যায়। এর বিশদ বর্ণনা সূরা মায়িদার তাফসীরে উল্লিখিত হয়েছে। তা সংক্ষেপে এই যে, কেউ কোনো হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে না করে কিন্তু যদি কোনো প্রয়োজন ব্যতিরেকেই কসম খেয়ে হারাম করে নেয়, তবে তা গোনাহ্ হবে। কোনো প্রয়োজন ও উপযোগিতাবশত হলে জায়েজ কিন্তু উত্তমের খেলাফ। তৃতীয় প্রকার এই যে, বিশ্বাসগতভাবেও হারাম মনে করে না এবং কসম খেয়েও হারাম করে না কিন্তু কার্যত তা চিরতরে বর্জন করার সংকল্প ছওয়াব মনে করে করলে বিদ'আত ও বৈরাগ্য হবে, যা শরিয়তে নিন্দনীয়। আর যদি কোনো দৈহিক অথবা আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থে করে তবে জায়েজ। কোনো কোনো সুফী বুজুর্গ থেকে ভোগ-সম্ভোগ বর্জনের যেসব গল্প বর্ণিত আছে, সেগুলো এই পর্যায়েরই।

উল্লেখিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কসম খেয়েছিলেন। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এই কসম ভঙ্গ করেন এবং কাফফারা আদায় করেন। দুররে-মানসূরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাফফারা হিসাবে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেন। –(বয়ানুল কুরআন)

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ করা জরুরি অথবা উত্তম বিবেচিত হয়, আল্লাহ তা'আলা সেক্ষেত্রে তোমাদের কসম ভঙ্গ করে কাফফারা আদায় করার পথ করে দিয়েছেন। অন্যান্য আয়াতে এর বিশদ বর্ণনা আছে।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا –অর্থাৎ নবী যখন তাঁর কোনো এক বিবির কাছে গোপন কথা বললেন। সহীহ্ ও অধিকাংশ রেওয়ায়েতদৃষ্টে এই গোপন কথা ছিল এই যে, হযরত যয়নব (রা.)-এর কাছে মধু পান করার কারণে অন্য বিবিগণ যখণ মনঃক্ষুন্ন হলেন, তখন তাদেরকে খুশি করার জন্য তিনি মধু পান না করার কসম খেলেন এবং বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যে বলে দিলেন, যাতে যয়নব (রা.) মনে মনে কষ্ট না পান। কিন্তু সেই বিবি এই গোপন কথা ফাঁস করে দিলেন। এই গোপন কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় বিষয় বর্ণিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ও সহীহ রেওয়ায়েতসমূহে তাই আছে, যা লিখিত হলো।

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ –অর্থাৎ সেই বিবি যখন গোপন কথাটি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিলেন এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে এ সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন, তখন তিনি সেই বিবির কাছে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ তো করলেন, কিন্তু পূর্ন কথা বললেন, না। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভদ্রতা। তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ কথা বললেন সে অধিক লজ্জিত হবে। কোন বিবির কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল এবং কার কাছে ফাঁস করা হয়েছিল, কুরআন পাক তা বর্ণনা করেনি। অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে তা ফাঁস করে দেন। এসম্পর্কে সহীহ বুখারীর হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা পরে উল্লেখ করা হবে।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাফসা (রা.)-কে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করেন; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে প্রেরণ করে তাঁকে তালাক থেকে বিরত রাখেন এবং বলে দেন যে, হযরত হাফসা (রা.) অনেক নামাজ পড়ে অনেক রোজা রাখে। তার নাম জান্নাতে আপনার বিবিগণের তালিকায় লিখিত আছে। –(মাযহারী)।

اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا –উপরিউক্ত ঘটনার পশ্চাতে যে দু'জন বিবি সক্রিয় ছিলেন, তাঁরা কে, এসম্পর্কে সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে তিনি বলেন ঃ যে দু'জন নারী সম্পর্কে কুরআন পাকে اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ বলা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-কে প্রশ্ন করার ইচ্ছা বেশ কিছুকাল আমার মনে ছিল। অবশেষে একবার তিনি হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে সুযোগ বুঝে আমিও সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি অজু করছিলেন এবং আমি পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম, তখন প্রশ্ন করলাম ঃ কুরআনে যে দু'জন নারী সম্পর্কে اِنْ تَتُوْبَا বলা হয়েছে, তাঁরা কে? হযরত ওমর (রা.) বললেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আপনি জানেন না, এরা দু'জন হলেন হযরত হাফসা ও হযরত আয়েশা (রা.)। অতঃপর এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজের একটি দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করলেন। এতে এ ঘটনার পূর্ববর্তী কিছু অবস্থাও বর্ণনা করলেন। তাফসীরে মাযহারীতে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আলোচ্য আয়াতে উপরোক্ত দুজন বিবিকে স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমাদের অন্তর অন্যায়ের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে বলে তোমরা তওবা কর, তবে ভালো কথা। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মহব্বত ও সন্তুষ্টি কামনা প্রত্যেক মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তোমরা উভয়ে পরস্পরে পরামর্শ করে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছ, যদ্দরুন তিনি ব্যথিত হয়েছেন। কাজেই এই গোনাহ থেকে তওবা করা জরুরি। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ – এতে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমরা তওবা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খুশি না কর, তবে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা, জিবরাঈল ও সমস্ত নেক মুসলমান তাঁর সহায়। সকল ফেরেশতাগণ তাঁর সেবায় নিয়োজিত। অতএব, তাঁর ক্ষতি করার সাধ্য কার? ক্ষতি যা হবার, তোমাদেরই হবে। অতঃপর তাঁদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ – এতে বিবিগণের এ ধারণার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তালাক দিয়ে দিলে তাদের মতো স্ত্রী সম্ভবত ঃ তিনি পাবে না। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলার সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু নেই। তিনি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দিলেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মতোই নয়; বরং তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নারী তাঁকে দান করবেন। এতে জরুরি হয় না যে, তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট নারী তখন বিদ্যমান ছিল। হতে পারে যে, তখন ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলা অন্য নারীদেরকে তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট করে দিতে পারেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবিগণের কর্ম ও চরিত্রের সংশোধন এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষার বর্ণনা আছে। অতঃপর সাধারণ মুমিনগণকেও এ ব্যাপারে আদেশ করা হচ্ছে।

قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ – এ আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে ঃ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে একথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য পাত্র হবে, তারা কোনো শক্তি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোরপ্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশতাদের নাম 'যাবানিয়া'

اهليكم শব্দের মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, চাকর-নওকর সবই দাখিল আছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত নাজিল হলে পর হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি তো বুঝে আসে (যে, আমরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকব এবং খোদায়ী বিধি-বিধান পালন করব,) কিন্তু পরিবার-পরিজনকে আমরা কিভাবে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এর উপায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ কর এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারবে। –(রূহুল-মা'আনী)।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য ঃ ফিকহবিদগণ বলেন ঃ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ফরজ কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলি শিক্ষা দেওয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজ। একথা আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এক হাদীসে আছে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বলে ঃ হে আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। তোমাদের রোজা, তোমাদের জাকাত, তোমাদের এতিম, তোমাদের মিসকিন, তোমাদের প্রতিবেশী, আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা সবাইকে তোমাদের সাথে জান্নাতে সমবেত করবেন। "তোমাদের নামাজ, তোমাদের রোজা" ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখ, এতে শৈথিল্য না হওয়া উচিত। "তোমাদের মিসকিন, তোমাদের এতিম" ইত্যাদি বলার অর্থ এই যে, তাদের প্রাপ্য খুশি মনে আদায় কর। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন সর্বাধিক আজাবে থাকবে, যার পরিবার-পরিজন ধর্ম সম্পর্কে মূর্খ ও উদাসীন হবে। –(রূহুল–মা'আনী)

মুমিনদেরকে উপদেশ দানের পর يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আয়াতে কাফেরদেরকে বলা হয়েছে ঃ এখন তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সামনে আসছে। এখন তোমাদের কোনো ওজর কবুল করা হবে না।

تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। উদ্দেশ্য গোনাহ থেকে ফিরে আসা। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় তওবার অর্থ বিগত গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার ধারে-কাছে না যাওয়ার দৃঢ়সংকল্প করা। نَصُوْحٌ শব্দটিকে যদি نَصِيْحَةٌ থেকে উদ্ভূত ধরা হয়, তবে এর অর্থ খাঁটি করা। আর যদি نَصَاحَةٌ থেকে উৎপন্ন ধরা হয়, তবে এর অর্থ বস্ত্র সেলাই করা ও তালি দেওয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে تَوْبَةً نَّصُوْحًا–এর অর্থ এমন তওবা, যা রিয়া ও নাম-যশ থেকে খাঁটি–কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও আজাবের ভয়ে ভীত হয়ে এবং গোনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে গোনাহ পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে نَصُوْحٌ শব্দটি এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্যে হবে যে, তওবা গোনাহের কারণে সৎকর্মের ছিন্নবস্ত্রে তালি সংযুক্ত করে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন ঃ বিগত কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না করার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করাই تَوْبَةٌ نَّصُوْحٌ–কালবী (রহ.) বলেন تَوْبَةٌ نَّصُوْحٌ হলো মুখে ক্ষমাপ্রার্থনা করা, অন্তরে অনুশোচনা করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভবিষ্যতে সেই গোনাহ থেকে দূরে রাখা। হযরত আলী (রা.)–কে জিজ্ঞাসা করা হলো; তওবা কি? তিনি বললেন ঃ ছয়টি বিষয়ের একত্র সমাবেশ হলে তওবা হবে –(১) অতীত মন্দকর্মের জন্যে অনুতাপ (২) যেসব ফরজ ও ওয়াজিব কর্ম তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাযা করা, (৩) কারও ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে থাকলে তা প্রত্যার্পণ করা, (৪) কাউকে হাতে অথবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তজ্জন্যে ক্ষমা নেওয়া, (৫) ভবিষ্যতে সেই গোনাহের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হওয়া এবং (৬) নিজেকে যেমন আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করতে দেখেছিল, তেমনি এখন আনুগত্য করতে দেখা –(মাযহারী)

হযরত আলী (রা.) বর্ণিত তওবার উপরিউক্ত শর্তসমূহ সবার কাছে স্বীকৃত। তবে কেউ সংক্ষেপে এবং কেউ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ – عَسٰى –শব্দের অর্থ আশা আছে, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য ওয়াদা। ওয়াদাকে আশা বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের তওবা অথবা অন্য কোনো সৎকর্ম হোক, কোনটিই জান্নাত ও মাগফেরাতের মূল্য হতে পারে না। নতুবা ইনসাফের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার জন্যে জরুরি হয়ে পড়ে যে, যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, তাকে

অবশ্যই জান্নাতে দাখিল করতে হবে। সৎকর্মের এক প্রতিদান তো প্রত্যেক মানুষ পার্থিব জীবনে প্রাপ্ত নিয়ামতের আকারে পেয়ে যায়। এর বিনিময় আইনের দৃষ্টিতে জান্নাত পাওয়া জরুরি নয়। এটা কেবল আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভরশীল। বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কাউকে শুধু তার সৎকর্ম মুক্তি দিতে পারে না যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কৃপা ও রহমতের ব্যবহার না করেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেও মুক্তি দিতে পারে না? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমাকেও। –(মাহযারী)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَامْرَاَتَ نُوْحٍ –সূরার শেষভাগে আল্লাহ তা'আলা চার জন নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। প্রথম দুই নারী দুই জন পয়গম্বরের পত্নী। তারা ধর্মের ব্যাপারে আপন আপন স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং গোপনে কাফের ও মুশরিকদেরকে সাহায্য করেছিল। ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ তা'আলার প্রিয় পয়গম্বরগণের বৈবাহিক সাহচর্যও তাদেরকে আজাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদের একজন হযরত নূহ (আ.)-এর পত্নী, তার নাম 'ওয়াগেলা' বর্ণিত আছে। অপরজন হযরত লূত (আ.) পত্নী, তার নাম 'ওয়ালেহা' কথিত আছে। –(কুরতুবী) তৃতীয়জন সর্ববৃহৎ কাফের, খোদায়ী দাবিদার ফেরাউনের পত্নী ছিলেন, কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মহান মর্যাদা দান করেছেন এবং দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের আসন দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর ফেরাউনী আচরণ তাঁর পথে মোটেই প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। চতুর্থ জন হযরত মরিয়ম (আ.)। তিনি কারও পত্নী নন, কিন্তু ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নুবয়তের গুণাবলি দান করেছেন, যদিও অধিকাংশ আলেমের মতে তিনি নবী নন।

এসব দৃষ্টান্ত দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, একজন মুমিনের ঈমান তার কোনো কাফের স্বজন ও আত্মীয়ের উপকারে আসতে পারে না এবং একজন কাফেরের কুফর তার কোনো মু'মিন স্বজনের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তাই নবী ও ওলীগণের পত্নীরা যেন নিশ্চিন্ত না হয় যে, তারা তাদের স্বামীদের কারণে মুক্তি পেয়েই যাবে এবং কোনো কাফের পাপাচারীর পত্নী যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয় যে, স্বামীর কুফরি ও পাপাচার তার জন্যে ক্ষতিকর হবে; বরং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে নিজেই নিজের ঈমান ও সৎকর্মের চিন্তা করা উচিত।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ– এটা ফেরাউন-পত্নী হযরত আসিয়া বিনতে মুযাহিমের দৃষ্টান্ত। হযরত মূসা (আ.) যখন জাদুকরদের মোকাবিলায় সফল হন এবং জাদুকররা মুসলমান হয়ে যায়, তখন বিবি আসিয়া তাঁর ঈমান প্রকাশ করে। ফেরাউন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইল। কতক রেওয়ায়েতে আছে, ফেরাউন তাঁর চার হাত পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর ভারি পাথর রেখে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া পর্যন্ত করতে না পারেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দোয়া করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, ফেরাউন উপর থেকে একটি ভারি পাথর তাঁর মাথার উপর ফেলে দিতে মনস্থ করলে তিনি এই দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আত্মা কবজ করে নেন এবং পাথরটি নিষ্প্রাণ দেহের উপর পতিত হয়। তিনি দোয়ায় বলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি নিজের সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের গৃহ দেখিয়ে দেন। –(মাযহারী)।

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ – كَلِمٰتُ رَبِّ বলে পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ তা'আলার সহীফা বোঝানো হয়েছে এবং كُتُبٌ বলে প্রসিদ্ধ ঐশীগ্রন্থ ইঞ্জিল, যাবূর ও তাওরাত বুঝানো হয়েছে।

وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ – قَانِتِيْنَ শব্দটি قَانِتٌ –এর বহুবচন। এর অর্থ নিয়মিত ইবাদতকারী, এটা হযরত মরিয়মের পরিচিতি। হযরত আবূ মূসা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল ও সিদ্ধপুরুষ হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফেরাউন-পত্নী আসিয়া, ইমরান তনয়া মরিয়ম সিদ্ধি লাভ করেছেন। –(মাযহারী) বাহ্যত এখানে নবুয়তের গুণাবলি বোঝানো হয়েছে, যা নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্জন করেছেন। –(মাযহারী)।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُحَرِّمُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার– تَحْرِيْم মূলবর্ণ (ح ـ ر ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তুমি হারাম, নিষিদ্ধ কর।

اَحَلَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَال মাসদার اِحْلَال মূলবর্ণ (ح ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে হালাল করেছে।

فَرَضَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَب মাসদার فَرْضٌ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– তিনি নির্ধারণ করে ফিরেছেন।

تَحِلَّةَ : মাসদার। বাব تَفْعِيْل ওজনে হলো تَفْعِلَةٌ মূলবর্ণ (ح ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– খোলা, হালাল করা।

اَسَرَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَال মসদার اِسْرَارٌ মূলবর্ণ (س – ر – ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– গোপনে, তিনি গোপন করেছেন।

نَبَّاَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْبِئَةٌ মূলবর্ণ (ن – ب – ء) জিনস مهموز لام অর্থ– সে বলে দিল। সে সংবাদ দিয়েছে।

اَظْهَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَال মাসদার (ظ ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সে প্রকাশ করেছে।

عَرَّفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْرِيْف মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– তিনি পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয় করে দেওয়া। অবহিত করে দেওয়া, নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

اَعْرَضَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَال মাসদার اِعْرَاضٌ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তিনি দূরে সরে গেছেন।

تَتُوْبَا : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার تَوْبَةٌ মূলবর্ণ (ت – و – ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা তওবা কর।

صَغَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَغْوٌ মূলবর্ণ (ص ـ غ ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি (স্ত্রী লোক) ঝুঁকে পড়েছেন। তিনি ধাবিত হয়েছেন।

قٰنِتٰتٌ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقُنُوْتُ মূলবর্ণ (ق – ن – ت) জিনস صحيح অর্থ– অনুগতা।

سٰٓئِحٰتٍ : সীগাহ جمع مونث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার سِيَاحَةٌ মূলবর্ণ (س – ى – ح) জিনস اجوف يائى অর্থ– রোজা পালনকারিণী।

ثَيِّبٰتٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন ثَيِّبٌ অর্থ– বিবাহিতা, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, অকুমারী।

اَبْكَارًا : শব্দটি বহুবচন, একবচন بِكْرٌ অর্থ– কুমারী, অবিবাহিতা নারী, বালিকা, কন্যা, জ্যেষ্ঠ সন্তান, প্রথম।

غِلَاظٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন غِلْظٌ অর্থ– নির্দয়, পাষাণ, কঠিন প্রাণ।

لَا يُخْزِي : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِخْزَاءٌ মূলবর্ণ (خ – ز – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অপমানিত করবেন না।

لَا تَعْتَذِرُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব إِفْتِعَالٌ মাসদার إِعْتِذَارٌ মূলবর্ণ (ع ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ওজর পেশ করো না, কোনো কৈফিয়ত পেশ করো না।

تُوبُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা তওবা কর। ফিরে আসো।

يُكَفِّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّكْفِيْرُ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তিনি দূরীভূত করেন, মার্জনা করে দেন।

جَاهِدٌ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُجَاهَدَةٌ মূলবর্ণ (ج ـ ه ـ د) জিনস صحيح অর্থ– তুমি জিহাদ কর, তুমি লড়াই কর।

خَانَتَا : সীগাহ تثنيه مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ ও كَرُمَ মাসদার– خِيَانَةٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– দু'জন মহিলা খেয়ানত করেছে।

لَمْ يُغْنِيَا : সীগাহ تثنيه مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِغْنَاءٌ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা দু'জন কাজে আসেনি, উপকারে আসেনি।

إِبْنِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بِنَاءٌ মূলবর্ণ (ب – ن – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বানিয়ে দিন।

نَجِّنِى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَنْجِيَةٌ মূলবর্ণ (ن – ج – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমাকে মুক্তি দিন।

اَحْصَنَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِحْصَانٌ মূলবর্ণ (ح –ص – ن) জিনস صحيح অর্থ– রক্ষা করেছিলেন।

فَنَفَخْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَفْخٌ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ خ) জিনস صحيح অর্থ– আমরা ফুঁক দিয়েছি অর্থাৎ প্রথমে প্রাণহীন ছিল, পরে তাতে প্রাণ ও অনুভূতি সৃষ্টি করে দেওয়া হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ : এখানে واو-টি আতেফা, আর اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, আর مَوْلٰكُمْ হলো খবর। আর هُوَ হলো মুবতাদা, আর اَلْعَلِيْمُ হলো প্রথম খবর এবং اَلْحَكِيْمُ হলো দ্বিতীয় খবর।

–[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৭]

وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ : এখানে واو টি استينافية আর مَاْوٰهُمْ মুবতাদা, আর جَهَنَّمُ হলো খবর। আর بِئْسَ হলো ফে'লে জামেদ الذم সৃষ্টি করার জন্য, আর اَلْمَصِيْرُ হলো ফায়েল, আর مخصوص بالذم-টা উহ্য রয়েছে : অর্থাৎ هِىَ। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৬]

পারা : ২৯

سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ

সূরা মুল্‌ক

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩০, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. তিনি [আল্লাহ] উচ্চ মর্যাদাশালী– যাঁর অধিকারে সমস্ত আধিপত্য রয়েছে এবং তিনি সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।	تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْكُ ؗ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرُ ۟ۙ (١)
২. যিনি মৃত্যু ও হায়াত সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কাজে কে অধিক উত্তম; তিনি মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীল।	الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ۟ۙ (٢)
৩. যিনি সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন তুমি আল্লাহর এ সৃষ্টির মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখতে পাবে না; সুতরাং তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নাও, কোথাও কোনো ত্রুটি তোমার দৃষ্টিগোচর হয় কি?	الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ (٣)
৪. অতঃপর পুনঃপুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ, [অবশেষে] দৃষ্টি অপদস্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমারই দিকে ফিরে আসবে।	ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِیْرٌ (٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

১. تَبٰرَكَ তিনি (আল্লাহ) উচ্চ মর্যাদাশালী الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْكُ যার অধিকারে সমস্ত আধিপত্য রয়েছে وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ আর তিনি সর্ববিষয়ের উপর قَدِیْرٌ ক্ষমতাবান।

২. الَّذِیْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ মৃত্যু ও হায়াত لِیَبْلُوَكُمْ যেন তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا তোমাদের মধ্যে কাজে কে অধিক উত্তম وَهُوَ الْعَزِیْزُ তিনি মহাপরাক্রান্ত الْغَفُوْرُ ক্ষমাশীল।

৩. الَّذِیْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন سَبْعَ سَمٰوٰتٍ সাত আসমানকে طِبَاقًا স্তরে স্তরে مَا تَرٰی তুমি দেখতে পাবে না فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ আল্লাহর এই সৃষ্টির মধ্যে مِنْ تَفٰوُتٍ কোনো ত্রুটি فَارْجِعِ الْبَصَرَ সুতরাং তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নাও هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ কোথাও কোনো ত্রুটি তোমার দৃষ্টি গোচর হয় কি?

৪. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ অতঃপর পুনঃপুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ یَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَرُ দৃষ্টি তোমারই দিকে ফিরে আসবে خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِیْرٌ অপদস্থ ও ক্লান্ত হয়ে।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ﴿٥﴾	৫. আর আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপপুঞ্জ [তারকারাজি] দ্বারা সুশোভিত করে রেখেছি, আর আমি ঐগুলোকে শয়তানদের বিতাড়িত করার উপকরণ করেছি এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।
وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٦﴾	৬. আর যারা স্বীয় প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য জাহান্নামের আজাব রয়েছে; আর তা নিকৃষ্ট বাসস্থান।
اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ﴿٧﴾	৭. যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা তার একটি বিকট ধ্বনি শুনতে পাবে এবং তা এরূপে ফুটতে থাকবে।
تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴿٨﴾	৮. মনে হবে যেন রোষে জাহান্নাম [এখনই] ফেটে পড়বে যখন তাতে [কাফেরদের] কোনো একটি দল নিক্ষিপ্ত হবে। তখন তার রক্ষকগণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের নিকট কি কোনো ভয় প্রদর্শনকারী [নবী] আগমন করেননি।
قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿٩﴾	৯. ঐ কাফেররা বলবে, নিশ্চয় আমাদের নিকট ভয় প্রদর্শনকারী এসেছিলেন; কিন্তু আমরা তাদেরকে অবিশ্বাস করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আল্লাহ কিছুই নাজিল করেননি। [আর] তোমরা মহাভ্রমে পতিত আছ।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. وَلَقَدْ زَيَّنَّا আর আমি সুশোভিত করে রেখেছি السَّمَآءَ الدُّنْيَا নিকটবর্তী আসমানকে بِمَصَابِيْحَ প্রদীপ পুঞ্জ দ্বারা وَجَعَلْنٰهَا আর আমি সেগুলোকে উপকরণ করেছি رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ শয়তানদের বিতাড়িত করার وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ আর আমি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি عَذَابَ السَّعِيْرِ জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।

৬. وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা অস্বীকার করে بِرَبِّهِمْ স্বীয় প্রতিপালককে عَذَابُ جَهَنَّمَ তাদের জন্য জাহান্নামের আজাব রয়েছে وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ আর তা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

৭. اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا তখন তারা তার বিকট ধ্বনি শুনতে পাবে وَّهِيَ تَفُوْرُ এবং তা এরূপে ফুটতে থাকবে।

৮. تَكَادُ تَمَيَّزُ মনে হবে যেন ফেটে পড়বে مِنَ الْغَيْظِ রোষে كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا যখন তাতে নিক্ষিপ্ত হবে فَوْجٌ কোনো একটি দল سَاَلَهُمْ তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে خَزَنَتُهَآ তার রক্ষকগণ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ তোমাদের নিকট কি কোনো ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেন নি।

৯. قَالُوْا ঐ কাফেররা বলবে بَلٰى নিশ্চয় قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ আমাদের নিকট ভয় প্রদর্শনকারী এসেছিলেন فَكَذَّبْنَا কিন্তু আমরা অবিশ্বাস করেছিলাম وَقُلْنَا এবং বলেছিলাম যে, مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ আল্লাহ কিছুই নাজিল করেননি اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ তোমরা মহাভ্রমে পতিত আছ।

অনুবাদ	আয়াত
১০. আর [এটাও] বলবে যে, যদি আমরা শুনতাম কিংবা বুঝতাম, তবে আমরা দোজখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।	وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿۱۰﴾
১১. মোটকথা, তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে, সুতরাং দোজখবাসীদের জন্য ধ্বংস।	فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿۱۱﴾
১২. নিঃসন্দেহে যারা নিজের প্রতিপালককে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহা প্রতিদান রয়েছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿۱۲﴾
১৩. আর তোমরা কথা চুপিচুপিই বল অথবা উচ্চৈঃস্বরেই বল; তিনি অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহ পূর্ণ অবগত আছেন।	وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۳﴾
১৪. আর তিনি কি জানবেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।	اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۴﴾
১৫. তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে বশীভূত করেছেন, অতএব, তোমরা তার পথসমূহে চলাফেরা কর এবং আল্লাহ [প্রদত্ত] রিজিক হতে আহার কর। আর পুনরুত্থান তো তাঁর নিকট।	هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿۱۵﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. وَقَالُوْا আর বলবে যে, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ যদি আমরা শুনতাম اَوْ نَعْقِلُ কিংবা বুঝতাম مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ তবে আমরা দোজখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।

১১. فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ মোটকথা তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ সুতরাং দোজখবাসীদের জন্য ধ্বংস।

১২. اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ নিঃসন্দেহে যারা ভয় করে رَبَّهُمْ নিজের প্রতিপালককে بِالْغَيْبِ না দেখে لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ এবং মহাপ্রতিদান।

১৩. وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ আর তোমরা কথা চুপি চুপিই বল اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ অথবা উচ্চৈঃস্বরেই বল اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ তিনি পূর্ণ অবগত আছেন بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহ।

১৪. اَلَا يَعْلَمُ আর তিনি কি জানবেন না مَنْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন وَهُوَ اللَّطِيْفُ অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী الْخَبِيْرُ সম্যক অবগত।

১৫. هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ তিনি এমন যিনি করেছেন لَكُمُ الْاَرْضَ তোমাদের জন্য জমিনকে ذَلُوْلًا বশীভূত فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا অতএব, তোমরা তার পথসমূহে চলাফেরা কর وَكُلُوْا এবং আহার কর مِنْ رِّزْقِهٖ আল্লাহ (প্রদত্ত) রিজিক হতে وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ আর পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।

১৬. তোমরা কি তাঁর হতে নির্ভয় রয়েছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদেরকে জমিনের মধ্যে ধসিয়ে দিবেন, অতঃপর জমিন থরথর করে কাঁপতে থাকবে।	ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾
১৭. নাকি তোমরা নির্ভয় হয়ে গেছ তা হতে যে, যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি এক প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করে দেন? সুতরাং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, আমার ভয় প্রদর্শন কিরূপ ছিল।	اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾
১৮. আর এদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তারাও অবিশ্বাস করেছিল, অতএব, আমার আজাব কিরূপ হয়েছিল?	وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾
১৯. এরা কি তাদের উপরে পক্ষীসমূহের প্রতি লক্ষ্য করেনি যে, তারা পাখা বিস্তার করে আছে [উড়ে বেড়াচ্ছে] আর পাখা সঙ্কুচিত করে নেয়? করুণাময় [আল্লাহ] ব্যতীত কেউই তাদেরকে রুখে রাখেনি; নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেক বস্তুকে দেখছেন।	اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؔۘ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾
২০. আচ্ছা [বল তো] দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত সে কে, যে তোমাদের সৈনিক হয়ে তোমাদের হেফাজত করতে পারে? [আর] কাফেররা শুধু ধোঁকার মধ্যে রয়েছে।	اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. ءَاَمِنْتُمْ তোমরা কি নির্ভয়ে রয়েছে যে, مَّنْ فِي السَّمَآءِ যিনি আসমানে আছেন তাঁর হতে اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ তিনি জমিনের মধ্যে ধসিয়ে দিবেন فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ অতঃপর ঐ জমিন থরথর করতে থাকে।

১৭. اَمْ اَمِنْتُمْ নাকি তোমরা নির্ভর হয়ে গেছ তা হতে যে, مَّنْ فِي السَّمَآءِ যিনি আসমানে আছেন اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا তিনি তোমাদের প্রতি এক প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করে দেন فَسَتَعْلَمُوْنَ সুতরাং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, كَيْفَ نَذِيْرِ আমার ভয় প্রদর্শন কিরূপ ছিল।

১৮. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ আর এদের পূর্বে যারা ছিল তারাও অবিশ্বাস করেছিল فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ অতএব, আমার আজাব কিরূপ হয়েছিল।

১৯. اَوَلَمْ يَرَوْا এরা কি লক্ষ্য করেনি اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ তাদের উপরে পক্ষীসমূহের প্রতি صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ এরা পাখা বিস্তার করে আছে আর পাখা সঙ্কুচিত করে নেয় مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ করুণাময় (আল্লাহ) ব্যতীত কেউ এদেরকে রুখে রাখেনি اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেক বস্তুকে দেখছেন।

২০. اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ আচ্ছা (বল তো) সে কে? هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ যে তোমাদের সৈনিক হয়ে يَنْصُرُكُمْ তোমাদের হেফাজত করতে পারে مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ কাফেররা শুধু ধোঁকার মধ্যে রয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
২১. আচ্ছা [বল তো], কে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদেরকে জীবিকা পৌঁছাবে, যদি আল্লাহ তাঁর [প্রদত্ত] রিজিক বন্ধ করে দেন; বরং তারা বিরুদ্ধাচরণ ও সত্যবিমুখতায় অবিচল রয়েছে।	أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾
২২. যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সেই কি সঠিক পথে চলে, নাকি সেই ব্যক্তি যে সোজা এক সমতল পথে চলে?	أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾
২৩. আপনি বলে দিন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরক কর্ণ ও চক্ষুসমূহ এবং অন্তর দিয়েছেন। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. আপনি বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়েছেন এবং তাঁরই সমীপে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।	قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾
২৫. আর তারা বলে, এ প্রতিশ্রুতি কখন [সংঘটিত] হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾
২৬. আপনি বলে দিন, এ [বিষয়ের] জ্ঞান তো আল্লাহরই আছে, আর আমি তো শুধু স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।	قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾
২৭. অনন্তর যখন তাকে নিকটবর্তী হতে দেখবে, তখন কাফেরদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যাবে এবং বলা হবে, এটাই তা যা তোমরা কামনা করতে।	فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي আচ্ছা (বল তো) কে সেই ব্যক্তি هُوَ يَرْزُقُكُمْ যে তোমাদেরকে জীবিকা পৌঁছাবে إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ যদি আল্লাহ তাঁর রিজিক বন্ধ করে দেন بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ বরং তারা বিরুদ্ধাচরণ ও সত্যবিমুখতায় অবিচল রয়েছে।

২২. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ আচ্ছা, যে ব্যক্তি ঝুকে মুখে ভর দিয়ে চলে أَهْدَىٰ সেই কি সঠিক পথে চলে أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ না সেই ব্যক্তি যে সোজা এক সমতল পথে চলে।

২৩. قُلْ আপনি বলে দিন هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন وَجَعَلَ لَكُمُ এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন السَّمْعَ কর্ণ وَالْأَبْصَارَ ও চক্ষুসমূহ وَالْأَفْئِدَةَ এবং অন্তর قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

২৪. قُلْ আপনি বলুন هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়েছেন وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ এবং তাঁরই সমীপে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

২৫. وَيَقُولُونَ আর তারা বলে مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ এই প্রতিশ্রুতি কখন হবে إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৬. قُلْ আপনি বলে দিন إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ এ জ্ঞান তো আল্লাহরই আছে وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ আর আমি তো শুধু স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

২৭. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً অনন্তর যখন তাকে নিকটবর্তী হতে দেখবে سِيئَتْ তখন বিকৃত হয়ে যাবে وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا কাফেরদের মুখমণ্ডল وَقِيلَ এবং বলা হবে هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ এটাই তা যা তোমরা কামনা করতে।

২৮. আপনি বলুন, তোমরা বল, যদি আল্লাহ আমাকে এবং আমার সঙ্গীকে ধ্বংস করে দেন অথবা আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, তবে কাফেরদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি হতে কে রক্ষা করবে?	قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾
২৯. আপনি বলুন, তিনি বড় দয়ালু, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি, আর তাঁরই উপর ভরসা করছি, অতএব, তোমরা সত্বরই জানতে পারবে যে, কে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে আছে।	قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾
৩০. আপনি বলে দিন, আচ্ছা বল তো, যদি তোমাদের পানি নিম্নদিকে অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের নিকট জলপ্রবাহ আনয়ন করবে?	قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. قُلْ আপনি বলুন اَرَاَيْتُمْ তোমরা বল اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ যদি আল্লাহ ধ্বংস করে দেন আমাকে وَمَنْ مَّعِيَ এবং আমার সঙ্গীকে اَوْ رَحِمَنَا অথবা আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ তবে কে কাফেরদের রক্ষা করবে مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ যন্ত্রণাময় শাস্তি হতে।

২৯. قُلْ আপনি বলুন هُوَ الرَّحْمٰنُ তিনি বড় দয়ালু اٰمَنَّا بِهٖ আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا আর তাঁরই উপর ভরসা করছি فَسَتَعْلَمُوْنَ অতএব তোমরা সত্বরই জানতে পারবে مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ কে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

৩০. قُلْ আপনি বলে দিন اَرَاَيْتُمْ আচ্ছা বল তো اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا যদি তোমাদের পানি নিম্নদিকে অদৃশ্য হয়ে যায় فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ তবে এমন কে আছে যে তোমাদের নিকট জলপ্রবাহ আনয়ন করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : পবিত্র কুরআনের অত্র সূরার নামকরণ তার প্রথম আয়াতাংশ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ - এর মধ্যকার اَلْمُلْكُ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়েছে। এতে ৩০টি আয়াত, ৩৩৫টি বাক্য এবং ১৩১৩টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটির অন্যান্য নাম : এ সূরাটিকে তাবারাকা, মুনজিয়াহ ও মানেয়া নামও দেওয়া হয়েছে। তাবারাকা নাম দেওয়ার কারণ হলো– এর পাঠকারী অশেষ কল্যাণ ও বরকত লাভ করে থাকে। আর মুনজিয়াহ নামের কারণ হলো– এর পাঠকারীকে কবর আজাব হতে পরিত্রাণ দেওয়া হয়। আর মানেয়া নাম দেওয়ার কারণ হলো– এর পাঠকারীকে এটা কবর আজাব হতে রক্ষা করে এবং বাধা দিয়ে থাকে। –[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

সূরাটির নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু সূরাটির ভাষা, বর্ণনাভঙ্গির বক্তব্য ও বিষয়বস্তু দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা নবী করীম ﷺ-এর মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ জন্য তাকে মক্কী সূরা বলা হয়। কতক তাফসীরকার বলেন, এ সূরাটি সূরা তূরের পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির ফজিলত : হযরত ইবনে শিহাব (র.) বলেন, اِنَّهٗ كَانَ يُسَمِّيْهَا الْمُجَادَلَةَ لِاَنَّهَا تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فِى الْقَبْرِ 'এ সূরাকে সূরাতুল মুজাদালাহও বলা হয়। কেননা এ সূরা তেলাওয়াতকারীর পক্ষ থেকে ফেরেশতাগণের সাথে ঝগড়া করবে এবং তেলাওয়াতকারীকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করবে।' যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–

১. رَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا هِيَ اِلَّا ثَلٰثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ وَاَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ وَهِيَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ ـ

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রাহ (র.) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন মাজীদের একটি সূরা রয়েছে, যা ৩০ আয়াত বিশিষ্ট, যে তা তেলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন এ সূরা তার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে দোজখ হতে বের করাবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করাবে। আর সে সূরাটি হলো– سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِيْ

২. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ اِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِيْ قَبْرِهٖ يُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَتَقُوْلُ رِجْلَاهُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيْلٌ لِاَنَّهٗ يَقُوْمُ بِسُوْرَةِ الْمُلْكِ ثُمَّ يُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ فَيَقُوْلُ لِسَانُهٗ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيْلٌ لِاَنَّهٗ كَانَ يَقْرَأُ بِيْ سُوْرَةَ الْمُلْكِ ثُمَّ قَالَ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَنْ قَرَأَهَا فِيْ لَيْلَةٍ فَقَدْ اَكْثَرَ وَاَطْنَبَ ـ

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে শায়িত করা হয় তখন সর্বপ্রথম তার পা যুগলের দিক থেকে আজাবের ফেরেশতা আসতে শুরু করে। তখন মৃতব্যক্তির পা দু'খানি ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, এ ব্যক্তির নিকটে আসার তোমাদের কোনো সুযোগ নেই। কেননা সে সূরা আল-মুলক সর্বদা পড়ত। অতঃপর তার মাথার দিক থেকেও পুনরায় আজাবের ফেরেশতা আসতে থাকে, তখন মৃতব্যক্তির মুখ বলবে এ ব্যক্তির নিকট তোমাদের আগমনের কোনো পন্থা নেই। কেননা সে আমার (মুখমণ্ডলের) মাধ্যমে সূরা মুলক তেলাওয়াত করত। অতঃপর তিনি বললেন, এটা আল্লাহর আজাবকে ফিরিয়ে দেয়। তাওরাত কিতাবেও এটা সূরাতুল মুলক নামে পরিচিতি ছিল। যে ব্যক্তি রাত্রিকালে তা তেলাওয়াত করবে সে ব্যক্তি অত্যধিক নেক কার্য করল এবং তার নেক আমলনামাকে দীর্ঘ করল। অপর একটি হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ বলেন– هِيَ الْمَانِعَةُ الْمُنْجِيَةُ (سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِيْ) এটা تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ) আল্লাহর শাস্তিকে প্রতিহতকারী, যে এটা তেলাওয়াত করবে তাকে তা কবরের শাস্তি থেকে নাজাত দান করবে। –[কুরতুবী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি যেন প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তি শিখে নেয় এবং তেলাওয়াত করে।

وَاَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ تَبَارَكَ الْمُلْكُ فِيْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ ـ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন– প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে সূরায় মুলক বদ্ধমূল রয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরায় ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় অচেতন ও গাফেল লোকদেরকে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলা হয়েছে। মক্কায় প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের বিশেষত্ব হলো, এগুলোতে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে খুব সংক্ষেপে অথচ হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে মানুষের অন্তঃকরণে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসসমূহ সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়। মানুষ তার প্রতি গভীর দৃষ্টি ও চিন্তা-ভাবনা করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়।

সূরাটির ১ থেকে ৫ নং আয়াত পর্যন্ত মহামহিম অসীম শক্তিধর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বময় ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার বর্ণনা দিয়ে সৃষ্টিকুলে তাঁর তুলনাহীন সৃষ্টি নৈপুণ্যের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা সৃষ্টিলোকের প্রতি আতিপাতি করে খোঁজাখুজি করলেও কোথাও কোনো খুঁত, অসমাঞ্জস্য ও ত্রুটি দেখবে না। জীবন-মৃত্যুকে এ জগতে তোমাদের পরীক্ষার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে তাদের মধ্যে কারা সৎকর্মশীল ও পুণ্যবান হয়, তা বাস্তবে প্রমাণ করে নিতে পারেন।

৬ থেকে ১১নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর সাথে কুফরি করার ভয়াবহ ও মারাত্মক পরিণতির কথা তুলে ধরেছেন এবং জাহান্নামের আজাবের বর্ণনা দিয়ে, যেন তার বাস্তব চিত্রটি লোকদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন।

১২ থেকে ১৪নং আয়াতে আল্লাহভীরু লোকদের শুভ পরিণাম ও সাফল্যের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ যে সর্বজ্ঞাতা, ছোট-বড় গোপন-প্রকাশ্য সকল শ্রেণির কাজ ও কথা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা এবং আল্লাহর অন্তর্যামী হওয়ার কথাও তুলে ধরেছেন।

১৫ থেকে ২৩ নং আয়াতে আল্লাহভীরু মানুষের নিকট কম গুরুত্বপূর্ণ অথচ চিরন্তন ও শাশ্বত মহাসত্য তুলে ধরে স্বীয় অসীম ক্ষমতা, কুদরত ও সৃষ্টি-কৌশলের অবিসংবাদিত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে– এ ভূ-প্রকৃতি ও ভূ-পৃষ্ঠকে আমি নরম ও চলনোপযোগী করে সৃষ্টি করেছি। আকাশকে শূন্যলোকে ঝুলন্ত রেখেছি। বায়ুমণ্ডলকে বিহঙ্গকুলের উড্ডয়নে উপযোগী করে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং তোমাদেরকে যদি আল্লাহ তা'আলা ভূমির তলদেশে ধসিয়ে দেন, কংকর বর্ষণ করে

তবে তোমাদের রক্ষা করার কে আছে? অতএব তোমরা সে মহাশক্তিধরের সম্মুখে অবনত হও, তাঁর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দাও, তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও অধিকারকে মেনে নাও। ইতঃপূর্বে যারা তাঁকে স্বীকার করেনি, তাঁর অধিকার ও ক্ষমতাকে মেনে নেয়নি, তাদের আমি [আল্লাহ] কঠোর শাস্তি দিয়েছি। আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের এমন কোনো সেনাবাহিনীও নেই, যারা আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। তিনি যদি তোমাদের জীবিকা ও জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের জীবিকা দান করার কেউ আছে কি? এ বাস্তব সত্যগুলোর প্রতি গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে তোমাদের ঈমান আনা উচিত। বস্তুত আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। এসব কথার উদ্দেশ্য হলো নির্ভেজালরূপে আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া, তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও আস্থাশীল হওয়া।

২৪ থেকে ২৭নং আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে; কিন্তু সে সময়টা কখন তা বলা নবীর দায়িত্ব নয়; বরং ঐ সময়টি আগমনের সংবাদটি দেওয়াই হলো নবীর কাজ। সে সময়টির আগমন মুহূর্তটি জানিয়ে দেওয়ার যে দাবি তোমরা উত্থাপন করেছে, তা সম্পর্কে নবী করীম ﷺ অবগত নন। সে নির্ঘাত মুহূর্তটি সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবগত রয়েছেন। তা যখন তোমরা অবলোকন করবে, তখন তোমরা ভীতবিহ্বল, কম্পমান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে।

পরিশেষে ২৮-৩০নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মক্কার মুশরিকদের সেসব অবাঞ্ছিত কথার জবাব দিয়েছেন, যা তারা নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গী-সাথিদের বিরুদ্ধে বলত। তারা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি নানারূপ কটূক্তি ও গালাগাল করত এবং ঈমানদারদের ধ্বংস কামনা করত। এর জবাবে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আর বলা হয়েছে– নবী করীম ﷺ তাঁর সঙ্গী-সাথিসহ ধ্বংস হোন বা তাঁর প্রতি আল্লাহর করুণার আশিসধারা বর্ষিত হোক, তাতে তোমাদের ভাগ্যের কোনোই পরিবর্তন হবে না। তোমাদের ব্যাপারটি তোমাদেরই চিন্তা করতে হবে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হলে তোমাদের কেউই রক্ষা পাবে না। তোমরা ঈমানদারদেরকে ভ্রান্ত ভাবছ, কিন্তু আসলে কারা ভ্রান্ত, তা একদিন অবশ্যই উদঘাটিত হবেই।

সূরাটির সর্বশেষে কাফেরদের কাছে এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, এ ধূসর মরু ও পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে তোমাদের অন্যতম জীবনোপকরণ হলো পানি, সে পানি যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে বল তো তোমাদের জন্য কে সে সঞ্জীবনী সূরা এনে দিতে পারে?

সূরা তাহরীমের সাথে সূরা মুলকের গোত্রসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে রেসালতের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরাতে তাওহীদের কথা দলিল সহকারে পেশ করা হয়েছে এবং তাওহীদের দায়িত্বের ব্যাপারে ত্রুটি করলে তার পরিণতির কথাও পেশ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরাতে নেককার ও বদকার নারীদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এ সূরাতে এ আলোচনাকে সাধারণ ও ব্যাপক করে তুলে ধরা হয়েছে।

বলা হয়েছে, এ সূরাটির সম্পর্ক রয়েছে সূরা আত্-তালাকে সপ্ত আকাশ ও জমিনের কথা আলোচিত হয়েছে। এ সূরাতে তার উপর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের কথা দলিল-প্রমাণসহকারে পেশ করা হয়েছে। এ মতে সূরা তাহরীম সূরা আত্-তালাকের অংশ বিশেষের মতো অথবা সূরা আত্-তালাকের সম্পূরক। -[রূহুল মা'আনী]

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (١٣)

শানে নুযূল ঃ কোনো কোনো সময় মুশরিকরা হুজুর ﷺ -কে গালি দিত। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহীর মাধ্যমে হুজুর ﷺ কে তা জানিয়ে দিতেন। এ কারণে মুশরিকরা পরস্পর পরামর্শ করল এখন থেকে তোমাদের জন্যে চুপে চুপে কথা বলা উচিত। যাতে মোহাম্মদের খোদা শুনতে না পায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়। -(কুরতুবী ১৮:২১৪)

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ : تَبَارَكَ শব্দটি بَرَكَ থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বেশি হওয়া। এই শব্দটি আল্লাহর শানে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সর্বোচ্চ ও মহান। بِيَدِهِ الْمُلْكُ আল্লাহর হাতে রয়েছে রাজত্ব। কুরআন পাকের স্থানে স্থানে আল্লাহর জন্য হাত অর্থে يَدٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বহু উর্ধ্বে। তাই এটা একটা مُتَشَابِهٌ শব্দ। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কিন্তু এর অবস্থা ও স্বরূপ কারো জানার বিষয় নয়। এর পিছনে পড়া অবৈধ। রাজত্ব বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহকাল ও পরকালের রাজত্ব বুঝানো হয়েছে। আয়াতে আল্লাহ তা'আলার জন্য চারটি গুণ দাবি করা হয়েছে। (এক) তিনি বিদ্যমান আছেন, (দুই) তিনি চরম পূর্ণত্ব গুণের অধিকারী এবং সবার উর্ধ্বে, (তিন) তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত এবং (চার) তিনি

সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই দাবির যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে, যা আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলেই ফুটে উঠে। তাই পরের আয়াতসমূহে সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্ট বস্তুর বিভিন্ন প্রকার দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব, তাওহীদ এবং তাঁর জ্ঞান ও শক্তিমত্তা সপ্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টির সেরা মানুষের অস্তিত্বে আল্লাহর কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি করে বলা হয়েছে, خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ এরপর কয়েক আয়াতে আকাশ সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রমাণ এনে বলা হয়েছে, اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ -এরপর هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا থেকে দুই আয়াতে পৃথিবী সৃজন ও তার উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে শূন্যমণ্ডলে বসবাসকারী সৃষ্টজীব পক্ষীদের উল্লেখ করে اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ বলা হয়েছে। মোটকথা, সমগ্র সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, জ্ঞান-গরিমা ও শক্তি-সামর্থ্যের পক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা। প্রসঙ্গক্রমে কাফেরদের শাস্তি, মু'মিনদের প্রতিদান ইত্যাদি বিষয়বস্তুও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার পূর্ণজ্ঞান ও শক্তির যেসব প্রমাণ মানুষের মধ্যে রয়েছে দুটি শব্দের মাধ্যমে সেগুলো নির্দেশ করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের স্বরূপ ঃ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ অর্থাৎ তিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবস্থাসমূহের মধ্যে এখানে কেবল মরণ ও জীবন এই দুটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা এই দুটি অবস্থাই মানব জীবনের যাবতীয় হাল ও ক্রিয়াকর্মে পরিব্যাপ্ত। জীবন একটি অস্তিবাচক বিষয় বিধায় এর জন্য 'সৃষ্টি' শব্দ যথার্থই প্রযোজ্য। কিন্তু মৃত্যু বাহ্যত নাস্তিবাচক বিষয়। অতএব একে সৃষ্টি করার মানে কি? এই প্রশ্নের জবাবে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক স্পষ্ট উক্তি এই যে, মৃত্যু নিরেট নাস্তিকে বলা হয় না; বরং মৃত্যুর সংজ্ঞা হচ্ছে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা। এটা অস্তিবাচক বিষয়। মোটকথা, জীবন যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম, মৃত্যুও তেমনি একটি অবস্থা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্য কয়েকজন তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, মরণ ও জীবন দুটি শরীরী সৃষ্টি। মরণ একটি ভেড়ার আকারে এবং জীবন একটি ঘোটকীর আকারে বিদ্যমান আছে। বাহ্যত একটি সহীহ্ হাদীসের সাথে সুর মিলিয়ে এই উক্তি করা হয়েছে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে দাখিল হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে এবং পুলসিরাতের সন্নিকটে জবাই করে ঘোষণা করা হবে, এখন যে যে অবস্থায় আছে অনন্তকাল সেই অবস্থায়ই থাকবে। এখন থেকে কারো মৃত্যু হবে না। কিন্তু এই হাদীস থেকে দুনিয়াতে মৃত্যুর শরীরী হওয়া জরুরি হয় না; বরং এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার অনেক অবস্থা ও কর্ম যেমন কিয়ামতের দিন শরীরী ও সাকার হয়ে যাবে, যা অনেক সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি মানুষের মৃত্যুরূপী অবস্থাও কিয়ামতে শরীরী হয়ে ভেড়ার আকার ধারণ করবে এবং তাকে জবাই করা হবে। –(কুরতুবী)

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, মৃত্যু নাস্তি হলেও নিরেট নাস্তি নয়; বরং এমন বস্তুর নাস্তি, যা কোনো সময় অস্তি লাভ করবে। এ ধরনের সকল নাস্তিবাচক বিষয়ের আকার জড় অস্তিত্ব লাভের পূর্বে 'আলমে মেছালে' (সাদৃশ্য জগতে) বিদ্যমান থাকে। এগুলোকে 'আ'য়ানে সাবেতা' তথা প্রতিষ্ঠিত বস্তুনিচয় বলা হয়। এসব আকারের কারণে এগুলোর অস্তিত্ব লাভের পূর্বেও এক প্রকার অস্তিত্ব আছে। এরপর তাফসীরে মাযহারীতে 'আলমে মেছাল' সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অনেক হাদীস থেকে প্রমাণাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের বিভিন্ন স্তর ঃ তাফসীরে মাযহারীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেককে এক প্রকার জীবন দান করেছেন। সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন মানবকে দান করা হয়েছে। এতে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলির পরিচয় লাভ করার যোগ্যতাও নিহিত রেখেছেন। এই পরিচয়ই মানুষকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অধীন করার ভিত্তি এবং এই পরিচয়ই সেই আমানতের গুরুভার, যা বহন করতে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং মানব আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতার কারণে বহন করতে সক্ষম হয়। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে। اَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ : অর্থাৎ কাফেরকে মৃত এবং মু'মিনকে জীবিত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ কাফের তার উপরিউক্ত পরিচয় বিনষ্ট করে দিয়েছেন। সৃষ্টির কোনো কোনো প্রকারের মধ্যে জীবনের এই স্তর নেই, কিন্তু চেতনা ও গতিশীলতা বিদ্যমান আছে। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ নিম্নোক্ত আয়াতে আছে :
كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ : এখানে জীবনের অর্থ অনুভূতি ও গতিশীলতা এবং মৃত্যুর অর্থ তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কোনো কোনো সৃষ্টির মধ্যে এই অনুভূতি ও গতিশীলতাও নেই, কেবল বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা আছে, যেমন সাধারণ বৃক্ষ ও উদ্ভিদ এ ধরনের জীবনের অধিকারী। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ يُحْيِى

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا আয়াতে আছে। এই তিন প্রকার জীবন মানব, জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদের মধ্যে সীমিত। এগুলো ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর মধ্যে এই প্রকার জীবন নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রস্তর নির্মিত প্রতিমা সম্পর্কে বলেছেন : أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ –কিন্তু এতদসত্ত্বেও জড় পদার্থের মধ্যেও আস্তির জন্য অপরিহার্য বিশেষ এক প্রকার জীবন বিদ্যমান আছে। এই জীবনের প্রভাবই কুরআন পাকে ব্যক্ত হয়েছে :

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ : অর্থাৎ এমন কোনো বস্তু নেই, যা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা কীর্তন করে না। উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে আয়াতে মৃত্যুকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণও ফুটে উঠেছে। মূলত মৃত্যুই অগ্রে। অস্তিত্ব লাভ করে এমন প্রত্যেক বস্তুই পূর্বে মৃত্যুজগতে থাকে। পরে তাকে জীবন দান করা হয়। এ কথাও বলা যায় যে, পরবর্তী لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا আয়াতে মরণ ও জীবন সৃষ্টি করার কারণ মানুষের পরীক্ষা নির্ণয় করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক। কেননা যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে উপস্থিত জ্ঞান করবে, সে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদনে অধিকতর সচেষ্ট হবে। জীবনের মধ্যেও এই পরীক্ষা আছে। কারণ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে যে, সে নিজে অক্ষম এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। এ অভিজ্ঞতা মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু মৃত্যুচিন্তা কর্ম সংশোধন ও সৎকর্ম সম্পাদনে সর্বাধিক কার্যকর।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا وَكَفَى بِالْيَقِيْنِ غِنًى –অর্থাৎ মৃত্যু উপদেশের জন্য এবং বিশ্বাসই ধনাঢ্যতার জন্য যথেষ্ট। –(তাবারানী) উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষকরণ সচাইতে বড় উপদেশদাতা। যারা এই দৃশ্য দেখে প্রভাবান্বিত হয় না, অন্য কোনো কিছু দ্বারা তাদের প্রভাবান্বিত হওয়া সুদূরপরাহত। আল্লাহ যাকে ঈমান ও বিশ্বাসরূপী ধন দান করেছেন, তার সমতুল্য কোনো ধনাঢ্য ও অমুখাপেক্ষী নেই। রবী ইবনে আনাস (র.) বলেন, মৃত্যু মানুষকে সংসারের সাথে সম্পর্কহীন করা ও পরকালের প্রতি আগ্রহান্বিত করার জন্য যথেষ্ট।

أَحْسَنُ عَمَلًا : এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মরণ ও জীবনের সাথে জড়িত মানুষের পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কার কর্ম ভালো। একথা বলেন নি যে, কার কর্ম বেশি। এ থেকে বুঝা যায় যে, কারো কর্মের পরিমাণ বেশি হওয়া আল্লাহর কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়; বরং কর্মটি ভালো, নির্ভুল ও মকবুল হওয়াই ধর্তব্য। এ কারণেই কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম গণনা করা হবে না; বরং ওজন করা হবে। এতে কোনো কোনো এক কর্মের ওজনই হাজারো কর্ম অপেক্ষা বেশি হবে।

ভালো কর্ম কি? হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তেলাওয়াত করে أَحْسَنُ عَمَلًا পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, সেই ব্যক্তি ভালো কর্মী, যে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়াদি থেকে সর্বাধিক বেঁচে থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সদাসর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে। –(কুরতুবী)

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُوْرٍ : এ আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, দুনিয়ার মানুষ আকাশকে চোখে দেখতে পারে এবং উপরে যে নীলাভ শূন্যমণ্ডল পরিদৃষ্ট হয়, তাই আকাশ হবে, এটা জরুরি নয়। বরং এটা সম্ভবপর যে, আকাশ আরো অনেক অনেক উপরে অবস্থিত হবে। উপরে যে নীলাভ রঙ দেখা যায়, এটা বায়ু ও শূন্য মণ্ডলের রঙ। দার্শনিকগণ তাই বলে থাকেন। কিন্তু এ থেকে এটাও জরুরি হয় না যে, আকাশ মানুষের দৃষ্টিগোচরই হবে না। এটা সম্ভবপর যে, এই নীলাভ শূন্যমণ্ডল কাঁচের মতো স্বচ্ছ হওয়ার কারণে বহু উপরে অবস্থিত আকাশ দেখার পথে অন্তরায় নয়। যদি এ কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় আকাশকে চোখে দেখা যেতে পারে না, তবে এই আয়াতে দেখার অর্থ হবে চিন্তা-ভাবনা করা। –(বয়ানুল কুরআন)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ :

مَصَابِيْحَ বলে নক্ষত্ররাজি বুঝানো হয়েছে। নিম্নতম আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করার জন্য এটা জরুরি নয় যে, নক্ষত্ররাজি আকাশের গায়ে অথবা তার উপর সংযুক্ত থাকবে, বরং নক্ষত্ররাজি আকাশের বহুনিম্নে মহাশূন্যে থাকা অবস্থায়ও এই আলোকসজ্জা হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। নক্ষত্ররাজিকে শয়তান বিতাড়িত করার জন্য অঙ্গার করে দেওয়ার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, নক্ষত্ররাজি থেকে কোনো আগ্নেয় উপাদান শয়তানদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং নক্ষত্ররাজি স্ব-স্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নক্ষত্রের ন্যায় গতিশীল দেখা যায়। তাই একে তারকা খসে যাওয়া এবং আরবিতে اِنْقِضَاضُ الْكَوْكَبِ বলে দেওয়া হয়। –(কুরতুবী)

এ থেকে আরো জানা গেল যে, ঐশী সংবাদাদি চুরি করার জন্য শয়তানরা যখন উর্ধ্ব গগনে আরোহণ করে, তখন তাদেরকে নক্ষত্ররাজির নীচেই বিতাড়িত করে দেওয়া হয়। –(কুরতুবী) এ পর্যন্ত বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে

আল্লাহ তা'আলার পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ থেকে সাত আয়াত পর্যন্ত কাফেরদের শাস্তি ও অনুগত মু'মিনদের ছওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে এরপর পুনরায় জ্ঞান ও শক্তির বর্ণনা আছে।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا : ذَلُولٌ এর শাব্দিক অর্থ বাধ্য ও অনুগত। যে জন্তু আরোহণের সময় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে না, তাকে ذَلُولٌ বলা হয়। مَنَاكِبُ শব্দটি مَنْكِبٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কাঁধ। যে কোনো জন্তুর কাঁধ আরোহণের স্থান নয়; বরং কোমর অথবা ঘাড় আরোহণের জায়গা হয়ে থাকে। যে জন্তু আরোহীর জন্য নিজের কাঁধও পেশ করে দেয়, সে খুবই বাধ্য, অনুগত ও বশীভূত হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে, আমি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য এমন বশীভূত করে দিয়েছি যে, তোমরা তার কাঁধে চড়ে অবাধে বিচরণ করতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং রুটি ও কর্দমের ন্যায় চাপ সহযোগে নীচেও নেমে যায় না। ভূপৃষ্ঠ এরূপ হলে তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবপর হতো না। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠকে লৌহ ও প্রস্তরের ন্যায় শক্তও করা হয়নি। এরূপ হলে তাতে বৃক্ষ ও শস্য বপন করা যেত না, কূপ ও খাল খনন করা যেত না এবং খনন করে সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। এর সাথে সথে আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন, যাতে এর উপর দালান-কোঠা স্থির থাকে এবং চলাচলকারীরা হোঁচট না খায়।

وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ : আল্লাহ তা'আলা প্রথমে ভূপৃষ্ঠের আনাচে-কানাচে বিচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর বলেছেন, আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক আহার কর। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ভ্রমণ এবং পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রফতানি আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক হাসিল করার দরজা। إِلَيْهِ النُّشُورُ –বাক্যে বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকারিতা লাভ করার অনুমতি আছে, কিন্তু মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যেয়ো না, পরিণামে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। ভূপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় পরকালের প্রস্তুতিতে লেগে থাক। পরবর্তী আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ও আল্লাহর আজাব আসতে পারে। ইরশাদ হয়েছে :

ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ :

তোমরা কি এ বিষয়ে ভাবনামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন এবং ভূগর্ভ তোমাদেরকে গিলে ফেলবে? অর্থাৎ যদিও আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, খনন ব্যতীত কেউ এর অভ্যন্তরে যেতে পারে না, কিন্তু তিনি একে এরূপও করে দিতে সক্ষম যে, এই ভূপৃষ্ঠই তার উপরে বসবাসকারীদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। পরের আয়াতে অন্য এক প্রকার আজাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ :

অর্থাৎ তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন? তখন তোমরা এই সতর্কবাণীর পরিণতি জানতে পারবে। কিন্তু তখন জানা নিষ্ফল হবে। আজ সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় এ বিষয়ে চিন্তা কর। এরপর দুনিয়াতে আজাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ঘটনাবলির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ আয়াতের মর্মার্থ তাই। অতঃপর সূরার মূল বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে সৃষ্টির হাল-অবস্থা থেকে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণ আনা হয়েছে। স্বয়ং মানব-সত্তা, আকাশ, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর শূন্য পরিমণ্ডলে উড়ন্ত পক্ষীকুলের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ : অর্থাৎ তারা কি পক্ষীকুলকে মাথার উপর উড়তে দেখে না, যারা কখনো পাখা বিস্তার করে এবং কখনো সংকুচিত করে। এদের ব্যাপারে চিন্তা কর, এরা ভারি দেহবিশিষ্ট। সাধারণ নিয়মদৃষ্টে ভারি বস্তু উপরে ছাড়া হলে তা মাটিতে পড়ে যাওয়া উচিত। বায়ু সাধারণভাবে তা আটকাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পক্ষীকুলকে বায়ুমণ্ডলে স্থির থাকার মতো করে সৃষ্টি করেছেন। বাতাসে ভর দেওয়া এবং তাতে সন্তরণ করে বিচরণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাখা বিস্তার ও সংকোচনের মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বায়ুর মধ্যে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করা যেরূপ পাখা তৈরি করা এবং পাখার মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়া এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিরই ফলশ্রুতি।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির হাল-অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্ব, তাওহীদ এবং নজীরবিহীন জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো নিয়ে সামান্যও চিন্তা-ভাবনা করে, তার জন্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত কাফের ও পাপাচারীদেরকে আল্লাহর আজাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। প্রথমে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়ের উপর

আজাব নাজিল করতে চান, তবে পৃথিবীর কোনো শক্তি তার গতিরোধ করতে পারে না। তোমাদের সেনাবাহিনী, সিপাই-সান্ত্রী তোমাদেরকে সেই আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছে :

: أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ -

এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং ভূমি থেকে শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ তা'আলার দান ও বখশিশ। তিনি তা বন্ধও করে দিতে পারেন। أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ –আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর কাফেরদের জন্য পরিতাপ করা হয়েছে, যারা নিজেরাও আল্লাহর নির্দেশাবলি সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং বর্ণনাকারীর বর্ণনাও শুনে না।

بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ : অর্থাৎ তারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় বেড়েই চলেছে। অতঃপর কিয়ামতের মাঠে কাফের ও মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের মাঠে কাফেররা উপুড় হয়ে মস্তকের উপর ভর দিয়ে চলবে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন –কাফেররা মুখে ভর দিয়ে কিরূপে চলবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে আল্লাহ তাদেরকে পায়ে ভর দিয়ে চালনা করেছেন তিনি কি মুখমণ্ডল ও মস্তকের উপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? নিম্নোক্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে :

: أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুখমণ্ডলে ভর দিয়ে চলে, সে বেশি হেদায়েতপ্রাপ্ত, না যে সোজা চলে? শেষোক্ত ব্যক্তিই মু'মিন। সে-ই হেদায়েত পেতে পারে। অতঃপর আবার মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও জ্ঞানের কতিপয় বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে :

: قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ -

অর্থাৎ আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর বানিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরের বৈশিষ্ট্য ঃ আয়াতে মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে তিনটি অঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর উপর জ্ঞান, অনুভূতি ও চেতনা নির্ভরশীল। দার্শনিকগণ জ্ঞান ও অনুভূতির পাঁচটি উপায় বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়। এগুলো হচ্ছে শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ। ঘ্রাণের জন্য নাক আস্বাদনের জন্য জিহ্বা তৈরি করা হয়েছে এবং স্পর্শশক্তি সমস্ত দেহে নিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা শ্রবণ করার জন্য কর্ণ এবং দেখার জন্য চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করেছেন কর্ণ ও চক্ষু। কারণ এই যে, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শের মাধ্যমে খুব কম বিষয়ের জ্ঞান মানুষ অর্জন করতে পারে। মানুষের জানা বিষয়সমূহের বিরাট অংশ শ্রবণ ও দর্শনের মধ্যে সীমিত। এতদুভয়ের মধ্যেও শ্রবণকে অগ্রে আনা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মানুষ সারাজীবনে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে শোনা বিষয়সমূহের সংখ্যা দেখা বিষয়সমূহের তুলনায় বহুগুণ বেশি। অতএব, মানুষের অধিকাংশ জানা বিষয় এই দুই পথে অর্জিত হয় বিধায় এখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বস্তু অন্তর হচ্ছে আসল ভিত্তি ও জ্ঞানের কেন্দ্র। কানে শোনা ও চোখে দেখা বিষয়সমূহের জ্ঞানও অন্তরের উপর নির্ভরশীল। অন্তর যে জ্ঞানের কেন্দ্র এর পক্ষে কুরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয়। এর বিপরীতে দার্শনিকগণ মস্তিষ্ককে জ্ঞানের কেন্দ্র মনে করেন।

এরপর আবার কাফেরদের প্রতি হুঁশিয়ারি ও শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে : তোমরা যারা পৃথিবীতে বসবাস কর, ভূপৃষ্ঠকে খনন করে কূপ তৈরি কর এবং সেই পানি দ্বারা নিজেদের পান ও শস্য উৎপাদনের কাজ কর, তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, এগুলো তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়, আল্লাহরই দান। তিনিই পানি বর্ষণ করেছেন এবং সেই পানিকে বরফের সাগরে পরিণত করে পচন রোধ করার জন্য পর্বতশৃঙ্গে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর এই বরফকে আস্তে আস্তে গলিয়ে পর্বতের শিরা-উপশিরার পথে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে নামিয়ে দিয়েছেন। এরপর কোনো পাইপলাইনের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই পানিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা যেথা ইচ্ছা মাটি খনন করে পানি বের করতে পার। তিনি এই পানি মৃত্তিকার উপরের স্তরেই রেখে দিয়েছেন যা কয়েক ফুট মাটি খনন করেই বের করা যায়। এটা স্রষ্টার দান। তিনি ইচ্ছা করলে একে নিম্নের স্তরে তোমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন।

: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ -

অর্থাৎ তারা ভেবে দেখুক, তারা যে পানি কূপের মাধ্যমে অনায়াসে বের করে পান করছে, তা যদি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কোন শক্তি পানির এই স্রোতধারাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? হাদীসে আছে, এই আয়াত তেলাওয়াত করার পর বলা উচিত اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাই পুনরায় এই পানি আনতে পারেন– আমাদের শক্তি নেই।

শব্দবিশ্লেষণ :

تَبَارَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّبَارُكُ মূলবর্ণ (ب - ر - ك) জিনস صحيح অর্থ, তিনি অনেক বরকতময় তিনি অতি মহান। تَبَارَكَ শব্দটি بَرَكَةٌ থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ, উন্নত হওয়া। অগ্রসর হওয়া, সীমাতিক্রম হওয়া। এ ফে'লের কোনো রূপান্তর হয় না। শুধু ফে'লে মাযীর একটি সীগাহ ব্যবহৃত হয় এবং তা কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্যই আসে। তাই কিছু লোক একে ইসমে ফে'ল বলেন।

لِيَبْلُوَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منصوب بلام كى বাব نَصَرَ মাসদার بَلَاءٌ মূলবর্ণ (ب - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– যেন পরীক্ষা করেন।

خَاسِئًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার خُسُوْءًا মূলবর্ণ (خ - س - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– অপদস্থ হয়ে, হীন, নীচ, নিকৃষ্ট, অক্ষম, ব্যথিত।

حَسِيْرٌ : এটি একবচন; বহুবচন, حَسْرٰى বাব نَصَرَ অর্থ– ক্লান্ত, অনুশোচনাকারী, অনুতপ্ত।

زَيَّنَّا : সীগাহ– جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ز - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমরা সুশোভিত করলাম। আমরা সৌন্দর্যময় করেছি। আমরা উজ্জ্বল করেছি।

مَصَابِيْحَ : ইসমে আলা। বহুবচন। একবচন مِصْبَاحٌ মাদ্দাহ (ص - ب - ح) অর্থ– চেরাগ, প্রদীপ, বাতি।

رُجُوْمًا : নিক্ষেপণ যন্ত্র رَجْمٌ এর বহুবচন। رَجْمٌ মূলতঃ মাসদার। আর যে জিনিস দ্বারা প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়, তার জন্য একে ইসম হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ– جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِعْتَادٌ মূলবর্ণ (ع - ت - د) জিনস صحيح অর্থ– আমরা তৈরি করে রেখেছি, প্রস্তুত করে রেখেছি।।

سَعِيْرٌ : সিফাতের সীগাহ। فَعِيْلٌ-এর ওজনে। مَفْعُوْلٌ এর অর্থে। অর্থ– জাহান্নাম, জ্বলন্ত অগ্নি, আগুন, নরক। سعر থেকে নির্গত। অর্থ– আগুন প্রজ্বলিত করা।

اُلْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالْ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা নিক্ষিপ্ত হবে।

شَهِيْقًا : শব্দটি মাসদার, বাব ضَرَبَ - فَتَحَ - سَمِعَ মূলবর্ণ (ش - ه - ق) জিনস صحيح অর্থ– বিকট ধ্বনি, গর্জন করা, চেঁচামেচি করা।

تَفُوْرُ : সীগাহ– واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার فَوْرٌ মূলবর্ণ (ف - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে টগবগ করছে, উথলে উঠে, সে জোস মারে فَوْرٌ এর ব্যবহার আগুনের উপর রাখা পাতিল টগবগ করা এবং ক্রোধ উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য হয়ে থাকে।

نَعْقِلُ : সীগাহ– جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার– عَقْلٌ মূলবর্ণ (ع - ق - ل) জিনস صحيح অর্থ– আমরা বুঝে নিতাম অর্থাৎ বুঝে মেনে নিতাম। স্মৃতিশক্তি বা স্মরণ শক্তিকেও عَقْل বলা হয়। বিদ্যাবুদ্ধিকেও আকল বলা হয়।

اِعْتَرَفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِعْتَرَفُوْا মূলবর্ণ (ع - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– তারা স্বীকার করেছে। মেনে নিয়েছে।

يَخْشَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাবে سَمِعَ মাসদার– خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা ভয় করে। يَخْشَوْنَ মূলতঃ يَخْشَيُوْنَ ছিল। ياء মুতাহাররক তার পূর্বাক্ষরে যবর হওয়ায় ياء কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এরপর দু'সাকিন একত্র হওয়ার কারণে الف পড়ে গেছে। ফলে يَخْشَوْنَ হয়েছে।

اَسِرُّوْا : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ جمع مذكر حاضر বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْرَارٌ মূলবর্ণ (س ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ, তোমরা গোপন কর। তোমরা গোপনে বল।

اِجْهَرُوْا : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ جمع مذكر حاضر বাব فَتَحَ মাসদার جَهْرٌ মূলবর্ণ (ج ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– জোরে প্রাকশ্যে বল। এর মূল অর্থ হলো খোলাখুলি বা সরাসরি কোনো কিছু বলা বা করা।

اَمِنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বাবে ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার– اَمْنٌ মূলবর্ণ (ا ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা নিরাপদ হয়েছ, তোমরা অভয় হয়েছ। ।

يَخْسِفُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خَسْفٌ মূলবর্ণ (خ ـ س ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– ডুবে যাবে, ধসিয়ে দিবেন। মাসদার خَسْفٌ। ধসিয়ে দেওয়া।

تَكَادُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব كَادَ يَكَادُ মাসদার كَوْدٌ মূলবর্ণ (ك – و – د) জিনস اجوف واوى অর্থ– মনে হবে যেন, অচিরেই, অতি নিকটে।

خَزَنَةٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে خَازِنٌ অর্থ– রক্ষকগণ, তত্ত্বাবধায়ক, চৌকিদার।

نَعْقِلُ : সীগাহ– جمع متكلم বহছ– مضارع معروف বাবে ضَرَبَ মাসদার– عَقْلٌ মূলবর্ণ (ع ـ ق ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– আমরা বুঝে নিতাম অর্থাৎ বুঝে মেনে নিতাম। স্মৃতিশক্তি বা স্মরণশক্তিকেও عقل বলা হয়। বিদ্যাবুদ্ধিকেও আকল বলা হয়।

ذَلُوْلاً : একবচন, বহুবচন ذُلُلٌ অথ– বশীভূত, অধীন, অনুগত, হেয়, সমতল।

اِمْشُوْا : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ جمع مذكر حاضر বাব ضَرَبَ মাসদার مَشْىٌ মূলবর্ণ (م – ش – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা চলাফেরা কর, তোমরা চল।

تَمُوْرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَوْرٌ মূলবর্ণ (م – و – ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– থরথর করতে থাকে, কাঁপে, আন্দোলিত হবে।

صَفّٰتٍ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার صَفٌّ মূলবর্ণ (ص – ف – ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পাখা বিস্তার করে আছে, কাতারবন্দি, সারিবদ্ধ, বিন্যস্ত, শ্রেণিবদ্ধ।

يَقْبِضْنَ : সীগাহ– جمع مؤنث غائب বহছ– مضارع معروف মাসদার قَبْضٌ, বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ق ـ ب ـ ض) জিনস صحيح অর্থ– তারা (পাখিরা) তাদের ডানা সংকুচিত করে।

يُمْسِكُهُنَّ : সীগাহ– واحد مذكر غائب বহছ– مضارع معروف মাসদার اِمْسَاكٌ বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (م ـ س ـ ك) জিনস صحيح - هن যমীর মাফউলে বিহী। অর্থ, তিনি এদের ধরে রাখেন, আটকে রাখেন।

لَجُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ. ضَرَبَ মাসদার لَجَاجَةٌ لَجَاجٌ মূলবর্ণ (ل – ج – ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা অবিচল রয়েছে। জেদ করা, এক গুঁয়ে হওয়া, অটল থাকা।

مُكِبًّا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِكْبَابٌ মূলবর্ণ (ك – ب – ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– উপুড় হয়ে, অধঃমুখী হয়ে।

تَشْكُرُوْنَ : সীগাহ– جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার شُكْرٌ মূলবর্ণ (ش ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা শুকরিয়া আদায় করেছ। ।

ذَرَاَ : সীগাহ– واحد مذكر غائب বহছ– ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার ذَرٌّ মূলবর্ণ (ذ ـ ر ـ ء) জিনস مهموز فاء অর্থ– তিনি সৃষ্টি করেছেন। বিক্ষিপ্ত করেছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন।

تُحْشَرُوْنَ : সীগাহ– جمع مذكر حاضر বহছ– مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার حَشْرٌ মূলবর্ণ (ح ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদেরকে সমবেত করা হবে, জমা করা হবে।

يَقُوْلُوْنَ : সীগাহ– جمع مذكر غائب বহচ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার قَوْلٌ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বলেন। বলা, কথা বলা।

صَادِقِيْنَ : সীগাহ– جمع مذكر اسم فاعل বহছ– باب نَصَرَ মাসদার صِدْقٌ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– সত্যবাদীগণ।

اِنَّمَا : সীমাবদ্ধকরণ শব্দ। অর্থ– নিশ্চয়ই, বাস্তব। এছাড়া নয়। اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল এবং ماكافه দ্বারা গঠিত যা حصر তথা সীমাবদ্ধতার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর اِنَّ কে مَا আমল করা থেকে বারণ করে।

مُبِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ باب اِفْعَالٌ মাসদার– اِبَانَةٌ মূলবর্ণ (ب ـ ي ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– প্রকাশকারী, বর্ণনাকারী।

رَاَوْهُ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) যমীর মাফউলে বিহী। তারা তাকে দেখেছে।, رَاَوْا মূলতঃ رَاَيُوْا ছিল। তা'লীল করায় رَاَوْ হয়েছে।

زُلْفَةٌ : ইসমে মুফরাদ। এর বহুবচন زُلَفٌ আসে। অর্থ– নৈকট্য, নিকট, মর্যাদা, সময়। ইমাম রাগেব লিখেন, এটি মাসদাররূপে ইসম। এর মুযাক্কার-মুয়ান্নাছ, ওয়াহেদ, তাছনিয়া ও জমা সবই সমান।

سِيْئَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার سُوْءٌ، سَوْءٌ মূলবর্ণ (س – و – ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف واوى এবং مهموز لام অর্থ– বিকৃত হয়ে যাবে। ম্লান হয়ে যাবে, খারাপ হয়ে যাবে।

تَدَّعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِدِّعَاءٌ মূলবর্ণ (د – ع – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– যা তোমরা কামনা করতে, আকাঙ্ক্ষা করতে।

اٰمَنَّا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মূলবর্ণ (ء ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমরা ঈমান আনলাম।।

تَوَكَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ– ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَوَكُّلٌ মূলবর্ণ (و ـ ك ـ ل) জিনস مثال واوى অর্থ– আমরা ভরসা করেছি। আমরা নির্ভর করেছি।; কোনো কিছুর উপর ভরসা বা নির্বর করা।

اَصْبَحَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصْبَاحٌ মূলবর্ণ (ص ـ ب ـ ح) অর্থ– সে সকাল করেছে। তার সকাল লেগেছে। হয়েছে। এটি ফে'লে নাকেসের অন্তর্ভুক্ত। সকাল করা।

يَأْتِيْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) كم যমীর মাফউলে বিহী। ফে'লটি باء দ্বারা মুতা'আদ্দী হওয়ায় অর্থ হবে, অর্থ– তোমাদের নিকট নিয়ে আসবে। আসা।

يُجِيْرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِجَارَةٌ মূলবর্ণ (ج – و – ر) জিনস ناقص واوى অর্থ– রক্ষা করবে, আশ্রয় দিবে।

غَوْرًا : শব্দটি ইসম ও মাসদার, অর্থ– নিম্নদিকে, তলদেশ, তলা, গর্ত, পানি ভূগর্ভে চলে যাওয়া, কোনো জিনিস নিচের দিকে চলে যাওয়া।

مَعِيْنٍ : সিফাতের সীগাহ فَعِيْلٌ -এর ওজনে, মাসদার مَعْنٌ মূলবর্ণ (م – ع – ن) জিনস صحيح অর্থ– জলপ্রবাহ, বহমান প্রবাহিত, স্বচ্ছ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ : এখানে اِنَّ টা حرف مشبه بالفعل আর الَّذِيْنَ হলো اسم اِنَّ আর يَخْشَوْنَ বাক্যটি সেলাহ হয়েছে। আর رَبَّهُمْ হলো مفعول به আর يَخْشَوْنَ -এর- بِالْغَيْبِ টা يَخْشَوْنَ যমীর থেকে حال হয়েছে। আর باء-টা فى অর্থে হয়েছে। আর لَهُمْ হলো خبر مقدم আর مَغْفِرَةٌ হলো مبتدا واو আর اَجْرٌ টা مغفرة -এর উপর আতফ হয়েছে। আর كَبِيْرٌ টা اَجْرٌ -এর সিফত হয়েছে। আর جملة اسمية موخر টা خبر اِنَّ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ১১-১২]

سُوْرَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ক্বলম

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৫২, রুকূ'- ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ	আয়াত
১. নূন, কলমের শপথ, আর তাদের লিপিবদ্ধ করার শপথ।	نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ﴿١﴾
২. আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন।	مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢﴾
৩. আর নিঃসন্দেহে আপনার জন্য এমন বিনিময় রয়েছে, যা নিঃশেষিত হবার নয়।	وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ﴿٣﴾
৪. আর নিঃসন্দেহে আপনি চরিত্রের উচ্চতম স্তরে আছেন।	وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿٤﴾
৫. অতএব, অচিরেই আপনি দেখতে পাবেন এবং তারাও দেখবে-	فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ﴿٥﴾
৬. আপনাদের মাঝে কে বিকারগ্রস্ত?	بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ﴿٦﴾
৭. আপনার প্রতিপালক খুব জানেন, কে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত হয়েছে, আর তিনি সুপথগামীদেরকেও খুব জানেন।	اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٧﴾
৮. সুতরাং আপনি অবিশ্বাসীদের কথা মানবেন না।	فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. نٓ নূন وَالْقَلَمِ কলমের শপথ وَمَا يَسْطُرُوْنَ আর তাদের লিপিবদ্ধ করার শপথ।

২. مَآ اَنْتَ আপনি নন بِنِعْمَةِ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে بِمَجْنُوْنٍ উন্মাদ

৩. وَاِنَّ لَكَ আর নিঃসন্দেহে আপনার জন্য রয়েছে لَاَجْرًا এমন বিনিময় غَيْرَ مَمْنُوْنٍ যা নিঃশেষিত হবার নয়।

৪. وَاِنَّكَ আর নিঃসন্দেহে আপনি لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ চরিত্রের উচ্চতম স্তরে আছেন।

৫. فَسَتُبْصِرُ অতএব অচিরেই আপনি দেখতে পাবেন وَيُبْصِرُوْنَ এবং তারাও দেখবে।

৬. بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ কে আপনাদের মাঝে বিকারগ্রস্ত।

৭. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ আপনার প্রতিপালক খুব জানেন بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ কে তার পথ হতে বিভ্রান্ত হয়েছে وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ আর তিনি সুপথগামীদেরকে ও খুব জানেন।

৮. فَلَا تُطِعِ সুতরাং আপনি মানবেন না الْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের কথা।

অনুবাদ	আয়াত
৯. তারা এই কামনা করে, যদি আপনি শিথিল হন, তবে তারাও শিথিল হবে।	وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾
১০. আর আপনি এমন ব্যক্তির কথা মানবেন না, যে অধিক শপথকারী, হীন প্রকৃতির।	وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾
১১. যে পশ্চাতে নিন্দাকারী, চোগলখুরি করে।	هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾
১২. সৎকার্যে বাধা দেয়, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপী।	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾
১৩. রুক্ষ স্বভাবসম্পন্ন, তদুপরি অবৈধজাত [-ও] হয়।	عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾
১৪. এ কারণে যে, সে সম্পদ ও সন্তানাদির অধিকারী।	أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾
১৫. যখন আমার আয়াতসমূহ তার সম্মুখে পড়া হয়, তখন বলে, এটা ভিত্তিহীন কথা, যা পূর্বপুরুষদের হতে চলে আসছে।	إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾
১৬. আমি অচিরেই তার নাসিকাপরি দাগ দিব।	سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾
১৭. আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন উদ্যান অধিপতিগণকে পরীক্ষা করেছিলাম, যখন তারা শপথ করল যে, নিশ্চয় প্রত্যুষেই তার ফল পেড়ে নিব।	إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾
১৮. এবং ইনশাআল্লাহও বলল না।	وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَدُّوا তারা এই কামনা করে لَوْ تُدْهِنُ যদি আপনি শিথিল হন فَيُدْهِنُونَ তবে তারাও শিথিল হবে।

১০. وَلَا تُطِعْ আর আপনি এমন ব্যক্তির কথা মানবেন না كُلَّ حَلَّافٍ যে অধিক শপথকারী مَّهِينٍ হীন প্রকৃতির।

১১. هَمَّازٍ যে পশ্চাতে নিন্দাকারী مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ চোগলখুরি করে।

১২. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ সৎকার্যে বাধা দেয় مُعْتَدٍ সীমালঙ্ঘনকারী أَثِيمٍ পাপী।

১৩. عُتُلٍّ রুক্ষ স্বভাবসম্পন্ন بَعْدَ ذَٰلِكَ তদুপরি زَنِيمٍ অবৈধজাত (ও) হয়।

১৪. أَن كَانَ একারণে যে ذَا مَالٍ وَبَنِينَ সে সম্পদ ও সন্তানাদির অধিকারী।

১৫. إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا যখন আমার আয়াতসমূহ তার সম্মুখে পড়া হয় قَالَ তখন বলে أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ এটা ভিত্তিহীন কথা যা পূর্ব পুরুষদের হতে চলে আসছে।

১৬. سَنَسِمُهُ আমি অচিরেই দাগ দিব عَلَى الْخُرْطُومِ তার নাসিকাপরি।

১৭. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ যেমন বাগওয়ালাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম إِذْ أَقْسَمُوا যখন তারা শপথ করল যে لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ নিশ্চয় প্রত্যুষেই তার ফল পেড়ে নিব।

১৮. وَلَا يَسْتَثْنُونَ এবং ইনশাআল্লাহও বলল না।

১৯. অতএব, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক পরিভ্রমণকারী [আপদ] তাতে বয়ে গেল, আর তারা ঘুমন্ত ছিল।	فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. অতঃপর প্রভাতে বাগানটি এমন হয়ে রইল, যেমন শস্যকাটা ক্ষেত।	فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ﴿٢٠﴾
২১. অনন্তর প্রাতঃকালে একে অন্যকে ডাকতে লাগল।	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ﴿٢١﴾
২২. নিজ নিজ ক্ষেত্রাভিমুখে প্রত্যুষেই চল, যদি ফল পাড়তে হয়।	اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. অনন্তর চুপি চুপি [এ কথা] বলতে বলতে চলল–	فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. "আজ যেন কোনো দরিদ্র তোমাদের নিকট আসতে না পারে।"	اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿٢٤﴾
২৫. এবং নিজেদেরকে তা না দিতে সক্ষম মনে করে চলল।	وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. অতঃপর যখন বাগান দেখল, তখন তারা বলতে লাগল, নিশ্চয় আমরা পথ ভুলে গেছি।	فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْۤا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. বরং আমরা তো বঞ্চিত।	بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. তাদের মধ্যকার ভালো লোকটি বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখন কেন [তওবা ও] তাসবীহ্ পাঠ করছ না?	قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. فَطَافَ عَلَيْهَا অতএব তাতে বয়ে গেল طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক পরিভ্রমণকারী وَهُمْ نَآئِمُوْنَ আর তারা ঘুমন্ত ছিল।

২০. فَاَصْبَحَتْ অতঃপর প্রভাতে বাগানটি এমন হয়ে রইল كَالصَّرِيْمِ যেমন শস্যকাটা ক্ষেত।

২১. فَتَنَادَوْا অনন্তর একে অন্যকে ডাকতে লাগল مُصْبِحِيْنَ প্রাতঃকালে।

২২. اَنِ اغْدُوْا প্রত্যুষেই চল عَلٰى حَرْثِكُمْ নিজ নিজ ক্ষেত্রাভিমুখে اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ যদি ফল পাড়তে হয়।

২৩. فَانْطَلَقُوْا অনন্তর চলল وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ চুপি চুপি বলতে বলতে।

২৪. اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا যেন আসতে না পারবে الْيَوْمَ আজ عَلَيْكُمْ তোমাদের নিকট مِّسْكِيْنٌ কোনো দরিদ্র।

২৫. وَّغَدَوْا এবং চলল عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ নিজেদেরকে তা না দিতে সক্ষম মনে করে।

২৬. فَلَمَّا رَاَوْهَا অতঃপর যখন বাগান দেখল قَالُوْۤا তখন তারা বলতে লাগল اِنَّا لَضَآلُّوْنَ নিশ্চয় আমরা পথ ভুলে গেছি।

২৭. بَلْ বরং نَحْنُ আমরা তো مَحْرُوْمُوْنَ বঞ্চিত।

২৮. قَالَ [illegible]سَطُهُمْ তাদের মধ্যকার ভালো লোকটি বলল اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ এখন কে[illegible]বীহ পাঠ করছ না।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
২৯. তখন তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।	قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. অতঃপর একে অন্যকে সম্বোধন করে পরস্পর দোষারোপ করতে লাগল।	فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. বলতে লাগল, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! নিশ্চয় আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।	قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. সম্ভবত আমাদের প্রভু আমাদেরকে প্রতিদানে এতদপেক্ষা উত্তম বাগান দান করতে পারেন, আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে রুজু করছি।	عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. এভাবে আজাব হয়ে থাকে এবং পরকালের আজাব এটা অপেক্ষা গুরুতর। কতইনা ভালো হতো যদি এরা জানত।	كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. নিঃসন্দেহে মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট আরামের বেহেশতসমূহ রয়েছে।	اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾
৩৫. আমি কী অনুগত বান্দাদেরকে নাফরমানদের সমতুল্য করে দেব?	اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তোমাদের কি হলো? তোমরা কেমন মীমাংসা করছ?	مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. قَالُوْا তখন তারা বলল سُبْحٰنَ رَبِّنَآ আমাদের প্রতিপালক পবিত্র اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।

৩০. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ অতঃপর একে অন্যকে সম্বোধন করে يَّتَلَاوَمُوْنَ পরস্পর দোষারোপ করতে লাগল।

৩১. قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ বলতে লাগল হায় দুর্ভাগ্য আমাদের اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ নিশ্চয় আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।

৩২. عَسٰى رَبُّنَآ সম্ভবতঃ আমাদের প্রভু اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ আমাদেরকে প্রতিদানে এতদপেক্ষা উত্তম বাগান দান করতে পারেন اِنَّآ আমরা اِلٰى رَبِّنَا আমাদের প্রতিপালকের দিকে رٰغِبُوْنَ রুজু করছি।

৩৩. كَذٰلِكَ الْعَذَابُ এভাবেই আজাব হয়ে থাকে وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ এবং পরকালের আজাব এটা অপেক্ষা গুরুতর لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ কতইনা ভালো হতো যদি এরা জানত।

৩৪. اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ নিঃসন্দেহে মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিকট جَنّٰتِ النَّعِيْمِ আরামের বেহেশতসমূহ।

৩৫. اَفَنَجْعَلُ আমি কী করে দেব الْمُسْلِمِيْنَ অনুগত বান্দাদেরকে كَالْمُجْرِمِيْنَ নাফরমানদের সমতুল্য?

৩৬. مَا لَكُمْ তোমাদের কি হলো كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ তোমরা কেমন মীমাংসা করছ।

৩৭. তোমাদের নিকট কি কোনো কিতাব আছে, যাতে তোমরা পাঠ করছ।	اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. তোমাদের জন্য তাতে এমন বস্তু [লিখিত] রয়েছে, যা তোমরা পছন্দ করে থাক।	اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. তোমাদের জন্য কৃত এমন কসমসমূহের ভার কি আমার উপর চাপানো আছে, আর ঐ কসমসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যে, যা সিদ্ধান্ত করছ, তোমরা তা-ই [জান্নাত] পাবে?	اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তাদের মধ্যে কে এর জিম্মাদার?	سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤٠﴾
৪১. তাদের স্থিরীকৃত কোনো শরিক রয়েছে কি? সুতরাং উচিত যে, তারা তাদের ঐ শরিকদেরকে উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।	اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٤١﴾
৪২. যেদিন পায়ের গোছা উন্মুক্ত করা হবে এবং লোকদেরকে সেজদার প্রতি আহ্বান করা হবে, তখন তারা সেজদা করতে সমর্থ হবে না।	يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. তাদের চক্ষুসমূহ অবনমিত হয়ে থাকবে, লাঞ্ছনা তাদেরকে ঢেকে ফেলবে এবং তাদেরকে সেজদার প্রতি ডাকা হতো, আর তারা সুস্থও ছিল।	خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. اَمْ لَكُمْ তোমাদের নিকট কি আছে كِتٰبٌ কোনো কিতাব? فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ যাতে তোমরা পাঠ করছ।

৩৮. اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ তোমাদের জন্য তাতে এমন বস্তু রয়েছে لَمَا تَخَيَّرُوْنَ যা তোমরা পছন্দ করে থাক।

৩৯. اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا তোমাদের জন্য কৃত এমন কসমসমূহের ভার কি আমার উপর চাপানো আছে بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ আর ঐ কসমসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যে اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ যা সিদ্ধান্ত করছ, তোমরা তা-ই পাবে।

৪০. سَلْهُمْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ তাদের মধ্য কে এর زَعِيْمٌ জিম্মাদার।

৪১. اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ তাদের স্থিরীকৃত কোনো শরিক রয়েছে কি? فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ সুতরাং উচিত যে, তারা তাদের ঐ শরিকদেরকে উপস্থিত করুক اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ যদি তারা সত্যবাদী হয়।

৪২. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ যেদিন পায়ের গোছা উন্মুক্ত করা হবে وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ এবং লোকদেরকে সেজদার প্রতি আহ্বান করা হবে فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ তখন তারা সেজদা করতে সমর্থ হবে না।

৪৩. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ তাদের চক্ষুসমূহ অবনমিত হয়ে থাকবে تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ লাঞ্ছনা তাদেরকে ঢেকে ফেলবে وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ এবং তাদেরকে সেজদার প্রতি ডাকা হতো وَهُمْ سٰلِمُوْنَ আর তারা সুস্থও ছিল।

৪৪. অতএব, আমাকে এবং যে এ কালামকে অবিশ্বাস করে, তাকে ছেড়ে দিন, আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে [দোজখের দিকে] নিয়ে যাচ্ছি, এভাবে যে, তারা আদৌ অবহিত নয়।	فَذَرۡنِیۡ وَمَنۡ یُّکَذِّبُ بِهٰذَا الۡحَدِیۡثِ ؕ سَنَسۡتَدۡرِجُهُمۡ مِّنۡ حَیۡثُ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۴۴﴾
৪৫. আর তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি; নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।	وَاُمۡلِیۡ لَهُمۡ ؕ اِنَّ کَیۡدِیۡ مَتِیۡنٌ ﴿۴۵﴾
৪৬. আপনি কি তাদের নিকট কোনো বিনিময় চাচ্ছেন যে, ঐ খেসারতের কারণে তারা ভারাক্রান্ত হচ্ছে?	اَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ اَجۡرًا فَهُمۡ مِّنۡ مَّغۡرَمٍ مُّثۡقَلُوۡنَ ﴿۴۶﴾
৪৭. কিংবা তাদের নিকট গায়েব [-এর ইলম] আছে যে, তারা লিখে রাখে?	اَمۡ عِنۡدَهُمُ الۡغَیۡبُ فَهُمۡ یَکۡتُبُوۡنَ ﴿۴۷﴾
৪৮. অতএব, আপনি নিজ প্রতিপালকের ব্যবস্থার উপর ধৈর্য ধরুন, আর মৎসওয়ালার ন্যায় হবেন না। যখন তিনি প্রার্থনা করলেন এবং চিন্তায় মর্মাহত ছিলেন।	فَاصۡبِرۡ لِحُکۡمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنۡ کَصَاحِبِ الۡحُوۡتِ ۘ اِذۡ نَادٰی وَهُوَ مَکۡظُوۡمٌ ﴿۴۸﴾
৪৯. আল্লাহর অনুগ্রহ তার নিকট না পৌছলে তবে তিনি প্রান্তরে শোচনীয় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হতেন।	لَوۡلَاۤ اَنۡ تَدٰرَکَهٗ نِعۡمَۃٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالۡعَرَآءِ وَهُوَ مَذۡمُوۡمٌ ﴿۴۹﴾
৫০. অনন্তর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনীত করলেন এবং তাঁকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।	فَاجۡتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۵۰﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. فَذَرۡنِیۡ অতএব, আমাকে ছেড়ে দিন وَمَنۡ یُّکَذِّبُ بِهٰذَا الۡحَدِیۡثِ এবং যে এ কালামকে অবিশ্বাস করে তাকে سَنَسۡتَدۡرِجُهُمۡ আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে নিয়ে যাচ্ছি مِّنۡ حَیۡثُ لَا یَعۡلَمُوۡنَ এভাবে যে, তারা আদৌ অবহিত নয়।

৪৫. وَاُمۡلِیۡ لَهُمۡ আর তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি اِنَّ کَیۡدِیۡ مَتِیۡنٌ নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

৪৬. اَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ اَجۡرًا আপনি কি তাদের নিকট কোনো বিনিময় চাচ্ছেন যে فَهُمۡ مِّنۡ مَّغۡرَمٍ مُّثۡقَلُوۡنَ ঐ খেসারতের কারণে তারা ভারাক্রান্ত হচ্ছে।

৪৭. اَمۡ عِنۡدَهُمُ الۡغَیۡبُ কিংবা তাদের নিকট গায়েব আছে যে فَهُمۡ یَکۡتُبُوۡنَ তারা লিখে রাখে।

৪৮. فَاصۡبِرۡ لِحُکۡمِ رَبِّکَ অতএব, আপনি নিজ প্রতিপালকের ব্যবস্থার উপর ধৈর্য ধরুন وَلَا تَکُنۡ کَصَاحِبِ الۡحُوۡتِ আর মৎসওয়ালার ন্যায় হবেন না اِذۡ نَادٰی যখন তিনি প্রার্থনা করলেন وَهُوَ مَکۡظُوۡمٌ এবং চিন্তায় মর্মাহত ছিলেন।

৪৯. لَوۡلَاۤ اَنۡ تَدٰرَکَهٗ نِعۡمَۃٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ আল্লাহর অনুগ্রহ তার নিকট না পৌছলে لَنُبِذَ بِالۡعَرَآءِ وَهُوَ مَذۡمُوۡمٌ তবে তিনি প্রান্তরে শোচনীয় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হতেন।

৫০. فَاجۡتَبٰهُ رَبُّهٗ অনন্তর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনীত করলেন فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ এবং তাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

৫১. আর এ কাফেররা যখন কুরআন শুনে, তখন এরূপ মনে হয়, যেন তারা আপনাকে নিজ দৃষ্টি দ্বারা আছড়ে ফেলবে এবং বলে যে, এ ব্যক্তি উন্মাদ।	وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾
৫২. অথচ এই কুরআন সারা বিশ্বের জন্য নসিহত।	وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫১. وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এ কাফেররা তখন এরূপ মনে হয় لَيُزْلِقُوْنَكَ তারা যেন আপনাকে আছড়ে ফেলবে بِاَبْصَارِهِمْ নিজ দৃষ্টি দ্বারা لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ যখন কুরআন শুনে وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ এবং বলে যে, এই ব্যক্তি উন্মাদ।

৫২. وَمَا هُوَ অথচ এ কুরআন اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ সারা বিশ্বের জন্য নসিহত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির নাম নূন অথবা আল-ক্বালাম, কেননা এ শব্দ দু'টি অত্র সূরার প্রথমে উল্লিখিত হয়েছে। এ দু'টি শব্দের অনুসরণেই অত্র সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। এতে ২ রুকূ', ৫২টি আয়াত, ৩০০টি বাক্য ও ১২৪৬টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কুরআন]

সূরাটি নাজিলের কারণ ও সময়কাল : এ সূরাটিও মক্কা শরীফে নবী করীম ﷺ -এর নবুয়তি জীবনের প্রথম দিকে নাজিলকৃত সূরাসমূহের অন্যতম। মক্কা শরীফে নতুন দীন প্রচার শুরু হলো এবং সর্বপ্রথম হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.), হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যায়েদ (রা.) এবং হযরত উম্মে আয়মান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন। এদিকে নবী করীম ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে অজু ও নামাজের তালিম দেওয়া হলো। নবী করীম ﷺ এবং নব মুসলমানগণের এ নতুন কাজ অবলোকন করে কাফেরগণ বিস্মিত হলো। মক্কার প্রতিটি ঘরে ঘরে, অলিগলিতে তাদের এ নবতর কাজ ও ইবাদতি অনুষ্ঠান এবং কুরআনের অলৌকিক বিস্ময়কর বাণীর কথা আলোচিত হতে লাগল। কাফের সরদারগণ তাদের শিরকি মতবাদের উপর একে একটি আঘাত মনে করল। কেননা কুরআনের প্রবল আকর্ষণে মানুষ বিমোহিত হয়ে শিরকি মতবাদ ছেড়ে এ নবতর দীনের আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল। ফলে কাফের সরদারগণ এর বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে উঠল। নবী করীম ﷺ -কে নানাভাবে উপহাস, তিরস্কার ও জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে লাগল। এমনকি তাঁকে উন্মাদ-পাগল নামে আখ্যায়িত করতেও ছাড়ল না। সুতরাং এতে নবী করীম ﷺ -এর মনে আঘাত পাওয়া এবং মনঃক্ষুণ্ন হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি এই সূরা অবতীর্ণ করে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেন; কিন্তু নাজিলের সময় কোনটি তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে সূরার আলোচ্য বিষয়বস্তু হতে বুঝা যায় যে, মক্কী জীবনে কাফেরদের বিরোধিতার মাত্রা যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল, সম্ভবত তখনই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : উক্ত সূরাতে আল্লাহ তা'আলা মোট তিনটি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ ইসলাম বিরোধীদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও ওজর-আপত্তির জবাব, তাদেরকে সতর্কীকরণ ও সদুপদেশ প্রদান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং অবিচলতার জন্য উপদেশ দান।

অত্র সূরার প্রথম পর্যায়ে রাসূলে করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের প্রতি আপনার ইসলামের দাওয়াত পেশ করার প্রেক্ষিতে তারা আপনাকে যে গালি দিচ্ছে, তাতে আপনার কিছু আসে যায় না। আপনি নৈতিকতার উচ্চমানে অধিষ্ঠিত, আপনি প্রভুর মহাসত্য প্রচারে রত। আপনি পাগল নন, বরং কে পাগল আর কে ভালো তা তো সকলেই অবগত রয়েছে। আপনার বিরোধিতার যে প্রচণ্ড ঝড় বইছে, এটার কোনো চাপই আপনি মেনে নিবেন না, কোনো না কোনো এক পর্যায়ে আপনি কেবল তাদের কথায় বাধ্য হয়ে যান, এটাই তাদের কামনা। এরা সত্য হতে মানুষকে পথভ্রষ্টকারী। সীমালঙ্ঘনকারী বটে এবং চুগলখোর। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যকার একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির চরিত্র

তুলে ধরা হয়েছে। সকল মক্কাবাসীদের নিকট সে সুপরিচিত। তখনও তাদের সকলের নিকট নবী করীম ﷺ -এর সুমহান চরিত্র উদ্ভাসিত ও উজ্জ্বল হয়েছিল। তথাপিও মুহাম্মদ ﷺ তাদের উক্ত সুপরিচিত ব্যক্তির নিকট আল্লাহর বাণী প্রচার করলে বলত, এটা প্রথম যুগের বা পূর্বযুগের মানুষদের কিস্সা-কাহিনী মাত্র। তবে আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির কথার জবাব খুব শক্তভাবেই দিয়েছেন। ১৭-৩৩ আয়াত পর্যন্ত একটি বাগানের মালিকদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এ বাগানের অধিকারী মালিকগণ আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত পেয়েও তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন হতে বঞ্চিত ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের বাগানকে সম্পূর্ণ নিধন করে দিয়েছিলেন। ফলে তারা তাঁর নিয়ামত হতে বঞ্চিত রয়ে গেল। এ বিষয়টি উল্লেখ করার মাধ্যমে মক্কাবাসী তথা সমগ্র বিশ্বের কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদেরকে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, রাসূলে করীম ﷺ -এর আদর্শ ও চরিত্রে চরিত্রবান না হলে যে কোনো যুগে যে কোনো জাতিই এরূপ আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে তাঁর গজবের সম্মুখীন হবে। ৩৪-৩৭ আয়াতসমূহে কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে কাফেরদেরকে ক্রমান্বয়ে নসিহত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কোথাও কাফেরদেরকে আবার কোথাও নবী করীম ﷺ -কে লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। সেসব সম্বোধন ও আলোচনার নির্যাস এই যে, যারা আল্লাহকে মান্য করবে আর যারা অমান্য করবে, এ উভয় পক্ষের পরকালীন পরিণতি এক হবে না, অথচ কাফেরদের এ বিষয়ে ধারণা হলো, শেষ পরিণতি তাদেরই পক্ষে হবে।

তাদের এহেন ধ্যান-ধারণার কোনো মূল্য নেই, এটা ভিত্তিহীন, এর পক্ষে তাদের কোনো প্রমাণাদি পেশ করা অসম্ভব। মূলত মু'মিনগণ জান্নাতের অধিবাসী হবে। আর কাফেররা জাহান্নামী হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের মতামত সত্যায়িত করার জন্য তাদের দলনেতাগণও শত চেষ্টা করে কোনো ফল বের করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ তাঁর দস্তুর মতেই স্বীয় কার্য চালিয়ে যাবেন।

৪৮ হতে শেষ আয়াত পর্যন্ত রাসূলে কারীম ﷺ -কে বিশেষভাবে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা আগমন করা পর্যন্ত দীন প্রচারে যত কঠোরতা ও দুঃখ-কষ্টেরই সঙ্গী হতে হয়, তা যেন তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে অতিক্রম করে যান। হযরত ইউনুস (আ.)-এর মতো যেন ধৈর্যহারা না হন। কারণ এ ধৈর্যহারা হওয়ার দরুন তিনি বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমত তাঁকে রক্ষা করেছিল। অতএব কাফেরদের সকল লাঞ্ছনার মোকাবিলায় তিনি যেন হতাশ না হন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আল মুলকে বেশির ভাগ আলোচনা ছিল একত্ববাদ এবং তার অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে। আর এ সূরার অধিকাংশ আলোচনা রেসালতের অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে করা হয়েছে। আর নবুয়তকে অবিশ্বাস করা কুফরি। সুতরাং কুফরির প্রতিফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। -[বয়ানুল কুরআন, মা'আরিফ]

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ...... اَلْاٰيَة (٢)

শানে নুযূল : মুশরিকরা হুজুর ﷺ -কে (নাউযুবিল্লাহ) পাগল এবং শয়তান বলত, তাদের এ মিথ্যাচারের জবাবে এই আয়াত নাজিল হয়।

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ..... (٤)

শানে নুযূল : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেয়ে অধিক উত্তম চরিত্রের অধিকারী কেউ ছিল না। সাহাবয়ে কেরাম ও পরিবারের যে কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ডাকতেন জবাবে তিনি লাব্বাইক বলতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়। –[কুরতুবী ১৮/১৩১]

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ .... اَلْاٰيَة (١٠)

শানে নুযূল -১ : এ আয়াতটি দুষ্টমতি কাফের ওলীদ ইবনে মুগীরার কু-স্বভাব বর্ণনা করে নাজিল করা হয়েছে। তাতে ওলীদ ইবনে মুগীরার দশটি কু-স্বভাব বর্ণনা করা হয়েছে। এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার এবং তার অনুগত্য না করার বিশেষ আদেশ দেওয়া হয়েছে।

শানে নুযূল -২ : কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, আয়াতটি আখনাস বিন শুরাইক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ১৮/২৩১]

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ .... اَلْاٰيَة (١٧)

শানে নুযূল : বদরের যুদ্ধের সময় আবূ জাহেল সদম্ভে ঘোষণা করেছিল যে, মুসলমানদের ধরে ধরে বেধে ফেল। সে প্রসঙ্গেই এ আয়াত নাজিল হয়।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الخ -এর শানে নযূল : উক্ত আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে সাবী গ্রন্থকার বলেন, যখন উহুদের ময়দানে রাসূল ﷺ -এর সাহাবীগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মুনাফিকদের উত্তেজিত ভাব দেখে পলায়ন করেছিলেন, তখন পলাতক ব্যক্তিবর্গের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ বদদোয়া করতে মনস্থ করলেন, এমতাবস্থায় তাঁকে বদদোয়া হতে বিরত থাকার নিমিত্তে আয়াত নাজিল হলো।

কারো কারো মতে, মক্কাবাসীদের অত্যাচার যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরে খুব ব্যথা জেগেছিল এবং মক্কার কাফেররা নিকৃষ্ট শ্রেণির লোকদেরকে রাসূলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল। কারো কারো মতে, এ অত্যাচারী লোকগণ ছিল বনূ ছাকীফ গোত্রীয় লোক। অত্যাচারীগণ রাসূল ﷺ -কে পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর পা মুবারক রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। এমতাবস্থায় তিনি তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বদদোয়া করতে চেয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন–

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ الخ -

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ আয়াতের শানে নুযূল : কাফেররা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি তাদের তীব্র শত্রুতার কারণে তাঁর কথা শ্রবণ করার সময় তাঁর প্রতি এরূপ চক্ষু ফিরিয়ে দেখতো যেন তাকে মাটিতে ফেলে দিবে, অথবা ক্রোধের দ্বারা যেন তাঁকে খেয়ে ফেলবে। তাদের মন-মগজ ও সর্ব শরীরের শত্রুতা চক্ষু দ্বারা প্রকাশ করত। তখন কাফেরদের উক্ত অবস্থা বর্ণনায় وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْاٰيَة অবতীর্ণ হয়।

অথবা, তাফসীরকারগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে– বনী আসাদ গোত্রে কয়েকজন কুদৃষ্টি নিক্ষেপক লোক ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, তাঁর উপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। তখন وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ .... لِّلْعٰلَمِيْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ বিষয় অবগত করা এবং কুদৃষ্টির কোনো প্রভাব তাঁর উপর পড়বে না বলে জানিয়ে দেওয়া এবং তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করা উদ্দেশ্য। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কুদৃষ্টির সর্বপ্রকার প্রভাব হতে মুক্ত রেখেছেন। সিহাহ সিত্তায় হযরত আবূ হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, اَلْعَيْنُ حَقٌّ কুদৃষ্টির প্রভাব সত্য। অর্থাৎ কুদৃষ্টি নিক্ষেপক ব্যক্তি কোনো বস্তুর প্রতি কুদৃষ্টিতে দেখলে অবশ্যই এ বস্তুর ক্ষতি হবে। এটা হতে বাঁচার জন্য তাবিজ-কবজ ইত্যাদি দ্বারা তদবির করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত হয়েছে, বদ-নজর দূর করার জন্য এ আয়াতদ্বয় পাঠ করে ফুঁক দিলে বদ-নজরের প্রভাব দূরীভূত হয়। -[রূহুল মা'আনী, খাযেন]

সাহেবে হূতের ঘটনা : আল্লাহ তা'আলা পূর্ব ভাষণের জের টেনে মহানবী ﷺ -কে কাফেরদের তিরস্কার-জ্বালাতন, দীনের বিরোধিতাকরণ এবং তাঁকে উন্মাদ ও পাগল আখ্যাদান ইত্যাদি ব্যাপারে অতিষ্ঠ ও অধৈর্য না হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আর বহু বছর পূর্বেকার একটি ঐতিহাসিক কাহিনীর দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, আপনি সেই মাছওয়ালার ন্যায় ধৈর্যহারা হবেন না; যে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করেই দেশ ছেড়ে পলায়ন করেছিল। এ মাছওয়ালা হলেন আল্লাহর একজন মনোনীত নবী। তাঁর জীবন চরিত্র অতি সংক্ষেপে প্রথম তিনটি আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। এ মহামতি নবী হলেন হযরত ইউনুস (আ.)। তাঁকে 'মাছওয়ালা' কেন সম্বোধন করা হয়েছে তার কারণ উদঘাটনের জন্য এখানে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী উল্লেখ করছি।

হযরত ইউনুস (আ.) কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন, তার সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর পিতার নাম ছিল মাত্তা, তা অনেক ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায়। যখন তাঁর বয়স ২৮ বছর হয়, তখন তিনি নবুয়ত লাভ করেন। ইতিহাস গ্রন্থ দ্বারা জানা যায় যে, তিনি হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর মধ্যবর্তী সময়ের নবী ছিলেন। তাঁকে অসুরীয় সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্য পাঠানো হয়েছিল।

অসুরীয়দের বিরাট এক গোত্রভিত্তিক সাম্রাজ্য ছিল, যার কেন্দ্রীয় শহর ছিল প্রাচীন নিনাওয়া শহর। এ শহরটি বর্তমান ইরাকে অবস্থিত। এ নগরীর ব্যাপক ধ্বংসাবশেষ বর্তমানেও দাজলা নদীর পূর্বতীরে বর্তমান মুসেল শহরের বিপরীত দিকে বিদ্যমান রয়েছে। এ অঞ্চলে 'ইউনুস নবী' নামে একটি স্থান এখনো রয়েছে। এ জাতির লোকেরা সেকালে যে কত উন্নত ছিল, তা রাজধানী নিনাওয়া প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপী এলাকা জুড়ে থাকার দ্বারা অনুমান করা যায়। এ নিনাওয়া শহরেই অসুরীয়দের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ.)-কে নবী করে পাঠান। কুরআনের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়– ঐ সময় ঐ শহরের লোকসংখ্যা এক লক্ষ হতেও বেশি ছিল। তিনি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে দীন ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন; কিন্তু তাঁর দাওয়াতে কেউ কর্ণপাত করল না। তখন তিনি তাদের প্রতি চল্লিশ দিনের মধ্যে আল্লাহর গজব নাজিল হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করে শহর ছেড়ে দূরে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।

এদিকে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে নগরীর লোকজন আল্লাহর গজব নাজিল হওয়ার পূর্বাভাস পেয়ে হযরত ইউনুস (আ.)-এর সন্ধানে বের হলো। তারা ভাবল হযরত ইউনুস (আ.) সত্যই আল্লাহর নবী। তাঁর কথা অবশ্যই প্রতিফলিত হবে। তারা হযরত ইউনুস (আ.)-কে না পেয়ে নগরীর রাজাসহ সকল লোক নিজেদের পশুপালসহ ময়দানে গিয়ে জমায়েত হয়ে খালেস তওবা করল এবং হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনে তাঁর দীনকে কবুল করে নিল। ফলে আল্লাহ তাদের উপর হতে আজাবের ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা নিরাপদে রয়ে গেল; কিন্তু এ সব হযরত ইউনুস (আ.) কিছুই জানলেন না। তিনি চল্লিশ দিন অপেক্ষা করার পর আজাব না আসতে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। শহরবাসীদের নিকট তিনি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছেন। তিনি লজ্জায় কিভাবে মুখ দেখাবেন। তাই তিনি আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা না করে ঐ অঞ্চল ছেড়ে পশ্চিম দিকে রওয়ানা হলেন, পথে ফোরাত নদী পার হওয়ার জন্য খেয়াতরীতে অনেক লোকসহ উঠলেন। খেয়া নদীর মাঝখানে যাওয়ার পর নদীতে তুফান সৃষ্টি হলো। খেয়া ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। এ সময় লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, নিশ্চয় হয়তো আমাদের মধ্যে মনিব হতে ভেগে আসা কোনো গোলাম থাকবে; তার কারণেই খেয়াতরীর এ অবস্থা। হযরত ইউনুস (আ.) ভাবলেন আমিতো আমার প্রভুর আদেশের অপেক্ষা না করে চলে এসেছি। পরিশেষে তিনি নিজে পলায়নকারী গোলাম বলে পরিচয় দিলেন। তখন এরূপ লোক কে? তা অবগত হওয়ার জন্য তিনবার লটারী করা হলো। তিনবারই হযরত ইউনুস (আ.)-এর নাম উঠল। অতঃপর তাঁর এবং লোকদের ইচ্ছায় তাঁকে নদীতে নিক্ষেপ করা হলো, নদীর তুফান থেমে গেল। খেয়াতরী নিরাপদ হলো। এদিকে আল্লাহর নির্দেশে বিরাট এক মৎস্য হযরত ইউনুস (আ.)-কে গিলে ফেলল। মৎস্যের পেটে অন্ধকারের মধ্যে থেকে তিনি আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনা জানালেন لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন। আল্লাহর নির্দেশে মৎস্য তাঁকে নদীর তীরে উন্মুক্ত প্রান্তরে বমি করে ফেলে দিল। তখন তাঁর অবস্থা ছিল অতিশয় দুর্বল ও নাজুক। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা উক্ত স্থানে একটি ছায়াবৃক্ষ জাগিয়ে দিলেন। হযরত ইউনুস (আ.) এ বৃক্ষতলে থেকে প্রখর রৌদ্রতাপ হতে নিরাপদ রইলেন। কিছুটা সুস্থতা বোধ করার পর তথায় একটি ঝুপড়ি নির্মাণ করে বৃক্ষ, তরুলতার ফল আহার করে জীবন ধারণ করতে লাগলেন। অতঃপর আবার আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ব মর্যাদায় ফিরিয়ে নিয়ে নিনাওয়াবাসীদের হেদায়েতের দায়িত্ব দিয়ে তথায় পাঠালেন। বাকি জীবন নিনাওয়া অধিবাসীদের হেদায়েত ও নসিহতে কাটিয়ে দিয়ে ঐ নিনাওয়া শহরেই ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তিনি সমাধিস্থ হন। -[কাসাসুল কুরআন, নাদওয়া]

সূরা মুলকে সৃষ্টজগতের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্ব, তাওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণাদি বিবৃত হয়েছে। সূরা কলমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি কাফেরদের দোষারোপের জবাব দেওয়া হয়েছে। তাদের সর্বপ্রথম দোষারোপ ছিল এই যে, তারা আল্লাহর প্রেরিত পূর্ণ বুদ্ধিমান, পূর্ণজ্ঞানী ও সর্বগুণে গুণান্বিত রাসূলকে (নাউযুবিল্লাহ) উন্মাদ ও পাগল বলত। এর কারণ হয় এই ছিল যে, ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ ওহীর সময় তার প্রতিক্রিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র অঙ্গে ফুটে উঠত। এরপর তিনি ওহী থেকে প্রাপ্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাতেন। এই গোটা ব্যাপারটি কাফেরদের জ্ঞান ও অনুভূতির উর্ধ্বে ছিল। তাই তারা একে পাগলামী আখ্যা দিত। না হয় এর কারণ ছিল এই যে, তিনি স্বজাতি ও সারা বিশ্বে বিদ্যমান ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীতে এই দাবি করেন যে, আরাধনার যোগ্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ নেই। তারা যেসব স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমাকে খোদা মনে করত, সেগুলো যে জ্ঞান ও চেতনা থেকে মুক্ত এবং কারও উপকার বা ক্ষতি করতে অক্ষম, একথা তিনি প্রকাশ্যে বর্ণনা করেন। এই নতুন ধর্মবিশ্বাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো সাথী ছিল না। তিনি একাই এই দাবি নিয়ে আত্মরক্ষার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই সারা বিশ্বের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে যান। বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিতে এই উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাই এরূপ দাবি নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়াকে পাগলামি মনে করা হয়েছে এছাড়া দোষারোপের উদ্দেশ্যেও তো দোষারোপ হতে পারে। এমতাবস্থায় কোনো কারণ ছাড়াই কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পাগল বলত। সূরার প্রথম আয়াতসমূহে তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা শপথ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ –নূন অক্ষরটি একটি খণ্ডবর্ণ। কুরআন পাকের অনেক সূরার প্রারম্ভে এ ধরনের খণ্ডবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ ও রাসূল ব্যতীত এগুলোর অর্থ কারও জানা নেই। এ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করতে উম্মতকে নিষেধ করা হয়েছে।

কলমের অর্থ এবং কলমের ফজিলত : এখানে কলমের অর্থ সাধারণ কলমও হতে পারে। এতে ভাগ্যলিপির কলম এবং ফেরেশতা ও মানবের লেখার কলম অন্তর্ভুক্ত। এখানে বিশেষতঃভাগ্যলিপির কলমও বুঝানো যেতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি তাই। এই বিশেষ কলম সম্পর্কে হযরত ওবাইদা ইবনে সামেত (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার আদেশ করেন। কলম আরজ করল, কি লিখব?

তখন খোদায়ী তাকদীর লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করা হলো। কলম আদেশ অনুযায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টি তাকদীর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছিলেন।

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, কলম আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নিয়ামত। কেউ কেউ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তাকদীরের কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ও সৃষ্টির তকদীর লিপিবদ্ধ করেছে। এরপর দ্বিতীয় কলম সৃষ্টি করেছেন। এই সকল দ্বারা পৃথিবীর অধিবাসীরা লিখে এবং লিখবে। সূরা ইকরার عَلَّمَ بِالْقَلَمِ আয়াতেও এই কলমের উল্লেখ আছে।

আয়াতে কলম বলে যদি সর্বপ্রথম সৃষ্টি তাকদীরের কলম উদ্দেশ্য হয়, তবে এর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কাজেই এর শপথ করা উপযুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি তাকদীরের কলম, ফেরেশতাদের কলম ও মানুষের কলমসহ সাধারণ কলম উদ্দেশ্য হয়, তবে এর শপথ করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে বড় বড় কাজ কলমের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। দেশ বিজয়ে তরবারির চাইতে কলম যে অধিক কার্যকর হাতিয়ার, এ কথা সর্বজনবিধিত। আবূ হাতেম বস্তী (র.) এই বিষয়বস্তুই দুটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন–

اِذَا اَقْسَمَ الْاَبْطَالُ يَوْمًا بِسَيْفِهِمْ
وَعَدُّوْهُ مَا يَكْسِبُ الْمَجْدَ وَالْكَرَمَ
كَفٰى قَلَمُ الْكُتَّابِ عِزًّا وَ رِفْعَةً
عَدَّى الدَّهْرَ اِنَّ اللّٰهَ اَقْسَمَ بِالْقَلَمِ

অর্থাৎ যদি বীর পুরুষরা কোনোদিন তাদের তরবারির শপথ করে এবং একে সম্মান ও গৌরবের কারণ মনে করে, তবে লেখকদের কলম ও তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব চিরতরে বৃদ্ধি করার জন্য যথেষ্ট। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কলমের শপথ করেছেন।

সারকথা, আয়াতে কলম এবং কলম দ্বারা যা কিছু লেখা হয়, তার শপথ করে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের দোষারোপ খণ্ডন করে বলেছেন ঃ مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ –অর্থাৎ আপনি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ ও কৃপায় কখনও পাগল নন। এখানে بِنِعْمَةِ رَبِّكَ যোগ করে দাবির স্বপক্ষে দলিলও দেওয়া হয়েছে যে, যার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, সে কিরূপে পাগল হতে পারে? তাকে যে পাগল বলে, সে নিজেই পাগল।

আলেমগণ বলেন ঃ কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুর শপথ করেন, তা শপথের বিষয়বস্তুর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়ে থাকে। এখানে وَمَا يَسْطُرُوْنَ বলে বিশ্ব-ইতিহাসের যা কিছু লিখা হয়েছে এবং লিখা হচ্ছে, তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্ব-ইতিহাসের পাতা খুলে দেখ, এমন মহান চরিত্র ও কর্মের অধিকারী ব্যক্তি পাগল হতে পারে কি? এরূপ ব্যক্তি তো অপরের জ্ঞান-বুদ্ধির সংস্কারক হয়ে থাকে। অতঃপর উপরিউক্ত বিষয়বস্তুর সমর্থনে বলা হয়েছে : وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ –অর্থাৎ আপনার জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার যে কাজকে তারা পাগলামী বলছে, সেটা আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয় কাজ। এর জন্যে আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারও এমন, যা কখনও নিঃশেষ হবে না- চিরন্তন। জিজ্ঞাসা করি, কোনো পাগলকে তার কর্মের জন্যে পুরস্কৃত করা হয় কি? অতঃপর আরেকটি বাক্য দ্বারা এই বিষয়বস্তুর আরও সমর্থন করা হয়েছে ঃ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ –এতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ জ্ঞানপাপীরা, তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ, দুনিয়াতে যারা পাগল ও উন্মাদ, তাদের চরিত্র ও কর্ম কি এরূপ হয়ে থাকে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মহৎ চরিত্র ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ ধর্ম। কেননা আল্লাহ তা'আলার কাছে ইসলাম ধর্ম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোনো ধর্ম নেই। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ স্বয়ং কুরআন রাসূলে কারীম ﷺ -এর মহৎ চরিত্র। অর্থাৎ কুরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। হযরত আলী (রা.) বলেন ঃ মহৎ চরিত্র বলে কোরআনের শিষ্টাচার বোঝানো হয়েছে: অর্থাৎ যেসব শিষ্টাচার কুরআন শিক্ষা দিয়েছে। সব উক্তির সারমর্ম প্রায় এক। রাসূলে কারীম ﷺ-এর সত্তায় আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় উত্তম চরিত্র পূর্ণমাত্রায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন ঃ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ –অর্থাৎ আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি। –(আবূ হাইয়ান)

হযরত আনাস (রা.) বলেন— আমি সুদীর্ঘ দশ বছরকাল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমত করেছি। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি যেসব কাজ করেছি, সে সম্পর্কে তিনি কখনও বলেননি যে, কাজটি এভাবে কেন করলে, অমুক কাজটি করলে না কেন? অথচ দশ বছর সময়ের মধ্যে অনেক কাজ তাঁর রুচি বিরুদ্ধও হয়ে থাকবে।— (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আনাস (রা.) আরো বলেন : তাঁর উত্তম চরিত্রের কথা কি বলব, মদিনার কোনো বাঁদীও তাঁর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত। —(বুখারী)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো স্বহস্তে কাউকে প্রহার করেন নি। তবে জিহাদের ময়দানে কাফেরদেরকে আঘাত করা ও হত্যা করা প্রমাণিত আছে। এছাড়া তিনি কোনো খাদেমকে অথবা স্ত্রীকে প্রহার করেন নি। তাদের মধ্যে কারো কোনো ভুলভ্রান্তি হলে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে কেউ আল্লাহর আদেশ লংঘন করলে তাকে শরিয়তসম্মত শাস্তি দিয়েছেন। —(মুসলিম)

হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সওয়ালের জবাবে কখনো 'না' বলেননি। —(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন— রাসূলুল্লাহ ﷺ অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশ্লীলতার ধারে-কাছেও যেতেন না। তিনি বাজারে হট্টগোল করতেন না এবং মন্দ ব্যবহারের জবাবে মন্দ ব্যবহার করতেন না; বরং ক্ষমা ও মার্জনা করে দিতেন।

হযরত আবূ দারদা (রা.) বলেন— রাসূলে কারীম ﷺ -এর উক্তি এই যে, আমলের দাঁড়ি-পাল্লায় উত্তম চরিত্রের সমান কোনো আমলের ওজন হবে না। আল্লাহ তা'আলা গালিগালাজকারী মন্দভাষী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।

হযরত আয়েশার বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— মুসলমান তার সচ্চরিত্রতার গুণ দ্বারাই সেই ব্যক্তির মর্তবা লাভ করে, যে সারারাত ইবাদতে জাগ্রত থাকে এবং সারাদিন রোজা রাখে। —(আবূ দাউদ)

হযরত মা'আয (রা.) বলেন, (আমাকে ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করার সময়) ঘোড়ার জিনের সাথে সংলগ্ন লোহার আংটিতে যখন আমি এক পা রাখলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সর্বশেষ উপদেশ দিয়ে বললেন— يَا مُعَاذُ اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ - হে মা'আয, জনগণের প্রতি সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করবে। —(মালেক)

এসব রেওয়াত তাফসীরে মাযহারী থেকে উদ্ধৃত করা হলো।

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ শীঘ্রই আপনিও দেখে নিবেন এবং কাফেররাও দেখে নিবে যে, কে বিকারগ্রস্ত। مَفْتُوْن শব্দের অর্থ এস্থলে বিকারগ্রস্ত পাগল। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি পাগল বলে দোষারোপকারীদের উক্তি প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছিল। এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই এ তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাগল ছিলেন, না যারা তাঁকে পাগল বলত, তারাই পাগল ছিল। সেমতে অল্পদিনের মধ্যেই বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে বিশ্ববাসীর চোখের সামনে এসে যায় এবং পাগল আখ্যাদানকারীদের মধ্যে থেকেই হাজার হাজার লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়ে রাসূলে কারীম ﷺ -এর অনুসরণ ও মহব্বতকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতে থাকে। অপরদিকে তাওফীক থেকে বঞ্চিত অনেক হতভাগা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে যায়।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ অর্থাৎ আপনি মিথ্যারোপকারীদের কথা মানবেন না। তারা তো চায় যে, আপনি প্রচারকার্যে কিছুটা নমনীয় হলে এবং শিরক ও প্রতিমা পূজায় তাদেরকে বাধা না দিলে তারাও নমনীয় হয়ে যাবে এবং আপনার প্রতি বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নির্যাতন ত্যাগ করবে।— (কুরতুবী)

মাস'আলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, 'আমরা তোমাদেরকে কিছু বলব না, তোমরাও আমাদেরকে কিছু বলো না'— কাফির ও পাপাচারীদের সাথে এই মর্মে কোনো চুক্তি করা দীনের ব্যাপারে শৈথিল্যের নামান্তর ও হারাম।— (মাযহারী) অর্থাৎ বেগতিক না হলে এরূপ চুক্তি না-জায়েজ।

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍۭ بِنَمِيْمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ -

আপনি আনুগত্য করবেন না এমন ব্যক্তির, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে দোষারোপ করে, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়, যে সৎকাজে বাধাদান করে, যে সীমালঙ্ঘন করে, যে অত্যধিক পাপাচার করে, যে কঠোর স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। زَنِيْمًا শব্দের অর্থ পিতৃ- পরিচয়হীন -জারজ। আয়াতে যে ব্যক্তির এসব বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, সে জারজই ছিল।

প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফিরদের আনুগত্য না করার এবং ধর্মের ব্যাপারে কোনোরূপ নমনীয়তা অবলম্বন না করার ব্যাপক আদেশ ছিল। এই আয়াতে বিশেষ করে দুষ্টমতি কাফের ওলীদ ইবনে-মুগীরার কুস্বভাব বর্ণনা করে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ও তার আনুগত্য না করার বিশেষ আদেশ দেওয়া হয়েছে। এরপরও কয়েক আয়াতে এই

ব্যক্তির মন্দ চরিত্র ও অবাধ্যতা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ -আমি কিয়ামতের দিন তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। ফলে পূর্ববর্তী সব লোকের সামনে তার লাঞ্ছনা ফুটে উঠবে। خُرْطُوْم শব্দটি বিশেষভাবে হাতী অথবা শূকরের শুঁড়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে ওলীদের নাসিকাকে ঘৃণা প্রকাশার্থে خُرْطُوْم শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ -অর্থাৎ আমি মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন উদ্যানের মালিকদের পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। পূর্বের আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মক্কাবাসী কাফেরদের দোষারোপের জবাব ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা বিগত যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন। মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বর্ণিতব্য কাহিনীতে উদ্যানের মালিকদেরকে যেমন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতরাজি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন, তারা কৃতঘ্নতা করেছিল। ফলে তাদের উপর আজাব পতিত হয়েছিল এবং নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তেমনি আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদেরকেও নিয়ামতরাজি দান করেছেন। তাদের সর্ববৃহৎ নিয়ামত তো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের মধ্যেই পয়দা করেছেন। এছাড়া তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করেছেন এবং তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছেন। এসব নিয়ামত মক্কাবাসীদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ দেখতে চান যে, তারা এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিনা এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি না। যদি তারা কুফর ও অবাধ্যতায় অটল থাকে, তবে উদ্যানের মালিকদের কাহিনী থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এই আয়াতগুলোকে মক্কায় অবতীর্ণ মনে করা হলেও এই তাফসীর সঠিক। কিন্তু অনেক তাফসীরবিদ এই আয়াতগুলোকে মদীনায় অবতীর্ণ মনে করেন এবং আয়াতে বর্ণিত পরীক্ষার অর্থ করেন দুর্ভিক্ষের আজাব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-র বদ-দোয়ার ফলে মক্কাবাসীর উপর আপতিত হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় তারা ক্ষুধার তাড়নায় মৃত জন্তু ও বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা হিজরতের পরবর্তী ঘটনা।

উদ্যানের মালিকদের কাহিনী ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের ভাষ্য অনুযায়ী এই উদ্যান ইয়ামনে অবস্থিত ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে জুবায়ের -এর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়ামনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শহর "সানআ" থেকে ছয় মাইল দূরে এই উদ্যান অবস্থিত ছিল। কারো কারো মতে এটা আবিসিনিয়ায় ছিল। -(ইবনে কাছীর) উদ্যানের মালিকরা ছিল আহলে- কিতাব। হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার কিছুকাল পরে এ ঘটনা ঘটে।-(কুরতুবী)

একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি এই উদ্যানটি তৈরি করেছিলেন। তিনি ফসল কাটার সময় কিছু ফসল ফকির-মিসকিনদের জন্যে রেখে দিতেন। তারা সেখান থেকে খাদ্য-শস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনিভাবে ফসল মাড়ানোর সময় যেসব দানা ভূষির মধ্যে থেকে যেত, সেগুলোও ফকির-মিসকিনদের জন্যে রেখে দিতেন। এই নিয়ম অনুযায়ী উদ্যানের বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করার সময় যেসব ফল নীচে পড়ে যেত; সেগুলোও ফকির-মিসকিনদের জন্যে রেখে দিতেন এ কারণেই ফসল কাটা ও ফল আহরণের সময় বিপুল সংখ্যক ফকির-মিসিকন সেখানে সমবেত হতো। এই সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যান ও ক্ষেতের উত্তরাধিকারী হলো। তারা পরস্পরে বলাবলি করল ঃ আমাদের পরিবার-পরিজন বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ফসলের উৎপাদন কম। তাই এখন ফকির - মিসকিনদের জন্য এত শস্য ও ফল রেখে দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, পুত্রত্রয় উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের ন্যায় বলল ঃ আমাদের পিতা বে-ওকুফ ছিল তাই বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য ও ফল মিসকিনদের জন্যে রেখে দিত। অতএব, আমাদের কর্তব্য এই প্রথা বন্ধ করে দেওয়া। অতঃপর তাদের কাহিনী স্বয়ং কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ -অর্থাৎ তারা পরস্পরে শপথ করে বলল ঃ এবার আমরা সকাল-সকালেই যেয়ে ক্ষেতের ফসল কেটে আনব, যাতে ফকির-মিসকিনরা টের না পায় এবং পিছনে না চলে। এই পরিকল্পনার প্রতি তাদের এতটুকু দৃঢ় আস্থা ছিল যে, ইনশাআল্লাহ বলারও প্রয়োজন মনে করল না। আগামীকালের কোনো কাজ করার কথা বলার সময় "ইনশাআল্লাহ আগামীকাল একাজ করব" বলা সুন্নত। তারা এই সুন্নতের পরওয়া করল না। কোনো কোনো তফসীরবিদ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ এর এরূপ অর্থ করেছেন যে, আমরা সম্পূর্ণ খাদ্যশস্য ও ফল নিয়ে আসব এবং ফকির-মিসকিনদের অংশ বাদ দিব না। -(মাযহারী)

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ - অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এই ক্ষেতে ও উদ্যানে একটি বিপদ হানা দিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, একটি অগ্নি এসে সমস্ত তৈরি ফসলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। وَهُمْ نَائِمُوْنَ অর্থাৎ এই আজাব রাত্রিবেলায় তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন তারা সবাই নিদ্রামগ্ন।

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ - صَرْمٌ শব্দের অর্থ ফল ইত্যাদি কর্তন করা। صَرِيْمٌ -এর অর্থ কর্তিত। উদ্দেশ্য এই যে, ফসল কেটে নেওয়ার পর ক্ষেত যেমন সাফ ময়দান হয়ে যায়, অগ্নি এসে ক্ষেতকে সেরূপ করে দিল। صَرِيْمٌ এর অর্থ কালো রাত্রিও হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, ফসলও কালো রাত্রির ন্যায় কালো ভস্ম হয়ে গেল।-(মাযহারী)

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ -অর্থাৎ যারা অতি প্রত্যুষেই একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল ঃ যদি ফসল কাটতে চাও, তবে সকাল-সকালই ক্ষেতে চল। وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ অর্থাৎ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তারা চুপিসারে কথাবার্তা বলতেছিল, যাতে ফকির-মিসকিনরা টের পেয়ে সাথে না চলে।

وَغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ -حَرْدٌ শব্দের অর্থ নিষেধ করা ও রাগা, গোস্বা দেখনো। উদ্দেশ্য এই যে, তারা ফকির-মিসকিনকে কিছু না দিতে সক্ষম, এরূপ ধারণা নিয়ে রওয়ানা হলো। যদি কোনো ফকির এসেও যায়, তবে তাকে হটিয়ে দিবে।

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوْا إِنَّا لَضَالُّوْنَ -যখন গন্তব্যস্থলে পৌছে ক্ষেত-বাগান কিছুই দেখতে পেল না, তখন প্রথমে বলল ঃ আমরা পথ ভুলে অন্যত্র এসে গেছি। কিন্তু পরে নিকটবর্তী স্থান ও আলামত দেখে বুঝতে পারল যে, গন্তব্যস্থলেই এসেছি; কিন্তু ক্ষেত পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তখন তারা বলল ঃ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ - আমরা এই ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ - তাদের মধ্যে যে মাঝারী ব্যক্তি ছিল, অর্থাৎ পিতার ন্যায় সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে আনন্দ লাভকারী ছিল, সে বলল ঃ আমি কি পূর্বেই তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো না কেন? অর্থাৎ তোমরা মনে কর যে, ফকীর-মিসকিনকে ধন-সম্পদ দিয়ে দিলে আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে ধন-সম্পদ দিবেন না, অথচ আল্লাহ তা'আলা এ বিষয় থেকে পবিত্র। যারা তাঁর পথে ব্যয় করে, তিনি নিজের কাছ থেকে তাদেরকে আরও বেশি দেন।-(মাযহারী)

قَالُوْا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ -তখন এই ব্যক্তির কথা কেউ না শুনলেও এখন সবাই স্বীকার করল যে, আল্লাহ তা'আলা সকল ত্রুটি ও অভাব থেকে পবিত্র এবং তারা নিজেরাই জালেম। কারণ তারা ফকির-মিসকিনের অংশও হজম করতে চেয়েছিল। এই মধ্যপন্থি ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল এবং সে অন্যদের চেয়ে ভালো ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দুষ্টদের সঙ্গী হয়ে তাদেরই মতানুসারে কাজ করতে সম্মত হয়ে গিয়েছিল। তাই তার দশাও তাদের মতোই হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে পাপকাজে নিষেধ করে, অতঃপর তাদেরকে বিরত না হতে দেখে নিজেও তাদের সাথে শরিক হয়ে যায়, সেও তাদের অনুরূপ। তার উচিত নিজেকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ -অর্থাৎ তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করার পরও একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল যে, তুই-ই প্রথমে ভ্রান্ত পথ দেখিয়েছিলি, যদ্দরুন এই আজাব এসেছে। অথচ তাদের কেউ একা অপরাধী ছিল না; বরং সবাই অথবা অধিকাংশই অপরাধে শরিক ছিল।

আকজাল এই বিপদটি ব্যাপকভাবে দেখা যায়। অনেকগুলো দলের সমষ্টিগত কর্মের ফলে কোনো ব্যর্থতা অথবা বিপদ আসলে একে অপরকে দোষী করে সময় নষ্ট করাও একটি বিপদ হয়ে দেখা দেয়।

قَالُوْا يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِيْنَ -অর্থাৎ প্রথমে একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করার পর যখন তারা চিন্তা করল, তখন সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল যে, আমরা সবাই অবাধ্য ও গোনাহগার। তাদের এই অনুতপ্ত স্বীকোরোক্তি তওবার স্থলাভিষিক্ত ছিল এ কারণেই তারা আশাবাদী হতে পেরেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আরও উত্তম উদ্যান দান করবেন। ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন ঃ আমি খবর পেয়েছি যে, তাদের খাঁটি তওবার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আরও উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সেই বাগানের এক একটি আঙ্গুর-গুচ্ছ এক খচ্চরের বোঝা হয়ে যেত।-(মাযহারী)

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ -মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষরূপী আজাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণএবং উদ্যান মালিকদের ক্ষেত জ্বলে যাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনার পর সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহর আজাব আসে, তখন এমনিভাবেই আসে। দুনিয়ায় এই আজাব আসার পরও তাদের পরকালের আজাব দূর হয়ে যায় না; বরং পরকালের আজাব ভিন্ন এবং তদপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে। পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে সৎ আল্লাহভীরুদের প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরে মক্কার মুশরিকদের একটি মিথ্যা দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। মুশরিকরা দাবি করতো যে, প্রথমত কিয়ামত হবে না এবং পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের কাহিনী উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। দ্বিতীয়ত যদি এরূপ হয়েও যায়, তবে সেখানেও আমরা দুনিয়ার ন্যায় নিয়ামত ও অগাধ ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হব। কয়েক আয়াতে এই দাবির জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা সৎ ও অপরাধীদেরকে সমান করে দিবেন- এ কেমন উদ্ভট ও অভিনব সিদ্ধান্ত! এর পক্ষে না আছে কোনো প্রমাণ, না আছে ঐশী কিতাব থেকে কোনো সাক্ষ্য এবং না আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ওয়াদা। এমতাবস্থায় কেমন করে এরূপ দাবি করা হয়?

কিয়ামতের একটি যুক্তি : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ হওয়া এবং সৎ-অসতের প্রতিদান ও শাস্তি হওয়া যুক্তিগতভাবে অবশ্যম্ভাবী। কেননা এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে দুনিয়াতে সাধারণত যারা পাপাচারী, কুকর্মী, চোর-ডাকাত, তারাই সুখে থাকে এবং মজা লুটে। একজন চোর ও ডাকাত মাঝে মাঝে এক রাত্রিতে এই পরিমান ধন-সম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন ভদ্র ও সাধু ব্যক্তি সারা জীবনেও উপার্জন করতে পারে না। তদুপরি সে আল্লাহ ও পরকালের ভয় কাকে বলে, জানে না এবং কোনো লজ্জা-শরমের বাধাও মানে না; যেভাবে ইচ্ছা মনের কামনা-বাসনা পূর্ণ করে যায়। পক্ষান্তরে সৎ ও ভদ্র ব্যক্তি প্রথমতো আল্লাহকে ভয় করে, যদি তাও না থাকে, তবে সামাজিক লজ্জা ও শরমের চাপে দামিত হয়ে থাকে। সারকথা এই যে, দুনিয়ার কারখানায় দুষ্কর্মী ও বদমায়েশেরা সফল এবং সৎ ও ভদ্র ব্যক্তি ব্যর্থ মনোরথ দৃষ্টিগোচর হয়। এখন সামনেও যদি এমন সময় না আসে যাতে সৎ ব্যক্তি উত্তম পুরস্কার পায় এবং অসাধু ব্যক্তি শাস্তি লাভ করে, তবে প্রথমত কোনো মন্দকে মন্দ এবং গোনাহকে গোনাহ বলা অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ এতে একজন মানুষকে অহেতুক তার কামনা থেকে বিরত রাখা হয়; দ্বিতীয়ত ন্যায় ও সুবিচারের কোনো অর্থ থাকে না। যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তারা এই প্রশ্নর কি জবাব দেবে যে, আল্লাহর ইনসাফ কোথায় গেল?

দুনিয়াতে প্রায়ই অপরাধী ধরা পড়ে, লাঞ্ছিত হয় এবং সাজা ভোগ করে। এতে করে সৎ লোকের স্বাতন্ত্র্য দুনিয়াতেই ফুটে উঠে। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের মাধ্যমে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং কিয়ামতের প্রয়োজন কি? উপরোক্ত বক্তব্যে এ ধরনের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। কেননা প্রথমত সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় রাষ্ট্রের দেখা শুনা সম্ভবপর নয়। যেখানে অপরাধী ধরা পড়ে, সেখানেও আদালতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি সর্বত্র সংগৃহীত হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধী বেকুসর খালাস পেয়ে যায়। গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি পাওয়া গেলেও ঘুষ, সুপারিশ ও চাপ সৃষ্টির অনেক চোরা দরজা দিয়ে অপরাধী নাগালের বাইরে চলে যায়। বর্তমান যুগে প্রচলিত আইন-আদালতের অপরাধ ও শাস্তি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, এ যুগে কেবল সেসব বে ওকুফ, নির্বোধ ও অসহায় ব্যক্তি শাস্তি পায়, যারা চালাকী করে কোনো চোরা দরজা বের করতে পারে না এবং যার কাছে ঘুষের টাকা নেই বা কোনো বড় লোক সুপারিশকারী নেই অথবা যে নির্বুদ্ধিতার কারণে এগুলোকে ব্যবহার করতে পারে না। এ ছাড়া সব অপরাধীই স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে বিচরণ করে।

কুরআন পাকের أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ বাক্যটি এই সত্য ফুটিয়ে তুলেছে যে, যুক্তিগতভাবে এরূপ সময় আসা জরুরি যেখানে সবার হিসাব-নিকাশ হবে, যেখানে অপরাধীদের জন্য কোনো চোরা-দরজা থাকবে না, যেখানে ইনসাফই ইনসাফ হবে এবং সৎ ও অসতের পার্থক্য দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠবে। এটা না হলে দুনিয়াতে কোনো মন্দ কাজ মন্দ নয়, কোনো অপরাধ অপরাধ নয় এবং আল্লাহর ন্যায় বিচার ও ইনসাফের কোনো অর্থ থাকে না।

যখন প্রমাণিত হলো যে, কিয়ামতের আগমন ও ক্রিয়া কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি নিশ্চিত, তখন অতঃপর কিয়ামতের কিছু ভয়াবহ অবস্থা ও অপরাধীদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে কিয়ামতের দিন كَشْفِ سَاقٍ অর্থাৎ গোছা উন্মোচিত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। এর স্বরূপ তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ -অর্থাৎ যারা কেয়ামতের কথা অবিশ্বাস করে, আপনি তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। এরপর দেখুন আমি কি করি। এখানে 'ছেড়ে দিন' কথাটি একটি বাক পদ্ধতির অনুসরণে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য আল্লাহর উপর ভরসা করা। এর সারমর্ম এই যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে বার বার এই দাবিও পেশ করা হতো, যদি আমরা বাস্তবিকই আল্লাহর কাছে অপরাধী হয়ে থাকি এবং আল্লাহ আমাদেরকে আজাব দিতে সক্ষম হন, তবে এই মুহূর্তেই আমাদেরকে আজাব দেন না কেন? তাদের এসব কষ্টদায়ক দাবির কারণে কখনও কখনও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনেও এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকবে এবং সম্ভবত তিনি কোনো সময় দোয়াও করে থাকবেন যে, এদের উপর এই মুহূর্তেই আজাব এসে গেলে অবশিষ্ট লোকদের সংশোধনের পথ হয়তো সুগম হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে : আমার রহস্য আমিই ভালো জানি। আমি তাদেরকে একটি সীমা পর্যন্ত সময় দেই; তাৎক্ষণিক আজাব প্রেরণ করি না। এতে করে তাদের পরীক্ষাও হয় এবং ঈমান আনার জন্যে অবকাশও হয়। পরিশেষে হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, হযরত ইউনুস (আ.) কাফেরদের দাবিতে অতিষ্ঠ হয়ে আজাবের দোয়া করেছিলেন। আজাবের আলামত সামনেও এসে গিয়েছিল এবং হযরত ইউনুস (আ.) আজাবের জায়গা থেকে অন্যত্র সরেও গিয়েছিলেন; কিন্তু এরপর সমগ্র সম্প্রদায় কাকুতি-মিনতি ও আন্তরিকতা সহকারে তওবা করেছিল এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে আজাব সরিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর ইউনুস (আ.) সম্প্রদায়ের কাছে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতিরেকে সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন না করার পথ বেছে নেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হুঁশিয়ার করার জন্য সামুদ্রিক ভ্রমণে মাছের পেটে চলে যাওয়ার ঘটনা ঘটান। অতঃপর হযরত ইউনুস (আ.) হুঁশিয়ার

হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাঁর প্রতি নিয়ামত ও অনুগ্রহের দরজা খুলে দেন। সূরা ইউনুস ও অন্যান্য সূরায় এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হয়েছে যে, আপনি কাফিরদের দাবির কাছে নত হবেন না এবং তাদের প্রতি দ্রুত আজাব প্রেরণের আকাঙ্ক্ষাও করবেন না। আমার নিগূঢ় রহস্য এবং বিশ্ববাসীর যথার্থ উপযোগিতা আমিই সম্যক জানি। আমার উপর ভরসা করুন।

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ–এখানে হযরত ইউনুস (আ.)-কে صَاحِبِ حُوتٍ মাছওয়ালা, বলা হয়েছে। কেননা তিনি কিছুকাল মাছের পেটে ছিলেন। وَاِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ - يُزْلِقُوْنَ শব্দটি اِزْلَاقٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হোচট দেওয়া, ভূপাতিত করা।–(রাগিব) উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা আপনাকে ক্রুদ্ধ ও তির্যক দৃষ্টিতে দেখে এবং আপনাকে স্বস্থান থেকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহর কালাম শ্রবণ করার সময় তাদের এই অবস্থা হয়। তারা বলে ঃ এ তো পাগল। وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ অথচ এই কালাম বিশ্বাসীদের জন্যে উপদেশ এবং তাদের সংশোধন ও সাফল্য প্রতিশ্রুত। এরূপ কালামের অধিকারী ব্যক্তি কখনো পাগল হতে পারে কি? সূরার শুরুতে কাফেরদের যে দোষারোপের জবাব দেওয়া হয়েছিল, উপসংহারে অন্য ভঙ্গিতে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে।

ইমাম বগভী প্রমুখ তাফসীরবিদ এসব আয়াতের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মক্কায় জনৈক ব্যক্তি নযর লাগানোর কাজে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সে উট ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ারকে নযর লাগালে তৎক্ষণাৎ সেটি মরে যেত। মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার জন্যে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করত। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে নযর লাগানোর উদ্দেশ্য সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল। সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নযর লাগানোর চেষ্টা করল; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরের হেফাজত করলেন। ফলে তাঁর কোনো ক্ষতি হলো না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ আয়াতে এই নযর লাগার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য, নযর লাগা একটি বাস্তব সত্য। ছহীহ্ হাদীস সমূহে এর সত্যতা সমর্থিত হয়েছে। আরবেও এটা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন ঃ নযর লাগা ব্যক্তির গায়ে وَاِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁ দিলে নযর লাগার অশুভ প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়।–(মাযহারী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْقَلَمُ : একবচন। মা'রেফা ব-লাম। বহুবচন اَقْلَامٌ অর্থ– কলম। ভাগ্য নিরীক্ষণ তীর। (ফাল মানে ভবিষ্যৎবাণী, জ্যোতির্বিদ্যা) قَلَمٌ -এর কাফে যের হলে অর্থ হবে, কর্তন। قَلَمٌ -এর লাম সাকিন হলে এটি মাসদার। কোনো শক্ত জিনিসকে কর্তন করা। আয়াতে কলম বলতে লেখার কলম/ যন্ত্রকে বুঝানো হয়েছে।

يَسْطُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার سَطْرٌ মূলবর্ণ (س - ط - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা লিখে

مَمْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَنُّ মূলবর্ণ (م - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– হ্রাসকৃত। কর্তিত। নিঃশেষিত।

مَفْتُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفِتْنَةُ মূলবর্ণ (ف - ت - ن) জিনস صحيح অর্থ– বিকারগ্রস্ত।

تُدْهِنُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ– مضارع معروف অর্থ– তুমি নম্রতা কর। অলসতা কর। তুমি ঢিলা হও اَدْهَنَ থেকে নির্গত। যার অর্থ মূলতঃ تَدْهِيْنٌ তথা পালিশ/ তৈলাক্ত/ পিচ্ছিল করা। তৈল লাগানো। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য কোমলতা, মসৃণতা ও অলসতা। কেননা কোনো জিনিসে তেল লাগালে তা নরম ও মসৃণ হয়ে যায়।

حَلَّافٌ : মুবালাগার সীগাহ জিনস صحيح অর্থ– অধিক শপথকারী।

مَهِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার هَيْنٌ মূলবর্ণ (ه - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– হীন প্রকৃতির।

هَمَّازٌ : মুবালাগার সীগাহ বাব ضَرَبَ মাসদার هَمْزٌ মূলবর্ণ (ه - م - ز) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাতে নিন্দাকারী।

مَشَّاءٌ : মুবালাগার সীগাহ বাব ضَرَبَ মাসদার مَشْىٌ মূলবর্ণ (م - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পথচারী। বেশি বিশি ঘোরাফেরাকারী।

نَمِيْمٌ : সিফাতের সীগাহ একবচন : বহুবচন نَمَائِمُ অর্থ– চোগল খোর। পরনিন্দাকারী। কুৎসা রটনাকারী।

نَسِمُهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَسْمٌ মূলবর্ণ (و - س - م) জিনস مثال واوى অর্থ– আমরা দাগিয়ে দিব।

خُرْطُوْمٌ : শব্দটি একবচন বহুবচন خَرَاطِيْمُ অর্থ– নাসিকা হাতির শূঁড়। নাক।

عُتُلٌّ : রুক্ষ, দুষ্ট, রূঢ়, বদমেজাজ। এখানে عُتُلٌّ দ্বারা উদ্দেশ্য রুক্ষ ও বদমেজাজী কাফির। عُتُلٌّ বলতে শক্ত যে কোনো বস্তুকে বুঝায়।

زَنِيْمٌ : দুর্নামি, কোনো খারাপ নিদর্শনে প্রসিদ্ধ হওয়া। ঐ ব্যক্তি যে কোনো সম্প্রদায়ের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। কিন্তু তাদের সাথেও থাকে না আবার তাদের থেকে সরেও যায় না।

يَصْرِمُنَّهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف بانون تاكيد ثقيله মাসদার صَرْمٌ বাব ضَرَبَ অর্থ– নিশ্চয় তারা ফল আহরণ করবে, কাটবো।

طَافَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার طَوْفٌ মূলবর্ণ (ط - و - ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– তাওয়াফ করেছে। প্রদক্ষিণ করেছে। ঘুরে বেড়িয়েছে। অর্থ, কোনো জিনিসকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করা।

اُغْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার غُدُوٌّ মূলবর্ণ (غ - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সকালে চল, প্রত্যুষে চল, খুব ভোরবেলা চল। সকালবেলা চলা।

يَتَخَافَتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَخَافُتٌ মূলবর্ণ (خ - ف - ت) জিনস صحيح অর্থ– চুপি চুপি বলে।

يَتَلَاوَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّلَاوُمُ মূলবর্ণ (ل - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– পরস্পর

رَاغِبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার رَغْبَةٌ মূলবর্ণ (ر - غ - ب) জিনস صحيح অর্থ– আগ্রহী, উৎসাহী।

تَخَيَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَخَيُّرٌ মূলবর্ণ (خ - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা পছন্দ কর, তোমরা নির্বাচন কর, গ্রহণ কর। পছন্দ করা, ইচ্ছা করা, গ্রহণ করা।

مَكْظُوْمٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার كَظْمٌ মূলবর্ণ (ك - ظ - م) জিনস صحيح অর্থ– চিন্তার কারণে ভারাক্রান্ত। বিষণ্ন। সংবরণ করা, চুপ থাকা, (ক্রোধ) চেপে রাখা।

تَدَارَكَهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف; বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَدَارُكٌ মূলবর্ণ (د - ر - ك) জিনস صحيح ; ه যমীর মাফউল। অর্থ– পৌঁছা, সে পেয়েছে। এ শব্দটির ব্যবহার বেশিরভাগ প্রার্থনা ও নেয়ামত অর্জনের ক্ষেত্রে হয়।

عَرَاءٌ : বিরান ভূমি, যেখানে গাস জন্মায় না।

يُزْلِقُوْنَكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِزْلَاقٌ মূলবর্ণ (ز - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা তোমাকে আছাড় দিবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ : এখানে فاء টি হলো আতেফা। আর طَافَ ফে'ল। আর عَلَيْهِ টা طَافَ-এর সাথে متعلق এবং طَائِفٌ হলো ফায়েল। আর مِنْ رَّبِّكَ টা طَائِفٌ-এর সিফত হয়েছে। আর وَهُمْ-এর واو টি حاليه এবং هُمْ হলো মুবতাদা। আর نَائِمُوْنَ হলো خبر –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৩৩]

سُوْرَةُ الْحَاۤقَّةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা আল হাক্কা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫২, রুকূ'–২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।	اَلْحَاۤقَّةُ ۙ﴿۱﴾
২. কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা!	مَا الْحَاۤقَّةُ ۚ﴿۲﴾
৩. আর সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা যে কত ভীষণ আপনি জানেন কি?	وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاۤقَّةُ ؕ﴿۳﴾
৪. ছামূদ ও আ'দ সম্প্রদায় সে খটখটকারী বস্তু [কিয়ামত]-কে অবিশ্বাস করেছিল।	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ﴿۴﴾
৫. সুতরাং ছামূদ সম্প্রদায়কে এক ভীষণ ধ্বনি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।	فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ﴿۵﴾
৬. আর আ'দ সম্প্রদায়– তাদেরকে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছে।	وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۙ﴿۶﴾
৭. যে বায়ুকে আল্লাহ তা'আলা সাত রাত্র ও আট দিবস পর্যন্ত তাদের উপর একাধারে চাপিয়ে রেখেছিলেন। অতএব, তুমি ঐ সম্প্রদায়কে তাতে এমন ভূপাতিত দেখতে পেতে, যেন তারা উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডসমূহ।	سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلْحَاۤقَّةُ সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

২. مَا الْحَاۤقَّةُ কেমন সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

৩. وَمَاۤ اَدْرٰىكَ আর আপনি জানেন কি مَا الْحَاۤقَّةُ ই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা যে কত ভীষণ।

৪. كَذَّبَتْ অবিশ্বাস করেছিল ثَمُوْدُ وَعَادٌ ছামূদ ও আদ সম্প্রদায় بِالْقَارِعَةِ সেই খটখটকারী বস্তু [কিয়ামত] -কে।

৫. فَاَمَّا ثَمُوْدُ সুতরাং ছামূদ সম্প্রদায়কে فَاُهْلِكُوْا ধ্বংস করা হয়েছে بِالطَّاغِيَةِ এক ভীষণ ধ্বনি দ্বারা।

৬. وَاَمَّا عَادٌ আর আদ সম্প্রদায় فَاُهْلِكُوْا তাদেরকে বিধ্বস্ত করা হয়েছে بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা।

৭. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ যে বায়ুকে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর চাপিয়ে রেখেছিলেন سَبْعَ لَيَالٍ সাত রাত وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ও আট দিবস পর্যন্ত حُسُوْمًا একাধারে فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى অতএব, তুমি ঐ সম্প্রদায়কে এমন ভূপাতিত দেখতে পেতে كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ যেন তারা উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডসমূহ।

৮. সুতরাং তাদের কাউকেও কি তুমি অবশিষ্ট দেখতে পাও?	فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾
৯. আর ফেরাউন ও তার পূর্ববর্তী লোক এবং ওলট-পালটকৃত জনপদসমূহের, বাসিন্দারা জঘন্য জঘন্য অপরাধ করল।	وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾
১০. তারা স্বীয় প্রতিপালকের [পক্ষ হতে প্রেরিত] রাসূলের কথা মান্য করল না, অতএব, আল্লাহ তাদেরকে অতি কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন।	فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾
১১. যখন পানি স্ফীত হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে [অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী মুমিনদেরকে] নৌকায় আরোহণ করালাম।	اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾
১২. যেন আমি ঐ ব্যাপারকে তোমাদের জন্য একটি স্মরণীয় বস্তু করি, আর স্মরণকারী কর্ণ তাকে স্মরণ রাখে।	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿١٢﴾
১৩. অনন্তর যখন সিঙ্গায় একবার ফুৎকার দেওয়া হবে।	فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾
১৪. এবং জমিন ও পর্বতমালাকে [নিজ নিজ স্থান হতে] উত্তোলিত করা হবে, অতঃপর উভয়কে একেবারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে।	وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ﴿١٤﴾
১৫. তবে সেদিন সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সংঘটিত হবে।	فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾
১৬. এবং আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আর তা সেদিন সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ হয়ে যাবে।	وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴿١٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. فَهَلْ تَرٰى সুতরাং তুমি কি দেখতে পাও لَهُمْ তাদের কাউকে مِّنْ بَاقِيَةٍ অবশিষ্ট।

৯. وَجَآءَ فِرْعَوْنُ আর ফেরাউন করল وَمَنْ قَبْلَهٗ ও তার পূর্ববর্তী লোক وَالْمُؤْتَفِكٰتُ এবং ওলট-পালটকৃত জনপদ সমূহের বাসিন্দারা بِالْخَاطِئَةِ জঘন্য জঘন্য অপরাধ।

১০. فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ তারা স্বীয় রবের রাসূলের কথা মান্য করল না فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً অতএব আল্লাহ তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন।

১১. اِنَّا আমি لَمَّا طَغَا الْمَآءُ যখন পানি স্ফীত হয়েছিল حَمَلْنٰكُمْ তখন তোমাদেরকে আরোহণ করালাম فِي الْجَارِيَةِ নৌকায়।

১২. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ যেন আমি ঐ ব্যাপারকে করি তোমাদের জন্য تَذْكِرَةً একটি স্মরণীয় বস্তু وَّتَعِيَهَآ আর তাকে স্মরণ রাখে اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ স্মরণকারী কর্ণ।

১৩. فَاِذَا نُفِخَ অনন্তর যখন ফুৎকার দেওয়া হবে فِي الصُّوْرِ শিঙ্গায় نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ একবার ফুৎকার।

১৪. وَّحُمِلَتِ এবং উত্তোলিত করা হবে الْاَرْضُ জমিন وَالْجِبَالُ ও পর্বতমালাকে فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً অতঃপর উভয়কে একেবারেই চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলা হবে।

১৫. فَيَوْمَئِذٍ তবে সেই দিন وَّقَعَتِ সংঘটিত হবে الْوَاقِعَةُ অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

১৬. وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ এবং আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে فَهِيَ يَوْمَئِذٍ আর তা সেদিন হয়ে যাবে وَّاهِيَةٌ সম্পূর্ণ নিস্তেজ।

১৭. এবং ফেরেশতারা তার কিনারায় কিনারায় এসে পড়বে আর সেদিন আপনার প্রতিপালকের আরশকে আটজন ফেরেশতা বহন করে থাকবে।	وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ۭ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾
১৮. যেদিন তোমাদেরকে [হিসাবের জন্য] উপস্থিত করা হবে, তোমাদের কোনো বিষয় গোপন থাকবে না।	يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾
১৯. অনন্তর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সে ব্যক্তি তো বলবে : নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ।	فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾
২০. আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমার হিসাব-নিকাশ আমার সম্মুখীন হবে।	اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾
২১. সুতরাং সে সন্তোষজনক জীবন যাপন করবে।	فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾
২২. সুউচ্চ বেহেশতে।	فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾
২৩. যার ফলসমূহ ঝুঁকে থাকবে।	قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾
২৪. [নির্দেশ হবে যে,] সানন্দে খাও এবং পান কর ঐ সমস্ত কাজের বিনিময়ে– যা তোমরা বিগতকালে প্রতিদানের আশায় করেছিলে।	كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا এবং ফেরেশতাগণ তার কিনারায় কিনারায় এসে পড়বে وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ আর আপনার প্রতিপালকের আরশকে বহন করতে থাকবে فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ সেই দিন আটজন ফেরেশতা।

১৮. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ তোমাদের কোনো বিষয় গোপন থাকবে না।

১৯. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ অনন্তর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে فَيَقُوْلُ সে ব্যক্তি বলবে هَآؤُمُ নাও اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ আমার আমলনামা পড়ে দেখ।

২০. اِنِّيْ ظَنَنْتُ আমার বিশ্বাস ছিল যে, اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ আমার হিসাব নিকাশ আমার সম্মুখীন হবে।

২১. فَهُوَ সুতরাং সে فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ সন্তোষজনক জীবন যাপন করবে।

২২. فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ সুউচ্চ বেহেশতে।

২৩. قُطُوْفُهَا যার ফলসমূহ دَانِيَةٌ ঝুঁকে থাকবে।

২৪. كُلُوْا وَاشْرَبُوْا খাও এবং পান কর هَنِيْٓئًا সানন্দে بِمَآ اَسْلَفْتُمْ ঐ সমস্ত কাজের বিনিময় যা তোমরা করেছিলে فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ বিগতকালে প্রতিদানের আশায়।

২৫. আর যার আমলনামা তার বাম হস্তে দেওয়া হবে, তখন সে [আক্ষেপের সাথে] বলবে, কি উত্তম হতো যদি আমার আমলনামা আমাকে দেওয়াই না হতো।	وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾
২৬. আর আমি এটাও জানতে না পারতাম যে, আমার হিসাব-নিকাশ কী?	وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾
২৭. হায়, যদি [প্রথম] মৃত্যুই আমাকে নিঃশেষ করে দিত।	يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾
২৮. আমার ধন-সম্পদ আমার কোনোই কাজে আসল না।	مَاۤ اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾
২৯. আমার প্রতিপত্তি [-ও] আমা হতে বিলুপ্ত হয়েছে।	هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾
৩০. [এরূপ লোকদের সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হবে যে,] এ ব্যক্তিকে ধর এবং তাকে বেড়ি লাগিয়ে দাও।	خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿٣٠﴾
৩১. অতঃপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ কর।	ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ﴿٣١﴾
৩২. অতঃপর তাকে এমন একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর, যার পরিমাণ সত্তর গজ।	ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿٣٢﴾
৩৩. এই ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখত না।	اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ﴿٣٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ আর যার আমলনামা তার বাম হস্তে দেওয়া হবে فَيَقُوْلُ তখন সে আক্ষেপের সাথে বলবে يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ কি উত্তম হতো যদি আমার আমলনামা আমাকে দেওয়াই না হতো।

২৬. وَلَمْ اَدْرِ আর আমি এটাও জানতে না পারতাম مَا حِسَابِيَهْ যে আমার হিসাব নিকাশ কি?

২৭. يٰلَيْتَهَا হায় যদি كَانَتِ الْقَاضِيَةَ মৃত্যুই আমাকে নিঃশেষ করে দিত।

২৮. مَاۤ اَغْنٰى عَنِّيْ আমার কোনোই কাজে আসল না مَالِيَهْ আমার ধনসম্পদ।

২৯. هَلَكَ عَنِّيْ আমা হতে বিলুপ্ত হয়েছে سُلْطٰنِيَهْ আমার প্রতিপত্তি।

৩০. خُذُوْهُ এই ব্যক্তিকে ধর فَغُلُّوْهُ এবং তাকে বেড়ি লাগিয়ে দাও।

৩১. ثُمَّ অতঃপর الْجَحِيْمَ দোজখে صَلُّوْهُ তাকে নিক্ষেপ কর।

৩২. ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ অতঃপর এমন একটি শৃঙ্খলে ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا যার পরিমাণ সত্তর গজ فَاسْلُكُوْهُ তাকে আবদ্ধ কর।

৩৩. اِنَّهٗ كَانَ এই ব্যক্তি لَا يُؤْمِنُ ঈমান রাখত না بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ মহান আল্লাহর প্রতি।

অনুবাদ	আয়াত
৩৪. আর অভাবগ্রস্তদেরকে অন্নদানে উৎসাহ প্রদান করত না।	وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣٤﴾
৩৫. অতএব, আজ এখানে তার জন্য কোনো সহায় নেই।	فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং কোনো আহার্য বস্তুও নেই, ক্ষত নিঃসৃত পানি ব্যতীত।	وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿٣٦﴾
৩৭. যা মহাপাপীরা ব্যতীত আর কেউ ভক্ষণ করবে না।	لَّا يَأْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِـُٔوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. অতঃপর আমি ঐ সমস্ত বস্তুরও শপথ করছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ।	فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. আর ঐ সমস্ত বস্তুরও যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।	وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. এই কুরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতা কর্তৃক আনীত বাণী।	اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿٤٠﴾
৪১. এবং এটা কোনো কবির উক্তিও নয়, তোমরা অতি অল্পই ঈমান আনয়ন করছ।	وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾
৪২. আর এটা কোনো গণকের কথাও নয় তোমরা খুব কমই বুঝছ।	وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. [বরং এটা] সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ [বাণী]।	تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَلَا يَحُضُّ আর উৎসাহ প্রদান করত না عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ অভাবগ্রস্তদেরকে অন্ন দানে।

৩৫. فَلَيْسَ لَهُ অতএব তার জন্য নেই الْيَوْمَ আজ هٰهُنَا حَمِيْمٌ কোনো সহায়।

৩৬. وَّلَا طَعَامٌ এবং কোনো আহার্য বস্তুও নেই اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ক্ষত নিঃসৃত পানি ব্যতীত।

৩৭. لَّا يَأْكُلُهٗۤ যা আর কেউ ভক্ষণ করবে না اِلَّا الْخَاطِـُٔوْنَ মহাপাপীরা ব্যতীত।

৩৮. فَلَاۤ اُقْسِمُ অতএব আমি ঐ সমস্ত বস্তুর শপথ করতেছি بِمَا تُبْصِرُوْنَ যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ।

৩৯. وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ আর ঐ সমস্ত বস্তুর যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।

৪০. اِنَّهٗ এই কুরআন لَقَوْلُ আনীত বাণী رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ একজন সম্মানিত ফেরেশতা কর্তৃক।

৪১. وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ এবং এটা কোনো কবির উক্তি নয় قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ তোমরা অতি অল্পই ঈমান আনয়ন করছ।

৪২. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ আর এটা কোনো গণকের কথাও নয় قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ তোমরা খুব কমই বুঝছ।

৪৩. تَنْزِيْلٌ (বরং এটা) অবতীর্ণ বাণী مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।

৪৪. আর যদি ইনি আমার উপর কোনো [মিথ্যা] আরোপ করতেন।	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾
৪৫. তবে আমি তাঁর ডান হস্ত [দৃঢ়ভাবে] ধরতাম।	لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾
৪৬. অতঃপর তাঁর প্রাণ-শিরা কেটে ফেলতাম।	ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾
৪৭. অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই তার এ শাস্তি হতে রক্ষাকারী হতো না।	فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর নিঃসন্দেহে এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য নসিহত।	وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আর আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কতক লোক অবিশ্বাসীও রয়েছে।	وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾
৫০. এবং এ কুরআন কাফেরদের জন্য অনুতাপের কারণ।	وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾
৫১. আর এ কুরআন যথার্থ সুনিশ্চিত বাণী।	وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾
৫২. অতএব, স্বীয় সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا আর যদি তিনি আমার উপর আরোপ করতেন بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ কোনো (মিথ্যা) কথা।

৪৫. لَأَخَذْنَا তবে আমি ধরতাম مِنْهُ তার بِالْيَمِينِ ডান হস্ত।

৪৬. ثُمَّ لَقَطَعْنَا অতঃপর কেটে ফেলতাম مِنْهُ الْوَتِينَ তাঁর প্রাণ-শিরা।

৪৭. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ হতো না عَنْهُ حَاجِزِينَ এই শাস্তি হতে রক্ষাকারী।

৪৮. وَإِنَّهُ আর নিঃসন্দেহে এই কুরআন لَتَذْكِرَةٌ নসিহত لِلْمُتَّقِينَ মুত্তাকীদের জন্য।

৪৯. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ আর আমি জানি যে, أَنَّ مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে কতক লোক রয়েছে مُكَذِّبِينَ অবিশ্বাসীও।

৫০. وَإِنَّهُ এবং এই কুরআন لَحَسْرَةٌ অনুতাপের কারণ عَلَى الْكَافِرِينَ কাফেরদের জন্য।

৫১. وَإِنَّهُ আর এই কুরআন لَحَقُّ الْيَقِينِ যথার্থ সুনিশ্চিত বাণী।

৫২. فَسَبِّحْ অতএব পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন بِاسْمِ নামের رَبِّكَ الْعَظِيمِ স্বীয় সুমহান প্রতিপালকের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ সূরাটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে দু'টি রুকু এবং ৫২টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায় ২৫৬ টি বাক্য ও ১৪৮০ অক্ষর রয়েছে।

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরাটির নাম اَلْحَاقَّةُ রাখা হয়েছে সূরাটির প্রথম শব্দের দিকে লক্ষ্য করে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন اَلْحَاقَّةُ কিয়ামতের একটি নাম যার অর্থ অবশ্যম্ভাবী বা আবশ্যকীয় ঘটনা। আর এ

নামকরণের কারণ হলো, কিয়ামতের দিনই সকল প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কবাণীর সঠিক বাস্তবায়ন হবে। কিয়ামত ধ্রুব সত্য এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। অথবা এ নামকরণের কারণ এও হতে পারে যে, কিয়ামতের দিনই সকল বিষয়ের সঠিক তাৎপর্য জানা যাবে। সেদিনই সকল আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। এ সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ' এবং ৫২টি আয়াত, ২৫৬টি বাক্য ও ১৪৮০টি অক্ষর রয়েছে।-[নূরুল কুরআন]

নাজিল হওয়ার সময়কাল : আল-কুরআনের এ সূরাটি ওহী অবতীর্ণের প্রাথমিক পর্বে নাজিলকৃত সূরা সমূহের মধ্যে পরিগণিত। তবে কখন অবতীর্ণ হয়, তা সঠিক করে কিছু বলা যায় না; কিন্তু হযরত ওমর (রা.)-এর একটি বর্ণনা হতে জানা যায় যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণের অনেক পূর্বেই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। বর্ণনা টি হলো এই– হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জ্বালা-যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর হতে বের হলাম। আমি গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি হেরেমের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং নামাজে দাঁড়িয়ে গেছেন। আমি গিয়ে শুনতে পেলাম যে, তিনি সূরা আল-হাক্কাহ্ পাঠ করছেন। আমি কুরআনের বাচন-ভঙ্গি ও বাক্য-বিন্যাসের মধুরতা ছন্দের ঝংকার শ্রুত হয়ে অভিভূত হলাম এবং মনে মনে বললাম– ইনি নিশ্চয় একজন উন্নত শ্রেণির কবি হবেন, নতুবা এমনি মোহনীয় ছন্দের বাক্য আর কে-ই বা রচনা করতে পারে। কুরাইশগণ তো এটাই বলে থাকেন। তখনই মহানবীর কণ্ঠে শুনতে পেলাম 'এটা এক মহাসম্মানিত বার্তাবাহকের বণী, কোনো কবির বাক্য নয়।' আমি মনে মনে বললাম, কবি না হবেন তো গণকঠাকুরের কথা অবশ্যই হবে। আর তখনই তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো 'এটা কোনো গণকঠাকুরের কথা নয়।' তোমরা চিন্তা-ভাবনা খুব কমই কর। এটা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। এটা শুনার ফলে তো ইসলাম আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। -[মুসনাদে আহমদ]

হযরত ওমর (রা.)-এর এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এ সূরাটি তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই অবতারিত। কেননা এ ঘটনার পরও বহুদিন পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার প্রথম রুকূ'তে কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কীয় আলোচনা এবং দ্বিতীয় রুকূ'তে কুরআন আল্লাহর অবিসংবাদিত মহাসত্য কালাম এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে।

সূরার ১-১২নং আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী ঘটিতব্য বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কিয়ামতের অস্বীকারকারী প্রাচীন আদ, ছামূদ ও ফেরাউনের সম্প্রদায়সমূহকে এ অবিশ্বাসের কারণে ধ্বংস করার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

১৩-১৭নং আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত কিভাবে সংঘটিত হবে, তার বাস্তব চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। অতঃপর ১৮-৩৭নং আয়াত পর্যন্ত মূল বিষয়টি বলে দেওয়া হয়েছে। তা হলো, পার্থিব জীবনের পর পরকালীন অনন্ত জীবন। এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর সকল মানুষ হিসাব-নিকাশ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে সমবেত হবে। এই পার্থিব জগতে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি; কিয়ামত, হাশর-নশর ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্মশীল জীবন যাপন করেনি তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তথায় জ্বালাময়ী শাস্তি ও অসম্মানজনক খাদ্য আহার প্রদান করা হবে। তখন কারো কোনো আমল গোপন করা হবে না। সকলের গোপন কথাই তুলে ধরা হবে এবং মু'মিনগণকে ডান হস্তে ও কাফেরগণকে বাম হস্তে আমলনামা দেওয়া হবে। মু'মিনগণ চিরন্তন-শাশ্বত, সুখ-সমৃদ্ধি ও আনন্দমুখর জীবন যাপন করবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করেনি, তাদেরকে আল্লাহর আজাব হতে কেউ রেহাই দিতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত চিরন্তন জাহান্নামই হবে তাদের স্থান।

৩৮-৫২নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিষয় আলোচনা রেখেছেন। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, কুরআন এক সম্মানিত বার্তাবাহকের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। এটা কোনো কবির রচিত কবিতার চরণ নয় এবং কোনো গণকঠাকুরের বলা কাহিনীও নয়; বরং বিশ্ব-পালকের নিকট হতে অবতারিত কিতাব। রাসূল ﷺ যদি নিজ পক্ষ হতে কিছু রচনা করে তা আমার নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত, তবে কঠোর হস্তে তা দমন করা হতো। তোমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না। এ কুরআন হচ্ছে আল্লাহভীরু লোকদের জন্য উপদেশ ভাণ্ডার বিশেষ। তোমাদের মধ্যে কিছু কিন্তু লোক আছে, যারা কুরআনকে অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরকে ভালোভাবেই জানি। এ কুরআনই হবে কাফেরদের জন্য পরকালে অনুশোচনার কার্যকারণ। এ কুরআন এক মহাসত্য আল্লাহর কালাম। সুতরাং হে নবী! আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসায় ও গুণগানে মশগুল থাকুন। কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় নবী কারীম ﷺ -এর রেসালাতের সত্যতার প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। অহংকার এবং নাফরমানির শোচনীয় পরিণতির কথাও বলা হয়েছে। আর এ সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ

স্থান পেয়েছে। ইতঃপূর্বে যেসব জাতি আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তাও বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য সূরায়। –[নূরুল কুরআন]

সূরাটির ফজিলত : অত্র সূরার বিভিন্ন ফজিলত তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন–

১. যদি কারো কেবল গর্ভ বিনষ্ট হয়ে যায় কোনো প্রকারেই রোধ করা যায় না। তখন কোনো বুজুর্গ ব্যক্তির মাধ্যমে অত্র সূরা লিখে গর্ভধারণকারিণীর সাথে তাবিজ বানিয়ে ব্যবহার করলে ইনশাআল্লাহ তার গর্ভ নষ্ট হবে না, সুস্থ-নিরাপদ থাকবে। –[আ'মালে কুরআনী]

২. মায়ের গর্ভ থেকে কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যদি অত্র সূরা তেলাওয়াত করে ফুঁক দেওয়া পানি শিশুকে খাইয়ে দেওয়া যায়, অথবা এক ফোঁটা কেবল মুখে দেওয়া যায়, তখন ঐ বাচ্চার স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে [আ'মলে কুরআনী] এবং সকল প্রকার বিপদাপদ ও অসুস্থতা হতে রেহাই পাবে। এটার সংখ্যা ৮১৭০৯।

وَلِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ

আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত বুরাইদা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ একদা হযরত আলী (রা.) -কে বলেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন, আমি তোমাকে যেন আমার নিকটে রাখি, তোমাকে যেন দূর করে না রাখি। সংরক্ষণ রাখাও আল্লাহর দায়িত্ব। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[দূররে মানছুর ১৬০/৬, তাবারী ২১৩/১২, কুরতুবী ২৩০/১৮, ইবনে কাছীর ৪১৩/৪, ফতহুল কাদীর ২৮২/৫]

এই সূরায় কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলি ও পাপাচারীদের শাস্তি এবং মুমিন খোদাভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। কুরআন পাকে কেয়ামতকে হাককা, কারিয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। حَاقَّة শব্দের এক অর্থ সত্য এবং দ্বিতীয় অর্থ অপরাপর বিষয়কে সত্য প্রতিপন্নকারী। কেয়ামতের জন্যে এই শব্দটি উভয় অর্থে খাটে। কেননা কেয়ামত নিজেও সত্য, এর বাস্তবতা প্রমাণিত ও নিশ্চিত এবং কেয়ামত মুমিনদের জন্যে জান্নাত এবং কাফেরদের জন্যে জাহান্নাম প্রতিপন্ন করে। এখানে কেয়ামতের এই নাম উল্লেখ করে বার বার প্রশ্ন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেয়ামত সকল প্রকার অনুমানের উর্ধ্বে এবং বিস্ময়করুরূপে ভয়াবহ।

قَارِعَةٌ শব্দের অর্থ খট খট শব্দকারী। কেয়ামত যেহেতু সব মানুষকে অস্থির ও ব্যাকুল করে দিবে এবং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ছিন্নবিছিন্ন করে দিবে তাই একে قَارِعَةٌ বলা হয়েছে। طَاغِيَة শব্দটি طُغْيَانٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। উদ্দেশ্য এমন কঠোর শব্দ, যা সারা দুনিয়ার শব্দসমূহের সীমার বাইরে ও বেশি মানুষের মন ও মস্তিষ্ক এই শব্দ বরদাশত করতে পারে না। সামুদ গোত্রের অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের উপর এই শব্দের আকারেই আজাব এসেছিল। এতে সারা বিশ্বের বজ্রনিনাদ ও সারা বিশ্বের শব্দসমূহের সমষ্টি সন্নিবেশিত ছিল। ফলে তাদের হৃদপিণ্ড ফেটে গিয়েছিল।

رِيحٍ صَرْصَرٍ : এর অর্থ অত্যধিক শৈত্যসম্পন্ন প্রচণ্ড বাতাস।

سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمٰنِيَةَ أَيَّامٍ : এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, বুধবারের সকাল থেকে এই ঝঞ্ঝাবায়ুর আজাব শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এভাবে দিন আটটি ও রাত্রি সাতটি হয়েছিল। حُسُومًا শব্দটি حَاسِمٌ এর বহুবচন। এর অর্থ একাধারে, অবিরাম।

مُؤْتَفِكَاتُ এ অর্থ পরস্পরের মিশ্রিত ও মিলিত। হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহকে مُؤْتَفِكَاتُ বলা হয়েছে। এর এক কারণ এই যে, তাদের বস্তিগুলো পরস্পরে মিলিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আজাব আসার পর তাদের বস্তিগুলো তছনছ হয়ে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ : তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে صُور শিং-এর আকারে কোনো বস্তুকে বলা হয়। কেয়ামতের দিন এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ এর অর্থ হঠাৎ একযোগে এই শিংগার আওয়াজ শুরু হবে এবং সবার মৃত্যু পর্যন্ত একটানা আওয়াজ অব্যাহত থাকবে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা কেয়ামতে শিংগার দুটি ফুৎকার প্রমাণিত আছে। প্রথম ফুৎকারকে نَفْخَة صَعْق বলা হয়। এসম্পর্কে কুরআনে আছে, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ : অর্থাৎ এই ফুৎকারের ফলে আকাশের অধিবাসী ফেরেশতা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী মানব, জিনও সমস্ত জীব-জন্তু অজ্ঞান হয়ে যাবে। (অতঃপর এই অজ্ঞান অবস্থায় সাবার মৃত্যু ঘটবে।) দ্বিতীয় ফুৎকারকে نَفْخَة بَعْث বলা হয়। শব্দের بَعْث অর্থ উঠা। এই ফুৎকারের মাধ্যমে সকল মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এ সম্পর্কে কুরআনে আছে, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ –অর্থাৎ পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। ফলে অকস্মাৎ সব মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দেখতে থাকবে।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এই দুই ফুৎকারের পূর্বে তৃতীয় একটি ফুৎকারের উল্লেখ আছে। এর নাম نَفْخَةَ فَزَعٍ কিন্তু রেওয়ায়েতের সমষ্টিতে চিন্তা করলে জানা যায় যে, এটা প্রথম ফুৎকারই। শুরুতে একে نَفْخَةَ فَزَعٍ বলা হয়েছে এবং পরিণামে এটাই نَفْخَةَ صَعْقٍ হয়ে যাবে। –(মাযহারী)

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ : অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার আরশকে বহন করবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, কেয়ামতের পূর্বে চার জন ফেরেশতা এই দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। কেয়ামতের দিন তাদের সাথে আরও চার জন মিলিত হবে।

আল্লাহ তা'আলার আরশ কি? এর স্বরূপ ও প্রকৃত আকার-আকৃতি কি? ফেরেশতারা কিভাবে একে বহন করছে? এসব প্রশ্নের সমাধান মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি দিতে পারে না এবং এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করার অনুমতি নেই। এ ধরনের যাবতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য সত্য এবং স্বরূপ অজ্ঞাত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ : অর্থাৎ সেদিন সবাই পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হবে। কোনো আত্মগোপনকারী আত্মগোপন করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে আজ দুনিয়াতেও কেউ আত্মগোপন করতে পারে না। সেই দিনের বিশেষত্ব সম্ভবত এই যে, হাশরের ময়দানে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ সবটি সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হবে। গর্ত, পাহাড় ঘর-বাড়ি, বৃক্ষ ইত্যাদি আড়াল বলতে কিছুই থাকবে না। দুনিয়াতে এসব বস্তুর পশ্চাতে আত্মগোপনকারীরা আত্মগোপন করে। কিন্তু সেখানে কিছুই থাকবে না। ফলে কেউ আত্মগোপন করার জায়গা পাবে না।

هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ : هَاؤُمُ–শব্দের অর্থ নাও। উদ্দেশ্য এই যে, যার আমলনামা ডান হাতে আসবে, সে আহলাদে আটখানা হয়ে আশেপাশের লোকজনকে বলবে : নাও, আমার আমলনামা পাঠ করে দেখ।

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ : سُلْطَانٌ – শব্দের অর্থ ক্ষমতা ও আধিপত্য। তাই রাষ্ট্রকে সুলতানাত এবং রাষ্ট্রনায়ককে সুলতান বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে অন্যদের উপর আমার ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল। আমি সবার বড় একজন। আজ সেই রাজত্ব ও প্রাধান্য কোনো কাজে আসল না। سُلْطَانٌ –এর অপর অর্থ প্রমাণ, সনদও হতে পারে। তখন অর্থ হবে, হায়! আজ আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার হাতে কোনো সনদ নেই।

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ : অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে : এই অপরাধীকে ধর এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, এই আদেশ উচ্চারিত হলে সব প্রাচীর ইত্যাদি সব বস্তু তাকে ধরার জন্যে দৌড় দিবে।

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ : অতঃপর তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে গ্রথিত করে দাও। শৃঙ্খলিত করার অর্থও রূপকভবে নেওয়া যায়। কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে মোতি অথবা তাসবীহর দানা গ্রথিত করার ন্যায় শিকল দেহে বিদ্ধ করে অপর দিক থেকে বের করে দেওয়া। কোনো কোনো হাদীসে এই আক্ষরিক অর্থেরও সমর্থন আছে। –(মাযহারী)

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ : حَمِيمٌ এর অর্থ সুহৃদ। غِسْلِينٌ সেই পানি, যা দ্বারা জাহান্নামীদের ক্ষতের পুঁজ ইত্যাদি ধৌত করা হবে। আয়াতের অর্থ এই যে, আজ তার কোনো সুহৃদ তাকে কোনোরূপ সাহায্য করতে পারবে না এবং আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার খাদ্য জাহান্নামীদের ক্ষত ধৌত নোংরা পানি ব্যতীত কিছু হবে না। "কিছু হবে না" এর অর্থ এই বলা হয়েছে যে, কোনো সুখাদ্য হবে না। ক্ষত ধৌত পানির অনুরূপ অন্য কোনো নোংরা খাদ্য হতে পারবে; যেমন অন্য আয়াতে জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ : অর্থাৎ সেইসব বস্তুর শপথ, যা তোমরা দেখ অথবা দেখতে পার এবং যা তোমরা দেখ না ও দেখতে পার না। এতে সমগ্র সৃষ্টি এসে গেছে। কেউ কেউ বলেন : 'যা দেখনা' বলে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : যা দেখ বলে দুনিয়ার বস্তুসমূহ এবং 'যা দেখ না' বলে পরকালের বিষয়সমূহ বোঝানো হয়েছে। –(মাযহারী)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا : تَقَوُّلٌ শব্দের অর্থ কথা রচনা করা। وَتِينٌ হৃদয় থেকে নির্গত সেই শিরাকে বলা হয়, যার মাধ্যমে আত্মা মানবদেহে বিস্তার লাভ করে। এই শিরা কেটে দিলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়ে যায়।

কাফেরদের কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবি এবং তাঁর কালামকে কবিতা, কেউ তাঁকে অতীন্দ্রিয়বাদী এবং তাঁর কালামকে অতীন্দ্রিয়বাদ বলত। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের এসব অনর্থক ধারণা খণ্ডন করা হয়েছিল। كَاهِنٌ তথা অতীন্দ্রিয়বাদী এমন ব্যক্তিকে বলা হয়; যে শয়তানদের কাছ থেকে কিছু সংবাদ পেয়ে এবং কিছু নক্ষত্রবিদ্যার মাধ্যমে জেনে নিয়ে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি সম্পর্কে আনুমানিক কথাবার্তা বলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যারা কবি অথবা অতীন্দ্রিয়বাদী বলত, তাদের দোষারোপের সারমর্ম ছিল এই যে, তিনি যে কালাম শুনান, তা আল্লাহর কালাম নয়। তিনি নিজেই নিজের কল্পনা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদীদের ন্যায় শয়তানদের কাছ থেকে কিছু কথাবার্তা সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোকে আল্লাহর কালাম বলে

প্রচার করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অন্য এক পন্থায় অত্যন্ত জোরেসোরে খণ্ডন করেছেন যে, যদি রাসূল আমার নামে মিথ্যা কথা রচনা করতো, তবে আমি কি তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতাম এবং তাঁকে মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার সুযোগ দিতাম? কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করতে পারে না। তাই আয়াতে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে : যদি এই রাসূল একটি কথাও আমার নামে মিথ্যা রচনা করতো, তবে আমি তার ডান হাত ধরে তার প্রাণশিরা কেটে দিতাম। এরপর আমার শাস্তির কবল থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। এখানে এই কঠোর ভাষা মূর্খ কাফিরদেরকে শুনানোর জন্য অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে। ডান হাত ধরার কথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, কোনো অপরাধীকে হত্যা করার সময় হত্যাকারী তার বিপরীতে দণ্ডায়মান হয়। ফলে হত্যাকারীর বাম হাতের বিপরীতে থাকে অপরাধীর ডান হাত। হত্যাকারী নিজের বাম হাত দিয়ে অপরাধীর ডান হাত ধরে নিজের ডান হাত দ্বারা তাকে হামলা করে।

এ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ না করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার নামে কোনো মিথ্যা কথা প্রচার করলে তাঁর সাথে এরূপ ব্যবহার করা হতো। এখানে কোনো সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়নি যে, যে ব্যক্তিই মিথ্যা নবুয়ত দাবি করবে তাকে সর্বদা ধ্বংসই করা হবে। এ কারণেই দুনিয়াতে অনেকেই মিথ্যা নবুয়ত দাবি করেছে; কিন্তু তাদের উপর এরূপ কোনো আজাব আসেনি।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ : এর আগে আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু বলেন না। তিনি আল্লাহর কালামই বলেন। এই কালাম আল্লাহভীরুদের জন্যে উপদেশ। কিন্তু আমি একথাও জানি যে, এসব অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়াদি জানা সত্ত্বেও অনেক লোক মিথ্যারোপ করতে থাকবে। এর পরিণাম হবে পরকালে তাদের অনুশোচনা ও সার্বক্ষণিক আজাব। অবশেষে বলা হয়েছে ঃ وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ –অর্থাৎ এটা পুরোপুরি সত্য ও নিশ্চিত। এতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ এত ইঙ্গিত আছে যে, আপনি এই হঠকারী কাফেরদের কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না এবং দুঃখিতও হবেন না; বরং আপনার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণায় নিজেকে নিয়োজিত করুন। এটাই সব দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়। অন্য এক আয়াতে এর অনুরূপ বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ : অর্থাৎ আমি জানি আপনি কাফেরদের অর্থহীন কথাবার্তায় মনঃক্ষুণ্ন হন। এর প্রতিকার এই যে, আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসায় মশগুল হয়ে যান এবং সেজদাকারীদের দলভুক্ত হয়ে যান। কাফেরদের কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। আবূ দাউদে হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেন, যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ আয়াতখানি নাজিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এতে তোমাদের রুকুতে রাখ। অতঃপর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى আয়াতখানি নাজিল হয়, তখন তিনি বললেন ঃ একে তোমাদের সেজদায় রাখ। এ কারণেই সর্বসম্মতভাবে রুকু ও সেজদায় এই দু'টি তাসবীহ পাঠ করা হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে এগুলো তিন বার পাঠ করা সুন্নত। কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

- حَاقَّةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ - ضَرَبَ মাসদার حَقًّا - حُقُوْقًا মূলবর্ণ (ح - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। সত্যবাদী, কিয়ামত দুর্যোগ।
- قَارِعَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْقَرْعُ মূলবর্ণ (ق – ر – ع) জিনস صحيح অর্থ– খটখটকারী বস্তু, অকস্মিক বিপদ, মসিবত।
- عَاتِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার عَتُوٌّ মূলবর্ণ (ع – ت – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– প্রচণ্ড, হাতছাড়া হওয়া, নাগালের বাইরে যাওয়া।
- صَرْعٰى : শব্দটি বহুবচন ; একবচন صَرِيْعٌ অর্থ– ভূপাতিত। ধরাশায়ী। পরাভূত। নিহত।
- اَعْجَازٌ : বহুবচন : একবচনে عَجُزٌ অর্থ– কাণ্ডসমূহ, গাছের শিকর, অপারাগতা।
- خَاوِيَةٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার خَوَاءٌ মূলবর্ণ (خ – و – ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– উৎপাটিত, উজার, পতিত, নির্জন, শূন্য, খালি।

مُؤْتَفِكَاتُ : সীগাহ جمع مؤنث اسم فاعل বহছ– উদ্দেশ্য হযরত লূত (আ.)-এর কওমের জনপদ বা লোকালয়, যেটি মৃত সাগরের উপকূলবর্তী এলাকা যার রাজধানী বা বড় শহর হলো সুদুম বা সানদুম। বর্তমানে এটি সিরিয়ার একটি এলাকা।

رَابِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث اسم فاعل বহছ অর্থ– টিলা, পাহাড়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বেশি, অধিক। رُبُوٌ হতে নির্গত। অর্থ– বেড়ে উঠা/বৃদ্ধি পাওয়া। পুংলিঙ্গ رَابِيٌ বা رَابٍ।

تَعِيَهَا : সীগাহ واحد مؤنث غائب مضارع معروف منصوب بلام كى বহছ ضَرَبَ বাব وَعْيٌ মাসদার মূলবর্ণ (و - ع - ى) জিনস لفيف مفروق ; ها যমীর মাফউল। অর্থ– সে তাকে স্মরণ রেখেছে। মনে রেখেছে। খেয়াল রেখেছে।।

دُكَّتَا : সীগাহ تثنيه مؤنث غائب ماضى مجهول -বহছ نَصَرَ বাব دَكٌّ মাসদার- মূলবর্ণ (د - ك - ك) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদের উভয়কে ভেঙে দিয়েছে। চূর্ণ করে দিয়েছে, সমান করা, সমতল করা, ধ্বংস করা, ভেঙে দেওয়া, চূর্ণ করা।

وَاهِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث اسم فاعل বহছ سَمِعَ، فَتَحَ বাব وَهْيٌ মাসদার মূলবর্ণ (و - ه - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– দুর্বল, কৃশ, জীর্ণ, নগণ্য, তুচ্ছ, চামড়ার থলি ফেঁটে যাওয়া, রশির বাঁধন ঢিলা হয়ে যাওয়া। মেঘ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া। পতিত হওয়া। প্রাচীর ধসে পড়ার উপক্রম হওয়া।

لَمْ اَدْرِ : সীগাহ واحد متكلم مضارع منفى بلم বহছ ضَرَبَ বাবে دِرَايَةٌ মাসদার মূলবর্ণ (د - ر - ى) জিনস ناقص يائى মূলতঃ শব্দটি اَدْرِىْ ছিল। لم এর কারণে ياء পড়ে গেছে। অর্থ– আমি জানি না।; অর্থ– কোনো বিষয়ে সম্পর্কে জানা, অবগত করা।

أَرْجَائِهَا : বহুবচন, একবচনে رَجَاءٌ অর্থ– কিনারায়। আশা, আকাঙ্ক্ষা। প্রত্যাশা। কামনা।

غُلُّوْهُ : সীগাহ جمه مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ نَصَرَ বাব غَلٌّ মাসদার মূলবর্ণ (غ - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাকে বেড়ি লাগিয়ে দাও। দৃঢ়করে বাঁধো।

صَلُّوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ تَفْعِيل বাব تَصْلِيَةٌ মাসদার মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাকে নিক্ষেপ কর। প্রবেশ করাও।

اُسْلُكُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ نَصَرَ বাব سُلُوْكٌ মাসদার মূলবর্ণ (س - ل - ك) জিনস صحيح ; ه যমীর মাফউল। তাকে প্রবেশ করাও। চলা, প্রবেশ করা।।

تَقَوَّلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى معروف বহছ تَفَعُّلٌ বাবে تَقَوُّلٌ মাসদার মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে বানিয়েছে। তৈরি করেছে। রচনা করেছে। নিজের থেকে কোনো কথা বলে তা অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করাকে تَقَوُّلَ বলা হয়।

اَقَاوِيْلَ : জমা মুনতাহাল জুমূ', اَقْوَالٌ এর বহুবচন। আর اَقْوَالٌ হলো قَوْلٌ এর বহুবচন। অর্থ– কথাসমূহ।

حَاجِزِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ অর্থ– বিদ্বেষী, শত্রুতা পোষণকারী, ঘৃণাকারী। মাসদার حَجْزٌ দুটি জিনিসের মধ্যে আঁড় দ্বারা বাঁধা সৃষ্টি করা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

غِسْلِيْنٌ : অর্থ- ক্ষত নিংসৃত পানি। পুঁজ। অত্যন্ত গরম পানি। জাহান্নামের বৃক্ষ।

اَلْوَتِيْنٌ : একবচন, বহুবচন وُتُنٌ অর্থ– প্রাণ শিরা, হৃদপিণ্ডের ধমনী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ : এখানে كَذَّبَتْ ফে'ল ثَمُوْدُ হলো ফায়েল। আর عَادٌ টা ثَمُوْدُ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর بِالْقَارِعَةِ টা كَذَّبَتْ-এর সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৪৫]

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ : এখানে فاء টি فصيحية আর سَبِّحْ হলো ফে'ল بِاسْمِ رَبِّكَ হলো سَبِّحْ-এর সাথে متعلق আর الْعَظِيْمِ হলো رَبِّكَ-এর نعت –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৬২]

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ

সূরা মা'আরিজ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪৪, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ	আয়াত
১. এক আবেদনকারী সে আজাব সংঘটিত হওয়ার আবেদন করল যা সংঘটিত হবে।	سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍۙ (١)
২. কাফেরদের উপর, যার কোনো প্রতিরোধকারী নেই।	لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌۙ (٢)
৩. যা আল্লাহর পক্ষ হতে ঘটবে, যিনি ধাপসমূহের [আসমানসমূহের] অধিপতি।	مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِؕ (٣)
৪. ফেরেশতাগণ ও আত্মাসমূহ তাঁর সমীপে আরোহণ করে যায়, এমন দিনে [আজাব সংঘটিত হবে] যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।	تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍۚ (٤)
৫. অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং এমন ধৈর্য যাতে কোনো প্রকার অভিযোগের নামও না থাকে।	فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا (٥)
৬. এরা ঐ দিনকে বহু দূরবর্তী মনে করছে।	اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًاۙ (٦)
৭. কিন্তু আমি তাকে দেখছি, অতি নিকটবর্তী।	وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًاؕ (٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

১. سَاَلَ আবেদন করল سَآئِلٌ এক আবেদনকারী بِعَذَابٍ সে আজাব সম্বন্ধে وَّاقِعٍ যা সংঘটিত হবে।

২. لِّلْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের উপর لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ যার কোনো প্রতিরোধকারী নেই।

৩. مِّنَ اللّٰهِ যা আল্লাহর পক্ষ হতে ঘটবে ذِى الْمَعَارِجِ যিনি ধাপসমূহের অধিপতি।

৪. تَعْرُجُ আরোহণ করে যায় الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ وَالرُّوْحُ ও আত্মাসমূহ اِلَيْهِ তাঁর সমীপে فِىْ يَوْمٍ এমন দিনে كَانَ مِقْدَارُهٗ যার পরিমাণ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ পঞ্চাশ হাজার বছর।

৫. فَاصْبِرْ অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন صَبْرًا جَمِيْلًا এবং এমন ধৈর্য যাতে কোনো প্রকার অভিযোগের নামও না থাকে।

৬. اِنَّهُمْ এরা يَرَوْنَهٗ ঐ দিবসকে মনে করছে بَعِيْدًا বহু দূরবর্তী।

৭. وَّنَرٰىهُ কিন্তু আমি তাকে দেখছি قَرِيْبًا অতি নিকটবর্তী।

৮. যেদিন আসমান গলিত ধাতুর ন্যায় হয়ে যাবে।	يَوْمَ تَكُونُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾
৯. আর পর্বতসমূহ রঙ্গিন [ধুনিত] পশমের ন্যায় হয়ে যাবে।	وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾
১০. আর কোনো বন্ধু কোনো বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করবে না।	وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾
১১. যদিও তাদের একের সাথে অন্যকে দেখা-সাক্ষাৎ করানো হবে; অপরাধী এই চাইবে সেদিনের আজাব হতে অব্যাহতির জন্য মুক্তিপণস্বরূপ স্বীয় পুত্রগণকে	يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾
১২. এবং স্বীয় পত্নী ও ভাইকে,	وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾
১৩. এবং পরিবারবর্গকে যাদের মধ্যে সে বাস করত।	وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُـْٔوِيهِ ﴿١٣﴾
১৪. এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত অধিবাসীদেরকে, যাতে তা [ঐ মুক্তিপণ] তাকে মুক্তি দেয়।	وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾
১৫. এটা কখনো হবে না। সে অগ্নি এমন জ্বলন্ত অগ্নি।	كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾
১৬. যা চর্ম পর্যন্ত খসিয়ে ফেলবে।	نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾
১৭. তা [অগ্নি] সে ব্যক্তিকে ডাকবে, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত এবং মুখ ফিরিয়ে থাকত।	تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. يَوْمَ যেদিন تَكُونُ السَّمَآءُ আসমান হয়ে যাবে كَالْمُهْلِ গলিত ধাতুর ন্যায়।

৯. وَتَكُونُ الْجِبَالُ আর পর্বতসমূহ হয়ে যাবে كَالْعِهْنِ রঙ্গিন পশমের ন্যায়।

১০. وَلَا يَسْـَٔلُ আর জিজ্ঞাসাও করবে না حَمِيمٌ حَمِيمًا কোনো বন্ধু কোনো বন্ধুকে।

১১. يُبَصَّرُونَهُمْ যদিও তাদের একের সাথে অন্যকে দেখা-সাক্ষাৎ করানো হবে يَوَدُّ الْمُجْرِمُ অপরাধী এই চাইবে لَوْ يَفْتَدِي অব্যাহতির জন্য মুক্তিপণস্বরূপ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ সেদিনের আজাব হতে بِبَنِيهِ স্বীয় পুত্রগণকে।

১২. وَصَاحِبَتِهِ এবং স্বীয় পত্নী وَأَخِيهِ ও ভাইকে।

১৩. وَفَصِيلَتِهِ এবং পরিবারবর্গকে الَّتِي تُـْٔوِيهِ যাদের মধ্যে সে বাস করত।

১৪. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত অধিবাসীদেরকে ثُمَّ يُنْجِيهِ যাতে তা তাকে মুক্তি দেয়।

১৫. كَلَّا এটা কখনো হবে না إِنَّهَا لَظَىٰ সে অগ্নি এমন জ্বলন্ত অগ্নি।

১৬. نَزَّاعَةً যা খসিয়ে ফেলবে لِلشَّوَىٰ চামড়া পর্যন্ত।

১৭. تَدْعُو তা ডাকবে সেই ব্যক্তিকে مَنْ أَدْبَرَ যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত وَتَوَلَّىٰ এবং মুখ ফিরিয়ে থাকত।

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
১৮. এবং ধন সঞ্চয় করত। অতঃপর তাকে সংরক্ষণ করত।	وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾
১৯. নিশ্চয় মানুষকে দুর্বলমনা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।	إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾
২০. যখন তাকে দুঃখ স্পর্শ করে, তখন সে হায়-হুতাশ করতে থাকে।	إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾
২১. আর যখন সে সচ্ছল হয়, তখন কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে।	وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾
২২. কিন্তু সেই নামাজিরা ব্যতীত	إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾
২৩. যারা স্বীয় নামাজে সর্বদা রত থাকে।	الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. এবং যাদের ধন সম্পদে হক নির্ধারিত রয়েছে।	وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾
২৫. যাচঞাকারী ও বঞ্চিততের জন্য।	لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾
২৬. এবং যারা কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে।	وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾
২৭. আর যারা স্বীয় প্রতিপালকের আজাবকে ভয় করে।	وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের আজাব নির্ভয়ের বস্তু নয়।	إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَجَمَعَ এবং ধন সঞ্চয় করত فَأَوْعَىٰ অতঃপর তাকে সংরক্ষণ করত।

১৯. إِنَّ الْإِنسَانَ নিশ্চয় মানুষকে خُلِقَ সৃষ্টি করা হয়েছে هَلُوعًا দুর্বলমনা।

২০. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ যখন তাকে দুঃখ স্পর্শ করে جَزُوعًا তখন সে হায়-হুতাশ করতে থাকে।

২১. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ আর যখন সে সচ্ছল হয় مَنُوعًا তখন কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে।

২২. إِلَّا الْمُصَلِّينَ কিন্তু সেই নামাজিরা ব্যতীত।

২৩. الَّذِينَ هُمْ যারা عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ স্বীয় নামাজে دَائِمُونَ সর্বদারত থাকে।

২৪. وَالَّذِينَ এবং যাদের فِي أَمْوَالِهِمْ ধন সম্পদে রয়েছে حَقٌّ مَّعْلُومٌ হক নির্ধারিত।

২৫. لِّلسَّائِلِ যাচঞাকারী وَالْمَحْرُومِ ও বঞ্চিতদের জন্য।

২৬. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ এবং যারা বিশ্বাস রাখে بِيَوْمِ الدِّينِ কিয়ামত দিবসের প্রতি।

২৭. وَالَّذِينَ هُم আর যারা مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ স্বীয় প্রতিপালকের আজাবকে مُّشْفِقُونَ ভয় করে।

২৮. إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের আজাব غَيْرُ مَأْمُونٍ নির্ভয়ের বস্তু নয়।

২৯. আর যারা স্বীয় লজ্জার স্থানসমূহকে সংরক্ষণকারী হয়।	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. তাদের পত্নীগণের সাথে অথবা স্বীয় ক্রীতদাসীদের সাথে ব্যতীত, কেননা তাদের প্রতি [তাতে] কোনো দোষারোপ নেই।	اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. কিন্তু যারা তাদের ব্যতীত [অপর স্থানে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে] প্রয়াসী হয়, তবে এরূপ লোকই সীমা অতিক্রমকারী।	فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٣١﴾
৩২. আর যারা স্বীয় আমানতসমূহ ও স্বীয় অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে।	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আর যারা নিজেদের সাক্ষ্যসমূহ ঠিক ঠিক প্রদান করে।	وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আর যারা স্বীয় [ফরজ] নামাজসমূহের [যথাযথভাবে] পাবন্দি করে।	وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. তারা সসম্মানে বেহেশতে প্রবেশ করবে।	اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. সুতরাং কাফেরদের কি হলো যে, তারা [এই সমস্ত বিষয় জেনে নেওয়া সত্ত্বেও তা মিথ্যা প্রতিপাদনের জন্য] আপনার দিকে দৌড়ে আসছে?	فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. ডান দিক হতে এবং বাম দিক হতে দলবদ্ধভাবে।	عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা لِفُرُوْجِهِمْ স্বীয় লজ্জার স্থানসমূহকে حٰفِظُوْنَ সংরক্ষণকারী হয়।

৩০. اِلَّا ব্যতীত عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ তাদের পত্নীগণের সাথে اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ অথবা স্বীয় কৃতদাসীদের সাথে فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ কেননা তাদের প্রতি (তাতে) কোনো দোষারোপ নেই।

৩১. فَمَنِ ابْتَغٰى কিন্তু যারা প্রয়াসী হয় وَرَآءَ ذٰلِكَ তাদের ব্যতীত فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ তবে এরূপ লোকই সীমা অতিক্রমকারী।

৩২. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা لِاَمٰنٰتِهِمْ স্বীয় আমানতসমূহ وَعَهْدِهِمْ ও স্বীয় অঙ্গীকারের প্রতি رٰعُوْنَ লক্ষ্য রাখে।

৩৩. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা بِشَهٰدٰتِهِمْ নিজেদের সাক্ষ্যসমূহ قَآئِمُوْنَ ঠিক ঠিক প্রদান করে।

৩৪. وَالَّذِيْنَ هُمْ আর যারা عَلٰى صَلَاتِهِمْ স্বীয় নামাজসমূহের يُحَافِظُوْنَ পাবন্দি করে।

৩৫. اُولٰٓئِكَ এরা প্রবেশ করবে فِيْ جَنّٰتٍ বেহেশতে مُّكْرَمُوْنَ সসম্মানে।

৩৬. فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا সুতরাং কাফেরদের কি হলো যে قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ তারা আপনার দিকে দৌড়ে আসছে।

৩৭. عَنِ الْيَمِيْنِ ডান দিক হতে وَعَنِ الشِّمَالِ এবং বাম দিক হতে عِزِيْنَ দলবদ্ধভাবে।

৩৮. তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কি এই আকাঙ্ক্ষা রাখে যে, তাকে প্রাচুর্যময় জান্নাতে প্রবেশ করা হবে?	أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. এটা কখনো হবে না। আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি। যা তারাও অবগত আছে।	كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. অনন্তর আমি উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমূহের প্রতিপালকের শপথ করছি যে, নিশ্চয় আমি ক্ষমতাবান।	فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ إِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. তাদের স্থলে তাদের অপেক্ষা উত্তম লোক স্থলবর্তী করতে এবং [এ ব্যাপারে] আমি অক্ষম নই।	عَلٰٓى أَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾
৪২. অতএব, আপনি তাদেরকে এ বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকেরও মধ্যে থাকতে দিন, যে যেদিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তারা সেদিনের সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।	فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. যেদিন তারা কবরসমূহ হতে বহির্গত হয়ে এরূপে ধাবিত হবে, যেমন তারা কোনো উপাসনাগারের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।	يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. তাদের চক্ষুসমূহ [লজ্জায়] অবনমিত থাকবে [এবং] অপমান তাদেরকে ঘিরে ফেলবে; এটাই তাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হতো।	خٰشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ তাদের প্রত্যেকেই কি এই আকাঙ্ক্ষা রাখে যে, أَنْ يُّدْخَلَ তাকে প্রবেশ করা হবে جَنَّةَ نَعِيْمٍ প্রাচুর্যময় জান্নাতে।

৩৯. كَلَّا এটা কখনো হবে না إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ যা তারাও অবগত আছে।

৪০. فَلَآ أُقْسِمُ অনন্তর আমি শপথ করছি بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমূহের প্রতিপালকের إِنَّا لَقٰدِرُوْنَ নিশ্চয় আমি ক্ষমতাবান।

৪১. عَلٰٓى أَنْ نُّبَدِّلَ তাদের স্থলে স্থলবর্তী করতে خَيْرًا مِّنْهُمْ তাদের অপেক্ষা উত্তম লোক وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ এবং আমি অক্ষম নই।

৪২. فَذَرْهُمْ অতএব আপনি তাদেরকে থাকতে দিন يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا এই বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ তারা সেদিনের সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ যে দিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

৪৩. يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ যেদিন তারা বহির্গত হয়ে مِنَ الْأَجْدَاثِ কবরসমূহ হতে سِرَاعًا এরূপে ধাবিত হবে كَأَنَّهُمْ إِلٰى نُصُبٍ যেন তারা কোনো উপাসনাগারের দিকে يُّوْفِضُوْنَ দৌড়ে যাচ্ছে।

৪৪. خٰشِعَةً অবনমিত থাকবে أَبْصَارُهُمْ তাদের চক্ষুসমূহ (লজ্জায়) تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ অপমান তাদেরকে ঘিরে ফেলবে ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ এটাই তাদের সেই দিন الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার তৃতীয় আয়াতে উল্লিখিত ذِى الْمَعَارِجِ হতে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে, একে اَلْمَوَاقِعُ ও বলা হয়। এতে ২টি রুকূ', ৪৪টি আয়াত, ২১৬টি বাক্য এবং ৮৬১টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কুরআন]

নাজিলের সময়কাল : এ সূরাটিও মক্কায় অবস্থানকালে অবতারিত প্রাথমিক সূরাসমূহের মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু সূরাটি কখন নাজিল হয়; তা সঠিকরূপে বলা যায় না। সূরার আলোচ্য বিষয়াদি হতে প্রমাণ হয় যে, পূর্ববর্তী সূরা اَلْحَاقَّةُ যে অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছিল, এ সূরাটিও প্রায় অনুরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি اَلْحَاقَّةُ -এর পর মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়। -[নূরুল কুরআন]

মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু : মক্কার কাফেরগণ কিয়ামত, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপারে মহানবী ﷺ এবং তাঁর অনুসারীগণকে খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-তামাসা ও ক্রীড়া-কৌতুক করত। আর বলত– হে মোহাম্মদ! তোমার কথা যদি সত্য হয় এবং তুমি যদি সত্যই নবী হয়ে থাক, তবে সে কিয়ামত সংঘটিত করিয়ে দেখাও দেখি। তুমি আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ আমরা তা স্বচক্ষে দেখলেও বিশ্বাস করবো না। আল্লাহ তা'আলা গোটা সূরাটিই কাফেরদের এই চ্যালেঞ্জের জবাবে অবতীর্ণ করেছেন।

প্রথম থেকে ১৪নং আয়াত পর্যন্ত কিয়ামতের অনিবার্যতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, জনৈক লোক কিয়ামতের শাস্তি চাচ্ছে। এ শাস্তি কাফেরদের জন্য বিলম্ব হলেও অবশ্যই হবে। কেননা আল্লাহ স্বীয় প্রতিশ্রুতির বিপরীত কিছু করেন না। সুতরাং আপনি তাদের অসদাচরণে ধৈর্যহারা হবেন না। তারা তাকে খুব দূরের বিষয় ভাবে; কিন্তু আমি অতি সন্নিকটে দেখছি। যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে সেদিন আকাশমণ্ডলী বিগলিত ধাতুর ন্যায় হবে। পাহাড়গুলো রঙ্গিন পশমের ন্যায় উড়বে। সেদিন পরস্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হলেও কেউ কারো নিকট তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে না। বন্ধু-বান্ধব সংবাদ নিবে না। লোকেরা শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্তান, স্ত্রী, ভাই-বোন জাতি-গোষ্ঠীকে মুক্তিপণ রাখতে চাইবে; কিন্তু কিছুতেই তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে না।

১৫ থেকে ১৮ নং আয়াত পর্যন্ত লেলিহান অগ্নিশিখার শাস্তির কথা বলা হয়েছে। সে আগুন দ্বারা দেহের চর্ম জ্বলে খসে পড়বে। এ পৃথিবীতে যারা ঈমান আনেনি এবং দীন থেকে দূরে সরে রয়েছে তাদেরকে জাহান্নাম নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকবে।

১৯ থেকে ৩৬ নং আয়াত পর্যন্ত কাফেরদের চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে– জাহান্নাম হতে কোন ধরনের লোক মুক্তি পাবে তাদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে– যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করে, ভিক্ষুক ও অভাবীদের জন্য নিজেদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করে, অপাত্র হতে নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে চলে এবং যারা প্রতিশ্রুতি ও আমানত রক্ষা করে, আর সঠিক সাক্ষ্য দানে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে, তারাই লাভ করবে অথৈ নিয়ামতের ভাণ্ডার জান্নাত। সেখানে তারা সম্মানজক জীবন যাপন করবে।

৩৬ থেকে ৪৪ নং আয়াত পর্যন্ত কাফেরদের আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের হলো কি? তারা আপনার কাছে দলে দলে এসে ভিড় জমায় কেন? তারা কি অথৈ নিয়ামতের পরিপূর্ণ জান্নাতের আশা করে? না কখনো তারা জান্নাত লাভ করতে পারবে না। জান্নাত লাভের একটি গুণগত মান রয়েছে। সে মানে তাদের পৌঁছতে হবে– অন্যথা নয়। তারা যদি ঈমান না আনে তবে আমি তাদের পরিবর্তে নতুন জাতি সৃষ্টিতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। এ কথা আমি বহু উদয়াচল ও অস্তাচলের একক প্রতিপালকের শপথ করে বলছি। আমি তাতে পূর্ণ মাত্রায় ক্ষমতাবান।

পরিশেষে বলেছেন যে, হে নবী! আপনি তাদেরকে আমোদ-ফুর্তি ও কৌতুকের মধ্য থাকতে দিন। তাদের প্রতি আপনি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। কিয়ামতের দিন তারা কবর হতে উত্থিত হয়ে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যবস্তুর দিকে দ্রুতবেগে দৌড়াতে থাকবে। সেদিন লজ্জা, অপমান ও লাঞ্ছনা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে। তাদের নয়নযুগল থাকবে সর্বদা অবনমিত। নিজেরাই নিজেদের কাজের জন্য অনুতাপ করতে থাকবে, কপালে হাত মেরে বলবে– হায়! কি করলাম; কিন্তু তখন সে অনুশোচনায় কোনোই কাজ হবে না।

সূরা আল-হাক্কাহ্-এর সাথে সূরা আল-মা'আরিজ-এর যোগসূত্র : সূরা আল-হাক্কাহ তে কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, কিয়ামতের অবিশ্বাসীর পরিণাম আলোচনা করা হয়েছে। সেখানকার আলোচনাকে সূরা আল-মা'আরিজ -এ পূর্ণতা দান করা হয়েছে। এ সূরাটি সূরা আল-হাক্কাহ্ -এর বক্তব্যের পূর্ণতা দানকারী হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ....الآيَة

শানে নুযূল : এ আয়াতটি নযর ইবনে হারেছ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। একদিন সে কুরআন ও রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করতে গিয়ে ধৃষ্টতা সহকারে বলেছিল اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ......الخ হে আল্লাহ! যদি এই কুরআন আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক আজাব প্রেরণ করুন। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাজিল হয়। –[কানযুন নুকূল : ১০৩]

لِّلْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ....الآيَة

শানে নুযূল : যখন سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ যখন এ আয়াত নাজিল হলো তখন লোকেরা বলল, এ আজাব কার উপর নাজিল হবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়। –[কানযুন নুকূল : ১০৩]

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ الآيَة

শানে নুযূল : এই আয়াত মুনাফেকদের ঐ দল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা দ্বীন ইসলাম নিয়ে বিদ্রূপ করতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হতো। কিন্তু হুজুর ﷺ-এর উপর ঈমান আনত না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়। –[কুরতুবী ১৮/২৯২]

سَأَلَ سَائِلٌ - سُؤَالٌ শব্দটি কখনও তথ্যানুসন্ধানের অর্থে আসে। তখন আরবি ভাষায় এর সাথে عَنْ অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং কখনো আবেদন ও কোনো কিছু চাওয়ার অর্থে আসে। আয়াতে এই অর্থে আসার কারণে এর সাথে بَاء অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি আজাব চাইল। নাসায়ীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নযর ইবনে হারেছ এই আজাব চেয়েছিল। সে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যারোপ করতে যেয়ে ধৃষ্টতাসহকারে বলেছিল اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ হে আল্লাহ! যদি এই কোরআনই আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক আজাব প্রেরণ করুন।–(মাযহারী) আল্লাহ তা'আলা তাকে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শাস্তি দেন।–(মাযহারী) সে আল্লাহ তা'আলার কাছে যে আজাব চেয়েছিল, অতঃপর তার কিছু স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এই আজাব কাফেরদের জন্যে দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কিংবা উভয় জাহানে অবধারিত। একে প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে, যিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই শেষ বাক্যটি প্রথম বাক্যের প্রমাণ। কারণ যে আজাব মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে, তাকে প্রতিহত করা কারও পক্ষে সম্ভপর নয়।

مَعَارِجُ শব্দটি مِعْرَاجٌ–এর বহুবচন। এটা عُرُوْجٌ থেকে উদ্ভূত, অর্থ ঊর্ধ্বারোহণ করা। مِعْرَاجٌ ও مِعْرَجٌ সেই সিঁড়িকে বলা হয়, যাতে নিচের থেকে উপর আরোহণ করার জন্যে অনেকগুলো স্তর থাকে। আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বিশেষণ ذِى الْمَعَارِجِ এই অর্থে আনা হয়েছে যে, তিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই সুউচ্চ মর্তবা হচ্ছে উপরে–নিচে সপ্ত আকাশ। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ذِى الْمَعَارِجِ এর অর্থ করেছেন আকাশসমূহের মালিক।

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ –অর্থাৎ উপরে নীচে স্তরে স্তরে সাজানো এই মর্তবাসমূহের মধ্যে ফেরশতাগণ ও 'রুহুল-আমীন' অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) আরোহণ করেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) একজন। কিন্তু তার বিশেষ সম্মানের কারণে তাঁর পৃথক নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ –অর্থাৎ উল্লিখিত আজাব সেই দিন সংঘটিত হবে, যে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমার প্রাণ যে সত্তার করায়ত্ত, তাঁর শপথ করে বলছি–এই দিনটি মুমিনের জন্যে একটি ফরজ নামাজ পড়ার সময়ের চেয়েও কম হবে।–(মাযহারী)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে, يَكُوْنُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كَمِقْدَارِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ –অর্থাৎ এ দিনটি মুমিনদের জন্যে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের মতো হবে।–(মাযহারী)।

এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, পঞ্চাশ হাজার বছর হওয়া একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। অর্থাৎ কাফেরদের জন্যে এতটুকু দীর্ঘ এবং মুমিনদের জন্যে এতটুকু খাটো হবে।

কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য এক হাজার বছর, না পঞ্চাশ হাজার বছর? আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত দিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর এবং সূরা হা-মিম তানযীলের আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। আয়াতটি এই ঃ

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ– আল্লাহ, তা'আলার কাজকর্ম পরিচালনা করে আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত, অতঃপর তাঁর দিকে উর্ধ্বগমন করেন এমন এক দিনে যা তোমাদের হিসাব অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। বাহ্যতঃ উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। উপরিউক্ত হাদীস দৃষ্টে এর জবাব হয়ে গেছে যে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দলের দিক দিয়ে বিভিন্ন রূপ হবে। কাফেরদের জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছর এবং মুমিনদের জন্যে এক নামাজের ওয়াক্তের সমান হবে তাদের মাঝখানে কাফেরদের বিভিন্ন দল থাকবে। সম্ভবতঃ কোনো কোনো দলের জন্যে এক হাজার বছরের সমান থাকবে। অস্থিরতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে সময় দীর্ঘ ও খাটো হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। অস্থিরতা ও কষ্টের এক ঘণ্টা মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সপ্তাহের চেয়েও বেশি মনে হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিপ্ত অনুভূত হয়।

যে আয়াতে এক হাজার বছরের কথা আছে, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে, এই আয়াতে পার্থিব একদিন বুঝানো হয়েছে। এই দিনে হযরত জিবরাঈল (আ.) ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে যাতায়াত করে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, যা মানুষ অতিক্রম করলে এক হাজার বছর লাগত। কেননা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পাঁচশত বছরের ব্যবধান আছে। অতএব, পাঁচশত বছর নিচে আসার এবং পাঁচশত বছর উর্ধ্বে গমনের ফলে মোট এক হাজার বছর মানুষের গতির দিক দিয়ে হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ এই দুরত্ব খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করেন। সুতরাং সূরা তানযীলের আয়াতে পার্থিব হিসাবেই 'একদিন'বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা-মা'আরিজে কেয়ামতের দিন বিধৃত হয়েছে, যা পার্থিব দিন অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্যে তাদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নরূপ অনুভূত হবে।

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا –এখানে স্থান ও কালের দিক দিয়ে দূর ও নিকট বোঝানো হয়নি ; বরং সম্ভাব্যতার ও বাস্তবতার দূরবর্তিতা বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা কিয়ামতের বাস্তবতা–বরং সম্ভাব্যতাকেও সুদূর পরাহত মনে করে আর আমি দেখছি যে, এটা নিশ্চিত।

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ - حَمِيمٌ শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম বন্ধু। কিয়ামতের দিন কোনো বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না–সাহায্য করা দূরের কথা। জিজ্ঞাসা না করার কারণ সামনে না থাকা নয় ; বরং আল্লাহ তা'আলার কুদরতে তাদের সবাইকে একে অপরের সামনেও করে দিবে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকবে যে, কেউ অপরের কষ্ট ও সুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে পারবে না।

كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ -لَظَىٰ শব্দের অর্থ অগ্নির লেলিহান শিখা। شَوَىٰ শব্দটি شَوَاةٌ- এর বহুবচন। অর্থ মাথা ও হাত-পায়ের চামড়া। অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নি একটি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা হবে, মস্তিষ্ক অথবা হাত-পায়ের চামড়া খুলে ফেলবে।

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ –এই অগ্নি নিজে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে; বিমুখ হয় এবং ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে তা আগলিয়ে রাখে। পুঞ্জীভূত করার অর্থ অবৈধ পন্থায় পুঞ্জীভূত করা এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ ফরজ ও ওয়াজিব হক আদায় না করা। সহীহ হাদীসে তাই অর্থ করা হয়েছে।

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا - هَلُوعٌ –এর শাব্দিক অর্থ লোভী, অধৈর্য ভীরু ব্যক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ এখানে অর্থ সেই ব্যক্তি, যে হারাম ধন-সম্পদের লোভ করে। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেন ঃ এর অর্থ কৃপণ এবং মুকাতিল বলেন ঃ এর অর্থ সংকীর্ণমনা ধৈর্যহীন ব্যক্তি। এসব অর্থ কাছাকছি। স্বয়ং কুরআনের ভাষায় هَلُوعٌ শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দোষমুক্ত অবস্থায়, তখন তাকে অপরাধী কেন সাব্যস্ত করা হয়? জবাব এই যে, এখানে মানব-স্বভাবে নিহিত প্রতিভা ও উপকরণ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানব-স্বভাবে সৎকাজের প্রতিভাও নিহিত রেখেছেন, তাকে জ্ঞান-গরিমাও দান করেছেন। কিতাব এবং রাসূলের মাধ্যমে প্রত্যেক ভালো-মন্দ কাজের পরিণতিও বলে দিয়েছেন। মানুষ স্বেচ্ছায় মন্দ উপকরণ অবলম্বন করে এবং স্বেচ্ছাকৃত মন্দ কর্মের কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। জন্মলগ্নে গচ্ছিত মন্দ উপকরণের কারণে অপরাধী হয় না। هَلُوعٌ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কুরআন পাক স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াকর্মই উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে :

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا অর্থাৎ মানুষ এত ভীরু ও বে-সবর যে, যখন সে কোনো দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন হা-হুতাশ শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে যখন কোনো সুখ-শান্তি ও আরাম লাভ করে, তখন কৃপণ হয়ে যায়। এখানে শরিয়তের সীমার বাইরে হা-হুতাশ বুঝানো হয়েছে। এমনিভাবে কৃপণতা বলে ফরজ ও ওয়াজিব কর্তব্য পালনে ক্রটি বুঝানো হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মানুষের এই বদ-অভ্যাস থেকে সৎকর্মী মুমিনদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করে

তাদের সৎ ক্রিয়াকর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম إِلَّا الْمُصَلِّينَ থেকে শুরু করে عَلَىٰ صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে مُصَلِّينَ বলে مُؤْمِنِينَ বুঝিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাজ মুমিনের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ আলামত। যারা নামাজি, তারাই মুমিন বলার যোগ্য হতে পারে। অতঃপর তাদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ –অর্থাৎ যে নামাজি তার সমগ্র নামাজে নামাজের দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে ; এদিকে সেদিকে তাকায় না। ইমাম বগভী (র.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে আবুল খায়র বলেন ঃ আমি সাহাবী হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াতের অর্থ কি এই যে, যারা সর্বক্ষণ নামাজ পড়ে? তিনি বললেন ঃ না, এই অর্থ নয় ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাজের দিকেই নিবিষ্ট থাকে এবং ডানে-বামে ও আগে-পিছে তাকায় না। অতঃপর وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ বাক্যে নামাজ ও নামাজের আদবসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই বিষয়বস্তুতে পুনরুক্তি নেই। এর পরে উল্লেখিত মুমিনদের গুণাবলি প্রায় তাই, যা সূরা মুমিনুনে বর্ণিত হয়েছে।

জাকাতের পরিমাণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, তা হ্রাসবৃদ্ধি করার ক্ষমতা কারও নেই : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ – এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, জাকাতের পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে। তাই জাকাতের নেসাব ও পরিমাণ উভয়টি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে স্থিরীকৃত। কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে এগুলো পরিবর্তিত হতে পারে না।

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ –এর পূর্বের আয়াতে যৌনকামনা চরিতার্থ করার বৈধ পাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ও মালিকানাধীন বাঁদী উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে এগুলো ছাড়া যৌনকামনা চরিতার্থ করার প্রত্যেক প্রকারকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হস্তমৈথুন করা হারাম : অধিকাংশ ফিকাহবিদ হস্তমৈথুনকেও উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত করে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে জুরায়জ বলেন : আমি হযরত আতাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি মাকরূহ বললেন। তিনি আরও বললেন : আমি শুনেছি, হাশরের ময়দানে কিছু এমন লোক আসবে, যাদের হাত গর্ভবতী হবে। আমার মনে হয় এরাই হস্তমৈথুনকারী। হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা.) বলেন : আল্লাহ তা'আলা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর আজাব নাজিল করেছেন, যারা হস্তমৈথুনে লিপ্ত ছিল। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ يَدَهُ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে হাতকে বিবাহ করে। এই হাদীসের সনদ অগ্রাহ্য। –[মাযহারী]

আল্লাহর হক ও সব বান্দার হক আমানতের অন্তর্ভুক্ত ঃ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ –এই আয়াতে আমানত শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য এক আয়াতেও তদ্রূপ করা হয়েছে।

আয়াতটি এই ঃ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا –উভয় আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমানত কেবল সে অর্থকেই বলে না, যা কেউ আপনার হাতে সোপর্দ করে বরং যেসব ওয়াজিব হক আদায় করা আপনার দায়িত্বে ফরজ, সেগুলো সবই আমানত। এগুলোতে ত্রুটি করা খেয়ানত। এতে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার হকও দাখিল আছে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার যেসব হক আপনার উপর ওয়াজিব করা হয়েছে অথবা কোনো লেনদেন ও চুক্তির মাধ্যমে আপনি যেসব হক নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন, সেগুলোও দাখিল আছে। এগুলো আদায় করা ফরজ এবং এতে ত্রুটি করা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। –(মাযহারী)

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ এখানেও শাহাদত শব্দটিকে বহুবচন আনার কারণে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'শাহাদত' তথা সাক্ষ্যের অনেক প্রকার আছে এবং প্রত্যেক প্রকার সাক্ষ্য কায়েম রাখা ওয়াজিব। এতে ঈমান, তাওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যও দাখিল এবং রমজানের চাঁদ, শরিয়তের বিচার-আচার ও পারস্পরিক লেনদেনের সাক্ষ্যও দাখিল আছে। এসব সাক্ষ্য গোপন করা ও এতে কম বেশি করা হারাম। বিশুদ্ধভাবে এগুলোকে কায়েম করা আয়াত দৃষ্টে ফরজ। –(মাযহারী)

শব্দবিশ্লেষণ :

سَأَلَ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س - ء - ل) জিনস مهموز عين অর্থ– আবেদন করল, জিজ্ঞাসা করল।

مَعَارِجُ : معراج -এর বহুবচন, ইসমে আলা বাব ضَرَبَ মাসদার عُرُوْجٌ মূলবর্ণ (ع - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ– স্তরসমূহ। সিঁড়িসমূহ। আরোহণ করা, উর্ধ্বগমন করা।

اَلْمُهْلِ : গলিত ধাতু, তেলের গাদ, তলানী, গলিত তামা, তরল খনিজ পদার্থ, গাদ। (জালালাইন)

اَلْعِهْنِ : শব্দটি একবচন, বহুবচন عُهُوْنٌ অর্থ– পশম, রঙিন পশম।

يُبَصَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْصِيْرٌ মূলবর্ণ (ب ـ ص ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তাদের দেখা-সাক্ষাৎ করানো হবে।

يَفْتَدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ف ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– মুক্তিপণ স্বরূপ দিতে।

تُؤْوِيْهِ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْوَاءٌ মূলবর্ণ (ا – و – ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং لفيف مقرون অর্থ– সে বাস করত। সে তাকে ঠিকানা দিবে। অবস্থান করবে.

لَظٰى : অর্থ- জ্বলন্ত অগ্নি, জাহান্নাম। বাব سَمِعَ মাসদার لَظٰى মূলবর্ণ (ل – ظ – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– জ্বলে উঠা। প্রজ্জ্বলিত হওয়া। শিখায়িত হওয়া।

نَزَّاعَةً : মুবালাগার সীগাহ বাব فَتَحَ মাসদার نَزْعٌ মূলবর্ণ (ن – ز – ع) জিনস صحيح অর্থ– খসিয়ে ফেলবে। উৎপাটনকারী। রিমুভার। টেনে বের করার যন্ত্র।

شَوٰى : বহুবচন; একবচনে شَوَاةٌ অর্থ- কলিজা। মুখের চামড়া। মাথার খুলি।

اَوْعٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْعَاءٌ মূলবর্ণ (و – ع – ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সংরক্ষণ করত।

هَلُوْعًا : মুবালাগার সীগাহ বাব سَمِعَ মাসদার هَلُوْعًا মূলবর্ণ (ه – ل – ع) জিনস صحيح অর্থ– দুর্বলমনা। অস্থির, অধীর, ভীতু।

جَزُوْعًا : সিফাতে মুশাব্বাহ বাব سَمِعَ মাসদার جَزَعٌ মূলবর্ণ (ج – ز – ع) জিনস صحيح অর্থ– সে হায় হুতাশ করে। উৎকণ্ঠিত। দুঃখিত ধৈর্যহারা।

عِزِيْنَ : শব্দটি عِزَةٌ-এর বহুবচন, অর্থ- দলবদ্ধভাবে।

اَجْدَاثِ : শব্দটি جَدَثٌ-এর বহুবচন, অর্থ- কবর সমূহ।

سِرَاعًا : শব্দটি سَرِيْعٌ-এর বহুবচন, অর্থ- দৌড়ে যাচ্ছে, দ্রুত, তাড়াতাড়ি, জলদি।

مُشْفِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِشْفَاقٌ মূলবর্ণ (ش ـ ف ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– ভয় করে। ভয়কারীগণ।

مَاْمُوْنٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاَمْنُ মূলবর্ণ (أ ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– নির্ভয়ের বস্তু।

مُهْطِعِيْنَ : সীগাহ جمع منكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهْطَاعٌ মূলবর্ণ (ه ـ ط ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– দৌড়ে আসছে।

مَسْبُوْقِيْنَ : সীগাহ جمع منكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّبْقُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– অক্ষম।

يَخُوْضُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم বাব نَصَرَ মাসদার خَوْضٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– বাক-বিতণ্ডা করবে।

يُوْفِضُوْنَ : সীগাহ جمع منكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْفَاضٌ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ض) জিনস مثال واوى অর্থ– দৌড়ে যাচ্ছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ এখানে : تَعْرُجُ ফে'ল الْمَلٰئِكَةُ হলো ফায়েল। আর اَلرُّوْحُ টা اَلْمَلٰئِكَةُ-এর উপর আতফ হয়েছে। এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ.) উদ্দেশ্য। আর اِلَيْهِ টা تَعْرُجُ-এর সাথে متعلق আর فِىْ يَوْمٍ টা উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়েছে। আর كَانَ হলো ফে'লে নাকেস আর مِقْدَارُهٗ তার ইসম। আর خَمْسِيْنَ হলো তার খবর। আর اَلْفَ سَنَةٍ হলো خَمْسِيْنَ-এর تميز অথবা تَعْرُجُ-এর সাথে متعلق। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৬৪-৬৫]

سُوْرَةُ نُوْحٍ مَكِّيَّةٌ

সূরা নূহ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ২৮, রুকূ'- ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ	আয়াত
১. আমি নূহকে তাঁর কওমের প্রতি পাঠিয়েছিলাম যে, আপনি স্বীয় কওমকে ভয় প্রদর্শন করুন, তার পূর্বে যে, তাদের প্রতি যন্ত্রণাময় শাস্তি এসে পড়ে।	اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١﴾
২. তিনি বললেন, হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।	قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢﴾
৩. তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।	اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٣﴾
৪. আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন আসবে, তখন তা অপসৃত হবে না। কতইনা উত্তম হতো যদি তোমরা বুঝতে!	يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاۗءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾
৫. নূহ দোয়া করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কওমকে রাত্রে ও দিবসে আহ্বান করেছি।	قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ﴿٥﴾
৬. কিন্তু আমার আহ্বানের দরুন তারা আরো দূরে সরে যাচ্ছে।	فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۗءِيْٓ اِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম اِلٰى قَوْمِهٖٓ তাঁর কওমের প্রতি اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ আপনি স্বীয় কওমকে ভয় প্রদর্শন করুন مِنْ قَبْلِ এর পূর্বে যে, اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তাদের প্রতি যন্ত্রণাময় শাস্তি এসে পড়ে।

২. قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার কওম اِنِّيْ لَكُمْ আমি তোমাদের জন্য نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

৩. اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর وَاتَّقُوْهُ এবং তাঁকে ভয় কর وَاَطِيْعُوْنِ এবং আমার কথা মানো।

৪. يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন وَيُؤَخِّرْكُمْ এবং তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى নির্ধারিত সময় পর্যন্ত اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاۗءَ আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন আসবে لَا يُؤَخَّرُ তখন তা অপসৃত হবে না لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ কতইনা উত্তম হতো যদি তোমরা বুঝতে।

৫. قَالَ رَبِّ নূহ দোয়া করলেন, হে আমার প্রতিপালক اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ আমি আমার কওমকে আহ্বান করেছি لَيْلًا وَّنَهَارًا রাত্রে ও দিবসে।

৬. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۗءِيْٓ কিন্তু আমার আহ্বানের দরুন তারা اِلَّا فِرَارًا আরো দূরে সরে যাচ্ছে।

বঙ্গানুবাদ	আয়াত
৭. আর আমি যখনই তাদেরকে ডেকেছি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, তখনই তারা নিজ নিজকর্ণসমূহে স্ব স্ব অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দিল এবং তাদের বস্ত্রসমূহ নিজেদের উপর জড়িয়ে নিল, আর তারা হঠকারিতা করল এবং চরম স্তরের অহংকার করল ।	وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾
৮. অনন্তর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করলাম ।	ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾
৯. অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যেও বুঝিয়েছি এবং সম্পূর্ণ গোপনেও বুঝিয়েছি ।	ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾
১০. আর আমি বলেছি যে, তোমরা স্বীয় রব কর্তৃক নিজেদের পাপ ক্ষমা করিয়ে নাও । নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ।	فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾
১১. তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন ।	يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾
১২. এবং তোমাদেরকে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন, আর তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহ স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করে দিবেন ।	وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾
১৩. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর মহত্ত্বে বিশ্বাসী হচ্ছো না?	مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾
১৪. অথচ তিনি তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন ।	وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ আমি যখনই তাদেরকে ডেকেছি যে, لِتَغْفِرَ لَهُمْ আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ তখনই তারা স্ব স্ব অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দিল فِي آذَانِهِمْ নিজ নিজ কর্ণসমূহে وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ এবং তাদের বস্ত্রসমূহ নিজেদের উপর জড়িয়ে নিল وَأَصَرُّوا আর তারা হঠকারিতা করল وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا এবং চরম স্তরের অহংকার করল ।

৮. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ অনন্তর আমি তাদেরকে আহ্বান করলাম جِهَارًا প্রকাশ্যে ।

৯. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যেও বুঝিয়েছি وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا এবং সম্পূর্ণ গোপনেও বুঝিয়েছি ।

১০. فَقُلْتُ আর বলেছি যে, اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ তোমরা স্বীয় রব কর্তৃক নিজেদের পাপ ক্ষমা করিয়ে নাও إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ।

১১. يُرْسِلِ السَّمَاءَ তিনি বর্ষণ করবেন عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি ।

১২. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ এবং তোমাদেরকে ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ আর তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহ স্থাপন করবেন وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا এবং তোমাদের জন্য নহর সমূহ প্রবাহিত করে দিবেন ।

১৩. مَا لَكُمْ তোমাদের কি হলো যে, لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا তোমরা আল্লাহর মহত্ত্বে বিশ্বাসী হচ্ছো না ।

১৪. وَقَدْ خَلَقَكُمْ অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন أَطْوَارًا পর্যায়ক্রমে ।

অনুবাদ	আয়াত
১৫. তোমাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ কিরূপে সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন?	أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾
১৬. আর তাতে চন্দ্রকে জ্যোতি [-র্ময়বস্তু] বানিয়েছেন, আর সূর্যকে প্রদীপ [-এর ন্যায়] করেছেন।	وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾
১৭. আর আল্লাহ তোমাদেরকে জমিন হতে এক বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন।	وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾
১৮. অনন্তর তোমাদেরকে পুনরায় জমিনেই উপনীত করবেন এবং [পুনরায় তা হতে] তোমাদেরকে বাইরে আনয়ন করবেন।	ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾
১৯. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা [-স্বরূপ] করেছেন।	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾
২০. যেন তোমরা তার মুক্ত পথসমূহে চলাফেরা কর।	لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ ع
২১. নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তারা আমার কথা মানেনি এবং এমন লোকদের অনুসরণ করেছি, যাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে।	قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾
২২. আর যারা বড় বড় ষড়যন্ত্র করেছিল।	وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾
২৩. আর যারা বলেছিল তোমরা তোমাদের উপাস্যদের কখনো ত্যাগ করো না, আর না ওয়াদ্দকে আর না সুও'আকে, আর না ইয়াগূস ও ইয়াউক এবং নাসরকে।	وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. اَلَمْ تَرَوْا তোমাদের কি জানা নেই كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ আল্লাহ কিরূপে সৃষ্টি করেছেন سَبْعَ سَمٰوٰتٍ সাত আসমানকে طِبَاقًا স্তরে স্তরে।

১৬. وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا আর তাতে চন্দ্রকে জ্যোতি (-র্ময়বস্তু) বানিয়েছেন وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا আর সূর্যকে প্রদীপ (এর ন্যায়) করেছেন।

১৭. وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন مِّنَ الْاَرْضِ জমিন হতে نَبَاتًا এক বিশেষ পদ্ধতিতে।

১৮. ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا অনন্তর তোমাদেরকে পুনরায় জমিনেই উপনীত করবেন وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا এবং তোমাদেরকে বাইরে আনয়ন করবেন।

১৯. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন الْاَرْضَ জমিনকে بِسَاطًا বিছানা স্বরূপ।

২০. لِّتَسْلُكُوْا যেন তোমরা চলাফেরা কর مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا তার মুক্ত পথসমূহে।

২১. قَالَ نُوْحٌ হযরত নূহ (আ.) বললেন رَّبِّ হে আমার প্রতিপালক اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ তারা আমার কথা মানেনি। وَاتَّبَعُوْا এবং এমন লোকদের অনুসরণ করেছে। مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا যাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে।

২২. وَمَكَرُوْا আর যারা ষড়যন্ত্র করেছিল। مَكْرًا كُبَّارًا বড় বড় ষড়যন্ত্র।

২৩. وَقَالُوْا আর যারা বলেছিল لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ তোমরা তোমাদের উপাস্যদের কখনো ত্যাগ করো না وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا আর না ওয়াদ্দকে আর না সুও'আকে। وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا আর না ইয়াগুছ ও ইয়াউক এবং নাসরকে।

অনুবাদ	আয়াত
২৪. আর তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে, আর এই জালিমদের পথভ্রষ্টতা আরো বর্ধিত করে দিন।	وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾
২৫. তাদের ঐ সমস্ত পাপের দরুনই তাদেরকে নিমজ্জিত করে দেওয়া হলো, অতঃপর দোজখে প্রবিষ্ট করা হলো আর তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সাহায়কও প্রাপ্ত হয়নি।	مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾
২৬. আর নূহ (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কাফেরদের মধ্যে হতে জমিনের উপর একজনকেও অবশিষ্ট রাখবেন না।	وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾
২৭. যদি আপনি তাদেরকে ভূপৃষ্ঠে থাকতে দেন তবে তারা আপনার বান্দাগণকে বিভ্রান্তই করবে এবং তাদের শুধু দুষ্কার্যকারী ও কাফের সান্তানই ভূমিষ্ট হবে।	اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾
২৮. হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন আমাকে এবং আমার মাতাপিতাকে, আর যে মুমিন হওয়া অবস্থায় আমার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাকে; আর সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীকেও। আর এ জালিমদের ধ্বংস হওয়াকে আরো বর্ধিত করে দিন।	رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا আর তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا আর এই জালিমদের পথভ্রষ্টতা আরো বর্ধিত করে দিন।

২৫. مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ তাদের ঐ সমস্ত পাপের কারণেই اُغْرِقُوْا তাদেরকে নিমজ্জিত করে দেওয়া হলো فَاُدْخِلُوْا نَارًا অতঃপর দোজখে প্রবিষ্ট করা হলো فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ আর তারা প্রাপ্ত হয়নি مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত اَنْصَارًا কোনো সহায়কও।

২৬. وَقَالَ نُوْحٌ আর নূহ বললেন رَّبِّ হে আমার প্রতিপালক! لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ জমিনের উপর অবশিষ্ট রাখবেন না مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا কাফেরদের মধ্য হতে একজনকেও।

২৭. اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ যদি আপনি তাদেরকে ভূপৃষ্ঠে থাকতে দেন يُضِلُّوْا عِبَادَكَ তবে তারা আপনার বান্দাগণকে বিভ্রান্তই করবে وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا এবং তাদের শুধু দুষ্কার্যকারী ও কাফের সন্তানই ভূমিষ্ঠ হবে।

২৮. رَبِّ اغْفِرْ لِيْ হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন আমাকে وَلِوَالِدَيَّ এবং আমার মাতা-পিতাকে وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا আর যে মুমিন হওয়া অবস্থায় আমার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাকে وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ আর সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীকেও। وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا আর ঐ জালিমদের ধ্বংস হওয়াকে আরো বর্ধিত করে দিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরাটির নাম হলো 'নূহ'। অত্র সূরার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনাবলি আলোচিত হয়েছে বিধায় এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ২৮টি আয়াত, ২২৪টি বাক্য এবং ৯২৯টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মক্কা শরীফে অবতারিত প্রাথমিক সূরাসমূহের মধ্যে পরিগণিত। অত্র সূরা অবতীর্ণের সঠিক সময়কালটি কখন তা বলা যায় না; কিন্তু বিষয়বস্তু হতে অনুমান হয় যে, মক্কায় কাফেরদের ইসলাম ও মহানবীর প্রতি বিরোধিতা যখন তীব্র আকার ধারণ করেছিল, তখনই প্রাচীন ইতিহাস হতে তাদের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন।

বিষয়বস্তু ও সারমর্ম : এ সূরাতে হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ হয়েছে; কিন্তু তা সাধারণ কাহিনী রূপে নয়। মক্কার কুরাইশ কাফেরদেরকে সতর্ককরণে যেটুকু বিষয়বস্তু আলোচনার প্রয়োজন ছিল, ঠিক ততটুকুই আলোচনা করা হয়েছে। এ কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর সময় তখনকার জনগণ ও সমাজপতিগণ যে আচার-আচরণ ও ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তোমরাও ঠিক অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছ। অতএব তাদের যে পরিণতি ঘটেছে, তোমাদেরও অনুরূপ নির্মম পরিণতির সম্মুখীন হওয়া বিচিত্র নয়। প্রথম থেকে ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের উপর আজাব আপতিত না হওয়া পর্যন্ত দীনের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর নির্দেশ মাফিক স্বীয় পরিচয় তুলে ধরে তাদের কাছে আল্লাহর দাসত্ব, নবীর আনুগত্য এবং আল্লাহ ভীরুতা অবলম্বন, এ তিন দফা দাওয়াত পেশ করলেন। আর তিনি বললেন, এ দাওয়াত গ্রহণ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট একটি সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ দিবেন; কিন্তু তাঁর নির্ধারিত সময়কালটির আগমন হলে তোমাদেরকে আর কোনো অবকাশ দেওয়া হবে না। হযরত নূহ (আ.) দিবারাত্রি গোপনে প্রকাশ্যে কৌশল অবলম্বন করে স্বীয় সম্প্রদায়কে দীনের পথে আনার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাদের বোধোদয় হলো না। তারা হযরত নূহ (আ.)-এর কথা শুনলেই কানে আঙ্গুল দিত এবং মুখমণ্ডল ঢেকে সরে পড়ত। তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে লাগল। সমাজপতিগণ অহংকার ও দাম্ভিকতাসহ এ আন্দোলন ও দাওয়াতের বিরোধিতায় অবিচল রইল। হযরত নূহ (আ.) বললেন, তোমরা এ তিন দফা দাওয়াত মনে-প্রাণে গ্রহণ করো এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি মহাক্ষমাশীল এবং তোমাদের জন্য আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে দেশকে সুজলা-সুফলা করে তুলবেন। তোমাদেরকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করবেন।

১৫ থেকে ২০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বলোক সৃষ্টি, মানুষকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি, আকাশকে সপ্তস্তরে বিন্যস্তকরণ, চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টির উপকারিতা, উদ্ভিদের ন্যায় মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে ক্রমোন্নতি দান, সে মাটিতেই বিলীন হওয়া এবং ঐ মাটি হতেই পুনরায় উত্থিত হওয়া। পৃথিবীতে সুবিস্তৃত করে মানুষের চলাচলের উপযোগী করা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত, মহত্ত্ব, সার্বভৌমত্ব এবং একচ্ছত্র আধিপত্যকে হযরত নূহ (আ.)-এর মুখে তৎকালীন লোকদের কাছে তুলে ধরেছেন। ২১ থেকে ২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত নূহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের হেদায়েতের ব্যাপারে চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থায় উপনীত হয়ে বললেন– 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জনগণ আমার অবাধ্য। তারা সমাজপতি ও গোত্রীয় সরদারদের কথা মেনে চলছে। অথচ তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তাদের ক্ষতি ও ধ্বংসকারিতাই ডেকে আনছে। সমাজপতিগণ আমার ও দীনি আন্দোলনের বিরোধিতায় সোচ্চারকণ্ঠ এবং কঠিন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা জনগণকে উদ্দা, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর প্রতিমার পূজা পরিত্যাগ না করার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করে আসছে। তারা বহু মানুষকে এ পথে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা শিরক-এর অপরাধে তাদেরকে মহা প্লাবনের পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করলেন। এটাই ছিল তাদের পার্থিব শাস্তি। আর পরকালে তাদেরকে নিক্ষেপ করবেন জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে।

২৬ থেকে ২৮ নং পর্যন্ত আয়াতে হযরত নূহ (আ.) চরম নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায়ের বেঈমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য যে বদদোয়া করেছেন, তা তুলে ধরা হয়েছে। হযরত নূহ (আ.) প্রার্থনা করলেন– হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়ের বেঈমানগণকে গজবে নিপতিত করে সমূলে ধ্বংস করুন। একটিকেও অব্যাহতি দিবেন না। কোনোটিকে অব্যাহতি দিলে তারা আপনার ঈমানদার বান্দাগণকে বিভ্রান্ত করবে এবং দুষ্কৃতকারী ও কাফের-বেঈমান জন্ম দিয়ে দুনিয়াকে শিরকী ও পাপাচারে ভরে ফেলবে। আপনি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে ও আমার সঙ্গী-সাথি ঈমানদারগণকে, আর সকল যুগের মুসলিম নর-নারীগণকে আপনার করুণায় ক্ষমা করে দিন, আপনি মহাক্ষমাশীল ও করুণাময়।

সংক্ষিপ্তভাবে হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা : হযরত নূহ (আ.) হলেন হযরত ইদরীস (আ.)-এর বংশধর নবী। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল গাফফার। তবে তিনি স্বীয় নেক আমলের স্বল্পতা এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে সর্বদা কান্নাকাটি করতে থাকতেন, তাই তার নাম হয়ে গেল نُوْح। তাঁর যুগের মানুষের মধ্যে কুফরি ও শিরক সীমাহীনভাবে বেড়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তখন হযরত নূহ (আ.)-কে পয়গম্বর বানিয়ে মানুষদের হেদায়েতের জন্য পাঠালেন। প্রথমে মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে আনতে শুরু করলেন। এভাবে বৎসরের পর বৎসর যুগের পর যুগ চলে যেতে লাগল,

কিন্তু মানুষ কিছুতেই তাঁর কথার প্রতি লক্ষ্য করছিল না; বরং তাদের কুফরির পর্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল। সারা জীবনে তিনি মাত্র ৮০ জন মানুষকে হেদায়েত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একদা তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, যখন তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে এবং তাদের অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারলেন যে, তারা হেদায়েত কবুল করবে না। আর তাদের বংশধরগণও ঈমান গ্রহণ করবে না। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে বৃক্ষ রোপণের নির্দেশ মোতাবেক বৃক্ষ রোপণ করলেন। ৪০ বছর পর সে বৃক্ষের দ্বারা তাঁকে নৌকা বানানোর নির্দেশ প্রদান করা হলো। ৬০০ গজ লম্বা এবং ৩০০ গজ চওড়া নৌকা বানানো হলো এবং আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সকল প্রকার জীব জন্তুর এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নেওয়ার নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, যাতে نَسْل বিনষ্ট না হয়। যখন নৌকা তৈরি করছিলেন, তখনো কাফেরগণ তার সম্মুখে এসে নৌকা বানাতে দেখে বলত হে নূহ! তুমি কি নবুয়ত হারিয়ে মিস্ত্রি হয়ে গেছ? কি পয়গম্বরীর কাজ সমাপ্ত করেছ? আবার কখনো বলত, বড় মিঞা, নৌকা তো তৈরি করছ তবে পানি কোথা হতে আনয়ন করবেন? যা হোক হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর হুকুমে ঈমানদারদেরকে এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের এক এক জোড়া নিয়ে নৌকায় উঠে গেলেন। তাদের নাফরমানির কারণে অনবরত ৪০ দিন পর্যন্ত তুফান ও তুফান বৃষ্টি বর্ষণ হলো এবং সকল নদী-নালা ভরে পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত ৪০ গজ পানির নিচে তলিয়ে গেল। فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ হযরত নূহ (আ.) নৌকায় সওয়ার হওয়ার পূর্বে তাঁর ছেলে কেনানকে নৌকায় আরোহণ করতে আহ্বান করলেন। তার ছেলে তখন উত্তর দিল আমি পাহাড়ের আশ্রয়ে থাকবো, যাতে পানির প্লাবন হতে রক্ষা পেয়ে যাবো। শেষ পর্যন্ত সেও ডুবে মরল। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ الخ -এর প্রেক্ষিতে উত্তর দিলেন اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ - এরপর হযরত নূহ (আ.) পুনঃ আল্লাহর নিকট উক্ত দোয়া হতে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

যখন তাঁর নৌকা কা'বা শরীফের বরাবর উপস্থিত হলো এবং جُوْدِيْ পাহাড়ের তলায় এসে পৌছল, তখন ছয়মাস সময় তুফানের পর অতিবাহিত হয়ে গেল এবং তুফান বন্ধ হয়ে গেল। পুনরায় তাঁর ঔরস থেকেই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হতে লাগল, তুফানের পরবর্তী বংশধর তাঁর তিন ছেলের ঔরস মাত্র।

১. সাম (سَامْ) আরব ও পারস্য অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ।
২. হাম (حَامْ) সুদান, হিন্দু, সিন্ধু, কিবতী ইত্যাদির পূর্বপুরুষ।
৩. ইয়াফাস (يَافِسْ) তুরকী, চীন, ইয়াজুজ মাজুজ ইত্যাদিদের পূর্বপুরুষ।

এ জন্যই হযরত নূহ (আ.)-কে اٰدَمِ ثَانِيْ বলা হয়। অথবা, نَجِيُّ اللّٰهِ شَيْخُ الْاَنْبِيَاءِ ও বলা হয়। দিবারাত্র তিনি তিনশত রাকাত নামাজ আদায় করতেন, তাঁর বয়স ছিল ১ হাজার চারশত বছর, অথবা নয়শত পঞ্চাশ বছর ছিল। তিনি অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর লাশ মুবারক بَيْتُ الْمَقْدِسِ শরীফে দাফন করা হয়েছে।

নূহ শব্দটির অর্থ : নূহ শব্দটি অনারবীয় শব্দ। কিরমানি বলেন, এটা সুরিয়ানী ভাষার শব্দ। তার অর্থ হচ্ছে– নিশ্চুপ, অবিচল, স্থির। এ শব্দটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট এবং মধ্যের অক্ষর সাকিন হওয়ার কারণে মুনসারিফ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, نُوْحٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে– অতিশয় কাকুতি মিনতি করা, ক্রন্দন করা। তিনি অতিশয় কাকুতি মিনতি ও ক্রন্দন করতেন বলে তাঁকে নূহ নামে ডাকা হয়। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত নূহ (আ.) কি রাসূল ছিলেন? 'কাওমে নূহ' কারা? : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম।' হযরত নূহ (আ.) কি রাসূল ছিলেন এবং হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় কারা? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا এ কথায় বুঝা যায় হযরত নূহ (আ.) রাসূল বা প্রেরিত। তিনি রাসূল ছিলেন এবং রেসালতের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল এটা সর্বসম্মত অভিমত। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

হযরত নূহ (আ.) -এর কওম সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ বলেন, হযরত নূহ (আ.) -এর কওম হচ্ছে, জাযীরাতুল আরবের অধিবাসীগণ। তদানীন্তন কালে যারা আরব উপদ্বীপে বাস করত তারাই ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়। কেউ কেউ বলেন, হযরত নূহ (আ.) -এর কওম হয়েছে যারা জাযীরাতুল আরব এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করতেন তারা। কেউ কেউ বলেন, যারা কূফা এবং কূফার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের অধিবাসী ছিলেন তারাই হযরত নূহ (আ.)-এর কওম। –[রূহুল মা'আনী]

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ : مِنْ অব্যয়টি প্রায়শঃ কতক অর্থ জ্ঞাপন করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের কতক গোনাহ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার হক সম্পর্কিত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। কেননা বান্দার হক

মাফ হওয়ার জন্যে ঈমান আনার পরও একটি শর্ত আছে। তা এই যে, হকটি আদায়যোগ্য হলে তা আদায় করতে হবে ; যেমন আর্থিক দায়-দেনা এবং আদায়যোগ্য না হলে তা মাফ নিতে হবে ; যেমন মুখে কিংবা হাতে কাউকে কষ্ট দেওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে, ঈমান আমলের পূর্ববর্তী সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়। এতেও বান্দার হক আদায় করা, অথবা মাফ নেওয়া শর্ত। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন ঃ আয়াতে مِنْ অব্যয়টি অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের সব গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ দৃষ্টে শর্তটি অপরিহার্য।

وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى : أَجَلٍ مُّسَمًّى –এর অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। অর্থাৎ বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে তোমাদেরকে কোনো পার্থিব আজাবে ধ্বংস করবেন না। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় এই যে, ঈমান না আনলে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই তোমাদেরকে আজাবে ধ্বংস করে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের মাঝে মাঝে এরূপ শর্ত থাকে যে, সে অমুক কাজ করলে উদাহরণতঃ তার বয়স আশি বছর হবে এবং না করলে ষাট বছর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এমনিভাবে অকৃতজ্ঞতার কাজে বয়স হ্রাস পাওয়া এবং কৃতজ্ঞতার কাজে বয়স বেড়ে যাওয়াও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

মানুষের বয়স হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনা ঃ তাফসীরে- মাযহারীতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ তাকদীর দুই প্রকার -(১) চূড়ান্ত অকাট্য এবং (২) শর্তযুক্ত। অর্থাৎ লওহে-মাহফূজে এভাবে লিখা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করলে তার বয়স উদাহরণতঃ ষাট বছর হবে এবং আনুগত্য না করলে পঞ্চাশ বছর বয়সে খতম করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় প্রকার তাকদীরে শর্তের অনুপস্থিতে পরিবর্তন হতে পারে। উভয় প্রকার তাকদীর কুরআন পাকের এই আয়াতে উল্লেখিত আছে। يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা লওহে-মাহফূযে- পরিবর্তন পরিবর্ধন করে থাকেন এবং তাঁর কাছে রয়েছে আসল কিতাব। "আসল কিতাব" বলে সেই কিতাব বোঝানো হয়েছে, যাতে অকাট্য তাকদীর আছে। কেননা শর্তযুক্ত তাকদীরে লিখিত শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ ব্যক্তি শর্তপূর্ণ করবে কি করবে না। তাই চূড়ান্ত তাকদীরে অকাট্য ফয়সালা লিখা হয়।

হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ অর্থাৎ দোয়া ব্যতীত কেনো কিছু আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা রোধ করতে পারে না এবং পিতা-মাতার বাধ্যতা ব্যতীত কোনো কিছু বয়স বৃদ্ধি করতে পারে না। এই হাদীসের মতলব এটাই যে, শর্তযুক্ত তাকদীরে এসব কর্মের কারণে পরিবর্তন হতে পারে। সারকথা, আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়াকে তাদের ঈমান আনার উপর নির্ভরশীল করে তাদের বয়স সম্পর্কে শর্তযুক্ত তাকদীর বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে থাকবেন। এ কারণে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলে দিলেন, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে যে আসল বয়স নির্ধারণ করেছেন, সেই পর্যন্ত তোমরা অবকাশ পাবে এবং কোনো পার্থিব আজাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা ঈমান না আন, তবে এই আসল বয়সের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার আজাব তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। এমতাবস্থায় পরকালের আজাব ভিন্ন হবে। অতঃপর আরও বলে দিলেন যে, ঈমান আনলেও চিরতরে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে না। বরং অকাট্য তাকদীরে তোমাদের যে বয়স লিখিত আছে, সেই বয়সে মৃত্যু আসা অপরিহার্য। কারণ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহস্য বলে এই বিশ্ব-চরাচরকে চিরস্থায়ী করেননি। এখানকার প্রত্যেক বস্তু অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এতে ঈমান ও আনুগত্য এবং কুফর ও গোনাহের কারণে কোনো পার্থক্য হয় না। اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। অতঃপর স্বজাতির সংশোধন ও ঈমানের জন্যে হযরত নূহ (আ.)-এর বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বিরামহীনভাবে নিয়োজিত থাকা এবং সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে নিরাশ হয়ে বদদোয়া করা এবং সমগ্র জাতির নিমজ্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে ঃ হযরত নূহ (আ.) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন এবং কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও চেষ্টায় ক্ষান্ত হননি এবং কোনো দিন নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি সবর করেন।

যাহহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ তাঁর সম্প্রদায়ের প্রহারের চোটে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এরপর তারা তাঁকে একটি কম্বলে জড়িয়ে গৃহে রেখে যেত। তারা মনে করত, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী দিন যখন চৈতন্য ফিরে আসত, তখন আবার সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দিতেন এবং প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ওবায়দ ইবনে আসরেশী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই

সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর গলা টিপে দিত। ফলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলতেন ঃ পুনরায় চেতনা ফিরে এলে তিনি এই দোয়া করতেন ঃ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ اِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন ; কারণ ওরা অবুঝ। তাদের এক পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তিনি দ্বিতীয় পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। দ্বিতীয় পুরুষের পর তৃতীয় পুরুষের ব্যাপারেও এমনি আশাবাদী হয়ে তিনি কর্তব্য পালনে লিপ্ত থাকতেন। কারণ তাদের পুরুষানুক্রমিক বয়স হযরত নূহ (আ.)-এর বয়সের ন্যায় দীর্ঘ ছিল। তিনি মুজিযা হিসাবে দীর্ঘ বয়স প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যখন সম্প্রদায়ের একের পর এক পুরুষ অতিক্রান্ত হতে থাকে এবং প্রত্যেক ভবিষ্যৎ পুরুষ বিগত পুরুষ অপেক্ষা অধিক দুষ্টুমি প্রমাণিত হতে থাকে, তখন হযরত নূহ (আ.) সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার দরবারে অভিযোগ পেশ করলেন এবং বললেন ঃ আমি ওদেরকে দিবারাত্রি, দলবদ্ধভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে, প্রকাশ্যে ও সঙ্গোপনে-সারকথা, সর্বতোভাবে পথে আনার চেষ্টা করেছি। কখনও আজাবের ভয় প্রদর্শন করেছি, কখনও জান্নাতের নিয়ামতরাজির লোভ দেখিয়েছি। আরও বলেছি-ঈমান ও সৎকর্মের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখ ও স্বাচ্ছান্দ্য দান করবেন এবং কখনও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলি পেশ করে বুঝিয়েছি, কিন্তু তারা কিছুতেই কর্ণপাত করল না। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে বলে দিলেন ঃ আপনার সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। اِنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ আয়াতের মতলব তাই। এমনি নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌঁছে হযরত নূহ (আ.)-এর মুখে বদদোয়া উচ্চারিত হলো। ফলে সমগ্র সম্প্রদায় নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। তবে মুমিনগণ রক্ষা পেলেন। তাদেরকে একটি জলযানে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে যেয়ে হযরত নূহ (আ.) তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কাছে ইস্তেগফার অর্থাৎ ঈমান এনে বিগত গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার দাওয়াত দেন এবং এর পার্থিব উপকার এই বর্ণনা করেন যে,

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ : এ থেকে অধিকাংশ আলেম বলেন যে, গোনাহ থেকে তওবা ও এস্তেগফার করলে আল্লাহ তা'আলা যথাস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে দেন না এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। কোথাও কোনো রহস্যের কারণে খেলাফও হয় ; কিন্তু তওবা ইস্তেগফারের ফলে পার্থিব বিপদাপদ দূর হয়ে যাওয়াই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার প্রচলিত রীতি। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا : এই আয়াতে তাওহীদ ও কুদরতের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সাজানোর কথা এবং তাতে চন্দ্রের আলোকোজ্জ্বল হওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে فِيْهِنَّ বলায় বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশগাত্রে অবস্থিত। কিন্তু আধুনিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত। এ সম্পর্কে সূরা ফোরকানের جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে হযরত নূহ (আ.) আরও বললেন ঃ وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا –অর্থাৎ তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিজেরাতো উৎপীড়ন করতই, উপরন্তু জনপদের গুণ্ডা ও দুষ্ট লোকদেরকেও হযরত নূহ (আ.)–এর পিছনে লেলিয়ে দিত। তারা পরস্পরে এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا অর্থাৎ আমরা আমাদের দেব-দেবী বিশেষতঃ এই পাঁচ জনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো পাঁচটি প্রতিমার নাম।

ইমাম বগভী (র.) বর্ণনা করেন, এই পাঁচ জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হযরত আদম ও নূহ (আ.)-এর আমলের মাঝামাঝি। তাঁদেরও নেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাঁদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল ঃ তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরি করে সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বোঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরি করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদতে বিশেষ পুলক অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল, তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল। তারা এই মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিমাপূজার সূচনা হয়ে গেল। উপরিউক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় পারস্পরিক চুক্তিতে তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا : অর্থাৎ এই জালেমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করা পয়গম্বরগণের কর্তব্য। হযরত নূহ (আ.) তাদের পথভ্রষ্টতার দোয়া করলেন কিভাবে? জবাব এই যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত নূহ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন তাদের মধ্যে কেউ মুসলমান হবে না। সেমতে পথভ্রষ্টতা ও কুফরের উপর তাদের মৃত্যুবরণ নিশ্চিত ছিল। হযরত নূহ (আ.) তাদের পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেওয়ার দোয়া করলেন, যাতে সত্বরই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

مِمَّا خَطِيْئٰتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا : অর্থাৎ তারা তাদের গোনাহ্ অর্থাৎ কুফর ও শিরকের কারণে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়েছে। পানিতে ডুবা ও অগ্নিতে প্রবেশ করা বাহ্যত ঃ পরস্পর বিরোধী আজাব হলেও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের পক্ষে অবাস্তব নয়। বলাবাহুল্য, এখানে জাহান্নামের অগ্নি বোঝানো হয়নি। কেননা তাতে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর প্রবেশ করবে ; বরং এটা বরযখী অগ্নি। কুরআন পাক এই বরযখী অগ্নিতে প্রবেশ করার খবর দিয়েছে।

কবরের আজাব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত : এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, বরযখ জগতে অর্থাৎ কবরের বাস করার সময়ও মৃতদের আজাব হবে! এ থেকে আরও জানা যায় যে, কবরে যখন কু-কর্মীর আজাব হবে, তখন সৎকর্মীরাও কবরে সুখ ও নিয়ামতপ্রাপ্ত হবে। সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে কবর অভ্যন্তরে আজাব ও সওয়াব হওয়ার বর্ণনা এতো অধিক ও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা হয়েছে এবং এটা স্বীকার করা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলামত।

শব্দবিশ্লেষণ :

اِسْتَغْشَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِغْشَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা জড়িয়ে নিল। আবৃত করে নেয়।

أَصَرُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصْرَارٌ মূলবর্ণ (ص - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা হঠকারিতা করল। বাড়াবাড়ি করল।

مِدْرَارٌ : মুবালাগার সীগাহ বাব ضَرَبَ . نَصَرَ মাসদার دَرٌّ মূলবর্ণ (د - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- প্রচুর বর্ষণকারী, মুষলধারে বৃষ্টি।

لَا تَرْجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– বিশ্বাসী হচ্ছে না। আশা রাখে না।

وَقَارًا : ইসম ও মাসদার, অর্থ– মহত্ত্ব, সম্মান, মর্যাদা, ইজ্জত।

فِجَاجًا : শব্দটি فَجٌّ -এর বহুবচন, অর্থ- গিরিপথ। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী প্রশস্ত রাস্তা।

كُبَّارًا : মুবালাগার সীগাহ, অর্থ– বড় বড়। অতি মহান। অনেক বড়।

لَا تَذَرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَذْرٌ মূলবর্ণ (و - ذ - ر) জিনস مثال واوى অর্থ– অবশিষ্ট রাখবেন না। ছাড়বেন না।

وُدًّا : আলম (নাম)। মারেফা। হযরত নূহ (আ.)-এর কওমের একটি মূর্তির নাম।

سُوَاعًا : একটি মূর্তির নাম।

لَا يَلِدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وِلَادَةٌ মূলবর্ণ (و - ل - د) জিনস مثال واوى অর্থ– ভূমিষ্ট হবে না।

تَبَارًا : ইসম ও মাসদার বাব ضَرَبَ.سَمِعَ অর্থ– ধ্বংস, ধ্বংস করা, বিনাশ করা, ক্ষতি করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا : এখানে واو টি আতেফা لَا تَزِدِ হলো ফে'ল الظّٰلِمِيْنَ হলো প্রথম মাফউল। আর اِلَّا হলো اداة حصر আর تَبَارًا হলো দ্বিতীয় মাফউল। আর এটা استثناء مفرغ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৮৭]

سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ

সূরা জিন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২৮, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনি বলুন, আমার নিকট ওহী এসেছে যে, জিনদের একদল কুরআন শুনেছে, অতঃপর তারা বলল, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।	قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿۱﴾
২. যা সরল পথ প্রদর্শন করে, সুতরাং আমরা তো তৎপ্রতি ঈমান এনেছি; আর আমরা নিজ প্রতিপালকের সাথে কাউকেও শরিক করব না।	يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ﴿۲﴾
৩. আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি সমুন্নত; তিনি কাউকেও না স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন আর না সন্তানরূপে।	وَّاَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ﴿۳﴾
৪. আর আমাদের মধ্যে যে নির্বোধ সে আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করত।	وَّاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿۴﴾
৫. আর আমাদের এ ধারণা ছিল যে, মানব ও জিন আল্লাহর শানে কখনো মিথ্যা উক্তি করবে না।	وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿۵﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قُلْ আপনি বলুন اُوْحِيَ اِلَيَّ আমার নিকট ওহী এসেছে اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ জিনদের একদল কুরআন শুনেছে فَقَالُوْٓا অতঃপর তারা বলল اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।

২. يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ যা সরল পথ প্রদর্শন করে فَاٰمَنَّا بِهٖ সুতরাং আমরা তো তৎপ্রতি ঈমান এনেছি وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا আর আমরা নিজ প্রতিপালকের সাথে কাউকেও শরিক করব না।

৩. وَّاَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি সমুন্নত مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً তিনি কাউকেও না স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন وَّلَا وَلَدًا আর না সন্তানরূপে।

৪. وَّاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا আর আমাদের মধ্যে যে নির্বোধ সে উক্তি করত عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি।

৫. وَّاَنَّا ظَنَنَّآ আর আমাদের এ ধারণা ছিল যে, اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ মানব ও জিন কখনো করবে না عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا আল্লাহর শানে মিথ্যা উক্তি।

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾	৬. আর মানবমণ্ডলীর মধ্যে বহু লোক এরূপ ছিল যে, তারা জিনদের কতিপয় লোকের আশ্রয় গ্রহণ করত, সুতরাং তারা ঐ জিনদের আত্মগরিমা আরো বর্ধিত করে দিল।
وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ﴿٧﴾	৭. আর [পুনরুত্থান সম্বন্ধে] তোমরা যেমন ধারণা করে রেখেছিলে, তদ্রূপ মানব সমাজও ধারণা করে রেখেছিল যে, আল্লাহ কাউকেও পুনর্জীবিত করবেন না।
وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ﴿٨﴾	৮. আর আমরা আসমানের [সংবাদসমূহ] অনুসন্ধান করতে চাইলাম, তখন আমরা আকাশকে কঠিন প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ পেলাম।
وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾	৯. আর [তৎপূর্বে] আমরা আসমানের [সংবাদ শ্রবণযোগ্য] স্থানসমূহে শোনার জন্য বসে থাকতাম; সুতরাং এখন যে কেউ শুনতে চায়, সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।
وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْۤ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾	১০. আর আমরা জানি না যে, বিশ্ববাসীদেরকে কোনো কষ্ট দেওয়াই উদ্দেশ্য, নাকি তাদের প্রভু তাদেরকে হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেছেন।
وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾	১১. আর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নেককার আর কেউ কেউ অন্য ধরনের রয়েছে; [ফলকথা] আমরা বিভিন্ন পন্থার উপর ছিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ আর মানবমণ্ডলীর বহুলোক এরূপ ছিল যে, يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ তারা জিনদের কতিপয় লোকের আশ্রয় গ্রহণ করত فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا সুতরাং তারা ঐ জিনদের আত্মগরিমা আরো বর্ধিত করে দিল।

৭. وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ আর তোমরা যেমন ধারণা করে রেখেছিলে তদ্রূপ মানব সমাজও ধারণা করে রেখেছিল اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا আল্লাহ কাউকেও পুনর্জীবিত করবেন না।

৮. وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ আর আমরা আসমানের [সংবাদসমূহ] অনুসন্ধান করতে চাইলাম فَوَجَدْنٰهَا তখন আমরা আকাশকে পেলাম مُلِئَتْ পরিপূর্ণ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا কঠিন প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা।

৯. وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ আর আমরা বসে থাকতাম مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ আসমানের স্থান সমূহে শোনার জন্য فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ সুতরাং এখন যে কেউ শুনতে চায় يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।

১০. وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْۤ আর আমরা জানি না اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ বিশ্ববাসীদেরকে কোনো কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا নাকি তাদের প্রভু তাদেরকে হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেছেন।

১১. وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ আর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নেককার وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ আর কেউ কেউ অন্য ধরনের রয়েছে كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا আমরা বিভিন্ন পন্থার উপর ছিলাম।

অনুবাদ	আয়াত
১২. আর আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহকে পরাজিত করতে পারব না, আর না পলায়ন করে তাকে পরাভূত করতে পারব।	وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾
১৩. আর আমরা যখন হেদায়েতের বাণী শুনেছি, তখন আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি; অতএব, যে নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনবে, তার না কোনো হ্রাসের আশঙ্কা থাকবে আর না বৃদ্ধির।	وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾
১৪. আর আমাদের মধ্যে কতিপয় তো মুসলমান আছে, আর আমাদের মধ্যে কতিপয় বিপথগামী আছে; অনন্তর যারা মুসলমান হয়েছে, তারা কল্যাণের পথ খুঁজে নিয়েছে।	وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾
১৫. আর যারা বিপথগামী তারা দোজখের ইন্ধন।	وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾
১৬. আর যদি তারা সরল পথে থাকত, তবে আমি তাদেরকে সচ্ছলতার পানি দ্বারা তৃপ্ত করতাম।	وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾
১৭. যেন তাতে তাদের পরীক্ষা করতে পারি; আর যে নিজ প্রতিপালকের স্মরণ হতে ফিরে থাকবে, আল্লাহ তাকে কঠিন আজাবে লিপ্ত করবেন।	لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. وَأَنَّا ظَنَنَّا আর আমরা বুঝতে পেরেছি যে, أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ আমরা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহকে পরাজিত করতে পারব না وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا আর না পলায়ন করে তাকে পরাভূত করতে পারব।

১৩. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ আর আমরা যখন হেদায়েতের বাণী শুনেছি آمَنَّا بِهِ তখন আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ অতএব, যে নিজের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনবে فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا তার না কোনো হ্রাসের আশঙ্কা থাকবে আর না বৃদ্ধির।

১৪. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ আর আমাদের মধ্যে কতিপয় তো মুসলমান আছে وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ আর আমাদের মধ্যে কতিপয় বিপথগামী আছে فَمَنْ أَسْلَمَ অনন্তর যারা মুসলমান হয়েছে فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا তারা কল্যাণের পথ খুজে নিয়েছে।

১৫. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ আর যারা বিপথগামী فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا তারা দোজখের ইন্ধন।

১৬. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ আর যদি এরা সরল পথে থাকত لَأَسْقَيْنَاهُم তবে আমি তাদেরকে তৃপ্ত করতাম مَّاءً غَدَقًا সচ্ছলতার পানি দ্বারা।

১৭. لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ যেন তাতে তাদের পরীক্ষা করতে পারি وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ আর যে নিজ প্রতিপালকের স্মরণ হতে ফিরে থাকবে يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا আল্লাহ তাকে কঠিন আজাবে লিপ্ত করবেন।

১৮. আর যত সেজদা আছে, তা সমস্তই আল্লাহর হক, সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করো না।	وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٨﴾
১৯. আর যখন আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা আল্লাহর ইবাদত করতে দাঁড়ায়, তখন তারা ঐ বান্দার উপর ভিড় করতে উদ্যত হয়।	وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾
২০. আপনি বলে দিন যে, আমি তো কেবল আমার প্রভুর ইবাদত করছি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করি না।	قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٠﴾
২১. আপনি বলে দিন, আমি না তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা রাখি আর না কোনো হিত সাধনের।	قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾
২২. আপনি বলে দিন, আমাকে আল্লাহ হতে না কেউ রক্ষা করতে পারবে, আর না তিনি ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয় পেতে পারি।	قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾
২৩. কেবল আল্লাহর পক্ষ হতে [সংবাদ] পৌঁছানো এবং তাঁর পয়গাম পালন করাই আমার কর্তব্য; আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে,তবে নিশ্চয় তাদের জন্য দোজখের অগ্নি রয়েছে, যাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে।	اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ আর যত সেজদা আছে তা সমস্তই আল্লাহর হক فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করো না।

১৯. وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ আর যখন আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা আল্লাহর ইবাদত করতে দাঁড়ায় كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا তখন তারা ঐ বান্দার উপর ভিড় করতে উদ্যত হয়।

২০. قُلْ আপনি বলে দিন যে اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ আমিতো কেবল আমার প্রভুর ইবাদত করছি وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا এবং তার সাথে কাউকেও শরিক করি না।

২১. قُلْ আপনি বলে দিন اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ আমি না তোমাদের ক্ষমতা রাখি ضَرًّا কোনো ক্ষতি সাধনের وَّلَا رَشَدًا আর না কোনো হিত সাধনের।

২২. قُلْ আপনি বলে দিন لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ আমাকে আল্লাহ হতে না কেউ রক্ষা করতে পারবে وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا আর না তিনি ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয় পেতে পারি।

২৩. اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ কেবল আল্লাহর পক্ষ হতে পৌঁছানো এবং তার পয়গাম পালন করাই আমার কর্তব্য وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ তবে নিশ্চয়ই তাদের জন্য দোজখের অগ্নি রয়েছে। خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا যাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে।

অনুবাদ	আয়াত
২৪. এমনকি যখন তারা সে বস্তু দেখতে পাবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, তখন জানতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার দল সংখ্যা-লঘিষ্ঠ।	حَتّٰۤى اِذَا رَاَوۡا مَا يُوۡعَدُوۡنَ فَسَيَعۡلَمُوۡنَ مَنۡ اَضۡعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ﴿۲۴﴾
২৫. আপনি বলে দিন আমি অবগত নই, যে বস্তুর প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তা নিকটবর্তী, নাকি আমার প্রতিপালক তার জন্য কোনো দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারিত করে রেখেছেন।	قُلۡ اِنۡ اَدۡرِىۡۤ اَقَرِيۡبٌ مَّا تُوۡعَدُوۡنَ اَمۡ يَجۡعَلُ لَهٗ رَبِّىۡۤ اَمَدًا ﴿۲۵﴾
২৬. তিনিই গায়বি বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব, তিনি তাঁর গায়বি বিষয় সম্বন্ধে কাউকেও অবহিত করেন না।	عٰلِمُ الۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلٰى غَيۡبِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾
২৭. কিন্তু হ্যাঁ, নিজের মনোনীত কোনো রাসূলকে তখন এরূপে জানান যে, ঐ রাসূলের সম্মুখে ও পশ্চাৎ দিকে প্রহরী ফেরেশতাদেরকে পাঠান।	اِلَّا مَنِ ارۡتَضٰى مِنۡ رَّسُوۡلٍ فَاِنَّهٗ يَسۡلُكُ مِنۡۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهٖ رَصَدًا ﴿۲۷﴾
২৮. যেন আল্লাহ জানতে পারেন যে, ঐ ফেরেশতাগণ স্বীয় প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছিয়েছেন, আর আল্লাহ তাদের সকল অবস্থা বেষ্টন করে আছেন এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা অবগত আছেন।	لِّيَعۡلَمَ اَنۡ قَدۡ اَبۡلَغُوۡا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمۡ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيۡهِمۡ وَاَحۡصٰى كُلَّ شَىۡءٍ عَدَدًا ﴿۲۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. حَتّٰۤى اِذَا رَاَوۡا এমনকি যখন তারা সে বস্তু দেখতে পাবে مَا يُوۡعَدُوۡنَ যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে فَسَيَعۡلَمُوۡنَ তখন জানতে পারবে। مَنۡ اَضۡعَفُ نَاصِرًا কার সাহায্যকারী দুর্বল। وَّاَقَلُّ عَدَدًا কার দল সংখ্যা লঘিষ্ঠ।

২৫. قُلۡ আপনি বলে দিন اِنۡ اَدۡرِىۡۤ আমি অবগত নই اَقَرِيۡبٌ مَّا تُوۡعَدُوۡنَ যে বস্তুর প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তা নিকটবর্তী। اَمۡ يَجۡعَلُ لَهٗ رَبِّىۡۤ اَمَدًا নাকি আমার প্রতিপালক তার জন্য কোনো দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারিত করে রেখেছেন।

২৬. عٰلِمُ الۡغَيۡبِ তিনি অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা فَلَا يُظۡهِرُ অতএব তিনি অবহিত করেন না। عَلٰى غَيۡبِهٖۤ اَحَدًا তিনি তার গায়বি বিষয় সম্বন্ধে কাউকেও।

২৭. اِلَّا مَنِ ارۡتَضٰى مِنۡ رَّسُوۡلٍ কিন্তু হ্যাঁ, নিজের মনোনীত কোনো রাসূলকে। فَاِنَّهٗ يَسۡلُكُ مِنۡۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهٖ رَصَدًا তখন এই রূপে জানান যে, ঐ রাসূলের সম্মুখে ও পশ্চাৎ দিকে প্রহরী ফেরেশতাদেরকে পাঠান।

২৮. لِّيَعۡلَمَ যেন আল্লাহ জানতে পারেন اَنۡ قَدۡ اَبۡلَغُوۡا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمۡ ঐ ফেরেশতাগণ স্বীয় প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছিয়েছেন وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيۡهِمۡ আর আল্লাহ তাদের সকল অবস্থা বেষ্টন করে আছেন। وَاَحۡصٰى كُلَّ شَىۡءٍ عَدَدًا আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা অবগত আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত 'আল-জিন্ন' শব্দটি এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা এ সূরাতে জিনদের কুরআন শ্রবণ এবং ঈমান আনয়ন করে স্বজাতির লোকদের নিকট প্রচার করার কথা বিবৃত হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ২৮টি আয়াত, ২৮৫টি বাক্য এবং ৮৭০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীসহ হাদীস শরীফের বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর কয়েকজন সাহাবীসহ উকায নামক বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নাখলা নামক স্থানে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। এমতাবস্থায় জিনদের একটি বাহিনী সে অঞ্চল অতিক্রম করে যাচ্ছিল। কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনে তারা থেমে গেল এবং গভীর মনোনিবেশের সাথে কুরআনের বাণী শ্রবণ করল। এ প্রেক্ষিতে সূরা আল-জিন্ন অবতীর্ণ হয়েছিল।

অধিক সংখ্যক তাফসীরকার এ বর্ণনার ভিত্তিতে মনে করেছেন যে, আসলে তা প্রখ্যাত তায়েফ যাত্রাকালীন একটি ঘটনা। হিজরতের তিন বছর পূর্বে অর্থাৎ নবুয়তের দশম বর্ষে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু কয়েকটি কারণে এ ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ তায়েফ সফরকালে জিনদের যে কুরআন শ্রবণের ঘটনা ঘটেছে তা একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। সূরা আহকাফে তার ব্যাখ্যা রয়েছে। আর জিনগণ কুরআন শুনে ঈমান আনয়নের পূর্ব থেকেই তারা হযরত মূসা (আ.) ও আসমানি কিতাবাদির উপর ঈমান রাখত। অত্র সূরার ২ থেকে ৭ পর্যন্ত আয়াতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, এ সময় কুরআন শ্রবণকারী জিনেরা বহু সংখ্যক ছিল, আর তারা মুশরিক ছিল। ইতিহাসের বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তায়েফ সফরকালে কেবল হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গী ছিলেন।

আর উকায নামক বাজারে সফরকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অনেক সাহাবী সঙ্গী ছিলেন। অনেকগুলো হাদীসের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, অত্র সফরে সঙ্গী জিনেরা রাসূলে কারীম ﷺ থেকে কুরআন শুনেছিল। আর এ সফরটি ছিল তায়েফের সফরের পর মক্কা হতে প্রত্যাবর্তনকালে অর্থাৎ উকায বাজারের দিকে যাওয়ার কালে নাখলা নামক স্থানে ফজরের নামাজ পড়ার সময় কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের ঘটনা।

এসব কারণে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সূরা আহকাফ ও সূরা আল-জিন্ন একই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি; বরং দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ছিল।

আর জিনগণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইচ্ছাকৃত কুরআন শ্রবণ করাননি; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবীকে সাথে করে উকায বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। আর এ মুহূর্তে শয়তান যখন আকাশের مَلَأْ اَعْلٰى তে আল্লাহ কি আলোচনা করেছেন তা শ্রবণ করতে যেয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ شِهَابٌ ثَاقِبٌ দ্বারা তাদেরকে আঘাত করা হয় তখনই তারা পরস্পর একত্রিত হয়ে যুক্তি করল যে, আকাশের সংবাদ নেওয়ার কাজে আমরা যে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি দুনিয়াতে এমন কিছু ঘটেছে যা আমাদের আসমানি সংবাদ নেওয়ার কাজে বাধা দানকারী হয়েছে, সুতরাং مَشْرِقْ থেকে مَغْرِبْ এবং شِمَالْ থেকে جُنُوْب পর্যন্ত গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। অতএব, তাদের আলোচনা মোতাবেক হেজাজ -এর তেহামাহ নামক স্থানে যে দল পৌঁছল তারা 'নাখলা' নামক স্থানে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ফজরের নামাজ পড়তে দেখল। সে স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফজরের নামাজের কেরাত শ্রবণ করে তারা পরস্পর শপথ করে বলাবলি করতে লাগল যে, এটাই আমাদের আসমানি সংবাদ নেওয়ার কাজে বাধাদানকারী বিষয়। তখন তারা তাদের অন্যান্যদের নিকট গিয়ে কুরআন শ্রবণের ঘটনা বর্ণনা করল। ভাষাটি ছিল اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا -[মা'আরিফ]

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরায় জিনদের আসমানি সংবাদ সংগ্রহের পথ বন্ধ হওয়ার কারণ উদঘাটন করতে গিয়ে মহানবীর কণ্ঠে কুরআন শ্রবণ করে বিমোহিত হওয়া এবং ঈমান আনা অতঃপর স্বজাতির মধ্যে প্রচার করার কথা বলা হয়েছে। প্রথম থেকে ১৫ পর্যন্ত আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক জিন কুরআনের বাণী শুনে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রচার করেছে, যা নবী করীম ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে। জিনগণ স্বজাতির নিকট গিয়ে বলেছে, আমরা এমন এক বিস্ময়কর বাণী শুনেছি যা মানব ও জিন সম্প্রদায়ের জন্য সত্য পথের দিশা দেয়। আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। কখনো আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকেও শরিক করবো না। তিনি মহান, তাঁর স্ত্রী-পুত্র কিছুই নেই কিন্তু আমাদের মধ্যে নির্বোধগণ আল্লাহর শানে অবাস্তব উক্তি করে থাকে। আমরা জানতাম, মানুষ ও জিন আল্লাহ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা উক্তি করতে পারে না। কতিপয় মানুষ জিনদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাদের অহমিকা বাড়িয়ে দেয়।

মানুষ এ মিথ্যা ধারণায় নিপতিত রয়েছে। আমরা যখন আসমানের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে যাই, তখনই আমরা বাধাপ্রাপ্ত হই এবং কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আসমানকে পরিপূর্ণ পাই। আমরা আসমানে কোনো এক গোপন স্থানে আরশের ফয়সালাকৃত সংবাদসমূহ জানার জন্য এর পূর্বে ওঁৎ পেতে বসে থাকতাম; কিন্তু এখন কেউ অনুরূপ বসলে সে জ্বলন্ত শেলের তাড়া খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের এ সংবাদ সংগ্রহের দ্বার বন্ধকরণ দ্বারা আল্লাহ পৃথিবীবাসীর অমঙ্গল চান, না পথের দিশা দিতে চান তা আমরা কিছুই বলতে পারি না। আমাদের মধ্যে অনেক নেককার ও পাপিষ্ঠ রয়েছে। আমরা আল্লাহকে কোনোক্রমেই পরাভূত করতে পারবো না। তাঁর আবেষ্টনীর মধ্যেই আমাদের আহ্বান। আমরা সত্যের বাণী শুনে ঈমান এনেছি। যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে তাদের পুরস্কার লাঘব হওয়া এবং শাস্তি বৃদ্ধির কোনো আশঙ্কা নেই। আমাদের মধ্যে কিছু রয়েছে মুসলমান এবং কিছু অমুসলমান। যারা হেদায়েত গ্রহণ করে তারা চিন্তা-ভাবনা করার পরই তা গ্রহণ করে। আর যারা জালেম ও সীমালঙ্ঘনকারী তারা কিছুই চিন্তা-ভাবনা করে না। তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

১৬ থেকে ১৮ নং আয়াত পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষকে শিরক পরিহার করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা শিরক বর্জন করবে তারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করতে পারবে। আর যারা তা করবে না তারা চরম ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

১৯ থেকে ২৩ নং আয়াত পর্যন্ত মক্কার কাফেরগণকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আল্লাহর নবী যখন ইবাদতে দণ্ডায়মান হয় তখন তোমরা তাঁর প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ো। অথচ তিনি একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করেন, তাঁর সাথে কাউকেও অংশীদার সাব্যস্ত করেন না। নবী তোমাদের অনিষ্ট বা কল্যাণ কিছুই করতে পারেন না। ভালোমন্দ করার কোনো কিছু তাঁর হাতে নেই। তা করার অধিপতি একমাত্র আল্লাহ। রাসূলের দায়িত্ব হলো মানুষের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেওয়া। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্বীকার করে না, তারা চিরন্তনভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

২৪ থেকে ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি শাস্তি আগমনের সময় জানতে চাচ্ছ। তা অতি নিকটে না দীর্ঘ দিন পর হবে, নবী তা কিছুই জানেন না। তোমরা নবী এবং তাঁর দলবলকে ক্ষুদ্র ও দুর্বল ভাবছ। তোমরা স্মরণ রেখো! সে শাস্তি যখন প্রত্যক্ষ করবে, তখনই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবে যে, কারা দুর্বল এবং কারা সংখ্যায় স্বল্প। আল্লাহ তা'আলা গায়েবী বিষয় সম্পর্কে তাঁর মনোনীত নবী ব্যতীত কাউকেও অবহিত করেন না। একমাত্র নবুয়তের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই তাঁকে এ বিষয় অবিহত করা হয়। নবীর দায়িত্ব হলো আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেওয়া : এ পয়গাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ ফেরেশতাগণকে প্রহরী ও সংরক্ষকরূপে নিয়োজিত করেন। সব কিছুই তাঁর আবেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা নূহে ইরশাদ হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল। আর এ সূরায় জিনদের ঈমান আনয়নের কথা রয়েছে যে, তারা কুরআনে হাকীম শ্রবণ করে তার প্রতি ঈমান এনেছে, আর মানুষ বিশেষত মক্কার কাফেররা কুরআনে কারীমের প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি। আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, আমি অনেক দিন যাবৎ দু'সূরার সম্পর্কের বিষয়টি চিন্তা করেছি। অবশেষে আমার নিকট যা প্রকাশ পেয়েছে, তা হলো সূরা নূহে রয়েছে–

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُّرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا.

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপ্রিয়। যদি তোমরা তাঁর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হও, তবে তিনি আসমান থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। -[আয়াত : ১১]

আর সূরা আল-জিন্নে রয়েছে– وَاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّاۤءً غَدَقًا অর্থাৎ যদি এ কাফেররা সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তবে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সমৃদ্ধ করতাম। -[আয়াত : ১৬] –[নূরুল কুরআন]

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا (١)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিনদের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে তেলাওয়াত করেননি এবং তাদের তিনি দেখেনও নি। একবার রাসূল ﷺ সাহাবীদের একদল নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তখন আসমান থেকে খবর সংগ্রহের পথ শয়তান জিনদের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের দিকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হতো। তাই শয়তান জিনরা স্বসম্প্রদায়ে ফিরে আসে। তারা এদের বলল, তোমাদের কি ব্যাপার? এরা বলল, আসমান থেকে খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা বাধা পাচ্ছি। আমাদের উপর উল্কাপিণ্ড ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে। এরা বলল, নতুন কোনো ব্যাপার ঘটেছে বলেই আসমান থেকে খবর সংগ্রহের বিষয়ে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। জমিনের পূর্ব পশ্চিম সব দিকে বেরিয়ে পড়। দেখ সেটি কি যা আমরা ও আমাদের আকাশের খবর সংগ্রহের মাঝে বাধা সৃষ্টি করেছে। তারপর তারা রওয়ানা হলো এবং পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম সব দিক ঘুরে তালাশ করতে লাগল। (আরবের)

হিতমা অঞ্চলের দিকে যে দলটি যাত্রা করেছিল, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে ফিরে এলো। তিনি উকায বাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা পথে নাখলায় অবস্থান করেছিলেন। তিনি তার সাহাবী নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। জিনদের এই দল যখন কুরআনের আওয়াজ শুনল তখন তারা এই দিকে কান পাতল এবং পরস্পর বলল আল্লাহর কসম! এই জিনিসই তোমাদের এবং আকাশের খবর সংগ্রহের মাঝে বাধা সৃষ্টি করেছে। এখান থেকেই তারা নিজেদের কওমে ফিরে যায় এবং বলে হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি যা সঠিক পথ নির্দেশ করে ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে কাউকে শরিক করব না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তার নবীর উপর এই আয়াত জিনদের বক্তব্যসহ নাজিল করেন। –(তিরমিযি ২:১৭২, বুখারী শরীফ : ৭২২)

وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا (٣)

শানে নুযূল : কারদাম বিন আবি সায়েব তার পিতার সাথে কোনো কাজের জন্য মদিনায় যায়। পথে তারা জনৈক রাখালের কাছে রাত্রি কাটাল। সেখানে তারা দেখল যে, রাত্র যখন অর্ধেক হলো তখন একটি বাঘ এসে একটি বকরির বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছে। তখন রাখাল চিৎকার দিয়ে বলল যে, হে মরুভূমির মালিক, আমি তোমার প্রতিবেশী তখন কেউ জবাব দিল যে, হে বাঘ ওকে ছেড়ে দাও তখন বাঘটি বকরির বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। বকরির বাচ্চাটি দ্রুত দৌড়ে চলে এলো। সে ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়। –(কুরতুবী)

وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا (١٦)

শানে নুযূল : এই আয়াত কুরাইশ কাফেরদের সম্পর্কে নাজিল হয়। যখন সাত বৎসর যাবত বৃষ্টি বন্ধ ছিল।
–(কানুযুল নুকূল : ১০৪)

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا (١٨)

শানে নুযূল : একদা জিনেরা নবী করীম ﷺ -এর কাছে আরজ করল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো আপনার থেকে দূরে রয়েছি। আমরা কিভাবে মসজিদে আসব, কিভাবে জামাতে শরিক হবো, তখন এই আয়াত নাজিল হয়।
–(মুখতাছার ইবনে কাসীর ৩:৫৫৯)

قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا (٢٢)

শানে নুযূল : জিনদের এক সর্দার তার মুরীদদের কাছে বলেছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর আশ্রয় চায় অথচ আমি চাই যে, সে যেন আমার আশ্রয়ে চলে আসে। তখন আল্লাহ পাক এই আয়াত নাজিল করেন। –(কানযুন নুকূল : ১০৪)
نَفَرٌ- نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ শব্দটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা জ্ঞাপন করে। বর্ণিত আছে যে, আয়াতে আলোচিত জিনদের সংখ্যা নয় ছিল। তারা ছিল নছীবাইনের অধিবাসী।

জিনদের স্বরূপ ঃ জিন আল্লাহ তা'আলার এক প্রকার শরীরী,আত্মাধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টজীব। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। এ কারণেই তাদেরকে জিন বলা হয়। জিন এর শাব্দিক অর্থ গুপ্ত। মানবসৃষ্টির প্রধান উপকরণ যেমন মৃত্তিকা, তেমনি জিন সৃষ্টির প্রধান উপকরণ অগ্নি। এই জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নর ও নারী আছে এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যমান আছে। কুরআন পাকে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, বাহ্যত ঃ তারাও জিনদের দুষ্ট শ্রেণির নাম। জিন ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার করা কুফর। –(মাযহারী)
قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ –থেকে জানা গেল যে, এখানে বর্ণিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ জিনদেরকে স্বচক্ষে দেখেননি। আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করেছেন।

সূরা জিন অবতরণের ঘটনা ঃ সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ জিনদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন শোনাননি এবং তিনি তাদেরকে দর্শনও করেননি। এই ঘটনা তখনকার, যখন শয়তানদেরকে আকাশের খবর শোনা থেকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়েছিল। এ সময়ে জিনরা পরস্পরে পরামর্শ করল যে, আকাশের খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এই ব্যাপারটি কোনো আকস্মিক ঘটনা মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোনো নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ও আনাচে-কানাচে জিনদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ খোঁজাখুঁজি করে এই নতুন ব্যাপারটি কি, তা

জেনে আসবে। হেজাযে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিদল যখন 'নাখলা' নামক স্থানে উপস্থিত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়ছিলেন। জিনদের এই প্রতিনিধিদল নামাজে কুরআন পাঠ শুনে পরস্পরে শপথ করে বলতে লাগল ঃ এই কালামই আমাদের ও আকাশের খবরাদির মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির কাছে ঘটনা বিবৃত করল এবং বলল ঃ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا আল্লাহ তা'আলা এসব আয়াতে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর রাসূলকে অবহিত করেছেন।

আবূ তালেবের ওফাত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তায়েফ গমন : অধিকাংশ তাফসীরেবিদ বলেন : আবূ তালেবের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় অসহায় ও অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। তখন তিনি স্বগোত্রের অত্যাচার ও নিপীড়নের মোকাবিলায় তায়েফের ছাকীফ্ গোত্রের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে একাকীই তায়েফে গমন করলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফে পৌছে ছাকীফ গোত্রের সরদার ও সম্ভ্রান্ত ভ্রাতৃত্রয়ের কাছে গেলেন। এই ভ্রাতৃত্রয় ছিল ওমায়রের পুত্র আবদে ইয়ালীল, সউদ ও হাবীব। তাদের গৃহে একজন কুরাইশ মহিলা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং স্বগোত্রের নিপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু জবাবে ভ্রাতৃত্রয় অশোভন আচরণ করে এবং তাঁর সাথে কথা বলতে অস্বীকার করে।

ছাকীফ গোত্রের গণ্যমান্য তিন ব্যক্তির কাছ থেকে নিরাশ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আপনারা যদি আমাকে সাহায্য না-ই করেন, তবে কমপক্ষে আমার আগমনের কথা কুরাইশদের কাছে প্রকাশ করবেন না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কুরাইশরা জানতে পারলে অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু তারা একথাও মানল না বরং গোত্রের দুষ্ট লোকদেরকে তাঁর উপর লেলিয়ে দিল। তারা তাঁকে গালিগালাজ করল ও তাঁর পিছু পিছু হট্টগোলের সৃষ্টি করতে থাকল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উৎপাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আঙ্গুর বাগানে প্রবেশ করলেন। বাগানের মালিক ওতবা শায়বা বাগানে উপস্থিত ছিল। তখন দুষ্টরা তাঁকে ছেড়ে ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুর বৃক্ষের ছায়ায় বসে গেলেন। ওতবা ও শায়বা ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে দেখছিল। তারা আরও লক্ষ্য করছিল যে, গোত্রের দুষ্ট লোকদের হাতে তিনি উৎপীড়িত হয়েছেন। ইতিমধ্যে সেই কুরাইশী মহিলাও বাগানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করল। তিনি মহিলার কাছে তার শ্বশুরালয়ের লোকদের মন্দ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলেন।

এই বাগানে বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কিছুটা স্বস্তি লাভ করলেন, তখন আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন। এরূপ অভিনত ভাষায় দোয়া তিনি আর কখনও করেছেন বলে বর্ণিত নেই। দোয়াটি এই :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَشْكُوْ اِلَيْكَ ضِعْفَ قُوَّتِىْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِىْ وَهَوَانِىْ عَلَى النَّاسِ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَاَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فَاَنْتَ رَبِّىْ اِلٰى مَنْ تَكِلُنِىْ اِلٰى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِىْ اَوْ اِلٰى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ اَمْرِىْ اِنْ لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَىَّ فَلَا اُبَالِىْ وَلٰكِنَّ عَافِيَتَكَ هِىَ اَوْسَعُ لِىْ اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مِنْ اَنْ تُنْزِلَ بِىْ غَضَبَكَ لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি আমার শক্তির দুর্বলতার, কৌশলের স্বল্পতার এবং লোকচক্ষুতে হেয়তার অভিযোগ করছি। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং আপনি দুর্বলদের সহায়, আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি আমাকে কার কাছে সমর্পণ করেন– পরের কাছে? যে আমাকে আক্রমণ করে; না কোনো শত্রুর কাছে, যাকে আমার মালিক করে দিয়েছেন (ফলে যা ইচ্ছা, তাই করবে?) আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন, তবে আমি কোনো কিছুরই পরওয়া করি না। আপনার নিরাপত্তা আমার জন্য শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। (আমি তা চাই।) আমি আপনার নূরের আশ্রয় গ্রহণ করি, যা দ্বারা সমস্ত অন্ধকার আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায় এবং ইহকাল ও পরকালের সব কাজ সঠিক হয়ে যায়। আশ্রয় গ্রহণ করি আপনার গজবে পতিত হওয়া থেকে। আপনাকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের কাজ। আমরা কোনো অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারি না এবং কোনো পুণ্য অর্জন করতে পারি না আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে। –[মাযহারী]

ওতবা ও শায়বা ভ্রাতৃদ্বয় এই অবস্থা দেখে দয়ার্দ্র হলো এবং 'আদ্দাস' নামক তাদের এক খ্রিস্টান গোলামকে ডেকে বলল : একগুচ্ছ আঙ্গুর একটি পাত্রে রেখে ঐ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাও এবং তাকে তা খেতে বলো। গোলাম তাই করল। সে আঙ্গুরের পাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রেখে দিল। তিনি বিসমিল্লাহ বলে পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন। 'আদ্দাস' এই দৃশ্য দেখে বলল : আল্লাহর কসম, বিসমিল্লাহির রহমানির-রাহিম বাক্যটি তো এই শহরের অধিবাসীরা বলে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আদ্দাস, তুমি কোনো শহরের অধিবাসী? তোমার ধর্ম কি? আদ্দাস বলল : আমি

খ্রিস্টান এবং আমার জন্মস্থান 'নায়নুয়া' শহরে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ভালো কথা। তাহলে তুমি আল্লাহর সৎবান্দা ইউনুস ইবনে মাতা' (আ.)-এর শহরের অধিবাসী। সে বলল : আপনি ইউনুস ইবনে মাতাকে চিনেন কিরূপে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তিনি তো আমার ভাই। কেননা তিনি যেমন আল্লাহর নবী, তেমনি আমিও আল্লাহর নবী।

একথা শুনে আদ্দাস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদতলে লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর মস্তক ও হস্তপদ চুম্বন করল। ওতবা ও শায়বা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখেছিল। তাদের একজন অপরজনকে বলল : লোকটি তো আমাদের গোলামকে নষ্ট করে দিল। অতঃপর আদ্দাস তাদের কাছে ফিরে এলে তারা বলল : আদ্দাস, তুমি লোকটির হস্তপদ চুম্বন করলে কেন? সে বলল : আমার প্রভুগণ, এসময়ে পৃথিবীর বুকে তাঁর চেয়ে উত্তম কোনো মানুষ নেই। তিনি আমাকে এমন একটি কথা বলেছেন, যা নবী ব্যতীত কারও বলার সাধ্য নেই। তারা বলল : আরে পাজী, লোকটি তোমাকে ধর্মচ্যুত না করে দেয়নি তো। তোমার ধর্ম তো সর্বাবস্থায় তার ধর্মের চেয়ে ভালো।

এরপর তায়েফবাসীদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ফেরার পথে তিনি 'নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করে শেষরাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজ শুরু করেন। ইয়ামনের নছীবাইন শহরের জিনদের এক প্রতিনিধি দলও তখন সেখানে অবস্থানরত ছিল। তারা কুরআন পাঠ শুনল বিশ্বাসস্থাপন করল। অতঃপর তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তারই আলোচনা করেছেন।–(মাযহারী)

জনৈক সাহাবী ও জিনের ঘটনা ঃ ইবনে জাওযী (র.) "আছ-ছফওয়া" গ্রন্থে হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক জায়গায় জনৈক বৃদ্ধ জিনকে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে দেখেন। সে পশমের জোব্বা পরিহিত ছিল। হযরত সাহল (রা.) বলেন ঃ নামাজ সমাপনান্তে আমি তাকে সালাম করলে সে জবাব দিল ও বলল ঃ তুমি এই জোব্বার চাকচিক্য দেখে বিস্মিত হচ্ছ? জোব্বাটি সাতশ' বছর ধরে আমার গায়ে আছে। এই জোব্বা পরিধান করেই আমি হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করেছি। অতঃপর এই জোব্বা গায়েই আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর দর্শন লাভ করেছি। যেসব জিন সম্পর্কে 'সূরা জিন' অবতীর্ণ হয়েছে, আমি তাদেরই একজন।–(মাযহারী)

হাদীস বর্ণিত লায়লাতুল-জিনের ঘটনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইচ্ছাকৃতভাবে জিনদের কাছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মক্কার অদূরে জঙ্গলে যাওয়া এবং কুরআন শোনানো উল্লেখিত আছে। এটা বাহ্যত ঃ সূরায় বর্ণিত কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা। আল্লামা খাফফাযী বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, জিনদের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একবার দু'বার নয়-ছয় বার আগমন করেছিল। অতএব, সূরার বর্ণনা ও হাদীসের বর্ণনার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই।

وَاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا : جَدّ শব্দের অর্থ শান, অবস্থা। আল্লাহ তা'আলার জন্যে বলা হয়। تَعٰلٰى جَدُّهٗ –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শান উর্ধ্বে। এখানে সর্বনামের পরিবর্তে رَبّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এতে শান উর্ধ্বে হওয়ার প্রমাণও এসে গেছে। কেননা যিনি সৃষ্টির পালনকর্তা তাঁর শানে যে উর্ধ্বে, তা বলাই বাহুল্য।

وَاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا وَاَنَّا ظَنَنَّـآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا : شَطَطٌ –শব্দের অর্থ অবান্তর কথা, অন্যায় ও জুলুম। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন জিনরা এ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে ঃ আমাদের সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা আল্লাহ তা'আলার শানে অবান্তর কথাবার্তা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম না যে, কোনো মানব অথবা জিন আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারে। তাই বোকাদের কথায় আমরা আজ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিলাম। এখন কুরআন শুনে আমাদের চক্ষু খুলেছে।

وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا : এই আয়াতে মুমিন জিনরা বলেছে ঃ মূর্খতাযুগে মানুষ যখন কোনো বিজন প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন প্রান্তরের জিনদের আশ্রয় গ্রহণ করত। এতে জিনরা মনে করে বসল আমরা মানবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানবও আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। এতে জিনদের পথভ্রষ্টতা আরও বেড়ে যায়।

জিনদের প্রেরণায় হযরত রাফে ইবনে ওমায়র (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ : তাফসীরে মাযহারীতে আছে 'হাওয়াতিফুল-জিন্ন' কিতাবে হযরত রাফে ইবনে ওমায়র (রা.) সাহাবীর ইসলাম গ্রহণের অন্যতম কারণ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন : এক রাত্রিতে আমি মরুভূমিতে সফর করছিলাম। হঠাৎ নিদ্রাভিভূত হয়ে আমি উট থেকে নেমে গেলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের পূর্বে আমি স্বগোত্রের অভ্যাস অনুযায়ী এই বাক্য উচ্চারণ করলাম : اِنِّىْ اَعُوْذُ بِعَظِيْمِ هٰذَا الْوَادِىْ مِنَ الْجِنِّ অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের জিন্ন সরদারের আশ্রয়গ্রহণ করছি। অতঃপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তির হাতে একটি অস্ত্র। সে আমার উটের বুকে তা দ্বারা আঘাত করতে চায়। আমি ত্রস্ত হয়ে উঠে পড়লাম এবং ডানে-বামে দৃষ্টিপাত করে কিছুই দেখতে পেলাম না। মনে মনে বললাম :

এটা শয়তানী কুমন্ত্রণা, আসল স্বপ্ন নয়। অতঃপর নিদ্রায় বিভোর হয়ে গেলাম। পুনরায় সেই স্বপ্ন দেখে উঠে পড়লাম। এবারও উটের চতুষ্পার্শ্বে কিছুই দেখলাম না কিন্তু উটটি কেন জানি থরথর করে কাঁপছিল। আমি আবার নিদ্রিত হয়ে সেই একই স্বপ্ন দেখলাম। জাগ্রত হয়ে দেখি, আমার উটটি ছটফট করছে এবং একজন যুবক বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি স্বপ্নে যে যুবককে দেখেছিলাম, সে সেই যুবক। সাথে সাথে দেখলাম, জনৈক বৃদ্ধ যুবকের হাত ধরে রেখেছে এবং উটকে আঘাত হানতে নিষেধ করেছে। ইতিমধ্যে তিনটি বন্য গর্দভ সামনে এসে গেলে বৃদ্ধ যুবককে বলল : এই তিনটির মধ্যে যেটি তোমার পছন্দ হয়, নিয়ে যাও এবং এই লোকটির উট ছেড়ে দাও। যুবক একটি বন্য গর্দভ নিয়ে চলে গেল। অতঃপর বৃদ্ধ আমাকে বলল : হে বোকা মানব! তুমি কোনো প্রান্তরে অবস্থান করে যদি জিন্নদের উপদ্রব আশঙ্কা কর, তবে এ কথা বলো : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ رَبِّ مُحَمَّدٍ مِنْ هَوْلِ هٰذَا الْوَادِىْ অর্থাৎ আমি এই প্রান্তরের ভয় ও অনিষ্ট থেকে মুহাম্মদের পালনকর্তা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। এরপর কোনো জিন -এর আশ্রয় গ্রহণ করো না। কেননা সেদিন গত হয়ে গেছে, যখন মানুষ জিনদের আশ্রয় গ্রহণ করত। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম : মুহাম্মদ কে? সে বলল : ইনি আরব নবী প্রাচ্যেরও নন, প্রতীচ্যেরও নন। তিনি সোমবারে প্রেরিত হয়েছেন। আমি জিজ্ঞাস করলাম, তিনি কোথায় থাকেন? সে বলল : ইনি খর্জুর-বস্তি ইয়াসরিবে (মদিনায়) থাকেন। অতঃপর প্রত্যুষেই আমি মদিনার পথ ধরলাম। দ্রুত উট হাঁকিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মদিনায় পৌঁছে গেলাম। রাসূলে কারীম ﷺ আমাকে দেখে আমার আদ্যোপান্ত ঘটনা বলে দিলেন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা.) এই ঘটনা বর্ণনা করে বলতেন : আমাদের মতে এই ঘটনা সম্পর্কে কুরআন পাকে وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ এ আয়াতখানি নাজিল হয়েছে। وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا -আরবি অভিধানে سَمَاءٌ শব্দের অর্থ যেমন আকাশ, তেমনি মেঘমালা অর্থেও এর ব্যবহার ব্যাপক ও সুবিদিত। এখানে বাহ্যত ঃ এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

জিনরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্যে মেঘমালা পর্যন্ত গমন করতো–আকাশ পর্যন্ত নয় ঃ জিন ও শয়তানরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্যে আকাশ পর্যন্ত যাওয়ার অর্থ মেঘমালা পর্যন্ত যাওয়া। এর প্রমাণ বোখারীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর এই হাদীস ঃ

قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْاَمْرَ الَّذِىْ قُضِىَ فِى السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهٗ فَتَتَوَجَّهُ اِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِاَةَ كَذِبَةٍ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ.

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে বলতে শুনেছি – ফেরেশতারা 'আনান' অর্থাৎ মেঘমালা পর্যন্ত অবতরণ করে। সেখানে আল্লাহ তা'আলার জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পরে আলোচনা করে। শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয়। –(মাযহারী)

বুখারীতেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)–এর এবং মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনা আসল আকাশে সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন আকাশে কোনো হুকুম জারি করেন, তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয়। এরপর তারা পরস্পরে সে বিষয়ে আলোচনা করে। খবরচোর শয়তানরা এই আলোচনা শুনে নেয় এবং তাতে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।

এই বিষয়বস্তু হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের পরিপন্থি নয়। কেননা এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, শয়তানরা আসল আকাশে পৌঁছে খবর চুরি করে। বরং এটা সম্ভবপর যে, এসব খবর পর্যায়ক্রমে আকাশের ফেরেশতাগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ফেরেশতাগণ মেঘমালা পর্যন্ত এসে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। এখান থেকে শয়তানরা তা চুরি করে। পূর্বোক্ত হাদীসে তাই বলা হয়েছে। –(মাযহারী)

সারকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত লাভের পূর্বে আকাশের খবর চুরিরধারা বিনা বাধায় অব্যাহত ছিল। শয়তানরা নির্বিঘ্নে মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত লাভের সময় তাঁর ওহীর হেফাজতের উদ্দেশ্যে চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং কোনো শয়তান খবর চুরির নিয়তে উপরে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। চোর বিতাড়নের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিনরা চিন্তিত হয়ে পড়ে, কারণ অনুসন্ধানের জন্যে পৃথিবীর কোণে সন্ধানকারী দল প্রেরণ করেছিল। অতঃপর 'নাখলা' নামক স্থানে একদল জিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কুরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

উল্কাপিণ্ড পূর্বেও ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল থেকে একে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার হচ্ছে ঃ প্রচলিত ভাষায় شِهَابٌ ثَاقِبٌ বলা হয় তারকা বিচ্যুতিকে। আরবিতে এর জন্যে اِنْقِضَاضُ الْكَوْكَبِ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই তারকা-বিচ্যুতির ধারা প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত আছে। অথচ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলের বৈশিষ্ট্য। এর জবাব এই যে, উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই ছিল। এর স্বরূপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের ভাষ্য এই যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছু আগ্নেয় পদার্থ শূন্যমণ্ডলে পৌঁছে এবং এক সময়ে তা প্রজ্বলিত হয়ে যায়। এটাও সম্ভবপর যে, কোনো তারকা অথবা গ্রহ থেকে এই আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হয়। যাই হোক না কেন, জগতের আদিকাল থেকেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে এই আগ্নেয় পদার্থকে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত লাভের সময় থেকে শুরু হয়েছে। দুষ্ট সব উল্কাপিণ্ডকে একাজে ব্যবহার করাও জরুরি নয়। সূরা হিজরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

وَاَنَّا لَا نَدْرِىْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا : অর্থাৎ খবর চুরি বন্ধ করার কারণ দ্বিবিধ হতে পারে–(১) পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দেওয়া, যাতে তারা আকাশের খবরাদি না পায়, (২) তাদের হেদায়েতের ব্যবস্থা করা, যাতে জিন ও শয়তান খোদায়ী ওহীতে কোনোরূপ বিঘ্ন করতে না পারে।

فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا : بَخْس শব্দে অর্থ প্রাপ্য অপেক্ষা কম দেওয়া এবং رَهَق শব্দের অর্থ লাঞ্ছনা ও অপমান। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনের প্রতিদান কম দেওয়া হবে না এবং পরকালে তার কোনো লাঞ্ছনা হবে না।

وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا : مَسَاجِدْ শব্দটি مَسْجِدْ-এর বহুবচন। এর এক অর্থ উপাসনালয় হতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, মসজিদসমূহ কেবল আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের জন্যে নির্মিত হয়েছে। অতএব, তোমরা মসজিদে যেয়ে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্যে ডেকো না ; যেমন ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের উপাসনালয়সমূহে এ ধরনের শিরকী করে থাকে। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম এই যে, মসজিদসমূহকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মিথ্যা কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র রাখতে হবে।

এছাড়া مَسْجِدْ শব্দটি এখানে مَصْدَرْ مِيْمِيّ হয়ে সেজদার অর্থেও হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সকল সেজদা আল্লাহ তা'আলার জন্যেই নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপরকে সাহায্যের জন্যে ডাকে, সে যেন তাকে সেজদা করে। অতএব অপরকে সেজদা করা থেকে বিরত থাক।

উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্যে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপরকে সেজদা করা হারাম এবং কোনো কোনো আলেমের মতে কুফর।

قُلْ اِنْ اَدْرِىْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّىْٓ اَمَدًا : এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে আদেশ করেছেন, যেসব অবিশ্বাসী আপনাকে কেয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ বলে দেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করে, তাদেরকে বলে দিন ঃ কেয়ামতের আগমন ও হিসাব-নিকাশ নিশ্চিত ; কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ আল্লাহ তা'আলা কাউকে বলেননি। তাই আমি জানি না কেয়ামতের দিন আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিবেন। দ্বিতীয় আয়াতে এর দলিল বর্ণনা করা হয়েছে যে, عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا –অর্থাৎ আমার না জানার কারণ এই যে, আমি 'আলেমুল-গায়ব' নই ; বরং আলেমুল গায়ব বিশেষণটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না।

এখানে কোনো নির্বোধ ব্যক্তির মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না, তখন তিনি রাসূল হলেন কিরূপে? কেননা রাসূলের কাছে আল্লাহ তা'আলা হাজারো গায়বের বিষয় ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যার কাছে ওহী আসে না, সে নবী ও রাসূল হতে পারে না। এই প্রশ্নের জবাবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে পরবর্তী আয়াতে ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে।

গায়ব ও গায়বের খবরের মধ্যে পার্থক্য ঃ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا –উপরিউক্ত বোকাসুলভ প্রশ্নের জবাব এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম। অর্থাৎ রাসূল গায়ব জানেন না–এ কথার অর্থ যে কোনো গায়ব জানেন না নয়; বরং রেসালতের জন্যে যে পরিমাণ গায়বের খবর ও অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান কোনো রাসূলকে দেওয়া অপরিহার্য, সেই পরিমাণ গায়বের খবর ওহীর মাধ্যমে রাসূলকে দান করা হয়েছে এবং তা খুবই সংরক্ষিত পথে দান করা হয়েছে। যখন রাসূলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তার চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা থাকে, যাতে শয়তান কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়। এখানে রাসূল শব্দ দ্বারা প্রথমে রাসূল ও নবীকে প্রদত্ত গায়বের প্রকার নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে শরিয়ত ও বিধি-বিধানের জ্ঞান এবং সময়োপযোগী গায়বের খবর। এরপর পরবর্তী বাক্যে আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, এসব খবর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ওহী নিয়ে

আগমনকারী ফেরেশতার চতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য ফেরেশতাগণের প্রহরা নিয়োগ করা হয়। এ থেকে বোঝা গেল, এই ব্যতিক্রমের মাধ্যমে নবী ও রাসূলের রেসালতের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকারের গায়ব সপ্রমাণ করা হয়েছে।

অতএব, পরিভাষায় এই ব্যতিক্রমকে إِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ বলা হয়। অর্থাৎ যে গায়ব সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না, ব্যতিক্রমের মাধ্যমে সেই গায়ব প্রমাণ করা হয়নি ; বরং বিশেষ ধরনের 'ইলমে–গায়ব' প্রমাণ করা হয়েছে। কুরআনের স্থানে স্থানে এক أَنْبَاءُ الْغَيْبِ শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। এক আয়াতে আছে- تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ কোনো কোনো অজ্ঞ লোক গায়ব ও গায়েবের খবরের মধ্যে পার্থক্য বোঝে না। তারা পয়গম্বরগণের জন্যে বিশেষত ঃ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ-এর জন্যে সর্বপ্রকার ইলমে-গায়ব সপ্রমাণ করার প্রয়াস পায় এবং তাঁকে আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ আলেমুল-গায়ব তথা সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞানবান মনে করে। এটা পরিষ্কার শিরক এবং রাসূলকে আল্লাহ তা'আলার আসনে আসীন করার অপপ্রয়াস বৈ নয়।–(নাউযুবিল্লাহ) যদি কোনো ব্যক্তি তার ভেদ তার বন্ধুকে বলে দেয়, এতে দুনিয়ার কেউ বন্ধুকে আলেমুল-গায়ব আখ্যা দিতে পারে না। এমনিভাবে পয়গম্বরগণকে ওহীর মাধ্যমে হাজারো গায়বের বিষয় বলে দেওয়ার কারণে তাঁরা আলেমুল-গায়ব হয়ে যাবেন না। এতএব, বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝে নেওয়া দরকার।

এক শ্রেণির সাধারণ মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না। ফলে তাদের কাছে যখন বলা হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলেমুল-গায়ব' নন, তখন তারা এই অর্থ বোঝে যে, (নাউযুবিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো গায়বের খবর রাখেন না। অথচ দুনিয়াতে কেউ এর প্রবক্তা নয় এবং হতে পারে না। কেননা এরূপ হলে খোদ নবুয়ত ও রেসালতই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই কোনো মুমিনের পক্ষেই এরূপ বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়।

সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে– وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا –অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর পরিসংখ্যান আল্লাহ তা'আলারই গোচরীভূত। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ অণু-পরমাণু রয়েছে, সারা বিশ্বের জলধিসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ জলবিন্দু আছে, প্রত্যেক বৃষ্টিতে কতসংখ্যক ফোঁটা বর্ষিত হয় এবং সারা জাহানের বৃক্ষসমূহের পত্রের সঠিক পরিসংখ্যান তাঁর জানা আছে। সমস্ত ইলমে গায়ব যে আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ, আয়াতে একথা আবার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে উপরিউক্ত ব্যতিক্রম দেখে ভুল বোঝাবুঝিতে পতিত না হয়।

ইলমে-গায়বের অর্থ ও তার বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নমলের قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

إِسْتَمَعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْتِعَال মাসদার إِسْتِمَاعٌ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– শুনেছে।

نَفَرٌ : ইসমে জমা। অর্থ- জামাত, দল, শহরের একটা অংশ, পাড়া, মহল্লা, ব্লক।

يَعُوْذُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَوْذٌ وَمَعَاذٌ মূলবর্ণ (ع - و - ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা আশ্রয় গ্রহণ করত।

شَطَطًا : মাসদার বাব نَصَرَ - ضَرَبَ মূলবর্ণ (ش - ط - ط) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– অবাস্তব উক্তি। অন্যায়। বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন।

رَهَقًا : ইসম ও মাসদার। অর্থ- অবাধ্যতা, অহংকার, বাড়াবাড়ি, জুলুম, নির্যাতন। বাবে سَمِعَ থেকে মাসদার আসে। মূলতঃ এর অর্থ, এক জিনিসকে আরেকটি জিনিসের উপর জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া। এর আবশ্যকীয় অর্থ হলো, ধ্বংসপ্রাপ্ত। বিধ্বস্ত। উজাড় হওয়া ইত্যাদি। তাই এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

لَمَسْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার لَمْسٌ মূলবর্ণ (ل - م - س) জিনস صحيح অর্থ– অনুসন্ধান করতে চাইলাম।

بَخْسًا : মাসদার বাব فَتَحَ অর্থ– কম করে দেওয়া, হ্রাস করা।

اَلْقَاسِطُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ ضَرَبَ বাব قِسْطٌ মাসদার (ق - س - ط) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– কতিপয় বিপথগামী।

صَعَدًا : মাসদার। অর্থ- চরম কঠিন, কষ্টদায়ক (শাস্তি), কাযী বায়যাবী (র.) লিখেন, صَعَدًا সিফাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

يُجِيْرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِجَارَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ- তিনি আশ্রয় দেন।

اِرْتَضٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْتِعَالٌ মাসদার إِرْتِضَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ض - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– নিজের মনোনীত, সন্তুষ্ট হয়েছে।

مُلِئَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَتَحَ মাসদার مَلْأٌ মূলবর্ণ (م - ل - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হয়েছে।

حَرَسًا : শব্দটি বহুবচন; একবচনে حَارِسٌ অর্থ– প্রহরী। রক্ষী, পাহারাদার, তত্ত্বাবধায়ক।

شُهُبًا : শব্দটি বহুবচন; একবচনে شِهَابٌ অর্থ- উল্কাপিণ্ড, অঙ্গার, অগ্নিশিখা।

قِدَدٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে قدة অর্থ– ফালি, ফিতা, দল, সম্প্রদায়।

تَحَرَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَحَرِّىْ মূলবর্ণ (ح - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা খুঁজে নিয়েছে।

غَدَقًا : অর্থ- (বৃষ্টির) প্রচুর পানি।

لِبَدًا : শব্দটি বহুবচন; একবচনে لُبْدَةٌ অর্থ- ভিড় করতে, কেশর, দল, জটবাধা চুল। জট বাঁধা চুল, দলে দলে, জনতার ঢল, বহু লোকের বিশৃঙ্খলা সমাবেশ।

مُلْتَحَدًا : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ إِفْتِعَالٌ বাব إِلْتِحَادٌ মাসদার (ل - ح - د) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– কোনো আশ্রয়, আশ্রয় স্থল।

اَمَدًا : অর্থ– সময়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا : এখানে قُلْ হলো ফে'ল ও ফায়েল। আর اُوْحِىَ ফে'ল আর اِلَىَّ টা اُوْحِىَ-এর সাথে متعلق হয়েছে। اَنَّ এবং তার অধীনে যা রয়েছে তা رفع-এর স্থানে হয়ে নায়েবে ফায়েল হয়েছে। আর اَنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর هُ হলো اسم ان আর اِسْتَمَعَ বাক্যটি হলো তার খবর। আর نَفَرٌ হলো اِسْتَمَعَ-এর ফায়েল। এবং مِنَ الْجِنِّ হলো نَفَرٌ-এর সিফত। আর فَقَالُوْا টা اِسْتَمَعَ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর اِنَّا হলো حرف مشبه بالفعل এবং তার اسم আর سَمِعْنَا বাক্যটি তার খবর। আর قُرْاٰنًا হলো مفعول به এবং عَجَبًا হলো সিফত।

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ

সূরা মুয্যাম্মিল

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২০, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. হে বস্ত্রাবৃত [রাসূল]।	يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝١
২. রাত্রিকালে [নামাজে] দণ্ডায়মান থাকুন, কিয়দংশ রাত্রি ব্যতীত।	قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٢
৩. অর্থাৎ অর্ধেক রাত্রি অথবা অর্ধেক হতেও কিছু কম করুন।	نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝٣
৪. অথবা অর্ধাংশ হতে কিছু বৃদ্ধি করুন আর [নামাজে] কুরআনকে খুব স্পষ্ট করে পাঠ করুন।	اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝٤
৫. আমি অচিরেই আপনার প্রতি এক গুরুভার বাণী প্রেরণ করছি।	اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝٥
৬. নিঃসন্দেহে রাত্রিকালে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং বাকস্ফুরণে সঠিক।	اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْـًٔا وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۝٦
৭. নিঃসন্দেহে দিবাভাগে আপনার বহু কাজ থাকে।	اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝٧
৮. আর নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে থাকুন এবং সবকিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারই দিকে মগ্ন থাকুন।	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ হে বস্ত্রাবৃত (রাসূল)

২. قُمِ الَّيْلَ রাত্রিকালে দণ্ডায়মান থাকুন اِلَّا قَلِيْلًا কিয়দংশ রাত্রি ব্যতীত।

৩. نِّصْفَهٗٓ অর্থাৎ অর্ধেক রাত্রি اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا অথবা অর্ধেক হতেও কিছু কম করুন।

৪. اَوْ زِدْ عَلَيْهِ অথবা অর্ধাংশ হতে কিছু বৃদ্ধি করুন وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا আর কুরআনকে খুব স্পষ্ট করে পাঠ করুন।

৫. اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ আমি অচিরেই আপনার প্রতি প্রেরণ করছি قَوْلًا ثَقِيْلًا এক গুরুভার বাণী।

৬. اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ নিঃসন্দেহে রাত্রিকালে উঠা هِيَ اَشَدُّ وَطْـًٔا প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক وَّاَقْوَمُ قِيْلًا এবং বাকস্ফুরণে সঠিক।

৭. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ নিঃসন্দেহে দিবাভাগে আপনার থাকে سَبْحًا طَوِيْلًا বহু কাজ।

৮. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ আর নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে থাকুন وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا এবং সবকিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারই দিকে মগ্ন থাকুন।

৯. তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের মালিক, তিনি ভিন্ন কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, অতএব, তাঁকেই নিজ কার্যাবলি সোপর্দ করার জন্য নির্ধারিত করে রাখুন।	رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ﴿٩﴾
১০. আর এরা যেসব উক্তি করে, তাতে ধৈর্যধারণ করুন এবং সুবিহিতভাবে তাদের থেকে পৃথক থাকুন।	وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿١٠﴾
১১. আর আমাকে ও সেই সুখ সম্পদে নিমগ্ন অবিশ্বাসীদের ছেড়ে দিন, আর তাদেরকে আরো কিছুদিন অবকাশ দিন।	وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١١﴾
১২. নিশ্চয় আমার নিকট বেড়িসমূহ ও দোজখ রয়েছে।	اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿١٢﴾
১৩. এবং গলায় আটকানোর মতো খাদ্য ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।	وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣﴾
১৪. যেদিন জমিন ও পর্বতমালা কম্পিত হতে থাকবে, আর পর্বতসমূহ [খণ্ড বিখণ্ড হয়ে] উড়ন্ত ধূলি-বালুকায় পরিণত হবে।	يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾
১৫. নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের নিকট এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছি যিনি তোমার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন, যেমন আমি ফেরাউনের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম।	اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের মালিক لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন কেউই ইবাদতের যোগ্য নয় فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا অতএব তাকেই নিজ কার্যাবলি সোপর্দ করার জন্য নির্ধারিত করে রাখুন।

১০. وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ আর এরা যেসব উক্তি করে তাতে ধৈর্যধারণ করুন وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا এবং সুবিহিতভাবে তাদের থেকে পৃথক থাকুন।

১১. وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ আর আমাকেও সেই সুখ-সম্পদে নিমগ্ন অবিশ্বাসীদেরকে ছেড়ে দিন وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا আর তাদেরকে আরো কিছুদিন অবকাশ দিন।

১২. اِنَّ لَدَيْنَآ নিশ্চয় আমার নিকট রয়েছে اَنْكَالًا বেড়িসমূহ وَّجَحِيْمًا ও দোজখ।

১৩. وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ এবং গলায় আটকানোর মতো খাদ্য وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৪. يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ যেদিন জমিন ও পর্বতমালা কম্পিত হতে থাকবে وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا আর পর্বতসমূহ উড়ন্ত ধূলি-বালুকায় পরিণত হবে।

১৫. اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের নিকট এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছি شَاهِدًا عَلَيْكُمْ যিনি তোমাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا যেমন আমি ফেরাউনের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম।

১৬. অনন্তর ফেরাউন সেই রাসূলের কথা অমান্য করল, অতঃপর আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম।	فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾
১৭. অতএব, যদি তোমরা কুফরি কর তবে ঐ দিন হতে কিরূপে রক্ষা পাবে যেদিন বালকদেরকেও বৃদ্ধ করে দিবে?	فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَا ﴿١٧﴾
১৮. যেদিন আসমান ফেটে যাবে; নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে।	السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ۚ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾
১৯. এটা একটি উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয়, স্বীয় প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।	اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾
২০. আপনার প্রতিপালক অবগত আছেন যে, আপনি ও আপনার সঙ্গীদের মধ্যে কতিপয় লোক [কখনো] রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এবং [কখনো] অর্ধেক রাত্রি, আবার [কখনো] রাত্রির এক তৃতীয়াংশ দণ্ডায়মান থাকেন; আর রাত্রি ও দিনের পূর্ণ পরিমাণ আল্লাহই করতে পারেন, অতএব তিনি আপনাদের অবস্থার প্রতি অনুগ্রহ করছেন, সুতরাং [তাহাজ্জুদে] যে পরিমাণ কুরআন সহজে পড়া যায়, পাঠ করবেন; তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে কতক পীড়িত হবে,	اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۚ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۚ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ অনন্তর ফেরাউন সেই রাসূলের কথা অমান্য করল فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا অতঃপর আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম।

১৭. فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ অতএব ঐ দিন হতে কিরূপে রক্ষা পাবে اِنْ كَفَرْتُمْ যদি তোমরা কুফরি কর يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا যেদিন বালক দিগকে বৃদ্ধ করে দিবে।

১৮. السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ যেদিন আসমান ফেটে যাবে كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا নিঃসন্দেহে তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে।

১৯. اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ এটা একটি উপদেশ فَمَنْ شَآءَ অতএব যার ইচ্ছা হয় اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا স্বীয় প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

২০. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ আপনার প্রতিপালক অবগত আছেন اَنَّكَ تَقُوْمُ আপনি দণ্ডায়মান থাকেন اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ وَنِصْفَهٗ এবং (কখনো) অর্ধেক রাত্রি وَثُلُثَهٗ আবার (কখনো) রাত্রের এক তৃতীয়াংশ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ও আপনার সঙ্গীগণের মধ্যে কতিপয় লোক وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ আর রাত্রি ও দিবসের পূর্ণ পরিমাণ আল্লাহই করতে পারেন عَلِمَ তিনি জানেন اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ আপনারা তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না فَتَابَ عَلَيْكُمْ তিনি আপনাদের অবস্থার উপর অনুগ্রহ করেছেন فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ সুতরাং (তাহাজ্জুদে) যে পরিমাণ কুরআন সহজে পড়া যায় পাঠ করবেন عَلِمَ তিনি অবগত আছেন اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى তোমাদের মধ্যে কতক পীড়িত হবে,

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۭ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۭ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

আর কতক জীবিকান্বেষণের জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করবে, আর কতক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, [কাজেই তাহাজ্জুদের আদেশ রহিত করা হলো] সুতরাং যে পরিমাণ কুরআন সহজে পড়া যায়, পাঠ করো, আর [ফরজ] নামাজের পাবন্দি কর এবং জাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক। আর যে নেক আমল নিজেদের জন্য [আখেরাতের পুঁজিস্বরূপ] পূর্বে প্রেরণ করবে, আল্লাহর সমীপে পৌছে তার প্রতিফল তদপেক্ষা উত্তম এবং প্রতিদান হিসেবে শ্রেষ্ঠতমরূপে প্রাপ্ত হবে আর আল্লাহর নিকট গুনাহ মোচনের প্রার্থনা করুন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

শাব্দিক অনুবাদ :

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ আর কতক দেশ বিদেশে ভ্রমণ করবে يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ জীবিকা অন্বেষণের জন্য وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ আর কতক আল্লাহর পথে জেহাদ করবে فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ সুতরাং যে পরিমাণ কুরআন সহজে পড়া যায় পাঠ কর وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি করো وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান কর وَاَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا এবং আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ আর নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে مِنْ خَيْرٍ নেক আমল تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ আল্লাহর সমীপে পৌছে প্রাপ্ত হবে هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا তার প্রতিফল তদপেক্ষা উত্তম এবং প্রতিদান হিসেবে শ্রেষ্ঠতম وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ আর আল্লাহর নিকট গোনাহ মোচনের প্রার্থনা করুন اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরাটির নাম সূরা اَلْمُزَّمِّلُ [আল-মুযযাম্মিল]। অত্র সূরার প্রথমোক্ত আয়াতে বর্ণিত শব্দ اَلْمُزَّمِّلْ হতে অত্র সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর একটি নামও مُزَّمِّلْ। একদা হযরত মুহাম্মদ ﷺ রাত্রিকালে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন, এমতাবস্থায় গায়েবের পক্ষ হতে يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এটা হতেই অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلْ তবে সূরার বিষয়বস্তুর সাথে শিরোনামের তেমন কোনো সামঞ্জস্য দেখা যায় না; কিন্তু এটা দ্বারা নামকরণ স্বার্থক না হওয়ারও কোনো কারণ নেই। অত্র সূরায় ২টি রুকূ', ২০টি আয়াত, ২৮৫টি শব্দ এবং ৮৭০টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কুরআন]

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরাতে মাত্র দু'টি রুকূ' রয়েছে তবে দু'টি রু'কূই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাজিল হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে। বিষয়বস্তু ও হাদীস শরীফের দলিলসমূহও এ কথা সত্যায়িত করে। প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ হতে বুঝা যায় যে, প্রথম রুকূ'টি নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে, কারণ তখন নবুয়তের দায়িত্ব পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আল্লাহর পক্ষ হতে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যেমন, সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে আপনি রাত্রিকালে শয্যা ত্যাগ করে উঠুন ও আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হোন, তবে তো নবুয়তের যথাযথ দায়িত্ব পালনে আপনার মধ্যে শক্তি অর্জিত হবে।

আর এতে তাহাজ্জুদ নামাজ ও কুরআন তেলাওয়াতে অর্ধেক রাত্রি বা তার চাইতে একটু কম সময় অতিবাহিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর বিরুদ্ধে বাদীদের সর্ব প্রকার অত্যাচারমূলক

আচরণের মোকাবিলায় পরম ধৈর্য গ্রহণের উপদেশও দেওয়া হয়েছে। আর সাথে সাথে মক্কার কাফেরদেরকে আজাবের হুমকি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এগুলো হতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন তাঁর শত্রুগণ প্রবলভাবে বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছিল। আর এগুলো নবুয়তের প্রথম অবস্থায়ই হয়েছিল।

দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াত সম্পর্কে যদিও বহুসংখ্যক মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, ঐগুলো মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে তথাপিও কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের মতে ঐগুলো মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর আয়াতসমূহ দ্বারাও যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। আর হুজুর ﷺ মাদানি জীবনেই যুদ্ধবিগ্রহ করেছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় রুকূ'টি মদিনায় অবতীর্ণ হওয়ার মতোই প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু তিনটি। প্রথম রুকূ'তে রাত্রের একটি অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ বাধ্যতামূলককরণ ও কাফেরদের কটূক্তি ও গালাগালকে উপেক্ষা করে চলার উপদেশ, দ্বিতীয় রুকূ'তে তাহাজ্জুদের নামাজ ঐচ্ছিক বিধানরূপে ঘোষণা করা।

১ হতে ৭ আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে কাফেরদের কথাবার্তার চিন্তাযুক্ত ও ব্যথিত হওয়ার কারণে তাঁর চিন্তা দূরীকরণ এবং তাঁর মনোবল বৃদ্ধিকরণের বিধান দেওয়া হয়েছে। সর্বপ্রথমেই তাঁকে চাদর আবৃত করে শয়নকারীরূপে আখ্যায়িত করে তাঁর মনের চিন্তা-বেদনা ও কষ্টক্লেশ দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। অতঃপর নবুয়তের বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য আধ্যাত্মিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার একটি ফর্মুলা পেশ করে বলা হয়েছে যে, আপনি রাত্রির একটি অংশ ইবাদতে দণ্ডায়মান থেকে কাটিয়ে দিন। এতে আপনার মনের অবিচলতা, অস্থিরচিত্তা এবং যে কোনো কঠিন বিপদের মুহূর্তেও অবিচল হয়ে সুদৃঢ় পদে দণ্ডায়মান থাকার ক্ষমতা লাভ করবেন এবং নবুয়তের বিরাট দায়িত্ব পালন করতেও সমর্থ হবেন। দিবাভাগের কর্মব্যস্ততার দরুন এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ দিনের বেলা আপনার পক্ষে সম্ভবপর নয়। নিঝুম-নিথর-নিস্তব্ধ যামিনীতে আরাম ও বিলাসিতাকে পরিহার করে সাধনায় মশগুল থাকাই আপনার পথ।

অতঃপর ৮ হতে ১৩ আয়াতে একনিষ্ঠ মনে ঐকান্তিক অনুরাগ নিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়ার এবং পার্থিব যাবতীয় সমস্যা আল্লাহ তা'আলার উপর সোপর্দ করার কথা বলা হয়েছে। আর কাফেরদের সর্বপ্রকার অবজ্ঞা, কটূক্তি ও গালাগালের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে সৌজন্যমূলক পন্থা গ্রহণ এবং তাদের কথার প্রতিবাদ না করার জন্য বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, যেসব সম্পদশালী লোক আপনার বিরোধিতায় সোচ্চার কণ্ঠ তাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করুন, আপনি প্রতিবাদে যাবেন না। আমি তাদেরকে ইহ-পরকালে কঠিন হস্তে শায়েস্তা করবো।

অতঃপর ১৪ হতে ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হে লোকেরা! তোমাদের কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি, যেরূপ ফেরাউনের নিকট পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সে নবীর বিরোধিতার ভূমিকা গ্রহণের আমি তার পরিণতি কি করেছি, ইতিহাসের পাতাগুলো তার সাক্ষী। মহাপ্রলয়ের পর তোমাদের সকলের যখন আমার কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হতে হবে, তখন তোমরা কিরূপে আমার শাস্তি হতে বাঁচবে। তোমাদের উচিত আমার পথ গ্রহণ করা। আমি উপদেশ দিচ্ছি। যার ইচ্ছা হয় সে নবীর বিরোধিতা পরিহার করে আমার পথ গ্রহণ করুক।

২০নং আয়াতে তাহাজ্জুদের বাধ্যতামূলক বিধানকে ঐচ্ছিককরণের কারণসমূহ বর্ণনা করে তাকে ঐচ্ছিক ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, তাহাজ্জুদ নামাজ যত হালকা করা সম্ভব হয় তাই কর; কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জাকাত আদায় এবং বিনা স্বার্থে দরিদ্র ও অভাবীগণকে ঋণদান করবে। তোমরা পরকালের কল্যাণার্থে যা কিছু ভালো ও কল্যাণজনক কাজ করবে তাই আমার নিকট বিরাট পুরস্কার আকারে লাভ করবে। তোমরা সর্বদা মাগফেরাত কামনায় থাকো, আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তিনি কারো ক্ষমা প্রার্থনাকে বিফল করবেন না।

সূরাটির ফজিলত : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত এ সূরা পাঠ করবে মহান আল্লাহ তাকে সুখে-শান্তিতে রাখবেন এবং দোজখের আজাব হতে তাকে রক্ষা করবেন।

* সর্বদা এ সূরা পাঠ করলে স্বপ্নে রাসূলে কারীম ﷺ -এর জেয়ারত লাভ করবে।
* এ সূরা পাঠ করে হাকীমের নিকট উপস্থিত হলে হাকীম সহৃদয় ব্যবহার করবে।
* নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, এ সূরা বিপদের সময় পাঠ করলে বিপদ দূর হবে।
* প্রত্যহ সাতবার পাঠ করলে রিজিক বৃদ্ধি পায়। -[নূরুল কুরআন]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা (আল-জিন্ন)-এর মধ্যে কাফেরদেরকে তাওহীদ, রিসালাত ও কর্মফলের প্রতি ঈমান আনয়ন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

অত্র সূরায় তাদের ঈমান না আনয়ন করার কারণে হুযূরে আকরাম ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। আর তিনি যেন তাঁর বিশেষত্ব ও মহত্ত্বকে দৃঢ়তার সাথে বজায় রাখেন সে দিকেও ইঙ্গিক করা হয়েছে। -[তাফসীরে আশরাফী]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ .... الاية

শানে নুযূল : প্রিয়নবী ﷺ-এর উপর যখন ওহী নাজিল হতো, তখন অত্যন্ত কঠিন একটি অবস্থা বিরাজ করত। অনেক সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মাঝেও তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে যেত। প্রথমাবস্থায় যখন ওহী নাজিল হতো তখন তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে যান। তখন আল্লাহ পাক তার প্রিয়নবীকে প্রিয় শব্দে সম্বোধন করে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[বায়জাবী]

وَذَرْنِى وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُو۟لِى ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا

শানে নুযূল : কুরাইশ দলপতি ও মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যারা হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ -কে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। মুকাতিল বলেন, ঐতিহাসিক বদর অভিযানের সময়ে, যে সকল কাফের দলপতিরা তাদের যুদ্ধা ও কর্মীদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিল, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ৪৪/১৯]

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ الخ

শানে নুযূল -১ : তাফসীর বিশারদ হযরত মুকাতিল প্রমুখ বলেন قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا আয়াতসমূহ যখন নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তা কষ্টদায়ক হয়ে দাড়াল। অপর দিকে অর্ধরাত্রি ও তৃতীয়াংশ রাত্রিকাল কখন হয় তাও মানুষের জানার বাইরে ছিল। তখন ভুল সংঘটিত হবার আশঙ্কায় নামাজে সকাল পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকত। ফলে তাদের পদযুগল ফুলে যেত, কষ্টে বিগড়ে যেত তাদের চেহারার রং। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে তাদের দায়িত্ব কমতি ও হ্রাস করে আল্লাহ তা'আলা عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ আয়াত নজিল করেন। –[কুরতুবী ৫০/১৯]

শানে নুযূল -২ : ইবনে হামীদ হযরত সাঈদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর উপর যখন يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ নাজিল করেন, তখন নবী করীম ﷺ দশ বৎসর পর্যন্ত আল্লাহ তাকে যে ভাবে আদেশ করেছেন, সেভাবেই কিয়ামুল লাইল পালন করেন। সাহাবায়ে কেরামের একটি দলও রাসূল ﷺ-এর সাথে কিয়ামুল লাইল পালন করে যেতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা দশ বৎসর পর রাসূল ﷺ-এর প্রতি إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ .... أَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ পর্যন্ত সে বিধান হাল্কা করার জন্য নাজিল করেন। –[তাবারী : ২৭৯/১২]

শানে নুযূল -৩ : ইবনে হামীদ হযরত আবূ আব্দুর রহমান (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ যখন নাজিল হয়, তখন তারা বৎসর কাল কিয়ামুল লাইল পালন করে যান, তখন তাদের পদযুগল ও গোড়ালী ফুলে যায়। ফলে আল্লাহ তা'আলা فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[তাবারী : ২৮০/১২]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ - مُزَّمِّلٌ এবং পরবর্তী সূরায় ব্যবহৃত مُدَّثِّرٌ শব্দদ্বয়ের অর্থ প্রায় এক অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত। উভয় সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি সাময়িক অবস্থা ও বিশেষ গুণ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ ভয় ও উদ্বেগের কারণে তীব্র শীত অনুভব করছিলেন এবং বস্ত্রাবৃত হয়েছিলেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম হেরা গিরিগুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ফেরেশতা জিবরাঈল আগমন করে সূরা আলাকের প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত খাদিজা (রা.)-এর নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন, زَمِّلُوْنِيْ، زَمِّلُوْنِيْ অর্থাৎ 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও।' এর পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে 'ফাতরাতুল-ওহী' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন, একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহায় সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একস্থানে একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ আয়াত নাজিল হলো। এ হাদীসে কেবল এই আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্য يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। এই আয়াতের ঘটনা পৃথকও হতে পারে। এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে বিশেষ এক করুণা ও অনুগ্রহ আছে। নিছক করুণা প্রকাশার্থে স্নেহ ও ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে সাময়িক অবস্থার দ্বারাও কাউকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। -(রূহুল মা'আনী) এই বিশেষ ভঙ্গিতে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাহাজ্জুদের আদেশ করা হয়েছে এবং এর কিছু বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

তাহাজ্জুদ নামাজের বিধানাবলী : مُدَّثِّرٌ ও مُزَّمِّلٌ শব্দদ্বয় থেকেই বুঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কুরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যন্ত পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ ছিল না। পাঞ্জেগানা নামাজ মে'রাজের রাত্রিতে ফরজ হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখের হাদীসদৃষ্টে ইমাম বগভী (র.) বলেন, এই আয়াতের আলোকে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ রাত্রির নামাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সমগ্র উম্মতের উপর ফরজ ছিল। এটা পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বের কথা।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের নামাজ কেবল ফরজই করা হয়নি বরং তাতে রাত্রির কম-পক্ষে এক-চতুর্থাংশ মশগুল থাকাও ফরজ করা হয়েছে। কারণ আয়াতের মূল আদেশ হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি নামাজে মশগুল থাকা। কিছু অংশ বাদ দেওয়ার বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম বগভী (র.) বলেন, এই আদেশ পালনার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের নামাজে ব্যয় করতেন। ফলে তাঁদের পদদ্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ নামাজে দণ্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, যতক্ষণ নামাজ পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামাজ পড়াই তাহাজ্জুদের জন্য যথেষ্ট। এই বিষয়বস্তু আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মে'রাজের রাত্রিতে পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এরপরও তাহাজ্জুদ সুন্নত থেকে যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন। -(মাযহারী)

قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا - اَللَّيْلَ শব্দের সাথে আলিফ ও লাম সংযুক্ত হওয়ার অর্থ হয়েছে সমস্ত রাত্রি নামাজে মশগুল থাকুন। অর্থাৎ আপনি সমস্ত রাত্রি নামাজে মশগুল থাকুন কিছু অংশ বাদ দিয়ে অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, نِصْفَهُ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ। অর্থাৎ এখন আপনি অর্ধরাত্রি তদপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশি নামাজে মশগুল হোন। এটা اِلَّا قَلِيْلًا ব্যতিক্রমের বর্ণনা। তাই প্রশ্ন হয় যে, অর্ধেক রাত্রি তো কিছু অংশ হতে পারে না। জবাব এই যে, রাত্রির প্রাথমিক অংশ তো মাগরিব ও ইশার নামাজ ইত্যাদিতে অতিবাহিতই হয়ে যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে অবশিষ্ট রাত্রির অর্ধেক। সেটা সারা রাত্রির তুলনায় কিছু অংশ। আয়াতে অর্ধরাত্রির কমেরও অনুমতি আছে, বেশিরও আছে। তই সমষ্টিগতভাবে এর সারমর্ম এই যে, কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ রাত্রির চেয়ে কিছু বেশি নামাজে মশগুল থাকা ফরজ।

تَرْتِيْلِ قُرْاٰنْ এর অর্থ– تَرْتِيْل -এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা। -(মুফরাদাত) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দ্রুত কুরআন তেলাওয়াত করবেন না বরং সহজভাবে এবং অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে উচ্চারণ করবেন। -(কুরতুবী) رَتِّلْ বলে রাত্রির নামাজে করণীয় কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামাজ কেরাত, তাসবীহ, রুকূ', সেজদা ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত হলেও তাতে আসল উদ্দেশ্য কুরআন পাঠ। একারণেই সহীহ হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের নামাজ অনেক লম্বা করে আদায় করতেন। সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল।

এ থেকে আরো জানা গেল যে, কেবল কুরআন পাঠই কাম্য নয় বরং তারতীল তথা সহজ ও সঠিকভাবে পাঠ কাম্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই পাঠ করতেন। রাত্রির নামাজে তিনি কিরূপে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, এই প্রশ্নের জবাবে হযরত উম্মে সালমা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কেরাত অনুকরণ করে শুনান তাতে প্রত্যেকটি হরফ স্পষ্ট ছিল। -(মাযহারী)

যথা সম্ভব সুললিত স্বরে তেলাওয়াত করাও তারতীলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তেলাওয়াত করেন, তাঁর কেরাতের মতো অন্য কারো কেরাত আল্লাহ তা'আলা শুনেন না। -(মাযহারী)

হযরত আলকামা (রা.) এক ব্যক্তিকে সুমধুর স্বরে তেলাওয়াত করতে দেখে বললেন, لَقَدْ رَتَّلَ الْقُرْاٰنَ فِدَاهُ اَبِىْ وَاُمِّىْ অর্থাৎ সে কুরআন তারতীল করেছে। আমার পিতামাতা তারজন্য উৎসর্গ হোন। -(কুরতুবী)

তবে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অন্তর্নির্হিত অর্থ চিন্তা করে তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তারতীল। হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করে ক্রন্দন করতে দেখে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا আয়াতে যে তরতীলের আদেশ করেছেন, এটাই সেই তরতীল। -(কুরতুবী)

اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا - قَوْلٌ ثَقِيْلٌ (ভারি কালাম) বলে কুরআন পাক বুঝানো হয়েছে। কেননা, কুরআন বর্ণিত হালাল, হারাম, জায়েজ ও নাজায়েজের সীমা স্থায়ীভাবে মেনে চলা স্বভাবত ভারি ও কঠিন। তবে যার জন্য আল্লাহ

তা'আলা সহজ করে দেন, তার কথা স্বতন্ত্র। কুরআনকে ভারি বলার আরেক কারণ এই যে, কুরআন নাজিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ ওজন ও তীব্রতা অনুভব করতেন। ফলে প্রচণ্ড শীতেও তাঁর মস্তক ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তিনি তখন কোনো উটের উপর সওয়ার থাকলে বোঝার কারণে উট নুয়ে পড়ত। –(বুখারী)

এই আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষকে কষ্টের অভ্যস্ত করার জন্য তাহাজ্জুদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। রাত্রিকালে নিদ্রার প্রাবল্য এবং মানসিক সুখের বিরুদ্ধে এটা একটা জিহাদ। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে কুরআন অবতীর্ণ কষ্টসাধ্য ও ভারি বিধি বিধান সহ্য করা সহজ হয়ে যাবে।

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ - نَاشِئَةَ শব্দটি ধাতু। এর অর্থ রাত্রির নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রার পর নামাজের জন্য গাত্রোত্থান করা। তাই এর অর্থ হয়ে গেছে তাহাজ্জুদ। কারণ এর শাব্দিক অর্থও রাত্রিতে নিদ্রার পর উঠে নামাজ পড়া। ইবনে কায়সান (রা.) বলেন, শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করাকে نَاشِئَةَ اللَّيْلِ বলা হয়। ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, রাত্রির যে অংশতে কোনো নামাজ পড়া হয়, তা نَاشِئَةَ اللَّيْلِ -এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আবী মুলায়কা (রা.) এক প্রশ্নের জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের (রা.) ও তাই বলেছেন। –(মাযহারী)

এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে রাত্রির যে কোনো অংশে যে নামাজ পড়া হয়, বিশেষত ইশার পর যে নামাজ পড়া হয়, তাই نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ও قِيَامُ اللَّيْلِ -এর মধ্যে দাখিল, যেমন হাসান বসরী (র.) বলেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও বুযুর্গগণ সর্বদাই এই নামাজ নিদ্রার পর শেষরাত্রে জাগ্রত হয়ে পড়তেন। তাই এটা উত্তম ও অধিক বরকতের কারণ। তবে ইশার নামাজের পর যে কোনো নফল নামাজ পড়া যায়, তাতে তাহাজ্জুদের সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

هِيَ أَشَدُّ وَطْأً - وَطْأً শব্দে দুরকম কেরাত আছে। প্রসিদ্ধ কেরাতে ওয়াও এর উপর যবর এবং ত্বোয়া সাকিন করে অর্থ দলন করা, পিষ্ট করা। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির নামাজ প্রবৃত্তি দলনে খুবই সহায়ক অর্থাৎ এতে করে প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং অবৈধ বাসনা থেকে বিরত রাখার কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয় কেরাত হচ্ছে كِتَابٌ -এর ওজনে وِطَاء এমতাবস্থায় এটা অনুকূল হওয়ার অর্থে ধাতু। لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ আয়াতেও শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে এই অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রিতে নামাজের জন্য গাত্রোত্থান করা অন্তর, দৃষ্টি, কর্ণ ও জিহবার মধ্যে পারস্পরিক একাত্মতা সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, أَشَدُّ وَطْأً -এর অর্থ এই যে, কর্ণ ও অন্তরের মধ্যে তখন অধিকতর একাত্মতা থাকে। কারণ রাত্রিবেলায় সাধারণত কাজকর্ম ও হট্টগোল থাকে না। তখন মুখ থেকে যে বাক্য উচ্চারিত হয়, কর্ণও তা শুনে ও অন্তরও উপস্থিত থাকে।

أَقْوَمُ -শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। অর্থাৎ রাত্রিবেলায় কুরআন তেলাওয়াত অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। কারণ তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিষ্ক ব্যাকুল হয় না।

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এই আয়াতেও তাহাজ্জুদের রহস্য বর্ণিত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا আয়াতে বর্ণিত রহস্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিজ সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং এ আয়াতে বর্ণিত রহস্যটি সমস্ত উম্মতের জন্য ব্যাপক।

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا - سَبْح শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও ঘোরাফেরা করা। এ কারণেই সাঁতার কাটাকেও سَبْح ও سِبَاحَة বলা হয়। এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যস্ততা, শিক্ষা দেওয়া, প্রচার করা, মানবজাতির সংশোধনের নিমিত্ত অথবা নিজের জীবিকার অন্বেষণে ঘোরাফেরা করা ইত্যাদি সবই এতে দাখিল।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের তৃতীয় রহস্য ও উপযোগিতা বর্ণিত হয়েছে। এটাও সবার জন্য ব্যাপক। রহস্য এই যে, দিবাভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্য সবাইকে অনেক কর্মব্যস্ততায় থাকতে হয়। ফলে একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাত্রি এ কাজের জন্য থাকা উচিত যে, প্রয়োজন মাফিক নিদ্রা ও আরাম এবং তাহাজ্জুদের ইবাদতও হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য : ফিকহবিদগণ বলেন, যে সব আলেম ও মাশায়েখ জনগণের শিক্ষাদীক্ষা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদেরও এ কাজ দিবাভাগে সীমিত রেখে রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত ও ইবাদতে মশগুল হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলেমগণের কর্মপদ্ধতি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে যদি কোনো সময় রাত্রিবেলায়ও উপরিউক্ত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক ব্যতিক্রম হতে পারে। এর সাক্ষ্য ও অনেক আলেম ও ফিকহবিদের কর্ম থেকে পাওয়া যায়।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا - تَبَتَّلْ -এর শাব্দিক অর্থ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাজ্জুদের নামাজের আদেশ দেওয়ার পর এই আয়াতে এমন এক ইবাদতের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা রাত্রি অথবা দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয় বরং সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। তা হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করা। এখানে সদাসর্বদা অব্যাহত রাখার অর্থে আল্লাহকে স্মরণ করার আদেশ করা হয়েছে। কেননা একথা কল্পনাও করা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন না, তাই এ আদেশ করা হয়েছে। -(মাযহারী)
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দিবারাত্রি সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এতে কোনো সময় অবহেলা ও অসাবধানতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এটা তখনই হতে পারে, যখন স্মরণ করার অর্থ ব্যাপক নেওয়া হয় অর্থাৎ মুখে, অন্তরে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যাপৃত রেখে ইত্যাদি যে কোনো প্রকারে স্মরণ করা। এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) كَانَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ حِيْنٍ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করতেন। এটাও উপরিউক্ত ব্যাপক অর্থে শুদ্ধ হতে পারে। কেননা প্রস্রাব-পায়খানার সময় তিনি যে মুখে আল্লাহকে স্মরণ করতেন না, একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তবে আন্তরিক স্মরণ সর্বাবস্থায় হতে পারে। আন্তরিক স্মরণ দুই প্রকার– ১. শব্দ কল্পনা করে স্মরণ করা এবং ২. আল্লাহর গুণাবলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। -(মাওলানা থানভী)
আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় আদেশ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا অর্থাৎ আপনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে ও ইবাদতে মগ্ন হোন। এর সাধারণ অর্থে ইবাদতে শিরক না করাও দাখিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসায়, চলাফেরায় দৃষ্টি ও ভরসা আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখা এবং অপরকে লাভ-লোকসান ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করাও দাখিল। হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, تَبَتَّلْ -এর অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা। -(মাযহারী) কিন্তু এই تَبَتَّلْ তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই رَهْبَانِيَّتَ তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে لَا رَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা শরিয়তের পরিভাষায় رَهْبَانِيَّةَ -এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ভোগ সামগ্রী ও হালাল বস্তুসমূহকে ইবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস থাকা যে, এসব হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারে না, অথবা ওয়াজিব হকে ত্রুটি করে কার্যত সম্পর্কচ্ছেদ করা। আর এখানে যে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে আল্লাহর সম্পর্কের উপর কোনো সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেওয়া। এ ধরনের সম্পর্কছেদ বিবাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কারবারের পরিপন্থি নয়; বরং এগুলোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর। পয়গম্বরগণের সুন্নত; বিশেষত পয়গম্বরকুল শিরোমণি মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ -এর সমগ্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে تَبَتَّلْ শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, পূর্ববর্তী বুজুর্গানে দীনের ভাষায় এরই অপর নাম 'ইখলাস'। -(মাযহারী)
জ্ঞাতব্য : অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং সাংসারিক সম্পর্ক ত্যাগ করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সূফী বুজুর্গগণ সবার অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা বলেন, আমরা যে দূরত্ব অতিক্রম করার কাজে দিবারাত্রি মশগুল আছি, প্রকৃতপক্ষে তার দু'টি স্তর আছে -প্রথম স্তর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় স্তর আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা। উভয় স্তর পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আলোচ্য আয়াতে এ দু'টি স্তরই পর পর দুই বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। ১. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ এবং ২. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا
এখানে আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ সার্বক্ষণিকভাবে স্মরণ করা যাতে কখনো দুটি ও শৈথিল্য দেখা না দেয়। এই স্তরকেই সুফী-বুযূর্গগণের পরিভাষায় وُصُوْلُ اِلَى اللّٰهِ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা বলা হয়। এভাবে প্রথম বাক্যে শেষ স্তর এবং শেষ বাক্যে প্রথম স্তর উল্লিখিত হয়েছে। এই ক্রম পরিবর্তনের কারণ সম্ভবত এই যে, দ্বিতীয় স্তরই আল্লাহর পথের পথিকের আসল উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। তাই এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করার জন্য স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। শেখ সাদী (র.) উপরিউক্ত দু'টি স্তর চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন–

تعلق حجاب است وبے حاصلی * چو پیوندہا بگسلی واصلی

ইসমে যাতের জিকির অর্থাৎ বারবার 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলাও ইবাদত : আয়াতে ইসম শব্দ উল্লেখ করে وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ বলা হয়েছে এবং وَاذْكُرْ رَبَّكَ বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসম অর্থাৎ আল্লাহ বারবার উচ্চারণ করাও আদিষ্ট বিষয় ও কাম্য। -(মাযহারী) কোনো কোনো আলেম একে বিদ'আত বলেছেন। আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের এই উক্তি ঠিক নয়।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا যাকে কোনো কাজ সোপর্দ করা হয়, অভিধানে তাকে وَكِيل বলা হয়। কাজেই فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহর কাছে সোপর্দ কর। পরিভাষায় একেই তাওয়াক্কুল বলা হয়। এই সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদত্ত নির্দেশাবলির মধ্যে এটা পঞ্চম নির্দেশ। ইমাম ইয়াকূব কারখী (র.) বলেন, সূরার শুরু থেকে এই আয়াত পর্যন্ত সুলূক তথা আল্লাহর পথে চলার পাঁচটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে ১. রাত্রিবেলায় আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্জনে গমন, ২. কুরআন পাকে মশগুল হওয়া, ৩. সদা-সর্বদা আল্লাহর স্মরণ ৪. সৃষ্টির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং ৫. তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের সর্বশেষ নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার গুণ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের পালনকর্তা এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাদি আগাগোড়া পূর্ণ করার জিম্মাদার, একমাত্র তিনিই তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার যোগ্য হতে পারেন এবং তার উপর যে ব্যক্তি ভরসা করবে, সে কখনও বঞ্চিত হবে না। কুরআনের অন্য এক আয়াতে আছে, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার যাবতীয় প্রয়োজনাদি ও বিপদাপদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

তাওয়াক্কুলের শরিয়তসম্মত অর্থ : আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার অর্থ এরূপ নয় যে, জীবিকা উপার্জন ও আত্মরক্ষার যেসব উপকরণ ও হাতিয়ার আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন, সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। বরং তাওয়াক্কুলের স্বরূপ এই যে, উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ও উপকরণাদি পুরোপুরি ব্যবহার কর, কিন্তু বৈষয়িক উপকরণাদিতে অতিমাত্রায় মগ্ন হয়ে যেও না। ইচ্ছাধীন কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর ফলাফল আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।

তাওয়াক্কুলের এই অর্থ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বগভী ও বায়হাকী (র.) বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেন,

إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا أَلَا فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি তখন পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হবে না, যে পর্যন্ত সে তার অবধারিত ও লিখিত রিজিক পুরোপুরি হাসিল না করে। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনে এতদূর মগ্ন হয়ো না যে, অন্তরের সমস্ত অভিনিবেশ বৈষয়িক উপকরণাদির মধ্যেই সীমিত থেকে যায় এবং তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর। -(মাযহারী) তিরমিযীতে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুনিয়া ত্যাগ এর নাম নয় যে, তোমরা হালালকৃত বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিবে অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ অযথা উড়িয়ে দিবে; বরং দুনিয়া ত্যাগের অর্থ এই যে, তোমাদের কাছে যা আছে, তার তুলনায় আল্লাহর কাছে যা আছে তার উপর তোমাদের ভরসা বেশি হবে। -(মাযহারী)

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ -ইমাম কারখী (র.)-এর উক্তিমতে এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদত্ত ষষ্ঠ নির্দেশ। অর্থাৎ মানুষের উৎপীড়ন ও গালিগালাজে সবর করা। এটা আল্লাহর পথের পথিকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। উদ্দেশ্য এই যে, যাদের শুভেচ্ছায় ও সহানুভূতিতে সাধক তার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও জীবন নিয়োজিত করে, প্রতিদানে তাদের পক্ষ থেকেই নির্যাতন ও গালিগালাজ শুনে উত্তম সবর করবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের কল্পনাও করবে না। সূফীগণের পরিভাষায় এই সর্বোচ্চ স্তর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا - هَجْر -এর শাব্দিক অর্থ বিষণ্ন ও দুঃখিত মনে কোনো কিছুকে ত্যাগ করা। অর্থাৎ মিথ্যারোপকারী কাফেররা আপনাকে যেসব পীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে, আপনি সেসবের প্রতিশোধ নিবেন না ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও রাখবেন না। সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় মানুষের অভ্যাস এই যে, যার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা হয়, তাকে গালমন্দ দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্পর্ক ত্যাগের আদেশ দিতে যেয়ে هَجْرًا جَمِيلًا শব্দ যোগ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপনার উচ্চ পদমর্যাদার খাতিরে আপনি কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন এবং মুখেও তাদেরকে মন্দ বলবেন না।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, পরবর্তীতে অবতীর্ণ জিহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা এই আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু চিন্তা করলে এরূপ বলার প্রয়োজন নেই। কেননা আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের উৎপীড়নের কারণে সবর ও সম্পর্ক ত্যাগ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটা হুমকি, শাস্তি জিহাদের পরিপন্থি নয়। এই আয়াতের নির্দেশ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য এবং জিহাদে যে শাস্তির হুমকি আছে তার আদেশ বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রযোজ্য। এছাড়া ইসলামি জিহাদ কোনো প্রতিশোধ স্পৃহা ও ক্রোধবশত করা হয় না, যা সবর ও উত্তম সম্পর্ক ত্যাগের পরিপন্থি হবে। বরং জিহাদ বিশেষ আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন মাত্র। সাধারণ অবস্থায় সবর ও সম্পর্ক ত্যাগও তেমনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্ত্বনার জন্য কাফেরদের পরকালীন আজাব বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী অত্যাচার-অবিচারের

কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন। তবে বিশেষ রহস্যের তাগিদে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। পরবর্তী আয়াত وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا -এর মর্ম তাই। এতে কাফেরদেরকে أُولِي النَّعْمَةِ বলা হয়েছে। نَعْمَةٌ শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া পরকাল অবিশ্বাসীরই কাজ হতে পারে। মু'মিনও মাঝে মাঝে এগুলো প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে তাতে মত্ত হয়ে পড়ে না। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মধ্যে থেকেও তার অন্তর পরকাল চিন্তা থেকে মুক্ত হয় না।

অতঃপর পরকালের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে أَنْكَالٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ আটকাবস্থা ও শিকল। এরপর জাহান্নামের উল্লেখ করে জাহান্নামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা আছে– طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ -এর গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকে যায় যে, গলধঃকরণও করা যায় না এবং উদগীরণও করা যায় না। জাহান্নামীদের খাদ্য যরী' ও যাক্কুমের অবস্থা তাই হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তাতে আগুনের ফোঁটা থাকবে; যা গলায় আটকে যাবে। -(নাউযুবিল্লাহ মিনহু) শেষে বলা হয়েছে, وَعَذَابًا أَلِيمًا নির্দিষ্ট আজাব উল্লেখ করার পর একথা বলে এর আরো অধিক কঠোরতা ও অকল্পনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের পরকাল ভীতি : ইমাম আহমদ, ইবনে আবী দাউদ, ইবনে আদী ও বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি কুরআন পাকের এই আয়াত শুনে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। হযরত হাসান বসরী (র.) একদিন রোজা রেখেছিলেন ইফতারের সময় সম্মুখে খাদ্য নীতি হলে অন্তরে এই আয়াতের কল্পনা জেগে উঠে। তিনি খাদ্য গ্রহণ করতে পারলেন না। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আবার এই ঘটনা ঘটল। তিনি আবার খাদ্য ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন তিনি খাদ্য গ্রহণ করলেন না, তখন তাঁর পুত্র হযরত সাবেত বুনানী, ইয়াযীদ যব্বী ও ইয়াহইয়া বাক্কা (র.)-এর কাছে যেয়ে পিতার অবস্থা জানালেন। তাঁরা এসে বহু পীড়াপীড়ির পর তাঁকে সামান্য খাদ্য গ্রহণে সম্মত করলেন। -(রূহুল মা'আনী)

অতঃপর কিয়ামতের কিছু ভয়াবহ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ -এরপর কাফেরদের ফেরাউন ও হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী শুনিয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, ফেরাউন পয়গম্বর হযরত মূসা (আ.)-কে মিথ্যারোপ করে আজাবে গ্রেফতার হয়েছে, তোমরা মিথ্যারোপ অব্যাহত রাখলে তোমাদের উপরও দুনিয়াতে এমনি ধরনের আজাব আসতে পারে। শেষে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে এরূপ আজাব না আসলেও কিয়ামতের সেই দিনের আজাবকে ঠেকাতে পারবে না, যেদিন ভয়াবহ ও দীর্ঘ হওয়ার কারণে বালককে বৃদ্ধে পরিণত করে দিবে। বাহ্যত এতে কিয়ামতের ভয়াবহতা ও কঠোরতা বিধৃত হয়েছে। সেদিন এমন ভীতি ও ত্রাস দেখা দিবে যে, বালকও বৃদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ একে উপমা বলেছেন এবং কারো মতে এটা বাস্তব সত্য। দিনটি এত দীর্ঘ হবে যে, বালকও বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে। -(কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

তাহাজ্জুদ আর ফরজ নয় : সূরার শুরুতে قُمِ اللَّيْلَ বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সকল মুসলমানের উপর তাহাজ্জুদ ফরজ করা হয়েছিল এবং এই নামাজ অর্ধরাত্রির কিছু কম অথবা কিছু বেশি এবং কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরজ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর একদল সাহাবী প্রায়ই রাত্রির অধিকাংশ সময় নামাজে অতিবাহিত করে এই ফরজ আদায় করতেন। প্রতি রাত্রিতেই এই ইবাদত এবং দিনের বেলায় দীনের দাওয়াত ও প্রচারকার্য, তদুপরি ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি নির্বাহ করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশই মেহনত মজুরী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। নিয়মিতভাবে এই দীর্ঘ নামাজ আদায় করতে করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের পদযুগল ফুলে যায়। তাঁদের এই কষ্ট ও শ্রম আল্লাহ তা'আলার অগোচরে ছিল না। কিন্তু তাঁর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল যে, এই পরিশ্রম ও মেহনতের ইবাদত ক্ষণস্থায়ী হবে, যাতে তাঁরা পরিশ্রম ও সাধনায় অভ্যস্ত হয়ে যান। এর প্রতি إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا আয়াতেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ এর চেয়ে ভারি ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী কুরআনের দায়িত্ব আপনাকে সোপর্দ করা হবে, তাই আপনাকে এই কষ্ট ও পরিশ্রমে নিয়োজিত করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী যখন এই সাধনা ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরজ রহিত করে দেওয়া হলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটাও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কেবল দীর্ঘ নামাজ রহিত হয়েছে এবং আসল তাহাজ্জুদের নামাজ পূর্ববৎ ফরজ রয়ে গেছে। অতঃপর মি'রাজের রাত্রিতে যখন পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ করা হলো, তখন তাহাজ্জুদের নামাজ আর ফরজ রইল না।

বাহ্যত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সমস্ত উম্মত থেকে এই ফরজ রহিত হয়ে গেছে। তবে তাহাজ্জুদের নামাজ মোস্তাহাব এবং আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়-এই বিধান এখনও বাকি আছে। এখন এই নামাজের কোনো সময়সীমা এবং কুরআন পাঠের কোনো বাঁধা-ধরা পরিমাণ রাখা হয়নি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি ও ফুরসত অনুযায়ী পড়তে পারে এবং যতটুকু সম্ভব কুরআন পাঠ করতে পারে।

শরিয়তের বিধান রহিত হওয়ার স্বরূপ ঃ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে তাদের আইন-কানুন পরিবর্তন ও রহিত করে থাকে। তবে এর বেশির ভাগ কারণ অভিজ্ঞতার পর নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে, যা পূর্বে জানা থাকে না। নতুন পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে প্রথম আইন রহিত করে অন্য আইন জারি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলিতে এরূপ কল্পনাও করা যায় না। কেননা কোনো নতুন বিধান জারি করার পর মানুষের কি অবস্থা দাঁড়াবে, কেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তা আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন। তাঁর সর্বব্যাপী ও চিরন্তন জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছু নেই। কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে কোনো কোনো বিধান আল্লাহর জ্ঞানে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জারি করা হয় এবং তা কারো কাছে প্রকাশ করা হয় না। ফলে মানুষ মনে করে যে, এই বিধান চিরকালের জন্য স্থায়ী। আল্লাহর কাছে নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যখন বিধানটি প্রত্যাহার করা হয়, তখন মানুষের দৃষ্টিতে তা রহিতকরণ বলে প্রতিভাত হয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা দ্বারা মানুষের কাছে একথা বর্ণনা করা ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে, বিধানটি চিরকালের জন্য নয়; বরং এই মেয়াদের জন্যই জারি করা হয়েছিল। এখন মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বিধানও শেষ হয়ে গেছে।

কুরআন পাকের অনেক আয়াত রহিত হতে দেখে সাধারণভাবে যে সন্দেহ উত্থাপন করা হয়, উপরিউক্ত বক্তব্যে তার জবাব দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরেও বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ ছিল। তাঁরা সূরা বনী ইসরাঈলের وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ আয়াতখানি এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। এতে বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দায়িত্বে তাহাজ্জুদের নামাজকে একটি অতিরিক্ত ফরজ হিসাবে আরোপ করা হয়েছে। কেননা نَافِلَةً শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত; মানে অতিরিক্ত ফরজ। কিন্তু অধিকাংশের মতে এই নামাজ এখন কারো উপর ফরজ নয়। তবে মোস্তাহাব সবার জন্যই। আয়াতে نَافِلَةً لَّكَ বলে পারিভাষিক নফল বুঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কিত অবশিষ্ট আলোচনা সূরা বনী ইসরাঈলের তাফসীরে দেখুন।

ফরজ তাহাজ্জুদ রহিতকারী اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ থেকে فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ পর্যন্ত আয়াতখানি সূরার শুরুভাগের আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার এক বছর অথবা আট মাস পর অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব পূর্ণ এক বছর পর ফরজ তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরার শুরুতে তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এক বছর পর্যন্ত এই আদেশ পালন করতে থাকেন। সূরার শেষ অংশ বার মাস পর্যন্ত আকাশে আটকে রাখা হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার পর শেষ অংশ অবতীর্ণ হয় এবং তাতে ফরজ তাহাজ্জুদ রহিত করে দেওয়া হয়। এরপর তাহাজ্জুদের নামাজ নিছক নফল ও মোস্তাহাব থেকে যায়। –(রূহুল মা'আনী)

এরপর রহিতকরণের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ اِحْصَاءُ শব্দের অর্থ গননা করতে পারবে না। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের নামাজে আল্লাহ তা'আলা রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এই নামাজে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্র কতটুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। কেননা তখনকার দিনে সময় জানার যন্ত্র ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না। থাকলেও নামাজে মশগুল হয়ে বারবার ঘড়ির দিকে তাকানো তাঁদের অবস্থা ও খুশু-খুজুর পরিপ্রেক্ষিতে সহজ ছিল না। আবার কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এখানে اِحْصَاءُ শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যহ যথারীতি নামাজ পড়তে সক্ষম না হওয়া। শব্দটি এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন হাদীসে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর নামসমূহকে কর্মের ভেতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জান্নাতে দাখিল হবে। সূরা ইবরাহীমের তাফসীরেও এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

تَوْبَةٌ – فَتَابَ عَلَيْكُمْ শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তওবাকেও এ কারণে তওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এখানে কেবল প্রত্যাহার বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফরজ

তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অবশেষে বলা হয়েছে, فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাজ, যা এখন ফরজের পরিবর্তে মোস্তাহাব অথবা সুন্নত রয়ে গেছে, তাতে যে যতটুকু কুরআন সহজে পাঠ করতে পারে, পাঠ করুক। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ –এখানে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে ফরজ নামাজ বুঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, ফরজ নামাজ পাঁচটি যা মে'রাজের রাত্রিতে ফরজ হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামাজ এক বছর পর্যন্ত ফরজ থাকা কালেই মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর পূর্বোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ফরজ তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। সুতরাং সূরার শেষের اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আয়াতের পাঞ্জেগানা ফরজ নামাজ বুঝানো যেতে পারে।

–(ইবনে কাছীর, কুরতুবী, বাহরে মুহীত)

এমনি ভাবে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ বাক্যে ফরজ যাকাত বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, জাকাত হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরজ হয়েছে এবং এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বিশেষভাবে এই আয়াতটিকে মদিনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু ইবনে কাসীর বলেন, জাকাত মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরজ হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদিনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ফরজ জাকাত বুঝানো যেতে পারে। -(রূহুল মা'আনীও তাই বলেছে)

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا –আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছে। এতে তার অবস্থার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের দিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা ধনীদের সেরা ধনী, তাঁকে দেওয়া ঋণ কখনো মারা যাবে না অবশ্যই পরিশোধিত হবে। ফরজ জাকাতের আদেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বুঝানো হয়েছে; যেমন আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনকে কিছু দেওয়া, মেহমানদের জন্য ব্যয় করা, আলিম ও সাধু পুরুষদের সেবাযত্ন করা ইত্যাদি। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমন পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। কাজেই اَقْرِضُوا اللّٰهَ বাক্যে এসব ওয়াজিব পাওনা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ অর্থাৎ তোমরা জীবদ্দশায় যে যে কাজ সম্পাদন কর, তা মৃত্যুর সময় সেই কাজের অসিয়ত করে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা স্বাধীন; তারা অসিয়ত পূর্ণ করতেও পারে, না-ও করতে পারে। এতে আর্থিক-ইবাদত, সদকা-খয়রাতসহ নামাজ-রোজা ইত্যাদিও দাখিল।

হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে নিজের ধনসম্পদের তুলনায় ওয়ারিশের ধনসম্পদকে বেশি ভালোবাসে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, নিজের ধনের চেয়ে ওয়ারিশের ধনকে বেশি ভালোবাসে এরূপ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, খুব বুঝেশুনে উত্তর দাও। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, এই উত্তর ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উত্তর জানা নেই। তিনি বললেন, (আচ্ছা, তা হলে বুঝে নাও) তোমার ধন তাই, যা তুমি স্বহস্তে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। তোমার মৃত্যুর পর যে ধন থেকে যাবে, তা তোমার ধন নয় তোমার ওয়ারিশের ধন। -(ইবনে কাছীর)

শব্দবিশ্লেষণ :

اَلْمُزَّمِّلُ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَزَمُّلٌ মূলবর্ণ (ز - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– বস্ত্রাবৃত।

اُنْقُصْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَقْصٌ মূলবর্ণ (ن - ق - ص) জিনস صحيح অর্থ– কম করুন।

زِدْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার زِيَادَةٌ মূলবর্ণ (ز - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ- বৃদ্ধি করুন।

رَتِّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَرْتِيْل মূলবর্ণ (ر - ت - ل) জিনস صحيح অর্থ– খুব স্পষ্টভাবে পাঠ করুন।

سَنُلْقِىْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অচিরেই প্রেরণ করছি, নিক্ষেপ করছি।

سَبْحًا : মাসদার। বাব فَتَحَ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– ব্যস্ত হওয়া, দ্রুত সাঁতার কাটা।

تَبَتَّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَبَتُّلٌ মূলবর্ণ (ب - ت - ل) জিনস صحيح অর্থ– মগ্ন থাকুন।

اُهْجُرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার هَجْرٌ মূলবর্ণ (ه - ج - ر) জিনস صحيح অর্থ– পৃথক থাকুন।

مَهِّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْهِيْلٌ মূলবর্ণ (م - ه - ل) জিনস صحيح অর্থ- তুমি অবকাশ দাও, ঢিল দাও, সময় দাও।

اَنْكَالًا : শব্দটি نِكْلٌ-এর বহুবচন অর্থ- বেড়িসমূহ।

تَرْجُفُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجْفٌ মূলবর্ণ (ر - ج - ف) জিনস صحيح অর্থ– কম্পিত হবে।

وَبِيْلًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব كَرُمَ মাসদার وَبْلٌ মূলবর্ণ (و - ب - ل) জিনস مثال واوى অর্থ– কঠোরভাবে প্রতিকূল। কঠিন পীড়াদায়ক।

شِيْبًا : শব্দটি اَشْيَبُ বহুবচন অর্থ- বৃদ্ধ।

مُنْفَطِرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার إِنْفِطَارٌ মূলবর্ণ (ف - ط - ر) জিনস صحيح অর্থ– ফেটে যাবে।

يُقَدِّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْدِيْرٌ মূলবর্ণ (ق - د - ر) জিনস صحيح অর্থ- তিনি পরিমাণ করবেন, অনুমান করবেন, মূল্যমান নির্ণয় করবেন।

لَنْ تُحْصُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع منصوب بلن বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْصَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ص - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তা নিয়ন্ত্রন করতে পারেন না ه - ضمير منصوب متصل

تَيَسَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَيَسُّرٌ মূলবর্ণ (ى - س - ر) জিনস مثال يائى অর্থ– তা সহজ হয়।

تُقَدِّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْدِيْمٌ মূলবর্ণ (ق - د - م) জিনস صحيح অর্থ– পূর্বে প্রেরণ করবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا : এখানে إِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর لَكَ হলো خبر ان المقدم আর فِى النَّهَارِ হলো حال কেননা এটা মূলত سَبْحًا-এর সিফত ছিল। আর سَبْحًا হলো اسم ان আর طَوِيْلًا হলো اسم ان المؤخر। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ১১২]

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা মুদ্দাছ্ছির

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫৬, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ	আয়াত
১. হে বস্ত্রাবৃত! [রাসূল]	يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾
২. উঠুন, অতঃপর [কাফেরদেরকে] ভীতি প্রদর্শন করুন।	قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢﴾
৩. এবং নিজ প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন।	وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾
৪. আর স্বীয় বস্ত্রসমূহ পবিত্র রাখুন।	وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾
৫. এবং মূর্তিসমূহ হতে দূরে থাকুন।	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾
৬. আর কাউকেও এ উদ্দেশ্যে দান করবেন না যে, অতিরিক্ত বিনিময় চাইবেন।	وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾
৭. আর স্বীয় প্রভুর [সন্তোষ লাভের] জন্য ধৈর্যধারণ করুন।	وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾
৮. অনন্তর যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে।	فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ হে বস্ত্রাবৃত (রাসূল)

২. قُمْ উঠুন فَاَنْذِرْ ভীতি প্রদর্শন করুন (কাফেরদেরকে)

৩. وَرَبَّكَ এবং নিজ প্রতিপালকের فَكَبِّرْ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন।

৪. وَثِيَابَكَ এবং নিজের বস্ত্রসমূহ فَطَهِّرْ পবিত্র রাখুন।

৫. وَالرُّجْزَ এবং মূর্তিসমূহ হতে فَاهْجُرْ দূরে থাকুন।

৬. وَلَا تَمْنُنْ আর কাউকেও এ উদ্দেশ্যে দান করবেন না যে, تَسْتَكْثِرُ অতিরিক্ত বিনিময় চাইবেন।

৭. وَلِرَبِّكَ স্বীয় প্রভুর জন্য فَاصْبِرْ ধৈর্য ধারণ করুন।

৮. فَاِذَا نُقِرَ অনন্তর যখন ফুৎকার দেওয়া হবে فِي النَّاقُوْرِ সিঙ্গায়।

৯. বস্তুত সেই সময়টুকু অর্থাৎ সেই দিনটি এক কঠিন দিন হবে ।	فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ﴿٩﴾
১০. কাফেরদের প্রতি তা বিন্দুমাত্রও সহজ হবে না ।	عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ﴿١٠﴾
১১. আমাকে এবং ঐ ব্যক্তিকে ছেড়ে দিন, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী ।	ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ﴿١١﴾
১২. আর তাকে প্রচুর ধন সম্পদ দান করেছি ।	وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ﴿١٢﴾
১৩. এবং নিকটে অবস্থানকারী পুত্রগণও ।	وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ﴿١٣﴾
১৪. এবং সর্বপ্রকারের সরঞ্জাম তার জন্য বন্দোবস্ত করেছি ।	وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ﴿١٤﴾
১৫. তবুও সে এই লালসা করে যে, আরো অধিক দেই ।	ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ﴿١٥﴾
১৬. কখনোই নয়; সে আমার আয়াতসমূহের বিরোধী ।	كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ﴿١٦﴾
১৭. অচিরেই তাকে দোজখের [সউদ] পর্বতে চড়াব ।	سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ﴿١٧﴾
১৮. সে চিন্তা করল, তৎপর একটা সিদ্ধান্ত স্থির করল ।	اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾
১৯. সুতরাং সে ধ্বংস হোক, সে কেমন সিদ্ধান্ত স্থির করল?	فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. فَذٰلِكَ বস্তুত সেই সময়টুকু يَوْمَئِذٍ অর্থাৎ সেই দিনটি يَوْمٌ عَسِيْرٌ কঠিন দিন হবে ।

১০. عَلَى الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের প্রতি তা غَيْرُ يَسِيْرٍ বিন্দুমাত্রও সহজ হবে না ।

১১. ذَرْنِيْ وَمَنْ আমাকে এবং ঐ ব্যক্তিকে ছেড়ে দিন । خَلَقْتُ وَحِيْدًا যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী ।

১২. وَجَعَلْتُ لَهٗ, আর তাকে দান করেছি । مَالًا مَّمْدُوْدًا প্রচুর ধন সম্পদ ।

১৩. وَبَنِيْنَ, এবং পুত্রগণও । شُهُوْدًا নিকটে অবস্থানকারী ।

১৪. وَمَهَّدْتُ لَهٗ, এবং তার জন্য বন্দোবস্ত করেছি । تَمْهِيْدًا সর্বপ্রকারের সরঞ্জাম ।

১৫. ثُمَّ يَطْمَعُ তবুও সে এই লালসা করে যে, اَنْ اَزِيْدَ আরো অধিক দেই ।

১৬. كَلَّا কখনই নয় । اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا সে আমার আয়াতসমূহের । عَنِيْدًا বিরোধী ।

১৭. سَاُرْهِقُهٗ অচিরেই তাকে আমি চড়াব । صَعُوْدًا দোজখের পর্বতে ।

১৮. اِنَّهٗ فَكَّرَ সে চিন্তা করল وَقَدَّرَ, তৎপর একটা সিদ্ধান্ত স্থির করল ।

১৯. فَقُتِلَ সুতরাং সে ধ্বংস হোক كَيْفَ قَدَّرَ কেমন সিদ্ধান্ত স্থির করল ।

২০. অনন্তর সে ধ্বংস হোক, সে কেমন সিদ্ধান্ত স্থির করল?	ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾
২১. অতঃপর দৃষ্টি করল।	ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾
২২. তৎপর সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল।	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾
২৩. তৎপর সে পিছনে ফিরল এবং দম্ভ প্রকাশ করল।	ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾
২৪. অনন্তর বলল, এটা তো নকল করা জাদু।	فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾
২৫. এটা তো মানুষের উক্তি।	إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾
২৬. অচিরেই আমি তাকে দোজখে নিক্ষেপ করব।	سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾
২৭. আর আপনার কি জানা আছে যে, দোজখ কী বস্তু?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾
২৮. যা তাদেরকে জীবিতাবস্থায় ছাড়বে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবে না।	لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾
২৯. তা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে,	لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾
৩০. 'সাকার' নামক উক্ত দোজখের তত্ত্বাবধানে উনিশজন ফেরেশতা [নিযুক্ত] থাকবে।	عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. ثُمَّ قُتِلَ অনন্তর সে ধ্বংস হোক كَيْفَ قَدَّرَ সে কেমন সিদ্ধান্ত স্থির করল।
২১. ثُمَّ نَظَرَ অতঃপর দৃষ্টি করল।
২২. ثُمَّ عَبَسَ তৎপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল وَبَسَرَ ও মুখ বিকৃত করল।
২৩. ثُمَّ أَدْبَرَ তৎপর সে পিছনে ফিরল وَاسْتَكْبَرَ এবং দম্ভ প্রকাশ করল।
২৪. فَقَالَ অনন্তর বলল إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ এটাতো নকল করা জাদু।
২৫. إِنْ هَٰذَا إِلَّا এটাতো قَوْلُ الْبَشَرِ মানুষের উক্তি।
২৬. سَأُصْلِيهِ অচিরেই আমি তাকে নিক্ষেপ করব سَقَرَ দোজখে।
২৭. وَمَا أَدْرَاكَ আপনার কি জানা আছে যে مَا سَقَرُ দোজখ কি বস্তু।
২৮. لَا تُبْقِي যা তাদেরকে জীবিতাবস্থায় ছাড়বে না وَلَا تَذَرُ, এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবে না।
২৯. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ তা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে
৩০. عَلَيْهَا তার উপর (নিযুক্ত) থাকবে تِسْعَةَ عَشَرَ উনিশজন ফেরেশতা।

বাংলা	আরবি
৩১. আর দোজখের কর্মচারী আমি কেবল ফেরেশতাদেরকেই নিযুক্ত করেছি, আর আমি তাদের সংখ্যা কেবল এরূপ রেখেছি যা কাফেরদের বিভ্রান্তির উপকরণ হয়, এ জন্য যে, কিতাবীগণ যেন বিশ্বস্ত হয় এবং ঈমানদারদের ঈমান আরো বর্ধিত হয়, আর কিতাবীগণ ও মুমিনগণ সন্দেহ না করে, আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা, আর কাফেররা যেন বলে যে, এই আশ্চর্য উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কী? এরূপই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, বিভ্রান্ত করে থাকেন, আর যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করে থাকেন; আর তোমাদের প্রভুর সৈন্যদেরকে তিনি ব্যতীত কেউই জানে না; আর দোজখ শুধু মানুষের উপদেশের জন্য।	وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾
৩২. নিশ্চয় চন্দ্রের শপথ।	كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾
৩৩. এবং রাত্রির [কসম], যখন তা অতিক্রান্ত হতে থাকে।	وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আর প্রভাতের যখন তা আলোকিত হয়।	وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ﴿٣٤﴾
৩৫. ঐ দোজখ অতি কঠিন বস্তু।	اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً আর দোজখের কর্মচারী আমি কেবল ফেরেশতাগণকেই নিযুক্ত করেছি وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর আমি তাদের সংখ্যা কেবল এরূপ রেখেছি যা কাফেরদের বিভ্রান্তির উপকরণ হয় لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ এই জন্য যে কিতাবীগণ যেন বিশ্বস্ত হয় وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا এবং ঈমানদারদের ঈমান আরো বর্ধিত হয় وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ আর কিতাবীগণ ও মুমিনগণ সন্দেহ না করে وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা আর কাফেররা যেন বলে مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا এই আশ্চর্য উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? كَذٰلِكَ এরূপেই يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করে থাকেন وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ আর যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করে থাকেন وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ তোমার প্রভুর সৈন্যদেরকে তিনি ব্যতীত কেউই জানে না وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ, আর দোজখ শুধু মানুষের উপদেশের জন্য।

৩২. كَلَّا وَالْقَمَرِ নিশ্চয়ই চন্দ্রের শপথ।

৩৩. وَالَّيْلِ এবং রাত্রির (কসম) اِذْ اَدْبَرَ যখন তা অতিক্রান্ত হতে থাকে।

৩৪. وَالصُّبْحِ, আর প্রভাতের اِذَآ اَسْفَرَ যখন তা আলোকিত হয়।

৩৫. اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ঐ দোজখ অতি কঠিন বস্তু।

অনুবাদ	আয়াত
৩৬. যা মানুষের জন্য অত্যন্ত ভীতিজনক।	نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾
৩৭. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে ইচ্ছা করে, তার জন্যও, অথবা যে পশ্চাদপসরণ করে, তার জন্যও।	لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾
৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কার্যাবলির বিনিময়ে আবদ্ধ হবে।	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾
৩৯. দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত।	إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾
৪০. কেননা তারা জান্নাতে থাকবে। [আর] তারা জিজ্ঞাসা করবে।	فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾
৪১. অপরাধীদের অবস্থা সম্বন্ধে।	عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾
৪২. কোন বস্তু তোমাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করল?	مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾
৪৩. তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না।	قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর না দরিদ্রদেরকে খানা খাওয়াতাম।	وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর [সত্য ধর্মকে বিলোপ করার চেষ্টায় রত ছিল, সে] প্রচেষ্টাকারীদের সঙ্গে আমরাও চেষ্টায় [রত] থাকতাম।	وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾
৪৬. এবং কিয়ামত দিবসকে অবিশ্বাস করতাম।	وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. نَذِيرًا যা অত্যন্ত ভীতিজনক لِلْبَشَرِ মানুষের জন্য।

৩৭. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা করে أَنْ يَتَقَدَّمَ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে أَوْ يَتَأَخَّرَ অথবা পশ্চাদপসরণ করে তার জন্যও।

৩৮. كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেক ব্যক্তি بِمَا كَسَبَتْ নিজ কার্যাবলির বিনিময়ে رَهِينَةٌ আবদ্ধ হবে।

৩৯. إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ওয়ালাগণ ব্যতীত।

৪০. فِي جَنَّاتٍ কেননা তারা জান্নাতে থাকবে يَتَسَاءَلُونَ তারা জিজ্ঞাসা করবে।

৪১. عَنِ الْمُجْرِمِينَ অপরাধীদের অবস্থা সম্পর্কে।

৪২. مَا سَلَكَكُمْ কোন বস্তু তোমাদেরকে নিক্ষেপ করল فِي سَقَرَ দোজখে।

৪৩. قَالُوا তারা বলবে لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ আমরা নামাজ পড়তাম না।

৪৪. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ আর না খানা খাওয়াতাম الْمِسْكِينَ দরিদ্রদেরকে

৪৫. وَكُنَّا نَخُوضُ আর আমরাও চেষ্টায় (রত) থাকতাম مَعَ الْخَائِضِينَ (সত্য ধর্মকে বিলোপ করার চেষ্টায় রত ছিল সে) প্রচেষ্টাকারীদেরকে সঙ্গে।

৪৬. وَكُنَّا نُكَذِّبُ এবং অবিশ্বাস করতাম بِيَوْمِ الدِّينِ কিয়ামত দিবসকে।

৪৭. এমন কি [এ অবস্থায়ই] আমাদের মৃত্যু এসে পড়ল।	حَتّٰىٓ اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾
৪৮. অতএব, সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না।	فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. অনন্তর তাদের কী হলো যে, তারা এ উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়?	فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. যেন তারা বন্য গাধা।	كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾
৫১. যারা ব্যাঘ্র হতে পলায়ন করছে।	فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾
৫২. বরং তারা প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে [আসমান হতে] খোলা চিঠি প্রদান করা হোক।	بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾
৫৩. কখনো না; বরং তারা আখেরাতকে ভয় করে না।	كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٥٣﴾
৫৪. কখনো না, এ কুরআনই [যথেষ্ট] উপদেশ।	كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾
৫৫. অতএব, যার ইচ্ছা হয় তা হতে উপদেশ লাভ করুক [আর যার ইচ্ছা না করুক]।	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿٥٥﴾
৫৬. আর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না; তিনি এমন সত্তা যাকে ভয় করা উচিত, আর [তিনিই] যিনি বান্দার পাপ মোচন করে থাকেন।	وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. حَتّٰىٓ اَتٰىنَا এমনকি আমাদের এসে পড়ল الْيَقِيْنُ মৃত্যু।

৪৮. فَمَا تَنْفَعُهُمْ অতএব কোনো উপকারে আসবে না شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ সুপারিশকারীদের সুপারিশ।

৪৯. فَمَا لَهُمْ অনন্তর তাদের কি হলো যে, তারা عَنِ التَّذْكِرَةِ এই উপদেশ হতে مُعْرِضِيْنَ মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৫০. كَاَنَّهُمْ যেন তারা حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ বন্য গাধা।

৫১. فَرَّتْ যারা পলায়ন করছে مِنْ قَسْوَرَةٍ ব্যাঘ্র হতে।

৫২. بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ বরং তারা প্রত্যেকেই কামনা করে যে, اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً তাকে খোলা চিঠি প্রদান করা হোক।

৫৩. كَلَّا কখনো না بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ বরং তারা আখেরাতকে ভয় করে না।

৫৪. كَلَّآ কখনো না اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ এই কুরআনই উপদেশ।

৫৫. فَمَنْ شَآءَ অতএব যার ইচ্ছা হয় ذَكَرَهٗ তা হতে উপদেশ লাভ করুক।

৫৬. وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى তিনি এমন সত্তা যাকে ভয় করা উচিত اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ, যিনি বান্দার পাপ মোচন করে থাকেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরাটির প্রথম আয়াতের শব্দ (اَلْمُدَّثِّرُ) হতে সূরাটির নাম দেওয়া হয়েছে। اَلْمُدَّثِّرُ এটা دَثَّرَ থেকে এসেছে। এটার অর্থ হলো কম্বল মুড়ি দিয়ে শয্যাগমনকারী। এতে ২টি রুকূ', ৫৬টি আয়াত, ২৫৫টি বাক্য এবং ১০১০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরার প্রথম সাতটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কারণ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত জাবির (রা.) হতে বেশ কয়টি হাদীস এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আর اِجْمَاعُ اُمَّتْ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .... مَا لَمْ يَعْلَمْ আয়াতগুলো সর্বপ্রথম মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। [হেরা গুহায়] এবং এটার পর হুযূর ﷺ -এর উপর বহুদিন যাবৎ ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ ছিল এবং এটার পর আবার নতুনভাবে যখন ওহী নাজিল হতে আরম্ভ করল, তখন প্রথমেই সূরা আল-মুদ্দাছ্ছিরের প্রথম থেকেই নাজিল হওয়া আরম্ভ করল। [ইমাম যুহরীও এ বর্ণনা প্রদান করেছেন] এটার পর ধারাবাহিকভাবে ওহী নাজিল হতে থাকে। বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে জারীর, সীরাতে ইবনে হিশাম ও আরো অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা মতে ৮ম আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো ঐ সময় নাজিল হয়েছিল যখন হুযূর ﷺ সরাসরিভাবে ইসলাম প্রচারের কার্য শুরু করলেন এব মক্কায় প্রথম হজব্রত পালন করতে আসছিলেন।

فَتْرَةُ الْوَحْيِ : ওহী অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ থাকার সময়ের কথা উল্লেখ করে স্বয়ং নবী করীম ﷺ বর্ণনা করেছেন, একদা আমি পথ চলতে ছিলাম, হঠাৎ আমি উর্ধ্বলোক হতে একটি আওয়াজ শুনতে পাই তখনই উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই ফেরেশতাকে যিনি আমার নিকট হেরা গুহায় ওহী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আসমান-জমিনের মাঝে একটি আসনে উপবেশন করে আছেন। এটা দেখে আমি ভীত হয়ে ঘরে চলে গেলাম এবং আমাকে কাপড় জড়িয়ে দিতে বললাম যে, আমার এ কারণে ভয় লাগছে। চাদরাবৃত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَاَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : সূরাটিতে মূলত মহানবী ﷺ -এর নবুয়তি জীবনের জন্য পহেলা কর্মসূচি, কিয়ামতের বর্ণনা, কাফের সর্দার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার আলোচনা, কুরাইশগণের ঈমান না আনার কারণ এবং তার ভয়াবহ পরিণতির কথা আলোচিত হয়েছে।

সূরার ১ থেকে ৭ আয়াতে নবী করীম ﷺ -এর ইসলামি আন্দোলনের কর্মসূচি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে আপনি তাওহীদের পতাকা নিয়ে দণ্ডায়মান হোন এবং তাওহীদের বিপরীত আচরণের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করতে থাকুন। আর দুনিয়ায় গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান রয়েছে, আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রভুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যের কথা ঘোষণা করতে থাকুন। তৃতীয়ত আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা এবং সামাজিক পরিবেশের সকল ক্ষেত্রে আপনার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র রাখুন। কাফেরদের প্রতিমাগুলো হতে পূর্ণমাত্রায় দূরে থাকুন এবং কারো কোনোরূপ অনুগ্রহ করলে নিঃস্বার্থভাবে করুন। আর এ দাওয়াতি আন্দোলনে আপনার উপর বিরাট বিপদ-আপদ আপতিত হতে পারে এবং পদে পদে দুঃখ-নির্যাতন দেখা দিতে পারে, আপনি এসব কিছু আপনার প্রতিপালকের সান্নিধ্য লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করবেন। এতে আদৌ কোনোরূপ ঘাবড়াবেন না।

৮ থেকে ১০ আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এ পর্যায়টি হবে কাফেরদের জন্য মহাসংকট কাল; কিন্তু মু'মিন লোকদের পক্ষে কোনো অসুবিধার কারণ হবে না।

১১ থেকে ৩১ আয়াতে কুরাইশ সর্দার মুগীরার আলোচনায় বলা হয়েছে যে, আমি তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সৃষ্টি করে পার্থিব জীবনে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে সুখী করেছি। সামাজিক জীবনে নেতা ও সর্দার বানিয়েছি কিন্তু আমার কুরআন সত্য শাশ্বতবাণী জেনেও তাকে অন্তরে চাপিয়ে সমাজে স্বীয় প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং মহানবীর নামে বদনাম রটিয়েছে। আমি তাকে কঠোরভাবে শায়েস্তা করবো এবং জাহান্নামের পাহাড়ের চূড়ায় চড়িয়ে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিবো।

৩২ থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত জান্নাতী লোকদের সাথে জাহান্নামী লোকদের কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, জান্নাতী লোকগণ জাহান্নমীদের কাছে এ শাস্তির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে আমরা পার্থিব জীবনে নামাজ আদায় করতাম না, অভাবীগণকে খাদ্য দিতাম না এবং ইসলামের বিরোধী গ্রুপের সাথে থাকতাম। আর পরকালকে অবিশ্বাস করতাম। এভাবে আমাদের জীবনটি শেষ হয়েছে। ফলে আমরা এ শাস্তি পাচ্ছি।

৪১ থেকে ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, কাফেরদের হলো কি তারা দীনের দাওয়াত শুনে এভাবে কেন পালাচ্ছে যেভাবে শিকারি হতে জংলী গাধা পালিয়ে থাকে। তারা যতই দাবি করুক না কেন কোনোক্রমেই তাদের দাবি পূরণ করা হবে না। এসব দাবি হলো তাদের বাহানামাত্র। মূলত পরকাল সম্পর্কে মনে কোনোরূপ ভয়ই রাখে না। সুতরাং তারা ঈমান না আনলে তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। কুরআনকে তাদের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। এটা দেখে যার মনে চায় সে ঈমান আনয়ন করুক। অথবা মন না চাইলে না আনুক। ভালো পথ মন্দ পথ গ্রহণ করা তাদের মর্জির উপর নির্ভরশীল। তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, কাউকেও ভয় করতে হলে একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা উচিত। অপরাধকে একমাত্র তিনি ক্ষমা করতে পারেন। সুতরাং তাদের কৃত অপরাধ হতে তওবা করে ঈমানের পথ গ্রহণ করা উচিত।

অত্র সূরার শানে নুযূল : অত্র সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে বলা হয়েছে প্রথম প্রথম অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ নির্জনতাকে খুবই ভালোবাসতেন। হযরত খাদীজা (রা.) প্রতিদিন তাঁর আহার্য তৈরি করে তাঁর সাথে দিয়ে দিতেন। তিনি তা নিয়ে হেরা গুহার একটি কোণে বসে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বয়ং হুযূর ﷺ ইরশাদ করেছেন, একদা আমি সে নির্জনতা হতে ঘরে ফিরে আসছিলাম। অতঃপর যখন ময়দানে গেলাম, তখন গায়েব হতে আমার কানে আওয়াজ আসল, তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। যখন আকাশের দিকে লক্ষ্য করলাম তখন দেখলাম আসমান জমিনের মাঝে চেয়ারের উপর একটি ফেরেশতা বসে আছে বলে অনুভব হয়েছে যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। এমতাবস্থায় ভয়ে আমার শরীর শীতল হয়ে উঠে, তখনই ঘরে এসেছে চাদর ইত্যাদি দ্বারা আবৃত হয়ে গেলাম। এ সময় আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরা অবতীর্ণ করেন।

লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে বলা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ فَتْرَةُ الْوَحْيِ সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে বলেন, আমি হাঁটাহাঁটি করছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, হেরা গুহায় যে ফেরেশতা আমার নিকট আসত সেই ফেরেশতাটি আসমান জমিনের মাঝে অবস্থিত রয়েছে, এতে আমি ভয় পেয়ে ঘরে চলে আসলাম এবং পরিবারকে বললাম زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির অবতীর্ণ করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, অলীদ ইবনে মুগীরা কুরাইশগণের জন্য খাবার তৈরি করে তাদেরকে জমায়েত করল। পানাহার শেষে সে বলল, এ লোকটিকে অর্থাৎ মুহাম্মদকে তোমরা কি বলতে চাও? কেউ বলল, সে তো জাদুকর। অন্য একজন বলল, না সে জাদুকর নয়। কেউ বলল, সে গণৎকার, প্রতিবাদে কেউ বলল, না সে গণৎকার নয়। আবার কেউ বলল, সে কবি। প্রতিবাদে কেউ বলল, সে কবিও নয়। কতক বলল, সে পরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত একজন জাদুকর। এ আলোচনার কথা মহানবী ﷺ -এর কর্ণে পৌঁছলে তিনি খুব মর্মাহত হলেন এবং বালিশের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর তাঁর দেহটি কম্বল দ্বারা জড়িয়ে দেওয়া হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (اَلْاٰيَةَ) আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[লুবাব, ইবনে কাছীর, খাযেন]

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ – (١)

শানে নুযূল : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাময়িকভাবে ওহী অবতরণ বন্ধ থাকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তার বর্ণনায় বলেছেন আমি হাটছিলাম এমন সময় আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম । আমার মাথা উপরে তুললাম। দেখি হেরা গুহায় যে ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিলেন তিনি আসমান ও জমিনের মাঝে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট। ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। পরে ঘরে ফিরে আসলাম। বললাম, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। বাড়ির লোকেরা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তখন এ সূরার প্রথম আয়াতগুলো নাজিল হয়। –[তিরমিযি, বুখারী শরীফ]

ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا – (١١)

শানে নুযূল -১ : এই আয়াত ও পরবর্তী কায়েকটি আয়াত দুষ্টমতী কাফের ওলীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহ পাক তাকে অঢেল ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাষায় তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ বাগিচা মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাওরী বলেন, তার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। কেউ কেউ আরও কম বলেছেন। তবে এতটুকু সবার কাছেই স্বীকৃত যে, তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানি সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ্ম সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। তাই কুরআন পাকে বলা হয়েছে وَجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا তাকে আরবের সরদার গণ্য করা হতো। জনসাধারণের মধ্যে তার উপাধি রায়হানা কুরায়শ খ্যাত ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশত নিজেকে ওহীদ ইবনুল ওহীদ অর্থাৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে সে ও তার পিতা মুগীরা কে অদ্বিতীয় বলত। কিন্তু এই পাপিষ্ট

আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করেনি এবং কুরআনকে খোদায়ী কালাম মেনে নেওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা রচনা বলে বকতে থাকে। সে কুরআনকে জাদু এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জাদুকর বলে প্রচার করে। তাফসীরে কুরতুবীতে তার ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে রাসূলে করীম ﷺ একদিন تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ থেকে اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলেন। ওলীদ ইবনে মুগীরা এই তেলাওয়াত শুনে একে খোদায়ী কালাম মেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধ্য হয় যে, আল্লাহর শপথ আমি তার মুখে এমন কালাম শুনেছি যা কোনো মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোনো জিনেরও হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ ধরনের বর্ণাঢ্যতা। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তর ভাগে প্রবাহিত হয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা এটা নিশ্চিতই সবার উর্ধ্বে থাকার কথা এবং এর উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, এসব কথা স্বীকার করার পরও শুধু অহংকার এবং বিদ্বেষবশতই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের স্বীকৃতি না দিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ বেছে নিল। ওলীদের ঘটনা বর্ণনা করে উক্ত আয়াতগুলো নাজিল হয়। –[সূত্র-মা'আরিফুল কুরআন বাংলা ১৪২০]

শানে নুযূল : -২ মুখতারার ইবনে কাসীরের মধ্যে ওলীদের ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওলীদ বিন মুগীরা মাখযূমী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে এলো, তখন নবী করীম ﷺ তাকে কুরআনের কতিপয় আয়াত তেলাওয়াত করে শুনান। কুরআনের আয়াতগুলো শুনার পর তার মন নরম হয়ে গেল। কিন্তু আবূ জাহল পর্যন্ত যখন সে কথা পৌঁছল তখন সে শীঘ্র তার কাছে যেয়ে বলতে লাগল যে, হে চাচাজান! আপনি কী আপনার সম্প্রদায়ের কথা ভেবেছেন? তারা মনে করছে আপনি মাল দৌলতের লোভে মুহম্মদের কাছে যেয়ে থাকেন ও বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে চলেছেন। তাতে সে রাগান্বিত হয়ে বলল, সে কি বলছ? আমার মাল দৌলত ও সন্তানাদি কি কম রয়েছে? আবূ জাহল তখন বলল, তাহলে আপনি কওমের নিকট সে কথা প্রকাশ করুন যে, আপনি মুহাম্মদের দ্বারা প্রভাবান্বিত নন। আপনি তার নব্য ধর্ম গ্রহণ করেননি। তখন ওলীদ বলল, আমি কি বলব আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই যে, আমার চেয়ে অধিক কবিতা বুঝতে পারে। আমি কাব্যের সকল বিষয়ে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি পারদর্শী। তোমাদের মাঝে জিনদের বিষয়েও কেউ আমার চেয়ে বেশি অবগত নও। আল্লাহ পাকের কসম, মুহাম্মদ ﷺ যা বলছে তা কবিতা বা জিনদের কোনো কথা মোটেও নয়। আল্লাহর কসম তার কথায় মধুরতা ও আকর্ষণ রয়েছে। তা অতি সুন্দর ও আলোকময় কথামালা। তার সামনে পৃথিবীর সকল সুন্দরতম কাব্য ও কথা অতি নগণ্য। আবূ জাহল তখন বলল, আপানর কওম ততক্ষণ আপনার ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো ধারণা লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ আপনি মুহাম্মদ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো কথা বলে না দেন। তখন সে বলল, তার সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলার জন্য আমাকে কিছু সময় দাও। অতঃপর ওলীদ বলল, মুহাম্মদ হলো একজন জাদুকর। কেননা সে তার জাদু দ্বারা সকলকে প্রভাবিত করে ফেলে। সে প্রেক্ষিতেই এই আয়াত নাজিল হয়।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ – (٣٠)

শানে নুযূল : ইহুদিদের একটি দল কোনো এক সাহাবীকে জাহান্নামের পাহারাদার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে এসে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়। –[ইবনে কাসীর]

وَمَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً – (٣١)

শানে নুযূল : একদিন আবূ জাহল বলল যে, হে কুরাইশ গোত্র, মুহাম্মদ ﷺ বলছেন যে, আল্লাহ তা'আলার যেসব সৈন্য তোমাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবে তাদের সংখ্যা মত্র ১৯ জন। এদিকে তোমাদের সংখ্যা সকল গোত্রের চেয়ে অধিক। তোমাদের শতজন লোকও কি সেই দোজখের সৈন্য বাহনীর একজন লোকের সাথে পেরে উঠতে সক্ষম হবে না। সে প্রেক্ষিতেই এই আয়াত নাজিল হয়। –[কানযুন নুকূল ১০৫]

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً – (٥٢)

শানে নুযূল : কাফেররা বলত যদি মুহাম্মদ ﷺ দোজখের দাবিতে সত্যবাদী হয় তাহলে সকালে আমাদের প্রত্যেকের মাথার নিচে একটি খোলা চিঠি পাওয়া যাক যার মধ্যে আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তির গ্যারান্টি থাকবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়।

সূরা মুদ্দাছছির সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরাও বলেছেন। সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর কুরআন অবতরণ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এই বিরতির শেষভাগে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পথ চলাকালে উপর দিক থেকে কিছু আওয়াজ শুনতে পান। তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে, সেই হেরা গিরিগুহায় আগমনকারী

ফেরেশতা শূন্য মণ্ডলে একটি ঝুলন্ত আসনে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে হেরা গিরিগুহার অনুরূপ তিনি আবার ভীত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কম্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং বললেন : زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ (আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর।) অতঃপর তিনি বস্ত্রাবৃত হয়ে শুয়ে পড়লেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুদ্দসসিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয়। তাই আয়াতে তাঁকে يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 'হে বস্ত্রাবৃত' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি دِثَارٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ শীত ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সাধারণ পোশাকের উপর ব্যবহৃত অতিরিক্ত বস্ত্র। مُزَّمِّلٌ শব্দের অর্থ এর কাছাকাছি। রূহুল-মা'আনীতে জাবের ইবনে যায়েদ তাবেয়ীর উক্তি বর্ণিত আছে যে, সূরা মুদ্দাসসির সূরা মুয্যাম্মিলের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু উপরে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাসসির অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ওহী বিরতির পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরা মুদ্দাসসিরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদত্ত সর্বপ্রথম নির্দেশ এই : قُمْ فَاَنْذِرْ অর্থাৎ উঠুন। এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান' ও হতে পারে। অর্থাৎ আপনি বস্ত্রাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেওয়াও অবাস্তব নয়। উদ্দেশ্য এই যে এখন আপনি সাহস করে জনশুদ্ধির দায়িত্ব পালনে ব্রতী হোন। فَاَنْذِرْ শব্দটি اِنْذَارٌ উদ্ভূত। অর্থ সতর্ক করা, কিন্তু এমন সতর্ক করা, যা স্নেহ ও ভালোবাসার উপর ভিত্তিশীল, যেমন পিতা তার সন্তানকে সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে সতর্ক করে। পয়গম্বরগণ এরূপই করে থাকেন। তাই তাঁরা نَذِيْرٌ ও بَشِيْرٌ উপাধিতে ভূষিত হন। نَذِيْرٌ-এর অর্থ স্নেহ ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ককারী এবং بَشِيْرٌ-এর অর্থ সুসংবাদদাতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরও এই উভয় উপাধি কুরআনের স্থানে স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এস্থলে শুধু সতর্ক করার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত মুমিন-মুসলমান গুণাগুণতি কয়েকজনই ছিল। অবশিষ্ট সবাই ছিল অবিশ্বাসী কাফের, যারা সুসংবাদের নয়—সতর্ক করারই যোগ্য পাত্র ছিল।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই : وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ অর্থাৎ শুধু আপন পালনকর্তার মহত্ত্ব বর্ণনা করুন কথায় ও কাজে। এখানে رَبّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা এটাই এই নির্দেশের মূল কারণ। যিনি সারাজাহানের পালনকর্তা, একমাত্র তিনিই সর্বপ্রকার মহত্ত্ব বর্ণনার যোগ্য। তাকবীরের শাব্দিক অর্থ আল্লাহু আকবার বলা হয়ে থাকে। এতে নামাজের তকবীরে তাহরীমাসহ অন্যান্য তাকবীরও দাখিল আছে। এই নির্দেশকে নামাজের তাকবীরে তাহরীমার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কুরআনের ভাষায় কোনো ইঙ্গিত নেই।

তৃতীয় নির্দেশ এই : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ : ثِيَابٌ শব্দটি ثَوْبٌ এর বহুবচন। এর আসল ও আক্ষরিক অর্থ কাপড়। রূপক অর্থে কর্মকেও لِبَاسٌ ও ثَوْبٌ বলা হয়; এমনিভাবে অন্তর, মন, চরিত্র ও ধর্মকেও বলা হয়। মানব দেহকেও لِبَاسٌ বলে ব্যক্ত করা হয়, যার সাক্ষ্য কুরআন ও আরবি বাক-পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতে তাফসীরবিদগণ থেকে উপরিউক্ত সকল অর্থই বর্ণিত আছে। বাহ্যতঃ এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। এমতাবস্থায় নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্রতা থেকে মুক্ত রাখুন। পায়জামা অথবা লুঙ্গি পায়ের গিটের নীচ পর্যন্ত পরিধান করার নিষেধাজ্ঞাও এ থেকে বোঝা যায়। কেননা গিটের নীচ পর্যন্ত পরিহিত বস্ত্র নাপাক হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। অতএব কাপড় পবিত্র রাখার আদেশের মধ্যে এ বিষয়ও দাখিল আছে যে, এভাবে কাপড় পরিধান কর যেন নাপাকী থেকে দূরে থাকে। হারাম অর্থ দ্বারা পোশাক তৈরি না করা এবং নিষিদ্ধ কাট্‌সাটে তৈরি না করাও এই আদেশের মধ্যে দাখিল আছে। পোশাক পবিত্র রাখার এই আদেশ বিশেষভাবে নামাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। তাই ফিকহ্‌বিদগণ বলেন : নামাজ ছাড়া অন্য অবস্থায়ও বিনা প্রয়োজনে শরীরকে নাপাক রাখা অথবা নাপাক কাপড় পরিধান করে থাকা অথবা নাপাক জায়গায় বসে থাকা জায়েজ নয়। তবে প্রয়োজনের মুহূর্তগুলো ব্যতিক্রমভুক্ত। -[মাযহারী]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা পছন্দ করেন। এক আয়াতে আছে, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে। তাই মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শরীর, স্থান ও পোশাককে বাহ্যিক নাপাকী থেকে এবং অন্তরকে আভ্যন্তরীণ অশুচি থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে।

চতুর্থ নির্দেশ এই : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ তফসীরবিদ মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা, যুহরী, ইবনে যায়েদ প্রমুখ এস্থলে رجز-এর অর্থ নিয়েছেন প্রতিমা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এক রেওয়ায়েতে এর অর্থ নিয়েছেন গোনাহ। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রতিমা পূজা অথবা গোনাহ পরিত্যাগ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো পূর্ব থেকেই এ সবের ধারে-কাছে ছিলেন না। এমতাস্থায় তাঁকে এই আদেশ করার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতেও এসব বিষয় থেকে দূরে থাকুন। প্রকৃতপক্ষে উম্মতকে

সম্বোধন করে আদেশটি দেওয়া হয়েছে। এতে উম্মত বুঝতে পারবে যে, আদেশটি খুবই গুরুত্ববহ। তাই নিষ্পাপ রাসূলকেও এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি।

পঞ্চম নির্দেশ : وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ অর্থাৎ বেশি পাওয়ার অভিপ্রায়ে কারও প্রতি অনুগ্রহ করো না। এ থেকে জানা যায় যে, প্রতিদানে বেশি দিবে, এই আশায় কাউকে উপঢৌকন দেওয়া নিন্দনীয় ও মকরূহ। কুরআনের অন্য আয়াত দ্বারা সাধারণ লোকের জন্যে এর বৈধতা জানা গেলেও এটা সাধারণ ভদ্রতার পরিপন্থি। বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে এটা হারাম।

ষষ্ঠ নির্দেশ : وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ : صَبْر -এর শাব্দিক অর্থ প্রবৃত্তিকে বাধা দেওয়া ও বশে রাখা। তাই আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান প্রতিপালনে প্রবৃত্তিকে কায়েম রাখা, আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহ থেকে প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা এবং বিপদাপদে যথাসাধ্য হা-হুতাশ করা থেকে বেঁচে থাকাও সবরের মধ্যে দাখিল। সুতরাং এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক নির্দেশ, যা গোটা দ্বীনকে পরিব্যাপ্ত করে। এস্থলে বিশেষভাবে এই নির্দেশ দানের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে দীনের প্রতি দাওয়াত এবং শিরক ও কুফরকে বাধা দানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এর ফলশ্রুতি এই ছিল যে, অনেক মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরোধিতা ও শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হবে। তাই সবর ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলা তাঁর জন্যে সমীচীন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই কয়েকটি নির্দেশ দেওয়ার পর কেয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। نَاقُوْرٌ শব্দের অর্থ শিঙ্গা এবং نَقْرٌ বলে শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে আওয়াজ বের করা বোঝানো হয়েছে। কেয়ামত দিবস সকল কাফেরের জন্যেই কঠিন হবে–একথা বর্ণনা করার পর জনৈক দুষ্টমতি কাফেরের অবস্থা ও তার কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ওলীদ ইবনে মুগীরার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি গিনি : এই কাফেরের নাম ওলীদ ইবনে মুগীরা। আল্লাহ তা'আলা তাকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর ভাষায়, তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাওরী (র.) বলেন : তার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। কেউ কেউ আরও কম বলেছেন। তবে এতটুকু সবার কাছেই স্বীকৃত যে, তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানি সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ্ম সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। তাই কুরআন পাকে বলা হয়েছে, وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا তাকে আরবের সরদার গণ্য করা হতো। জনসাধারণের মধ্যে তার উপাধি 'রায়হানা কুরায়শ' খ্যাত ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশতঃ নিজেকে ওহীদ ইবনুল-ওহীদ অর্থাৎ এককের পুত্র একক বলত। তার দাবি ছিল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সেও তার পিতা মুগীরা অদ্বিতীয়।–(কুরতুবী) কিন্তু এই পাপিষ্ঠ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করেনি এবং কুরআনকে আল্লাহর কালাম মেনে নেওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা রচনা বলে বকতে থাকে। সে কুরআনকে জাদু এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জাদুকর বলে প্রচার করে। তাফসীরে-কুরতুবীতে তার ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে–

রাসূলে কারীম ﷺ একদিন حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ থেকে اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলেন। ওলীদ ইবনে মুগীরা এই তেলাওয়াত শুনে একে আল্লাহর কালাম মেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধ্য হয় যে–

وَاللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلَامًا مَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الْاِنْسِ وَلَا مِنْ كَلَامِ الْجِنِّ وَاِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَاِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَاِنَّ اَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَاِنَّ اَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَاِنَّهُ لَيَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى عَلَيْهِ وَمَا يَقُوْلُ هٰذَا بَشَرٌ.

"আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোনো মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোনো জিনেরও হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ ধরনের এক বর্ণাঢ্যতা। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার উর্ধ্বে থাকবে এবং এর উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম নয়।"

আরবের সর্ববৃহৎ ঐশ্বর্যশালী সরদারের মুখে একথা উচ্চারিত হওয়া মাত্রই কুরাইশদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। তারা সবাই ইসলাম ও ঈমানের দিকে ঝুঁকতে লাগল। অপরদিকে কাফের কুরাইশ সরদাররা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। তারা পরামর্শ সভায় একত্রিত হলো। আবূ জাহল বলল : চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি এখানি যাচ্ছি, তাকে ঠিক করে আসব।

আবূ জাহল ও ওলীদের কথোপকথন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যতায় মতৈক্য : আবূ জাহল মুখমণ্ডলে কৃত্রিম বিষণ্নতা ফুটিয়ে ওলীদের কাছে পৌঁছল (এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন কথা বলল, যাতে সে রাগান্বিত হয়)। ওলীদ বলল : ব্যাপার কি, তুমি এমন বিষণ্ন কেন? আবূ জাহল বলল : বিষণ্ন না হয়ে উপায় কি, তারা সবাই চাঁদা সংগ্রহ করে তোমাকে অর্থকড়ি দেয়। কারণ তুমি এখন বুড়ো হয়ে গেছ, তোমাকে সাহায্য করা দরকার। কিন্তু এখন তারা জানতে পেরেছে যে, তুমি মুহাম্মদ ও ইবনে আবী কোহাফা অর্থাৎ আবূ বকরের কাছে যাতায়াত কর, যাতে তারা তোমাকে কিছু আহার্য দেয়। তুমি খোশামোদের ছলে তাদের কালাম শুনে বাহবা দাও এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কর। (বাহ্যত চাঁদা করে ওলীদকে

অর্থকড়ি দেওয়ার বিষয়টিও মিথ্যা ছিল, যা কেবল তাকে রাগান্বিত করার জন্যই বলা হয়েছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে আহার্য গ্রহণের ব্যাপারটি তো মিথ্যা ছিলই)। একথা শুনে ওলীদ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং অহংকারে পাগলপারা হয়ে বলতে লাগল : একি বললে, আমি মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের রুটির টুকরার মুখাপেক্ষী? তুমি কি আমার ধন-দওলতের প্রাচুর্য সম্পর্কে জান না? লাত ও উযযার শপথ! আমি কখনও তাদের মুখাপেক্ষী নই। তাবে তোমরা যে মুহাম্মদকে উন্মাদ বল, একথা মিথ্যা। এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাদের কেউ তাকে কোনো পাগলসুলভ কাণ্ড করতে দেখেছে কি? আবূ জাহল স্বীকার করে বলল : না, আমরা তা দেখিনি। ওলীদ বলল, তোমরা তাকে কবি বল। জিজ্ঞাসা করি, তাকে কি কখনও কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছ? আবূ জাহল বলল : না, শুনিনি। ওলীদ বলল : তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বল। বল তো দেখি, এ পর্যন্ত তার কোনো কথা মিথ্যা পেয়েছে কি? এর জবাবেও আবূ জাহলকে لَا وَاللّٰهِ (না, আল্লাহর শপথ) বলতে হলো। ওলীদ আরও বলল : তোমরা তাকে অতীন্দ্রিয়বাদী বল। তোমরা কি কখনও তার এমন অবস্থা ও কথাবার্তা দেখেছ বা শুনেছ, যা অতীন্দ্রিয়বাদীদের হয়ে থাকে? আমি অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথাবার্তা ভালোরূপেই চিনি। তার কালাম অতীন্দ্রিয়বাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এ ক্ষেত্রেও আবূ জাহলকে لَا وَاللّٰهِ বলতে হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সমগ্র কুরাইশ গোত্রের মধ্যে 'আল-আমীন' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। ওলীদের যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তায় আবূ জাহল হার মানতে বাধ্য হলো এবং উপরিউক্ত কুৎসা রটনার অসারতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করতে লাগল যে, তাহলে কি কথা বলে মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখা যায়! তাই সে ওলীদকেই সম্বোধন করে বলল : তা হলে তুমিই বল মুহাম্মদকে কি বলা যায়। ওলীদ কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করল। অতঃপর আবূ জাহলের দিকে চোখ তুলে তাচ্ছিল্য প্রকাশার্থে মুখ ভেংচাল। অবশেষে বলল : মুহাম্মদকে উন্মাদ, কবি, অতীন্দ্রিয়বাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যাবে না। হ্যাঁ, তাকে জাদুকর বললে তা যুৎসই হবে। এ হতভাগা খুব জানত যে, তিনি জাদুকরও নন এবং তাঁর কালামকে জাদুকরদের কালামও বলা যায় না। কিন্তু সে এভাবে তার কথাকে দাঁড় করাল যে, তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও জাদুকরদের জাদুর প্রতিক্রিয়ার ন্যায় হয়ে থাকে। জাদুকররা তাদের জাদু বলে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিত। নাউযুবিল্লাহ! তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ। যে-ই ঈমান আনে, সে-ই তার কাফের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়। ওলীদের এই ঘটনা কুরআন পাক নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ব্যক্ত করেছে ঃ

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ এখানে قدر শব্দটি تقدير থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রস্তাব করা। উদ্দেশ্য এই যে, এই হতভাগা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করারই সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু অপমানের ভয়ে পরিষ্কার মিথ্যা বলা থেকে বিরত রইল। তাই অনেক চিন্তা-ভাবনার পর প্রস্তাব করল, তাঁকে উপরিউক্ত যুক্তির ভিত্তিতে জাদুকর বলা হোক। এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ বলে ওর প্রতি পুনঃপুনঃ অভিসম্পাত করেছেন।

কাফেররাও মিথ্যা ভাষণে বিরত থাকত : চিন্তা করুন, সব কুরাইশ সরদারই কাফের পাপাচারী এবং নানা রকম গোনাহ ও অশ্লীল কার্যের সাথে জড়িত থাকত কিন্তু মিথ্যা ভাষণ এমন একটি দোষ, যা থেকে কাফেররাও পলায়ন করত। ইসলাম-পূর্বকালে রোম সম্রাটের দরবারে আবূ সুফিয়ানের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, কাফেররা রাসূলে করীম ﷺ-এর বিরোধিতায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু মিথ্যা বলায় প্রস্তুত ছিল না। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান বিপরীতমুখী উন্নতির যুগে এই দোষটি যেন দোষই নয়; বরং সবচাইতে বড় নৈপুণ্যে পরিণত হয়ে গেছে। শুধু কাফের পাপিষ্ঠই নয়, সৎ ও ধার্মিক মুসলমানদের মন থেকেও এর প্রতি ঘৃণা দূর হয়ে গেছে। তারা অনর্গল মিথ্যা বলা ও অপরকে বলতে বাধ্য করাকে গর্বের সাথে বর্ণনা করে। –[নাউযুবিল্লাহ]

সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা একটি নিয়ামত ঃ ওলীদ ইবনে মুগীরাকে আল্লাহ তা'আলা যেসব নিয়ামত দান করেছিলেন তম্মধ্যে একটি ছিল وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا। অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা। এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করা ও জীবিত থাকা যেমন নিয়ামত, তেমনিভাবে সন্তান-সন্ততি কাছে উপস্থিত থাকাও আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। তারা পিতামাতার চক্ষু শীতল করে এবং অন্তরকে শান্ত রখে। তাদের উপস্থিতির দ্বারা পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও কাজকারবারে সাহায্য পাওয়া আর একটি অতিরিক্ত নিয়ামত। বর্তমান বিপরীতমুখী উন্নতি কেবল সোনারূপার মুদ্রা ও কাগজী নোটের নাম রেখেছে আরাম-আয়েশ, যার জন্য পিতামাতা অত্যন্ত গর্বের সাথে সন্তান-সন্ততিকে বিদেশে নিক্ষেপ করে দেয়। তারা এতই আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে, বছরের পর বছর সন্তানের মুখ না দেখলেও সন্তানের মোটা অংকের

বেতন ও অগাধ আমদানির খবর তাদের কানে পৌঁছতে থাকে। তারা এই খবরের মাধ্যমে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করার প্রয়াস পায়। মনে হয়, তারা সুখ ও আরামের অর্থ সম্পর্কেই বেখবর হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলাকে বিস্মৃত হওয়ার পরিণতি এটাই হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা নিজেদেরকে অর্থাৎ নিজেদের প্রকৃত সুখ ও আরামকেও বিস্মৃত হয়ে যাবে। কুরআন বলে : نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ : তাফসীরবিদ মুকাতিল বলেন ঃ এটা আবূ জাহলের উক্তির জবাব। সে যখন কুরআনের এই বক্তব্য শুনল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশ জন ফেরেশতা, তখন কুরায়শ যুবকদেরকে সম্বোধন করে বলল, মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশ জন। অতএব, তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুদ্দী বলেন ঃ উপরিউক্ত মর্মে আয়াত নাজিল হলে পর জনৈক নগণ্য কুরায়শ কাফের বলে উঠল ঃ হে কুরায়শ গোত্র, কোনো চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্যে আমি একাই যথেষ্ট, আমি ডান বাহু দ্বারা দশ জনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয় জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের কিস্‌সা চুকিয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় ঃ আহাম্মকের স্বর্গে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমতঃ ফেরেশতা একজনও তোমাদের সবার জন্যে যথেষ্ট। এখানে যে উনিশ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফেরদেরকে আজাব দেওয়ার জন্যে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছে, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। অতঃপর কেয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ - كُبَرٌ শব্দটি كُبْرٰى এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে জাহান্নামে দাখিল করা হবে, সেটি অবশ্যই গুরুতর বিপদ। এ ছাড়া তাতে রয়েছে আরো নানারকম আজাব।

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ : এখানে অগ্রে যাওয়ার অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের থেকে পশ্চাতে থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে সতর্ক করা সব মানুষের জন্যে ব্যাপক। অতঃপর এই সতর্কবাণী শুনে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হয় এবং কোনো কোনো হতভাগা এরপরও পশ্চাতে থেকে যায়।

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلَّا اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ : رَهِيْنَةٌ-এর অর্থ এখানে প্রত্যেকের আটক ও বন্দি হওয়া। ঋণের পরিবর্তে বন্ধকি দ্রব্য যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে-মালিক তাকে কোনো কাজে লাগাতে পারে না, তেমনি কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার গোনাহের বিনিময়ে আটক ও বন্দি থাকবে। কিন্তু, আসহাবুল–ইয়ামীন' তথা ডানদিকের সৎলোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে।

এখানে জাহান্নামে বন্দি থাকাও অর্থ হতে পারে। মা'আরিফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য জাহান্নামে বন্দি থাকবে। কিন্তু 'আসহাবুল ইয়ামীন' বন্দি থাকবে না। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা গেল যে, আস্‌হাবুল ইয়ামীন তারা, যারা ঋণ পরিশোধ করেছে এবং করজ ও ফরজ সব আদায় করেছে। অতএব তাদের বন্দি থাকার কোনো কারণ নেই। এই তাফসীর বাহ্যত নির্মল ও সহজবোধ্য। পক্ষান্তরে যদি আটক থাকার অর্থ হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত এবং দোজখে প্রবেশ করার পূর্বে কোনো স্থানে আটক থাকা নেওয়া হয়, তবে এর সারমর্ম এই হবে যে, সব লোক হিসাব-নিকাশের জন্য আটক থাকবে এবং হিসাব না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোথাও যেতে পারবে না। এমতাবস্থায় আস্‌হাবুল ইয়ামীন তারা হতে পারে, যাদের হিসাব-নিকাশ নেই এবং নিষ্পাপ। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা। এটা হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি। অথবা তারা হতে পারে, যাদের সম্পর্কে হাদীসে আছে : এই উম্মতের অনেক লোককে হিসাব থেকে মুক্তি দিয়ে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করা হবে। সূরা ওয়াকিয়ায় হাশরে উপস্থিত লোকদের তিন প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে– ১. অগ্রগামী ও নৈকট্যশীল, ২. ডানদিকস্থ লোক ও ৩. বাম দিকস্থ লোক। এই সূরায় নৈকট্যশীলগণকে ডান দিকস্থ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে শুধু 'আস্‌হাবুল ইয়ামীন' উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই অর্থের দিক দিয়ে সকল আস্‌হাবুল ইয়ামীন হিসাব থেকে মুক্ত থাকবে–একথা কোনো আয়াত অথবা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই। তাই এ আয়াতের তাফসীর জাহান্নামে আটক থাকা গ্রহণ করলে সেটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ : এখানে هُمْ সর্বনাম দ্বারা সেসব অপরাধীকে বোঝানো হয়েছে, পূর্বের আয়াতে যারা তাদের চারটি অপরাধ স্বীকার করেছে– (১) তারা নামাজ পড়ত না, (২) তারা কোনো অভাবগ্রস্ত ফকিরকে আহার্য দিত না; অর্থাৎ দরিদ্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করত না, (৩) ভ্রান্ত লোকেরা ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলত অথবা গোনাহ

ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতো, তারাও তাদের সাথে তাতে লিপ্ত হতো এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, (৪) তারা কেয়ামত অস্বীকার করত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যেসব অপরাধী এসব গোনাহ করে এবং কেয়ামত অস্বীকার করার মতো কুফরি করে, তাদের জন্যে কারও সুপারিশ উপকারী হবে না। কেননা তারা কাফের। কাফেরের জন্যে সুরারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। কেউ করলে গ্রহণীয় হবে না। যদি সব সুপারিশকারী একত্রিত হয়ে জোরালোভাবে সুপারিশ করে, তাতেও উপকার হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ বলা হয়েছে।

কাফেরের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না, মুমিনের জন্য হবে : এই আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে, মুসলমান গোনাহগার হলেও তার জন্যে সুপারিশ উপকারী হবে। অনেক সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবীগণ, ওলীগণ, সৎকর্মপরায়ণগণ–এমন কি সাধারণ মুমিনগণও অপরের জন্যে সুপারিশ করবেন এবং তা কবুল হবে। তবে কাফেরের জন্য কারও কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : পরকালে আল্লাহর ফেরেশতাগণ, পয়গম্বরগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপীদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তাঁদের সুপারিশের কারণে পাপীরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তবে উপরোল্লিখিত চার প্রকার লোক মুক্তি পাবে না; অর্থাৎ যারা নামাজ ও জাকাত তরক করে, কাফেরদের ইসলাম বিরোধী কথাবার্তায় শরিক থাকে এবং কিয়ামত অস্বীকার করে। এ থেকে জানা যায় যে, বে-নামাজি ও জাকাত তরককারীর জন্য সুপারিশ কবুল হবে না। কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে এ কথাই শুদ্ধ মনে হয় যে, যারা কিয়ামত অস্বীকার সহ উপরিউক্ত চারটি অপরাধ করবে, তাদের জন্যই সুপারিশ কবুল হবে না। আর যারা কিয়ামত অস্বীকার ব্যতীত আলাদা আলাদা অন্যান্য অপরাধ করবে, তাদের জন্য এই শাস্তি জরুরি নয়। কিন্তু কতক হাদীসে বিশেষ বিশেষ গোনাহগার সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, তারা সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সুপারিশ বা নবী-রাসূলগণের শাফায়াত সত্য বলে বিশ্বাস করে না অথবা হাউজে কাওসারের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সুপারিশ এবং হাউজে কাওসারে তার কোনো অংশ নেই।

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ : এখান تَذْكِرَةٌ তথা উপদেশ বলে কুরআন মাজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা এর শাব্দিক অর্থ স্মারক। কুরআন পাক আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলি, রহমত, গজব ছওয়াব ও আজাবের অদ্বিতীয় স্মারক।

শেষে বলা হয়েছে كَلَّا إِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ অর্থাৎ নিশ্চিতই কুরআন উপদেশ, যা তোমরা বর্জন করে রেখেছ। قَسْوَرَةٌ-এর অর্থ সিংহ এবং তীরন্দাজ শিকারী। এ স্থলে সাহাবায়ে-কেরাম থেকে উভয় অর্থ বর্ণিত আছে।

هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ : আল্লাহ্ তা'আলা اَهْل تَقْوٰى এই অর্থে যে, একমাত্র তিনিই ভয় করার ও তাঁর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার যোগ্য। اَهْل مَغْفِرَتْ হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনিই বড় অপরাধী ও গোনাহগারের অপরাধ ও গোনাহ যখন ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। অন্য কেউ এরূপ উচ্চমনা হতে পারে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَلْمُدَّثِّرُ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ اِفَّعُّلْ বাব اَلْاِدِّثَارُ মাসদার (د ـ ث ـ ر) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ– বস্ত্রাবৃত।

اَنْذِرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اِنْذَارٌ মাসদার (ن ـ ذ ـ ر) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ– তুমি ভয় দেখাও।

كَبِّرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ تَفْعِيْل বাব تَكْبِيْرٌ মাসদার (ك ـ ب ـ ر) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ– বড়ত্ব স্বীকার করা, বড় বলা।

اَلرُّجْزَ : অর্থ– পাপ, খারাপ, নাপাক, শাস্তি, মূর্তি।

لَاتَمْنُنْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر نهى حاضر معروف বহছ نَصَرَ বাব مَنٌّ মাসদার (م ـ ن ـ ن) মূলবর্ণ مضاعف ثلاثى জিনস অর্থ– অধিক পাওয়ার আশায় দান করো না।

نُقِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب ماضى مجهول বহছ نَصَرَ বাব اَلنَّقْرُ মাসদার (ن ـ ق ـ ر) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ– ফুৎকার দেওয়া হবে।

عَسِيْرٌ : সিফাতে মুশাব্বাহ। অর্থ– কঠিন, ভারি, জটিল, কঠোর, কষ্টকর। عُسْرٌ হতে নির্গত।

يَسِيْرٌ : সিফাতে মুশাব্বাহ মূলবর্ণ (ى ـ س ـ ر) জিনস مثال يائى অর্থ- সহজ, সরল, হালকা। সহজ হওয়া।

ذَرْنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার وَذْرٌ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– আমাকে ছেড়ে দিন।

وَحِيْدًا : সিফাতে মুশাব্বাহ। অর্থ– একক, একমাত্র, অন্যান্য, অদ্বিতীয়, একাকী, বিজন। واحد থেকে নির্গত।

مَمْدُوْدًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَدُّ মূলবর্ণ (م ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রচুর।

شُهُوْدًا : شَاهِدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– সাক্ষী, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী। আদালতের সাক্ষী, উপস্থিত, বিদ্যমান।

مَهَّدْتُّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْهِيْدٌ মূলবর্ণ (م ـ ه ـ د) জিনস صحيح অর্থ– বন্দোবস্ত করেছি।

سَاُرْهِقُهٗ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرْهَاقٌ মূলবর্ণ (ر ـ ه ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– অচিরেই তাকে চড়াব।

فَكَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَفْكِيْرٌ মূলবর্ণ (ف ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সে চিন্তা করল।

عَنِيْدًا : সিফাত মুশাব্বাহ অর্থ– বিরোধী। একগুয়ে। জেদী।

يُؤْثَرُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَثْرٌ মূলবর্ণ (ء – ث – ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– নকল করা। বর্ণনা করা হয়।

اَدْبَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْبَارٌ মূলবর্ণ (د ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সে পিছনে ফিরল।

عَبَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عَبْسًا মূলবর্ণ (ع ـ ب ـ س) জিনস صحيح অর্থ– সে ভ্রু-কুঞ্চিত করল।

بَسَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার بُسُوْرًا মূলবর্ণ (ب ـ س ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– মুখ বিকৃত করল।

اِسْتَكْبَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكْبَارُ মূলবর্ণ (ك ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ সে দম্ভ প্রকাশ করল, অহংকার করল, অভিমান করল।

سَاُصْلِيْهِ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصْلَاءٌ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি অচিরেই তাকে আগুনে নিক্ষেপ করব।

بَشَرٌ : بَشَرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– ত্বক, চর্ম, চামড়া, ছাল, চামড়ার উপরিভাগ। (খাযেন, কাবীর, কাশ্‌শাফ)

لَا يَرْتَابُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِيَابٌ মূলবর্ণ (ر ـ ى ـ ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে সন্দেহে পড়েনি।

اَسْفَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْفَارٌ মূলবর্ণ (س ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আলোকিত হয়।

اَلْكُبَرُ : جمع مؤنث। ওয়াহেদ মুয়ান্নাছ اَلْكُبْرٰى ; কঠিন বিপদ, মহা মসিবত।

يَتَقَدَّمُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَقَدُّمٌ মূলবর্ণ (ق ـ د ـ م) জিনস صحيح অর্থ– সে আগে বেড়ে যায়।

يَتَأَخَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّاَخُّرُ মূলবর্ণ (ا ـ خ ـ ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– পশ্চাদপসরণ করে।

يَتَسَاَئَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَسَائُلٌ মূলবর্ণ (س ـ ء ـ ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তারা জিজ্ঞাসা করবে।

سَلَكَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّلُوْكُ মূলবর্ণ (س ـ ل ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– সে তোমাদেরকে অনুশীলন করিয়েছে; চালিয়েছে।

نُطْعِمُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِطْعَامٌ মূলবর্ণ (ط ـ ع ـ م) জিনস صحيح অর্থ– খানা খাওয়াতাম।

نَخُوْضُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার خَوْضٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– চেষ্টায় (রত) থাকতাম।

اَلْيَقِيْنُ : ইসম। সকল তাফসীরকারকগণ এখানে অর্থ করেছেন, মৃত্যু।

تَنْفَعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَفْعٌ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– উপকারে আসবে।

شَافِعِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার شَفَاعَةٌ মূলবর্ণ (ش ـ ف ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– সুপারিশকারীদের।

حُمُرٌ : حمار -এর বহুবচন। অর্থ– গাধা।

مُسْتَنْفِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِنْفَارٌ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– বন্য, উচ্ছৃঙ্খল।

فَرَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার فِرَارٌ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পলায়ন করেছে।

خَائِضِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার خَوْضٌ মূলবর্ণ (خ – و – ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– প্রচেষ্টাকারী। নিমগ্ন ব্যক্তি।

قَسْوَرَةٍ : শব্দটি ইসম অর্থ– ব্যাঘ্র।

يُؤْتَى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ء – ت – ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ– প্রদান করা হোক। দেওয়া হয়।

صُحُفًا : হলো صحفا -এর বহুবচন। صحيفة

مُنَشَّرَةً : منشرة ইসমে মাফউল, واحد مؤنث বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَنْشِيْرٌ মূলবর্ণ (ن ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– খোলা। উন্মুক্ত। বিস্তৃত।

لَا يَخَافُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَوْفٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা ভয় করে না।

مَا يَذْكُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ منفى مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذِّكْرُ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা উপদেশ গ্রহণ করে না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ : এখানে ياء হলো হরফে নেদা। اَيُّهَا হলো منادى যা ضمه -এর উপর মাবনী। আর اَلْمُدَّثِّرُ হলো بدل বা সিফত। আর قُمْ ফে'ল তার উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল। আর فَاَنْذِرْ টা قسم -এর উপর আতফ হয়েছে। আর واو হলো আতেফা। আর رَبَّكَ হলো مفعول به مقدم আর كَبِّرْ হলো ফে'ল আর তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড ; পৃ. ১২৫]

سُوْرَةُ الْقِيٰمَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ক্বিয়ামা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪০, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. আমি কিয়ামত দিবসের কসম করছি।	لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ﴿١﴾
২. আর এমন আত্মার কসম করছি, যে নিজকে তিরস্কার করে।	وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾
৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাদের হাড়সমূহকে একত্র করব না?	اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ﴿٣﴾
৪. আমি অবশ্যই একত্র করব, কেননা আমি এতে সক্ষম যে, তার অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগকে পর্যন্ত ঠিক করে দেই।	بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ﴿٤﴾
৫. বরং কোনো কোনো মানুষ এরূপ চায় যে, নিজেদের ভবিষ্যত জীবনেও পাপকার্যে লিপ্ত থাকে।	بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ﴿٥﴾
৬. সে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত দিবস কবে আসবে?	يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ﴿٦﴾
৭. অনন্তর যখন চক্ষুগুলো বিস্ফারিত হয়ে যাবে।	فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. لَآ اُقْسِمُ আমি কসম করছি بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসের।

২. وَلَآ اُقْسِمُ আর কসম করছি بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ এমন আত্মার যে নিজকে তিরস্কার করে।

৩. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ মানুষ কি মনে করে যে اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ আমি তাদের হাড়সমূহকে একত্র করব না।

৪. بَلٰى قٰدِرِيْنَ আমি অবশ্যই একত্র করব, কেননা আমি এতে সক্ষম যে عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ তার আঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগকে পর্যন্ত ঠিক করে দেই।

৫. بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ বরং কোনো কোনো মানুষ এরূপ চায় যে لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ নিজেদের ভবিষ্যত জীবনেও পাপ কার্যে লিপ্ত থাকে।

৬. يَسْـَٔلُ সে জিজ্ঞাসা করে اَيَّانَ কবে আসবে يَوْمُ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবস

৭. فَاِذَا بَرِقَ অনন্তর যখন বিস্ফারিত হয়ে যাবে الْبَصَرُ চক্ষুগুলো

অনুবাদ	আয়াত
৮. আর চন্দ্র নিস্প্রভ হয়ে পড়বে।	وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾
৯. এবং সূর্য ও চন্দ্র এক অবস্থা প্রাপ্ত হবে।	وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾
১০. সেদিন মানুষ বলবে, এখন কোন দিকে পলায়ন করি?	يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾
১১. কখনো সম্ভব নয়, কোথাও আশ্রয়ের স্থান নেই।	كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾
১২. সেদিন কেবল আপনার প্রতিপালকের সমীপেই ঠিকানা আছে।	اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِالْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾
১৩. সেদিন মানুষকে তার সমস্ত পূর্বকৃত ও পরে কৃত কার্যাবলি জানিয়ে দেওয়া হবে।	يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ﴿١٣﴾
১৪. বরং মানুষ নিজেই নিজের অবস্থা সম্বন্ধে খুব অবহিত হবে।	بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ﴿١٤﴾
১৫. যদিও সে নিজের ওজরসমূহ পেশ করবে।	وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ﴿١٥﴾
১৬. হে রাসূল! আপনি কুরআনের ব্যাপারে স্বীয় জিহ্বা চালাবেন না তা ত্বরিত আয়ত্ত করার জন্য।	لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿١٦﴾
১৭. তা একত্র করা এবং পাঠ করিয়ে দেওয়া আমারই দায়িত্ব।	اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾
১৮. অতএব, যখন আমি তা পাঠ করতে থাকি, তখন আপনি তার অনুসরণ করতে থাকুন।	فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. وَخَسَفَ আর নিস্প্রভ হয়ে পড়বে الْقَمَرُ চন্দ্র।

৯. وَجُمِعَ এবং এক অবস্থা প্রাপ্ত হবে الشَّمْسُ সূর্য وَالْقَمَرُ ও চন্দ্র।

১০. يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ মানুষ বলবে يَوْمَئِذٍ সেদিন اَيْنَ الْمَفَرُّ এখন কোন দিকে পলায়ন করি?

১১. كَلَّا কখনো সম্ভব নয় لَا وَزَرَ কোথাও আশ্রয়ের স্থান নেই।

১২. اِلٰى رَبِّكَ কেবল আপনার প্রতিপালকের সমীপেই আছে يَوْمَئِذٍ সেদিন الْمُسْتَقَرُّ ঠিকানা।

১৩. يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হবে يَوْمَئِذٍ সেদিন بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ তার সমস্ত পূর্বকৃত ও পরে কৃত কার্যাবলি।

১৪. بَلِ الْاِنْسَانُ বরং মানুষ عَلٰى نَفْسِهٖ নিজেই নিজের অবস্থা সম্বন্ধে بَصِيْرَةٌ খুব অবহিত হবে।

১৫. وَلَوْ اَلْقٰى যদিও সে পেশ করবে مَعَاذِيْرَهٗ নিজের ওজরসমূহ।

১৬. لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ হে রাসূল আপনি কুরআনের ব্যাপারে স্বীয় জিহবা চালাবেন না لِتَعْجَلَ بِهٖ তা ত্বরিত আয়ত্ত করার জন্য।

১৭. اِنَّ عَلَيْنَا আমারই দায়িত্ব جَمْعَهٗ তা একত্র করা وَقُرْاٰنَهٗ ও পাঠ করিয়ে দেওয়া।

১৮. فَاِذَا قَرَاْنٰهُ অতএব যখন আমি তা পাঠ করতে থাকি فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ তখন আপনি তার অনুসরণ করতে থাকুন।

১৯. অতঃপর তা বর্ণনা করিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব।	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾
২০. হে অবিশ্বাসীগণ! [তোমরা মনে কর, কিয়ামত হবে না] এরূপ কখনো নয়; বরং তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাস।	كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾
২১. এবং পরকালকে ছেড়ে বসেছ।	وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾
২২. [কিয়ামত অর্বশ্যই হবে] বহু মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে।	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾
২৩. [এবং] স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাকাতে থাকবে।	إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾
২৪. আর বহু মুখমণ্ডল সে দিন মলিন হবে।	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾
২৫. [এবং] ভাবনা করতে থাকবে যে, তাদের সাথে কোমরভাঙ্গা আচরণ করা হবে।	تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾
২৬. কখানো এরূপ নয়, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়ে	كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং বলা হয় যে, কোনো ঝাড় ফুঁককারী আছে কি?	وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾
২৮. আর সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বস্ত হয় যে, [এটাই দুনিয়া] ত্যাগ করার সময়।	وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾
২৯. এবং এক পায়ের গোছা অপর পায়ের গোছার সাথে জড়িয়ে যেতে থাকে।	وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. ثُمَّ অতঃপর إِنَّ عَلَيْنَا আমার দায়িত্ব بَيَانَهُ তা বর্ণনা করিয়ে দেওয়া।

২০. كَلَّا হে বিশ্বাসীগণ! কখনো এরূপ হবে না بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ বরং তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাস।

২১. وَتَذَرُونَ এবং ছেড়ে বসেছ الْآخِرَةَ পরকালকে।

২২. وُجُوهٌ বহু মুখমণ্ডল يَوْمَئِذٍ সেদিন হবে نَاضِرَةٌ উজ্জ্বল।

২৩. إِلَىٰ رَبِّهَا স্বীয় প্রতিপালকের দিকে نَاظِرَةٌ তাকাতে থাকবে।

২৪. وَوُجُوهٌ আর বহু মুখমণ্ডল يَوْمَئِذٍ সেদিন হবে بَاسِرَةٌ মলিন।

২৫. تَظُنُّ ভাবনা করতে থাকবে যে أَنْ يُفْعَلَ بِهَا তাদের সাথে করা হবে فَاقِرَةٌ কোমরভাঙ্গা আচরণ।

২৬. كَلَّا কখনো এরূপ নয় إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়ে।

২৭. وَقِيلَ এবং বলা হয় যে مَنْ (سكتة) رَاقٍ কোনো ঝাড়-ফুঁককারী আছে কি?

২৮. وَظَنَّ আর সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বস্ত হয় যে أَنَّهُ الْفِرَاقُ (এটাই দুনিয়া) ত্যাগ করার সময়।

২৯. وَالْتَفَّتِ এবং জড়িয়ে যেতে থাকে السَّاقُ بِالسَّاقِ এক পায়ের গোছা অপর পায়ের গোছার সাথে।

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
৩০. সেদিন তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাগমন করা হবে।	إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾
৩১. [কেননা] তখন সে তো বিশ্বাসও করেনি এবং নামাজও পড়েনি।	فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾
৩২. পরন্তু অবিশ্বাস করেছিল এবং পরাঙ্মুখ হয়েছিল।	وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾
৩৩. অতঃপর গর্বভরে স্বীয় গৃহাভিমুখে চলে যেত।	ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿٣٣﴾
৩৪. তোমার দুর্ভাগ্যোপরি দুর্ভাগ্য আগত।	أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾
৩৫. আবার [শুন] তোমার দুর্ভাগ্যোপরি দুর্ভাগ্য আগত।	ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾
৩৬. মানুষ কি এরূপ মনে করে যে, তাকে এমনি নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে।	أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾
৩৭. সে কি এক বিন্দু শুক্র ছিল না? যা [মাতৃগর্ভে] নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল।	أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾
৩৮. অতঃপর তা জমাট রক্ত হয়েছিল, তৎপর আল্লাহ [মানুষরূপে] সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক করেছেন।	ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾
৩৯. অতঃপর তা হতে দুপ্রকার স্ত্রী ও পুরুষ বানিয়েছেন।	فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾
৪০. [যিনি এত বিবর্তন ঘটিয়েছেন] তিনি কি মৃতদেরকে জীবন দান করতে সক্ষম হবেন না?	أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. إِلَىٰ رَبِّكَ তোমার প্রতিপালকের নিকট يَوْمَئِذٍ সেদিন الْمَسَاقُ প্রত্যাগমন করা হবে।

৩১. فَلَا صَدَّقَ তখন সে তো বিশ্বাসও করেনি وَلَا صَلَّىٰ, এবং নামাজও পড়েনি।

৩২. وَلَٰكِن كَذَّبَ, পরন্তু অবিশ্বাস করেছিল وَتَوَلَّىٰ এবং পরাঙ্মুখ হয়েছিল।

৩৩. ثُمَّ ذَهَبَ অতঃপর চলে যেত إِلَىٰ أَهْلِهِ গৃহাভিমুখে يَتَمَطَّىٰ গর্বভরে।

৩৪. أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ তোমার দুর্ভাগ্যোপরি দুর্ভাগ্য আগত।

৩৫. ثُمَّ আবার (শুন) أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ তোমার দুর্ভাগ্যোপরি দুর্ভাগ্য আগত।

৩৬. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ মানুষ কি এরূপ মনে করে যে أَن يُتْرَكَ سُدًى তাকে এমনি নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে।

৩৭. أَلَمْ يَكُ সে কি ছিল না نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ এক বিন্দু শুক্র يُمْنَىٰ যা (মাতৃগর্ভে) নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল।

৩৮. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً অতঃপর তা জমাট রক্ত হয়েছিল فَخَلَقَ তৎপর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন فَسَوَّىٰ অতঃপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক করেছেন।

৩৯. فَجَعَلَ অতঃপর বানিয়েছেন مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ তা হতে দুপ্রকার الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ স্ত্রী ও পুরুষ।

৪০. أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ তিনি কি সক্ষম হবেন না عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ মৃতদেরকে জীবন দান করতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম আয়াত لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ الخ হতে اَلْقِيٰمَةُ শব্দটি দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে। বস্তুত এ সূরায় কিয়ামত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার কারণে এ নামকরণ যথার্থ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ৪০টি আয়াত, ৯৯টি বাক্য এবং ৬৫২টি অক্ষর রয়েছে।

শানে নুযূল : অত্র সূরা নাজিল হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে হাদীস শরীফের এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না; কিন্তু এতে আলোচিত বিষয়ে এমন একটি অন্তর্নিহিত সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যা হতে জানা যায় যে, তা মক্কার প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি। কারণ এর আয়াত لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ -এর অর্থ হলো, ওহী দ্রুত স্মরণ করে নেওয়ার জন্য স্বীয় জিহ্বা নাড়িও না। তা অন্তরে বসিয়ে দেওয়া ও পড়িয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। ইত্যাদি বর্ণনাসমূহ ওহীর প্রথম অবস্থা, সে সময় রাসূলে কারীম ﷺ ওহীসমূহকে পুরাপুরি সংরক্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হননি। আর সে সময়টুকুই ছিল মাক্কী জীবনের ওহীর প্রথম অবস্থা। সুতরাং তা মাক্কী সূরা -এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরার মূলবিষয় হলো কিয়ামত সম্পর্কীয় অবস্থাসমূহের আলোচনা। পরকালে অবিশ্বাসীদের প্রতি সম্বোধন করে তাদের অনেক সন্দেহকে দূরীভূত করে দেওয়া হয়েছে। অকাট্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কিয়ামত ও পরকালের সম্ভাব্যতা, তা সংঘটিত এবং তার অপরিহার্যতা প্রকট করে তোলা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা পরকালকে অস্বীকার করে তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাকে অসম্ভব বলে মনে করে। তার মূল কারণ তাদের মনের কামনা ও বাসনা তা না দেখে মেনে নিতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসের শপথ ও নফসে লাওয়ামাহ -এর শপথ করে বলেন, মানুষ যত কিছুই মনে করুক না কেন আমি সব কিছুকেই পুনরুজ্জীবনে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। পবিত্র কালামের স্থানে স্থানে বহু আয়াতে কিয়ামত সম্পর্কে বলার পরও তারা জেনেশুনেও যেহেতু আপনাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে, তখন আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন– কিয়ামত এমন একদিন সংঘটিত হবে, যেদিন মানুষ চক্ষু দ্বারা সরিষাফুল দেখবে। প্রতিপালক ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাবে না। চন্দ্র-সূর্য সেদিন একত্র হয়ে যাবে। সূর্য ১২ গুণ অতিরিক্ত তাপ প্রদান করতে থাকবে। সকল মানুষের কৃতকর্মসমূহ অর্থাৎ আমলনামা তাদের সম্মুখে পেশ করা হবে। ইচ্ছা করে কিছুই গোপন করার মতো সুযোগ হবে না। স্কন্ধের ফেরেশতাগণ সবই সত্যভাবে লিখে রাখবে।

১৬ নং আয়াত হতে ধারাবাহিকভাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট ওহী নাজিল হওয়ার প্রথম অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। যখন ওহী প্রথম নাজিল হতো তখন তিনি পূর্ণভাবে তা বুঝে স্মরণ রাখতে মুশকিলজনক হতো। তাই ওহীর বিষয়টি সাথে সাথেই পড়তে থাকতেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সহানুভূতির জন্য ওহীকে তাঁর অন্তরে স্থায়ী করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং সে কথা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। এর পর ২০ নং আয়াত হতে পুনরায় কাফেরদের কিয়ামত অস্বীকার করার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন সত্যবাদীদের কপাল বা মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, আর কাফেরদের চেহারা খুবই ঘৃণিত হবে এবং আল্লাহর শাস্তির প্রতিফলে শরিরের সকল হাড় একস্থান হতে অন্যস্থানে চলে যাবে।

৩১ নং আয়াত হতে কাফেরদের দুরবস্থার সকল কারণ বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ তারা নামাজ, রোজা ইত্যাদি বলতে সত্যের নিকটও যেত না। প্রত্যেকেরই কড়া-ক্রান্তি হিসাব নেওয়া হবে।

সর্বশেষ মানুষের সৃষ্টির মূলের প্রতি ইঙ্গিত করে সূরাটি খতম করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যে আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বহীনতা হতে এত বড় মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তিনি তাদের পুনরুজ্জীবিত করতেও নিশ্চয় সক্ষম হবেন। পরকাল অবিশ্বাসীরা যেন এ কথা জেনে রাখে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা اَلْمُدَّثِّرُ-এর শেষার্ধে একটি আয়াত হচ্ছে– كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْاٰخِرَةَ 'কখনো নয়, বরং তারা পরকালকে ভয় করে না।' যেহেতু কাফেররা পরকালকে ভয় করে না, কিয়ামতকে অস্বীকার করে, তাই আলোচ্য সূরায় কিয়ামতের বিবরণ রয়েছে এবং ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানবদেহ থেকে কিভাবে রূহ বের হয়ে আসবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ .... الاية - (١٦)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন কুরআন নাজিল হতো, তখন তাড়াতাড়ি তা আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জিহ্বা নাড়াতে থাকতেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। –(তিরমিযী শরীফ)

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى - (٣٤-٣٥)

শানে নুযূল : সূরায়ে মুদ্দাসসিরের তৃতীয় আয়াত নাজিল হওয়ার পর আবূ জাহল কুরাইশদেরকে বলল, দোজখের প্রহরী মাত্র উনিশজন অথচ তোমাদের সংখ্যা তা থেকে অনেক অধিক। তোমাদের দশজন ও কি তাদের একজনের সাথে পেরে উঠবে না? তখন আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল ﷺ–এর প্রতি ওহী নাজিল করেন যে, আবূ জাহলের কাছে গিয়ে বলুন যে, তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ অত্যাসন্ন। –[কানুযুন নুকূল : ১০৫]

لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ –এখানে لَا অব্যয়টি অতিরিক্ত। কারও বিরোধী মনোভাব খণ্ডন করার জন্যে শপথ করা হলে শপথের পূর্বে অতিরিক্ত لَا ব্যবহৃত হয়। আরবি বাক-পদ্ধতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আমাদের ভাষায়ও মাঝে মাঝে তাকীদযোগ্য বিষয়বস্তু বর্ণনা করার পূর্বে বলা হয় 'না', এরপর স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। এ সূরায় কেয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার ও তাদের সন্দেহ-সংশয়ের জবাব দান করা হয়েছে। প্রথমে কেয়ামত দিবস পরে 'নফসে-লাওউয়ামা' তথা ধিক্কারকারী মনের শপথ করে সূরা শুরু করা হয়েছে। শপথের জবাব স্থানের ইঙ্গিত উহ্য আছে। অর্থাৎ কেয়ামত অবশ্যসম্ভাবী। কেয়ামতের শপথ যে স্থানোপযোগী হয়েছে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। এমনিভাবে নফসে-লাউওয়ামার শপথেও তার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। নফস শব্দের অর্থ প্রাণ ও আত্মা সুবিদিত। لَوَّامَةٌ শব্দটি لَوْمٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ তিরস্কার ও ধিক্কার দেওয়া। 'নফসে লাউওয়ামা' বলে এমন নফস বুঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। অর্থাৎ কৃত গোনাহ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে যে, তুই এমন করলি কেন? সৎকর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে যে, আরও বেশি সৎকাজ সম্পাদন করে উচ্চমর্যাদা লাভ করলে না কেন? সারকথা, কামেল মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কাজের জন্যে নিজেকে তিরস্কারই করে। গোনাহ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে তিরস্কার করার হেতু বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সৎকাজ তিরস্কার করার কারণ এই যে, নফস ইচ্ছা করলে আরও বেশি সৎকাজ করতে পারত। সে বেশি সৎকাজ করল না কেন? এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।–(ইবনে–কাছীর) এই অর্থের ভিত্তিতে হযরত হাসান বসরী (র.) নফসে–লাউওয়ামার তাফসীর করেছেন 'নফসে–মুমিনা।' তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম, মুমিন তো সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে ধিক্কারই দেয়। সৎকর্মসমূহেও সে আল্লাহর শানের মোকাবিলায় আপন কর্মে অভাব ও ত্রুটি অনুভব করে। কেননা আল্লাহর হক পুরোপুরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে ত্রুটি থাকে এবং তজ্জন্যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান বসরী (রহ.) প্রমুখের এই তাফসীর অনুযায়ী নফসে-লাউওয়ামার শপথ করার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুমিন ব্যক্তিদের সম্মান ও সম্ভ্রম প্রকাশ করা, যারা নিজেদেরকে তিরস্কার করে।

নফসে-লাউওয়ামার এই তাফসীরে 'নফসে-মুতমায়িন্না ও' দাখিল আছে। এগুলো 'নফসে-মুত্তাকীরই' উপাধি।

নফসে আম্মারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িন্না ঃ সূফী বুযুর্গগণ বলেন ঃ নফস মজ্জাগত ও স্বভাবগতভাবে لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, সৎকর্ম ও সাধনার বলে সে নফসে-লাউওয়ামা হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ ও ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সৎকর্মে উন্নতি ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যলাভে চেষ্টা করতে করতে যখন শরিয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরিয়তবিরোধী কাজের প্রতি স্বভবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফসই মুতমায়িন্না উপাধিপ্রাপ্ত হয়।

অতঃপর কেয়ামত অবিশ্বাসীদের একটি সাধারণ প্রশ্নের জবাব আছে। প্রশ্ন এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হবে। তার অস্থিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সেগুলোকে পুনরায় একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে? জবাবে বলা হয়েছে ঃ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ -এর সারমর্ম এই যে, চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহকে একত্রিত করে পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তোমরা বিস্মিত হচ্ছ ঃ অথচ এ বিষয়টি পূর্বে একবার প্রত্যক্ষ করেছ যে, দুনিয়াতে পালিত ও বর্ধিত প্রত্যেক মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ ও কণা নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। অতএব, যে ক্ষমতাশালী সত্তা প্রথমবার সারাবিশ্বে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একজন মানুষের অস্তিত্বে একত্রিত করেছেন, এখন পুনরায় সেগুলোকে একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কিরূপে কঠিন হবে? তিনি পূর্বে যেমন তার কাঠামোতে আত্মা রেখে তাকে জীবিত করেছেন, পুনরায় এরূপ করলে তা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে কেন?

দেহ পুনরুত্থানে কুদরতের অভাবনীয় কর্ম : চিন্তার বিষয় এটা যে, একজন মানুষ যে দেহাবয়ব ও আকার-আকৃতিতে প্রথমে সৃজিত হয়েছিল, আল্লাহর কুদরত পুনর্বারও তার অস্তিত্বে সে সব বিষয় চুল পরিমাণ পার্থক্য ব্যতিরেকে সন্নিবেশিত

করে দিবেন। অথচ সৃষ্টির আদিকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কত বিচিত্র আকার-আকৃতির মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। কার সাধ্য যে, তাদের সবার আকার-আকৃতি ও দৈহিক গঠনের গুণাগুণ আলাদা আলাদাভাবে স্মরণও রাখতে পারে– পুনরায় তদ্রুপ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বলেছেন যে, আমি কেবল মৃত ব্যক্তির বড় ও প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই পূর্ববৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম নই বরং মানব অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতম অঙ্গকেও সম্পূর্ণ পূর্বের ন্যায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। আয়াতে বিশেষভাবে অঙ্গুলির অগ্রভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই মানুষের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ। এই ছোট অঙ্গের পুনঃ সৃষ্টিতেই যখন কোনো পার্থক্য হবে না, তখন হাত পা ইত্যাদি বড় বড় অঙ্গের তো কথাই নেই।

চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বিশেষভাবে অঙ্গুলির অগ্রভাগ উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এক মানুষকে অন্য মানুষ থেকে পৃথক করার জন্য তার সর্বাঙ্গের বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। এসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা সে আলাদাভাবে পরিচিত হয়। বিশেষত মানুষের যে মুখমণ্ডল কয়েক বর্গ ইঞ্চির বেশি নয়, তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এমন সব স্বাতন্ত্র্য রেখেছেন, যার ফলে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একের মুখমণ্ডল অপরের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিল খায় না। মানুষের জিহ্বা ও কণ্ঠনালী সম্পূর্ণ একই রকম হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে স্বাতন্ত্র্য। ফলে, বালক, বৃদ্ধ এবং নারী ও পুরুষের কণ্ঠস্বর আলাদা-আলাদাভাবে চেনা যায় এবং প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠস্বর পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়। আরও বেশি বিস্ময়কর বস্তু হচ্ছে মানুষের বৃদ্ধাঙ্গলি ও অঙ্গুলির অগ্রভাগ। এগুলোর উপর যে সব রেখা ও কারুকার্যের ঝাল বিস্তৃত আছে, তা কখনও একে অপরের সাথে মিলে না। অথচ মাত্র অর্ধ ইঞ্চি পরিসরের মধ্যে এসব পারস্পরিক সামঞ্জস্যবিহীন স্বাতন্ত্র্য নিহিত আছে। প্রাচীন ও আধুনিক প্রতি যুগে বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপকে একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বস্তুরূপে গণ্য করে এর ভিত্তিতেই আদালতের ফয়সালা হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, এটা কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিরই বৈশিষ্ট্য নয়, বরং প্রত্যেক অঙ্গুলির অগ্রভাগের রেখাও এমনিভাবে স্বাতন্ত্র্য।

একথা বুঝে নেওয়ার পর বিশেষভাবে অঙ্গুলির অগ্রভাগ উল্লেখ করার কারণ আপনা-আপনি হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা তো এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ কর যে, এই মানুষ পুনরায় কিরূপে জীবিত হবে! আরও সামান্য অগ্রসর হয়ে চিন্তা কর যে, কেবল জীবিতই হবে না বরং তার পূর্বের আকার-আকৃতিও প্রত্যেক স্বাতন্ত্রমূলক বৈশিষ্ট্য সহকারে জীবিত হবে। এমনকি, পূর্বের সৃষ্টিতে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অঙ্গুলিসমূহের রেখা যেভাবে ছিল, পুনঃ সৃষ্টিতেও তদ্রুপই থাকবে।

لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ - اَمَامَ শব্দের অর্থ সম্মুখ ও ভবিষ্যত। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফের ও গাফেল মানুষ আল্লাহ তা'আলার কুদরতের এসব চাক্ষুষ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, যাতে অতীতের অস্বীকারের দরুন অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যত ঠিক করে নিতে পারে ; বরং ভবিষ্যতেও সে কুফর, শিরক, অস্বীকার ও মিথ্যারোপে অটল থাকতে চায়।

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ –এখানে কেয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। بَرِقَ অর্থ চক্ষুতে ধাঁধা লেগে গেল এবং দেখতে পারল না। কেয়ামতের দিন সবার দৃষ্টিতে ধাঁধা লেগে যাবে। ফলে চক্ষুস্থির কোনো বস্তু দেখতে পারবে না। خَسَفَ শব্দটি خُسُوْفٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ –এতে বলা হয়েছে যে, শুধু চন্দ্রই জ্যোতিহীন হবে না ; বরং সূর্যের দশাও তাই হবে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আসল আলো সূর্যের মধ্যে নিহিত। চন্দ্রও সূর্যের কিরণ থেকে আলো লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কেয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে একই অবস্থায় একত্রিত করা হবে উভয়েই জ্যোতি হারিয়ে ফেলবে। কেউ কেউ বলেন, চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করার অর্থ এই যে, সেদিন উভয়েই একই উদয়াচল থেকে উদিত হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে তাই বর্ণিত আছে।

يُنَبَّؤُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ –অর্থাৎ মানুষকে সেদিন অবহিত করা হবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে সৎকাজ করে নেয়, তা সে অগ্রে প্রেরণ করে এবং যে সৎ অথবা অসৎ উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায়, যা তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে। (এর ছওয়াব অথবা শাস্তি সে পেতে থাকবে।) হযরত কাতাদা (রা.) বলেন ঃ مَا قَدَّمَ বলে এমন সৎকাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ জীবদ্দশায় করে নেয় এবং مَا اَخَّرَ বলে এমন সৎকাজ বোঝানো হয়েছে, যা সে করতে পারত, কিন্তু করেনি এবং সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে।

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ - بَصِيْرٌ ও بَصِيْرَةٌ এর অর্থ চক্ষুষ্মান। এর অপর অর্থ প্রমাণও হয়ে থাকে। কুরআনে আছে–قَدْ جَاۤءَكُمْ بَصَاۤئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ এখানে بَصَاۤئِرُ শব্দটি بَصِيْرَةٌ –এর বহুবচন। অর্থ প্রমাণ। مَعَاذِيْر শব্দটি ওযর অর্থে مِعْذَارٌ -এর বহুবচন। আয়াতের অর্থ এই যে, যদিও ন্যায়বিচারের বিধি অনুযায়ী মানুষকে তার প্রত্যেকটি কর্ম সম্পর্কে হাশরের মাঠে অবহিত করা হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেননা মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। সে কি করেছে, তা সে নিজেই জানে। এছাড়া হাশরের মাঠে প্রত্যেকে তার সৎ অসৎ কর্ম স্বচক্ষে

দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا অর্থাৎ, দুনিয়াতে মানুষ যা করেছে, হাশরের মাঠে তাকে উপস্থিত পাবে এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এখানে মানুষকে নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান বলার অর্থ তাই।

পক্ষান্তরে بَصِيْرَةٌ –এর অর্থ প্রমাণ হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ হবে। সে অস্বীকার করলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে। কিন্তু মানুষ তার অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা সত্ত্বেও বাহানাবাজি ত্যাগ করবে না। সে তার কৃতকর্মের অজুহাত পেশ করতেই থাকবে। وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ বাক্যের অর্থ তাই।

এ পর্যন্ত কেয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা আলোচিত হলো। পরেও এই আলোচনা আসবে। মাঝখানে চার আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন। (এক) কোথাও এর শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোনো পার্থক্য না হয়ে যায়। (দুই) কোথাও এর কোনো অংশ, কোনো বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) কোনো আয়াত শোনাতেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহ্বা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, যাতে বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই পরিশ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআন বিশুদ্ধ পাঠ করানো, মুখস্থ করানো ও মুসলমানদের কাছে হুবহু পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহ্বাকে দ্রুত নাড়া দেওয়ার কষ্ট করবেন না। لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ বাক্যের অর্থ তাই। এরপর বলেছেন, اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ অর্থাৎ আয়াতসমূহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হুবহু আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এর চিন্তা পরিত্যাগ করুন। এরপর বলা হয়েছে, فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ এখানে কুরআনের অর্থ পাঠ। অর্থ এই যে, যখন আমি অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) কুরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না ; বরং চুপ করে শুনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। এখানে কুরআন অনুসরণ করার মানে চুপ করে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পাঠ শ্রবণ করা। সকল তফসীরবিদই এতে একমত।

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাআত না করার একটি প্রমাণ : সহীহ হাদীসে আছে অনুকরণ ও অনুসরণের জন্যই নামাজে ইমাম নিযুক্ত হয়। অতএব, মুক্তাদীদের উচিত ইমামের অনুসরণ করা। যখন সে রুকূ' করে, তখন সব মুক্তাদী রুকূ' করবে এবং যখন সে সেজদা করে তখন সবাই সেজদা করবে। মুসলিমের রেওয়ায়েতে তৎসঙ্গে আরও বলা হয়েছে– যখন ইমাম কিরাআত করে, তখন তোমরা চুপ করে শ্রবণ কর। اِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا এ থেকেও বোঝা যায় যে, ইমামের অনুসরণ উদ্দেশ্য। রুকূ' ও সেজদায় ইমামের অনুসরণ এই যে, তার সাথে সাথে রুকূ' ও সেজদা আদায় করবে কিন্তু সাথে সাথে কিরাআত করা কিরাআতের অনুসরণ নয় বরং কিরাআতের অনুসরণ এই যে, ইমাম যখন কিরাআত করবে, তখন তোমরা চুপ করে শুনবে। ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের কিরাআত করা উচিত নয়– এই মাসআলা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও অপর কয়েকজন ইমামের এটাই দলিল।

অবশেষে বলা হয়েছে اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ অর্থাৎ আপনি এ চিন্তাও করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝিয়ে দেওয়াও আমার দায়িত্ব। আমি কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব। এই চার আয়াতে কুরআন ও তার তেলাওয়াত সম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণনা করার পর আবার কিয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতারই অবশিষ্ট আলোচনা করা হচ্ছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই চার আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক কি? তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত সম্পর্ক এই যে, ইতঃপূর্বে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ স্বীয় অসীম কুদরতের বলে প্রত্যেক মানুষকে পূর্বে যে আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেছিলেন, সেই আকারে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এমনকি, তার অঙ্গলির অগ্রভাগ এবং তাতে অঙ্কিত রেখা ও চিহ্নসমূহকেও হুবহু পূর্বের ন্যায় করে দিবেন। এতে কেশাগ্র পরিমাণ পার্থক্য হবে না। এটা তখনই হতে পারে, যখন আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানও অসীম হয় এবং তথ্যাবলী সংরক্ষণে পদ্ধতিও অদ্বিতীয় হয়। এর সাথে মিল রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই চার আয়াত সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তো ভুলেও যেতে পারেন এবং বর্ণনায় ভুল করারও আশঙ্কা আছে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয়ের উর্ধ্বে। এসব বিষয়ের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। তাই আপনি কুরআনের বাক্যাবলী সংরক্ষিত রাখা অথবা এগুলোর অর্থ বোঝার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার কষ্ট ছেড়ে দিন। এসব কাজ আল্লাহ তা'আলাই সম্পন্ন করবেন। অতঃপর কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থাৎ সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হাসি-খুশি ও সজীব হবে এবং তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে জান্নাতীগণ চর্মচক্ষে আল্লাহ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুন্নত-ওয়াল-জামাতের সকল আলেম ও ফিকহবিদ এ বিষয়ে একমত। কেবল মুতাজিলা ও খারেজী

সম্প্রদায় এটা স্বীকার করে না। তাদের অস্বীকারের কারণ দার্শনিক সন্দেহ। তাদের ভাষ্য এই যে, চর্মচক্ষে দেখার জন্য দর্শক এবং যাকে দেখা হয় উভয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের জন্য যে সব শর্ত রয়েছে, সেগুলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে অনুপস্থিত। আহলে সুন্নত-ওয়াল-জামাতের বক্তব্য এই যে, পরকালে আল্লাহর দীদার ও সাক্ষাৎ এসব শর্তের উর্ধ্বে থাকবে। না কোনো দিক ও পার্শ্বের সাথে এর সম্পর্ক থাকবে এবং না কোনো বিশেষ আকার-আকৃতির সাথে। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। তবে এই দীদার ও সাক্ষাতে জান্নাতীগণের বিভিন্ন স্তর থাকবে। কেউ সপ্তাহে একবার অর্থাৎ শুক্রবারে এই সাক্ষাৎ লাভ করবে, কেউ দৈনিক সকাল-বিকাল লাভ করবে এবং কেউ সারাক্ষণ সাক্ষাতেই থাকবে।-(মাযহারী)

كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيْلَ مَنْ (سكته) رَاقٍ وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ –পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাতি ও জাহান্নামিদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই আয়াতে মৃত্যুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ঈমান ও সৎকর্মের দিকে ধাবিত হয়। আয়াতে মৃত্যুর চিত্র অঙ্কন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, গাফেল মানুষ যখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে থাকে, তখন তার মাথার উপর মৃত্যু এসে দণ্ডায়মান হয় এবং আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে ঠেকে। শুশ্রূষাকারীরা চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে ঝাড়ফুঁককারীদেরকে খুঁজতে থাকে এবং পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যায়। এটাই আল্লাহর কাছে যাওয়ার সময়। এ সময়ে কোনো তওবা কবুল হয় না এবং কোনো আমলও করা যায় না। কাজেই বুদ্ধিমানের উচিত এর আগেই সংশোধনের চেষ্টা করা।

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ – سَاقٌ –এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা। গোছার সাথে জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অস্থিরতার কারণে এক গোছা দ্বারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বলতার আতিশয্যে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ এখানে দুই গোছা বলে দুই জগৎ–ইহকাল ও পরকাল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তখন হবে ইহকালের শেষ দিন এবং পরকালের প্রথম দিনের সম্মিলন। তাই মানুষ ইহকালের বিরহ-বেদনা এবং পরকালে কি হবে না হবে তার চিন্তায় গ্রেফতার থাকবে।

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى – اَوْلٰى শব্দটি وَيْلٌ এর অপভ্রংশ। অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। যে, ব্যক্তি কুফর ও মিথ্যারোপকেই আঁকড়ে থাকে এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদে মত্ত থাকে ও তদবস্থায় মারা যায়, তার জন্যে, মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরে সমবেত হওয়ার সময় এবং অবশেষে সময় বিপর্যয় ও দুর্ভোগই তোমরা প্রাপ্য।

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى অর্থাৎ জীবন-মৃত্যু ও সারা বিশ্ব যে সত্তার করতলগত, তিনি কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কেয়ামার এই আয়াত পাঠ করে, তার বলা উচিত بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তিনি সক্ষম এবং আমিও এর একজন সাক্ষী। সূরা ত্বীনের শেষ আয়াত اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ পাঠ করার সময়ও একথা বলার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি সূরা মুরসালাতের فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ আয়াত পাঠ করে তার বলা উচিত اٰمَنَّا بِاللّٰهِ

শব্দবিশ্লেষণ :

لَآ اُقْسِمُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقْسَامٌ মূলবর্ণ (ق - س - م) জিনস صحيح অর্থ– আমি শপথ করছি।

لَوَّامَةٌ : মুবালাগার সীগাহ। মুয়ান্নাছ। لَوَّامٌ মুযাক্কার। অর্থ– বেশি তিরস্কারকারী, ভর্ৎসনাকারী।

يَحْسَبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার حُسْبَانٌ মূলবর্ণ (ح - س - ب) জিনস صحيح অর্থ– সে ধারণা করে।

عِظَامٌ : হাড্ডি, عظم -এর বহুবচন। যেমন, سَهْمٌ -এর বহুবচন سِهَامٌ আসে।

قَادِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ - ضَرَبَ - سَمِعَ মাসদার قَدْرٌ - قُدْرَةٌ মূলবর্ণ (ق - د - ر) জিনস صحيح অর্থ–ক্ষমতাবান।

نُسَوِّيَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْوِيَةٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– ঠিক করে দেই।

بَنَانٌ : শব্দটি بَنَانَةٌ -এর বহুবচন অর্থ– আঙ্গুলের অগ্রভাগ। আঙ্গুল।

لِيَفْجُرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منصوب بلام كى বাব نَصَرَ মাসদার فَجْرٌ মূলবর্ণ (ف - ج - ر) জিনস صحيح অর্থ– পাপ কার্যে লিপ্ত থাকে। প্রকাশ্যে গুনাহ করে

اَلْمُسْتَقَرُّ : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِقْرَارٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ঠিকানা। আশ্রয়স্থল। স্থায়িত্ব। দৃঢ়তা।

بَرِقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার بَرْقٌ মূলবর্ণ (ب - ر - ق) জিনস صحيح অর্থ– বিস্ফারিত হয়ে যাবে।

خَسَفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خُسُوْفٌ মূলবর্ণ (خ - س - ف) জিনস صحيح অর্থ– নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।

يُنَبَّؤُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْبِئَةٌ মূলবর্ণ (ن - ب - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– জানিয়ে দেওয়া হবে।

قَدَّمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْدِيْمٌ মূলবর্ণ (ق - د - م) জিনস صحيح অর্থ– পূর্বকৃত।

اَخَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَاخِيْرٌ মূলবর্ণ (ء - خ - ر) জিনস مهموز لام অর্থ– পরেকৃত।

مَعَاذِيْرَهُ : এখানে معاذير মুযাফ। ه যমীর মুযাফ ইলাইহি। مَعَاذِيْرُ বহুবচন। একবচন مَعْذِرَةٌ অর্থ– ওযর-আপত্তি।

لَا تُحَرِّكْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْرِيْكٌ মূলবর্ণ (ح - ر - ك) জিনস صحيح অর্থ– চালাবেন না।

اَلْقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পেশ করে। ঢেলেছেন। নিক্ষেপ করেছেন।

لِتَعْجَلَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منصوب بلام كى বাব سَمِعَ মাসদার عَجَلٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ل) জিনস صحيح অর্থ– ত্বরিত আয়ত্ত করার জন্য।

تُحِبُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْبَابٌ মূলবর্ণ (ح - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা ভালোবাস।

اَلْعَاجِلَةَ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার عَجَلٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ل) জিনস صحيح অর্থ– দুনিয়া।

تَذَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سمع . ضرب মাসদার وذر মূলবর্ণ (و - ذ - ر) জিনস مثال واوى অর্থ– ছেড়ে বসেছ।

نَاضِرَةٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার نَضْرٌ মূলবর্ণ (ن - ض - ر) জিনস صحيح অর্থ– উজ্জ্বল হবে।

بَاسِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَسْرُ মূলবর্ণ (ب - س - د) জিনস صحيح অর্থ– মলিন হবে।

تَظُنُّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার ظَنٌّ মূলবর্ণ (ظ - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ধারণা করে, অনুমান করে, আন্দাজ করে।

فَاقِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার فَقْرًا মূলবর্ণ (ف - ق - ر) জিনস صحيح অর্থ– কোমড়াভাঙ্গা।

بَلَغَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার بُلُوْغٌ মূলবর্ণ (ب - ل - غ) জিনস صحيح অর্থ– পৌছে যায়। হয়ে পড়ে।

اِلْتَفَتَ : সীগাহ বহছ واحد مؤنث غائب ماضي معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِلْتِفَافُ মূলবর্ণ (ل ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– জড়িয়ে যাবে।

سَاقٌ : পায়ের গোছা। আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী কামূসে বর্ণনা করেন, পায়ের টাখনু হতে হাঁটু পর্যন্ত অংশকে سَاقٌ বলা হয়। এর বহুবচন سَوْقٌ ও سِيْقَانٌ ، سُوْقٌ আসে। এখানে واو কে হামযা করা হয়েছে। যাতে পেশকে গ্রহণ করতে পারে। وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ এক পা অপর পায়ের সাথে জড়িয়ে যাবে।

اَلتَّرَاقِيْ : শব্দটি تَرْقُوَةٌ-এর বহুবচন অর্থ– কণ্ঠ। হাসুলী। গলার নিচের হাড়।

رَاقٍ : সীগাহ বহছ واحد مذكر اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার رَقْيٌ মূলবর্ণ (ر – ق – ى) জিনস ناقص يائي অর্থ– ঝাড় ফুঁককারী। জাদুকর।

يَتَمَطّٰى : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَمَطِّيْ মূলবর্ণ (م – ط – ى) জিনস ناقص يائي অর্থ– গর্বভরে চলে। অহংকার করে চলে।

مَنِيٌّ : সিফাতের সীগাহ فَعِيْلٌ-এর ওজনে অর্থ– এক বিন্দু শুক্র। এমন বস্তু যার দ্বারা মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও অবয়ব বানানো হয়।

صَدَّقَ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب ماضي معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْدِيْقٌ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– বিশ্বাস করা, সত্যায়ন করা।

صَلّٰى : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب ماضي معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– নামাজ পড়েছে।

كَذَّبَ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب ماضي معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْذِيْبٌ মূলবর্ণ (ك ـ ذ ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– অবিশ্বাস করেছিল।

تَوَلّٰى : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب ماضي معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– পরাঙ্মুখ হয়েছিল।

ذَهَبَ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب ماضي معروف বাব فَتَحَ মাসদার ذِهَابٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ه ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– চলে যেত।

يُتْرَكُ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার تَرْكٌ মূলবর্ণ (ت ـ ر ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– ছেড়ে দেওয়া হবে।

يُمْنٰى : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِمْنَاءٌ মূলবর্ণ (م ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائي অর্থ– নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

عَلَقَةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন হলো علق অর্থ– জমাট রক্ত। রক্তপিণ্ড, যা বীর্য হতে সৃষ্টি হয়।

يُحْيِيَ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْيَاءٌ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– জীবন দান করতে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ : এখানে لَا تُحَرِّكْ ফে'ল যমীর اَنْتَ ফায়েল আর بِهٖ টা لِتَعْجَلَ-এর সাথে متعلق আর لِسَانَكَ হলো মাফউলে বিহী। আর لِتَعْجَلَ ফে'ল। بِهٖ টা لَا تُحَرِّكْ-এর সাথে متعلق আর اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل এবং عَلَيْنَا হলো خبر مقدم আর جَمْعَهٗ হলো اسم موخر আর قُرْاٰنَهٗ টা جَمْعَهٗ-এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন, ৮ম খণ্ড; পৃ. ১৪৮]

سُوْرَةُ الدَّهْرِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা দাহর

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩১, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ	আয়াত
১. নিঃসন্দেহের মানুষের উপর কালের মধ্যে এমন একটি সময় অতীত হয়েছে, যখন সে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না।	هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾
২. আমি মানুষকে সংমিশ্রিত শুক্র দ্বারা সৃষ্টি করেছি, এরূপে যে, আমি তাকে বিধানাধীন করেছি, সুতরাং আমি তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন করেছি।	إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾
৩. আমি তাকে পথ দেখিয়েছি, হয়তো সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা অকৃতজ্ঞ হবে।	إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾
৪. আমি কাফেরদের জন্য শৃঙ্খল ও বেড়িসমূহ এবং জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।	إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾
৫. যারা নেককার তারা এমন পানপাত্রে [শরাব] পান করবে, যাতে কাফূর মিশ্রিত থাকবে।	إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾
৬. অর্থাৎ এমন ঝরনা হতে, যা হতে আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণ পান করবে, যা তারা যথেচ্ছা প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে।	عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ নিঃসন্দেহে মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ কালের মধ্যে এমন একটি সময় لَمْ يَكُن যখন সে ছিল না। شَيْئًا مَّذْكُورًا কোনো উল্লেখ যোগ্য বস্তুই ।

২. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ সংমিশ্রিত শুক্র দ্বারা نَّبْتَلِيهِ এরূপে যে, আমি তাকে বিধানাধীন করেছি। فَجَعَلْنَاهُ সুতরাং আমি তাকে করেছি। سَمِيعًا بَصِيرًا শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন ।

৩. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ আমি তাকে পথ দেখিয়েছি। إِمَّا شَاكِرًا হয়তো সে কৃতজ্ঞ হয়েছে। وَإِمَّا كَفُورًا অথবা অকৃতজ্ঞ হবে।

৪. إِنَّا أَعْتَدْنَا আমি প্রস্তুত করে রেখেছি لِلْكَافِرِينَ কাফেরদের জন্য سَلَاسِلَا শৃঙ্খল। وَأَغْلَالًا ও বেড়িসমূহ। وَسَعِيرًا এবং জ্বলন্ত অগ্নি।

৫. إِنَّ الْأَبْرَارَ যারা নেককার يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ তারা এমন পানপাত্রে (শরাব) পান করবে كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا যাতে কাফূর মিশ্রিত থাকবে।

৬. عَيْنًا এমন ঝর্ণা হতে يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ যা হতে আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণ পান করবে। يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا যা তারা যথেচ্ছা প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে।

৭. তারা ওয়াজিব কার্যগুলো পালন করে থাকে এবং সেই দিনকে ভয় করে, যার কঠোরতা সর্বব্যাপী হবে।	يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾
৮. আর তারা [কেবল] আল্লাহর মহব্বতে দরিদ্র ও এতিম এবং বন্দীকে খাদ্য দান করে।	وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾
৯. আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই খাদ্য দান করছি, না আমরা তোমাদের নিকট প্রতিদান চাই, আর না কৃতজ্ঞতা।	إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾
১০. আমরা আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এক কঠিন ও তিক্তকর দিবসের আশঙ্কা করছি।	إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾
১১. অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে ঐ দিবসের কঠোরতা হতে নিরাপদে রাখবেন এবং তাদেরকে স্ফূর্তি ও আনন্দ দান করবেন।	فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾
১২. আর তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তাদেরকে বেহেশত এবং রেশমি পোশাক প্রদান করবেন।	وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾
১৩. এ অবস্থায় যে, তারা তন্মধ্যে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে থাকবে, তথায় তারা না উত্তাপ ভোগ করবে আর না শীত,	مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ তারা ওয়াজিব কার্যগুলো পালন করে থাকে وَيَخَافُونَ يَوْمًا এবং সেই দিবসকে ভয় করে كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا যার কঠোরতা সর্বব্যাপী হবে।

৮. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ আর তারা খাদ্য দান করে عَلَىٰ حُبِّهِ আল্লাহর মহব্বতে مِسْكِينًا وَيَتِيمًا দরিদ্র, এতিম وَأَسِيرًا ও বন্দিকে।

৯. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ আমরা তোমাদেরকে খাদ্য দান করছি لِوَجْهِ اللَّهِ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই لَا نُرِيدُ مِنكُمْ না আমরা তোমাদের নিকট চাই جَزَاءً প্রতিদান وَلَا شُكُورًا আর না কৃতজ্ঞতা।

১০. إِنَّا نَخَافُ আমরা আশঙ্কা করছি مِن رَّبِّنَا আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে يَوْمًا এক দিবসের عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا কঠিন ও তিক্তকর।

১১. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রাখবেন شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ ঐ দিবসের কঠোরতা হতে وَلَقَّاهُمْ এবং তাদেরকে দান করবেন نَضْرَةً وَسُرُورًا স্ফূর্তি ও আনন্দ।

১২. وَجَزَاهُم আর তাদেরকে প্রদান করবেন بِمَا صَبَرُوا ধৈর্যের বিনিময়ে جَنَّةً وَحَرِيرًا জান্নাত এবং রেশমি পোশাক।

১৩. مُّتَّكِئِينَ عَلَى الْأَرَائِكِ এই অবস্থায় যে, তারা তন্মধ্যে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে থাকবে لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا তথায় তারা না উত্তাপ ভোগ করবে وَلَا زَمْهَرِيرًا আর না শীত।

১৪. আর এ অবস্থা হবে যে, (বেহেশতের) বৃক্ষসমূহের ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে। আর তার ফলপুঞ্জ তাদের আয়ত্তাধীন থাকবে।	وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿١٤﴾
১৫. আর তাদের নিকট রৌপ্যের পাত্র আনয়ন করা হবে এবং পানপাত্রসমূহ যা কাঁচের (নির্মিত) হবে।	وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ﴿١٥﴾
১৬. ঐ কাঁচ রৌপ্য নির্মিত হবে, যা পূর্ণকারীগণ যথোপযুক্ত পরিমাণে পূর্ণ করবে।	قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾
১৭. আর তথায় তাদেরকে এমন শরাবের পেয়ালা পান করানো হবে যা আদ্রক সংমিশ্রিত হবে।	وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿١٧﴾
১৮. জান্নাতের এমন নির্ঝরিণী হতে- যার নাম সালসাবীল।	عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿١٨﴾
১৯. আর তাদের নিকট এমন বালকগণ ঘুরে বেড়াবে, যারা সদা বালকই থাকবে, হে শ্রোতা! যদি তুমি তাদেরকে দেখ, তবে এরূপ মনে করবে যেন, বিক্ষিপ্ত মুক্তা।	وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ﴿١٩﴾
২০. আর হে শ্রোতা! যদি তুমি সে স্থান দেখতে পাও, তবে তুমি বিরাট নিয়ামত ও বিশাল রাজত্ব দেখতে পাবে।	وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا আর অবস্থা এই হবে যে, (বেহেশতের) বৃক্ষ সমূহের ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا আর তার ফলপুঞ্জ তাদের আয়ত্তাধীন থাকবে।

১৫. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ আর তাদের নিকট আনয়ন করা হবে بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ রৌপ্যের পাত্র وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا এবং পানপাত্রসমূহ যা কাঁচের (নির্মিত) হবে।

১৬. قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ ঐ কাঁচ রৌপ্য নির্মিত হবে। قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا পূর্ণকারীগণ যথোপযুক্ত পরিমাণে পূর্ণ করবে।

১৭. وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا আর তথায় তাদেরকে এমন শরাবের পেয়ালা পান করানো হবে كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا যা আদ্রক সংমিশ্রিত হবে।

১৮. عَيْنًا فِيْهَا জান্নাতের এমন নির্ঝরিণী হতে تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا যার নাম সালসাবীল।

১৯. وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ আর তাদের নিকট ঘুরে বেড়াবে وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ এমন বালকগণ যারা সদা বালকই থাকবে اِذَا رَاَيْتَهُمْ হে শ্রোতা! যদি তুমি তাদেরকে দেখ حَسِبْتَهُمْ তবে এরূপ মনে করবে। لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

২০. وَاِذَا رَاَيْتَ আর হে শ্রোতা যদি তুমি সে স্থান দেখতে পাও ثَمَّ رَاَيْتَ তবে তুমি দেখতে পাবে। نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا বিরাট নিয়ামত ও বিশাল রাজত্ব।

অনুবাদ	আয়াত
২১. সেই জান্নাতবাসীদের উপর মিহীন রেশমের সবুজ পোশাক থাকবে, আর মোটা রেশমের পোশাকও, আর তাদেরকে রৌপ্যের কঙ্কনসমূহ পরানো হবে, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন।	عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ۫ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿٢١﴾
২২. (তোমাদের আনন্দ আরো বর্ধিত করার জন্য বলা হবে) এটা তোমাদের প্রতিদান এবং তোমাদের সাধনা মকবুল হয়েছে।	اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾
২৩. আমি আপনার প্রতি কুরআনকে ক্রমে ক্রমে করে অবতীর্ণ করেছি।	اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ﴿٢٣﴾
২৪. অতএব, আপনি স্বীয় প্রভুর নির্দেশের উপর অটল থাকুন, আর তাদের অন্তর্গত কোনো ফাসেক কিংবা কাফের ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না।	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ﴿٢٤﴾
২৫. আর প্রভাতে ও সন্ধ্যায় স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে থাকুন।	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٢٥﴾
২৬. এবং কিয়ৎ পরিমাণ রাত্রিকালেও তাঁকে সেজদা করুন, আর রাত্রির প্রধান অংশে তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন।	وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾
২৭. এরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং তাদের সম্মুখবর্তী এক ভীষণ দিনকে বর্জন করে আছে।	اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿٢٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. عٰلِيَهُمْ সেই জান্নাতবাসীদের উপর থাকবে ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ মিহীন রেশমের সবুজ পোশাক وَّاِسْتَبْرَقٌ আর মোটা রেশমের পোশাকও وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ আর তাদেরকে রৌপ্যের কঙ্কন সমূহ পরানো হবে وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন شَرَابًا طَهُوْرًا পবিত্র পানীয়।

২২. اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً এটা তোমাদের প্রতিদান وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا এবং তোমাদের সাধনা মকবুল হয়েছে।

২৩. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا আমি অবতীর্ণ করেছি عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ আপনার প্রতি কুরআনকে تَنْزِيْلًا ক্রমে ক্রমে করে।

২৪. فَاصْبِرْ অতএব আপনি অটল থাকুন لِحُكْمِ رَبِّكَ স্বীয় প্রভুর নির্দেশের উপর وَلَا تُطِعْ আর অনুসরণ করবেন না مِنْهُمْ তাদের অন্তর্গত اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا কোনো ফাসেক কিংবা কাফের ব্যক্তির।

২৫. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ আর স্বীয় প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাকুন بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا প্রভাতে ও সন্ধ্যায়।

২৬. وَمِنَ الَّيْلِ এবং কিয়ৎ পরিমাণ রাত্রিকালেও فَاسْجُدْ لَهٗ তাঁকে সেজদা করুন وَسَبِّحْهُ আর তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন لَيْلًا طَوِيْلًا রাত্রির প্রধান অংশে।

২৭. اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ এরা يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে وَيَذَرُوْنَ এবং বর্জন করে আছে وَرَآءَهُمْ তাদের সম্মুখবর্তী يَوْمًا ثَقِيْلًا এক ভীষণ দিনকে।

২৮. আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আমিই তাদের গ্রন্থিসমূহ সুদৃঢ় করেছি, আর যখনই আমি ইচ্ছা করব, তখনই তাদের ন্যায় মানুষ তাদের স্থলে পরিবর্তন করে দিব।	نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾
২৯. নিশ্চয় তা [যথেষ্ট] নসিহত, অতএব, যার ইচ্ছা সে স্বীয় প্রভুর রাস্তা অবলম্বন করুক।	اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٩﴾
৩০. আর আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনো বিষয়ের ইচ্ছা করতে পার না; আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٣٠﴾
৩১. তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন; আর জালিমদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।	يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۗ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ আমিই তাদের গ্রন্থিসমূহ সুদৃঢ় করেছি وَاِذَا شِئْنَا আর যখনই আমি ইচ্ছা করব بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا তখনই তাদের ন্যায় মানুষ তাদের স্থলে পরিবর্তন করে দিব।

২৯. اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ নিশ্চয়ই তা নসিহত فَمَنْ شَآءَ অতএব যার ইচ্ছা اتَّخَذَ সে অবলম্বন করুক اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا স্বীয় প্রভুর রাস্তা।

৩০. وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ আর আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনো বিষয়ের ইচ্ছা করতে পার না اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

৩১. يُّدْخِلُ তিনি অন্তর্ভুক্ত করেন مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা فِيْ رَحْمَتِهٖ স্বীয় অনুগ্রহের وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ আর জালিমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন عَذَابًا اَلِيْمًا যন্ত্রণাময় শাস্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির দু'টি নাম রয়েছে– একটি হলো اَلدَّهْرُ [আদ্-দাহর] আরেকটি নাম হলো اَلْاِنْسَانُ [আল-ইনসান]। আর এ দু'টি শব্দই অত্র সূরার প্রথম আয়াতে রয়েছে। এ দু'টি শব্দ হতেই এ দু'টি নাম গৃহীত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا আর কেউ কেউ কেবল اَلْاِنْسَانُ নামেই এটাকে ভূষিত করেছেন। তবে তাও যথার্থ। কেননা অত্র সূরায় যে আলোচনার বিষয়বস্তু রয়েছে, তাতে মানুষের জীবন বৃত্তান্ত অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব হতে আজীবন কালের অবস্থা এবং মৃত্যুর পর বেহেশত ও দোজখের যাবতীয় সুখ-দুঃখ কার ভাগ্যে কি ঘটবে সেই মর্মে ব্যক্তি বিশেষ, অবস্থা বিশেষ, সময় বিশেষ সকল দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাই উভয় নামেই নামকরণ করা যথার্থ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ৩১টি আয়াত, ২৪০টি বাক্য ও ১০৫৪টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরার অবতীর্ণকাল সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরকার বিভিন্ন মতামত জাহির করেছেন। তবে আল্লামা যমখশারী, ইমাম রাযী, কাজি বাইযাবী, আল্লামা হাফিজ ইবনে কাছীর, আল্লামা নিযামুদ্দীন নীশাপুরী (র.) প্রমুখসহ আরো অন্যান্য তাফসীরকারের মতে এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা আলূসী (র.)-এর মতে তা সর্বসমর্থিত মতামত বলে গৃহীত। আর কেউ কেউ গোটা সূরাটিকে মাদানি বলে অভিহিত করেছেন। আবার কারো কারো মতে ৮-১০ আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং বাকি অংশ মক্কায় অবতীর্ণ। কারো কারো মতে এটা মাক্কী সূরাসমূহের শেষগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারো মতে তার আয়াত وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ব্যতীত অবশিষ্ট সকল আয়াত মাদানি। (এটা হযরত হাসান বসরী ও ইকরামা (র.)-এর অভিমত।) কেউ কেউ বলেন, প্রথম হতে ২৩ নং আয়াত অর্থাৎ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا পর্যন্ত আয়াতগুলো মাক্কী এবং বাকি আয়াতগুলো মদিনায় অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার আলোচ্য বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য হলো– এ দুনিয়ায় মানুষের স্থান কোথায় এবং তার অবস্থানের স্বরূপ কি? তাদেরকে এ জগতে কেন পাঠানো হয়েছে, এখানে তাদের কর্তব্য কী? এ জগতে তাদেরকে কুফরের পথ ও ঈমানের পথ এ দু'য়ের কোনো একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে– যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করবে তাদের পুরস্কার পরকালে কি হবে এবং যারা কুফরের পথ গ্রহণ করবে তাদের পরিণাম ফলাফল কি হবে, এসব বিষয়ই এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে।

১-৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন নর-নারীর দেহাভ্যন্তরে অণু আকারে শুক্রকীটরূপে অবস্থান করছিল, তখন তারা উল্লেখযোগ্য বস্তু বলতে কিছুই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে নর-নারীর মিলিত শুক্রের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো পার্থিব জীনবটিকে তাদের জন্য একটি পরীক্ষাগার করা। এ পরীক্ষা নেওয়ার জন্যই তাদেরকে চক্ষু ও কর্ণ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা ভালোমন্দ দেখতে ও শুনতে পায়। আর তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে তাদের নিকট নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তারা সঠিক পথ কোনটি তা জানবার সুযোগ পায়। সুতরাং এরপর তাদেরকে এ দুনিয়ার জীবনে ভালোমন্দ, ঈমানী ও কুফরি পথের যে কোনো একটি পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলে তারা কুফরির পথ গ্রহণ করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে ঈমানের পথও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যারা কুফরির পথ গ্রহণ করে অকৃতজ্ঞ হবে তাদের শাস্তির জন্য শৃঙ্খল-বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি প্রস্তুত রয়েছে। আর যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করে নেককার হবে তাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে চিরন্তন জান্নাত। তাতে তারা কাফুর মিশ্রিত পানীয় পান করবে।

৭-২২ নং আয়াতে মু'মিন বান্দাদের প্রশংসা করে জান্নাতে তাদের অপূর্ব ও অফুরন্ত নিয়ামতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– আমার মু'মিন বান্দাগণ আমার নামে যে মানত করে তা পূর্ণরূপে আদায় করে, তারা এতিম, মিসকিন ও বন্দিগণকে পানাহার করায় দুনিয়ার কোনো স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য নয়; বরং নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে। এমনকি তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও আশা তারা করে না। তারা ভয়াবহ কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশের ভয় করে। সুতরাং পরকালে তারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করে পরম আনন্দ ও সুখ ভোগ করবে, তাদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তাদেরকে এ জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামতরাজি– আল্লাহর পথে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ধৈর্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বনের প্রতিদানেই দেওয়া হবে। তথায় তারা রেশমাবস্ত্র পরিধান করবে এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার তাদের দেহে শোভা পাবে। তাদের সেবাযত্নের জন্য থাকবে হুর-গেলমান। তাদের জন্য উন্নত মানের পানীয়ের ব্যবস্থা থাকবে। তাদের আসবাবপত্রগুলো হবে রৌপ্য নির্মিত ও কাঁচের আসবাব। হে নবী! আপনি যদি এ সব দেখেন, তবে দেখবেন কেবল অথৈ ও রাশি রাশি নিয়ামত এবং বিশাল সাম্রাজ্য। এ সব নিয়ামত আপনাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ এবং আপনাদের কর্মের প্রতিফল হিসেবে প্রদান করা হবে।

২৩-৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, এ কুরআন আমারই কালাম। আমিই বিভিন্ন সময় প্রয়োজন অনুসারে খণ্ড খণ্ড করে তা অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং কাফেরগণ যা কিছুই বলুক সেদিকে কর্ণপাত করবেন না। আপনি আপনার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় থাকুন। আপনি পাপিষ্ঠ ও কাফের লোকদের কথা মেনে চলবেন না। আপনি সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের স্মরণে থাকুন এবং রাত্রিকালে দীর্ঘক্ষণ নামাজে অতিবাহিত করুন। কাফেরগণ এ দুনিয়াকে অতিশয় ভালোবাসে বলেই পরকালকে ছেড়ে দিয়েছে। এ কাফের পাপিষ্ঠগণকে আমিই সৃষ্টি করেছি এবং তাদেরকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করতে আমি পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। বস্তুত আমার এ কুরআন হচ্ছে উপদেশ ভাণ্ডার। যার ইচ্ছা হয় সে তার উপদেশ গ্রহণ করে তার প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করুক; অথবা তাকে পরিহার করুক। এ ব্যাপারে মানুষকে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন রাখা হয়েছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ দান করেন; কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারী কাফেরদের প্রতি রয়েছে তাঁর নির্মম চিরন্তন শাস্তি। অতএব, হে মানবকুল সাবধান!

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে এবং যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ সূরায় আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর কুদরতের বর্ণনা রয়েছে। মানুষকে তিনি তাঁর বিশেষ কুদরতে অস্তিত্ব দান করেছেন, এরপর মানুষের সম্মুখে তিনি হেদায়েত ও গোমরাহীর দু'টি স্বতন্ত্র পথ তুলে ধরেছেন। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, যে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং হেদায়েতের পথ গ্রহণ করে সে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত লাভ করবে। যে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করবে না, হেদায়েতের স্থলে গোমরাহীকে গ্রহণ করবে তার শাস্তি অবধারিত। –[নূরুল কুরআন]

هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ـــ ١

শানে নুযূল : তাবারানী ও ইবনে মারদুবিয়া হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আবিসিনিয়া হতে একজন লোক আসল। হযরত রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি জিজ্ঞেস করে বুঝে নাও। তখন সে লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনিতো রং, আকৃতি ও নবুয়ত দ্বারা আমাদের উপর

মর্যাদার উচ্চাসন গ্রহণ করে নিলেন। অতএব, আপনি যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন আমিও যদি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং আপনি যে আমল করেছেন আমিও যদি সে আমল করি, তাহলে আমি আপনার সাথে বেহেশতে থাকতে পারব কী? তিনি বললেন, হ্যাঁ! যার কর্তৃত্বে আমার আত্মা সেই আল্লাহর কসম হাজারো বৎসরের দূরত্ব থেকে বেহেশতের মাঝে কালোর মাঝে শুভ্রতা দেখা যাবে। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলবে আল্লাহর নিকট তার জন্য একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ বলবে তার জন্য এক কোটি বিশ লক্ষ্য নেকি লিখা হবে। তখন সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা ১-২০ আলোচ্য আয়াত সমূহ নাজিল করেন। –[ফতহুল কাদীর ৩৪৩/৫, কুরতুবী ১৩২/১৯]

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥)

শানে নুযূল : ইবনে আসাকির মুজাহিদ (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূল ﷺ যখন সাতজন মুহাজিরের দায়িত্ব মক্কার বদরী মুশরিক বন্দিদের ব্যয় ধার্য্য করে দেন। সে সাতজন হলেন যথাক্রমে হযরত আবূ বকর, ওমর, আলী, যুবাইর, আব্দুর রহমান, সা'আদ ও আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)। তখন আনসারীগণ বলছিলেন যে, তাদের সাথে যুদ্ধ করলাম আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলের পথে আবার তাদের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। আনসারীগণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য ৫-১৮ নং পর্যন্ত আয়াত সমূহ নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১১৭/১৯, দুররে মানছুর ২১৯/৬] মুকাতিল বলেন, এক আনসারী একই দিনে দুঃস্থ, এতিম ও বন্দিকে খাদ্য দান করেছিলেন, দানবীর সেই আনসারী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১১৭/১৯]

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)

শানে নুযূল : এ আয়াত আবুল দাহদাহ (রা.) -এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তিনি রোজা অবস্থায় ছিলেন। ইফতারের সময় তার কাছে চারটি রুটি ছিল। তার মাঝে কতিপয় এতিম মিসকিন কয়েদীকে ক্ষুধার্ত দেখে তাদেরকে তিনটি রুটি দিয়ে দেন। বাকি একটি দ্বারা তার পরিবারের সকলে আহার কার্য সম্পন্ন করেন।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (٢٠)

শানে নুযূল : একদিন হযরত ওমর (রা.) এসে দেখতে পান যে, রাসূল ﷺ খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। নবীজীর শরীরে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। তা দেখে হযরত ওমর (রা.) কেঁদে ফেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, হে ওমর! তুমি কাঁদছ কেন? তিনি আরজ করলেন, আমরা একদিকে পারস্য রাজ ও তার তার বিশাল রাজত্ব অন্য দিকে রোম রাজ ও তার বিশাল রাজত্ব এবং আবিসিনিয়ার বিশাল রাজত্ব ও সেসব রাজ বর্গেও আরাম আয়েশের চিত্র দেখতে পাই। অন্য দিকে আপনি যিনি আল্লাহ পাকের রাসূল। আপনি খেজুর পাতার চাটাইয়ে শুয়ে আছেন। তখন হযরত রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, যে, তুমি তাতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্যে দুনিয়া ও আমাদের জন্য আখেরাতকে আরাম করা হয়েছে সে প্রেক্ষিতেই আল্লাহ পাক এই আয়াতে কারীমা অবতরণ করেন। –(কানযুন নুকূল : ১০৬)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (٢٤)

শানে নুযূল–১ : কাফের সর্দার একদা আবূ জাহল বলল, আমি যদি কখনো মুহাম্মদ ﷺ -কে নামাজরত দেখতে পাই তাহলে তার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করে দিব। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। –(কানযুন নুকূল : ১০৬)

শানে নুযূল–২ : ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন হযরত রাসূল ﷺ -এর উপর নামাজ ফরজ করা হয়, তখন আবূ জাহল ঘোষণা দিয়েছিল যে, আমি যদি মুহাম্মদকে নামাজ আদায় করতে দেখতে পাই, তাহলে তার গণ্ডদেশ ছিড়ে ফেলব। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর ৩০৩/৬, কুরতুবী ১৩২/১৯]

শানে নুযূল–৩ : অপর এক বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত উতবা বিন রবীআ ও ওলীদ বিন মুগীরা সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তারা রাসূল ﷺ -এর খেদমতে অনেক ধন সম্পদ ও সুন্দরী নারী এনে পেশ করে যাতে তিনি নবুয়তের দাবি প্রত্যাহার করেন। সেই দুই নরাধম সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

শানে নুযূল–৪ : মুকাতিল বলেন, বিবাহের প্রস্তাব করেছিল উতবা বিন রবীআহ। সে বলেছিল কুরাইশের মধ্যে আমার কন্যাই হচ্ছে একমাত্র সুন্দরী। সুতরাং তুমি নবুয়তের দাবি হতে সরে দাড়াও আমার এ কন্যাটি তোমার নিকট বিবাহ দিব। ওয়ালীদ বলল, তুমি যা করছ যদি ধন সম্পদের লালসায় করে থাক, তাহলে তোমাকে পরিতৃপ্ত করে আমি সম্পদ দান করব। আর এ পথ থেকে তুমি ফিরে আস। এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ১৩৩/১৯, রূহুল মা'আনী ২১০/২৯/১৫]

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلۡعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمۡ يَوۡمًا ثَقِيلًا ‎(٢٧)

শানে নুযূল -১ : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক মতামত রয়েছে। কারো মতে আলোচ্য আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে, ইহুদিরা রাসূল ﷺ -এর পরিচিতিকে গোপন করত তাঁর নবুয়তের হক্কানিয়াত ও সত্যতাকে অস্বীকার করত। তারা নগদ অর্থ সম্পদকে ভালোবাসত এবং রাসূল ﷺ-এর পরিচিতি ও নবুয়ত গোপন করে রাখার জন্য ঘুষ গ্রহণ করত। জাগতিক অর্থ সম্পদের প্রলোভনে ইহুদিদের সত্য গোপন রাখার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

শানে নুযূল -২ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। মুনাফিকেরাও জাগতিক ধন সম্ভারের প্রলোভনে পড়ে কুফরিকে গোপন করে রাখে। তাদের এহেন কপটতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১৩৪/১৯]

সূরা দাহরের অপর নাম সূরা 'ইনসান' ও সূরা 'আবরার'। –(রূহুল-মা'আনী)

এতে মানব সৃষ্টির আদি-অন্ত, কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি, কেয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর বিশুদ্ধ ও সাবলীল ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡـٔٗا مَّذۡكُورًا : هَلْ অব্যয়টি আসলে প্রশ্নবোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে কোনো জাজ্বল্যমান ও প্রকাশ্য বিষয়কে প্রশ্নের আকারে ব্যক্ত করা যায়, যাতে তার প্রকাশ্যতা আরও জোরদার হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, যাকেই জিজ্ঞাসা করবে, সে এ উত্তরই দিবে, অপর কোনো সম্ভাবনাই নেই। উদাহরণত ঃ কেউ দুপুরের সময় কাউকে জিজ্ঞাসা করে–এখন কি দিন নয়? এটা দৃশ্যতঃ প্রশ্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি যে একেবারে চরম জাজ্বল্যমান, তারই বর্ণনা। তাই এ ধরনের স্থানে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন যে, هَلْ অব্যয়টি এখানে قَدْ (বাস্তবিক নিশ্চয়তার) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাহোক, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উপর এমন দীর্ঘ এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন পৃথিবীতে তার নাম-নিশানা এমন কি, আলোচনা পর্যন্ত ছিল না। حِيْنٌ শব্দটিকে تَنْوِيْن সহ উল্লেখ করে সময়ের দীর্ঘতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত যে দীর্ঘ সময় মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে, তাতে তার কোনো না কোনো পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। নতুবা মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে–একথা বলা দুরস্ত হয় না। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এই দীর্ঘ সময়ের অর্থ মায়ের পেটে গর্ভ সঞ্চারের পর থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়, যা সাধারণতঃ নয় মাসে হয়ে থাকে। এতে মানব সৃষ্টির যত স্তর অতিবাহিত হয়–বীর্য থেকে দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রাণ সঞ্চার ইত্যাদি সব দাখিল আছে। এই সম্পূর্ণ সময়ে এক পর্যায়ে তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সে ছেলে, না মেয়ে তা কেউ জানে না। ফলে কোথাও তার কোনো আলোচনা পর্যন্ত হয় না। আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময়কে আরও বিস্তৃত অর্থ দেওয়া যেতে পারে। যে বীর্য থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা, সেই বীর্যও খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়। সেই খাদ্য এবং খাদ্যের পূর্ববর্তী উপকরণ কোনো না কোনো আকারে দুনিয়াতে ছিল। এই সময়কেও শামিল করলে আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময় হাজারো বছর হতে পারে। সারকথা, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দৃষ্টি এক নিগূঢ়তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। মানুষ যদি সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিরও অধিকারী হয় এবং এই তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে, তবে একদিকে তার নিজের স্বরূপ তার কাছে উদঘাটিত হয়ে যাবে এবং অপরদিকে স্রষ্টার অস্তিত্ব, জ্ঞান ও অপার শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না। যদি একজন সত্তর বছর বয়স্ক ব্যক্তি ধ্যান করে যে, এখন থেকে একাত্তর বছর পূর্বে তার কোনো নাম-নিশানা ছিল না, কোনো ভঙ্গিতেই কেউ তার সম্পর্কে কোনো আলোচনা করতে পারত না, পিতামাতা ও দাদা-দাদীর মনেও তার বিশেষ অস্তিত্বের কোনো আশঙ্কা পর্যন্ত ছিল না, তখন কি বস্তু তার আবিষ্কার ও সৃষ্টির কারণ হয়েছে এবং কোন বিস্ময়কর অপার শক্তি সারা বিশ্বে বিস্তৃত কণাসমূহকে তার অস্তিত্বে একত্রিত করে তাকে একজন হুঁশিয়ার, জ্ঞানী, শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান মানুষে রূপান্তরিত করেছে, তবে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথা বলতে বাধ্য হবে যে,

ما نبودیم وتقاضا ما نبود - لطف تو نا گفته ما می شنود

এরপর মানব সৃষ্টির সূচনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ إِنَّا خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ أَمۡشَاجٍ অর্থাৎ আমি মানুষকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। أَمْشَاجٌ শব্দটি مَشِيْجٌ-এর বহুবচন। অর্থ মিশ্র। বলাবাহুল্য এখানে নর ও নারীর মিশ্র বীর্য বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদ তাই বলেছেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে أَمْشَاجٌ বলে রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত–এই শারীরিক উপাদান চতুষ্টয় বোঝানো হয়েছে। এগুলো দিয়ে বীর্য গঠিত হয়।

প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের উপাদান ও কণা শামিল আছে ঃ চিন্তা করলে দেখা যায়, উপরিউক্ত শারীরিক উপাদান চতুষ্টয়ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে অর্জিত হয়। প্রত্যেক মানুষের খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা করলেও দেখা যায়, এতে দূর-দূরান্ত দেশ ও ভূখণ্ডের উপাদান পানি, বায়ু ইত্যাদির মাধ্যমে শামিল হয়। এভাবে একজন মানুষের বর্তমান শরীর বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে, এটা এমন উপাদান ও কণাসমূহের সমষ্টি, যা বিশ্বের আনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্ত ছিল।

সর্বশক্তিমানের অভাবনীয় ব্যবস্থা সেগুলোকে বিস্ময়করভাবে তার শরীরে একত্রিত করেছে। اَمْشَاجٍ -এর এই শেষোক্ত অর্থ অনুযায়ী এর দ্বারা কিয়ামত-অবিশ্বাসীদের সর্ববৃহৎ সন্দেহের অবসানও হয়ে যায়। কেননা এই নিরীশ্বরবাদীদের মতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পথে সর্ববৃহৎ অন্তরায় এটাই যে, মানুষ মরে মৃত্তিকায় পরিণত হয়, এরপর তা ধূলিকণা হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এসব কণাকে পুনরায় একত্র করা এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করা তাদের মতে যেন একেবারে অসম্ভব।

اَمْشَاجٍ -এর তাফসীরে তাদের এই সন্দেহের সুস্পষ্ট জবাব রয়েছে। কারণ মানুষের প্রথম সৃষ্টিতেও তো সারা বিশ্বের উপাদান ও কণাসমূহ শামিল ছিল। এই প্রথম সৃষ্টি যার জন্য কঠিন হলো না, পুনর্বার সৃষ্টি তার জন্য কঠিন হবে কেন?

نَبْتَلِيْهِ : এটা اِبْتِلَاءٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ পরীক্ষা করা। এই বাক্যে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তাকে পরীক্ষা করা, পরের আয়াতে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমি পয়গম্বর ও ঐশী গ্রন্থের মাধ্যমে তাকে পথ বলে দিয়েছি যে, এই পথ জান্নাতের দিকে এবং এই পথ জাহান্নামের দিকে যায়। এরপর তাকে ক্ষমতা দিয়েছি যে কোনো পথ অবলম্বন করার। সেমতে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا অর্থাৎ একদল তো তাদের স্রষ্টা ও নিয়ামতদাতাকে চিনে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু অপর দল অকৃতজ্ঞ হয়ে কাফের হয়ে গেছে। অতঃপর উভয়দলের প্রতিফল ও পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেরদের জন্যে রয়েছে শিকল, বেড়ী ও জাহান্নাম। আর ঈমান ও ইবাদত পালনকারীদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত নিয়ামত। সর্বপ্রথম পানীয় বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাত্র দেওয়া হবে, যাতে কাফুরের মিশ্রণ থাকবে। কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন ঃ কাফুর জান্নাতের একটি ঝরনার নাম। এই শরাবের স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি করার জন্যে তাতে এই ঝরনার পানি মিলানো হবে। যদি কাফুরের প্রসিদ্ধ অর্থ নেওয়া হয়, তবে জরুরি নয় যে, জান্নাতের কাফুর দুনিয়ার কাফুরের ন্যায় অখাদ্য হবে। বরং সেই কাফুরের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হবে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ : عَيْنًا শব্দটি كَافُوْرًا -এর بَدَل ও হতে পারে। এমতাবস্থায় এটা নির্দিষ্ট যে, আয়াতে কাফূর বলে জান্নাতের ঝরনাই বোঝানো হয়েছে। عِبَادُ اللّٰهِ বলে আল্লাহর সেসব নেক বন্দাকেই বোঝানো হয়েছে, ইতঃপূর্বে যাদেরকে اَبْرَارٌ বলা হয়েছিল। পক্ষান্তরে যদি عَيْنًا শব্দটি مِنْ كَاْسٍ -এর بَدَل হয়, তবে এটা অন্য কোনো ঝরনা ও পানির বর্ণনা হবে। এমতাবস্থায় عِبَادُ اللّٰهِ -এর অর্থ হবে اَبْرَارٌ থেকে নিম্নস্তরের অন্য কোনো দল।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ এতে বিধৃত হয়েছে যে, সৎকর্মশীল বান্দাগণকে এসব নিয়ামত কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর ওয়াস্তে যে কাজের মানত করে, তা পূর্ণ করে। نَذْرٌ -এর শাব্দিক অর্থ নিজের জন্যে এমন কোনো কাজ ওয়াজিব করে নেয়, যা শরিয়তের তরফ থেকে তার দায়িত্ব ওয়াজিব নয়। এরূপ মানত পূর্ণ করা শরিয়তের আইনে ওয়াজিব। এখানে মানত পূর্ণ করাকে জান্নাতীদের মহান প্রতিদান ও অফুরন্ত নিয়ামত লাভের কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা যখন নিজেদের ওয়াজিব করা বিষয় পালনে যত্নবান, তখন যে সব ফরজ-ওয়াজিব কর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো পালনে আরও উত্তমরূপে যত্নবান হবে। এভাবে মানত পূর্ণ করার মধ্যে সকল ওয়াজিব ও ফরজ কর্ম পালনের বিষয় শামিল হয়ে গেছে। ফলে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ লাভের পূর্ণ কারণ হবে পূর্ণ আনুগত্য এবং ফরজ ও ওয়াজিব কর্মসমূহ সম্পাদন। তবে মানত পূর্ণ করা যে ওয়াজিব ও গুরুত্বপূর্ণ, তা এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

মাস'আলা : কয়েকটি শর্তসাপেক্ষ মানত হয়ে থাকে ১. যে কাজের মানত করা হয় তা জায়েজ ও হালাল হওয়া চাই এবং গুনাহ না হওয়া চাই। কেউ কোনো নাজায়েজ কাজের মানত করলে তা পূর্ণ না করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা আদায় করতে হবে। ২. কাজটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াজিব না হওয়া চাই। সেমতে কোনো ব্যক্তি ফরজ নামাজ অথবা ওয়াজিব বেতেরের মানত করলে তা মানত হবে না।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আরও একটি শর্ত এই যে, যেসব ইবাদত শরিয়তে ওয়াজিব করা হয়েছে, সেই জাতীয় কাজের মানত করতে হবে, যেমন নামাজ-রোজা, সদকা, কুরবানি ইত্যাদি। যে জাতীয় কাজের কোনো ইবাদত শরিয়তে উদ্দিষ্ট নয়, সেই জাতীয় কোনো মানত করলে তা পূর্ণ করা জরুরি হয় না; যেমন কোনো রুগ্ণ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া অথবা জানাজার পশ্চাৎগমন ইত্যাদি। এগুলো ইবাদত হলেও উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا : অর্থাৎ জান্নাতীদের এসব নিয়ামত এ কারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিদেরকে আহার্য দান করত। عَلٰى حُبِّهٖ -এর মর্মার্থ এই যে, তারা শুধু নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার্যই দরিদ্রদেরকে দান করে না ; বরং নিজেদের প্রয়োজন সত্ত্বেও দান করে। দরিদ্র ও এতিমদেরকে আহার্য দেওয়া যে ইবাদত, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। বন্দি বলে এমন বন্দি বোঝানো হয়েছে, যাকে শরিয়তের নীতি অনুযায়ী বন্দি করা হয়েছে–সে কাফের হোক অথবা মুসলমান অপরাধী। বন্দিকে খাওয়ানো ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কেউ বন্দিকে আহার্য দিলে সে যেন সরকার ও বায়তুল মালকে সাহায্য করে। তাই বন্দি কাফের হলেও তাকে খাওয়ানো ছওয়াবের কাজ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বন্দিদেরকে খাওয়ানো ও তাদের হেফাজতের দায়িত্ব সাধারণ মুসলমানদের উপর বণ্টন করে অর্পণ করা হতো। বদর যুদ্ধের বন্দিদের বেলায় তাই করা হয়েছিল।

قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ : দুনিয়ার রৌপ্য-পাত্র গাঢ় ও মোটা হয়ে থাকে- আয়নার মতো স্বচ্ছ হয় না। পক্ষান্তরে কাঁচ নির্মিত পাত্র রৌপ্যের মতো শুভ্র হয় না। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে, কিন্তু জান্নাতের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানকার রৌপ্য আয়নার মতো স্বচ্ছ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ জান্নাতের সব বস্তুর নজির দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। তবে দুনিয়ার রৌপ্য নির্মিত গ্লাস ও পাত্র জান্নাতের পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ নয়।

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا : زَنْجَبِيْلُ -এর প্রসিদ্ধ অর্থ শুঁঠ বা শুকনা আদা। আরবরা শরাবে এর মিশ্রণ পছন্দ করত। তাই জান্নাতেও একে পছন্দ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ জান্নাতের বস্তু ও দুনিয়ার বস্তু নামেই কেবল অভিন্ন। বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাই দুনিয়ার আদার আলোকে জান্নাতের আদাকে বুঝার উপায় নেই।

وَحُلُّوا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ : اَسَاوِرُ শব্দটি سِوَارٌ -এর বহুবচন। অর্থ কংকন যা হাতে পরিধান করার অলংকারবিশেষ। এই আয়াতে রূপার কংকন এবং অন্য এক আয়াতে স্বর্ণের কংকন উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা কোনো সময় রূপার এবং কোনো সময় স্বর্ণের কংকন ব্যবহৃত হতে পারে, অথবা কেউ রূপার এবং কেউ স্বর্ণের ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এখানে কথা থাকে এই যে, কংকন নারীদের ব্যবহারের অলংকার। পুরুষদের জন্য এরূপ অলংকার পরিধান করা সাধারণত দূষণীয়। জবাব এই যে, কোনো অলংকার নারীদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া এবং পুরুষদের জন্য দূষণীয় হওয়া– এটা সর্বতোভাবে প্রচলন ও অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কোনো কোনো দেশে অথবা জাতিতে যে জিনিস দূষণীয়, অন্য জাতিতে তাই পছন্দনীয় হয়ে থাকে। পারস্য সম্রাটগণ হাতে কংকন পরিধান করতেন এবং বুকে ও মুকুটে অলংকারাদি ব্যবহার করতেন। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য ও সম্মানরূপে গণ্য হতো। পারস্য সাম্রাজ্য বিজিত হওয়ার পর সম্রাটদের যে ধনভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাতে রাজকীয় কংকনও ছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সামান্য ভৌগোলিক ও জাতিগত তফাতের কারণে যখন এরূপ হতে পারে, তখন জান্নাতকে দুনিয়ার আলোকে দেখার কোনো মানে থাকতে পারে না। জান্নাতে অলংকারাদি পুরুষদের জন্যও উত্তম বিবেচিত হবে।

اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا : অর্থাৎ জান্নাতীরা যখন জান্নাতে পৌঁছে যাবে, তখন আল্লাহর তরফ থেকে বলা হবে ঃ জান্নাতের এসব বিস্ময়কর অবদানসমূহ তোমাদের দুনিয়াতে কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান এবং তোমাদের প্রচেষ্টা আল্লাহর কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। এসব বাক্য মোবারকবাদ হিসাবে বলা হবে। আশেক ও প্রেমিকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, জান্নাতের সব নিয়ামত একদিকে এবং রাব্বুল আলামীনের এই উক্তি একদিকে; নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে বড় নিয়ামত। কারণ এতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তুষ্টির সনদ বিতরণ করেছেন। সাধারণ জান্নাতীদের নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করার পর অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ নিয়ামত হচ্ছে কুরআন অবতরণ। এই মহান নিয়ামত উল্লেখ করার পর প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধী কাফেররা যে অস্বীকার, হঠকারিতা ও নানাভাবে আপনাকে হয়রানি করে, তজ্জন্য আপনি সবর করুন। এছাড়া দিবারাত্রি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকুন। এর মাধ্যমেই কাফেরদের হয়রানিরও অবসান হবে।

পরিশেষে কাফেরদের হঠকারিতার এই কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই মূর্খরা পার্থিব ধ্বংসশীল ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পরিণাম অর্থাৎ পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। অথচ আমি দুনিয়াতেও খোদ তাদের অস্তিত্বে এমন উপকরণ রেখেছিলাম, যে সম্পর্কে চিন্তা করলে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারতো। বলা হয়েছে, نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ অর্থাৎ আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন প্রকৃতি মজবুত ও সুদৃঢ় করেছি।

মানবদেহের গ্রন্থিতে কুদরতের অপূর্ব লীলা : এই আয়াতের ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ তার এক এক গ্রন্থি সম্পর্কে ভেবে দেখুক। উপযোগিতা ও আরামের খাতিরে দৃশ্যত এগুলো নরম ও নাজুক মনে হয় এবং নরম নরম মাংসপেশী দ্বারা পরস্পরে সংযুক্ত আছে। ফলে স্বভাবত এক-দুই বছরেই গ্রন্থির এই বন্ধন ও মাংসপেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার কথা ছিল; বিশেষত যখন এগুলো সারাক্ষণ নড়াচড়া এবং বাঁকানো মোড়ানোর মধ্যেই থাকে। এভাবে দিবারাত্র নড়াচড়ার মধ্যে থাকলে তো লোহার স্প্রিংও এক-দুই বছরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এসব নরম ও নাজুক মাংসপেশী কিভাবে দেহের গ্রন্থিসমূহকে বেঁধে রেখেছে! এগুলো না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, না ভেঙ্গে যায়। হাতের অঙ্গুলীর গ্রন্থিগুলোই দেখুন এবং হিসাব করুন, সারা জীবনে এরা কতবার নড়াচড়া করেছে এবং কেমন কেমন জোর ও চাপ এদের উপর পড়েছে। ইস্পাতের তৈরি হলেও এতো দিনে ক্ষয় হয়ে যেত। কিন্তু সত্তর-আশি বছর চালু থাকার পরও এগুলো সগর্বে অক্ষত আছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَتٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ء ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– অতীত হয়েছে, এসেছে।

نَبْتَلِيْهِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِلَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি তাকে বিধানাধীন করেছি।

يُفَجِّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَفْجِيْرٌ মূলবর্ণ (ف - ج - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে।

مُسْتَطِيْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِطَارٌ মূলবর্ণ (ط - ى - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– সর্বব্যাপী হবে।

اَمْشَاجٍ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে مَشِيْجٌ ، مَشْجٌ অর্থ– সংমিশ্রিত।

عَبُوْسًا : মাসদার। বাব ضَرَبَ অর্থ– মলিন মুখ, ভ্রুকুটিপূর্ণ, কঠোর, রূঢ়, মাথা ঘুরানো, চিটি করা।

قَمْطَرِيْرًا : অর্থ– তিক্তকর। দুঃখ কষ্টের দীর্ঘ সময় অর্থাৎ কিয়ামত দিবস।

نَضْرَةً : ইসমে মানসূব। নাকেরাহ। অর্থ– স্ফূর্তি। সজীবতা, লাবণ্য।

دَانِيَةً : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّنُوُّ মূলবর্ণ (د - ن - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ঝুঁকে থাকবে। নিকটবর্তী। কাছাকাছি। ঝুলন্ত।

ذُلِّلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَذْلِيْلٌ মূলবর্ণ (ذ - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আয়ত্তাধীন থাকবে।

سَلْسَبِيْلَ : জান্নাতের একটি ঝরনার নাম। যার অর্থ হলো, পরিষ্কার পানি।

وِلْدَانٌ : অর্থ– জান্নাতের গিলমান, জান্নাতী বালকবৃন্দ।

حُلُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْلِيَةً মূলবর্ণ (ح - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তাদেরকে সজ্জিত করা হবে, ভূষিত করা হবে।

تَشَاءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং اجوف يائى) অর্থ– তোমরা ইচ্ছা করতে পার।

مَنْثُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার نَثْرٌ মূলবর্ণ (ن - ث - ر) জিনস صحيح অর্থ– বিক্ষিপ্ত।

اَسَاوِرَ : سِوَارٌ-এর বহুবচন। অর্থ– বালা, চুড়ি। কঙ্কন।

مَشْكُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার شُكْرٌ মূলবর্ণ (ش - ك - ر) জিনস صحيح অর্থ– মকবুল হয়েছে।

شِئْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مهموز لام এবং اجوف يائى) অর্থ– আমি ইচ্ছা করি।

بَدَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْدِيْلٌ মূলবর্ণ (ب - د - ل) জিনস صحيح অর্থ– পরিবর্তন করে দিব।

اِتَّخَذَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (ا - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– অবলম্বন করুক।

يُدْخِلُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْخَالٌ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– অন্তর্ভুক্ত করেন।

ظَالِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার ظُلْمٌ মূলবর্ণ (ظ - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– জালিমদের জন্য।

أَعَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْدَادٌ মূলবর্ণ (ع - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রস্তুত করে রেখেছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর اَلْاَبْرَارَ হলো اسم ان আর يَشْرَبُوْنَ বাক্যটি হলো خبر ان আর مِنْ كَاْسٍ টা يَشْرَبُوْنَ-এর সাথে متعلق আর يَشْرَبُوْنَ-এর মাফউল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ خَمْرًا مِنْ كَاْسٍ আর كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا বাক্যটি كَاْسٍ-এর সিফত হয়েছে। আর كَانَ হলো ফে'লে নাকেস, আর مِزَاجُهَا হলো اسم كان আর كَافُوْرًا হলো خبر كان –[ই'রাবুল কুরআন অষ্টম খণ্ড, পৃ. ১৬২-১৬৩]

سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা মুরসালাত

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫০, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. সে সমস্ত বায়ুর শপথ, যা হিত সাধনের জন্য প্রেরিত হয়।	وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ﴿۱﴾
২. অনন্তর ঐ বায়ুর, যা প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়।	فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ﴿۲﴾
৩. এবং ঐ সমস্ত বায়ুর, যা মেঘরাশিকে ছড়িয়ে দেয়।	وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ﴿۳﴾
৪. অনন্তর ঐ সমস্ত বায়ুর, যা মেঘরাশিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।	فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ﴿۴﴾
৫. অনন্তর ঐ সমস্ত বায়ুর, যা উদ্রেক করে আল্লাহর স্মরণ।	فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۵﴾
৬. অর্থাৎ তওবা কিংবা ভয়ের।	عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ﴿۶﴾
৭. তোমাদেরকে যে বস্তুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবধারিত।	اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ؕ﴿۷﴾
৮. অতএব, যখন নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে।	فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۙ﴿۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالْمُرْسَلٰتِ সে সমস্ত বায়ুর শপথ عُرْفًا যা হিত সাধনের জন্য প্রেরিত হয়।

২. فَالْعٰصِفٰتِ অনন্তর ঐ বায়ুর, যা প্রবাহিত হয় عَصْفًا প্রবলবেগে।

৩. وَالنّٰشِرٰتِ এবং ঐ সমস্ত বায়ুর। نَشْرًا যা মেঘরাশিকে ছড়িয়ে দেয়।

৪. فَالْفٰرِقٰتِ অনন্তর ঐ সমস্ত বায়ুর فَرْقًا যা মেঘরাশিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

৫. فَالْمُلْقِيٰتِ অনন্তর ঐ সমস্ত বায়ুর, যা উদ্রেক করে। ذِكْرًا আল্লাহর স্মরণ।

৬. عُذْرًا অর্থাৎ তওবা। اَوْ نُذْرًا কিংবা ভয়ের।

৭. اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ তোমাদেরকে যে বস্তুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে لَوَاقِعٌ তা অবধারিত।

৮. فَاِذَا النُّجُوْمُ অতএব, যখন নক্ষত্র সমূহ طُمِسَتْ জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে।

৯. আর যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে,	وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾
১০. আর যখন পর্বতমালা উড়ে বেড়াবে,	وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾
১১. এবং যখন সমস্ত রাসূলগণকে এক নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত করা হবে।	وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ﴿١١﴾
১২. [তখন সকলের মীমাংসা হবে। তোমরা কি জান] কোন দিনের জন্য পয়গম্বরদের মু'য়ামালা মুলতবি রাখা হয়েছে?	لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ﴿١٢﴾
১৩. মীমাংসার দিনের জন্য।	لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾
১৪. আপনি কি জানেন, সে মীমাংসার দিনটি কেমন?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾
১৫. ঐ দিন অবিশ্বাসীদের সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾
১৬. আমি কি পূর্বকালের [কাফের] লোকদেরকে ধ্বংস করিনি?	اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. অতঃপর পরবর্তীদেরকেও তাদেরই অনুগামী করে দিব।	ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. [হে রাসূল!] আমি অপরাধীদের সাথে এরূপই করে থাকি।	كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾
১৯. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড় সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَاِذَا السَّمَآءُ আর যখন আসমান فُرِجَتْ বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

১০. وَاِذَا الْجِبَالُ আর যখন পর্বতমালা نُسِفَتْ উড়ে বেড়াবে।

১১. وَاِذَا الرُّسُلُ এবং যখন সমস্ত রাসূলগণকে اُقِّتَتْ এক নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত করা হবে।

১২. لِاَيِّ يَوْمٍ কোন দিনের জন্য اُجِّلَتْ পয়গম্বরদের মু'য়ামালা-মুলতবি রাখা হয়েছে।

১৩. لِيَوْمِ الْفَصْلِ মীমাংসার দিনের জন্য।

১৪. وَمَآ اَدْرٰىكَ আপনি কি জানেন مَا يَوْمُ الْفَصْلِ সে মীমাংসার দিনটি কেমন?

১৫. وَيْلٌ সর্বনাশ হবে يَّوْمَئِذٍ ঐ দিন لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের।

১৬. اَلَمْ نُهْلِكِ আমি কি ধ্বংস করিনি الْاَوَّلِيْنَ পূর্বকালের লোকদেরকে।

১৭. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ অতঃপর তারই অনুগামী করে দিব الْاٰخِرِيْنَ পরবর্তীদেরকেও।

১৮. كَذٰلِكَ এরূপই نَفْعَلُ আমি করে থাকি بِالْمُجْرِمِيْنَ অপরাধীদের সাথে।

১৯. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ হবে يَّوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের।

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
২০. আমি কি তোমাদেরকে এক ঘৃণিত পানি দ্বারা [অর্থাৎ শুক্রবিন্দু দ্বারা] সৃষ্টি করিনি?	أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾
২১. অনন্তর আমি তাকে এক সুরক্ষিত স্থানে [অর্থাৎ মাতৃগর্ভে] রেখেছি।	فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾
২২. এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।	إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾
২৩. ফলকথা, আমি একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছি, অতএব, আমি কেমন উত্তম পরিমাণ নির্ধারণকারী।	فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড় সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾
২৫. আমি কি জমিনকে সমবেতকারী করিনি।	أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾
২৬. জীবিতদের এবং মৃতদের?	أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا ﴿٢٦﴾
২৭. আর আমি তাতে সুউচ্চ পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি, আর আমি তোমাদেরকে সুমিষ্ট পানি পান করিয়েছি।	وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَٰمِخَٰتٍ وَأَسْقَيْنَٰكُم مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾
২৮. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড় সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾
২৯. [আর কাফেরদেরকে কিয়ামত দিবসে বলা হবে যে,] তোমরা সেই আজাবের দিকে চল যা তোমরা অবিশ্বাস করতে।	ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. أَلَمْ نَخْلُقكُّم আমি কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ এক ঘৃণিত পানি দ্বারা।

২১. فَجَعَلْنَٰهُ অনন্তর আমি তাকে রেখেছি فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ এক সুরক্ষিত স্থানে।

২২. إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

২৩. فَقَدَرْنَا ফলকথা, আমি একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছি فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ অতএব, আমি কেমন উত্তম পরিমাণ নির্ধারণকারী।

২৪. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ يَوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِينَ অবিশ্বাসীদের।

২৫. أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ আমি কি জমিনকে করিনি كِفَاتًا সমবেতকারী।

২৬. أَحْيَآءً জীবিতদের وَأَمْوَٰتًا এবং মৃতদের।

২৭. وَجَعَلْنَا فِيهَا আর আমি তাতে সৃষ্টি করেছি رَوَٰسِىَ شَٰمِخَٰتٍ সুউচ্চ পর্বতমালা وَأَسْقَيْنَٰكُم আর আমি তোমাদেরকে পান করিয়েছি مَّآءً فُرَاتًا সুমিষ্ট পানি।

২৮. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ يَوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِينَ অবিশ্বাসীদের।

২৯. ٱنطَلِقُوٓا۟ তোমরা সেই আজাবের দিকে চল إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ যা তোমরা অবিশ্বাস করতে।

৩০. তোমরা একটি শামিয়ানার দিকে চল যার তিনটি শাখা আছে।	اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾
৩১. যাতে না [শীতল] ছায়া আছে, আর না তা উত্তাপ হতে রক্ষা করে।	لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾
৩২. তা অট্টালিকাতুল্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করতে থাকবে।	اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾
৩৩. তা পীতাভ কালো বর্ণের উষ্ট্র শ্রেণি সদৃশ।	كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾
৩৪. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড় বিনাশ হবে।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. এটা সেদিন হবে, যেদিন তারা কথা বলতেও পারবে না।	هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং তাদের জন্য [ওজর পেশ করার] অনুমতিও থাকবে না, বস্তুত ওজরও করতে পারবে না।	وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড়ই বিনাশ হবে।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. [তাদেরকে বলা হবে] এই হলো মীমাংসার দিন, আমি তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তীদেরকে [মীমাংসার জন্য] একত্র করেছি।	هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. অতএব, যদি তোমাদের নিকট [এ মীমাংসা হতে রক্ষা পাওয়ার] কোনো তদবির থাকে, তবে আমার উপর সে তদবির চালাও।	فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾
৪০. সেদিন অবিশ্বাসীদের জন্য বড় সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. اِنْطَلِقُوْٓا তোমরা চল اِلٰى ظِلٍّ একটি শামিয়ানার দিকে ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ যার তিনটি শাখা আছে।
৩১. لَّا ظَلِيْلٍ যাতে না ছায়া আছে وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ আর না তা উত্তাপ হতে রক্ষা করে।
৩২. اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করতে থাকবে كَالْقَصْرِ বড় বড় অট্টালিকাতুল্য।
৩৩. كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ তাপীতাভ কালো বর্ণের উষ্ট্র শ্রেণি সদৃশ।
৩৪. وَيْلٌ বড় বিনাশ يَّوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের।
৩৫. هٰذَا يَوْمُ এটা সেদিন হবে لَا يَنْطِقُوْنَ যেদিন তারা কথা বলতেও পারবে না।
৩৬. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ এবং তাদের জন্য অনুমতিও থাকবে না فَيَعْتَذِرُوْنَ বস্তুত ওজরও করতে পারবে না।
৩৭. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ يَّوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের।
৩৮. هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ এই হলো মীমাংসার দিন جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ আমি তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তীদেরকে একত্র করেছি।
৩৯. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ অতএব যদি তোমাদের নিকট কোনো তদবির থাকে فَكِيْدُوْنِ তবে আমার উপর সেই তদবির চালাও।
৪০. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ يَّوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের।

৪১. মুত্তাকীগণ ছায়াসমূহ এবং ঝরনাসমূহের মধ্যে থাকবে।	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾
৪২. এবং বাঞ্ছিত ফলসমূহের প্রাচুর্যের মধ্যে থাকবে।	وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾
৪৩. [এবং বলা হবে] তোমাদের আমলসমূহের প্রতিদানে পরম আনন্দে পানাহার কর।	كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾
৪৪. আমি নেককারদেরকে এরূপ প্রতিদানই প্রদান করে থাকি।	إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾
৪৫. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড় সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾
৪৬. তোমরা [দুনিয়াতে] আরো কিছুকাল খেয়ে নাও এবং উপভোগ করে নাও, [কিন্তু মনে রেখো, অচিরেই তোমাদের দুর্ভাগ্য আসবে। কেননা] নিঃসন্দেহে তোমরা অপরাধী।	كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾
৪৭. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড় সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর যখন তাদেরকে বলা হয় বিনত হও, [অর্থাৎ ঈমান এনে তাঁর বন্দেগি কর] তখন তারা বিনত হয় না।	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾
৪৯. সেদিন অবিশ্বাসীদের বড় সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾
৫০. তবে এটার [কুরআনের] পর তারা আর কোন বাণীর উপর ঈমান আনবে?	فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. إِنَّ الْمُتَّقِينَ মুত্তাকীগণ থাকবে فِي ظِلَٰلٍ ছায়াসমূহ وَعُيُونٍ এবং ঝরনাসমূহের মধ্যে।

৪২. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ এবং বাঞ্ছিত ফলসমূহের প্রাচুর্যের মধ্যে থাকবে।

৪৩. كُلُوا وَاشْرَبُوا পানাহার কর هَنِيئًا পরম আনন্দে بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমাদের আমলসমূহের প্রতিদানে।

৪৪. إِنَّا كَذَٰلِكَ আমি এরূপেই نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ নেককারদেরকে প্রতিদান প্রদান করে থাকি।

৪৫. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ يَوْمَئِذٍ সেদিন হবে لِّلْمُكَذِّبِينَ অবিশ্বাসীদের।

৪৬. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا তোমরা (দুনিয়াতে) আরো কিছুকাল খেয়ে নাও এবং উপভোগ করে নাও إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ নিঃসন্দেহে তোমরা অপরাধী।

৪৭. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ يَوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِينَ অবিশ্বাসীদের।

৪৮. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ আর যখন তাদেরকে বলা হয় ارْكَعُوا বিনত হও لَا يَرْكَعُونَ তখন তারা বিনত হয় না।

৪৯. وَيْلٌ বড় সর্বনাশ يَوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِينَ অবিশ্বাসীদের।

৫০. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ তবে কোন বাণীর উপর بَعْدَهُ এরপর يُؤْمِنُونَ ঈমান আনবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ اَلْمُرْسَلٰتِ অবলম্বনে। এতে ২টি রুকূ', ৫০টি আয়াত, ১৮১টি শব্দ ও ৮১৬টি অক্ষর রয়েছে। একে সূরাতুল আরাফও বলা হয়। -[নূরুল কুরআন]

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়। কেননা সূরার বিষয়বস্তু হতে প্রমাণিত হয় যে, এটা মক্কায়ই অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন, পরকাল ও মহাবিচার দিন– হাশরের কথা। ১-৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহাপ্রলয় কিয়ামত সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শনে মৃদু বায়ু, প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু, মেঘ সঞ্চালনকারী বায়ু এবং মেঘ পরিচালনাকারী বায়ুর শপথ করে বলেছেন, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী ও অবশ্যই ঘটিতব্য ব্যাপার। কেননা প্রথমে আল্লাহ মানব কল্যাণে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহ করে তাকে ক্রমান্বয়ে সতেজ, প্রচণ্ড ও ঘূর্ণিবায়ুতে পরিণত করেন। অতঃপর বায়ু দ্বারা কালো আঁধারময় মেঘমালা নিয়ে আসেন। ফলে ধরণীর উপরে মুষলধারে বৃষ্টি বষর্ণ হয় এবং গাছপালা, উদ্ভিদ ও ঘরবাড়িকে মথিত ও লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এ প্রলয় সৃষ্টি মুহূর্তে মু'মিন বান্দাদের মনে আল্লাহর স্মরণ জেগে উঠে এবং বেঈমান কাফেরদের মনে সৃষ্টি হয় অনুশোচনা অথবা ভীতি। মহাক্ষমতাবান আল্লাহ যখন এ প্রলয়ঙ্কারী ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেন তদ্রূপ এ পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করায়ও তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

৮-১৫ নং আয়াতে সে মহাপ্রলয় তথা কিয়ামত সংঘটনের আংশিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে– ঊর্ধ্বলোকের সমস্ত ব্যবস্থাপনা সেদিন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ স্খলিত হয়ে আলোহীন হয়ে পড়বে। আকাশ ফেটে যাবে। পর্বতমালা পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। আর সেদিন সমস্ত নবী-রাসূলগণকে সাক্ষীর জন্য সমবেত করা হবে যাদের কথা কাফেরগণ অবিশ্বাস করেছে। সেদিনটি হলো বিচার দিন এবং চূড়ান্ত ফয়সালার দিন। এ দিনটির মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পক্ষে খুবই ভয়াবহ ও দুর্গতির দিন হবে। তাদের দুঃখ-কষ্টের কোনো সীমা থাকবে না।

১৬-৪০ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত ও পুনরুজ্জীবনের সম্ভাব্যতার অনুকূলে মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে এবং দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে যুক্তিরূপে উপস্থাপিত করেছেন। বলা হয়েছে– নগণ্য এক বিন্দু পানি যা এ ভূমির উৎপাদিত উপকরণে পরিণত করেছেন। তাকে নির্দিষ্ট একটি সময় নারীর গর্ভাশয়ে রেখে একটি অভিনব পূর্ণ অবয়বরূপী মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তার প্রয়োজনে কত অফুরন্ত সম্পদ ভূমির বুক চিরে বের হয়ে থাকে। আবার সবই সে ভূমির বুকেই লয় হয়। মানুষের লাশটিও সেই ভূমির বুকেই স্থান পায়। সুতরাং যে একক অনন্য শক্তিধর সত্তা এটা করতে সক্ষম হলেন, তিনি মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না; এটা কোনো নির্বোধ লোকও স্বীকার করবে না। যারা এ কিয়ামত ও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী হবে না তাদের পরকালে দুঃখের সীমা থাকবে না। প্রচণ্ড সূর্যতাপে তারা ছায়া খুঁজতে থাকবে। সেদিন জাহান্নামের ধুম্রকে কুণ্ডলীর আকারে দেখতে পেয়ে তারা তার তলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটাছুটি করবে; কিন্তু মূলত তার ছায়া না হবে শীতল, আর না পারবে সূর্যতাপকে বাধা দান করতে। তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা ও দুর্গতির সীমা থাকবে না। তাদের অপরাধ যখন আল্লাহর আদালতে প্রমাণ হবে তখন তাদের ওজর-আপত্তি করার বা কথা বলার কোনো অবকাশ থাকবে না। এ দিনই হবে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন।

৪১-৫০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঐ দিন মুত্তাকী-পরহেজগার লোকগণ মহাশান্তিতে থাকবে। জান্নাতে মনের স্বাদ মিটিয়ে ফলমূল আহার করবে এবং চিরস্থায়ীভাবে পরম আনন্দে কাল কাটাবে।

উপসংহারে আল্লাহ কাফেরগণকে ধমক দিয়ে বলেছেন, তোমরা অপরাধী ও জালিম- এ দুনিয়ায় কয়েকটি দিন স্বাদ আস্বাদন করে নাও, পরকালে পাবে আসল সাজা। তোমাদের উচিত কিয়ামত ও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী হওয়া। এ কুরআনই যদি তোমাদেরকে হেদায়েত করতে না পারে, তবে কোন গ্রন্থ তোমাদেরকে হেদায়েত করতে পারবে?

সূরাটির শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বুখারী শরীফে একটি বর্ণনা এই মর্মে পাওয়া যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমরা একদা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে লাইলাতুল জিন -এ (اَلَيْلَةُ الْجِنِّ) ভ্রমণ করছিলাম। মিনা নামক স্থানের একটি গর্তে আমরা উপনীত হলাম। ইত্যবসরেই সূরা وَالْمُرْسَلٰتِ অবতীর্ণ হলো। রাসূলে কারীম ﷺ সূরা আল-মুরসালাত পড়ছিলেন এবং হযরতের মুখ এটার পবিত্র তেলাওয়াতের অবস্থায় একটু রসাল হয়ে উঠল। শুনে আমিও তেলাওয়াত শুরু করলাম। হঠাৎ একটি সাপ এসে আমাদের আক্রমণ করল। হুযূর ﷺ বললেন, একে হত্যা করো। তখনই আমরা তার প্রতি আক্রমণ করলে তা পলায়ন করল। তখন হুযূর

ﷺ বললেন, যেভাবে তোমরা উক্ত সর্পের ক্ষতিগ্রস্ত হতে রক্ষা পেলে সেও তোমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল। (মা'আরিফ, ইবনে কাছীর, সাবী) কারো কারো মতে, এটা মক্কা শরীফে প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে একটি।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আদ-দাহারে মানবজাতির ইতিবৃত্ত স্থান পেয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এমনও সময় ছিল যখন মানুষ উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না, আল্লাহ তা'আলাই তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। আর অত্র সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে এবং কিয়ামতের যে কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে। -[নূরুল কুরআন]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٤٨)

শানে নুযূল : এই আয়াত ছাকীফ গোত্রের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা যখন নবী করীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল, তখন নবীজি ﷺ তাদেরকে নামাজ শিক্ষা দিলেন। তাদেরকে নির্দেশ দিলেন নামাজ আদায় কর। তারা তখন বলল আমরা রুকূ' করতে পারব না। কারণ তা আমাদের জন্য অসম্মানজনক। কেননা মানুষ সোজা হয়েই জন্ম নেয়, কিন্তু যখন তারা নত হয় তখন তাদেরকে মনে হয় কোনো গাভী বা বলদ। তাতে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, সে ধর্ম মঙ্গলজনক হতে পারে না যার মাঝে নত হওয়া অর্থাৎ রুকূ' সেজদা না থাকে। -[তাফসীরে আযীযি ৩৫৮, কানযুন নুকূল ১০৬]

এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি বস্তুর শপথ করে কেয়ামতের নিশ্চিত আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই বস্তুগুলোর নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তবে সেগুলোর স্থলে এ পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে – مُرْسَلَاتٌ -عَاصِفَاتٌ – نَاشِرَاتٌ – فَارِقَاتٌ – اَلذِّكْرُ : مُلْقِيَاتٌ কিন্তু এগুলো কার বিশেষণ, কোনো হাদীসে তা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই এ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বিভিন্নরূপ তাফসীর বর্ণিত আছে।

কারো কারো মতে এগুলো সব ফেরেশতাগণের বিশেষণ। সম্ভবতঃ ফেরেশতাগণের বিভিন্ন দল এসব বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত। কেউ কেউ এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ বায়ু বিভিন্ন প্রকার ও গুণের হয়ে থাকে। ফলে বায়ুরও এসব বিভিন্ন বিশেষণ হতে পারে। কেউ কেউ স্বয়ং পয়গম্বরগণকে এসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। এ কারণেই ইবনে জারীর এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকাকে অধিকতর নিরাপদ ঘোষণা করে বলেছেন ঃ সবই হতে পারে, কিন্তু আমরা কোনকিছু নির্দিষ্ট করি না।

এতে সন্দেহ নেই যে, এখানে উল্লিখিত পাঁচটি বিশেষণের মধ্যে কয়েকটি ফেরেশতাগণের সাথেই অধিক খাপ খায় এবং তাদের জন্যই উপযুক্ত। এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ করা হলে টানা-হেঁচড়া ও সদর্থের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। পক্ষান্তরে কতক বিশেষণ এমন যে, এগুলো বায়ুর সাথেই অধিক খাপ খায়। এগুলোকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে সদর্থ করা ছাড়া শুদ্ধ হয় না। তাই এ স্থলে ইবনে কাসীরের ফয়সালাই উত্তম মনে হয়। তিনি বলেছেন, প্রথমোক্ত তিনটি বায়ুর বিশেষণ। এগুলোতে বায়ুর শপথ করা হয়েছে এবং শেষোক্ত দুটি ফেরেশতাগণের বিশেষণ। এগুলোতে ফেরেশতাগণের শপথ করা হয়েছে।

বায়ুর বিশেষণ করা হলে শেষোক্ত দুই বিশেষণে যে সদর্থ করা হয়, তা আপনি তাফসীরের সার-সংক্ষেপে দেখেছেন। কেননা এতে এই মত অবলম্বন করেই তাফসীর করা হয়েছে। এমনিভাবে এগুলোকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে প্রথমোক্ত তিনটি বিশেষণ مُرْسَلَاتٌ - عَاصِفَاتٌ ও نَاشِرَاتٌ-কে ফেরেশতাগণের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য এমনি ধরনের সদর্থের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইবনে কাছীরের মতানুযায়ী আয়াতসমূহের অর্থ এই : প্রেরিত বায়ুসমূহের কসম। عُرْفًا-এর অর্থ কল্যাণের জন্য। বলা বাহুল্য, বৃষ্টি নিয়ে আগমনকারী বায়ু কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। عُرْفًا-এর অপর অর্থ একের পর একও হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে সব বায়ু মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ে একের পর এক অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়। عَاصِفَاتٌ - শব্দটি عَصْفٌ-থেকে উদ্ভূত। অর্থ সজোরে বায়ু প্রবাহিত হওয়া। উদ্দেশ্য ঝটিকা ও ঝঞ্ঝাবায়ু, যা মাঝে মাঝে প্রবাহিত হয়। نَاشِرَاتٌ –বলে এমন বায়ু বোঝানো হয়েছে যা বৃষ্টির পর মেঘমালাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। فَارِقَاتٌ -এটা ফেরেশতাগণের বিশেষণ। অর্থাৎ যারা ওহী নাজিল করে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলে। مُلْقِيَاتٌ الذِّكْرُ –এটাও ফেরেশতাগণের বিশেষণ। ذِكْرٌ-এর অর্থ কুরআন অথবা ওহী। উদ্দেশ্য এই যে, সে সব ফেরেশতার শপথ যারা ওহীর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে এবং সে সব ফেরেশতার শপথ, যারা পয়গম্বরগণের নিকটে ওহী ও কুরআন নাজিল করে। এভাবে কোনো বিশেষণে সদর্থ ও টানা-হেঁচড়ার প্রয়োজন হয় না।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই তাফসীরের ভিত্তিতে প্রথমে বায়ুর ও পরে ফেরেশতাগণের শপথ করা হয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে মিল কি? জবাব এই যে, আল্লাহর কালামের রহস্য কেউ পূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম নয়। তথাপি এরূপ মিল থাকতে পারে যে, বায়ুর দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে– এক. বৃষ্টিবাহী ও কল্যাণকর এবং অপরটি ঝটিকা ও অকল্যাণকর। এগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। প্রত্যেকেই এগুলোকে বুঝে ও চিনে। প্রথমে চিন্তা-ভাবনার জন্য এগুলোকে মানুষের সামনে

আনা হয়েছে। এরপর ফেরেশতা ও ওহী উপস্থিত করা হয়েছে, যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে এগুলোর বিশ্বাস লাভ করা যায়।

عُذْرًا أَوْ نُذْرًا -এই আয়াত ذِكْرًا শব্দটি مُلْقِيَاتِ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ ذِكْر তথা ওহী পয়গম্বরগণের কাছে নাজিল করা হয়, যাতে তা মুমিনদের জন্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে ওজরখাহীর কারণ হয় এবং কাফেরদের জন্যে সতর্ককারী হয়ে যায়। বায়ু, ফেরেশতা অথবা উভয়ের শপথ করে আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ অর্থাৎ তোমাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে কেয়ামত, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও শাস্তির যে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর বাস্তবায়ন মুহূর্তেই কতিপয় অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে সব নক্ষত্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অথবা জ্যোতিহীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। ফলে সমগ্র বিশ্ব গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, পর্বতসমূহ তুষারের ন্যায় উড়তে থাকবে। চতুর্থ অবস্থা এই–

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ : أُقِّتَتْ শব্দটি تَوْقِيتٌ থেকে উদ্ভুত। এর আসল অর্থ সময় নির্ধারণ করা। আল্লামা যমখশরী (র.) বলেন ঃ এর অর্থ কোনো সময় নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থই উপযুক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের জন্যে উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার যে সময় নিরূপিত হয়েছিল, তাঁরা যখন সে সময়ে পৌঁছে যাবেন এবং তাঁদের উপস্থিতির মেয়াদ এসে যাবে। তাই তাফসীরে এর অর্থ করা হয়েছে যখন পয়গম্বরগণকে একত্রিত করা হবে। অতঃপর وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন খুবই ভয়াবহ হবে। কারণ এটা বিচার দিবস। এতে কাফের ও মিথ্যারোপকারীদের জন্যে ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া কিছু হবে না। وَيْلٌ শব্দের অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। হাদীসে আছে وَيْل জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এতে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থানের পুঁজ একত্রিত হবে এবং এটাই হবে মিথ্যারোপকারীদের বাসস্থান। অতঃপর বর্তমান লোকদেরকে অতীত লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে- أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ অর্থাৎ আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে তাদের কুফরের কারণে ধ্বংস করিনি? এখানে আদ, ছামুদ, কওমে-লূত, কওমে-ফেরাউন ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ এক কেরাত অনুযায়ী অর্থ এই যে, আমি কি পূর্ববর্তীদের পর পরবর্তীদেরকেও তাদের পশ্চাতে ধ্বংস করিনি? এমতাবস্থায় পরবর্তী মানে পূর্ববর্তীদেরই পরবর্তী লোকেরা, যারা কুরআন অবতরণের পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অপর কেরাত অনুযায়ী এটা আলাদা বাক্য এবং পরবর্তী মানে উম্মতে মুহাম্মদীর কাফের। উদ্দেশ্য পরবর্তী লোকদের ধ্বংসের খবর দিয়ে বর্তমান কাফেরদেরকে ভবিষ্যৎ আজাবের খবর দেওয়া। এই আজাব বদর, ওহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে তাদের উপর পতিত হয়েছে।

পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তীদের উপর আসমানী আজাব নাজিল হতো, যাতে সমগ্র জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো আর বর্তমান কাফেরদের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মানার্থে আসমানী আজাব আসে না। বরং মুসলমানদের তরবারির মাধ্যমে তাদের আজাব আসে। এতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয় না– কেবল প্রধান আপরাধীরাই নিহত হয়।

كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا – أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا –অর্থাৎ আমি কি ভূমিকে জীবিত ও মৃত মানুষদের জন্যে كِفَاتٌ করিনি? শব্দটি كفت থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ মিলানো। كِفَاتٌ সেই বস্তু, যে অনেক কিছুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। ভূমিও জীবিত মানুষকে তার পৃষ্ঠে এবং সকল মৃতকে তার পেটে ধারণ করে।

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ – قَصْر -এর অর্থ অট্টালিকা। جِمَالَتٌ উটকে বলা হয় এবং صُفْر শব্দটি أَصْفَر এর বহুবচন, অর্থ পীতবর্ণ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের অগ্নি বিশালকায় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে, যা বিরাট অট্টালিকার ন্যায় মনে হবে। অতঃপর তা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হবে এবং খণ্ডগুলো পীতবর্ণ উষ্ট্র শ্রেণির সমান মনে হবে। কেউ কেউ এখানে صُفْر -এর অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণবর্ণ। কেননা পীতবর্ণ কৃষ্ণাভ হয়ে থাকে।–(রূহুল মা'আনী)

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ অর্থাৎ সেদিন কেউ কথা বলতে পারবে না এবং কাউকে কৃতকর্মের ওজর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। অন্যান্য আয়াতে কাফেরদের কথা বলা এবং ওজর পেশ করার কথা রয়েছে। সেটা এর পরিপন্থি নয়। কেননা হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থান আসবে। কোনো স্থানে ওজর পেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে এবং কোনো স্থানে অনুমতি দেওয়া হবে।–(রূহুল মা'আনী)

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ –অর্থাৎ কিছুদিন খেয়ে-দেয়ে নাও এবং আরাম করে নাও। তোমরা তো অপরাধী; অবশেষে কঠোর আজাব ভোগ করতে হবে। পয়গম্বরগণের মাধ্যমে একথা দুনিয়াতে মিথ্যারোপকারীদেরকে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের পর তোমাদের কপালে আজাবই আজাব রয়েছে।–(আবূ হাইয়্যান)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ –এখানে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে রুকূ'র আভিধানিক অর্থ নত হওয়া বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে যখন তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানাবলি মেনে চলতে বলা হতো, তখন তারা মেনে

চলত না। কেউ কেউ রুকূ'র পারিভাষিক অর্থও নিয়েছেন। আয়াতে উদ্দেশ্য এই যে, যখন তাদেরকে নামাজের দিকে আহ্বান করা হতো, তখন তারা নামাজ পড়ত না। কাজেই আয়াতে রুকূ' বলে পুরো নামাজ বুঝানো হয়েছে।–(রূহুল মা'আনী) فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ তারা যখন কুরআনের মতো অপূর্ব, অলংকারপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিমণ্ডিত কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করল না, তখন এরপর আর কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? এখানে উদ্দেশ্য তাদের ঈমানের ব্যাপারে নৈরাশ্য ব্যক্ত করা। হাদীসে আছে, যখন এই সূরা তেলাওয়াতকারী এই আয়াত পাঠ করে তখন তার امنا بالله বলা উচিত। অর্থাৎ আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নামাজের বাইরে ও নফল নামাজের মধ্যে এই বাক্য বলা উচিত। ফরজ ও সুন্নত নামাজে এ থেকে বিরত থাকা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَلْمُرْسَلَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْسَالُ মূলবর্ণ (ر - س - ل) জিনস صحيح অর্থ– প্রেরিত বায়ু।

عُرْفًا : মাসদার। অর্থ- নেকি, দয়া, কল্যাণ, দান। এখানে দুটি অর্থ- উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা, ১. প্রসিদ্ধ নেক কাজ ও ভালো কাজ। ২. অনবরত এর পরিভাষা। আয়াত وَالْمُرْسَلَاتِ-এর মধ্যে উভয় অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নেকি ও কল্যাণসহ প্রেরিত বাতাস বা অনবরত প্রেরিত বাতাস।

عَاصِفَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَصْفُ মূলবর্ণ (ع - ص - ف) জিনস صحيح অর্থ– প্রবলবেগে প্রবাহিত বায়ু।

وَالنّٰشِرَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّشْرُ মূলবর্ণ (ن - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– এমন বায়ু যা মেঘরাশিকে ছড়িয়ে দেয়।

اَلْفَارِقَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سمع মাসদার فَرْقٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ق) জিনস صحيح অর্থ– বিচ্ছিন্ন কারিণী।

اَلْمُلْقِيَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– উদ্রেককারী।

طُمِسَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার طَمْسٌ মূলবর্ণ (ط - م - س) জিনস صحيح অর্থ– জ্যোতিহীন নক্ষত্র।

فُرِجَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفَرْجُ মূলবর্ণ (ف - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ- আকাশ বিদীর্ণ করে দেওয়া হবে।

نُسِفَتْ : সীগহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّسْفُ মূলবর্ণ (ن - س - ف) জিনস صحيح অর্থ– উড়ে বেড়াবে।

اُقِّتَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْقِيْتٌ মূলবর্ণ (و - ق - ت) জিনস مثال واوى অর্থ– সমবেত করা হবে।

اُجِّلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَاْجِيْلٌ মূলবর্ণ (ا - ج - ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– মুলতবি রাখা হয়েছে।

وَيْلٌ : ইসম। মারফূ। ধ্বংসাত্মক শাস্তি। দোজখের শাস্তির একটি উপত্যকার নাম। আজাবের তীব্রতা। وَيْلٌ - এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। পাপ ও অপকর্মে প্রবিষ্ট হওয়া। ভারাক্রান্ত হওয়া। বিপদগ্রস্ত করা। এ সকল অর্থে মাসদার আসে وَيْلٌ।

كِفَاتًا : সবকিছুকে ধারণা করার স্থান (জমিন)। জীবিতদেরকে তার উপরে আর মৃত্যুদেরকে তার ভিতর মাটি ধারণ করে নেয়।

شٰمِخٰتٍ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلشَّمْخُ. اَلشُّمُوْخُ মূলবর্ণ (ش - م - خ) জিনস صحيح অর্থ– সুউচ্চ।

اِنْطَلِقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْطِلَاقٌ মূলবর্ণ (ط - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ- চলো।

شُعَبٌ : شُعْبَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ- বৃক্ষের কাণ্ড, কোনো কিছুর শাখা, অংশ।

ظَلِيْلٌ : صفت مشبه অর্থ- ছায়াময়, শীতল ছায়াসমূহ। ছায়াবিশিষ্ট। আরবদের অভ্যাস অনুযায়ী দৃঢ়তা বুঝানোর জন্য এই শব্দটি চয়িত। যেভাবে يَوْمٌ - اَلْيَوْمَ কঠিন দিন, আর لَيْلٌ - اَللَّيْلُ লম্বা রাত ব্যবহার হয়।

لَهَبٌ : মাসদার। অর্থ- আগুন জ্বলে উঠা, আগুনের স্ফুলিঙ্গ। ধূলি এবং ধোঁয়াকেও لَهَبٌ বলা হয়। لَهَبَتِ النَّارُ আগুন জ্বলে উঠেছে।

لَا يَنْطِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نُطْقٌ মূলবর্ণ (ن - ط - ق) জিনস صحيح অর্থ- তারা কথা বলতে পারবে না।

لَا يُؤْذَنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اِذْنٌ মূলবর্ণ (ء - ذ - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ- অনুমতিও থাকবে না।

يَعْتَذِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِعْتِذَارٌ মূলবর্ণ (ع - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ- ওজর করবে।

اَلْفَصْلُ : অর্থ- কিয়ামত দিবস। সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী দিবস। -[মু'জাম]

كِيْدُوْنِ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব كَادَ- يَكَادُ মাসদার اَلْكَيْدُوْدَةُ মূলবর্ণ (ك - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ- আমার উপর সে তদবির চালাও।

يَشْتَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِشْتِهَاءٌ মূলবর্ণ (ش - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- বঞ্ছিত, তারা যা চাইবে, কামনা করবে।

هَنِيْئًا : صفت مشبه, মাসদার هَنَاءٌ বাব ضَرَبَ ، نَصَرَ অর্থ- আরামদায়ক, তৃপ্তিদায়ক, সুখকর, স্বাস্থ্যকর।

تَمَتَّعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَمَتُّعٌ মূলবর্ণ (م - ت - ع) জিনস صحيح অর্থ- উপভোগ করে নাও।

قِيْلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- বলা হয়।

اِرْكَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার رَكْعٌ মূলবর্ণ (ر - ك - ع) জিনস صحيح অর্থ- বিনত হও।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর ما মাওসূল হলো اسم ان আর تُوْعَدُوْنَ বাক্যটি সেলাহ। আর لَوَاقِعٌ-এর লাম টি المزخلقة আর وَاقِعٌ হলো خبر ان আর عائد উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اِنَّ الَّذِىْ تُوْعَدُوْنَهُ -[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ১৭৯]

فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ : এখানে فا টি আতেফা جَعَلْنَا হলো ফে'ল ও ফায়েল আর ه হলো مفعول به এবং فِىْ قَرَارٍ টা দ্বিতীয় মাফউলের স্থানে, আর مَكِيْنٍ হলো قَرَارٍ-এর সিফত। -[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড ; পৃ. ১৮৩]

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ : এখানে فا টা হলো فصيحة অর্থাৎ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِالْقُرْاٰنِ فَيُؤْمِنُوْنَ بِاَيِّ شَيْءٍ আর ظرف بَعْدَهٗ টা উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়েছে। আর حَدِيْثٍ হলো مضاف اليه। আর يُؤْمِنُوْنَ টা بِاَيِّ-এর সাথে متعلق হয়ে حَدِيْثٍ-এর সিফত হয়েছে। আর يُؤْمِنُوْنَ হলো فعل مضارع مرفوع -[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ১৯১]

পারা : ৩০

سُوْرَةُ النَّبَا مَكِّيَّةٌ
সূরা নাবা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪০, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. তারা একে অপরের নিকট কিসের অবস্থা জিজ্ঞাসা করছে?	عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١﴾
২. সে বড় ঘটনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করছে?	عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ﴿٢﴾
৩. যে সম্বন্ধে তারা [সত্যপন্থিদের সাথে] মতভেদ করছে।	الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ﴿٣﴾
৪. কখনো এরূপ নয়, [বরং কিয়ামত আসবে এবং] তারা সত্বরই জানতে পারবে।	كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾
৫. অনন্তর কখনো এরূপ নয়, তারা অচিরেই জানতে পারবে।	ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٥﴾
৬. আমি কি জমিনকে বিছানা করিনি?	اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ﴿٦﴾
৭. এবং পর্বতসমূহকে ও [জমিনের জন্য] পেরেক স্বরূপ নির্মাণ করিনি।	وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. عَمَّ কিসের অবস্থা يَتَسَآءَلُوْنَ তারা একে অপরের নিকট জিজ্ঞাসা করছে?

২. عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ সে বড় ঘটনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করছে?

৩. الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ যে সম্বন্ধে তারা مُخْتَلِفُوْنَ মতভেদ করছে।

৪. كَلَّا কখনো এরূপ নয় سَيَعْلَمُوْنَ তারা সত্বরই জানতে পারবে।

৫. ثُمَّ كَلَّا অনন্তর কখনো এরূপ নয় سَيَعْلَمُوْنَ তারা অচিরেই জানতে পারবে।

৬. اَلَمْ نَجْعَلِ আমি কি করিনি الْاَرْضَ مِهٰدًا জমিনকে বিছানা?

৭. وَّالْجِبَالَ এবং পর্বতসমূহকে اَوْتَادًا [জমিনের জন্য] পেরেক স্বরূপ নির্মাণ করিনি।

৮. এবং আমিই তোমাদেরকে জোড়া [নর ও নারী] বানিয়েছি।	وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ﴿٨﴾
৯. আর আমিই তোমাদের নিদ্রাকে আরামের উপকরণ করেছি।	وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾
১০. আর আমিই রাত্রিকে আবরণের বস্তু বানিয়েছি।	وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾
১১. আর আমিই দিনকে জীবিকা অর্জনের সময় করেছি।	وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾
১২. আর আমিই তোমাদের উপর সাতটি মজবুত আসমান নির্মাণ করেছি।	وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾
১৩. আর আমিই এক উজ্জ্বল প্রদীপ [অর্থাৎ সূর্যকে] প্রস্তুত করেছি।	وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴿١٣﴾
১৪. আর আমিই পানিপূর্ণ মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি।	وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾
১৫. যেন আমি সে পানি দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য ও সবজি [উদ্ভিদ]।	لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴿١٥﴾
১৬. এবং নিবিড় উদ্যানসমূহ। [সমস্ত কাজে কি আমার পূর্ণ ক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে না? তবে কেন কিয়ামত সম্বন্ধে আমার ক্ষমতায় সন্দেহ করা হচ্ছে?]	وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ﴿١٦﴾
১৭. নিশ্চয় বিচারের দিন [একটি] নির্ধারিত [সময়] রয়েছে।	اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾
১৮. অর্থাৎ যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর তোমরা দলে দলে এসে উপস্থিত হবে।	يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. وَّخَلَقْنٰكُمْ এবং আমিই তোমাদেরকে বানিয়েছি اَزْوَاجًا জোড়া [নর ও নারী]।
৯. وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ আর আমিই তোমাদের নিদ্রাকে করেছি سُبَاتًا আরামের উপকরণ।
১০. وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ আর আমিই রাত্রিকে বানিয়েছি لِبَاسًا আবরণের বস্তু।
১১. وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ আর আমিই দিনকে করেছি مَعَاشًا জীবিকা অর্জনের সময়।
১২. وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ আর আমিই তোমাদের উপর নির্মাণ করেছি سَبْعًا شِدَادًا সাতটি মজবুত আসমান।
১৩. وَّجَعَلْنَا আর আমিই প্রস্তুত করেছি سِرَاجًا وَّهَّاجًا এক উজ্জ্বল প্রদীপ [অর্থাৎ সূর্যকে]।
১৪. وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ আর আমিই পানিপূর্ণ মেঘমালা হতে বর্ষণ করেছি مَآءً ثَجَّاجًا প্রচুর বৃষ্টি।
১৫. لِّنُخْرِجَ بِهٖ যেন আমি সে পানি দ্বারা উৎপন্ন করি حَبًّا وَّنَبَاتًا শস্য ও সবজি [উদ্ভিদ]।
১৬. وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا এবং নিবিড় উদ্যানসমূহ।
১৭. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ নিশ্চয় বিচারের দিন كَانَ مِيْقَاتًا নির্ধারিত রয়েছে।
১৮. يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ অর্থাৎ যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا অতঃপর তোমরা দলে দলে এসে উপস্থিত হবে।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১৯. আর আসমান খুলে দেওয়া হবে, অনন্তর তাতে বহু দরজা হয়ে যাবে।	وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ ﴿١٩﴾
২০. আর পাহাড়সমূহকে স্থানচ্যুত করা হবে, অতঃপর তা বালুকারাশির ন্যায় হয়ে যাবে।	وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ؕ ﴿٢٠﴾
২১. নিশ্চয় দোজখ ওঁৎপাতার স্থল।	اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۙ ﴿٢١﴾
২২. এটা সীমালঙ্ঘনকারীদের আবাসস্থল।	لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۙ ﴿٢٢﴾
২৩. যাতে তারা অনন্তকাল [পড়ে] থাকবে।	لّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًا ۚ ﴿٢٣﴾
২৪. সেখানে তারা না কোনো প্রকার স্নিগ্ধতার স্বাদ গ্রহণ করবে আর না পানীয় বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করবে।	لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۙ ﴿٢٤﴾
২৫. উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত।	اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۙ ﴿٢٥﴾
২৬. এটাই [স্বীয় কৃতকর্মের] পূর্ণ প্রতিদান।	جَزَآءً وِّفَاقًا ؕ ﴿٢٦﴾
২৭. তারা হিসাব-নিকাশের ভয় করত না।	اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۙ ﴿٢٧﴾
২৮. এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করত।	وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ؕ ﴿٢٨﴾
২৯. আর আমি প্রত্যেক বিষয়ই লিখিতভাবে সংরক্ষিত রেখেছি।	وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۙ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ আর আসমান খুলে দেওয়া হবে فَكَانَتْ اَبْوَابًا অনন্তর তাতে বহু দরজা হয়ে যাবে।

২০. وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ আর পাহাড়সমূহকে স্থানচ্যুত করা হবে فَكَانَتْ سَرَابًا অতঃপর তা বালুকারাশির ন্যায় হয়ে যাবে।

২১. اِنَّ جَهَنَّمَ নিশ্চয় দোজখ كَانَتْ مِرْصَادًا ওঁৎপাতার স্থল।

২২. لِّلطّٰغِيْنَ এটা সীমালঙ্ঘনকারীদের مَاٰبًا আবাসস্থল।

২৩. لّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ যাতে তারা থাকবে اَحْقَابًا অনন্তকাল।

২৪. لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا সেখানে তারা না কোনো প্রকার স্নিগ্ধতার স্বাদ গ্রহণ করবে وَّلَا شَرَابًا আর না পানীয় বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

২৫. اِلَّا حَمِيْمًا উত্তপ্ত পানি ব্যতীত وَّغَسَّاقًا ও পুঁজ।

২৬. جَزَآءً وِّفَاقًا এটাই স্বীয় কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান।

২৭. اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ তারা ভয় করত না حِسَابًا হিসাব-নিকাশের।

২৮. وَّكَذَّبُوْا এবং তারা অবিশ্বাস করত بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا আমার আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণ।

২৯. وَكُلَّ شَيْءٍ আর প্রত্যেক বিষয়ই اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا আমি লিখিতভাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

অনুবাদ	আয়াত
৩০. সুতরাং [এখন তোমরা তোমাদের সে কৃতকর্মের] স্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করতে থাকব।	فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾
৩১. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য সফলতা রয়েছে।	اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾
৩২. অর্থাৎ [বিভিন্ন মেওয়াপূর্ণ] উদ্যানসমূহ ও আঙ্গুরপুঞ্জ।	حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ﴿٣٢﴾
৩৩. আর সমবয়স্কা নবযুবতীগণ রয়েছে।	وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং পরিপূর্ণ পানপাত্রসমূহ।	وَّكَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾
৩৫. তারা সেখানে না কোনো নিরর্থক কথা শুনতে পাবে আর না কোনো মিথ্যা কথা।	لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾
৩৬. এটা প্রতিদান, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যথাযোগ্য পুরস্কার।	جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾
৩৭. যিনি আসমানসমূহ ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুর মালিক, পরম দয়ালু, তার পক্ষ হতে অধিকার কারো হবে না যে, আবেদন-নিবেদন করে।	رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾
৩৮. যেদিন সমস্ত প্রাণী ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে, কেউই কথা বলতে পারবে না সে ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে দয়াময় [আল্লাহ] অনুমতি দিবেন এবং সে কথাও ঠিক ঠিক বলবে।	يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. فَذُوْقُوْا সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের সে কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا আমি তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করতে থাকব।

৩১. اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে। مَفَازًا সফলতা।

৩২. حَدَآئِقَ অর্থাৎ উদ্যানসমূহ وَاَعْنَابًا ও আঙ্গুরপুঞ্জ।

৩৩. وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا আর সমবয়স্কা নবযুবতীগণ রয়েছে।

৩৪. وَّكَاْسًا এবং পানপাত্রসমূহ دِهَاقًا পরিপূর্ণ।

৩৫. لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا তারা সেখানে না কোনো নিরর্থক কথা শুনতে পাবে وَّلَا كِذّٰبًا আর না কোনো মিথ্যা কথা।

৩৬. جَزَآءً এটা প্রতিদান مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যথাযোগ্য পুরস্কার।

৩৭. رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا যিনি আসমানসমূহ ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুর মালিক الرَّحْمٰنِ পরম দয়ালু لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا তার পক্ষ হতে অধিকার কারো হবে না যে, আবেদন-নিবেদন করে।

৩৮. يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا যেদিন সমস্ত প্রাণী ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ কেউই কথা বলতে পারবে না সে ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে দয়াময় [আল্লাহ] অনুমতি দিবেন وَقَالَ صَوَابًا এবং সে কথাও ঠিক ঠিক বলবে।

৩৯. এটা সুনিশ্চিত দিন, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল গ্রহণ করুক।	ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾
৪০. আমি তোমাদেরকে এক আসন্ন আজাবের ভয় প্রদর্শন করলাম, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ঐ কৃতকর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করবে, যা সে স্বহস্তে করেছে, আর কাফের বলবে, হায়! আমি যদি মৃত্তিকা হয়ে যেতাম।	اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ এটা সুনিশ্চিত দিন فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল গ্রহণ করুক।

৪০. اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا আমি তোমাদেরকে এক আসন্ন আজাবের ভয় প্রদর্শন করলাম يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ঐ কৃতকর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করবে, যা সে স্বহস্তে করেছে وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ আর কাফের বলবে يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا হায়! আমি যদি মৃত্তিকা হয়ে যেতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার নাম 'আন-নাবা'। সূরার দ্বিতীয় আয়াতের عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ -এর মধ্য হতে اَلنَّبَا শব্দকে কেন্দ্র করেই اَلنَّبَا নামকরণ করা হয়েছে। 'নাবা' শব্দটির অর্থ সংবাদ বা খবর। এ সূরায় কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তাই এ কারণে اَلنَّبَا নামকরণ যথার্থ হয়েছে। এ সূরাকে عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ও عَمَّ এবং 'তাসাওল' ও বলা হয়। এতে ২টি রুকু', ৪০টি আয়াত, ১৩৭টি শব্দ এবং ৬৯০টি অক্ষর রয়েছে। –[খাযেন, কাবীর, নূরুল কুরআন]

সূরাটির মূলকথা ও আলোচ্য বিষয় : আলোচ্য সূরাটিতে প্রধানত কিয়ামতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী সূরা আল-মুরসালাতে'ও অনুরূপভাবে পরকাল ও কিয়ামতের কথা আলোচিত হয়েছে। এ সূরার প্রথম অংশে নাবায়ে আজীম বা কিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। এর সমর্থনে পরবর্তী ৬ হতে ১৩ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপুণ্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর নাবায়ে আজীম-এর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে ১৭ হতে ২০ আয়াতে। কিয়ামতের পরে দোজখবাসী ও বেহেশতবাসীদের পর্যায়ক্রমে শাস্তি ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করে উপসংহারে হাশরের ময়দানে অবিশ্বাসীদের অনুশোচনার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

এ সূরায় বলা হয়েছে– পরকালের কথা শুনেত পেয়ে মক্কাবাসীরা শহরের প্রতিটি অলিতে-গলিতে আলোচনা সমালোচনা শুরু করেছে। তাই সূরার প্রথম বাক্যেই সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতঃপর পরকালে অবিশ্বাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তোমরা কি এ পৃথিবী ও এ জমিনকে দেখতে পাও না? একে তো আমিই তোমাদের শয্যারূপে বানিয়ে দিয়েছি। এ সুউচ্চ পর্বতমালা কি তোমাদের দৃষ্টিতে পড়ে না? একে আমিই খুঁটির মতো মাটিতে পুঁতে রেখেছি। তোমরা কি নিজেদের ব্যাপারে ভেবে দেখ না? আমিই তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। তোমাদের নিদ্রাকে শান্তির বাহন হিসেবে সৃষ্টি করেছি। রাতকে আচ্ছাদনকারী এবং দিনকে জীবিকা অর্জনের উপায় বানিয়ে দিয়েছি। সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ এবং আলো ও তাপ প্রদানকারী উজ্জ্বল সূর্য সৃষ্টি করেছি। আকাশে ভাসমান মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং ঐ বৃষ্টির পানির দ্বারা তোমাদের জন্য শস্য, শাক-সবজি ও ঘন বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করেছি। এটা কি তোমাদের বোধগম্য হয় না? আমি যদি এ সমস্ত কর্মকাণ্ড করতে পারি তবে এ সৃষ্টিকে ধ্বংস করে আবার পুনঃ সৃষ্টি করতে পারবো না– এটা তোমরা কিভাবে ধারণা কর? এ বিশ্বজগতের যাবতীয় সৃষ্টি লক্ষ্যহীন নয়। সৃষ্টিলোকের এ বিরাট কারখানা মূলত মানবজাতির কল্যাণের জন্যই পরিপূর্ণ বুদ্ধিমাত্তা ও সূক্ষ্ম জ্ঞানশীলতা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। তাই মানবজাতিকে এর উৎকৃষ্ট ব্যবহারের প্রচুর ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ যথেচ্ছভাবে এসব কিছুর ভোগ-ব্যবহার করবে, আর সৃষ্টিকর্তার আদেশ নিষেধ মানবে না, ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না, তা কেমন করে বোধগম্য হতে পারে?

এ সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের পরে বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে যে, শেষ বিচারের দিন নিঃসন্দেহে যথাসময়ে তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমরা যে যেখানে বা যখনই মৃত্যুবরণ করে থাক না কেন, সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে দলে দলে পুনরুত্থান করে তোমাদেরকে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। সে দিন আকাশসমূহের দ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং পাহাড়-পর্বতগুলো স্থানচ্যুত হয়ে ছিন্নভিন্ন বালুকণায় পরিণত হবে। পুনরুত্থানের পরে অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসীদের পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে– যারা আল্লাহদ্রোহী তাদের জন্য জাহান্নাম হবে ঘাঁটি বিশেষ। অনন্তকাল তারা জাহান্নামে অবস্থান করবে। তৃষ্ণায় তারা ঠাণ্ডা পানীয়ের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না। শাস্তিস্বরূপ অসহনীয় গরম পানীয় ও পুঁজ পরিবেশন করা হবে। যেহেতু তারা হিসাব-নিকাশের ভবিষ্যদ্বাণীকে তোয়াক্কা করেনি; বরং মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। পক্ষান্তরে ঈমানদারদের পুরস্কার সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ সফলকাম হবে। তাদেরকে বাগ-বাগিচা, আঙ্গুর সমবয়স্কা যুবতী নারী এবং উপচে পড়া পানপাত্র প্রদান করা হবে। অনুরূপভাবে আরো বিচিত্র রকমের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা হবে।

শেষ দিকের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার আদালতের চিত্র পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ঐ দিন জীবাত্মাসমূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকেবে। আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। যা বলবে তাও যথার্থ বলবে। উপসংহারে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে আগাম যে খবর দেওয়া হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। যার ইচ্ছা সে দিনটির সত্যতা স্বীকার করে আল্লাহর পথ অবলম্বন করতে পারে। এ সর্তকবাণী শুনেও যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করবে, তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তাদের চোখের সামনে উপস্থাপন করা হবে। তখন অনুতাপ করা ছাড়া আর তাদের কোনো উপায় থাকবে না। তখন তারা অনুতাপ করে বলবে, হায়! আমরা যদি দুনিয়াতে সৃষ্টি না হতাম, অথবা পশু-পাখি ও বৃক্ষ-লতার মতো মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতাম তবে কতইনা ভালো হতো। –[খাযেন, কাবীর]

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ .... الاية

শানে নুযূল : হুজুর ﷺ নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন, এবং কেয়ামতের বিষয়ে আলোচনা করেন। ফলে কাফেরেরা একে অপরকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত যে, কেয়ামত কবে সংঘটিত হবে? তাদের এই প্রশ্নাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতসমূহ নাজিল হয়। –[সূত্র- লুবাব উর্দু কানযুন নুকূল : ১০৬]

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ –অর্থাৎ তারা কি বিষয়ে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অতঃপর আল্লাহ নিজেই উত্তর দিয়েছেন : عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيْمِ نَبَأ- শব্দের অর্থ মহাখবর। এখানে মহাখবর বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মক্কাবাসী কাফেররা কিয়ামত সম্পর্কে সওয়াল-জবাব করছে, যে সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, কুরআনের অবতরণ শুরু হলে মক্কার কাফেররা তাদের বৈঠকে বসে এ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করত। কুরআনে কিয়ামতের আলোচনাকে অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ এটা তাদের মতে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই এ সম্পর্কে অধিক পরিমাণে আলোচনা চলত। কেউ একে সত্য মনে করত এবং কেউ অস্বীকার করত। তাই আলোচ্য সূরার শুরুতে কাফেরদের অবস্থা উল্লেখ করে কিয়ামতের সম্ভাব্যতা আলোচনা করা হয়েছে। কেয়ামত সম্পর্কে কাফেররা যেসব খটকা ও আপত্তি উত্থাপন করত, সেগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে?। কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন যে, কাফেরদের এই সওয়াল ও জবাব তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্য নয় বরং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার উদ্দেশ্যে ছিল। কুরআন পাক এর জবাবে একই বাক্যকে তাকীদের জন্য দুবার উল্লেখ করেছে– كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ –অর্থাৎ কিয়ামতের বিষয়টি সওয়াল-জবাব, আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম হবে না বরং এটা যখন সামনে উপস্থিত হবে, তখনই এর স্বরূপ জানা যাবে। এর নিশ্চিত বিষয়ে বিতর্ক, প্রশ্ন ও অস্বীকারের অবকাশ নেই। অতিসত্বর অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরজগতের বস্তুসমূহ দৃষ্টিতে ভেসে উঠবে এবং সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলী দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। তখন কিয়ামতের স্বরূপ খুলে যাবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি, প্রজ্ঞা ও কারিগরির কয়েকটি দৃশ্য উল্লেখ করেছেন, যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় তদ্রুপই সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে ভূমি ও পর্বতমালা সৃষ্টি এবং নর ও নারীর যুগলের আকারে মানব সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর মানুষের সুখ, স্বাস্থ্য ও কাজ-কারবারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে একটি বাক্য এই যে, – وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا – سُبَاتًا শব্দটি سَبْت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কমানো, কর্তন করা। নিদ্রা মানুষের চিন্তাভাবনাকে কর্তন করে তার অন্তর ও মস্তিষ্ককে এমন স্বস্তি ও শান্তি দান করে, যার বিকল্প দুনিয়ার কোনো শান্তি হতে পারে না। একারণেই কেউ কেউ سُبَاتًا -এর অর্থ করেছেন সুখ, আরাম।

নিদ্রা খুব বড় নিয়ামত : এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যুগলাকারে সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করার পর তার আরামের সব উপকরণের মধ্যে থেকে বিশেষভাবে নিদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন। চিন্তা করলে বোঝা যায় এটি এক বিরাট নিয়ামত।

নিদ্রাই মানুষের সব সুখের ভিত্তি। এই নিয়ামতটি আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক করে দিয়েছেন। ফলে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, রাজা-প্রজা সবাই এই ধন সমহারে একই সময়ে প্রাপ্ত হয় বরং বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গরীব ও শ্রমজীবী মানুষ এ নিয়ামত যে পরিমাণে লাভ করে, ধনাঢ্য ও ঐশ্বর্যশালীদের ভাগ্যে তা ঘটে না। তাদের কাছে সুখের সামগ্রী, সুখের বাসগৃহ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, নরম তোশক, নরম বালিশ ইত্যাদি সবই থাকে, যা দরিদ্ররা কদাচ চোখেও দেখে না কিন্তু নিদ্রা এসব তোশক, বালিশ অথবা প্রাসাদবাংলোর অনুগামী নয়। এটা তো আল্লাহ তা'আলার এমন এক নিয়ামত, যা সরাসরি তাঁর কাছ থেকেই আসে। মাঝে মাঝে নিঃস্ব সম্বলহীন ব্যক্তিকে কোনো শয্যা-বালিশ ছাড়াই উন্মুক্ত আকাশের নিচে এ নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দান করা হয় এবং মাঝে মাঝে সম্পদশালীদেরকে দান করা হয় না। তারা নিদ্রার বটিকা সেবন করে এ নিয়ামত লাভ করে এবং প্রায় সময়ে এই বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়। চিন্তা করুন, এর চেয়ে বড় নিয়ামত এই যে, এই নিদ্রা কেবল বিনা মূল্যে ও বিনা পরিশ্রমেই মানুষ, জন্তু নির্বিশেষে সবাইকে দান করা হয়নি বরং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার অনুগ্রহে এই নিয়ামতটি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। মানুষ মাঝে মাঝে কাজের আধিক্যের দরুন সারারাত্রি জেগে কাজ করতে চায় কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ তার উপর জোরেজবরে নিদ্রা চাপিয়ে দেন, যাতে সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং সে আরও অধিক কাজের শক্তি অর্জন করে। অতঃপর এই নিদ্রারূপী মহা অবদানের পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا –অর্থাৎ আমি রাত্রিকে করেছি আবরণ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বভাবত মানুষের নিদ্রা তখন আসে, যখন আলো অধিক না থাকে, চতুর্দিকে নীরবতা বিরাজ করে এবং হট্টগোল না থাকে। আল্লাহ তা'আলা রাত্রিকে আবরণ বলে ইশারা করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে কেবল নিদ্রাই দেননি বরং সারা বিশ্বে নিদ্রার উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সমস্ত মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে একই সময়ে নিদ্রা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সবাই একযোগে নিদ্রা গেলেই চারদিকে পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করবে। নতুবা অনান্য কাজের ন্যায় নিদ্রার সময়ও যদি বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্নরূপ হতো; তবে কেউ পূর্ণ শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারত না।

এরপর বলা হয়েছে وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا –মানুষের সুখ ও শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় আহার্য দ্রব্যাদির সরবরাহও নিতান্ত জরুরি। নতুবা নিদ্রা সাক্ষাৎ মৃত্যু হয়ে যাবে। যদি সারাক্ষণ রাত্রিই থাকত এবং মানুষ কেবল নিদ্রাই যেত, তবে এসব দ্রব্য কিরূপে অর্জিত হতো। এর জন্য চেষ্টা, পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি জরুরি, যা আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে সম্ভবপর। তাই বলা হয়েছে : তোমাদের সুখকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি কেবল রাত্রি ও তার অন্ধকার সৃষ্টি করিনি বরং একটি আলোকোজ্জ্বল দিনও দিয়েছি, যাতে তোমরা কাজ-কারবার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পার। অতঃপর মানুষের সুখের সেই উপকরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা আকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ উপকারি বস্তু হচ্ছে সূর্যের আলো। বলা হয়েছে : وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا –অর্থাৎ আমি একটি প্রোজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। এরপর মানুষের সুখের প্রয়োজনে আকাশের নিচে সৃজিত বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু মেঘমালার কথা উল্লেখ হয়েছে।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا - مُعْصِرٰتِ শব্দটি مُعْصِرَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ জলে পরিপূর্ণ মেঘমালা। এ থেকে জানা গেল যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। কোনো কোনো আয়াতে আকাশ থেকে বর্ষিত হওয়ার কথা আছে। তাতে আকাশের অর্থ আকাশের শূন্যমণ্ডল। এই অর্থে سَمَاءٌ শব্দের ব্যবহার কুরআনে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এছাড়া একথাও বলা যায় যে, কোনো সময় সরাসরি আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষিত হতে পারে। এটা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। এসব কারিগরি ও নিয়ামত উল্লেখ করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু কিয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا –অর্থাৎ বিচারের দিন মানে কিয়ামত নির্দিষ্ট সময়ে আসবে। তখন এই বিশ্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, দুইবার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকারের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সাথে সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এসময় বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ দলে দলে আল্লাহর সকাশে উপস্থিত হবে। হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে। একদল উদরপূর্তি ও পোশাক পরিহিত অবস্থায় সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে হাশরের ময়দানে আসবে। দ্বিতীয় দল পায়ে হেঁটে আগমন করবে এবং তৃতীয় দলকে উপুড় অবস্থায় পায়ে ধরে টেনে হাশরের ময়দানে আনা হবে। –(মাজহারী) কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আয়াতের তাফসীরে দশ দল হবে বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : নিজ নিজ কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে তাদের দল হবে অসংখ্য। এসব উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই।

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا –অর্থাৎ যে পাহাড়কে আজ অটল ও অনড় হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হ সেই পাহাড় স্ব-স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। سَرَابٌ-এর শাব্দিক অর্থ চলে যাওয়া। মরুভূমির যে

বালুকাস্তূপ দূর থেকে পানির ন্যায় ঝলময় করতে থাকে তাকেও سَرَابٌ -এ কারণে বলা হয় যে, কাছে গেলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়। –[সেহাহ, রাগেব]

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا –যে স্থানে বসে কারো দেখাশোনা অথবা অপেক্ষা করা হয়, তাকে مِرْصَادًا বলা হয়। এখানে জাহান্নামের অর্থ জাহান্নামের পুল তথা পুলসিরাত। সওয়াবদাতা ও শাস্তিদাতা উভয় প্রকার ফেরেশতা এখানে অপেক্ষা করবে। জাহান্নামীদেরকে শাস্তিদাতা ফেরেশতারা পাকড়াও করবে এবং জান্নাতীদেরকে ছওয়াবতাদা ফেরেশতারা তাদের গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবে। –[মাজহারী]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : জাহান্নামের পুলের উপর পরিদর্শক ফেরেশতাগণের চৌকি থাকবে। যার কাছে জান্নাতের ছাড়পত্র থাকবে, তাকে অগ্রে যেতে দেওয়া হবে এবং যার কাছে এই ছাড়পত্র থাকবে না তাকে আটকিয়ে রাখা হবে। –[কুরতুবী]

لِلطَّاغِيْنَ مَآبًا –এটা إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا -এর দ্বিতীয় خَبَرْ উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক সৎ ও অসৎকে জাহান্নামের পুলের উপর দিয়ে যেতে হবে এবং জাহান্নাম সীমালঙ্ঘনকারীদের আবাসস্থল। طَاغِيْنَ শব্দটি طَاغِىْ -এর বহুবচন এবং طُغْيَانْ থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ অবাধ্যতা করা। طَاغِىْ এমন লোককে বলা হয়। যে অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। ঈমান না থাকলেও এটা হতে পারে। তাই এখানে طَاغِىْ অর্থ কাফের। কু-বিশ্বাসী, প্রথভ্রষ্ট মুসলমানদের সেই দলও অর্থ হতে পারে, যারা কুরআন ও সুন্নাহর সীমা ডিঙ্গিয়ে যায়। যদিও প্রকাশ্যভাবে কুফর অবলম্বন করে না, যেমন রাফেজী, খারেজী ও মুতাজিলা সম্প্রদায়! –[মাজহারী]

لَا بِثِيْنَ فِيْهَا أَحْقَابًا - لَا بِثِيْنَ শব্দটি لَا بِثْ -এর বহুবচন। অর্থ অবস্থানকারী। أَحْقَابٌ শব্দটি حُقْبَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ সুদীর্ঘ সময়। ইবনে জারীর হযরত আলী (রা.) থেকে এর পরিমাণ আশি বছর বর্ণনা করেছেন, যার প্রত্যেক বছর বার মাসের, প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনের এবং প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের। এভাবে প্রায় দুই কোটি আটাশি বছরে এক حُقْبَةٌ হয়। অপর কয়েকজন সাহাবী এর পরিমাণ আশির পরিবর্তে সত্তর বছর বলেছেন। অবশিষ্ট হিসাব পূর্বের ন্যায়। –(ইবনে কাছীর) কিন্তু মুসনাদে বাজযারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّارِ حَتَّى يَمْكُثَ فِيْهِ أَحْقَابًا وَالْحُقْبُ بِضْعٌ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً كُلُّ سَنَةٍ ثَلْثُ مِائَةٍ وَسِتُّوْنَ يَوْمًا مِمَّا تَعُدُّوْنَ.

তোমাদের যাকে গোনাহের সাজায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাকে কয়েক হুক্‌বা জাহান্নামে অবস্থান না করা পর্যন্ত বের করা হবে না। এক হুক্‌বা আশি বছরের কিছু বেশী এবং একবছর তোমাদের বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ৩৬০ দিনের হবে। –[মাযহারী]

এ হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর না হলেও এতে أَحْقَابٌ শব্দের অর্থ বর্ণিত আছে। অপরদিকে কয়েকজন সাহাবী থেকে এ সম্পর্কে প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের বর্ণিত আছে। যদি এটাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি হয়, তবে এর অর্থ এই যে, হাদীসের মধ্যে বিরোধ আছে। এই বিরোধ আসা অবস্থায় কোনো এক অর্থ নিশ্চিতভাবে নেওয়া যায় না। তবে উভয় হাদীসের অভিন্ন বিষয়বস্তু এই যে, হুক্‌বা অত্যন্ত দীর্ঘ সময়কে বলা হয়। একারণেই ইমাম বায়যাভী أَحْقَابٌ-এর অর্থ করেছেন دُهُوْرًا مُتَتَابِعَةً অর্থাৎ উপর্যুপরি বহুবছর।

জাহান্নামে চিরকাল বসবাস সম্পর্কে আপত্তি ও জবাব : হুক্‌বার পরিমাণ যত দীর্ঘই হোক, তা সীমিত, অনন্ত নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই সুদীর্ঘ সময়ের পর কাফের জাহান্নামীরাও জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। অথচ এটা কুরআনের অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থি। যে সব আয়াতে خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই উম্মতের ইজমা হয়েছে যে, জাহান্নাম কখনও ধ্বংস হবে না এবং কাফেররা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হবে না।

সুদ্দী হযরত মুররা ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন : যদি জাহান্নামীদেরকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, জাহান্নামে তাদের অবস্থান সারা বিশ্বের কংকরের সমান হবে, তবে এতেও তারা আনন্দিত হবে। কারণ, কংকরের সংখ্যা অগণিত হলেও সীমিত। ফলে একদিন না একদিন আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। যদি একই সংবাদ জান্নাতীদেরকে দেওয়া হয়, তবে তারা দুঃখিত হবে। কেননা, কংকরের সমান মেয়াদ যত দীর্ঘই হোক না কেন, সেই মেয়াদের পর তারা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃতি হবে। –[মাজহারী]

সারকথা, আলোচ্য আয়াতের أَحْقَابًا শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, কয়েক হুক্‌বা অতিবাহিত হলে পরে জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। এই অর্থ অন্য সব আয়াত, হাদীস ও ইজমার পরিপন্থি হওয়ার কারণে ধর্তব্য নয়। কেননা, এই আয়াতে কয়েক হুক্‌বার পরে কি হবে, তার বর্ণনা নেই। এতে শধু উল্লেখ আছে যে, তারা কয়েক হুক্‌বা জাহান্নামে থাকবে। এ থেকে জরুরি হয় না যে, কয়েক হুক্‌বার পর জাহান্নাম থাকবে না অথবা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এ কারণেই হযরত হাসান (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন : আয়াতে আল্লাহ তা'আলা

জাহান্নামীদের জন্য কোনো সময় ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করেননি, যদ্বারা তাদের জাহান্নাম থেকে বের হওয়া বোঝা যেতে পারে বরং উদ্দেশ্য এই যে, যখন সময়ের এক অংশ অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন অন্য অংশ শুরু হয়ে যাবে। এমনিভাবে তৃতীয় চতুর্থ অংশ করে অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) কাতাদাহ্ থেকেও এই তাফসীরই বর্ণনা করেছেন যে, اَحْقَابٌ -এর অর্থ অনন্তকাল অর্থাৎ এক হুক্‌বা শেষ হলে দ্বিতীয় হুক্‌বা শুরু হবে এবং এই ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। –[ইবনে কাছীর]

ইবনে কাছীর এখানে وَيَحْتَمِلُ বলে আরও একটি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, طَاغِيْنَ -এর অর্থ কাফের না নেওয়া বরং মুসলমানদের এমন দল বোঝানো, যারা বাতিল আকীদার কারণে পথভ্রষ্ট দল বলে গণ্য হয়। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় তাদেরকে প্রবৃত্তিবাদী বলা হয়। এমতাবস্থায় আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, যে সব কালেমা উচ্চারণকারী তাওহীদ পন্থি লোক বাতিল আকীদা রাখার কারণে কুফরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে কিন্তু প্রকাশ্য কাফের নয়, তারা কয়েক হুক্‌বা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকার পর অবশেষে কালেমার বরকতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। কুরতুবী এই ব্যাখ্যাকে সম্ভবপর আখ্যা দিয়েছেন এবং মাজহারী এই ব্যাখ্যাই পছন্দ করেছেন। তিনি এর সমর্থনে মুসনাদে বাজযার বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর পূর্বোল্লেখিত হাদীসও পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, কয়েক হুক্‌বা অতিবাহিত হওয়ার পর তারা জাহান্নাত থেকে নিষ্কৃত পাবে।

কিন্তু আবূ হাইয়ান বলেন যে, পরবর্তী আয়াত اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا -এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় যে, طَاغِيْنَ -এর অর্থ এখানে তাওহীদ পন্থি ভ্রান্তদল হবে। কেননা, এই আয়াতে কিয়ামত অস্বীকার এবং আয়াতসমূহকে মিথ্যারোপ করার কথা। পরিষ্কার বর্ণিত আছে। এমনিভাবে আবূ হাইয়ান মুকাতিলের এই উক্তিই প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, এই আয়াতটি মানসূখ বা রহিত।

একদল তাফসীরকারক আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তৃতীয় একটি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, এই আয়াতের পরবর্তী لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا আয়াতটি اَحْقَابًا থেকে جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ হবে। আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা কোনো শীতলদ্রব্য ও পানীয় আস্বাদন করবে না ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত। এরপর সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের এই দুরবস্থার পরিবর্তন হতে পারে এবং অন্য প্রকার আজাব হতে পারে। حَمِيْمٌ এমন ফুটন্ত পানি, যা মুখের কাছে আনা হলে গোশ্‌ত জ্বলে যাবে এবং পেটে গেলে ভিতরের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। غَسَّاقٌ –জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি। جَزَآءً وِّفَاقًا –অর্থাৎ জাহান্নামে তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টিতে তাদের বাতিল বিশ্বাস ও কু-কর্মের অনুরূপ হবে। এতে কোন বাড়াবাড়ি হবে না।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا –অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে যেমন কুফর ও অস্বীকারে কেবল বেড়েই চলেছ– বাধ্যতামূলক মৃত্যুর সম্মুখীন না হলে আরও বেড়েই চলতে, তেমনিভাবে আজ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আজাব কেবল বৃদ্ধিই করবেন। অতঃপর কাফেরদের বিপরীতে মু'মিন মুত্তাকীদের ছওয়াব ও জান্নাতের নিয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا –অর্থাৎ জান্নাতের এসব নেয়ামত মু'মিনদের প্রতিদান এবং আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত দান। এখানে জান্নাতের নিয়ামতসমূহকে প্রথমে কর্মের প্রতিদান ও পরে আল্লাহ্‌র দান বলা হয়েছে। বাহ্যত উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। কেননা, কোনো কিছুর বিনিময়ে যা দেওয়া হয়, তাকে প্রতিদান এবং বিনিময় ছাড়াই পুরস্কারস্বরূপ যা দেওয়া হয়, তাকে দান বলা হয়। কুরআন পাক উভয় শব্দকে একত্র করে ইঙ্গিত করেছে যে, জান্নাতে প্রবেশাধিকার এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহ কেবল আকার ও বাহ্যিক দিক দিয়েই জান্নাতীদের কর্মের প্রতিদান–প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলো খাঁটি আল্লাহর দান। কেননা, মানুষের কাজকর্ম তো সেসব নিয়ামতেরই প্রতিদান হতে পারে না, যেগুলো তাকে দুনিয়াতে দান করা হয়। পরকালীন নিয়ামত অর্জন তো শুধু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, কৃপা ও দান বৈ নয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোনো ব্যক্তি শুধু তার কর্মের জোরে জান্নাতে যেতে পারে না যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ না হয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : আপনিও কি? উত্তর হলো : হ্যাঁ, আমিও আমার কর্মের জোরে জান্নাতে যেতে পারি না। حِسَابًا শব্দে অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে– এক. এমন দান যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্ত প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত হয়। এই অর্থ নিম্নোক্ত ব্যবহার থেকে নেওয়া হয়েছে– اَحْسَبْتُ فُلَانًا اَىْ اَعْطَيْتُهٗ مَا يَكْفِيْهِ حَتّٰى قَالَ حَسْبِىْ অর্থাৎ আমি তাকে এতটুকু দিলাম, যা তার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট; এমনকি, সে বলে উঠল, ব্যস, এতটুকু আমার জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় অর্থ মোকাবিলা করণ। তাফসীরবিদগণের কেউ কেউ প্রথম অর্থ এবং

কেউ কেউ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। হযরত মুজাহিদ (র.) দ্বিতীয় অর্থ নিয়ে আয়াতের অর্থ করেছেন– এই দান জান্নাতীদেরকে তাদের আমলের হিসেবে দেওয়া হবে। আন্তরিকতা ও কর্ম সৌন্দর্যের হিসেবে এই দানের স্তর নির্ধারিত হবে। উদাহরণত সহীহ্ হাদীসসমূহে উম্মতের কর্মের মোকাবিলায় সাহাবায়ে কেরামের কর্মের এই মর্যাদা নিরূপিত হয়েছে যে, সাহাবী আল্লাহর পথে একমুদ (প্রায় এক সের) ব্যয় করলে তা অন্যের ওহুদ পর্বত সমান ব্যয়েরও অধিক মর্যাদাশীল হবে।

لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا –এই বাক্য পূর্বের جَزَاءً مِّنْ رَّبِّكَ বাক্যের সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে যেরূপ ছওয়াব দান করবেন, তাতে কারও কথা বলার সাধ্য হবে না যে, অমুককে কম এবং অমুককে বেশি কেন দেওয়া হলো? যদি একে আলাদা বাক্য সাব্যস্ত করা হয়; তবে উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কারও ভাষণ দেওয়ার ক্ষমতা হবে না। এই অনুমতি কোনো কোনো স্থানে হবে এবং কোনো কোনো স্থানে হবে না।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰۤئِكَةُ صَفًّا –কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে 'রূহ' বলে এখানে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করার সাধারণ উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণের পূর্বে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, রূহ আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট বাহিনী, যারা ফেরেশতা নয় তাদের মাথা ও হস্তপদ আছে। এই তাফসীর অনুযায়ী দুটি সারি হবে– একটি রূহের ও অপরটি ফেরেশতাগণের।

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ –বাহ্যত এই দিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন। হাশরে প্রত্যেকেই তার কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখতে পাবে হয় আমলনামা হাতে আসার ফলে দেখবে, না হয় কাজকর্ম সব সশরীরী হয়ে সামনে এসে যাবে। কোনো কোনো হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত আছে। এ দিন মৃত্যুর দিনও হতে পারে। এমতাবস্থায় স্বীয় কাজকর্ম দেখা কবরে ও বরযখে হতে পারে। –[মাযহারী]

وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا –হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন সমগ্র ভূপৃষ্ঠ এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এতে মানব, জিন, গৃহপালিত জন্তু ও বন্য জন্তু সবাইকে একত্র করা হবে। জন্তুদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তুর উপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এমনকি কোনো শিংবিশিষ্ট ছাগল কোনো শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে সেদিন তারও প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এই কর্ম সমাপ্ত হলে সব জন্তুকে আদেশ করা হবে : মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে- হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। এরূপ হলে আমরা হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নামের আজাব থেকে বেঁচে যেতাম।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَهْدًا : ইসম, একবচন; বহুবচনে مُهُدٌ অর্থ : বিছানা। উদ্দেশ্য ঠিকানা,

اَوْتَادًا : বহুবচন; একবচনে وَتَدٌ অর্থ : কীলক, পেরেক।

مَعَاشًا : ইসম ও মাসদার। জীবন-জীবিকা। عَيْشٌ কোনো প্রাণী বা মানুষের জীবন। حَيَاتٌ শব্দটি ব্যাপক। আল্লাহ, ফেরেশতা, মানুষ ও প্রাণীজগত সকলের জন্যই এটি ব্যবহৃত হয়। অন্য مَعَاشٌ ও عَيْش -এর ব্যবহার শুধু প্রাণী ও মানুষের জন্য হয়। مَعِيْشَتٌ জীবনোপকরণ। বহুবচন مَعَائِشُ আসে। বাব ضَرَبَ।

وَهَّاجًا : মুবালাগার সীগাহ। মাসদার وَهْجٌ মূলবর্ণ (و - ه - ج) জিনস مثال واوى অর্থ– উজ্জ্বল প্রদীপ, অনেক আলো, বিরাট উজ্জ্বল। মুফাসসিরগণের বড় এক জামাত লিখেছেন, سِرَاجًا وَّهَّاجًا -এর দ্বারা সূর্য উদ্দেশ্য।

اَلْمُعْصِرَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْصَارُ মূলবর্ণ (ع - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– পানিপূর্ণ মেঘমালা নিংড়ানো।

ثَجَّاجًا : মুবালাগার সীগাহ। মাসদার ثَجٌّ বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ث - ج - ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রচুর বারি, প্রবলভাবে বৃষ্টি হওয়া।

اَلْفَافًا : অর্থ– মিশ্রিত। মিলিত। ঘন গাছপালা। اَوْزَاعٌ ও اَخْيَافٌ -এর মতো এরও কোনো একবচন হয় না।

سَرَابًا : চকচকে বালি, মরীচিকা। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দুপুরে সূর্যের তীব্র তাপদাহে মরুভূমিতে যে বালুকারাশিকে পানির মত প্রবাহিত হচ্ছে মনে হয়, তাকে মরীচিকা বলা হয়। অনেকেই পানি মনে করে দৌড়ে সেখানে গিয়ে ধোঁকা খায়, এজন্য سَرَابٌ শব্দটি ধোঁকা ও প্রতারণার ক্ষেত্রে প্রবাদ হয়ে গেছে।

أَحْقَابًا : حَقْبٌ -এর বহুবচন। অর্থ– যুগ যুগ ধরে, অখণ্ডকাল حُقُبٌ (কাফে পেশ) সময়কে বলা হয় আর حَقْبٌ (কাফ সাকিন) এক নির্ধারিত সময়ের নাম। তবে এর সময় নির্ধারণের ব্যাপারে ভাষাবিদগণ মতানৈক্য করেছেন। কারো মতে আশিবছর আবার কারো মতে সত্তর বছর। কারো মতে তিনশ বছর। কারো মতে চল্লিশ বছর আবার কেউ ত্রিশ হাজার বছরের কথাও বলেছেন। মুফাসসিরগণের মধ্যে ইমাম কাতাদাহ্ (র.) স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন, حَقْبٌ -এর দ্বারা অনির্ধারিত সময় উদ্দেশ্য। তবে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তা বলতে পারবে না।

غَسَّاقًا : জাহান্নামীদের শরীর থেকে প্রবাহিত পুঁজ বা রক্ত। (জালালাইন) হিম বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পানি। (মু'জামুল কুরআন) এক হাদীসে এসেছে, غَسَّاقٌ এর এক অংশ যদি দুনিয়ায় ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে দুনিয়াবাসীদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যাবে; সবাই পাগলামী করতে থাকবে।

مَفَازًا : ইসমে মাসদার। অর্থ– সফল হওয়া। অথবা যরফে মাকান। সফলতার স্থান, সফলতা।

كَوَاعِبَ : كَاعِبٌ -এর বহুবচন, অর্থ– অভিজ্ঞতাহীন, যুবতী কুমারী মেয়ে, যার স্তনগুলো খুব স্ফীত كَعَبَتِ الْجَارِيَةُ মেয়েটির স্তন স্ফীত হয়ে উঠেছে। মাসদার : كَعَابَةٌ، كُعُوْبًا، كُعُوْبَةٌ : বাবে نَصَرَ (লাজেম) كَعَبَ الْاِنَاءَ كَعْبًا ضَرَبَ মুতা'আদ্দী। বাব : فتح প্লেটকে ভরে দিয়েছে। (কামূস)

أَتْرَابًا : শব্দটি تِرْبٌ -এর বহুবচন অর্থ– সমবয়স্কা নারী, নবযুবতীগণ।

دِهَاقًا : ইসম, সিফাত। পরিপূর্ণ, দীপ্তিমান। কানায় কানায় পূর্ণ পেয়ালা। মাসদার : دَهْقٌ : বাব فَتَحَ মূলবর্ণ (د ـ ه ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– কানায় কানায় পূর্ণ করা, ঢেলে দেওয়া, কেটে ফেলা, আঘাত করা।

صَوَابًا : সত্য, সঠিক কথা, সঠিক, সরল, অকপট, ন্যায়। ভুলের বিপরীত।

مَآبًا : ইসমে যরফ, শরণাপন্ন হওয়ার স্থান। মাসদার– مَآبٌ এটি ইসমে যরফে জামান ও মাকান উভয়টিই হয়। অর্থাৎ শরণাপন্ন বা প্রত্যাবর্তিত হওয়া। প্রত্যাবর্তিত হওয়ার স্থান/কাল। মাসদার– اِيَابًا ও اَوْبٌ আসে। বাব– نَصَرَ

اَلْكَافِرُ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ বাব نَصَرَ মাসদার كُفْرٌ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অস্বীকারকারী। ইসলাম ও শরিয়ত অস্বীকারকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجًا : এখানে واو টি আতেফা, আর اَنْزَلْنَا ফে'ল ও ফায়েল আর مِنَ الْمُعْصِرَاتِ টা اَنْزَلْنَا -এর সাথে متعلق হয়েছে; আর مَآءً হলো مفعول به এবং ثَجَّاجًا হলো مَآءً -এর সিফত। [ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ১৯৬]

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا : এখানে اِنَّ হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল نَا হলো اسم ان আর اَنْذَرْنٰكُمْ বাক্যটি خبر ان আর اَنْذَرْنَا হলো ফে'ল ও ফায়েল এবং كُمْ হলো مفعول به اول আর عَذَابًا হলো দ্বিতীয় مفعول به আর قَرِيْبًا হলো عَذَابًا-এর সিফত। [ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ২০৩]

سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা নাযি'আত

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪৬, রুকূ'– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. কসম সে ফেরেশতাগণের যারা কঠোরভাবে [কাফেরদের] প্রাণ বের করে।	وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾
২. এবং যারা [মুমিনদের] মৃদুভাবে বন্ধন খুলে দেয়।	وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾
৩. এবং যারা তীব্রগতিতে সাঁতরিয়ে চলে।	وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ﴿٣﴾
৪. অনন্তর যারা দ্রুতবেগে দৌড়ায়।	فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ﴿٤﴾
৫. অতঃপর প্রত্যেক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।	فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ﴿٥﴾
৬. কেয়ামত নিশ্চয় আসবে, যেদিন কম্পনকারী বস্তু প্রকম্পিত করবে।	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾
৭. যার পর আর এক পশ্চাৎগামী বস্তু এসে পড়বে।	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾
৮. সেদিন অনেক অন্তর ধড়ফড় করতে থাকবে।	قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا কসম সে ফেরেশতাগণের যারা কঠোরভাবে [কাফেরদের] প্রাণ বের করে।

২. وَّالنّٰشِطٰتِ এবং শপথ তাদের যারা বন্ধন খুলে দেয় نَشْطًا মৃদুভাবে।

৩. وَّالسّٰبِحٰتِ এবং যারা সাঁতরিয়ে চলে سَبْحًا তীব্রগতিতে ।

৪. فَالسّٰبِقٰتِ অনন্তর যারা দৌড়ায় سَبْقًا দ্রুতবেগে ।

৫. فَالْمُدَبِّرٰتِ অতঃপর নিয়ন্ত্রণ করে اَمْرًا প্রত্যেক কাজ

৬. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ কেয়ামত নিশ্চয় আসবে যেদিন কম্পনকারী বস্তু প্রকম্পিত করবে।

৭. تَتْبَعُهَا যার পর এসে পড়বে الرَّادِفَةُ আর এক পশ্চাৎগামী বস্তু ।

৮. قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ সেদিন অনেক অন্তর وَّاجِفَةٌ ধড়ফড় করতে থাকবে।

৯. তাদের নয়নসমূহ ভয়ে অবনত হবে।	أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾
১০. তারা বলে, আমরা কি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসব?	يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾
১১. তবে কি আমরা যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনো [পুনর্জীবনে] প্রত্যাবর্তিত হব।	أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾
১২. তারা বলতে লাগল যে, এমতাবস্থায় এ প্রত্যাবর্তন [আমাদের জন্য] বড়ই ক্ষতিকর হবে।	قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾
১৩. এটা তো কেবল একটি ভীষণ ধ্বনি হবে।	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾
১৪. যার ফলে সকলেই তৎক্ষণাৎ মাঠে এসে উপস্থিত হবে।	فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾
১৫. আপনার নিকট কি মূসার কাহিনী পৌঁছেছে?	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿١٥﴾
১৬. যখন তাকে তার প্রতিপালক এক পবিত্র প্রান্তরে অর্থাৎ তুয়ায় ডেকে বললেন।	إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾
১৭. তুমি ফেরাউনের নিকট যাও, সে অত্যন্ত দুরন্তপনা করছে।	اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿١٧﴾
১৮. অতঃপর তুমি (তাকে) বল, তুমি কি এটা চাও যে, সংশোধিত হয়ে যাবে।	فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾
১৯. এবং আমি তোমাকে তোমার প্রভুর দিকে পথ প্রদর্শন করি যাতে তুমি ভয় করতে থাক।	وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. أَبْصَارُهَا তাদের নয়নসমূহ خَاشِعَةٌ ভয়ে অবনত হবে।

১০. يَقُولُونَ তারা বলে أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ আমরা কি আবার ফিরে আসব فِي الْحَافِرَةِ পূর্বাবস্থায়।

১১. أَإِذَا তখনো কি যখন كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়ে পরিণত হয়ে যাব তখনো (পুনর্জীবনে) প্রত্যাবর্তিত হব।

১২. قَالُوا তারা বলতে লাগল যে تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ এমতাবস্থায় এ প্রত্যাবর্তন خَاسِرَةٌ (আমাদের জন্য) বড়ই ক্ষতিকর হবে।

১৩. فَإِنَّمَا هِيَ এটা তো কেবল زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ একটি ভীষণ ধ্বনি হবে।

১৪. فَإِذَا هُم যার ফলে সকলেই তৎক্ষণাৎ بِالسَّاهِرَةِ মাঠে এসে উপস্থিত হবে।

১৫. هَلْ أَتَاكَ আপনার নিকট কি পৌঁছেছে حَدِيثُ مُوسَىٰ মূসার কাহিনী

১৬. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ যখন তাকে তার প্রতিপালক ডেকে বললেন بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى এক পবিত্র প্রান্তরে অর্থাৎ তুয়ায়।

১৭. اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ তুমি ফেরাউনের নিকট যাও إِنَّهُ طَغَىٰ সে অত্যন্ত দুরন্তপনা করছে।

১৮. فَقُلْ অতঃপর তুমি (তাকে) বল هَل لَّكَ إِلَىٰ তুমি কি এটা চাও যে أَن تَزَكَّىٰ সংশোধিত হয়ে যাবে।

১৯. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ এবং আমি তোমাকে তোমার প্রভুর দিকে পথ প্রদর্শন করি فَتَخْشَىٰ যাতে তুমি ভয় করতে থাক।

২০. অনন্তর তিনি তাকে মহা নিদর্শন দেখালেন।	فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾
২১. কিন্তু সে [এটা] অবিশ্বাস করল এবং কথা মানল না।	فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾
২২. অনন্তর সে পৃথক হয়ে [তার বিরুদ্ধে] প্রচেষ্টা করতে লাগল।	ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾
২৩. অতঃপর সে [লোকদেরকে] সমবেত করল, তৎপর সে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করল।	فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾
২৪. এবং বলল, "আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক"।	فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾
২৫. অনন্তর আল্লাহ তাকে আখেরাতের ও দুনিয়ার আজাবে পাকড়াও করলেন।	فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾
২৬. নিশ্চয় তাতে সে ব্যক্তির জন্য বড় শিক্ষণীয় রয়েছে, যে [আল্লাহকে] ভয় করে।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾
২৭. আচ্ছা! তোমাদেরকে সৃষ্টি করাই কি অধিক কঠিন কাজ, নাকি আসমান? আল্লাহই এটা নির্মাণ করেছেন।	ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنٰهَا ﴿٢٧﴾
২৮. [এরূপে যে,] তার ছাদ উচ্চ করেছেন এবং তাকে সুবিন্যস্তও করেছেন।	رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾
২৯. আর তার রাত্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং তার দিনকে প্রকাশ করেছেন।	وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. فَاَرٰىهُ অনন্তর তিনি তাকে দেখালেন الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى মহানিদর্শন।

২১. فَكَذَّبَ কিন্তু সে [এটা] অবিশ্বাস করল وَعَصٰى এবং কথা মানল না।

২২. ثُمَّ অনন্তর اَدْبَرَ পৃথক হয়ে (তার বিরুদ্ধে) يَسْعٰى প্রচেষ্টা করতে লাগল

২৩. فَحَشَرَ অতঃপর সে সমবেত করল فَنَادٰى তৎপর সে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করল।

২৪. فَقَالَ এবং বলল اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।

২৫. فَاَخَذَهُ اللّٰهُ অনন্তর আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى আখেরাতের ও দুনিয়ার আজাবে।

২৬. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ নিশ্চয় তাতে রয়েছে لَعِبْرَةً বড় শিক্ষণীয় لِّمَنْ يَّخْشٰى সে ব্যক্তির জন্য, যে ভয় করে।

২৭. ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا আচ্ছা! তোমাদেরকে সৃষ্টি করাই কি অধিক কঠিন কাজ اَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنٰهَا নাকি আসমান? আল্লাহই এটা নির্মাণ করেছেন।

২৮. رَفَعَ سَمْكَهَا তার ছাদ উচ্চ করেছেন فَسَوّٰىهَا এবং তাকে সুবিন্যস্তও করেছেন।

২৯. وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا আর তার রাত্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا এবং তার দিনকে প্রকাশ করেছেন।

৩০. আর তারপর জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছেন।	وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحٰهَا ﴿٣٠﴾
৩১. তা হতে তার পানি ও তৃণ বের করেছেন।	أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا ﴿٣١﴾
৩২. এবং পর্বতসমূহকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন।	وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا ﴿٣٢﴾
৩৩. তোমাদের এবং তোমাদের পশুগুলোর জন্য উপকারস্বরূপ ।	مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾
৩৪. অনন্তর যখন সে মহাসংকট উপস্থিত হবে।	فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾
৩৫. অর্থাৎ যেদিন মানুষ নিজেদের কৃতকর্ম স্মরণ করবে।	يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾
৩৬. আর দর্শনকারীদের সম্মুখে দোজখ প্রকাশ করা হবে।	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرٰى ﴿٣٦﴾
৩৭. অনন্তর সেদিন এ অবস্থা হবে যে, যে ব্যক্তি অবাধ্যতাচরণ করে থাকবে।	فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾
৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকবে।	وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾
৩৯. সুতরাং দোজখই হবে তার বাসস্থান।	فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٣٩﴾
৪০. আর যে নিজের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে [অর্থাৎ পরলোকে বিশ্বাস থাকার দরুন বিচার-দিবস হতে ভীত রয়েছে] এবং আত্মাকে প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত রেখেছে।	وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ আর তারপর জমিনকে دَحٰهَا বিছিয়ে দিয়েছেন।

৩১. أَخْرَجَ مِنْهَا তা হতে বের করেছেন مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا তার পানি ও তৃণ ।

৩২. وَالْجِبَالَ এবং পর্বতসমূহকে أَرْسٰهَا দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন।

৩৩. مَتَاعًا উপকারস্বরূপ لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ তোমাদের এবং তোমাদের পশুগুলোর জন্য ।

৩৪. فَإِذَا جَاءَتِ অনন্তর যখন উপস্থিত হবে الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى সে মহাসংকট।

৩৫. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ যেদিন মানুষ স্মরণ করবে مَا سَعٰى নিজেদের কৃতকর্ম ।

৩৬. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ আর দোজখ প্রকাশ করা হবে لِمَنْ يَرٰى দর্শনকারীদের সম্মুখে ।

৩৭. فَأَمَّا مَنْ অনন্তর সেদিন এ অবস্থা হবে যে ব্যক্তি طَغٰى অবাধ্যতাচরণ করে থাকবে।

৩৮. وَآثَرَ এবং অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকবে الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনকে ।

৩৯. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ সুতরাং দোজখই হবে الْمَأْوٰى তার বাসস্থান।

৪০. وَأَمَّا مَنْ خَافَ আর যে ব্যক্তি ভয় করেছে مَقَامَ رَبِّهِ নিজের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে وَنَهَى النَّفْسَ এবং আত্মাকে নিবৃত্ত রেখেছে عَنِ الْهَوٰى প্রবৃত্তি হতে ।

৪১. তবে নিশ্চয় বেহেশতই তার বাসস্থান।	فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاْوٰی ﴿٤١﴾
৪২. তারা আপনাকে কেয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, তা কখন সংঘটিত হবে।	یَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَیَّانَ مُرْسٰىهَا ﴿٤٢﴾
৪৩. তা বর্ণনা করার সাথে আপনার কী সম্পর্ক?	فِیْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾
৪৪. তা আপনার প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।	اِلٰی رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٤﴾
৪৫. আপনি তো কেবল ঐ ব্যক্তিরই ভয় প্রদর্শনকারী, যে তাকে ভয় করে।	اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ یَّخْشٰىهَا ﴿٤٥﴾
৪৬. [কাফেরদের হাবভাবে বুঝা যায়, তারা যেন কিয়ামতের আগমন দ্রুত কামনা করছে, কিন্তু] যেদিন তারা তা দেখতে পাবে, তখন এরূপ মনে করবে, যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র একসন্ধ্যা অথবা একপ্রভাত অবস্থান করেছে।	كَاَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَهَا لَمْ یَلْبَثُوْۤا اِلَّا عَشِیَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ তবে নিশ্চয় বেহেশতই الْمَاْوٰی তার বাসস্থান।

৪২. یَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ তারা আপনাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে اَیَّانَ مُرْسٰىهَا তা কখন সংঘটিত হবে।

৪৩. فِیْمَ اَنْتَ আপনার কী সম্পর্ক مِنْ ذِكْرٰىهَا তা বর্ণনা করার সাথে

৪৪. اِلٰی رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের উপরই مُنْتَهٰىهَا তা নির্ভর করে।

৪৫. اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ আপনি তো কেবল ভয় প্রদর্শনকারী مَنْ یَّخْشٰىهَا ঐ ব্যক্তিরই, যে তাকে ভয় করে।

৪৬. كَاَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَهَا যেদিন তারা তা দেখতে পাবে (তখন এরূপ মনে করবে,) যেন لَمْ یَلْبَثُوْۤا اِلَّا তারা (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছে কেবলমাত্র عَشِیَّةً اَوْ ضُحٰىهَا একসন্ধ্যা অথবা একপ্রভাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : اَلنّٰزِعٰتِ শব্দ نَزْعٌ হতে নিষ্পন্ন। نَازِعٌ-এর বহুবচন نَازِعَاتٌ-এর আভিধানিক অর্থ : আকর্ষণকারীগণ, সজোরে কোনো বস্তুকে টেনে আনয়নকারীগণ। সূরাটি نَازِعَاتٌ শব্দ যোগে শুরু করা হেতু এর নামকরণ হয়েছে اَلنَّازِعَاتُ। এর ছাড়া এ সূরার আরো কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন– سَاهِرَةٌ ও تَامَّةٌ এ সূরায় ২টি রুকূ', ৪৬ টি আয়াত, ১৭৩টি বাক্য এবং ৯৫৩টি অক্ষর রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামত দিবসের আজাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, আর এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা শপথ করে বলেছেন যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামতকে যারা অস্বীকার করে তাদের শাস্তির ঘোষণা এসেছে, আর অত্র সূরায় শপথ করে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত অত্যাসন্ন, এর পাশাপাশি এ কথাও ইরশাদ হয়েছে যে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা হককে বাতিলের উপর বিজয়ী করেন। এ মর্মে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যে, কিভাবে হযরত মূসা (আ.) অহংকারী ফেরাউনকে সত্য গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন এবং কিভাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনকে ধ্বংস করেছেন। –[বাহরুল মুহীত]

শানে নুযূল : হিজরতের পূর্বে যেসব অকাট্য প্রমাণসহ আয়াত নাজিল হয়েছিল মক্কার হঠকারী কাফেররা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির ফলে ঐ সকল আয়াত বিশ্বাস করত না এবং এর প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপও করত না। অথচ কিয়ামতের ধ্বংস-প্রলয়

সম্পর্কে বারবার তাদেরকে বলা হচ্ছিল। আল্লাহর অসীম কুদরতের কথাও তাদের নিকট বারবার বিবৃত হচ্ছিল। তবু তারা বলত কিয়ামত হবেই এ কথাটা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সূরা নাজিল করে কিয়ামতের সম্ভাবনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে প্রমাণ করেন। –[মা'আলিম]

সূরাটির ফজিলত : সূরা আন-নাযি'আত দুশমনের সামনে পাঠ করলে তার শত্রুতা এবং অনিষ্টতা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আর যে ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে উক্ত সূরাটি তেলাওয়াত করতে দেখে অথবা এমনিতেই দেখে, তার অন্তর হতে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা দূরীভূত হয়ে যায়। –[নূরুল কুলূব]

একটি দুর্বল বর্ণনায় এসেছে যে, যে ব্যক্তি সূরা আন-নাযিয়াত সর্বদা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে কবর ও হাশরে এত আরামে রাখবেন যে, তার মনে হবে, সে যেন এই মাত্র এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় পরিমাণ তথায় অবস্থান করেছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু : আলোচ্য সূরায় কিয়ামত, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং এর সংশ্লিষ্ট কতিপয় অবস্থার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং জান কবজকারী, আল্লাহর হুকুম অবিলম্বে পালনকারী ও আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ফেরেশতাদের নামে শপথ করা হয়েছে। এরূপ কথা দ্বারা নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যই হবে। মৃত্যুর পর অন্য এক জীবন অবশ্যই যাপন করতে হবে। উক্ত দু'টি বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা যেসব ফেরেশতার হাতে এখানে জান কবজ করানো হচ্ছে, তাদের হাতেই পুনরায় তাদের দেহে প্রাণের সঞ্চার করানো কঠিন কিছু নয়। সে ফেরেশতারাই সেদিন সে আল্লাহর হুকুম মোতাবেকই সমস্ত সৃষ্টি লোকের বর্তমান শৃঙ্খলা ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নতুনভাবে অপর একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয় যে, একটি ধাক্কায় বিশ্বলোকের বর্তমান ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। আর তার পুনরুজ্জীবনের জন্যও একটি ধাক্কারই প্রয়োজন মাত্র। আজ যারা এর অস্বীকার করছে তাদের চোখের সামনেই তা সংঘটিত হবে, তখন তারা ভীত-বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে।

অতঃপর হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাসূলকে অবিশ্বাসকারী, হেদায়েতকে অস্বীকারকারী এবং রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। যদি তারা তাদের উক্ত অপকর্মসমূহ বর্জন করত হেদায়েতের পথে না আসে তাহলে তাদেরকে ফেরাউনের ন্যায় মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

পুনরায় জীবিত হওয়ার দলিল পেশ করা হয়েছে। অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে– তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা কঠিন কাজ; কিংবা মহাশূন্যে অসংখ্য কোটি গ্রহ-নক্ষত্রসহ বিস্তীর্ণ এ বিরাট-অসীম বিশ্বলোক সৃষ্টি করা কঠিন কাজ? যে আল্লাহর পক্ষে এ কাজটি করা কঠিন ছিল না– তাঁর পক্ষে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? পরকাল হওয়ার সম্ভাব্যতা প্রমাণের জন্য এ অকাট্য যুক্তি একটি কার্যে সমাপ্ত করা হয়েছে। তারপর পৃথিবী এবং তাতে মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য প্রদত্ত সাজ-সরঞ্জাম ও দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এখানে প্রতিটি জিনিসই উদাত্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করছে, এটা অতি উচ্চ কর্মকুশলতা সহকারে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ হতে মানুষের বিবেকের নিকট একটি অতি বড় প্রশ্ন রাখা হয়েছে। তা এই যে, এ সুবিশাল সৃষ্টিলোকে মানুষকে ক্ষমতা ইখতিয়ার দেওয়ার পর তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা অধিক যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞান সম্মত মনে হয় না। পৃথিবীতে যথেচ্ছা বিচরণ করা ও স্বেচ্ছাচারিতা করে মৃত্যুবরণ করা ও মাটির সাথে চিরতরে মিলেমিশে সম্পূর্ণ নিশ্চহ্ন হয়ে যাওয়া এবং অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিভাবে প্রয়োগ করেছে, কিভাবে পালন করেছে সে বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া অধিক বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়?

উপরিউক্ত প্রশ্নের উপর কোনোরূপ আলোচনা ব্যতীতই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আখেরাতে মানুষের স্থায়ী ফয়সালা হয়ে যাবে। আর তা এ ভিত্তিতে হবে যে, কে দুনিয়ায় আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আরাম-বিলাসকেই মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করেছে? পক্ষান্তরে কে স্বীয় প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয়ে নাফরমানদের কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসাকে সামলিয়েছে? সুতরাং যে ব্যক্তি হঠকারিতা পরিহার করে বিশ্বাসী অন্তর নিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে চিন্তা করবে সে আপনা হতেই উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাব পাবে। কেননা বিবেক, যুক্তি ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে মানুষের উপর কোনো দায়িত্ব অর্পণের অর্থ এই যে, পরিশেষে তাতে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে, এর হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। এ ব্যাপারে তার সফলতার কারণে তাতে পুরস্কৃত করা হবে। পক্ষান্তরে ব্যর্থতার কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

পরিশেষে কাফেরদের এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? জবাবের সারমর্ম এই যে, পয়গম্বরের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। পয়গম্বরের দায়িত্ব তো শুধু সতর্ক করে দেওয়া যে, সেদিন অবশ্যই আসবে।

কখন আসবে তা জানা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বের বিষয় হলো, তোমরা এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সুতরাং যার মনে চায় সে একে ভয় করে নিজের চরিত্রকে সংশোধন করে নিক। আর যার ইচ্ছা সে যথেচ্ছভাবে সময় কাটিয়ে দিক। যখন বিচারের দিন সমাগত হবে, তখন যারা এ পৃথিবীর জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে বসেছিল, তারা অনুভব করবে যে, দুনিয়াতে তারা মাত্র কিছুক্ষণ অবস্থান করেছিল। তখন তারা হাড়ে-হাড়ে টের পাবে যে, দুনিয়ার অল্প কয় দিনের জীবনের সুখ-শান্তির মোহে পড়ে কিভাবে ভবিষ্যতের স্থায়ী শান্তিকে খুইয়ে বসেছিল।

قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢)

শানে নুযূল : যখন সূরা নাযিআতের দশম আয়াত অর্থাৎ তারা বলে আমরা কি উল্টো পায়ে প্রত্যাবর্তিত হব। তখন কুরাইশরা বলতে লাগল সত্যিই যদি আমরা মৃত্যুর পর আবার জীবিত হই তাহলে আমাদের সর্বনাশ হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[সূত্র- লুবাব, কানযুন নুকূল : ১০৬]

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (٣٩)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত নযর বিন হারেছ এবং তার পুত্র হারেছ বিন নযর এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এবং দুনিয়া লোভী সকল কাফের সম্প্রদায়ই এ শানে নুযূলের আওতাধীন রয়েছে। –[কুরতুবী : ১৮০/১৯]

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (٤١)

শানে নুযূল– ১ : আলোচ্য আয়াতদ্বয় হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) ও তদ্বীয় ভাই আমের বিন উমায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ (যে সীমালঙ্ঘন করে) সে হচ্ছে মুসআব বিন উমায়েরের বদর দিন স্ব-স্বীকৃত ভাই। আনসারগণ তাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কে? সে বলল, আমি মুসআব বিন উমায়েরের ভাই। সে জন্যে দড়িতে না বেঁধে তাকে সম্মান প্রর্দশন করে, তাদের সাথেই তাকে রাত্রিতে রাখেন। সকাল হলো তারা মুস্‌আব বিন উমায়েরের নিকট এ ঘটনার বিবরণ দিলেন। তিনি বলেন, সে আমার ভাই নয়, সে তোমাদের বন্দী, তাকে বেঁধে রাখ। তার মাতা হচ্ছে মক্কানগরীর সর্বাধিক স্বর্ণ-রৌপ্য ও মাল-দৌলতের অধিকারিণী। সুতরাং তারা তাকে বেঁধে ফেলেন, অতঃপর মাতা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেয় وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ দ্বারা মুস্‌আব বিন উমায়েরকে বোঝানো হয়েছে। ওহুদ অভিযানের দিনে রাসূল ﷺ থেকে সকলেই যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি নিজেকে ঢাল বানিয়ে হযরত রাসূল ﷺ-কে হেফাজত করেছিলেন। অবশেষে তাঁর মুখে এসে তীর বেঁধে যায়। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন তাকে রক্তে রঞ্জিত দেখতে পান তিনি বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর হেফাজতে অর্পণ করলাম। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর এক বর্ণনা রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয় আবূ জাহল বিন হিশাম ও মুস্‌আব বিন উমায়ের (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

সুদ্দী বলেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর একটি গোলাম ছিল। সে তাঁর খাবারের আয়োজন করত। তাঁর নিকট খানা নিয়ে আসলেই জিজ্ঞেস করতেন, কোথা হতে তা সংগ্রহ করেছ? অতঃপর তিনি আহার করতেন। একদিন যখন তার নিকট খানা নিয়ে আসল, কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করেই তিনি খানা খেয়ে ফেলেন। ফলে গোলাম তাঁকে জিজ্ঞেস করল অন্যান্য দিনের ন্যায় আজ আমাকে খাদ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেননি কেন? তিনি বলেন, আমি তো ভুলে গিয়ে ছিলাম। যা হোক বলত কোথা হতে তা সংগ্রহ করলে? সে বলল, জাহেলিয়্যা যুগে আমি এক সম্প্রদায়ের জন্যে জ্যোতিষী করেছিলাম। তারা তা আমাকে দিয়েছে। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বমি করে তা ফেলে দিলেন। আর বললেন, হে আমার রব! আমার রক্তে তার অংশ যা রয়েছে তা আপনার ইচ্ছাধীন। তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী : ১৮১/১৯]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, মক্কার মুশরিক সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্রূপাত্মকভাবে হযরত রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিল যে, কিয়ামত বা মহাপ্রলয় কখন হবে? মুশরিকদের জিজ্ঞেস করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[কুরতুবী : ১৮২/১৯]

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣)

শানে নুযূল : ইবনে মারদুভীয়া হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত রাসূল আকরাম ﷺ কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন। সে জিজ্ঞাসার জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। নাসায়ী, ইবনে জারীর প্রমুখ হযরত ত্বারিক বিন শিহাব (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামত সম্পর্কীয় আলোচনা বেশি বেশি করতেন। সে জন্যে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ১৮২/১৯, ফতহুল কাদীর ৩৮১/৫, তাবারী ৪৪১/১২ দূররে মানছূর ১৩১৪/৬]

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا - نَازِعَاتٌ শব্দটি نَزْعٌ -থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোনো কিছুকে উৎপাটন করা। اِغْرَاقٌ ও غَرْقٌ -এর অর্থ কোনো কাজ নির্মমভাবে করা। বাকপদ্ধতিতে বলা হয় : اَغْرَقَ النَّازِعُ فِي الْقَوْسِ –অর্থাৎ তীর নিক্ষেপকারী ধনুকে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছে। সূরার শুরুতে ফেরেশতাগণের কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে তাদের শপথ করা হয়েছে। শপথের জবাব উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত ও হাশর-নাশর অবশ্যই হবে। ফেরেশতাগণ এখনও সারা বিশ্বের কাজকর্ম ও শৃঙ্খলা বিধানে নিয়োজিত রয়েছে কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন বস্তুনিষ্ঠ কারণাদি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং অসাধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন ফেরেশতাগণই যাবতীয় কর্ম নির্বাহ করবে। এই সম্পর্কের কারণে সূরায় তাদের শপথ করা হয়েছে।

এস্থলে ফেরেশতাগণের পাঁচটি বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে। এগুলো মানুষের মৃত্যু ও আত্মা বের করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদ্দেশ্য, কিয়ামতের সত্যতা বর্ণনা করা। মানুষের মৃত্যু দ্বারা এই বর্ণনা শুরু করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার জন্য আংশিক কিয়ামত হয়ে থাকে। কিয়ামতের বিশ্বাসে এর প্রভাব অসাধারণ। প্রথম বিশেষণ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا অর্থাৎ নির্মমভাবে টেনে আত্মা নির্গতকারী। এখানে আজাবের সে সব ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা কাফেরের আত্মা নির্মমভাবে বের করে। যেহেতু এই নির্মমতা আত্মিক হয়ে থাকে, তাই দর্শকদেরও এটা অনুভব করা জরুরি নয়। এ কারণেই কাফেরদের আত্মা প্রায়ই সহজে বের হতে দেখা যায় কিন্তু এটা কেবল আমাদের দেখার মধ্যেই। তার আত্মার উপর যে নির্মম কাণ্ড সংঘটিত হয়, তাকে দেখতে পারে। এটা তো আল্লাহ্‌র উক্তি থেকেই জানা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের আত্মা টেনে টেনে নির্মমভাবে বের করা হয়।

দ্বিতীয় বিশেষণ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا - نَاشِطَاتٌ –শব্দটি نَشْطٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাঁধন খুলে দেওয়া। কোনো কিছুতে পানি অথবা বাতাস ভর্তি থাকলে যদি তার বাঁধন খুলে দেওয়া হয়, তবে সেই পানি বা বাতাস সহজে বের হয়ে যায়। এতে মু'মিনের আত্মা বের করাকে এর সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, যে ফেরেশতা মু'মিনের রূহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছে, সে অনায়াসে রূহ কবজ করে– কঠোরতা করে না। এখানেও বিষয়টি আত্মিক বিধান কোনো মুসলমান বরং সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আত্মা বের হতে বিলম্ব হলে একথা বলা যায় না যে, তার প্রতি নির্মমতা করা হচ্ছে– যদিও শারীরিকভাবে নির্মমতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃত কারণ এই যে, কাফেরের আত্মা বের করার সময় থেকেই বরজখের আজাব সামনে এসে যায়। এতে তার আত্মা অস্থির হয়ে দেহে আত্মগোপন করতে চায়। ফেরেশতা জোরে-জবরে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মু'মিনের রূহের সামনে বরজখের ছওয়াব নিয়ামত ও সুসংবাদ ভেসে উঠে। ফলে সে দ্রুতবেগে সে দিকে যেতে চায়।

তৃতীয় বিশেষণ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا - سَبْحٌ -এর আভিধানিক অর্থ সন্তরণ করা। এখানে উদ্দেশ্য দ্রুতবেগে চলা। নদীপথে কোনো বাধা-বিঘ্ন থাকে না। সন্তরণকারী ব্যক্তি অথবা নৌকারোহী সোজা গন্তব্য স্থানের দিকে ধাবিত হয়। এই সন্তরণকারী বিশেষণটিও মৃত্যুর ফেরেশতাগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের রূহ্ কবজ করার পর তারা দ্রুত গতিতে আকাশের দিকে নিয়ে যায়।

চতুর্থ বিশেষণ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا –উদ্দেশ্য এই যে, যে আত্মা ফেরেশতাগণের হস্তগত হয়, তাকে ভালো অথবা মন্দ ঠিকানায় পৌছানোর কাজে তারা দ্রুততায় একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যায়। তারা মু'মিনের আত্মাকে জান্নাতের আবহাওয়ায় ও নিয়ামতের জায়গায় এবং কাফেরের আত্মাকে জাহান্নামের আবহাওয়ায় ও আজাবের জায়গায় পৌছিয়ে দেয়।

পঞ্চম বিশেষণ। فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا মৃত্যুর ফেরেশতাদের সর্বশেষ কাজ এই যে, যে আত্মাকে ছওয়াব ও আরাম দেওয়ার আদেশ হয়, তারা তার জন্য ছওয়াব ও আরামের ব্যবস্থা করে এবং যাকে আজাব ও কষ্টে রাখার আদেশ হয়, তারা তার জন্য আজাব ও কষ্টের ব্যবস্থা করে।

কবরে ছওয়াব ও আজাব : উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ মানুষের মৃত্যুর সময় আগমন করে রূহ কবজ করে আকাশের দিকে নিয়ে যায়, ভালো অথবা মন্দ ঠিকানায় দ্রুতবেগে পৌছিয়ে দেয় ও সেখানে ছওয়াব অথবা আজাব এবং কষ্ট অথবা সুখের ব্যবস্থা করে। এই আজাব ও ছওয়াব কবরে অর্থাৎ বরজখে হবে। হাশরের আজাব ও ছওয়াব এর পরে হবে। সহীহ হাদীসসমূহে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে মেশকাতে এতদসম্পর্কিত হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.)-এর একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে।

নফ্স ও রূহ্ সম্পর্কে কাযী সানাউল্লাহ (র.)-এর উপাদেয় বক্তব্য : তাফসীরে মাযহারীর বরাত দিয়ে নফ্স ও রূহের স্বরূপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা সূরা হিজরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র.) এ স্থলে লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব তথ্যের মধ্যে অনেক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো। হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.)-এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষের নফ্স উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা গঠিত একটি সূক্ষ্ম দেহ, যা তার জড় দেহে নিহিত আছে। দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদগণ একেই রূহ বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের

রূহ্ একটি অশরীরী আল্লাহর নৈপুণ্য, যা নফসের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে এবং নফসের জীবন এর উপরই নির্ভরশীল। ফলে এটা যেন রূহের রূহ। কারণ দেহের জীবন নফ্সের উপর এবং নফ্সের জীবন এর উপর নির্ভরশীল। নফ্সের সাথে এই রূহের যে সম্পর্ক, তার স্বরূপ স্রষ্টা ব্যতীত কেউ জানে না। নফ্সকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এমন একটি আয়না সদৃশ করেছেন, যাকে সূর্যের বিপরীতে রেখে দেওয়া হয়েছে। সূর্যে আলো তাতে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে সে নিজেও সূর্যের ন্যায় আলো বিকিরণ করে। মানুষের নফ্স যদি ওহীর শিক্ষা অনুযায়ী সাধানা ও পরিশ্রম করে তবে সে নিজেও আলোকিত হয়ে যায়। নতুবা সে জড় দেহের বিরূপ প্রভাব দ্বারা প্রভাম্বিত হয়ে পড়ে। এই সূক্ষ্ম দেহ তথা নফসকেই ফেরেশতাগণ উপরে নিয়ে যায়। অতঃপর সম্মান সহকারে নিচে আনে যদি সে আলোকিত হয়ে থাকে। নতুবা তার জন্য আকাশের দ্বার খুলে না এবং উপর থেকেই নিচে সজোরে নিক্ষেপ করা হয়। এই সূক্ষ্ম দেহ সম্পর্কেই উপরিউক্ত হাদীসে আছে যে, আমি একে পৃথিবীর মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি, এতেই ফিরিয়ে আনব এবং পুনরায় এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করব। এই সূক্ষ্ম দেহই সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আলোকিত ও সুগন্ধযুক্ত হয়ে যায় এবং কুফর ও শিরকের মাধ্যমে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। জড় দেহের সাথে অশরীরী রূহের সম্পর্ক সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ নফ্সের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। অশরীরী রূহ্ মৃত্যুর আওতায় পড়ে না। কবরের আজাব এবং ছওয়াবও নফ্সের সাথে জড়িত থাকে। কবরের সাথে এ নফ্সেরই সম্পর্ক থাকে এবং অশরীরী রূহ্ ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করে পরোক্ষভাবে নফ্সের ছওয়াব এবং আজাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এভাবে রূহ্ কবরে থাকে কথাটি নফ্স কবরে থাকে অর্থে বিশুদ্ধ এবং নফ্স রূহ্ জগতের অথবা ইল্লিয়্যীনে থাকে কথাটি রূহ্ থাকে অর্থে নির্ভুল। এর ফলে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের অসামঞ্জস্য দূর হয়ে যায়। অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা, এতে প্রথম ফুঁৎকার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্তি, দ্বিতীয় ফুঁৎকার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের পুনঃসৃষ্টি এবং এ সম্পর্কে কাফেরদের আপত্তি ও তার জবাব উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষে বলা হয়েছে : فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ - سَاهِرَةٌ অর্থ সমতল ময়দান। কিয়ামতে পুনরায় যে ভূপৃষ্ঠ সৃষ্টি করা হবে, তা সমতল হবে, এতে উঁচু-নিচু, পাহাড়-পর্বত, টিলা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। একেই سَاهِرَةٌ বলা হয়েছে। অতঃপর কিয়ামত অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা ও শত্রুতার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মর্মপীড়া অনুভব করতেন, তা দূর করার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুরা কেবল আপনাকেই কষ্ট দেয়নি, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও শত্রুদের পক্ষ থেকে দারুণ মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। তাঁরা সবর করেছেন। অতএব, আপনারও সবর করা উচিত।

فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى - نَكَالٌ শব্দের অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যা দেখে অন্যরাও আতঙ্কিত হয়ে যায়। نَكَالَ الْاٰخِرَةِ হলো ফেরাউনের পরকালীন আজাব এবং نَكَالَ الْاُوْلٰى -দরিয়ায় নিমজ্জিত হওয়ার আজাব। অতঃপর মরে মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর পুনরুজ্জীবন কিরূপে হবে! কাফেরদের এই বিস্ময়ের জবাব দেওয়া হয়েছে। এতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃজিত বস্তুসমূহের উল্লেখ করে অনবধান মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যে মহান সত্তা কোনোরূপ উপকরণ ও হাতিয়ার ব্যতিরেকেই এসব মহাসৃষ্টিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি যদি এগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্তির পর পুনরায় সৃষ্টি করে দেন, তবে এতে বিস্ময়ের কি আছে? এরপর আবার কিয়ামত দিবসের কঠোরতা, প্রত্যেকের আমলনামা সামনে আসা এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের ঠিকানা বর্ণনা করা হয়েছে। অবশেষে জাহান্নামী ও জান্নাতীদের বিশেষ বিশেষ আলামত উল্লিখিত হয়েছে, যা দ্বারা একজন মানুষ দুনিয়াতেই ফয়সালা করতে পারে যে, 'আইনের দৃষ্টিতে' তার ঠিকানা জান্নাত, না জাহান্নাম। আইনের দৃষ্টিতে বলার কারণ এই যে, অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, কারও সুপরিশে অথবা সরাসরি আল্লাহর রহমতে কোনো কোনো জাহান্নামীকে জান্নাতে পৌছানো হবে। কারও বেলায় এরূপ হলে সেটা হবে ব্যতিক্রমধর্মী আদেশ। জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার আসল বিধি তাই, যা এসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমে জাহান্নামীদের দুটি বিশেষ আলামত বর্ণিত হয়েছে। فَأَمَّا مَنْ طَغٰى وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا এক. আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করা। **দুই.** পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া অর্থাৎ যে কাজ অবলম্বন করলে দুনিয়াতে সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায় কিন্তু পরকালে তার জন্য আজাব নির্দিষ্ট আছে, সে ক্ষেত্রে পরকালের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই অগ্রাধিকার দেওয়া। দুনিয়াতে যে ব্যক্তির মধ্যে এই দুটি আলামত পাওয়া যায়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে : فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى –অর্থাৎ জাহান্নামই তার ঠিকানা। এরপর জান্নাতীদেরও দুটি বিশেষ আলামত বর্ণনা করা হয়েছে : وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى **এক.** দুনিয়াতে প্রত্যেক কাজের সময় এরূপ ভয় করা যে, একদিন আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হয়ে এ কাজের হিসাব দিতে হবে। **দুই.** অবৈধ খেয়ালখুশি চরিতার্থ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এই দুটি গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়, কুরআন পাক তাকে সুসংবাদ দেয় : فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى অর্থাৎ জান্নাতই তার ঠিকানা।

খেয়াল-খুশির বিরোধিতার তিন স্তর : আলোচ্য আয়াতে জান্নাত ঠিকানা হওয়ার দুটি শর্ত ব্যক্ত করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ফলাফলের দিক দিয়ে এগুলো একই শর্ত। কারণ প্রথম শর্ত হচ্ছে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয় এবং দ্বিতীয় শর্ত নিজেকে খেয়াল-খুশি থেকে বিরত রাখা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ভয়ই মানুষকে খেয়াল-খুশির অনুসরণ থেকে বিরত রাখে। কাযী সানাউল্লাহ পনিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে খেয়ালা-খুশির বিরোধিতার তিনটি স্তর উল্লেখ করেছেন। প্রথম স্তর এই যে, যেসব ভ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাস কুরআন, হাদীস এবং ইজমার বিপরীত, সেগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা। কেউ এই স্তরে পৌঁছলেই সে সুন্নী মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য হয়।

মধ্যম স্তর এই যে, কোনো গোনাহ্ করার সময় আল্লাহর সামনে জবাবদিহির কথা চিন্তা করে গোনাহ্ থেকে বিরত থাকা। সন্দেহজনক কাজ থেকেও বিরত থাকা এবং কোনো জায়েজ কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে কোনো নাজায়েজ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সেই জায়েজ কাজ থেকে বিরত থাকাও এই মধ্যম স্তরের পরিশিষ্ট। হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকে, সে তার আবরু ও ধর্মকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হয়, সে পরিশেষে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে। যে কাজে জায়েজ ও নাজায়ের উভয়বিধ সম্ভাবনা থাকে তাকেই সন্দেহজনক কাজ বলা হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে সন্দেহ দেখা দেয় যে, কাজটি তার জন্য জায়েজ না নাজায়েজ। উদাহরণত জনৈক রুগ্ণ ব্যক্তি অজু করতে সক্ষম কিন্তু অজু করা তার জন্য ক্ষতিকরই হবে এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস নেই। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েজ কিনা, তা সন্দেহযুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে কিন্তু খুব বেশি কষ্ট হয়। এমতাবস্থায় বসে নামাজ পড়া জায়েজ কিনা তা সন্দিগ্ধ হয়ে গেল। এরূপ ক্ষেত্রে সন্দিগ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে নিশ্চিত জায়েজ কাজ করা তাকওয়া এবং খেয়াল-খুশির বিরোধিতার মধ্যম স্তর।

নফসের চক্রান্ত : যেসব বিষয় প্রকাশ্য গোনাহ্, সেসব বিষয়ে খেয়াল-খুশির বিরোধিতা করার চেষ্টা করলে যে কেউ নিজে নিজেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু খেয়াল–খুশি এমনও রয়েছে, যেগুলো ইবাদত ও সৎ কর্মে শামিল হয়ে যায়। রিয়া, নাম-যশ, আত্মপ্রীতি এমন সূক্ষ্ম গোনাহ্ ও খেয়ালা-খুশি, যাতে মানুষ প্রায়শই ধোঁকা খেয়ে নিজের কর্মকে সঠিক ও বিশুদ্ধ মনে করতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই খেয়াল-খুশির বিরোধিতা করাই সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক জরুরি। কিন্তু এ থেকে আত্মরক্ষা করার একটি মাত্র অব্যর্থ ও অমোঘ ব্যবস্থাপত্র আছে। তা এই যে, এমন শায়খে-কামেল তালাশ করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে, জিনি কোনো সুদক্ষ শায়খের সংসর্গে থেকে সাধনা করেছেন এবং নফসের দোষত্রুটি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন।

শায়খ-ইমাম ইয়াকূব কারখী (র.) বলেন : আমি প্রথম বয়সে কাঠমিস্ত্রী ছিলাম। আমি নিজের মধ্যে এক প্রকার শৈথিল্য ও অন্ধকার অনুভব করে কয়েকদিন রোজা রাখার ইচ্ছা করলাম, যাতে এই অন্ধকার ও শৈথিল্য দূর হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এই রোজা রাখা অবস্থায় আমি একদিন শায়খে-কামেল ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি মেহ্মানদের জন্য গৃহ থেকে আহার্য আনালেন এবং আমাকেও খাওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর বললেন : যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশির বান্দা, সে অত্যন্ত মন্দ বান্দা। এই খেয়াল-খুশি তাকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়ে। তিনি আরও বললেন : খেয়াল-খুশির অনুগামী হয়ে যে রোজা রাখা হয়, তার চেয়ে খানা খেয়ে নেওয়াই উত্তম। এসব কথাবার্তা শুনে আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আমি আত্মপ্রীতির শিকার হচ্ছিলাম এবং শায়খ তা ধরে ফেলেছেন। তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, জিক্‌র-আযকার ও নফল ইবাদতে কোনো শায়খে-কামেলের অনুমতি ও নির্দেশ দরকার। কেননা শায়খে-কামেল নফসের চক্রান্ত জানেন, বুঝেন। যে নফল ইবাদতে নফসের চক্রান্ত থাকবে, তিনি তা করতে নিষেধ করবেন। আমি শায়খের নিকট আরজ করলাম, হযরত, পরিভাষায় যাকে ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ বলা হয়, এরূপ শায়খ পাওয়া না গেলে কি করতে হবে? শায়খ বললেন : এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের পর বিশবার করে দৈনিক একশ বার ইস্তেগফার করা উচিত। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : আমি মাঝে মাঝে অন্তরে মলিনতা অনুভব করি। তখন আমি প্রত্যহ একশ বার এস্তেগফার অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

খেয়াল-খুশির বিরোধিতার তৃতীয় স্তর এই যে, অধিক জিক্‌র, অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে নফসকে এমন পবিত্র করা, যাতে খেয়াল-খুশির চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট না থাকে। এটা বিশেষ ওলীত্বের স্তর এবং তা সেই ব্যক্তিরই হাসিল হয়, যাকে সূফী বুযুর্গগণের পরিভাষায় ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ বলা হয়। এই শ্রেণির ওলীগণের সম্পর্কেই কুরআনে শয়তানকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ –অর্থাৎ আমার বিশেষ বান্দাদের উপর তোর কোনো ক্ষমতা চলবে না। এক হাদীসেও তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ –অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ কামেল মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ তার খেয়াল-খুশী আমার শিক্ষার অনুসারী না হয়ে যায়। কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ

-কে কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ও সময় বলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করত। সূরার উপসংহারে তাদের এই হঠকারিতার জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার রহস্য বলে এ বিষয়ের জ্ঞান নিজের জন্যই নির্দিষ্ট রেখেছেন। এবং এই সংবাদ কোনো ফেরেশতা অথবা রাসূল ﷺ-কে তিনি দেন নি। কাজেই এ দাবি অসার।

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَازِعَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার نَزْعٌ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– যে ফেরেশতাগণ প্রাণ বের করে, উৎপাটনকারী, অপসারণকারী

اَلنَّاشِطَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার نَشْطٌ মূলবর্ণ (ن ـ ش ـ ط) জিনস صحيح অর্থ– বন্ধন মুক্তকারী

اَلسَّابِحَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার سَبْحٌ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তীব্র গতিতে সঞ্চরণকারী

اَلسَّابِقَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার سَبْقٌ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– যারা দ্রুত বেগে দৌড়ায়, অগ্রগামী, অগ্রবর্তী।

اَلْمُدَبِّرَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَدْبِيْرٌ মূলবর্ণ (د ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– নিয়ন্ত্রণকারী, পরিণাম চিন্তাকারী, অপেক্ষা কারী।

تَرْجُفُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجْفٌ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– প্রকম্পিত করবে।

اَلرَّادِفَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার رَدْفٌ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাতগামি বস্তু।

وَاجِفَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার وَجْفٌ মূলবর্ণ (و ـ ج ـ ف) জিনস مثال واوى অর্থ– ধড়ফড়কারী, কম্পমান।

مَرْدُوْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার رَدٌّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পূর্বাবস্থায় গমনকারী।

حَافِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার حَفْرٌ মূলবর্ণ (ح ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– পূর্বাবস্থা, প্রারম্ভ।

سَاهِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার سَهْرٌ মূলবর্ণ (س ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– মাঠে এসে উপস্থিত হবে, জমিন, ময়দানের নরম ভূমি।

طَامَّةٌ : অর্থ– মহাসঙ্কট, মহাবিপদ, বিরাট বিশৃঙ্খলা, طَمٌّ থেকে নির্গত। যার অর্থ– গিলে ফেলা, আচ্ছন্ন করা। কোনো জিনিস এত বেড়ে যাওয়া যে, তা সর্বত্র ছেয়ে যায় কিংবা প্রবল হয়ে যায়। তাই طَامَّةٌ-এর অর্থ করা হয়, মহাবিপদ।

بُرِّزَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْرِيْزٌ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ز) জিনস صحيح অর্থ– প্রকাশ করা হবে।

نَهٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَهْىٌ মূলবর্ণ (ن ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিবৃত্ত রেখেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَقُوْلُوْنَ হলো ফে'ল তার যমীর হলো ফায়েল। يَقُوْلُوْنَ বাক্যটি উহ্য মুবতাদার খবর। এখানে : يَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ অর্থাৎ اَئِنَّا-এর হামযাটি استفهام انكارى-এর জন্য। আর ان হলো হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল, আর نَا হলো اسم ان আর لَمَرْدُوْدُوْنَ হলো خبر ان আর فِى الْحَافِرَةِ টা مَرْدُوْدُوْنَ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আবার এটা حال হওয়ার ভিত্তিতে উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হওয়া ও জায়েজ। [ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ২০৭]

سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

সূরা 'আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৪২, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. রাসূল ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।	عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۝١
২. এ কারণে যে, তার নিকট এক অন্ধ এসেছে।	اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢
৩. আপনি কি জানেন হয়তো সে [উপদেশে] সংশোধিত হতো।	وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ۝٣
৪. অথবা নসিহত গ্রহণ করত, অনন্তর নসিহত তাকে সুফল প্রদান করত।	اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤
৫. আর যে বেপরোয়া ভাব দেখায়।	اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥
৬. বস্তুত আপনি তার ভাবনায় পড়েছেন।	فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦
৭. অথচ সে সংশোধিত না হলে আপনার উপর কোনো দোষারোপ নেই।	وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧
৮. আর যে আপনার নিকট দৌড়ে আসে।	وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. عَبَسَ রাসূল ভ্রুকুঞ্চিত করলেন وَتَوَلّٰى এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

২. اَنْ جَآءَهُ এ কারণে যে, তার নিকট এসেছে الْاَعْمٰى এক অন্ধ।

৩. وَمَا يُدْرِيْكَ আপনি কি জানেন لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى হয়তো সে [উপদেশে] সংশোধিত হতো।

৪. اَوْ يَذَّكَّرُ অথবা নসিহত গ্রহণ করত فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى অনন্তর নসিহত তাকে সুফল প্রদান করত।

৫. اَمَّا مَنِ আর যে ব্যক্তি اسْتَغْنٰى বেপরোয়া ভাব দেখায়।

৬. فَاَنْتَ বস্তুত আপনি لَهٗ تَصَدّٰى তার ভাবনায় পড়েছেন।

৭. وَمَا عَلَيْكَ অথচ আপনার উপর কোনো দোষারোপ নেই اَلَّا يَزَّكّٰى সে সংশোধিত না হলে

৮. وَاَمَّا مَنْ আর যে ব্যক্তি جَآءَكَ আপনার নিকট আসে يَسْعٰى দৌড়ে।

অনুবাদ	আয়াত
৯. এবং সে [আল্লাহকে] ভয়ও করে।	وَهُوَ يَخْشٰى ﴿٩﴾
১০. আপনি তাকে উপেক্ষা করেন।	فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ﴿١٠﴾
১১. কখনোই এরূপ করবেন না, কুরআন নসিহতের বাণী।	كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾
১২. সুতরাং যার ইচ্ছা সে তা গ্রহণ করুক [ইচ্ছা না হয়, না করুক]।	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿١٢﴾
১৩. তা এমন পুস্তিকাসমূহের মধ্যে রয়েছে, যা সম্মানিত।	فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾
১৪. যা সমুন্নত পবিত্র।	مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾
১৫. যা এমন লিখকদের হস্তে রয়েছে,	بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾
১৬. যারা সম্মানিত [ও] নেককার।	كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾
১৭. মানুষের উপর লা'নত, সে কত অকৃতজ্ঞ।	قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾
১৮. আল্লাহ তাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন।	مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾
১৯. শুক্র হতে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তাকে পরিমিতভাবে বানিয়েছেন।	مِنْ نُّطْفَةٍ ۭ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَهُوَ এবং সে يَخْشٰى [আল্লাহকে] ভয় করে।

১০. فَاَنْتَ আপনি عَنْهُ تَلَهّٰى তাকে উপেক্ষা করেন।

১১. كَلَّآ কখনোই এরূপ করবেন না, اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ কুরআন নসিহতের বাণী।

১২. فَمَنْ شَآءَ সুতরাং যার ইচ্ছা ذَكَرَهٗ সে তা গ্রহণ করুক ।

১৩. فِيْ صُحُفٍ তা এমন পুস্তিকাসমূহের মধ্যে রয়েছে مُّكَرَّمَةٍ যা সম্মানিত।

১৪. مَّرْفُوْعَةٍ যা সমুন্নত مُّطَهَّرَةٍ পবিত্র।

১৫. بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ যা এমন লিখকদের হস্তে রয়েছে,

১৬. كِرَامٍۭ যারা সম্মানিত بَرَرَةٍ [ও] নেককার।

১৭. قُتِلَ الْاِنْسَانُ মানুষের উপর লা'নত مَآ اَكْفَرَهٗ সে কত অকৃতজ্ঞ।

১৮. مِنْ اَيِّ شَيْءٍ আল্লাহ কোন বস্তু হতে خَلَقَهٗ তাকে সৃষ্টি করেছেন ।

১৯. مِنْ نُّطْفَةٍ শুক্র হতে خَلَقَهٗ তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন فَقَدَّرَهٗ অনন্তর তাকে পরিমিতভাবে বানিয়েছেন।

২০. অতঃপর তার [বহির্গমনের] পথ সহজ করে দিয়েছেন।	ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٠﴾
২১. অতঃপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন, পরে কবরে স্থাপন করেছেন।	ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾
২২. অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন তাকে পুনরায় জীবিত করবেন।	ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾
২৩. না, কখনো না, তাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে তা পালন করেনি।	كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾
২৪. সুতরাং মানুষ যেন স্বীয় খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখে।	فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾
২৫. আমিই প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি।	أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾
২৬. অনন্তর জমিনকে সুন্দররূপে বিদীর্ণ করেছি।	ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾
২৭. অনন্তর তাতে শস্য উৎপাদন করেছি।	فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾
২৮. এবং আঙ্গুর ও শাক-সবজি।	وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾
২৯. এবং যায়তুন ও খেজুর।	وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾
৩০. এবং নিবিড় উদ্যানসমূহ।	وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. ثُمَّ السَّبِيلَ অতঃপর তার [বহির্গমন] পথ يَسَّرَهُ সহজ করে দিয়েছেন।

২১. ثُمَّ أَمَاتَهُ অতঃপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন فَأَقْبَرَهُ পরে কবরে স্থাপন করেছেন।

২২. ثُمَّ إِذَا شَاءَ অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন أَنْشَرَهُ তাকে পুনরায় জীবিত করবেন।

২৩. كَلَّا না কখনো না لَمَّا يَقْضِ সে পালন করেনি مَا أَمَرَهُ তাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা।

২৪. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ সুতরাং মানুষ যেন দৃষ্টিপাত করে দেখে إِلَىٰ طَعَامِهِ স্বীয় খাদ্যের প্রতি।

২৫. أَنَّا صَبَبْنَا আমিই বর্ষণ করেছি الْمَاءَ صَبًّا প্রচুর পানি।

২৬. ثُمَّ شَقَقْنَا অনন্তর বিদীর্ণ করেছি الْأَرْضَ شَقًّا জমিনকে সুন্দররূপে।

২৭. فَأَنْبَتْنَا অনন্তর উৎপাদন করেছি فِيهَا حَبًّا তাতে শস্য।

২৮. وَعِنَبًا এবং আঙ্গুর وَقَضْبًا ও শাক-সবজি।

২৯. وَزَيْتُونًا এবং যায়তুন وَنَخْلًا ও খেজুর।

৩০. وَحَدَائِقَ এবং উদ্যানসমূহ غُلْبًا নিবিড়।

৩১. এবং ফল-ফলাদি ও তৃণলতা।	وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿٣١﴾
৩২. এটা তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর উপকারস্বরূপ	مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾
৩৩. অনন্তর যখন কর্ণবিদারক নাদ [অর্থাৎ কিয়ামত] উপস্থিত হবে [তখন পথভ্রষ্টতার পরিণাম বুঝতে পারবে।]	فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾
৩৪. যেদিন মানুষ নিজের ভাই হতে পলায়ন করবে।	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾
৩৫. এবং নিজের মাতা ও পিতা হতে।	وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং স্বীয় পত্নী ও সন্তান-সন্ততি হতেও [অর্থাৎ কেউ কারো প্রতি সহানুভূতি দেখাবে না]।	وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿٣٦﴾
৩৭. তাদের প্রত্যেকেরই সেদিন এমন ব্যস্ততা হবে যে, তা তাকে অন্য দিকে মনোযোগী হতে দিবে না।	لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾
৩৮. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন [ঈমানের বরকতে] দীপ্তিমান হবে।	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾
৩৯. [আনন্দে] হাস্যোজ্জ্বল, হর্ষোৎফুল্ল হবে।	ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾
৪০. আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন [কুফরের কারণে] অন্ধকার হবে।	وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾
৪১. [এবং অন্ধকারের সাথে সাথে] তাদের উপর [বিষাদের] মলিনতা সমাচ্ছন্ন হবে।	تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾
৪২. তারাই কাফের, দুষ্কার্যকারী লোক।	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَّفَاكِهَةً এবং ফল-ফলাদি وَّاَبًّا ও তৃণলতা।
৩২. مَّتَاعًا উপকারস্বরূপ لَّكُمْ তোমাদের জন্য وَلِاَنْعَامِكُمْ এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য।
৩৩. فَاِذَا جَآءَتِ অনন্তর যখন উপস্থিত হবে الصَّآخَّةُ কর্ণবিদারক নাদ।
৩৪. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ যেদিন মানুষ পলায়ন করবে مِنْ اَخِيْهِ নিজের ভাই হতে ।
৩৫. وَاُمِّهٖ এবং নিজের মাতা وَاَبِيْهِ ও পিতা (হতে)।
৩৬. وَصَاحِبَتِهٖ এবং স্বীয় পত্নী وَبَنِيْهِ ও সন্তান-সন্ততি হতেও।
৩৭. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ তাদের প্রত্যেকেরই يَوْمَئِذٍ সেদিন شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ এমন ব্যস্ততা হবে যে, তা তাকে অন্য দিকে মনোযোগী হতে দিবে না।
৩৮. وُجُوْهٌ অনেক মুখমণ্ডল يَّوْمَئِذٍ সেদিন [ঈমানের বরকতে] مُّسْفِرَةٌ দীপ্তিমান হবে।
৩৯. ضَاحِكَةٌ হাস্যোজ্জ্বল مُّسْتَبْشِرَةٌ হর্ষোৎফুল্ল হবে।
৪০. وَوُجُوْهٌ আর অনেক মুখমণ্ডল يَّوْمَئِذٍ সেদিন عَلَيْهَا غَبَرَةٌ অন্ধকার হবে।
৪১. تَرْهَقُهَا তাদের উপর সমাচ্ছন্ন হবে قَتَرَةٌ মলিনতা
৪২. اُولٰٓئِكَ هُمُ তারাই الْكَفَرَةُ কাফের الْفَجَرَةُ দুষ্কার্যকারী লোক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরাটির প্রথম শব্দ عَبَسَ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে 'আবাসা' -কুরআন মাজীদের অন্যান্য সূরার ন্যায় এতেও تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ -এর রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সূরাটির আরো কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন– الْاَعْمٰى ও السَّفَرَةُ وَالصَّاخَّةُ ইত্যাদি।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : মুফাসসির মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য অনুযায়ী আলোচ্য সূরাটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-এর সাথে নবী করীম ﷺ-এর একটি আচরণকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, একবার নবী করীম ﷺ-এর দরবারে মক্কার কতিপয় বড় বড় সরদার ও সমাজপতি বসেছিল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে ইবনে উম্মে মাকতূম নামে একজন অন্ধ সাহাবী নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন। এ সময়ে নবী করীম ﷺ-এর বাক্যালাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় তিনি এতে কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন এবং তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এ সময় আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়। ঐতিহাসিক ঘটনা হতে আলোচ্য সূরাটি নবী করীম ﷺ -এর মক্কায় অবস্থানকালে ইসলামের প্রথম দিকেই নাজিল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রথমত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং হাফেজ ইবনে হাজার ও ইবনে কাছীর (র.) প্রমুখগণ লিখেছেন– اِنَّهُ اَسْلَمَ بِمَكَّةَ قَدِيْمًا

দ্বিতীয়ত হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা হতে দেখা যায় যে, উপরিউক্ত ঘটনার সময় তিনি হয়ত পূর্ব হতেই মুসলমান ছিলেন, না হয় তখন ইসলাম গ্রহণের জন্যই প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এক বর্ণনায় আছে, তিনি এসে বললেন يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ অন্য দিকে অত্র সূরার ৩নং আয়াত لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى -এর তাফসীরে ইবনে জারীর (র.) লিখেছেন– لَعَلَّهُ يُسْلِمُ

তৃতীয়ত নবী করীম ﷺ-এর দরবারে তখন যারা বসা ছিল হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী তারা হলো উতবাহ, শাইবাহ, আবূ জাহল ও উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখগণ। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, তখনো তাদের সাথে মহানবী ﷺ-এর মেলামেশা ও উঠাবসা চালু ছিল এবং সংঘাত চরম আকার ধারণ করেনি। উপরিউক্ত বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বুঝা যায় যে, উক্ত সূরাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কায় নাজিল হয়েছে।

আয়াতের সংখ্যা : অত্র সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এতে ৪২টি আয়াত, ১৩০টি বাক্য এবং ৫৩৫টি অক্ষর রয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি ও সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরায় দানের পদ্ধতি, উপদেশ গ্রহণ না করার প্রতি তিরস্কার, উপদেশ গ্রহণে বিমুখ ব্যক্তিদের পারলৌকিক শাস্তি এবং উপদেশ গ্রহণকারীদের পারলৌকিক পুরস্কারের বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সূরার প্রথমাংশ মধ্যমাংশের ভূমিকা এবং মধ্যমাংশ শেষাংশের ভূমিকা, আর শেষাংশ হলো মূলবক্তব্য বিষয়।

প্রথমাংশে শুরু করার ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, অন্ধ ব্যক্তির প্রতি অমনোযোগিতা ও বড় বড় নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি সাগ্রহ মনোযোগিতা প্রদর্শন করায় নবী করীম ﷺ-এর প্রতি শাসন ও তিরস্কারমূলক বাণী অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু সম্পূর্ণ সূরাটির প্রতি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে জানা যায়, এ সূরায় মূলত কাফের কুরাইশ সর্দারদের প্রতিই চরম অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা তারা সত্যবিমুখতার কারণে দীনের দাওয়াতকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর সে সঙ্গে নবী করীম ﷺ-কে দীন প্রচারের সঠিক পন্থা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রাথমিকভাবে নবুয়তের কাজ সম্পাদনের যেসব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেগুলোর ভ্রান্তি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। নবী করীম ﷺ কুরাইশ সরদারদের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং অন্ধকে অবজ্ঞা করেছেন। আপত দৃষ্টিতে এরূপ মনে হলেও মূল ব্যাপারটি ছিল ভিন্নতর! মূলত কোনো মতাদর্শ প্রচারকের প্রাথমিক লক্ষ্যই থাকে সামনে প্রভাবশালী লোকদের প্রতি। অন্ধ ব্যক্তি কর্তৃত্বহীন ও দুর্বল বলে তার প্রতি উপেক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল না। আর এর মূলে দীনি দাওয়াতের উৎকর্ষের প্রতি গভীর আন্তরিকতাই ছিল একমাত্র কারণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে বুঝিয়ে দিলেন যে, ইসলামি আদর্শ প্রচারের এটা সঠিক পন্থা নয়। প্রকৃতপক্ষে সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বের অধিকারী, সে যত দুর্বল ও প্রভাবহীনই হোক না কেন। পক্ষান্তরে যাদের সত্যানুরাগ নেই তারা সামাজিকভাবে যত প্রভাব, প্রতিপত্তিশালীই হোক না কেন, তারা গুরুত্বহীন।

প্রথম হতে ১৬ আয়াত পর্যন্ত এ কথাগুলো বলার পর ১৭ আয়াত হতে ঐ সমস্ত কাফেরদের প্রতি সরাসরি রোষ প্রকাশ করা হয়েছে যারা নবী করীম ﷺ -এর দীনি দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ পর্যায়ে তারা নিজেদের স্রষ্টা ও

প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি যে আচরণ অবলম্বন করেছিল এর প্রতি প্রথমে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে এবং শেষে পরকালে তাদেরকে এজন্য চরম সংকটের সম্মুখীন হতে হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : এ সূরার পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কিয়ামতের কথাই বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সূরার শেষেও কিয়ামাতের বিষয় বিবৃত হয়েছে। এ জন্য অনুমিত হয় যে, কিয়ামতের বর্ণনাই এ সূরার উদ্দেশ্যগত অঙ্গ। শেষাংশে কিয়ামত বিষয়ক বর্ণনায় বিশেষভাবে কাফেরদের কঠোর শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, সূরার মধ্যমাংশের قُتِلَ الْإِنْسَانُ এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুসমূহের উল্লেখ করত একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামতগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো কিছুই প্রতিবন্ধকতা ছিল না; এতদসত্ত্বেও তারা যে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে, এটা চরম ধর্মদ্রোহিতা বৈ কিছু নয়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের প্রতি কঠোর আজাব হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

ধর্মদ্রোহীদের এ চরম অকৃতজ্ঞতা সংশোধনের জন্য নবী করীম ﷺ সর্বদা সচেষ্ট ও চিন্তান্বিত থাকতেন। এ কারণে কাফেরদেরকে উপদেশ দেওয়ার সময় অন্ধ সাহাবী কর্তৃক মাঝখানে তার কথায় ব্যাঘাত ঘটানোটা তাঁর নিকট কিছুটা বিরক্তিকরই ঠেকেছিল, কিন্তু কাফেরদের প্রতি হযরতের এ মনোযোগ এবং একজন ঈমানদারের প্রতি এ সামান্যতম উদাসীনতাকেও আল্লাহ পছন্দ করেননি। এ ক্ষেত্রে পরোক্ষ ঈমানের চেয়ে কাফেরদের প্রতি অধিক মর্যাদা প্রদর্শিত হয়ে যেত দেখে মার্জিত ভাষায় আল্লাহ হযরতকে কাফেরদের হেদায়েতের প্রশ্নে এত বেশি ব্যস্ত হতে নিষেধ করেছেন এবং সত্যিকার প্রেমিক ও ধর্মান্বেষীদের প্রতি সবিশেষে দৃষ্টি রাখতে উপদেশ দিয়েছেন।

সূরাটির শানে নুযূল : মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ সর্বসম্মতভাবে এ সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, একবার নবী করীম ﷺ-এর দরবারে কুরাইশ কাফেরদের কতিপয় নেতা উপস্থিত ছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনাতে তারা হলেন আবূ জাহল ইবনে হিশাম, উকবাহ ইবনে রাবীয়াহ, উবাই ইবনে খাল্ফ, উমাইয়া ইবনে খাল্ফ এবং শাইবাহ। রাসূলে কারীম ﷺ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করছিলেন। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম নামে এক অন্ধ সাহাবী রাসূলে কারীম ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ-কে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন। নবী করীম ﷺ তার এরূপ আচরণে রুষ্ট হলেন। কাজেই তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। তখন আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

কোনো কোনো বর্ণনা হতে জানা যায় যে, উক্ত সূরাটি নাজিল হওয়ার পর নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট গমন করে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন। এরপর যখন ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) মহানবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হতেন তখন নবী করীম ﷺ তার জন্য স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিতেন এবং বলতেন যে, مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِيْ رَبِّيْ অর্থাৎ যার কারণে আমার প্রভু আমাকে তিরস্কার করেছেন তাকে সুস্বাগতম। মাঝে মাঝে সফরে যাওয়ার সময় নবী করীম ﷺ হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে মদিনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। তিনি তাকে মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিনও নিয়োগ করেছিলেন। –[নূরুল কুরআন]

সূরাটির মর্যাদা : একটি হাদীসে বর্ণিত আছে "مَنْ قَرَءَ سُوْرَةَ عَبَسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهٗ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা আবাসা পাঠ করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে উজ্জ্বল চেহারায় উত্তোলন করবেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, উক্ত হাদীসখানা মাওযূ'।

عَبَسَ وَتَوَلّٰى [١] اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى [٢]

শানে নুযূল : তিরমিযী ও ইবনুল মুনজির প্রমুখ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত অন্ধ সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (র.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি একদা রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আমাকে উপদেশ করুন। সে সময়ে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মুশরিকদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের বৈঠক ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি লক্ষ্য করা থেকে বিরত থেকে অন্যদের প্রতি মনোযোগী হয়ে বললেন, আমি যা বলছি তাতে তুমি কি মন্দ কিছু বুঝেছ? সে বলল, না। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতদ্বয় নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ১৮৪/১৯, ফতহুল কাদীর ৩৮৬/৫, তাবারী ৪৪৩/১২, দুররে মানছূর ৩১৪,৬, ইবনে কাছীর ৪৮০/৪, রূহুল মা'আনী ৪৯/৩০/১৫]

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ [١٧]

শানে নুযূল : যাহ্হাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত উতবা বিন আবী লাহাব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে প্রথম দিকে ঈমান গ্রহণ করেছিল। অতঃপর যখন وَالنَّجْمِ সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন মুর্তাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে বলল, সূরা اَلنَّجْمِ ব্যতীত পূর্ণ কুরআনের প্রতি আমি ঈমান এনেছি। তখন

আল্লাহ তা'আলা তার ধ্বংস অনিবার্যতার ঘোষণা দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১৮৯/১৯, রূহুল মা'আনী ৫৫/৩০/১৫ বহরে মুহীত্ব ৪২০/৮, দুররে মানছুর ৩১৫/৩]

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ [٣٤] وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ [٣٥] وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ [٣٦]

শানে নুযূল–১ : যাহ্হাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিনে কাবিল তদীয় ভাই হাবিল হতে পালিয়ে থাকবে। হযরত নবী করীম ﷺ পালিয়ে থাকবেন নিজ মাতা হতে। নিজ পুত্র হতে পালিয়ে থাকবেন হযরত নূহ (আ.)। স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন হযরত লূত (আ.)। হযরত আদম (আ.) পৃথক থাকবেন নিজ পুত্রের দুষ্কর্ম হতে। কিয়ামতের দিনের সেই ভয়াবহ অবস্থায় যে অস্থিরতা বিরাজ করবে, তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : হাসান বলেন কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পিতা হতে পালিয়ে থাকবেন যিনি তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। মাতা হতে যিনি সর্ব প্রথম পালিয়ে থাকবেন তিনি হলেন মহানবী ﷺ সর্বপ্রথম পুত্র হতে যিনি পালিয়ে থাকবেন, তিনি হলেন হযরত নূহ (আ.)। ভাই হতে সর্বপ্রথম যিনি পালিয়ে থাকবেন তিনি হলেন হাবিল, আর স্ত্রী হতে সর্ব প্রথম যিনি পালিয়ে থাকবেন তিনি হলেন হযরত নূহ (আ.) ও হযরত লূত (আ.)। তাঁদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ১৯৫/১৯, দুররে মানছুর ৩১৭/৬, রূহুল মা'আনী ৬২/৩০/১৫, কাশ্শাফ ৭০৬]

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ [٤٠]

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম জাফর বিন মুহাম্মদ তাঁর পিতা দাদার মধ্যস্থতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিনে কাফেরদের মুখ পর্যন্ত পানি পৌঁছে যাবে। অতঃপর তাদের চেহারার উপর ধূলো-বালি ছুড়ে দেওয়া হবে। কিয়ামতের সেই ভয়াবহতা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর ৩১৭/৬]

শানে নুযূলে বর্ণিত অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে-মাকতূম (র.)-এর ঘটনায় ইমাম বগভী (র.) আরও রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) অন্ধ হওয়ার কারণে একথা জানতে পারেন নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন। তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আওয়াজ দিতে শুরু করেন এবং বারবার আওয়াজ দেন। –(মাযহারী) ইবনে কাসীরের এক রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরআনের একটি আয়াতের পাঠ জিজ্ঞেস করেন এবং সাথে সাথে জবাব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মক্কার কাফের নেতৃবর্গকে উপদেশ দানে মশগুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতবা ইবনে রাবীয়া, আবূ জাহল ইবনে হিশাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও মুসলমান হন নি। এরূপ ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-এর এভাবে কথা বলা এবং আয়াতের ভাষায় ঠিক করা মামুলী প্রশ্ন রেখে তাৎক্ষণিক জবাবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) পাক্কা মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তার এই জবাব বিলম্বিত করার মধ্যে কোনো ধর্মীয় ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। এর বিপরীত কুরাইশ নেতৃবর্গ সব সময় মজলিসে আগমন করতো না এবং যে কোনো সময় তাদের কাছে তাবলীগও করা যেত না। এ সময়ে তারা মনোনিবেশ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করছিল। ফলে তাদের ঈমান আনা আশাতীত ছিল না। তাদের কথাবার্তা কেটে দিলে ঈমানের আশাই সুদূরপরাহত ছিল। এ ধরনের পরিস্থিতির কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে আমল দেন নি এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তিনি কাফের নেতৃবর্গের সাথে কথাবার্তা অব্যাহত রাখেন। অতঃপর মজলিস সমাপ্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মপদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করে তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই কর্মপদ্ধতি নিজস্ব ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, যে মুসলমান কথাবার্তায় মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করে, তাকে কিছু হুঁশিয়ার করা দরকার, যাতে সে ভবিষ্যতে মজলিসের রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখে। এ কারণে তিনি আব্দুল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এছাড়া কুফর ও শিরক বাহ্যত সর্ববৃহৎ গোনাহ্। এর অবসানের চিন্তা আগে হওয়া উচিত। আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) তো ধর্মের একটি শাখাগত বিষয়ের শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিলেন মাত্র কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই ইজতিহাদকে সঠিক আখ্যা দেন নি এবং হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি ধর্মীয় শিক্ষার প্রত্যাশী হয়ে প্রশ্ন করেছিল, তার জবাবের উপকারিতা নিশ্চিত, আর যে বিরুদ্ধবাদি, কথা শুনতেও নারাজ, তার সাথে কথা বলার উপকারিতা অনিশ্চিত।

অতএব অনিশ্চিতকে নিশ্চিতের উপর কিরূপে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়? এটা সত্যি যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন কিন্তু কুরআনে أَعْمَىٰ –শব্দ ব্যবহার করে তাঁর ওজর বর্ণনা করে দিয়েছে যে, তিনি অন্ধ ছিলেন। তাই দেখতে সক্ষম ছিলেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখন কি কাজে মশগুল আছেন এবং কাদের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে। সুতরাং তিনি ক্ষমার্হ ছিলেন এবং বিমুখতা প্রদর্শনের পাত্র ছিলেন না। এ থেকে জানা যায় যে, কোনো অপারগ ব্যক্তির দ্বারা অজ্ঞাতসারে মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা নিন্দার্হ হবে না।

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ : প্রথম শব্দের অর্থ রুষ্টতা অবলম্বন করা এবং চোখে-মুখে বিরক্তি প্রকাশ করা। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটা মুখোমুখি সম্বোধন করে উপস্থিত পদবাচ্য দ্বারা এসব কথা বলার স্থান ছিল। কিন্তু তা না করে কুরআন পাক অনুপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করেছে। এতে ভর্ৎসনার স্থলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, কাজটি যেন অন্য কেউ করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এরূপ করা আপনার পক্ষে সমীচীন হয়নি। পরবর্তী وَمَا يُدْرِيكَ –(আপনি কি জানেন?) বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওজরের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, আপনার মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হয়নি যে, সাহাবীর জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উপকারিতা নিশ্চিত এবং কাফেরদের সাথে আলোচনার উপকারিতা অনিশ্চিত। এ বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্যের পরিবর্তে উপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করার মধ্যেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে। কেননা যদি কোথাও উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা না হতো, তবে সন্দেহ হতে পারত যে, এই কর্মপদ্ধতি অপছন্দ করার কারণেই মুখোমুখি সম্বোধন বর্জন করা হয়েছে। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য অসহনীয় কষ্টের কারণ হতো। সুতরাং প্রথম বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয় বাক্যে উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা– উভয়টির মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে।

لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ : অর্থাৎ আপনি কি জানেন, এই সাহাবী যা জিজ্ঞাসা করছিল, তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তা দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে পারত কিংবা কমপক্ষে আল্লাহকে স্মরণ করে প্রাথমিক উপকার লাভ করতে পারত। ذِكْرَىٰ শব্দের অর্থ আল্লাহকে বহুল পরিমাণে স্মরণ করা। –[সিহাহ]

এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে– يَذَّكَّرُ ও يَزَّكَّىٰ –প্রথমটির অর্থ পাক-পবিত্র হওয়া এবং দ্বিতীয়টির অর্থ উপদেশ লাভ করা। প্রথমটি সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্ভীরুদের স্তর। যারা নফসকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার নোংরামি থেকে পাক-সাফ করে নেয় এবং দ্বিতীয়টি ধর্মের পথে চলার প্রথম স্তর। কারণ যে আল্লাহর পথে চলা শুরু করে, তাকে আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত করা হয় -যাতে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভয় তার মনে উপস্থিত থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, এই সাহাবীকে শিক্ষা দিলে তাতে এক না এক উপকার হতোই–প্রথমটি, না হয় দ্বিতীয়টি। উভয় প্রকার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। –[মাযহারী]

প্রচার ও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কুরআনী মূলনীতি : এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে একই সময়ে দু'টি কাজ উপস্থিত হয়– ১. একজন মুসলমানকে শিক্ষা দান ও তার মনস্তুষ্টি বিধান এবং ২. অমুসলমানদের হেদায়তের দিকে মনোযোগ। কুরআন পাকের ইরশাদ একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, প্রথম কাজটি দ্বিতীয় কাজের অগ্রে সম্পাদন করতে হবে এবং দ্বিতীয় কাজের কারণে প্রথম কাজে বিলম্ব করা অথবা ত্রুটি করা বৈধ নয়। এ থেকে জানা গেল যে, মুসলমানদের শিক্ষা ও সংশোধনের চিন্তা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা থেকে অধিক গুরুত্ববহ ও অগ্রণী।

এতে সেসব আলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ রয়েছে, যারা অমুসলমানদের সন্দেহ দূরীকরণ এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার খাতিরে এমন সব কাণ্ড করে বসেন, যা দ্বারা সাধারণ মুসলমানদের মনে সন্দেহ-সংশয় অথবা অভিযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের উচিত এই কুরআনী দিক নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদের সংরক্ষণ ও অবস্থা সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আকবর এলাহাবাদী মরহুম চমৎকার বলেছেন :

بے وفا سمجھیں تمہیں اہل حرم اس سے بچو ☆ دیر والے کج ادا کہدیں یہ بدنامی بھلی

পরবর্তী আয়াতসমূহে কুরআন পাক এ বিষয়টিই পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার ও আপনার ধর্মের প্রতি বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করছে, আপনি তার চিন্তায় মশগুল আছেন যে, সে কোনোরূপে মুসলমান হোক। অথচ এটা আপনার দায়িত্ব নয়। সে মুসলমান না হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্মের জ্ঞান অন্বেষণে দৌড়ে আপনার কাছে আসে এবং সে আল্লাহকে ভয়ও করে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষা সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাকাপোক্ত মুসলমান করা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী। এর চিন্তা অধিক করা উচিত। অতঃপর কুরআন যে উপদেশবাণী এবং উচ্চামর্যাদাসম্পন্ন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

صُحُفٌ - فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ বলে লওহে মাহফুজ বোঝানো হয়েছে। এটা যদিও এক বস্তু কিন্তু সমস্ত ঐশী সহীফা এতে লিখিত আছে বলে একে বহুবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। مرفوعة বলে এর উচ্চমর্যাদা বোঝানো হয়েছে এবং مُطَهَّرَةٌ বলে বোঝানো হয়েছে যে, নাপাক মানুষ, হায়েজ ও নেফাসওয়ালী নারী এবং অজুহীন ব্যক্তি একে স্পর্শ করতে পারে না।

بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ - سَفَرَةٌ শব্দটি سَافِرٌ-এর বহুবচন হতে পারে। অর্থ হবে লিপিকার। এমতাবস্থায় এই শব্দ দ্বারা ফেরেশতা কেরামুন-কাতেবীন অথবা পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের ওহী লেখকগণকে বোঝানো হবে। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.)-এর তাফসীর।

سَفَرَةٌ -শব্দটি سَفِيْرٌ -এর বহুবচনও হতে পারে। অর্থ দূত। এমতাবস্থায় এর দ্বারা দূত ফেরেশতা, পয়গম্বরগণ এবং ওহী লেখক সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে। আলিমগণও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কেননা তাঁরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উম্মতের মধ্যবর্তী দূত। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কেরাতে বিশেষজ্ঞ কুরআন পাঠকও এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আর যে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ নয় কিন্তু কষ্টে-সৃষ্টে কেরাত শুদ্ধ করে নেয়, সে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে, কেরাতের ছওয়াবও কষ্ট করার ছওয়াব। এ থেকে জানা গেল যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অনেক ছওয়াব পাবে। –[মাযহারী]

অতঃপর মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব নিয়ামত ভোগ করে, সেসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও অনুভূত বিষয়। সামান্য চেতনাশীল ব্যক্তিও এগুলো বুঝতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথমে مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ বলে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, হে মানুষ, চিন্তা কর, আল্লাহ তোমাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নের জবাব নির্দিষ্ট– অন্য কোনো জবাব হতেই পারে না। তাই নিজেই জবাব দিয়েছেন: مِنْ نُّطْفَةٍ –অর্থাৎ মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ –অর্থাৎ কেবল বীর্য থেকে মানুষকে সৃষ্টিই করেন নি; বরং তাকে সুপরিমিতও করেছেন। তার গঠনপ্রকৃতি, আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ, গ্রন্থি, চক্ষু, নাক, কান ইত্যাদি এমন সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটু এদিক সেদিক হলে মানুষের আকৃতিই বিগড়ে যেত এবং কাজকর্ম দুরূহ হয়ে যেত।

قَدَّرَهٗ -শব্দের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যখন মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর চারটি বিষয়ের পরিমাণ লিখে দেন। (১) সে কি কি কাজ করবে এবং কিরূপে করবে, (২) তার বয়স কত হবে, (৩) কি পরিমাণ রিজিক পাবে এবং (৪) পরিণামে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগ্য হবে। –[বুখারী, মুসলিম]

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহস্য বলে মাতৃগর্ভের তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এবং সংরক্ষিত জায়গায় মানুষকে সৃষ্টি করেন। যার গর্ভে এই সৃষ্টিকর্ম চলে, সে নিজেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানে না। এরপর আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিই জীবিত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষের মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয়। চারপাঁচ পাউণ্ড ওজনের দেহটি সহীহ্ সালামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে তেমন কোনো দৈহিক ক্ষতি হয় না।

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ –নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করার পর পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যু ও কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কোনো বিপদ নয়-নিয়ামত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ "মৃত্যু মু'মিনের জন্য উপঢৌকনস্বরূপ"। এর মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। فَاَقْبَرَهٗ অর্থাৎ অতঃপর তাকে কবরস্থ করেছেন। বলা বাহুল্য, এটাও এক নিয়ামত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় যেখানে মরে সেখানেই পচে গলে যেতে দেন নি; বরং তাকে গোসল দিয়ে পাক-সাফ কাপড় পরিয়ে সম্মান সহকারে কবরে দাফন করে দেওয়া হয়। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, মৃত মানুষকে দাফন করা ওয়াজিব।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهٗ –এতে অবিশ্বাসী মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যে, আল্লাহর উপরিউক্ত নিদর্শনাবলি ও নিয়ামতরাজির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর বিধানাবলি পালন করা। কিন্তু হতভাগ্য মানুষ তা করেনি। অতঃপর মানবসৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তির মাঝখানে যেসব নিয়ামত মানুষ ভোগ করে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের রিজিক কিভাবে সৃষ্টি করা হয়? কিভাবে আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়ে মাটির নিচে চাপাপড়া বীজকে সজীব ও সতেজ করে তোলে। ফলে একটি সরু ও ক্ষীণকায় অংকুর মাটি ভেদ করে উপরে উঠে। অতঃপর তা থেকে হরেক রকমের শস্য, ফল-মূল ও বাগ-বাগিচা সৃষ্টি হয়। এসব নিয়ামত সম্পর্কে মানুষের বারবার অবহিত করার পর পরিশেষে আবার কিয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ - صَاخَّةٌ এমন কঠোর নাদ; যার ফলে মানুষ শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলে। এখানে কিয়ামতের হট্টগোল তথা শিঙ্গার ফুঁক বোঝানো হয়েছে।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ –এখানে হাশরের ময়দানে সকলের সমাবেশের দিন বোঝানো হয়েছে। সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। দুনিয়াতে যেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না, হাশরে তারাই নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারও খবর নিতে পারবে না; বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেক মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে-পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে থেকে মুখ লুকিয়ে ফিরবে। দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভ্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেশি পিতামাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশি স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হাশরের ময়দানে মু'মিন ও কাফেরের পরিণতি বর্ণনা করে সূরার ইতি টানা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

عَبَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عُبُوْسًا وَعَبْسًا মূলবর্ণ (ع - ب - س) জিনস صحيح অর্থ– ভ্রুকুঞ্চিত করলেন।

يُدْرِيْكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِدْرَاءً মূলবর্ণ (د - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আপনি কি জানেন, তোমাকে জানাবে

إِسْتَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِسْتِفْعَالٌ মাসদার إِسْتِغْنَاءً মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বেপরোয়া ভাব দেখায়।

تَصَدّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَصَدّٰى মূলবর্ণ (ص - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আপনি ভাবনায় পড়েছেন।

تَلَهّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَلَهّٰى মূলবর্ণ (ل - ه - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনি উপেক্ষা করেন।

مُطَهَّرَةٌ : সব ধরনের শারীরিক ও আত্মিক কলুষতা ও পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র। مُطَهَّرَةٌ অর্থাৎ مُتَنَزِّهَةٌ عَنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ তথা শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র। (জালালাইন) মাসদার تَطْهِيْرٌ বাব تَفْعِيْلٌ

لَمَّا يَقْضِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضرب মাসদার قضاء মূলবর্ণ (ق - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে পালন এখনও করেনি।

صَبَبْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَبًّا মূলবর্ণ (ص - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমি বর্ষণ করেছি, প্রবাহিত করলাম।

شَقَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার شَقٌّ মূলবর্ণ (ش - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিদীর্ণ করেছি, ভেঙ্গে ফেলেছি।

صَاخَّةٌ : এটি ইসমে ফায়েল বা মাসদার হবে। অর্থ, কর্ণবিদারী আওয়াজ। চিৎকার, হট্টগোল। সাইয়্যিদ মুরতাজা যুবায়দী বলেন, صَاخَّةٌ ঐ চিৎকারকে বলা হয়, যা কানকে ফাটিয়ে দেয় অর্থাৎ চিৎকারের প্রচণ্ডতার কারণে বয়রা করে দেয়। অথবা صَاخَّةٌ শব্দটি صَخَّ - يَصِخُّ -এর ইসমে ফায়েলের সীগাহ বা মাসদার। অর্থ, শোরগোল করে কান ফাটিয়ে দেওয়া।

مُسْفِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِسْفَارٌ মূলবর্ণ (س - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ– দীপ্তিমান, উজ্জ্বল, আলোকিত।

تَرْهَقُهَا : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার رَهْقٌ মূলবর্ণ (ر - ه - ق) জিনস صحيح অর্থ– তাদের উপর সমাচ্ছন্ন হবে।

اَلْفَجَرَةُ : বহুবচন, একবচন فَاجِرٌ। অর্থ– পাপী, নাফরমান। প্রকাশ্য পাপ কর্মকারী, সত্য ত্যাগকারী।

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা তাকভীর

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২৯, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হবে।	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾
২. আর যখন নক্ষত্রসমূহ খসে খসে পড়বে।	وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾
৩. আর যখন পর্বতসমূহকে চলমান করা হবে।	وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾
৪. আর যখন দশ মাসের পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে।	وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾
৫. আর যখন বন্য পশু সকল একত্র হবে।	وَإِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾
৬. আর যখন সাগরসমূহকে স্ফীত করা হবে।	وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾
৭. আর যখন এক এক রকমের লোকদেরকে [ভিন্ন ভিন্ন দলে] সমবেত করা হবে।	وَإِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾
৮. আর যখন জীবন্ত প্রোথিত [শিশু] কন্যাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে–	وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. إِذَا الشَّمْسُ সূর্যকে যখন كُوِّرَتْ নিষ্প্রভ করা হবে।

২. وَإِذَا النُّجُوْمُ আর যখন নক্ষত্রসমূহ انْكَدَرَتْ খসে খসে পড়বে।

৩. وَإِذَا الْجِبَالُ আর যখন পর্বতসমূহকে سُيِّرَتْ চলমান করা হবে।

৪. وَإِذَا الْعِشَارُ আর যখন দশ মাসের পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী عُطِّلَتْ উপেক্ষিত হবে।

৫. وَإِذَا الْوُحُوْشُ আর যখন বন্য পশুগুলোকে حُشِرَتْ একত্র করা হবে।

৬. وَإِذَا الْبِحَارُ আর যখন সাগরসমূহকে سُجِّرَتْ স্ফীত করা হবে।

৭. وَإِذَا النُّفُوْسُ আর যখন এক এক রকমের লোকদেরকে زُوِّجَتْ জোড়ায় জোড়ায় সমবেত করা হবে।

৮. وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ আর যখন জীবন্ত প্রোথিত [শিশু] কন্যাদেরকে سُئِلَتْ জিজ্ঞাসা করা হবে।

৯. তাকে কী অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল?	بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾
১০. আর যখন আমলনামাসমূহ উন্মোচিত হবে।	وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾
১১. আর যখন আসমান খুলে দেওয়া হবে।	وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾
১২. আর যখন দোজখকে প্রজ্বলিত করা হবে।	وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾
১৩. আর যখন বেহেশতকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।	وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾
১৪. [সিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুৎকারের ফলে যখন এই ঘটনাগুলো ঘটবে, তখন] প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আমলসমূহ জানতে পারবে। যা নিয়ে সে এসেছে।	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾
১৫. অতএব, আমি সে নক্ষত্রপুঞ্জের কসম করছি, যারা পিছনে হটতে থাকে।	فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾
১৬. [অতঃপর পিছনের দিকেই] চলতে থাকে [এবং স্ব স্ব উদয়স্থলে] আত্মগোপন করে।	الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾
১৭. আর রাতের কসম! যখন তা গমনোদ্যত হয়।	وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾
১৮. আর প্রাতঃকালের কসম! যখন তা আগমন করতে থাকে।	وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾
১৯. নিশ্চয় এই কুরআন এক সম্মানিত ফেরেশতা [হযরত জিবরাঈল (আ.)] কর্তৃক আনীত [আল্লাহর] বাণী।	اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. بِاَيِّ ذَنْۢبٍ কী অপরাধে قُتِلَتْ তাকে হত্যা করা হয়েছিল?

১০. وَاِذَا الصُّحُفُ আর যখন আমলনামাসমূহ نُشِرَتْ উন্মোচিত হবে।

১১. وَاِذَا السَّمَآءُ আর যখন আসমান كُشِطَتْ খুলে দেওয়া হবে।

১২. وَاِذَا الْجَحِيْمُ আর যখন দোজখকে سُعِّرَتْ প্রজ্বলিত করা হবে।

১৩. وَاِذَا الْجَنَّةُ আর যখন বেহেশতকে اُزْلِفَتْ নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।

১৪. عَلِمَتْ نَفْسٌ প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে مَّآ اَحْضَرَتْ (সেই আমলসমূহ) যা নিয়ে সে এসেছে।

১৫. فَلَآ اُقْسِمُ অতএব আমি কসম করছি بِالْخُنَّسِ সে নক্ষত্রপুঞ্জের যারা পিছনে হটতে থাকে।

১৬. الْجَوَارِ চলতে থাকে الْكُنَّسِ আত্মগোপন করে।

১৭. وَالَّيْلِ আর রাতের কসম اِذَا عَسْعَسَ যখন তা গমনোদ্যত হয়।

১৮. وَالصُّبْحِ আর প্রাতঃকালের কসম اِذَا تَنَفَّسَ যখন তা আগমন করতে থাকে।

১৯. اِنَّهٗ لَقَوْلُ নিশ্চয় তা (এই কুরআন) আনীত বাণী رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ এক সম্মানিত ফেরেশতার।

অনুবাদ	আয়াত
২০. যিনি শক্তিশালী [এবং] আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাবান।	ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿٢٠﴾
২১. [আর] সেখানে [অর্থাৎ আসমানসমূহে] তার কথা প্রতিপালিত হয়, [এবং] তিনি বিশ্বাসভাজন।	مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿٢١﴾
২২. আর তোমাদের এই সঙ্গী [মুহাম্মদ (সা.)] উন্মাদ নন।	وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾
২৩. আর তিনি সেই ফেরেশতাকে পরিষ্কার আকাশ প্রান্তে দর্শন করেছেন।	وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾
২৪. আর তিনি [ওহী দ্বারা জ্ঞাত] গুপ্ত কথাগুলোর ব্যাপারে কৃপণও নন।	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾
২৫. আর এই কুরআন কোনো বিতাড়িত শয়তানের কথাও নয়।	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾
২৬. তোমরা কোন দিকে চলে যাচ্ছ?	فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. এটা তো বিশ্ববাসীদের জন্য এক বিরাট নসিহতনামা।	اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. এমন লোকদের জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে ইচ্ছুক।	لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾
২৯. আর তোমরা সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুর ইচ্ছা করতে পার না।	وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. ذِىْ قُوَّةٍ যিনি শক্তিশালী عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ (এবং) আরশের মালিকের নিকট مَكِيْنٍ মর্যাদাবান।

২১. مُّطَاعٍ ثَمَّ সেখানে তার কথা প্রতিপালিত হয় اَمِيْنٍ (এবং) তিনি বিশ্বাসভাজন।

২২. وَمَا صَاحِبُكُمْ আর তোমাদের এই সঙ্গী নন بِمَجْنُوْنٍ উন্মাদ।

২৩. وَلَقَدْ رَاٰهُ আর তিনি সেই ফেরেশতাকে দর্শন করেছেন بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ পরিষ্কার আকাশ প্রান্তে।

২৪. وَمَا هُوَ আর তিনি নন عَلَى الْغَيْبِ গুপ্ত কথাগুলোর ব্যাপারে بِضَنِيْنٍ কৃপণও।

২৫. وَمَا هُوَ আর এটা (কুরআন) নয় بِقَوْلِ কথা شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ কোনো বিতাড়িত শয়তানের।

২৬. فَاَيْنَ কোন দিকে تَذْهَبُوْنَ তোমরা চলে যাচ্ছ?

২৭. اِنْ هُوَ اِلَّا এটা তো কেবল ذِكْرٌ এক বিরাট নসিহতনামা لِّلْعٰلَمِيْنَ বিশ্ববাসীদের জন্য।

২৮. لِمَنْ এমন লোকদের জন্য شَآءَ مِنْكُمْ যে তোমাদের মধ্যে ইচ্ছুক اَنْ يَّسْتَقِيْمَ সরল পথে চলতে।

২৯. وَمَا تَشَآءُوْنَ আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না اِلَّآ তবে পার اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ আল্লাহ ইচ্ছা করলে رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : تَكْوِيْر অর্থ : সংকোচন। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতের كورت শব্দের মাসদার 'তাকভীর' হতে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এর অর্থ সংকুচিত করা বা গুটিয়ে নেওয়া। এর এ নামকরণের বিশেষত্ব হলো, সূরাটিতে সূর্যরশ্মিকে সংকুচিত করা বা নিষ্প্রভ করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এতে ২৯টি আয়াত, ১০৪টি বাক্য এবং ৫৩৩টি অক্ষর রয়েছে। [নূরুল কুরআন]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আবাসায় কিয়ামতের দিনের মহাবিপদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, সে বিপদ সংকুল সময় একান্ত আপনজনও একে অন্যের খবর নিবে না; বরং একে অপরের নিকট হতে পলায়নপর হবে। আর অত্র সূরায় কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ দৃশ্যের বিবরণ স্থান পেয়েছে। –[নূরুল কুরআন]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরার আলোচিত বিষয়াদি এবং কথার ভঙ্গি দেখে স্পষ্ট মনে হয়- এটা মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে একটি। এর বিষয়বস্তু জানার জন্য তাফসীরে খাযেনে উল্লিখিত সহীহ তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসই যথেষ্ট। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কারো কিয়ামতের দিনকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে, সে যেন সূরা আত-তাকভীর ও সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে।

এ সূরায় দু'টি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। একটি পরকাল অপরটি রেসালত। প্রথম তেরটি আয়াতে 'কিয়ামত' অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের দশটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়টি আয়াতে মহাপ্রলয়ের ভয়াবহ বিভীষিকার বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, নক্ষত্রমালা কক্ষচ্যুত হয়ে খসে পড়বে, পর্বতসমূহ উৎপাটিত হয়ে মেঘের মতো শূন্যে উড়তে থাকবে, ভয়-বিহ্বল মানুষের একান্ত প্রিয় বস্তুর প্রতিও লক্ষ্য থাকবে না। বন-জঙ্গলের জীব-জন্তু দিকবিদিক জ্ঞানহারা হয়ে একস্থানে সমবেত হবে, সমুদ্রের পানি উদ্বেলিত হয়ে আগুন জ্বলে উঠবে। এর পরবর্তী সাতটি আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এ সময় আত্মাসমূহ নতুন করে দেহের মধ্যে সংযোজিত হবে, আমলনামা দেখানো হবে, অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে, আকাশসমূহের সমস্ত আবরণ দূর হবে এবং বেহেশত ও দোজখ তখন চোখের সামনে ভেসে উঠবে। পরকালের এ বর্ণনা প্রদানের পর মানুষকে চিন্তা করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সেদিন প্রত্যেকেই জানতে পারবে, সে ইহকাল হতে কি সম্বল নিয়ে পরকালে এসেছে।

অতঃপর কুরআন ও রেসালত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে মক্কাবাসী কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের কাছে যা পেশ করছে, তা পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের কুমন্ত্রণা নয়; বরং তা আল্লাহ তা'আলার এক সম্মানিত বার্তাবাহক ফেরেশতা তথা হযরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক আল্লাহর পক্ষ হতে আনীত বাণী। হযরত মুহাম্মদ ﷺ উজ্জ্বল আকাশ প্রান্তে দিবালোকে নিজ চোখে তাঁকে দেখেছেন। এ মহান আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে তোমরা কেন বিপথগামী হচ্ছ?

সূরার শেষ তিনটি আয়াত এ সূরার উপসংহার। পবিত্র কুরআন রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বাণী। অতএব যে কেউ ইচ্ছা করলে এ কুরআনকে বরণ করে ইহকাল ও পরকালকে সার্থক করতে পারে। আর এটা আল্লাহর কালাম হলেও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছে করলে মানব মনে এর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

সূরাটির ফজিলত : বর্ণিত আছে যে,"مَنْ قَرَءَ سُوْرَةَ التَّكْوِيْرِ اَعَاذَهُ اللّٰهُ اَنْ يَفْضَحَهُ حِيْنَ تُنْشَرُ صَحِيْفَتُهُ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা আত-তাকভীর পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আমলনামা খোলার সময় লাঞ্ছনা হতে রক্ষা করবেন। –[অবশ্য বলা হয়েছে যে, উক্ত হাদীসখানা জাল।]

সূরাটির শিক্ষণীয় বিষয় : অত্র সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষদেরকে (কিয়ামতের দিন) জুড়ে দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন,

"يُقْرَنُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ وَيُقْرَنُ الرَّجُلُ السُّوْءُ مَعَ الرَّجُلِ السُّوْءِ فِى النَّارِ فَذٰلِكَ تَزْوِيْجُ النُّفُوْسِ"

অর্থাৎ লোকদেরকে জুড়ে দেওয়ার অর্থ হলো, নেককার নেককারের সাথে জান্নাতী হবে এবং পাপী পাপীর সাথে জাহান্নামী হবে। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– "اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ" অর্থাৎ লোক যাকে ভালোবাসবে তার সঙ্গ লাভ করবে। এটা হতে বোধগম্য হয় যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যায়- শায়খ ও মুরিদের সম্পর্কের তাৎপর্য এখানেই।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ [١٩]

শানে নুযূল : মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পাগল বলত সুতরাং তাদের মতে কুরআন হলো পাগলের প্রলাপ মাত্র। মুশরিকদের এহেন কুৎসিত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[কুরতুবী ২০৮/১৯]

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [٢٩]

শানে নুযূল : আবদ বিন হুমাইদ প্রমুখ হযরত সুলাইমান বিন মূসা -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (তোমাদের মধ্য হতে এমন লোকদের জন্যে যারা সরল পথে চলতে ইচ্ছুক) আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন আবূ জাহল বলত তা-তো আমাদের ব্যাপার। আমরা ইচ্ছা করলেই সরল পথে চলতে পারি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন আবূ জাহল বলেছিল যে, এ বিষয়টি আমাদের ইচ্ছাধীন আমরা ইচ্ছা করলেই সরল পথে চলতে পারি আবার নাও চলতে পারি। তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

-[তবারী ৪৭৫/১২, ইবনে কাছীর ৪৮০/৪, কুরতুবী ২১১/১৯, দুররে মানছূর ২২২/৬]

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ - تَكْوِيرٌ -এর এক অর্থ জ্যোতিহীন হওয়া। হাসান বসরী (র.) এই তাফসীরই করেছেন। এর অপর অর্থ নিক্ষেপ করাও হয়ে থাকে। রবী ইবনে খাইসাম (র.) এই তাফসীর করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, সূর্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে এবং সূর্যের উত্তাপে সারা সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। এই দুই তাফসীরের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা, এটা সম্ভবপর যে, প্রথমে সূর্যকে জ্যোতিহীন করে দেওয়া হবে, অতঃপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। মুসনাদে আহমদে আছে জাহান্নামে নিক্ষেপ্ত হবে। এই আয়াত প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন তাফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও সমস্ত নক্ষত্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন, অতঃপর এর উপর প্রবল বাতাস প্রবাহিত হবে। ফলে সারা সমুদ্র অগ্নি হয়ে যাবে। এভাবে চন্দ্র, সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে–এই উভয় কথাই ঠিক হয়ে যায়। কেননা সারা সমুদ্র তখন জাহান্নাম হয়ে যাবে। -[মাযহারী, কুরতুবী]

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ - اِنْكِدَارٌ–এর অর্থ পতিত হওয়া। পূর্ববর্তীগণ থেকে এই তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। আকাশের সব নক্ষত্র সমুদ্রে পতিত হবে। পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে এর বিবরণ রয়েছে।

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ আরবের রীতি অনুযায়ী দৃষ্টান্তস্বরূপ একথা বলা হয়েছে। কেননা কুরআনে আরবদেরকেই প্রথমে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের কাছে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বিরাট ধনরূপে গণ্য হতো। তারা এর দুগ্ধ ও বাচ্চার অপেক্ষা করত। ফলে একে দৃষ্টির আড়াল হতে দিত না এবং কখনও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত না।

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ - تَسْجِيرٌ -এর অর্থ অগ্নিসংযোগ করা ও প্রজ্বলিত করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই অর্থই নিয়েছেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন মিশ্রিত করা। এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। প্রথমে লোনা সমুদ্র ও মিঠা সমুদ্র একাকার করা হবে। মাঝখানের অন্তরায় শেষ করে দেওয়া হবে। ফলে উভয় প্রকার সমুদ্রের পানি মিশ্রিত হয়ে যাবে। অতঃপর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এতে নিক্ষেপ করে সমস্ত পানিকে অগ্নি তথা জাহান্নামে পরিণত করা হবে। -[মাযহারী]

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ অর্থাৎ যখন হাশরে সমবেত লোকদেরকে বিভিন্ন দলে দলবদ্ধ করে দেওয়া হবে। এই দলবদ্ধকরণ ঈমান ও কর্মের দিক দিয়ে করা হবে। কাফের এক জায়গায় ও মু'মিন এক জায়গায়। কাফের এবং মু'মিনের মধ্যেও কর্ম এবং অভ্যাসের পার্থক্য থাকে। এদিক দিয়ে কাফেরদেরও বিভিন্ন প্রকার দল হবে আর মু'মিনদেরও বিশ্বাস এবং কর্মের ভিত্তিতে দল হবে। বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন, যারা ভালো হোক মন্দ হোক একই প্রকার কর্ম করবে, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। উদাহরণত আলিমগণ এক জায়গায়, ইবাদতকারী সংসারবিমুখগণ এক জায়গায়, জিহাদকারী গাজীগণ এক জায়গায় এবং সদ্‌কা-খায়রাতে বৈশিষ্ট্যের অধিকারীগণ এক জায়গায় সমবেত হবে। এমনিভাবে মন্দ লোকদের মধ্যে চোর-ডাকাতকে এক জায়গায়, ব্যভিচারীকে এক জায়গায় এবং অন্যান্য বিশেষ গোনাহে অংশগ্রহণকারীদেকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হাশরে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বজাতির সাথে থাকবে (কিন্তু এই জাতীয়তা বংশ অথবা দেশভিত্তিক হবে না বরং কর্ম ও বিশ্বাসভিত্তিক হবে)। তিনি এর প্রমাণস্বরূপ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً –আয়াতখানি পেশ করেন। অর্থাৎ হাশরে লোকদের তিনটি প্রধান দল হবে– ১. পূর্ববর্তী সৎকর্মী লোকদের, ২. আসহাবুল ইয়ামীনের এবং ৩. আসহাবুশ শিমালের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাফের পাপাচারীদের। তারা মুক্তি পাবে না।

مَوْءُودَةً – وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ -এর অর্থ জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। মূর্খ আরবরা কন্যাসন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং জীবন্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। ইসলাম এই কু-প্রথার মূলোৎপাটন করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। ভাষাদৃষ্টে জানা যায় যে, স্বয়ং কন্যাকেই জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাতে হত্যা করা হলো? উদ্দেশ্য এই যে, সে নিজের নির্দোষ ও মজলুম হওয়ার বিষয় আল্লাহর কাছে পেশ করুক, যাতে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। এটাও সম্ভবপর যে, জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সম্পর্কে তার হত্যাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা একে কি অপরাধে হত্যা করলে?

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, কিয়ামতের নামই তো يَوْمُ الْحِسَابِ (হিসাব দিবস), يَوْمُ الْجَزَاءِ (প্রতিদান দিবস) ও يَوْمُ الدِّيْنِ (বিচার দিবস)। এতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সব কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এ স্থলে বিশেষভাবে জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সম্পর্কিত প্রশ্নকে এতো গুরুত্ব দেওয়ার রহস্য কি? চিন্তা করলে জানা যায় যে, এই মজলুম শিশু কন্যাকে স্বয়ং তার পিতামাতা হত্যা করেছে। তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে কোনো বাদী নেই; বিশেষত গোপনে হত্যা করার কারণে কেউ জানতেই পারেনি যে সাক্ষ্য দেবে। হাশরের ময়দানে যে ন্যায়বিচারের আদালত কায়েম হবে, তাতে এমন অত্যাচার ও নিপীড়নকেও সর্বসমক্ষে আনা হবে, যার কোনো সাক্ষ্য নেই এবং কোনো দাবিদারও নেই।

চার মাস পর গর্ভপাত করা হত্যার শামিল : শিশুদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করা অথবা হত্যা করা মহাপাপ ও গুরুতর জুলুম এবং চার মাসের পর গর্ভপাত করাও এই জুলুমের শামিল। কেননা চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং সে জীবিত মানুষের মধ্যে গণ্য হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি গর্ভবতী নারীর পেটে আঘাত করে, ফলে গর্ভপাত হয়ে যায়, উম্মতের ঐকমত্যে তার উপর 'গুররা' ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ একটি গোলাম অথবা তার মূল্য দিতে হবে। যদি জীবিতাবস্থায় গর্ভপাত হয়, এরপর মারা যায়, তবে বয়স্ক লোকের সমান রক্তপণ দিতে হবে। একান্ত অপারগতা না হলে চার মাসের পূর্বেও গর্ভপাত করা হারাম, অবশ্য প্রথমোক্ত হারামের চেয়ে কিছুটা কম। কারণ এটা কোনো জীবিত মানুষের প্রকাশ্য হত্যা নয়। –[মাযহারী]

আজকাল দুনিয়াতে জন্মশাসনের নামে এমন পন্থা অবলম্বন করা হয়, যাতে গর্ভ সঞ্চারই হয় না। এর শত শত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ একেও وَأْدٌ خَفِيٌّ –অর্থাৎ 'গোপনভাবে শিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করা' আখ্যা দিয়েছেন। –(মুসলিম) অন্য কতক রেওয়ায়েতে 'আযল' তথা প্রত্যাহার পদ্ধতির কথা আছে। এতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যাতে বীর্য গর্ভাশয়ে না যায়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নীরবতা ও নিষেধ না করা বর্ণিত আছে। এটা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমিত। তাও এভাবে করতে হবে, যাতে স্থায়ী বংশবিস্তার রোধের পদ্ধতি না হয়ে যায়। আজকাল জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে প্রচলিত ঔষধপত্র ও ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে কতগুলো এমন, যাদ্বারা সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শরিয়তে কোনোক্রমেই এর অনুমতি নেই।

كُشِطَ – وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ -এর আভিধানিক অর্থ জন্তুর চামড়া খসানো। বাহ্যত এটা প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা, যা এই দুনিয়াতেই ঘটবে। আকাশের সৌন্দর্য সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। আকাশের বর্তমান আকার-আকৃতি বদলে যাবে। এই অবস্থাকে كُشِطَ -শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ লিখেছেন গুছিয়ে নেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, মাথার উপর ছাদের ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে গুছিয়ে নেওয়া হবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ –অর্থাৎ কিয়ামতের উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ সৎ কর্ম কিংবা অসৎ কর্ম– সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে– আমলনামায় লিখিত অবস্থায় অথবা অন্য কোনো বিশেষ পন্থায়। হাদীস থেকে এরূপই জানা যায়। কিয়ামতের এসব অবস্থা ও ভয়াবহ দৃশ্যত্য বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন যে, এই কুরআন সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে খুব হেফাজত সহকারে প্রেরিত। যার প্রতি এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি একজন মহাপুরুষ। তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতাকে পূর্ব থেকে চিনতেন, জানতেন। তাই এর সত্যতায় কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে পাঁচটি নক্ষত্রের শপথ করা হয়েছে। সৌরবিজ্ঞানীদের ভাষায় এগুলোকে خَمْسَةٌ مُتَحَيِّرَةٌ (অদ্ভুত পঞ্চ নক্ষত্র) বলা হয়। এরূপ বলার কারণ এগুলোর অদ্ভুত গতিবিধি। কখনো পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে, অতঃপর পশ্চাৎগামী হয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে চলে। এই বিভিন্নমুখী গতির কারণ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আধুনিক দার্শনিকদের গবেষণা সেসব উক্তির কোনোটিকে সমর্থন করে এবং কোনোটিকে প্রত্যাখ্যান করে। এর প্রকৃত স্বরূপ স্রষ্টা ব্যতীত আর কেউই জানেন না। সবাই অনুমানভিত্তিক কথা বলে যা ভুলও হতে পারে, শুদ্ধও হতে পারে। কুরআন মুসলমানদেরকে এই অনর্থক আলোচনায় জড়িত করেনি। দরকারী কথাটুকু বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ অপার মহিমা ও কুদরতের এসব নিদর্শন দেখে তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আন।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ –অর্থাৎ এই কুরআন একজন সম্মানিত দূতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাশীল, ফেরেশতাগণের মান্যবর এবং আল্লাহর বিশ্বাসভাজন। পয়গাম আনা-নেওয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম-বেশি করার আশঙ্কা নেই। এখানে رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ বলে বাহ্যত হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। পয়গম্বরগণের ন্যায় ফেরেশতাগণের বেলায়ও 'রাসূল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত সবগুলো বিশেষণ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর জন্য বিনাদ্বিধায় প্রযোজ্য। তিনি যে শক্তিশালী, সূরা নজমে তার পরিষ্কার উল্লেখ আছে : عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى তিনি যে আরশ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণের মান্যবর, তা মি'রাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাথে নিয়ে আকাশে পৌঁছলে তাঁর আদেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি যে اَمِيْن -তথা বিশ্বাসভাজন, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ -এর অর্থ নিয়েছেন মুহাম্মদ ﷺ। তাঁরা উল্লিখিত বিশেষণগুলোকে কিছু কিছু সদর্থ করে তাঁর জন্য প্রযোজ্য করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাহাত্ম্য এবং কাফেরদের অলীক অভিযোগের জবাব দেওয়া হয়েছে। وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ -যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উন্মাদ বলত, এতে তাদেরকে জবাব দেওয়া হয়েছে। وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ –অর্থাৎ তিনি জিবরাঈল (আ.)-কে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। সূরা নজমে আছে : فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى –এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে পরিচিত ছিলেন, তাঁকে আসল আকার-আকৃতিতেও দেখেছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

كُوِّرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْوِيْرٌ মূলবর্ণ (ك – و – ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– নিষ্প্রভ করা হবে।

اِنْكَدَرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْكِدَارٌ মূলবর্ণ (ك – د – ر) জিনস صحيح অর্থ– খসে খসে পড়বে।

عُطِّلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْطِيْلٌ মূলবর্ণ (ع – ط – ل) জিনস صحيح অর্থ– উপেক্ষিত হবে।

سُجِّرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْجِيْر মূলবর্ণ (س – ج – ر) জিনস صحيح অর্থ– স্ফীত করা হবে।

اَلْمَوْءُدَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার وَاْدٌ মূলবর্ণ (و – ا – د) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং مثال واوى অর্থ– জীবন্ত প্রোথিত কন্যা।

كُشِطَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার كَشْطٌ মূলবর্ণ (ك – ش – ط) জিনস صحيح অর্থ– খুলে দেওয়া হবে।

سُعِّرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْعِيْرٌ মূলবর্ণ (س – ع – ر) জিনস صحيح অর্থ– প্রজ্জ্বলিত করা হবে।

اُزْلِفَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মসদার اِزْلَافٌ মূলবর্ণ (ز – ل – ف) জিনস صحيح অর্থ– নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।

اَلْخُنَّسْ : ইসমে ফায়েল, ওয়াহেদ মুয়ান্নাছ, বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার خُنُوْسٌ ও خُنَّاسٌ মূলবর্ণ (خ – ن – س) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাদগামী, প্রত্যাবর্তনকারী। মাসদার : خَنَسٌ কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য নক্ষত্র।

اَلْكُنَّسْ : اَلْكَنَّاسُ -এর বহুবচন। বাব ضَرَبَ ; كَنَّاسْ অর্থ– হরিণ থাকার ঝোপ-ঝাড়। জঙ্গলে হরিণের আত্মগোপন। আয়াতে كُنَّسٌ দ্বারা উদ্দেশ্য অপ্রকাশ্য নক্ষত্র।

عَسْعَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مطلق معروف বাব بَعْثَرَ মাসদার عَسْعَسَةٌ মূলবর্ণ (ع - س - ع - س) জিনস مضاعف رباعى অর্থ- রাতের অন্ধকার দূর হয়, রাতের অবসান হয়।

تَنَفَّسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَنَفُّسٌ মূলবর্ণ (ن - ف - س) জিনস صحيح অর্থ- শ্বাস নিয়েছে। শ্বাস গ্রহণ করা, হাঁফ ছাড়া। এখানে উদ্দেশ্য যখন উষার আর্বিভাব হয়।

اَمِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ افعال বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَمْنٌ ও اَمَانَةٌ; মূলবর্ণ (ا - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ- বিশ্বস্ত, বিশ্বাস ভাজন।

الاُفُقُ : খোলা দিগন্তে। খোলা আকাশের এক প্রান্তে। বহুবচন- اٰفَاقٌ আসে।

تَذْهَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার ذِهَابٌ মূলবর্ণ (ذ - ه - ب) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা যাবে।

يَسْتَقِيْمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِقَامَةٌ অর্থ- সোজা চলা।

مَكِيْنٌ : সিফাতে মুশাব্বাহ (যের বিশিষ্ট)। অর্থ- সম্মানিত, মর্যাদাবান। মাসদার كَوْنٌ অর্থ, হওয়া।

مُطَاعٍ : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ افعال বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ- অনুসৃত। যাকে মান্য করা হয়। তার কথা প্রতিপালিত হয়।

ضَنِيْنٍ : সিফাতে মুশাব্বাহ। অর্থ : কৃপণ, লোভী, অপ্রফুল্ল। ضَنٌّ থেকে মুশতাক। যার অর্থ, কার্পণ্য করা, দিতে না চাওয়া, আবার কখনো ضَنٌّ -এর ব্যবহার হয় উৎকৃষ্ট জিনিসের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা সম্পর্কে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ : এখানে واو টি আতেফা, আর مَا টি নাফিয়া تَشَاءُوْنَ ফে'ল, তার যমীর ফায়েল, اِلَّا হলো أداة حصر আর اَنْ ও তার পরে যা রয়েছে তা نصب بنزع الخافض -এর স্থলে হয়েছে। এখন جار এবং মাজরূর মিলে تَشَاءُوْنَ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর اَللّٰهُ শব্দটি ফায়েল এবং رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ লো اَللّٰهُ শব্দ হতে بدل অথবা اَللّٰهُ শব্দ হতে সিফাত হয়েছে। -[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮]

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ
সূরা ইনফিত্বার

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৯, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

বাংলা	আরবি
১. যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে।	اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾
২. আর যখন নক্ষত্রগুলো খসে পড়বে।	وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾
৩. আর যখন সাগরসমূহ প্রবাহিত হয়ে পড়বে।	وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾
৪. আর যখন কবরসমূহ উৎখাত করা হবে।	وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾
৫. তখন প্রত্যেকে জানবে, সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে।	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ﴿٥﴾
৬. হে মানব! কোন বস্তু তোমাকে তোমার এমন দয়ালু প্রতিপালক সম্বন্ধে ভ্রমে ফেলে রেখেছে।	يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٦﴾
৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে গঠন করেছেন, তৎপর তোমাকে সুসামঞ্জস্যভাবে তৈরি করেছেন।	الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾
৮. যে আকৃতিতে তিনি ইচ্ছা করেছেন তোমাকে গঠন করেছেন।	فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا السَّمَآءُ যখন অসমান اَنْفَطَرَتْ বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

২. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ আর যখন নক্ষত্রগুলো انْتَثَرَتْ খসে পড়বে।

৩. وَاِذَا الْبِحَارُ আর যখন সাগরসমূহ فُجِّرَتْ প্রবাহিত করা হবে।

৪. وَاِذَا الْقُبُوْرُ আর যখন কবরসমূহ بُعْثِرَتْ উৎখাত করা হবে।

৫. عَلِمَتْ نَفْسٌ তখন প্রত্যেকে জানবে مَّا قَدَّمَتْ সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে وَاَخَّرَتْ ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে।

৬. يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ হে মানব! مَا غَرَّكَ কোন বস্তু তোমাকে ভ্রমে ফেলে রেখেছে بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ তোমার এমন দয়ালু প্রতিপালক সম্বন্ধে।

৭. الَّذِيْ خَلَقَكَ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন فَسَوّٰىكَ অনন্তর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে গঠন করেছেন فَعَدَلَكَ অতঃপর তোমাকে সুসামঞ্জস্যভাবে তৈরি করেছেন।

৮. فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ যে আকৃতিতে مَّا شَآءَ তিনি ইচ্ছা করেছেন رَكَّبَكَ তোমাকে গঠন করেছেন।

৯. না, কখনো নয়, বরং তোমরা প্রতিফলকেই অবিশ্বাস করেছ।	كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴿٩﴾
১০. আর তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে সংরক্ষক ফেরেশতাগণ।	وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾
১১. সম্মানিত লিখকগণ,	كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾
১২. যারা তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত আছে।	يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾
১৩. নেককার লোকগণ নিশ্চয় সুখে থাকবে।	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾
১৪. আর বদকার লোক নিশ্চয় দোজখে থাকবে।	وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾
১৫. তারা প্রতিফল দিবসে তাতে প্রবেশ করবে।	يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾
১৬. এবং তা হতে বহির্গত হবে না।	وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾
১৭. আর আপনার কী জানা আছে যে, সেই প্রতিফল দিবস কিরূপ?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٧﴾
১৮. পুনরায় [বলছি] আপনার কি জানা আছে, সেই প্রতিফল দিবস কিরূপ?	ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾
১৯. তা এমন দিন, যেদিন কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো ব্যক্তির উপকার করার কিছুমাত্র অধিকার চলবে না, আর সেদিন সমস্ত নির্দেশ একমাত্র আল্লাহরই হবে।	يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. كَلَّا কখনো নয় بَلْ বরং تُكَذِّبُونَ তোমরা অবিশ্বাস কর بِالدِّينِ প্রতিফলকেই

১০. وَإِنَّ আর নিশ্চয় عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর রয়েছে لَحَافِظِينَ সংরক্ষক ফেরেশতাগণ।

১১. كِرَامًا সম্মানিত كَاتِبِينَ লিখকগণ

১২. يَعْلَمُونَ তারা অবগত আছে / জানে مَا تَفْعَلُونَ তোমাদের কৃতকর্ম / কার্যকলাপ সম্পর্কে / তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে

১৩. إِنَّ الْأَبْرَارَ নিশ্চয় নেককার লোকগণ لَفِي نَعِيمٍ সুখে থাকবে

১৪. وَإِنَّ الْفُجَّارَ আর নিশ্চয় বদকার লোকজন لَفِي جَحِيمٍ দোজখে থাকবে

১৫. يَصْلَوْنَهَا তারা তাতে প্রবেশ করবে يَوْمَ الدِّينِ প্রতিফল দিবসে

১৬. وَمَا هُمْ এবং তারা হবে না عَنْهَا তা হতে بِغَائِبِينَ বহির্গত / অনুপস্থিত

১৭. وَمَا أَدْرَاكَ আর আপনার কী জানা আছে / আপনি কী জানেন مَا يَوْمُ الدِّينِ সেই প্রতিফল দিবস কিরূপ

১৮. ثُمَّ অতঃপর مَا أَدْرَاكَ আর আপনার কী জানা আছে / আপনি কী জানেন مَا يَوْمُ الدِّينِ সেই প্রতিফল দিবস কিরূপ।

১৯. يَوْمَ এমন এক দিন لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ কোনো ব্যক্তি মালিক হবে না لِنَفْسٍ অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য شَيْئًا কোনো কিছুর وَالْأَمْرُ আর সমস্ত নির্দেশ يَوْمَئِذٍ সেদিন لِلَّهِ একমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরাটির নাম তার প্রথম আয়াতের শব্দ اِنْفَطَرَتْ হতে চয়ন করা হয়েছে। اِنْفَطَرَتْ শব্দটি اَلْاِنْفِطَارُ হতে নির্গত। اَلْاِنْفِطَارُ-এর অর্থ হলো ফেটে যাওয়া, দীর্ণ-বিদীর্ণ হওয়া। এ সূরায় আসমান বিদীর্ণ হওয়ার উল্লেখ থাকায় এ সূরাকে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৯ আয়াত ৮০ বাক্য এবং ১০৭টি অক্ষর রয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

অবতীর্ণ হওয়ার সময়-কাল : এ সূরা এবং তার পূর্ববর্তী সূরা 'আত্-তাকভীর' -এর বিষয়বস্তুর মধ্যে মিল রয়েছে। অতএব, উভয় সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সময়ও প্রায় কাছাকাছি হবে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ-এর মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তা নাজিল হয়েছে। তবে এটি সূরা আন-নাযি'আতের পর অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : আলোচ্য সূরাটির মূলবক্তব্য হলো পরকাল। মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনুল মুনযির, তাবারানী, হাকিম ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ হতে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

"مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَاْىَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও সূরা ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে।

এ সূরায় কিয়ামতের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এ দিন যখন উপস্থিত হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে তার যাবতীয় কৃতকর্ম উপস্থিত হবে। অতঃপর মানুষের মধ্যে আত্মসম্বিত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে মহান আল্লাহ তোমাকে জীবন দিয়েছেন, যাঁর ঐকান্তিক দয়া এবং অনুগ্রহে আজ তুমি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে উত্তম দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী হয়েছ, তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধোঁকায় কেমন করে পড়লে যে, তিনি শুধু দয়া ও অনুগ্রহ-ই করেন, ইনসাফ ও সুবিচার করেন না। তিনি দয়া অনুগ্রহ করেন এটা ঠিক; তবে তার অর্থ এ নয় যে, তার সুবিচারকে তোমরা ভয় করবে না। এরপর মানুষকে কোনোরূপ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ [٦]

শানে নুযূল-১ : আলোচ্য আয়াত আবুল আসাদ বিন কালাদা আল্ জুমাহী এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে অনুরূপ এক বর্ণনা রয়েছে। –[কুরতুবী ২১৩/১৯]

শানে নুযূল -২ : আল্লামা বগভী কালবী ও মুকাতিল এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তারা দু'জন বলেছেন, আলোচ্য আয়াত আসওয়াদ-বিন শরীক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, সে নরাধম হযরত নবী করীম ﷺ-কে প্রহার করেছিল, কিন্তু তার পিছে ধাওয়া করা হয়নি। নরাধম শরীকের এ আচরণের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ : অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্রসমূহ ঝরে মিঠা ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া, কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসা ইত্যাকার কিয়ামতের ঘটনা যখন ঘটে যাবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়েছে। অগ্রে প্রেরণ করার এক অর্থ কাজ করা এবং পশ্চাতে ছাড়ার অর্থ কাজ না করা। সুতরাং কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং সৎ অসৎ কি কর্ম করেনি। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পরে যে, অগ্রে প্রেরণ করেছে মানে যে কর্ম সে নিজে করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়েছে মানে যে কর্ম সে নিজে তো করেনি কিন্তু তার ভিত্তি ও প্রথা স্থাপন করে এসেছে। কাজটি সৎ হলে তার ছওয়াব সে পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ্ আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম সুন্নত ও নিয়ম চালু করে, সে তার ছওয়াব সব সময় পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো কু-প্রথা অথবা পাপ কাজ চালু করে, যতদিন মানুষ এই পাপ কাজ করবে, ততদিন তার আমলনামায় এর গোনাহ লিখিত হতে থাকবে।

يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামতের ভয়াবহ কাজ-কারবার উল্লিখিত হয়েছে। এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত এবং তাঁদের নির্দেশাবলির চুল পরিমাণও বিরুদ্ধাচরণ করত না। কিন্তু মানুষ ভুল-ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে : হে মানুষ, তোমরা সূচনা ও পরিণামের এসব অবস্থা সামনে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করল যে, আল্লাহ্র নাফরমানি শুরু করেছ?

এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে فَعَدَلَكَ –অর্থাৎ তোমার অস্তিত্বকে বিশেষ সমতা দান করেছেন যা অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। মানবসৃষ্টিতে যদিও রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত ইত্যাদি পারস্পরবিরোধী উপকরণ শামিল রয়েছে কিন্তু আল্লাহর রহস্য, এগুলোর সমন্বয়ে একটি সুষম মেযাজ তৈরি করে দিয়েছে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে :

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে একই আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেননি। এরূপ করলে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য থাকত না। বরং তিনি কোটি কোটি মানুষের আকার-আকৃতি এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

সৃষ্টির এসব প্রারম্ভিক পর্যায় বর্ণনার পর বলা হয়েছে : يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ- হে অনবধান মানব, যে পালনকর্তা তোমার মধ্যে এতসব গুণ গচ্ছিত রেখেছেন, তাঁর ব্যাপারে তুমি কিরূপে ধোঁকা খেলে যে, তাঁকে ভুলে গেছ এবং তাঁর নির্দেশাবলি অমান্য করছ? তোমার দেহের প্রতিটি গ্রন্থিই তো তোমাকে আল্লাহার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় এই বিভ্রান্তি কিরূপে হলো? এখানে كَرِيمِ –শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের ধোঁকায় পড়ার কারণ এই যে, আল্লাহ মহানুভব। তিনি দয়া ও কৃপার কারণে মানুষের গোনাহের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না, এমনকি তার রিজিক, স্বাস্থ্য ও পার্থিব সুখ-শান্তিতেও কোনো বিঘ্ন ঘটান না। এতেই মানুষ ধোঁকা খেয়ে গেছে। অথচ সামান্য বুদ্ধি খাটালে এই দয়া ও কৃপা বিভ্রান্তির কারণ হওয়ার পরিবর্তে পালনকর্তার অনুগ্রহের কাছে ঋণী হয়ে আরও বেশি আনুগত্যের কারণ হওয়া উচিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : كَمْ مِنْ مَغْرُورٍ تَحْتَ السِّتْرِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ অর্থাৎ অনেক মানুষের দোষত্রুটি ও গোনাহের উপর আল্লাহ তা'আলা পর্দা ফেলে রেখেছেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করেননি। ফলে তারা আরও বেশি ধোঁকায় পড়ে গেছে।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ : পূর্ববর্তী عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ –আয়াতে যে কর্ম সামনে আসার কথা বলা হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতে তারই শাস্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা সৎ কর্ম করত তারা নিয়ামতে তথা জান্নাতে থাকবে এবং অবাধ্য ও নাফরমানরা জাহান্নামে থাকবে।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ : অর্থাৎ জাহান্নামীরা কোনো সময় জাহান্নাম থেকে পৃথক হবে না। কারণ তাদের জন্য চিরকালীন আজাবের নির্দেশ আছে। لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا –অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কোনো ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অন্যের কোনো উপকার করতে পারবে না এবং কারও কষ্ট লাঘবও করতে পারবে না। এতে সুপারিশ করবে না, এরূপ বোঝা যায় না। কেননা কারও সুপারিশ করা নিজ ইচ্ছায় হবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ কাউকে কারও সুপারিশ করার অনুমতি না দেন। তাই আল্লাহ তা'আলাই আসল আদেশের মালিক। তিনি স্বীয় কৃপায় কাউকে সুপারিশের অনুমতি দিলে এবং তা কবুল করলে তাও তাঁরই আদেশ হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِنْفَطَرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْفِطَارٌ মূলবর্ণ (ف – ط – ر) জিনস صحيح অর্থ– বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

اِنْتَثَرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِنْتِثَارٌ মূলবর্ণ (ن – ث – ر) জিনস صحيح অর্থ– খসে পড়বে।

فُجِّرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَفْجِيْرٌ মূলবর্ণ (ف – ج – ر) জিনস صحيح অর্থ– বেগে প্রবাহিত করা হবে।

بُعْثِرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব رباعى مجرد মাসদার بَعْثَرَةٌ মূলবর্ণ (ب – ع – ث – ر) জিনস صحيح অর্থ– উঠানো হবে, উৎখাত করা হবে।

رَكَّبَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَرْكِيْب মূলবর্ণ (ر – ك – ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমাকে গঠন করেছেন।

فُجَّارٌ : فَاجِرٌ -এর বহুবচন। মাসদার فُجُوْرٌ বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ف – ج – ر) জিনস صحيح অর্থ– খারাপ লোক, কাফের। পাপী দীনের পর্দা বিদীর্ণকারী, প্রকাশ্যে গোনাহকারী, হক থেকে দূরে গমনকারী।

جَحِيْم : সীগাহ فَعِيْل এর ওজনে فَاعِلٌ এর অর্থে। জাহান্নাম। দোজখ, প্রজ্জ্বলিত আগুন। মাসদার جَحْم আগুনকে খুব প্রজ্জ্বলিত করা। جَحِيْم শব্দটি এর থেকে নির্গত। ইমাম জুরাইজ বলেন, জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। যথা, ১. জাহান্নাম ২. লাজা ৩. হুতামা ৪. সায়ির ৫. সাক্বার ৬. জাহিম ৭. হাভিয়াহ। (মা'আলিম : ৪/১০০)

يَصْلَوْنَهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার صَلْىٌ মূলবর্ণ (ص – ل – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাতে প্রবেশ করবে।

أَدْرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِدْرَاءٌ মূলবর্ণ (د– ر – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– জানিয়েছে, খবর দিয়েছে।

تَمْلِكُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مُلْكٌ মূলবর্ণ (م ـ ل ـ ك) জিনস صحيح; مِلْك এর অর্থ দুটি। এক. মালিক ও অভিভাবক হওয়া। দুই. ক্ষমতা পাওয়া, চাই নিজে মালিক হোক বা ওলী হোক বা না হোক। এখানে দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ : এখানে ان হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল আর الْاَبْرَارَ হলো ان এর اسم আর لَفِيْ -এর লাম টি হলো المزحلقة আর فِيْ نَعِيْمٍ হলো ان এর خبر আর وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আতফ হয়েছে। আর يَصْلَوْنَهَا বাক্যটি لَفِيْ جَحِيْمٍ থেকে حال হয়েছে। يَصْلَوْنَ ফেল, তার যমীর ফায়েল আর هَا হলো مفعول به এবং يَوْمَ الدِّيْنِ টা يَصْلَوْنَهَا -এর সাথে ظرف متعلق হয়েছে। আবার يَصْلَوْنَهَا বাক্যটি جملة مستانفه ও হতে পারে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ২৪৪]

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ مَكِّيَّةٌ

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩৬, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়।	وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿١﴾
২. যখন তারা মানুষের নিকট থেকে মেপে নেয় তখন পুরাপুরি নেয়।	الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿٢﴾
৩. আর যখন তাদেরকে মেপে কিংবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।	وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴿٣﴾
৪. তাদের কি এর বিশ্বাস নেই যে, তাদেরকে জীবিত করে উঠানো হবে।	اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿٤﴾
৫. এক অত্যন্ত কঠোর দিবসে।	لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥﴾
৬. যে দিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে।	يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾
৭. না, কখনো নয়, বদকার লোকদের আমলনামা সিজ্জীনের মধ্যে থাকবে।	كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ﴿٧﴾
৮. আর আপনার কি জানা আছে যে, সিজ্জীনে রক্ষিত আমলনামা কী বস্তু।	وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَيْلٌ দুর্ভোগ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ যারা মাপে কম দেয়।

২. الَّذِيْنَ যারা اِذَا যখন اكْتَالُوْا মেপে নেয় عَلَى النَّاسِ মানুষের নিকট থেকে يَسْتَوْفُوْنَ (তখন) তারা পুরাপুরি নেয়।

৩. وَاِذَا আর যখন كَالُوْهُمْ তারা তাদেরকে মেপে দেয় اَوْ وَّزَنُوْهُمْ কিংবা ওজন করে দেয় يُخْسِرُوْنَ তখন তারা কম দেয়।

৪. اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ তারা কী এ কথা বিশ্বাস করে না اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ যে, তারা পুনরুত্থিত হবে।

৫. لِيَوْمٍ একটি দিবসে عَظِيْمٍ অত্যন্ত কঠোর।

৬. يَّوْمَ যে দিন يَقُوْمُ النَّاسُ সমস্ত মানুষ দণ্ডায়মান হবে لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে।

৭. كَلَّآ কখনো নয় اِنَّ নিশ্চয় كِتٰبَ الْفُجَّارِ বদকার লোকদের আমলনামা لَفِيْ سِجِّيْنٍ সিজ্জীনের মধ্যে থাকবে।

৮. وَمَآ اَدْرٰكَ আর আপনার কী জানা আছে / আপনি কী জানেন مَا سِجِّيْنٌ সিজ্জীন কী বস্তু।

৯. তা একটি চিহ্নযুক্ত লিখিত কিতাব।	كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٩
১০. সেদিন অবিশ্বাসীদের সর্বনাশ হবে।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠
১১. যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।	الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝١١
১২. আর তাকে তো সেই লোকই মিথ্যা প্রতিপাদন করে যে সীমালঙ্ঘনকারী হয়, পাপী হয়।	وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢
১৩. যখন তার সম্মুখে আমার আয়াতগুলো পাঠ করা হয় তখন সে বলে এগুলো তো ভিত্তিহীন কথা– পূর্বকালীন লোকদের হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।	اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣
১৪. কখনো এরূপ নয়, বরং তাদের অন্তরসমূহে তাদের [গর্হিত] কার্যকলাপের মরিচা ধরেছে।	كَلَّا بَلْ ٚ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٤
১৫. কখনো এরূপ নয়, এ সমস্ত লোক সেদিন তাদের প্রভু [এর দর্শন লাভ] হতে প্রতিরুদ্ধ থাকবে।	كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝١٥
১৬. অনন্তর তারা দোজখে প্রবেশ করবে।	ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۝١٦
১৭. অতঃপর বলা হবে, এটাই [সে দোজখ] যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।	ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝١٧
১৮. [এই কাফেররা যে, মুমিনদের প্রতিদান প্রাপ্ত হওয়াকে অবিশ্বাস করছে,] কখনো এরূপ নয়, নেককারদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনের মধ্যে থাকবে।	كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ۝١٨

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. كِتٰبٌ একটি কিতাব / আমলনামা مَّرْقُوْمٌ চিহ্নযুক্ত লিখিত।

১০. وَيْلٌ দুর্ভোগ يَّوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের / অস্বীকারকারীদের জন্য।

১১. الَّذِيْنَ যারা يُكَذِّبُوْنَ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে بِيَوْمِ الدِّيْنِ প্রতিফল দিবসকে।

১২. وَمَا يُكَذِّبُ আর মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না بِهٖ তাকে اِلَّا তবে করে كُلُّ প্রত্যেক مُعْتَدٍ সীমালঙ্ঘনকারী اَثِيْمٍ পাপী।

১৩. اِذَا تُتْلٰى যখন পাঠ করা হয় عَلَيْهِ তার সম্মুখে اٰيٰتُنَا আমার আয়াতগুলো قَالَ তখন সে বলে اَسَاطِيْرُ (এগুলো তো) ভিত্তিহীন কথা / কল্পকাহিনী الْاَوَّلِيْنَ পূর্বকালীন লোকদের।

১৪. كَلَّا بَلْ কখনো এরূপ নয়, বরং رَانَ মরিচা ধরেছে عَلٰى قُلُوْبِهِمْ তাদের অন্তরসমূহে مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ তাদের অর্জিত বিষয়ের (কৃতকর্মের) / তারা যা অর্জন করে, তার।

১৫. كَلَّآ কখনো নয় اِنَّهُمْ এ সমস্ত লোক / তারা عَنْ رَّبِّهِمْ তাদের প্রতিপালক থেকে يَوْمَئِذٍ সেদিন لَّمَحْجُوْبُوْنَ প্রতিরুদ্ধ থাকবে / তাদেরকে আড়ালে রাখা হবে

১৬. ثُمَّ اِنَّهُمْ অনন্তর তারা لَصَالُوا প্রবেশ করবে الْجَحِيْمِ দোজখে

১৭. ثُمَّ يُقَالُ অতঃপর বলা হবে هٰذَا الَّذِيْ এটাই সে জিনিস كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

১৮. كَلَّآ কখনো নয় اِنَّ নিশ্চয় كِتٰبَ আমলনামা الْاَبْرَارِ নেককারদের لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ইল্লিয়্যীনের মধ্যে থাকবে।

১৯. আপনার কি জানা আছে যে, ইল্লিয়্যীন [রক্ষিত আমলনামা] কি বস্তু?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ﴿١٩﴾
২০. তা একটি চিহ্নিত লিখিত কিতাব।	كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٢٠﴾
২১. যা নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ [আগ্রহের সাথে] দর্শন করে থাকেন।	يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. নেককারগণ অত্যন্ত আরামে থাকবে।	اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿٢٢﴾
২৩. তারা পালঙ্কসমূহের উপর [বসে বেহেশতের সুখপ্রদ চমৎকার আসবাবসমূহ] দেখতে থাকবে।	عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. [হে শ্রোতা!] তুমি তাদের মুখমণ্ডলে সুখের পরিচয় পাবে।	تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٤﴾
২৫. আর তাদেরকে সীল-মোহরযুক্ত বিশুদ্ধ শরাব হতে পান করানো হবে।	يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٥﴾
২৬. যাতে কস্তুরীর সীল মোহর হবে,আর এরূপ বস্তুর প্রতিই লালসাকারীদের লালসা করা উচিত।	خِتٰمُهُ مِسْكٌ ؕ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. আর তার সংমিশ্রণ 'তাসনীম' [নামক ঝরনার পানি] দ্বারা হবে।	وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٧﴾
২৮. অর্থাৎ এমন এক ঝরণা যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ পান করবে।	عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَمَآ اَدْرٰىكَ আর আপনার কী জানা আছে / আপনি কী জানেন مَا عِلِّيُّوْنَ ইল্লিয়্যূন কী

২০. كِتٰبٌ একটি আমলনামা, কিতাব مَّرْقُوْمٌ লিখিত চিহ্নিত

২১. يَّشْهَدُهُ তা দর্শন করে থাকেন الْمُقَرَّبُوْنَ নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ

২২. اِنَّ الْاَبْرَارَ নিশ্চয় নেককারগণ لَفِيْ نَعِيْمٍ আরামে থাকবে

২৩. عَلَى الْاَرَآئِكِ পালঙ্কসমূহের উপর (বসে) يَنْظُرُوْنَ তারা দেখতে থাকবে

২৪. تَعْرِفُ তুমি চিনতে পারবে فِيْ وُجُوْهِهِمْ তাদের মুখমণ্ডলে نَضْرَةَ النَّعِيْمِ সুখের সজীবতা / দীপ্তি, সুখের পরিচয়।

২৫. يُسْقَوْنَ আর তাদেরকে পান করানো হবে مِنْ رَّحِيْقٍ বিশুদ্ধ শরাব হতে مَّخْتُوْمٍ সীল-মোহরযুক্ত

২৬. خِتٰمُهُ তার সীল মোহর হবে مِسْكٌ কস্তুরীর وَفِيْ ذٰلِكَ আর এর প্রতিই فَلْيَتَنَافَسِ লালসা করা উচিত الْمُتَنَافِسُوْنَ লালসাকারীদের

২৭. وَمِزَاجُهُ আর তার সংমিশ্রণ হবে مِنْ تَسْنِيْمٍ 'তাসনীম' দ্বারা।

২৮. عَيْنًا এমন এক ঝরণা يَّشْرَبُ بِهَا যা হতে পান করবে الْمُقَرَّبُوْنَ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ।

২৯. [আর] যারা অপরাধী ছিল, তারা [দুনিয়ায়] মুমিনদের কে নিয়ে উপহাস করত।	إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾
৩০. আর যখন তারা [কাফেররা] তাদের সম্মুখ দিয়ে গমন করত, তখন তারা পরস্পর চোখ টেপাটেপি করত [অর্থাৎ অবজ্ঞার ভাব দেখাত]।	وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾
৩১. আর যখন তারা নিজেদের গৃহে ফিরে যেত, তখন [ও মুমিনদের আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে] হাসিঠাট্টা করে ফিরত।	وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾
৩২. আর যখন তাদেরকে দেখত, তখন এরূপ বলাবলি করত যে, নিশ্চয় তারা ভ্রান্তিতে আছে।	وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. অথচ তারা তাদের উপর সংরক্ষকরূপে প্রেরিত হয়নি।	وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾
৩৪. সুতরাং আজ মুমিনগণ কাফেরদের প্রতি উপহাস করতে থাকবে।	فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾
৩৫. পালঙ্কের উপর [বসে তাদের অবস্থা] দেখতে থাকবে।	عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. বাস্তবিকই কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্মের যথাযথ প্রতিদান দেওয়া হয়েছে তো ?	هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. إِنَّ الَّذِينَ নিশ্চয় যারা أَجْرَمُوا অপরাধ করেছে كَانُوا তারা مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا মুমিনদের নিয়ে করত يَضْحَكُونَ উপহাস/হাসি-তামাশা।

৩০. وَإِذَا مَرُّوا আর যখন তারা গমন করত بِهِمْ তাদের সম্মুখ/পাশ দিয়ে يَتَغَامَزُونَ (তখন) তারা পরস্পর চোখ টেপাটেপি করত।

৩১. وَإِذَا আর যখন انْقَلَبُوا তারা ফিরে আসত/যেত إِلَىٰ أَهْلِهِمُ নিজেদের গৃহে/পরিবারের কাছে, انْقَلَبُوا فَكِهِينَ তখন [ও মুমিনদের আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে] হাসিঠাট্টা করে ফিরত।

৩২. وَإِذَا আর যখন رَأَوْهُمْ তারা তাদেরকে দেখত قَالُوا (তখন) তারা বলাবলি করত إِنَّ هَٰؤُلَاءِ নিশ্চয় তারা لَضَالُّونَ মহা ভ্রান্তিতে আছে।

৩৩. وَمَا أُرْسِلُوا অথচ তাদেরকে প্রেরণ করা হয়নি عَلَيْهِمْ তাদের উপর/জন্য حَافِظِينَ সংরক্ষকরূপে/ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে

৩৪. فَالْيَوْمَ সুতরাং আজ الَّذِينَ آمَنُوا যারা ঈমান এনেছে,তারা مِنَ الْكُفَّارِ কাফেরদেরকে يَضْحَكُونَ উপহাস করতে থাকবে / করবে।

৩৫. عَلَى الْأَرَائِكِ পালঙ্কের উপর (বসে বসে) يَنْظُرُونَ তারা দেখতে থাকবে / দেখবে

৩৬. هَلْ ثُوِّبَ প্রতিদান দেওয়া হয়েছে তো الْكُفَّارُ কাফেরদেরকে مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ তাদের কৃতকর্মের

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নামটি প্রথম আয়াতের لِّلْمُطَفِّفِينَ শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

কারো মতে তাতফিফ অর্থ কম করা, ওজনে কম দেওয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, অবিচার করা, আমানতে খেয়ানত করা প্রভৃতি। যেহেতু অত্র সূরাতে যে সকল লোক ওজনে কমবেশি করে মানুষকে প্রতারিত করে, তাদের পরিণাম সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। তাই সূরার নাম মুতাফফিফীন রাখা হয়েছে। এতে ৩৬টি আয়াত, ১৬৯টি বাক্য এবং ৭৩০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : এ সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল তাফসীরকারের মতে এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আরেক দলের মতে এটা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এটা মদীনায় হিজরতের পথে অবতীর্ণ হয়েছে। এ অভিমতও পাওয়া যায় যে, ২৯ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কতেকের মতে ১৩ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ এবং ১-১২ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সারকথা হচ্ছে– কুরআনের কোনো আয়াতকে বিষয় ও ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করলেই সাহাবী ও তাবেঈনগণ বলতেন এটা অমুক ব্যাপারে অবতীর্ণ। যদিও একে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ না-ও হতো। যারা এ সূরাটি মাদানী বলে অভিমত রেখেছেন, তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেন। যেমন শানে নুযূলে উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু সে বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতের বক্তব্য জানতে পেরে মদীনার লোকগণ পরিমাপে কারচুপি করার বদ অভ্যাসকে বর্জন করেন। এটা দ্বারা এ সূরা মদীনায়ই অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণ হয় না। যে অভ্যাসটির কথা বলা হয়েছে তা যেমন মদীনার লোকদের মধ্যে ছিল অনুরূপ কমবেশি মক্কার লোকদের মধ্যেও পাওয়া যেত। অতএব, সূরার বিষয়বস্তু প্রমাণ দেয় যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। কোনো কোনো তাফসীরকার একে মক্কায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলবক্তব্য : সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় পরকাল। প্রথম ছয়টি আয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত লোকদের মধ্যে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে অবস্থিত বে-ঈমানীর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তারা অন্যদের নিকট হতে গ্রহণ কালে পুরামাত্রায় মেপে ও ওজন করে গ্রহণ করত, কিন্তু অন্যদের দেওয়ার সময় ওজন ও পরিমাপে প্রত্যেককে কিছু কম অবশ্যই দিত। বর্তমান সূরায় প্রাথমিক ছয়টি আয়াতে এর-ই প্রতিবাদ, মন্দতা ও বীভৎসতা বর্ণিত হয়েছে। তদানীন্তন সমাজের অসংখ্য প্রকার দোষ-ত্রুটির মধ্যে এটা ছিল একটি অত্যন্ত মন্দ দোষ। একে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকাল সম্পর্কে উদাসীনতা ও উপেক্ষা এর মূল কারণ। একদিন অবশ্যই আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে এবং কড়া-ক্রান্তি হিসাব দিতে হবে। এ বিশ্বাস যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয় মনে দৃঢ়মূল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো লোকের পক্ষেই বৈষয়িক কাজকর্মে সততা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। সততা ও বিশ্বস্ততাকে কেউ ভালো পলিসি' মনে করে ছোটখাটো ব্যাপারে এটা পালন করলেও করতে পারে এটা বিচিত্র নয়; সে-ই যখন অন্য কোনো ক্ষেত্রে বেঈমানী ও দুর্নীতিকে ভালো পালিসি মনে করবে, তখন তার পক্ষে সততা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে না। বস্তুত মানুষের চরিত্রে স্থায়ী বিশ্বস্ততা ও সততা কেবলমাত্র আল্লাহর ভয় ও পরকালের প্রত্যয়ের ফলেই আসতে পারে। কেননা এরূপ অবস্থায় সততা ও বিশ্বস্ততা কোনো পলিসি নয়, ঐকান্তিক মানসিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এর উপর স্থায়ী অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীতে এ নীতি সুবিধাজনক বা অসুবিধাজনক হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং পরকালের ভালো ও মন্দের চিন্তাই এ ব্যাপারে তাতে প্রভাবিত করে। মোটকথা, পরকাল বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্র যে পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই এখানে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। অতঃপর ৭-১৭ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, পাপী লোকদের আমলনামা প্রথমেই অপরাধ প্রবণ লোকদের খাতায় লিখিত হচ্ছে এবং পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে।

এরপর ১৮-২৮ পর্যন্ত আয়াতে সৎলোকদের অতীত উত্তম পরিণতির কথা বলা হয়েছে। সে সাথে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের খাতায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে।

পরিশেষে সৎ ও ভালো লোকদের সুখ-শান্তি আলোচনা করা হয়েছে এবং কাফেরদের কটাক্ষ ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের জন্য তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে কাফেরদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

সূরাটির ফজিলত :" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা আল-মুতাফফিফীন তেলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সংরক্ষিত পানীয় পান করাবেন।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ [١]

শানে নুযূল-১ : নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন, তৎকালে মদীনাবাসী মাপের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণির লোক ছিল। তাদের সে চরিত্রের প্রতি ঘৃণা স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর ২২৩/৬, ইবনে কাছীর ৪৮৩/৪, কুরতুবী ২১৮/১৯]

শানে নুযূল-২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর এক বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি বলেন, মদীনায় এক শ্রেণির লোক ছিল, যারা কোনো বস্তু ক্রয় করতে হলে পুরোপুরিভাবে মেপে নিত, তবে যখন বিক্রি করত, তখন তারা মাপে কম প্রদান করত। মাপে বেশি নেওয়া এবং কম দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-৩ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াত আবূ জুহাইনা নামে পরিচিত এক ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তার নাম হচ্ছে আমর। মাপের জন্যে তার দু'ধরনের সা' (মাপ যন্ত্র) ছিল, একটি দ্বারা মেপে নিত তারা, অতঃপর অপরটি দ্বারা প্রদান করত। মাপে বেশি নেওয়া কম দেওয়ার ভয়াবহতা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২১৮/১৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.)-এর মতে মক্কায় অবতীর্ণ এবং হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ (রা.) মুকাতিল ও যাহ্হাক (র.)-এর মতে এই সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ কিন্তু মাত্র আটটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। ইমাম নাসায়ী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় তশরিফ আনেন, তখন মদীনাবাসীদের সাধারণ কাজ-কারবার 'কায়ল' তথা মাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। তারা এ ব্যাপারে চুরি করা ও কম মাপায় খুবই অভ্যস্ত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা তাত্বফীফ্ অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরও বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় পৌছার পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কারণ মদীনাবাসীদের মধ্যে তখন এ বিষয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল যে, তারা নিজেরা কারও কাছ থেকে সওদা নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করত এবং অন্যের কাছে বিক্রি করার সময় মাপে কম দিত। এই সূরা নাজিল হওয়ার পর তারা এই বদ-অভ্যাস থেকে বিরত হয় এবং এমন বিরত হয় যে, আজ পর্যন্ত তাদের এই সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। –[মাযহারী]

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ : تَطْفِيْف -এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরূপ করে, তাকে বলা হয় مُطَفِّف -কুরআনের এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাপে কম করা হারাম।

تَطْفِيْف -কেবল মাপে কম করার মধ্যেই সীমিত নয় বরং যে কোনো ব্যাপারে প্রাপককে প্রাপ্য থেকে কম দেওয়াও تَطْفِيْف -এর অন্তর্ভুক্ত : কুরআন ও হাদীসে মাপ ও ওজনে কম করাকে হারাম করা হয়েছে। সাধারণভাবে কাজ-কারবারে লেনদেনে এই দুই উপায়েই সম্পন্ন হয় এবং প্রাপকের প্রাপ্য আদায় হলো কি না, তা এই দুই উপায়েই নির্ণীত হয়। প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দেওয়াই যে এর উদ্দেশ্য, একথা বলাই বাহুল্য। অতএব বোঝা গেল যে, এটা শুধু মাপ ও ওজনের মধ্যেই সীমিত থাকবে না; বরং মাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোনো পন্থায় প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা تَطْفِيْف -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে আছে, হযরত ওমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাজের রুকূ-সেজদা ইত্যাদি ঠিকমতো করে না এবং দ্রুত নামাজ শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বললেন : لَقَدْ طَفَّفْتَ -অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আদায়ে تَطْفِيْف করেছ। এই উক্ত উদ্ধৃত করে হযরত ইমাম মালেক (র.) বলেন : لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيْفٌ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেওয়া ও কম করা আছে, এমনকি নামাজ ও অজুর মধ্যেও। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অন্যান্য হক ও ইবাদতে এবং বান্দার নির্দিষ্ট হকে ত্রুটি ও কম করে, সেও تَطْفِيْف -এর অপরাধে অপরাধী। মজুর, কর্মচারী যতটুকু সময় কাজ করার চুক্তি করে, তাতে কম করাও অন্যায় এবং প্রচলিত নিয়মের বরখেলাফ, কাজে অলসতা করাও নাজায়েজ। এসব ব্যাপারে সাধারণ লোক, এমনকি আলিমদের মধ্যেও অমনযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়। তারা চাকুরীর কর্তব্যে ত্রুটি করাকে পাপই গণ্য করে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : خَمْسٌ بِخَمْسٍ -অর্থাৎ পাঁচটি গোনাহের শাস্তি পাঁচটি–১. যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ তার উপর শত্রুকে প্রবল ও জয়ী করে দেন। ২. যে জাতি আল্লাহ্‌র আইন পরিত্যাগ করে অন্যান্য আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন ব্যাপক আকার ধারণ

করে। ৩. যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারে ব্যাপক হয়ে যায়, আল্লাহ তাদের উপর প্লেগ ও অন্যান্য মহামারী চাপিয়ে দেন। ৪. যারা মাপ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ তাদেরকে দুর্ভিক্ষের সাজা দেন। ৫. যারা জাকাত আদায় করে না, আল্লাহ তাদেরকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে দেন। –[কুরতুবী]

তাবারানীর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন : যে জাতির মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চুরি প্রচলিত হয়ে যায়, আল্লাহ তাদের অন্তরে শত্রুর ভয়ভীতি চাপিয়ে দেন, যে জাতির মধ্যে সুদের প্রচলন হয়ে যায়, তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রাচুর্য দেখা দেয়, যে জাতি মাপ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ তাদের রিজিক বন্ধ করে দেন, যে জাতি ন্যায়ের বিপরীতে ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে হত্যা ও খুন-খারাবি ব্যাপক হয়ে যায় এবং যারা চুক্তির ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আল্লাহ তাদের উপর শত্রুকে প্রবল করে দেন। –[মাযহারী]

দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও রিজিক বন্ধ করার বিভিন্ন উপায় : হাদীসে বর্ণিত রিজিক বন্ধ করা কয়েক উপায়ে হতে পারে–১. রিজিক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে, ২. রিজিক মওজুদ আছে কিন্তু তা খেতে পারে না কিংবা ব্যবহার করতে পারে না; যেমন আজকাল অনেক অসুখ-বিসুখে এরূপ হতে দেখা যায় এবং এটা বর্তমান যুগে খুবই ব্যাপক। এমনিভাবে দুর্ভিক্ষ কয়েক প্রকারে হতে পারে–১. প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেলে এবং ২. দ্রব্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেলে। আজকাল অধিকাংশ জিনিসপত্রে এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। হাদীসে বর্ণিত দারিদ্র্যের অর্থও কেবল টাকা-পয়সা এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকা নয়; বরং দারিদ্র্যের আসল অর্থ পরমুখাপেক্ষিতা ও অভাব-অনটন। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ-কারবারে অপরের প্রতি যতবেশি মুখাপেক্ষী, সে ততবেশি দরিদ্র। বর্তমান যুগের পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ তার বসবাস, চলাফেরা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে এমন এমন আইন-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ যে, তার লোকমা ও কালেমা পর্যন্ত বিধিনিষেধের আওতাধীন। ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে ক্রয় করতে পরে না, যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে সফর করতে পারে না। বিধি-নিষেধের বেড়াজাল এত বেশি যে, প্রত্যেক কাজের জন্য অফিসে যাতায়াত এবং অফিসার থেকে শুরু করে পিয়ন পর্যন্ত খোশামোদ করা ছাড়া জীবন নির্বাহ করা কঠিন। এসব পরমুখাপেক্ষিতারই তো অপর নাম দারিদ্র্য। বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বাহ্যত যেসব সন্দেহ দেখা দিতে পারে, এই বর্ণনার মাধ্যমে তা দূরীভূত হয়ে গেল।

সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীন : كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ : سِجِّينٍ-এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় বন্দি করা। কামূসে আছে– سِجِّينٍ -এর অর্থ চিরস্থায়ী কয়েদ। হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, سِجِّينٍ একটি বিশেষ স্থানের নাম। এখানে কাফেরদের রূহ্ অবস্থান করে এবং এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। এখানে এটাও সম্ভবপর যে, এস্থলে এমন কোনো খাতা আছে, যাতে সারা বিশ্বের কাফেরদের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।

স্থানটি কোথায় অবস্থিত, এ সম্পর্কে হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.)-এর এক নাতিদীর্ঘ রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সিজ্জীন সপ্তম নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং ইল্লিয়্যীন সপ্তম আকাশে আরশের নিচে অবস্থিত। –(মাযহারী) কোনো কোনো হাদীসে আরও আছে সিজ্জীন কাফের ও পাপাচারীদের আত্মার আবাসস্থল এবং ইল্লিয়্যীন মু'মিন-মুত্তাকীগণের আত্মার আবাসস্থল।

জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান স্থল : বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, জান্নাত আকাশে এবং জাহান্নাম মর্ত্যে অবস্থিত। ইবনে জারীর (র.) রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে وَجِيْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ (সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : জাহান্নামকে সপ্তম জমিন থেকে উপস্থিত করা হবে। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নাম সপ্তম জমিনে আছে। সেখান থেকেই প্রজ্বলিত হবে এবং সমুদ্র ও দরিয়া তার অগ্নিতে শামিল হবে, অতঃপর সবার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। এভাবে সেসব রেওয়ায়েতের মধ্যেও সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, সিজ্জীন জাহান্নামের একটি অংশের নাম। –[মাযহারী]

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ : এস্থলে مَّرْقُومٌ-এর অর্থ مَخْتُومٌ -(মোহরকৃত)। ইমাম বগভী ও ইবনে কাছীর (র.) বলেন : এটা সিজ্জীনের তাফসীর নয় বরং পূর্ববর্তী كِتَابُ الْفُجَّارِ -এর বর্ণনা। অর্থ এই যে, কাফের ও পাপাচারীদের আমলনামা মোহর লাগিয়ে সংরক্ষিত করা হবে। ফলে এতে হ্রাসবৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে না। এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিজ্জীন। এখনেই কাফেরদের রূহ্ জমা করা হবে।

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ : رَانَ শব্দটি رَيْنٌ থেকেই উদ্ভূত। অর্থ মরিচা ও ময়লা। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অন্তরে পাপের মরিচা পড়ে গেছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভালো ও মন্দের পার্থক্য বুঝে না। হযরত আবূ

হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মু'মনি ব্যক্তি কোনো গোনাহ করলে তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। যদি সে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং সংশোধিত হয়ে যায়, তবে এই কাল দাগ মিটে যায় এবং অন্তর পূর্ববৎ উজ্জ্বল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি তওবা না করে এবং গোনাহ্ করে যায়, তবে এই কালো দাগ তার সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একেই আয়াতে رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ বলা হয়েছে। –(মাযহারী) পূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কাফেররা কুরআনকে উপকথা বলে পরিহাস করে। এই আয়াতের শুরুতে كَلَّا -বলে তাদেরকে শাসানো হয়েছে যে, তারা গোনাহের স্তূপে পড়ে অন্তরের সেই ঔজ্জ্বল্য ও যোগ্যতা খতম করে দিয়েছে, যাদ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝা যায়। এই যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় গচ্ছিত রাখেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মিথ্যারোপ কোনো প্রমাণ, জ্ঞানবুদ্ধি ও সুবিবেচনা প্রসূত নয় বরং এর কারণ এই যে, তাদের অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ভালোমন্দ দৃষ্টিগোচরই হয় না।

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এই কাফেররা তাদের পালনকর্তার জিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) বলেন : এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মু'মিন ও ওলীগণ আল্লাহ তা'আলার জিয়ারত লাভ করবে। নতুবা কাফেরদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখার কেনো উপকারিতা নেই।

জনৈক শীর্ষস্থানীয় আলিম বলেন ; এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, প্রত্যেক মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসতে বাধ্য। এ কারণেই সাধারণ কাফের ও মুশরিক যত কুফর ও শিরকেই লিপ্ত থাকুক না কেন এবং আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে যত ভ্রান্ত বিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা সবার অন্তরেই বিরাজমান থাকে। তারা নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁরই অন্বেষণ ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত করে থাকে। ভ্রান্ত পথের কারণে তারা মন্‌জিলে মকসুদে পৌঁছতে না পারলেও অন্বেষণ সেই মন্‌জিলেরই করে। আলোচ্য আয়াত থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। কেননা কাফেরদের মধ্যে যদি আল্লাহ্‌র জিয়ারতের আগ্রহ না থাকত, তবে শাস্তি স্বরূপ একথা বলা হতো না যে, তারা আল্লাহর জিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ যে ব্যক্তি কারও জিয়ারতের প্রত্যাশীই নয় বরং তার প্রতি ভীতশ্রদ্ধ, তার জন্য তার জিয়াতর থেকে বঞ্চিত করা কোনো শাস্তি নয়।

اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ :কারও কারও মতে عِلِّيِّيْنَ শব্দটি عُلُوٌّ -এর বহুবচন। উদ্দেশ্য উচ্চতা। ফাররা (র.)-এর মতে এটা এক জায়গার নাম– বহুবচন নয়। পূর্বোল্লিখিত বারা ইবনে আজেব (র.)-এর হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়্যীন সপ্তম আরশের নিচে এক স্থানের নাম। এতে মু'মিনদের রূহ ও আমলনামা রাখা হয়। পরবর্তী كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ বাক্যটিও ইল্লিয়্যীনের তাফসীর নয়–সৎলোকদের আমলনামার বর্ণনা। উপরে اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ বাক্যে এই আমল নামার উল্লেখ আছে।

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ : يَشْهَدُ শব্দটি شُهُوْدٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ উপস্থিত হওয়া, প্রত্যক্ষ করা। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মশীলদের আমলনামা নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ দেখবে অর্থাৎ তত্ত্বাবধান ও হেফাজত করবে। –(কুরতুবী) شُهُوْد -এর অর্থ উপস্থিত হওয়া নেওয়া হলে يَشْهَدُهُ -এর সর্বনাম দ্বারা ইল্লিয়্যীন বোঝানো হবে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, নৈকট্যশীলগণের রূহ্ এই ইল্লিয়্যীন নামক স্থানে উপস্থিত হবে। কারণ এটাই তাদের আবাসস্থল; যেমন সিজ্জীন কাফেরদের রূহের আবাসস্থল। সহীহ্ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.)-এর বর্ণিত একটি হাদীস এর প্রমাণ। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : শহীদগণের রূহ্ আল্লাহর সান্নিধ্যে সবুজ পাখীদের মধ্যে থাকবে এবং জান্নাতের বাগবাগিচা ও নহরসমূহে ভ্রমণ করবে। তাদের বাসস্থানে আরশের নিচে ঝুলন্ত প্রদীপ থাকবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, শহীদগণের রূহ্ আরশের নিচে থাকবে এবং জান্নাতে ভ্রমণ করতে পারবে। সূরা ইয়াসীনে হাবীব নাজ্জারের ঘটনায় বলা হয়েছে :

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ এ থেকে জানা যায় যে, হাবীব নাজ্জার মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। কোনো কোনো হাদীস দ্বারাও জানা যায় যে, মু'মিনদের রূহ জান্নাতে থাকবে ; সবগুলো সারমর্ম এই যে, এসব রূহের আবাসস্থল হবে সপ্তম আকাশে আরশের নিচে। জান্নাতের স্থানও এটাই। এসব রূহকে জান্নাতে ভ্রমণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখানে নৈকট্যশীলগণের উচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যদিও এ অবস্থাটি শুধু তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও প্রকৃতপক্ষে এটাই সব মু'মিনের রূহের আবাসস্থল। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلَقُ فِيْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتّٰى تَرْجِعَ إِلٰى جَسَدِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ মু'মিনের রূহ পাখীর আকারে জান্নাতের বৃক্ষে ঝুলন্ত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন আবার আপন দেহে ফিরে যাবে। এই বিষয়বস্তুরই এক রেওয়ায়েত মুসনাদে আহমদ ও তাবারানীতে বর্ণিত হয়েছে। –[মাযহারী]

মৃত্যুর পর মানবাত্মার স্থান কোথায়? এ ব্যাপারে হাদীসসমূহে বাহ্যত বিভিন্নরূপ। সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীনের তাফসীর প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের আত্মা সিজ্জীনে থাকে যা সপ্তম জমিনে অবস্থিত এবং মু'মিনদের আত্মা সপ্তম আকাশে আরশের নিচে ইল্লিয়্যীনে থাকে। উল্লিখিত কতক রেওয়ায়েত থেকে আরও জানা যায় যে, কাফেরদের আত্মা জাহান্নামে এবং মু'মিনদের আত্মা জান্নাতে থাকে। আরও কতক হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ও কাফের উভয় শ্রেণির আত্মা তাদের কবরে থাকে। বারা ইবনে আজেব (রা.)-এর বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে আছে, যখন মু'মিনের আত্মাকে ফেরেশতাগণ আকাশে নিয়ে যায়, তখন আল্লাহ বলেন : আমার এই বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে লিখে দাও এবং তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। কেননা আমি তাকে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছি, মৃত্যুর পর তাতেই ফিরিয়ে দিব এবং মাটি থেকে তাকে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত করব। এই আদেশ পেয়ে ফেরেশতাগণ তার আত্মা কবরে ফিরিয়ে দেয়। এমনিভাবে কাফেরের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তাকে কবরে ফিরেয়ে দেওয়ার আদেশ করা হবে। ইমাম ইবনে আবদুল বার (র.) এই হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যার মর্ম এই যে, মু'মিন ও কাফের সবার আত্মা মৃত্যুর পর কবরেই থাকে। উপরিউক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়, চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা কোনো বিরোধ নয়। কেননা ইল্লিয়্যীনের স্থান সপ্তম আকাশে আরশের নিচে এবং জান্নাতের স্থানও সেখানেই। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে আছে :

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى-এ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে। সিদরাতুল মুনতাহা যে সপ্তম আকাশে একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই আত্মার স্থান ইল্লিয়্যীন জান্নাতের সংলগ্ন এবং আত্মাসমূহ জান্নাতের বাগিচায় ভ্রমণ করে। অতএব, আত্মার স্থান জান্নাতও বলা যায়।

এমনিভাবে কাফেরদের আত্মার স্থান সিজ্জীন–সপ্তম জমিনে অবস্থিত। হাদীস দ্বারা একথাও প্রমাণিত আছে যে, জাহান্নামও সপ্তম জমিনে অবস্থিত এবং জাহান্নামের উত্তাপ ও কষ্ট সিজ্জীনবাসীরা ভোগ করবে। তাই কাফেরদের আত্মার স্থান জাহান্নাম একথা বলে দেওয়াও নির্ভুল। তবে যে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের আত্মা কবরে থাকে, সেই রেওয়ায়েত বাহ্যত উপরিউক্ত দুই রেওয়ায়েতের বিরোধী। প্রখ্যাত তাফসীরবিদ হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র.) তাফসীরে-মাযহারীতে এই বিরোধের মীমাংসা দিয়ে বলেছেন : এটা মোটেই অবান্তর নয় যে, আত্মাসমূহের আসল স্থান ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীনই। কিন্তু এসব আত্মার একটি বিশেষ যোগসূত্র কবরের সাথেও কায়েম রয়েছে। এই যোগসূত্র কিরূপ, তার স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। কিন্তু সূর্য ও চন্দ্র যেমন আকাশে থাকে এবং তাদের কিরণ পৃথিবীতে পড়ে পৃথিবীকেও আলোকোজ্জ্বল করে দেয় এবং উত্তপ্তও করে, তেমনিভাবে ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীনস্থ আত্মা-সমূহের কোনো অদৃশ্য যোগসূত্র কবরের সাথে থাকতে পারে। এই মীমাংসার ব্যাপারে কাযী সানাউল্লাহ্ (র.)-এর সুচিন্তিত বক্তব্য সূরা নাযিয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, রূহ্ দুই প্রকার–১. মানবদেহে প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ। এটা বস্তুনিষ্ঠ এবং চারি উপাদানে গঠিত দেহ, কিন্তু এমন সূক্ষ্ম যে, দৃষ্টিগোচর হয় না। একেই নফস বলা হয়। ২. অবস্তুনিষ্ঠ অশরীরী রূহ্। এই রূহ্ই নফসের জীবন। কাজেই একে রূহের রূহ্ বলা যায়। মানবদেহের সাথে উভয় প্রকার রূহের সম্পর্ক আছে। কিন্তু প্রথম প্রকার রূহ্ অর্থাৎ নফ্স মানবদেহের অভ্যন্তরে থাকে। এর বের হয়ে যাওয়ারই নাম মৃত্যু। দ্বিতীয় রূহ্ প্রথম রূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে কিন্তু এই সম্পর্কের স্বরূপ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। মৃত্যুর পর প্রথম রূহকে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, অতঃপর কবরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কবরই এর স্থান। আজাব ও ছওয়াব এর উপরই চলে এবং দ্বিতীয় প্রকার অশরীরী রূহ্ ইল্লিয়্যীন অথবা সিজ্জীনে থাকে। এভাবে সব রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। অতএব, অশরীরী আত্মাসমূহ জান্নাতে অথবা ইল্লিয়্যীনে, জাহান্নামে অথবা সিজ্জীনে থাকে এবং প্রথম প্রকার রূহ্ তথা সূক্ষ্মা শরীরী নফ্স কবরে থাকে।

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ : تَنَافُسْ-এর অর্থ কোনো বিশেষ পছন্দনীয় জিনিস অর্জন করার জন্য কয়েকজনের ধাবিত হওয়া ও দৌড়ানো, যাতে অপরের আগে সে তা অর্জন করে। এখানে জান্নাতের নিয়ামতরাজি উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা গাফিল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন : আজ তোমরা যেসব বস্তুকে প্রিয় ও কাম্য মনে কর, সেগুলো অর্জন করার জন্য অগ্রে চলে যাওয়ার চেষ্টায়রত আছ, সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নিয়ামত। এসব

নিয়ামত প্রতিযোগিতার যোগ্য নয়। এসব ক্ষণস্থায়ী সুখের সামগ্রী হাতছাড়া হয়ে গেলেও তেমন দুঃখের কারণ নয়। হ্যাঁ, জান্নাতের নিয়ামতরাজির জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত। এগুলো সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী। আকবর এলাহাবাদী মরহুম চমৎকার বলেছেন :

یہ کہاں کافسانہ ہے سودوزیاں * جوگیاسوگیاجوملاسوملا

کہوذہن سے فرصت عمرہے کم * جودلاتوخداہی کی یاددلا

إِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সত্যপন্থিদের সাথে মিথ্যাপন্থিদের ব্যবহারের পূর্ণ চিত্র অংকন করেছেন। কাফেররা মু'মিনদেরকে উপহাস করে হাসত, তাদেরকে সামনে দেখলে চোখ টিপে ইশারা করত। এরপর তারা যখন নিজেদের বাড়িঘরে ফিরত, তখন মু'মিনদেরকে উপহাস করার বিষয়ে আনন্দভরে আলোচনা করত। কাফেররা মু'মিনদেরকে দেখে বাহ্যত সহানুভূতির সুরে এবং প্রকৃতপক্ষে উপহাসের ছলে বলত : এ বেচারীরা বড় সরলমনা ও বেওকুফ। মুহাম্মদ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

আজকালকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, যারা নব্যশিক্ষার অশুভ ফলস্বরূপ ধর্ম ও পরকালের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি নামেমাত্রই বিশ্বাসী রয়ে গেছে, তারা আলিম ও ধর্মপরায়ণ লোকদের সাথে হুবহু এমনি ধরনের ব্যবহার করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এই মর্মন্তুদ আজাব থেকে রক্ষা করুন। এই আয়াতে মু'মিন ও ধার্মিক লোকদের জন্য সান্ত্বনার যথেষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে। তাদের উচিত এই তথাকথিত শিক্ষিতদের উপহাসের পরোয়া না করা। জনৈক কবি বলেন :

ہنسے جانے سے جب تک ہم ڈرینگے * زمانہ ہم پرہنستاہی رہیگا

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْمُطَفِّفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَطْفِيْفٌ মূলবর্ণ (ط – ف – ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যারা মাপে কম দেয়।

اِكْتَالُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِكْتِيَالٌ মূলবর্ণ (ك – ى – ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা মেপে নেয়।

يَسْتَوْفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِيْفَاءٌ মূলবর্ণ (و – ف– ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পুরাপুরি নেয়।

كَالُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার كَيْلٌ মূলবর্ণ (ك – ى – ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা মেপে দেয়।

يُخْسِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِخْسَارٌ মূলবর্ণ (خ – س– ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা কম দেয়।

سِجِّيْنٌ : জেলখানা। আবূ হাতেম কিতাবুল জিনাতে বর্ণনা করে, এই শব্দটি অনারবী। শায়খ ইসমাঈল হক বারুসভী লিখেন, সিজ্জীন ঐ স্বয়ংসম্পূর্ণ কিতাবের ইলম, যা খারাপের পাণ্ডুলিপি, যাতে শয়াতানসমূহের কুফরিসুলভ আর মানুষ ও জিনের সকল আমল সংরক্ষিত। এই শব্দটিকে মুনসারিফ পড়া হবে। কারণ তার একটি মাত্র সবব। তা হলো মারেফা। হযরত বারা (রা.) হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ থেকে রেওয়ায়েত করেন, সিজ্জীন সাত জমিনের মধ্যে সর্বশেষ ও নিচের স্তর।

مَرْقُوْمٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার رَقْمٌ মূলবর্ণ (ر – ق – م) জিনস صحيح অর্থ– লিখিত, সিল মোহরকৃত।

رَانَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার رَيْنٌ মূলবর্ণ (ر – ى – ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– মরিচিকা ধরেছে।

مَحْجُوبُونَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার حِجَابًا ও حَجْبًا মূলবর্ণ (ح ـ ج ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– বাঁধা দেওয়া, আল্লাহ তা'আলার নুরের তাজ্জালীকে যে দেখবে না। সৌন্দর্য দেখা থেকে বাঁধা দেওয়া হবে।

صَالُوا : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার صَلْىٌ মূলবর্ণ (ص – ل – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা প্রবেশ করবে।

عِلِّيِّيْنَ : উপরওয়ালা, উর্ধ্বে অবস্থানকারী। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেন, আয়াতে عِلِّيِّيْنَ কে অনেকে সবচেয়ে উচ্চস্তরের জান্নাতের নাম বলে মনে করেন। যেমন, সবচেয়ে নিম্নস্তরের দোজখকে سجين বলে নামকরণ করা হয়েছে।

يَشْهَدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার شُهُوْدٌ মূলবর্ণ (ش ـ ه ـ د) জিনস صحيح অর্থ– সে হাজির হবে, উপস্থিত হবে, সে উপস্থিত থাকবে।

رَحِيْقٌ : ইসমে জামেদ। অর্থ : পানীয়, মদ, পরিষ্কার, অকৃত্রিম, খাঁটি। আল্লামা আবূ মানসুর সায়লাবি (র.) ফিকহুল লুগাতে আবূ ওবায়দা (র.) থেকে নকল করেন, اَلرَّحِيْقُ صَفْوَةُ الْخَمْرِ الَّتِىْ لَيْسَ فِيْهَا غَشٌّ রহীক হলো ঐ স্বচ্ছ পানীয়, যার মধ্যে কোনো মতলামী নেই।

مِسْكٌ : ইসম, মিশক, মৃগনাভী, কস্তুরি, প্রসিদ্ধ সুগন্ধি, এর মীমে যের ও পেশ উভয়টি দিয়ে পড়া যায়। পারস্যের লোকেরা মীমে যের দিয়ে আর মাওরায়ান্নাহার লোকেরা মীমে পেশ দিয়ে পড়ে। (লোগাতে কিশওয়ারী)

يَتَنَافَسُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَنَافُسٌ মূলবর্ণ (ن – ف – س) জিনস صحيح অর্থ– লালসা করে।

يَتَغَامَزُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَغَامُزٌ মূলবর্ণ (غ ـ م ـ ز) জিনস صحيح অর্থ– তারা পরস্পর চোখ টেপাটেপি করত।

اِنْقَلَبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْقِلَابٌ মূলবর্ণ (ق – ل – ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা ফিরে যেত।

ضَالُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার ضَلَالٌ মূলবর্ণ (ض – ل – ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ভ্রান্ত গোমরাহ, পথভ্রষ্ট।

ثُوِّبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَثْوِيْبٌ মূলবর্ণ (ث ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– প্রতিদান দেওয়া হয়েছে, বদলে দেওয়া হয়েছে, বিনিময় দেওয়া হলো। এ শব্দটি কুরআন মাজীদের যেখানে যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বড় বড় আমলের প্রতিদান দেওয়ার অর্থে হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ خِتَامُهٗ مِسْكٌ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ : এখানে يُسْقَوْنَ হলো فعل مضارع مجهول আর مِنْ رَّحِيْقٍ হলো يُسْقَوْنَ-এর সাথে متعلق আর مَخْتُوْمٌ হলো رَحِيْقٌ-এর সিফত। আর خِتَامُهٗ হলো মুবতাদা, আর مِسْكٌ হলো খবর। মুবতাদা খবর মিলে رَحِيْق-এর দ্বিতীয় সিফত হয়েছে। আর وَفِىْ ذٰلِكَ টা فَلْيَتَنَافَسْ-এর সাথে متعلق আর فَلْيَتَنَافَسِ-এর فاء টি হলো হরফে আতফ আর واو-এর ذٰلِكَ আতেফা لِيَتَنَافَسْ হলো ফে'ল, আর اَلْمُتَنَافِسُوْنَ হলো ফায়েল। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ২৫৫]

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ইনশিকাক

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২৫, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. [দ্বিতীয় ফুৎকারে] যখন আসমান বিদীর্ণ হবে।	اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝
২. এবং স্বীয় প্রভুর নির্দেশ শ্রবণ করবে এবং সে [আসমান] তারই [অর্থাৎ সে আজ্ঞা পালনেরই] যোগ্য।	وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝
৩. আর যখন জমিনকে বিস্তৃত করা হবে।	وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝
৪. আর সে স্বীয় গর্ভস্থ বস্তুসমূহ উগরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে।	وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝
৫. এবং স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ শ্রবণ করবে আর সে এরই যোগ্য।	وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝
৬. হে মানব! তুমি তোমার রবের সম্মুখে উপনীত হওয়া পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে হবে। অতঃপর তারই সাথে সাক্ষাৎ করবে।	يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۝
৭. অনন্তর যার আমলনামা তার ডান হাতে প্রদান করা হবে।	فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا السَّمَآءُ যখন আসমান اِنْشَقَّتْ বিদীর্ণ হবে।

২. وَاَذِنَتْ এবং সে শ্রবণ করবে لِرَبِّهَا স্বীয় প্রভুর (নির্দেশ) وَحُقَّتْ এবং সে তারই যোগ্য।

৩. وَاِذَا الْاَرْضُ আর যখন জমিনকে مُدَّتْ বিস্তৃত করা হবে।

৪. وَاَلْقَتْ উগরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করবে / ফেলে দিবে مَا فِيْهَا স্বীয় গর্ভস্থ বস্তুসমূহ / যা তার ভিতরে রয়েছে, তা وَتَخَلَّتْ এবং সে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে / খালি হয়ে যাবে।

৫. وَاَذِنَتْ এবং সে শ্রবণ করবে لِرَبِّهَا স্বীয় প্রভুর (নির্দেশ) وَحُقَّتْ এবং সে এরই যোগ্য।

৬. يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ হে মানব! اِنَّكَ নিশ্চয় তুমি كَادِحٌ সাধনা করতে হবে / পরিশ্রম করছ اِلٰى رَبِّكَ তোমার রবের সম্মুখে উপনীত হওয়া পর্যন্ত كَدْحًا কঠোর সাধনা / পরিশ্রম فَمُلٰقِيْهِ অতঃপর তারই সাথে সাক্ষাৎ করবে।

৭. فَاَمَّا مَنْ অনন্তর যাকে اُوْتِىَ প্রদান করা হবে كِتٰبَهٗ তার আমলনামা بِيَمِيْنِهٖ তার ডান হাতে।

অনুবাদ	আয়াত
৮. তবে তার থেকে সহজ হিসাব নেওয়া হবে।	فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴿٨﴾
৯. এবং সে তার পরিজনের নিকট সানন্দে ফিরে আসবে।	وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿٩﴾
১০. আর যাকে তার আমলনামা পশ্চাৎ দিক দিয়ে প্রদান করা হবে।	وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ﴿١٠﴾
১১. ফলে সে মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে।	فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ﴿١١﴾
১২. এবং দোজখে প্রবেশ করবে।	وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ﴿١٢﴾
১৩. এই ব্যক্তি [দুনিয়ায়] স্বীয় পরিজনের মধ্যে সানন্দে ছিল।	اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿١٣﴾
১৪. সে ভেবেছিল যে, তাকে [আল্লাহর সমীপে] কখনো প্রত্যাবর্তন করতে হবে না।	اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ﴿١٤﴾
১৫. অবশ্যই ফিরে যাবে; নিশ্চয় তার প্রভু তাকে ভালোরূপেই দেখছিলেন।	بَلٰٓى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ﴿١٥﴾
১৬. অতএব আমি শফকের [অস্তরাগের লালিমাযুক্ত পশ্চিমাকাশের] শপথ করে বলছি।	فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾
১৭. আর রাত্রির এবং সে সমস্ত বস্তুর যা রাত্রি সমবেত করে।	وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾
১৮. আর চন্দ্রের যখন তা পরিপূর্ণ হয়।	وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ তার থেকে হিসাব নেওয়া হবে। حِسَابًا يَّسِيْرًا অত্যন্ত সহজ হিসাব।

৯. وَّيَنْقَلِبُ এবং সে ফিরে আসবে اِلٰٓى اَهْلِهٖ তার পরিজনের নিকট। مَسْرُوْرًا সানন্দে।

১০. وَاَمَّا আর مَنْ اُوْتِيَ যাকে প্রদান করা হবে كِتٰبَهٗ তার আমলনামা وَرَآءَ ظَهْرِهٖ তার পশ্চাৎ দিক দিয়ে

১১. فَسَوْفَ يَدْعُوْا ফলে সে ডাকতে থাকবে। ثُبُوْرًا মৃত্যুকে ধ্বংসকে।

১২. وَّيَصْلٰى এবং সে প্রবেশ করবে। سَعِيْرًا দোজখে।

১৩. اِنَّهٗ كَانَ নিশ্চয় এই ব্যক্তি ছিল فِيْٓ اَهْلِهٖ স্বীয় পরিজনের মধ্যে। مَسْرُوْرًا সানন্দে।

১৪. اِنَّهٗ ظَنَّ সে ভেবেছিল যে اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ তাকে কখনো প্রত্যাবর্তন করতে হবে না।

১৫. بَلٰٓى অবশ্যই اِنَّ رَبَّهٗ নিশ্চয় তার প্রভু। كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا তাকে ভালোরূপেই দেখছিলেন।

১৬. فَلَآ اُقْسِمُ অতএব আমি শপথ করছি بِالشَّفَقِ শফকের / সান্ধ্য লালিমার

১৭. وَالَّيْلِ আর শপথ রাত্রের وَمَا وَسَقَ এবং সে সমস্ত বস্তুর যা রাত্রি সমবেত করে।

১৮. وَالْقَمَرِ আর চন্দ্রের শপথ اِذَا اتَّسَقَ যখন তা পরিপূর্ণ হয়।

১৯. অবশ্যই তোমাদেরকে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় উপনীত হতে হবে।	لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾
২০. সুতরাং তাদের কি হলো যে, তারা ঈমান আনছে না?	فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾
২১. আর যখন তাদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা নত হয় না।	وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾
২২. বরং কাফেররা তাকে অবিশ্বাস করে।	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. আর আল্লাহ তা'আলার সবকিছুই জানা আছে, তারা যা [যে অসৎ কার্যসমূহ] সঞ্চয় করছে।	وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. সুতরাং আপনি তাদেরকে এক যন্ত্রণাময় আজাবের খবর শুনিয়ে দিন।	فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾
২৫. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং নেককাজ করেছে তাদের জন্য [পরকালে] এমন প্রতিদান রয়েছে যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়।	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. لَتَرْكَبُنَّ অবশ্যই তোমাদেরকে উপনীত হতে হবে طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায়।

২০. فَمَا لَهُمْ সুতরাং তাদের কি হলো যে لَا يُؤْمِنُونَ তারা ঈমান আনছে না?

২১. وَإِذَا قُرِئَ আর যখন পাঠ করা হয় عَلَيْهِمُ তাদের সম্মুখে الْقُرْآنُ কুরআন لَا يَسْجُدُونَ তখন তারা নত হয় না।

২২. بَلِ الَّذِينَ বরং যারা كَفَرُوا কুফরি করেছে يُكَذِّبُونَ তারা (তাকে) অবিশ্বাস করে।

২৩. وَاللَّهُ أَعْلَمُ আর আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই জানেন بِمَا يُوعُونَ তারা যা সঞ্চয় করছে -সে সম্পর্কে।

২৪. فَبَشِّرْهُمْ সুতরাং আপনি তাদেরকে খবর শুনিয়ে দিন بِعَذَابٍ أَلِيمٍ এক যন্ত্রণাময় আজাবের।

২৫. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا কিন্তু যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং নেককাজ করেছে لَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ এমন প্রতিদান যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম প্রথম আয়াতে উল্লিখিত اِنْشَقَّتْ শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ : বিদীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা দ্বারাই সূরার ভাষণটি শুরু করা হয়েছে। এতে ২৫টি আয়াত, ১০৯টি বাক্য এবং ৭৩০ টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ ইসলামি যুগের প্রথম দিকের সূরা। যদিও অবতীর্ণের সঠিক সময় কখন ছিল, তা জানা যায় না, তবে সূরার আলোচ্য বিষয়াদি হতে প্রমাণ হয় যে, তখনো মক্কায় ইসলামের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু হয়নি; বরং কুরআনকে মিথ্যা জানা হতো এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদিকে অস্বীকার করা হতো। সম্ভবত এ সময়ই কিয়ামতের অনিবার্যতা এবং হাশর-নশর ও হিসাব-নিকাশের অবশ্যম্ভাবিতা অবহিত করানোর জন্য এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলকথা : কিয়ামত ও পরকালই এর মূল আলোচ্য বিষয়। প্রথম পাঁচটি আয়াতে শুধু কিয়ামতের পরিস্থিতির কথাই বলা হয়নি; বরং এটা যে- নিঃসন্দেহে সত্য ও অবধারিত, তার যুক্তিও দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের পরিস্থিতে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- সেদিন আকাশ ফেটে যাবে, জমিন সম্প্রসারিত করে সমতল প্রান্তর বানিয়ে দেওয়া হবে। মাটির গর্ভে যা কিছু লুক্কায়িত রয়েছে (মৃত মানুষের দেহাবশেষ এবং তাদের আমলের প্রমাণাদি) তা সবই বাহিরে নিক্ষিপ্ত হবে। শেষ পর্যন্ত সেখানে কিছুই থাকবে না। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, আকাশ ও জমিনের প্রতি এটাই হবে আল্লাহর নির্দেশ। আর উভয়ই যেহেতু আল্লাহর সৃষ্ট, এ জন্য তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা বা অমান্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

অতঃপর ৬-১৯ পর্যন্ত থেকে আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে এর চেতনা থাকুক আর নাই থাকুন- আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার দিকে তারা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তীব্র গতিতে গমন করছে। অতঃপর সব মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

এক ভাগের লোকদের ডান হাতে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে এবং কোনোরূপ সঠিক হিসাব-নিকাশ ছাড়াই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। দ্বিতীয় ভাগের লোকদের আমলনামা তাদের পিছনের দিক হতে সামনে ফেলে দেওয়া হবে। এ অবস্থায় যে কোনোভাবে তাদের মৃত্যু আসুক, তাই হবে তাদের মনের একমাত্র কামনা। কিন্তু মৃত্যু তো নেই, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা যেহেতু দুনিয়াতে এক বড় ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। তারা মনে করে বসেছিল যে, জাবাবদিহির জন্য কখনই আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে না। তাদের উক্ত রূপ পরিণাম হবে ঠিক এ কারণেই। কেননা আল্লাহ তো তাদের সব আমলই দেখছিলেন। তাদের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ হতে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়ার তো কোনোই কারণ নেই। দুনিয়ার জীবন হতে পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ও পর্যায়ে তাদের উপস্থিতি সন্দেহাতীত ব্যাপার। সূর্যাস্তের পর রঙিন উষার উদয়, দিনের অবসানে রাত্রের আগমন, এতে মানুষ ও গৃহপালিত চুতষ্পদ জন্তুগুলোর নিজ নিজ আশ্রয়ে ফিরে আসা এবং চন্দ্রের প্রথম হাঁসুলির আকার হতে ক্রমবৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ চন্দ্রের রূপ লাভ যতটা নির্ভুল ও সন্দেহাতীত, এ ব্যাপারটিও ঠিক তেমনই নিশ্চিত।

যেসব কাফের কুরআন মাজীদ শুনে আল্লাহর নিকট অবনত হওয়ার পরিবর্তে উল্টো তাকেই মিথ্যা মনে করে সে কাফেরদেরকে শেষের আয়াতে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনয়ন করে নেকআমল গ্রহণ করে তাদেরকে অপরিমিত সুফল দানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا [٩]

শানে নুযূল : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন যে, বর্ণিত রয়েছে, আলোচ্য আয়াত মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশে সর্বপ্রথম হিজরতকারী হযরত আবূ সালাম বিন আব্দুল আসাদ (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। -[কুরতুবী ২৩৮/১৯]

وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ [١٠]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আবূ সালমান ভাই আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে তা সকল মু'মিন ও কাফের আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। -[কুরতুবী ২৩৯/১৯]

এ সূরায় কিয়ামতের অবস্থা, হিসাব-নিকাশ এবং সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা আছে। অতঃপর গাফিল মানুষকে তার সত্তা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তাদ্বারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছার নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যে, তার গর্ভে যেসব গুপ্ত ভাণ্ডার অথবা মানুষের মৃতদেহ আছে, সব সেদিন বাইরে উদগীরণ করে দেবে এবং হাশরের জন্য এক নতুন পৃথিবী তৈরি হবে। তাতে না থাকবে কোনো পাহাড়-পর্বত এবং না থাকবে কোনো দালান-কোঠা ও বৃক্ষলতা। পরিষ্কার একটি সমতল ভূমি হবে। একে আরও সম্প্রসারিত করা হবে, যাতে করে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ তাতে সমবেত হতে পরে! অন্যান্য সূরায়ও এই বর্ণনা বিভিন্ন ভঙ্গিতে এসেছে। এখানে নতুন সংযোজন এই যে, কিয়ামতের দিক আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ - أَذِنَتْ -এর অর্থ শুনেছে অর্থাৎ আদেশ পালন করেছে। حُقَّتْ -এর অর্থ حَقَّ لَهَا الْاِنْقِيَادُ অর্থাৎ আদেশ পালন করাই তার ওয়াজিব কর্তব্য ছিল।

আল্লাহর নির্দেশ দুই প্রকার : এখানে আকাশ ও পৃথিবীর আনুগত্য এবং আদেশ প্রতিপালনের দুই অর্থ হতে পারে। কেননা আল্লাহর নির্দেশ দুই প্রকার-১. শরিয়তগত নির্দেশ; এতে একটি আইন ও বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি বলে দেওয়া হয় না কিন্তু প্রতিপক্ষকে করা না করার ব্যাপারে বাধ্য করা হয় না বরং তাকে স্বেচ্ছায় আইন মানা না মানা উভয় বিষয়ের ক্ষমতা

দান করা হয়। এসব নির্দেশ সাধারণত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টির প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে; যেমন মানব ও জিন। এই শ্রেণির নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মু'মিন ও কাফের এবং বাধ্য ও অবাধ্যের দুইটি প্রকার সৃষ্টি হয়। ২. সৃষ্টিগত ও তাকদীরগত নির্দেশ; এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে আরোপিত হয়। কারও সাধ্য নেই যে, চুল পরিমাণ বিরুদ্ধাচরণ করে। সমগ্র সৃষ্টি এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করে; জিন এবং মানবও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মু'মিন কাফির, সৎ ও পাপাচারী সবাই এই আইন মেনে চলতে বাধ্য।

ذرہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے * زندگی کے خواب کی جامی یہی تعبیر ہے

এস্থলে এটা সম্ভবপর যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীকে আদিষ্ট মানব ও জিনের ন্যায় চেতনা ও উপলব্ধি দান করবেন। ফলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ আসা মাত্রই তারা স্বেচ্ছায় তা পালন করবে ও মেনে নেবে। আর যদি নির্দেশের অর্থ এখানে সৃষ্টিগত নির্দেশ নেওয়া হয়, যাতে ইচ্ছা ও এরাদার কোনো দখলই নেই, তবে এটাও সম্ভবপর। তবে اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ -এর ভাষা প্রথমোক্ত অর্থের অধিক নিকটবর্তী। দ্বিতীয় অর্থও রূপক হিসাবে হতে পারে।

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ : مَدَّ –এর অর্থ টেনে লম্বা করা। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন পৃথবীকে চামড়ার (অথবা রবারের) ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করা হবে। এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ একত্রিত হওয়ার ফলে এক একজনের ভাগে কেবল পা রাখার স্থান পড়বে। –[মাযহারী]

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ : অর্থাৎ পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু উদগীরণ করে একেবারে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত ধনভাণ্ডার, খনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মৃত মানুষের দেহকণা ইত্যাদি রয়েছে। প্রবল ভূকম্পনের মাধ্যমে পৃথিবী এসব বস্তু গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ : كَدْحٌ -এর অর্থ কোনো কাজে পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা। اِلٰى رَبِّكَ –অর্থাৎ মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা ও অধ্যবসায় আল্লাহ্র দিকে চূড়ান্ত হবে।

আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন : এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্বোধন করে চিন্তাভাবনার একটি পথ দেখিয়েছেন। যদি মানুষের মধ্যে সামান্যতম জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনা থাকে এবং এ পথে চিন্তাভাবনা করে, তবে সে তার চেষ্টা চরিত্র ও অধ্যবসায়ের সঠিক গতি নির্ণয় করতে সক্ষম হবে এবং এটা হবে তার ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। আল্লাহ তা'আলার প্রথম কথা এই যে, সৎ-অসৎ ও কাফের-মু'মিন নির্বিশেষে মানুষ মাত্রই প্রকৃতিগতভাবে কোনো না কোনো বিষয়কে লক্ষ্য স্থির করে তা অর্জনের জন্য অধ্যাবসায় ও শ্রম স্বীকার করতে অভ্যস্ত। একজন সম্ভ্রান্ত ও সৎ লোক যেমন জীবিকা ও জীবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈধ পন্থাসমূহ অবলম্বন করে এবং তাতে স্বীয় শ্রম ও শক্তি ব্যয় করে, তেমনি দুষ্কর্মী ও অসৎ ব্যক্তিও পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় ব্যতিরেকে স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে না। চোর, ডাকাত, বদমায়েশ ও লুটতরাজকারীদেরকে দেখুন, তারা কি পরিমাণ মানসিক ও দৈহিক শ্রম স্বীকার করে। এরপরই তারা লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয়। দ্বিতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মানুষের প্রত্যেকটি গতিবিধি বরং নিশ্চলতাও এমন এক সফরের বিভিন্ন মনজিল, যা সে অজ্ঞাতসারেই অব্যাহত রেখেছে। এই সফরে শেষ সীমা আল্লাহর সামনে উপস্থিত অর্থাৎ মৃত্যু। اِلٰى رَبِّكَ বাক্যাংশে এরই বর্ণনা রয়েছে । এই শেষ সীমা এমন একটি অকাট্য সত্য, যা অস্বীকার করার শক্তি কারও নেই। প্রত্যেকেই এই অপ্রিয় সত্য স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা-চরিত্র ও অধ্যবসায় মৃত্যু পর্যন্ত নিঃশেষ হওয়া নিশ্চিত। তৃতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় সমস্ত গতিবিধি, কাজকর্ম ও চেষ্টা চরিত্রের হিসাব-নিকাশ হওয়া বিবেক ও ইনসাফের দৃষ্টিতে অবশ্যম্ভাবী, যাতে সৎ ও অসতের পরিণাম আলাদা আলাদাভাবে জানা যায়। নতুবা ইহকালে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একজন সৎ লোক একমাস মেহনত-মজুরি করে যে জীবনোপকরণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যোগাড় করে, চোর ও ডাকাত তা এক রাত্রিতে অর্জন করে ফেলে। যদি হিসাবে কোনো সময় না আসে এবং প্রতিদান ও শাস্তি না হয়, তবে চোর, ডাকাত ও সৎ লোক এক পর্যায়ে চলে যাবে, যা বিবেক ও ইনসাফের পরিপন্থি। অবশেষে বলা হয়েছে : فَمُلَاقِيْهِ -এর সর্বনাম দ্বারা كَدْحٌ ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ হবে এই যে, মানুষ এখানে যে চেষ্টা-চরিত্র করছে, পরিশেষে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং এর শুভ অথবা অশুভ পরিণতির সামনে এসে যাবে। এই সর্বনাম দ্বারা رَبّ -ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ পরকালে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং হিসাবের জন্য তার সামনে উপস্থিত হবে। অতঃপর সৎ ও অসৎ এবং মু'মিন ও কাফের মানুষের আলাদা আলাদা পরিণতি উল্লেখ করা

হয়েছে। ডান হাতে অথবা বাম হাতে আমলনামা আসার মাধ্যমে এর সূচনা হবে। ডান হাতওয়ালারা জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়ামতের সুসংবাদ এবং বাম হাতওয়ালারা জাহান্নামের শাস্তির দুঃসংবাদ পেয়ে যাবে। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, এমনকি অনেক অনাবশ্যক ভোগ্য বস্তুও সৎ-অসৎ উভয়-প্রকার লোকই অর্জন করে। এভাবে পার্থিব জীবন উভয়ের অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু উভয়ের পরিণতিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একজনের পরিণতি স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন সুখই সুখ এবং অপরজনের পরিণতি অনন্ত আজাব ও বিপদ। মানুষ আজই এই পরিণতির কথা চিন্তা করে কেন চেষ্টা ও কর্মের গতিধারা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে দেয় না। যাতে দুনিয়াতেও তার প্রয়োজনাদি পূর্ণ হয় এবং পরকালেও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত হাতছাড়া না হয়?

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِیَمِیْنِهٖ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا وَّیَنْقَلِبُ اِلٰۤی اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا : এতে মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের আমলনামা ডান হাতে আসবে এবং তাদের সহজ হিসাব নিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হবে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : مَنْ حُوْسِبَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عُذِّبَ- অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে আজাব থেকে রক্ষা পাবে না। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) প্রশ্ন করলেন : কুরআনে কি یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا বলা হয়নি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই আয়াতে যাতে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নয় বরং কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিতি। যে ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাজকর্মের পুরোপুরি হিসাব নেওয়া হবে, সে আজাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। –[বুখারী]

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, মু'মিনদের কাজকর্মও সব আল্লাহ্‌র সামনে পেশ করা হবে কিন্তু তাদের ঈমানের বরকতে প্রত্যেক কর্মের চুলচেরা হিসাব হবে না। এরই নাম সহজ হিসাব। পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসার বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. পরিবার-পরিজনের অর্থ জান্নাতের হুরগণ। তারাই সেখানে মু'মিনদের পরিবার-পরিজন হবে। দুই. দুনিয়ার পরিবার-পরিজনই অর্থ। হাশরের ময়দানে হিসাবের পর যখন মু'মিন ব্যক্তি সফল হবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী সাফল্যের সুসংবাদ শুনানোর জন্য সে তাদের কাছে যাবে। তাফসীরকারকগণ উভয় অর্থ বর্ণনা করেছেন। –[কুরতুবী]

اِنَّهٗ كَانَ فِیْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا : অর্থাৎ যার আমলনামা তার পিঠের দিক থেকে বাম হাতে আসবে সে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে আজাব থেকে বেঁচে যায় কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। এর এক কারণ এই বলা হয়েছে যে, সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে আনন্দ-উল্লাসে দিন যাপন করত। মু'মিনগণ এর বিপরীত। তারা পার্থিব জীবনে কখনও নিশ্চিন্ত হয় না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের মধ্যেও তারা পরকালের কথা বিস্মৃত হয় না। কুরআন পাক তাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে : اِنَّا كُنَّا فِیْۤ اَهْلِنَا مُشْفِقِیْنَ : অর্থাৎ আমরা পরিবার-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়েও পরকালের ভয় রাখতাম। তাই উভয় দলের পরিণতি তাদের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। যারা দুনিয়াতে পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে পরকালের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন ও আনন্দ-উল্লাসে দিন অতিবাহিত করত, আজ তাদের ভাগ্যে জাহান্নামের আজাব এসেছে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াতে পরকালের হিসাব-নিকাশ ও আজাবের ভয় রাখত, তারা আজ অনাবিল আনন্দ ও খুশি অর্জন করেছেন। এখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দে বসবাস করবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, দুনিয়ার সুখে মত্ত ও বিভোর হয়ে যাওয়া মু'মিনের কাজ নয়। সে কোনো সময় কোনো অবস্থাতেই পরকালের হিসাবের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয় না।

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ : এখানে আল্লাহ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করে মানুষকে আবার اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰی رَبِّكَ আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করেছেন। শপথের জবাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ এক অবস্থার উপর স্থিতিশীল থাকে না এবং তার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শপথের চারটি বস্তু এই বিষয়বস্তুর সাক্ষ্য দেয়। প্রথমে شَفَقٌ -এর শপথ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই লাল আভা, যা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে দেখা যায়। এটা রাত্রির সূচনা, যা মানুষের অবস্থায় একটি বড় পরিবর্তনের পূর্বাভাস। এ সময় আলো বিদায় নেয় এবং অন্ধকারের সয়লাব চলে আসে। এরপর স্বয়ং রাত্রির শপথ করা হয়েছে, যা এই পরিবর্তনকে পূর্ণতা দান করে। এরপর সেসব জিনিসের শপথ করা হয়েছে, যেগুলোকে রাত্রির অন্ধকার নিজের মধ্যে একত্র করে। وَسَقٌ -এর আসল অর্থ একত্র করা। এর ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে এতে জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অর্থও হতে পারে যে, যেসব বস্তু সাধারণত দিনের আলোতে চারদিকে ছড়িয়ে থাকে, রাত্রিবেলায় সেগুলো জড়ো হয়ে নিজ নিজ ঠিকানায় একত্রিত হয়ে যায়। মানুষ তার গৃহে, জীবজন্তু নিজ নিজ গৃহে ও বাসায় একত্রিত

হয়। কাজ-কারবারে ছড়ানো আসবাবপত্র গুটিয়ে এক জায়গায় জমা করা হয়। এই বিরাট পরিবর্তন স্বয়ং মানুষ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর মধ্যে হয়ে থাকে। চতুর্থ শপথ হচ্ছে : وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ এটাও وَسْقٌ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ একত্র করা। চন্দ্রের একত্র করার অর্থ তার তার আলোকে একত্র করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রাত্রিতে হয়, যখন চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ্র প্রথমে খুবই সরু ধনুকের মতো দেখা যায়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে যায়। অবিরাম ও উপর্যুপরি পরিবর্তনের সাক্ষ্যদাতা চারটি বস্তুর শপথ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ উপরে নিচে স্তরে স্তরে সাজানো জিনিসপত্রের এক একটি স্তরকে طَبَقٌ বলা হয়। رُكُوْبٌ-এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোনো সময় এক অবস্থায় স্থির থাকে না বরং তার উপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে।

মানুষের অস্তিত্বে অগণিত পরিবর্তন, অব্যাহত সফর এবং তার চূড়ান্ত মনজিল : সে বীর্য থেকে জমাট রক্ত হয়েছে, এরপর গোশ্তপিণ্ড হয়েছে, অতঃপর তাতে অস্থি সৃষ্টি হয়েছে, অস্থির উপর গোশ্ত হয়েছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করেছে, এরপর রূহ্ স্থাপন করার ফলে সে একজন জীবিত মানুষ হয়েছে। মায়ের পেটে তার খাদ্য ছিল গর্ভাশয়ের পচা রক্ত। নয় মাস পরে আল্লাহ তা'আলা তার পৃথিবীতে আসার পথ সুগম করে দিলেন। সে পচা রক্তের বদলে মায়ের দুধ পেল, দুনিয়ার সুবিস্তৃত পরিমণ্ডল দেখল, আলো-বাতাসের ছোঁয়া পেল। সে বাড়তে লাগল এবং নাদুস-নুদুস হয়ে গেল। দু'বছরের মধ্যে হাঁটি হাঁটি পা-পাসহ কথা বলারও শক্তি লাভ করল। মায়ের দুধ ছাড়া পেয়ে আরও অধিক সুস্বাদু ও রকমারি খাদ্য আসল। খেলাধুলা ও ক্রীড়াকৌতুক তার দিবারাত্রির একমাত্র কাজ হয়ে গেল। যখন কিছু জ্ঞান ও চেতনা বাড়ল তখন শিক্ষাদীক্ষার যাঁতা কলে আবদ্ধ হয়ে গেল। যখন যৌবনে পদার্পণ করল তখন অতীতের সব কাজ পরিত্যক্ত হয়ে যৌবনসুলভ কামনা-বাসনা তার স্থান দখল করে বসল এবং এক রোমাঞ্চকর জগৎ সামনে এলো। বিয়ে-শাদী, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিচালনার কর্মব্যস্ততায় দিবারাত্রি অতিবাহিত হতে লাগল। অবশেষে এ যুগেরও সমাপ্তি ঘটল। আঙ্গিক শক্তি ক্ষয় পেতে লাগল। প্রায়ই অসুখ-বিসুখ দেখা দিতে লাগল। অবশেষে বার্ধক্য আসল এবং ইহকালের সর্বশেষ মনজিল কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলল। এসব বিষয় তো চোখের সামনে থাকে, যা কারও অস্বীকার করার সাধ্য নেই কিন্তু অদূরদর্শী মানুষ মনে করে যে, মৃত্যু ও কবরই তার সর্বশেষ মনজিল। এরপর কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞানী ও সব বিষয়ের খবর রাখেন। তিনি পয়গম্বরগণের মাধ্যমে গাফিল মানুষকে অবহিত করেছেন যে, কবর তোমার সর্বশেষ মনজিল নয়; বরং এটা এক প্রতীক্ষাগার। সামনে এক মহাজগৎ আসবে। তাতে এক মহাপরীক্ষার পর মানুষের সর্বশেষ মনজিল নির্ধারিত হবে, যা হয় চিরস্থায়ী আরাম ও সুখের মনজিল হবে, না হয় অনন্ত আজাব ও বিপদের মনজিল হবে। এই সর্বশেষ মনজিলেই মানুষ তার সত্যিকার আবাসস্থল লাভ করবে এবং পরিবর্তনের চক্র থেকে অব্যাহতি পাবে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى - كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ এবং اِلٰى رَبِّكَ –বলে এই বিষয়বস্তুই বর্ণনা করেছে। সে গাফিল মানুষকে এই সর্বশেষ মনজিল সম্পর্কে অবহিত করে হুঁশিয়ার করেছে যে, বয়স হচ্ছে দুনিয়ার সব পরিবর্তন, সর্বশেষ মনজিল পর্যন্ত যাওয়ার সফর এবং তার বিভিন্ন পর্যায়। মানুষ চলাফেরায়, নিদ্রা ও জাগরণে, দাঁড়ানো ও উপবিষ্ট–সর্বাবস্থায় এই সফরের মনজিলসমূহ অতিক্রম করছে। অবশেষে সে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাবে এবং সারা জীবনের কাজ-কর্মের হিসাব দিয়ে সর্বশেষ মনজিলে অবস্থান লাভ করবে, সেখানে হয় সুখই সুখ এবং নিরবচ্ছিন্ন আরাম, না হয় আজাবই আজাব এবং অশেষ বিপদ রয়েছে। এতএব, বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়াতে নিজেকে একজন মুসাফির মনে করা এবং পরকালের জন্য আসবাবপত্র তৈরি ও প্রেরণের চিন্তাকেই দুনিয়ার সর্ববৃহৎ লক্ষ্য স্থির করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ : অর্থাৎ তুমি দুনিয়াতে এভাবে থাক, যেমন কোনো মুসাফির কয়েক দিনের জন্য কোথাও অবস্থান করে অথবা কোনো পথিক পথে চলতে চলতে বিশ্রামের জন্য থেমে যায়। উপরে বর্ণিত طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ-এর তাফসীরের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত আবূ নাঈম (র.) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই দীর্ঘ হাদীসটি এ স্থলে কুরতুবী আবূ নাঈমের এবং ইবনে কাছীর (র.) ইবনে আবী হাতেম (র.)-এর বরাত দিয়ে বিস্তারিত উদ্ধৃত করেছেন। এসব আয়াতে গাফিল মানুষকে তার সৃষ্টি ও দুনিয়াতে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ সামনে এনে নির্দেশ করা হয়েছে যে, হে মানুষ এখনও সময় আছে, নিজের পরিণতি ও পরকালের চিন্তা কর। কিন্তু এতসব উজ্জ্বল নির্দেশ সত্ত্বেও অনেক মানুষ গাফলতি ত্যাগ করে না। তাই শেষে বলা হয়েছে : فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ –অর্থাৎ এই গাফিল ও মূর্খ লোকদের কি হলো যে, তারা সবকিছু শোনা ও জানার পরও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না?

وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ : অর্থাৎ যখন তাদের সামনে সুস্পষ্ট হেদায়েতে পরিপূর্ণ কুরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহর দিকে নত হয় না।

سُجُوْد ও سَجْدَة -এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। এর মাধ্যমে আনুগত্য ও ফরমাবরদারী বোঝানো হয়। বলা বাহুল্য, এখানে পরিভাষিক সেজদা উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া তথা বিনীত হওয়া উদ্দেশ্য এর সুস্পষ্ট কারণ এই যে, এই আয়াতে কোনো বিশেষ আয়াত সম্পর্কে সেজদার নির্দেশ নেই; বরং নির্দেশটি সমগ্র কুরআন সম্পর্কিত। সুতরাং এই আয়াতে পরিভাষিক সেজদা অর্থ নেওয়া হলে কুরআনের প্রত্যেক আয়াতে সেজদা করা অপরিহার্য হবে, যা উম্মতের ইজমার কারণে হতে পারে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণের মধ্যে কেউ এর প্রবক্তা। এখন প্রশ্ন থাকে যে, এই আয়াত পাঠ করলে ও শুনলে সেজদা ওয়াজিব হবে কি না? বলা বাহুল্য কিঞ্চিৎ সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতকেও সেজদা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়। কোনো কোনো হানাফী ফিকহবিদ তাই করেছেন। তাঁরা বলেন : এখানে اَلْقُرْاٰنُ বলে সমগ্র কুরআন বোঝানো হয়নি বরং اَلِفْ لَامْ عَهْدِىْ হওয়ার ভিত্তিতে বিশেষভাবে এই আয়াতই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা এক প্রকার সদর্থই, যাকে সম্ভাবনার পর্যায়ে শুদ্ধ বলা যেতে পারে। কিন্তু বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে এটা অবান্তর মনে হয়। তাই নির্ভুল কথা এই যে, এর ফয়সালা হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি দ্বারা হতে পারে। তেলাওয়াতের সেজদা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার হাদীস বর্ণিত আছে। ফলে মুজতাহিদ আলিমগণও বিষয়টিতে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এই আয়াতেও সেজদা ওয়াজিব। তিনি নিম্নোদ্ধৃত হাদীস সমূহকে এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন :

সহীহ্ বুখারীতে আছে, হযরত আবূ রাফে' (রা.) বলেন : আমি একদিন ইশার নামাজ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর পিছনে পড়লাম। তিনি নামাজে সূরা ইনশিকাক পাঠ করলেন এবং এই আয়াতে সেজদা করলেন। নামাজান্তে আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম : এ কেমন সেজদা? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পশ্চাতে এই আয়াত সেজদা করেছি। তাই হাশরের ময়দানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত আমি এই আয়াতে সেজদা করে যাব। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে সূরা ইনশিকাক ও সূরা ইকরায় সেজদা করেছি। ইবনে আরাবী (র.) বলেন : এটাই ঠিক যে, এই আয়াতটিও সেজদার আয়াত। যে এই আয়াত তেলাওয়াত করে অথবা শুনে তার উপর সেজদা ওয়াজিব। –(কুরতুবী) কিন্তু ইবনে আরাবী (র.) যে সম্প্রদায়ে বসবাস করতেন, তাদের মধ্যে এই আয়াতে সেজদা করার প্রচলন ছিল না। তারা হয়তো এমন ইমামের মুকাল্লিদ (অনুসারী) ছিল, যার মতে এই আয়াতে সেজদা নেই। তাই ইবনে আরাবী (র.) বলেন : আমি যখন কোথাও ইমাম হয়ে নামাজ পড়াতাম তখন সূরা ইনশিকাক পাঠ করতাম না। কারণ আমার মতে এই সূরায় সেজদা ওয়াজিব। কাজেই যদি সেজদা না করি, তবে গোনাহগার হব। আর যদি করি, তবে গোটা জামাত আমার এই কাজকে অপছন্দ করবে। কাজেই অহেতুক মতানৈক্য সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَنْشَقَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْشِقَاقٌ মূলবর্ণ (ش – ق – ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিদীর্ণ হবে।

اَذِنَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اِذْنٌ মূলবর্ণ (أ – ذ – ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– শ্রবণ করেছে, শুনেছে।

حُقَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার حَقٌّ মূলবর্ণ (ح – ق – ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে তারই যোগ্য নিশ্চিত করা হবে।

مُدَّتْ : সীগহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার مَدٌّ মূলবর্ণ (م – د – د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিস্তৃত করা হবে।

اَلْقَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل – ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– উপরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

تَخَلَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَخَلِّىْ মূলবর্ণ (خ – ل – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে, জমিন খালি হওয়া।

كَادِحٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার كَدْحٌ মূলবর্ণ (ك - د - ح) জিনস صحيح অর্থ– পরিশ্রমকারী, মেহনতকারী।

مُلَاقِيْهِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُلَاقَاةٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– মিলা, সাক্ষাত করা।

ظَهْرٌ : পিঠ। পেট ও পিঠ দুই পরস্পর বিপরীত অঙ্গ। بَطْنٌ উদর, পেট পাকস্থলী। ظَهْرٌ পৃষ্টদেশ, পশ্চাৎ ভাগ। তাজুল উরুসের মধ্যে আছে, মানুষের কাঁধ থেকে শুরু করে নিতম্বের নিকট পর্যন্ত অংশকে পিঠ বলা হয়। এটি আরবি ভাষায় মুযাক্কার হিসেবে আসে। তাছাড়া এটি সে সকল ইসমের অন্তর্ভুক্ত, যা যরফের স্থানে ব্যবহার করা হয়। এর বহুবচন ظُهُوْرٌ، اَظْهُرٌ এবং ظُهْرَانٌ আসে।

ثُبُوْرٌ : মাসদার ও ইসম। বাব : نَصَرَ-এর মাসদার। মূলবর্ণ (ث – ب – ر) জিনস صحيح অর্থ– ধ্বংস হওয়া, মরে যাওয়া, ধ্বংস, মৃত্যু।

لَنْ يَّحُوْرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مستقبل معروف بلن در نفى تاكيد বাব نَصَرَ মাসদার حُوْرٌ মূলবর্ণ (ح – و – ر) জিনস اجوف واوى অর্থ–তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে না।

وَسَقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَسْقٌ মূলবর্ণ (و - س - ق) জিনস مثال واوى অর্থ– সে যা কিছু সমাবেশ ঘটায়। অর্থাৎ রাত মানুষ, জীবজন্তু ও পাখি সবাইকে একত্র করে এবং প্রত্যেককেই তার নিজস্ব ঠিকানায় পৌছে দেয়।

اِتَّسَقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّسَاقٌ মূলবর্ণ (و – س – ق) জিনস مثال واوى অর্থ– পরিপূর্ণ হয়।

تَرْكَبُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع بانون تاكيد বাব سَمِعَ মাসদার رُكُوْبٌ মূলবর্ণ (ر – ك – ب) জিনস صحيح অর্থ– অবশ্যই তোমাদেরকে উপনীত হতে হবে।

يُوْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْعَاءٌ মূলবর্ণ(و – ع – ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তার যা সঞ্চয় করেছে।

بَشِّرْهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَبْشِيْرٌ মূলবর্ণ (ب - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ তুমি তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। هُمْ যমীর জমা মুযাক্কার গায়েব মাফউল।

غَيْرُ مَمْنُوْنٍ : غَيْرٌ অর্থ– ব্যতীত, নয়। আর مَمْنُوْنٌ সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার مَنٌّ মূলবর্ণ (م – ن – ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ : এখানে واو টা হরফে আতফ اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা اَعْلَمُ তার খবর। আর بِمَا টা متعلق হয়েছে اَعْلَمُ-এর সাথে। আর يُوْعُوْنَ-এর কোনো محل নেই যেহেতু ما এর সেলাহ হয়েছে।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ : এখানে فَبَشِّرْ হলো فعل তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল। আর هُمْ হলো مفعول به আর بِعَذَابٍ টা بَشِّرْ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর اَلِيْمٍ হলো عَذَابٍ-এর সিফাত।

–[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ২৬৫-২৬৬]

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ

সূরা বুরূজ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২২, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. বুরূজ [বড় বড় নক্ষত্র] বিশিষ্ট আসমানের শপথ।	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ﴿١﴾
২. আর প্রতিশ্রুত দিবসের [কিয়ামত দিবসের]।	وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ﴿٢﴾
৩. আর উপস্থিত হওয়ার [দিনের শপথ] আর যাতে [যে দিনে লোকদের] উপস্থিতি হয় তার।	وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ﴿٣﴾
৪. অভিশপ্ত হয়েছে খন্দকের অধিবাসীগণ।	قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ﴿٤﴾
৫. অর্থাৎ বহু ইন্ধনযুক্ত অগ্নির অধিকারী [আয়োজনকারী] গণ।	النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ﴿٥﴾
৬. যখন তারা তার আশেপাশে উপবিষ্ট ছিল।	اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ﴿٦﴾
৭. এবং তারা মুসলমানদের প্রতি যা কিছু [অত্যাচার] করছিল, তা দেখছিল।	وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ﴿٧﴾
৮. আর ঐ কাফেররা সেই মুসলমানদের মধ্যে এতদ্ব্যতীত আর কোনো দোষ পায়নি যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রসংশনীয়।	وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالسَّمَآءِ শপথ সে আসমানের ذَاتِ الْبُرُوْجِ যা বড় বড় নক্ষত্রবিশিষ্ট।
২. وَالْيَوْمِ শপথ সে দিবসের الْمَوْعُوْدِ যা প্রতিশ্রুত
৩. وَشَاهِدٍ শপথ উপস্থিত হওয়ার وَّمَشْهُوْدٍ এবং যাতে (লোকদের) উপস্থিতি হয় তার।
৪. قُتِلَ অভিশপ্ত হয়েছে اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ খন্দকের অধিবাসীগণ।
৫. النَّارِ অগ্নির ذَاتِ الْوَقُوْدِ বহু ইন্ধনযুক্ত
৬. اِذْ هُمْ যখন তারা عَلَيْهَا তার আশেপাশে قُعُوْدٌ উপবিষ্ট ছিল।
৭. وَّهُمْ এবং তারা عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ যা কিছু করছিল, তা بِالْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের সাথে شُهُوْدٌ দেখছিল।
৮. وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ আর তারা দোষ খুঁজে পায়নি اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا এটা ছাড়া যে তারা ঈমান আনে بِاللّٰهِ এমন আল্লাহর প্রতি الْعَزِيْزِ যিনি মহাপরাক্রান্ত الْحَمِيْدِ প্রসংশনীয়।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৯. তিনি এমন যে, তারই জন্য আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব; আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন।	الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝٩
১০. যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, অতঃপর তওবা না করে, তবে তাদের জন্য দোজখের আজাব এবং [বিশেষভাবে] তাদের জন্য দহন-যন্ত্রণা রয়েছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠
১১. [আর] অবশ্যই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য উদ্যানসমূহ রয়েছে; যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে; এটাই বিরাট সফলতা।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝١١
১২. আপনার প্রভুর পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর।	اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝١٢
১৩. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনর্বার সৃষ্টি করবেন।	اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۝١٣
১৪. আর তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ।	وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝١٤
১৫. আরশের অধিপতি, মর্যাদাশীল।	ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۝١٥
১৬. তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা করেই ছাড়েন।	فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝١٦

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. الَّذِيْ لَهٗ যার জন্য রয়েছে مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব وَاللّٰهُ আর আল্লাহ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে شَهِيْدٌ অবগত আছেন।

১০. اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا যারা কষ্ট দেয় الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا অতঃপর তওবা না করে فَلَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে عَذَابُ جَهَنَّمَ দোজখের আজাব وَلَهُمْ এবং তাদের জন্য রয়েছে عَذَابُ الْحَرِيْقِ দহন-যন্ত্রণা।

১১. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে لَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে এমন উদ্যানসমূহ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে الْاَنْهٰرُ নহরসমূহ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ এটাই বিরাট সফলতা।

১২. اِنَّ بَطْشَ নিশ্চয় পাকড়াও رَبِّكَ আপনার প্রভুর لَشَدِيْدٌ অত্যন্ত কঠোর।

১৩. اِنَّهٗ هُوَ নিশ্চয় তিনিই يُبْدِئُ প্রথমবার সৃষ্টি করেন وَيُعِيْدُ এবং পুনর্বার সৃষ্টি করবেন।

১৪. وَهُوَ الْغَفُوْرُ আর তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল الْوَدُوْدُ অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ।

১৫. ذُو الْعَرْشِ আরশের অধিপতি الْمَجِيْدُ মর্যাদাশীল।

১৬. فَعَّالٌ তিনি ভালোভাবেই করতে পারেন لِّمَا يُرِيْدُ যা তিনি ইচ্ছা করেন।

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
১৭. আপনার নিকট কি ঐ সেনাদলসমূহের কাহিনী পৌছেছে ।	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾
১৮. অর্থাৎ ফেরাউন ও ছামূদের ।	فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ﴿١٨﴾
১৯. বরং এই কাফেররা [কুরআনকে] মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মধ্যে [লিপ্ত] রয়েছে ।	بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾
২০. আর আল্লাহ তাদেরকে চতুর্দিক হতে বেষ্টন করে আছেন ।	وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾
২১. বরং তা এক সম্মানিত কুরআন ।	بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾
২২. যা সংরক্ষিত ফলকে [অর্থাৎ লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ] রয়েছে ।	فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. هَلْ اَتٰىكَ আপনার নিকট কি পৌছেছে/এসেছে حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ঐ সেনাদলসমূহের কাহিনী ।

১৮. فِرْعَوْنَ ফেরাউন وَثَمُوْدَ ও ছামূদের ।

১৯. بَلِ الَّذِيْنَ বরং যারা كَفَرُوْا কুফরি করেছে فِيْ تَكْذِيْبٍ [তারা লিপ্ত রয়েছে] মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মধ্যে ।

২০. وَّاللّٰهُ আর আল্লাহ مِنْ وَّرَآئِهِمْ তাদের চতুর্দিক হতে مُّحِيْطٌ পরিবেষ্টন করে আছেন ।

২১. بَلْ هُوَ বরং তা قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ এক সম্মানিত কুরআন ।

২২. فِيْ মাঝে لَوْحٍ ফলকের مَّحْفُوْظٍ সংরক্ষিত ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে প্রথম আয়াতের 'আল-বুরূজ' শব্দ অবলম্বনে । এতে ২২টি আয়াত, ১০৯টি বাক্য ও ৪৩৮টি অক্ষর রয়েছে ।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট : এ সূরাটি মহানবী ﷺ-এর মাক্কী জীবনের সূরা সমূহের মধ্যে অন্যতম । সম্ভবত সূরাটি মাক্কী জীবনের শেষভাগে অবতীর্ণ হয়েছে । নবী করীম ﷺ-এর ক্রমাগতভাবে দীনের দাওয়াতের ফলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করছিল । ইসলামের এ ক্রমোন্নতি ছিল মক্কার কাফের সর্দারদের নিকট অসহনীয় । তারা দীনের দাওয়াত ও আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য সম্ভাব্য সব উপায়ই অবলম্বন করল । অসহায়-দরিদ্র মুসলমানদের প্রতি অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার করা; ধূসর মরুভূমিতে প্রখর রৌদ্র তাপের মধ্যে হাত-পা বেঁধে রাখা, জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা দেহে দাগ কাটা, শূলীতে চড়ানো, মারপিট করা ইত্যাদি কোনো পন্থাই তারা হাতছাড়া করল না । এটা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল সত্য-সনাতন দীন ইসলাম হতে সে সকল লোককে ফিরিয়ে রাখা । এ সময়ই আল্লাহ তা'আলা মুসলিম ও কাফের উভয় দলের শিক্ষার জন্য এ ঐতিহাসিক তত্ত্বসমৃদ্ধ সূরাটি অবতীর্ণ করেন ।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলবক্তব্য : কাফেররা ঈমানদারদের উপর যে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল, তার নির্মম পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা এবং সে সঙ্গে মুসলমানদেরকে এ কথা বলে সান্ত্বনা দেওয়া যে, তারা যদি এ জুলুম-নির্যাতনের মুখেও নিজেদের ঈমান ও আদর্শের উপর সুদৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকতে পারে, তাহলে তাদেরকে উত্তম প্রতিফল দেওয়া হবে এবং আল্লাহ এ জালেমদের হতে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, এটাই হলো এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য ।

এ প্রসঙ্গে সূরাটির প্রথমে আসহাবে উখদূদের কাহিনী শুনানো হয়েছে। তারা ঈমানদার লোকদেরকে অগ্নিগর্তে নিক্ষেপ করে ধ্বংস করেছিল। এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে প্রকারান্তরে মু'মিন ও কাফেরদেরকে কয়েকটি কথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে। তন্মাধ্যে একটি হলো, উখদূদ সম্প্রদায় যেভাবে আল্লাহর অভিশাপে ধ্বংস হয়ে গেছে মক্কার কাফের সর্দাররাও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করে অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে।

দ্বিতীয়ত, তখনকার সময় ঈমানদার লোকেরা যেভাবে অগ্নিগর্তে নিক্ষিপ্ত হতে ও প্রাণের কুরবানি দিতে প্রস্তুত হয়েছিল; কিন্তু ঈমানের অমূল্য সম্পদ হারাতে কোনোক্রমেই প্রস্তুত হয়নি। অনুরূপভাবে বর্তমানে ঈমানদার লোকদের কর্তব্য হলো সর্বপ্রকার অত্যাচার নিপীড়ন অকাতরে বরদাশত করে নেওয়া আর ঈমানের মহা মূল্যবান ধন কোনো অবস্থাই হস্তচ্যুত না করা।

তৃতীয়ত, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে কাফেরা ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়েছে এবং ঈমানদার লোকেরাও তার উপর অবিচল থাকতে বদ্ধ পরিকর সে আল্লাহ সর্বজয়ী সর্বশক্তিমান। তিনিই জমিন ও আসমানের একচ্ছত্র মালিক। তিনি স্বীয় সত্তায় প্রশংসিত। তিনি উভয় সমাজের লোকদের অবস্থা দেখছেন। কাজেই কাফেররা তাদের কুফরির শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। শুধু এটাই শেষ নয়; বরং তা ছাড়াও তাদের এ জুলুমের শাস্তি স্বরূপ দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। অনুরূপভাবে ঈমানদার লোকেরা নেক আমল করে জান্নাতে যাবে। এটাই তাদের বিরাট ও চূড়ান্ত সাফল্য এটাও নিঃসন্দেহে। এরপর কাফেরদেরকে সর্তক করা হয়েছে এ বলে যে; আল্লাহর পাকড়াও নিশ্চিত ও অত্যন্ত শক্ত। তোমাদের মনে জনশক্তির কারণে যদি কোনো অহমিকতা জেগে থাকে, তাহলে তোমাদের মনে রাখা উচিত, তোমাদের পূর্বে ফেরাউন ও নমরুদের জনশক্তি বিন্দুমাত্র কম ছিল না। তা সত্ত্বেও তাদের জনতার যে পরিণতি ঘটেছে তা দেখে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। আল্লাহর অমোঘ অপ্রতিরোধ্য শক্তি তোমাদেরকে গ্রাস করে আছে। এ গ্রাস হতে তোমরা কিছুতেই নিষ্কৃতি পেতে পার না। তোমরা যে কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ ও অবিশ্বাস করার জন্য বদ্ধ পরিকর, সে কুরআনের প্রতিটি কথা অটল অপরিবর্তনীয়। তা এমন সুরক্ষিত যে, তার লেখা পরিবর্তন করার শক্তি কারো নেই।

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ [٤] النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ [٥] إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ [٦] وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ [٧] وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ [٨] الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [٩]

শানে নুযূল–১ : আবদ বিন হুমাইদ ইবনে আবাসী এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুহাজিরগণ যখন কোনো এক গাযওয়া বা যুদ্ধ অভিযান হতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাদের নিকট হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর মৃত্যু বরণ করার অপপ্রচার পৌঁছল। তখন মুহাজিরগণ পরস্পরে বলতে লাগল যে, অগ্নিপূজকদের বিধান কি? পক্ষান্তরে তারা তো, আহলে কিতাব এবং আরবের মুশরিক কোনোটিই নয় কি? হযরত আলী (রা.) বললেন, ওরা তো আহলে কিতাব ছিল। তাদের জন্যে মদ্যপান বৈধ ছিল। সুতরাং কোনো এক বাদশা মদ্যপান করে মাতাল হয়ে নিজ বোনকে পেয়ে তার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়। সেই নরাধম মাতাল মুক্ত হবার পর বোনকে বলল, তোমার জন্যে আফসোস হয়! আমি যে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছি তা হতে উত্তরণের পন্থা কি হতে পারে? তুমি মানুষকে বোঝাও যে, বোনদের বিবাহ করা বৈধ। সুতরাং সে জনসমক্ষে বলতে লাগল, হে মানুষেরা! আল্লাহ বোনদের বিবাহ করার অনুমতি দান করেছেন। মানুষেরা বলল, আমরা এমন কথা থেকে আল্লাহর নিকট হতে দায়মুক্ত হচ্ছি। আমাদের কোনো নবী ও কিতাব আসেনি। অতঃপর লজ্জিত হয়ে সে ফিরে এসে বলল, মানুষেরা মেনে নিতে অস্বীকার করছে। অতঃপর বোনের পরামর্শক্রমে তাদের উপর বেত্রাঘাত ধার্য করল, তাতেও তারা মেনে নেয়নি। ফলে লজ্জিত হয়ে ফিরে এসে বলল, তোমার জন্যে অনুতাপ তারাতো তাতেও একমত হচ্ছে না। অতঃপর সে বলল, আবারোও তাদের বোঝাও। যদি মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদের ব্যাপারে তরবারি কোষমুক্ত করে নেবে। এমনি করেও নিস্ফল হয়ে ফিরে এসে বলল, মানুষেরা তাতেও মেনে নিচ্ছেনা। তখন সে বলল, তাহলে তাদের জন্যে লম্বা গর্ত খনন করা হোক। অতঃপর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে সেই অগ্নিগর্ত পারে তাদের উপস্থিত কর। যারা মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে আগুনে ফেলে দেবে। সুতরাং সে তাই করল। যারা মানেনি তাদেরকে অগ্নিগর্তে ফেলে দেয়। এহেন নৃসংশতা প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[তাবারী ৫২৩/১২]

শানে নুযূল–২ : আব্দুল্লাহ বিন আবী জাফর হযরত ইবনে আনাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে শুনতে পেয়েছি যে, তারা নবী শূন্য সময়ে লোক সমাজে কোনো প্রকারের ফেতনা ফ্যাসাদ দেখতে পেলে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যেত এবং নিজ নিজ মতাদর্শ নিয়ে উল্লসিত থাকত। তারা কোনো একটি জনপদে গিয়ে একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়ে যায়। নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত আদায়ে অনড় থাকে। কোনো এক দূরাচারী বাদশাহ তাদের এ সংবাদ পেয়ে যায়। সুতরাং তাদের নিকট লোক প্রেরণ করা হলো, তাদেরকে যেন প্রতিমা পূজারীতে পরিণত করে। তারা তাকে অস্বীকার করে বলল, আমরা একক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে উপাসনা করব না। বাদশাহ বলল, আমি যার উপাসনা করি, তার উপাসনা তোমরা যদি না কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে হত্যা করে দেব। কিন্তু তারা তা মেনে নেয়নি। অতঃপর তাদের জন্যে অগ্নিগর্ত খনন করা হয় এবং দূরাচার বাদশাহ তাদেরকে অগ্নিগর্তের পাশে দাড় করিয়ে বলল, হয় অগ্নিকে বরণ করে নেবে না হয় আমি যে পথে রয়েছি তাতে আসবে। তারা বলল, অগ্নিগর্তই আমাদের নিকট অতিপ্রিয়। তাদের স্ত্রী সন্তানেরা তাতে ভীত হয়ে গেল। তাদের বড়রা ছোটদেরকে বলল আজকের আগুনের পর আমাদের জন্যে আর কোনো আগুন হবে না। সুতরাং তারা অগ্নি গোহায় ঝাঁপিয়ে পরল। তবে অগ্নিতাপ তাদের গায়ে লাগার আগেই, তাদের আত্মা বের হয়ে যায়। অপর দিকে আগুনও গুহার সীমা ছাড়িয়ে দূরাচারী বাদশাহ ও তাদের দল বলকে জ্বালিয়ে পুঁড়িয়ে ফেলে। সেই অতীত প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে মু'মিনদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত সমূহ নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৪৯৩/৪]

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ : بُرُوجٌ শব্দটি بَرْجٌ -এর বহুবচন। অর্থ বড় প্রাসাদ ও দুর্গ। অন্য আয়াতে আছে وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ –এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর মূল ধাতু بَرَجٌ -এর আভিধানিক অর্থ যাহির হওয়া। تَبَرَّجْ -এর অর্থ বেপর্দা খোলাখুলি চলাফেরা করা। এক আয়াতে আছে وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ –অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে بُرُوجٌ -এর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। কয়েকজন তাফসীরবিদ এস্থলে অর্থ নিয়েছেন প্রাসাদ অর্থাৎ সেসব গৃহ, যা আকাশে প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্য নির্ধারিত। পরবর্তী কোনো কোনো তাফসীরবিদ দার্শনিকদের পরিভাষায় বলেছেন যে, সমগ্র আকাশমণ্ডলী বার ভাগে বিভক্ত। এ প্রত্যেক ভাগকে بَرْجٌ -বলা হয়। তাঁদের ধারণা এই যে, স্থিতিশীল নক্ষত্রসমূহ এসব بَرْجٌ -এর মধ্যেই অবস্থান করে। গ্রহসমূহ আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব بَرْجٌ -এর মধ্যে অবতরণ করে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। কুরআন পাক গ্রহসমূহকে আকাশে প্রোথিত বলে না যে, এগুলো আকাশের গতিতে গতিশীল হবে বরং কুরআনের মতে প্রত্যেক গ্রহ নিজস্ব গতিতে গতিশীল। সূরা ইয়াসীনে আছে : وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ এখানে فَلَكٌ -এর অর্থ আকাশ নয় বরং গ্রহের কক্ষপথ, যেখানে সে বিচরণ করে।

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ : মারেফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে তিরমিযীর হাদীসের বরাত দিয়ে লিখিত হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কিয়ামতের দিন, شَاهِدٌ -এর অর্থ শুক্রবার দিন এবং مَشْهُوْدٌ -এর অর্থ আরাফার দিন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। এক. বুরূজবিশিষ্ট আকাশের, দুই. কিয়ামত দিবসের, তিন. শুক্রবারের এবং চার. আরাফার দিনের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি, কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানের দলিল। শুক্রবার আরাফাতের দিন মুসলমানদের জন্য পরকালের পুঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন। অতঃপর শপথের জবাবে সেই কাফেরদেরকে অভিশাপ করা হয়েছে, যারা মুসলমানদেরকে ঈমানের কারণে অগ্নিতে পুড়িয়ে মেরেছে। এরপর মু'মিনদের পরকালীন মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

গর্তওয়ালাদের ঘটনার কিছু বিবরণ : এই ঘটনাই সূরা অবতরণের কারণ। কোনো কোনো রেওয়য়েতে অতীন্দ্রিয়বাদীর পরিবর্তে জাদুকর বলা হয়েছে এবং এই বাদশাহ্ ছিল ইয়ামেন দেশের বাদশাহ্। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত মতে তার নাম ছিল 'ইউসুফ যুনওয়াস'। তার সময় ছিল রাসূলে কারীম ﷺ-এর জন্মের সত্তর বছর পূর্বে। যে বালককে অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা জাদুকরের কাছে তার বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য বাদশাহ্ আদেশ করেছেন, তার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে তামের। পাদ্রী খ্রিস্টধর্মের আবেদ ও যাহেদ ছিল। তখন খ্রিস্টধর্ম ছিল সত্যধর্ম, তাই এই পাদ্রী তখনকার খাঁটি মুসলমান ছিল। বালকটি পথিমধ্যে পাদ্রীর কাছে যেয়ে তার কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত হতো এবং অবশেষে মুসলমান হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাকে পাকাপোক্ত ঈমান দান করেছিলেন। ফলে বহু নির্যাতনের মুখেও সে ঈমানে অবিচল ছিল। পথিমধ্যে সে পাদ্রীর কাছে বসে কিছু সময় অতিবাহিত করত। ফলে অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা জাদুকরের কাছে বিলম্বে

পৌঁছার কারণেও সে তাকে প্রহার করত। ফেরার পথে আবার পাদ্রীর কাছে যেত। ফলে গৃহে পৌঁছতে বিলম্ব হতো এবং গৃহের লোকেরা তাকে মারত। কিন্তু সে কোনো কিছুর পরোয়া না করে পাদ্রীর কাছে যাতায়াত অব্যাহত রাখল। এরই বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পূর্বোল্লিখিত কারামত তথা অলৌকিক ক্ষমতা দান করলেন। এই অত্যাচারী বাদশাহ্ মু'মিনদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গর্ত খনন করিয়ে তা অগ্নিতে ভর্তি করে দিল। অতঃপর মু'মিনদের এক একজনকে উপস্থিত করে বলল : ঈমান পরিত্যাগ কর নতুবা এই গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে এমন দৃঢ়তা দান করেছিলেন যে, তাদের একজনও ঈমান ত্যাগ করতে সম্মত হলো না এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকেই পছন্দ করে নিল। মাত্র একজন স্ত্রীলোক, যার কোলে শিশু ছিল, সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হতে সামান্য ইতস্তত করছিল। তখন কোলের শিশু বলে উঠল : আম্মা, সবর করুন, আপনি সত্যের উপর আছেন। এই প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে যারা প্রাণ দিয়েছিল, তাদের সংখ্যা কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বার হাজার এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরও বেশি বর্ণিত আছে।

বালক নিজেই বাদশহ্কে বলেছিল : আপনি আমার তূন থেকে একটি তীর নিন এবং 'বিসমিল্লাহি রব্বী' বলে আমার গায়ে নিক্ষেপ করুন, আমি মরে যাব। এ পদ্ধতিতে সে তার প্রাণ দেওয়ার সাথে সাথে বাদশহ্র গোটা সম্প্রদায় আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে উঠে এবং মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করে দেয়। এভাবে কাফের বাদশহ্কে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও বিফল মনোরথ করে দেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, ইয়ামেনের যে স্থানে এই বালকের সমাধি ছিল, ঘটনাক্রমে কোনো প্রয়োজনে সেই জায়গা হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে খনন করানো হলে তার লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় নির্গত হয়। লাশটি উপবিষ্ট অবস্থায় ছিল এবং হাত কোমরদেশে রক্ষিত ছিল। বাদশাহের তীর সেখানেই লেগেছিল। কোনো একজন দর্শক তার হাতটি সরিয় দিলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে। হাতটি আবার পূর্বের ন্যায় রেখে দেওয়া হলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। তার হাতের আংটিতে اَللّٰهُ رَبِّىْ (আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা) লিখিত ছিল। ইয়ামেনের গর্ভনর খলীফা হযরত ওমর (রা.)-কে এই ঘটনার সংবাদ দিলে তিনি উত্তরে লিখে পাঠালেন : তাকে আংটিসহ পূর্বাবস্থায় রেখে দাও। –[ইবনে কাছীর]

ইবনে কাছীর ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে লিখেছেন : অগ্নিকুণ্ডের ঘটনা দুনিয়াতে একটি নয়-বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অনেক সংঘটিত হয়েছে। এরপর ইবনে আবী হাতেম বিশেষভাবে তিনটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন–এক. ইয়ামেনের অগ্নি-কুণ্ড, যার ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের সত্তর বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল, দুই. সিরিয়ার অগ্নিকুণ্ড এবং তিন, পারস্যের অগ্নিকুণ্ড। এই সূরায় বর্ণিত অগ্নিকুণ্ড আরবের ভূখণ্ড ইয়ামেনের নাজারানে ছিল।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ : এখানে অত্যাচারী কাফেরদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা মু'মিনদেরকে কেবল ঈমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। শাস্তি প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে–এক وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ তাদের জন্য পরকালে জাহান্নামের আজাব রয়েছে দুই. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ অর্থাৎ তাদের জন্য দহন যন্ত্রণা রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামে যেয়ে তারা চিরকালে দহন যন্ত্রণা ভোগ করবে। এটাও সম্ভবপর যে, দ্বিতীয় বাক্যে দুনিয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, মু'মিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁদে রূহ কবজ করে নেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অতঃপর এই অগ্নি আরও বেশি প্রজ্বলিত হয়ে তার লেলিহান শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলমানদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার তামাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কেবল বাদশাহ্ 'ইউসুফ যুনওয়াস' পালিয়ে যায়। সে অগ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই সলিল সমাধি লাভ করে। –[মাযহারী]

কাফেরদের জাহান্নামের আজাব দহন যন্ত্রণার খবর দেওয়ার সাথে সাথে কুরআন বলেছে : ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا –অর্থাৎ এই আজাব তাদের উপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেনি। এতে তাদেরকে তওবার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : বাস্তবিকই আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপার কোনো পারাপার নেই। তারা তো আল্লাহর ওলীগণকে জীবিত দগ্ধ করে তামাশা দেখেছে, আল্লাহ তা'আলা এরপরও তাদেরকে তওবা ও মাগফিরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন। –[ইবনে কাছীর]

শব্দ বিশ্লেষণ :

شَاهِدٍ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ سَمِعَ বাব اَلشُّهُوْدُ মাসদার (ش - ه - د) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ– সাক্ষী, উপস্থিত, বক্তা। এখানে উদ্দেশ্য জুমার দিন। শাহেদ হুজুর ﷺ এর পবিত্র নামেরও একটি; কারণ তিনি কেয়ামতের দিন উম্মতের জন্য সাক্ষ্য দিবেন এবং দুনিয়ায় আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলে গেছেন।

مَشْهُوْدٍ : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ سَمِعَ বাব اَلشُّهُوْدُ মাসদার (ش - ه - د) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ– উপস্থিতকৃত অর্থাৎ নামাজ। মাগরিবের নামাজ, ফজরের নামাজ। ফজরের নামাজের কেরাতে ফেরেশতা উপস্থিত হন। মাশহূদ বলতে জুমার দিন কেয়ামতের দিন ও আরাফার দিন। তবে এখানে তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী কেয়ামতের দিন উদ্দেশ্য। অনেক তাফসীরবিদদের মতে আরাফার দিন উদ্দেশ্য।

اُخْدُوْدٌ : একবচন; বহুবচন। اَخَادِيْدُ ; অর্থ : দাগ, রেখা, গর্ত, খাদ, পরিখা। اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ পরিখা খননকারী। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ঐ সকল দুশমন উদ্দেশ্য, যারা গর্ত খনন করে তাতে আগুন দিয়ে আল্লাহর ইবাদত কারীদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করেছিল।

شُهُوْدٌ : شَاهِدٌ -এর বহুবচন। যেমন سُجُوْدٌ শব্দটি سَاجِدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– দেখছিল, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী, উপস্থিত, বিদ্যমান।

مَا نَقَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نَقَمٌ মূলবর্ণ (ن – ق – م) জিনস صحيح অর্থ– তার দোষ খুজে পায়নি, প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি।

فَتَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার فَتْنٌ মূলবর্ণ (ف – ت – ن) জিনস صحيح অর্থ– কষ্ট দেয়, দুঃখ দিয়েছে।

حَرِيْقٌ : সিফাতে মুশাব্বাহ। ফায়েল ও মাফউল উভয় অর্থ দেয়। অর্থ, অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী। حرق থেকে নির্গত। অর্থ– জ্বালানো। বাবে ضَرَبَ

تَكْذِيْبٌ : মাসদার। বাব تَفْعِيْلٌ মূলবর্ণ (ك – ذ – ب) জিনস صحيح অর্থ– মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, মিথ্যারোপ করা।

مُحِيْطٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ اِفْعَالٌ বাব اِحَاطَةٌ মাসদার (ح – و – ط) মূলবর্ণ اجوف জিনস واوى অর্থ– বেষ্টন করে আছেন। বেষ্টনকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ : এখানে قُتِلَ ফে'ল আর اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ হলো نائب فاعل ; اَلنَّارِ হলো الْاُخْدُوْد থেকে بدل الاشتمال আর ذَاتِ الْوَقُوْدِ হলো اَلنَّارِ -এর সিফত।

وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ : এখানে واو আতফ اللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা مِنْ وَّرَائِهِمْ টা مُحِيْطٌ -এর সাথে متعلق হয়েছে, আর مُحِيْطٌ হলো খবর اَللّٰهُ মুবতাদার। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ২৬৮]

سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ
সূরা ত্বারিক

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৭, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. শপথ আসমানের আর সে বস্তুর যা রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে।	وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝١
২. আর আপনার কি জানা আছে যে, রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশকারী বস্তুটি কী?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢
৩. এটা উজ্জ্বল নক্ষত্র।	النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣
৪. এমন কোনো মানুষই নেই যার সঙ্গে [আমলের] স্মরণকারী কোনো [ফেরেশতা] নিযুক্ত নেই।	اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤
৫. অতএব মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাকে কী বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।	فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥
৬. তাকে স্ববেগে নির্গত পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।	خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝٦
৭. যা মেরুদণ্ড এবং বক্ষদেশের [অর্থাৎ সমগ্র দেহের] মধ্য হতে নির্গত হয়।	يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝٧
৮. নিশ্চয় তিনি তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম।	اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝٨

শব্দ বিশ্লেষণ :

১. وَالسَّمَآءِ শপথ আসমানের وَالطَّارِقِ আর সে বস্তুর যা রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে।

২. وَمَآ اَدْرٰىكَ আর আপনার কি জানা আছে যে مَا الطَّارِقُ রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশকারী বস্তুটি কী?

৩. النَّجْمُ নক্ষত্র الثَّاقِبُ উজ্জ্বল।

৪. اِنْ كُلُّ نَفْسٍ এমন কোনো মানুষই নেই لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ যার সঙ্গে কোনো স্মরণকারী নিযুক্ত নেই।

৫. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ অতএব মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে مِمَّ خُلِقَ তাকে কী বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬. خُلِقَ তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ স্ববেগে নির্গত পানি দ্বারা।

৭. يَّخْرُجُ যা নির্গত হয় مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ মেরুদণ্ডের মধ্য হতে وَالتَّرَآئِبِ এবং বক্ষদেশের।

৮. اِنَّهٗ নিশ্চয় তিনি عَلٰى رَجْعِهٖ তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে لَقَادِرٌ সক্ষম।

৯. যেদিন সকলের গুপ্ত বিষয় প্রকাশ হয়ে যাবে।	يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴿٩﴾
১০. অতঃপর সেই মানুষের না নিজের কোনো [প্রতিরোধ] ক্ষমতা থাকবে, আর না তার কোনো সহায়ক থাকবে।	فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾
১১. শপথ আসমানের, যা হতে বৃষ্টিপাত হয়।	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾
১২. আর শপথ জমিনের, যা [বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সময়] ফেটে যায়।	وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾
১৩. নিশ্চয় এই কুরআন [সত্য ও অসত্যের মধ্যে] মীমাংসাকারী বাণী।	إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾
১৪. আর এটা কোনো নিরর্থক বস্তু নয়।	وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾
১৫. তারা বিভিন্ন রকমের তদবীর করছে।	إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾
১৬. আর আমি [তাদের তদবীর বিফল করার জন্য] বিভিন্ন রকমের তদবীর করছি।	وَّأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾
১৭. সুতরাং আপনি এই কাফেরদেরকে এভাবেই থাকতে দিন, [বেশি দিন নয়] অল্প কিছু দিনের জন্য থাকতে দিন।	فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

শব্দ বিশ্লেষণ :

৯. يَوْمَ تُبْلَى যেদিন প্রকাশ হয়ে যাবে السَّرَآئِرُ সকলের গুপ্ত বিষয়।

১০. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ অতঃপর তার না কোনো ক্ষমতা থাকবে وَّلَا نَاصِرٍ আর না কোনো সহায়ক থাকবে।

১১. وَالسَّمَآءِ শপথ সে আসমানের ذَاتِ الرَّجْعِ যা বৃষ্টিবর্ষণ করে।

১২. وَالْأَرْضِ শপথ সে জমিনের ذَاتِ الصَّدْعِ যা ফেটে যায়।

১৩. إِنَّهُ নিশ্চয় তা لَقَوْلٌ فَصْلٌ মীমাংসাকারী বাণী।

১৪. وَّمَا هُوَ আর এটা নয় بِالْهَزْلِ নিরর্থক কোনো বস্তু।

১৫. إِنَّهُمْ নিশ্চয় তারা يَكِيدُونَ তদবীর করে كَيْدًا বিভিন্ন রকমের।

১৬. وَّأَكِيدُ আর আমি [ও] তদবীর করি كَيْدًا বিভিন্ন রকমের।

১৭. فَمَهِّلِ সুতরাং আপনি অবকাশ দিন/থাকতে দিন الْكٰفِرِيْنَ এই কাফেরদেরকে أَمْهِلْهُمْ আপনি তাদেরকে অবকাশ দিন/থাকতে দিন رُوَيْدًا অল্প কিছু দিনের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম আয়াতে اَلطَّارِقُ শব্দটি উল্লেখ থাকার কারণে একে سُوْرَةُ الطَّارِقِ নামে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৭টি আয়াত, ৬১টি বাক্য এবং ২৩৯টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : সূরাটির ভাষণ দ্বারা অনুমিত হয় যে, এটা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ প্রাথমিক পর্যায়ের সূরাসমূহের একটি। অবতীর্ণের সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। তবে মক্কার কাফেরগণ যখন কুরআনের দাওয়াত এবং এর উপস্থাপিত বিধান সম্পর্কে নানারূপ ষড়যন্ত্র এ এবং বিষয় নিয়ে কৌতুক করত, তখনই এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য দু'টি। একটি হচ্ছে : মৃত্যুর পর অবশ্যই মানুষকে আল্লাহর নিকট হাজির হতে হবে। আর দ্বিতীয়, কুরআন একটি চূড়ান্ত বাণী। কাফেরদের কোনো অপকৌশল কোনো ষড়যন্ত্রই এর ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়।

সর্বপ্রথম আকাশ মণ্ডলে বিস্তীর্ণ নক্ষত্ররাজিকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করে বলা হয়েছে যে, বিশ্বলোকের কোনো বস্তুই এক মহান সুদৃঢ় সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে নিজ স্থানে স্থির ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে না। পরে মানুষের নিজ সত্তার প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির মূল সূত্রের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, একবিন্দু শুক্রকীট দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে এক জীবন্ত, চলন্ত ও পূর্ণাঙ্গ সত্তায় পরিণত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে মহান সত্তা এভাবে মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন– মৃত্যুর পর তিনি যে তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে এই উদ্দেশ্যে যে, দুনিয়ার জীবনে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য অজ্ঞানতার অন্তরালে লুকিয়ে রয়ে গেছে পরবর্তী জীবনে তাই যাচাই ও পরীক্ষা করা হবে। এ সময় মানুষ তার কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য হবে। এ ফল ভোগ করা হতে- না সে নিজের বলে আত্মরক্ষা করতে পারবে আর না অন্য কেউ তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আকাশ হতে বৃষ্টিপাত এবং জমিনে গাছপালা ও শস্যের উৎপাদন যেমন কোনো অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন খেলা নয়; বরং এক গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক বিরাট কাজ, কুরআনের যেসব সত্য ও তথ্য বিবৃত হয়েছে তাও ঠিক তেমনি কোনো হাসি-তামাশার ব্যাপার নয়। এটা অতীব পাকা-পোক্ত এবং অবিচল ও অটল বাণী। কাফেররা নানা অপকৌশল দ্বারা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে বলে মনে করছে, তা তাদের মারাত্মক ভুল বৈ আর কিছুই নয়। তারা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলাও তার এক নিজস্ব পরিকল্পনায় ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। তার এ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মোকাবিলায় কাফেরের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য।

অতঃপর একটি বাক্যাংশে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। আর সান্ত্বনা বাণীর অন্তরালে কাফেরদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আপনি একটু ধৈর্যধারণ করুন। কাফেরদেরকে কিছু দিন তাদের ইচ্ছা মাফিক চলতে দিন। অপেক্ষা করুন বেশি দিন লাগবে না। তারা যেখানেই কুরআনকে আঘাত দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে, কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, সেখানেই কুরআন বিজয়ী হবে। আর তারা নিজেরাই তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ [١٠]

শানে নুযূল : আবূ সালেহ হযরত ইবনে আব্বস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আবূ তালিব এর সাথে কোথাও বসা ছিলেন। তখন একটি তারকা খসে পড়তে দেখতে পেলেন এতে ভূপৃষ্ঠ আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায়। তখন আবূ তালিব সংকিত হয়ে পড়ল এবং বলল, তা কি? জবাবে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ হচ্ছে আল্লাহর কুদরতের নির্দশনাবলির অন্যতম নির্দশন। এতে আবূ তালিব আশ্চর্য হয়ে পড়ল। আবূ তালিবের আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৫/২০]

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ .... الاية

শানে নুযূল : এই আয়াত আবুল আশাদ এর ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। সে চামড়ার উপর দাঁড়িয়ে বলত। হে কোরাইশগণ! যে আমাকে এ চামড়া থেকে নামাতে পারবে তার জন্য এই এই পুরস্কার রয়েছে। এবং আরও বলত মুহাম্মদ ﷺ মনে করেন যে, দোজখের উপর উনিশজন পাহারাদার রয়েছেন। দশজনের বিরুদ্ধে তো আমি একাই যথেষ্ট আর বাকি নয়জনের জন্যে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[লুবাবুন নুকূল]

এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন : প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। সে তার সমস্ত কাজকর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। এর পরিপ্রেক্ষতে মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে দুনিয়াতে যা কিছু করছে, তা সবই কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোনো সময় পরকাল ও কিয়ামতের চিন্তা থেকে গাফিল হওয়া অনুচিত। এরপর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে শয়তান মানুষের মনে যে অসম্ভাব্যতার সন্দেহ সৃষ্টি করে, তার জবাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : মানুষ লক্ষ্য করুক যে, সে কিভাবে বিভিন্ন অণু, কণা ও বিভিন্ন উপকরণ থেকে সৃজিত হয়েছে। যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের কণাসমূহ একত্র করে একজন জীবিত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পর পুনরায় তদ্রূপ সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এরপর কিয়ামতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করে আবার আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষকে পরকাল চিন্তার যে

শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে যেন তাকে হাসি-তামাশা মনে না করে। এটা এক বাস্তব সত্য, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অবশেষে দুনিয়াতেই কোনো আজাব আসে না– কাফেরদের এই প্রশ্নের জবাবের মাধ্যমে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

প্রথম শপথে আকাশের সাথে طَارِقْ শব্দ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ রাত্রিতে আগমনকারী। নক্ষত্র দিনের বেলায় লুক্কায়িত থাকে এবং রাতে প্রকাশ পায়, এজন্য নক্ষত্রকে طَارِقْ বলা হয়েছে। কুরআন এ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে নিজেই জবাব দিয়েছে اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ –অর্থাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র। আয়াতে কোনো নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই যে কোনো নক্ষত্রকে বুঝানো যায়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন বিশেষ নক্ষত্র 'সুরাইয়া', যা সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটি নক্ষত্র কিংবা 'শনিগ্রহ' অর্থ নিয়েছেন। আরবি ভাষায় সুরাইয়া ও শনিগ্রহকে نَجْم বলা হয়ে থাকে।

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ-এটা শপথের জবাব। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। এখানে حَافِظٌ শব্দ একবচনে উল্লেখ করা হলেও তারা যে একাধিক তা অন্য আয়াত থেকে জানা যায়। অন্য আয়াতে আছে : وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ : حَافِظ -এর অপর অর্থ আপদবিপদ থেকে হেফাজতকারীও হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের হেফাজতের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তারা দিনরাত মানুষের হেফাজতে নিয়োজিত থাকে। তবে আল্লাহ তা'আলা যার জন্য যে বিপদ অবধারিত করে দিয়েছেন, তারা সে বিপদ থেকে হেফাজত করে না। অন্য এক আয়াতে একথা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে : لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ অর্থাৎ মানুষের জন্য পালাক্রমে আগমনকারী পাহারাদার ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আল্লাহর আদেশে সামনে ও পেছনে থেকে তার হিফাজত করে।

এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন– প্রত্যেক মু'মিনের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার হেফাজতের জন্য তিনশ ষাট জন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা তার প্রত্যেক অঙ্গের হেফাজত করে। তন্মধ্যে সাতজন ফেরেশতা কেবল চোখের হেফাজতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। এসব ফেরেশতা অবধারিত নয়–এমন প্রত্যেক বালা-মসিবত থেকে এভাবে মানুষের হেফাজত করে, যেমন মধুর পাত্রে আগমনকারী মাছিকে পাখা ইত্যাদির সাহায্যে দূর করে দেওয়া হয়। মানুষের উপর এরূপ পাহারা না থাকলে শয়তান তাকে ছিনিয়ে নিত। –[কুরতুবী]

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ : অর্থাৎ মানুষ সৃজিত হয়েছে এক সবেগে স্খলিত পানি থেকে যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থিপিঞ্জরের মধ্য থেকে নির্গত হয়। সাধারণভাবে তাফসীরবিদগণ এর এই অর্থ করেছেন যে, বীর্য পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু মানবদেহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুচিন্তিত অভিমত ও অভিজ্ঞতা এই যে, বীর্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে নির্গত হয় এবং সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ নারী ও পুরুষের সেই অঙ্গ থেকে নির্গত বীর্য দ্বারা গঠিত হয়। তবে এ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি প্রভাব থাকে মস্তিষ্কের। এ কারণেই সাধারণত দেখা যায়, যারা অতিরিক্ত স্ত্রীমৈথুন করে, তারা প্রায়ই মস্তিষ্কের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়। তাদের আরও সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বীর্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে স্খলিত হয়ে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে অণ্ডকোষে জমা হয় এবং সেখান থেকে নির্গত হয়।

এই অভিমত বিশুদ্ধ হলে তাফসীরবিদগণের উপরিউক্ত উক্তির সঙ্গত ব্যাখ্যাদান অবান্তর নয়। কেননা চিকিৎসাবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, বীর্য উৎপাদনে সর্বাধিক প্রভাব রয়েছে মস্তিষ্কের। আর মস্তিষ্কের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে সেই শিরা, যা মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্ক থেকে পৃষ্ঠদেশে ও পরে অণ্ডকোষে পৌছেছে। এরই কিছু উপাশিরা বক্ষের অস্থি-পাঁজরে এসেছে। এটা সম্ভবপর যে, নারীর বীর্যে বক্ষপাঁজর থেকে আগত বীর্যের এবং পুরুষের বীর্যে পৃষ্ঠদেশ থেকে আগত বীর্যের প্রভাব বেশি। –[বায়যাভী]

কুরআন পাকের ভাষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এতে নারী ও পুরুষের কোনো বিশেষত্ব নেই। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশের মধ্য থেকে নির্গত হয়। এর সরাসরি অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বীর্য নারী ও পুরুষ উভয়ের সমস্ত দেহ থেকে নির্গত হয়। তবে সামনের ও পশ্চাতের প্রধান অঙ্গের নাম উল্লেখ করে সমস্ত দেহ ব্যক্ত করা হয়েছে। সম্মুখভাগে বক্ষ এবং পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠ প্রধান অঙ্গ। এই দুই অঙ্গ থেকে নির্গত হওয়ার অর্থ নেওয়া হবে সমস্ত দেহ থেকে নির্গত হওয়া।

وَاِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ : رَجْع -এর অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা প্রথমবার মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও ভালোরূপে সক্ষম।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ : تُبْلٰى -এর শাব্দিক অর্থ পরীক্ষা করা, যাচাই করা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের যেসব বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মনন ও সংকল্প অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, দুনিয়াতে কেউ জানত না, এবং যেসব কাজকর্ম সে গোপনে করেছিল, কিয়ামতের দিন সে সবগুলোই পরীক্ষিত হবে। অর্থাৎ প্রকাশ করে দেওয়া হবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষের সব গোপন ভেদ খুলে যাবে। প্রত্যেক ভালোমন্দ বিশ্বাস ও কর্মের আলামত হয় মানুষের মুখমণ্ডলে শোভা পাবে না হয় অন্ধকার ও কাল রঙের আকারে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। –[কুরতুবী]

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ : رَجْع -এর অর্থ পর পর বর্ষিত বৃষ্টি। একবার বৃষ্টি হয়ে শেষ হয়ে যায়, আবার হয়।

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ : অর্থাৎ কুরআন সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা করে; এতে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।
হযরত আলী (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরআন সম্পর্কে বলতে শুনেছি :

كِتَابٌ فِيهِ خَبَرُ مَا قَبْلَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَعْدَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ.

অর্থাৎ এই কিতাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের সংবাদ এবং তোমাদের পরে আগমনকারীদের জন্য বিধি-বিধান রয়েছে। এটা চূড়ান্ত উক্তি; আমার মুখের কথা নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلطَّارِقُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার طُرُوْقٌ – طَرْقٌ মূলবর্ণ (ط – ر – ق) জিনস صحيح অর্থ– রাতে আগমনকারী, যা রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে।

اَلثَّاقِبُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার ثُقُوْبٌ মূলবর্ণ (ث – ق – ب) জিনস صحيح অর্থ : উজ্জ্বল নক্ষত্র, দীপ্তিমান, বিজলী।

دَافِقٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ. نَصَرَ মাসদার دَفْقٌ মূলবর্ণ (د – ف – ق) জিনস صحيح অর্থ– স্ববেগে নির্গত।

صُلْبٌ : একবচন; বহুবচন أَصْلَابٌ ; অর্থ– পিঠ। ইমাম রাগেব (র.) লিখেন, صُلْبٌ -এর অর্থ– কঠিন হওয়া, শক্ত হওয়া।

لِيَنْظُرْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَظَرٌ মূলবর্ণ (ن . ظ . ر) জিনস صحيح অর্থ– যেন সে দেখে।

سَرَائِرُ : এটি سَرِيْرَةٌ এর বহুবচন। অর্থ গোপন করা, গোপন বিষয় রহস্য। আল্লামা ইবনে খালুবিয়াহ লিখেন, ياء কে বহুবচনের মধ্যে হামযাহ্ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা বহুবচনে ইয়ার পূর্বে আলিফ সাকিন রয়েছে। তাই ইয়াকে হামযা দ্বারা বদল করে দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে তাকে যের দেওয়া হয়েছে। যেমন, قَبِيْلَةٌ এর বহুবচনে ياء টি মৌলিক হলে তাকে হামযা বানানো যেত না। যেমন, مَعِيْشَةٌ শব্দটি। আল্লাহ তা'আলা এর বহুবচনে প্রমাণস্বরূপ বলেন, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ এখানে ياء কে বিদ্যমান রেখেছেন।

رَجْعٌ : মাসদার। ইসম অর্থ : ফিরা, প্রত্যাবর্তন করা, বৃষ্টি, মেঘ। বাব ضَرَبَ হতে মুতা'আদ্দী অর্থে।

صَدْعٌ : মাসদার। অর্থ : ভেঙ্গে যাওয়া, ফেটে যাওয়া। বাব فَتَحَ ; মূলবর্ণ (ص – د – ع) জিনস صحيح ; এখানে صَدْعٌ দ্বার উদ্দেশ্য চাষকৃত জমিন হতে ফসল ফেটে বা বিদীর্ণ করে বের হওয়া।

فَصْلٌ : হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য। সত্য কথা, সঠিক বিচারকারী কথা। হককে বাতিল থেকে পৃথককারী কথা বা বাক্য। হাড্ডি ও অঙ্গের জোড়া। দুই জিনিস মিলিত হওয়াকে বাঁধা দানকারী। আয়াতে প্রথমটি উদ্দেশ্য।

اَلْهَزْلُ : ইসম ও মাসদার। বাব : سَمِعَ ও ضَرَبَ ; অর্থ : বাতিল, নিরর্থক, তামাশা করা, কৌতুক করা।

يَكِيْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার كَيْدٌ মূলবর্ণ (ك – ى – د) জিনস اجوف يائى অর্থ– তদবীর করে, চক্রান্ত করে, কৌশল করে।

مَهِّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْهِيْلٌ মূলবর্ণ (م – ه – ل) জিনস صَحِيح অর্থ– এভাবেই থাকতে দিন, অবকাশ দিন, সুযোগ দিন, ঢিল দিন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ : এখানে إِنَّ হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল আর ه হলো اسم ان আর لَقَوْلٌ -এর লাম হলো المزحلقة যা তাকিদের জন্য হয়েছে। আর قَوْلٌ হলো خبر ان আর فَصْلٌ হলো قَوْلٌ -এর সিফাত। আর وَمَاهُوَ -এর واو টা হরফে আতফ। আর مَا হলো بمعنى ليس আর هُوَ হলো তার ইসিম। আর باء হলো হরফে زائد। আর اَلْهَزْلُ হলো শাব্দিকভাবে مجرور কিন্তু محل হিসেবে منصوب যেহেতু مَا -এর খবর হয়েছে।

إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا : এখানে إِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর هُمْ হলো اسم ان আর يَكِيْدُوْنَ বাক্যটি خبر إِنَّ আর كَيْدًا হলো يَكِيْدُوْنَ -এর মাফউলে মুতলাক। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৮০]

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى مَكِّيَّةٌ

সূরা আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৯, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনি স্বীয় মহোন্নত প্রভুর নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴿١﴾
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর যথাযথভাবে বানিয়েছেন।	الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٢﴾
৩. আর যিনি [প্রত্যেক প্রাণীর জন্য তদুপযোগী বস্তুসমূহের] ব্যবস্থা করেছেন, অনন্তর পথ প্রদর্শন করেছেন।	وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ﴿٣﴾
৪. আর যিনি ঘাস উৎপন্ন করেছেন।	وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ﴿٤﴾
৫. অনন্তর তাকে মলিন খড়-কুটায় পরিণত করেছেন।	فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ﴿٥﴾
৬. আমি আপনাকে [কুরআন] পাঠ করিয়ে দিব। অতঃপর আপনি ভুলবেন না।	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ﴿٦﴾
৭. কিন্তু যা আল্লাহর ইচ্ছা হয়, তিনি প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় অবগত আছেন।	اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ﴿٧﴾
৮. আর আমি এই সহজ শরিয়তের জন্য আপনার সুবিধা করে দিব।	وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. سَبِّحِ আপনি পবিত্রতা বর্ণনা করুন اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى স্বীয় মহোন্নত প্রভুর নামের।

২. الَّذِىْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন فَسَوّٰى অনন্তর যথাযথভাবে বানিয়েছেন।

৩. وَالَّذِىْ قَدَّرَ আর যিনি ব্যবস্থা করেছেন فَهَدٰى অনন্তর পথ প্রদর্শন করেছেন।

৪. وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ আর যিনি উৎপন্ন করেছেন الْمَرْعٰى ঘাস।

৫. فَجَعَلَهٗ অনন্তর তাকে পরিণত করেছেন غُثَآءً اَحْوٰى মলিন খড়-কুটায়।

৬. سَنُقْرِئُكَ আমি আপনাকে [কুরআন] পাঠ করিয়ে দিব فَلَا تَنْسٰٓى অতঃপর আপনি ভুলবেন না।

৭. اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ কিন্তু যা আল্লাহর ইচ্ছায় হয় اِنَّهٗ يَعْلَمُ তিনি অবগত আছেন الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়।

৮. وَنُيَسِّرُكَ আর আমি আপনার সুবিধা করে দিব لِلْيُسْرٰى এই সহজ শরিয়তের জন্য।

অনুবাদ	আয়াত
০৯. সুতরাং আপনি উপদেশ দান করতে থাকুন, যদি উপদেশ ফলপ্রদ হয়।	فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾
১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে।	سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾
১১. আর যে অতিশয় হতভাগ্য সে তা হতে বিমুখ থাকে।	وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿١١﴾
১২. যে [পরিণামে] ভয়াবহ অগ্নিতে প্রবেশ করবে।	الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾
১৩. অনন্তর সে তন্মধ্যে না মরবে না আর [আরামে] বাঁচবে।	ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾
১৪. সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা লাভ করেছে।	قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾
১৫. এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে ও নামাজ পড়তে রয়েছে।	وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾
১৬. বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও।	بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾
১৭. অথচ আখেরাত বহুগুণে উত্তম ও স্থায়ী।	وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾
১৮. এটা [শুধু কুরআনেরই দাবি নয়; বরং] পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও রয়েছে।	اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾
১৯. অর্থাৎ ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে,	صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

০৯. فَذَكِّرْ সুতরাং আপনি উপদেশ দান করতে থাকুন اِنْ نَّفَعَتِ যদি ফলপ্রদ হয় الذِّكْرٰى উপদেশ।

১০. سَيَذَّكَّرُ কিন্তু সে ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করবে مَنْ يَّخْشٰى যে ভয় করে।

১১. وَيَتَجَنَّبُهَا আর সে তা হতে বিমুখ থাকে الْاَشْقَى যে অতিশয় হতভাগ্য।

১২. الَّذِيْ يَصْلَى যে (পরিণামে) প্রবেশ করবে النَّارَ الْكُبْرٰى ভয়াবহ অগ্নিতে।

১৩. ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا অনন্তর সে তন্মধ্যে না মরবে وَلَا يَحْيٰى না আর (আরামে) বাঁচবে।

১৪. قَدْ اَفْلَحَ সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি مَنْ تَزَكّٰى যে পবিত্রতা লাভ করেছে।

১৫. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে فَصَلّٰى ও নামাজ পড়তে রয়েছে।

১৬. بَلْ تُؤْثِرُوْنَ বরং তোমরা প্রাধান্য দাও الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনকে।

১৭. وَالْاٰخِرَةُ অথচ আখেরাত خَيْرٌ বহু গুণে উত্তম وَّاَبْقٰى ও স্থায়ী।

১৮. اِنَّ هٰذَا এটা لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى পূর্ববর্তী সহীফা সমূহেও রয়েছে।

১৯. صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত الأعلى শব্দটি সূরার নামকরণে নির্বাচন করা হয়েছে। আল-আ'লা অর্থ– সুমহান, সুউচ্চ। অর্থাৎ এ গুণটি দ্বারা আল্লাহর মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বুঝানো হয়েছে। এ সূরাটির অপর নাম হলো 'সূরাতুস-সাব্বাহ'। এতে ১৯ টি আয়াত, ৭২ টি বাক্য এবং ২৮৪ টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : এতে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হতে বুঝা যায় যে, এ সূরাটিও মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এর ৬ নং আয়াতে রাসূল ﷺ-কে বলা হয়েছে। আমি তোমাকে পড়িয়ে দিবো; অতঃপর তুমি আর ভুলে যাবে না। এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি একেবারে প্রাথমিক কালের এবং সে সময়ে অবতীর্ণ যখন নবী করীম ﷺ ওহী গ্রহণে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। ওহী নাজিল হওয়ার সময়ে তাঁর মনে আশঙ্কা জাগত যে, তিনি এর শব্দ ও ভাষা ভুলে যেতে পারেন। এ আয়াতের সাথে সূরা ত্বাহার ১১৪ নং আয়াত এবং সূরা ক্বিয়ামাহ-এর ১৬-১৯ নং আয়াত মিলালে দেখা যায় এদের মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। সর্বপ্রথম এ সূরার মাধ্যমে নবী করীম ﷺ-কে এই বলে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, স্মরণ রাখতে পারার ব্যাপার নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। অতঃপর দীর্ঘদিন পর যখন সূরা ক্বিয়ামাহ নাজিল হয়। তখন নবী করীম ﷺ অস্থিরভাবে ওহীর শব্দসমূহ বারবার পড়ে আয়ত্ত ও মুখস্থ করতে লাগলেন, তখন তাকে বলা হলো 'হে নবী'! এ ওহীকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য নিজের মুখ দ্রুত চালু করবেন না। এটা মুখস্থ করে দেওয়া ও পড়ে দেওয়া তো আমার কাজ-আমার দায়িত্ব। কাজেই যখন এটা পাঠ করা হয় তখন আপনি মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন। তাছাড়া এর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়াও আমারই দায়িত্ব।

শেষবারে সূরা ত্বহা নাজিল হওয়ার সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে নবী করীম ﷺ-এর আশঙ্কা জাগল যে, এ ১১৩ টি আয়াত-যা একই সঙ্গে ক্রমাগত নাজিল হলো। এটা হতে কোনো একটি অংশও যেন আমার স্মৃতি বহির্ভূত হয়ে না যায়। এ জন্য তিনি তা মুখস্থ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এ উপলক্ষে নবী করীম ﷺ-কে বলা হলো : 'কুরআন পড়ায় খুব তাড়াহুড়া করবেন না, যতক্ষণ না এ ওহী আপনার নিকট পুরা মাত্রায় পৌঁছে যায়। অতঃপর আর কোনো সময় ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা নেই এবং আর কোনো কথা বলার কখনো প্রয়োজন হয়নি। কুরআন মাজীদের অন্য কোথাও এ ব্যাপারে আর কোনো উল্লেখ নেই।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে– তাওহীদ। এর সাথে নবী করীম ﷺ-কে উপদেশ দান, পাপিষ্ঠ ও বেঈমান লোকদের অশুভ পরিণতি এবং ঈমানদার ও পবিত্র লোকদের পরকালীন সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে ১-৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নামে তাসবীহ পাঠের আহ্বান জানিয়ে মূলত তাওহীদের কথা বলেছেন। কেননা মহান আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার জন্যই তাঁর সম্পর্কে কল্পিত রূপ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং আল্লাহর সত্তা, গুণ, ক্ষমতা ও একত্ববাদ কোনো প্রকারে ক্ষুণ্ন হয় এবং দোষত্রুটি প্রকাশ পায় এমন নাম বর্জন করে তাঁর সুমহান নামসমূহের দ্বারা তাসবীহ পাঠের আহ্বান জানানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টি কৌশলের কথা বলেছেন– সে মহান আল্লাহর গুণগান কর, যিনি সৃষ্টিলোককে সঠিক ও সুচারুভাবে সৃষ্টি করেছেন। এদের জন্য তাকদীর নির্ধারণ করে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক আইন ও বিধান দিয়ে পথের দিশা দিয়েছেন। তিনিই জীবকুলের জন্য চারণভূমিতে সবুজের মহাসমারোহ সৃষ্টি করেন আবার একে আবর্জনায় পরিণত করেন। তাঁর নির্দেশেই ঘটে বসন্তের আগমন ও শীতের সমাগম। তিনিই মহান ক্ষমতার অধিকারী।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬-৮ নং আয়াতে নবী করীম ﷺ-কে ওহী স্মরণ থাকার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– আপনি ওহী হৃদয়ঙ্গম করুণ এবং মন হতে এটা বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার কথা ভাববেন না। আপনার স্মৃতিপটে একে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। আপনি উচ্চৈঃস্বরে ও নিঃশব্দে কুরআন পাঠ করেন এ সম্পর্কে আমি অবগত। আপনার জন্য এটা স্মরণ রাখাকে আমি খুব সহজতর করে দিবো। আপনার কোনোই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না।

তৃতীয় পর্যায়ে ৯-১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনি মানুষের কাছে আল্লাহর দীনের কথা প্রচার করতে থাকুন এবং তাদেরকে নসিহত করার ধারা অব্যাহত রাখুন। আপনার দাওয়াত ও নসিহত তারাই গ্রহণ করবে যারা অদৃশ্য আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু; যারা হতভাগ্য ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক তারা আপনার দাওয়াত ও নসিহত গ্রহণ করবে না এবং ঈমানও আনবে না। তারা মহা অগ্নিকুণ্ড জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাতে তারা জ্যান্ত-মরা অবস্থায় অবস্থান করবে।

চতুর্থ পর্যায়ে ১৪-১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা দাওয়াত ও নসিহত গ্রহণ করে আকীদা-বিশ্বাস ও চরিত্র-আমলে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং জিকির ও নামাজ আদায় করবে, পরকালে তারাই হবে সফলকাম। তারাই সফল জীবন লাভ

করে মহাসুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করবে; কিন্তু অনেক লোকই পরকালীন সে মহাসুখ-শান্তি ও স্থায়ী আনন্দের কথা চিন্তা-ভাবনা করে না; বরং পার্থিব জগতের ক্ষণকালীন আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে এবং একেই তারা পরকালের উপর প্রাধান্য দেয় অথচ পরকালের আনন্দ ও সুখ-শান্তিই সর্বোত্তম, অনন্ত ও চিরন্তন।

সর্বশেষে বলা হয়েছে যে, আমার এসব কথা নতুন কিছু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব হতে মানুষের কাছে এটা পৌঁছিয়ে আসছি। এমনকি হযরত ইবরাহীম ও হযরত মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত গ্রন্থাবলিতেও এসব আলোচনা বিদ্যমান। আমি নতুন কিছুই বলিনি। এতএব, তোমরা পার্থিব জীবনের ধাঁধায় পতিত হয়ে অনন্ত সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করো না।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى .... الاية.

শানে নুযূল : হযরত জিবরাইল (আ.) যখন ওহী নিয়ে হুজুরের খেদমতে আসতেন, তখন হযরত জিবরাইল (আ.) আয়াত পাঠ শেষ করতে না করতেই হুজুর ﷺ কুরআনের শব্দগুলো শুরু থেকে আবৃত্তি করতে থাকতেন। এ আশঙ্কায় যেন কুরআনের শব্দাবলি বিস্মৃত হয়ে না যায়। বরং যেন তা মুখস্ত হয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[কুরতুবী ২০ : ১৮]

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى [١٠]

শানে নুযূল : আবূ সালেহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ২১/২০]

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقٰى [١١]

শানে নযূল : আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল করেছেন।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى [١٤]

শানে নুযূল : হযরত আত্বা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত উছমান বিন আফফান (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, মদীনায় এক আনসারীর বাড়ীর পার্শ্ববর্তী এক মুনাফিকের খেজুর গাছ আনসারীর বাড়ির দিকে হেলে পড়ে রয়েছিল। যখন বাতাস প্রবাহিত হতো, তখন আনসারীর বাড়িতে তার গাছের পাকা ও তরতাজা খেজুর পরত। ফলে তার সন্তান-সন্ততিরা তা কুড়িয়ে খেয়ে ফেলত। এতে করে মুনাফিক আনসারীর সাথে ঝগড়া বাঁড়িয়ে দিত। সুতরাং নিরীহ আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে সে সম্পর্কে অভিযোগ জানালো। হযরত রাসূল ﷺ-এর নিকট তার নেফাক সম্পর্কে জানা ছিল না। তিনি তাকে ডেকে এনে বললেন যে, তোমার আনসারী ভাই বলল তোমার গাছের পাকা ও তরতাজা খেজুর তার বাড়িতে পরলে তার সন্তান-সন্ততিরা সেগুলো খেয়ে ফেলে। আমি বেহেশতের মাঝে এর বিনিময়ে একটি গাছ তোমাকে দিয়ে দেব কী? সে বলল, আমি নগদকে বাকির বিনিময়ে কি বিক্রি করে দেব? এমনটি করব না। তখন হযরত উছমান বিন আফফান (রা.) বেহেশতের খেজুর গাছটির পরিবর্তে একটি বাগান তাকে দিয়ে দিলেন। হযরত উসমান গনী (রা.)-এর এ দানের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। যাহহাক বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী ২৩/১২]

মাস'আলা : আলিমগণ বলেন : নামাজের বাইরে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى তেলাওয়াত করলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলা মুস্তাহাব। সাহাবায়ে কেরাম এ সূরা তেলাওয়াত শুরু করলে এরূপ বলতেন। –[কুরতুবী]

ওকবা ইবনে আমের জোহানী (রা.) বর্ণনা করেন, যখন সূরা আ'লা নাজিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : اِجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ অর্থাৎ তোমরা سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى কালেমা টি সেজদায় পাঠ কর। تَسْبِيْح শব্দের অর্থ পবিত্র রাখা, পবিত্রতা বর্ণনা করা। سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ-এর অর্থ এই যে, আপন পালনকর্তার নাম পবিত্র রাখুন। অর্থাৎ পালনকর্তার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার সময় বিনয়, নম্রতা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তাঁর উপযুক্ত নয়– এমন যাবতীয় বিষয় থেকে তাঁর নামকে পবিত্র রাখুন। এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজের যেসব নাম বর্ণনা করেছেন, তাঁকে কেবল সেসব নামের মাধ্যমেই ডাকুন। অন্য কোনো নামে তাঁকে ডাকা জায়েজ নয়।

এর অপর অর্থ এই যে, যেসব নাম আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, সেগুলো কোনো মানুষের জন্য ব্যবহার করা তাঁর পবিত্রতার পরিপন্থি, তাই নাজায়েজ। যেমন রহমান, রায্যাক, গাফফার, কুদ্দুস ইত্যাদি। (কুরতুবী) আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীনতার অন্ত নেই। মানুষ নাম সংক্ষেপ করতে খুবই আগ্রহী। মানুষ অবলীলাক্রমে আব্দুর রহমানকে রহমান, আব্দুর রায্যাককে রায্যাক এবং আব্দুল গাফফারকে গাফ্ফার বলে থাকে। কেউ একথা বোঝে না যে, যে এরূপ বলে এবং যে শুনে উভয়ই গোনাহগার হয়। এই নিরর্থক গোনাহ্ দিবারাত্রি অহেতুক হতে থাকে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে اِسْم-এর অর্থ নিয়েছেন যার নাম তাব

সত্তা। আরবি ভাষায় এর অবকাশ আছে এবং কুরআন পাকেও اِسْم শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কালেমাটি নামাজের সেজদায় পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন, সেটি سُبْحَانَ اِسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰى নয়; বরং سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى এ থেকেও জানা যায় যে, এ ক্ষেত্রে নাম উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বয়ং সত্তা উদ্দেশ্য। -[কুরতুবী]

বিশ্ব সৃষ্টির নিগূঢ় তাৎপর্য : اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى এগুলো সব জগৎ সৃষ্টিতে আল্লাহর অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত গুণাবলি। প্রথম গুণ خَلَقَ -এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয় বরং কোনো পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোনো কিছুকে নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করা। কোনো সৃষ্টির এ কাজ করার সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরতেই কোনো পূর্বনমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে। দ্বিতীয় গুণ فَسَوّٰى এটা تَسْوِيَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিশেষ মিল রেখে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ ও প্রত্যেক জীব-জানোয়ারকে তার প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। হস্তপদ ও অঙ্গসমূহের মধ্যে এমন জোড় ও প্রাকৃতিক স্প্রিং সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে এগুলোকে চতুর্দিকে ঘোরানো-মোড়ানো যায়। এই বিস্ময়কর মিল স্রষ্টার রহস্য ও শক্তি সামর্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য যথেষ্ট।

তৃতীয়গুণ : تَقْدِيْرٌ - قَدَّرَ -এর অর্থ কোনো বস্তুকে বিশেষ পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি করা। শব্দটি ফয়সালা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালা। এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বস্তুসমূহকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি; প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করে সে কাজের উপযুক্ত সম্পদ দিয়ে তাকে সে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এটা কোনো বিশেষ শ্রেণির সৃষ্টির মধ্যে সীমিত নয়- সমগ্র সৃষ্টি জগৎ ও সৃষ্টিকেই আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং সে কাজেই নিয়োজিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তার পালনকর্তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আকাশ, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি থেকে শুরু করে মানুষ, জীবজন্তু উদ্ভিদ, জড় পদার্থ সবাইকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যেতে দেখা যায় : ابروباد ومہ خورشید وفلک رکاردند মাওলানা রুমী বলেছেন :

خاک وباد وآب وآتش بندہ اند * بامن وتو مردہ باحق زندہ اند

বিশেষত মানুষ ও জীবজন্তুর প্রত্যেক প্রকারকে আল্লাহ তা'আলা যে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা প্রকৃতিগতভাবে সে কাজই করে যাচ্ছে। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সে কাজকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছে :

ہر کسے بہر کارے ساختند * میل اورادر دلش انداختند

চতুর্থ গুণ : فَهَدٰى অর্থাৎ স্রষ্টা যে কাজের জন্য যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশ আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিতেই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ তা'আলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিম্নস্তরের। অন্য আয়াতে আছে : اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করে এক অস্তিত্ব দিয়েছেন, অতঃপর তার সংশ্লিষ্ট কাজের পথনির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ এ পথনির্দেশের প্রভাবে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টির আদি থেকে যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছে, সে কাজ হুবহু তেমনিভাবে কোনোরূপ ত্রুটি ও আলসতা ব্যতিরেকে সম্পাদন করে চলেছে। বিশেষ করে মানুষ ও জীবজন্তুর বুদ্ধি ও চেতনা তো সবসময় চোখের সামনেই রয়েছে। তাদের সম্পর্কে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে, তাদের প্রত্যেক শ্রেণি বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র অর্জন করার এবং প্রতিকূল পরিবেশে থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিস্ময়কর সূক্ষ্ম নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বাধিক বুদ্ধি ও চেতনাশীল জীব মানুষের কথা বাদ দিন, বনের হিংস্র-জন্তু, পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গকে লক্ষ্য করুন! প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ, বসবাস এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য কেমন সব কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো বিশ্ব স্রষ্টার তরফ থেকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা। তারা কোনো স্কুল-কলেজ থেকে কিংবা কোনো ওস্তাদের কাছ থেকে এসব শিক্ষা করেনি বরং এগুলো সব সাধারণ আল্লাহর পথ নির্দেশেরই ফলশ্রুতি যা اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى এবং এই সূরার قَدَّرَ فَهَدٰى আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দান : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সর্বাধিক জ্ঞান ও চেতনা দান করেছেন এবং তাকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সমগ্র পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এবং এগুলোতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ মানুষের সেবা ও উপকারের জন্য সৃজিত হয়ে কিন্তু এগুলোর দ্বারা পুরোপুরি ও বিভিন্ন প্রকার উপকার লাভ করা এবং বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে নতুন জিনিস সৃষ্টি করা অত্যধিক জ্ঞান ও নৈপুণ্য সাপেক্ষ কাজ। আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে এমন সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি নিহিত রেখেছেন যে, সে পর্বত খনন করে এবং সাগর গর্ভে ডুবে গিয়ে শত প্রকার খনিজ ও সামুদ্রিক সামগ্রী আহরণ করতে পারে এবং কাঠ, লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদির সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন বস্তু নির্মাণ করতে

পারে। এ জ্ঞান নৈপুণ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কলেজের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়। জগতের আদিকাল থেকে অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তিরাও এসব কাজ করে আসছে। প্রকৃতিগত এ বিজ্ঞানই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন। অতঃপর শাস্ত্রীয় ও শিক্ষাগত গবেষণার মাধ্যমে এতে উন্নতি লাভ করার প্রতিভাও আল্লাহ তা'আলারই দান।

সবাই জানে যে, বিজ্ঞান কোনো বস্তু সৃষ্টি করে না বরং আল্লাহর সৃজিত বস্তুসমূহের ব্যবহার শিক্ষা দেয়। এ ব্যবহারের সামান্য স্তর তো আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রকৃতিগত ভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর এতে কারিগরি গবেষণা ও উন্নতির এক বিস্তৃত ময়দান খোলা রেখে মানুষের প্রকৃতিতে তা বোঝার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত রেখেছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে নিত্যই নতুন নতুন আবিষ্কার সামনে আসছে এবং আল্লাহ জানেন ভবিষ্যতে আরও কি কি আসবে। বলা বাহুল্য, এ সবই আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ এবং কুরআনের একটি মাত্র শব্দ فَهَدٰى -এর প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা। আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে এসব কাজের পথ দেখিয়েছেন এবং তা সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান করেছেন। পরিতাপের বিষয়, যারা বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করেছে, তারা কেবল এ মহাসত্য সম্পর্কে অজ্ঞই নয় বরং দিন দিন অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى فَجَعَلَهٗ غُثَاۤءً اَحْوٰى - مَرْعٰى শব্দের অর্থ পশু-চারণ ভূমি এবং غُثَاۤءً শব্দের অর্থ আবর্জনা যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে। احوى শব্দের অর্থ কৃষ্ণাভ গাঢ় সবুজ রং। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বীয় কুদরত ও হিকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর একে শুকিয়ে কালো রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে দিয়েছেন। এতে মানুষের পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দেহের এ সজীবতা, সৌন্দর্য, স্ফূর্তি ও চাতুর্য আল্লাহ তা'আলারই দান। কিন্তু পরিশেষে এসবই নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤى اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُ –পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও হিকমতের কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর এস্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নবুয়তের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তাঁর কাজ সহজ করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে কুরআনের কোনো আয়াত শোনাতেন, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলি বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে সাথে তা পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মুখস্থ করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, হযরত জিবরাঈর (আ.)-এর চলে যাওয়ার পর কুরআনের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করানো এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। এর ফলে فَلَا تَنْسٰۤى اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُ -অর্থাৎ আপনি কোনো বিষয় বিস্মৃত হবেন না সে অংশ ব্যতীত যা কোনো উপযোগিতার কারণে আল্লাহ তা'আলা আপনার স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চাইবেন। উদ্দেশ্য এই যে, কুরআনে কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিষ্কার দ্বিতীয় আদেশ নাজিল করা। এর আর একটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সকল মুসলমানের স্মৃতি থেকে তা মুছে দেওয়া। এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে : مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ আমি কোনো আয়াত রহিত করি অথবা আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই। কেউ কেউ اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُ -এর অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো উপযোগিতা বশত কোনো আয়াত সাময়িকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন এটা সম্ভবপর। হাদীসে আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো একটি সূরা তেলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয়ে মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মনসূখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি। (কুরতুবী) অতএব উল্লিখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সময়িকভাবে কোনো আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থি নয়।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى -এর আক্ষরিক অর্থ এই যে, আমি আপনাকে সহজ করে দেব সহজ পদ্ধতির জন্য। সহজ পদ্ধতি বলে ইসলামি শরিয়ত বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বাহ্যত এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি এ পদ্ধতি এবং এ শরিয়তকে আপনার জন্য সহজ করে দেব। কিন্তু এর পরিবর্তে কুরআন বলেছে, আপনাকে এই শরিয়তের জন্য সহজ করে দেব। এর তাৎপর্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এরূপ করে দিবেন যে, শরিয়ত আপনার মজ্জা ও স্বভাবে পরিণত হবে এবং আপনি তার ছাঁচে গঠিত হয়ে যাবেন।

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى পরবর্তী আয়াতসমূহে নবুয়তের কর্তব্য পালনে আল্লাহ প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই কর্তব্য পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাউকে এরূপ বলা যে, যদি তুমি মানুষও হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি অমুকের ছেলে হও তবে একাজ

করা উচিত। বলা বাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং কাজটি যে, অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসূ, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী উপদেশ আপনি কোনো সময় পরিত্যাগ করবেন না।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - زَكٰوةٌ -এর আসল অর্থ শুদ্ধ করা। ধন-সম্পদের জাকাতকেও এ কারণে জাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে শুদ্ধ করে। এখানে تَزَكَّى শব্দের অর্থ ব্যাপক। এতে ঈমানগত ও চরিত্রগত শুদ্ধ এবং আর্থিক জাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى অর্থাৎ তারা পালনকর্তার নাম স্মরণ করে এবং নামাজ আদায় করে। বাহ্যত এতে ফরজ ও নফল সবরকম নামাজ অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের নামাজ দ্বারা এর তাফসীর কারেছেন। তাও এতে শামিল। بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত এবং পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টি থেকে উধাও ও অনুপস্থিত। তাই অপরিণামদর্শী লোকেরা উপস্থিতকে অনুপস্থিতের উপর প্রাধান্য দিয়ে বসে, যা তাদের জন্য চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা আল্লাহর কিতাবও রাসূলগণের মাধ্যমে পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপস্থিত ও বিদ্যমান। একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে অবলম্বন কর, তা আসলে কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংসশীল। এরূপ বস্তুতে মজে যাওয়া ও তার জন্য স্বীয় শক্তি ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে : وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ তোমরা যারা দুনিয়াকে পরকালের উপর প্রাধান্য দাও, একটু চিন্তা কর যে, তোমরা কি বস্তু ছেড়ে কি বস্তু অবলম্বন করছ। যে দুনিয়ার জন্য তোমরা পাগলপারা, প্রথমত তার বৃহত্তম সুখ এবং আনন্দ ও দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রমের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, দ্বিতীয়ত তার কোনো স্থিরতা ও স্থায়িত্ব নেই। আজ যে বাদশাহ, কাল সে পথের ভিখারী। আজিকার যুবক ও বীর্যবান, আগামীকাল দুর্বল ও অক্ষম। এটা দিবারাত্রি চোখের সামনে ঘটছে। এর বিপরীতে পরকাল এসব দোষ থেকে মুক্ত। পরকালের প্রত্যেক নিয়ামত ও সুখ উৎকৃষ্টই উৎকৃষ্ট। দুনিয়ার কোনো নিয়ামত ও সুখের সাথে তার কোনো তুলনা হয় না। তদুপরি তা اَبْقٰى অর্থাৎ চিরস্থায়ী। মানুষ চিন্তা করুক, যদি তাকে বলা হয় তোমার সামনে দু'টি গৃহ আছে। একটি সুউচ্চ প্রাসাদ যা যাবতীয় বিলাসসামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত এবং অপরটি মামুলী কুঁড়েঘর, যাতে কোনো সাজসরঞ্জামও নেই। এখন হয় তুমি এই প্রাসাদোপম বাংলো গ্রহণ কর কিন্তু কেবল এক দু'মাসের জন্য এরপর একে খালি করে দিতে হবে, না হয় এই কুঁড়েঘর গ্রহণ কর, যা তোমার চিরস্থায়ী মালিকানার থাকবে। এখন প্রশ্ন এই যে, বুদ্ধিমান মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে পরকালের নিয়ামত যদি অসম্পূর্ণ নিম্নস্তরেরও হতো, তবুও চিরস্থায়ী হওয়ার কারণে তাই অগ্রাধিকারের যোগ্য ছিল। অথচ বাস্তবে যখন এই নিয়ামত দুনিয়ার নিয়ামতের মোকাবিলায় উৎকৃষ্ট, উত্তম ও চিরস্থায়ীও, তখন কোনো বোকারাম হতভাগাই এ নিয়ামত পরিত্যাগ করে দুনিয়ার নিয়ামতকে প্রাধান্য দিতে পারে।

إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولٰى صُحُفِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ এই সূরার সব বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু (অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত মূসা (আ.)-এর সহীফা সমূহে। হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাতের পূর্বে কিছু সহীফাও দেওয়া হয়েছিল। এখনে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে অথবা তওরাতও বোঝানো যেতে পারে।

ইবরাহীমী সহীফার বিষয়বস্তু : হযরত আবূযর গিফারী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা কিরূপে ছিল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এসব সহীফায় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছিল। তন্মধ্যে এক দৃষ্টান্তে অত্যাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : হে ভুঁইফোঁড় গর্বিত বাদশাহ, আমি তোমাকে ধনৈশ্বর্য স্তূপীকৃত করার জন্য রাজত্ব দান করিনি বরং আমি তোমাকে এজন্য শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছি, যাতে তুমি উৎপীড়িতের বদদোয়া আমা পর্যন্ত পৌছতে না দাও। কেননা আমার আইন এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও তা কাফেরের মুখ থেকে হয়।

অপর এক দৃষ্টান্তে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : বুদ্ধিমানের কাজ হলো, নিজের সময়কে তিনভাগে বিভক্ত করা। এক ভাগ তার পালনকর্তার ইবাদত ও তাঁর সাথে মুনাজাতের, এক ভাগ আত্মসমালোচনার ও আল্লাহর মহাশক্তি এবং কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং এক ভাগ জীবিকা উপার্জনের ও স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি মোটানোর।

আরও বলা হয়েছে : বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য এই যে, সে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবে, উদ্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং জিহ্বার হেফাজত করবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাকেও নিজের কর্ম বলে মনে করবে, তার কথা খুবই কম হবে এবং কেবল জরুরি বিষয়ে সীমিত থাকবে।

হযরত মূসা (আ.)-এর সহীফার বিষয়বস্তু : হযরত আবূযর (রা.) বলেন : অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ.)-এর সহীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এসব সহীফায় কেবল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুই ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ : আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করি, যে মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। অতঃপর সে কিরূপে আনন্দিত থাকে! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে বিধিলিপি বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিরূপে অপারক, হতোদ্যম ও চিন্তাযুক্ত হয়! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে দুনিয়া, দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের উত্থান-পতন দেখে, সে কিরূপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী। অতঃপর সে কিরূপে কর্ম পরিত্যাগ করে বসে থাকে? হযরত আবূযর (রা.) বলেন : অতঃপর আমি প্রশ্ন করলাম : এসব সহীফার কোনো বিষয়বস্তু আপনার কাছে আগত ওহীর মধ্যেও আছে কি? তিনি বলেন : হে আবূযর, এ আয়াতগুলো সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ কর- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

سَبِّحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

مَرْعٰى : জরফে মাকান। অর্থ– চারণভূমি। বিবচরণ ক্ষেত্র। জানোয়ার ও মানুষের খাদ্য অর্থাৎ শস্য, ফল, ঘাস-পাতা ইত্যাদি। মূলতঃ رَعْيٌ -এর অর্থ প্রাণীর হেফাজত করা. রক্ষাণাবেক্ষণ করা। চাই খাদ্য দিয়ে হোক কিংবা শত্রুর অনিষ্টতা হতে রক্ষা করার মাধ্যমে হোক কিংবা সুব্যবস্থাপনার দ্বারা হোক।

غُثَاءً : অর্থ– আবর্জনা, বন্যার খড় কুটা, ময়লা, ধূলা, হাড্ডির শ্লেষ্মা, ফেনা। غُثَاءٌ -এর ثاء -এর মধ্যে তাশদীদ দিয়েও ব্যবহার করা যায়। এর থেকে ফে'ল আসে। غَثَا - يَغْثُوْ - غَثْوًا বাব نَصَرَ আর غَثَا - يَغْثِيْ - غَثْيَانًا - বাব ضَرَبَ ; বাব থেকে আসে।

اَحْوٰى : অর্থ– গাঢ় লাল, কালো অন্ধকার। حَوَّةٌ থেকে নির্গত হয়েছে। মাসদার حَوًى বাব سَمِعَ

سَنُقْرِئُكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اِقْرَاءٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– আমি আপনাকে পাঠ করিয়ে দিব।

لَا تَنْسٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منفى معروف বাব سَمِعَ মাসদার نِسْيَانٌ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আপনি ভুলবেন না।

نُيَسِّرُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَيْسِيْرٌ মূলবর্ণ (ى ـ س ـ ر) জিনস مثال يائى অর্থ– আমি সুবিধা করে দিব।

اَلذِّكْرٰى : মাসদার। অর্থ– নসিহত করা, উপদেশ দেওয়া, আলোচনা করা, স্মরণ, উপদেশ। এটি ذِكْر থেকে বেশি বালাগাতপূর্ণ।

يَتَجَنَّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَجَنُّبٌ মূলবর্ণ (ج ـ ن ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– সে বিমুখ থাকে।

اَشْقٰى : اسم تفضيل অর্থ অতিশয় হতভাগ্য, বড় হতভাগা, নিতান্ত বদনসীব। মাসদার شَقَاوَةٌ অর্থ, দুর্ভাগা হওয়া। হতভাগ্য হওয়া। বাবে سَمِعَ।

تَزَكّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّزَكِّىْ মূলবর্ণ (ز ـ ك ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পবিত্রতা লাভ করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى : এখানে سَبِّحْ ফে'ল তার যমীর اَنْتَ ফায়েল, আর اِسْمَ رَبِّكَ হলো مفعول له আর الْاَعْلٰى হলো رَبِّكَ -এর সিফত, ইবনে হিশাম এটাকে اِسْمَ -এর সিফত বলা বৈধ বলেছেন, আর اَلَّذِىْ হলো رب -এর দ্বিতীয় সিফত, আর خَلَقَ বাক্যটি اَلَّذِىْ -এর সেলাহ হয়েছে। আর خَلَقَ فَسَوّٰى - خَلَقَ -এর মাফউল উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ كُلَّ شَيْءٍ আর فَسَوّٰى -এর فاء টি আতেফা। আর سَوّٰى টা خَلَقَ -এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ২৮৫-২৮৬]

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা গাশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২৬, রুকু'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনার নিকট কি সে সর্বগ্রাসী ঘটনার [অর্থাৎ কিয়ামতের] কোনো সংবাদ পৌছেছে?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾
২. বহু মুখমণ্ডল সেদিন লাঞ্ছিত হবে।	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾
৩. কষ্টভোগী [এবং কষ্টভোগের দরুন] কাতর হবে।	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾
৪. [তারা] দগ্ধকারী অগ্নিতে প্রবেশ করবে।	تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾
৫. তাদেরকে উত্তপ্ত ঝরনা হতে পানি পান করানো হবে।	تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٥﴾
৬. [এবং] কাঁটাযুক্ত গুল্ম ব্যতীত অপর কোনো খাদ্য তাদের ভাগ্যে জুটবে না।	لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٦﴾
৭. যা না পুষ্ট করবে আর না ক্ষুধা নিবারণ করবে।	لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ﴿٧﴾
৮. বহু মুখমণ্ডল সেদিন হর্ষোৎফুল্ল হবে।	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. هَلْ اَتٰىكَ আপনার নিকট কি পৌছেছে حَدِيْثُ কোনো সংবাদ الْغَاشِيَةِ সে সর্বগ্রাসী ঘটনার।

২. وُجُوْهٌ বহু মুখমণ্ডল হবে يَّوْمَئِذٍ সেদিন خَاشِعَةٌ লাঞ্ছিত।

৩. عَامِلَةٌ কষ্টভোগী نَّاصِبَةٌ কাতর হবে।

৪. تَصْلٰى (তারা) প্রবেশ করবে نَارًا حَامِيَةً দগ্ধকারী অগ্নিতে।

৫. تُسْقٰى তাদেরকে পানি পান করানো হবে مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ উত্তপ্ত ঝরনা হতে।

৬. لَيْسَ لَهُمْ তাদের ভাগ্যে জুটবে না طَعَامٌ অপর কোনো খাদ্য اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ কাঁটাযুক্ত গুল্ম ব্যতীত।

৭. لَّا يُسْمِنُ যা না পুষ্ট করবে وَلَا يُغْنِيْ আর না নিবারণ করবে مِنْ جُوْعٍ ক্ষুধা।

৮. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ বহু মুখমণ্ডল সেদিন হবে نَّاعِمَةٌ হর্ষোৎফুল্ল।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৯. নিজেদের কৃতকর্মের জন্য সন্তুষ্ট হবে।	لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾
১০. [আর তারা] উচ্চ বেহেশতে থাকবে।	فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾
১১. যাতে কোনো নিরর্থক কথাবার্তা শুনতে পাবে না।	لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾
১২. তন্মধ্যে প্রবাহিত ঝরণাসমূহ থাকবে।	فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾
১৩. তাতে উঁচু উঁচু আসনসমূহ রয়েছে।	فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾
১৪. এবং প্রস্তুত রয়েছে পানপাত্রসমূহ।	وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾
১৫. আর সারি সারি তাকিয়াসমূহ রয়েছে।	وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾
১৬. এবং সর্বদিকে গালিচাসমূহ সম্প্রসারিত রয়েছে।	وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾
১৭. তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কী [বিচিত্র] রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।	أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾
১৮. আর আসমানের দিকে যে, [তাকে] কিরূপে উচ্চ করা হয়েছে?	وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾
১৯. আর পর্বতমালার দিকে যে, কিরূপে [তাকে] দাঁড় করানো হয়েছে?	وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. لِسَعْيِهَا নিজেদের কৃত কর্মের জন্য رَاضِيَةٌ সন্তুষ্ট হবে।

১০. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (আর তারা) উচ্চ বেহেশতে থাকবে।

১১. لَا تَسْمَعُ فِيهَا যাতে শুনতে পাবে না لَاغِيَةً কোনো নিরর্থক কথাবার্তা।

১২. فِيهَا তন্মধ্যে থাকবে عَيْنٌ جَارِيَةٌ প্রবাহিত ঝরণাসমূহ।

১৩. فِيهَا তাতে রয়েছে سُرُرٌ আসনসমূহ مَرْفُوعَةٌ উঁচু উঁচু।

১৪. وَأَكْوَابٌ এবং পানপাত্রসমূহ مَوْضُوعَةٌ প্রস্তুত রয়েছে।

১৫. وَنَمَارِقُ আর তাকিয়াসমূহ রয়েছে مَصْفُوفَةٌ সারি সারি।

১৬. وَزَرَابِيُّ এবং সর্ব দিকে গালিচাসমূহ مَبْثُوثَةٌ সম্প্রসারিত রয়েছে।

১৭. أَفَلَا يَنْظُرُونَ তবে তারা কি লক্ষ্য করে না যে إِلَى الْإِبِلِ উটের দিকে كَيْفَ خُلِقَتْ কিরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৮. وَإِلَى السَّمَاءِ আর আসমানের দিকে যে كَيْفَ رُفِعَتْ কিরূপে উচ্চ করা হয়েছে।

১৯. وَإِلَى الْجِبَالِ আর পর্বতমালার দিকে যে كَيْفَ نُصِبَتْ কিরূপে (তাকে) দাঁড় করানো হয়েছে।

২০. আর জমিনকে যে, কিভাবে [তাকে] সম্প্রসারিত করা হয়েছে?	وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾
২১. সুতরাং আপনি [কেবল] উপদেশ দিতে থাকুন; কেননা আপনি তো কেবল উপদেষ্টা মাত্র।	فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾
২২. আপনি তাদের উপর দায়গ্রস্ত অধিকারী [নিযুক্ত] নন।	لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾
২৩. কিন্তু যে বিমুখ হবে এবং কুফরি করবে।	اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾
২৪. তবে আল্লাহ তাকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন।	فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿٢٤﴾
২৫. আমারই নিকট তাদের আসতে হবে।	اِنَّ اِلَيْنَاۤ اِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾
২৬. অতঃপর তাদের হতে হিসাব নেওয়া আমারই কাজ।	ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. وَاِلَى الْاَرْضِ আর জমিনকে যে كَيْفَ سُطِحَتْ কিভাবে (তাকে) সম্প্রসারিত করা হয়েছে।
২১. فَذَكِّرْ সুতরাং আপনি উপদেশ দিতে থাকুন اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّرٌ কেননা আপনি তো কেবল উপদেষ্টা মাত্র।
২২. لَسْتَ عَلَيْهِمْ আপনি তাদের উপর নন بِمُصَيْطِرٍ দায়গ্রস্ত অধিকারী।
২৩. اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى কিন্তু যে বিমুখ হবে وَكَفَرَ এবং কুফরি করবে।
২৪. فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ আল্লাহ তাকে প্রদান করবেন الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ অত্যন্ত কঠোর শাস্তি।
২৫. اِنَّ اِلَيْنَاۤ আমারই নিকট اِيَابَهُمْ তাদের আসতে হবে।
২৬. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا অতঃপর আমারই কাজ حِسَابَهُمْ তাদের থেকে হিসাব নেওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম আয়াতের اَلْغَاشِيَةُ শব্দটি এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ২৬টি আয়াত, ২৯০টি বাক্য এবং ৩৮১টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ প্রমাণ করে যে, এটাও মক্কার প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এটা নাজিল হয়েছিল তখন, যখন নবী করীম ﷺ দীন প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। আর মক্কার লোকেরা শুনে উপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করেছিল। এর প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব প্রবল হচ্ছিল।

সূরার বিষয়বস্তু ও মূলকথা : সূরাটির প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো– তাওহীদ ও পরকাল। সর্বপ্রথম মানুষকে শঙ্কিত করার উদ্দেশ্য সহসা তাদের সম্মুখে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা কি খবর রাখ সে সময়ের যখন সমগ্র জগত আচ্ছন্নকারী এক মহাবিপদ এসে পড়বে? পরে এর বিস্তারিত জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তখন সমস্ত মানুষ দুটি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দু'টি ভিন্নতর পরিণতির সম্মুখীন হবে। একটি দল জাহান্নামে যাবে। তাদেরকে নানাবিধ আজাব ভোগ করতে হবে। অন্যদিকে অপর দল উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে নানা রকম নিয়ামত দেওয়া হবে। চিরদিন তারা তথায় থাকবে।

কথার মোড় পাল্টিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কুরআনের তাওহীদ শিক্ষা ও পরকাল সংক্রান্ত সংবাদ শুনে যারা নাক ছিটকায়, বিরক্তি প্রকাশ করে তারা কি তাদের সম্মুখে প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত ঘটনাবলি লক্ষ্য করে দেখে না? তারা কি একটু

ভেবে দেখে না যে, কে মরুভূমির উপযোগী করে উষ্ট্রীকে সৃষ্টি করেছেন? উর্ধ্বলোকে এ আকাশ কিভাবে চতুর্দিক আচ্ছন্ন ও পরিবেষ্টন করে আছে? সম্মুখে ঐ পাহাড় কিভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে? নিম্নের ধরণীতল কি করে বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে? এ সব কোনো মহাশক্তিমান, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর ও সুবিজ্ঞ সুনিপুণ শিল্পীর অপূর্ব দক্ষতা ছাড়া সম্ভবপর হয়েছে কি? এক সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও অসীম ক্ষমতা বলে এ সব তৈরি করেছেন। এ ব্যাপারে অপর কেউই তাঁর শরিক নেই। এটা হতে প্রমাণিত হয় তিনি পুনরুত্থানে সক্ষম। অতঃপর কাফেরদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, এ লোকেরা এহেন যুক্তি সঙ্গত ও বিবেক সম্মত কথা যদি না-ই মানে, তো না মানুক। আপনাকে এদের উপর জবরদস্তিকারী, বানিয়ে পাঠানো হয়নি। কাজেই জোর করে তাদের দ্বারা কোনো কথা স্বীকার করানোর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আপনার কাজ হলো শুধু উপদেশ দিয়ে যাওয়া। কাজেই আপনি তাই কারতে থাকুন। শেষ পর্যন্ত আমার নিকটই তাদেরকে ফিরে আসতে হবে। আমি তাদের নিকট হতে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব গ্রহণ করাবো এবং কাফের ও পাপিষ্ঠদেরকে কঠোর শাস্তি দিবো। অতএব, আপনি তাদের ব্যাপারে অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ে নিজের মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করবেন না; বরং আপনি নিশ্চিত মনে আপনার দায়িত্ব পালন করে যান।

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (৭)

শানে নুযূল : জাহান্নামীরা "যরী" ব্যতীত অন্য কোনো খাবার পাবে না। কথা শুনে কাফের মুশরিকরা বলতে লাগল যে, আমাদের উট গুলোতো যরী খেয়েই এত মোটা-তাজা হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কাফের মুশরিকদের এহেন বিদ্রূপাত্মক উক্তি করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৩১/২০ ফতহুল কাদীর ৪২৯/৫]

বাশশার হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জান্নাতে যা কিছু রয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত রাসূল ﷺ যখন বয়ান করেন, তখন পথ ভ্রষ্ট দলের লোকেরা আর্শ্চয হলো। তাদের এহেন আর্শ্চয বোধতার নিরসন করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[তাবারী ৫৫৬/১২, কুরতুবী ৩৩/২০]

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (১৭)

শানে নুযূল : যখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিভিন্ন জিনিসের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন। তখন পথভ্রষ্ট লোকেরা তাতে অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ কিয়ামতের দিন মু'মিন ও কাফের আলাদা আলাদা বিভক্ত দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাফেরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তা خَاشِعَةٌ অর্থাৎ হেয় হবে। خُشُوعٌ শব্দের অর্থ নত হওয়া ও লাঞ্ছিত হওয়া। নামাজে খুশুর অর্থ আল্লাহর সামনে নত হওয়া, হেয় হওয়া। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর সামনে খুশু অবলম্বন করেনি, কিয়ামতে এর শাস্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে : نَاصِبَةٌ - عَامِلَةٌ –বাকপদ্ধতিতে অবিরাম কর্মের কারণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে عَامِلَةٌ এবং ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় نَاصِبَةٌ –বলা বাহুল্য, কাফেরদের এ দু'অবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা পরকালে কোনো কর্ম ও মেহনত নেই। তাই কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন : প্রথম অবস্থা অর্থাৎ মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত হওয়া তো পরকালে হবে এবং পরবর্তী দু'অবস্থা কাফেরদের দুনিয়াতেই হয়। কেননা অনেক কাফের দুনিয়াতে মুশরিকসুলভ ইবাদত এবং বাতিল পন্থায় অধ্যাবসায় ও সাধনা করে থাকে। হিন্দু, যোগী ও খ্রিস্টান পাদ্রী অনেক এমন আছে, যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ তা'আলারই সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াতে ইবাদত ও সাধনা করে থাকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করে। কিন্তু এসব ইবাদত মুশরিকসুলভ ও বাতিল পন্থায় হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে ছওয়াব ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না। অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রইল এবং পরকালে তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রাখবে।

হযরত হাসান বসরী (র.) বর্ণনা করেন, খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) যখন শাম দেশে সফরে গমন করেন, তখন জনৈক খ্রিস্টান বৃদ্ধ পাদ্রী তাঁর কাছে আগমন করে। সে তার ধর্মীয় ইবাদত, সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশি আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের মধ্যেও কোনো শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন : এই বৃদ্ধের করুণ অবস্থা দেখে আমি ক্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারা স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য জীবনপথ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে কিন্তু সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। অতঃপর খলীফা হযরত ওমর (রা.) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ –আয়াত তেলাওয়াত করলেন। –[কুরতুবী]

نَارًا حَامِيَةً - حَامِيَةٌ শব্দের অর্থ গরম, উত্তপ্ত। অগ্নি স্বভাবতই উত্তপ্ত। এর সাথে উত্তপ্ত বিশেষণ যুক্ত করা একথা বলার জন্য যে, এই অগ্নির উত্তাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোনো সময় কম অথবা নিঃশেষ হয় না বরং এটা চিরন্তন উত্তপ্ত।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ –অর্থাৎ যরী ব্যতীত জাহান্নামীরা কোনো খাদ্য পাবে না। যরী পৃথিবীর এক প্রকার কণ্টকবিশিষ্ট ঘাস যা মাটিতেই ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্তু-জানোয়ার এর ধারেকাছেও যায় না।

জাহান্নামে ঘাস, বৃক্ষ কিরূপে হবে : এখানে প্রশ্ন হয় যে, ঘাস-বৃক্ষ তো আগুনে পুড়ে যায়। জাহান্নামে এগুলো কিরূপে থাকবে? জবাব এই যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে এগুলোকে পানি ও বায়ু দ্বারা লালন করেছেন। তিনি জাহান্নামে এগুলোকে অগ্নিতে পরিণত করতেও সক্ষম; ফলে আগুনেই বাড়বে, ফলন্ত হবে।

কুরআনে জাহান্নামীদের খাদ্য সম্পর্কে যরী ব্যতীত যাক্‌কূম ও গিস্‌লীনেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সীমিত করে বলা হয়েছে যে, যরী ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্য থাকবে না। এর অর্থ এই যে, জাহান্নামীরা কোনো সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য পাবে না বরং যরীর মতো কষ্টদায়ক বস্তু খেতে দেওয়া হবে। অতএব, যাক্‌কূম এবং গিসলীনও যরীর অন্তর্ভুক্ত। কুরতুবী বলেন : সম্ভবত জাহান্নামীদের বিভিন্ন স্তর থাকবে এবং বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন খাদ্য হবে–কোথাও যরী, কোথাও যাক্‌কূম এবং কোথাও গিসলীন।

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ –জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যরী–একথা শুনে কোনো কোনো কাফের বলতে থাকে যে, আমাদের উট তো যরী খেয়ে খুব মোটাতাজা হয়ে যায়। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার যরী দ্বারা জাহান্নামের যরীকে বোঝার চেষ্টা করো না। জাহান্নামের যরী খেয়ে কেউ মোটাতাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً –অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতীরা কোনো অসার ও মর্মন্তুদ কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মিথ্যা, কুফরি কথাবার্তা, গালিগালাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا –অর্থাৎ তারা জান্নাতে কোনো অনর্থক ও দোষারোপের কথা শুনবে না। আরও কতিপয় আয়াতে এ বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে।

এ থেকে জনা গেল যে, দোষরোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই পীড়াদায়ক। তাই জান্নাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

কতিপয় সামাজিক রীতিনীতি : وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ - أَكْوَابٌ শব্দটি كُوبٌ-এর বহুবচন। অর্থ পানপাত্র, যথা গ্লাস ইত্যাদি। مَوْضُوعَةٌ অর্থাৎ নির্দিষ্ট জায়গায় পানির সন্নিকটে রক্ষিত থাকবে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পানপাত্র পানির কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা উচিত। যদি এদিক-সেদিক থাকে এবং পানি পান করার সময় তালাশ করতে হয়, তবে এটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই সব ব্যবহারের বস্তু–যেমন বদনা, গ্লাস, তোয়ালে ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা এবং ব্যবহারের পর সেখানেই রেখে দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই যত্নবান হওয়া উচিত যাতে অন্যদের কষ্ট না হয়। জান্নাতীদের পানপাত্র পানির কাছে রক্ষিত থাকবে –একথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ –কিয়ামতের অবস্থা এবং মু'মিন ও কাফেরের প্রতিদান এবং শাস্তি বর্ণনা করার পর কিয়ামতে অবিশ্বাসী হঠকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার কথা বলেছেন। আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য। এখানে মরুচারী আরবদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা উটে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তে সফর করে। তখন তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূপৃষ্ঠ এবং অগ্র-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা। এই চারটি বস্তু সম্পর্কেই তাদেরকে চিন্তাভাবনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য নিদর্শন বাদ দিয়ে যদি এ চারটি বস্তু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়, যা প্রতিনিয়ত তাদের সামনে রয়েছে। তবে আল্লাহর অপার কুদরত চাক্ষুষ দেখা যাবে।

জন্তুদের মধ্যে উটের এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যা বিশেষভাবে চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও কুদরতের দর্পণ হতে পারে। প্রথমত আরবে দেহাবয়বের দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ জীব হচ্ছে উট। সে দেশে হাতী নেই। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা এই বিশাল বপু জীবকে এমন সহজলভ্য করেছেন যে, আরবের বেদুইন ও দারিদ্রতম ব্যক্তিও এই বিরাট জীবকে লালন-পালন করতে মোটেই অসুবিধা বোধ করে না। কারণ একে ছেড়ে দিলে নিজে নিজেই পেটভরে খেয়ে চলে আসে। উঁচু বৃক্ষের পাতা ছিঁড়ে দেওয়ার কষ্টও স্বীকার করতে হয় না। সে নিজেই বৃক্ষের ডাল খেয়ে খেয়ে দিনাতিপাত করে। হাতী ও অন্যান্য জীবের ন্যায় তাকে দুর্মূল্য খাবার দিতে হয় না। আরবের প্রান্তরে পানি খুবই দুষ্প্রাপ্য বস্তু। সর্বত্র সর্বদা পাওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা উটের পেটে একটি রিজার্ভ টাংকী স্থাপন করেছেন। সে সাত-আট দিনের পানি একবারে পান করে এক টাংকীতে ভরে নেয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে সে এই রিজার্ভ পানি ব্যয় করে। এত উঁচু জীবের পিঠে সওয়ার হওয়ার জন্য স্বভাবতই সিঁড়ির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার পা তিন ভাঁজে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ প্রত্যেক পায়ে দু'টি করে হাঁটু রেখেছেন। সে যখন সবগুলো হাঁটু গেড়ে বসে যায়, তখন তার পিঠে সওয়ার হওয়া ও নামা খুব সহজ হয়ে যায়। উট এত পরিশ্রমী যে, সব জীবের চেয়ে অধিক বোঝা বহন করতে পারে। আরবের প্রান্তরসমূহে অসহনীয় রৌদ্রতাপের কারণে দিবাভাগে সফর করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তাই আল্লাহ তা'আলা এই জীবকে

সারারাত্রি সফরে অভ্যস্ত করে দিয়েছেন। উট এত নিরীহ প্রাণী যে, একটি ছোট বালিকাও তার নাকরশি ধরে যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এছাড়া আল্লাহর কুদরতের সবক দেয় এমন আরও বহু বৈশিষ্ট্য উটের মধ্যে রয়েছে। সূরার উপসংহারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে : لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ –অর্থাৎ আপনি তাদের শাসক নন যে, তাদেরকে মু'মিন করতেই হবে। আপনার কাজ শুধু প্রচার করা ও উপদেশ দেওয়া। এতটুকু করেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদের হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদান আমার কাজ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

غَاشِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার غِشَاوَةٌ মূলবর্ণ (غ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সর্বগ্রাসী, সকল দিক থেকে বেষ্টনকারী শাস্তি।

نَاصِبَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার نَصْبٌ মূলবর্ণ (ن - ص - ب) জিনস صحيح অর্থ– কাতর। অক্ষম, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি।

تَصْلَى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার صَلْيٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– প্রবেশ করবে।

حَامِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার حَمْىٌ মূলবর্ণ (ح - م - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– দগ্ধকারী অগ্নি।

اٰنِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَنْىٌ মূলবর্ণ (ا - ن - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– উত্তপ্ত।

ضَرِيْعٍ : কন্টকময় গাছ। কাটা। সহীহ বুখারীতে আছে, ضَرِيْعٌ -এক প্রকার ঘাস যাকে শিবরাক বলা হয়। এ ঘাস যখন শুকিয়ে যায়, তখন আরবরা একে ضَرِيْعٌ বলে থাকে। যেগুলো উট ভক্ষণ করে।

لَا يُسْمِنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِسْمَانٌ মূলবর্ণ (س - م - ن) জিনস صحيح অর্থ– না পুষ্ট করবে।

نَاعِمَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার نُعُوْمَةٌ মূলবর্ণ (ن - ع - م) জিনস صحيح অর্থ– হর্ষোৎফুল্ল, আনন্দ। সন্তুষ্ট ও সজীবতা।

لَاغِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার لَغْوٌ মূলবর্ণ (ل - غ - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– নিরর্থক কথাবার্তা, অর্থহীন।

نَمَارِقُ : نُمْرُقَةٌ -এর বহুবচন অর্থ– ঠেস, বালিশ, তাকিয়া, نَمْرَقَةٌ ও نَمْرَقٌ ছোট তাকিয়া, জ্বিন-পালং, অল্প বৃষ্টি ভরা মেঘ। (কামূস)। হেলান দেওয়ার বালিশ। (মহল্লী, রূহুল মা'আনী)

مَصْفُوْفَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার صَفٌّ মূলবর্ণ (ص - ف - ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সারিসারি। কাতারে বিন্যস্ত, সোজাসুজি।

اِيَابَهُمْ : তাদের প্রত্যাবর্তন, তাদের ফিরে আসা। মাসদার إِيَابٌ বাব نَصَرَ।

سُطِحَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَتَحَ মাসদার سَطْحٌ মূলবর্ণ (س - ط - ح) জিনস صحيح অর্থ– সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

مُصَيْطِرٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَيْعَلَةٌ মাসদার صَيْطَرَةٌ মূলবর্ণ (ص - ط - ر) জিনস صحيح অর্থ– দায়গ্রস্ত অধিকার।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اِلَيْنَا হলো خبر مقدم আর اِيَابَهُمْ হলো اسم موخر আর ثُمَّ হলো হরফে আতফ। আর اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল عَلَيْنَا হলো خبر مقدم এবং حِسَابَهُمْ হলো اسم مقدم –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ২৯৭]

سُوْرَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ফাজ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৩০, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. শপথ ফজরের।	وَالْفَجْرِ ﴿١﴾
২. আর [জিলহজের] দশ রাত্রির।	وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾
৩. আর জোড় ও বেজোড়ের [অর্থাৎ জিলহজের দশম ও নবম তারিখের]।	وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾
৪. আর রাত্রির শপথ যখন তা গমন করতে থাকে।	وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾
৫. নিশ্চয় তাতে জ্ঞানবানদের জন্য যথেষ্ট শপথ রয়েছে।	هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ﴿٥﴾
৬. আপনার কি জানা নেই যে, আপনার প্রতিপালক 'আদ সম্প্রদায়ের সাথে কী ব্যবহার করেছেন?	اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾
৭. অর্থাৎ ইরাম সম্প্রদায়ের সাথে, যাদের অবয়ব থামের মতো [লম্বা সুদৃঢ়] ছিল।	اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾
৮. [সমগ্র দুনিয়ার] নগরসমূহে যাদের সদৃশ কোনো মানুষ সৃষ্ট হয়নি।	الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالْفَجْرِ শপথ ফজরের।
২. وَلَيَالٍ عَشْرٍ আর (জিলহজের) দশ রাত্রির।
৩. وَالشَّفْعِ আর জোড় وَالْوَتْرِ ও বেজোড়ের।
৪. وَالَّيْلِ আর রাত্রির শপথ اِذَا يَسْرِ যখন তা গমন করতে থাকে।
৫. هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ নিশ্চয় তাতে যথেষ্ট শপথ রয়েছে لِّذِيْ حِجْرٍ জ্ঞানবানের জন্য।
৬. اَلَمْ تَرَ আপনার কি জানা নেই যে كَيْفَ فَعَلَ কী ব্যবহার করেছেন رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক بِعَادٍ আদ সম্প্রদায়ের সাথে।
৭. اِرَمَ অর্থাৎ ইরাম সম্প্রদায়ের সাথে ذَاتِ الْعِمَادِ যাদের অবয়ব থামের মতো ছিল।
৮. الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ কোনো মানুষ সৃষ্ট হয়নি مِثْلُهَا তাদের সদৃশ فِي الْبِلَادِ নগরসমূহে।

অনুবাদ	আয়াত
৯. আর ছামূদের সাথে যারা ওয়াদিল কোরাতে [পর্বতের] প্রস্তরসমূহ কাটত [এবং গৃহ নির্মাণ করত]।	وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾
১০. আর কীলকের অধিকারী ফেরাউনের সাথে।	وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ﴿١٠﴾
১১. যারা নগরসমূহে সীমালঙ্ঘন করেছিল।	الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ ﴿١١﴾
১২. এবং তাতে বহু ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে রেখেছিল।	فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾
১৩. অনন্তর আপনার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির চাবুক বর্ষণ করেছিলেন।	فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾
১৪. নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে রয়েছেন। [অর্থাৎ বান্দার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।]	اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾
১৫. অনন্তর মানুষকে যখন তার প্রভু পরীক্ষা করেন, অর্থাৎ [দুনিয়াতে] তাকে সম্মান ও সম্পদ দান করেন, তখন সে [গর্ব করে] বলে আমার প্রভু আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।	فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾
১৬. আর যখন তাকে [অন্যভাবে] পরীক্ষা করেন, অর্থাৎ তার জন্য তার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, আমার প্রভু আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন।	وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَهَانَنِ ﴿١٦﴾
১৭. কখনো এরূপ নয়, বরং তোমরা এতিমের সম্মান করো না।	كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَثَمُوْدَ আর ছামূদের সাথে الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ যারা প্রস্তরসমূহ কাটত بِالْوَادِ ওয়াদিল কোরাতে।

১০. وَفِرْعَوْنَ আর ফেরাউনের সাথে ذِى الْاَوْتَادِ কীলকের অধিকারী।

১১. الَّذِيْنَ طَغَوْا যারা সীমালঙ্ঘন করেছে فِى الْبِلَادِ নগরসমূহে।

১২. فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ এবং তাতে বহু ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে রেখেছিল।

১৩. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ অনন্তর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলেন رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক سَوْطَ عَذَابٍ শাস্তির চাবুক।

১৪. اِنَّ رَبَّكَ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক لَبِالْمِرْصَادِ পর্যবেক্ষণ ঘাঁটতি রয়েছেন।

১৫. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ অনন্তর মানুষকে اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ যখন তার প্রভু পরীক্ষা করেন فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ অর্থাৎ তাকে সম্মান ও সম্পদ দান করেন فَيَقُوْلُ তখন সে বলে رَبِّىْٓ اَكْرَمَنِ আমার প্রভু আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

১৬. وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ অর্থাৎ তার জন্য তার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেন فَيَقُوْلُ তখন সে বলে رَبِّىْٓ اَهَانَنِ আমার প্রভু আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন।

১৭. كَلَّا কখনো এরূপ নয় بَلْ বরং لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ তোমরা এতিমের সম্মান করো না।

১৮. আর অপরকেও মিসকিনদেরকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করো না।	وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾
১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারীত্ব সম্পদ আয়ত্ত করে পূর্ণটুকু খেয়ে ফেল।	وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾
২০. আর তোমরা ধন-সম্পদের অত্যধিক মায়া রাখ।	وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾
২১ কখনো এরূপ নয়, যে সময়ে জমিনকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে।	كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾
২২. আর আপনার প্রতিপালক এবং দলে দলে ফেরেশতাগণ [হাশরের মাঠে] আগমন করবেন।	وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾
২৩. আর সেদিন দোজখকে আয়ন করা হবে, ঐদিন মানুষের বুঝে আসবে, আর তখন বুঝে আসার সুযোগ থাকল কোথায় [অর্থাৎ তখন বুঝে লাভ কী?]	وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾
২৪. অতঃপর বলতো, হায়! যদি আমি আমার এই [পরকালের] জীবনের জন্য কোনো কাজ পূর্বে পাঠিয়ে রাখতাম।	يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾
২৫. অনন্তর সেদিন আল্লাহর শাস্তির ন্যায় কেউ শাস্তি প্রদানকারী হবে না।	فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾
২৬. আর না তার বন্ধনের ন্যায় কেউ বন্ধনকারী হবে।	وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾
২৭. হে নফসে মুত্মাইন্না! [অর্থাৎ শান্তিময় আত্মা]।	يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ, আর অপরকেও উৎসাহিত করো না عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ মিসকিনদের খাদ্য দানে।

১৯. وَتَأْكُلُوْنَ, আর তোমরা খেয়ে ফেল التُّرَاثَ উত্তরাধিকারিত্ব সম্পদ اَكْلًا لَّمًّا। পূর্ণটুকু আয়ত্ব করে।

২০. وَتُحِبُّوْنَ আর তোমরা মায়া রাখ الْمَالَ ধন-সম্পদের حُبًّا جَمًّا অত্যধিক মায়া।

২১. كَلَّا কখনো এরূপ নয় اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ যে সময় জমিনকে ভেঙ্গে করে দেওয়া হবে دَكًّا دَكًّا চূর্ণ বিচূর্ণ।

২২. وَجَآءَ আর আগমন করবেন رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক وَالْمَلَكُ, এবং ফেরেশতাগণ صَفًّا صَفًّا দলে দলে।

২৩. وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ, সেদিন আনয়ন করা হবে بِجَهَنَّمَ দোজখকে يَوْمَئِذٍ ঐদিন يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ মানুষের বুঝে আসবে وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى, আর তখন বুঝে আসার সুযোগ রইল কোথায়?

২৪. يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ অতঃপর বলতো হায় قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ যদি আমি আমার এই জীবনের জন্য কোনো কাজ পূর্বেই পাঠিয়ে রাখতাম।

২৫. فَيَوْمَئِذٍ অনন্তর সেদিন لَا يُعَذِّبُ শাস্তি প্রদানকারী হবে না عَذَابَهٗ আল্লাহর শাস্তির ন্যায় اَحَدٌ কেউ।

২৬. وَلَا يُوْثِقُ, আর না বন্ধনকারী হবে وَثَاقَهٗ, তার বন্ধনের ন্যায় اَحَدٌ কেউ।

২৭. يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ হে নফসে মুতমাইন্না (শান্তিময় আত্মা)।

২৮. তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে চল, এভাবে যে তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট ।	ارْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
২৯. অনন্তর তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও ।	فَادْخُلِي فِي عِبَٰدِي ﴿٢٩﴾
৩০. আর আমার বেহেশতে প্রবেশ কর ।	وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. ارْجِعِيٓ তুমি চল এইভাবে যে إِلَىٰ رَبِّكِ তোমার প্রতিপালকের দিকে رَاضِيَةً তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট مَّرْضِيَّةً এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট ।

২৯. فَادْخُلِي অনন্তর তুমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও فِي عِبَٰدِي আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে ।

৩০. وَادْخُلِي আর প্রবেশ কর جَنَّتِي আমার বেহেশতে ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে । এতে ৩০টি আয়াত, ১৩৯টি বাক্য এবং ৫৯৭টি অক্ষর রয়েছে ।

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : এর বিষয়বস্তু ও আলোচিত কথা হতে বুঝা যায় যে, মক্কায় যখন ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর জুলুম-অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালানো শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাজিল হয় । এ কারণে সূরাটিতে মক্কার লোকদেরকে 'আদ, ছামূদ ও ফেরাউনের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে ।

সূরার শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যোবায়ের ও আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) প্রমুখ সাহাবী ও তাফসীরকারদের মতে এ সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছিল । আরবের অধিবাসীরা একসময় বলেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষের ভালো বা মন্দ কাজের জন্য সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হতেন, তবে ইহলোকেই তো তার জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করতেন । তিনি যখন ইহলোকে কিছু করছেন না, তখন পরলোকেও কিছু করবেন না । পুনরুজ্জীবন, হাশর-নশর, শাস্তি ও পুরস্কার এক ভিত্তিহীন উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয় । অবিশ্বাসীদের এ সকল উক্তির জবাবেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরা নাজিল করেন ।

সূরার আলোচ্য বিষয় : আলোচ্য সূরায় পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের আলোচনা করা হযেছে । কেননা মক্কাবাসীরা এটা বিশ্বাস করত না । এ উদ্দেশ্যে সূরাটিতে ক্রমাগত ও পর পর যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে । এখানে সে পুরস্কার অনুযায়ী যুক্তিসমূহ বিবেচনার দাবি রাখে ।

সূরাটির শুরুতেই ফজর, দশ রাত, জোড়-বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের শপথ করা হয়েছে এবং শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তোমরা যে কথাকে মান্য করছ না, এর সত্যতার সাক্ষী এবং প্রমাণ হিসাবে এ জিনিসগুলো কি যথেষ্ট নয়?

এর পর মানুষের ইতিহাস হতে যুক্তি পেশ করা হয়েছে । ইতিহাস খ্যাত 'আদ, ছামূদ ও ফেরাউনের মর্মান্তিক পরিণতি পেশ করে বলা হয়েছে যে, এরা যখন সীমালঙ্ঘন করল এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করল, তখনই আল্লাহর আজাবের চাবুক তাদের উপর বর্ষিত হলো । এটা হতে বোধগম্য হয় যে, এক মহাবিজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ কুশলী শাসক এর উপর রাজত্ব করছেন । বুদ্ধি-বিবেক ও নৈতিক অনুভূতি দিয়ে যাকে তিনি এ জগতে ক্ষমতা চালানোর এখতিয়ার দিয়েছেন । তার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা, তার নিকট হতে যাবতীয় কাজের হিসাব গ্রহণ করা এবং এর ভিত্তিত তাকে শাস্তি বা ভালো প্রতিফল দান করা তাঁরই এক অপরিবর্তনীয় নীতি । এরপর মানব সমাজের নৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়েছে । আরবে তো তখন নৈতিক অবস্থার ছিল চরম দুর্দিন । এ অবস্থার দু'টি দিকের সমালোচনা করা হয়েছে । একটি হলো লোকদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি । এর দরুনই তারা নৈতিকভাবে ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে নিছক বৈষয়িক প্রতিপত্তিকেই মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছিল । ধন-সম্পদ দান করে অথবা এটা ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহ যে শুধু মানুষকে পরীক্ষা করতে চান তা তারা সম্পূর্ণ ভুলেই বসেছিল ।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে– পিতার মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এতিম সন্তান চরমভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। গরিবের পৃষ্ঠপোষক কোথাও কেউ নেই। সুযোগ পেলেই তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়, অর্থ লোভ এক অতৃপ্ত পিপাসার মতো মানুষকে পেয়ে বসেছে। যত সম্পদই করায়ত্ত হোক না কেন, মানুষের ধনক্ষুধা কোনো ক্রমেই চরিতার্থ হয় না। এটাই হলো মানব সামাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থা। এটা দ্বারা মানুষের মনে এ জিজ্ঞাসার জন্ম দেওয়া হয়েছে যে, এরপরও তাদেরকে শুভ প্রতিফল ও শাস্তির সম্মুখীন না করে ছেড়ে দেওয়া হবে কেন? এটা কি কোনো বিবেক সমর্থন করতে পারে? সুতরাং এর নিরিখেই সূরার শেষ পর্যায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, হিসাব-নিকাশ সেদিন অবশ্যই হবে, যেদিন আল্লাহ আল্লাহ তা'আলার আদালত কায়েম হবে। এ হিসাব-নিকাশ অমান্যকারীরা সেদিন সে কথাটি হাড়ে হাড়ে টের পাবে। যা আজ শত বুঝানোর পরও বুঝতে পারছে না। সেদিন তারা শত অনুতপ্তও হবে, কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় হবে না।

পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবনে যারা আসমানি কিতাব ও নবী-রাসূলগণের উপস্থাপিত চরম সত্যকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা সেদিন তাদের প্রতি রাজি হবেন। আর তারাও আল্লাহর দান পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। সেদিন তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের জামাতে শামিল হওয়ার এবং জান্নাতে দাখিল হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানানো হবে।

সূরাটির ফজিলত : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

"مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْفَجْرِ فِى اللَّيَالِى الْعَشَرَةِ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ غُفِرَ لَهُ وَمَنْ قَرَأَهَا فِىْ سَائِرِ الْاَيَّامِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

অর্থাৎ জিলহজ মাসের প্রথম দশ রাতে যে ব্যক্তি সূরা ফজর তেলাওয়াত করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর সর্বদা যে, এটা তেলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন এটা তার জন্য নূর হবে।

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ [١٨]

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন যে, আলোচ্য আয়াত কুদামাহ বিন মাজউন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, কুদামাহ বিন মাজউন উমাইয়া বিন খালফ্ এর তত্ত্বাবধানে ছিল। তখন সে যথাযথভাবে তাকে লালন পালন করেনি। সুতরাং এতিমের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৪৮/২০]

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ .... الاية.

শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ একদা ঘোষণা করলেন যে, যে ব্যক্তি রুমা কূপটি ক্রয় করে তা আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দিবে, তাকে আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) সে কূপটি ক্রয় করে নিলেন। রাসূল ﷺ তখন তাকে বললেন যে, তুমি তা জনকল্যাণে ওয়াকফ করে দিতে পার? তিনি বললেন, নিশ্চয় হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ তখন হযরত ওসমান (রা.)-এর ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী ২০ : ৫৮]

এ সূরায় পাঁচটি বস্তুর শপথ করে اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দুনিয়াতে তোমরা যা কিছু করছ, তার শাস্তি ও প্রতিদান অপরিহার্য ও নিশ্চিত। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

শপথের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে ফজর অর্থাৎ সোবহে-সাদেকের সময়। এখানে প্রত্যেক দিনের প্রভাতকালও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করে এবং আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। এখানে বিশেষ দিনের প্রভাতকালও বুঝানো যেতে পারে। তাফসীরবিদ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়র (রা.) থেকে প্রথম অর্থ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে ও হযরত কাতাদাহ্ (রা.) থেকে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল বর্ণিত হয়েছে। এ দিনটি ইসলামি চান্দ্র বছরের সূচনা।

কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন জিলহজ মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল। মুজাহিদ (র.) ও ইকরিমা (রা.)-এর উক্তি তাই। বিশেষ করে এদিনের শপথ করার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দিনের সাথে একটি রাত্রি সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইসলামী নিয়মানুযায়ী দিনের পূর্বে থাকে। একমাত্র 'ইয়াওমুন্নাহ্‌র' তথা জিলহজের দশম তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে কোনো রাত্রি নেই। কারণ এর পূর্বের রাত্রি এ দিনের রাত্রি নয় বরং আইনত তা আরাফারই রাত্রি। এ কারণেই কোনো হাজী যদি 'ইয়াওমে-আরাফা' তথা নবম তারিখে দিনের বেলায় আরাফাতের ময়দানে পৌছতে না পারে এবং রাত্রিতে সোবহে সাদেকের পূর্বে কোনো সময় পৌছে যায়, তবে তার আরাফাতে অবস্থান সিদ্ধ ও হজ শুদ্ধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, আরাফা দিবসের রাত্রি দু'টি–একটি পূর্বে ও একটি পরে এবং 'ইয়াওমুন্নাহর' তথা দশম তারিখের কোনো রাত্রি নেই। এদিক দিয়ে এ দিনটি সব দিনের তুলনায় বিশেষ শানের অধিকারী। –[কুরতুবী]

শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদাহ এবং মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে এতে জিলহজের প্রথম দশ রাত্রি বোঝানো হয়েছে। কেননা হাদীসে এসব রাত্রির ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইবাদত করার জন্য আল্লাহর কাছে জিলহজের দশদিন সর্বোত্তম দিন। এর প্রত্যেক দিনের রোজা এক বছর রোজার সমান এবং এতে প্রত্যেক রাত্রির ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমতুল্য। –(মাযহারী) হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ-এর তাফসীর করেছেন, জিলহজের দশদিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে وَاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী বলেন : হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, জিলহজের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং হাদীস থেকে জানা গেল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর জন্যও এই দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল।

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ –এ দু'টি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে 'জোড়' ও 'বেজোড়'। এই জোড় ও বেজোড় বলে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, আয়াত থেকে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اَلْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ –অর্থাৎ وَتْر-এর অর্থ আরাফা দিবস, (জিলহজের নবম তারিখ) এবং شَفْع- এর অর্থ ইয়াওমুন্নাহ্র [জিলহজের দশম তারিখ]।

কুরতুবী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন : এটা সনদের দিক দিয়ে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ, যাতে জোড় ও বেজোড় নামাজের কথা আছে। তাই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরিমা (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদ প্রথমোক্ত তাফসীরই অবলম্বন করেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টজগৎ বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন : وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ –অর্থাৎ আমি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি; যথা কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত ও গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বেজোড় একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সত্তার– هُوَ اللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ

وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ - يَسْرٰى অর্থ রাত্রিতে চলা। অর্থাৎ রাত্রির শপথ, যখন সে চলতে থাকে তথা খতম হতে থাকে। এই পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা গাফেল মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বলেছেন :

هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ : حِجْر-এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেওয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই حِجْر -এর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্য এসব শপথও যথেষ্ট কি না? এই প্রশ্ন প্রকৃত পক্ষে মানুষকে গাফলতি থেকে জাগ্রত করার একটি কৌশল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে, তাঁর শপথ করে কোনো বিষয় বর্ণনা করা সম্পর্কে এবং শপথের বিষয়সমূহের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়, তার নিশ্চয়তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। এখানে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়েছে, তা এই যে, মানুষের প্রত্যেক কর্মের পরকালে হিসাব হওয়া এবং তার শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। শপথের এই জবাব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের উপর আজাব আসার কথা বর্ণনা করেও একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি পরকালে হওয়া তো স্থিরীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদেরে প্রতি আজাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আজাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে– এক. আ'দ বংশ, দুই. ছামূদ গোত্র এবং তিন. ফিরাউন সম্প্রদায়। আ'দ ও ছামূদ জাতিদ্বয়ের বংশতালিকা উপরের দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। এভাবে ইরাম শব্দটি আ'দ ও ছামূদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য।

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ –এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে আ'দ-গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম আ'দকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় আ'দের তুলনায় আ'দের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে আ'দে-ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদেরকেই এখানে عَادٌ اِرَمَ শব্দ দ্বারা এবং সূরা নজমে عَادٌ الْاُوْلٰى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে : ذَاتِ الْعِمَادِ - عِمَادٌ ও عَمُوْدٌ শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদেরকে ذَاتِ الْعِمَادِ বলা হয়েছে। এই আ'দ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কুরআন পাক তাদের এই স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে : لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ অর্থাৎ এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী জাতি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সৃজিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও কুরআন তাদের দেহের মাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে উল্লেখ করেনি। ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে তাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি সম্পর্কে অদ্ভুত

ধরনের কথাবার্তা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুকাতিল (র.) থেকে তাদের উচ্চতা বার হাত তথা ১৮ ফুট বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য, তাঁরা ইসরাইলী রেওয়ায়েতদৃষ্টেই একথা বলেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : ইরাম আ'দ তনয় শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণ ذَاتِ الْعِمَادِ - কেননা এই অনুপম প্রাসাদটি বহু স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান এবং স্বর্ণরৌপ্য ও মণিমুক্ত দ্বারা নির্মিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এই নগদ বেহেশতকে পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদসহ সমভিব্যাহারে এ বেহেশতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব নাজিল হলো। ফলে সবাই ধ্বংস হলো এবং কৃত্রিম বেহেশতও ধূলিসাৎ হয়ে গেল। (কুরতুবী) এ তাফসীরের দিক দিয়ে আয়াতে আ'দ গোত্রের একটি বিশেষ আজাব বর্ণিত হয়েছে, যা শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের উপর নাজিল হয়েছে। প্রথম তাফসীর অনুযায়ী এতে আ'দ গোত্রের সমস্ত আজাবের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ - أَوْتَادٌ শব্দটি وَتَدٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কীলক। ফেরাউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। এই শব্দের মধ্যে তার জুলুম-নিপীড়ন ও শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এ কারণই প্রসিদ্ধ। ফেরাউন যার প্রতি কুপিত হতো, তার হস্তপদ চারটি কীলকে বেঁধে অথবা চার হাতপায়ে কীলক মেরে রৌদ্রে শুইয়ে দিত এবং তার দেহে সাপ, বিচ্ছু ছেড়ে দিত। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়ার ঈমান প্রকাশ করা এবং ফেরাউন কর্তৃক তাঁকে এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। –[মাযহারী]

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ –আ'দ, সামূদ ও ফেরাউন গোত্রের অপকীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের আজাবকে কশাঘাতের শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কশাঘাত যেমন দেহের বিভিন্ন অংশে হয়, তেমনি তাদের উপরও বিভিন্ন প্রকার আজাব নাজিল করা হয়।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ - مِرْصَادٌ ও مَرْصَدٌ শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টি রাখার ঘাঁটি, যা কোনো উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ বাক্যকে পূর্বোক্ত শপথ বাক্যসমূহের জবাব সাব্যস্ত করেছেন।

দুনিয়াতে জীবনোপকরণের বাহুল্য ও স্বল্পতা আল্লাহর কাছে প্রিয়পাত্র ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আলামত নয় : فَأَمَّا الْإِنْسَانُ। –আয়াতে আসলে কাফের ইনসানকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সেসব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা নিম্নরূপ ধারণায় লিপ্ত থাকে।

আল্লাহ তা'আলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধনসম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে দেয়– **এক.** সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণগরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্যপাত্র। **দুই.** আমি আল্লাহ্‌র কাছেও প্রিয়পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নিয়ামত দান করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলিল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কারণে ক্রুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পাত্র ছিল কিন্তু তাকে অহেতুক লাঞ্ছিত ও হেয় করা হয়েছে। কাফের ও মুশরিকদের মধ্যে এ ধরনের ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং কুরআন পাকে কয়েক জায়গায় তা উল্লেখও ররেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানও এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের অবস্থাই উল্লেখ করেছেন : كَلَّا –অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। দুনিয়াতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য সৎ ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত হওয়ার দলিল নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। খোদায়ী দাবি করা সত্ত্বেও ফিরাউনের কোনোদিন মাথা ব্যথাও হয়নি, অপরপক্ষে কোনো কোনো পয়গম্বরকে শত্রুরা করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, মুহাজিরগণের মধ্যে যারা দারিদ্র ও নিঃস্ব ছিল, তারা ধনী মুহাজিরগণ অপেক্ষা চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে যাবে। –(মাযহারী) অন্য এক হাদীসে আছে আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে ভালোবাসেন, তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ।–[মাযহারী]

এতিমের জন্য ব্যয় করাই যথেষ্ট নয়, তাকে সম্মান করাও জরুরি : এরপর কাফেরদের কয়েকটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ –অর্থাৎ তোমরা এতিমকে সম্মান করো না। এখানে আসলে বলা উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এতিমদের প্রাপ্য আদায় করো না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করো না। কিন্তু 'সম্মান করো না' বলার মধ্যে

ইঙ্গিত রয়েছে যে, এতিমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয়ভার বহন করলেই তোমাদের যৌক্তিক, মানবিক ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ধনসম্পদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায় না; বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে; নিজেদের সন্তানদের মোকাবিলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না। কাফেররা যে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সম্মান এবং অভাব-অনটনকে অপমান মনে করত, এটা বাহ্যত তারই জবাব। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোনো সময় অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তা এ কারণে হয় যে, তোমরা এতিমের ন্যায় দয়াযোগ্য বালক-বালিকাদের প্রাপ্যও আদায় কর না। তাদের দ্বিতীয় মন্দ অভ্যাস হলো : وَلَا تَحٰضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ অর্থাৎ তোমরা নিজেরা তো গরিব-মিসকিনকে অন্নদান করই না, পরন্তু অপরকেও এ কাজে উৎসাহিত করো না। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনী ও বিত্তশালীদের উপর যেমন গরিব-মিসকিনের হক আছে, তেমনি যারা দান করার সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপরও হক আছে যে, তারা অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে।

তৃতীয় মন্দ অভ্যাস এই যে, وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا –অর্থাৎ তোমরা হারাম ও হালাল সবরকম উত্তরাধিকারীত্ব সম্পত্তি একত্র করে খেয়ে ফেল এবং নিজের অংশের সাথে অপরের অংশও ছিনিয়ে নাও। সবরকম হালাল ও হারাম ধনসম্পদ একত্র করা নাজায়েজ কিন্তু এখানে বিশেষভাবে ওয়ারিশী সম্পত্তির কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, ওয়ারিশী সম্পত্তির দিকে বেশি দৃষ্টি রাখা ও তার পেছনে লেগে থাকা ভীরুতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। এ ধরনের লোক মৃতভোজী জন্তুদের মতোই তাকিয়ে থাকে, কবে সম্পত্তির মালিক মরবে এবং তারা সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার সুযোগ পাবে। যারা কৃতী পুরুষ, তারা নিজেদের উপার্জনেই সন্তুষ্ট থাকে এবং মৃতদের সম্পত্তির প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। চতুর্থ মন্দ অভ্যাস হচ্ছে : وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا –অর্থাৎ তোমরা ধনসম্পদকে অত্যধিক ভালোবাস। অত্যধিক বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনসম্পদের ভালোবাসা এক পর্যায়ে নিন্দনীয় নয় বরং মানুষের জন্মগত তাগিত। তবে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তাতে মজে যাওয়া নিন্দনীয়। কাফেরদের এসব মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে কিয়ামত আগমনের কথা বলা হয়েছে।

اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا – دَكًّا -এর শাব্দিক অর্থ কোনো বস্তুকে আঘাত করে ভেঙ্গে দেওয়া। এখানে কিয়ামতের ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে যা পর্বতমালাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। دَكًّا دَكًّا বারবার বলায় ইঙ্গিত হয়েছে যে, কিয়ামতের ভূকম্পন একের পর এক অভ্যাহত থাকবে।

وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا –অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে আগমন করবেন, তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۢ بِجَهَنَّمَ –অর্থাৎ সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে অর্থাৎ সামনে উপস্থিত করা হবে। এর উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে আনা হবে, তার স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তবে বাহ্যত বোঝা যায় যে, সপ্তম পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত জাহান্নাম তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে এবং সব সমুদ্র অগ্নিময় হয়ে তাতে শামিল হয়ে যাবে। এভাবে জাহান্নাম হাশরের আঙিনায় সবার সামনে এসে যাবে।

يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى – تَذَكُّرْ -এর অর্থ এখানে বুঝে আসা। অর্থাৎ কাফেররা সেদিন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে তার কি করা উচিত ছিল আর সে কি করেছে। কিন্তু তখন এই বুঝে আসা নিষ্ফল হবে। কেননা পরকাল কর্মজগৎ নয়– প্রতিদান জগৎ। অতঃপর সে يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ বলে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে যে, হায়! আমি যদি দুনিয়াতে কিছু সৎকর্ম করতাম! কিন্তু কুফর ও শিরকের শাস্তি সামনে এসে যাওয়ার পর এ আকাঙ্ক্ষায় কোনো লাভ হবে না। এখন আজাব ও পাকড়াওয়ের সময়। আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াওয়ের মতো কঠিন পাকড়াও কারো হতে পারে না। অতঃপর মু'মিনদের ছওয়াব ও জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে।

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ –এখানে মু'মিনদের রূহকে نَفْسٌ مُّطْمَئِنَّةٌ (প্রশান্ত আত্মা) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সে আত্মা, যে আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্যের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তা না করলে অশান্তি ভোগ করে। সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মন্দস্বভাব ও হীনমন্যতা দূর করেই এই স্তর অর্জন করা যায়। আল্লাহ্র আনুগত্য, জিকির ও শরিয়ত এরূপ ব্যক্তির মজ্জার সাথে একাকার হয়ে যায়। সম্বোধন করে বলা হয়েছে : اِرْجِعِىْۤ اِلٰى رَبِّكِ –অর্থাৎ নিজের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও। ফিরে যাওয়া বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, তার প্রথম বাসস্থানও পালনকর্তার কাছে ছিল। সেখানেই ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। এতে সে হাদীসের সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, মু'মিনগণের আত্মা তাদের আমলনামাসহ সপ্তম আকাশে আরশের ছায়াতলে অবস্থিত ইল্লিয়্যীনে থাকবে। সমস্ত আত্মার আসল বাসস্থান সেখানেই। সেখান থেকে এনে মানব দেহে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং মৃত্যুর পর সেখানেই ফিরে যায়

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً –অর্থাৎ এ আত্মা আল্লাহর প্রতি তাঁর সৃষ্টিগত ও আইনগত বিধি-বিধানে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা বান্দার সন্তুষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বান্দা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়ার তাওফীকই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুকালে মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَائَهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন। এই হাদীস শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন : আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ তো মৃত্যুর মাধ্যমেই হতে পারে। কিন্তু মৃত্যু আমাদের অথবা কারো পছন্দনীয় নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আসল ব্যাপার তা নয়। প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, যা শুনে মৃত্যু তার কাছে অত্যধিক প্রিয় বিষয় হয়ে যায়। এমনিভাবে মৃত্যুর সময় কাফেরের সামনে আজাব ও শাস্তি উপস্থিত করা হয়। ফলে তখন তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক মন্দ ও অপছন্দনীয় কোনো বিষয় মনে হয় না। –(মাযহারী) সারকথা বর্তমানে যে মানুষমাত্রই মৃত্যুকে অপছন্দ করে, তা ধর্তব্য নয় বরং আত্মা নির্গত হওয়ার সময়ে যে ব্যক্তি মৃত্যুতে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً -এর মর্ম তাই।

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ –প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা ধর্মপরায়ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। এ থেকে জানা যায় যে, যারা দুনিয়াতে ধার্মিক ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও সংসর্গ অবলম্বন করে, তারা যে তাদের সাথে জান্নাতে যাবে, এটা তারই আলামত। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আ.) দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন : وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ এবং হযরত ইউসুফ (আ.) দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন : وَاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ এতে বোঝা গেল, সৎসর্গ একটি মহানিয়ামত, যা পয়গম্বরগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ –এতে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে 'আমার জান্নাত' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাত কেবল চিরন্তন সুখ-শান্তির আবাসস্থলই নয় বরং সর্বোপরি এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থান।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত মু'মিনগণকে আল্লাহ তা'আলার সম্মানসূচক এ সম্বোধন কখন হবে, সে সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, কিয়ামতে হিসাব-নিকাশের পর এ সম্বোধন হবে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনার দ্বারাও এর সমর্থন হয়। কারণ পূর্বোল্লিখিত কাফেরদের আজাব কিয়ামতের পরেই হবে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'মিনদের প্রতি এ সম্বোধনও তখনই হবে। কেউ কেউ বলেন : এ সম্বোধন মৃত্যুর সময় দুনিয়াতেই হয়। অনেক হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই ইবনে কাছীর বলেছেন : উভয় সময়েই মু'মিনদের আত্মাকে এই সম্বোধন করা হবে– মৃত্যুর সময়েও এবং কিয়ামতেও।

যেসব হাদীস থেকে মৃত্যুর সময় সম্বোধন হবে বলে জানা যায়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.)-এর হাদীস। অপর একটি হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন মু'মিনের মৃত্যুর সময় আসে, তখন রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী বস্ত্র সামনে রেখে তার আত্মাকে সম্বোধন করে اُخْرُجِىْ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً اِلٰى رَوْحِ اللّٰهِ وَرَيْحَانِ اللّٰهِ অর্থাৎ তুমি আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট– এমতাবস্থায় তুমি এ দেহে থেকে বের হয়ে আস। এই বের হওয়া হবে আল্লাহর রহমত এবং জান্নাতের চিরন্তন সুখের দিকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ আয়াতখানি পাঠ করলাম। হযরত আবূ বকর (রা.) মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এটা কি চমৎকার সম্বোধন ও সম্মান প্রদর্শন! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : শুনে রাখুন, মৃত্যুর পর ফেরেশতা আপনাকে এই সম্বোধন করবে। –[ইবনে কাছীর]

কয়েকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা : হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা.) বলেন : তায়েফ নগরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ইন্তিকাল হয়। জানাযা প্রস্তুত হওয়ার পর সেখানে একটি পাখী এসে উপস্থিত হলো যার অনুরূপ পাখী কখনো দেখা যায়নি। অতঃপর পাখীটি শবাধারে ঢুকে পড়ল। এরপর কেউ তাকে বের হতে দেখেনি। অতঃপর মৃতদেহ কবরে নামানোর সময় কবরের এক পাশ থেকে একটি অদৃশ্য কণ্ঠ يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ –আয়াতখানি পাঠ করল। সবাই তালাশ করল কিন্তু কে পাঠ করল, তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না। –[ইবনে কাছীর]

ইমাম হাফেজ তাবারানী 'কিতাবুল আজায়েব' গ্রন্থে ফাত্তান ইবনে রুযাইনের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। ফাত্তান ইবনে রুযাইন বলেন : একবার রোমদেশে আমরা বন্দী হয়ে সেখানকার বাদশাহের সামনে নীত হলাম। এই কাফের বাদশাহ্ আমাদের উপর তার ধর্ম অবলম্বন করার জন্য জোর-জবরদস্তি চালাল। সে বলল : যে কেউ আমার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করবে, তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে তিন ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে বাদশাহের ধর্ম অবলম্বন করল। চতুর্থ ব্যক্তি বাদশাহের সামনে নীত হলো। সে তার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করল। সেমতে তার গর্দান কেটে মস্তকটি নিকটবর্তী একটি নহরে নিক্ষেপ করা হলো। তখন মস্তকটি পানির গভীরে চলে গেল বটে কিন্তু পরক্ষণেই পানির উপর ভেসে উঠল এবং তাদের দিকে চেয়ে প্রত্যেকর নাম নিয়ে বলতে লাগল, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ
এরপর মস্তকটি আবার পানিতে ডুবে গেল।

উপস্থিত সবাই এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখল ও শুনল। সেখানকার খ্রিস্টানরা এ ঘটনা দেখে প্রায় সবাই মুসলমান হয়ে গেল। ফলে বাদশাহের সিংহাসন কেঁপে উঠল। ধর্মত্যাগী তিন ব্যক্তি আবার মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর খলীফা আবূ জাফর মনসূর (র.) আমাদেরকে বাদশাহ্র কবল থেকে মুক্ত করে আনেন। –[ইবনে কাছীর]

শব্দ বিশ্লেষণ :

الْفَجْرِ : ইসমে ফে'ল। মাসদার। অর্থ– ফেঁটে যাওয়া, সকালের আলো প্রকাশিত হওয়া, বিদীর্ণ করে প্রবাহিত করা, গুনাহ করা। বখশিস, উদারতা, দয়া, মাল ও প্রচুর মাল। কুরআন মাজীদে এর ব্যবহার কেবল ফজরের সময় ও প্রভাত উদিত হওয়ার অর্থে হয়েছে।

لَيَالٍ : বহুবচন لَيْل وَلَيْلَةٌ একবচন। রাত্রি। মূলতঃ শব্দটি لَيَالِىٌّ ছিল। তা'লিল হয়ে يَاءٌ পড়ে গেছে। এখানে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত উদ্দেশ্য। (আহমদ ও নাসাঈতে মারফূরূপে জাবের থেকে উদ্ধৃত) মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ এবং যাহহাক প্রমুখেরও এই মত। দ্বিতীয়তঃ যাহহাকের মতে এখানে মুহাররম মাসের দশ তারিখ উদ্দেশ্য। (আ'আলিম)

اَلشَّفْعِ : জোড়া, দম্পতি, মিথুন। কোনো জিনিস তার মতোই আরেকটি জিনিসের সাথে মিলে যাওয়া। লুগাতে এ অর্থ করা হয়েছে। কিন্তু شَفْعٌ দ্বারা উদ্দেশ্য জিলহজের দশম তারিখ।

اَلْوَتْرِ : ইসম। বেজোড়। জোড়ের বিপরীত। এক কেরাতে واو এ যের দিয়ে اَلْوِتْرُ পড়া হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য জিলহজের নবম তারিখ।

يَسْرِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَرْىٌ মূলবর্ণ (س - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– গমন করতে থাকে। সে চলছে।

اِرَمَ : -এর তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতে এটি একটি গোত্রের নাম। যা প্রবীণ পুরুষ ইরম ইবনে সাম ইবনে নূহের নামে রাখা হয়েছে। এটি গাইরে মুনসারিফ। মুয়ান্নাছ হলো তার আলামত।

جَابُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার جَوْبٌ মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা কাটত। বিদীর্ণ করেছে।

اَوْتَادٌ : وَتَدٌ-এর বহুবচন। অর্থ– তীলক, পেরেক, খুঁটি।

طَغَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার طُغْيَانٌ মূলবর্ণ (ط - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সীমালঙ্ঘন করেছে, নাফরমানি করেছে।

صَبَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَبٌّ মূলবর্ণ (ص - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিনি বর্ষন করেছেন। তিনি প্রবাহিত করলেন, তিনি উপর থেকে ঢাললেন।

سَوْط : চামড়ার চাবুক। এর বহুবচন سِيَاطٌ ও سَوَاطٌ আসে। سَوْطٌ-এর মূল অর্থ হলো, কোনো বস্তু একত্রে মিলে যাওয়া। চাবুককের কড়াগুলো এমনিতেই মোচড়ানো থাকে বলে একে চাবুক বলে। ইবনে দুরাইদ বলেন, যখন বেত্রাঘাত বা চাবুক মারা হয়, তখন বেত্রাঘাতের কারণে গোস্তকে রক্তের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়। তাই চাবুককে سَوْطٌ বলা হয়।

اِبْتَلٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِلَاءٌ মূলবর্ণ (ب - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাকে পরীক্ষা করেন।

نَعَّمَهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْعِيْمٌ মূলবর্ণ (ن - ع - م) জিনস صحيح অর্থ– সম্পদ দান করেন।

قَدَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قُدْرَةٌ মূলবর্ণ (ق - د - ر) জিনস صحيح অর্থ– তিনি সংকর্ণি করেদেন, কমিয়ে দেন।

أَهَانَنِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهَانَةٌ মূলবর্ণ (ه - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন।

تَحَاضُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُحَاضَّةُ মূলবর্ণ (ح - ض - ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা উৎসাহিত করো না।

تُرَاثَ : অর্থ– মিরাস, উত্তরাধিকারী, মৃত ব্যক্তির সম্পদ। মূলতঃ শব্দটি وَارِثٌ ছিল। واو -কে تاء দ্বারা বদল করা হয়েছে।

جَمًّا : মাসদার। বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার আসে। মূলবর্ণ (ج - م - م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– মন ভরে, অনেক, অত্যধিক। প্রত্যেক প্রকারের খুশি ও অতিরিক্ত বুঝানোর জন্য আসে।

دُكَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার دَكًّا মূলবর্ণ (د - ك - ك) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে।

جِاْئَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئُ মূলবর্ণ (ج - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام এবং اجوف يائى অর্থ– আনয়ন করা হবে।

قَدَّمْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْدِيْمٌ মূলবর্ণ (ق - د - م) জিনস صحيح অর্থ– পূর্বে পাঠিয়ে রাখতাম।

لَا يُعَذِّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْذِيْبٌ মূলবর্ণ (ع - ذ - ب) জিনস صحيح অর্থ– তিনি শাস্তি দিবেন না।

لَا يُوْثِقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْثَاقٌ মূলবর্ণ (و - ث - ق) জিনস مثال واوى অর্থ– কেউ বন্ধন কারী হবে না।

ادْخُلِىْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ أمر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُخُوْلٌ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– তুমি প্রবেশের কর।

رَاضِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلرِّضْوَانُ মূলবর্ণ (ر - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তুমি সন্তুষ্ট।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ : এখানে يَا হলো হরফে নেদা, আর اَيَّةُ হলো মুনাদা যা ضمه -এর উপর مبنى হয়েছে আর ها টা تنبيه -এর জন্য। النَّفْسُ আর الْمُطْمَئِنَّةُ হলো النَّفْسُ -এর সিফত। আর ارْجِعِىْ ফেল, যমীর اَنْتِ ফায়েল আর بدل হলো اِلٰى رَبِّكِ টা ارْجِعِىْ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً টা حال হয়েছে। আর فَادْخُلِىْ টা ارْجِعِىْ -এর উপর বিন্যস্ত করা হয়েছে। আর فِىْ عِبَادِىْ টা ادْخُلِىْ -এর সাথে متعلق হয়েছে। এবং وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ টাও আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩১২]

سُوْرَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ
সূরা বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ২০, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আমি এই [মক্কা] নগরের শপথ করছি।	لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾
২. এবং আপনার জন্য এই নগরে যুদ্ধ করা বৈধ হবে।	وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾
৩. আর পিতার [আদমের] এবং সন্তান সন্ততির [সমস্ত আদম সন্তানের] শপথ।	وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ﴿٣﴾
৪. আমি মানুষকে অত্যন্ত ক্লেশের মধ্যে [ক্লেশ বিজড়িত করে] সৃষ্টি করেছি।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ﴿٤﴾
৫. সে কি এমন ধারণা করে যে, তার উপর কারো ক্ষমতা চলবে না?	اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ﴿٥﴾
৬. [যদি এরূপ না হয়, তবে সে কেন এমন ভ্রমে পড়ে আছে, এবং] বলছে যে, আমি এত অধিক মাল খরচ করে ফেলেছি।	يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾
৭. সে কি ধারণা করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?	اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٧﴾
৮. আমি কি তাকে দুটি চক্ষু প্রদান করিনি?	اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. لَآ اُقْسِمُ আমি শপথ করছি بِهٰذَا الْبَلَدِ এই (মক্কা) নগরের।

২. وَاَنْتَ حِلٌّ আপনার জন্য যুদ্ধ করা বৈধ হবে بِهٰذَا الْبَلَدِ এই নগরে।

৩. وَوَالِدٍ আর পিতার وَّمَا وَلَدَ এবং সন্তান-সন্ততির শপথ।

৪. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি فِيْ كَبَدٍ অত্যন্ত ক্লেশের মধ্যে।

৫. اَيَحْسَبُ সে কি এমন ধারণা করে যে اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ ক্ষমতা চলবেনা عَلَيْهِ اَحَدٌ তার উপর কারো।

৬. يَقُوْلُ বলছে যে اَهْلَكْتُ আমি খরচ করে ফেলেছি مَالًا لُّبَدًا এত অধিক মাল।

৭. اَيَحْسَبُ সে কি এমন ধারণা করে যে اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ তাকে কেউ দেখেনি।

৮. اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ আমি কি প্রদান করিনি عَيْنَيْنِ দুটি চক্ষু।

৯. এবং জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট?	وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝٩
১০. আর অনন্তর আমি তাকে [নেক ও বদ] উভয় পথ প্রদর্শন করেছি [যেন সে মন্দ পথ হতে বাঁচতে পারে এবং ভালো পথে চলতে পারে।]	وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝١٠
১১. অনন্তর সে [ধর্মের] ঘাঁটি-স্থল দিয়ে [পথ] অতিক্রম করল না।	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝١١
১২. আপনার কি জানা আছে যে, ঘাটি-স্থল কী বস্তু?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝١٢
১৩. [তা হলো] কোনো গর্দানকে [দাসত্ব হতে] মুক্ত করে দেওয়া।	فَكُّ رَقَبَةٍ ۝١٣
১৪. অথবা খাদ্য দান করা অনাহার বা দুর্ভিক্ষের দিনে।	اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۝١٤
১৫. কোনো আত্মীয় এতিমকে।	يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥
১৬. কিংবা ধুলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে।	اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝١٦
১৭. অতঃপর ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি যারা ঈমান এনেছে এবং একে অন্যকে [ঈমানের উপর] ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অন্যকে [আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি] সদয় হতে উপদেশ দিয়েছে।	ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝١٧

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَلِسَانًا এবং জিহবা وَّشَفَتَيْنِ ও দুটি ঠোঁট।

১০. وَهَدَيْنٰهُ আর অনন্তর আমি তাকে প্রদর্শন করেছি النَّجْدَيْنِ উভয় পথ।

১১. فَلَا اقْتَحَمَ অনন্তর সে অতিক্রম করল না الْعَقَبَةَ ঘাটি-স্থল দিয়ে।

১২. وَمَآ اَدْرٰىكَ আপনার কি জানা আছে যে مَا الْعَقَبَةُ ঘাটি-স্থল কি বস্তু?

১৩. فَكُّ رَقَبَةٍ কোন গর্দানকে মুক্ত করে দেওয়া।

১৪. اَوْ اِطْعٰمٌ অথবা খাদ্য দান করা فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ অনাহারের দিনে।

১৫. يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ কোন আত্মীয় এতিমকে।

১৬. اَوْ مِسْكِيْنًا কিংবা দরিদ্রকে ذَا مَتْرَبَةٍ ধুলায় লুণ্ঠিত।

১৭. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অতঃপর ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি যারা ঈমান এনেছে وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ এবং একে অন্যকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ এবং একে অন্যকে সদয় হতে উপদেশ দিয়েছে।

১৮. তারাই ডান দিকওয়ালা [সৌভাগ্যশীল]।	أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝١٨
১৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল তারাই বাম দিকওয়ালা [হতভাগ্য]।	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝١٩
২০. [তাদের পরিণাম এই হবে যে,] তাদের উপর অগ্নি পরিবেষ্টিত হবে যা অবরুদ্ধ করে দেওয়া হবে।	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ۝٢٠

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. أُولَٰئِكَ এরাই أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ডান দিক ওয়ালা।

১৯. وَالَّذِينَ كَفَرُوا আর যারা অস্বীকার করল بِآيَاتِنَا আমার আয়াতসমূহকে هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ তারাই বামদিক ওয়ালা।

২০. عَلَيْهِمْ نَارٌ তাদের উপর অগ্নি পরিবেষ্টিত হবে مُؤْصَدَةٌ যা অবরুদ্ধ করে দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াত لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ শব্দটিকে এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এতে ২০টি আয়াত, ৮২টি বাক্য এবং ৩২০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু হতে প্রতীয়মান হয় যে, এ সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাজিল হয়েছে। তা ছাড়া এমন সময় এটা নাজিল হয়েছিল বলে বুঝা যায় যখন নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু হয়েছিল।

সূরাটির শানে নুযূল :

১. আবুল আসাদ ইবনে কালাদাহ যাহমী কুরইশদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী বীর ছিল। তার গায়ে এত শক্তি ছিল যে, সে একটি আস্ত চামড়া পায়ের নিচে রেখে লোকদেরকে তা টেনে বের করার জন্য আহ্বান জানাত। লোকেরা তা টেনে হেঁচড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত, তথাপি এটা তার পায়ের নিচে হতে বের হতো না।
নবী করীম ﷺ যখন তাকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন সে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করল এবং বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! তুমি আমাকে যে জাহান্নামের ভয় দেখাও তার উনিশজন প্রহরীকে শায়েস্তা করার জন্য আমার বাম হাতই যথেষ্ট। আর তুমি যে জান্নাতের লোভ দেখাচ্ছ, আমি বিবাহ করে ও মেহমানদারী করে যে সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি তা তার সমানও তো হবে না। তার অনুরূপ বক্তব্যের ব্যাপারে আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।
২. কেউ কেউ বলেছেন, ওয়ালদি ইবনে মুগীরার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষিতে এ সূরাটি নাজিল হয়েছে।
৩. কারো কারো মতে, আবূ জাহলের বর্বরোচিত ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।
৪. কেউ কেউ বলেন, এটা হারিছ ইবনে আমেরের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে।
৫. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, ইরামবাসী 'আদ ও ছামূদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ শোনার পর নবী করীম ﷺ-কে মক্কার মুশরিকরা বলল, তুমি তোমার আল্লাহকে বল, তিনি যেন আমাদের উপরও 'আদ ও ছামূদ জাতির ন্যায় আজাব নাজিল করে এ শহরসহ আমাদেরকেও ধ্বংস করে দেন। তাদের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরাটি নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এটা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক প্রত্যাদেশসমূহের অন্যতম এবং অনেকের মতে নবী করীম ﷺ-এর নবুয়তের প্রথম বছরই এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে নবী করীম ﷺ-এর মক্কা বিজয়ের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এ সূরার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। এ সূরায় বহুলাংশে সৎকর্মের আলোচনা করা হয়েছে। সূরার প্রথমাংশে ভূমিকা স্বরূপ সৎকর্মের তথা দুঃখ-কষ্টের এবং মানুষের উপর আল্লাহর দানের উল্লেখ করা হয়েছে। আর পরিশিষ্টে দুষ্কর্ম ও সৎকর্মের প্রতিফলের উল্লেখ রয়েছে।

এ সূরাতে একটি অনেক বড় বক্তব্যকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন এ ক্ষুদ্রকায় সূরাটির মধ্যে অতীব মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষ ও মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক মর্যাদা বা হিসাবটা কি তা বুঝানোই হলো এ সূরার মূল বিষয়বস্তু। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের

সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য লাভের দু'টি পথই খুলে দিয়েছেন। আর সে পথে চলার উপায়-উপকরণও দিয়েছেন। মানুষ কল্যাণের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে, না অকল্যাণের পথে চলে অশুভ পরিণতি লাভ করবে, তা তার নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। এ দুনিয়া মানুষের জন্য কোনো নিশ্চিত বিশ্রামের স্থান নয়; বরং কঠোর পরিশ্রম করে পরকালের জন্য কিছু উপার্জনের স্থান। এ সত্যটি প্রমাণ করার জন্য সূরার প্রথমে মক্কা নগরে নবী করীম ﷺ -এর উপর আপতিত বিপদাপদ এবং গোটা আদম সন্তানের সঠিক অবস্থা পেশ করা হয়েছে।

অতঃপর মানুষের একটা ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। মানুষ মনে করে যে, সে যা কিছু নিশ্চিন্তে করছে তার কোনো হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে না। তার উপর কোনো শক্তিমান ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না, কোন পথে অর্থ উপার্জন করল আর কোন পথে ব্যয় করল তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে না।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, আমি মানুষকে উপলব্ধি করার পন্থা ও যোগ্যতা দিয়েছি। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উভয় পথই তার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে– সৌভাগ্যের পথ কন্টকাকীর্ণ ও দুর্গম, আর দুর্ভাগ্যের পথ মোহময় ও আকর্ষণীয়। মানুষ স্বাভাবিক দুর্বলতার কারণে দুর্ভাগ্যের পথকে বেছে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত অধঃপতিত হয়।

উপসংহারে আল্লাহ তা'আলা সৌভাগ্যমণ্ডিত উচ্চতর পথ নির্দেশ করেছেন। লোক দেখানো কার্যকলাপ ও অহংকারমূলক অর্থ ব্যয় পরিহার করে এতিম-মিসকিনের সাহায্যে অর্থ ব্যয় করা এবং ঈমানদার লোকদের দলে শামিল হয়ে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ধৈর্য সহকারে সমাজ গঠন করাই সৌভাগ্যের পথ। আর এর বিপরীতটা হলো দুর্ভাগ্য বা জাহান্নামের পথ।

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ [١] وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ [٢]

শানে নুযূল : ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আবী বারযা আসলমী (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়কালে বের হয়ে আব্দুল্লাহ বিন খাতালকে কা'বা গৃহের গেলাফে লুকিয়ে থাকতে দেখতে পেলাম, তখন রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যখানে তার মাথায় আঘাত করি। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[দুররে মানছুর ৩৫১/৬]

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ [٤] أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ [٥]

শানে নুযূল : আল্লামা কালবী (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত বনূ জুমাহা গোত্রের এক লোক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তার নাম হচ্ছে আবুল আশাদ্দীন। সে উকাযী চামড়া সংগ্রহ করে তার পদ দ্বয়ের নিচে রেখে বলল যে, তা হতে স্থানান্তর করতে পারে এমন কেউ আছে কী? যদি থাকে তাকে অমুক পুরস্কার দেওয়া হবে। তখন তাকে দশজন লোক টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তবে তার পা দু'টিকে নাড়াতে পারেনি। পক্ষান্তরে সে ছিল হযরত নবী করীম ﷺ-এর পরম শত্রু। সেই নরাধম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতদ্বয় নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৫৭/২০]

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ : এখানে لا অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং আরবি বাকপদ্ধতিতে এর অতিরিক্ত ব্যবহার সুবিদিত। অধিক বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্য এই لا শপথ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল তোমার ধারণা নয়; বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। اَلْبَلَدُ (নগরী) বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা ত্বীনেও এমনিভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে اَمِيْن বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা নগরীর শপথ এ কথা জ্ঞাপন করে যে, অন্যান্য নগরীর তুলনায় এটা অভিজাত ও সেরা নগরী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আ'দী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের সময় মক্কা নগরীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : আল্লাহর কসম, তুমি গোটা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। আমাকে যদি এখান থেকে বের হতে বাধ্য করা না হতো, তবে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করতাম না। –[মাযহারী]

وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ : حِلٌّ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে–এক. এটা حُلُوْلٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোনো কিছুতে অবস্থান নেওয়া, থাকা ও অবতরণ করা। অতএব, حِلٌّ -এর অর্থ হবে অবস্থানকারী, বসবাসকারী। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মক্কা নগরী নিজেও সম্মানিত ও পবিত্র; বিশেষত আপনিও এ নগরীতে বসবাস করেন। বসবাসকারীর শ্রেষ্ঠত্বের দরুনও বাসস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে যায়। কাজেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য ও সম্মান দ্বিগুণ হয়ে গেছে। দুই. এটা حِلَّتْ থেকে উদ্ভূত। অর্থ হালাল হওয়া। এ দিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফেররা হালাল মনে করে রেখেছে এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোনো শিকারকেই হালাল মনে করে না। এমতাবস্থায় তাদের জুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহর রাসূলের হত্যাকে হালাল মনে করে দিয়েছে! অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্য মক্কার হেরেমে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে। বস্তুত মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্য তাই করা হয়েছিল। মাযহারীতে সম্ভাব্য তিনটি অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ : এখানে وَالِدٌ বলে মানব পিতা হযরত আদম (আ.) আর مَا وَلَدَ বলে বনী-আদমকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে এতে হযরত আদম (আ.) ও দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জবাবে বলা হয়েছে :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ : كَبَدٌ -এর শাব্দিক অর্থ শ্রম ও কষ্ট। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মানুষ গর্ভাশয়ে আবদ্ধ থাকে; জন্মলগ্নে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে, এরপর আসে জননীর দুগ্ধ পান করার ও তা ছাড়ানোর শ্রম। অতঃপর জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের কষ্ট, বার্ধক্যের কষ্ট, মৃত্যু, কবর ও হাশর এবং তাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি, প্রতিদান ও শাস্তি– এসমুদয় শ্রমের বিভিন্ন পর্যায়, যা মানুষের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়। এ শ্রম ও কষ্ট শুধু মানুষেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যান্য জীব-জানোয়ারও এতে শরিক রয়েছে। কিন্তু এখানে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথমত মানুষ সব জীব-জানোয়ার অপেক্ষা অধিক চেতনা ও উপলব্ধির অধিকারী। পরিশ্রমের কষ্ট চেতনাভেদে কম-বেশি হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ শ্রম হচ্ছে হাশরের মাঠে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব দেওয়া। এটা অন্য জীব-জানোয়ারের বেলায় নেই। কোনো কোনো আলিম বলেন : মানুষের ন্যায় অন্য কোনো সৃষ্টজীব কষ্ট সহ্য করে না অথচ সে শরীর ও দেহাবয়বে অধিকাংশ জীবের তুলনায় দুর্বল। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কশক্তি অত্যন্ত বেশি। একারণেই বিশেষভাবে মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কা মুকাররমা, আদম ও বনী-আদমের শপথ করে আল্লাহ তা'আলা এ সত্যটি বর্ণনা করেছেন যে, আমি মানুষকে কষ্ট ও শ্রমনির্ভরশীলরূপেই সৃষ্টি করেছি। এটা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মানুষ আপনাআপনি সৃজিত হয়নি অথবা অন্য কোনো মানুষ তাকে জন্ম দেয়নি বরং তার সৃষ্টিকর্তা এক সর্বশক্তিমান, যিনি প্রত্যেক সৃষ্টজীবকে বিশেষ বিশেষ স্বভাব ও বিশেষ ক্রিয়াকর্মের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানব-সৃষ্টিতে যদি মানবের কোনো প্রভাব থাকত, তবে সে নিজের জন্য কখনও এরূপ শ্রম ও কষ্ট পছন্দ করত না। –[কুরতুবী]

কষ্ট স্বীকারে জন্য মানুষের প্রস্তুত থাকা উচিত : এ শপথ ও তার জবাবে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়াতে অনাবিল সুখই কামনা কর এবং কোনো কষ্টের সম্মুখীন হতে চাও না, তোমাদেরই এই কামনা একটি দুঃস্বপ্ন, যা কোনোদিন বাস্তব রূপ লাভ করবে না। তাই দুনিয়াতে প্রত্যেকের দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য। অতএব যখন শ্রম ও কষ্ট করতেই হবে, তখন বুদ্ধিমানের কাজ হলো, এমন বিষয়ে কষ্ট করা, যা চিরকাল কাজে লাগবে এবং চিরস্থায়ী সুখের নিশ্চিয়তা দেবে। বলা বাহুল্য, এটা কেবল ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ। অতঃপর পরকালে অবিশ্বাসী মানুষের কতিপয় মূর্খতাসুলভ অভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে : اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗ اَحَدٌ –অর্থাৎ এই বোকা কি মনে করে যে, তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখেনি? তার জানা উচিত যে, তার স্রষ্টা সবকিছুই দেখেছেন।

চক্ষু ও জিহ্বা সৃষ্টির কয়েকটি রহস্য : اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ : نَجْدَيْنِ শব্দটি نَجْدٌ -এর দ্বিবচন। এর শাব্দিক অর্থ উর্ধ্বগামী পথ। এখানে প্রকাশ পথ বোঝানো হয়েছে। এর পথ দু'টির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিষ্ট ও ধ্বংসের পথ।

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, সে মনে করে যে, তার উপর আল্লাহ তা'আলারও কোনো ক্ষমতা নেই এবং তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখে না। আলোচ্য আয়াতে এমন কতিপয় নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর কারিগরি নৈপুণ্য ও রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করলে আল্লাহ তা'আলার অতুলনীয় হিকমত ও কুদরত এর মধ্যেই নিরীক্ষণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রথম চক্ষুদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। চোখের নাজুক শিরা-উপশিরা, তার অবস্থান ও আকার সব মিলে এটা খুবই নাজুক অঙ্গ। এর হেফাজতের ব্যবস্থা এর সৃষ্টির পরিধির মধ্যেই করা হয়েছে। এর উপরে এমন পর্দা রাখা হয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মতো কোনো ক্ষতিকর বস্তু সামনে আসতে দেখলেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। এই পর্দার উপরে ধূলোবালি প্রতিরোধ করার জন্য পশম স্থাপন করা হয়েছে। মাথার দিক থেকে পতিত বস্তু যাতে সরাসরি চোখে পড়তে না পারে, সেজন্য ভ্রূর চুল রাখা হয়েছে। মুখমণ্ডলের মধ্যে চক্ষুকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে, উপরে ভ্রূর শক্ত হাড় এবং নিচে গণ্ডদলের শক্ত হাড় রয়েছে। ফলে মানুষ যদি কোথাও উপুড় হয়ে পড়ে যায় কিংবা মুখমণ্ডলে কোনো কিছু পড়ে, তবে উপর নিচের শক্ত অস্থিদ্বয় চক্ষুকে অনায়াসে রক্ষা করতে পারে।

দ্বিতীয় নিয়ামত হচ্ছে জিহ্বা। এর কারিগরিও বিস্ময়কর। এই রহস্যঘন স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে মনের ভাব ব্যক্ত করা হয়। এর বিস্ময়কর কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন- মনের মাঝে কোনো একটি বিষয়বস্তু উঁকি দিল, মস্তিষ্ক সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করল এবং এর জন্য ভাষা তৈরি করল। অতঃপর সে ভাষা জিহ্বার মেশিন দিয়ে বের হতে লাগল। এই দীর্ঘ কাজটি অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। ফলে শ্রোতা অনুভবও করতে পারে না যে, কতগুলো মেশিনারী কর্মরত হওয়ার পর এই ভাষাগুলো জিহ্বায় এসেছে। জিহ্বার কাজে ওষ্ঠ খুব সহায়ক বিধায় এর সাথে ওষ্ঠেরও উল্লেখ করা হয়েছে। ওষ্ঠই

আওয়াজ ও অক্ষরকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে। আরও একটি কারণ সম্ভবত এই যে, আল্লাহ তা'আলা জিহ্বাকে একটি দ্রুত কর্মসম্পাদনকারী মেশিন করেছেন। ফলে অর্ধ মিনিটের মধ্যে তার দ্বারা এমন কথা বলা যায় যা, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন, ঈমানের কলেমা। অথবা দুনিয়াতে শত্রুর কাছেও প্রিয় করে দেয়। যেমন, বিগত অন্যায় ক্ষমা করা। এই জিহ্বা দ্বারাই ততটুকু সময়ে এমন কথাও বলা যায়, যা তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। যেমন, কুফরের কালেমা। অথবা দুনিয়াতে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও তার শত্রুতে পরিণত করে দেয়। যেমন, গালিগালাজ ইত্যাদি। জিহ্বার উপকারিতা যেমন অসংখ্য, তেমনি এর ধ্বংসকারিতাও অগণিত। এটা যেন এক তরবারি, যা শত্রুর গর্দানও উড়াতে পারে এবং স্বয়ং তার গলাও বিচ্ছিন্ন করতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা এ তরবারিকে ওষ্ঠদ্বয়ের চাদর দ্বারা আবৃত করে দিয়েছেন। এ স্থলে ওষ্ঠদ্বয়ের উল্লেখ করার মধ্যে এরূপ ইঙ্গিতও থাকতে পারে যে, যে প্রভু মানুষকে জিহ্বা দিয়েছেন, তিনি তা বন্ধ রাখার জন্য ওষ্ঠও দিয়েছেন। তাই একে বুঝে- সুঝে ব্যবহার করতে হবে এবং অস্থলে একে ওষ্ঠদ্বয়ের কোষ থেকে বের করা যাবে না। তৃতীয় নিয়ামত পথপ্রদর্শন করা দু'রকম। আল্লাহ তা'আলা ভালো ও মন্দের পরিচয়ের জন্য মানুষের মধ্যে এক প্রকার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। যেমন এক আয়াতে আছে فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا অর্থাৎ মানুষের নফসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পাপাচার ও সদাচারের উপকরণ রেখে দিয়েছেন। এভাবে একটি প্রাথমিক পথ প্রদর্শন মানুষ তার বিবেকের কাছ থেকেই পায়। অতঃপর এর সমর্থনে পয়গম্বরগণ ও ঐশী কিতাব আগমন করে। সারকথা এই যে, গাফিল ও অবিশ্বাসী মানুষ যদি তার নিজের অস্তিত্বের কয়েকটি দেদীপ্যমান বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে আল্লাহর কুদরত ও হিকমত চাক্ষুষ দেখতে পাবে। চোখে দেখ, মুখে স্বীকার কর এবং পথ দু'টির মধ্য থেকে মঙ্গলজনক পথ অবলম্বন কর। অতঃপর আবার গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে– এসব উজ্জ্বল প্রমাণ দ্বারা আল্লাহর কুদরত, কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশের নিশ্চিত বিশ্বাস হওয়া উচিত ছিল এবং এ বিশ্বাসের ফলেই সৃষ্টজীবের উপকার করা, তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, নিজের সংশোধন করা এবং অপরের সংশোধনের চিন্তা করা দরকার ছিল, যাতে কিয়ামতে সে 'আসহাবে-ইয়ামীন' তথা জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু হতভাগ্য মানুষ তা করেনি বরং কুফরকেই আঁকড়ে রয়েছে, যার পরিণাম জাহান্নামের আগুন। সূরার শেষ অবধি এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এতে কতিপয় সৎ কর্ম অবলম্বন না করার বিষয়কে বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ : عَقَبَةٌ বলা হয় পাহাড়ের বিরাট প্রস্তর খণ্ডকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা মাটিকে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে এ মাটি মানুষকে সহায়তা করে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করে আত্মরক্ষা করা যায় অথবা মাটিতে প্রবেশ করে অন্যত্র চলে যাওয়া যায়। এস্থলে আল্লাহর ইবাদতকে একটি মাটি রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। মাটি যেমন শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়, সৎকর্মও তেমনি পরকালের আজাব থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এসব সৎ কর্মের মধ্যে প্রথমে فَكُّ رَقَبَةٍ অর্থাৎ দাসমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা খুব বড় ইবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামান্তর। দ্বিতীয় সৎ কর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান। যে কাউকে অন্নদান করা ছওয়াবমুক্ত নয় কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ শ্রেণির লোককে অন্ন দান করলে তা আরও বিরাট ছওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে :

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ : অর্থাৎ বিশেষভাবে যদি আত্মীয় এতিমকে অন্নদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ ছওয়াব হয়। এক. ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার ছওয়াব এবং দুই. আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার ছওয়াব। فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ –অর্থাৎ বিশেষভাবে ক্ষুধার দিনে তাকে অন্ন দান করা অধিক ছওয়াবের কারণ হয়ে যায়। এমনিভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত মিসকিন অর্থাৎ নিরতিশয় নিঃস্ব ব্যক্তিকে অন্নদান করাও অধিক ছওয়াবের কাজ। এরূপ ব্যক্তি যত বেশি অভাবী হবে, অন্নদাতার ছওয়াবও ততই বৃদ্ধি পাবে।

অপরকেও সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া ঈমানের দাবি : ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ এ আয়াতে ঈমানের পর মু'মিনের এই কর্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে অপরাপর মুসলমান ভাইকে সবর ও অনুকম্পার উপদেশ দেবে। সবরের অর্থ নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও সৎ কর্ম সম্পাদন করা। مرحمة -এর অর্থ অপরের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও জুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। এতে দীনের প্রায় সব নির্দেশই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أُقْسِمُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقْسَامٌ মূলবর্ণ (ق - س - م) জিনস صحيح অর্থ– আমি শপথ করছি।

حِلٌّ : মাসদার। বাবে ضَرَبَ; অর্থ– হালাল হওয়া। আর حَلَالٌ শব্দটি এ বাবের মাসদার আসে।

وَلَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وِلَادَةٌ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– সন্তান সন্ততি। সে প্রসব করেছে। পিতা হয়েছে।

كَبَدٌ : ইসম। অর্থ– কষ্ট, ক্লেশ। কঠিন, কঠোর। كَبِدٌ، كَبَدٌ ـ كَبْدٌ কলিজা। كِبَادٌ وَكُبُودٌ وَاَكْبَادٌ আন্তরিক হওয়া। كَبْدٌ অন্তরে মারা। বাব نَصَرَ، ضَرَبَ আর كَبَدٌ অন্তরে দরদ হওয়া। বাব : سَمِعَ

لُبَدًا : প্রচুর সম্পদ। لَابِدٌ ও لُبَدٌ এরও এই উদ্দেশ্য। মূলতঃ لِبْدَةٌ ও لِبَدٌ এবং لُبَدَةٌ-এর অর্থ হলো, জট বাঁধা চুল বা পশম, বিপুল সম্পদ। বেশি ব্যবহৃত হওয়ায় শব্দটি বিপুল সম্পদের অর্থে আসে। এত বেশি যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

شَفَتَيْنِ : দ্বিবচন, দু'ঠোঁট। একবচন شَفَةٌ। কারো নিকট এটি মূলতঃ شَفْوَةٌ ছিল। واو -কে বিলুপ্ত করে তার যবরকে পূর্বাক্ষরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর شَفْوَةٌ-এর বহুবচন شَفَوَاتٌ ও شِفَاهٌ।

نَجْدَيْنِ : ইসম, দ্বিচন। একবচন اَلنَّجْدُ অর্থ দুই রাস্তা অর্থাৎ ভালোর রাস্তা ও খারাপের রাস্তা। এর বহুবচন اَنْجُدٌ، نُجُوْدٌ، اَنْجَادٌ আসে। উঁচুভূমি। স্পষ্ট ও আলোকিত পথ। গৃহসজ্জার আসবাবপত্র। দক্ষ পরিচালক বা পথপ্রদর্শক। চিন্তা, প্রাধান্য, চাপ প্রয়োগ। মাসদার نَجْدٌ বাব نَصَرَ জারি হওয়া, চালু হওয়া। রাস্তা আলোকিত হওয়া, প্রাধান্য পাওয়া, نَجْدٌ মাসদার। বাবে– سَمِعَ ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, আত্মহারা হওয়া, জ্ঞানশূন্য হওয়া।

اِقْتَحَمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِحَامٌ মূলবর্ণ (ق ـ ح ـ م) জিনস صحيح অর্থ– সে অতিক্রম করল।

عَقَبَةٌ : ঘাঁটি। বহুবচন عُقَبٌ ও عِقَابٌ পাহাড়ে আরোহণ করতে যে বন্ধুর বা কঠিন রাস্তা থাকে, তাকে عَقَبَةٌ বলা হয়।

مَسْغَبَةٌ : ইসম, মাসদার سَمِعَ ও نَصَرَ : বাবে مَسْغَبَةً، سُغُوْبَةً এবং سَغَابَةً ـ سَغْبٌ মূলবর্ণ (س ـ غ ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– ক্ষুধা, ক্ষুধার্ত হওয়া।

مَتْرَبَةٍ : ইসম। বাবে سَمِعَ মাসদার تَرْبٌ ـ تَرَبًا ـ اَتْرَابًا মুখাপেক্ষী হয়েছে। মূলবর্ণ (ت ـ ر ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– নিঃস্ব, অসহায়, যার কিছুই নাই। মাটি ধূলা।

تَوَاصَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَوَاصٌ মূলবর্ণ (و ـ ص ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– একে অন্যকে উপদেশ দিয়েছে।

مَيْمَنَةٌ : ইসম। সোজা হাত, ডান পার্শ, ডান দিক। اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য ডান দিকের লোক অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী। (রাগেব) আরবরা বাম হাতকে شُوْمِىٌّ অর্থাৎ অমঙ্গল বলত। আর সোজা তথা ডান হাতকে বরকতময় বা সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করত। তাই ডান পার্শ্বের লোকদেরকে সৌভাগ্যশালী ভাবা হয়।

مَشْئَمَةٌ : ইসম। অর্থ– বাম দিক। (জালালাইন) شُوْمِىٌّ বাম দিক, শাম দেশ কা'বা হতে বাম দিকে অবস্থিত। شُؤْمٌ খারাপের চিহ্ন বা আলামত।

مُؤْصَدَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْصَادٌ মূলবর্ণ (ء ـ ص ـ د) জিনস مهموز فاء অর্থ– অবরুদ্ধ করে দেওয়া হবে। অবরুদ্ধ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ـ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ এখানে : اُولٰٓئِكَ মুবতাদা اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ হলো খবর। আর واو হরফে আতফ اَلَّذِيْنَ মুবতাদা كَفَرُوْا বাক্যটি সেলাহ। আর بِاٰيٰتِنَا হলো كَفَرُوْا-এর সাথে متعلق; আর هُمْ হলো মুবতাদা اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ হলো খবর। আর هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ বাক্যটি اَلَّذِيْنَ মুবতাদার খবর হয়েছে। আর عَلَيْهِمْ হলো خبر مقدم আর نَارٌ হলো متبدا موخر আর مُؤْصَدَةٌ হলো نَارٌ-এর সিফাত। আর পূর্ণ বাক্যটি দ্বিতীয় খবর। কিংবা جمله استينافية –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ৩২৪]

سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

সূরা শামস

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ১৫, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. শপথ সূর্য ও তার আলোকের।	وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١
২. আর শপথ চন্দ্রের, যখন [তা] সূর্যের পশ্চাতে আসে।	وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢
৩. আর শপথ দিবসের, যখন তা তাকে ভালোরূপে আলোকিত করে।	وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝٣
৪. আর শপথ রাত্রির, যখন এটা তাকে সমাচ্ছন্ন করে।	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤
৫. আর শপথ আসমানের এবং যিনি এটাকে নির্মাণ করেছেন।	وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥
৬. আর শপথ জমিনের এবং যিনি এটাকে বিছিয়েছেন তাঁর।	وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦
৭. আর শপথ [মানুষের] আত্মার আর যিনি তাকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন তার।	وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝٧
৮. অতঃপর তার দুষ্কার্য ও পরহেজগারার, যা তাকে [তার অন্তরে] নিক্ষেপ করেছে।	فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالشَّمْسِ শপথ সূর্য وَضُحٰهَا ও তার আলোকের।

২. وَالْقَمَرِ আর চন্দ্রের اِذَا تَلٰهَا যখন সূর্যের পশ্চাতে আসে।

৩. وَالنَّهَارِ আর দিবসের اِذَا جَلّٰهَا যখন তা তাকে ভালো রূপে আলোকিত করে।

৪. وَالَّيْلِ আর রাত্রের اِذَا يَغْشٰهَا যখন তা তাকে সমাচ্ছন্ন করে।

৫. وَالسَّمَآءِ আর আসমানের وَمَا بَنٰهَا এবং যিনি এটাকে সৃষ্টি করেছেন।

৬. وَالْاَرْضِ আর জমিনের وَمَا طَحٰهَا এবং যিনি এটাকে বিছিয়েছেন।

৭. وَنَفْسٍ আর শপথ (মানুষের) আত্মার وَّمَا سَوّٰهَا আর যিনি এটাকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন।

৮. فَاَلْهَمَهَا অতঃপর যা তাকে (তার অন্তরে) নিক্ষেপ করেছেন فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا তার দুষ্কার্য ও পরহেজগারির।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ﴿٩﴾	৯. নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে যে তাকে বিশুদ্ধ করেছে।
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ﴿١٠﴾	১০. আর সে বিফলকাম হয়েছে– যে তাকে [পাপে] গেড়ে দিয়েছে।
كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ﴿١١﴾	১১. ছামূদ সম্প্রদায় নিজেদের দুষ্টামির দরুন [সালেহকে] অবিশ্বাস করেছে।
اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ﴿١٢﴾	১২. যখন সে সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তি [উটনীকে বধ করার জন্য] দাঁড়াল।
فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ﴿١٣﴾	১৩. তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন, আল্লাহর উটনী এবং তার পানি পান করা সম্পর্কে সাবধান থাক।
فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۙ۬ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٤﴾	১৪. অনন্তর তারা রাসূলকে অবিশ্বাস করল, অতঃপর সে উষ্ট্রীকে হত্যা করল, তখন তাদের প্রভু তাদের পাপের দরুন তাদের উপর ধ্বংস ক্রিয়া নাজিল করলেন এবং তাকে সর্বব্যাপী করে দিলেন।
وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿١٥﴾	১৫. আর আল্লাহ এর পরিণাম সম্বন্ধে কোনো খারাবির আশঙ্কা করেননি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. قَدْ اَفْلَحَ নিশ্চয় সে সফল হয়েছে مَنْ زَكّٰىهَا যে তাকে বিশুদ্ধ করেছে।

১০. وَقَدْ خَابَ আর সে বিফল হয়েছে مَنْ دَسّٰىهَا যে তাকে পাপে গেড়ে দিয়েছে।

১১. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ ছামূদ গোত্র (ছালেহকে) অবিশ্বাস করেছে بِطَغْوٰىهَا নিজেদের দুষ্টামির দরুন।

১২. اِذِ انْۢبَعَثَ যখন দাড়াল اَشْقٰىهَا সে সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তি (উটনীকে বধ করার জন্য)

১৩. فَقَالَ لَهُمْ তখন তাদের কে বললেন رَسُوْلُ اللّٰهِ আল্লাহর রাসূল نَاقَةَ اللّٰهِ আল্লাহর উটনী وَسُقْيٰهَا এবং তার পানি পান করা সম্পর্কে সাবধান থাক।

১৪. فَكَذَّبُوْهُ অনন্তর তারা রাসূলকে অবিশ্বাস করল فَعَقَرُوْهَا অতঃপর সেই উষ্ট্রীকে হত্যা করল فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ তখন তাদের উপর ধ্বংসক্রিয়া নাজিল করলেন رَبُّهُمْ তাদের প্রভু بِذَنْۢبِهِمْ তাদের পাপের দরুন فَسَوّٰىهَا এবং তাকে সর্বব্যাপী করে দিলেন।

১৫. وَلَا يَخَافُ আর আল্লাহ কোনো খারাবির আশঙ্কা করেননি عُقْبٰهَا এর পরিণাম সম্বন্ধে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম শব্দই হলো "اَلشَّمْس" একে কেন্দ্র করেই অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৫টি আয়াত, ৫৪টি বাক্য এবং ২৪৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় বুঝা যায় যে, এ সূরাটি মহানবী ﷺ-এর মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে নবী করীম ﷺ-এর বিরোধিতা তখন প্রবলভাবে শুরু হয়েছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলকথা : নেকী-বদী, পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য বুঝানোই এ সূরার বিষয়বস্তু। যারা এ পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে এবং পাপের পথে চলতেই থাকে, তাদেরকে অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

সূরাটির মূল বক্তব্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। সূরার প্রথম হতে ১০ আয়াত পর্যন্ত প্রথম ভাগ। আর ১১ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম ভাগে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে।

১. চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত, আসমান-জমিন পরস্পর হতে ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্রিয়া, প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী; পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায় পরস্পর হতে ভিন্নতর এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, প্রভাব ও ফলাফলের দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী। এ দু'টি এদের বাহ্যিক রূপের দিক দিয়ে যেমন এক নয়, তেমনি তাদের ফলাফল ও পরিণতিও এক হতে পারে না।
২. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দেহইন্দ্রিয় ও মানসশক্তি দান করে দুনিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর করে ছেড়ে দেননি; বরং এক স্বভাবজাত প্রত্যাদেশের সাহায্যে তার অবচেতনায় পাপ-পুণ্যের পার্থক্য, ভালো-মন্দের তারতম্য এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছেন।
৩. আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধ, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যেসব শক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন সেগুলোকে ব্যবহার ও প্রয়োগ করে সে নিজের মধ্যকার ভালো ও মন্দ প্রবণতাসমূহ হতে কোনোটিকে তেজস্বী করে আর কোনোটিকে দমন করে, তার উপরই তার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সে যদি ভালো প্রবণতাসমূহ সমৃদ্ধ ও তেজস্বী করে এবং খারাপ প্রবণতা হতে নিজেকে মুক্ত রাখে, তাহলে সে প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য লভ করতে পারবে। পক্ষান্তরে সে যদি তার ভালো প্রবণতাসমূহকে দমন করে এবং খারাপ প্রবণতাসমূহকে তেজস্বী করে, তবে তার অকল্যাণ ও ব্যর্থতা অনিবার্য।

সূরাটির দ্বিতীয় অংশে ছামূদ জাতির ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করে রেসালাত ও নবুয়তের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। যেহেতু ভালো ও মন্দ পর্যায়ে মানব প্রকৃতিতে রক্ষিত ও গচ্ছিত ইলহামী জ্ঞানই নিজ স্বভাবে মানুষের হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট নয়, তাকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে না পারার দরুন মানুষ ভালো ও মন্দ পর্যায়ে ভুল দর্শন ও মানদণ্ড নিরূপণ করে পথভ্রষ্ট হয়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এ স্বভাবজ্ঞাত ইলহামের সাহায্যের জন্য নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ওহী নাজিল করেছেন। তাঁরা পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দকে লোকদের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরবেন। দুনিয়াতে নবী রাসূলগণকে পাঠানোর এটাই মূল উদ্দেশ্য। ছামূদ জাতির নিকট হযরত সালেহ (আ.)-কে এ ধরনেরই একজন নবী করে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সে জাতি ও জনগণ নিজেদের নফসের দোষযুক্ত ভাবধারায় ডুবে গিয়ে এমনভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল যে, তারা এ নবীকে সত্য বলে মানল না। তাদের দাবি অনুযায়ী একটি উষ্ট্রীকে যখন তিনি মু'জিযারূপে তাদের সম্মুখে পেশ করলেন, তখন তাদেরকে সতর্ক করা সত্ত্বেও উক্ত জাতির দুষ্টতম ব্যক্তি জাতির ইচ্ছানুযায়ী তাকে হত্যা করে দিল। তারই ফলে শেষ পর্যন্ত গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো।

ছামুদ জাতির দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা হযরত সালেহ (আ.)-এর জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, মক্কায় তখন ঠিক অনুরূপ অবস্থায়ই উদ্ভব হয়েছিল। এ কারণে সে অবস্থায় এ কাহিনী শুনানো স্বতঃই মক্কাবাসীকে একথা বুঝনোর জন্য যথেষ্ট ছিল যে, ছামুদ জাতির এ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তাদের উপর পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে।

এই সূরার শুরুতে সাতটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির সাথে তার পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষণ যোগ করা হয়েছে। প্রথম শপথ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا এখানে ضُحٰى শব্দটি অর্থগতভাবে شَمْس -এর বিশেষণ। অর্থাৎ শপথ সূর্যের যখন তা উর্ধ্বগগনে থাকে। সূর্য উদয়ের পর যখন কিছু উর্ধ্বে উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়কে ضُحٰى বলা হয়। তখন সূর্য কাছেই দৃষ্টিগোচর হয় এবং তোমন প্রখরতা না থাকার কারণে তা পূর্ণরূপে দেখাও যায়।

দ্বিতীয় শপথ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا –অর্থাৎ চন্দ্রের শপথ যখন তা সূর্যের পেছনে আসে এবং এর এক অর্থ এই যে, যখন চন্দ্র সূর্যাস্তের পরেই উদিত হয়। মাসের মধ্যভাগে এরূপ হয়। তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। পেছনে আসার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কিছুটা উর্ধ্বগগনে থাকার সময় সূর্য যেমন পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয়। তৃতীয় শপথ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا এখানে جَلّٰهَا -এর সর্বনাম দ্বারা পৃথিবী অথবা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ শপথ দিবসের দুনিয়া অথবা পৃথিবীর- যাকে দিন আলোকিত করে। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণরূপে আলোকিত দিবসের শপথ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এখানে সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে আলোকিত করে। অর্থাৎ যখন দিন শুরু হওয়ার কারণে সূর্য উজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়।

চতুর্থ শপথ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا –অর্থাৎ শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। মানে সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয়।

পঞ্চম শপথ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا –এখানে مَا অব্যয়কে مَصْدَرِيَّةٌ ধরে এই অর্থ নেওয়া সুস্পষ্ট যে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। কুরআনের অন্য এক আয়াতে এর নজির আছে بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ এমনিভাবে ষষ্ঠ শপথ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا বাক্যের অর্থ এরূপ হবে যে, শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখও এতদুভয়ের পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্য। এই তাফসীর হযরত কাতাদাহ্ (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। কাশশাফ, বায়যাবী ও কুরতুবী একেই পছন্দ করেছেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এস্থলে مَا অব্যয়কে مَنْ -এর অর্থে ধরে এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরিউক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ হবে শপথ আকাশের ও তাঁর, যিনি একে নির্মাণ করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও তাঁর, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এখানে সবগুলো শপথই সৃষ্টবস্তুর শপথ। মাঝখানে স্রষ্টার শপথ এসে যাওয়া ধারাবাহিকতার খেলাফ মনে হয়। প্রথমোক্ত তাফসীর অনুযায়ী এ আপত্তিও দেখা দেয় না যে, সৃষ্টবস্তুর শপথ স্রষ্টার শপথের অগ্রে বর্ণিত হলো কেন?

সপ্তম শপথ : وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا এখানে দু'রকম অর্থ হতে পারে– এক. শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং দুই. শপথ নফসের এবং তাঁর যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا : اَلْهَمَ -এর অর্থ নিক্ষেপ করা এবং فُجُوْر শব্দের অর্থ প্রকাশ্য গোনাহ্। এই বাক্য সপ্তম শপথের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের নফস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎ কর্ম ও সৎ কর্ম উভয়ের প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহ্ ও ইবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা ইবাদতের পথ। যখন সে নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোনো এক পথ অবলম্বন করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে ছওয়াব অথবা আজাবের যোগ্য হয়। এই তাফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও ইবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্য সে কোনো ছওয়াব অথবা আজাবের যোগ্য হবে না। একটি হাদীস থেকে এই তাফসীর গৃহীত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, তাফসীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে গোনাহ্ ও ইবাদতের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন, কিন্তু তাকে কোনো একটি করতে বাধ্য করেন নি; বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোনো একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে তাকওয়ার তাওফীক দান কর, তুমিই আমার মুরুব্বী ও পৃষ্ঠপোষক।

সপ্তম শপথের পর জবাবে বলা হয়েছে : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا অর্থাৎ সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে। تَزْكِيَة শব্দের প্রকৃত অর্থ অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে দেয়। دَسَّ -এর অর্থ মাটিতে প্রোথিত করা; যেমন এক আয়াতে আছে : اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ আয়াতের অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়; যাকে আল্লাহ্ শুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। এ আয়াত সমগ্র মানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও ব্যর্থ। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার মানুষের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। ছামূদ গোত্রের ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে তাদের এই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে :

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا : دَمْدَمَ শব্দ এমন কঠোর শাস্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বারবার কোনো ব্যক্তি অথবা জাতির উপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। سَوّٰهَا -এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আজাব জাতির আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সবাইকে বেষ্টন করে নেয়। وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তিদান ও কোনো জাতিকে নির্মূল করে দেওয়ার ব্যাপারকে দুনিয়ার ব্যাপারের মতো মনে করো না। দুনিয়াতে কোনো রাজাধিরাজ ও প্রবল পরাক্রান্ত শাসকও কোনো জাতির বিরুদ্ধে ধ্বংসাভিযান পরিচালনা করলে সে জাতির অবশিষ্ট লোক অথবা তাদের সমর্থকদের প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম ও গণবিদ্রোহের আশঙ্কা করতে থাকে। এখানে যারা অপরকে হত্যা করে, তারা নিজেরাও হত্যার আশঙ্কা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যারা অপরকে আক্রমণ করে তারা নিজেরাও আক্রান্ত হওয়ার ভয় রাখে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ নন। কারও পক্ষ থেকে কোনো সময় তাঁর কোনো বিপদশঙ্কা নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

شَمْسٌ : অর্থ– সূর্যকেও বলা হয় আবার দুপুরের তাপকেও বলা হয়। বহুবচন شُمُوْسٌ আসে।

ضُحٰى : অর্থ– চাশতের সময়, সকাল বেলা, পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহর, সূর্যকিরণ ছড়ানো। আল্লামা ইবনে খালুভিয়া বলেন, ضُحٰى ইসমে মাকছুরা। যেমন هُدًى শব্দটি ইসমে মাকসূরাহ অর্থাৎ ضُحٰى শব্দটি মুয়ান্নাছ। এর তাসগীর ضُحَيَّةٌ আসে। তবে উত্তম হলো, এর তাসগীর ضُحٰى অর্থাৎ تاء ব্যতীত আসা। যাতে তার তাসগীর ضَحْوَةٌ -এর তাসগীরের সাথে মিলে না যায়।

اَلْقَمَرِ : একবচন। বহুবচন اَقْمَارٌ তৃতীয় তারিখ থেকে মাসের শেষ পর্যন্ত চাঁদকে قَمَرٌ বলা হয়। قُمَرَاءُ চাঁদনী (রাত)। قَمَرٌ জুয়া খেলা, বাজি ধরা। বাবে– نَصَرَ - ضَرَبَ সম্ভবতঃ চাঁদের আলো তারকারাজির আলোর উপর প্রাধান্য পায় বলে قَمَرٌ কে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

تَلٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার تُلُوٌّ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– (আর শপথ চাঁদের! যখন) তা সূর্যের পশ্চাতে আসে।

جَلّٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَجْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ج - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাকে ভালোরূপে আলোকিত করে। আবৃত করে।

بَنٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بِنَاءٌ মূলবর্ণ (ب - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– এটাকে নির্মাণ করেছেন, বানিয়েছেন।

طَحٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার طَحْىٌ মূলবর্ণ (ط - ح - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– এটাকে বিছিয়েছেন, ছড়িয়েছেন।

سَوّٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْوِيَةٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, সমান করে দিয়েছেন।

اِنْبَعَثَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْبِعَاثٌ মূলবর্ণ (ب - ع - ث) জিনস صحيح অর্থ– সে উঠে দাড়াল।

اَشْقٰهَا : اشقى সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার شَقَاءٌ মূলবর্ণ (ش - ق - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তি।

سُقْيٰهَا : ইসম। سَقْىٌ হতে নির্গত। অর্থ– তাকে পানি পান করানো। এর বহুবচন سُقْيَاتٌ আসে। যেমন, حُبْلٰى -এর বহুবচন حُبْلَيَاتٌ আসে।

عُقْبٰهَا : অর্থ– তার পরিণাম, পরিণতি, তার বদলা, তার ফলাফল। আল্লামা আবুল হাসান উন্দুলসী (র.) البحر المحيط গ্রন্থে লিখেন, اَلْعُقْبٰى خَاتِمَةُ الشَّىْءِ وَمَا يَجِىْءُ مِنَ الْاُمُوْرِ عَلٰى عَقْبِهٖ তথা عقبى -এর অর্থ, কোনো জিনিসের পরিণাম এবং যে কথা কোনো কিছুর পরে উঠে আসে। কাযী ছানাউল্লাহ (র.) বলেন অর্থ, কাজের প্রতিদান বা বিনিময়। তবে عُقْبٰى -এর ব্যবহার ছওয়াব ও নেকীর উত্তম প্রতিদানের সাথে নির্দিষ্ট। যেমন عِقَابٌ، عُقُوْبَةٌ -এর ব্যবহার আজাব ও মন্দতা কঠিন শাস্তির সাথে নির্দিষ্ট। আয়াতে عقبى -এর ব্যবহার ছওয়াবের জন্য হয়নি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا : এখানে واو টি হরফে কসম ও হরফে জার। আর اَلشَّمْسِ হলো মাজরূর। এখন জার ও মাজরূর মিলে উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়েছে। আর ضُحٰهَا টা اَلشَّمْسِ -এর উপর আতফ হয়েছে। وَالْقَمَرِ টাও আতফ হয়েছে। আর اذا টা শুধুমাত্র ظرفية এর জন্য হয়েছেন। যা উহ্য কসমের ফে'লের সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩২৯]

سُوْرَةُ الَّيْلِ مَكِّيَّةٌ

সূরা লায়ল

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২১, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ রজনীর, যখন তা [সূর্যকে] আচ্ছন্ন করে ফেলে।	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ﴿۱﴾
২. আর দিবসের, যখন তা আলোকিত হয়ে পড়ে।	وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ﴿۲﴾
৩. আর তার, যিনি নর ও মাদীকে সৃষ্টি করেছেন।	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۙ﴿۳﴾
৪. নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী।	اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ؕ﴿۴﴾
৫. অনন্তর যে [আল্লাহর রাস্তায়] দান করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে।	فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۙ﴿۵﴾
৬. আর ভালো কথাকে [ইসলাম ধর্মকে] সত্য বলে বুঝেছে।	وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ﴿۶﴾
৭. তবে আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ؕ﴿۷﴾
৮. আর যে কার্পণ্য করেছে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে।	وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۙ﴿۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالَّيْلِ শপথ রাত্রির اِذَا يَغْشٰى যখন তা (সূর্যকে) আচ্ছন্ন করে ফেলে।

২. وَالنَّهَارِ আর দিবসের اِذَا تَجَلّٰى যখন তা আলোকিত হয়ে পড়ে।

৩. وَمَا خَلَقَ আর তাঁর যিনি সৃষ্টি করেছেন الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى নর ও মাদীকে।

৪. اِنَّ سَعْيَكُمْ নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা لَشَتّٰى বিভিন্নমুখী।

৫. فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى অনন্তর যে দান করেছে وَاتَّقٰى এবং আল্লাহকে ভয় করেছে।

৬. وَصَدَّقَ আর সত্য বলে বুঝেছে بِالْحُسْنٰى ভালো কথাকে।

৭. فَسَنُيَسِّرُهٗ তবে আমি তার জন্য সুগম করে দিব لِلْيُسْرٰى সহজ পথ।

৮. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ আর যে কার্পণ্য করেছে وَاسْتَغْنٰى এবং নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করেছে।

৯. আর ভালো কথাকে [সত্য ধর্মকে] অবিশ্বাস করেছে।	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿٩﴾
১০. তবে আমি তাকে ক্লেশদায়ক বস্তু [দোজখ] - এর জন্য আসবাব প্রদান করব।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ﴿١٠﴾
১১. আর তার ধন সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না, যখন সে [দোজখে] অধঃপতিত হবে।	وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ﴿١١﴾
১২. বাস্তবিকই আমার জিম্মায় শুধু পথ দেখিয়ে দেওয়া।	اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ﴿١٢﴾
১৩. আর আমারই আয়ত্তে রয়েছে পরকাল এবং ইহকাল।	وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ﴿١٣﴾
১৪. অনন্তর আমি তোমাদেরকে এক প্রজ্বলিত অগ্নির ভয় প্রদর্শন করছি।	فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴿١٤﴾
১৫. তাতে কেবল সে হতভাগ্যই প্রবেশ করবে।	لَا يَصْلٰىهَاۤ اِلَّا الْاَشْقَى ﴿١٥﴾
১৬. যে [সত্য ধর্মকে] অবিশ্বাস করেছে এবং [তা হতে] মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।	الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٦﴾
১৭. আর তা হতে এমন ব্যক্তিকে দূরে রাখা হবে, যে অত্যন্ত পরহেজগার।	وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿١٧﴾
১৮. যে স্বীয় ধন সম্পদ [শুধু] এই উদ্দেশ্যে দান করে যেন সে পবিত্র হয় [অর্থাৎ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই তার উদ্দেশ্য]।	الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَكَذَّبَ আর অবিশ্বাস করেছে بِالْحُسْنٰى ভালো কথাকে।

১০. فَسَنُيَسِّرُهٗ তবে আমি তাকে প্রদান করব لِلْعُسْرٰى ক্লেশদায়ক বস্তু (দোজখ) এর জন্য আসবাব।

১১. وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗ, আর তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না اِذَا تَرَدّٰى যখন সে [দোজখে] অধঃপতিত হবে।

১২. اِنَّ عَلَيْنَا বাস্তবিক আমার জিম্মায় শুধু لَلْهُدٰى পথ দেখিয়ে দেওয়া।

১৩. وَاِنَّ لَنَا, আর আমারই আয়ত্তে রয়েছে لَلْاٰخِرَةَ পরকাল وَالْاُوْلٰى, এবং ইহকাল।

১৪. فَاَنْذَرْتُكُمْ অনন্তর আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি نَارًا تَلَظّٰى এক প্রজ্বলিত অগ্নির।

১৫. لَا يَصْلٰىهَاۤ اِلَّا তাতে কেবল প্রবেশ করবে الْاَشْقَى সেই হতভাগ্যই।

১৬. الَّذِيْ كَذَّبَ যে অবিশ্বাস করেছে وَتَوَلّٰى, এবং মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

১৭. وَسَيُجَنَّبُهَا আর তা হতে এমন ব্যক্তিকে দূরে রাখা হবে الْاَتْقَى যে অত্যন্ত পরহেজগার।

১৮. الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ যে স্বীয় ধন-সম্পদ (শুধু) এই উদ্দেশ্যেই দান করে يَتَزَكّٰى যেন সে পবিত্র হয়।

১৯. আর তার জিম্মায় কারো কোনো ইহসান [অনুগ্রহ] ছিল না যে, তার প্রতিদান দিতে হয়।	وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾
২০. কেবল তার মহোন্নত প্রতিপালকের সন্তুষ্টি সাধন ব্যতীত।	إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾
২১. আর এই ব্যক্তি সত্বরই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।	وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ আর তার জিম্মায় ছিলনা কারো مِنْ نِعْمَةٍ কোনো ইহসান যে تُجْزَىٰ তার প্রতিদান দিতে হয়।

২০. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ কেবল সন্তুষ্টি সাধন ব্যতীত رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ তার মহোন্নত প্রতিপালকের।

২১. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ আর এই ব্যক্তি সত্বরই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ ঃ অত্র সূরার প্রথম শব্দ اَللَّيْلِ -কে কেন্দ্র করে অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ২১টি আয়াত, ৭১টি বাক্য এবং ৩২০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল ঃ অত্র সূরা ও এর পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তু প্রায় এক ও অভিন্ন। এটা হতে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাও মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : মানব জীবনের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের পারস্পরিক পার্থক্য এবং তার পরিণাম ও ফলাফলের তারতম্য বর্ণনা করাই এ সূরার বিষয়বস্তু।

এর মূলবক্তব্য দু'টি ভাগে বিভক্ত। শুরু হতে ১১ নং আয়াত পর্যন্ত তার প্রথম ভাগ। এ অংশে বলা হয়েছে, মানবজাতির ব্যক্তি, জাতি ও দলসমূহ দুনিয়াতে যে শ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছে, তা স্বীয় নৈতিকতার দিক দিয়ে ঠিক তেমনি পরস্পর বিরোধী। যেমন পরস্পর বিরোধী দিন ও রাত এবং পুরুষ জীব ও স্ত্রী জীব। এরপর দু'প্রকারের নৈতিক বিশেষত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম প্রকারের নৈতিক বিশেষত্বসমূহ এই- দান-সদকা করা, আল্লাহভীতি ও পরহেজগারী অবলম্বন এবং ভালো ও কল্যাণকে, ভালো ও কল্যাণ বলে মেনে নেওয়া। অপর ধরনের বিশেষত্বসমূহ হচ্ছে কার্পণ্য ও বখিলী, আল্লাহর সন্তোষ ও অসন্তোষ সম্পর্কে নির্ভীক হওয়া, ভালো কথাকে মিথ্যা অভিহিত করে অমান্য করা। ফলে বলা হয়েছে যে, এ বিশেষত্বসমূহ নিজস্ব দিক দিয়ে যতটা পরস্পর বিরোধী, এদের ফলাফল অবলম্বনকারীরা দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য লাভ করবে। তাদের জন্য ভালো ও কল্যাণকর কাজগুলোকে সহজ করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কর্মনীতি গ্রহণকারীদের জন্য ভালো কাজ কঠিন ও মন্দ কাজ সহজ হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে, দুনিয়ার এ সম্পদ যা অর্জনের জন্য মানুষ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, তা তার মালিকের সাথে কবরে তো যাবে না। তাহলে মৃত্যুর পর তা মালিকের কোন কাজে আসবে?

দ্বিতীয় অংশেও সংক্ষেপে তিনটি মৌলনীতি পেশ করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার এ পরীক্ষা ক্ষেত্রে অজ্ঞ ও অনবহিত করে ছেড়ে দেননি। জীবনের বিভিন্ন পথের মধ্যে ঠিক কোন পথটি সুষ্ঠু ও সঠিক তা মানুষকে ভালোভাবে জানিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি নিজের উপর গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় মৌলতত্ত্বে এই বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের নিরঙ্কুশ মালিক একমাত্র আল্লাহই। দুনিয়া পেতে চাইলে তারই নিকট হতে পেতে হবে। আর পরকাল চাইলে তার দাতাও সে আল্লাহ। এখন তুমি বান্দা তার নিকট কি চাইবে, তার ফয়সালার দায়িত্ব তোমার নিজের।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে, রাসূল ও কিতাবের সাহায্যে যে কল্যাণ বিধান পেশ করা হয়েছে তা যে হতভাগ্য ব্যক্তি মিথ্যা মনে করে, অমান্য ও অস্বীকার করবে তার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডলি প্রস্তুত হয়ে আছে। অপরদিকে যে আল্লাহভীরু ব্যক্তি ঈমান এনে সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করবে, আল্লাহ তার উপর রাজি-খুশি হবেন এবং সেও আল্লাহর দান পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

সূরাটির শানে নুযূল : সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। তার আয়াতসমূহের অভিব্যক্তি সাধারণ হলেও বহু বিশিষ্ট তাফসীরকারের মতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ নামক জনৈক ধর্মদ্রোহী সম্বন্ধে এ সূরা নাজিল হয়েছে। আরবের মধ্যে তারা উভয়েই ধনবান ও নেতৃস্থানীয় ছিল; কিন্তু উভয়ের মধ্যে চরিত্র, ধর্ম বিশ্বাস ও কার্যকলাপে বিরাট পার্থক্য ছিল। হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সমস্ত অর্থ ইসলামের উন্নতি ও কল্যাণে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহায্যে এবং মুসলমানের উপকার এবং বিভিন্নরূপ সৎকার্যে ব্যয় করেছেন। পক্ষান্তরে উমাইয়া তার সঞ্চিত অর্থরাশি এক কপর্দকও কোনোরূপ সৎকার্যে ব্যয় করেনি। অধিকন্তু উমাইয়া ভয়ানক ইসলাম বিদ্বেষী ছিল এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে সে তার কৃতদাস হযরত বেলাল (রা.)-এর উপর ভীষণ অত্যাচার করত। হযরত আবূ বকর (রা.) এ সংবাদ শ্রবণে দশ সহস্রাধিক স্বর্ণ মুদ্রা ও নিজ কৃতদাস নিসতাস রূমীর বিনিময়ে হযরত বেলালকে উমাইয়ার নিকট হতে ক্রয় করে তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছেন। হযরত সিদ্দীক (রা.) আরও কতিপয় নওমুসলিম দাস-দাসীকে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে অত্যাচারী কাফেরদের কবল হতে মুক্ত করেছেন। তিনি তাঁর সঞ্চিত চল্লিশ সহস্র দিরহাম রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সমস্ত মুসলমানদের হিতার্থে ব্যয় করেছেন। চৌত্রিশ হাজার দিরহাম মক্কায় তেরো বছর যাবৎ মুসলমানদের হিতার্থে ব্যয় করেছেন। অবশিষ্ট ছয় হাজার দিরহাম হিজরতের পথে এবং মদীনায় মসজিদে নববীর ভূমি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করেছেন। এভাবে ইসলাম ও ইসলামি উম্মাহর জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়েও তিনি কোনো দিন কারো নিকট সাহায্য ও প্রতিদান প্রার্থী হননি। একদা তিনি কম্বল জড়িয়ে বসেছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর নবী, এ কম্বল জড়ানো ফকির কে? যিনি নিজের সমস্ত সম্পদ আপনার জন্য ব্যয় করে নিঃস্ব হয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁকে সালাম জানিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেছেন, এ দরিদ্রাবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট আছেন কিনা? এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সিদ্দীক (রা.)-কে জানিয়েছেন। হযরত সিদ্দীক (রা.) এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে পেলেন এবং ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, আমি তাতেও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আছি, আমি আল্লাহর উপর রাজি আছি– এ সময়ই অত্র সূরাটি অবতীর্ণ হয়। –[আযীযী]

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى [١] وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى [٢] وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى .... إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلٰى [٢٠] وَلَسَوْفَ يَرْضٰى.

শানে নযূল-১ : ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কোনো এক ব্যক্তির খেজুর গাছের বাগানে ছিল। তন্মধ্য হতে একটি গাছের শাখা পার্শবর্তী এক সৎ ও হতদরিদ্র লোকের বাড়ির উপর ছিল। হতদরিদ্র লোকটির ছিল ছোট ছোট সন্তান-সন্ততি। গাছের মালিক যখন খেজুর আহরণ করতে আসত, তখন কোনো খেজুর পরে গেলে গরিব লোকটির সন্তান-সন্ততিরা কেউ তা তুলে নিত অথবা মুখে দিত, সে লোকটি গাছ থেকে নেমে যাদের হাতে খেজুর থাকত, তা ছিনিয়ে নিত এবং যারা মুখে দিয়ে দিত, তাদের মুখে আঙ্গুল দিয়ে তা বের করে নিয়ে আসত। সুতরাং সেই লোকটি যে বিপদের সম্মুখীন তা রাসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে সে বিপদ সম্পর্কে অভিযোগ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি চলে যাও। অতঃপর তিনি খেজুর গাছের মালিকের নিকট গিয়ে বললেন যে, অমুকের বাড়ির উপর যে খেজুর গাছটি ঝুলে রয়েছে, সে গাছটি আমাকে দিয়ে দাও এর বিনিময়ে বেহেশতে একটি খেজুর গাছ পাবে। সে বলল, গাছটি আপনাকে দিয়ে দিতাম তবে এ গাছের খেজুর গুলো আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। আমার যদিও আরো অনেক খেজুর গাছ আছে, তবুও অন্যান্য গাছা অপেক্ষা এ গাছটির খেজুরই আমার নিকট অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এখান থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে চললেন। এক ব্যক্তি আড়াল থেকে কথাগুলো শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বলল, আমি যদি অমুক খেজুর গাছটি আপনাকে দান করি, তা হলে অমুক ব্যক্তির সাথে প্রতিশ্রুত বেহেশতের খেজুর গাছটি এর বিনিময়ে আমাকে দেবেন কী? তিনি বললেন, হ্যাঁ দেব! অতঃপর সে ব্যক্তির ৪০ চল্লিশটি খেজুর গাছের বিনিময়ে সেই খেজুর গাছটি খরিদ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অমুকের বাড়িতে ঝুলে পড়া খেজুর গাছটি আমার হয়েছে। আমি তা আপনাকে দিয়ে দিলাম। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ দরিদ্র সাহাবীর নিকট গিয়ে বললেন, আজ হতে গাছটি তোমার। তোমার সন্তান-সন্ততির মালিকাধীন এ গাছটি। হযরত ইকরিমা ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল-২ ঃ আত্বা বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, আলোচ্য সূরা হযরত আবুদ্দাহদাহ (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, কোন এক আনসারীর একটি খেজুর বৃক্ষ ছিল। সেই খেজুর বৃক্ষ হতে কাঁচা খেজুর তার পরশীর বাড়িতে পরত। তার সন্তান-সন্ততিরা সেই খেজুর কুড়িয়ে নিত। তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করল। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন যে, সে বৃক্ষটি আমার নিকট বেহেশতের একটি খেজুর বৃক্ষের বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে? তাতে সে অস্বীকৃতি জানাল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আসলেন। পথিমধ্যে আবুদ্দাহদাহ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, তুমি বেহেশতের খেজুর বৃক্ষের বিনিময়ে তা খরিদ করে দেবে কী? আবুদ্দাহদাহ বললেন, বেহেশতের খেজুর বৃক্ষের বিনিময়ে আমার নিকট থেকে তা খরিদ করে নেবেন? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ! আল্লাহর শপথ করে তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আবুদ্দাহদাহ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ গাছটি আপনার! তখন রাসূলে আকরাম ﷺ সেই আনসারী পরাশীকে ডেকে এনে বললেন, এ বৃক্ষটির দায়িত্ব গ্রহণ কর। তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরাটি নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ৮১/২০]

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى [٤]

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) উমাইয়্যা ও উবাই বিন খালাফ এর নিকট হতে হযরত বিলাল (রা.)-কে নিজ কম্বল ও দশটি মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে তাকে দাসত্ব জীবন হতে মুক্ত করেন। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ৮০/২০]

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى [٥] وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى [٦] فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى [٧] وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى [٨] وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى [٩] فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى [١٠]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর হযরত আবূ দারদা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রতিদিনই যখন সূর্য অস্তমিত হয়, তখন আহ্বানকারী দু'জন ফেরেশতা আহ্বান করতে থাকে। তাদের আহ্বান জিন ও মানুষ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টিই শুনতে পায়। তারা বলে থাকে اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا তখন আহ্বানকারী দু'জন ফেরেশতার আহ্বান করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৫১৯/৪, তাবারী ৬১৩/১২]

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى [١٩]

শানে নুযূল : আত্বা ও যাহহাক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুশরিকরা হযরত বিলাল (রা.)-কে শাস্তি দিতেছিল, আর হযরত বিলাল (রা.) বলতে ছিলেন, আহাদ-আহাদ। এ মুহূর্তে হযরত নবী করীম ﷺ তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, আহাদ অর্থাৎ আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, হে আবূ বকর! বেলালকে আল্লাহর পথে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূললুল্লাহ ﷺ-এর মন্তব্যের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে নিজ ঘরে চলে গেলেন। অতঃপর তিনি প্রায় আধাসের ওজনের স্বর্ণ সাথে নিয়ে উমাইয়্যা বিন খালফ এর নিকট গেলেন। তিনি উমাইয়্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, বিলালকে আমার নিকট বিক্রি করবে কী? সে বলল, হ্যাঁ। সুতরাং তিনি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিলেন। তখন মুশরিকরা বলেছিল যে, আবূ বকর তাকে মুক্ত করেছে তো নিজ শক্তি অর্জনের জন্যে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কর্তৃক বিলাল (রা.)-কে মুক্তিদান করা এবং কাফেরদের এ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেনে।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥)

শানে নুযূল : হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পিতা কুহাফা একদা তাকে বলল, হে আবূ বকর! আমি লক্ষ্য করছি যে, তুমি নিতান্ত অসহায় ও কমজোর লোকদেরকে আজাদ করে থাক। তা না করে তুমি যদি শক্তিশালী লোকদের আজাদ করতে তাহলে দুঃসময়ে সে তোমার কাজে আসত। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, হে পিতা! আমি কেবল তাই চাই যার দ্বারা আমার রব খুশি হন। কারণ একমাত্র তার নিকট থেকেই আমি প্রতিদানের আশা করে থাকি। তখন উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[ইবনে কাছীর ৬ : ৬৪৭]

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ –এ বাক্যটি সূরা ইনশিকাকের إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا বাক্যের অনুরূপ যার তাফসীর সে সূরায় বর্ণিত হয়ে গেছে। মর্মার্থ এই যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে কোনো না কোনো কাজের জন্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ে অভ্যস্ত কিন্তু কোনো কোনো লোক তার অধ্যাবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করে দেয়, আর কেউ কেউ এই পরিশ্রম দ্বারাই অনন্ত আজাব ক্রয় করে। হাদীসে আছে, প্রত্যেক মানুষ সকাল বেলায় গাত্রোত্থান করে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে পরকালের আজাব থেকে মুক্ত করে। পক্ষান্তরে কারও শ্রম ও প্রচেষ্টাই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হলো প্রথমে নিজের প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিণতি চিন্তা করা এবং যে কর্মের পরিণতি সাময়িক সুখ ও আনন্দ হয়, তার কাছেও না যাওয়া।

কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'দল : অতঃপর কুরআন পাক কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকের তিনটি করে বিশেষণ বর্ণনা করেছে। প্রথমে সফলকাম দলের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ : অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহকে ভয় করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, তাঁর অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে এবং সে উত্তম কলেমাকে সত্য মনে করে। এখানে 'উত্তম কালেমা' বলে কলেমায়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বোঝানো হয়েছে। (ইবনে আব্বাস, যাহ্হাক) এই কালেমাকে সত্য মনে করার অর্থ ঈমান আনা। যদিও ঈমান সব কর্মেরই প্রাণ এবং সবার অগ্রবর্তী বিষয় কিন্তু এখানে পেছনে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে উদ্দেশ্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা। এগুলো কর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। ঈমান হলো একটি অন্তরের বিষয় অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ ও রাসূলকে সত্য জানা এবং কলেমায়ে শাহাদতের মাধ্যমে মুখেও তা স্বীকার করা। বলাবাহুল্য, এই উভয় কাজে কোনো শারিরিক শ্রম নেই এবং কেউ এগুলোকে কর্মের তালিকাভুক্ত গণ্য করে না।

দ্বিতীয় দলেরও তিনটি কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে : وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ –অর্থাৎ যে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে তথা জাকাত ও ওয়াজিব সদকাও দেয় না, আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে তাঁর প্রতি বিমুখ হয় এবং উত্তম কালেমা তথা ঈমানের কলেমাকে মিথ্যা মনে করে। এতদুভয়ের প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ : يُسْرَىٰ -এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও আরামদায়ক বিষয়, যাতে কোনো কষ্ট নেই। এখানে জান্নাত বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ - عُسْرَىٰ -এর শাব্দিক অর্থ কঠিন ও কষ্টদায়ক বিষয়। এখনে জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রথমোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, (অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করা, আল্লাহকে ভয় করা এবং ঈমানকে সত্য মনে করা) তাদেরকে আমি জান্নাতের কাজের জন্য সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে জাহান্নামের কাজের জন্য সহজ করে দেই। এখানে বাহ্যত এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি তাদের জন্য জান্নাতের অথবা জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেই। কেননা কাজকর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে– ব্যক্তি সহজ অথবা কঠিন হয় না। কিন্তু কুরআন পাক এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, স্বয়ং তাদের সত্তাকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রথম দলের জন্য জান্নাতের কাজকর্ম তাদের মজ্জায় পরিণত হবে। আর এর বিপরীত কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব করবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় দলের জন্য জাহান্নামের কাজকর্ম মজ্জায় পরিণত করে দেওয়া হবে। ফলে তারা এজাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই শান্তি পাবে। উভয় দলের মজ্জায় এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়াকেই একথা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদেরকে এসব কাজের জন্য সহজ কারে দেওয়া হবে। এক হাদীস এর সমর্থনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ.

অর্থাৎ তোমরা নিজ নিজ কর্ম করে যাও। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেকাজই সহজ করা হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবানদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। আর যে হতভাগা, হতভাগাদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। এতদুভয় বিষয় আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলশ্রুতিতে অর্জিত হয়। তাই একারণে আজাব ও ছওয়াব দেওয়া হয়। অতঃপর হতভাগ্য জাহান্নামী দলকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে :

وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى : অর্থাৎ যে ধনসম্পদের খাতিরে এ হতভাগ্য ওয়াজিব হক দিতেও কৃপণতা করত, সে ধনসম্পদ আজাব আসার সময় তার কোনো কাজে আসবে না। تَرَدّٰى -এর শাব্দিক অর্থ গর্তে পতিত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে কবরে অতঃপর কিয়ামতে যখন সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে, তখন এই ধনসম্পদ কোনো উপকারে আসবে না।

لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى : অর্থাৎ এই জাহান্নামে নিতান্ত হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলাবাহুল্য, এরূপ মিথ্যা আরোপকারী কাফেরই হতে পারে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, পাপী মু'মিন যে মিথ্যারোপের অপরাধে অপরাধী নয়, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না। অথচ কুরআনের অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ব্যক্তি গোনাহ্ করার পর যদি তওবা না করে অথবা কারও সুপারিশের বলে কিংবা বিশেষ রহমতে যদি তাকে ক্ষমা করা না হয়, তবে সেও জাহান্নামে যাবে এবং গোনাহের শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে। অবশ্য শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে ঈমানের কল্যাণে তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের ভাষা বাহ্যত এর পরিপন্থি। অতএব এ আয়াতের অর্থ এমন হওয়া জরুরি, যা অন্যান্য আয়াত ও সহীহ হাদীসের খেলাফ নয়। এখানে চিরকালের জন্য দাখিল হওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা কাফেরেরই বৈশিষ্ট্য! মু'মিন কোনো না কোনো সময় গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পাবে। তাফসীরবিদগণ এছাড়া আরও কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে আছে যে, আয়াতে اَشْقٰى এবং اَتْقٰى শব্দদ্বয়ের অর্থ ব্যাপক নয় বরং এখানে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তাদের মধ্যে কোনো মুসলমান গোনাহ্ করা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংসর্গের বরকতে জাহান্নামে যাবে না।

সাহাবায়ে কেরাম সবাই জাহান্নাম থেকে মুক্ত : কারণ প্রথমত তাঁদের দ্বারা গোনাহ্ খুব কমই হয়েছে। তাছাড়া তাঁদের অবস্থা থেকে একথা জরুরিভাবে জানা যায় যে, তাঁদের কারও দ্বারা কোনো গোনাহ্ হয়ে থাকলে তিনি তওবা করে নিয়েছেন। আরও বলা যায় যে, তাঁদের এক একটি গোনাহের মোকাবিলায় সৎকর্মের সংখ্যা এত বেশি যে, সে গোনাহ্ অনায়াসেই মাফ হয়ে যেতে পারে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে : اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ অর্থাৎ সৎ কর্ম অসৎ কর্মের কাফফরা হয়ে যায়। স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ-এর সঙ্গও এমন একটি সৎকর্ম, যা সব সৎকর্মের উপর প্রবল। হাদীসে সৎকর্মশীল বুযুর্গদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : هُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ وَلَا يَخَابُ اَنِيْسُهُمْ অর্থাৎ তাঁদের সাথে যারা উঠাবসা করে, তারা হতভাগা হতে পারে না এবং তাদের সাথে যারা প্রীতির সম্পর্ক রাখে, তারা বঞ্চিত হতে পরে না। –(বুখারী, মুসলিম) সুতরাং যে ব্যক্তি পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর সহচর হবে, সে কিরূপে হতভাগ্য হতে পারে? এ কারণেই অনেক সহীহ হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম সবাই জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্ত। খোদ কুরআনে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى –অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হুসনা অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্য এক আয়াতে আছে : اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ : অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে হুসনা (জান্নাত) অবধারিত হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে। এক হাদীসে আছে, জাহান্নামের অগ্নি সে ব্যক্তিকে সম্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে। –[তিরমিযী]

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى : এতে সৌভাগ্যশালী আল্লাহভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে আনুগত্যে অভ্যস্ত এবং একমাত্র গোনাহ্ থেকে শুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে।

আয়াতের ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তিই ঈমানসহ আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। কিন্তু এ আয়াতের শানে-নুযূল সংক্রান্ত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, এখানে اَتْقٰى বলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ওরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাতজন মুসলমানকে কাফেররা গোলাম বানিয়ে রেখেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। হযরত আবূ বকর (রা.) বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে তাদেরকে কাফের মালিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে নেন এবং মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়। –[মাযহারী]

এর সাথেই সম্পর্কশীল আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে : وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى –অর্থাৎ যেসব গোলামকে হযরত আবূ বকর (রা.) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোনো সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত; বরং اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى –তাঁর লক্ষ্য মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোনো মুসলমানকে কাফের মালিকের হাতে বন্দী দেখলে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণত দুর্বল ও শক্তিহীন হতো। একদিন তাঁর পিতা হযরত আবূ কোহাফা বললেন : তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহাসী গোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে হেফাজত করতে পারে। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন : কোনো মুক্ত করা মুসলমান দ্বারা উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তাদেরকে মুক্ত করি। –[মাযহারী]

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তার ধনসম্পদ ব্যয় করেছে এবং পার্থিব উপকার চায়নি, আল্লাহ তা'আলাও পরকালে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নিয়ামত তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যটি হযরত আবূ বরক (রা.)-এর জন্য একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন এ সংবাদ দুনিয়াতেই তাঁকে শোনানো হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَغْشٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার غِشَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আচ্ছন্ন করে ফেলে।

تَجَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَجَلِّىٌ মূলবর্ণ (ج - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আলোকিত হয়ে পড়ে।

شَتّٰى : অর্থ– বিভিন্ন রকম। ভিন্ন ভিন্ন। আলাদা-আলাদা। কারো নিকট এটি মুফরাদ আবার কারো নিকট شتيت -এর বহুবচন।

اَعْطٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْطَاءٌ মূলবর্ণ (ع - ط - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– দান করেছে। দিয়েছে।

اِتَّقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– আল্লাহকে ভয় করেছে।

صَدَّقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَصْدِيْقٌ মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ– সে সত্য বলে বুঝেছে।

حُسْنٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْحُسْنُ মূলবর্ণ (ح - س - ن) জিনস صحيح অর্থ– ভালো কথা, অতি সুন্দর।

نُيَسِّرُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَيْسِيْرٌ মূলবর্ণ (ى - س - ر) জিনস مثال يائى অর্থ– আমি সুগম করে দিব।

يُسْرٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার يُسْرٌ মূলবর্ণ (ى - س - ر) জিনস مثال يائى অর্থ– অধিক সহজ।

بَخِلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার بُخْلٌ মূলবর্ণ (ب - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– সে কৃপণতা করেছে, কার্পণ্য করেছে।

إِسْتَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِسْتِفْعَالٌ মাসদার إِسْتِغْنَاءٌ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করেছে।

عُسْرٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার عُسْرٌ মূলবর্ণ (ع ـ س ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– ক্লেশ দায়ক বস্তু, চরম কাঠিন্য, দুর্গম পথ, শক্ত জিনিস, কঠিন কাজ।

تَرَدّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَرَدِّىْ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অধঃপতিত হবে।

اَنْذَرْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি ভয় দেখালাম।

تَلَظّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَلَظِّىْ মূলবর্ণ (ل ـ ظ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– প্রজ্বলিত অগ্নি। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

اَشْقٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার اَلشَّقْوُ মূলবর্ণ (ش ـ ق ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– চরম হতভাগা।

اَتْقٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার وَقْىٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– অত্যন্ত পরহেজগার।

يَتَزَكّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَزَكِّىْ মূলবর্ণ (ز ـ ك ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে পবিত্র হয়।

تُجْزٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তার প্রতিদান দিতে হয়।

يَرْضٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার رِضًى মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى : এখানে واو টি হরফে আতফ। আর سَيُجَنَّبُهَا -এর سين টি حرف استقبال যা তাকিদের জন্য হয়েছে। আর يُجَنَّبُ ফে'ল। আর هَا হলো মাফউলে বিহী, আর الْاَتْقٰى হলো ফায়েল। আর الَّذِىْ হলো الْاَتْقٰى -এর সিফত, আর يُؤْتِىْ বাক্যটি الَّذِىْ -এর সেলাহ হয়েছে। আর مَالَهٗ হলো মাফউলে বিহী। আর يَتَزَكّٰى ফে'ল, তার উহ্য যমীর হলো ফায়েল, আর বাক্যটি হয়তো يُؤْتِىْ থেকে بدل হয়েছে। তখন এর কোনো اعراب -এর محل নেই। কেননা তখন সেটা الَّذِىْ -এর সেলাহ -এর অধীনে হয়ে যাবে। অথবা বাক্যটি يُؤْتِىْ -এর ফায়েল থেকে حال হবে অর্থাৎ مُتَزَكِّيًا بِهٖ عِنْدَ اللّٰهِ –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৩৬]

سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ

সূরা দুহা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ১১, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ দিনের আলোকের।	وَالضُّحٰى ﴿١﴾
২. আর রাত্রির, যখন তা প্রশান্ত হয়।	وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿٢﴾
৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগও করেনি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿٣﴾
৪. আর আপনার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহুগুণে উত্তম।	وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿٤﴾
৫. আর সত্বরই আল্লাহ আপনাকে [এরূপ বস্তু] দান করবেন, অনন্তর আপনি [তা পেয়ে] সন্তুষ্ট হবেন।	وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٥﴾
৬. আল্লাহ কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন।	اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٦﴾
৭. আর আল্লাহ আপনাকে [শরিয়ত হতে] বে-খবর পেয়েছিলেন, অনন্তর আপনাকে পথ দেখিয়েছেন।	وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿٧﴾
৮. আর আল্লাহ আপনাকে সম্বলহীন পেয়েছিলেন, অতঃপর সম্পদশালী করেছেন।	وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالضُّحٰى কসম দিনের আলোকের।

২. وَالَّيْلِ আর রাত্রির اِذَا سَجٰى যখন তা প্রশান্ত হয়।

৩. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগও করেননি وَمَا قَلٰى এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।

৪. وَلَلْاٰخِرَةُ আর পরকাল خَيْرٌ لَّكَ আপনার জন্য বহু গুণে উত্তম مِنَ الْاُوْلٰى ইহকাল আপেক্ষা।

৫. وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ আর সত্বরই আপনাকে দান করবেন رَبُّكَ আল্লাহ (তোমার প্রভু) فَتَرْضٰى অনন্তর আপনি (তা পেয়ে) সন্তুষ্ট হবেন।

৬. اَلَمْ يَجِدْكَ আল্লাহ কি আপনাকে পাননি يَتِيْمًا এতিম فَاٰوٰى অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

৭. وَوَجَدَكَ আর আল্লাহ আপনাকে পেয়েছিলেন ضَآلًّا (শরিয়ত হতে) বেখবর فَهَدٰى অনন্তর আপনাকে পথ দেখিয়েছেন।

৮. وَوَجَدَكَ আর আল্লাহ আপনাকে পেয়েছিলেন عَآئِلًا সম্বলহীন فَاَغْنٰى অতঃপর সম্পদশালী করেছেন।

৯. অতএব, আপনি এতিমের প্রতি কঠোরতা করবেন না।	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾
১০. আর ভিক্ষুককে ভর্ৎসনা করবেন না।	وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾
১১. আর স্বীয় প্রভুর দানসমূহের আলোচনা করতে থাকুন।	وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. فَأَمَّا الْيَتِيمَ অতএব, আপনি এতিমের প্রতি فَلَا تَقْهَرْ কঠোরতা করবেন না।

১০. وَأَمَّا السَّائِلَ আর ভিক্ষুককে فَلَا تَنْهَرْ ভর্ৎসনা করবেন না।

১১. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ আর স্বীয় প্রভুর দান সমূহের فَحَدِّثْ আলোচনা করতে থাকুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম শব্দ الضُّحٰى -কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ৪০টি বাক্য এবং ১০২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরার আলোচ্য বিষয় হতে জানা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনে ইসলামের প্রথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, কিছুদিন পর্যন্ত ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম ﷺ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে বারবার আশঙ্কা জাগছিল যে, আমার দ্বারা এমন কোনো অপরাধ তো হয়ে পড়েনি; যার কারণে আমার আল্লাহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। এরূপ মানসিক অবস্থায় এ সূরাটি নাজিল হয়। এতে নবী করীম ﷺ -কে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে– আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোনোরূপ অসন্তোষ নেই এবং ওহী নাজিল হওয়াও এ কারণে বন্ধ হয়ে যায়নি; বরং একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বন্ধ রাখা হয়েছে। দিনের আলোর পর রাতের নিঝুম অন্ধকারের প্রশান্তির মূলে যে লক্ষ্য কার্যকর থাকে তার পশ্চাতেও ঠিক তাই নিহিত রয়েছে। মূলকথা ওহীর তীব্র রশ্মি যদি আপনার উপর নিরবিচ্ছন্নভাবে আপতিত হতে থাকে এবং মোটেই অবকাশ দেওয়া না হতো, তাহলে আপনার স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ত। এ কারণে মাঝখানে বিরতি দেওয়া হয়েছে। এ বিরতিকালে আপনি সম্পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবেন। বস্তুত ওহী নাজিল হওয়ার প্রথমিককালে নবী করীম ﷺ -এর স্নায়ুমণ্ডলীর উপর এক দুঃসহ প্রভাব পড়ত। তখন পর্যন্তও ওহীর তীব্র চাপ সহ্য কারার অভ্যাস তাঁর হয়নি, এ কারণে এ ব্যাপারে মাঝে মধ্যে অবকাশ ও বিরতি দেওয়া অপরিহার্য ছিল। পরে অবশ্য এ চাপ সহ্য করার মতো শক্তি তাঁর মধ্যে জেগেছিল। সেজন্য প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম হওয়ার পর ওহী নাজিল হওয়ার ব্যাপারে বিরতি দেওয়ার তেমন কোনো প্রয়োজন হয়নি।

সূরার শেষভাগে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে বলেছেন– আপনার প্রতি আমি যেসব দয়া ও অনুগ্রহ করেছি, তার প্রত্যুত্তরস্বরূপ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আপনার কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত এবং আমার নিয়ামতসমূহের শোকর কিভাবে আদায় করা উচিত, তা আপনি উত্তমরূপে বুঝে নিন এবং স্মৃতিপটে আঁকিয়ে রাখুন।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করাই এ সূরার মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু। ওহী নাজিল হওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম ﷺ -এর মনে যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল, তা দূর করাই ছিল এ সূরার উদ্দেশ্য। সূরার শুরুতে দিনের দীপ্তি ও রাতের প্রশান্তির শপথ করা হয়েছে এবং নবী করীম ﷺ -কে সুসংবাদ শুনানো হয়েছে এই বলে যে, আপনার আল্লাহ আপনাকে কক্ষণই পরিত্যাগ করেননি। তিনি আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্টও নন; অল্প দিনের মধ্যেই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। আপনার পক্ষে প্রতিটি পরবর্তী পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় উত্তম হবে এবং এ পরিবর্তন অব্যাহত ধারায় হতে থাকবে। অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তা পেয়ে আপনি অত্যন্ত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হবেন। পরবর্তীকালে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। অথচ যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন এর কোনো সম্ভাবনাই জাগতিক দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন– আমি আপনাকে পরিত্যাগ করেছি এমন ধারণা আপনার মনে কেমন করে আসল? আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিছি– এমন ধারণা বশতঃ আপনি উদ্বিগ্নই বা হলেন

কেন? অথচ আপনার জন্ম হতেই আমি আপনার প্রতি ক্রমাগত ও অব্যাহত ধারায় অনুগ্রহ করে আসছি। আপনি তো এতিম ছিলেন, আমিই আপনার লালন-পালন ও হেফাজতের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আপনি পথের সন্ধানে ব্যাকুল ছিলেন, আমিই আপনাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। আপনি ছিলেন নিঃসম্বল আমিই আপনাকে সম্পদশালী করেছি। মোটকথা, শুরু হতেই আমার দয়া ও অনুগ্রহ আপনার উপর বর্ষিত হচ্ছিল।

পরিশেষে বলা হয়েছে, হে নবী! আপনার প্রতি আমি যেসব দয়া ও অনুগ্রহ দান করেছি, তার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আপনার কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত এবং কিভাবে আমার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করা উচিত তা আপনি ভালোভাবে বুঝে নিন এবং তদনুযায়ী আমল করুন।

সূরাটির ফজিলত : বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি এ সূরা তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করবেন যাদের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর সুপারিশ গৃহীত হবে। তা ছাড়া যত এতিম ও ভিক্ষুক আছে তাদের সংখ্যায় দশগুণ ছওয়াব তাকে দান করা হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এ সূরা ও তার পরবর্তী সূরাসমূহ পাঠ করার পর لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ তাকবীর পাঠ করা সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরা নাজিল হওয়ার পর উক্ত তাকবীর পাঠ করেছেন।

وَالضُّحٰى وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى .... الاية.

শানে নুযূল–১ : এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক ঘটনাবলি রয়েছে। তিরমিযীতে হযরত যুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি আংগুলিতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন– هَلْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ × وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ

তুমি তো একটি আংগুলিই যা রক্তাক্ত হয়ে গেছো। তুমি যে কষ্ট পেয়েছো তা আল্লাহর পথেই পেয়েছো। (কাজেই দুঃখ কিসের) এ ঘটনার পর কিছু দিন হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নীয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে দেয় যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আদ দুহা অবতীর্ণ হয়।

শানে নুযূল–২ : বুখারী শরীফে জুনদুব (রা.) থেকে আরও একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যার মধ্যে তাহাজ্জুদের আলোচনা রয়েছে। রেওয়ায়েতটির বিস্তারিত বিবরণ হলো একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় একবার দু'রাত তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে পারেননি। তখন রাসূল ﷺ-এর কাছে একজন মহিলা আসল। সে ছিল আবূ লাহাবের স্ত্রী আওরা বিন তোহার এবং সুফিয়ানের বোন এবং হারব ইবনে উমাইয়্যার কন্যা। তাকে উম্মে জামিলও বলা হতো। যিনি সূরা লাহাবে ঘোষিত حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ছিলেন। সে বলল, আমার মনে হয় তোমার উপর যে শয়তান আছর করেছে সে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে, কেননা আমি তাকে তোমার কাছে দু'তিন রাতধরে দেখতে পাচ্ছি না। এ পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ২০ : ৯২, বুখারী শরীফ]

শানে নুযূল–৩ : একবার কুরআন অবতরণের প্রথম ভাগে যাকে "ফাতরাতে ওহীর" কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশি দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইহুদিরা রাসূল ﷺ-এর কাছে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং তিনি পরে জবাব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছু দিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। সে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى (٤)

শানে নুযূল-১ : একদা নবী করীম ﷺ বললেন, আমার পর আমার উম্মতের বিজিত রাজ্যগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। তাতে আমার মন অত্যন্ত খুশি হয়েছে। সে প্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[২০ : ৯৫]

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى (٥)

শানে নুযূল : আসকারী, ইবনে মারদুভিয়া প্রমূখ হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত রাসূল ﷺ হযরত ফাতেমা (রা.)-এর নিকট গমন করে দেখতে পেলেন ফাতেমা চাকা দিয়ে আটা তৈরি করছে। তার পরিধানে রয়েছে উট রাখালের চাদর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তা দেখতে পেলেন, তিনি বললেন, হে ফাতেমা! সত্বরই পরলৌকিক আরাম আয়েশের জন্যে ইহলৌকিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে নাও। রাসূল ﷺ কর্তৃক ফাতেমা (রা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর ৩৬১/৬]

শানে নুযূল–২ : মুজাহিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও উবাই বিন কা'আব (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ যখন সূরা وَالضُّحٰى শেষ করতেন তখন পরবর্তী সকল সূরার শেষেই اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে তাকবীর বলতেন।

তাতে সূরার সাথে তাকবীর মিলিয়ে পড়তেন না বরং আলাদা করে পড়তেন। এর কারণ হচ্ছে হযরত নবী করীম ﷺ-এর প্রতি কোনো কারণ বশতঃ ওহী আসতে বিলম্বিত হওয়ার কারণে মুশরিকরা বলত যে, মুহাম্মদ এর রব মুহাম্মদকে পরিত্যাগ করেছে ও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। তখন এ সূরা নাজিল হয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনি বলেছিলেন আল্লাহু আকবর। সে কারণে পরবর্তী সকল সূরার শেষ করে তাকবীল বলা সুন্নত। তা হলো اَللّٰهُ اَكْبَرُ অথবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ –[কুরতুবী ৯৪/২০, দুররে মানছুর]

এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি অংগুলীতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন :

اِنْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ ۔ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ

অর্থাৎ তুমি তো একটি অংগুলিই যা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহর পথেই পেয়েছ। (কাজেই দুঃখ কিসের)। এ ঘটনার পর কিছু দিন হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে এই সূরা দুহা অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত হযরত জুনদুব (রা.)-এর রেওয়ায়েতে দু'এক রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠার কথা আছে–ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তিরমিযীতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য, উভয় ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে বিধায় উভয় রেওয়ায়েতে কোনো বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয় তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রেওয়ায়েতে আছে যে, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছিল। ওহী বিলম্বিত হওয়ার ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার কুরআন অবতরণের প্রথমভাগে, যাকে 'ফাতরাতে-ওহীর' কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশি দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিল এবং তিনি পরে জবাব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন 'ইনশাআল্লাহ' না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা দুহা অবতীর্ণ হয়, সেটাও এমনি ধরনের। সবগুলো ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া জরুরি নয় বরং আগে-পিছেও হতে পারে।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى : এখানে اُخْرَةٌ ও اُوْلٰى শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ পরকাল ও ইহকাল নেওয়া হলে এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা আপনার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এর আসারতা তো তারা ইহকালে দেখে নিবেই, অধিকন্তু আমি আপনাকে পরকালে নিয়ামত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে আপনাকে ইহকাল অপেক্ষা অনেক বেশি নিয়ামত দান করা হবে। এখানে اُخْرَةٌ কে শাব্দিক অর্থে নেওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা; যেমন اُوْلٰى শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আল্লাহর নিয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। এতে জ্ঞানগরিমা ও আল্লাহর নৈকট্যে উন্নতি লাভসহ জীবিকা এবং পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى : অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দেবেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কাম্যবস্তুই প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাম্যবস্তুসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের উন্নতি, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার, উম্মতের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভ, শত্রুদেশে ইসলামের কলেমা সমুন্নত করা ইত্যাদি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার উম্মতের একটি লোকও জাহান্নামে থাকবে। (কুরতুবী) হযরত আলী (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মত সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবুল করবেন এবং অবশেষে তিনি বলবেন : رَضِيْتَ يَا مُحَمَّدُ হে মুহাম্মদ! এখন আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি? আমি আরজ করব : يَارَبِّ رَضِيْتُ হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি সন্তুষ্ট। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বর্ণনা করেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কিত এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন : فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তি সম্বলিত অপর একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন : اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ -এরপর তিনি দু'হাত তুলে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন : اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করতে প্রেরণ করলেন : (এবং বললেন, অবশ্য আমি সব জানি)। জিবরাঈলের জবাবে তিনি বললেন : আমি আমার উম্মতের মাগফেরাত চাই। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে বললেন : যাও, গিয়ে বল যে, আল্লাহ তা'আলা উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং আপনাকে দুঃখিত করবেন না।

উপরে কাফেরদের বলাবলির জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ইহকালে ও পরকালে আল্লাহর নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। অতঃপর তিনটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করে এর কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হয়েছে : الم يجدك يتيما فاوى –এটা প্রথম নিয়ামত। অর্থাৎ আমি আপনাকে পিতৃহীন পেয়েছি। আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করেছিল। পিতা কোনো বিষয়-আশয়ও ছেড়ে যায়নি, যা দ্বারা আপনার লালন-পালন হতে পারত। অতঃপর আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ প্রথমে পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের ও পরে পিতৃব্য আবূ তালিবের অন্তরে আপনার প্রতি অগাধ ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছি। ফলে তারা ঔরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক যত্নসহকারে আপনাকে লালন-পালন করত।

দ্বিতীয় নিয়ামত : وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى : ضال শব্দের অর্থ পথভ্রষ্টও হয় এবং অনভিজ্ঞ, বেখবরও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। অতঃপর নবুয়তের পদ দান করে তাঁকে পথনির্দেশ দেওয়া হয়।

তৃতীয় নিয়ামত : وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰى : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত পেয়েছেন। অতঃপর আপনাকে ধনশালী করেছেন। হযরত খাদীজা (রা.)-এর ধনসম্পদ দ্বারা অংশীদারী কারবার করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়, অতঃপর হযরত খাদীজা (রা.)-কে বিবাহ করার ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়।

এ তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ – فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ قهر শব্দের অর্থ জবরদস্তিমূলকভাবে অধিকারভুক্ত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কোনো পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিশ মনে করে তার ধনসম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করে নেবেন না। একারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এতিমের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : মুসলমানদের সে গৃহই সর্বোত্তম যাতে কোনো এতিম রয়েছে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়। আর সে গৃহ সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোনো এতিম রয়েছে কিন্তু তার সাথে অসদ্ব্যবহার করা হয়। –[মাযহারী]

দ্বিতীয় নির্দেশ : وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ : نهر শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া এবং سَائِلَ -এর অর্থ সাহায্যপ্রার্থী। অর্থগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকার সাহায্যপ্রার্থী এর অন্তর্ভুক্ত। উভয়কে ধমক দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নিষেধ করা হয়েছে। সাহায্যপ্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জবাবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার করা নিষেধ। তবে যদি কোনো সাহায্যপ্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে যায় তবে প্রয়োজনে তাকে ধমক দেওয়াও জায়েজ।

তৃতীয় নির্দেশ : وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ : تَحْدِيْثٌ শব্দের অর্থ কথা বলা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সামনে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাও এক পন্থা। এমনকি একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তারও শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ তা'আলারও শোকর আদায় করে না। –[মাযহারী]

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তোমারও উচিত তার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া। যদি আর্থিক প্রতিদান দিতে অক্ষম হও, তবে মানুষের সামনে তার প্রশংসা কর। কেননা যে জ্ঞানসমক্ষে তার প্রশংসা করে, সে কৃতজ্ঞতার হক আদায় করে দেয়। –[মাযহারী]

মাস'আলা : সবরকম নিয়ামতের শোকর আদায় করাই ওয়াজিব। আর্থিক নিয়ামতের শোকর হলো তা থেকে কিছু খাঁটি নিয়তে ব্যয় করা। শরিরিক নিয়ামতের শোকর হলো শারিরিক শক্তিকে আল্লাহর ফরজ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করা। জ্ঞানগত নিয়ামতের শোকর হলো অপরকে তা শিক্ষা দেওয়া। –[মাযহারী]

সূরা দুহা থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার সাথে তকবীর বলা সুন্নত। শায়েখ সালেহ মিসরীর মতে এই তাকবীর হলো : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ –[মাযহারী]

ইবনে কাছীর প্রত্যেক সূরা শেষে এবং বগভী (র.) প্রত্যেক সূরার শুরুতে তাকবীর বলা সুন্নত বলেছেন। –(মাযহারী) উভয়ের মধ্যে যাই করা হবে, তাতে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

সূরা দুহা থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং কয়েকটি সূরায় কিয়ামত ও তার অবস্থাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মহান এবং যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। এই বিষয়বস্তু দ্বারাই কুরআন পাক শুরু করা হয়েছে এবং সেই সত্তার মহাত্ম্য বর্ণনা দ্বারা শেষ করা হয়েছে, যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

وَالضُّحٰى : শপথ প্রভাব বেলার। ضُحٰى-এর অর্থ, সূর্যের রশ্মি ছড়ানো ও দিন উদিত হওয়া। শাইখ মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদ, কামূসের মধ্যে স্পষ্ট লিখেন, ضُحٰى মুযাক্কারও আসে। আল্লামা আবুল ফযল জামাল কুরেশী লিখেন, ضُحٰى মুযাক্কারও আসে। আল্লামা আবুল ফযল জামাল কুরেশি আরো লিখেছন, যারা একে মুয়ান্নাছ বলেন, তাদের মতে এর বহুবচন ضَحْوَةٌ হবে। আর যারা মুযাক্কার বলেন, তাদের মতে এটি ইসম; فَعْلٌ-এর ওজনে। যেমন, صَرْدٌ শব্দটি। এটি যরফ গায়রে মুতামাক্কিন। যেমন, سَحْرٌ

سَجٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার سَجْوٌ মূলবর্ণ (س - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– প্রশান্ত হয়। ঠাণ্ডা হয়।

مَاوَدَّعَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْدِيْعٌ মূলবর্ণ (و - د - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– আপনাকে পরিত্যাগ করেননি। আপনাকে ছাড়েননি।

مَاقَلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قَلْيٌ মূলবর্ণ (ق - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বিরূপ ও হননি।

يُعْطِيْكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْطَاءٌ মূলবর্ণ (ع - ط - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে তোমাকে দেয়।

تَرْضٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার رَضْىٌ মূলবর্ণ (ر - ض - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

لَمْ يَجِدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف منفى بلم বাব ضَرَبَ মাসদার وَجْدٌ মূলবর্ণ (و - ج - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তিনি পাননি।

اٰوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْوَاءٌ মূলবর্ণ (أ - و - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং لفيف مقرون অর্থ– আশ্রয় দিয়েছেন।

هَدٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পথ দেখিয়েছেন।

عَائِلًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার عَيْلًا মূলবর্ণ (ع - ى - ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– সম্বলহীন, নিঃস্ব। অক্ষম।

اَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِغْنَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সম্পদশালী করেছেন।

فَلَا تَنْهَرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَهْرٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ر) জিনস صحيح অর্থ– ভর্ৎসনা করবেন না, ধমক দিবেন না।

فَحَدِّثْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْدِيْثٌ মূলবর্ণ (ح - د - ث) জিনস صحيح অর্থ– তুমি বর্ণনা করো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌلَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى : এখানে واو টা আতেফা। আর لام টা হলো لام الابتداء আর اَلْاٰخِرَةُ হলো মুবতাদা এবং خَيْرٌ হলো তার খবর। আর لَكَ টা خَيْرٌ-এর প্রথম متعلق হয়েছে। আর مِنَ الْاُوْلٰى টা خَيْرٌ-এর সাথে দ্বিতীয় متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৪২]

سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ مَكِّيَّةٌ

সূরা ইনশিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৮, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ [বিদ্যা ও সহিষ্ণুতা দ্বারা] প্রসারিত করে দেইনি?	اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾
২. আর আমি আপনার উপর হতে আপনার সেই ভার অপসারিত করেছি।	وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾
৩. যা আপনার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে রেখেছিল।	الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾
৪. আর আমি আপনার জন্য আপনার খ্যাতি সমুন্নত করেছি।	وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾
৫. অনন্তর [আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে] নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সঙ্গে [সঙ্গেই] স্বস্তি রয়েছে।	فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾
৬. নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সঙ্গে [সঙ্গেই] স্বস্তি রয়েছে।	اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾
৭. সুতরাং আপনি যখনই অবসর পান, তখনই [নফল ইবাদতে] পরিশ্রম করবেন।	فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿٧﴾
৮. আর নিজের প্রভুর দিকেই আগ্রহের দৃষ্টি রাখবেন।	وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلَمْ نَشْرَحْ আমি কি প্রসারিত করে দেইনি لَكَ আপনার জন্য صَدْرَكَ আপনার বক্ষ।

২. وَوَضَعْنَا আর আমি অপসারিত করেছি عَنْكَ আপনার উপর হতে وِزْرَكَ আপনার সেই ভার।

৩. الَّذِيْٓ اَنْقَضَ যা ভেঙ্গে রেখেছিল ظَهْرَكَ আপনার মেরুদণ্ড।

৪. وَرَفَعْنَا لَكَ আর আমি সমুন্নত করেছি ذِكْرَكَ আপনার খ্যাতি।

৫. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ অন্তর নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সঙ্গে রয়েছে। يُسْرًا স্বস্তি।

৬. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সঙ্গে রয়েছে। يُسْرًا স্বস্তি।

৭. فَاِذَا فَرَغْتَ সুতরাং আপনি যখনই অবসর পান فَانْصَبْ (নফল ইবাদতে) পরিশ্রম করবেন।

৮. وَاِلٰى رَبِّكَ আর নিজের প্রভুর দিকেই فَارْغَبْ আগ্রহের দৃষ্টি রাখবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের প্রথমাংশকে এর নাম হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ২৭টি বাক্য এবং ১০৩ টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু হতে অনুমতি হয় যে, পূর্ববর্তী সূরা আদ্ব-দুহা ও এ সূরাটি প্রায় একই সময় নাজিল হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি মক্কা শরীফে সূরা আদ্ব-দুহার পরে নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : মূলত এ সূরাতে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। নবুয়তের পূর্ববর্তী সময় নবী করীম ﷺ মক্কাবসীদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করতেই সমগ্র সমাজ ও জাতি যেন তাঁর শত্রুতে পরিণত হলো। তখন মক্কা নগরীতে তাঁর কথা শুনতে কেউই প্রস্তুত ছিল না। তারা প্রতি পদে পদে তাঁর সম্মুখে নানাবিধ সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি করতে লাগল। তাঁর জন্য এ সব খুবই মর্মন্তুদ ও নিরুৎসাহ ব্যাঞ্জক ছিল। এ কারণে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রথমে সূরা আদ্ব-দুহা ও পরে এ সূরাটি নাজিল হয়।

সূরাটিতে সর্বপ্রথম নবী করীম ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, আমি আপনাকে তিনটি বড় বড় নিয়ামত দান করেছি। এ নিয়ামতসমূহ বর্তমান থাকতে আপনার নিরুৎসাহ ও হৃদয় ভারাক্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। একটি হলো 'শরহে সদর' (বক্ষপ্রসারণ) -এর নিয়ামত। দ্বিতীয় নবুয়তের পূর্বে যে দুর্বহ বোঝা আপনার মেরুদণ্ড বাঁকা করে দিয়েছিল, আমি তা আপনার উপর হতে নামিয়ে দিয়েছি। আর তৃতীয় হলো তার উচ্চ ও ব্যাপক উল্লেখের নিয়ামত। একমাত্র আপনি ছাড়া সৃষ্টিলোকের অন্য কাউকে এরূপ নিয়ামত দান করা হয়নি।

অতঃপর সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে বর্তমানের কঠিনতাপূর্ণ ও দুষ্কর সময় খুব বেশি দীর্ঘ হবে না। এ সংকীর্ণতাপূর্ণ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই বিশালতা ও প্রশস্ততার ফল্গুধারা অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে।

পরিশেষে নবী করীম ﷺ-কে উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের এ কঠিনতা ও কঠোরতা, সামস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করার শক্তি আপনার মধ্যে একটি জিনিস হতেই আসবে। আর তা হলো, আপনি যখনই আপনার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যস্ততা হতে অবসর পাবেন, তখন আপনি ইবাদত-বন্দেগির শ্রম ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিমগ্ন হবেন। সবকিছু হতে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে নিবেন।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ .... الاية.

শানে নুযূল : যখন মুশরিকরা মুসলমানদের দারিদ্র ও অভাবের জন্যে তাদেরকে তিরস্কার করেছিল, তখন অত্র সূরা নাজিল হয়। –[কানযুন নুকূল : ১০৮]

সূরা দুহার শেষে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা দুহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি সূরায় বেশির ভাগ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি নিয়ামত ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মাত্র কয়েকটি সূরায় কিয়ামতের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সূরা ইনশিরাহেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদত্ত বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে এবং এ বর্ণনায়ও সূরা দুহার ন্যায় জিজ্ঞাসাবোধক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - شَرْحٌ শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য বক্ষকে প্রশস্ত করে দেওয়ার অর্থে বক্ষ উম্মুক্ত করা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য এক আয়াতে আছে : فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র বক্ষকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান-তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য এমন বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যে, বড় বড় পণ্ডিত-দার্শনিকও তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারে কাছে পৌঁছতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টির প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করত না। কোনো কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশে বাহ্যত ও তাঁর বক্ষ বিদারণ করে পরিষ্কার করেছিল কোনো কোনো তাফসীরবিদ এস্থলে বক্ষ উম্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই নিয়েছেন। –[ইবনে কাছীর]

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ - وزر -এর শাব্দিক অর্থ বোঝা আর نَقْض ظَهْر -এর শাব্দিক অর্থ কোমর ভেঙ্গে দেওয়া। অর্থাৎ কোমরকে নুইয়ে দেওয়া। কোনো বড় বোঝা কারো মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুয়ে পড়ে, তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার এক ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে যে, এতে সকল বৈধ ও অনুমোদিত কাজ বোঝানো হয়েছে, যা কোনো কোনো সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাৎপর্য ও উপযোগিতাবশত সম্পাদন করেছেন কিন্তু পরে জানা গেছে যে, কাজটি উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে ছিল এবং

তিনি আল্লাহর নৈকট্যের বিশেষ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই এ ধরনের কাজের জন্যও তিনি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত ও ব্যথিত হতেন। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সুসংবাদ শুনিয়ে সে বোঝা তাঁর উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ ধরনের কাজের জন্য আপনাকে পাকড়াও করা হবে না।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে বোঝার অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নবুয়তের প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ওহীর প্রতিক্রিয়াও গুরুতররূপে দেখা দিত। তদুপরি সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করা এবং কুফর ও শিরকের বিলোপ সাধন করে সমগ্র মানব জাতিকে তাওহীদে একত্রিত করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। এসব ব্যাপারে আদেশ ছিল : فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ অর্থাৎ আপনি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী সরলপথে অটল থাকুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই গুরুভার তিলে তিলে অনুভব করতেন। এক হাদীসে আছে, তাঁর দাড়ির কতক চুল সাদা হয়ে গেলে তিনি বললেন : فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ এই আয়াত আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।

এই বোঝাকেই তাঁর অন্তর থেকে সরিয়ে দেওয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে উক্ত হয়েছে। একে সরানোর পন্থা পরের আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আপনার প্রত্যেক কষ্টের পর স্বস্তি আসবে। আল্লাহ তা'আলা বক্ষ উন্মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর মনোবল আকাশচুম্বী করে দেন। ফলে প্রত্যেক কঠিন কাজই তাঁর কাছে সহজ মনে হতে থাকে এবং কোনো বোঝাই আর বোঝা থাকেনি।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ –রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আলোচনা উন্নত করা এই যে, ইসলামের বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহর নামের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। সারা বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিম্বরে 'আশহাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাথে সাথে 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'ও বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বের কোনো জ্ঞানী মানুষ তাঁর নাম সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান হয়।

এখানে তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে– شَرْحُ صَدْرٍ (বক্ষ উন্মোচন) وَضْعُ وِزْرٍ (বোঝা লাঘবকরণ) ও رَفْعُ ذِكْرٍ (আলোচনা উন্নতকরণ)। এগুলোকে তিনটি বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাক্যে কর্তা ও কর্মের মাঝখানে لَكَ অথবা عَنْكَ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব কাজ আপনার খাতিরেই করা হয়েছে।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا আরবি ভাষার একটি নীতি এই যে, আলিফ ও লাম যুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তুসত্তা অর্থ হয়ে থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে اَلْعُسْرُ শব্দটি যখন পুনরায় اَلْعُسْرُ উল্লিখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল যে, উভয় জায়গায় একই عُسْر অর্থাৎ কষ্ট বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে يُسْرًا শব্দটি উভয় জায়াগায় আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে উল্লিখিত হয়েছে। এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় يُسْر তথা স্বস্তি প্রথম يُسْر তথা স্বস্তি থেকে ভিন্ন। অতএব আয়াতে اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -এর পুনরুল্লেখ থেকে জানা গেল যে, একই কষ্টের জন্য দু'টি স্বস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু' -এর উদ্দেশ্যও ঐখানে বিশেষ দু'-এর সংখ্যা নয়; বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি কষ্টের সাথে তাঁকে অনেক স্বস্তিদান করা হবে।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে এই আয়াত থেকে দু'টি সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ অর্থাৎ এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রবল হতে পারে না। সেমতে মুসলমান ও অমুসলমানদের লিখিত সব ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, যে কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর বরং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সে কাজ সহজতর হয়ে গিয়েছিল।

শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য একান্তে জিকির ও আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা জরুরি : فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ অর্থাৎ আপনি যখন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ থেকে অবসর পান, তখন অন্য কাজের জন্য তৈরি হয়ে যান। আর তা হলো এই যে, আল্লাহর জিকির, দোয়া ও ইস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করুন। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ তাফসীরই করেছেন। কেউ কেউ অন্য তাফসীরও করেছেন কিন্তু এটাই অধিকতর বোধগম্য তাফসীর। এর সারমর্ম এই যে, দাওয়াত, তাবলীগ, মানুষকে পথপ্রদর্শন করা এবং তাদের সংশোধনের চিন্তা করা-এসবই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্ববৃহৎ ইবাদত। কিন্তু এটা সৃষ্টিজীবের মধ্যস্থতায় ইবাদত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কেবল এজাতীয় পরোক্ষ ইবাদত করে ক্ষান্ত হবেন না বরং যখনই এ ইবাদত থেকে অবসর পাবেন, তখন একান্তে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করুন। তাঁর কাছেই প্রত্যেক কাজে সাফল্য লাভের দোয়া করুন। আল্লাহর জিকির

ও প্রত্যক্ষ ইবাদতই তো আসল উদ্দেশ্য। এর জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই পরোক্ষ ইবাদত থেকে অবসর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা এক প্রয়োজনের ইবাদত। এ থেকে অবসর পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষ ইবাদত তথা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা এমন বিষয়, যা থেকে মু'মিন ব্যক্তি কখনো অবসর পেতে পারে না। বরং তার জীবন ও সর্বশক্তি এতে ব্যয় করতে হবে।

এ থেকে জানা গেল যে, আলিম সমাজ, যারা শিক্ষা, প্রচার ও জনসংশোধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের কিছু সময় আল্লাহর জিকির ও আল্লাহর দিকে মনোনিবেশে ব্যয়িত হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণ এরূপই ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা এবং প্রচারকার্যও কার্যকর হয় না এবং তাতে বরকতও হয় না। فَانْصَبْ শব্দটি نَصَبٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পরিশ্রম ও ক্লান্তি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদত ও জিকির এতটুকু করা উচিত যে, তাতে কিছু কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভূত হয়। আরাম পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত নয়। কোনো ওযিফা কিংবা নিয়ম মেনে চলাও এক প্রকার কষ্ট ও ক্লান্তি, যদিও কাজ সামান্যই হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلَمْ نَشْرَحْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف منفى بلم বাব فَتَحَ মাসদার شَرْحٌ মূলবর্ণ (ش - ر - ح) জিনস صحيح অর্থ– আমি কি প্রসারিত করে দেইনি।

صَدْرَ : শব্দটি একবচন; বহুবচন صدور অর্থ– বুক, বক্ষ।

وَضَعْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার وَضْعٌ মূলবর্ণ (و - ض - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– আমি অপসারিত করেছি।

وِزْرَكَ : ইসম (যবর বিশিষ্ট) মুযাফ। ك মুযাফ ইলাইহি। অর্থ– তোমার বোঝা।

اَنْقَضَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْقَاضٌ মূলবর্ণ (ن - ق - ض) জিনস صحيح অর্থ– ভেঙ্গে রেখেছিল।

ظَهْرَ : অর্থ– পিঠ। ظهر ও بطن দুটি বিপরীত অঙ্গের নাম। بَطْنٌ অর্থ, পেট।

رَفَعْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার رَفْعٌ মূলবর্ণ (ر - ف - ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি উঁচু করেছি, আমি উঠিয়েছি।

اَلْعُسْرُ : কঠিন, শক্ত, কষ্ট, ক্লেশ, সমস্যা, সংকীর্ণতা, দারিদ্র, বিপদ। يُسْرٌ -এর বিপরীত শব্দ ও মাসদার। এর ফে'ল বাবে كَرُمَ ও سَمِعَ থেকে আসে। কারণ, অভাবের সাথে বিপদ ও কষ্ট-ক্লেশ আছে। তাই এটি অভাবী বা বিপদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। কামূসের মধ্যে আছে, ع ও س উভয়ের উপর পেশ দিয়ে আসে। আবার উভয়টিকে যবর দিয়েও আসে। এটি يُسْرٌ -এর বিপরীত।

فَرَغْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার فَرَاغٌ মূলবর্ণ (ف - ر - غ) জিনস صحيح অর্থ– আপনি অবসর পান।

اِنْصَبْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার نَصَبٌ মূলবর্ণ (ن - ص - ب) জিনস صحيح অর্থ– পরিশ্রম করুন।

اِرْغَبْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার رَغْبَةٌ মূলবর্ণ (ر - غ - ب) জিনস صحيح অর্থ– আগ্রহের দৃষ্টি রাখবেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَرَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ : এখানে واو টি হরফে আতফ رَفَعْنَا ফে'ল আর نا হলো ফায়েল। আর لَكَ টা رَفَعْنَا -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর ذِكْرَكَ হলো মাফউলে বিহী। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৪৯]

سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ
সূরা তীন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৮, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ আনজীর ও যায়তূনের।	وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ﴿١﴾
২. আর শপথ সিনাই পর্বতের।	وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ﴿٢﴾
৩. আর শপথ এই শান্তিময় নগর [মক্কা শরীফ]-এর।	وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ﴿٣﴾
৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছি।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْۤ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ﴿٤﴾
৫. অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। নীচ থেকে নীচে।	ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ﴿٥﴾
৬. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, অনন্তর তাদের জন্য এরূপ প্রতিদান রয়েছে যা কখনো নিঃশেষ হবে না।	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٦﴾
৭. অতঃপর কোন বস্তু তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করছে?	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالتِّيْنِ শপথ আনজীর وَالزَّيْتُوْنِ ও যায়তূনের।

২. وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ আর শপথ সিনাই পর্বতের।

৩. وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ আর শপথ এই শান্তিময় নগর (মক্কা শরীফ) -এর।

৪. لَقَدْ خَلَقْنَا নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি الْاِنْسَانَ মানুষকে فِيْۤ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অত্যন্ত সুন্দর গঠনে।

৫. ثُمَّ رَدَدْنٰهُ অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ নীচ থেকে নীচে।

৬. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا কিন্তু যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং ভালো কাজ করেছে فَلَهُمْ اَجْرٌ অনন্তর তাদের জন্য এরূপ প্রতিদান রয়েছে غَيْرُ مَمْنُوْنٍ যা কখনো নিঃশেষ হবে না।

৭. فَمَا يُكَذِّبُكَ অতঃপর কোন বস্তু তোমাকে আবিশ্বাসী করছে? بَعْدُ بِالدِّيْنِ কেয়ামত সম্বন্ধে।

৮. আল্লাহই কি সমস্ত বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?	اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. اَلَيْسَ اللّٰهُ আল্লাহই কি নন بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ সমস্ত বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : اَلتِّيْنِ। অর্থ : আনজীর, ডুমুর বা ঐরূপ ফল বিশেষ। কেউ কেউ একে পর্বত-প্রান্তর অথবা মসজিদ বিশেষের নাম বলে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য সূরার প্রথম শব্দ 'ত্বীন' হতে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ৩৪টি বাক্য এবং ১৫৯টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, সূরাটি মাদানী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে দু'টি বর্ণনা রয়েছে, একটিতে মক্কায় অপরটিতে মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। এটা মাক্কী সূরা হওয়ার সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ হলো, এতে মক্কা শরীফ সম্পর্কে هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ (এ শান্তির শহর) শব্দ কয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা যদি মদীনায় অবতীর্ণ হতো, নিশ্চয় মক্কা শহরকে 'এ শহর' বলা হতো না। এ ছাড়া সূরাটির মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে একটু চিন্তা করলেও মনে হয়, তা মক্কা শরীফে নবুয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের যে বাচনভঙ্গি, সংক্ষিপ্ত আয়াত ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা ধারা, তা এতে পুরাপুরি বর্তমান। পরকালে শুভ কর্মফল ও শাস্তি অপরিহার্য এবং অতীব যুক্তিসঙ্গত, এ কথাই এতে বুঝানো হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরাটি সর্বসম্মত মতে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। এতে ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম–এ তিনটি প্রধান ধর্ম এবং এর জগদ্বিখ্যাত প্রবর্তকত্রয়ের ধর্ম ও কর্মের বিকাশ স্থাপনের শপথ করে মানবের উৎপত্তি ও পরিণতির বিষয় বিবৃত করা হয়েছে।

ভালো কাজের ভালো ফল এবং মন্দ কাজের শাস্তি প্রমাণই এর বিষয়বস্তু। এ কথা প্রমাণের জন্যই নবী-রাসূলগণের অভ্যুদয়ের স্থানসমূহের নামে শপথ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে অতি উত্তম আকৃতি বিশিষ্ট ও সুঠাম করে সৃষ্টি করেছেন। নবুয়তের ন্যায় উচ্চতম মর্যাদার ধারক লোক এই মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে– মানুষ দু' প্রকার–

১. যারা অতি উত্তম মান ও কাঠামোতে সৃষ্টি হওয়ার পর খারাপ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নৈতিক অধঃপতনের এত নিম্নস্তরে পৌঁছে, যে পর্যন্ত অন্য কোনো সৃষ্টি যেতে পারে না।

২. যারা ঈমান ও নেক আমলের পথ অবলম্বন করে এ পতন হতে রক্ষা পেয়ে যায় এবং উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানব সমাজের সর্বত্র ও সর্বদাই এ দু' প্রকারের বাস্তবতার কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সূরার শেষভাগে উপরিউক্ত বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে– মানুষের মাঝে যখন এ দু' ধরনের পরস্পর বিরোধী স্বভাবের মানুষ বর্তমান দেখা যায়, তখন কর্মফলকে অস্বীকার করা যেতে পারে না। অধঃপতনে পতিত লোকদেরকে কোনো শাস্তি এবং উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত লোকদেরকে কোনো পুরস্কার যদি না-ই দেওয়া হয়, তাহলে আল্লাহর আদালতে বে-ইনসাফী ও অবিচার প্রমাণিত হয়। অথচ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। অতএব, এ ব্যাপার নিঃসন্দেহ যে, মহাবিচারক আল্লাহ অধঃপতিতদেরকে চরম শাস্তি দিবেন এবং ঈমান ও কর্ম দ্বারা উন্নত মর্যাদার অধিকারীদেরকে যারপরনাই পুরস্কার দান করবেন।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ.

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, কিছু লোক এমন ছিল যারা শেষ বয়সে উপনীত হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তখন তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাওয়ার সময়কালের কৃতকর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে একথার জানানদেন যে, আল্লাহ পাক তাদের সেই কৃতকর্মের প্রতিদান দিবেন যা তারা বুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বে করেছিল। –[কানযুন নুকূল : ১০৯]

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ –এ সূরায় চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এক. তীন অর্থাৎ আঞ্জীর তথা ডুমুর বৃক্ষ। দুই. যায়তূন বৃক্ষ। তিন. তূরে সিনীন। চার. মক্কা মোকাররমা। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তূর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যায়তূন বৃক্ষও বহুল উপকারী। এটাও সম্ভবপর যে, এখানে তীন ও যায়তূন উল্লেখ করে সে স্থান বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শাম দেশ, যা পয়গম্বরগণের আবাসভূমি। হযরত ইবরাহীম (আ.)ও সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মক্কা মোকাররমায় আনা হয়েছিল। এভাবে উপরিউক্ত শপথসমূহে সেসব পবিত্র ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। শাম দেশ অধিকাংশ পয়গম্বরের আবাসভূমি। তূর পর্বত হযরত মূসা (আ.)-এর আল্লাহর সাথে বাক্যালাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা তূর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর শেষনবী ﷺ-এর জন্মস্থান ও বাসস্থান।

শপথের পর বলা হয়েছে : لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ - تَقْوِيْم -এর শাব্দিক অর্থ কোনো কিছুর অবয়ব ও ভিত্তিকে ঠিক করা।

اَحْسَنِ تَقْوِيْم -এর উদ্দেশ্য এই যে, তার মজ্জা ও স্বভাবকেও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর : মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন। ইবনে আরাবী (র.) বলেন : আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞানী, শক্তিমান, বক্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি। সেমতে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে : اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে নিজের আকারে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এটাই হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার কতিপয় গুণাবলি কোনো কোনো পর্যায়ে তাকেও দেওয়া হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তা'আলার কোনো আকার নেই। –[কুরতুবী]

মানব সৌন্দর্যের একটি অভাবনীয় ঘটনা : কুরতুবী এস্থলে বর্ণনা করেন, ঈসা ইবনে মূসা হাশেমী খলীফা আবূ জা'ফর মানসূরের একজন বিশেষ সভাসদ ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। একদিন জোসনা রাত্রিতে স্ত্রীর সাথে বসে হাসি তামাশার ছলে বলে ফেললেন : اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا اِنْ لَمْ تَكُوْنِىْ اَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ অর্থাৎ তুমি তিন তালাক, যদি তুমি চাঁদ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী না হও। একথা বলতেই স্ত্রী উঠে পর্দায় চলে গেল এবং বলল : আপনি আমাকে তালাক দিয়েছেন। ব্যাপারটি যদিও হাসি তামাশার ছিল কিন্তু বিধান এই যে, পরিষ্কার তালাক শব্দ হাসি তামাশার ছলে উচ্চারণ করলেও তালাক হয়ে যায়। ঈসা ইবনে মূসা চরম অস্থিরতার মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করলেন। প্রত্যুষে খলীফা আবূ জা'ফর মনসূরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। খলীফা শহরের ফতওয়াবিদ আলিমগণকে ডেকে মাস'আলা জিজ্ঞেস করলেন। সবাই এক উত্তর দিলেন যে, তালাক হয়ে গেছে। কেননা তাদের মতে চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর হওয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভবপরই নয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার জনৈক শিষ্য আলিম চুপচাপ বসে ছিলেন। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিশ্চুপ কেন? তখন তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করে আলোচ্য সূরা তীন তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন : আমিরুল মু'মিনীন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ মাত্রই অবয়ব সুন্দরতম। কোনো কিছুই মানুষ অপেক্ষা সুন্দর নয়। একথা শুনে উপস্থিত আলিমগণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন এবং কেউ বিরোধিতা করলেন না। সেমতে খলীফা তালাক হয়নি বলে রায় দিয়ে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দররূপ ও সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এবং শারীরিক গড়নের দিক দিয়েও। তার মস্তকে কেমন অঙ্গ কি কি আশ্চর্যজনক কাজ করছে– মনে হয় যেন একটি ফ্যাক্টরী, যাতে নাযুক, সূক্ষ্ম ও স্বয়ংক্রিয় মেশিন চালু রয়েছে। তার বক্ষ ও পেটের অবস্থাও তদ্রূপ। তার হস্তপদের গঠন ও আকার হাজারো উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই দার্শনিকগণ বলেন : মানুষ একটি ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ সমগ্র জগতের একটি মডেল। সমগ্র জগতে যেসব বস্তু ছড়িয়ে আছে, তা সবই মানুষের মধ্যে সমবেত আছে। –[কুরতুবী]

সূফী বুযুর্গগণও এ বিষয়ের সমর্থন করেছেন এবং কেউ কেউ মানুষের আপদমস্তক বিশ্লেষণ করে তাতে জগতের সব বস্তুর নমুনা দেখিয়েছেন।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ –পূর্বের আয়াতে মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরতম সৃষ্টি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীতে বলা হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রারম্ভে যেমন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তার বাহ্যিক ও শারিরিক অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। যৌবন অস্তমিত হয়ে গেলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ধক্য এসে তাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। সে কুশ্রী দৃষ্টিগোচার হতে থাকে এব কর্মক্ষমতা হারিয়ে অপরের উপর বোঝা হয়ে যায়। কারো কোনো উপকারে আসে না। অন্যান্য জীবজন্তু এর বিপরীত। তারা শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে। মানুষ তাদের কাছ থেকে দুগ্ধ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য বহু রকম কাজ নেয়। তাদেরকে জবাই করা হলে অথবা তারা মারা গেলেও তাদের চামড়া, পশম, অস্থি মানুষের কাজে আসে। কিন্তু মানুষ যখন বার্ধক্যে অক্ষম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও তার কোনো অংশ দ্বারা কোনো মানুষ অথবা জন্তুর উপকার হয় না। সারকথা, মানুষ সে নিকৃষ্টদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এর অর্থ তা বৈষয়িক ও শারিরিক অবস্থা। হযরত যাহ্হাক প্রমুখ থেকে এ তাফসীরই বর্ণিত রয়েছে। –[কুরতুবী]

এ তাফসীর অনুযায়ী পরের আয়াতে মু'মিন সৎকর্মীর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মু'মিন সৎকর্মী বার্ধক্যের অক্ষম ও অপারগ হয় না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের দৈহিক বেকারত্ব ও বৈষয়িক অকর্মণ্যতার ক্ষতি তাদের হয় না বরং ক্ষতি কেবল তাদের হয় যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও যোগ্যতা বৈষয়িক উন্নতিতেই ব্যয় করেছিল। এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই। কিন্তু মু'মিন সৎকর্মীর পুরস্কার ও ছওয়াব কোনো সময়ই নিঃশেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ধক্যের বেকারত্ব ও অপারগতার সম্মুখীন হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখই সুখ বিদ্যমান থাকে। বার্ধক্যজনিত বেকারত্ব ও কর্ম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলনামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। হযরত আনাস (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোনো মুসলমান অসুস্থত হয়ে পড়লে আল্লাহ তা'আলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সৎ কর্ম করত, সেগুলো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাক। –(বুখারী) এছাড়া এস্থলে মু'মিন সৎ কর্মীর প্রতিদান জান্নাত ও তার নিয়ামত বর্ণনা করার পরিবর্তে বলা হয়েছে : لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ –অর্থাৎ তাদের পুরস্কার কখনো বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত হবে না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তাদের এই পুরস্কার দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদের জন্য বার্ধক্যে এমন খাঁটি সহচর জুটিয়ে দেন, যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে আত্মিক উপকারিতা লাভ করতে থাকেন এবং তাদের সর্বপ্রকার সেবাযত্ন করেন। এভাবে বার্ধক্যের যে স্তরে মানুষ বৈষয়িক ও দৈহিক দিক দিয়ে অকেজো, বেকার ও অপরের উপর বোঝারূপে গণ্য হয়, সে স্তরেও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ বেকার থাকেন না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এরূপ তাফসীর করেছেন যে, رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ –সাধারণ মানুষের জন্য নয় বরং কাফের ও পাপাচারীদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ প্রদত্ত সুন্দর অবয়ব, গুণগত উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে বরবাদ করে দেয়। এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসাবে তাদেরকে হীনতম পর্যায়ে পৌছে দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বাক্যের ব্যতিক্রম বাহ্যিক অর্থেই বহাল থাকে। অর্থাৎ যারা মু'মিন ও সৎকর্মী, তাদেরকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌছানো হবে না। কেননা তাদের পুরস্কার সব সময়ই অব্যাহত থাকবে। –[মাযহারী]

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ –এতে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহর কুদরতের উপরিউক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্য পরকাল ও কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কি সব বিচারকের মহা বিচারক নন?

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সূরা তীনের اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ পর্যন্ত পাঠ করে, তার উচিত وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ বলা। সেমতে ফিকহবিদগণের মতেও এই বাক্যটি পাঠ করা মোস্তাহাব।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَحْسَنَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْحُسْنُ মূলবর্ণ (ح - س - ن) জিনস صحيح অর্থ– খুব উত্তম, ভালো।

تَقْوِيْمٌ : মাসদার। বাব تَفْعِيْل মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– ঠিক করা, উত্তমরূপে গঠন করা।

رَدَدْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ফিরিয়ে দিয়েছি।

أَسْفَلَ : اسم تفضيل সর্বনিম্ন। أَعْلٰى-এর বিপরীত বাব نَصَرَ মাসদার سُفُوْلٌ মূলবর্ণ (س - ف - ل) জিনস صحيح অর্থ– নীচ থেকে নিচে।

سَافِلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّفُوْلُ মূলবর্ণ (س - ف - ل) জিনস صحيح অর্থ– নীচ।

مَمْنُوْنٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার مَنٌّ মূলবর্ণ (م - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– হ্রাসকৃত। কর্তনকৃত।

يُكَذِّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْذِيْبٌ মূলবর্ণ (ك - ذ - ب) জিনস صحيح অর্থ– অবিশ্বাস করছে।

أَحْكَمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُكْمُ মূলবর্ণ (ح - ك - م) জিনস صحيح অর্থ, উত্তম বিচারক। শ্রেষ্ঠ বিচারক।

حَاكِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُكْمُ মূলবর্ণ (ح - ك - م) জিনস صحيحঅর্থ– বিচারক, হাকিম, জজ, হুকুমদাতা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ : এখানে ثُمَّ টি হরফে আতফ। আর رَدَدْنٰهُ হলো ফে'ল, যমীর نَا ফায়েল। আর ه হলো مفعول به আর أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ টা মাফউলে বিহী থেকে حال হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮]

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ

সূরা 'আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৯, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. হে পয়গাম্বর! আপনি নিজ প্রভুর নাম নিয়ে কুরআন পাঠ করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন।	اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ﴿١﴾
২. যিনি মানুষকে জমাট রক্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾
৩. আপনি কুরআন পাঠ করুন, আর আপনার প্রভু মহামহিমান্বিত।	اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿٣﴾
৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।	الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾
৫. মানুষকে ঐ সমস্ত জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।	عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾
৬. সত্যি সত্যিই, নিঃসন্দেহে মানুষ সীমা হতে বের হয়ে যায়।	كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ﴿٦﴾
৭. এ কারণে যে, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে।	اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ﴿٧﴾
৮. [হে শ্রোতা!] তোমার প্রতিপালকের দিকেই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।	اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِقْرَاْ [হে পয়গাম্বর!] আপনি কুরআন পাঠ করুন بِاسْمِ رَبِّكَ নিজ প্রভুর নাম নিয়ে الَّذِىْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন।

২. خَلَقَ الْاِنْسَانَ যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন مِنْ عَلَقٍ জমাট রক্ত দ্বারা।

৩. اِقْرَاْ আপনি কুরআন পাঠ করুন وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ আর আপনার প্রভু মহামহিমান্বিত।

৪. الَّذِىْ عَلَّمَ যিনি শিক্ষা দিয়েছেন بِالْقَلَمِ কলমের সাহায্যে।

৫. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ মানুষকে ঐ সমস্ত জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন مَا لَمْ يَعْلَمْ যা সে জানত না।

৬. كَلَّا সত্যি সত্যিই اِنَّ الْاِنْسَانَ নিঃসন্দেহে মানুষ لَيَطْغٰى সীমা হতে বের হয়ে যায়।

৭. اَنْ رَّاٰهُ এ কারণে যে, সে নিজেকে মনে করে اسْتَغْنٰى অমুখাপেক্ষী।

৮. اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ [হে শ্রোতা!] তোমার প্রতিপালকের দিকেই সকল কে করতে হবে الرُّجْعٰى প্রত্যাবর্তন।

বাংলা অনুবাদ	আরবি আয়াত
৯. [হে শ্রোতা!] আচ্ছা তুমি কি তাকে দেখেছ, যে নিষেধ করে।	أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿٩﴾
১০. [আমার] এক [বিশিষ্ট] বান্দাকে যখন সে নামাজ পড়ে।	عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿١٠﴾
১১. [হে শ্রোতা!] আচ্ছা এটা তো বল, যদি সে বান্দা সৎপথে থাকে।	أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١١﴾
১২. অথবা সে পরহেজগারীর শিক্ষা দান করে [তবে কি তার বিরোধিতা সঙ্গত হয়?]	أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿١٢﴾
১৩. [হে শ্রোতা!] আচ্ছা বল তো, যদি সে ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বিমুখ হয়।	أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٣﴾
১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ [তার কার্যাবলি] দেখছেন।	أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾
১৫. সাবধান! যদি সে ফিরে না আসে, তবে আমি ললাটের কেশগুচ্ছ ধরে তাকে হেঁচড়াব।	كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾
১৬. যে কেশগুচ্ছ মিথ্যা ও পাপযুক্ত।	نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾
১৭. অনন্তর সে স্বীয় পরিষদবর্গকে আহ্বান করুক।	فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾
১৮. আমিও দোজখের পেয়াদাদেরকে আহ্বান করব।	سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾
১৯. সাবধান! আপনি তার কথা মানবেন না আর আপনি [রীতিমতো] নামাজ পড়তে থাকুন এবং [আল্লাহর] নৈকট্য লাভ করতে থাকুন।	كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. أَرَءَيْتَ الَّذِي [হে শ্রোতা!] আচ্ছা তুমি কি তাকে দেখেছ يَنْهَىٰ যে নিষেধ করে।

১০. عَبْدًا এক বান্দাকে إِذَا صَلَّىٰ যখন সে নামাজ পড়ে।

১১. أَرَءَيْتَ إِن كَانَ হে শ্রোতা। আচ্ছা এটাতো বল যদি সে বান্দা থাকে عَلَى الْهُدَىٰ সৎপথে।

১২. أَوْ أَمَرَ অথবা সে শিক্ষা দান করে بِالتَّقْوَىٰ পরহেজগারীর।

১৩. أَرَءَيْتَ [হে শ্রোতা!] আচ্ছা বলতো إِن كَذَّبَ যদি সে ধর্মকে অস্বীকার করে وَتَوَلَّىٰ এবং বিমুখ হয়।

১৪. أَلَمْ يَعْلَم সে কি জানে না بِأَنَّ اللَّهَ যে, আল্লাহ يَرَىٰ দেখছেন।

১৫. كَلَّا সাবধান! لَئِن لَّمْ يَنتَهِ যদি সে ফিরে না আসে لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ তবে আমি ললাটের কেশ গুচ্ছ ধরে তাকে হেঁচড়াব।

১৬. نَاصِيَةٍ যে কেশ গুচ্ছ كَاذِبَةٍ মিথ্যা خَاطِئَةٍ ও পাপযুক্ত।

১৭. فَلْيَدْعُ অনন্তর সে আহ্বান করুক نَادِيَهُ স্বীয় পরিষদবর্গকে।

১৮. سَنَدْعُ আমিও আহ্বান করব الزَّبَانِيَةَ দোজখের পেয়াদাদেরকে।

১৯. كَلَّا সাবধান! لَا تُطِعْهُ আপনি তার কথা মানবেন না وَاسْجُدْ আর আপনি নামাজ পড়তে থাকুন وَاقْتَرِب এবং (আল্লাহর) নৈকট্য লাভ করতে থাকুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : عَلَق অর্থ : রক্ত অথবা তার ঘনীভূত প্রগাঢ় অবস্থা। এর অন্য অর্থ জলৌকাকৃতি ক্ষুদ্রতর কীটাণু বা শুক্রকীট। এর মর্মার্থে প্রেম-প্রীতি, আসক্তি, আকর্ষণ ও আলিঙ্গন প্রভৃতিও পরিগ্রহণ করা যেতে পারে। এ 'আলাক্ব' ই হচ্ছে মানব সৃষ্টির একটি মূল উপাদান। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতের আলাক্ব শব্দ হতেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

এ সূরার অন্য নাম 'ইকরা'। অত্র সূরাতেই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাঠ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। পাঠ করার নির্দেশকে আরবি 'ইকরা' দিয়ে বুঝানো হয়। তাই সূরার নাম 'ইকরা' রাখা হয়েছে।

অত্র সূরার অন্য আরেক নাম 'ক্বালাম'। কেননা ৪র্থ আয়াতে عَلَّمَ بِالْقَلَمِ বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় ১৯টি আয়াত, ৭২টি বাক্য এবং ১২২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : আলোচ্য সূরাটির দু'টি অংশ। এক অংশ শুরু হতে পঞ্চম আয়াত مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى হতে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত চলেছে। অধিকাংশ আলেমগণের মতে, নবী করীম ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ এটাই সর্বপ্রথম ওহী। হযরত আয়েশা (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) সহ বিপুল সংখ্যক সাহাবী হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এ পাঁচটি আয়াতই সর্ব প্রথম নাজিল হয়েছে। সূরাটির দ্বিতীয় অংশ পরবর্তীকালে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ যখন হারাম শরীফে নামাজ পড়তে শুরু করলেন এবং আবূ জাহল তাকে ধমক দিয়ে এ কাজ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করছিল ঠিক সে সময় এ দ্বিতীয় অংশ নাজিল হয়।

সূরার বিষয়বস্তু : সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। এই সূরাটির দু'টি অংশ। পথমাংশ প্রথম হতে পঞ্চম আয়াতের مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতই হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ এবং এটা অবতীর্ণ হয়েছিল পবিত্র মক্কার অনতিদূরে হেরা গিরিগুহায়।

সূরার দ্বিতীয় অংশটি পরবর্তীকালে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ যখন হেরেম শরীফে নামাজ পড়তে শুরু করেছিলেন এবং আবূ জাহল ধমক দিয়ে এই কাজ হতে তাঁকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিল, ঠিক সেই সময়ই এই দ্বিতীয় অংশ নাজিল হয়। পরে নাজিল হওয়া এ অংশ প্রথম নাজিল হওয়া আয়াতের পরে সংযোজিত হয়েছে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক সংযোজন। কেননা প্রথম ওহী বা প্রত্যাদেশ নাজিল হওয়ার পর ইসলামের পথম প্রকাশ ঘটেছিল এ নামাজেরই মাধ্যমে; কাফেরদের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও নামাজের কারণেই শুরু হয়েছিল। অত্র সূরার কয়টি আয়াতে সংক্ষেপে মানুষ সৃষ্টির রহস্য, অজানাকে জানানো ও জ্ঞান দানের রহস্য এবং মহীয়ান আল্লাহর কুদরত বর্ণনা করা হয়েছে। তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর দীর্ঘ দিনের চিন্তা-ভাবনার অবসান ঘটিয়ে তাঁকে রিসালাতের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। তিনি দিবালোকের মতো দিকনির্দেশ পেয়েছেন। শেষ দিকে ভ্রান্ত কাফেরদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত প্রদান করে নবী করীম ﷺ -কে ভালো কাজগুলো করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ [١] خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ [٢]

শানে নুযূল- : সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত দ্বারা নুযূলে কুরআন বা কুরআন নাজিল হবার ধারা শুরু হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা গৃহে গিয়ে নামাজ আদায় করতেন। সেখানে যেন নামাজ আদায় না করেন সে জন্যে আবূ জাহল নিষেধ করে দিল।

ইবনে জারির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কা'বা গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজ আদায় করার পথে বাঁধা দিয়ে আবূ জাহেল বলেছিল যে, মুহাম্মদ যদি নামাজ আদায়ের জন্যে কা'বা গৃহে পুনরায় আসে, তাহলে তাঁকে হত্যা করে দেব। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত সমূহ নাজিল করেন।

–[ইবনে কাছীর ৫২৯/৪, দুররে মানছূর ৩৬৯/৬/ তাবারী ৬৪৯/১২]

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى

শানে নুযূল : আবূ জাহেল লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করল যে, তোমাদের সামনে মুহাম্মদ ﷺ কি সেজদা করে থাকে? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন আবূ জাহেল বলল, লাত ও উজ্জার কসম! আমি যদি তাকে আর কখনো এমন করতে দেখি তাহলে তার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করে দিব। তার চেহারা ধুসরিত করে দিব। সে কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক এ আয়াত নাজিল করেন।

–[কানযুন নুকূল : ১০৯]

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠)

শানে নুযূল : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নরাধম আবূ জাহেল কা'বা গৃহে নামাজ আদায় করার জন্যে হযরত রাসূল ﷺ কে নিষেধ করে ছিল। সে সুবাদে সে একদা বলল, আমি যদি মুহাম্মদকে নামাজ আদায় করতে দেখি, তাহলে তার গণ্ডদেশ ধুমড়ে মুচড়ে দিব। তখন তার প্রতি আশ্চর্যতা প্রকাশবোধক আঙ্গিকে আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১১৫/২০, তাবারী ৬৪৭/১২]

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٧-١٨)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় আবূ জাহেল এসে বলল, আমি কি তোমাকে একাজ থেকে নিষেধ করিনি? আমি কি তোমাকে এ বিষয়ে নিষেধ করিনি? আমি কি তোমাকে এরূপ করতে নিষেধ করিনি?

নবী করীম ﷺ সালাত শেষে ফিরে তাকালেন এবং শাসালেন। আবূ জাহেল বলল, তুমি অবশ্যই জানো আমার চেয়ে বেশি লোক এই শহরে আর কারো নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যদি সে তার পার্শ্বচরদের আহ্বান করত, তবে অবশ্যই তাকে আল্লাহর ফেরেশতা পাকড়াও করত। –[তিরমিযি ২ : ১৭২]

ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত (مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত) সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ সূরা মুদ্দাস্‌সিরকে সর্বপ্রথম সূরা এবং কেউ কেউ সূরা ফাতিহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম বগভী (র.) অধিকাংশ আলিমের মতকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। সূরা মুদ্দাসসিরকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, সূরা আলাকের পাঁচ আয়াত নাজিল হওয়ার পর দীর্ঘকাল কুরআন অবতরণ বন্ধ থাকে, যাকে ওহীর বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে–এই বিরতির কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ মর্মবেদনা ও মানসিক অশান্তির সম্মুখীন হন। এরপর একদিন হঠাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) সামনে আসেন এবং সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। এ সময়ও ওহী অবতরণ এবং হযরত জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাতের দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে সে পূর্বের মতোই ভাবান্তর দেখা দেয়, যা সূরা আলাকে অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখা দিয়েছিল। এভাবে বিরতিকালের পর সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা আখ্যা দেওয়া যায়। সূরা ফাতিহাকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসাবে একত্রে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার অংশবিশেষই অবতীর্ণ হয়েছিল। –(মাযহারী) বুখারী ও মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীসে নবুয়ত ও ওহীর সূচনা সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন : সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ওহীর সূচনা হয়। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন, বাস্তবে হুবহু তাই সংঘটিত হতো এবং তাতে কোনোরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকত না। স্বপ্নে দেখা ঘটনা দিবালোকের মতো সামনে এসে যেত।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে নির্জনতার ও একান্তে ইবাদত করার প্রবল ঝোঁক সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি হেরা গিরিগুহাকে পছন্দ করে নেন (এ গুহাটি মক্কার কবরস্থান জান্নাতুল মুয়াল্লা থেকে একটু সামনে জাবালে নূর নামক পাহাড়ে অবস্থিত। এর শৃঙ্গ দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়)। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : তিনি এ গুহায় রাত্রিতে গমন করতেন এবং ইবাদত করতেন। পরিবার পরিজনের খবরাখবর নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা না দিলে তিনি সেখানেই অবস্থান করতেন এবং প্রয়োজনীয় পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পাথেয় শেষ হয়ে গেল তিনি পত্নী হযরত খাদীজা (রা.)-এর কাছে ফিরে আসতেন এবং আরও কিছুদিনের পাথেয় নিয়ে গুহায় গমন করতেন। এমনিভাবে গুহায় অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে ওহী আগমন করে। হেরা গুহায় নির্জনবাসের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি পূর্ণ রমজান মাস এ গুহায় অবস্থান করেন। ইবনে ইসহাক ও যরকানী (র.) বলেন : এর চেয়ে বেশি সময় অবস্থান করার প্রমাণ কোনো রেওয়ায়েতে নেই। ওহী অবতরণের পূর্বে নামাজ ইত্যাদি ইবাদতের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে ইবাদত করতেন সে সম্পর্কে কোনো কোনো আলিম বলেন : তিনি হযরত নূহ, ইবরাহীম ও ঈসা (আ.)-এর শরিয়ত অনুসরণ করে ইবাদত করতেন। কিন্তু কোনো রেওয়ায়েতে এর প্রমাণ নেই এবং তিনি নিরক্ষর ছিলেন বিধায় একে বিশুদ্ধও মেনে নেওয়া যায় না। বরং বাহ্যত বোঝা যায় যে, তখন জনকোলাহল থেকে একান্তে গমন এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ধ্যানে মগ্ন হওয়াই ছিল তাঁর ইবাদত। –[মাযহারী]

ওহীর আগমন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আগমন করে বললেন : اِقْرَاْ (পাঠ করুন)। তিনি বলেন : مَا اَنَا بِقَارِئٍ আমি পড়া জানি না। [কারণ তিনি উম্মী ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর উদ্দেশ্য কি, কিভাবে পড়াতে চান এবং কোনো লিখিত বিষয় পড়তে হবে কিনা ইত্যাদি বিষয় তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হননি। তাই ওজর পেশ করেছেন।] রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার এ জবাব শুনে হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সজোরে চাপ দিলেন। ফলে আমি চাপের কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : اِقْرَاْ (পাঠ করুন)। আমি আবার পূর্ববৎ জবাব দিলাম। এতে তিনি পুনরায় আমাকে চেপে ধরলেন। চাপের কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বারের মতো পাঠ করতে বললেন। আমি এবারও পূর্ববৎ জবাব দিলে তিনি তৃতীয়বারের মতো আমাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

কুরআনের এই সর্বপ্রথম পাঁচখানি আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ফিরলেন। তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। হযরত খাদীজা (রা.)-এর কাছে পৌঁছে বললেন : زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ আমাকে আবৃত কর, আমাকে আবৃত কর। হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করলে কিছুক্ষণ পর ভীতি বিদূরিত হলো। এ ভাবান্তর ও কম্পন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ভয়ে ছিল না। তাঁর শান এর চেয়ে আরও অনেক উর্ধ্বে বরং এই ওহীর মাধ্যমে নবুয়তের যে বিরাট দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করা হয়েছিল, তারই গুরুভার তিনি তিলে তিলে অনুভব করেছিলেন। এছাড়া একজন ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার কারণে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত খাদীজা (রা.)-কে হেরা গুহার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললেন : এতে আমার মধ্যে এমন ভাবান্তর দেখা দেয় যে, আমি জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়ি। হযরত খাদীজা (রা.) বললেন : না, এরূপ কখনো হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কখনো ব্যর্থ হতে দেবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, বোঝাক্লিষ্ট লোকদের বোঝা বহন করেন, বেকারকে কাজে নিয়োজিত করেন, অতিথি সেবা করেন এবং বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। হযরত খাদীজা (রা.) ছিলেন বিদূষী মহিলা। তিনি সম্ভবত তওরাত ও ইঞ্জিল থেকে অথবা এসব আসমানি কিতাবের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, উপরিউক্ত চরিত্রগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি কখনো বঞ্চিত ও ব্যর্থ হন না। তাই এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

এরপর হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে আপন পিতৃব্যপুত্র ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন। ইনি জাহিলিয়াতের যুগে প্রতিমাপূজা বর্জন করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যা ছিল তৎকালে একমাত্র সত্য ধর্ম। শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে হিব্রু ভাষায়ও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আরবি ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তিনি হিব্রু ভাষায়ও লিখতেন এবং ইঞ্জীল আরবিতে অনুবাদ করতেন। তখন তিনি অত্যধিক বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। বার্ধক্যের কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লুপ্তপ্রায় ছিল। হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে বললেন : ভাইজান, আপনি তাঁর কথাবার্তা একটু শুনুন। ওয়ারাকার জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা গুহার সমুদয় বৃত্তান্ত বলে শোনালেন। শোনামাত্রই ওয়ারাকা বলে উঠলেন : ইনিই সে পবিত্র ফেরেশতা, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায়, আমি যদি আপনার নবুয়তকালে শক্তিশালী হতাম! হায়, আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম, যখন আপনার কওম আপনাকে (দেশ থেকে) বহিষ্কার করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আমার স্বজাতি কি আমাকে বহিষ্কার করবে? ওয়ারাকা বললেন : অবশ্যই বহিষ্কার করবে। কারণ যখনই কোনো ব্যক্তি সত্য পয়গাম ও সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করে, যা আপনি নিয়ে এসেছেন, তখনই তার কওম তার উপর নিপীড়ন চালায়। যদি আমি সে সময়কাল পাই, তবে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। ওয়ারাকা এর কয়েকদিন পরই ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পরই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। -(বুখারী, মুসলিম) সোহায়লী বর্ণনা করেন, ওহীর বিরতিকাল ছিল আড়াই বছর। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে তিন বছরও আছে। -[মাযহারী]

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ এখানে اِسْمِ -শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখনই কুরআন পড়বেন, আল্লাহর নাম অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করবেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পেশকৃত ওজরের জবাবের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি যদিও বর্তমান অবস্থায় উম্মী; লেখাপড়া জানেন না কিন্তু আপনার পালনকর্তা উম্মী ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা, বক্তৃতা নৈপুণ্য, বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছিল। -(মাযহারী) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহর 'রব' নামটি উল্লেখ করায় এ বিষয়বস্তু আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই আপনার পালনকর্তা। তিনি

সর্বতোভাবে আপনাকে পালন করেন। তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে পাঠ করাতে সক্ষম। আল্লাহর গুণাবলির মধ্য থেকে এ স্থলে বিশেষভাবে সৃষ্টগুণ উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত রহস্য এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম অনুগ্রহ। এ স্থলে ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য خَلَقَ ক্রিয়াপদের কর্ম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতই এই সৃষ্টি কর্মের ফল।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ পূর্বের আয়াতে সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সেরা সৃষ্টি মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় সমগ্র বিশ্বজগতের সার-নির্যাস হচ্ছে মানুষ। জগতে যা কিছু আছে, তার প্রত্যেকটির নজির মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই মানুষকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করার এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, নবুয়ত, রিসালত ও কুরআন নাজিল করার লক্ষ্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করানো। এটা বিশেষভাবে মানুষেরই কাজ; عَلَقٍ –শব্দের অর্থ জমাট রক্ত, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত হয়। মৃত্তিকা ও উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা এর সূচনা হয়, এরপর বীর্য ও এরপর জমাট রক্তের পালা আসে। অতঃপর মাংসপিণ্ড ও অস্থি ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এসবের মধ্যে জমাট রক্ত হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এর উল্লেখ করায় এর পূর্বাপর অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ –এখানে اِقْرَأْ আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ মারেফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাঠ করার জন্য প্রথম اِقْرَأْ বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় اِقْرَأْ তাবলীগ, দাওয়াত ও অপরকে পাঠ করানোর জন্য বলা হয়েছে। اَكْرَمُ বিশেষণে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগৎ সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিজের কোনো স্বার্থ ও লাভ নেই বরং এগুলো সব দানশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। ফলে তিনি অযাচিতভাবে সৃষ্টিজগৎকে অস্তিত্বের মহান নিয়ামত দান করেছেন।

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ মানব সৃষ্টির পর মানব শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। কারণ শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র এবং সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে। শিক্ষার পদ্ধতি সাধারণত দ্বিবিধ। এক. মৌখিক শিক্ষা এবং দুই. কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার শুরুতে اِقْرَأْ –শব্দের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা রয়েছে কিন্তু এ আয়াতে শিক্ষাদান সম্পর্কিত বর্ণনায় কলমের সাহায্যে শিক্ষাকেই অগ্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষার সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِىْ كِتَابِهٖ فَهُوَ عِنْدَهٗ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِىْ غَلَبَتْ غَضَبِىْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। হাদীসে আরো বলা হয়েছে :

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهٗ اُكْتُبْ فَكَتَبَ مَا يَكُوْنُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ عِنْدَهٗ فِى الذِّكْرِ فَوْقَ عَرْشِهٖ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সে মতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহর কাছে আরশে রক্ষিত আছে। –[কুরতুবী]

কলম তিন প্রকার : আলিমগণ বলেন : জগতে তিনটি কলম আছে : এক. আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে সৃজিত সর্বপ্রথম কলম, যাকে তিনি তাকদীর লেখার আদেশ করেছিলেন। দুই. ফেরেশতাগণের কলম, যা দ্বারা তারা ভবিতব্য ঘটনা, তার পরিমান এবং মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধ করেন। তিন. সাধারণ মানুষের কলম, যা দ্বারা তারা তাদের কথাবার্তা লিখে এবং নিজেদের অভীষ্ট কাজে ব্যবহার করে। লিখন প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার বর্ণনা এবং বর্ণনা মানুষের বিশেষ গুণ। –(কুরতুবী) তাফসীরবিদ মুজাহিদ আবূ আমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্ট জগতে চারটি বস্তু স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। এগুলো ব্যতীত সব বস্তু 'কুন' তথা 'হয়ে যাও' আদেশের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। সেই বস্তু চতুষ্টয় এই : কলম, আরশ, জান্নাতে আদন ও আদম (আ.)।

লিখন জ্ঞান সর্বপ্রথম দুনিয়াতে কাকে দান করা হয় : কেউ কেউ বলেন–সর্বপ্রথম এই জ্ঞান মানবপিতা হযরত আদম (আ.)-কে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম লেখা শুরু করেন।–(কা'বে আহবার) কেউ কেউ বলেন, হযরত ইদরীস (আ.)-এই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম লেখক।–(যাহ্হাক) কারও কারও মতে প্রত্যেক লেখকের শিক্ষাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

অংকন ও লিখন আল্লাহর বড় নিয়ামত : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, কলম আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। কলম না থাকলে কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকত না এবং দুনিয়ার কাজকারবারও সঠিকভাবে পরিচালিত হতো না। হযরত আলী (রা.) বলেন : এটা আল্লাহ তা'আলার একটা বড় কৃপা যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে অজ্ঞাত বিষয়সমূহের জ্ঞান দান করেছেন এবং তাদেরকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে বের করে এনেছেন। তিনি মানুষকে লিখন বিদ্যায় উৎসাহিত করেছেন। কেননা এর উপকারিতা অপরিসীম। আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা গণনা করে শেষ করতে পারে না। যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইতিহাস, জীবনালেখ্য ও উক্তি আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সমস্তই কলমের সাহায্যে লিখিত হয়েছে এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে। কলম না থাকলে ইহকাল ও পরকালের সব কাজকর্মই বিঘ্নিত হবে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণ সর্বদা লিখন কর্মের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের অগণিত রচনাশৈলীই এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগে আলিম ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি চরম উদাসীনতা বিরজমান রয়েছে। ফলে শত শত লোকের মধ্যে দু'চারজনই এ ব্যাপারে পণ্ডিত দৃষ্টিগোচর হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লিখন শিক্ষা না দেওয়ার রহস্য : আল্লাহ তা'আলা শেষনবী ﷺ-এর মর্যাদাকে মানুষের চিন্তা ও অনুমানের উর্ধ্বে রাখার জন্য তাঁর জন্মস্থান থেকে ব্যক্তিগত অবস্থা পর্যন্ত সবকিছুকে এমন করেছিলেন যে কোনো মানুষ এসব ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও শ্রম দ্বারা কোনো উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে না। তাঁর জন্মস্থানের জন্য আরবের মরুভূমি মনোনীত হয়েছে, যা সভ্য জগৎ ও জ্ঞান-গরিমার পীঠভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং পথ ও যোগাযোগের দিক দিয়ে অত্যধিক দুর্গম ছিল। ফলে শাম, ইরাক, মিসর ইত্যাদি উন্নত নগরীর অধিবাসীদের সাথে সেখানকার লোকদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ কারণেই আরবের সবাই উম্মী বলে কথিত হয়। এমন দেশ ও গোত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণের পর আল্লাহ তা'আলা আরও কিছু ব্যবস্থা করলেন। তা এই যে, আরবদের মধ্যে যদিও বা খুব নগণ্য সংখ্যক লোক জ্ঞান-বিজ্ঞান, অঙ্কন ও লিখন বিদ্যা শিক্ষা করত, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা শিক্ষা করারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির কাছ থেকে কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত চরিত্র আশা করতে পারত? হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের অলংকারে ভূষিত করলেন এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অশেষ ফল্গুধারা তাঁর মুখ দিয়ে প্রবাহিত করে দিলেন। বিশুদ্ধতায় ও প্রাঞ্জলতায় আরবের বড় বড় কবি ও অলংকারবিদও তাঁর কাছে হার মেনে যায়। এই প্রোজ্জ্বল মু'জিযাটি স্বচক্ষে দেখে এ প্রত্যয় না করে উপায় নেই যে, তাঁর এসব গুণ-গরিমা মানবীয় প্রচেষ্টা ও কর্মের ফলশ্রুতি নয় বরং আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য দান। অংকন ও লিখন শিক্ষা না দেওয়ার মধ্যে এ রহস্যই নিহিত ছিল। –[কুরতুবী]

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ তা'আলা তাঁর শিক্ষার মাধ্যম অসংখ্য, অগণিত– শুধু কলমের মধ্যেই সীমিত নয়। তাই বলা হয়েছে–আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে পূর্বে জানত না। এতে কলম অথবা অন্য কোনো উপায় উল্লেখ না করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার এ শিক্ষা মানুষের জন্মলগ্ন থেকে অব্যাহত রয়েছে। তিনি মানুষকে প্রথমে বুদ্ধি দান করেন, যা জ্ঞান লাভের সর্ববৃহৎ উপায়। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে কোনো শিক্ষা ব্যতিরেকে অনেক কিছু শিখে নেয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের সামনে ও পিছনে স্বীয় অসীম কুদরতের বহু নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। যাতে সে সেগুলো প্রত্যক্ষ করে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে। এরপর ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে অনেক বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দান করেছেন। এছাড়া আরও বহু বিষয়ের জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্ক আপনা-আপনি জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। এতে কোনো ভাষা অথবা কলমের সাহায্যে শিক্ষার দখল নেই। একটি চেতনাহীন শিশু জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তার খাদ্যের কেন্দ্র অর্থাৎ জননীর স্তনযুগলকে চিনে নেয়। স্তন থেকে দুগ্ধ বের করার জন্য মুখ চেপে ধরার কৌশল তাকে কে শিক্ষা দেয় এবং দিতে পারে? আল্লাহ তা'আলা শিশুকে ক্রন্দন করার কৌশল জন্মলগ্ন থেকেই শিখিয়ে দেন। তার এই ক্রন্দন তার অনেক প্রয়োজন মেটানোর উপায় হয়ে থাকে। তাকে ক্রন্দনরত দেখলে পিতামাতা তার কষ্টের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উত্তাপ, শৈত্য ইত্যাদি অভাব ক্রন্দনের দ্বারাই বিদূরিত হয়। সদ্যপ্রসূত শিশুকে এই ক্রন্দন কে শেখাতে পারত এবং কিভাবে শেখাত? এগুলো সবই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, যা আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক প্রাণী বিশেষত মানুষের মস্তিষ্কে সৃষ্টি করে দেন। এই জরুরি শিক্ষার পর মৌখিক শিক্ষা ও অন্তরগত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। مَا لَمْ يَعْلَمْ (যা সে জানত না) বলার বাহ্যত কোনো প্রয়োজন ছিল না! কারণ শিক্ষা স্বভাবত অজ্ঞানা

বিষয়েরই হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এজন্য বলা হয়েছে, যাতে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও কৌশলকে তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে না বসে। এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উপর এমনও এক সময় আসে, যখন সে কিছুই জানে না; যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে : أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জননীর গর্ভ থেকে এমতাবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জান না। অতএব বুঝা গেল যে, মানুষের জ্ঞান-গরিমা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয় বরং স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ তা'আলারই দান। –(মাযহারী) কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতে ইনসানের অর্থ নিয়েছেন হযরত আদম (আ.) অথবা রাসূলে কারীম ﷺ। হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম শিক্ষা দান করেছেন। বলা হয়েছে :

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا এবং নবী করীম ﷺ-এই সর্বশেষ পয়গম্বর, যার শিক্ষায় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের এবং লওহ ও কলমের শিক্ষা শামিল রয়েছে। বলা হয়েছে : وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ।

সূরা ইকরার উপরিউক্ত পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত। এর পরবর্তী আয়াতসমূহ অনেক দিন পরে অবতীর্ণ হয়। কেননা সূরার শেষ অবধি অবশিষ্ট আয়াতসমূহ আবূ জাহেলের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো বিরুদ্ধবাদী ছিল না বরং সবাই তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করত, মনেপ্রাণে ভালোবাসত ও সম্মান করত। আবূ জাহলের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা বিশেষত নামাজে নিষেধ করার ঘটনা বলা বাহুল্য তখনকার, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুয়ত ও দাওয়াত ঘোষণা করেন এবং রজনীতে নামাজের হুকুম অবতীর্ণ হয়।

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবূ জাহেলকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর জুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণত বিত্তশালী, শাসনক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণির লোকের মধ্যে এই প্রবণতা বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনাঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মদমত্ত হয়ে অপরকে পরোয়াই করে না। আবূ জাহেলের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সে ছিল মক্কার বিত্তশালীদের অন্যতম। তার গোত্র এমনকি সমগ্র শহরের লোক তাকে সমীহ করত। সে এমনি অহংকারে মত্ত হয়ে পয়গম্বরকুল শিরোমণি ও সৃষ্টির সেরা মানব রাসূলে কারীম ﷺ-এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল। পরের আয়াতে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى অর্থাৎ সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং ভালোমন্দ কার্মের হিসাব নেবে। অবাধ্যতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে। এটাও অসম্ভব নয় যে, এ আয়াতে গর্বিত মানুষের গর্বের প্রতিকার বর্ণনা করার জন্য বলা হয়েছে : হে নির্বোধ, তুমি নিজেকে সবকিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী ও স্বেচ্ছাধীন মনে কর কিন্তু চিন্তা করলে তুমি নিজেকে প্রতিটি উঠাবসায় ও চলাফেরায় আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী পাবে। তিনি যদি বাহ্যত তোমাকে কোনো মানুষের মুখাপেক্ষী না করে থাকেন, তবে কমপক্ষে এটা তো দেখ যে, তোমাকে প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী করেছেন। মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত মনে করার বিষয়টিও বাহ্যিক বিভ্রান্তি বৈ কিছু নয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবরূপে সৃষ্টি করেছেন। সে একা তার কোনো প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। সে তার মুখের একটি গ্রাসের প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখতে পাবে যে, সেটা হাজারো মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘদিনের সাধনার ফলশ্রুতি, যা সে অনায়াসে গিলে যাচ্ছে। এত হাজার হাজার মানুষকে নিজের কাজে নিয়োজিত করার সাধ্য কার আছে? মানুষের পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অবস্থাও তদ্রূপ। সেগুলো সরবরাহের পেছনে হাজারো, লাখো মানুষের শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে, যারা কোনো ব্যক্তি বিশেষের গোলাম নয়। কেউ তাদের সবাইকে বেতন দিয়ে কাজ করাতে চাইলেও তা সাধ্যাতীত ব্যাপার। এসব বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ এ রহস্য জানতে পারে যে, মানুষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা তার নিজের তৈরি নয় বরং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা তাঁর অচিন্তনীয় প্রজ্ঞাবলে এই পরিকল্পনা তৈরি করেছেন ও চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কারো অন্তরে কৃষিকাজের ইচ্ছা জাগ্রত করেছেন, কারো মনে কাঠ কাটা ও মিস্ত্রীগিরির প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, কাউকে কর্মকারের কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, কাউকে শ্রম ও মুজুরি করার মধ্যেই সন্তুষ্টি দান করেছেন এবং কাউকে

বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতি উৎসাহিত করে মানুষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের বাজার বসিয়ে দিয়েছেন। কোনো রাষ্ট্র আইন করে এসব ব্যবস্থাপনা করতে পারে না এবং একা কোনো ব্যক্তির পক্ষেও এটা সম্ভব নয়। তাই এই চিন্তা-ভাবনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে, إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ অর্থাৎ পরিশেষে সব মানুষই যে আল্লাহর কুদরত ও প্রজ্ঞার অধীন, একথা জীবন্ত হয়ে দৃষ্টির সামনে এসে যায়।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাজের আদেশ লাভ করার পর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়া শুরু করেন, তখন আবূ জাহেল তাঁকে নামাজ পড়তে বারণ করে এবং হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে নামাজ পড়লে ও সেজদা করলে সে তাঁর ঘাড় পদতলে পিষ্ট করে দেবে। এর জবাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে : أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ অর্থাৎ সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন? কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতির কল্পনাও করা যায় না।

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ - سَفْعٌ-এর অর্থ কঠোরভাবে হেঁচড়ানো। نَاصِيَة শব্দের অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছ। যার এই কেশগুচ্ছ অন্যের মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার করতলগত হয়ে পড়ে।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ এতে নবী করীম ﷺ-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবূ জাহলের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সেজদা ও নামাজে মশগুল থাকুন। কারণ এটাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উপায়।

সেজদায় দোয়া কবুল হয় : আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ অর্থাৎ বান্দা যখন সেজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সেজদায় বেশি পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরো বলা হয়েছে : فَإِنَّهُ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ-অর্থাৎ সেজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য।

নফল নামাজের সেজদায় দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এর বিশেষ দোয়াও বর্ণিত আছে। বর্ণিত সে দোয়া পাঠ করাই উত্তম। ফরজ নামাজসমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রমাণ নেই। কারণ ফরজ নামাজ সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে শুনে, সবার উপর সেজদা করা ওয়াজিব। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِقْرَأْ : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر বাব فَتَحَ মাসদার قِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ء) জিনস مهموز لام অর্থ- আপনি পাঠ করুন।

خَلَقَ : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব نَصَرَ মাসদার خَلْقٌ মূলবর্ণ (خ - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ- তিনি সৃষ্টি করেছেন।

عَلَقٍ : অর্থ- জমাট রক্ত, যা শুকায়নি। ইমাম রাগেব (র.)-এর অর্থ শুধু 'জমাট রক্ত' বলেছেন। কিন্তু কামূসের মধ্যে عَلَقٌ-এর অর্থ, করা হয়েছে সাধারণ রক্ত বা এমন রক্ত, যা খুব লাল বা জমাট বদ্ধ।

اَلْاَكْرَمُ : اسم تفضيل। খুব দয়ালু। বাবে كَرُمَ মহা মহিমান্বিত খুব দয়ালু।

عَلَّمَ : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব تَفْعِيل মাসদার تَعْلِيْمٌ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ- তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।

لَيَطْغَىٰ : সীগাহ مضارع معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব فَتَحَ মাসদার طُغْيَانٌ মূলবর্ণ (ط - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সীমা হতে বের হয়ে যায়।

أَنْ رَّاٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব মহমুয আইন এবং নাকেস ইয়ায়ী অর্থ– সে নিজেকে মনে করে :

اِسْتَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِغْنَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অমুখাপেক্ষী।

يَنْهٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَهْىٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিষেধ করে।

صَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে নামাজ পড়েছে।

لَمْ يَنْتَهِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِنْتِهَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যদি সে ফিরে না আসে।

لَنَسْفَعًا : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون خفيفه বাব فَتَحَ মাসদার سَفْعٌ মূলবর্ণ (س - ف - ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি তাকে হেঁচড়াব।

اَلنَّاصِيَةَ : একবচন, বহুবচন نَوَاصِىْ ও نَاصِيَاتٌ অর্থ– ললাটের কেশগুচ্ছ।

خَاطِئَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْخَطَاءُ মূলবর্ণ (خ - ط - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– পাপ যুক্ত, পাপী।

فَلْيَدْعُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে আহ্বান করুক।

نَادِيَهٗ : نَادِىَ মুযাফ। ه যমীর মুযাফ ইলাইহি। তার পরিষদবর্গ, মজলিস অর্থাৎ তার মজলিসের সাথিবৃন্দ।

اَلزَّبَانِيَةَ : অর্থ– দোজখের পেয়াদা প্রহরী, পুলিশ, দোজখের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রহরী বা ফেরেশতা। ইবনে আবি হাতেম ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও "দোজখের ফেরেশতাগণ" অর্থ বর্ণিত আছে। আল্লামা বগভী (র.) লিখেন, زَبَانِيَة হলো- زَبْنٰى-এর বহুবচন। যা زَبْنٌ থেকে নির্গত। অর্থ– দূর করা।

لَا تُطِعْهُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তার কথা মানবেন না।

اِقْتَرِبْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِرَابٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– নৈকট্য লাভ করতে থাকুন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ : এখানে اِقْرَأْ ফে'ল, তার যমীর انت ফায়েল। بِاسْمِ رَبِّكَ টা উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে ফায়েলের যমীর থেকে অর্থাৎ مفتتحا আর الَّذِىْ টা رَبِّ-এর সিফাত হয়েছে। আর তা জর এর স্থানে হয়েছে। আর خَلَقَ বাক্যটির কোনো محل নেই। কেননা الذ -এর সেলাহ এর মধ্যস্থ যমীর الَّذِىْ-এর দিকে ফিরেছে। خَلَقَ الْاِنْسَانَ টা خلق থেকে بدل হয়েছে। আবার এটাকে تاكيد لفظى ও বলা যেতে পারে। আর الْاِنْسَانَ হলো مفعول به এবং مِنْ عَلَقٍ-এর সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন : ৮/৩৬১-৬২]

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা কাদ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. নিঃসন্দেহে আমি মহিমান্বিত রজনীতে কুরআন অবতীর্ণ করেছি।	اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ﴿۱﴾
২. আর আপনার কি জানা আছে যে, মহিমান্বিত রজনী কী?	وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ﴿۲﴾
৩. মহামান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।	لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿۳﴾
৪. [অর্থাৎ এ রাত্রিতে ইবাদতের ছওয়াব সহস্র মাসের ইবাদতের ছওয়াব অপেক্ষাও অধিক] সে রাত্রে ফেরেশতাগণ এবং রূহুল কুদুস [হযরত জিবরাঈল (আ.)] স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে [পৃথিবীতে] অবতরণ করেন।	تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴿۴﴾
৫. [আর সে রাত্রি] শুধুই শান্তি। সে রাত্রি ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত [বরকতময়] থাকে।	سَلٰمٌ ۛ هِیَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿۵﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ নিঃসন্দেহে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ মহিমান্বিত রজনীতে।

২. وَمَاۤ اَدْرٰىكَ আর আপনার কি জানা আছে যে مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ মহিমান্বিত রজনী কি?

৩. لَیْلَةُ الْقَدْرِ মহিমান্বিত রজনী خَیْرٌ উত্তম مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ হাজার মাস অপেক্ষা।

৪. تَنَزَّلُ অবতরণ করেন الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ وَالرُّوْحُ এবং রূহুল কুদুস فِیْهَا সে রাত্রে بِاِذْنِ رَبِّهِمْ স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশে مِنْ كُلِّ اَمْرٍ প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে।

৫. سَلٰمٌ শুধুই শান্তি هِیَ সে রাত্রি থাকে حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : قَدْرٌ শব্দের ধাতুগত অর্থ : পরিমাণ নির্ধারণ ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ। এ মূলধাতু হতেই তাকদীর বা ভাগ্য শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ সম্মান, গৌরব ও মহিমা। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতের 'কদর' শব্দ হতেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ৩০টি বাক্য এবং ১২১টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী না মাদানী এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ক আবুল হাইয়্যান তাঁর اَلْبَحْرُ الْمُحِيْطُ নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এ সূরাটি মাদানী।

খ. পক্ষান্তরে আল্লামা আল-মাওয়ারদী (র.) বলেন, অধিকাংশ কুরআন বিশারদের মতে তা মাক্কী সূরা। ইমাম সুয়ূতী (র.) আল-ইতকান গ্রন্থে এটাই লিখেছেন।

সূরাটির বিষয়বস্তু : কুরআন মাজীদের মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্ব বুঝানোই সূরাটির মূল বিষয়বস্তু। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বলেছেন : আমিই এ কিতাব নাজিল করেছি। অর্থাৎ তা মুহাম্মদ ﷺ-এর নিজস্ব কোনো রচনা নয়; বরং তা আমারই নাজিল করা কিতাব। আমি এ কিতাব কদরের রাত্রে নাজিল করেছি। তা বড়ই সম্মান ও মর্যাদার রাত। পরে এ কথার ব্যাখ্যা করে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : এটা হাজার মাসের তুলনায়ও অধিক উত্তম রাত।

সূরার শেষভাগে বলা হয়েছে, এ রাতে ফেরেশতা ও রূহ জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর অনুমতিক্রমে সব রকমের আদেশ-নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত তা এক পরিপূর্ণ শান্তির রাত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ রাতে কোনোরূপ অশুভ বিষয়ের স্থান হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা'আলার ফয়সালাই যে মানবতার কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি, কোনো জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ফয়সালা হলেও তা অবশ্যই গোটা মানবতার কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। এ রাতে হযরত জিবরাঈল (আ.) ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে মুত্তাকী মুসলমানদের গৃহে গমন করে প্রত্যেক নর-নারীকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সালাম ও শান্তির বাণী জ্ঞাপন করেন।

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বনী ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকে এবং কখনো অস্ত্র সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ এ কথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে উম্মতের জন্য শুধু এক রাত্রির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (র.) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী ইসরাইলের জনৈক ইবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জিহাদের জন্য বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জিহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা সূরা-কদর নাজিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এ থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, শবে-কদর উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য। –[মাযহারী]

ইবনে কাছীর ইমাম মালিক (র.)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের কেউ কেউ একে অধিকাংশের মাযহাব বলেছেন। খাত্তাবী এর উপর ইজমা দাবি করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো হাদীসবিদ এ ব্যাপারে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন।

লায়লাতুল কদরের অর্থ : কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এ স্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে 'লায়লাতুল কদর' তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। আবূ বকর ওয়াররাক বলেন : এ রাত্রিকে লায়লাতুল কদর বলার কারণ এই যে, কর্মহীনতার কারণে এর পূর্বে যার কোনো সম্মান ও মূল্য থাকে না, সে এই রাত্রিতে তওবা ইস্তেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে সম্মানিত ও মহিমান্বিত হয়ে যায়।

কদরের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিজিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে লিখে দেওয়া হয়, এমনকি, এ বছর কে হজ করবে, তাও লিখে দেওয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি অনুযায়ী চারজন ফেরেশতাকে এসব কাজ সোপর্দ করা হয়। তারা হলেন–ইসরাফীল, মীকাঈল, আজরাঈল ও জিবরাঈল (আ.)। –[কুরতুবী]

সূরা দুখানে বলা হয়েছে–

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا.

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এ পবিত্র রাতে তাকদীর সংক্রান্ত সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ -এর অর্থ শবে-কদরই। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্য শাবানের রাত্রি অর্থাৎ শবে-বরাত। তাঁরা বলেন যে, তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রাথমিক ও সংরক্ষিত ফয়সালা শবে বরাতের হয়ে যায়। অতঃপর তার বিশদ বিবরণ শবে-কদরে লিপিবদ্ধ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বগভীর রেওয়ায়েতে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা সারা বছরের তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদির ফয়সালা শবে-বরাতে সম্পন্ন করেন; অতঃপর শবে-কদরে এসব ফয়সালা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। –(মাযহারী) পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ রাত্রিতে তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে, সেগুলো লওহে মাহফূজ থেকে নকল করে ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা। নতুবা আসল বিধিলিপি আদিকালেই লিখিত হয়ে গেছে।

শবে-কদর কোন রাত্রি : কুরআন পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে-কদর রমজান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছে। তাফসীরে মাযহারীতে আছে এসব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, শবে-কদর রমজান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে কিন্তু এরও কোনো তারিখ নির্দিষ্ট নেই বরং যে কোনো রাত্রিতে হতে পারে। প্রত্যেক রমজানে তা পরিবর্তিতও হয়। সহীহ্ হাদীসদৃষ্টে এই দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে শবে-কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যদি শবে-কদরকে রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ঘূর্ণায়মান এবং প্রতি রমজানে পরিবর্তনশীল মেনে নেওয়া যায়, তবে শবে-কদরের দিন তারিখ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাই অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক উক্তি এই যে, শবে-কদর নির্দিষ্ট দিনেই হয়ে থাকে। –[ইবনে কাছীর]

সীহাহ বুখারীর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ অর্থাৎ রমজানের শেষ দশকে শবে-কদর অন্বেষণ কর। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে : فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا অর্থাৎ শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে তালাশ কর। –[মাযহারী]

শবে-কদরের কতক ফজিলত ও তাঁর বিশেষ দোয়া : এ রাত্রির সর্ববৃহৎ ফজিলত তো আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, এক রাত্রির ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এক হাজার মাসে তিরাশি বছরের কিছু বেশি হয়। এই শ্রেষ্ঠত্ব কতগুণ, তার কোনো সীমা নেই। অতএব দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, দশ গুণ, শতগুণ সবই হতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি শবেকদরে ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকে, তার অতীত সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : শবে-কদরে সিদরাতুলমুন্তাহায় অবস্থানকারী সব ফেরেশতা হযরত জিবরাঈলের সাথে দুনিয়াতে অবতরণ করে এবং মদ্যপায়ী ও শূকরের মাংস ভক্ষণকারী ব্যতীত প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও নারীকে সালাম করে।

অন্য এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : যে বক্তি শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সম্পূর্ণই বঞ্চিত ও হতভাগ্য। শবে-কদরে কেউ কেউ বিশেষ নূরও প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু এটা সবাই লাভ করতে পারে না এবং শবে-কদরের বরকত ও ছওয়াব হাসিল হওয়ার ব্যাপারে এরূপ দেখার কোনো দখলও নেই। কাজেই এর পেছনে পড়া উচিত নয়।

হযরত আয়েশা (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন : যদি আমি শবে-কদর পাই, কি দোয়া পাঠ করব? উত্তরে তিনি বললেন : এ দোয়া করো : اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ হে আল্লাহ, আপনি অত্যন্ত ক্ষমতাশীল। ক্ষমা আপনার পছন্দনীয়। অতএব আমার গোনাহসমূহ ক্ষমা করুন। –[কুরতুবী]

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কুরআন পাক শবে-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, সমগ্র কুরআন লওহে-মাহফূজ থেকে শবে-কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছাতে থাকেন। দ্বিতীয় এই হতে পারে যে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কুরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

সমস্ত ঐশী কিতাব রমজানেই অবতীর্ণ হয়েছে : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাসমূহ ৩রা রমজানে, তাওরাত ৬ই রমজানে, ইনজীল ১৩ই রমজানে এবং যাবূর ১৮ই রমজানে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন পাক ২০শে রমজানুল-মুবারকে নাজিল হয়েছে। –[মাযহারী]

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ - رُوحٌ বলে হযরত জিবরাঈল (আ.) কে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে আছে, শবে-কদরে জিবরাঈল ফেরেশতাদের বিরাট একদল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং যত নারী-পুরুষ নামাজ অথবা জিকিরে মশগুল থাকে, তাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। –[মাযহারী]

مِنْ كُلِّ أَمْرٍ –অর্থাৎ ফেরেশতাগণ শবে-কদরে সারা বছরের অবধারিত ঘটনাবলি নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ একে سَلَامٌ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ করেছেন যে, এর রাত্রিটি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে শান্তিস্বরূপ। –[ইবনে কাছীর]

سَلَامٌ অর্থাৎ এ রাত্রি শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিষ্টের নামও নেই। –(কুরতুবী) কেউ কেউ একে مِنْ كُلِّ أَمْرٍ -এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন–ফেরেশতাগণ প্রত্যেক শান্তি ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন করে। –[মাযহারী]

هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ অর্থাৎ শবে-কদরের এই বরকত রাত্রির কোনো বিশেষ অংশে সীমিত নয় বরং ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

জ্ঞাতব্য : এ সূরায় শবে-কদরকে এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই এক হাজার মাসের মধ্যে প্রতি বছর শবে-কদর আসবে। অতএব হিসাব কিরূপে হবে? তাফসীরবিদগণ বলেছেন, এখানে এমন এক হাজার মাস বোঝানো হয়েছে যাতে 'শবে-কদর' নেই। অতএব কোনো অসুবিধা নেই। –[ইবনে কাছীর]

উদায়াচলের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দিনে শবে-কদর হতে পারে। প্রত্যেক দেশের দিক দিয়ে যে রাত্রি কদরের রাত্রি হবে, সে রাত্রিতেই শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত হাসিল হবে।

মাস'আলা : যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইশা ও ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়ে নেয়, সেও এ রাত্রির ছওয়াব হাসিল করবে। যে ব্যক্তি যত বেশি ইবাদত করবে, সে তত বেশি ছওয়াব পাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতের সাথে পড়ে, সে অর্ধ রাত্রির ছওয়াব অর্জন করে। যদি সে ফজরের নামাজও জামাতের সাথে পড়ে নেয়, তবে সমস্ত রাত্রি জাগরণের ছওয়াব হাসিল করে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَنْزَلْنَاهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِنْزَالٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ– আমি তা অবতীর্ণ করেছি।

اَلْقَدْرِ : অর্থ– মহিমান্বিত। বরকত ও মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি। এমন মহান রাত্রি, যে রাত্রিতে বড় বড় কাজের তাকদিরী ফয়সালা করা হয়।

تَنَزَّلُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَنَزُّلٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ– অবতরণ করেন।

مَلَائِكَةٌ : اَلْمَلَكُ -এর বহুবচন। এটি মুফরাদও হতে পারে আবার ইসমে জামেদও হতে পারে। অর্থ– ফেরেশতা।

اَلرُّوحُ : আত্মা, প্রাণ, জীবন, রহস্য। অদৃশ্য ফয়েয। ওহী। কুরআন। ফিরিশতা। ইমাম রাগেব (রহ.) লিখেন, روح মূলতঃ একক। আর رُوحٌ কে نَفْسٌ অর্থাৎ জীবন নামকরণ করা হয়েছে।

إِذْنٌ : অর্থ– হুকুম, এজাজত, ইচ্ছা, চাওয়া إِذْنٌ -এর ব্যবহার চাওয়ার অর্থ, ছাড়া হয় না।

أَمْرٌ : অর্থ– কাজ, লেনদেন, অবস্থা, হুকুম, أَمْرٌ শব্দটি সকল কথা ও কাজের জন্য ব্যাপক।

سَلَامٌ : মাসদার ও ইসম, দোষ ও বিপদ হতে নিরাপদ রাখা। নিরাপত্তা, শান্তি, স্বস্তি, নিরাপদ। বাতেনী সকল বিপদপদ থেকে দূরে রাখা। "কদর রাত্রি সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি ও বিপদ থেকে নিরাপদ এক রজনী।" –[জালালাইন]

مَطْلَعٌ : মাসদারে মীমি। অর্থ, উদিত হওয়া। مَطْلَعِ الْفَجْرِ ফজর উদিত হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ : এখানে إِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর نَا হলো إِسْمُ إِنَّ আর أَنْزَلْنَاهُ বাক্যটি خَبَرُ إِنَّ; আর أَنْزَلْنَاهُ -এর أَنْزَلْنَا ফে'ল এবং যমীর ফায়েল আর ه হলো مفعول به, আর فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ হলো انزلنه -এর সাথে متعلق; –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৬৯]

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা বাইয়্যিনা

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৮, রুকূ‘– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আহলে কিতাব [ইহুদি, নাসারা] ও মুশরিকদের মধ্য হতে যারা কাফের ছিল, তারা [কুফর হতে কখনো] প্রত্যাবর্তনকারী ছিল না, যে পর্যন্ত না তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হয়।	لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١
২. [অর্থাৎ] আল্লাহর প্রেরিত কোনো একজন রাসূল, যিনি [তাদেরকে] পবিত্র সহীফাসমূহ পাঠ করে শুনিয়ে দেন।	رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝٢
৩. যাতে সঠিক বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ থাকে।	فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝٣
৪. আর যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল, তাদের নিকট এই স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরই তারা বিভক্ত হয়ে গেল।	وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝٤
৫. অথচ তাদের প্রতি [পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কেবল] এই নির্দেশই হয়েছিল যে, আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত এরূপে করে, ইবাদতকে যেন তারই জন্য নির্দিষ্ট রাখে [বাতিল ধর্ম হতে] একনিষ্ঠ হয়ে, আর নামাজের পাবন্দি করে এবং জাকাত প্রদান করে, আর তাই সে [বর্ণিত] সঠিক বিষয়সমূহের পন্থা।	وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝٥

শাব্দিক অনুবাদ :

১. لَمْ يَكُنْ ছিল না اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কাফের ছিল مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ আহলে কিতাব وَالْمُشْرِكِيْنَ ও মুশরিকদের মধ্য হতে مُنْفَكِّيْنَ প্রত্যাবর্তনকারী حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ যে পর্যন্ত না উপস্থিত হয় اَلْبَيِّنَةُ সুস্পষ্ট প্রমাণ।

২. رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহর প্রেরিত কোনো একজন রাসূল يَتْلُوْا যিনি পাঠ করে শুনিয়ে দেন صُحُفًا مُّطَهَّرَةً পবিত্র সহীফাসমূহ।

৩. فِيْهَا كُتُبٌ যাতে লিপিবদ্ধ থাকে قَيِّمَةٌ সঠিক বিষয়সমূহ।

৪. وَمَا تَفَرَّقَ আর বিভক্ত হয়ে গেল اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল তারা اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ তাদের নিকট উপস্থিত হওয়ার পর اَلْبَيِّنَةُ এই স্পষ্ট প্রমাণ।

৫. وَمَآ اُمِرُوْٓا অথচ তাদের প্রতি এই নির্দেশই ছিল যে اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত এরূপে করে مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ইবাদত কে যেন তারই জন্য নির্দিষ্ট রাখে حُنَفَآءَ একনিষ্ঠ হয়ে وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি করে وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করে وَذٰلِكَ আর এটাই دِيْنُ الْقَيِّمَةِ সেই সঠিক বিষয়সমূহের পন্থা।

৬. নিশ্চয় আহলে কিতাবগণ ও মুশরিকগণের মধ্য হতে যারা কাফের হয়েছে, তারা দোজখের অগ্নির মধ্যে হবে, যেখানে তারা সদাসর্বদা অবস্থান করবে; [আর] তারাই নিকৃষ্টতর সৃষ্টি।	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾
৭. নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারাই উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি।	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ ۙ أُولَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾
৮. তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট সর্বদা অবস্থানের বেহেশতসমূহ রয়েছে, যার নিম্নদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, এটা সে ব্যক্তির জন্য, যে নিজের প্রতিপালককে ভয় করে।	جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে مِنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ আহলে কিতাবগণ وَالْمُشْرِكِينَ ও মুশরিকগণের মধ্য হতে فِي نَارِ جَهَنَّمَ তারা দোজখের অগ্নির মধ্যে হবে خَٰلِدِينَ فِيهَا সেখানে তারা সদা সর্বদা অবস্থান করবে أُولَٰٓئِكَ هُمْ এরাই شَرُّ الْبَرِيَّةِ নিকৃষ্টতর সৃষ্টি।

৭. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ এবং নেক কাজ করেছে أُولَٰٓئِكَ هُمْ তারাই خَيْرُ الْبَرِيَّةِ উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি।

৮. جَزَآؤُهُمْ তাদের প্রতিদান عِندَ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিকট جَنَّٰتُ عَدْنٍ সর্বদা অবস্থানের বেহেশতসমূহ রয়েছে تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ যার নিম্নদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا যেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন وَرَضُوا عَنْهُ আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে ذَٰلِكَ لِمَنْ এটা সে ব্যক্তির জন্য যে خَشِيَ رَبَّهُ নিজের প্রতিপালককে ভয় করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটি নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দটি দ্বারা সূরাটির নামকরণ হয়েছে আল-বাইয়্যিনাহ। "বাইয়্যিনাহ" অর্থ স্পষ্ট দলিল ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ। এটা দ্বারা মূলত রাসূলে কারীম ﷺ উত্থাপিত দীন ও জীবনাদর্শের কথা বুঝানো হয়েছে। উক্ত সূরাটির আরও কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন : কিয়ামাহ, বালাদ, মুনফাক্কীন, বারিইয়্যা এবং লাম-ইয়াকুন। এতে ১টি রুকূ ৮টি আয়াত, ২৫টি বাক্য এবং ১৪৯টি অক্ষর রয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

সূরাটি অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী বা মাদানী হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কতিপয় তাফসীরকার বলেন, সাধারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এ সূরাটি মাক্কী। আর অপর কিছু সংখ্যক মুফাসসির বলেন, সাধারণ বিশেজ্ঞদের মতে তা মাদানী সূরা। হযরত ইবনে জুবাইর এবং আতা ইবনে ইয়াসার (র.)-এর মতে এটা মাদানী সূরা। হযরত ইবনে

আব্বাস ও কাতাদা (রা.) এ পর্যায়ে দু'টি কথা উদ্ধৃত হয়েছে। একটি কথানুযায়ী তা মাদানী। হযরত আয়েশা (রা.) তাকে মাক্কী বলেছেন। আল-বাহরুল মুহীত গ্রন্থকার আবূ হাইয়ান ও আহকামুল কুরআন প্রণেতা আবুল মুনয়িম (র.) এ সূরাটির মাক্কী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ সূরাতে বর্ণিত কথা ও বিষয়বস্তুতে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে, যার ভিত্তিতে একটি কথাকে প্রাধান্য দেওয়া যায়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : সূরাটিতে সর্বপ্রথম রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে সে কথাটি হলো : দুনিয়ার মানুষ আহলে কিতাব বা মুশরিক যা-ই হোক না কেন, যে কুফরির অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল, তা হতে মুক্তি লাভের জন্য এমন এক জন রাসূল প্রেরণ অপরিহার্য ছিল যার নিজ সত্তাই হবে তাঁর রাসূল হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। তাকে প্রদত্ত কিতাব হবে সম্পূর্ণরূপে যথাযথ, সঠিক ও নির্ভুল শিক্ষায় পরিপূর্ণ।

এরপর আহলে কিতাব জাতিসমূহের গোমরাহীর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পথ দেখাননি বলেই যে তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে তা নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ হতে সঠিক পথের নির্দেশ পাওয়ার পরই তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। কাজেই তাদের গোমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। আর এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে নবী ও রাসূলই এসেছেন আর যে কিতাব-ই নাজিল হয়েছে, তা একটি মাত্র নির্দেশই দিয়েছে। সে নির্দেশ হলো, সকল পথ-পন্থা ও নির্দেশ পরিত্যাগ করে আল্লাহর খালেস বন্দেগি করার পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এটা হতেও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আহলে কিতাব এ আসল ও প্রকৃত দীন হতে বিচ্যুত হয়ে নিজের ধর্মে যেসব নতুন নতুন মত-পথ ও কথার উদ্ভাবন বা বৃদ্ধি করে নিয়েছে, তা সবই সম্পূর্ণ বাতিল।

কাজেই আল্লাহর এ শেষ নবী যিনি এখন এসেছেন, তিনিও সে আসল দীনের দিকে ফিরে আসার জন্য তাদেরকে অকুল আহ্বান জানিয়েছেন। সূরার শেষ ভাগে স্পষ্ট ও অকাট্য ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, আহলে কিতাব ও মুশরিক এ নবীকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে। তারা নিকৃষ্টতম জীব। চিরকালীন জাহান্নামই তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনে নেক আমলের পথ অবলম্বন করবে তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... الاية

শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ-এর আগমনের পূর্বে ইহুদি নাসারারা বলত যে, আফসোস যদি আমরা শেষ নবীকে পেতাম। তাহলে আমরা তার উপর সবার পূর্বে ঈমান আনয়ন করতাম। কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হন তখন কতিপয় লোক ছাড়া তাদের মাঝে কেউ ঈমান আনয়ন করেনি। তাদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্যেই এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। –[কানযুন নুকূল : ১০৯]

প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়াতে কুফর, শিরক ও মূর্খতার ঘোর অন্ধকারের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এহেন সর্বগ্রাসী অন্ধকার দূর করার জন্য একজন পারদর্শী সংস্কারক প্রেরণ করা ছিল অপরিহার্য। রোগ যেমন জটিল ও বিশ্বব্যাপী, তার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকও তেমনি সুনিপুণ ও বিচক্ষণ হওয়া দরকার। অন্যথা রোগ নিরাময়ের আশা সুদূরপরাহত হতে বাধ্য। অতঃপর সেই বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকের গুণাগুণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁর অস্তিত্ব একটি 'বাইয়্যিনাহ' অর্থাৎ কুফর ও শিরককে অসার প্রতিপন্ন করার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরপর বলা হয়েছে যে, এই চিকিৎসক হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত একজন রাসূল, যিনি কুরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে আগমন করেছেন। এ পর্যন্ত আয়াত থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল- এক. পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে দুনিয়াতে বিরাট অনর্থ এবং মূর্খতার অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং দুই. রাসূলুল্লাহ ﷺ মহান মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর কুরআনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ - يَتْلُوا শব্দটি تِلَاوَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ 'পাঠ করা'। তবে যে কোনো পাঠকেই তিলাওয়াত বলা যায় না বরং যে পাঠ পাঠদানকারীর প্রদত্ত অনুশীলনের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবে তাকেই 'তেলাওয়াত' বলা হয়। তাই পরিভাষায় সাধারণত কুরআন পাঠ করার ক্ষেত্রে 'তেলাওয়াত' শব্দ ব্যবহৃত হয়। صُحُفٌ শব্দটি صَحِيْفَةٌ -এর বহুবচন। যেসব কাগজে কোনো বিষয়বস্তু লিখিত থাকে সেগুলোকেই বলা হয় সহীফা। كُتُبٌ শব্দটি كِتَابٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ লিখিত বস্তু। এদিকে দিয়ে কিতাব ও সহীফা সমার্থবোধক। কিতাব অর্থ কোনো সময় আদেশও হয়ে থাকে। যেমন, এক আয়াতে আছে لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ –এখানেও এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অন্যথা فِيْهَا বলার কোনো মানে থাকে না।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুশরিক ও আহলে-কিতাবদের পথভ্রষ্টতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে সরে আসা সম্ভবপর ছিল না, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আল্লাহর কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে রাসূলকে সুসপষ্ট প্রমাণরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর কর্তব্য ছিল তাঁদেরকে পবিত্র সহীফা তেলাওয়াত করে শুনানো অর্থাৎ তিনি সেসব বিধান শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়। কেননা প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সহীফা থেকে নয়-স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাতেন। এসব সহীফায় ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে প্রদত্ত ও চিরন্তন বিধি-বিধান লিখিত ছিল।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ - تفرق -এর অর্থ এখানে বিরোধ ও অস্বীকার করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্ম ও আবির্ভাবের পূর্বে আহলে-কিতাবরা তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। কেননা তাদের ঐশী গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জীল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত, তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণাবলি ও তাঁর প্রতি কুরআন অবতরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল। তাই ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো বিরোধ ছিল না যে, শেষ জমানায় হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ আগমন করবেন, তাঁর প্রতি কুরআন নাজিল হবে এবং তাঁর অনুসরণ সবার জন্য অপরিহার্য হবে।

কুরআন পাকেও তাদের এই ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ আহলে-কিতাবরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং যখনই মুশরিকদের সাথে তাদের মোকাবিলা হতো, তখনই তাঁর মধ্যস্থতায় আল্লাহ তা'আলার কাছে বিজয় কামনা করে দোয়া করত যে, শেষ নবীর বরকতে আমাদেরকে সাফল্য দান করা হোক। অথবা তাঁরা মুশরিকদেরকে বলত : তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা করছ বটে, কিন্তু সত্বরই একজন রাসূল আসবেন, যিনি তোমাদেরকে পদানত করবেন। আমরা তাঁর সাথে থাকব, ফলে আমাদেরই বিজয় হবে।

সারকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমনের পূর্বে আহলে-কিতাবরা সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করত কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তখন তারা অস্বীকার করতে লাগল। কুরআনের অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا جَاۤءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ অর্থাৎ তাদের কাছে যখন পরিচিত রাসূল সত্য ধর্ম অথবা কুরআন নিয়ে আগমন করল, তখন তাঁরা কুফর করতে লাগল। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আশ্চর্যের বিষয়, রাসূলের আগমন ও তাঁকে দেখার পূর্বে তো তাদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কোনো মতবিরোধ ছিল না; সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে একমত ছিল কিন্তু যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ শেষনবী আগমন করলেন, তখন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ তো বিশ্বাস স্থাপন করে মু'মিন হলো এবং অনেকেই কাফের হয়ে গেল।

এ ব্যাপারটি কেবল আহলে-কিতাবদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে– মুশকিরদের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রথম ব্যাপারে উভয় দলই শরিক ছিল, তাই প্রথম আয়াতে উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ বলা হয়েছে।

মা'আরিফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে দ্বিতীয় ব্যাপারেও মুশরিক এবং আহলে-কিতাব উভয় সম্প্রদায়কে শামিল করে তাফসীর করা হয়েছে।

وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ অর্থাৎ আহলে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে, নামাজ কায়েম করতে ও জাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এটা কেবল তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক সঠিক মিল্লাতের অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের তরিকাও তাই। বলা বাহুল্য, قَيِّمَةٌ শব্দটি كُتُبٌ -এর বিশেষণ হলে এর উদ্দেশ্য কুরআনি বিধি-বিধান হবে এবং আয়াতের মতলব হবে এই যে, মোহাম্মদী শরিয়ত প্রদত্ত বিধি-বিধানও হুবহু তাই, যা তাদের কিতাব তাদেরকে পূর্বে দিয়েছিল। ভিন্ন বিধি-বিধান হলে অবশ্য তারা বিরোধিতার বাহানা পেত। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ এ আয়াতে জান্নাতীদের প্রতি সর্ববৃহৎ নিয়ামত আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাতিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন : يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ (হে জান্নাতিগণ)। তখন তারা জবাব দিবে لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّ فِيْ يَدَيْكَ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন :

هَلْ رَضِيْتُمْ তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা জবাব দেবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! এখনও সন্তুষ্ট না হওয়ার কি সম্ভাবনা? আপনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোনো সৃষ্টি পায়নি। আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নিয়ামত দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি নাজিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না। –[বুখারী, মুসলিম]

আলোচ্য আয়াতেও খবর দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতিরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ ও কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতেই পারে না। এমতাবস্থায় এখানে জান্নাতিদের সন্তুষ্টি উল্লেখ করার তাৎপর্য কি? জবাব এই যে, সন্তুষ্টির এক স্তর হলো প্রত্যেক আশা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া এবং কোনো কামনা অপূর্ণ না থাকা। এখানে সন্তুষ্টি বলে এ স্তরকেই বুঝানো হয়েছে। উদাহরণত সূরা দুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে: وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى অর্থাৎ সত্বরই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এমন বস্তু দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এখানে অর্থ চূড়ান্ত বাসনা পূর্ণ করা। এ কারণেই এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার একটি উম্মতও জাহান্নামে থাকবে। –[মাযহারী]

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ –সূরার উপসংহারে আল্লাহর ভয়কে সমস্ত ধর্মীয় উৎকর্ষ এবং পারলৌকিক নিয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোনো শত্রু, হিংস্র জন্তু অথবা ইতর প্রাণী দেখে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাকে خَشْيَةٌ বলা হয় না; বরং কারও অসাধারণ মাহাত্ম্য ও প্রতাপ থেকে যে ভয়-ভীতির উৎপত্তি, তাকেই خَشْيَةٌ বলা হয়। এই ভয়ের প্রেক্ষিতে সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা হয় এবং অসন্তুষ্টির সন্দেহ থেকেও আত্মরক্ষা করা হয়। এই ভীতিই মানুষকে কামিল ও প্রিয় বান্দায় পরিণত করে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَمْ يَكُنْ : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب بحث نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার كَوْنٌ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– ছিল না।

مُنْفَكِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْفِكَاكٌ মূলবর্ণ (ف - ك - ك) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রত্যাবর্তনকারী। বিরত, পৃথক। মুক্ত।

تَأْتِيَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتيان মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– উপস্থিত হয়, আসে।

اَلْبَيِّنَةُ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে بَيِّنَاتٌ অর্থ– খোলা দলিল, সুস্পষ্ট দলিলকে بَيِّنَةٌ বলা হয়। চাই তা যৌক্তিক প্রমাণ হোক বা জ্ঞানগত প্রমাণ হোক।

رَسُوْلٌ : পয়গাম্বর, নবী, প্রেরিত, দূত। رَسُوْلٌ শব্দটি رِسَالَةٌ থেকে নির্গত হয়েছে। শায়খ শামসুদ্দীন কুহেস্তানী লিখেছেন, فَعُوْلٌ মুবালাগার সীগাহ مُرْسَلٌ بِالْفَتْحِ - مفعل আর فعول এর ব্যবহার এভাবে কমই হয়ে থাকে।

يَتْلُوْا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পাঠ করে শুনিয়ে দেয়।

صُحُفًا : صَحِيْفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– কিতাবসমূহ। পাতাসমূহ। তবে এর বহুবচন খুব কম আসে। কেননা فَعِيْلَةٌ বহুবচন فُعُلٌ এর ওজনে আসলেও কদাচিৎ। যেমন– سَفِيْنَةٌ এবং سُفُنٌ আসে।

مُطَهَّرَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ– اسم مفعول বাব تفعيل মাসদার تَطْهِيْرٌ মূলবর্ণ (ط ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সকল প্রকার ময়লা, শারীরিক ও মানসিক অপবিত্রতা থেকে পাক হওয়া।

قَيِّمَةٌ : সিফাতের সীগাহ। মুয়ান্নাছ নাকেরাহ। সঠিক সত্য, ঠিক, ইহকাল ও পরকাল যিনি ঠিক করে। উদ্দেশ্য হলো পূর্ববর্তী আসমানী ছহীফা ও কিতাবসমূহ যথার্থ ও সঠিক থাকা এবং মানুষের জীবনকে পরিশুদ্ধকরণ। কুরআন মজিদ সব দিক থেকেই পূর্ণাঙ্গ একটি কিতাব।

تَفَرَّقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّل মাসদার تَفَرُّقٌ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– বিভক্ত হয়ে গেল।

أُوتُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব إفْعَال মাসদার إِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– প্রদান করা হয়েছিল। দেওয়া হয়েছে।

أُمِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার أَمْرٌ মূলবর্ণ (أ ـ م ـ ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– তাদের প্রতি এই নির্দেশ ছিল।

مُخْلِصِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব إِفْعَال মাসদার إِخْلَاصٌ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ ص) জিনস صحيح অর্থ– একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশকারী।

حُنَفَاءَ : حنيف -এর বহুবচন। অর্থ– একনিষ্ঠ।

بَرِيَّةٌ : সৃজন। সৃষ্টিজীব। بَرِيَّةٌ শব্দটি فَعِيْلَةٌ -এর ওজনে মাফউলের অর্থে। بَرْءٌ থেকে নির্গত। অর্থ– অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনা।

أَبَدًا : সর্বদা, অসীম ভবিষ্যৎকাল।

رَضُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلرِّضْوَانُ মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা সন্তুষ্ট থাকবে।

خَشِيَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَشْيُ মূলবর্ণ (خ ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে ভয় করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ এখানে : لَمْ يَكُنِ হলো ফে'লে নাকেস আর الَّذِيْنَ তার اسم نَاقص আর كَفَرُوْا বাক্যটি الَّذِيْنَ -এর সেলাহ হয়েছে। আর مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ টা উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে। আর مُنْفَكِّيْنَ টা خبر ناقص হয়েছে। আর وَالْمُشْرِكِيْنَ হলো হরফে জার। আর حَتّٰى ফে'ল যা حَتّٰى -এর পরে اَنْ উহ্য থাকায় منصوب হয়েছে। আর هُمْ হলো مفعول به আর الْبَيِّنَةُ হলো ফায়েল। অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলিল। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৭৪]

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা যিলযাল

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৮, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যখন জমিনকে ভীষণ কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে।	اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١
২. আর জমিন স্বীয় বোঝা [অর্থাৎ প্রোথিত ধন এবং মুরদাগণ]-কে বাইরে নিক্ষেপ করবে।	وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝٢
৩. আর [এ অবস্থা দেখে কাফের] মানুষ বলবে, তার কী হলো [ভূ-কম্পন ও এবং গুপ্তধন কেন বের হলো]?	وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣
৪. সেদিন জমিন নিজের সমস্ত [ভালো মন্দ] খবর ব্যক্ত করতে আরম্ভ করবে।	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝٤
৫. এই কারণে যে, তার প্রতি আপনার প্রতিপালকের এই নির্দেশই হবে।	بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝٥
৬. সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে [বিচারক্ষেত্র হতে] প্রত্যাবর্তন করবে। যাতে নিজেদের আমলসমূহ [অর্থাৎ তাদের ভালোমন্দ ফল] দেখতে পায়।	يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝٦

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا زُلْزِلَتِ যখন প্রকম্পিত করা হবে الْاَرْضُ জমিনকে زِلْزَالَهَا ভীষণ কম্পনে।

২. وَاَخْرَجَتِ আর বাইরে নিক্ষেপ করবে الْاَرْضُ জমিন اَثْقَالَهَا স্বীয় বোঝাকে (প্রাথিত ধন এবং মুরদারগণ)।

৩. وَقَالَ الْاِنْسَانُ আর মানুষ বলবে مَا لَهَا -তার কি হলো?

৪. يَوْمَئِذٍ সেদিন জমিন تُحَدِّثُ ব্যক্ত করতে আরম্ভ করবে اَخْبَارَهَا নিজের সমস্ত খবর।

৫. بِاَنَّ رَبَّكَ এই কারণে যে আপনার প্রতিপালকের اَوْحٰى لَهَا তার প্রতি এই নির্দেশই হবে।

৬. يَوْمَئِذٍ সেদিন النَّاسُ يَصْدُرُ মানুষ প্রত্যাবর্তন করবে اَشْتَاتًا বিভিন্ন দলে বিভিক্ত হয়ে لِيُرَوْا যাতে দেখতে পায় اَعْمَالَهُمْ নিজেদের আমলসমূহ।

৭. অনন্তর যে ব্যক্তি [দুনিয়াতে] অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।	فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ﴿٧﴾
৮. আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ বদ কাজ করবে, সে তাও তথায় দেখতে পাবে।	وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. فَمَنْ يَّعْمَلْ অনন্তর যে ব্যক্তি করবে مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অণু পরিমাণ। خَيْرًا নেক কাজ يَّرَهٗ সে তা দেখতে পাবে।

৮. وَمَنْ يَّعْمَلْ আর যে ব্যক্তি করবে مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অণু পরিমাণ। شَرًّا বদ কাজ يَّرَهٗ সে তা তথায় দেখতে পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম আয়াতের زُلْزِلَتْ শব্দ হতে এর নামকরণ করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ : প্রকম্পিত। এ সূরাতে কিয়ামত হওয়ার সময় সমস্ত পৃথিবী প্রকম্পিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ৩৫টি বাক্য এবং ১০০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরা নাজিলের স্থান ও সময়কাল নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। ইবনে মাসউদ, আতা, জারীর ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখের মতে এটা মাক্কী সূরা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও এরূপ একটি শক্তিশালী অভিমত পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হযরত কাতাদাহ ও মুকাতিল (র.)-এর মতে এটা মাদানী সূরা; কিন্তু এর বাচন-ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেই প্রমাণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরাতে কিয়ামত ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বপ্রথম তিনটি বাক্যে বলা হয়েছে– মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বারের জীবন কিভাবে হবে এবং কিভাবে মানুষের জন্য বিস্ময়ের উদ্রেককারী হবে? পরে দু'টি বাক্যে বলা হয়েছে এই যে, জমিনের উপর থেকে নিশ্চিন্তভাবে সকল প্রকার কাজ করেছে এবং এ নিষ্প্রাণ-নির্জীব জিনিস কোনো এক সময় তার কাজকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে, তা তার চিন্তায়ও কখনো আসেনি। অথচ তা-ই একদিন আল্লাহর নির্দেশে কথা বলে উঠবে এবং কোনো সময় কোথায় কি কাজ করে তাও বলে দিবে। সেদিন সকল মানুষ উত্থিত হবে এবং তাদের আমলের চুলচেরা হিসাব-নিকাশ হবে।

সূরাটির ফজিলত : হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিলযালকে কুরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরূনকে এক-চতুর্থাংশ বলেছেন। –[মা'আরেফুল কুরআন]

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ .... اَلْاٰيَة.

শানে নুযূল : যখন সূরায়ে যিলযালের অষ্টম আয়াত নাজিল হয়, তখন মুসলমানরা চিন্তা করল যে, সামান্য গুনাহ করার দ্বারা যেমন কোনো ক্ষতি নেই তেমনি সামান্য ছওয়াবের দ্বারাও কোনো উপকার হবে না। যথা : মিথ্যা বলা, চুগলখুরী করা ইত্যাদির দ্বারা কোনো গুনাহ হয় না। তারা আরো মনে করতে ছিল যে, কেবল কবিরা গুনাহগুলোর ফলেই আল্লাহ পাক রাগান্বিত হন। সে প্রেক্ষিতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কানযুল নুকূল : ১০৯]

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا আয়াতে প্রথম শিংগা ফুঁৎকার পূর্বেকার ভূকম্পন বুঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ফুৎকারের পূর্বেকার ভূকম্পন কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে গণ্য হয় এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে কবর থেকে উত্থিত হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও তাফসীরবিদগণের উক্তি এ ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ যে, আলোচ্য আয়াতে কোন ভূকম্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এ স্থলে দ্বিতীয় ভূকম্পন বুঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ এরপর কিয়ামতের অবস্থা তথা হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। –[মাযহারী]

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا এই ভূকম্পন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালকায় স্বর্ণখণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধনসম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করেছিল সে তা দেখে বলবে, এর জন্যই কি আমি এতবড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। –[মুসলিম]

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ আয়াতে خَيْرً বলে শরিয়তসম্মত সৎ কর্ম বুঝানো হয়েছে; যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা ঈমান ব্যতীত কোনো সৎ কর্মই আল্লাহর কাছে সৎ কর্ম নয়। কুফর অবস্থায় কৃত সৎ কর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেওয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যার মধ্যে অণু পরিমান ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেওয়া হবে। কেননা এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎ কর্মের ফল পরকালে পাওয়া জরুরি। কোনো সৎ কর্ম না থাকলেও স্বয়ং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মু'মিন ব্যক্তি যত বড় গোনাহ্গারই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাফের ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো সৎকর্ম করে থাকলে ঈমানের অভাবে তা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই পরকালে তার কোনো সৎকাজই থাকবে না। وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ জীবদ্দশায় তওবা করেনি-এখানে এমন অসৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন ও হাদীসে অকাট্য প্রমাণ আছে যে, তওবা করলে গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তবে যে গোনাহ্ থেকে তওবা করেনি, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক-পরকালে অবশ্যই সামনে আসবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন, দেখ, এমন গোনাহ্ থেকেও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও, যাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হয়। কেননা এর জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে। –[নাসায়ী, ইবনে মাজা]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : কুরআনের এ আয়াতটি সর্বাধিক অটল ও ব্যাপক অর্থবোধক। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতকে اَلْفَاذَةُ الْجَامِعَةُ –অর্থাৎ একক, অনন্য ও সর্বব্যাপক বলে অবিহিত করেছেন।

হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা যিলযালকে কুরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরূনকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশ বলেছেন। –[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

زُلْزِلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার زَلْزَلَةٌ মূলবর্ণ (ز - ل - ز - ل) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– প্রকম্পিত করা হবে।

اَثْقَالَهَا : ثِقْلٌ -এর বহুবচন। অর্থ– তার বোঝা, এখানে খাজানা ও ধনভাণ্ডার উদ্দেশ্য।

تُحَدِّثُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْدِيْثٌ মূলবর্ণ (ح - د - ث) জিনস صحيح অর্থ– ব্যক্ত করতে আরম্ভ করবে।

يَصْدُرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَدْرٌ মূলবর্ণ (ص - د - ر) জিনস صحيح অর্থ– প্রত্যাবর্তন করবে। বের হবে।

اَشْتَاتًا : আলাদা আলাদা, পৃথক পৃথক, شَتٌّ ও اَشْتَاتٌ -এর বহুবচন। যার অর্থ পুরনো, বিভিন্ন।

لِيُرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول منصوب بلام كى বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং ناقص يائى অর্থ– যাতে দেখতে পায়।

خَيْرٌ : ভালো, উত্তম, নেকী, ভালো কাজ, মঙ্গল, যে জিনিস সকলের পছন্দ। বুদ্ধি, ন্যায়, দয়া, উপকারী জিনিস, খারাপের বিপরীত। خَيْرٌ দু'প্রকার। (১) خَيْر مُطْلَقٌ যা সর্বাবস্থায় সকলের নিকট পছন্দীয়। যেমন, জান্নাত। (২) দ্বিতীয় প্রকার خَيْرٌ নির্দিষ্ট নয়। কারো জন্য ভালো আবার কারো জন্য খারাপ। যেমন, সম্পদ কারো ক্ষেত্রে ভালো আবার কারো ক্ষেত্রে খারাপ।

مِثْقَالَ : একবচন। বহুবচন مَثَاقِيْلُ অর্থ– ভারি, সমান সমান। মাদ্দাহ ثِقْلٌ বাব كَرُمَ অর্থ– ভারী হওয়া। মাসদার ثَقَالَةٌ ও ثِقَالٌ বাব نَصَرَ ثَقَلَ الشَّيْئَ: জিনিসটি উঠাল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا : এটা পূর্বের উপর আতফ হয়েছে। আর اَخْرَجَتْ ফে'ল। اَلْاَرْضُ হলো ফায়েল। আর اَثْقَالَهَا হলো مفعول به।

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا : এখানে واو টি আতেফা قَالَ ফে'ল। আর اَلْاِنْسَانُ হলো ফায়েল। আর مَا টা اسم استفهام যা رفع -এর স্থলে হয়ে মুবতাদা হয়েছে। আর لَهَا হলো তার খবর। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৮০]

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা 'আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১১, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির।	وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١
২. অতঃপর যারা [পাথরের উপর] পদাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করতে থাকে।	فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢
৩. অনন্তর প্রভাতকালে অভিযান আরম্ভ করে।	فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٣
৪. অনন্তর তখন ধূলি উড়ায়।	فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝٤
৫. অতঃপর [শত্রু] দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।	فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝٥
৬. নিশ্চয় মানুষ [অর্থাৎ কাফেররা] স্বীয় প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ।	اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝٦
৭. আর এটা সে নিজেও অবহিত আছে।	وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝٧
৮. এবং সে ধন-সম্পদের মোহে অত্যন্ত মজবুত।	وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالْعٰدِيٰتِ শপথ অশ্বরাজির ضَبْحًا উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান।

২. فَالْمُوْرِيٰتِ অতঃপর যারা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত করতে থাকে قَدْحًا পদাঘাতে।

৩. فَالْمُغِيْرٰتِ অনন্তর অভিযান আরম্ভ করে صُبْحًا প্রভাতকালে।

৪. فَاَثَرْنَ بِهٖ অনন্তর তখন উড়ায় نَقْعًا ধূলি।

৫. فَوَسَطْنَ بِهٖ অতঃপর ঢুকে পড়ে جَمْعًا (শত্রু) দলের মধ্যে।

৬. اِنَّ الْاِنْسَانَ নিশ্চয় মানুষ لِرَبِّهٖ স্বীয় প্রতিপালকের لَكَنُوْدٌ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৭. وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ আর এটা সে নিজেও لَشَهِيْدٌ অবহিত আছে।

৮. وَاِنَّهٗ এবং সে لِحُبِّ الْخَيْرِ ধন-সম্পদের মোহে لَشَدِيْدٌ অত্যন্ত মজবুত।

৯. তার কি সে সময়টি জানা নেই, যখন জীবিত করা হবে সমাধিস্থ মুরদাদেরকে।	أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾
১০. আর যা অন্তরসমূহের মধ্যে আছে তা প্রকাশ হয়ে যাবে।	وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾
১১. নিঃসন্দেহে সেদিন তাদের প্রতিপালক তাদের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।	إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. أَفَلَا يَعْلَمُ তার কি সে সময়টি জানা নেই إِذَا بُعْثِرَ যখন জীবিত করা হবে مَا فِي الْقُبُورِ সমাধিস্থ মুরদাদেরকে।

১০. وَحُصِّلَ আর তা প্রকাশ হয়ে যাবে مَا فِي الصُّدُورِ যা অন্তরসমূহে আছে।

১১. إِنَّ رَبَّهُمْ নিঃসন্দেহে তাদের প্রতিপালক بِهِمْ তাদের অবস্থা সম্বন্ধে يَوْمَئِذٍ সেদিন لَّخَبِيرٌ পূর্ণ অবহিত আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম العديات [আল-'আদিয়াত] শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ৪০টি বাক্য এবং ১৬৩টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরা মক্কী কি মাদানী, এ বিষয়ে মতাপার্থক্য রয়েছে।

ক. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) জারীর, হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা (র.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক মত অনুযায়ী এটা মাক্কী সূরা।

খ. হযরত আনাস (রা.), কাতাদাহ (র.) ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অন্য মত অনুযায়ী এটা মাদানী সূরা। তবে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে এটা মাক্কী সূরা হওয়াই প্রতীয়মান হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরাতে পরকাল অবিশ্বাসের পরিণাম যে কত ভয়াবহ ও মারাত্মক হতে পারে এবং মহা-বিচারের দিন মানুষের আমল সহ মনের গোপন উদ্দেশ্য ও নিয়তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ হবে, তা-ই তুলে ধরা হয়েছে।

এ আলোচনায় তদানীন্তন মরু আরবের মানুষের জুলুম, অত্যাচার ও অবিচার এবং মারামারি, কাটাকাটি ও হানাহানির একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেকালে মানুষ সামাজিক জীবনে যে চরম দুর্ভোগ পোহাত, এক গোত্র অপর গোত্রের উপর রাতের অন্ধকারে চড়াও হয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ এবং তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে দাসী বানাত– এটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। তখন মানব জীবনের কোনোই নিরাপত্তা ছিল না। পারস্পরিক হানাহানি, লাঠালাঠি, লড়াই, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি কার্যাবলি, পরকাল সম্পর্কে উদাসীনতা ও অবিশ্বাসেরই ফলশ্রুতি– তাই প্রকারান্তরে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত একটি দৃশ্যের পটভূমিকায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে– মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতার অপচয় ঘটিয়ে তাঁর না-শোকরী করছে। ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তির লোভে অন্ধ হয়ে পড়ছে। তাদের জেনে রাখা উচিত ছিল যে, কবর হতে তাদেরকে পুনরায় উত্থিত করা হবে। আর তাদের যাবতীয় কাজ তাদের সম্মুখে উপস্থিত করে বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হবে। শুধু কার্যগুলোর রেকর্ডই উপস্থিত করা হবে না; বরং কার্যের কারণ ও মনের গোপন উদ্দেশ্য ও নিয়ামতসমূহের বাস্তব রেকর্ড উপস্থিত করে তার চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের পরই তাদের জন্য রায় ঘোষণা করা হবে। কারো প্রতি বিচারের বেলায় পক্ষপাতিত্ব ও জুলুমের আশ্রয় নেওয়া হবে না। সকলের প্রতিই ন্যায় ও ইনসাফের নীতি কার্যকর থাকবে। সুতরাং মানুষের উচিত পরকালের মহা বিচারদিনের ভয়াবহতার কথাটি নিজেদের হৃদয়ে জাগ্রত রাখা এবং বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী সামাজিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। অন্যথা তাদের জীবনে কালো অমানিশা আসার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই।

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا [١] فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا .... وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ [١٠] إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ [١١]

শানে নুযূল-১ : বাযযার ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ কোনো এক অভিযানে অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। সে বাহিনী থেকে এক মাস পর্যন্ত কোনো প্রকারের খবরাখবর আসেনি। সেই নিখোঁজ বাহিনীর নিরাপদ অবস্থান এবং বিজয়ের সু-সংবাদ প্রদান করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ২৭৪/৩০/১৫ ইবনে কাছীর ৫৪২/৪]

শানে নুযূল-২ : বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ কেনানার প্রতি এক সারিয়া বা ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন এবং মুনযির বিন আমর আনসারীকে তাদের হাকেম নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। সে বাহিনীর খবরা খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছাতে এক মাস বিলম্ব হয়ে গেল, এতে মুনাফিকরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বলতে লাগল যে, তারা নিহত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাদের জবাবে তাদের নিরাপদ অবস্থান এবং তাদের সকল অভিযানের সু-সংবাদ দান করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরা নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ২৭৮/৩০/১৫]

হযরত ইবনে মাসউদ, জাবের, হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা (রা.) প্রমুখের মতে সূরা আদিয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয় এবং হযরত ইবনে আব্বাস, আনাস (রা.) ইমাম মালিক ও কাতাদাহ (র.) প্রমুখের মতে মদীনায় অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী]

এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা সামরিক অশ্বের কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। একথা বার বার বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ ঘটনাবলি ও বিধানাবলি বর্ণনা করেন। এটা আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। মানুষের জন্য কোনো সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করার লক্ষ্য নিজের বক্তব্যকে বাস্তব সম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। কুরআন পাক যে বস্তুর শপথ করে কোনো বিষয় বর্ণনা করে, বর্ণিত বিষয় স্বপ্রমাণে সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। এখানে সামরিক অশ্বের কঠোর কর্তব্য নিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, অশ্ব বিশেষত সামরিক অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কত কঠোর খেদমতই না আনজাম দিয়ে থাকে। অথচ এসব অশ্ব মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তাও তার সৃজিত নয়। আল্লাহর সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌঁছে দেয় মাত্র। এখন অশ্বকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে! তার সামান্য ইশারায় সে তার জীবনকে সাক্ষাৎ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, কঠোরতম কষ্ট সহ্য করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'আলা তাকে এক ফোঁটা তুচ্ছ বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এতসব উচ্চস্তরের অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। এবার শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করুন– عَادِيَاتِ শব্দটি عَدْوٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ দৌড়ানো। ضَبْحًا –ঘোড়ার দৌড় দেওয়ার সময় তাঁর বক্ষ থেকে নির্গত আওয়াজকে বলা হয়। مُورِيَاتِ শব্দটি إِيرَاءٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ অগ্নি নির্গত করা; যেমন চকমকি পাথর ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘাষা দিয়ে অগ্নি নির্গত করা হয়। قدح -এর অর্থ ক্ষুরাঘাত করা। লৌহজুতা পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া যখন প্রস্তরময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় مُغِيرَاتِ শব্দটি اِغَارَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ হামলা করা, হানা দেওয়া। صُبْحًا আরবদের অভ্যাস হিসেবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বীরত্ববশত রাত্রির অন্ধকারে হানা দেওয়া দূষণীয় মনে করত। তাই তারা ভোর হওয়ার পর এ কাজ করত। اَثَرْنَ শব্দটি اِثَارَه থেকে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। نَقْعٌ ধূলিকে বলা হয়। অর্থাৎ অশ্বসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে এত দ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিশেষত প্রভাতকালে ধূলি উড়া অধিক দ্রুতগামিতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, স্বভাবত এটা ধূলি উত্থিত হওয়ার সময় নয়। তীব্র দৌড় দ্বারাই ধূলি উড়তে পারে।

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا –অর্থাৎ এসব অশ্ব শত্রু দলের অভ্যন্তরে নির্ভয়ে ঢুকে পড়ে। كَنُودٌ হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন; এর অর্থ সে ব্যক্তি, যে বিপদ স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ভুলে যায়।

আবূ বকর ওয়াসেতী (র.) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে গোনাহের কাজে ব্যয় করে, তাকে كَنُوْدٌ বলা হয়। তিরমিযীর মতে এর অর্থ, যে নিয়ামত দেখে কিন্তু নিয়ামতদাতাকে দেখে না। এসব উক্তির সারমর্ম নিয়ামতের নাশোকরী করা।

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ - خَيْر -এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। আরবে ধনসম্পদকেও خَيْر বলে ব্যক্ত করা হয়, যেন ধনসম্পদ মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার। প্রকৃতপক্ষে কোনো কোনো ধনসম্পদ মানুষকে হাজারো বিপদে জড়িত করে দেয়। পরকালে তো হারাম ধনম্পদের পরিণতি তা-ই হবে; দুনিয়াতেও তা মানুষের জন্য বিপদ হয়ে যায়। কিন্তু আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী এ আয়াতে ধনসম্পদকে خَيْر বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে اِنْ تَرَكَ خَيْرًا।

উপরিউক্ত আয়াতে অশ্বের শপথ করে মানুষ সম্পর্কে দু'টি কথা ব্যক্ত করা হয়েছে– এক. মানুষ অকৃতজ্ঞ, সে বিপদাপদ ও কষ্ট স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ও অনুগ্রহ ভুলে যায়। দুই. সে ধনসম্পদের লালসায় মত্ত। উভয় বিষয় শরিয়ত ও যুক্তির নিরিখে নিন্দনীয়। অকৃতজ্ঞতা যে নিন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তবে ধনসম্পদ মানুষের প্রয়োজনাদির ভিত্তি। এর উপার্জন শরিয়তে কেবল হালালই নয় বরং প্রয়োজন মাফিক ফরজও বটে। সুতরাং ধনসম্পদের ভালোবাসা নিন্দনীয় হওয়ার এক কারণ তাতে এমনভাবে মত্ত হওয়া যে, আল্লাহর বিধি-বিধান থেকেও গাফিল হয়ে পড়া এবং হালাল ও হারামের পরওয়া না করা। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ধনসম্পদ উপার্জন করা এবং প্রয়োজনমাফিক সঞ্চয় করা তো নিন্দনীয় নয়, বরং ফরজ। কিন্তু একে ভালোবাসা নিন্দনীয়। কেননা ভালোবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। সারকথা এই যে, ধনসম্পদ প্রয়োজনমাফিক অর্জন করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া তো ফরজ ও প্রশংসনীয় কিন্তু অন্তরে তৎপ্রতি মহব্বত হওয়া নিন্দনীয়। উদাহরণত মানুষ প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজন মিটায়, এজন্য যত্নবান হয় কিন্তু অন্তরে এর প্রতি মহব্বত থাকে না। অসুস্থ অবস্থায় মানুষ ঔষধ সেবন করে, অপারেশন করায়, কিন্তু অন্তরে ঔষধ ও অপারেশনের প্রতি মহব্বত থাকে না; বরং অপারগ অবস্থায় এগুলো অবলম্বন করে। এমনিভাবে মু'মিনের এরূপ হওয়া দরকার যে, সে প্রয়োজনমাফিক অর্থোপার্জন করবে, তার হেফাজত করবে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাকে কাজেও লাগাবে কিন্তু অন্তরকে তার মহব্বতে মশগুল করবে না। মাওলানা রূমী অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন :

آب اندر زیر کشتی پشتی است * آب در کشتی ہلاک کشتی است

অর্থাৎ পানি যতক্ষণ নৌকার নীচে থাকে, ততক্ষণ নৌকার পক্ষে সহায়ক হয় কিন্তু এ পানিই যখন নৌকার অভ্যন্তরে চলে যায়, তখন নৌকাকে নিমজ্জিত করে দেয়। এমনিভাবে ধনসম্পদ যতক্ষণ নৌকারূপী অন্তরের আশেপাশে থাকে, ততক্ষণই তা উপকারী থাকে। কিন্তু যখন তা অন্তরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে, তখন অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়। সূরার উপসংহারে মানুষের এ দু'টি ঘৃণ্য স্বভাবের কারণে পরকালীন শাস্তিবাণী শুনানো হয়েছে।

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ অর্থাৎ মানুষ কি জানে না যে, কিয়ামতের দিন সব মৃতকে কবর থেকে জীবিত উত্থিত করা হবে এবং অন্তরের সকল ভেদ ফাঁস হয়ে যাবে? এটাও সবার জানা যে, আল্লাহ তা'আলা সব অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত। অতএব তদনুযায়ী শাস্তি ও প্রতিদান দিবেন। কাজেই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হলো অকৃতজ্ঞতা না করা এবং ধনসম্পদের লালসায় মত্ত না হওয়া।

জ্ঞাতব্য : আলোচ্য সূরায় মানুষ মাত্রেই দু'টি ঘৃণ্য স্বভাব বর্ণিত হয়েছে। অথচ মানুষের মধ্যে এমন অনেক নবী, ওলী ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা এ ঘৃণ্য স্বভাবদ্বয় থেকে মুক্ত এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা। তারা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং হারাম ধনসম্পদ থেকে বেঁচে থাকেন। তবে অধিকাংশ মানুষ যেহেতু এসব দোষে পতিত, তাই মানুষ মাত্রেই এই বদ-অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে সবারই এরূপ হওয়া জরুরি হয় না। এ কারণেই কেউ কেউ আয়াতে মানুষ বলে কাফের মানুষ বুঝিয়েছেন। এর সার অর্থ হবে এই যে, এ ঘৃণ্য বিষয় প্রকৃতপক্ষে কাফেরদের স্বভাব। আল্লাহ না করুন, যদি কোনো মুসলমানের মধ্যেও এগুলো পাওয়া যায়, তবে অবিলম্বে তা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْعَادِيَاتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَدْوُ মূলবর্ণ (ع - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ধাবমান অশ্বরাজি।

ضَبْحًا : মাসদার বাব فَتَحَ মূলবর্ণ (ض - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– হাঁপানো। ঘোড়ার দৌড়ানোর কারণে ঊর্ধ্ব শ্বাস ফেলাকে ضبح বলা হয়।

اَلْمُوْرِيَاتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْرَاءٌ মূলবর্ণ (و - ر - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গতকারী।

قَدْحًا : অর্থ– চমকিত পাথরের আঘাত করে আগুন বের করা। পাথরের উপর পাথর বা লোহার আঘাত করে আগুন বের করা। قَدْحٌ-এর পরে فى আসলে অর্থ হবে টিপ্পনি কাটা (نَصَرَ) আকারের মধ্যে قَدْحًا-এর পরে কোনো صله আসেনি। তাই অর্থ হবে, ঘোড়ার নালযুক্ত পায়ের দ্বারা পাথরের জমিনে আঘাত করা।

اَلْمُغِيْرَاتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِغَارَةٌ মূলবর্ণ (غ - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– অভিযান আরম্ভকারী।

نَقْعًا : ইসম, মানসূব। অর্থ– ধূলাবালু, মাটি, উট পাখির ডাক। পানি জমা হওয়ার সংকীর্ণ স্থান। কূপে আবদ্ধ পানি।

وَسَطْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَسَطٌ মূলবর্ণ (و - س - ط) জিনস مثال واوى অর্থ– ঢুকে পড়ে। প্রবেশ করল।

جَمْعًا : মাসদার। جَمْعٌ-এর বহুবচন। جُمُوْعٌ বাব فَتَحَ। মূলবর্ণ (ج - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– একত্র হওয়া, দাঁড়ানো, জড়ো হওয়া। জামাত, দল, সৈন্য বাহিনী।

كَنُوْدٌ : সিফাতে মুশাব্বাহর সীগাহ। অর্থ– অকৃতজ্ঞ- পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। কাফের। আল্লাহকে যে খারাপ বলে। একা ভক্ষণকারী। বখিল। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য। كَنُدٌ ও كَنَادٌ অকৃতজ্ঞ পুরুষ। মাসদার كُنُوْدٌ বাব نَصَرَ অকৃতজ্ঞ হওয়া।

بُعْثِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার بَعْثَرَةٌ মূলবর্ণ (ب - ع - ث - ر) জিনস صحيح অর্থ– জীবিত করা হবে। উঠানো হবে।

حُصِّلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْصِيْلٌ মূলবর্ণ (ح - ص - ل) জিনস صحيح অর্থ– প্রকাশ হয়ে যাবে। অর্জন করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ : এখানে اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহবিল ফে'ল আর رَبَّهُمْ হলো اسم ان আর بِهِمْ টা خَبِيْرٌ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর يَوْمَئِذٍ টাও خَبِيْرٌ-এর সাথে ظرف متعلق হয়েছে। আর لَخَبِيْرٌ-এর لام المزحلقة হলো আর خَبِيْرٌ হলো خبر اِنَّ –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৩৮৭]

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা কারি'আ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ১১, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. সে খট্খট্কারী বস্তু [কিয়ামত বা মহা প্রলয়]।	اَلْقَارِعَةُ ۝١
২. কি রকম সে খট্খট্কারী বস্তু [কিয়ামত বা মহা প্রলয়]?	مَا الْقَارِعَةُ ۝٢
৩. আর আপনার কি কিছু জানা আছে সে খটখটকারী বস্তু [কিয়ামত বা মহা প্রলয়] কিরূপ?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣
৪. যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় হয়ে যাবে।	يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤
৫. আর পাহাড়সমূহ ধুনিত রঙ্গিন পশমের ন্যায় হয়ে [উড়ে] যাবে।	وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥
৬. অনন্তর যার [ঈমানের] পাল্লা ভারি হবে [অর্থাৎ সে মুমিন]।	فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦
৭. সে তো বাসনানুরূপ সুখে অবস্থান করবে।	فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧
৮. আর যার [ঈমানের] পাল্লা হালকা হবে [অর্থাৎ, সে কাফের হয়]।	وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلْقَارِعَةُ সে খটখটকারী বস্তু।
২. مَا الْقَارِعَةُ কি রকম সে খটখটকারী বস্তু।
৩. وَمَآ اَدْرٰىكَ আর আপনার কি কিছু জানা আছে مَا الْقَارِعَةُ সে খটখটকারী বস্তু কিরূপ?
৪. يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ যেদিন মানুষ হয়ে যাবে كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়।
৫. وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ আর পাহাড়সমূহ হয়ে যাবে كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ধুনিত রঙ্গিন পশমের ন্যায়।
৬. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ অনন্তর যার ভারি হবে مَوَازِيْنُهٗ (ঈমানের) পাল্লা।
৭. فَهُوَ সে তো অবস্থান করবে فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ বাসনানুরূপ সুখে।
৮. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ আর যার হালকা হবে مَوَازِيْنُهٗ (ঈমানের) পাল্লা।

৯. তবে তার বাসস্থান হবে হাবিয়া।	فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝٩
১০. আর আপনার কি জানা আছে হাবিয়া কী?	وَمَا أَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١٠
১১. [এটা] একটি জ্বলন্ত অগ্নি।	نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. فَأُمُّهُ তবে তার বাসস্থান হবে هَاوِيَةٌ হাবিয়া।

১০. وَمَا أَدْرٰىكَ আর আপনার কি জানা আছে مَا هِيَهْ হাবিয়া কি।

১১. نَارٌ حَامِيَةٌ একটি জ্বলন্ত অগ্নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : قَارِعَةٌ অর্থ- খটখটকারী, আঘাতকারী, বিধ্বস্তকারী, বিচূর্ণকারী, কিন্তু এখানে অর্থ হলো- কিয়ামত বা মহাপ্রলয়। অত্র সূরার প্রথম আয়াতেই সে মহা-প্রলয়ের আরবি শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। সে শব্দকে কেন্দ্র করে সূরার নাম اَلْقَارِعَةُ রাখা হয়েছে। মূলত এটা কেবল নাম-ই নয়; বরং এর বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্যের শিরোনামও তা। কেননা এতে মহাপ্রলয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ৩৩টি বাক্য এবং ১৫২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী। এর মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। তার বিষয়বস্তু হতে বুঝা যায় যে, এটা মক্কায় প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

সূরাটির বিয়বস্তু ও সারকথা : সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া ও পরকালে পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহর দরবারে পার্থিব জীবনের কৃতকর্মসমূহের হিসাব দেওয়া এবং প্রতিদান গ্রহণের জন্য মানুষের উপস্থিত হওয়া। সূরার প্রথমেই মানুষের মন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয় এবং থরথর করে কেঁপে উঠে, এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের দেশীয় কথায় বাঘ! বাঘ! বলা হলে যেমন স্তম্ভিত হয়ে যায় এবং প্রাণভয়ে মানুষ কাঁপতে থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলাও সূরার প্রথমে এমনি একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে সমস্ত মানুষ কেঁপে উঠে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়। অতঃপর মহাপ্রলয় কি? তার প্রশ্ন রেখে গুণগত দিকটি তুলে ধরে মূল ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এ মহাপ্রলয় এমন ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় হবে যে, মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। সেদিন মানুষ পতঙ্গকুলের ন্যায় দিক-বিদিক ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। তাদের অবস্থা হবে তখন দিশাহারা ও পাগলপারা মানুষের ন্যায়। পাহাড়গুলো পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। এর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, সে মহাপ্রলয়ের আকার ও রূপটি হবে কত ভয়ঙ্কর ও ভয়াল! পরিশেষে মানবকুলের বিচার অনুষ্ঠানের জন্য হাশর প্রান্তরে আল্লাহর আদালত বসবে। সে আদালতে মানুষের কার্যাবলির বিচার-বিশ্লেষণ হয়ে তা পরিমাপ করা হবে। যাদের সৎকাজের পরিমাণ বেশি এবং ওজনের পাল্লা ভারি হবে, তাদের পরিণাম হবে শুভ। তারা লাভ করবে চিরস্থায়ী সন্তোষজনক জীবন। মহা সুখ-শান্তি ও আনন্দে তারা জীবন কাটাবে। আর যাদের অসৎ কাজের পরিমাণ বেশি ও পাল্লা ভারি হবে তাদের পরিণাম হবে খুব দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। প্রজ্বলিত উত্তপ্ত অনল-গর্ত হবে তাদের স্থায়ী নিবাস। সেখানেই তারা অনাদি-অনন্ত চিরদুঃখ ও কষ্টজনক জীবন কালাতিপাত করতে থাকবে।

এ সূরায় আমলের ওজন ও তার হালকা এবং ভারি হওয়ার প্রেক্ষিতে জাহান্নাম অথবা জান্নাত লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমলের ওজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাফের শুরুতে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। সেখানে একথাও লিখিত হয়েছে যে, বিভিন্ন হাদীস ও আয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জানা যায় আমলের ওজন সম্ভবত দু'বার হবে। একবার ওজন করে মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হবে। মু'মিনের পাল্লা ভারি ও কাফেরের পাল্লা হালকা হবে। এরপর মু'মিনদের মধ্যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের পার্থক্য বিধানের জন্য হবে দ্বিতীয় ওজন। এ সূরায় বাহ্যত প্রথম ওজন বুঝানো হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মু'মিনের পাল্লা ঈমানের কারণে ভারি হবে, তার কর্ম যেমনই হোক। আর প্রত্যেক কাফেরের পাল্লা ঈমানের অভাবে হালকা হবে, সে যদিও কিছু সৎ কর্ম করে থাকে। তাফসীরে

মাযহারীতে আছে, কুরআন পাকে সাধারণভাবে কাফের ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনদের মধ্যে যারা সৎ ও অসৎ মিশ্র কর্ম করে, কুরআন পাকে সাধারণভাবে দান প্রদানের কোনো উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, কিয়ামতে মানুষের আমল ওজন করা হবে-গণনা করা হবে না। আমলের ওজন ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। যার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যায় কম হলেও তার আমলের ওজন বেশি হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যায় তো নামাজ, রোজা, সদকা-খয়রাত, হজ-ওমরা অনেক করে কিন্তু আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আমলের ওজন কম হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْقَارِعَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْقَرْعُ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– খট-খটকারী বস্তু। কিয়ামত।

مَا اَدْرَاكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْرَاءٌ মূলবর্ণ (د ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আপনার কি কিছু জানা আছে।

اَلْفَرَاشِ : বহুবচন। একবচন فَرَاشَةٌ। অর্থ- পতঙ্গ, প্রজাপতি, ধূর্ত, ফন্দিবাজ, সল্পজ্ঞান সম্পন্ন লোক। এখানে প্রথমটি উদ্দেশ্য। আয়াতে فَرَاشٌ জিনস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তার সিফাত একবচন নেয়া হয়েছে। اَلْمَبْثُوْثَةُ -এর মূল اَلْمَبْثُوْثُ বলা হয়েছে। যেরূপ اَلسَّحَابُ ; سَحَابَةٌ -এর বহুবচন। কিন্তু এটি ইসমে জিনস হয়।

اَلْعِهْنِ : অর্থ– রঙ্গিন পশম। লোগাতে عِهْنٌ অর্থ– রঙ্গিন পশম, যাতে নানা রকম রং থাকে। বহুবচন عهون আসে।

اَلْمَنْفُوْشِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার نُفُوْشٌ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ش) জিনস صحيح অর্থ– ধুনিত।

ثَقُلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার ثِقَلٌ মূলবর্ণ (ث ـ ق ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– ভারি হবে।

مَوَازِيْنُهُ : ইসমে আলা বা ইসমে মাফউল। একবচন مِيْزَانٌ বা اَلْمَوْزُوْنُ অর্থ– পাল্লা, নেকীর ওজন।

خَفَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خِفَّةٌ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– হালকা হবে।

هَاوِيَةٌ : দোজখের একটি স্তরের নাম। বহুবচন : هوة অর্থ– গর্ত, নিম্নভূমি, আকাশ জমিনের মধ্যবর্তী অংশ।

حَامِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার حَمْىٌ মূলবর্ণ (ح ـ م ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– জ্বলন্ত। প্রজ্জ্বলিত। উত্তপ্ত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَآ اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ : এখানে واو টি আতেফা। আর مَا হলো اسم استفهام যা মুবতাদা হয়েছে। আর اَدْرٰكَ خبر বাক্যটি আর كَ হলো اَدْرٰى -এর মাফউলে বিহী। আর مَاهِيَهْ -এর ما হলো اسم استفهام যা মুবতাদা হয়েছে আর هِىَ হলো খবর। এর শেষের هاء টি سلت -এর জন্য হয়েছে। আর نَارٌ হলো উহ্য هِىَ মুবতাদার খবর। আর حَامِيَةٌ হলো نَارٌ -এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৩৯৪]

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা তাকাছুর

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৮, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা [পার্থিব সম্পদের উপর গর্বিত হওয়া] তোমাদেরকে [পরকাল হতে] ভুলিয়ে রাখে।	اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾
২. এমন কি তোমরা কবরসমূহে উপনীত হও।	حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾
৩. [পার্থিব সম্পদ] কখনো [গর্বের বস্তু] নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾
৪. আবার বলি [শুনে রাখ] এটা সঙ্গত নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾
৫. সাবধান! যদি [এ বিষয়] তোমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হতে [যেমন মৃত্যুর পর হবে, তবে এরূপ দাম্ভিকতার মধ্যে পতিত থাকতে না।]	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿٥﴾
৬. আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই দোজখ দেখবে।	لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ﴿٦﴾
৭. আবার [বলা হয়েছে] আল্লাহর কসম, নিশ্চয় তোমরা তা এমন দেখা দেখবে, যা স্বয়ং প্রত্যক্ষ বিশ্বাস।	ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿٧﴾
৮. অতঃপর তোমরা সেদিন সকলেই নিয়ামত [ভোগ্য বস্তুসমূহ] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।	ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلْهٰكُمُ তোমাদেরকে (পরকাল হতে) ভুলিয়ে রাখে اَلتَّكَاثُرُ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা (পার্থিব সম্পদের উপর গর্বিত হওয়া।)

২. حَتّٰى زُرْتُمُ এমনকি তোমরা উপনীত হও اَلْمَقَابِرَ কবরসমূহে।

৩. كَلَّا কখনো নয় سَوْفَ শীঘ্রই تَعْلَمُوْنَ তোমরা জানতে পারবে।

৪. ثُمَّ كَلَّا আবার বলি এটা সঙ্গত নয় سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।

৫. كَلَّا সাবধান لَوْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা অবগত হতে عِلْمَ الْيَقِيْنِ নিশ্চিতরূপে।

৬. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই দোজখ দেখবে।

৭. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا আবার আল্লাহর কসম নিশ্চয় তোমরা তা এমন দেখা দেখবে عَيْنَ الْيَقِيْنِ যা স্বয়ং প্রত্যক্ষ বিশ্বাস।

৮. ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ অতঃপর তোমরা সকলেই জিজ্ঞাসিত হবে يَوْمَئِذٍ সেদিন عَنِ النَّعِيْمِ নিয়ামত (ভোগ্য বস্তু) সম্বন্ধে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের اَلتَّكَاثُرُ শব্দটিকে নামকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এতে ৮টি আয়াত, ২৮টি বাক্য এবং ১২০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : আবূ হাইয়ান ও শাওকীনী বলেন, সব তাফসীরকারকদের মতেই এ সূরাটি মাক্কী। ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন, সবচাইতে বেশি পরিচিত কথা হলো- এটা মাক্কী সূরা; কিন্তু কোনো কোনো হাদীসে এটা মাদানী বলে উল্লিখিত হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে দুনিয়া পূজা ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করা এবং মানুষকে আখেরাতপন্থি ও পরকালমুখি করা। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, তোমাদের জাগতিক জীবনে অধিক মাত্রায় উপায়-উপকরণ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছে। তোমরা বেশি বেশি লাভ করা এবং অপরের তুলনায় নিজে বেশি সম্পদের অধিকারী হওয়াকেই জীবনের আসল উন্নতি ও যথার্থ সাফল্য ভেবে নিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে তোমরা জীবনের আসল মূল্যবোধ, দর্শন ও দৃষ্টভঙ্গি হতে অনেক দূরে সরে পড়েছ। সেদিকে দৃষ্টিপাত করা ও মনোযোগ দেওয়ার কোনোই সুযোগ পাচ্ছে না এবং মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনও অনুভব কর না। অথচ জাগতিক উপায়-উপকরণের তুলনায় এদিকে মনোযোগ দেওয়াই ছিল তোমদের আসল কর্তব্য। পরকালের হিসাব-নিকাশ এবং আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করার চিন্তা ভুলেও তোমাদের মনের কোণে জাগরিত হয় না। এরূপ অবস্থায় নিমজ্জিত হয়ে থাকলে পরিণতিতে জাহান্নাম যে তোমাদের অবলোকন করতে হবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। যেদিন চাক্ষুষ জাহান্নামকে অবলোকন করবে, সেদিনই তার আসল সত্যাসত্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে।

সূরার সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের জীবনে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ও অবদান বর্তমান। এ নিয়ামতসমূহ কোন পথে, কি নিয়মে ব্যবহার করলে, সে বিষয় তোমাদের মৃত্যুর পর অবশ্যই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, সময় থাকতে তোমরা সাবধান হও, সতর্ক হও। পরকালমুখী গতি-চরিত্র গ্রহণ করো। এটাই তোমাদের জীবনে মহাসাফল্য এনে দিবে।

সূরাটির ফজিলত : নবী করীম ﷺ সাহাবীদেরকে বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন নেই, যে প্রতিদিন কুরআনের এক হাজার আয়াত পাঠ করে? তাঁরা বললেন– কার সাধ্য আছে যে, প্রতিদিন এক হাজার আয়াত পাঠ করে? তখন তিনি ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ কি اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করতে পারে না? –[অর্থাৎ এ সূরা এক হাজার আয়াতের সমতুল্য]।

হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, রাতে এক হাজার আয়াত পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলার দীদার নসীব হবে। সাহাবীগণ অপারগতা প্রকাশ করলে নবী করীম ﷺ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করে ইরশাদ করলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, এ সূরাটি এক হাজার আয়াতের সমান। –[রূহুল মা'আনী]

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ .... اَلْاٰيَةَ.

শানে নুযূল : ১. এই সূরা আনসারদের দু'টি গোত্র সম্পর্কে নাজিল হয়। যারা পরস্পর একে অপরের সাথে সম্পদের প্রাচুর্য ও শক্তি নিয়ে গর্ব করত। তারা একে অপরের খারাপ লোকদের বর্ণনা করে বলত যে, তোমাদের মাঝে অমুক অমুক ব্যক্তি রয়েছে যারা জঘন্যতম। প্রথমে তারা জীবিতদের নিয়ে এমন মন্দচারী করত অতঃপর মৃতুদের কথাও ব্যক্ত করত। এমনকি তারা কবরস্থানে যেয়ে একে অপরের খারাপ লোকদের কবরগুলো দেখিয়ে গাল-মন্দ করত। –[কানযুন নুকূল : ১১০]

২. অন্য রেওয়ায়েতে আছে হযরত আলী (রা.) বলেন, আমরা কবরের আজাবের ব্যাপারে সন্দেহে ছিলাম তখন উক্ত সূরাটি নাজিল হয়। –[সূত্র-তিরমিযি শরীফ : ২]

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ- تَكَاثُرُ শব্দটি كَثْرَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হাসান বসরী (র.) এ তাফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ (র.) এ অর্থই করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এ আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন : এর অর্থ অবৈধ পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা। –[কুরতুবী]

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ : এখানে করবসমূহে উপনীত হওয়ার– অর্থ মরে কবরে পৌঁছা। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন : حَتّٰى يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ –(ইবনে কাছীর) অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশ-গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফেল ও উদাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিণতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোনো চিন্তা তোমরা করো না এবং এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায়। আর মৃত্যুর পর তোমরা আজাবে গ্রেফতার হও। একথা বাহ্যত সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে, যারা ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালোবাসায় অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফুরসতই পায় না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রা.) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছে দেখলাম, তিনি أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ তেলাওয়াত করে বলেছেন :

يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِيْ مَالِيْ لَكَ مِنْ مَالِكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْتَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهٗ لِلنَّاسِ.

মানুষ বলে, আমার ধন– আমার ধন অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই, যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে–তুমি অপরের জন্য তা ছেড়ে যাবে। –[ইবনে কাছীর, তিরমিযী, আহমদ]

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لَاَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَاَ فَاهُ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ.

আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যক থাকে, তবে সে (তাতেই সন্তুষ্ট হবে না; বরং) দু'টি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো (কবরের) মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহর দিকে রুজু করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। –[বুখারী]

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন : আমরা সূরা তাকাছুর নাজিল হওয়া পর্যন্ত উপরিউক্ত হাদীসকে কুরআন মনে করতাম। মনে হয়– রাসূলুল্লাহ ﷺ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় উপরিউক্ত উক্তিটি করেছিলেন। এতে কোনো সাহাবী তাঁর উক্তিকেও কুরআনের ভাষা মনে করলেন। পরে যখন সম্পূর্ণ সূরা সামনে আসে, তখন তাতে এসব বাক্য ছিল না। ফলে প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠে যে, এগুলো ছিল তাফসীরের বাক্য।

لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ - لَوْ-এর জবাব এ স্থলে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لَمَا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কিয়ামতের হিসাব-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে, তবে কখনো প্রাচুর্যের বড়াই করতে না এবং উদাসীন হতে না।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ -উপরে বলা হয়েছে عَيْنَ الْيَقِيْنِ -এর অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : হযরত মূসা (আ.) যখন তূর পর্বতে অবস্থান করেছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায় গোবৎসের পূজা করতে শুরু করছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তূর পর্বতেই তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাইলরা গোবৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তওরাতের তক্তিগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। –[মাযহারী]

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ –অর্থাৎ তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর শোকর আদায় করেছ কি না এবং পাপ কাজে ব্যয় করেছ কি না? তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক নিয়ামতের সুস্পষ্ট উল্লেখ কুরআনের অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে : اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا এতে মানুষের শ্রবণশক্তি হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নিয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। বলা হবে : আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দেইনি, আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি পান করতে দেইনি? –[তিরমিযী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আদায় না করা পর্যন্ত হাশরের মাঠে কেউ স্বস্থান ত্যাগ করতে পারবে না। এক. সে তার জীবনের দিনগুলো কি কি কাজে নিঃশেষ করেছে? দুই. সে তার যৌবনশক্তিকে কি কাজে ব্যয় করেছে? তিন. সে যে সম্পদ উপার্জন করেছিল তা বৈধ পন্থায়, না অবৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে? চার. সে সেই ধনসম্পদ কোথায় কোথায় ব্যয় করেছে? পাঁচ. আল্লাহ প্রদত্ত ইল্‌ম অনুযায়ী সে কতটুকু আমল করেছে? –[বুখারী]

তাফসীরবিদ ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেন : কিয়ামতের দিন এ ধরনের প্রশ্ন প্রত্যেক ভোগবিলাস সম্পর্কে করা হবে, তা পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান সম্পর্কিত ভোগবিলাস হোক কিংবা সান্তান-সন্ততি, শাসনক্ষমতা অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কিত ভোগবিলাস হোক। কুরতুবী এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন : এটা একান্ত যথার্থ যে, কোনো বিশেষ নিয়ামত সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَلْهٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِلْهَاءٌ মূলবর্ণ (ل ـ ه ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ভুলিয়ে রাখে।

تَكَاثُرُ : ইসম ও মাসদার। অর্থ : প্রাচুর্য। উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মান ও সম্মান মর্তবা, ধন ও জনের প্রাচুর্যের জন্য ঝগড়া করা। শব্দটি تفاعل-এর ওজনে।

زُرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার زِيَارَةٌ মূলবর্ণ (ز ـ و ـ ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা উপনীত হও।

مَقَابِرَ : সীগাহ جمع منتهى الجموع। যরফে মাকান। একবচন مَقْبَرَةٌ ও مَقْبُرَةٌ অর্থ, কবরস্থান।

لَتَرَوُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং ناقص يائى অর্থ– অবশ্যই দোজখ দেখবে।

لَتُسْئَلُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّوَالُ মূলবর্ণ (س ـ ء ـ ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।

نَعِيْمِ : ইসম। মারিফাহ। মাজরূর। অর্থ– নিয়ামত অর্থাৎ নিয়ামতের শুকরিয়াহ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ : এখানে أَلْهٰكُمْ হলো ফে'ল আর كم হলো مفعول به যা مقدم হয়েছে আর التَّكَاثُرُ হলো ফায়েল। আর حَتّٰى আতেফা বা হরফে জার। আর زُرْتُمْ হলো ফে'ল ও ফায়েল اَلْمَقَابِرَ হলো মাফউলে বিহী। –[ইরাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৩৯৮]

سُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা 'আস্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

وَالْعَصْرِ ۝١	১. মহাকালের শপথ।
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢	২. নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣	৩. কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং যারা নেক কাজ করে এবং একে অন্যকে সত্যের প্রতি উপদেশ দিতে থাকে এবং একে অন্যকে ধৈর্যের প্রতি উপদেশ দিতে থাকে [তারাই ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে।]

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالْعَصْرِ মহাকালের শপথ।

২. اِنَّ الْاِنْسَانَ নিশ্চয় মানুষ لَفِيْ خُسْرٍ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

৩. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا কিন্তু যারা ঈমান আনে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং যারা নেক কাজ করে وَتَوَاصَوْا এবং একে অন্যকে উপদেশ দিতে থাকে بِالْحَقِّ সত্যের প্রতি وَتَوَاصَوْا এবং একে অন্যকে উপদেশ দিতে থাকে بِالصَّبْرِ (সবরের) ধৈর্যের প্রতি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম اَلْعَصْرِ শব্দকেই এর নামরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ১৪টি বাক্য এবং ৬৮টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটির নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটি কখন নাজিল হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়।

১. হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল (র.) প্রমুখের মতে, এ সূরাটি মদীনায় নাজিল হয়েছে।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সহ জমহুর মুফাসসিরগণের মতে, সূরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে। এর বিষয়বস্তু হতেও বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়েছে। কেননা এতে ঈমান ও আমলের মৌলিক কথার উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : সূরাটি অতিশয় ক্ষুদ্র, অথচ এতে বক্তব্য ও ভাবের মহাসমুদ্র লুক্কায়িত রয়েছে। আল্লাহ এ ক্ষুদ্রকায় বাক্য কয়টিতে মানব জীবনের আসল নীতি-আদর্শ ও কর্মময় ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা তুলে ধরেছেন। এ সূরাটি ভাব ও মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে এত ব্যাপক যে, গোটা ইসলামি জীবন চরিত্রটি একটি সংক্ষেপ অথচ বিরাট-বিশালকায় রূপ অংকন করা হয়েছে। এ জন্যই ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন– কোনো লোক এ সূরাটি সম্পর্কে গভীরভাবে

চিন্তা-গবেষণা করলে এটা-ই তার হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট। মোটকথা, আল্লাহ এতে মানব জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতার চার দফা মূলনীতি উপস্থাপন করেছেন। ১. ঈমান ২. নেক আমল, ৩. সত্যের পারস্পরিক উপদেশ, ৪. ধৈর্যের পারস্পরিক নসিহত। এ চার দফা মূলনীতি হতে যারা সরে পড়বে তাদের ধ্বংস ইহকালে ও পরকালে অনিবার্য। সে ধ্বংস ও ক্ষতি হতে কেউই উদ্ধার পাবে না। আর তার ধারণা ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত উভয়কালের মুক্তি ও সাফল্য।

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ .... الاية.

শানে নুযূল : গোলাহ বিন উসায়েদ ইসলাম পূর্ব সময়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাছে এসে বসত। ইসলাম আসার পর যখন হযরত আবূ বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন একদা সে এসে বলতে থাকে যে, হে আবূ বকর, তোমার কি হলো যে, তোমার ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে। তুমি কোন ধ্যানে নিমগ্ন হলে যার ফলে তোমার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তুমি দেখছি একেবারে কপর্দক শূন্য হয়ে যাচ্ছ। হযরত আবূ বকর (রা.) তখন উত্তর দেন যে, হে নির্বোধ! যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও তার রাসূলের গোলাম বনে যায় সে ক্ষতিগ্রস্ত নয়। বরং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তো সেই ব্যক্তি যে, আখেরাতের চিন্তা বাদ দিয়ে কেবল দুনিয়ার উন্নতির চিন্তায় মশগুল রয়েছে। আর সে জন্যেই তার সকল সময় ব্যয় করে দিচ্ছে। সে প্রেক্ষিতেই হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শানে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। –[তাফসীরে আজীজী : ২৭৪]

সূরা আসরের বিশেষ ফজিলত : হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে হিসন (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যে দু'ব্যক্তি ছিল, তারা পরস্পর মিলে একজন অন্যজনকে সূরা আসর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। –(তাবারানী) ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন : যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি সম্পর্কেই চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। –[ইবনে কাছীর]

সূরা আসর কুরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এমন অর্থপূর্ণ সূরা যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভাষায় মানুষ এ সূরাটিকেই চিন্তা-ভাবনা সহকারে পাঠ করলে তাদের ইহকাল ও পরকালের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা যুগের কসম করে বলেছেন যে, মানবজাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে-ঈমান, সৎ কর্ম, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশ দেয়। দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা উপকার লাভ করার চার বিষয় সম্বলিত এ ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দু'টি বিষয় আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় দু'টি বিষয় মুসলমানদের হেদায়ত ও সংশোধন সম্পর্কিত।

প্রথম প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এ বিষয়বস্তুর সাথে যুগের কি সম্পর্ক, যার কসম করা হয়েছে? কসম ও কসমের জবাবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন : মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সূরায় যে সব কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও এই যুগকালেরই দিবারাত্রিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ করা হয়েছে।

মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততায় যুগ ও কালের প্রভাব কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, আয়ুষ্কালের সাল, মাস, সপ্তাহ, দিবারাত্র বরং ঘণ্টা ও মিনিটই মানুষের একমাত্র পুঁজি, যার সাহায্যে সে ইহকাল ও পরকালের বিরাট এবং বিস্ময়কর মুনাফাও অর্জন করতে পারে এবং ভ্রান্ত পথে চললে এটাই তার জন্য বিপজ্জনকও হয়ে যেতে পারে। জনৈক আলিম বলেন :

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا = مَضٰى نَفَسٌ مِنْهَا اِنْتَقَصْتَ بِهٖ جُزْءًا

অর্থাৎ তোমার জীবন কতিপয় গুণাগুনতি শ্বাস-প্রশ্বাসের নাম। যখন একটি শ্বাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তোমার বয়সের একটি অংশ হ্রাস পায়।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে তার আয়ুষ্কালের অমূল্য পুঁজি দিয়ে একটি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে দিয়েছেন, যাতে সে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে এ পুঁজিকে খাঁটি লাভদায়ক কাজে লাগাতে পারে। যদি সে লাভদায়ক কাজে এ পুঁজিকে বিনিয়োগ করে, তবে মুনাফার কোনো অন্ত থাকে না। পক্ষান্তরে যদি সে এই পুঁজি কোনো ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করে, তবে মুনাফা দূরের কথা, পুঁজিই বিনষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর কেবল মুনাফা ও পুঁজি বিনষ্ট হয়েই ব্যাপার শেষ হয়ে যায় না বরং তার উপর শত শত অপরাধের শাস্তি আরোপিত হয়। কেউ যদি এ পুঁজিকে লাভজনক অথবা ক্ষতিকর কোনো কাজেই ব্যবহার না করে, তবে এ ক্ষতি তো অবশ্যম্ভাবী যে, তার মুনাফা ও পুঁজি উভয়ই বিনষ্ট হলো। এটা নিছক কবিসুলভ কল্পনাই নয়, বরং এক হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

كُلُّ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠে তার প্রাণের পুঁজি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এ পুঁজিকে লোকসান থেকে মুক্ত করে নেয় এবং কেউ ধ্বংস করে দেয়।

খোদ কুরআনও ঈমান এবং সৎ কর্মকে মানুষের ব্যবসারূপে ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে : هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ আয়ুষ্কাল যখন পুঁজি আর মানুষ হলো ব্যবসায়ী, তখন সাধারণ অবস্থায় এই ব্যবসায়ীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা এ বেচারীর পুঁজি কোনো অসাড় পুঁজি নয় যে কিছুদিন বেকারও রাখা যাবে; যাতে ভবিষ্যতে আবার কাজে লাগানো যায়। বরং এটা বহমান পুঁজি, যা প্রতিনিয়ত বয়ে চলেছে। এ পুঁজির ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত চালাক ও সুচতুর হতে হবে। কারণ বহমান বস্তু থেকে মুনাফা অর্জন করা সহজ কথা নয়। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বরফ বিক্রেতার দোকানে গিয়ে সূরা আসরের যথার্থ তাফসীর বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, দোকানদার সামান্য উদাসীন হলেই তার পুঁজি পানি হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই আয়াতে কালের শপথ করে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, সে যেন ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে বস্তু চতুষ্টয় সম্বলিত ব্যবস্থাপত্র ব্যবহারে সামান্যও গাফিল না হয়, বয়সের প্রতিটি মুহূর্তকে যেন সঠিকভাবে কাজে লাগায় এবং চার প্রকার কাজে নিজেকে সদা নিয়োজিত রাখে।

কালের শপথের আরও একটি সম্পর্ক এরূপ হতে পারে যে, যার শপথ করা হয়, সে একদিক দিয়ে সেই বিষয়ের সাক্ষী হয়ে থাকে। কালও এমন বিষয় যে, কেউ যদি এর ইতিহাস এবং এর জাতিসমূহের উত্থান-পতন সম্পর্কিত ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে সে অবশ্যই এ বিশ্বাসে উপনীত হবে যে, উপরিউক্ত চারটি কাজের মধ্যেই মানুষের সাফল্য সীমিত। যে এগুলোকে বিসর্জন দেয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত। জগতের ইতিহাস এর সাক্ষী।

অতঃপর এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন। ঈমান ও সৎ কর্ম-আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে সত্যের উপদেশ ও সবরের উপদেশ এ দু'টি বিষয়ের উদ্দেশ্য কি, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। تَوَاصِيْ শব্দটি وَصِيَّتٌ থেকে উদ্ভূত। কাউকে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে উপদেশ দেওয়া ও সৎ কাজের জোর তাকীদ করার নাম অসিয়ত। এ কারণেই মরণোন্মুখ ব্যক্তি পরবর্তীকালের জন্য যেসব নির্দেশ দেয়, তাকেও অসিয়ত বলা হয়।

উপরিউক্ত দু'রকম উপদেশ প্রকৃতপক্ষে এই অসিয়তেরই দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় সত্যের উপদেশ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় সবরের উপদেশ। এখন এ দু'টি শব্দের কয়েক রকম অর্থ হতে পারে–এক. সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎ কর্মের সমষ্টি। আর সবরের অর্থ যাবতীয় গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। অতএব প্রথম শব্দের সারমর্ম হলো 'আমর বিল মারূফ' তথা সৎ কাজের আদেশ করা এবং দ্বিতীয় শব্দের সারমর্ম হলো 'নাহী আনিল মুনকার' তথা মন্দ কাজে নিষেধ করা। এখন সমষ্টির সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, নিজে যে ঈমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করেছে, অপরকেও তার উপদেশ দেওয়া। দুই. সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সবরের অর্থ সৎ কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা। কেননা সবরের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেওয়া ও অনুবর্তী করা। এ অনুবর্তী করার মধ্যে সৎ কর্ম সম্পাদন এবং গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা উভয়ই শামিল।

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন : দু'টি বিষয় মানুষকে ঈমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করতে স্বভাবত বাধা দেয়-এক. সন্দেহ ও সংশয় অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের ব্যাপারে মানুষের মনে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যাওয়া, যদ্দরুন বিশ্বাসই বিঘ্নিত হয়ে যায়। বিশ্বাসে ত্রুটি ঢুকে পড়লে কর্ম ত্রুটিযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। দুই. খেয়ালখুশি, যা মানুষকে কোনো সময় সৎ কাজের প্রতি বিমুখ করে দেয় এবং কোনো সময় মন্দ কাজে লিপ্ত করে দেয়; যদিও সে বিশ্বাসগতভাবে সৎ কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরি মনে করে। অতএব, আলোচ্য আয়াতে সত্যের উপদেশ বলে সন্দেহ দূর করা এবং সবরের উপদেশ বলে খেয়ালখুশি ত্যাগ করে সৎ কাজ অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া বুঝানো হয়েছে। সংক্ষেপে সত্যের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের শিক্ষাগত সংশোধন করা এবং সবরের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের কর্মগত সংশোধন করা।

মুক্তির জন্য নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের চিন্তাও জরুরি : এ সূরায় মুসলমানদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজেদের ধর্মকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী করে নেওয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি, ততটুকুই জরুরি অন্য মুসলমানদেরকেও ঈমান ও সৎ কর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমত চেষ্টা করা। নতুবা কেবল নিজেদের

আমল মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না, বিশেষত আপন পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কুকর্ম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা আপন মুক্তির পথ বন্ধ করার নামান্তর, যদিও নিজে পুরোপুরি সৎকর্মপরায়ণ হয়। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সাধ্যমতো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ফরজ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান এমনকি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত উদাসীনতায় লিপ্ত রয়েছে। তারা নিজেদের আমলকেই যথেষ্ট মনে করে বসে আছে, সন্তান-সন্ততি কি করছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। –[আমীন]

শব্দ বিশ্লেষণ :

عَصْرِ : অর্থ– সময়, যুগ। ইমাম রাগের (র.) লিখেন, عَصْر ও عَصَرٌ -এর অর্থ, জমানা। এর বহুবচন عُصُوْرٌ আসে।

اِنْسَانَ : অর্থ– মানুষ اِنْسَانٌ শব্দটি مذكر ও مؤنث উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়।

خُسْرٍ : এটি মাসদার অর্থ– ক্ষতি, ধ্বংস, সর্বনাশ। خَسَارَةٌ ও خُسْرَانٌ ও এর মাসদার। এ তিন মাসদারের অর্থই ক্ষতি হওয়া অর্থাৎ মূলধন বা পুঁজি কমে যাওয়া এবং লোকসান হওয়া।

اٰمَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (أ - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা ঈমান এনেছে।

عَمِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَمَلُ মূলবর্ণ (ع - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা নেক কাজ করেছে।

تَوَاصَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَوَاصِىٌ মূলবর্ণ (و - ص - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পরস্পর একে অন্যকে উপদেশ দেয়।

صَبْرِ : মাসদার। অর্থ– ধৈর্য, সহ্য, বিপদে স্থির থাকা। ইমাম রাগেব (র.) বর্ণনা করেন, صَبْر -এর অর্থ ধৈর্য, সহ্য, বিপদে স্থির থাকা, নিজের মনকে এমন জিনিসের থেকে রক্ষা করা যাতে বুদ্ধি ও শরিয়তের দাবি রয়েছে অথবা বিবেক ও শরিয়ত যেসব কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখার দাবি করে, তার থেকে বিরত থাকাকে صَبْر বা ধৈর্য বলা হয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ : এখানে واو টি হরফে কসম ও জার। আর الْعَصْرِ হলো مجرور; জার ও মাজরূর মিলে উহ্য ফে'লের সাথে متعلق আর اقسم উহ্য। اِنَّ الْاِنْسَانَ বাক্যটি جواب قسم -এর কোনো محل নেই। আর اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর الْاِنْسَانَ হলো اسم ان এবং لَفِىْ -এর লাম টি হলো لام المزحلقه এবং فِىْ خُسْرٍ হলো خبر اِنَّ –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৪০২-৪০৩]

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা হুমাযা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৯, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. নিরতিশয় অনিষ্ট রয়েছে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে [কারো] অগোচরে নিন্দা করে এবং সাক্ষাতে ধিক্কার দেয়।	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿۱﴾
২. যে [লোভের আতিশয্যে] মাল জমা করে এবং তা বারবার গণনা করে।	الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ﴿۲﴾
৩. সে মনে করে যে,তার ধন সম্পদ তার নিকট চিরকাল থাকবে।	یَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ﴿۳﴾
৪. কখনো না, আল্লাহর কসম, সে এমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে যে, তাতে যা পতিত হয় তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে।	كَلَّا لَیُنْۢبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ ﴿۴﴾
৫. আর আপনার কি জানা আছে, সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী অগ্নি কিরূপ?	وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ؕ﴿۵﴾
৬. এটা আল্লাহর অগ্নি, যা প্রজ্বলিত করা হয়েছে।	نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ﴿۶﴾
৭. যা [শরীরে লাগামাত্র] হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে।	الَّتِیْ تَطَّلِعُ عَلَی الْاَفْـِٕدَةِ ؕ﴿۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَيْلٌ নিরতিশয় অনিষ্ট রয়েছে لِكُلِّ هُمَزَةٍ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য যে (কারো) অগোচরে নিন্দা করে لُمَزَةٍ এর সাক্ষাতে ধিক্কার দেয়।

২. اَلَّذِیْ جَمَعَ مَالًا যে মাল জমা করে وَعَدَّدَهٗ এবং তা বারবার গণনা করে।

৩. یَحْسَبُ সে মনে করে যে اَنَّ مَالَهٗ তার ধনসম্পদ اَخْلَدَهٗ তার নিকট চিরকাল থাকবে।

৪. كَلَّا কখনো না لَیُنْۢبَذَنَّ আল্লাহর কসম, সে এমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে যে فِی الْحُطَمَةِ তাতে যা পতিত হয় তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে।

৫. وَمَاۤ اَدْرٰىكَ আর আপনার কি জানা আছে مَا الْحُطَمَةُ সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী অগ্নি কিরূপ?

৬. نَارُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর অগ্নি الْمُوْقَدَةُ যা প্রজ্বলিত করা হয়েছে।

৭. اَلَّتِیْ تَطَّلِعُ যা গিয়ে পৌঁছবে عَلَی الْاَفْـِٕدَةِ হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত।

৮. তা তাদের উপর আবদ্ধ করে দেওয়া হবে।	إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾
৯. সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মধ্যে [বেষ্টিত হবে]।	فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ তা তাদের উপর مُّؤْصَدَةٌ আবদ্ধ করে দেওয়া হবে।
৯. فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মধ্যে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম আয়াতের "هُمَزَةٍ" শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। هُمَزَةٍ অর্থ– নিন্দুক। অত্র সূরায় নিন্দুকের ভয়াবহ পরিণতির উল্লেখে করা হয়েছে বিধায় নামকরণ স্বার্থক হয়েছে। এতে ৯টি আয়াত ও ১৬১টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আলোচ্য সূরাটি মাক্কী। বিষয়বস্তু হতেও বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : ইসলাম-পূর্ব যুগে জাহেলিয়াতের আরব সমাজের অর্থ পূজারী ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কতগুলো মারাত্মক ধরনের নৈতিক ত্রুটি ও দোষ বিদ্যমান ছিল। এ সূরায় তার-ই বীভৎসতা ব্যক্ত করে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা এর কারণে মানুষ মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ-আস্বাদ, আরাম-আয়েশ ও মান-মর্যাদা অত্যধিক অর্জন করার এবং প্রতিযোগিতায় অন্যদের তুলনায় বেশি দূর অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চিন্তায় ও চেষ্টায় দিন-রাত তন্ময় হয়ে থাকে। সুতরাং তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে তোমাদেরকে যে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। সম্পদ অসৎ পথে উপার্জন এবং তার যথেচ্ছা ব্যয়ের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, জাহান্নামই হবে এ সব লোকদের চির আবাস। তাদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, সেদিন জাহান্নামের আগুন হতে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। দাহনকারী আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলবে। কাজেই যারা ধন-সম্পদের অহমিকায় পড়ে পরনিন্দায় ও মানুষকে কটাক্ষ করার পিছনে পড়ে রয়েছে, তাদের এখন হতেই সাবধান হওয়া উচিত। এ সব অহঙ্কারী নিন্দুক ধনীদের আবাসস্থল হবে হুতামাহ নামক দোজখ।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

শানে নুযূল : উমাইয়া ইবনে খালফ যখন হুজুর ﷺ-কে দেখত তখন তাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। –[লুবাব উর্দু, কানযুন নুকূল : ১১]

এ সূরায় তিনটি জঘন্য গুনাহের শাস্তি ও তার তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে। গুনাহ্ তিনটি হচ্ছে هَمْز - لَمْز ও جَمْعِ مَالٍ প্রথমোক্ত শব্দদ্বয় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে هَمْز -এর অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং لَمْز -এর অর্থ সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কাজই জঘন্য গুনাহ। পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গুনাহে মশগুল হওয়ার পথে সামনে কোনো বাধা থাকে না। যে এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গুনাহ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সম্মুখের নিন্দা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গুনাহ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারো পশ্চাতে নিন্দা করা এ কারণেও বড় অন্যায় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না।

একদিক দিয়ে لَمْز তথা সম্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয় তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিতও করা হয়। এর কষ্টও বেশি, ফলে শাস্তিও গুরুতর। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

شِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ لِبُرَاءِ الْعَنَتِ.

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষে নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

যেসব বদভ্যাসের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থলিপ্সা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে– অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গুনাহ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরি হক আদায় করা না হয় কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা লালসার কারণে দীনের জরুরি কাজ বিঘ্নিত হয়।

تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ –অর্থাৎ জাহান্নামের এই অগ্নি হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাও বৈশিষ্ট্য। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। মানুষ তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও জ্বলে যাবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নির এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌঁছবে এবং হৃদয় দাহনের তীব্র যন্ত্রণা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

وَيْلٌ : ইসম মারফূ মাসদার। ধ্বংস, শাস্তি, জাহান্নামের একটি উপত্যকা, কঠিন, শাস্তি। وَيْلٌ -এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন আফসোস করা, খারাপের মধ্যে প্রবেশ করা, বিপদগ্রস্ত হওয়া। মাসদারী অর্থ হলো, আফসো, কঠিন। ধমকের ও ভয়ের শব্দ, শাস্তির শব্দ, জাহান্নামের একটি কূপের নাম। তিরস্কার ও ভর্ৎসনার শব্দ।

هُمَزَةٍ : মুবালাগার সীগাহ। বড় নিন্দুক, গীবতকারী, ছিদ্রান্বেষী।

لُمَزَةٍ : সিফাতের সীগাহ মুবালাগার অর্থে। নিন্দুক, পিছনে নিন্দাকারী।

عَدَّدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْدِيْد মূলবর্ণ (ع ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিনি গণনা করে রাখেন।

أَخْلَدَهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِخْلَادُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ د) জিনস صحيح অর্থ– চিরকাল থাকবে, সর্বদা থাকবে।

لَيُنْبَذَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مستقبل مجهول درفعل بانون تاكيد ثقيلة لام تاكيد বাব ضَرَبَ মাসদর اَلنَّبْذُ মূলবর্ণ (ن ـ ب ـ ذ) জিনস صحيح অর্থ– সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে।

حُطَمَةِ : حَطْمٌ থেকে নির্গত। অর্থ– পিষ্টকারী। দোজখের একটাস্তরের নাম।

اَلْمُوْقَدَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِيْقَادُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– যা প্রজ্বলিত করা হয়েছে।

تَطَّلِعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার الاطلاع মূলবর্ণ (ط ـ ل ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– সে পৌঁছবে।

اَفْئِدَةٌ : বহুবচন, একবচন فواد অর্থ– হৃৎপিণ্ড, দিল, অন্তর।

مُؤْصَدَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِيْصَادُ মূলবর্ণ (ء ـ ص ـ د) জিনস مهموز فاء অর্থ– আবদ্ধ করে দেওয়া হবে।

عَمَدٍ : বহুবচন। একবচন, عماد অর্থ– দীর্ঘ স্তম্ভ। বড় স্তম্ভ। আল্লামা কাইয়ূমী লিখেন, عِمَادٌ হলো ঐ জিনিস, যার উপর নির্ভর করা হয়। ভরসা করা হয়। কিন্তু কামূসের মধ্যে عِمَادٌ -এর অর্থ উচ্চ ইমারত লিখা হয়েছে।

مُمَدَّدَةٍ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّمْدِيْدُ মূলবর্ণ (م ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সুদীর্ঘ, লম্বা, প্রসারিত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ـ فِىْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ : এখানে اِنَّ টি হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, هَا টি তার ইসম। عَلَيْهِمْ শব্দটি مُؤْصَدَةٌ এর সাথে مُتَعَلِّق এবং فِىْ عَمَدٍ টি مُؤْصَدَةٌ -এর সিফত। আর এটাই আবুল বাকাইয়ের মাযহাব।

–[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮, পৃ. ৪১০]

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৫, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনার কি জানা নেই যে, আপনার প্রভু হাতীওয়ালাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন।	اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ﴿١﴾
২. [কা'বা বিনষ্ট করার ব্যাপারে] তাদের চেষ্টা-তদবীরকে কি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেননি?	اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ﴿٢﴾
৩. এবং তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল প্রেরণ করলেন।	وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ﴿٣﴾
৪. যারা তাদের উপর কঙ্কর জাতীয় প্রস্তরসমূহ নিক্ষেপ করছিল।	تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٤﴾
৫. অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে ভক্ষিত ভূষির ন্যায় [বিনষ্ট] করে দিলেন।	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلَمْ تَرَ আপনার কি জানা নেই যে كَيْفَ فَعَلَ কিরূপ ব্যবহর করেছেন رَبُّكَ আপনার প্রভু بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ হাতীওয়ালাদের সাথে।
২. اَلَمْ يَجْعَلْ তিনি করে দেননি كَيْدَهُمْ তাদের চেষ্টাতদবীরকে فِيْ تَضْلِيْلٍ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।
৩. وَاَرْسَلَ এবং তিনি প্রেরণ করলেন عَلَيْهِمْ তাদের উপর طَيْرًا اَبَابِيْلَ ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল।
৪. تَرْمِيْهِمْ যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করছিল بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ কঙ্কর জাতীয় প্রস্তরসমূহ।
৫. فَجَعَلَهُمْ অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে করে দিলেন كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ভক্ষিত ভূষির ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে তাঁর প্রথম আয়াতের اَلْفِيْلُ শব্দ অবলম্বনে। اَصْحَابُ الْفِيْلِ অর্থ- হস্তির অধিপতি। এটা দ্বারা একটি হস্তিসজ্জিত সেনাবাহিনীর কথা বুঝানো হয়েছে এবং তার পরাজয় কিভাবে হয়েছিল গোটা সূরায় তা-ই স্থান পেয়েছে। এ কারণেই সূরাটির নাম যথাযথ হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য এবং ৭৬টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : তাফসীরকারকদের সর্বসম্মত মতে, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি লক্ষ্য করলেই অনুমিত হয় যে, এটা মাক্কী জীবনে অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম।

ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ : ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইয়েমেনের ইহুদি শাসক যুনাওয়াস তথাকার খ্রিস্টানদের প্রতি চরম অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে জ্বালিয়ে-ধ্বংসপ্রায় করে ফেলে। এতে পার্শ্ববর্তী আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান শাসকগণ খুব ক্ষুব্ধ হয়। এরই প্রতিশোধে ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়েমেনের উপর অভিযান চালিয়ে আবিসিনিয়ার শাসকগণ

ইয়েমেনের হিময়ারী সরকারের পতন ঘটায় এবং দেশটি দখল করে নেয়। এ অভিযানের প্রধান নায়ক ছিল এরিয়াত এবং তার সহকারী ছিল আবরাহা। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে যুদ্ধ বেঁধে যায়। আবরাহা এরিয়াতকে হত্যা করে ইয়েমেনের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে। আবিসিনিয়া শাসকদের ইয়েমেন দখল করার পিছনে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি কার্যকর থাকলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কথাও তারা দৃষ্টির আড়ালে রাখেনি। এটাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। ধর্মীয় প্রতিশোধ গ্রহণ ছিল একটি বাহানা মাত্র। আর সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হলো আরবের সাথে পূর্ব আফ্রিকা, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক জলপথ ও স্থলপথের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কেননা শত শত বছর ধরে আরবগণ এ পথে যাতায়াত করে প্রভূত মুনাফা লাভ করে আসছিল। বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল। ইয়েমেন দখল করার পূর্বে লোহিত সাগরের বাণিজ্যিক পথটি তারা রোমানদের সহায়তায় দখল করে নিয়েছিল।

এখন লক্ষ্য হলো, শাতিল আরব হতে মিসর ও সিরিয়া গমনের স্থলপথ। পথটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনাই ছিল ইয়েমেনের আবরাহা সরকারের মূল উদ্দেশ্য- কিন্তু এ উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে আবরাহা নতুন এক ফন্দি করল। সে আরবদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মান-মর্যাদা বিলীন করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে খ্রিস্টানদের জন্য ইয়েমেনের সানয়ায় একটি আন্তর্জাতিক মানের গীর্জা নির্মাণ করল এবং সেখানে হজের মৌসুমে দুনিয়ার সমস্ত লোককে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানাল। কিন্তু ইয়েমেনের খ্রিস্টান লোক ব্যতীত হজের মৌসুমে অন্য কোনো এলাকার লোকের সমাগম না দেখতে পেয়ে সে ভাবল, মক্কার ঘরই হচ্ছে এর অন্তরায়। মক্কার কা'বা ঘরকে ধ্বংস করা ব্যতীত সানয়ায় এ আন্তর্জাতিক মেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তাই সে সদর্পে ঘোষণা করল, আমি মক্কার হজ অনুষ্ঠান আগামী বৎসর হতে এ সানয়ায়ই করতে চাই। সুতরাং এ জন্য, আমার প্রথম কর্তব্য হবে-মক্কার কা'বা ঘরকে ধূলিসাৎ করে ফেলা। এ ঘোষণা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সেও প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল। এ উদ্দেশ্যে সে ষাট হাজার দুর্ধর্ষ সেনার একটি বিরাট বাহিনী সাজাল। ঐ বাহিনীতে ১৩টি যুদ্ধ-হস্তিও ছিল। অতঃপর সে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করল।

আবরাহার বাহিনী কা'বা ধ্বংসের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলল। পথে দু'টি গোত্র তাদেরকে বাধা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তারা এ বিশাল বাহিনীর শক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকতে না পেরে পরাজয় বরণ করল। আবরাহা বাহিনী তায়েফে উপনীত হলে তথাকার লোকেরা নিজেদের 'লাত মন্দির' ভেঙ্গে ফেলার আশঙ্কা করল। কিন্তু তারা এত বড় বিরাট শক্তির মোকাবিলায় দণ্ডায়মান থাকতে পারবে না, এ ধারণায় তাদের একটি প্রতিনিধিদল আবরাহার নিকট গিয়ে বলল- আপনার মূল লক্ষ্য হলো কা'বা-গৃহ। আপনি আমাদের লাত-মন্দির ধ্বংস করবেন না, আমরা আপনার মক্কায় পৌঁছার পথ প্রদর্শনের ভূমিকা পালন করব, আবরাহা এতে সম্মত হলো। আবূ রুগাল নামে এক ব্যক্তিকে তার পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করল; কিন্তু আল-মুগাম্মাস নামক স্থানে পৌঁছলে- আবূ রুগাল মারা গেল।

সেখান হতে আবরাহা একটি অগ্রবর্তী দল পাঠাল। তারা তেহামা হতে কুরাইশদের অনেক পালিত পশু লুণ্ঠন করে নিয়ে আসল। তারা মহানবী ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবেরও দুইশত উষ্ট্র লুট করে নিয়ে আসে।

আবরাহা বাহিনী আস-সিফাহ (আরাফাহ পর্বতমালার নিকটবর্তী স্থান) নামক স্থানে পৌছে কুরাইশদের নিকট দূত পাঠায়। দূত বলল, আমরা তোমাদের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আসিনি, কা'বা ঘর ধ্বংস করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তোমরা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে না আসলে আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো না। জবাবে কুরাইশ সরদার আব্দুল মুত্তালিব বললেন- তোমাদের সাথেও আমাদের যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা নেই। কা'বা ঘরের যে মালিক, তিনি তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। দূত বলল, তবে আপনি আমার সাথে আমাদের সেনাপতি আবরাহার নিকট চলুন। আব্দুল মুত্তালিব তার কথায় আবরাহার নিকট গেলেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন খুব সুশ্রী বলিষ্ট ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। আবরাহা তাকে দেখে খুবই প্রভাবিত হলো। সে নিজের আসন হতে উঠে এসে তার পাশে বসল। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বললেন, আমার যেসব উট লুট করে আনা হয়েছে তা ফেরত দিন। আবরাহা বলল, আপনাকে দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার এ কথায় আমার দৃষ্টিতে আপনার কোনো মর্যাদা থাকল না। কেননা পিতৃ ধর্মের কেন্দ্রস্থল কা'বা ঘর রক্ষার জন্য আপনি কোনো কথাই বললেন না। তিনি বললেন, আমি তো কেবল আমার উটগুলোর মালিক, আর সেগুলো সম্পর্কেই আপনার নিকট আবেদন করতে এসেছি। এ ঘরের ব্যাপার আলাদা। এর একজন রব আছেন, তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন। আবরাহা বলল, সে আমার আঘাত হতে তা রক্ষা করতে পারবে না। আব্দুল মুত্তালিব বললেন, ঐ ব্যাপারের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তা আপনি জানেন, আর তিনি [এ ঘরের মালিক] জানেন। এ কথা বলে তিনি আবরাহার নিকট হতে ফিরে আসলেন। পরে সে তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দিল। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনা হতে জানা যায়, আব্দুল মুত্তালিব আবরাহাকে বলেছেন, আপনি যা কিছু চান আমাদের নিকট হতে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করুন। কিন্তু আবরাহা তাতে রাজি হলো না।

আব্দুল মুত্তালিব আবরাহার সেনানিবাস হতে ফিরে এসে কুরাইশদেরকে সাধারণ হত্যাকাণ্ড হতে বাঁচার জন্য বংশ-পরিবার নিয়ে পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বললেন। পরে তিনি কুরাইশদের কতিপয় সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে হারাম শরীফে উপস্থিত হন এবং কা'বার দরজার কড়া ধরে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, তিনি যেন তাঁর ঘর ও তাঁর সেবকদের হেফাজত করেন। সেদিন কোনো দেব-দেবির নিকট নয়; বরং একমাত্র আল্লাহর নিকটই তারা দোয়া করেছিলেন। ইবনে হিশাম তাঁর 'সীরাত' গ্রন্থে আব্দুল মুত্তালিবের নিম্নোদ্ধৃত কবিতা উল্লেখ করেছেন।

لَا هُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ يَمْنَعُ • رَحْلَهُ فَامْنَعْ رِحَالَكَ
لَا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُمْ • وَمِحَالُهُمْ غَدًا مِحَالَكَ
إِنْ كُنْتَ تَارِكَهُمْ • وَقِبْلَتَنَا فَأَمْرٌ مَا بَدَا لَكَ

হে আল্লাহ! বান্দা নিজের ঘরের সংরক্ষণ করে,
আপনিও রক্ষা করুন আপনার নিজের ঘর।
কাল যেন তাদের ক্রুশ এবং চেষ্টা-যত্ন আপনার ব্যবস্থাপনার মোকাবিলায় জয়ী হতে না পারে।
আপনি যদি তাদেরকে এবং আমাদের কেবলা ঘরকে এমনিই ছেড়ে দিতে চান, তাহলে আপনার যা ইচ্ছা তা-ই করুন।
সুহাইলী 'রওজুল উনুফ' নামক গ্রন্থে এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত কবিতাংশও উদ্ধৃত করেছেন–

وَانْصُرْنَا عَلَى آلِ الصَّلِيبِ • وَعَابِدِيهِ الْيَوْمَ لَكَ

ক্রুশধারী ও তার পূজারীদের মোকাবিলায় আমি আপনাকে ছাড়া আর কারো নিকট কোনো আশা রখি না।
ইবনে জারীর আব্দুল মুত্তালিবের দোয়া প্রসঙ্গে পড়া নিম্নোক্ত ছত্র দু'টিরও উল্লেখ করেছেন।

يَا رَبِّ لَا أَرْجُو لَهُمْ سِوَاكَا • يَا رَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حِمَاكَا
إِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مَنْ عَادَاكَا• اِمْنَعْهُمْ أَنْ يُخَرِّبُوا قِرَاكَا

"হে আমার প্রভু! তাদের মোকাবিলায় আমি তোমাকে ব্যতীত আর কারো নিকট কোনো কিছু আশা করি না। হে প্রভু! তুমি তোমার ঘরকে রক্ষা কর। এ ঘরের শত্রুগণ, তোমার শত্রু। তোমার জনবসতি তাদের আক্রমণ হতে মুক্ত রাখ।"

আব্দুল মুত্তালিব এ প্রার্থনা করার পর স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে পর্বতমালায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। পরদিন আবরাহার বাহিনী মুহাসসির (মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী মুহাস্‌সার উপত্যকার নিকটবর্তী স্থান) নামক স্থান হতে কা'বা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বাহিনীর অগ্রে আবরাহার হস্তিটিকে পরিচালনা করল। কিঞ্চিৎ দূরে যাওয়ার পরই হস্তিটি বসে পড়ল, কোনো ক্রমেই অগ্রসর হতে চাইল না। মারপিট দেওয়া হলো, তবুও হাতিটি নড়ল না। মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে পরিচালনার চেষ্টা করা হলে সে দিকে চলল; কিন্তু যখনই কা'বা অভিমুখী হয়, তখনই হাতিটি বসে পড়ে। তারপর শুরু হলো আবরাহা বাহিনীর উপর আল্লাহর গজব নাজিলের পালা। লোহিত সাগরের দিক হতে ঝাঁকে ঝাঁকে অপরিচিত নতুন পক্ষীকুল এসে তাদের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর বর্ষণ করতে লাগল। কঙ্করগুলো আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার তেজস্ক্রিয়া ছিল খুব বেশি। যার দেহে পড়ত, তার দেহেই জালা-পোড়া সৃষ্টি হতো। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত গোটা দেখা দিত। যেখানে পড়ত সেখানে সরাসরি বিপরীত দিক দিয়ে বের হয়ে যেত। দৈহিক জ্বালা-পোড়া, বসন্ত গোটা উদগমন ও কঙ্কর বর্ষণে অতিষ্ঠ হয়ে বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করল এবং সে স্থানেই অনেকে মৃত্যুবরণ করল। আর পথে পথেও অনেকে পড়ে রইল। আবরাহাও কঙ্কর আঘাতে জখম হয়ে কোনো মতে খাসয়াম অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছে ছিল। অতঃপর সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এটাই আসহাবুল ফীলের ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

এ ঘটনা সমগ্র আরবদেশে ছড়িয়ে পড়ল। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বুকে স্বীয় অসীম কুদরতের যৎকিঞ্চিৎ নজির স্থাপন করলেন। মক্কার লোকগণ এ ঘটনায় আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করল। আরবগণ এ ঘটনার পর হতে দশ বছর পর্যন্ত প্রতিমা পূজা ছেড়ে নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করত। এ বছরটি আরবদের নিকট 'হস্তি বছর' নামে সুপরিচিত হয়ে গেল। আবরাহার হস্তিবাহিনীর ধ্বংস করার ঘটনাটি যে মাসে সংঘটিত হয়, তা ছিল মহররম মাস। মহানবী ﷺ-এর জন্মের দুই মাস পূর্বে। দুই মাস পরই ১২ই রবিউল আউয়াল কাবার প্রহরী ও বিশ্বমানবের মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ মুজতবা আহমদ মুস্তফা ﷺ এ ধরার বুকে তাশরীফ আনেন।

হস্তিবাহিনীর ঘটনাটিকে নিয়ে সেকালের বহু বিখ্যাত কবিও অনেক কবিতা-চরণ লিখে ঘটনাটিকে অমর করে রেখেছেন। পক্ষীকুলের নিক্ষিপ্ত কঙ্করগুলোও নিজেদের নিকট স্মৃতি স্বরূপ রেখে ছিল। তাদের বিপুল রণসম্ভার ও খাদ্য সামগ্রী কুরাইশদের হস্তগত হলো। এ সূরা নাজিল হওয়া পর্যন্ত এ ঘটনার অনেক দর্শকই তখনো বর্তমান ছিল। মাত্র চল্লিশ

পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যবধান। ঘটনাটি আরবের লোকদের মুখেমুখেই লেগে ছিল। এ কারণেই এ সূরায় বিস্তারিত ঘটনা আলোচিত না হয়ে যেটুকু মক্কাবাসীদের সম্মুখে আলোচনার প্রয়োজন ছিল, তা-ই আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের শাস্তিদানের বিবরণটি। এ সূরা অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশসহ সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে ইসলামি দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের বিরোধিতা হতে বিরত থাকারই প্রকারন্তরে আহ্বান জানিয়েছেন। -[খাযেন, কাছীর, মু'আলিম, হোসাইনী]

সূরাটির সারকথা : সূরা আল-ফীলে সংক্ষিপ্তভাবে আবরাহার আক্রমণ এবং ধ্বংস আলোচিত হয়েছে। কেননা, মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকটই এ ঘটনা জানা ছিল। আরবের কোনো ব্যক্তিই এ সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। সমগ্র আরববাসীদের ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল যে, আবরাহার আক্রমণ হতে কা'বা ঘরের হেফাজতের কার্যটি কোনো দেব-দেবী কর্তৃক হয়নি। এটা নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহরই অবদান। এ কারণেই একাধারে কয়েকটি বছর পর্যন্ত কুরাইশের লোকেরা এ ঘটনার দ্বারা এতই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিল যে, তারা এ সময় আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেনি। এ ঘটনার উল্লেখ দ্বারা কুরাইশদের এবং সাধারণভাবে আরববাসীদের মনে চিন্তার খোরাক দেওয়া হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তা অন্যান্য সব মা'বূদ পরিত্যাগ করার এবং একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর বন্দেগি করার দাওয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়। সাথে সাথে এ কথাও যেন বিশ্বাস করে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর এ সত্য দীনের দাওয়াতকে যদি তারা জোরপূর্বক দমন করতে চেষ্টা করে, তাহলে যে আল্লাহ তা'আলা হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, তারা সে আল্লাহর ক্রোধ ও রোষাগ্নিতে পড়ে চিরতরে ভস্ম হয়ে যেতে পারে।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ .... اَلْاٰيَةَ.

শানে নুযূল : সেই হস্তী বাহিনী যারা আবরাহা বাদশাহের নেতৃত্বে পবিত্র কাবা ঘরকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য হাতি নিয়ে এসেছিল ও ক্ষুদ্র আবাবিল পাখির প্রস্তরাঘাতে যারা ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের বর্ণনা ও স্মরণ করার জন্যই অত্র সূরাটি অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য যে, এ পথভ্রষ্ট বাহিনীর পথ প্রদর্শক ছিল কুরাইশদের মধ্য থেকেই আবূ রুগাল নামক এক কুলাঙ্গার।

এ সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কা'বা গৃহকে ভূমিসাৎ করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধূলায় মিশ্রিত করে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের বছর এ ঘটনা ঘটেছিল : মক্কা মোকাররমায় খাতামুল আম্বিয়া ﷺ-এর জন্মের বছর হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কতক রেওয়ায়েত দ্বারাও এটা সমর্থিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ উক্তি। -(ইবনে কাছীর) হাদীসবিদগণ এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক প্রকার মু'জিযা রূপে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মো'জেযা নবুয়ত দাবির সাথে নবীর সমর্থনের প্রকাশ করা হয়। নবুয়ত দাবির পূর্বে বরং নবীর জন্মেরও পূর্বে আল্লাহ তা'আলা মাঝে মাঝে দুনিয়াতে এমন ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা অলৌকিকতায় মো'জেযার অনুরূপ হয়ে থাকে। এ ধরনের নিদর্শনাবলিকে হাদীসবিদগণের পরিভাষায় 'ইরহাসাত' বলা হয়। 'রাহস' এর অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। এসব নিদর্শন নবীর নবুয়ত প্রমাণের ভিত্তি ও ভূমিকা হয় বিধায় এগুলোকে 'ইরহাসাত' বলা হয়ে থাকে। নবী করীম ﷺ-এর নবুয়ত এমনকি, জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের কয়েক প্রকার 'ইরহাসাত' প্রকাশ পেয়েছে। হস্তীবাহিনীকে আসমানি আজাব দ্বারা প্রতিহত করাও এসবের অন্যতম।

হস্তীবাহিনীর ঘটনা : এ সম্পর্কে হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদ ইবনে কাছীরের ভাষ্য এরূপ : আরবের ইয়েমেন প্রদেশ মুশরিক, 'হিমইয়ারী' রাজন্যবর্গের অধিকারভুক্ত ছিল। তাদের সর্বশেষ রাজা ছিলেন 'যু-নওয়াস'। সে সময় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ই ছিল সত্য ধর্মাবলম্বী। রাজা 'যুনওয়াস' তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন। তিনি একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত গর্ত খনন করে তা অগ্নিতে ভর্তি করে দেন। অতঃপর যত খ্রিস্টান পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এক আল্লাহর ইবাদত করত, তাদেরকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেন। এরূপ নির্যাতিতদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজারেরও কাছাকাছি। এই গর্তের কথাই সূরা বুরূজে 'আসহাবুল-উখদূদে'র নামে ব্যক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'ব্যক্তি কোনোরূপে অত্যাচারীদের কবল থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। তারা সিরিয়ার রোমক শাসকের দরবারে যেয়ে খ্রিস্টানদের প্রতি রাজা-যুনওয়াসের লোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করল। রোমক শাসক ইয়েমেনের নিকটবর্তী আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান সম্রাটের কাছে এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী, দুই সেনানায়ক আরবাত ও আবরাহার নেতৃত্বে রাজা যুনওয়াসের মোকাবিলায় পাঠিয়ে দিলেন। আবিসিনিয়ার সেনাবাহিনী ইয়েমেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সমগ্র ইয়েমেনকে হিমইয়ারীদের কবল থেকে মুক্ত করল। রাজা যু-নওয়াস পলায়ন করলেন এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। এভাবে আরবাত ও আবরাহার মাধ্যমে ইয়েমেন আবিসিনিয়া সম্রাটের করতলগত হলো। এরপর আরবাত ও আবরাহার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই হলো এবং আরবাত নিহত হলো। আবিসিনিয়া সম্রাট বিজয়ী আবরাহাকে ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করলেন।

ইয়েমেন অধিকার করার পর আবরাহার ইচ্ছা হলো যে, সে তথায় এমন একটি বিশাল সুরম্য গীর্জা নির্মাণ করবে, যার নযীর পৃথিবীতে নেই। এতে তার লক্ষ্য ছিল এই যে, ইয়েমেনের আরব বাসিন্দারা প্রতি বৎসর হজ করার জন্য মক্কায় গমন করে এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে। তারা এই গীর্জার মাহাত্ম্য ও জাঁকজমকে অভিভূত হয়ে বায়তুল্লাহর পরিবর্তে এই গীর্জায় আগমন করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে একটি বিরাট সুরম্য গীর্জা নির্মাণ করল। নিচে দাঁড়িয়ে কেউ এই গীর্জার উচ্চতা পরিমাপ করতে পারত না। স্বর্ণ-রৌপ্য ও মূল্যবান হীরা-জহরত দ্বারা কারুকার্যখচিত এই গীর্জা নির্মাণ করার পর সে ঘোষণা করল : এখন থেকে ইয়েমেনের কোনো বাসিন্দা হজের জন্য কা'বাগৃহে যেতে পারবে না। এর পরিবর্তে তারা এই গীর্জায় ইবাদত করবে। আরবে যদিও পৌত্তলিকতার জোর বেশি ছিল কিন্তু দীনে ইবরাহীম এবং কা'বার মাহাত্ম্য ও মহব্বত তাদের অন্তরে গ্রথিত ছিল। তাই আদনান, কাহতান ও কুরাইশ উপজাতিসমূহের মধ্যে এই ঘোষণার ফলে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তীব্রতর হয়ে উঠল। সে মতে তাদেরই কেউ রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে গীর্জায় প্রবেশ করে প্রস্রাব-পায়খানা করল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাদের এক যাযাবর গোত্র নিজেদের প্রয়োজনে গীর্জার সন্নিকটে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল। সেই অগ্নি গীর্জায় লেগে যায় এবং গীর্জার প্রভূত ক্ষতি হয়।

আবরাহাকে সংবাদ দেওয়া হলো যে, জনৈক কুরাইশী এই দুষ্কর্ম করেছে। তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে শপথ করল : আমি কুরাইশদের কা'বাগৃহ নিশ্চিহ্ন না করে ক্ষান্ত হব না। অতঃপর সে এর প্রস্তুতি শুরু করল এবং আবিসিনিয়ার সম্রাটের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। সম্রাট কেবল অনুমতিই দিলেন না বরং তার মাহমূদ নামক খ্যাতনামা হস্তীটিও আবরাহার সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এই হস্তীটি এমন বিশালকায় ছিল যে, এর সমতুল্য সচরাচর দৃষ্টিগোচর হতো না। এছাড়া আরো আটটি হাতি এই বাহিনীর জন্য সম্রাটের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হলো। এতসব হাতি প্রেরণ করার উদ্দেশ্য ছিল কা'বাগৃহ ভূমিসাৎ করার কাজে হাতি ব্যবহার করা। পরিকল্পনা ছিল এই যে, কা'বাগৃহের স্তম্ভে লোহার মজবুত ও লম্বা শিকল বেঁধে দেওয়া হবে। অতঃপর সেসব শিকল হাতির গলায় বেঁধে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সমগ্র কা'বাগৃহ (নাঊযুবিল্লাহ) মাটিতে ধসে পড়বে।

আরবে এই আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র আরব মোকাবিলার জন্য তৈরি হয়ে গেল। ইয়েমেনী আরবদের মধ্য থেকে যুনকর নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে আরবরা আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল আবরাহার পরাজয় ও লাঞ্ছনা বিশ্ববাসীর জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয়রূপে তুলে ধরা। তাই আরবরা যুদ্ধে সফল হতে পারল না। আবরাহা তাদেরকে পরাজিত করে যুনকরকে বন্দি করল। অতঃপর সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে 'খাস'আম' গোত্রের কাছে উপনীত হলে গোত্র সরদার নুফায়েল ইবনে হাবীব তার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। কিন্তু আবরাহার লশকর তাকেও পরাজিত ও বন্দি করল। আবরাহা নুফায়েলকে হত্যা না করে পথপ্রদর্শকের কাজে নিয়োজিত করল। অতঃপর এই সেনাবাহিনী তায়েফের নিকটবর্তী হলে তথাকার সাকীফ গোত্র আবরাহাকে বাধা দিল না। কারণ, তারা বিগত দু'টি যুদ্ধে আবরাহার বিজয় ও আরবদের পরাজয়ের ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। তারা আবরাহার সাথে সাক্ষাৎ করে এই মর্মে এক শান্তিচুক্তিও সম্পাদন করল যে, তারা আবরাহার সামনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে না। যদি তায়েফে নির্মিত তাদের লাত নামক মূর্তির মন্দির অক্ষত থাকে। উপরন্তু তারা পথপ্রদর্শনের জন্য তাদের সরদার আবূ রুগালকেও আবরাহার সঙ্গে দিয়ে দেবে। আবরাহা এতে সম্মত হয়ে আবূ রুগালকে সাথে নিয়ে মক্কার অদূরে 'মাগমাস' নামক স্থানে পৌঁছে গেল। সেখানে কুরাইশ গোত্রের উট-চারণ ভূমি অবস্থিত ছিল। আবরাহা সর্বপ্রথম সেখানে হামলা চালিয়ে সমস্ত উট বন্দি করে নিয়ে এল। এতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর পিতামহ আব্দুল মোত্তালিবেরও দুই শত উট ছিল। এখান থেকে আবরাহা বিশেষ দূত মারফত মক্কা শহরে কুরাইশ নেতাদের কাছে বলে পাঠাল যে, আমরা কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই না। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কা'বাগৃহ ভূমিসাৎ করা। এ লক্ষ্য অর্জনে বাধা না দিলে কুরাইশদের কোনো ক্ষতি করা হবে না। বিশেষ দূত 'হানাতা' এই পয়গাম নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলে সবাই তাকে প্রধান কুরাইশ নেতা আব্দুল মোত্তালিবের ঠিকানা বলে দিল। হানাতা তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে আবরাহার পয়গাম পৌঁছে দিল। ইবনে ইসহাক (র.)-এর বর্ণনা মতে আব্দুল মোত্তালিব প্রত্যুত্তরে বললেন : আমরাও আবরাহার মোকাবিলায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা রাখি না। মোকাবিলা করার যথেষ্ট শক্তিও আমাদের নেই। তবে একথা বলে দিচ্ছি যে, এটা আল্লাহর ঘর, তাঁর খলীল ইবরাহীম (আ.)-এর হাতে নির্মিত। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণের জিম্মাদার। আবরাহা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে করুক এবং দেখুক আল্লাহ তা'আলা কি করেন। হানাতা বলল : তাহলে আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আবরাহার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব।

আবরাহা আব্দুল মোত্তালিবের সুদর্শন সৌম্য চেহারা দেখে সিংহাসন ছেড়ে নিচে উপবেশন করল এবং আব্দুল মোত্তালিবকে সাথে বসালো। অতঃপর দোভাষীর মাধ্যমে আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করল। আব্দুল মোত্তালিব বললেন : আমার

প্রয়োজন এতটুকুই যে, আমার কিছু উট আপনার সৈন্যরা নিয়ে এসেছে। সেগুলো ছেড়ে দিন। আবরাহা বলল : আমি প্রথম যখন আপনাকে দেখলাম, তখন আমার মনে আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু আপনার কথাবার্তা শুনে তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। আপনি আমার কাছে কেবল দুই শত উটের কথাই বলছেন। আপনি কি জানেন না যে, আমি আপনাদের কা'বা তথা আপনাদের দীন-ধর্মকে ভূমিসাৎ করতে এসেছি? আপনি এ সম্পর্কে কোনো কথাই বললেন না! আশ্চর্যের বিষয় বটে। আব্দুল মোত্তালিব জবাব দিলেন : উটের মালিক আমি, তাই উটের কথাই চিন্তা করেছি। আমি কা'বা গৃহের মালিক নই। এর মালিক একজন মহান সত্তা। তিনি জানেন তাঁর এ ঘরকে কিরূপে রক্ষা করতে হবে। আবরাহা বলল : আপনার আল্লাহ একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আব্দুল মোত্তালিব বললেন : তাহলে আপনি যা ইচ্ছা করুন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, আব্দুল মোত্তালিবের সাথে আরো কয়েকজন কুরাইশ নেতা আবরাহার দরবারে গমন করেছিলেন। তাঁরা আবরাহার কাছে এই প্রস্তাব রাখলেন যে, আপনি আল্লাহর ঘরে হস্তক্ষেপ না করলে আমরা সমগ্র উপত্যকার এক তৃতীয়াংশ ফসল আপনাকে খেরাজ প্রদান করব। কিন্তু আবরাহা এ প্রস্তাব মানতে সম্মত হলো না। আব্দুল মোত্তালিব তাঁর উট নিয়ে শহরে ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর চৌকাঠ ধরে দোয়ায় মশগুল হলেন। কুরাইশ গোত্রের বহু লোকজন দোয়ায় তাঁর সাথে শরীক হলো। তারা বলল : হে আল্লাহ আবরাহার বিরাট বাহিনীর মোকাবিলা করার সাধ্য আমাদের কারো নেই। আপনিই আপনার ঘরের হেফাজতের ব্যবস্থা করুন। কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করার পর আব্দুল মোত্তালিব সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আবরাহার বাহিনীর উপর আল্লাহর গজব পতিত হবে। প্রত্যুষে আবরাহা কা'বা ঘর আক্রমণের প্রস্তুতি নিল এবং মাহমূদ নামক প্রধান হস্তীটিকে অগ্রে চলার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। বন্দি নুফায়েল ইবনে হাবীব সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হস্তীর কান ধরে বিড় বিড় করে বলতে লাগল : তুই যেখান থেকে এসেছিস, সেখানেই নিরাপদে চলে যা; কেননা তুই এখন আল্লাহর সংরক্ষিত শহরে আছিস। অতঃপর সে হাতির কান ছেড়ে দিল। হাতি একথা শুনেই বসে পড়ল। চালকরা তাকে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে উঠাতে চাইল। কিন্তু সে আপন জায়গা থেকে একবিন্দুও সরল না। বড় বড় লৌহ শলাকা দ্বারা পিটানো হলো, নাকের ভিতরে লোহার শিক ঢুকিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সে দণ্ডায়মান হলো না। তখন তারা তাকে ইয়েমেনের দিকে ফিরিয়ে দিতে চাইল। সে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল। অতঃপর সিরিয়ার দিকে চালাতে চাইলে চলতে লাগল। এরপর পূর্ব দিকেও কিছুদূর চলল। এসব দিকে চালানোর পর আবার যখন মক্কার দিকে চালানো হলো, তখন পূর্ববৎ বসে পড়ল।

এখানে তো আল্লাহর কুদরতের এই লীলাখেলা চলছিলই; অপরদিকে সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এক ধরনের পাখি সারিবদ্ধভাবে উড়ে আসতে দেখা গেল। এগুলোর প্রত্যেকটির কাছে ছোলা অথবা মসুরের সমান তিনটি করে কংকর ছিল; একটি চঞ্চুতে ও দু'টি দুই থাবায়। ওয়াকেদী (র.) বর্ণনা করেন : পাখিগুলো অদ্ভুত ধরনের ছিল, যা ইতঃপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। দেখতে দেখতে সেগুলো আবরাহার বাহিনীর উপরিভাগ ছেয়ে ফেলল এবং বাহিনীর উপর কংকর নিক্ষেপ করতে লাগল। প্রত্যেকটি কংকর সেই কাজ করল, যা বন্দুকের গুলীতেও করতে পরে না। কংকর যে ব্যক্তির উপর পতিত হতো, তাকে এপার-ওপার ছিদ্র করে মাটিতে পুঁতে যেত। এই আজাব দেখে সব হাতি ছুটাছুটি করে পালিয়ে গেল। একটিমাত্র হাতি ময়দানে ছিল, যা কংকরের আঘাতে নিহত হলো। বাহিনীর সব মানুষই অকুস্থলে প্রাণ হারায়নি বরং তারা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করল এবং পথিমধ্যে মাটিতে পড়ে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আবরাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই সে তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করেনি। কিন্তু তার দেহে মারাত্মক বিষ সংক্রমিত হয়েছিল। ফলে দেহের এক একটি গ্রন্থি পড়ে-গলে খসে পড়তে লাগল। এমতাবস্থায়ই সে ইয়েমেনে নীত হলো। রাজধানী 'সান'আয়' পৌঁছার পর তার সমস্ত শরির ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আবরাহার হস্তী মাহমূদের সাথে দু'জন চালক মক্কাতেই রয়ে গেল। তারা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল! মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন : আমি এই দু'জন চালককে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ অবস্থায় দেখেছি। হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভগিনী আসমা (রা.) বলেন : আমি এই বিকলাঙ্গ অন্ধদ্বয়কে ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখেছি। হস্তীবাহিনীর এই ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ-এখানে أَلَمْ تَرَ 'আপনি কি দেখেননি' বলা হয়েছে অথচ এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কাজেই দেখার কোনো প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সেই ঘটনার জ্ঞানকেও 'দেখা' বলে ব্যক্ত করা হয়। যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে; যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আসমা (রা.) উভয়েই দু'জন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখেছিলেন।

طَيْرًا اَبَابِيْلَ - اَبَابِيْلَ শব্দটি বহুবচন। অর্থ পাখির ঝাঁক-কোনো বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। এই পাখি আকারে কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল কিন্তু এ জাতীয় পাখি পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। –[কুরতুবী]

بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ভিজা মাটি আগুনে পুড়ে যে কংকর তৈরি হয়, সেই কংকরকে سِجِّيْلَ বলা হয়ে থকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই কংকরেরও নিজস্ব কোনো শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে এগুলো বন্দুকের গুলী অপেক্ষা বেশি কাজ করেছিল।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ - عَصْفٌ-এর অর্থ ভূষি। ভূষি নিজেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তৃণ। তদুপরি যদি কোনো জন্তু সেটিকে চর্বন করে, তবে এই তৃণও আর তৃণ থাকে না। কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সেনাবাহিনীর অবস্থা তদ্রুপই হয়েছিল।

হস্তী বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের অন্তরে কুরাইশদের মাহাত্ম্য আরো বাড়িয়ে দিল। এখন সবাই স্বীকার করতে লাগল যে, তারা বাস্তবিকই আল্লাহ ভক্ত। তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ স্বয়ং তাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। –[কুরতুবী]

এই মাহাত্ম্যের প্রভাবেই কুরাইশরা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশে গমন করত এবং পথিমধ্যে কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করত না। অথচ তখন সাধারণের জন্য দেশ সফর করা ছিল জীবন বিপন্ন করার নামান্তর। পরবর্তী সূরা কুরাইশে তাদের এই সফরের কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْفِيْلِ : فِيْلٌ শব্দটি ইসমে জিনস। একবচন, বহুবচন فِيَلَةٌ ও اَفْيَالٌ অর্থ– হাতি।

تَضْلِيْلٍ : মাসদার, বাব تَفْعِيْل মূলবর্ণ (ض ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।

اَرْسَلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْسَالُ মূলবর্ণ (ر ـ س ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তিনি প্রেরণ করলেন।

اَبَابِيْلَ : ঝাঁকেঝাঁকে, দলেদলে। আবূ উবায়দা উল্লেখ করেন, খণ্ড-খণ্ড দলকে اَبَابِيْلُ বলা হয়। যেমন, আরবরা বলে جَاءَتِ الْخَيْلُ اَبَابِيْلَ هُنَا وَهُهُنَا "এদিক সেদিক থেকে আরোহীরা দলে দলে আসছে।" ফাররার বর্ণনা মতে যেরূপভাবে عَبَادِيْدُ ও شَمَاطِيْطُ-এর একবচন হয় না, এরূপভাবে اَبَابِيْلُ এরও একবচন হয় না। দ্বিতীয় মত হলো, এর একবচন আসে। আবূ জাফর এর উক্তিমতে اَبَابِيْلَ-এর একবচন اِبَالَةٌ।

سِجِّيْلٍ : এটি ফারসী শব্দ سنگ كل থেকে পরিবর্তিত আরবি রূপ, অর্থ– কুফার।

عَصْفٍ : ভূসি, শস্যের পাতা, দমকা হওয়া, প্রবল বাতাস। তাফসীরে কাবীরে এর কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। ১. ভূসি যা আমাদের মহিষগুলো ভক্ষণ করে। ২. পুদিনা পাতা। ৩. ভক্ষণকৃত ফলের খোসা। ইমাম কুরতুবী (র.) তার তাফসীরে লিখেন, عَصْفٌ বহুবচন আর একবচন হলো عَصْفَةٌ، عَصَافَةٌ এবং عَصِيْفَةٌ

مَّأْكُوْلٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (أ ـ ك ـ ل) জিনস مهموز فاء অর্থ- ভক্ষিত।

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ

সূরা কুরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৪, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. যেহেতু কুরাইশগণ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।	لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾
২. [অর্থাৎ] শীত ও গ্রীষ্মকালীন পর্যটনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। [অর্থাৎ তারা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়কালেই দেশ ভ্রমণ করে থাকত]।	اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾
৩. অতএব, তাদের উচিত যেন তারা এই খানায়ে কা'বার মালিকের ইবাদত করে।	فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾
৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন, আর ভয়-ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন।	الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. لِاِيْلٰفِ যেহেতু অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে قُرَيْشٍ কুরাইশগণ।

২. اٖلٰفِهِمْ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ শীত ও গ্রীষ্মকালীন পর্যটনে।

৩. فَلْيَعْبُدُوْا অতএব, তাদের উচিত তারা যেন ইবাদত করে رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ এই খানায়ে কা'বার মালিকের।

৪. الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ যিনি তাদেরকে আহার্য দান করেছেন مِّنْ جُوْعٍ ক্ষুধায় وَّاٰمَنَهُمْ আর তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন مِّنْ خَوْفٍ ভয় ভীতি হতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের قُرَيْشٍ শব্দটি দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৪টি আয়াত, ১৭টি বাক্য এবং ৭৩টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিলের সময়কাল : এ সূরাটি কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। খুব কম সংখ্যক তাফসীরকার একে মাদানী সূরা বলে অভিহিত করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ সূরাটি মক্কায়ই অবতীর্ণ হয়। কারণ সূরার দু'নম্বর আয়াতে فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ দ্বারা মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার কথাই প্রমাণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দাওয়াত দেওয়া।

মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির বহুকাল পূর্ব হতেই মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায় নানা প্রকার সামাজিক কুসংস্কার ও অনৈসলামি আকীদায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে নানা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। স্বয়ং কা'বা ঘরকেই এ শিরকের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিল। মহানবীর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব হতেই কা'বা ঘরে

৩৬০টি প্রতিমা রাখা হয়েছিল; কিন্তু কুরাইশগণ এদেরকে আল্লাহ মানত না। এদের অসিলায় তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে, এ আশায় তারা এদের পূজা করত। এদের নিকট অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজন পুরা করার প্রার্থনা করত। অথচ কুরাইশগণের সমগ্র আরবের উপর বংশীয় কৌলিন্য-আভিজাত্য, সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুনাম যশ-লাভের একমাত্র কারণ ছিল কা'বা ঘর। কা'বা ঘরের কারণেই তারা আবরাহার আক্রমণ হতে রক্ষা পেয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি তাঁর বহুবিদ বদান্যতা ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন-হে কুরাইশগণ! তোমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্যিক সফরে। তোমরা দেশ হতে দেশান্তরে নিরাপদে ও সম্মানের সাথে যাতায়াত করতে পারছ; এটা আল্লাহর ঘরের খেদমত ও সেবা করারই ফলশ্রুতি। সুতরাং তোমাদের উচিত দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা পরিত্যাগ করে, এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত-বন্দেগি করা; অভাব-অভিযোগ ও হাজত পূরণের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা- তিনিই তো তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করে সুখী-সমৃদ্ধিশালী করেছেন এবং তোমাদের জন্য ভিতর-বাইর সর্বত্র এবং বাণিজ্যিক পথগুলোকে নিরাপদ করেছেন। তোমরা যেখানেই যাও, সেখানেই আল্লাহর ঘরের খাদেম বলে সম্মান পাচ্ছ। এমনকি আরবের দুর্বৃত্ত ও ডাকাত দলও তোমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে না। তোমাদের প্রতি হামলা করে না, তোমরা আল্লাহর এ সব নিয়ামত কিরূপে বিস্মৃত হতে পার? তোমাদের উচিত, যে ঘরের দ্বারা লাভবান হচ্ছ সে ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করা। অন্যথা তোমাদের নিকট হতে এ নিয়ামত কেড়ে নেওয়া হবে। তখন তোমরা পদে পদে অপমান ও অপদস্থ হবে।

لِإِيْلٰفِ قُرَيْشٍ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ .... الاية.

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ কুরাইশদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সাতটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যা না এর আগে না এর পরে কোনো সম্প্রদায় পেয়েছে বা পাবে। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ১. আমি কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেছি। ২. নবুয়ত রিসালাত তাদেরকেই একমাত্র দান করা হয়েছে। ৩. কা'বা শরীফের খেদমত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। ৪. হাজীদের পানি পানের দায়িত্ব তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। ৫. আসহাবে ফীলের উপর আল্লাহ পাক তাদেরকে বিজয়ী করেছেন। ৬. দশ বছর যাবত কুরাইশগণ ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর ইবাদত করেনি। (অর্থাৎ নবুয়তের প্রথম দশ বছররের মাঝে কুরাইশ বংশ ছাড়া অন্য কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি।) ৭. কুরাইশদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে একটি সূরা নাজিল করেছেন। উম্মে হানী বিনতে আবি তালেব বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, আমি কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেছি। এর স্থলে খেলাফত কুরাইশদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে ও দশ বছর ইবাদত করেনি এর স্থলে সাত বছর ইবাদত করেনি। –[মুস্তাদরাকে হাকীম ২ : ৫৩৬]

এ ব্যাপারে সব তাফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবত এ কারণেই কোনো কোনো মাসহাফে এ দু'টিকে একই সূরারূপে লিখা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিখিত ছিল না। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) যখন তাঁর খেলাফতকালে কুরআনের সব মাসহাফ একত্র করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সকল সাহাবায়ে কেরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর তৈরি এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়।

لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ আরবি ব্যাকরণিক গঠনপ্রণালী অনুযায়ী حَرْف لَامْ -এর সম্পর্ক কোনো পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে হওয়া বিধেয়। আয়াতে উল্লিখিত لَامْ -এর সম্পর্ক কিসের সাথে, এ সম্পর্কে একাধিক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সূরা ফীলের সাথে অর্থগত সম্পর্কের কারণে কেউ কেউ বলেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে اِنَّا اَهْلَكْنَا اَصْحَابَ الْفِيْلِ অর্থাৎ আমি হস্তীবাহিনীকে এজন্য ধ্বংস করেছি, যাতে কুরাইশদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন দুই সফরের পথে কোনো বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবার অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে اَعْجِبُوْا অর্থাৎ তোমরা কুরাইশদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ কর তারা কিভাবে শীত ও গ্রীষ্মের সফর নিরাপদে নির্বিবাদে করে! কেউ কেউ বলেন : এই لَامْ -এর সম্পর্ক পরবর্তী বাক্য فَلْيَعْبُدُوْا -এর সাথে। অর্থাৎ এই নিয়ামতের ফলশ্রুতিতে কুরাইশদের কৃতজ্ঞ হওয়া ও আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সারকথা, এই সূরার বক্তব্য এই যে, কুরাইশরা যেহেতু শীতকালে ইয়েমেনের দিকে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার দিকে সফরে অভ্যস্ত ছিল এবং এ দু'টি সফরের উপরই তাদের জীবিকা

নির্ভরশীল ছিল এবং তারা ঐশ্বর্যশালীরূপে পরিচিত ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের শত্রু হস্তীবাহিনীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারা যে কোনো দেশে গমন করে, সকলেই তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

সমগ্র আরবে কুরাইশদের শ্রেষ্ঠত্ব : এ সূরায় আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে কুরাইশগণ আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয়। রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেনানাকে কেনানার মধ্যে, কুরাইশকে কুরাইশের মধ্যে এবং বনী হাশিমকে বনী হাশিমের মধ্যে আমাকে মনোনীত করেছেন। অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন : সব মানুষ কুরাইশের অনুগামী ভালো ও মন্দে। প্রথম হাদীসে উল্লিখিত মনোনয়নের কারণ সম্ভবত এই গোত্রসমূহের বিশেষ নৈপুণ্য ও প্রতিভা। মূর্খতাযুগেও তাদের কতক চরিত্র ও নৈপুণ্য অত্যন্ত উচ্চস্তরে ছিল। সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তাদের মধ্যে পুরোপুরি ছিল। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম ও আল্লাহর ওলীগণের অধিকাংশই কুরাইশের মধ্য থেকে হয়েছেন। –[মাযহারী]

رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ : একথা সুবিদিত যে, মক্কা শহর যে স্থলে অবস্থিত, সেখানে কোনো চাষাবাদ হয় না, বাগবাগিচা নেই; যা থেকে ফলমূল পাওয়া যেতে পারে। এজন্যই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) দোয়া করেছিলেন وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! এতে বসবাসকারীদেরকে ফলমূলের রিজিক দান করুন। আরো বলেছিলেন : يُجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ বাইরে থেকেও যেন এখানে ফলমূল আনার ব্যবস্থা হয়। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করার উপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রপিতামহ হাশিম কুরাইশকে ভিনদেশে যেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই গ্রীষ্মকালে তারা সিরিয়ায় সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়েমেন গরম দেশ ছিল বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহর খাদেম হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। সরদার হাশিমের নিয়ম ছিল এই যে, ব্যবসায়ের সমস্ত মুনাফা তিনি কুরাইশের ধনী ও দরিদ্র সবার মধ্যে বন্টন করে দিতেন। ফলে তাদের দারিদ্র ও ধনীদের সমান গণ্য হতো। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ ও নিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ : নিয়ামত উল্লেখ করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কুরাইশকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এই গৃহের মালিকের ইবাদত কর। এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের [illegible] গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلَّذِيْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ : সুখী জীবনের জন্য যা যা দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরাইশকে এগুলো দান করেছিলেন। اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ বলে পানাহারের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম বুঝানো হয়েছে এবং اٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ বাক্যে দস্যু শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা এবং পরকালীন আজাব থেকে নিষ্কৃতি এ উভয় মর্মই বুঝানো হয়েছে।

ইবনে কাছীর বলেন : এ কারণেই যে ব্যক্তি এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য উভয় জাহানে নিরাপদ ও শঙ্কামুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইবাদতের প্রতি বিমুখ হয় তার কাছ থেকে উভয় প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অন্য এক আয়াতে আছে :

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এক জনপদের অধিবাসীরা সর্বপ্রকার বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করত। তাদের কাছে সব জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে জীবনোপকরণ আগমন করত। অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামতসমূহের নাশোকরী করল এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ আস্বাদন করালেন।

আবুল হাসান কাযবিনী (র.) বলেন : যে ব্যক্তি শত্রু অথবা বিপদের আশঙ্কা করে তার জন্য সূরা কুরাইশের তেলাওয়াত নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। একথা উদ্ধৃত করে ইমাম জাযরী (র.) বলেন–এটা পরীক্ষিত আমল। কাযী সানাউল্লাহ (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেন : আমাকে আমার মুর্শিদ 'মির্যা মাযহার জান-জানা' বিপদাপদের সময় এই সূরা তেলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন : প্রত্যেক বালামুসিবত দূর করার জন্য এটা পরীক্ষিত ও অব্যর্থ। কাজী সানাউল্লাহ (র.) আরো বলেন : আমি বারবার এর পরীক্ষা করেছি।

শব্দ বিশ্লেষণ :

إِيلَافِ : মাসদার। বাব إِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ى - ل - ف) জিনস مثال يائى অর্থ– আসক্ত হওয়া, পরিচিতি হওয়া, অন্তরঙ্গতা রাখা। পছন্দ করা।

قُرَيْشٍ : قَرْشٌ-এর তাসগীর, যার অর্থের ব্যাপারে অনেক উক্তি রয়েছে।

(১) قُرَيْش হল সামুদ্রিক এক ভয়ঙ্কর ও সাহসী জন্তু। কুরাইশদের মধ্যে এ সামঞ্জস্য থাকার কারণে তাদেরকে কুরাইশ বলা হয়।

(২) تَقْرِيْش -এর অর্থ– একত্র করা, জমা করা। কুসাই ইবনে কিলাব এই বিক্ষিপ্ত জাতিকে মক্কায় একত্র করেছিল বলে তাদেরকে কুরাইশ বলা হয়।

(৩) قُرَيْش -এর অর্থ كَسْب বা আয়-উপার্জনও হয়। কারণ তারা ব্যবসা করে উপার্জন ও কামাই রোজগার করত। লুটতরাজ কম করত। তাই তাদের কুরাইশ বলা হয়। কুরাইশ গোত্র ছিল আদনানের কবিলায়ে কিনানার একটি শাখা গোত্র। পরবর্তিতে এরাই কুরাইশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তার উর্ধ্বতন পুরুষ نَضْرٌ পর্যন্ত তের স্তর আর এই نَضْرٌ কেই কুরাইশ বলা হয়।

رِحْلَةَ : মাসদার। সফর করা, যাত্রা করা। কাজবা বেঁধে দেওয়া। মূলতঃ এর অর্থ হলো, উটের উপর মজবুত করে বেঁধে দেওয়া বোঝা। আর এখানে উদ্দেশ্য হলো সফর বা ভ্রমণ করা। আবার এ শব্দটি সফর করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বাবে فَتَحَ।

شِتَاءِ : একবচন, বহুবচন اَشْتِيَةٌ আসে। অর্থ– শীত মৌসুম। আর কোনো কোনো আলেম شِتَاءِ কে شَتْوَةٌ - এর বহুবচন বলেছেন।

صَيْفِ : গ্রীষ্মকাল, গরমকাল। এটি شِتَاء এর বিপরীত। এটি মূলতঃ صَافَ - يَصِيْفُ-এর মাসদার। যার অর্থ, গরম মৌসুমে কোনো স্থলে অবস্থান করা। আর গরম মৌসুমের জন্য ইসমও ব্যবহার হয়।

اَطْعَمَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطْعَامُ মূলবর্ণ (ط - ع - م) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে আহার্য দান করেছেন।

اٰمَنَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (أ - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তাদেরকে নিরাপত্তাদান করেছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ : এখানে فاء টি فاء فصيحة কেননা এটি উহ্য শর্তের জবাবে এসেছে لام টি لام امر আর يَعْبُدُوْا শব্দটি فعل مضارع مجزوم باللام ; واو টি فاعل আর رَبَّ হচ্ছে مفعول به এবং هٰذَا টি مضاف اليه আর بَيْت শব্দটি هذا হতে بدل হয়েছে। -[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮, পৃ. ৪২১]

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ

সূরা মা'উন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৭, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
১. আপনি কি সেই লোকটিকে দেখেছেন, যে প্রতিফল দিবসকে অবিশ্বাস করে।	اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۞١
২. অনন্তর সে তো ঐ ব্যক্তি, যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়।	فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۞٢
৩. এবং অভাবগ্রস্তকে আহার্য দানে উৎসাহ প্রদান করে না।	وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞٣
৪. অতএব, দুর্ভোগ ঐ সকল নামাজিদের জন্য।	فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۞٤
৫. যারা স্বীয় নামাজ সম্পর্কে উদাসীন।	الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۞٥
৬. [আর] যারা এরূপ যে, [যখন নামাজ পড়ে, তখন] লৌকিকতা প্রদর্শন করে [অর্থাৎ লোক দেখানো নামাজ পড়ে]।	الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۞٦
৭. এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্যদানে বিরত থাকে।	وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۞٧

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَرَءَيْتَ আপনি কি সেই লোকটিকে দেখেছেন الَّذِيْ يُكَذِّبُ যে অবিশ্বাস করে بِالدِّيْنِ প্রতিফল দিবসকে।

২. فَذٰلِكَ الَّذِيْ অনন্তর সে তো ঐ ব্যক্তি يَدُعُّ الْيَتِيْمَ যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়।

৩. وَلَا يَحُضُّ এবং উৎসাহ প্রদান করে না عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ অভাবগ্রস্তকে আহার্য দানে।

৪. فَوَيْلٌ অতএব, দুর্ভোগ لِّلْمُصَلِّيْنَ ঐ সকল নামাজিদের জন্য।

৫. الَّذِيْنَ هُمْ যারা عَنْ صَلَاتِهِمْ স্বীয় নামাজ সম্পর্কে سَاهُوْنَ উদাসীন।

৬. الَّذِيْنَ هُمْ যারা এরূপ যে يُرَآءُوْنَ লৌকিকতা প্রদর্শন করে।

৭. وَيَمْنَعُوْنَ এবং বিরত থাকে الْمَاعُوْنَ গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্যদানে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির শেষ আয়াতের শেষ শব্দ "اَلْمَاعُوْنَ" (আল-মাউন)-কে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৭টি আয়াত, ২টি বাক্য এবং ১১১টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়-কাল : আলোচ্য সূরা 'আল-মাউন' মাক্কী না মাদানী এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. ইবনে জুবাইর, আতা ও জাবিরসহ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের একটি দলের মতে, আলোচ্য সূরা 'আল-মাউন' মাক্কী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও অনুরূপ এক বর্ণনা রয়েছে।

২. হযরত কাতাদাহ ও যাহহাকসহ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অপর এক দলের মতে, এ সূরাটি মাদানী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

কিন্তু আলোচ্য সূরায় নামাজে গাফিলতি করা ও লোক দোখানো (আমল ও নামাজ)-এর কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। স্পষ্টতই তা দ্বারা মুনাফিকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর মুনাফিকদের আবির্ভাব হয়েছে মদিনায়। কাজেই এ হতে বুঝা যায় যে, সূরাটি মদিনায় নাজিল হওয়ার মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা পরকালে অবিশ্বাসী লোকদের চরিত্র কতদূর নিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়, তার একটি চিত্র অংকন করেছেন। সর্বপ্রথমেই বলা হয়েছে– পরকাল বা দীন ইসলামে যারা বিশ্বাসী হয় না; বরং অস্বীকার করে, তাদের সম্পর্কে তোমরা কিছু জান কি? তাদের সামাজিক চরিত্র লেনদেন কতখানি নিম্নস্তরের হীন ও নীচ হতে পারে, তা শোন। তাদের প্রথম চরিত্র হলো এতিমদের হক ও অধিকারকে তারা নস্যাৎ করে। তাদের ধন-সম্পদ ও বিষয়- সম্পত্তিকে আত্মসাৎ করে তা হতে তাদেরকে বেদখল করে। তারা তা চাইতে এলে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো– নিজেরা তাদের খাদ্য দেওয়া তো দূরের কথা, অপরকেও খাদ্য দিতে এবং সাহায্য-সহানুভূতি করতে বলে না। তারা পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থ আদায়ের জন্য কুফরিকে গোপন রেখে নামাজি সেজে জামাতে শামিল হয় এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, আমরা মুসলমান। রাষ্ট্রীয় যাবতীয় সুযোগ-সুবিধায় আমাদের অধিকার রয়েছে। এ সব মুনাফিক নামাজিদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা নামাজের ক্ষেত্রে খুবই উদাসীন। নামাজের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে নামাজ পড়ে না। নামাজের প্রতি প্রকারান্তরে অবজ্ঞা দেখায়। কেবল নামাজই নয়-সমস্ত কাজকর্মই লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে থাকে। এমনকি সামাজিক জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীও অন্যকে ধার দিতে চায় না। তারা কত স্বার্থপর ও আত্মপূজারী হয় যে, অপরের জন্য কিঞ্চিৎ কষ্ট করা এবং সাধারণ একটু স্বার্থ বিসর্জন দেওয়াকেও পছন্দ করতে পারে না। এটাই হলো পরকাল ও দীন ইসলাম অস্বীকারকারীদের জীবন চরিত্রের যৎকিঞ্চিৎ রূপ।

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ .... اَلْآيَة.

শানে নুযূল : এ আয়াতটি কাফের সর্দার আবূ জাহেলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আবূ জাহল এমন দুরাচার লোক ছিল যে, মানুষ যখন মৃত্যু শয্যায় কাতর অবস্থায় নিপতিত হতো, তখন সে তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলত, তুমি তোমার সন্তানাদির জন্য কোনো চিন্তা করো না। আমিই তার দেখা শুনা করব। এভাবে তাকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার মাধ্যমে তার অর্থ সম্পদ নিজের করায়ত্বে নিয়ে নিত। অতঃপর তার পরবর্তী ওয়ারিশদেরকে গলাধাক্কিয়ে বের করে দিত। তাতে এতিম অসহায় সন্তানরা নিদারুন কষ্ট উপভোগ করত। ঘটনাক্রমে এমন একজন এতিম যার ধন সম্পদ সব আবূ জাহলের কাছে রক্ষিত ছিল সে হুজুর ﷺ -এর কাছে এসে তাঁর দুর্ভোগের ব্যাপারেও নালিশ জানাল। তখন নবী করীম ﷺ আবূ জাহলের বাড়িতে যেয়ে এতিমের মাল ফেরত দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু আবূ জাহল প্রথমত তা দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তা দিতে বাধ্য হয়। –[আসবাবে নুযূল : ৪০৩]

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ .... اَلْآيَة.

শানে নুযূল : এ আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা মুসলমানদের সামনে তাদেরকে দেখানোর জন্য নামাজ আদায় করত; কিন্তু একাকী অবস্থায় নামাজ পড়ত না। আর মুসলমানদেরকে কোনো জিনিস ধার দিতেও অস্বীকার করত। এ সূরায় কাফের ও মুনাফিকদের কতিপয় দুষ্কর্ম উল্লেখ করে তজ্জন্য জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিন ব্যক্তি বিচার দিবস অস্বীকার করে না। সুতরাং কোনো মু'মিন যদি এসব দুষ্কর্ম করে, তবে তা শরিয়ত মতে কঠোর গুনাহ ও নিন্দনীয় অপরাধ হলেও বর্ণিত শাস্তির বিধান তার জন্য প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচার দিবস তথা কিয়ামত অস্বীকার করে। এতে অবশ্যই ইঙ্গিত আছে যে, বর্ণিত দুষ্কর্ম কোনো মু'মিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এটা কোনো অবিশ্বাসী কাফেরই করতে পারে। বর্ণিত দুষ্কর্ম এই : এতিমের সাথে দুর্ব্যবহার, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্য না দেওয়া এবং অপরকেও দিতে উৎসাহ না দেওয়া, লোক দেখানো নামাজ পড়া এবং জাকাত না দেওয়া। এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয় এবং কঠোর গুনাহ। আর যদি কুফর ও মিথ্যারোপের ফলশ্রুতিতে কেউ এসব কর্ম করে, তবে তার শাস্তি চিরকাল দোজখে বাস। এ সূরায় وَيْل (দুর্ভোগ) শব্দের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ এটা মুনাফিকদের অবস্থা। তারা লোক দেখানোর জন্য এবং মুসলমানিত্বের দাবি প্রমাণ করার জন্য নামাজ পড়ে। কিন্তু নামাজ যে ফরজ, এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল নামাজেরও খেয়াল রাখে না। লোক দেখানোর জায়গা হলে পড়ে নেয়, নতুবা ছেড়ে দেয়। আসল নামাজের প্রতিই ভ্রূক্ষেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং عَنْ صَلَاتِهِمْ শব্দের আসল অর্থও তাই। নামাজের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়া, যা থেকে কোনো মুসলমান, এমনকি রাসূলে কারীম ﷺ ও মুক্ত ছিলেন না-তা এখানে বুঝানো হয়নি। কেননা, এজন্য জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে না। এটা উদ্দেশ্য হলে عَنْ صَلَاتِهِمْ –এর পরিবর্তে فِيْ صَلَاتِهِمْ বলা হতো। সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনেও একাধিকবার নামাজের মধ্যে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল।

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ - مَاعُوْنَ শব্দের আসল অর্থ যৎকিঞ্চিৎ ও তুচ্ছ বস্তু। এমন ব্যবহার্য বস্তুসমূহকেও مَاعُوْنَ বলা হয়, যা স্বভাবত একে অপরকে ধার দেয় এবং যেগুলোর পারস্পরিক লেনদেন সাধারণ মানবতারূপে গণ্য হয়; যথা কুড়াল, কোদাল অথবা রান্না-বান্নার পাত্র। প্রয়োজনে এসব জিনিস প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া দূষণীয় মনে করা হয় না। কেউ এগুলো দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে বড় কৃপণ ও নীচ মনে করা হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে مَاعُوْنَ বলে জাকাত বুঝানো হয়েছে। জাকাতকে مَاعُوْنَ বলার কারণ এই যে, জাকাত পরিমাণে আসল অর্থের তুলনায় খুবই কম-অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে। হযরত আলী (রা.) ও ইবনে ওমর (রা.) এবং হাসান বসরী, কাতাদাহ ও যাহহাক (র.) প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ এখানে এ তাফসীরই করেছেন। –(মাযহারী) বলাবাহুল্য, বর্ণিত শাস্তি ফরজ কাজ তরক করার কারণেই হতে পারে। ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে দেওয়া খুব ছওয়াবের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরি কিন্তু ফরজ ও ওয়াজিব নয়, যা না দিলে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে। কোনো কোনো হাদীসে مَاعُوْنَ -এর তাফসীর ব্যবহার্য জিনিস দ্বারা করা হয়েছে। এর মর্মার্থ তাদের চরম নীচতাকে ফুটিয়ে তোলা যে, তারা জাকাত কি দিবে? ব্যবহার্য জিনিস দেওয়ার মধ্যে কোনো খরচ নেই– এতেও তারা কৃপণতা করে। অতএব শাস্তির বিধান কেবল ব্যবহার্য জিনিস না দেওয়ার কারণে নয় বরং ফরজ জাকাত না দেওয়াসহ চরম কৃপণতার কারণে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَرَأَيْتَ : أَ টি প্রশ্নবোধক। رَأَيْتَ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فتح মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস مركب (ناقص يائى و مهموز عين) অর্থ– আপনি কী দেখেছেন?

يُكَذِّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْذِيْبُ মূলবর্ণ (ك - ذ - ب) জিনস صحيح অর্থ- সে অবিশ্বাস করে।

اَلدِّيْنِ : কিয়ামতের দিন। কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে ইসলাম ধর্ম।

يَدُعُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعُّ মূলবর্ণ (د - ع - ع) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যে ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়।

لَا يَحُضُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَضُّ মূলবর্ণ (ح - ض - ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- উৎসাহ প্রদান করে না।

سَاهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّهْوُ মূলবর্ণ (س - ه - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ভুলে থাকে, অসতর্ক, উদাসীন।

يُرَاؤُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُرَاءَاةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস مركب (ناقص يائى و مهموز عين) অর্থ– লৌকিকতা প্রদর্শন করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ : এখানে واو টি حرف عطف এবং لَا টি لا نافية; يَحُضُّ শব্দটি فعل مضارع مرفوع তার فاعل টি উহ্য। যার উহ্য রূপ হলো هُوَ অর্থাৎ اَلَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ এবং عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ বাক্যটি يَحُضُّ -এর সাথে متعلق; –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮, পৃ : ৪২৩]

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা কাওছার

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৩, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. নিশ্চয় আমি আপনাকে [হাউজে] কাওছার দান করেছি।	اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١
২. অতএব আপনি [এই নিয়ামতসমূহের শুকরিয়াস্বরূপ] স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন, আর [আল্লাহর নামে] কুরবানি করুন।	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢
৩. নিঃসন্দেহে আপনার দুশমনই নির্বংশ [নিশ্চিহ্ন হবে।]	اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ নিশ্চয় আমি আপনাকে দান করেছি اَلْكَوْثَرَ কাওছার।

২. فَصَلِّ অতএব আপনি নামাজ পড়ুন لِرَبِّكَ স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে وَانْحَرْ, আর কুরবানি করুন।

৩. اِنَّ شَانِئَكَ নিঃসন্দেহে আপনার দুশমনই هُوَ الْاَبْتَرُ নির্বংশ [নিশ্চিহ্ন] হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার শুরুতে اَلْكَوْثَرَ শব্দ হতে তার নামকরণ করা হয়েছে سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ। আর অত্র সূরায় حَوْض كَوْثَر সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ সূরার নাম سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ রাখা হয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ১০টি বাক্য এবং ৪২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : হযরত আয়েশা (রা.) হতে সূরাটি মাক্কী বলে বর্ণিত হয়েছে। বেশির ভাগ মুফাসসিরদের মত এটাই। হযরত ইকরিমা, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র.) একে মাদানী বলেছেন। ইমাম সুয়ূতি (র.) একে সঠিক মত বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ বলেন, 'এই মাত্র আমার প্রতি একটি সূরা নাজিল হয়েছে। পরে তিনি বিসমিল্লাহ বলে সূরা কাওছার পাঠ করলেন।' এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন মদিনায়। তিনি বলেন- এ সূরাটি আমাদের উপস্থিতিতে নাজিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরাটি নাজিলের ঐতিহাসিক পটভূমি কি ছিল, তা সম্মুখে শানে নুযূলের আলোচনায় আমরা সামান্য উল্লেখ করেছি। অতি সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতে তিনটি বক্তব্য রাখা হয়েছে। প্রথম আয়াতে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ইহকাল-পরকাল ব্যাপী আল্লাহ তা'আলার অজস্র নিয়ামত, প্রাচুর্য যশ-খ্যাতি, সুনাম ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে- আমি আপনাকে ব্যাপক প্রাচুর্য ও নিয়ামত দান করেছি, যার কোনো সীমারেখা নেই। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে জীবনের সব কাজকর্ম বিশ্ব পালনকর্তার উদ্দেশ্যে করার জন্য হেদায়েত করে বলেছেন- আপনি নামাজ ও কুরআনকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করুন। তৃতীয় আয়াতে ইসলামের শত্রুগণ চিরতরে

নির্মূল হওয়ার এবং উত্তরোত্তর ইসলাম ও মহানবীর শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর আদর্শ ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বলা হয়েছে– আপনি শিকড় কাটা ও নির্বংশ নন; বরং আপনার শত্রুরাই এ জগতের পাতা হতে চিরতরে মুছে যাবে। কোথাও তাদের নাম-ধাম ও বংশের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে আপনার পুত্র-সন্তান না থাকলেও আপনার যশ-খ্যাতি, সুনাম, বংশ পৃথিবীর বুকে চিরগৌরবময় হয়ে থাকবে। মানুষ আপনাকে মাথার তাজতুল্য স্মরণ করবে। এমনকি আপনার সঙ্গীগণের সাথে সম্পর্ক থাকাকেও গৌরব ও পরকালের নাজাতের বিষয় মনে করবে।

শানে নুযূল : মুহাম্মদ ইবনে আলী, ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির পুত্রসন্তান মারা যায়, আরবে তাকে اَبْتَرُ নির্বংশ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেল, তখন কাফেররা তাঁকে নির্বংশ বলে গালি দিতে লাগল। তাদের মধ্যে কাফের 'আস ইবনে ওয়ায়েলের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো আলোচনা হলে সে বলত : আরে তাঁর কথা বাদ দাও। সে তো কোনো চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তাঁর নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউছার অবতীর্ণ হয়। –[ইবনে কাছীর, মাযহারী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, ইহুদি কা'ব ইবনে আশরাফ একবার মক্কায় আগমন করলে কুরাইশরা তার কাছে যেয়ে বলল : আপনি কি সেই যুবককে দেখেন না, যে নিজকে ধর্মের দিক দিয়ে সর্বোত্তম বলে দাবি করে? অথচ আমরা হাজীদের সেবা করি, বায়তুল্লাহর হেফাজত করি এবং মানুষকে পানি পান করাই। কা'ব একথা শুনে বলল : আপনারাই তদপেক্ষা উত্তম। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউছার অবতীর্ণ হয়। –[মাযহারী]

সারকথা, পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি দোষারোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। এরই প্রেক্ষাপটে সূরা কাউছার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, শুধু পুত্রসন্তান না থাকার কারণে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বে-খবর। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যদিও তা কন্যাসন্তানের তরফ থেকে হয় অনন্তর নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ উম্মত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি অপেক্ষাও বেশি হবে। এছাড়া এ সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আল্লাহর কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও তৃতীয় আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এতে কা'ব ইবনে আশরাফ-এর উক্তি খণ্ডিত হয়ে যায়।

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ –হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : 'কাউছার' সেই অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দান করেছেন। কাউছার জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম। এ উক্তি সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : একথাও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তির পরিপন্থি নয়। কাউছার নামক প্রস্রবণটিও এই অজস্র কল্যাণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাই মুজাহিদ, কাউছারের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন : এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে জান্নাতের বিশেষ কাউছার প্রস্রবণও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

হাউজে কাউছার : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত :

بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظْهُرِ نَا فِى الْمَسْجِدِ اذَا اُغْفِىَ اغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ مُتَبَسِّمًا - قُلْنَا مَا اَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ انِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الخ ثُمَّ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّىْ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ وَهُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ اُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَاَقُوْلُ رَبِّ اِنَّهُ مِنْ اُمَّتِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثَ بَعْدَكَ.

অর্থাৎ, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে এক প্রকার নিদ্রা অথবা অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসি মুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন : এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ সহ সূরা কাউছার পাঠ করলেন এবং বললেন : তোমরা জান, কাউছার কি? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন : এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দিবেন বলে

ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউজে কিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউজ থেকে হটিয়ে দিবে। আমি বলব : পরওয়ারদিগার! সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মতপথ অবলম্বন করেছিল।–(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী) উপরিউক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাছীর লিখেন :

وَقَدْ وَرَدَ فِيْ صِفَةِ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّهٗ يُشْخَبُ فِيْهِ مِيْزَابَانِ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ نَهْرِ الْكَوْثَرِ وَ اِنَّ اٰنِيَتَهٗ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ.

অর্থাৎ, হাউজ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, তাতে দু'টি পরনালা আকাশ থেকে পতিত হবে, যা কাউছার নহরের পানি দ্বারা হাউজকে ভর্তি করে দেবে। এর পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে।

এ হাদীস দ্বারা সূরা কাউছার অবতরণের হেতু এবং কাউছার শব্দের তাফসীর (অজস্র কল্যাণ) জানা গেল। আরো জানা গেল যে, এই অজস্র কল্যাণের মধ্যে হাউজে কাউছারও শামিল আছে, যা কিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মদীর পিপাসা নিবারণ করবে।

এ হাদীস আরো ফুটিয়ে তুলেছে যে, আসল কাউছার প্রস্রবণটি জান্নাতে অবস্থিত এবং হাউজে কাউছার থাকবে হাশরের ময়দানে। দু'টি পরনালার সাহায্যে এতে কাউছার প্রস্রবণের পানি আনা হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদী জান্নাতে দাখিল হওয়ার পূর্বে হাউজে কাউছারের পানি পান করবে। এটা উপরিউক্ত রেওয়ায়েতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। যারা পরবর্তীকালে ইসলাম ত্যাগ করেছিল কিংবা পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়-মুনাফিক ছিল, তাদেরকেই হাউজে কাউছার থেকে হটিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ হাদীসসমূহে হাউজে কাউছারের পানির স্বচ্ছতা মিষ্টতা এবং কিনারাসমূহ মণি-মানিক্য দ্বারা কারুকার্যখচিত হওয়া সম্পর্কে এমন বর্ণনা আছে, যার তুলনা দুনিয়ার কোনো বস্তু দ্বারা সম্ভবপর নয়।

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী এই সূরা যদি কাফেরদের দোষারোপের জবাবে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে এ সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাউজে কাউছারসহ কাউছার দান করার কথা বলে দোষারোপকারীদের অপপ্রচার খণ্ডন করা হয়েছে যে, তাঁর বংশধর কেবল ইহকাল পর্যন্তই চালু থাকবে না বরং তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের সম্পর্ক হাশরের ময়দানেও অনুভূত হবে। সেখানে তারা সংখ্যায়ও সকল উম্মত অপেক্ষা বেশি হবে এবং তাদের সম্মান আপ্যায়নও সর্বাপেক্ষা বেশি হবে।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ - نَحْر –শব্দের অর্থ উট কোরবানি করা। এর মজযুম পদ্ধিতি হাত-পা বেঁধে কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরিকা দিয়ে আঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেওয়া। গরু-ছাগল ইত্যাদির কোরবানির পদ্ধতি জবাই করা। অর্থাৎ জন্তুকে শুইয়ে কণ্ঠনালীতে ছুরিকাঘাত করা। আরবে সাধারণত উট কোরবানি করা হতো। তাই কোরবানি বুঝাবার জন্য এখানে نَحْر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এ শব্দটি যে কোনো কোরবানির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরার প্রথম আয়াতে কাফেরদের মিথ্যা ধারণার বিপরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাউছার অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের প্রত্যেক কল্যাণ তাও অজস্র পরিমাণে দেওয়ার সুসংবাদ শুনানোর পর এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– নামাজ ও কোরবানি। নামাজ শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ ইবাদত এবং কোরবানি আর্থিক ইবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী। কেননা, আল্লাহর নামে কোরবানি করা প্রতিমা পূজারীদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি জিহাদ বটে। তারা প্রতিমাদের নামে কোরবানি করত। এ কারণেই অন্য এক আয়াতেও নামাজের সাথে কোরবানির উল্লেখ আছে– اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ –আলোচ্য আয়াতে وَانْحَرْ -এর অর্থ যে কোরবানি, একথা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), আতা, মুজাহিদ, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ নামাজে বুকে হাত বাঁধা করেছেন বলে যে রেওয়ায়েত প্রচলিত আছে, ইবনে কাছীর সেই রেওয়ায়েতকে মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ - شَانِئٌ -এর অর্থ শত্রুতাপোষণকারী, দোষারোপকারী। যেসব কাফের রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্বংশ বলে দোষারোপ করত, এ আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে অধিকাংশ রেওয়ায়েত মতে আস ইবনে ওয়ায়েল, কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে ওকবা এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে কা'ব ইবনে আশরাফকে

বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাউছার অর্থাৎ অজস্র কল্যাণ দান করেছেন। এর মধ্যে সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যও দাখিল। তাঁর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কম নয়। এছাড়া পয়গম্বর উম্মতের পিতা এবং উম্মত তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মত পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বরের উম্মত অপেক্ষা অধিক হবে। সুতরাং একদিকে শত্রুদের উক্তি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং অপরদিকে আরো বলা হয়েছে যে, যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ।

চিন্তা করুন, রাসূলে কারীম ﷺ-এর স্মৃতিকে আল্লাহ তা'আলা কিরূপ মাহাত্ম্য ও উচ্চমর্যাদা দান করেছেন। তাঁর আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোণে কোণে তাঁর নাম দৈনিক পাঁচবার করে আল্লাহর নামের সাথে মসজিদের মিনারে উচ্চারিত হয়। পরকালে তিনি সর্বাপেক্ষা বড় সুপারিশকারীর মর্যাদা লাভ করেছেন। এর বিপরীতে বিশ্বের ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করুন, আস ইবনে ওয়ায়েল, ওকবা ও কা'ব ইবনে আশরাফের সন্তান-সন্ততিরা কোথায় এবং তাদের পরিবারের কি হলো? স্বয়ং তাদের নামও ইসলামি বর্ণনা দ্বারা আয়াতসমূহের তাফসীর প্রসঙ্গে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। নতুবা আজ দুনিয়াতে তাদের নাম মুখে নেওয়ার কেউ আছে কি? فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَعْطَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদর اَلْإِعْطَاءُ মূলবর্ণ (ع - ط - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি দান করেছি।

اَلْكَوْثَرَ : খুব বেশি। অভিধানবিদরা বলেন, كَوْثَرٌ শব্দটি كَثْرَةٌ থেকে নির্গত। যেমন, نَوْفَلٌ শব্দটি نَفَلٌ থেকে। যা সংখ্যায় অনেক আর মর্যাদা শ্রেষ্ঠ হয়, আরবরা তাকে كَوْثَرْ বলে।

মুফাসসিরীনে কেরাম كَوْثَرْ শব্দের বিভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যথা–

(১) কাউছার জান্নাতের একটি নহরের নাম। যার পানি দুধের চেয়েও বেশি সাদা এবং মধুর চেয়েও অতি মিষ্ট।

(২) একটি হাউজের নাম, যেটিকে আল্লাহ তা'আলা হুজুর ﷺ -কে বিশেষভাবে দান করেছেন। যার থেকে কিয়ামতের দিন তিনি তার উম্মতদেরকে পানি পান করাবেন। একথা হযরত আনাস (রাযি.) থেকে মরফূরূপে মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে।

(৩) কুরআন মাজীদ। (৪) মহান নবুয়ত। (৫) মাকামে মাহমূদ। (৬) অনন্ত অফুরন্ত কল্যাণ। সায়িদ বিন যুবাইর, ইবনে আব্বাস। মুজামুল কুরআনের লেখক ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর কওলকে প্রধান্য দিয়েছেন।

فَصَلِّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّصْلِيَة মূলবর্ণ (ص- ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আপনি নামাজ পড়ুন।

اِنْحَرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদর اَلنَّحْرُ মূলবর্ণ (ن - ح - ر) জিনস صحيح অর্থ– কুরবানি করুন।

شَانِئٌ : একবচন, বহুবচন شَنَاءٌ অর্থ– বিদ্বেষ পোষণকারী।

اَبْتَرُ : সিফাতে মুশাব্বাহ। অর্থ- লেজকাটা, নিঃসন্তান, বিকলাঙ্গ, ত্রুটিপূর্ণ। بَتْرٌ থেকে নির্গত হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ- এখানে বাক্যটি مستأنفة مؤكدة; ان টি حرف مشبه بالفعل এবং شَانِئَكَ তার اسم আর هُوَ টি দ্বিতীয় مبتدأ অথবা ضمير فصل আর ابتر টি هُوَ-এর خبر এবং বাক্যটি إِنَّ-এর خبر অথবা أَبْتَرُ টি إِنَّ-এর خبر; –[ই'রাবুল কুরআন, খ. ৮. পৃ : ৪৭২]

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ

সূরা কাফিরূন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৬, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনি [এই কাফেরদেরকে] বলে দিন যে, হে কাফেরগণ!	قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿١﴾
২. না আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করি।	لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾
৩. আর না তোমরা আমার মা'বূদের উপাসনা কর।	وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٣﴾
৪. আর না [ভবিষ্যতেও] আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করব [অর্থাৎ আমি একত্ববাদী হয়ে শিরিক করব না]।	وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿٤﴾
৫. আর না তোমরা [মুশরিক অবস্থায়] আমার মা'বূদের উপাসনা করবে।	وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٥﴾
৬. তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমর ধর্ম।	لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قُلْ আপনি বলে দিন যে يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ হে কাফেরগণ।
২. لَآ اَعْبُدُ না আমি উপাসনা করি مَا تَعْبُدُوْنَ তোমাদের উপাস্যদের।
৩. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ, আর না তোমরা উপাসনা কর مَآ اَعْبُدُ আমার মা'বূদের।
৪. وَلَآ اَنَا عَابِدٌ, আর না আমি উপাসনা করব مَّا عَبَدْتُّمْ তোমাদের উপাস্যদের।
৫. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ, আর না তোমরা উপাসনা করবে مَآ اَعْبُدُ আমার মা'বূদের।
৬. لَكُمْ دِيْنُكُمْ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম وَلِيَ دِيْنِ আর আমার জন্য আমার ধর্ম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম বাক্যের শব্দ اَلْكَافِرُوْنَ হতে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে– سُوْرَةُ اَلْكَافِرُوْنَ –[সূরাতুল কাফিরূন]

অত্র সূরায় বিশেষভাবে কাফেরদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সাথে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও মুসলমানদের সকল আচরণের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ অবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এ কারণেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুল কাফিরূন। এতে ৬টি আয়াত, ২৬টি বাক্য এবং ৭৪টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ইকরামাহ (রা.) এবং হাসন বসরী (র.) বলেন, এ সূরাটি মাক্কী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) বলেন, এ সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে দু'টি মত উদ্ধৃত হয়েছে। একটি মতানুযায়ী তা মাক্কী এবং অপর একটি মতানুযায়ী মাদানী। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্সিরদের মতে, তা মাক্কী সূরা। আর এর বিষয়বস্তু হতেও তা মাক্কী বলে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মূলবক্তব্য : এক কথায় এর মূল বক্তব্য হলো, তাওহীদের শিক্ষা এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ ঘোষণা। অর্থাৎ কাফেরদের ধর্মমত, তাদের পূজা-উপাসনা এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবী হতে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে যে নিঃসম্পর্ক এ কথাটি অত্র সূরা দ্বারা জানিয়ে দেওয়া-ই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। আর এ সূরা দ্বারা এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, কাফের অথবা মুশরিকদের সাথে মুসলমানরা যেন সর্বদা অনমনীয়তার পরিচয় দিয়ে থাকে। কুফরি ও দীন পূর্ণমাত্রায় পরস্পর বিরোধী, আর এ দু'টির মধ্যে কোনো একটি দিকও যে পরস্পরের সাথে হওয়ার মতো নেই, এ কথাটিও তাদেরকে সম্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য। বর্তমান সূরাটি এ বিষয়ের জন্য পরিপূরক।

কাজেই একে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির ফর্মূলা পেশকারী সূরা মনে করার কোনো প্রশ্নই হবে না। আর কুফর যেখানে যেরূপ অবস্থায়ই থাকুক না কেন মুসলমানদেরকে তা হতে নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা ও বর্জনের ঘোষণা করতে হবে।

দীনের ব্যাপারে মুসলমানরা যে কাফেরদের সাথে কোনো প্রকার সন্ধি-সমঝোতার আচরণ গ্রহণ করতে পারে না। তা কোনোরূপ খাতির-উদারতা ও সংকোচ-কুণ্ঠা ব্যতিরেকেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে হবে। আর আগুন ও পানির ন্যায় ইসলাম ও কুফরি দু'টি বিপরীতমুখি আদর্শ। কেননা ইসলাম হলো আল্লাহ প্রদত্ত একত্ববাদের ধর্ম, আর কুফরি মানব রচিত মানব মন গড়ানীতি, ইসলামের পরিপন্থি। মুসলমানদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। আর কাফেরদের উপাস্য তারা ধার্য করেছিল ৩৬০টি মূর্তিকে। অতএব, মুসলমান ও অমুসলমানদের নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। -[আশরাফী]

সূরাটির ফজিলত : অত্র সূরার বহু ফজিলত রয়েছে-

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ পবিত্র কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান মর্যাদাশীল সূরা। -[তিরমিযী]
২. শিরক হতে পরিত্রাণ দানকারী হিসেবে এ সূরাটি প্রসিদ্ধ। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হযরত নওফাল (রা.) আরজ করেন হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দিন- যা আমি শয্যাগমনকালে রাত্রিতে পড়তে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সূরা কাফিরূন পড়ো, কেননা তা শিরক হতে পবিত্রতা ঘোষণা করে। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারেমী]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ফজরের সুন্নত নামাজে পাঠ করার জন্য দু'টি সূরা উত্তম-সূরা কাফিরূন ও সূরা এখলাস। -(মাযহারী) তাফসীরে ইবনে কাছীরে কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের সুন্নত এবং মাগরিবের পরবর্তী সুন্নতে এ দু'টি সূরা অধিক পরিমাণে পাঠ করতে শুনেছেন। জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন : আমাকে নিদ্রার পূর্বে পাঠ করার জন্য কোনো দোয়া বলে দিন। তিনি সূরা কাফিরূন পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন, এটা শিরক থেকে মুক্তিপত্র। হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা.) বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি চাও যে, সফরে গেলে সঙ্গীদের চেয়ে অধিক সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাক এবং তোমার আসবাবপত্র বেশি হয়? আমি জবাব দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমি অবশ্যই এরূপ চাই। তিনি বললেন : কুরআনের শেষ দিককার পাঁচটি সূরা-সূরা কাফিরূন, নছর, ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ কর এবং প্রত্যেক সূরা বিসমিল্লাহ বলে শুরু কর ও বিস্মিল্লাহ বলে শেষ কর। হযরত জুবায়ের (রা.) বলেন, ইতঃপূর্বে আমার অবস্থা ছিল এই যে, সফরে আমার পাথেয় কম এবং সঙ্গীদের তুলনায় আমি দুর্দশাগ্রস্ত হতাম। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই শিক্ষা অনুসরণ করলাম, তখন থেকে আমি সফরে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল হয়ে থাকি। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিচ্ছু দংশন করলে তিনি পানির সাথে লবণ মিশ্রিত করলেন এবং সূরা কাফিরূন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে করতে ক্ষতস্থানে পানি লাগালেন। -[মাযহারী]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মোত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খলফ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল : আসুন, আমরা পরস্পরে এই শান্তিচুক্তি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের

ইবাদত করব। –(কুরতুবী) তিবরানীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, কাফেররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এই প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব, ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব এবং এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন। –[মাযহারী]

আবূ সালেহ -এর রেওয়ায়েতে হযরত ইবেন আব্বাস (রা.) বলেন : মক্কার কাফেররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি আমাদের কোনো কোনো প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত জিবরাঈল (আ.) সূরা কাফিরূন নিয়ে আগমন করলেন। এতে কাফেরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আল্লাহর অকৃত্রিম ইবাদতের আদেশ আছে।

শানে নুযূলে উল্লিখিত একাধিক ঘটনার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে এবং সবগুলোর জবাবেই সূরাটি অবতীর্ণ হতে পারে। এধরনের শান্তিচুক্তিতে বাধা দেওয়া জবাবের মূল লক্ষ্য।

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ –এ সূরায় কয়েকটি বাক্য পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হওয়ায় স্বভাবত প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ ধরনের আপত্তি দূর করার জন্য বুখারী অনেক তাফসীরবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য একবার বর্তমান কালের জন্য এবং একবার ভবিষ্যৎ কালের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি এক্ষণে কার্যত তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরাও আমার উপাস্যের ইবাদত করো না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না। তাফসীরের সার-সংক্ষেপে এই তাফসীরই অবলম্বিত হয়েছে। কিন্তু বুখারীর তাফসীরে لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ –আয়াতের অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, শান্তি চুক্তির প্রস্তাবিত পদ্ধতি গ্রহণের যোগ্য নয়। আমি আমার ধর্মের উপর কায়েম আছি এবং তোমরা তোমাদের ধর্মের উপর কায়েম আছ। অতএব এর পরিণতি কি হবে। বয়ানুল কুরআনে এখানে دِين অর্থ ধর্ম নয়-প্রতিদান করা হয়েছে।

ইবনে কাছীর এখানে অন্য একটি তাফসীর অবলম্বন করেছেন। তিনি এক জায়গায় مَا -কে مَوْصُول ধরেছেন এবং অন্য জায়গায় مَصْدَرِيَّة ধরেছেন। ফলে প্রথম জায়গায় لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ –আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা যেসব উপাস্যের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না এবং আমি যে উপাস্যের ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করো না। দ্বিতীয় জায়গায় وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ –আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও তেমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমি তোমাদের মতো ইবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার ইবাদত করতে পার না। এভাবে প্রথম জায়গায় উপাস্যদের বিভিন্নতা এবং দ্বিতীয় জায়গায় ইবাদত-পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। সার কথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নতা নেই এবং ইবাদত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের ইবাদত-পদ্ধিতি তাই, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে। আর মুশরিকদের ইবাদত-পদ্ধতি হলো নিজেদের মনগড়া।

ইবনে কাছীর (র.) এই তাফসীরের পক্ষে বক্তব্য রাখতে যেয়ে বলেন : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কলেমার অর্থও তাই হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। ইবাদত-পদ্ধিতি তাই গ্রহণযোগ্য, যা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে।

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাছীর (র.) বলেন : এ বাক্যটি তেমনি যেমন অন্য আয়াতে আছে : فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ আরো এক আয়াতে لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ-এর সারমর্ম এই যে, ইবনে কাছীর دِين শব্দকে ধর্মের ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন এবং উদ্দেশ্য তাই যা বয়ানুল কুরআনে আছে যে, প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, স্থান বিশেষে সব পুনরুল্লেখ আপত্তিকর নয়। অনেক স্থলে পুনরুল্লেখ ভাষার অলংকাররূপে গণ্য হয়। যেমন– إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا আয়াতে তাই হয়েছে। এখানে পুনরুল্লেখের এক উদ্দেশ্য বিষয়বস্তুর তাকীদ করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য একাধিক বাক্যে খণ্ডন করা। কারণ, তারা শান্তি চুক্তির প্রস্তাবও একাধিকবার করেছেন। –[ইবনে কাছীর]

কাফেরদের সাথে শান্তি চুক্তির কতক প্রকার বৈধ ও কতক প্রকার অবৈধ : আলোচ্য সূরায় কাফেরদের প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির কতক প্রকার সম্পূর্ণ খণ্ডন করে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং কুরআন পাকে একথাও আছে যে, فَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا –অর্থাৎ কাফেররা সন্ধি করতে চাইলে তোমরাও সন্ধি কর। মদিনায় হিজরত করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইহুদিদের সাথে শান্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ সূরা কাফিরূনকে মনসূখ ও রহিত সাব্যস্ত করেছেন এবং এর বড় কারণ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ আয়াতখানি, কেননা, এটা বাহ্যত জিহাদের আদেশের বিপরীত। কিন্তু শুদ্ধ কথা এই যে, لَكُمْ دِينُكُمْ-এর অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে বরং এর সারমর্ম হলো 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। অতএব অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে সূরাটি রহিত নয়। যে ধরনের শান্তি চুক্তি নিষিদ্ধ করার জন্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল, তা সে সময়েও নিষিদ্ধ ছিল এবং আজও নিষিদ্ধ রয়েছে। فَإِنْ جَنَحُوا আয়াত দ্বারা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুক্তি দ্বারা সে শান্তি চুক্তির অনুমতি বা বৈধতা জানা যায়, তা সে সময় যেমন বৈধ ছিল, আজও তেমনি বৈধ আছে। বৈধতা ও অবৈধতার আসল কারণ হচ্ছে স্থান-কাল পাত্র এবং সন্ধির শর্তাবলি। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালা দিতে যেয়ে বলেছেন : إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْحَرَّمَ حَلَالًا অর্থাৎ সেই সন্ধি অবৈধ, যা কোনো হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম করে। এখন চিন্তা করুন, কাফেরদের প্রস্তাবিত চুক্তি মেনে নিলে শিরক করা জরুরি হয়ে পড়ে। কাজেই সূরা কাফিরূন এ ধরনের সন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে ইহুদিদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ইসলামের মূলনীতি বিরুদ্ধ কোনো বিষয় ছিল না। উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তিঅন্বেষায় ইসলামের সাথে কোনো ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু শান্তি চুক্তি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে–আল্লাহর আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোনো প্রকার দর কাষাকষির অবকাশ নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– আপনি বলে দিন।

اَلْكٰفِرُونَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদর اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– কাফেরগণ।

لَا أَعْبُدُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعِبَادَةُ মূলবর্ণ (ع ـ ب ـ د) জিনস صحيح অর্থ– না আমি উপাসনা করি।

تَعْبُدُونَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعِبَادَةُ মূলবর্ণ (ع ـ ب ـ د) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা উপাসনা কর।

عَبَدْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদর اَلْعِبَادَةُ মূলবর্ণ (ع ـ ب ـ د) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা উপাসনা করেছ।

دِيْنِ : ইসম, মাসদার। একবচন, বহুবচন اديان অর্থ– ধর্ম, প্রতিফল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ- এখানে و টি عاطفة এবং لا টি نافيه আর أَنْتُمْ টি مبتدأ এবং عَابِدُونَ তার خبر; مَا টি اسم موصول আর বাক্যটি صلة অথবা مَا টি مصدرية ; [ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮, পৃ : ৪৩১]

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা নাস্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. যখন আল্লাহর সাহায্য এবং [মক্কা] বিজয় এসে পৌঁছবে।	اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١
২. আর আপনি লোকদেরকে আল্লাহর ধর্মে [অর্থাৎ ইসলামে] দলে দলে প্রবেশ করতে দেখতে পাবেন।	وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢
৩. তখন স্বীয় প্রতিপালকের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করুন, আর তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি অতিশয় তওবা কবুলকারী।	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا جَآءَ যখন এসে পৌঁছবে نَصْرُ اللّٰهِ আল্লাহর সাহায্য وَالْفَتْحُ এবং বিজয়।

২. وَرَاَيْتَ النَّاسَ আর আপনি দেখতে পাবেন লোকদেরকে يَدْخُلُوْنَ প্রবেশ করতে فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ আল্লাহর ধর্মে اَفْوَاجًا দলে দলে।

৩. فَسَبِّحْ তখন তাসবীহ পাঠ করুন بِحَمْدِ ও তাহমীদ رَبِّكَ স্বীয় প্রতিপালকের وَاسْتَغْفِرْهُ আর তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন اِنَّهٗ নিশ্চয় তিনি كَانَ تَوَّابًا অতিশয় তওবা কবুলকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : উক্ত সূরার প্রথম আয়াত হতেই তার নামকরণ করা হয়েছে। আর দলে দলে যখন মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল তখন তাতে ইসলামের শক্তি ও সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি হচ্ছিল। এ সূরায় সে সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নাম দেওয়া হয়েছে سُوْرَةُ النَّصْرِ। আর অত্র সূরাকে (سُوْرَةُ التَّوْدِيْعِ) বিদায় সূরাও বলা হয়। কেননা তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদায় সম্পর্কীয় ইঙ্গিতও রয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ২৭টি বাক্য এবং ৭৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এরপর আর কোনো সূরা নাজিল হয়নি; অর্থাৎ এটাই সর্বশেষ সূরা। –[মুসলিম, নাসায়ী, তাবারানী]

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, এ সূরাটি বিদায় হজ কালে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে 'মিনা' নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর হুযূর পাক ﷺ তাঁর উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে বিদায় হজের ভাষণ দেন। –[তিরমিযী, বায়হাকী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি যখন নাজিল হয় তখন নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, আমাকে আমার ইন্তেকালের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আমার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে। –[আহমদ]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) বলেন, এ সূরাটি যখন নাজিল হয় তখন হুযূর ﷺ বলেন, এ বছর আমার ইন্তেকাল হবে। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) কেঁদে উঠেন। হযরত মুহাম্মদ ﷺ তখন বলেন, আমার বংশধরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) হেসে উঠলেন। –[ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়াহ]

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা রয়েছে যে, সূরা আন-নাসর কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। অর্থাৎ এরপর কুরআনের পরিপূর্ণ কোনো সূরা নাজিল হয়নি।

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, এরপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الخ আয়াতটি নাজিল হয়।

অতঃপর হুযূর ﷺ মাত্র ৮০ দিন জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে আয়াতে كَلَالَة নাজিল হয়। তখন হুযূর ﷺ -এর বয়স মাত্র ৫০ দিন বাকি ছিল।

অতঃপর لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ الخ নাজিল হয়, তখন হুযূর ﷺ-এর বয়স মাত্র ৩৫ দিন বাকি ছিল। অতঃপর وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ الخ নাজিল হয়, তারপর হুযূর ﷺ-এর হায়াত ২১/৭ দিন বাকি ছিল। তবে اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ الخ সূরাটি فَتْحِ مَكَّه -এর পূর্বে কি পরে নাজিল হয় এ মর্মে রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বাহরে মুহীত হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়। তাতে বর্ণিত রয়েছে, এটা খায়বার হতে ফেরার পথে নাজিল হয়। আর খায়বারের যুদ্ধ فَتْحِ مَكَّه -এর পূর্বে হয়েছিল। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূলবক্তব্য হচ্ছে, আরবের বুকে ইসলাম একটি অপ্রতিহত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আরব হতে পৌত্তলিকতা নির্বাসিত হওয়ার শুভ সংকেত দান এবং নবী করীম ﷺ-এর বিদায়কাল ঘনিয়ে আসার পূর্বাভাষ। সুতরাং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর মদদ ও বিজয় যখন সমাগত হবে, তখন দিকে দিকে তোমরা লক্ষ্য করবে ইসলামের জয়জয়কার অবস্থা, দেখতে পাবে যে, দলে দলে ও গোত্রে গোত্রে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। চুপে চুপে ইসলাম গ্রহণের দিন শেষ হয়েছে। এখন ইসলাম আল্লাহর মদদে পুষ্ট হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অসত্যের বিদায় হবে। এটা ছিল মুসলমানদের জন্য একটি ভবিষ্যত বাণী। সর্বশেষে নবী করীম ﷺ-কে আল্লাহর হামদ ও গুণগানসহ তাসবীহ পাঠের এবং ইস্তেগফার করার নির্দেশ দিয়ে প্রকারান্তরে এ কথা বলা হয়েছে– ইসলাম আরবের বুকে সমস্ত বাতিল ধর্ম ও মতাদর্শের উপর একটি বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের এ বিজয় ডংকা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং নবীর দায়িত্ব শেষ হয়েছে। এখন তাঁর বিদায়ের দিন সমাগত। অতএব হে নবী! আপনার দ্বারা আল্লাহ যে এ মহৎ কাজ করালেন আপনি এ জন্য আল্লাহর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করুন এবং বিনীত মস্তকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দৃষ্টিতে নবী করীম ﷺ-এর ভুল-ত্রুটি বা দায়িত্ব পালনে গাফেলতি হয়নি; বরং আল্লাহর দৃষ্টিতে বান্দা সর্বদাই অপরাধী। বান্দা কোনো সময়ই নিজেকে আল্লাহর নিকট নির্দোষ বলতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শুকরিয়া আদায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং অতিশয় বিনয় প্রকাশের জন্যই ইস্তেগফার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ .... اَلْاٰيَةَ.

শানে নুযূল : মক্কা বিজয়ের দিন যখন নবী করীম ﷺ বিশাল বাহিনীসহ মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে মক্কার নিম্নবর্তী এলাকায় কিছু সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তাদের সাথে কুরাইশরা যুদ্ধে লিপ্ত হয় ও পরাজিত হয়। তখন হযরত খালেদ (রা.) তাদেরকে অস্ত্র ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। তখন আল্লাহ পাক অত্র সূরা নাজিল করেন। –[সূত্র : কানযুন নুকূল : ১১০]

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে যে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব আপনি তাসবীহ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। হযরত মুকাতিল (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রাসূল ﷺ সাহাবীদের এক সামাবেশে সূরাটি তেলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা.) ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর রাসূল ﷺ ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন।

হরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও এরূপই রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরো আছে যে, হযরত ওমর (রা.) একথা শুনে বল্লেন, এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি। –[সূত্র : কুরতুবী]

এ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মদিনায় অবতীর্ণ এবং এর অপর নাম সূরা 'তাওদী'। 'তাওদী' শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম 'তাওদী' হয়েছে।

কুরআন পাকের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত : হযরত ইবেন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নসর কুরআনের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ এরপর কোনো সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কতক রেওয়ায়েতে কোনো কোনো আয়াত নাজিল হওয়ার যে কথা আছে, তা এর পরিপন্থি নয়। সূরা ফাতেহাকে এই অর্থেই কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা বলা হয়; অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরা রূপে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছে। সুতরাং সূরা আ'লাক, মুদ্দাছছির ইত্যাদির কোনো কোনো আয়াত পূর্বে নাজিল হলেও তা এর পরিপন্থি নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন : সূরা নসর বিদায় হজ্জে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হায়াতের যখন মাত্র পঞ্চাশ দিন বাকি ছিল, তখন কালালার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পঁয়ত্রিশ দিন বাকি থাকার সময় لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ الخ –আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একুশ দিন বাকি থাকার সময় اِتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী]

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, প্রথম আয়াতে বিজয় বলে মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে, তবে সূরাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাজিল হয়েছে, না পরে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। اذ اجاء ভাষাদৃষ্টে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বাহ্যত মনে হয়। রূহুল মা'আনীতে এর অনুকূলে একটি রেওয়ায়েতও বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, খায়বার যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। খায়বার বিজয় যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। রূহুল মা'আনীতে হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হজ্জে নাজিল হয়েছে, সেগুলোর মর্মার্থ এরূপ হতে পারে যে, এস্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরাটি পাঠ করে থাকবেন। ফলে সবাই ধারণা করেছে যে, এটা এক্ষুণি নাজিল হয়েছে।

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তাসবীহ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। মুকাতিল (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের এক সামাবেশে সূরাটি তেলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন। বুখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাই রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরো আছে যে, হযরত ওমর (রা.) একথা শুনে বললেন : এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি। –[কুরতুবী]

وَرَاَيْتَ النَّاسَ মক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু কুরাইশদের ভয়ে অথবা কোনো ইতস্ততার কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। মক্কা বিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইয়েমেন থেকে সাত'শ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পথিমধ্যে আজান দিতে দিতে ও কুরআন পাঠ করতে করতে মদিনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে বেশি পরিমাণে তাসবীহ ও ইস্তেগফার করা উচিত : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ –হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : এ সূরা নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাজের পর এই দোয়া পাঠ করতেন : سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ –[বুখারী]

হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন : এ সূরা নাজিল হওয়ার পর তিনি উঠাবসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় এই দোয়া পাঠ করতেন : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ তিনি বলতেন : আমাকে এর আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর প্রমাণস্বরূপ সূরাটি তেলাওয়াত করতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন : এ সূরা নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে ইবাদতে মনোনিবেশ করেন। ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে যায়। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

جَاءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئُ মূলবর্ণ (ج - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (اجوف يائى ও مهموز لام) অর্থ– এসে পৌঁছবে।

نَصْرُ : মাসদার। বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ن - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– সাহায্য।

اَلْفَتْحُ : মাসদার। বাব فَتَحَ মূলবর্ণ (ف - ت - ح) জিনস صحيح অর্থ– বিজয়।

رَاَيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ– আপনি দেখতে পান।

يَدْخُلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّخُوْلُ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রবেশ করবে।

اَفْوَاجًا : বহুবচন, একবচন فَوْجٌ অর্থ– দলে দলে।

سَبِّحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْبِيْحُ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– তাসবীহ পাঠ করুন।

اِسْتَغْفِرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِغْفَارُ মূলবর্ণ (غ - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ- ক্ষমা প্রার্থনা কর।

تَوَّابًا : মুবালাগার সীগাহ। অর্থ– অতিশয় তওবা কবুল কারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا : এখানে واو টি عاطفة এবং رَاَيْتَ النَّاسَ টি فعل ماضى، فاعل، مفعول به ও الرؤية টি بصرية হতে পারে। তখন يَدْخُلُوْنَ বাক্যটি حالية হবে। আর الرؤية টি علمية ও হতে পারে। তখন বাক্যটি رَاَيْتَ- এর দ্বিতীয় مفعول به হবে। فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ বাক্যটি يَدْخُلُوْنَ- এর সাথে متعلق এবং اَفْوَاجًا টি حال হয়েছে। আর اَفْوَاجًا শব্দটি فَوْجٌ (واو টি ساكن)-এর বহুবচন। يَدْخُلُوْنَ -এর واو থেকে

–[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮, পৃ. ৪৩৫-৩৬]

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।	تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴿١﴾
২. না তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে এসেছে, আর না তার উপার্জন।	مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾
৩. অচিরেই সে এক শিখাবিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করবে।	سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾
৪. [সে নিজেও] এবং তার স্ত্রীও, যে কাষ্ঠ বহন করে আনে।	وَّامْرَاَتُهٗ ۚ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾
৫. [এবং দোজখে] তার গলায় একটি রশি হবে– খুব পাকানো।	فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. تَبَّتْ ধ্বংস হোক يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ আবূ লাহারে হস্তদ্বয় وَّتَبَّ এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।

২. مَآ اَغْنٰى عَنْهُ না তার কোনো কাজে এসেছে مَالُهٗ তার ধন-সম্পদ وَمَا كَسَبَ, আর না তার উপার্জন।

৩. سَيَصْلٰى আচিরেই সে প্রবেশ করবে نَارًا অগ্নিতে ذَاتَ لَهَبٍ এক শিখাবিশিষ্ট।

৪. وَّامْرَاَتُهٗ এবং তার স্ত্রীও حَمَّالَةَ الْحَطَبِ যে কাষ্ঠ বহন করে আনে।

৫. فِيْ جِيْدِهَا তার গলায় হবে حَبْلٌ একটি রশি مِّنْ مَّسَدٍ খুব পকানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম আবী-লাহাব। সূরার প্রথম আয়াতের শব্দ تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ হতে নামকরণ করা হয়েছে। আর আবূ লাহাব-এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অত্র সূরায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, এটাকে সূরা আবী-লাহাব নামকরণ করা স্বার্থক হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য আবং ৭৭টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : উক্ত সূরাটি যে মাক্কী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং মতভেদও নেই। তবে মাক্কী জীবনের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে তা ঠিক কোন অধ্যায়ে নাজিল হয়েছে– এ কথাটি সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে নবী করীম ﷺ এবং তাঁর ইসলামি দাওয়াত ও আন্দোলনের ব্যাপারে আবূ লাহাবের যে ভূমিকা ছিল, সে দৃষ্টিতে অনুমান করা যায় যে, যে সময়ে নবী করীম ﷺ-এর বিরোধিতা ও শত্রুতায় সে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং তার আচরণ ইসলামের অগ্রগতির পথে একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতায় পরিণত হয়েছিল, ঠিক সে সময়েই এ সূরাটি নাজিল হয়েছে।

আর এটাও সম্ভব যে, কুরাইশের লোকেরা যখন নবী করীম ﷺ এবং তাঁর গোটা বংশ পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে শি'আবে আবী তালিবে অবরুদ্ধ করেছিল এবং আবূ লাহাবই কেবল এমন ব্যক্তি ছিল, যে নিজের বংশ পরিবারের লোকদের সংস্পর্শ পরিহার করে দুশমনদের পক্ষ সমর্থন করেছিল, এ সূরাটি সে সময় নাজিল হয়েছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু : ইসলামের কোনো শত্রুর নাম উল্লেখ করে কুরআন মাজীদে কোনো আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কেবল এ সূরাটিকেই ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ সূরাটি আবূ লাহাব এবং তার স্ত্রীকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে। এর কারণ হলো যে, আবূ লাহাব ইসলামের শত্রুতায় আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিন্ন করতে কুণ্ঠিত হয়নি। অথচ নবী করীম ﷺ তার শত্রুতার জবাবে কোনো দিনই কিছু বলেননি; বরং তার অত্যাচার-নিপীড়ন নীরবেই সহ্য করে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তার হীনতা-নীচতা, বিদ্বেষপরায়ণতা ও শত্রুতা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখনই আল্লাহ তা'আলা তার এবং তার স্ত্রীর ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করে এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। বলা হয়েছে– আবূ লাহাব সর্বাঙ্গীনভাবে তার স্ত্রীসহ ধ্বংস হোক, চরমভাবে তার বিনাশ ঘটুক। তার বিপুল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, ইহকাল ও পরকাল কোথাও উপকারে আসবে না। সে তার কর্মের বিনিময়ে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তার সেই স্ত্রীও, যে মহানবী ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য কাঁটাযুক্ত ডাল বহন করে তাঁর দুয়ারে ফেলে রাখে। পরকালে তার গলায় শৃঙ্খলের হাসুলী পড়িয়ে দেওয়া হবে। এ সূরা অবতীর্ণের পরও তারা ঈমান আনল না; বরং মহানবীর বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে গেল এবং বকাবকি ও আবোল-তাবোল বলতে লাগল। তার কথার কোনো মূল্য নেই। তাই আস্তে আস্তে মহানবীর দিকেই মানুষের মন আকৃষ্ট হতে লাগল।

আবূ লাহাবের আসল নাম ছিল আব্দুল ওয্যা। সে ছিল আব্দুল মোত্তালিবের অন্যতম সন্তান। গৌঢ়বর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবূ লাহাব। কুরআনপাক তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ, সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবূ লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কট্টর শত্রু ও ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল, সে নানাভাবে রাসূল ﷺ -কে কষ্ট দেওয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে যেয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত। –[ইবনে কাছীর]

শানে নুযূল : বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পর্বতে আরোহণ করে কুরাইশ গোত্রের উদ্দেশ্যে يَا صَبَاحَاه বলে অথবা আবদে মানাফ ও আব্দুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে ডাক দেওয়া তখন আরবে বিপদাশঙ্কার লক্ষণ রূপে বিবেচিত হতো)। ডাক শুনে কুরাইশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি আমি বলি যে, একটি শত্রুদল ক্রমশই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিকাল যে কোনো সময় তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠল : হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন : আমি (শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আজাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শুনে আবূ লাহাব বলল : تَبًّالَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا –ধ্বংস হও তুমি, এজন্যই কি আমাদেরকে একত্র করেছ? অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাথর মারতে উদ্যত হলো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ - يَدَ শব্দের আসল অর্থ হাত। মানুষের সব কাজে হাতের প্রভাবই বেশি, তাই কোনো ব্যক্তির সত্তাকে হাত বলেই ব্যক্ত করে দেওয়া হয়; যেমন কুরআনে بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আবূ লাহাব একদিন বলতে লাগল : মুহাম্মদ বলে যে, মৃত্যুর পর অমুক অমুক কাজ হবে। এরপর সে তার হাতের দিকে ইশারা করে বলল : এই হাতে সেগুলোর মধ্য থেকে একটিও আসেনি। অতঃপর সে তার হাতকে লক্ষ্য করে বলল : تَبًّا لَكُمَا مَا اَرٰى فِيْكُمَا شَيْئًا مِمَّا قَالَ مُحَمَّدٌ –অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও; মুহাম্মদ যেসব বিষয় সংঘটিত হওয়ার কথা বলে আমি সেগুলোর মধ্যে একটিও তোমাদের মধ্যে দেখি না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক বলেছে।

تَبَابٌ -এর অর্থ ধ্বংস ও বরবাদ হওয়া। আয়াতে বদ-দোয়ার অর্থে تَبَّتْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আবূ লাহাব ধ্বংস হোক। দ্বিতীয় বাক্যে وَتَبَّ -এ বদদোয়া কবুল হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে যে, আবূ লাহাব ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলমানদের ক্রোধ দমনের উদ্দেশ্যে বদদোয়ার বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আবূ লাহাব যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে تَبًّا বলেছিল,

তখন মুসলমানদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তারা তাদের জন্য বদ-দোয়া করবে। আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের মনের কথা নিজেই বলে দিলেন। সাথে সাথে এ খবরও দিয়ে দিলেন যে, এ বদ-দোয়ার ফলে সে ধ্বংসও হয়ে গেছে। আবূ লাহাবের ধ্বংসপ্রাপ্তির এই পূর্ব সংবাদের প্রভাবে বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে বিজন জয়গায় ছেড়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এই অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিন দিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি। পঁচতে শুরু করলে চাকর-বাকরদের দ্বারা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। –[বয়ানুল কুরআন]

مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ –তাফসীরের সার-সংক্ষেপে مَا كَسَبَ-এর অর্থ করা হয়েছে ধনসম্পদ দ্বারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। কেননা সন্তান-সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهٖ وَاِنَّ وَلَدَهٗ مِنْ كَسْبِهٖ –অর্থাৎ মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল ও পবিত্র এবং তার সন্তান-সন্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে দাখিল। অর্থাৎ সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামান্তর। (কুরতুবী) একারণে কয়েকজন তাফসীরবিদ এস্থলে مَا كَسَبَ -এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ তা'আলা আবূ লাহাবকে যেমন দিয়েছিলেন আগাধ ধনসম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। অকৃতজ্ঞতার কারণে এদু'টি বস্তুই তার গর্ব, অহমিকা ও শাস্তির কারণ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন স্বগোত্রকে আল্লাহর আজাব সম্পর্কে সতর্ক করেন তখন আবূ লাহাব একথাও বলেছিল, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা যদি সত্যই হয়ে যায়, তবে আমার কাছে ঢের অর্থবল ও লোকবল আছে। আমি এগুলোর বিনিময়ে আত্মরক্ষা করব। এর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহর আজাব যখন তাকে পাকড়াও করল, তখন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোনো কাজে আসল না। অতঃপর পরকালের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ অর্থাৎ কিয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর কবরেই সে এক লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে মিল রেখে অগ্নির বিশেষণ ذَاتَ لَهَبٍ বলার মধ্যে বিশেষ অলংকার রয়েছে।

وَامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ আবূ লাহাবের ন্যায় তার স্ত্রীও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে সাহায্য করত। সে ছিল আবূ সুফিয়ানের ভগিনী ও হরব ইবনে উমাইয়ার কন্যা। তাকে উম্মে-জামীল বলা হতো। আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই হতভাগীনিও তার স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ শুষ্ককাঠ বহনকারিনী। আরবের বাক-পদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকে حَمَّالَةَ (খড়িবাহক) বলা হতো। শুষ্ক কাঠ একত্র করে যেমন কেউ অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্ষে নিন্দাকার্যটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আবূ লাহাব পত্নী পরোক্ষে নিন্দাকার্যের সাথেও জড়িত ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইকরিমা ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এখানে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ -এর এ তাফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে ইবনে যায়েদ ও যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ একে আক্ষরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এই নারী বন থেকে কন্টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাঁর পথে বিছিয়ে রাখত। তার এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কুরআন حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলে ব্যক্ত করেছে। –(কুরতুবী, ইবনে কাছীর) কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি জাহান্নামে হবে। সে জাহান্নামে যাক্কুম ইত্যাদি বৃক্ষ থেকে লাকড়ি এনে জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরো প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহায্য করে তার কুফর ও জুলুম বাড়িয়ে দিত। –[ইবনে কাছীর]

পরোক্ষে নিন্দাকার্য মহাপাপ : রাসূলে করীম ﷺ বলেন : জান্নাতে পরোক্ষে নিন্দাকারী প্রবেশ করবে না। ফুযায়েল ইবনে আয়ায (র.) বলেন : তিনটি কাজ মানুষের সমস্ত সৎকর্ম বরবাদ করে দেয়, রোজাদারের রোজা এবং অজুওয়ালার অজু নষ্ট করে দেয়–গীবত, পরোক্ষে নিন্দা এবং মিথ্যা ভাষণ। আতা ইবনে সায়েব (র.) বলেন : আমি হযরত শা'বী (র.)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদীস বর্ণনা করলাম : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَافِكُ دَمٍ وَلَا مَشَّاءٌ بِنَمِيْمَةٍ وَلَا تَاجِرٌ يُرْبِىْ অর্থাৎ তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না–অন্যায় হত্যাকারী, যে এখানের কথা সেখানে নিয়ে যায় এবং যে ব্যবসায়ী সুদের কারবার করে। অতঃপর আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম : হাদীসে কথা চালনাকারীকে হত্যাকারী ও সুদখোরের সমতুল্য কিরূপে করা হলো? তিনি বললেন : হ্যাঁ, কথা চালনা করা এমন গুরুতর কাজ যে, এর কারণে অন্যায় হত্যা ও মাল ছিনতাইও হয়ে যায়। –[কুরতুবী]

مَسَدٌ - فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ শব্দটি সীন-এর উপর সাকিনযোগে ধাতু। অর্থ রশি পাকানো, রশি মজবুত করা এবং সীন-এর উপর যবরযোগে সর্বপ্রকার মজবুত রশিকে বলা হয়।-(কামূস) কেউ কেউ আরবের অভ্যাস অনুযায়ী এর অনুবাদ করেছেন খর্জুরের রশি। কিন্তু ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অনুবাদ করেছেন লোহার তার পাকানো মোটা দড়ি। জাহান্নামে তার গলায় লোহার তার পাকানো বেড়ী পরানো হবে। হযরত মুজাহিদ (র.) ও তাই তাফসীর করেছেন। –[মাযহারী]

হযরত শা'বী, মুকালিত (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ একেও দুনিয়ার অবস্থা ধরে নিয়ে অর্থ করেছেন খর্জুরের রশি। তাঁরা বলেন : আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী ধনাঢ্য এবং গোত্রের সরদার রূপে গণ্য হতো। কিন্তু তার স্ত্রী হীনমন্যতা ও কৃপণতার কারণে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বোঝা তৈরি করত এবং বোঝার রশি তার গলায় বেঁধে রাখত, যাতে বোঝা মাথা থেকে পড়ে না যায়। একদিন সে মথায় বোঝা এবং গালায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ তাফসীর অনুযায়ী এটা হবে তার অশুভ পরিণতি ও নীচতার বর্ণনা–(মাযহারী) কিন্তু আবূ লাহাবের পরিবারের পক্ষে বিশেষত তার স্ত্রীর পক্ষে এরূপ করা সুদূর পরাহত ছিল। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদ প্রথম তাফসীরই পছন্দ করেনে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَبَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلتَّبَابُ মূলবর্ণ (ت - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ধ্বংস হোক, ভেঙ্গে যাক।

اَبِىْ لَهَبٍ : কুনিয়ত আবূ উতবাহ। নাম আব্দুল উজ্জাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। রাসূল ﷺ -এর আপন চাচা, সে রাসূল ﷺ -এর উপর অনেক অত্যাচার করেছে।

تَبَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلتَّبَابُ মূলবর্ণ (ت - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ধ্বংশ হোক, সে বিনষ্ট হোক।

مَا اَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– না তার কোনা কাজে এসেছে।

كَسَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَسْبُ মূলবর্ণ (ك - س - ب) জিনস صحيح অর্থ– সে উপার্জন করেছে।

سَيَصْلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلصَّلْىُ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অচিরেই সে প্রবেশ করবে।

لَهَبٍ : মাসদার। অর্থ- অগ্নি প্রজ্জলিত হওয়া। ধোঁয়া ও ধূলাবালিকেও لَهَبٌ বলা হয়। আব্দুল উয্যা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব খুব সুন্দর মানুষ ছিল। আগুনের মতো তার শরীরের রং চমকাত। তাই তাকে এ উপাধি দেওয়া হয়েছে। বাব فَتَحَ।

حَمَّالَةَ : মুবালাগার সীগাহ, মাসদার اَلْحَمْلُ বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ح - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– যে কাষ্ঠ বহন করে আনে, কাষ্ঠ বহনকারিণী, বোঝা বহনকারিণী।

جِيْدِهَا : তার গ্রীবা, গর্দান। جِيْد -এর বহুবচন جُيُوْدٌ ও اَجْيَادٌ আসে।

مَسَدٍ : ইসম। মাসদার اَلْمَسَدُ বাব ضَرَبَ অর্থ– খুব পাকানো, রশি পাকানো, কষ্টে ফেলা। খেজুর গাছের ছাল দ্বারা পাকনো রশি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ : এখানে س টি حرف استقبال আর يَصْلُ টি فعل مضارع এবং তার فاعل হচ্ছে هُوَ অর্থাৎ اَبُوْ لَهَبٍ ؛ نَارًا শব্দটি مفعول به এবং ذَاتَ لَهَبٍ শব্দটি نَارًا -এর সিফত। -[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮ পৃ. ৪৪১]

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনি [তাদেরকে] বলে দিন যে, তিনি অর্থাৎ আল্লাহ এক।	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١
২. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।	اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢
৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।	لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣
৪. আর তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই।	وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قُلْ আপনি বলে দিন যে هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ তিনি অর্থাৎ আল্লাহ এক।
২. اَللّٰهُ আল্লাহ اَلصَّمَدُ অমুখাপেক্ষী।
৩. لَمْ يَلِدْ তিনি কাউকে জন্ম দেননি وَلَمْ يُوْلَدْ এবং তাকে ও জন্ম দেওয়া হয়নি।
৪. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ আর নেই তার كُفُوًا সমতুল্য اَحَدٌ কেউ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : কুরআন মাজীদে সমস্ত সূরাসমূহের নামই সূরা হতে চয়নকৃত একটি শব্দ দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে; কিন্তু এ সূরাটি এর ব্যতিক্রম। সূরার কোনো শব্দ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়নি; বরং সূরার মূলবক্তব্য ও ভাবধারা হতে এটার নামকরণ করা হয়েছে, 'আল-ইখলাস'। এর অর্থ হলো– নির্ভেজাল, নিরঙ্কুশ, একনিষ্ঠতা। কেননা এ সূরায় আল্লাহর একত্ববাদ ও অন্যান্য তাওহীদের কথা বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা, গুণ ও ক্ষমতায় অন্য কোনো বস্তুর সংমিশ্রণ ও ভেজাল নেই; তাঁর ক্ষেত্রে কোনো কিছু মিশ্রিত হয়নি। তিনি নিরেট নির্ভেজাল খালেস একক সত্তা। কেউ কেউ তার নাম রেখেছেন-সূরাতুল আসাস বা মৌল সূরা। অর্থাৎ ইসলামি জীবন-বিধানটি আল্লাহ কেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। সে আল্লাহর মূল ও আসল পরিচয়টি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ কারণে তাকে সূরাতুল আসাস বলা হয়। আবার কেউ কেউ সূরাটির প্রথম আয়াত দ্বারা তার নামকরণ করেছেন– سُوْرَةُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ। এতে ৪টি আয়াত, ১৫টি বাক্য এবং ৪৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী কিংবা মাদানী এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে :

১. অনেকের মতে, তা মাক্কী। যেমন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– কুরাইশগণ নবী করীম ﷺ -কে বলল- আপনার রব-এর বংশতালিকা বলুন, তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। এ মতের সাথে উবাই ইবনে কা'বও একমত :

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, ইহুদিদের একদল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলো, তাদের মধ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ, হুয়াই ইবনে আখতাবও ছিল। তারা বলল– হে মুহাম্মদ! আপনার সে রব কি রকম

যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরাটি নাজিল করেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ সূরাটি মাদানী। তবে উভয় ধরনের হাদীসকে একত্র করলে বুঝা যায় যে, প্রথমে তা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তারপর একই প্রশ্ন ইহুদিরা মদিনাতে করলে একই সূরা পাঠ করে শুনিয়ে দেওয়া হয়।

মূলবক্তব্য : সূরাটির মূলবক্তব্য হলো, এক কথায় একত্ববাদ। রাসূলে কারীম ﷺ যখন একত্ববাদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন দেব-দেবী ও মূর্তিপূজকে জগৎ পরিপূর্ণ ছিল। মূর্তি পূজকরা কাষ্ঠ, পাথর, স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি দ্বারা দেব-দেবীর আকার আকৃতি বানাত এবং সেগুলো পূজা করত। এগুলোই ছিল তাদের খোদা। তাদের খোদাগণের দেহ ছিল এবং সেগুলোর যথারীতি বংশ মর্যাদার ধারা ছিল। কোনো দেবতা স্ত্রীহারা ছিল না, আর কোনো দেবী স্বামীহারা ছিল না, তাদের পানাহারের প্রয়োজন ছিল। তাদের পূজারীগণ তাদের জন্য এগুলো ব্যবস্থা করে দিত। তখন মুশরিকদের অনেকেই বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ তা'আলারও মানবাকৃতি আছে, তিনিও সে আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন।

তখনকার খ্রিস্টানরা এক খোদাকে বিশ্বাস করত, কিন্তু সে খোদার একজন পুত্র তো অবশ্যই থাকতে হতো, আর সে পুত্রের মাতাও থাকতে হতো এবং শ্বশুর শাশুড়িও ছিল।

অনুরূপভাবে ইহুদিগণেরও এক খোদা এবং তার পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি থাকতে হতো। মোটকথা, সে খোদা মানবীয় গুণাবলির ঊর্ধ্বে ছিল না এবং তাদের সে খোদা ভ্রমণ করত, মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করত। কখনো বা যে কোনো সৃষ্টির সাথে লড়াই কুস্তি করত। এ সব অবস্থার বাইরে ছিল অগ্নিপূজক, তারকাপূজক অর্থাৎ মাজূসী, সাবী।

আর ইহুদিগণ হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলত এবং নাসারাগণ হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র ও মরিয়ম (আ.)-কে আল্লাহর স্ত্রী বলত।

তাদের এ সকল অশ্লীল ধারণা উৎখাত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় একত্ববাদের পরিচয় দান করেন এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে একথা ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য বলেন যে, আল্লাহ এক, তিনি কোনো মানুষ বা অন্যান্য সৃষ্টিকুলের সাথে অতুলনীয় অসামঞ্জস্যশীল এবং নিরাকার। তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁরও কোনো সন্তান নেই, আর এরূপ ধারণা করা অশোভনীয়। তিনি স্বনির্ভর, কারো উপর নির্ভর করা নিষ্প্রয়োজন। তিনিই সকলের চেয়ে অতুলনীয়ভাবে মহান। অশেষ ক্ষমতাবান। তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। তাঁর বংশ ও বংশধারা নেই। তাই সকলেরই তাঁর একত্ববাদের উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক।

সূরাটির ফজিলত : এ সূরাটির ফজিলত অনেক–

১. এ সূরাটি যদি কেউ একবার শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করে, তবে ১০ পারা কুরআনের ছওয়াব পাওয়া যাবে। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এক রাতে (অর্থাৎ শোবার সময়) এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে পারবে? সাহাবীগণ আরজ করলেন, এটা কেমন করে সম্ভব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– قُلْ هُوَ اللّٰهُ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ কুলহুওয়াল্লাহু কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। –[বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম আহমদ (র.) হযরত উকবাহ ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরাহ শুনাচ্ছি, যা তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ও কুরআন সব কিতাবেই নাজিল হয়েছে এবং বলেন, রাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ না পড়ে শুবে না। হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) বলেন, আমি তখন থেকে আর এ সূরাগুলো পড়া ব্যতীত শুই না। –[ইবনে কাছীর]

২. কোনো একজন সাহাবী আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সূরা কুলহুওয়াল্লাহটি পড়তে ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমার এ ভালোবাসাই তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে। –[তিরমিযী] ইবনে কাছীর ইমাম আহমদ ও হযরত আনাস (রা.) থেকে এরূপ বর্ণনা করেন।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, যে ব্যক্তি قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরাহ প্রতিদিন একশতবার পাঠ করবে, তবে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অবশ্য ঋণের দায় থেকে মুক্ত হবে না। –[তিরমিযী ও দারেমী]

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিদ্রাগমনের শয্যায় ডান হয়ে ১০০ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তাকে তার ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিবেন। –[তিরমিযী]

৫. হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা পড়তে শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়েছে! তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ওয়াজিব হয়েছে? হুযূর ﷺ বলেন, জান্নাত। –[ইবনে কাছীর, তিরমিযী, নাসায়ী]

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, যে ব্যক্তি দশবার এ সূরা তেলাওয়াত করবে তার জন্য বেহেশতে একটি মহল এবং যে ব্যক্তি বিশবার পড়বে তার জন্য দু'টি, আর ত্রিশবার পড়লে তিনটি মহল তৈরি হবে। –[দারেমী]

৭. প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় খাঁটি মনে অন্তত একবার করে তেলাওয়াত করলে ঈমানের দুর্বলতা থেকে মুক্তি পাবে এবং শিরক থেকে রক্ষা পাবে।

৮. খাঁটি মনে দুইশতবার করে তেলাওয়াত করলে একশত বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।
৯. তিনবার পাঠ করলে এক খতম কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব পাওয়া যায়।
১০. এক হাজার বার পড়ে দোয়া করলে যে কোনো সৎ মনোবাসনা পূর্ণ হবে এবং বিপদ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।
১১. কবরস্থানে গিয়ে পড়লে মুর্দাদের কবর আজাব মাফ হয়। যে কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পড়ে দম করলে সে আরোগ্য হয়।
১২. হযরত আনাস (রা.) বলেন, জনৈক আনসার ব্যক্তি কোবা মসজিদে নামাজ পড়ালেন। প্রত্যেক রাকাতে প্রথমে [ফাতিহার পর] সূরা ইখলাস পড়া তার নিয়ম ছিল। পরে অপর কোনো সূরা পাঠ করতেন। লোকেরা তাতে আপত্তি জানিয়ে বলল– তুমি এটা কি করছ, قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা পাঠের পর তাকে যথেষ্ট মনে না করে তার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পাঠ করছ, এটা ঠিক নয়। হয় এ সূরাটি পড়ো অথবা তাকে বাদ দিয়ে অন্য সূরা পড়ো। তখন সে বলল, আমি তা ত্যাগ করতে পারি না। তোমরা চাইলে নামাজ পড়াবো, না হয় ইমামতি ছেড়ে দিবো; কিন্তু লোকগণ তার পরবর্তী অন্য কাউকে ইমাম বানাতে পছন্দ করল না। শেষ পর্যন্ত নবী করীম ﷺ -এর সমীপে ব্যাপারটি পেশ করা হলো। তিনি সে লোককে জিজ্ঞাসা করলেন– তোমার সাথীগণ যা চায়, তা মানতে তুমি অপারগণ কেন? তখন সে বলল– আমি এ সূরাটি খুব ভালোবাসি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন– এ সূরার প্রতি তোমার অগাধ ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতী বানাবে। –[বুখারী]

এ ছাড়াও আরো অসংখ্য ফজিলতের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

তা'বীর : বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওহীদের প্রতি ঈমান নসীব করবেন। তার পরিবারবর্গের সংখ্যা কম হবে। সে অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করবে এবং তার দোয়া কবুল করা হবে। –[নূরুল কুরআন]

শানে নুযূল : তিরমিযী, হাকেম প্রমুখের রেওয়ায়েতে আছে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জবাবে এই সূরা নাজিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, মদিনার ইহুদিরা এ প্রশ্ন করেছিল। এ কারণে যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ। –[কুরতুবী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, মুশরিকরা আরো প্রশ্ন করেছিল-আল্লাহ তা'আলা কিসের তৈরি, স্বর্ণ-রৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জবাবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ –'বলুন' কথার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে। 'আল্লাহ' শব্দটি এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সর্বগুণের আধার ও সর্বদোষ থেকে পবিত্র। اَحَدٌ - وَاحِدٌ ও উভয়ের অর্থ এক। কিন্তু اَحَدٌ শব্দের অর্থে এটাও শামিল যে, তিনি কোনো এক অথবা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরি নন, তাঁর মধ্যে একাধিকত্বের কোনো সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারো তুল্য নন। এটা তাদের সেই প্রশ্নের জবাব, যাতে বলা হয়েছিল আল্লাহ কিসের তৈরি? এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কিত সকল আলোচনা এসে গেছে এবং قُلْ শব্দের মধ্যে নবুয়তের কথা এসে গেছে। অথচ এসব আলোচনা বিরাটকায় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ - صَمَدٌ শব্দের অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের অনেক উক্তি আছে। তিবরানী এসব উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন : এগুলো সবই নির্ভুল। এতে আমাদের পালনকর্তার গুণাবলিই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু صَمَدٌ -এর আসল অর্থ সেই সত্তা, যার কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে এবং যার সমান মহান কেউ নয়। সার কথা এই যে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। –[ইবনে কাছীর]

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ –যারা আল্লাহ তা'আলার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, এটা তাদের জবাব। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য–স্রষ্টার নয়। অতএব, তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁর কোনো সন্তান নেই।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ –অর্থাৎ কেউ তাঁর সমতুল্য নয় এবং আকার-আকৃতিতে তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না।

সূরা ইখলাসে তাওহীদ শিরকের পূর্ণ বিরোধিতা আছে : দুনিয়াতে তাওহীদ অস্বীকারকারী মুশরিকদের বিভিন্ন প্রকার বিদ্যমান আছে : সূরা ইখলাস সর্বপ্রকার মুশরিকসুলভ ধারণা খণ্ডন করে পূর্ণ তাওহীদের সবক দিয়েছে। তাওহীদ বিরোধীদের একদল স্বয়ং আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করে না, কেউ অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তাঁকে চিরন্তন মানে না এবং কেউ উভয় বিষয় মানে, কিন্তু গুণাবলির পূর্ণতা অস্বীকার করে। কেউ কেউ সবই মানে, কিন্তু ইবাদতে অন্যকে শরীক করে। اَللّٰهُ اَحَدٌ বাক্যে সব ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন হয়ে গেছে। কতক লোক ইবাদতেও শরীক করে না, কিন্তু অন্যকে অভাব বরণকারী ও কার্যনির্বাহী মনে করে। صَمَدٌ শব্দে এই ধারণা বাতিল করা হয়েছে। যারা আল্লাহর সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে لَمْ يَلِدْ বলে জবাব দেওয়া হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ امر বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- আপনি বলে দিন।

اَحَدٌ : একবচন, বহুবচন احاد অর্থ– এক, একক, প্রথম।

اَلصَّمَدُ : অমুখাপেক্ষি, প্রয়োজনমুক্ত, অভাবমুক্ত। উল্লেখ্য যে, মুফাসসিরগণের নিকট صَمَدٌ -এর অর্থ, নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে আব্বাস মুজাহিদ, হাসান, সায়িদ, ইবনে যুবাইর প্রমুখ বলেন, صَمَدٌ হলো যার পেট নেই। শা'বী (র.) বলেন, যে পাহানার করে না। আব্দুল আলিয়া হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, اَلصَّمَدُ -এর পরবর্তী বাক্যই তার ব্যাখ্যা। অর্থাৎ اَلَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ অর্থাৎ صَمَدٌ হলো যে কাউকে জন্ম দেয়নি এবং নিজেও কারো থেকে জন্ম নেয়ননি। কারণ, যে জন্ম নেয়, সে অবশ্যই মারা যাবে এবং সে উত্তরাধিকারী হয়। অন্য লোকও তার থেকে মিরাস পায়। হযরত ইকরামা ও হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি হলো, যার উপরে আর কেউ নেই। মোল্লা আলী কারী (র.) اَلْحِرْزُ الثَّمِيْنُ شَرْحُ الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ -এর মধ্যে সকল অর্থের সারমর্ম বর্ণনা করেছেন–

وَحَاصِلُهُ الْغِنَى الْمُغْنِى الَّذِىْ لاَ يَحْتَاجُ اِلٰى شَيْئٍ وَيَحْتَاجُ اِلَيْهِ كُلُّ اَحَدٍ

মূলকথা, সামাদ হলো, যে কোনো জিনিসের দিকে মুহতাজ নয় কিন্তু তার দিকে প্রত্যেকেই মুহতাজ হয়।

لَمْ يَلِدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার الولادة মূলবর্ণ (و - ل - د) জিনস مثال واوى অর্থ- তিনি কাউকে জন্ম দেননি।

لَمْ يُوْلَدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِلاَدَةُ মূলবর্ণ (و - ل - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তাকে ও জন্ম দেওয়া হয়নি।

كُفُوًا : ইসম। لَمْ يَكُنْ -এর খবর বা এটি لَمْ يَكُنْ -এর খবরে লাহু আর كُفُوًا হাল হওয়ার কারণে যবর হয়েছে। তখন বাক্যটির মূল দাঁড়াবে– لَمْ يَكُنْ لَهُ اَحَدٌ كُفُوًا আর কায়দা আছে, নাকেরা ইসম অগ্রবর্তী করা হলে তার মানসূবকে হালের উপর অগ্রবর্তী করতে হবে। অর্থ– সমতুল্য, সমান। বরাবর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ : এখানে قُلْ শব্দটি فعل امر তার فاعل টি উহ্য। উহ্য রূপ হচ্ছে اَنْتَ يَامُحَمَّدُ; هُوَ টি ضمير الشان আর اللّٰهُ শব্দটি مبتدأ এবং اَحَدٌ শব্দটি خبر;

اَللّٰهُ الصَّمَدُ এখানে اَللّٰهُ শব্দটি مبتدأ এবং اَلصَّمَدُ শব্দটি خبر; لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ এখানে لم টি حرف نفى আর يلد শব্দটি فعل مضارع مجزوم بلم; واو টি حرف عطف এবং لم টি حرف نفى আর يُوْلَدْ শব্দটি فعل مضارع مجزوم بلم

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ এখানে واو টি حرف عطف এবং لَمْ টি حرف نفى আর يَكُنْ শব্দটি مضارع مجزوم بلم; لَهُ শব্দটি جارمجرور যা كُفُوًا -এর متعلق مقدم আর كُفُوًا টি اَحَدٌ -এর حال এবং اَحَدٌ শব্দটি ذوالحال

-[ই'রাবুল কুরআন. খ. ৮. প. ৪৪৬]

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ফালাক

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫, রুকূ‘– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আপনি বলুন যে, আমি প্রভাতের স্রষ্টার আশ্রয় গ্রহণ করছি।	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١
২. তাঁর সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর অপকারিতা হতে।	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢
৩. আর অন্ধকার রাত্রির অপকারিতা হতে যখন [তা] এসে উপস্থিত হয়।	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣
৪. আর [জাদু তাগার] গ্রন্থিসমূহের উপর পড়ে পড়ে ফুৎকারকারিণীদের অপকারিতা হতে।	وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤
৫. আর হিংসা পোষণকারীর অপকারিতা হতে যখন সে হিংসা করতে থাকে।	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قُلْ আপনি বলুন যে اَعُوْذُ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি بِرَبِّ الْفَلَقِ প্রভাতের স্রষ্টার।

২. مِنْ شَرِّ আপকারিতা হতে مَا خَلَقَ তাঁর সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর।

৩. وَمِنْ شَرِّ আর আপকারিতা হতে غَاسِقٍ অন্ধকার রাত্রির اِذَا وَقَبَ যখন (তা) এসে উপস্থিত হয়।

৪. وَمِنْ شَرِّ আর অপকরিতা হতে النَّفّٰثٰتِ পড়ে পড়ে ফুৎকার কারিণীদের فِى الْعُقَدِ গ্রন্থিসমূহের উপর।

৫. وَمِنْ شَرِّ আর অপকারিতা হতে حَاسِدٍ হিংসা পোষণকারীর اِذَا حَسَدَ যখন সে হিংসা করতে থাকে।

سُوْرَةُ النَّاسِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা নাস

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৬, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনি বলুন যে, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানবকুলের প্রতিপালকের।	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١)
২. মানববৃন্দের অধিপতির।	مَلِكِ النَّاسِ (٢)
৩. সমস্ত মানবের মা'বূদের।	اِلٰهِ النَّاسِ (٣)
৪. কুপ্ররোচনা প্রদানকারী, পশ্চাদপসরণকারীর [অর্থাৎ শয়তানের] অপকারিতা হতে।	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ەۙ الْخَنَّاسِ (٤)
৫. যে মানবমণ্ডলীর অন্তরসমূহে কুপ্ররোচনা প্রদান করে।	الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ (٥)
৬. চাই সে জিন হোক অথবা মানব হোক [অর্থাৎ মানব ও জিন উভয় শ্রেণির শয়তান হতে আশ্রয় নিচ্ছি]।	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قُلْ আপনি বলুন যে اَعُوْذُ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি بِرَبِّ النَّاسِ মানবকুলের প্রতিপালকের।

২. مَلِكِ النَّاسِ মানববৃন্দের অধিপতির।

৩. اِلٰهِ النَّاسِ সমস্ত মানবের মা'বূদের।

৪. مِنْ شَرِّ আপকারিতা হতে الْوَسْوَاسِ কুপ্ররোচনা প্রদানকারী الْخَنَّاسِ পশ্চাদপসরণকারীর (শয়তানের)

৫. الَّذِيْ يُوَسْوِسُ যে কুপ্ররোচনা প্রদান করে فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ মানবমণ্ডলীর অন্তরসমূহে।

৬. مِنَ الْجِنَّةِ চাই সে জিন হোক وَالنَّاسِ, অথবা মানব হোক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা দুটির নামকরণের কারণ : সূরা আল-ফালাক্বের নামটি গ্রহণ করা হয়েছে সূরার প্রথম আয়াতের اَلْفَلَقْ শব্দ হতে। اَلْفَلَقْ শব্দের অর্থ হচ্ছে– বিদীর্ণ হওয়া। তা দ্বারা রাতের আঁধার ভেদ করে ঊষার উদয় হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। আর সূরা আন-নাস -এর নামকরণ করা হয়েছে সূরার প্রথম আয়াতের 'আন-নাস' শব্দ দ্বারা। এর অর্থ হলো মানবকুল। কতিপয় তাফসীরকার এ সূরা দু'টিকে سُوْرَةُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ নাম রেখেছেন। এ সূরা দু'টি পাঠ করে আল্লাহর নিকট সর্বপ্রকার অনিষ্টতা হতে পানাহ চাওয়া হয়।

সূরা আল-ফালাক্বে রয়েছে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য এবং ৬৯টি অক্ষর।
আর সূরা আন-নাসে রয়েছে ৬টি আয়াত, ২০টি বাক্য এবং ৭৯টি অক্ষর।

নাজিলের সময়কাল : এ সূরা দু'টি অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও সময়কাল নির্ধারণে তাফসীরকারদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এক দলের অভিমত হলো, এটা মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়। হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, আতা ও জাবির ইবনে যায়েদ (রা.) এ মতের সমর্থক। তাঁদের মতে, যখন মহানবী ﷺ চতুর্দিক দিয়ে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হন এবং বৈরীদল তাঁর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে ফেলার জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তখন তা অবতীর্ণ হয়। সূরা আল-ফালাক্বের 'রাতের অন্ধকারে অনিষ্টতা' কথাটি এ দিকেরই ইঙ্গিত বহন করে বলে অনুমিত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর ও কাতাদাহ (রা.)-এর মতে, সূরা দু'টি মাদানী সূরার অন্তর্ভুক্ত। মদিনাবাসী ইহুদি লাবীদ ইবনে আসেম জাদুমন্ত্র দ্বারা মহানবী ﷺ -এর জীবন নাশের হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং জাদুর প্রভাব মহানবী ﷺ-এর পবিত্র বদনমণ্ডলের উপর নিপতিত হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে মদিনাতে অবস্থানকালে উক্ত সূরা দু'টি অবতীর্ণ হয়। ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর সূত্রে বলেছেন– মহানবী ﷺ-এর জাদুগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা ৭ম হিজরি সনের। এ সূত্র ধরে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) সূরা দু'টিকে মাদানী বলে মনে করেন। তবে সূরা দু'টি স্পষ্টত মক্কায় অবতীর্ণ বলে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা জোরালো বলে মনে হয়। পরে মদিনাতে মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকদের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র যখন প্রবল হয়ে উঠে, তখন নবী করীম ﷺ তা পাঠ করার নির্দেশপ্রাপ্ত হন সুতরাং শুধুমাত্র জাদু সংক্রান্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া সমীচীন নয়।

সূরা দু'টির বিষয়বস্তু : নবী করীম ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সমগ্র পৃথিবী, বিশেষ করে আরবের সমাজ ব্যবস্থা বাতিল শক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। মানবিকতার সম্মানজনক অবস্থান থেকে মানবজাতি পাশবিকতার নিম্নস্তরে উপনীত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যকে তারা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। আল্লাহর আসনে সমাসীন করেছিল নানা প্রকৃতির মূর্তি, পাথর, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি কল্পিত দেবতাদের। পুরোহিত শ্রেণি নানা ভেলকীবাজির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি লাভ করত। এক কথায় সমাজে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার চরম অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। এমনি নৈরাজ্যকর পরিবেশে হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাওহীদের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিপন্থি আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে তিনি অসহনীয় যন্ত্রণা ও অবর্ণনীয় নির্যাতনের সম্মুখীন হলেন। দৈহিক নির্যাতন, মানসিক অশান্তি ও পারিবারিক উৎপীড়ন দ্বারাও যখন তাঁর বৈপ্লবিক প্রচারণাকে স্তব্ধ করা গেল না, তখন দুনিয়ার কোল থেকে চিরতরে অপসারিত করে দেওয়ার ঝঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে আল্লাহদ্রোহী শক্তি কার্পণ্য করেনি। এ সংকটজনক পরিস্থিতিতে মহানবী ﷺ আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক ও ভয়-ভীতিতে তথা সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ও তাঁর শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে– হে নবী! আপনি বলুন, উষা উদয়ের পরিচালক সর্বশক্তিমান সত্তার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, সৃষ্টিকুলের সর্বপ্রকার অনিষ্ট হতে; গাঢ় তমসার রজনীর অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে -যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়............।

সৃষ্টিকুলের যাবতীয় অনিষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতি হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মহানবী ﷺ প্রত্যহ এ সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। মুসলিম জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন– 'রাসূলে কারীম ﷺ রাত্রিকালে বিছানায় শয়নকালে দু'হাত একত্রিত করে সূরা আল-ইখলাস, আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে দু'হাতের তালুতে ফুঁক দিতেন এবং সমস্ত শরীর মুছে নিতেন। হাতদ্বয় দ্বারা মোছার কাজটি মাথা হতে আরম্ভ করতেন এবং দেহের সম্মুখভাগ তিনবার মুছে ফেলতেন।'

এ সূরাদ্বয়ের আলোকে ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান রয়েছে বলে অনুমিত হয়। অবশ্য ঝাড়-ফুঁকের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও তা সঠিকভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে অলাভজনক। কেননা বিভিন্ন সূত্রের অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে, 'যে লোক দাগানোর চিকিৎসা করাল এবং ঝাড়-ফুঁক করাল সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।'–[তিরমিযী]

পরিশেষে বলা যায় যে, সৃষ্টিকুলের অনিষ্টকারিতা থেকে অব্যাহতি লাভ, আত্মরক্ষা ও একমাত্র আল্লাহকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান বলে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ঝাড়–ফুঁককেই কেবল আরোগ্য লাভের মাধ্যম কল্পনা করা ইত্যাদি হচ্ছে আলোচ্য সূরাদ্বয়ের বিষয়বস্তু ও মূলকথা।

এ সূরা দুটি কুরআনের অংশ : শুধু হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) উক্ত সূরাদ্বয়কে কুরআনের সূরা হিসেবে মানতেন না। তাঁর নিকট রক্ষিত 'মাসহাফ' হতে তিনি নাকি এ সূরাদ্বয়কে মুছে ফেলেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন– 'কুরআনের অংশ নয় এমন সব জিনিস কুরআনের সাথে মিশাইও না। এ সূরাদ্বয় কুরআনে শামিল নয়। এটা তো নবী করীম ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর দেওয়া একটি হুকুম মাত্র। তা দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাত্র।'

ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্ত অভিমতের জবাবে ওলামায়ে কেরাম বলেন–

১ তিনি তাঁর মাসহাফে সূরাদ্বয় শুধু উল্লেখ করেননি।

২. নবী করীম ﷺ যে এ সূরাদ্বয়কে কুরআনে শামিল করার অনুমতি দিয়েছেন, সে কথা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) জানতে পারেননি।

৩. এটা তাঁর নিছক ব্যক্তিগত অভিমত। এ মত অন্য কারো নয়। অন্য কোনো সাহাবীও তাঁর এ মতকে সমর্থন করেননি।

৪. হযরত ওসমান (রা.) সমস্ত সাহাবীর সম্পূর্ণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে কুরআন মাজীদের যে অনুলিপি তৈরি করিয়েছেন, তাতে উক্ত সূরাদ্বয় শামিল ছিল।

৫. নবী করীম ﷺ উক্ত সূরাদ্বয় নামাজে পড়েছিলেন বলে সহীহ হাদীস পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর একজন ইহুদি লাবীদ ইবনুল আসিম কর্তৃক একদা জাদু করা হয়েছিল। এর প্রভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ বিষয়টি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হুযূর ﷺ-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর জাদু যে বস্তুর মাধ্যমে করা হয়েছিল তা ছিল হুযূর ﷺ-এর চিরুনির একটি টুকরা এবং মাথা মুবারকের এক গাছি চুল সংযোজনে বনূ জুরাইজের যী আরওয়ান নামক একটি কূপের তলায় পাথর চাপা দিয়ে পুরুষ খেজুর গাছের ছড়ার আবরণে রাখা হয়েছিল।

অতঃপর হযরত মুহাম্মদ ﷺ লোক পাঠিয়ে ঐ সকল জাদুর বস্তুগুলো নিয়ে আসলেন এবং সূরা আন-নাস ও আল-ফালাক্বের এক একটি আয়াত পড়লেন এবং একটি গিরাহ খুলে ফেললেন, অতঃপর তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) হতে এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, হুযূর ﷺ-এর উপর একজন ইহুদি লাবীদ ইবনুল আসিম জাদু করল, তাতে হুযূর ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতঃপর একদা তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট বললেন যে, হে আয়েশা! আমার অসুস্থতা কি, তা আল্লাহ তা'আলা আমাকে অবগত করিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি, আমার নিকট দু'জন (ফেরেশতা) লোক মানুষের আকৃতিতে এসেছেন। একজন আমার শিহরে বসল, অপরজন পায়ের দিকে বসল। মাথার দিকের ব্যক্তি পায়ের দিকস্থ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করল যে, এ মহামানবের অসুস্থতা কি? অপরজন বললেন, তাঁকে জাদু করা হয়েছে। আবার প্রশ্ন করলেন, কে তাঁকে জাদু করেছে? বললেন, লবীদ ইবনে আসম যে ইহুদিদের সাহায্যকারী মুনাফিক ছিল। আবার পশ্ন করলেন কিসের মধ্যে করা হয়েছে? বললেন, একটি চিরুনি ও দাঁতের মধ্যে। অতঃপর প্রশ্ন করলেন তা কোথায় রাখা হয়েছে? বললেন, তা খেজুরের ঐ গেলাপে রাখা হয়েছে যাতে খেজুর হয়। আর তা بِئْرِ ذَرْوَانَ-এর তলায় একটি পাথরের নিচে চাপা দেওয়া অবস্থায় রয়েছে। হুযূর ﷺ স্বয়ং সে কূপে গমন করে তা বের করে আনলেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন তা প্রকাশ করেননি যে, অমুক ইহুদি এ বেয়াদবি করেছে? হুযূর ﷺ বললেন, আমাকে আল্লাহ শেফা দান করেছেন, আর কারো কষ্ট দেওয়া আমার পছন্দ নয়।

ইমাম ছা'লাবী (র.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, হুযূর ﷺ-এর খেদমতে একটি ছেলে ছিল, এক ইহুদি তাকে ফুসলিয়ে তার মাধ্যমে হুযূর ﷺ-এর দাঁত মোবারক ও চিরুনি মোবারক অর্জন করে এবং একটি দাঁতের সুতায় ১১টি গিরা সংযোগ করে জাদু করল। প্রত্যেকটি গিরায় একটি সুঁই লাগাল এবং চিরুনির সাথে এগুলো সংযোগ করে একত্রে খেজুর ফলের গেলাপে পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রাখে। আল্লাহ তা'আলা سُوْرَةُ مُعَوِّذَتَيْنِ নাজিল করেছেন এবং এতে ১১টি আয়াত রয়েছে। এক এক আয়াত পড়ে হুযূর ﷺ এক একটি গিরা খুলেন এবং সুস্থতা অর্জন করেন।

জাদুর বাস্তবতা : জাদুর বাস্তবতার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়– কারো কারো মতে, এর কোনো ভিত্তি নেই। এটা নিছক কুসংস্কার মাত্র। আবার কারো মতে, এর বাস্তবতা রয়েছে।

প্রথম দলের মতে- জাদুর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কাজেই তাকে বাস্তব মনে করা যেতে পারে না। কিন্তু দুনিয়ার এমন বহু জিনিস আছে যা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণেই শুধু আসে; কিন্তু তা কিভাবে সংঘটিত হয় তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন কোনো কথা নেই। জাদু মূলত একটা মনস্তত্ত্বিক প্রক্রিয়া। তা মন হতে সংক্রমিত হয়ে দেহকে প্রভাবিত করতে পারে, যেমন দৈহিক প্রভাব সংক্রমিত হয়ে মনকে প্রভাবিত করে। ভয় একটা মনস্তাত্ত্বিক জিনিস; কিন্তু তা দেহে সংক্রমিত হয়ে দেহে লোমহর্ষণ ঘটে। সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করে। জাদুর দ্বারা আসল ব্যাপারে পরিবির্তন ঘটে না বটে, কিন্তু তার কারণে মানুষের মন ও ইন্দ্রিয় প্রভাবিত হয়। তখন আসল ব্যাপারই পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে অনুভূত হয়। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বন্দুকের গুলী ও বিমান হতে নিক্ষিপ্ত বোমার মতো জাদুর কার্যকারিতা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া অসম্ভব; কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে যা মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা

পড়েছে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা নিছক হঠকারিতা বৈ কিছুই নয়। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট প্রমাণ আছে। যেমন– ফিরআউনের যুগে যখন হযরত মূসা (আ.)-কে পাঠানো হয়েছিল, তখন হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তারা জাদুকরদেরকে জামায়েত করেছে বলে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা দিয়েছেন–

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ - وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ - لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ - فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ .... الخ (أَيْضًا) سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ - وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ - فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ - قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

উভয় সূরার ফজিলত : হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমাকে নবী করীম ﷺ আদেশ দিয়েছেন আমি যেন প্রত্যেক নামাজের পর সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস পাঠ করি। –[তিরমিযী]

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তুমি প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যা সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক্ব এবং সূরা আন-নাস তিনবার করে পাঠ করবে, তাহলে সব বিষয়ে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। –[তিরমিযী]
* হযরত আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ জিন ও ইনসানের দৃষ্টির ক্ষতি হতে পানাহ চেয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। যখন সূরা আল-ফালাক্ব ও আন-নাস নাজিল হয়। তখন তিনি এ দু'টি সূরা পাঠ করতে শুরু করলেন, আর অন্যান্য দোয়া পাঠ হতে বিরত থাকলেন।
* হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিছানায় বিশ্রাম করার সময় সূরা আল-ইখলাস, আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে উভয় হাতে ফুঁক দিতেন। অতঃপর হাত দ্বারা চেহারা মোবারক এবং শরীরে যেখানে হাত যায় সেখানে মাসাহ্ করতেন। আমি যদি কষ্ট অনুভব করতাম, তবে আমাকেও এ আমল করার আদেশ প্রদান করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]
* হযরত আয়েশা (রা.) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কষ্ট অনুভব করতেন তখন তিনি সূরা আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে দম করতেন। যখন তাঁর ব্যথা বেড়ে যেত তখন আমি নিজেই এই সূরাদ্বয় পাঠ করতাম এবং তাঁর হাত দিয়ে মাসেহ করিয়ে নিতাম।
* হযরত আয়েশা (রা.) আরো বলেন, যে রোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়, সে সময়ও তিনি সূরা আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিয়ে ছিলেন। কিন্তু যখন অসুস্থতা বেড়ে গেল তখন আমি ফুঁক দিতাম এবং তাঁর চেহারা মোবারক মুছে দিতাম। –[নুরুল কুরআন]

সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাফেজ ইবনে কাইয়ূম (র.) উভয় সূরার তাফসীর একত্রে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্য এ দুটি সূরার প্রয়োজন অত্যাধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সূরাদ্বয়ের কার্যকারিতা অনেক। সত্যি বলতে কি মানুষের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাদ্বয় তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। মুসনদে আহমদে বর্ণিত আছে, জনৈক ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদু করেছিল। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইহুদি জাদু করেছে এবং যে জিনিসে জাদু করা হয়েছে, তা অমুক কূপের মধ্যে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাতে কয়েকটি গ্রন্থি ছিল। তিনি গ্রন্থিগুলো খুলে দেওয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করেন। জিবরাঈল ইহুদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চিনতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার অভ্যাস তাঁর কোনো দিনই ছিল না। তাই আজীবন এই ইহুদীকে কিছু বলেন নি এবং তার উপস্থিতিতে মুখমণ্ডলে কোনোরূপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেন নি। কপটবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইহুদি রীতিমত দরবারে হাজির হতো। সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জনৈক ইহুদী জাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেন নি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললেন, আমার রোগটা কি আল্লাহ তা'আলা তা আমাকে বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে) দু'ব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং একজন শিয়রের কাছেও অন্যজন পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্যজনকে বলল, তাঁর অসুখটা কি? অন্যজন বলল : ইনি জাদুগ্রস্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, কে জাদু করল? উত্তর হলো, ইহুদিদের মিত্র মুনাফিক লবীদ ইবনে আ'সাম জাদু করেছে। আবার প্রশ্ন হলো, কি বস্তুতে জাদু করেছে? উত্তর

হলো, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হলো, চিরুনীটি কোথায়? উত্তর হলো, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বরযরওয়ান' কূপের একটি পাথরের নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সে কূপে গেলেন এবং বললেন, স্বপ্নে আমাকে এই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিরুনীটি সেখান থেকে বের করে আনলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আপনি ঘোষণা করলেন না কেন (যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জাদু করেছে)? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে রোগ মুক্ত করেছেন। আমি কারো জন্য কষ্টের কারণ হতে চাই না। (উদ্দেশ্য, একথা ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করত অথবা কষ্ট দিত)। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অসুখ ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরো আছে যে, কতক সাহাবায়ে কেরাম জানতে পেরেছিলেন যে, এ দুষ্কর্মের হোতা লবীদ ইবনে আ'সাম। তাঁরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে আরজ করলেন, আমরা এই পাপিষ্ঠকে হত্যা করব না কেন? তিনি তাঁদেরকে সেই উত্তর দিলেন, যা হযরত আয়েশা (রা.)-কে দিয়েছিলেন। ইমাম সা'লাবী (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে জনৈক বালক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাজকর্ম করত। ইহুদি তার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চিরুনী হস্তগত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর একটি তাঁতের তাতের এগারটি গ্রন্থি লাগিয়ে প্রত্যেক গ্রন্থিতে একটি করে সুঁই সংযুক্ত করে। চিরুনীসহ সেই তার খেজুর ফলের আবরণীতে রেখে অতঃপর একটি কূপের প্রস্তর খণ্ডের নিচে রেখে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা এগার আয়াতবিশিষ্ট এ দু'টি সূরা নাজিল করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক গ্রন্থিতে এক আয়াত পাঠ করে তা খুলতে লাগলেন। গ্রন্থি খোলা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি অনুভব করলেন যেন একটি বোঝা নিজের উপর থেকে সরে গেছে। -[ইবনে কাছীর]

জাদুগ্রস্ত হওয়া নবুয়তের পরিপন্থী নয় : যারা জাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, তারা বিস্মিত হয় যে, আল্লাহর রাসূলের উপর জাদু কিরূপে ক্রিয়াশীল হতে পারে! জাদুর স্বরূপ ও তার বিশদ বিবরণ সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে এতটুকু জানা জরুরি যে, জাদুর ক্রিয়াও অগ্নি, পানি ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণাদির ক্রিয়ার ন্যায়। অগ্নি দাহন করে অথবা উত্তপ্ত করে, পানি ঠাণ্ডা করে এবং কোনো কানো কারনের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বর আসে! এগুলো সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পয়গম্বরগণ এগুলোর উর্ধ্বে নন। জাদুর প্রতিক্রিয়াও এমনি ধরণের একটি ব্যাপার। কাজেই তাঁদের জাদুগ্রস্ত হওয়া অবান্তর নয়।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর ফজিলত : প্রত্যেক মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত লাভ-লোকসান আল্লাহ তা'আলার করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কারো অণু পরিমাণ লাভ অথবা লোকসান করতে পারে না। অতএব, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে আল্লাহর আশ্রয়ে দিয়ে দেওয়া এবং কাজেকর্মে নিজেকে তাঁর আশ্রয়ে যাওয়ার যোগ্য করতে সচেষ্ট হওয়া। সূরা ফালাকে ইহলৌকিক বিপদাপদ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা আছে এবং সূরা নাসে পারলৌকিক বিপাদপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে উভয় সূরার অনেক ফজিলত ও বরকত বর্ণিত আছে। সহীহ মুসলিমে ওকবা ইবনে আমের (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, অদ্য রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি এমন আয়াত নাজিল করেছেন, যার সতুল্য আয়াত দেখা যায় না অর্থাৎ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ আয়াতসমূহ। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে তওরাত, ইঞ্জিল, জাবুর এবং কুরআনেও অনুরূপ কোনো সূরা নেই। এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওকবা ইবনে আমের (রা.)-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করালেন, অতঃপর মাগরিবের নামাজে এ সূরাদ্বয়ই তিলাওয়াত করে বললেন : এই সূরাদ্বয় নিদ্রা যাওয়ার সময় এবং নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থানের সময়ও পাঠ কর। অন্য হাদীসে তিনি প্রত্যেক নামাজের পর সূরাদ্বয় পাঠ করার আদেশ করেছেন। –[আবূ দাউদ, নাসায়ী]

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো রোগে আক্রান্ত হলে এই সূরাদ্বয় পাঠ করে হাতে ফুঁদিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি এই সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারত না। তাই আমি এরূপ করতাম। -[ইবনে কাছীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব (রা.) বর্ণনা করেন, এক রাত্রিতে বৃষ্টি ও ভীষণ অন্ধকার ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খুঁজতে বের হলাম। যখন তাঁকে পেলাম, তখন প্রথমেই তিনি বললেন, বল। আমি আরজ করলাম, কি বলব? তিনি বললেন, সূরা ইখলাছ ও কুল আউযু সূরাদ্বয়। সকাল-সন্ধ্যায় এগুলো তিনবার পাঠ করলে তুমি প্রত্যেক কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। -[মাযহারী]

সার কথা এই যে, যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এই সূরাদ্বয়ের আমল করতেন। অতঃপর আয়াতসমূহের তাফসীর দেখু :

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - فَلَقٌ -এর শাব্দিক অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য নিশি শেষে ভোর হওয়া। অন্য এক আয়াতে আল্লাহর গুণ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর সমস্ত গুণের মধ্য থেকে একে অবলম্বন করার রহস্য এই

হতে পারে যে, রাত্রির অন্ধকার প্রায়ই অনিষ্ট ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে এবং ভোরের আলো সেই বিপদাপদের আশংকা দূর করে দেয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে, তিনি তার সকল মসিবত দূর করে দিবেন। -[মাযহারী]

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ আল্লামা ইবনে কাইয়ুম (র.) লিখেন– شَرّ শব্দটি দু'প্রকার বিষয়বস্তুকে শামিল করে এক, প্রত্যক্ষ অনিষ্ট ও বিপদ, যাদ্বারা মানুষ সরাসরি কষ্ট পায়, দুই. যা মুসীবত ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে; যেমন কুফর ও শিরক। কুরআন ও হাদীসে যেসব বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে, সেগুলো এই প্রকারদ্বয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেগুলো হয় নিজেই বিপদ, না হয় কোনো বিপদের কারণ।

আয়াতের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই আশ্রয় গ্রহণের জন্য এ বাক্যটিই যথেষ্ট ছিল কিন্তু এস্থলে আরো তিনটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রায়ই বিপদ ও মুসীবতের কারণ হয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়েছে : وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ - غَسَقٌ শব্দের অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান ও মুজাহিদ (র.) غَاسِقٍ এর অর্থ নিয়েছেন রাত্রি। وُقُوْبٌ -এর অর্থ অন্ধকার পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই রাত্রি থেকে যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। রাত্রিবেলায় জিন, শয়তান, ইতরপ্রাণী কীটপতঙ্গ ও চোর-ডাকাত বিচরণ করে এবং শত্রুরা আক্রমণ করে। জাদুর ক্রিয়াও রাত্রিতে বেশি হয়। তাই বিশেষভাবে রাত্রি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় এই :

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ - نَفَثٌ -এর অর্থ ফুঁ দেওয়া। عُقَدٌ শব্দটি عُقْدَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ গ্রন্থি। যারা জাদু করে, তারা ডোর ইত্যাদিতে গিঁরা লাগিয়ে তাতে জাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়। এখানে نفاثات স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা نُفُوْس -এরও বিশেষণ হতে পারে যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে। বাহ্যত এটা নারীর বিশেষণ। জাদুর কাজ সাধারণত নারীরাই করে এবং জন্মগতভাবে এর সাথে তাদের সম্পর্কও বেশি। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরাদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে। সেই ঘটনায় ওলীদের কন্যারাই পিতার আদেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদু করেছিল। জাদু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, এর অনিষ্ট সর্বাধিক। কারণ, মানুষ জাদুর কথা জানতে পারে না। অজ্ঞতার কারণে তা দূর করতে সচেষ্ট হয় না। রোগ মনে করে চিকিৎসা করতে থাকে। ফলে কষ্ট বেড়ে যায়।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ অর্থাৎ হিংসুক ও হিংসা। হিংসার কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদু করা হয়েছিল। ইহুদি ও মুনাফিকরা মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসার অনলে দগ্ধ হত। তারা সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পেরে জাদুর মাধ্যমে হিংসার দাবানল নির্বাপিত করার প্রয়াস পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি হিংসা পোষণকারীর সংখ্যা জগতে অনেক। এ কারণেও বিশেষভাবে হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

حَسَدٌ শব্দের অর্থ কারো নিয়ামত ও সুখ দেখে দগ্ধ হওয়া তাঁর অবসান কামনা করা। এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ। এটাই আকাশে করা সর্বপ্রথম গুনাহ এবং এটাই পৃথিবীতে করা সর্বপ্রথম গুনাহ। আকাশে ইবলীস আদম (আ.)-এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদমপুত্র কাবীল তদীয় ভ্রাতা হাবীলের প্রতি হিংসা করেছে। -[কুরতুবী]

حَسَدٌ তথা হিংসার কাছাকাছি হচ্ছে غِبْط তথা ঈর্ষা। এর সারমর্ম হচ্ছে কারো নিয়ামত ও সুখ দেখে নিজের জন্যও তদ্রূপ নিয়ামত ও সুখ কামনা করা। এটা জায়েজ বরং উত্তম।

এখানে তিনটি বিষয় থেকে বিশেষ আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথা যুক্ত করা হয়েছে غَاسِقٍ -এর সাথে اِذَا وَقَبَ এবং حَاسِدٍ -এর সাথে اِذَا حَسَدَ সংযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় نَفّٰثٰتِ -এর সাথে কোনো কিছু সংযুক্ত কর হয়নি। কারণ এই যে, জাদুর ক্ষতি ব্যাপক। কিন্তু রাত্রির ক্ষতি ব্যাপক নয় এবং রাত্রি যখন গভীর হয়, তখনই ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়। এমনি ভাবে হিংসুক ব্যক্তি যে পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে প্রবৃত্ত না হয়, সেই পর্যন্ত হিংসার ক্ষতি তার নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে সে যদি হিংসায় উত্তেজিত হয়ে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট হয়, তবেই প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে।

সূরা ফালাকে জাগতিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য সূরা নাসে পারলৌকিক আপদ ও মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু পরকালীন ক্ষতি গুরুতর, তাই এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কুরআনে পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এখানে نَاسٌ -এর দিকে এবং পূর্ববর্তী সূরায় فَلَقٌ -এর দিকে رَبّ -এর সম্বন্ধ করা হয়েছে। কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সূরায় বাহ্যিক ও দৈহিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য এবং সেটা মানুষের মধ্যে সীমিত নয়। জন্তু-জানোয়ারও দৈহিক বিপদাপদ এবং মুসীবতে পতিত হয়। কিন্তু এ সূরায় শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এটা মানুষের মধ্যে সীমিত এবং জিন জাতিও প্রসঙ্গত শামিল আছে। তাই এখানে رَبّ শব্দের সম্বন্ধ نَاسٌ -এর দিকে করা হয়েছে। –[বায়যাভী]

مَلِكِ النَّاسِ –মানুষের অধিপতি, إِلٰهِ النَّاسِ –মানুষের মা'বূদ। এদু'টি গুণ সংযুক্ত করার কারণ এই যে, رَبّ শব্দটি কোনো বিশেষ বস্তুর দিকে সম্বন্ধ হলে আল্লাহ ব্যতীত অপরের জন্যও ব্যবহৃত হয়; যথা رَبُّ الدَّارِ গৃহের মালিক। প্রত্যেক মালিকই অধিপতি হয় না। তাই مَلِكِ النَّاسِ বলা হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক অধিপতিই মা'বূদ হয় না। তাই إِلٰهِ النَّاسِ বলতে হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ মালিক, অধিপতি, মা'বূদ সবই। এই তিনটি গুণ একত্র করার রহস্য এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ হেফাজত ও সংরক্ষণ দাবি করে। কেননা, প্রত্যেক মালিক তার মালিকানাধীন বস্তুর, প্রত্যেক রাজা তার প্রজার এবং প্রত্যেক উপাস্য তার উপাসকদের হেফাজত করে। এই গুণত্রয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার মধ্যে একত্রিত আছে। তিনি ব্যতীত কেউ এই গুণত্রয়ের সমষ্টি নন। তাই আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় সর্বাধিক বড় আশ্রয়। হে আল্লাহ, আপনিই এসব গুণের আধার এবং আমরা কেবল আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি–এভাবে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার নিকটবর্তী হবে। এখানে প্রথমে رَبِّ النَّاسِ বলার পর ব্যাকরণিক নীতি অনুযায়ী সর্বনাম ব্যবহার করে مَلِكِهِمْ ও إِلٰهِهِمْ বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু দোয়া ও প্রশংসার স্থল হওয়ার কারণে একই শব্দকে বার বার উল্লেখ করাই উত্তম বিবেচিত হয়েছে। কেউ কেউ نَاسٌ শব্দটি বার বার উল্লেখ করার ব্যাপারে একটি রসালতত্ত্ব ও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন : এ সূরায় نَاسٌ শব্দটি পাঁচবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম نَاسٌ বলে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা বুঝানো হয়েছে। একারণেই এর আগে رَبّ অর্থাৎ পালনকর্তা শব্দ আনা হয়েছে। কেননা অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারাই প্রতিপালনের অধিক মুখাপেক্ষী। দ্বিতীয় نَاسٌ দ্বারা যুবক শ্রেণী বুঝানো হয়েছে। مَلِك (রাজা, শাসক) শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শাসন যুবকদের জন্য উপযুক্ত। তৃতীয় نَاسٌ বলে সংসারত্যাগী, ইবাদতে মশগুল বুড়ো শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে। ইবাদতের অর্থ বাহী ইলাহ শব্দ তাদের জন্য উপযুক্ত। চতুর্থ نَاسٌ বলে আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দা বুঝানো হয়েছে। وَسْوَسَه শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শয়তান সৎকর্মপরায়ণদের শত্রু। তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করাই তার কাজ। পঞ্চম نَاسٌ বলে দুষ্কৃতকারী লোক বুঝানো হয়েছে। কেননা, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ –যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য অত্র আয়াতে সেই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। وَسْوَاسٌ শব্দটি ধাতু। এর অর্থ কুমন্ত্রণা। এখানে অতিরঞ্জনের নিয়মে শয়তানকেই কুমন্ত্রণা বলে দেওয়া হয়েছে; সে যেন আপাদমস্তক কুমন্ত্রণা। আওয়াজহীন গোপন বাক্যের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার আনুগত্যের আহ্বান করে। মানুষ এই বাক্যের অর্থ অনুভব করে কিন্তু কোনো আওয়াজ শুনে না। শয়তানের এরূপ আহ্বানকে কুমন্ত্রণা বলা হয়।–(কুরতুবী) خَنَّاسٌ শব্দটি خَنَسٌ থেকে উৎপন্ন। অর্থ পশ্চাতে সরে যাওয়া। মানুষ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে পিছনে সরে যাওয়াই শয়তানের অভ্যাস। মানুষ গাফিল হলে শয়তান আবার অগ্রসর হয়। অতঃপর হুঁশিয়ার হয়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে শয়তান আবার পশ্চাতে সরে যায়। এ কার্যধারাই অবিরাম অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দু'টি গৃহ আছে। একটিতে ফেরেশতা ও অপরটিতে শয়তান বাস করে। (ফেরেশতা সৎ কাজে এবং শয়তান অসৎ কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে)। মানুষ যখন আল্লাহর জিকির করে, তখন শয়তান পিছনে সরে যায় এবং যখন জিকিরে থাকে না, তখন তর চঞ্চু মানুষের অন্তরে স্থাপন করে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। –[মাযহারী]

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ অর্থাৎ কুমন্ত্রণাদাতা জিনের মধ্য থেকেও হয় এবং মানুষের মধ্য থেকেও হয়। অতএব সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে। এখন জিন শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝতে অসুবিধা হয় না; কারণ তারা অলক্ষ্যে থেকে মানুষের অন্তরে কোনো কথা রাখতে পারে। কিন্তু মানুষ শয়তান প্রকাশ্যে সামনে এসে কথা বলে। এটা কুমন্ত্রণা কিরূপে হলো? জবাব এই যে, মানুষ শয়তানও কারো সামনে এমন কথা বলে, যা থেকে সেই ব্যক্তির মনে কোনো ব্যাপার সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এই সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয় সে পরিষ্কার বলে না। শায়খ ইযযুদ্দীন (র.) তদীয় গ্রন্থে বলেন : মানুষ শয়তানের অনিষ্ট বলে নফসের (মনের) কুমন্ত্রণা বুঝানো হয়েছে। কেননা, জিন শয়তান যেমন মানুষের অন্তরে কু-কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে তেমনি স্বয়ং মানুষের নফসও মন্দ কাজেরই আদেশ করে। একারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন নফসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই, আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং তাঁর শিরক থেকেও।

শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম : ইবনে কাছীর (র.) বলেন : এ সূরার শিক্ষা এই যে, পালনকর্তা, অধিপতি, মা'বূদ–আল্লাহ তা'আলার এই গুণত্রয় উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা না করা মানুষের উচিত। কেননা প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি করে শয়তান লেগে আছে। সে প্রতি পদক্ষেপে মানুষকে ধ্বংস ও বরবাদ করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। প্রথমে তাকে পাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে এবং নানা প্রলোভন দিয়ে পাপ কাজের দিকে

নিয়ে যায়। এতে সফল না হলে মানুষের সৎকর্ম ও ইবাদত বিনষ্ট করার জন্য রিয়া, নাম-যশ, গর্ব ও অহংকার অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়। বিদ্বান লোকদের অন্তরে সত্য বিশ্বাস সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করে। অতএব, শয়তানের অনিষ্ট থেকে সে-ই বাঁচতে পারে যাকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার উপর তার সঙ্গী শয়তান চড়াও হয়ে না আছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথেও এই সঙ্গী আছে কি? উত্তর হলো? হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শয়তানের মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য করেন। এর ফলশ্রুতিতে শয়তান আমাকে সদুপদেশ ব্যতীত কিছু বলে না।

হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসে আছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে এতেকাফরত ছিলেন। এক রাত্রিতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সফিয়্যা (রা.) তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য মসজিদে যান। ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন। গলিপথে চলার সময় দু'জন আনসারী সাহাবী সামনে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ আওয়াজ দিলেন, তোমরা আস। আমার সাথে আমার সহধর্মিনী সফিয়্যা বিনতে-হুয়াই (রা.) রয়েছেন। সাহাবীদ্বয় সম্ভ্রমে আরজ করলেন : সোবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ, (অর্থাৎ আপনি মনে করেছেন যে, আমরা কোনো কুধারণা করব)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : নিশ্চয়। কারণ, শয়তান মানুষের রক্তের সাথে তার শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। আমি আশঙ্কা করলাম যে, শয়তান তোমাদের অন্তরে আমার সম্পর্কে কুধারণা সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমি বলে দিয়েছি যে, আমার সাথে কোনো বেগানা নারী নেই।

নিজে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যেমন জরুরি, তেমনি অন্য মুসলমানকে নিজের ব্যাপারে কুধারণা করার সুযোগ দেওয়াও দুরস্ত নয়। মানুষের মনে কুধারণা সৃষ্টি হয়– এ ধরনের আচরণ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে গেলে পরিষ্কার কথার মাধ্যমে অপবাদের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া সঙ্গত। সারকথা এই যে, উপরিউক্ত হাদীস প্রমাণ করেছে যে, শয়তানী কুমন্ত্রণা অত্যধিক বিপজ্জনক ব্যাপার। আল্লাহর আশ্রয় ব্যতীত এ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ নয়। এখানে যে কুমন্ত্রণা থেকে সতর্ক করা হয়েছে, এটা সেই কুমন্ত্রণা, যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে মশগুল হয়। অনিচ্ছাকৃত কুমন্ত্রণা ও কল্পনা, যা অন্তরে আসে এবং চলে যায়– সেটা ক্ষতিকর নয় এবং তজ্জন্য কোনো গুনাহ হয় না।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস -এর আশ্রয় প্রার্থনার মধ্যে একটি পার্থক্য : সূরা ফালাকে যার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার), তার মাত্র একটি বিশেষণ رَبِّ الْفَلَقِ উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেসব বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, সেগুলো অনেক বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো প্রথমে مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ বাক্যে সংক্ষেপে এবং পরে তিনটি বিশেষ বিপদের কথা আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নাসে যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তা তো মাত্র একটি; অর্থাৎ কুমন্ত্রণা এবং যার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তার তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে দোয়া করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, শয়তানের অনিষ্ট সর্ববৃহৎ অনিষ্ট; প্রথমত এ কারণে যে, অন্য আপদ-বিপদের প্রতিক্রিয়া মানুষের দেহ ও পার্থিব বিষয়াদিতে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু শয়তানের অনিষ্ট মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয়কে বিশেষত পরকালকে বরবাদ করে দেয়। তাই এ ক্ষতি গুরুতর। দ্বিতীয়ত দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু না কিছু বৈষয়িক প্রতিকারও মানুষের করায়ত্ত আছে এবং তা করা হয়ে থাকে, কিন্তু শয়তানের মোকাবিলা করার কোনো বৈষয়িক কৌশল মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে মানুষকে দেখে, কিন্তু মানুষ তাকে দেখে না। সুতরাং এর প্রতিকার একমাত্র আল্লাহর জিকির ও তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা।

মানুষের শত্রু মানুষও এবং শয়তানও। এই শত্রুদ্বয়ের আলাদা আলাদা প্রতিকার : মানুষের শত্রু মানুষও এবং শয়তানও। আল্লাহ তা'আলা মানুষ শত্রুকে প্রথমে সচ্চরিত্র, উদার ব্যবহার, প্রতিশোধ বর্জন ও সবরের মাধ্যমে বশ করার শিক্ষা দিয়েছেন। যদি, সে এতে বিরত না হয়, তবে তার সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করার আদেশ দান করেছেন। কিন্তু শয়তান শত্রুর মোকাবিলা কেবল আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে করার শিক্ষা দিয়েছেন। ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীরের ভূমিকায় তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। এসব আয়াতে মানুষের উপরিউক্ত শত্রুদ্বয়ের উল্লেখ করার পর মানুষ শত্রুর প্রতিরক্ষায় সচ্চরিত্রতা, প্রতিশোধ বর্জন ও সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান শত্রুর প্রতিরক্ষায় কেবল আশ্রয় প্রার্থনার সবক দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাছীর (র.) বলেন : সমগ্র কুরআনে এই বিষয়বস্তুর মাত্র তিনটি আয়াতই বিদ্যমান আছে। সূরা আ'রাফের এক আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ -এর অর্থ এই যে, ক্ষমা ও মার্জনা, সৎ কাজের আদেশ এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ শত্রুর মোকাবিলা করা। এ আয়াতেই অতঃপর বলা হয়েছে :

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ –এতে শয়তান শত্রুর মোকাবিলা করার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যার সারকথা আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রর্থনা করা। দ্বিতীয় সূরা 'কাদ আফলাহাল মু'মিনূনে' প্রথমে মানুষ শত্রুর মোকাবিলার প্রতিকার বর্ণনা করেছেন : اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ অর্থাৎ মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত কর। অতঃপর শয়তান শত্রুর মোকাবিলার জন্য বলেছেন : وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি আপনার আশ্রয় চাই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তাদের আমার কাছে আসা থেকে। তৃতীয় আয়াত সূরা হা-মীম সেজদায় প্রথমে মানুষ শত্রুকে প্রতিহত করা জন্য বলার হয়েছে : اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ অর্থাৎ তুমি মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত কর। এরূপ করলে দেখবে যে, তোমার শত্রু তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে। এ আয়াতেই পরবর্তী অংশে শয়তান শত্রুর মোকাবিলার জন্য বলা হয়েছে : وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এটা প্রায় সূরা আ'রাফেরই অনুরূপ আয়াত। এর সারমর্ম এই যে, শয়তান শত্রুর মোকাবিলা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ছাড়া কিছুই নয়। উপরিউক্ত তিনটি আয়াতেই মানুষ শত্রুর প্রতিকার ক্ষমা, মার্জনা ও সচ্চরিত্রতা বর্ণিত হয়েছে। কেননা, ক্ষমা ও অনুগ্রহের কাছে নতিস্বীকার করাই মানুষের স্বভাব। আর যে নরপিচশ মানুষের প্রকৃতিগত যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তার প্রতিকার জিহাদ ও যুদ্ধ ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, সে প্রকাশ্য শত্রু, প্রকাশ্য হাতিয়ার নিয়ে সামনে আসে। তার শক্তির মোকাবিলা শক্তি দ্বারা করা সম্ভব। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান স্বভাবগত দুষ্ট। অনুগ্রহ, ক্ষমা, মার্জনা তার বেলায় সুফলপ্রসূ নয়। যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমে তার বাহ্যিক মোকাবিলাও সম্ভবপর নয়। এই উভয় প্রকার নরম ও গরম কৌশল কেবল মানুষ শত্রুর মোকাবিলায় প্রযোজ্য–শয়তানের মোকাবিলায় নয়। তাই এর প্রতিকার কেবল আল্লাহর আশ্রয়ে আসা এবং তাঁর জিকিরে মশগুল হয়ে যাওয়া। সমগ্র কুরআনে তাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এই বিষয়বস্তুর উপরই কুরআন খতম করা হয়েছে।

পরিণতির বিচারে উভয় শত্রুর মোকাবিলার বিস্তর ব্যবধান রয়েছে : উপরে কুরআনী শিক্ষায় প্রথমে অনুগ্রহ ও সবর দ্বারা মানুষ শত্রুর প্রতিরক্ষা বর্ণিত হয়েছে। এতে সফল না হলে জিহাদ ও যুদ্ধ দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে বলা হয়েছে। উভয় অবস্থায় মোকাবিলাকারী মু'মিন কামিয়াবী থেকে বঞ্চিত নয়। সম্পূর্ণ অকৃতকার্যতা মু'মিনের জন্য সম্ভবপর নয়। শত্রুর মোকাবিলায় বিজয়ী হলে তো তার কামিয়াবী সুস্পষ্টই, পক্ষান্তরে যদি সে পরাজিত হয় অথবা নিহত হয়, তবে পরকালের সাওয়াব ও শাহাদতের ফজিলত দুনিয়ার কামিয়াবী অপেক্ষাও বেশি পাবে। সারকথা, মানুষ শত্রুর মোকাবিলায় হেরে যাওয়াও মু'মিনের জন্য ক্ষতির কথা নয়। কিন্তু শয়তানের খোশামোদ ও তাকে সন্তুষ্ট করা এবং গুনাহ তার মোকাবিলায় হেরে যাওয়া পরকালকে বরবাদ করারই নামান্তর। এ কারণেই শয়তান শত্রুর প্রতিরক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নেওয়াই একমাত্র প্রতিকার। তাঁর শরণের সামনে শয়তানের প্রত্যেকটি কলাকৌশল মাকড়সার জালের ন্যায় দুর্বল।

শয়তানী চক্রান্ত ক্ষণভঙ্গুর : উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, তাহলে শয়তানের শক্তিই বৃহৎ। তার মোকাবিলা সুকঠিন। এহেন ধারণা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। সূরা নাহলে কুরআন পাঠ করার সময় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ রয়েছে। সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমানদার আল্লাহর উপর ভরসাকারী অর্থাৎ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনাকারীর উপর শয়তানের কোনো জোর চলে না। বলা হয়েছে :

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ – اِنَّمَا سُلْطَانُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ.

অর্থাৎ তুমি যখন কুরআন পাঠ কর, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। যারা মু'মিন ও আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাদের উপর শয়তানের জোর চলে না। তার জোর তো কেবল তাদের উপরই চলে যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে ও তাকে অংশীদার মনে করে।

কুরআনের সূচনা ও সমাপ্তির মিল : আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতেহার মাধ্যমে কুরআন পাক শুরু করেছেন, যার সারমর্ম আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর তাঁর সাহায্য ও সরলপথে চলার তাওফীক প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সরলপথের মধ্যেই মানুষের যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামিয়াবী নিহিত আছে। কিন্তু এ দু'টি বিষয় অর্জনে এবং অর্জনের পর তা ব্যবহারে প্রতি পদক্ষেপে অভিশপ্ত শয়তানের চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণার জাল বিছানো থাকে। তাই এ জাল ছিন্ন করার কার্যকর পন্থা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা কুরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ اَلْقَوْلُ মাসদর نَصَرَ বাব (ق - و - ل) মূলবর্ণ জিনস اجوف واوى অর্থ- আপনি বলুন।

اَعُوْذُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْذُ মূলবর্ণ (ع - و - ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি।

رَبِّ : মাসদার। অর্থ– প্রতি পালক, মালিক, রব, প্রভু।

اَلْفَلَقِ : ইসমে ফে'ল। অর্থ– প্রভাত, উষা।

شَرِّ : একবচন, বহুবচন شرور অর্থ– অপকারিতা, যার দ্বারা সকলে কষ্ট পায়।

خَلَقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْقُ মূলবর্ণ (خ - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ– তিনি সৃষ্টি করেছেন।

غَاسِقٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْغَسْقُ মূলবর্ণ (غ - س - ق) জিনস صحيح অর্থ– অন্ধকার রাত।

وَقَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَقْبُ মূলবর্ণ (و - ق - ب) জিনস مثال واوى অর্থ– অদৃশ্য হয়ে যাবে।

اَلنَّفّٰثٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مبالغه বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّفْثُ মূলবর্ণ (ن - ف - ث) জিনস صحيح অর্থ– পড়ে পড়ে ফুৎকার কারিণী।

اَلْعُقَدِ : ইসমে জমা, বহুবচন, একবচন عقدة অর্থ– গ্রন্থি সমূহ, গিরা। আয়াতে وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ এখানে عُقَدُ দ্বারা উদ্দেশ্য গিরা। জাদু কারীরা চুলের বেনীতে জাদু মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিয়ে পরে তা লাগিয়ে দেয়। তাই জাদুকারীদেরকে معقد বলা হয়।

حَاسِدٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার اَلْحَسَدُ মূলবর্ণ (ح - س - د) জিনস صحيح অর্থ– হিংসা পোষণকারী।

حَسَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার اَلْحَسَدُ মূলবর্ণ (ح - س - د) জিনস صحيح অর্থ– সে হিংসা করে।

مَلِكِ : সিফাতের সীগাহ। অর্থ- বাদশাহ, রাজা, অধিপতি, মহাবিচারক।

اِلٰهِ : فعال -এর ওযনে, ইসমে মাফউলের অর্থে। উপাস্য, প্রত্যেক কওমের নিকট উপাসনার যোগ্য যে হবে, তাকেই ইলাহ বলা হয়। চাই সে সত্য মা'বূদ হোক বা বাতিল হোক।

اَلْوَسْوَاسِ : মাসদার। বাব فَعْلَلَةٌ কখনো কখনো وَسْوَسَةٌ ও মাসদার হিসেবে আসে। অর্থ– কুপ্ররোচনা প্রদানকারী।

خَنَّاسِ : মুবালাগার সিগাহ। فَعَّالٌ -এর ওযনে। মাসদার اَلْخَنْس মূলবর্ণ (خ - ن - س) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাদ পসরণকারী, শয়তান।

يُوَسْوِسُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার اَلْوَسْوَسَةُ মূলবর্ণ (و - س - و - س) জিনস মুরাক্কাব (لفيف مفروق ও مضاعف رباعى) অর্থ– প্ররোচনা প্রদান করে, মন্ত্রণাদেয়।

اَلْجِنَّةِ : ইসমে জমা। বহুবচন, একবচন, جِنِّىٌّ। অর্থ– জিন, জিনের দল।

اَلنَّاسِ : ইসমে জমা বা বহুবচন। অর্থ– লোক, মানুষ। কিছু লোকের মতে اَلنَّاسُ মূলতঃ أُنَاسٌ ছিল। উহ্য همزة -এর পরিবর্তে ال দেওয়া হয়েছে। তাই ال টি হামযাসহ আসে না এবং اَلْأُنَاسُ বলা হবে না। (বায়যাবী) পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা, বড়, ভালো, খারাপ, মুসলমান, কাফের সকলের ক্ষেত্রেই শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়। সম্মানিত, জ্ঞানীও উদ্দেশ্য হয় অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যে মনুষ্যত্বের সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যবলিতে পরিপূর্ণ। আর অভিধান বিদগণ বলেন, ناس -কে نَاسَ - يَنُوْسُ نَوْسًا থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হলো, ব্যাকুল হওয়া, অন্দোলিত হওয়া। জনৈক ইয়েমেনী যুবরাজের চুলের গুচ্ছ বা বেনি ঝুলে থাকত, তাই তাকে ذو نواس বলা শুরু হয়। এমতাবস্থায় نَاسٌ -এর তাসগীর হবে نُوَيْسٌ আর واو টি মৌলিক বলে স্বীকৃত হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّمَاخَلَقَ : এখানে قُلْ শব্দটি فعل امر এবং তার فاعل টি উহ্য। যার উহ্য রূপ হচ্ছে اَنْتَ ;اَعُوْذُ বাক্যটি قول -এর مقول ;اَعُوْذُ শব্দটি فعل مضارع مرفوع তার فاعل টি উহ্য। যার উহ্য রূপ হচ্ছে انا ;بِرَبِّ الْفَلَقِ বাক্যটি اَعُوْذُ -এর متعلق ;ومن شر বাক্যটি اَعُوْذُ -এর সাথে متعلق আর ما টি اسم موصول مضاف اليه আর خَلَقَ শব্দটি صلة এবং তার عائد টি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ خَلَقَهُ; ما টি مصدرية হওয়ার সম্ভাবনা ও রয়েছে।

وَمِنْ شَرِّغَاسِقٍ اذَا وَقَبَ এ বাক্যটি পূর্বের বাক্যের উপর عطف হয়েছে। اِذَا টি ظرفية আর وَقَبَ শব্দটি جر -এর স্থানে পতিত হয়েছে তার দিকে اِذَا টি اضافت হওয়ার কারণে। وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ -এ বাক্যটি ও পূর্বের বাক্যের উপর عطف হয়েছে। فِى الْعُقَدِ টি نَفّٰثٰت -এর সাথে متعلق হয়েছে।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَاحَسَدَ -এ বাক্যটি ও পূর্বের বাক্যের উপর عطف হয়েছে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ اِلٰهِ النَّاسِ -এখানে قُلْ শব্দটি فعل امر তার فاعل টি উহ্য। যার উহ্য রূপ হচ্ছে اَنْتَ ;اَعُوْذُ বাক্যটি قول -এর مقول ;اَعُوْذُ শব্দটি فعل مضارع مرفوع তার فاعل টি উহ্য যার উহ্যরূপ হলো انا ;بِرَبِّ النَّاسِ বাক্যটি اَعُوْذُ -এর সাথে متعلق হয়েছে। مَلِكِ النَّاسِ ও اِلٰهِ النَّاسِ দুটি بدل অথবা صفت অথবা عطف بيان;

مِنْ شَرِّالْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ এখানে مِنْ شَرِّ টি جارومجرور হয়ে اَعُوْذُ -এর সাথে متعلق হয়েছে। وَالْوَاسِ টি مضاف اليه আর الخناس টি صفت হয়েছে।

اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِالنَّاسِ এখানে اَلَّذِىْ টি وَاسْوَاسْ -এর صفت আর يُوَسْوِسُ শব্দটি فعل مضارع; فِى صُدُوْرِ النَّا টি جار ومجرور হয়ে يُوَسْوِسُ -এর সাথে متعلق হয়েছে।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ এ বাক্যটির দু'টি সম্ভাব না রয়েছে– ১. يُوَسْوِسُ -এর بيان হবে, আর তখন مِنْ টি بيانية হবে। ২. পৃথক বাক্য হবে। আর তখন من টি حرف جر হবে এবং يُوَسْوِسُ -এর সাথে متعلق হবে। অর্থাৎ– يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ جِهَةِ الْجِنَّةِ وَمِنْ جِهَةِ النَّاسِ –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮ পৃ. ৪৫৩ ও ৪৫৬]

সমাপ্ত